সচিত্র মাসিক পত্র

৮ম বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড

মাঘ, ১৩৪১—আষাঢ়, ১৩৪২

সম্পাদক

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এল্

পরিচালক

সুশীলচন্দ্র মিত্র, এম্-এ, ডি-লিট্ (প্যারিস)

২৭৷১, ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

বার্ষিক মূল্য—৬

বিষয়-সূচী

(মাঘ ১৩৪১—আষাঢ় ১৩৪২)

চিত্র সূচী

(কেবল পূর্ণ-পৃষ্ঠ)

অষ্টম বর্ষ, ২য় খণ্ড | মাঘ, ১৩৪১ | ১ম সংখ্যা

নারী প্রগতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শুনেছিনু নাকি মোটরের তেল
পথের মাঝেই করেছিল ফেল,
তবু তুমি গাড়ি ধরেছ দৌড়ে’---
হেন বীরনারী আছে কি গৌড়ে ?
নারী প্রগতির মহাদিনে আজি
নারী-পদগতি জিনিল এ বাজি ।

হায় কালিদাস, হায় ভবভূতি,
এই গতি আর এই সব জুতি
তোমাদের গজগামিনীর দিনে
কবি কল্পনা নেয়নি তো কিনে,’
কেনেনি ইষ্টিশনের টিকেট্ ;
হৃদয় ক্ষেত্রে খেলেনি ক্রিকেট্
চণ্ড বেগের ডাণ্ডাগোলায় ;
তারা তো মন্দ মধুর দোলায়
শান্ত মিলন-বিরহ-বন্ধে
বেঁধেছিল মন শিথিল ছন্দে ।

রেলগাড়ী আর মোটরের যুগে
বহু অপঘাত চলিয়াছি ভুগে'—
তাহারি মধ্যে এল সম্প্রতি
এ দুঃসাহস, এ তড়িৎগতি,
পুরুষেরে দিল দুর্দ্দাম তাড়া,
দুর্ব্বার তেজে নিষ্ঠুর নাড়া।—
ভূকম্পনের বিগ্রহবতী
প্রলয়দাতার নিগ্রহ অতি
বহন করিয়া এসেছে বঙ্গে
পাদুকামুখর চরণভঙ্গে।

সে ধ্বনি শুনিয়া পরলোকে বসি,'
কবি কালিদাস, পড়িল কি খসি'
উষ্ণীষ তব, দুরু দুরু বুকে
ছন্দ কিছু কি জুটিয়াছে মুখে?
একটি প্রশ্ন শুধাব এবার,
অকপটে তারি জবাব দেবার
আগে একবার ভেবে দেখো মনে,
উত্তর পেলে রাখিব গোপনে—
স্নিগ্ধচ্ছায়া ছিলে যে অতীতে
তেয়াগিয়া তাহা তড়িৎ গতিতে
নিতে চাও কভু তীব্রভাষণ
আধুনিকাদের কবির আসন?
মেঘদূত ছেড়ে বিদ্যুৎ দূত
লিখিতে পারে কি ভাষা মজবুৎ?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একদিন কলিকাতা ছিল অখ্যাত অসংস্কৃত পল্লী, সেখানে বসল বিদেশী বাণিজ্যের হাট, গ্রামের শ্যামল আবেষ্টন সরিয়ে দিয়ে সহরের উদ্ধত রূপ প্রকাশ পেতে লাগল। সেই সহর আধুনিক কালকে দিল আসন পেতে; বাণিজ্য এবং রাষ্ট্রের পথে দিগন্তের পর দিগন্তে সেই আসন বিস্তৃত হয়ে চলল।

এই উপলক্ষে বর্ত্তমান যুগের বেগবান চিত্তের সংস্রব ঘটল বাংলা দেশে। বর্ত্তমান যুগের প্রধান লক্ষণ এই যে, সে সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতায় বদ্ধ বা ব্যক্তিগত মূঢ় কল্পনায় জড়িত নয়। কী বিজ্ঞানে, কী সাহিত্যে সমস্ত দেশে সমস্ত কালে তার ভূমিকা। ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক সভ্যতা সর্ব্বমানবচিত্তের সঙ্গে মানসিক দেনা-পাওনার ব্যবহার প্রশস্ত করে চলেছে।

একদিকে পণ্য এবং রাষ্ট্রবিস্তারে পাশ্চাত্য মানুষ এবং তার অনুবর্ত্তীদের কঠোর শক্তিতে সমস্ত পৃথিবী অভিভূত, অন্যদিকে পূর্ব্বপশ্চিমে সর্ব্বত্রই আধুনিক কালের প্রধান বাহন পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অমোঘ প্রভাব বিস্তীর্ণ। বৈষয়িক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের আক্রমণ আমরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রতিরোধ করিতে পারি নি, কিন্তু পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে আমরা ক্রমে ক্রমে স্বতঃই স্বীকার করে নিচ্ছি। এই ইচ্ছাকৃত অঙ্গীকারের স্বাভাবিক কারণ এই সংস্কৃতির বন্ধনহীনতা, চিত্তলোকে এর সর্ব্বত্রগামিতা—নানাধারায় এর অবাধ প্রবাহ, এর মধ্যে নিত্য উদ্যমশীল বিকাশধর্ম্ম নিয়ত উন্মুখ, কোনো দুর্গম্য কঠিন নিশ্চল সংস্কারের জালে এ পৃথিবীর কোণে কোণে স্থবিরভাবে বদ্ধ নয়, রাষ্ট্রিক ও মানসিক স্বাধীনতার গৌরবকে এ ঘোষণা করেছে, সকল প্রকার যুক্তিহীন অন্ধ বিশ্বাসের অবমাননা থেকে মানুষের মনকে মুক্ত করবার জন্যে এর প্রয়াস। এই সংস্কৃতি আপন বিজ্ঞানে দর্শনে সাহিত্যে বিশ্ব ও মানবলোকের সকল বিভাগভুক্ত সকল বিষয়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত, সকল কিছুই পরীক্ষা করেছে, বিশ্লেষণ, সংঘটন, বর্ণন করেছে, মনোবৃত্তির গভীরে প্রবেশ ক'রে সূক্ষ্ম স্থূল যত কিছু রহস্যকে অবারিত করছে। তার অন্তহীন জিজ্ঞাসা-বৃত্তি প্রয়োজন অপ্রয়োজনে নির্ব্বিচার, তার রচনা তুচ্ছ মহৎ সকল ক্ষেত্রেই উপাদান সংগ্রহে নিপুণ। এই বিরাট সাধনা আপন বেগবান প্রশস্ত গতির দ্বারাই আপন ভাষা ও ভঙ্গীকে যথাযথ অত্যুক্তি-বিহীন এবং কৃত্রিমতার জঞ্জাল-বিমুক্ত করে তোলে।

এই সংস্কৃতির সোনার কাঠি প্রথম যেই তাকে স্পর্শ করল, অমনি বাংলাদেশ সচেতন হয়ে উঠল। এ নিয়ে বাঙালী যথার্থই গৌরব করতে পারে। সজল মেঘ নীল নদীর তট থেকেই আসুক, আর পূর্ব্ব সমুদ্রের বক্ষ থেকেই বাহিত হোক, তার বর্ষণে মুহূর্ত্তেই অন্তর থেকে সাড়া দেয় উর্ব্বরা ভূমি—মরুক্ষেত্র তাকে অস্বীকার করার দ্বারা যে অহঙ্কার করে, সেই অহঙ্কারের নিষ্ফলতা শোচনীয়। মানুষের চিত্তসম্ভূত যা কিছু গ্রহণীয়, তাকে সম্মুখে

আসবামাত্র চিনতে পারা ও অভ্যর্থনা করতে পারার উদার শক্তিকে শ্রদ্ধা করতেই হবে। চিত্তসম্পদকে সংগ্রহ করার অক্ষমতাই বর্ব্বরতা, সেই অক্ষমতাকেই মানসিক আভিজাত্য ব'লে যে মানুষ কল্পনা করে, সে কৃপাপাত্র।

প্রথম আরম্ভে ইংরেজী শিক্ষাকে ছাত্ররূপেই বাঙালী যুবক গ্রহণ করেছে। সেটা ধার-করা সাজ সজ্জার মতোই তাকে অস্থির করে রাখলে, বাইরে থেকে পাওয়া জিনিষের অহঙ্কার নিয়ত উদ্যত হয়ে রইল। ইংরেজী সাহিত্যের ঐশ্বর্য্যভোগের অধিকার তখন ছিল দুর্ল্লভ এবং অল্পসংখ্যক লোকের আয়ত্ত-গম্য, সেই কারণেই এই সঙ্কীর্ণ শ্রেণীগত ইংরেজি-পোড়োর দল নূতন লব্ধ শিক্ষাকে অস্বাভাবিক আড়ম্বরের সঙ্গেই ব্যবহার করতেন।

কথায়-বার্ত্তায়, পত্র ব্যবহারে, সাহিত্য রচনায় ইংরেজি ভাষার বাইরে পা বাড়ানো তখনকার শিক্ষিতদের পক্ষে ছিল অকৌলিন্যের লক্ষণ। বাংলা-ভাষা তখন সংস্কৃত পণ্ডিত ও বাংলা পণ্ডিত দুই দলের কাছেই ছিল অপাংক্তেয়। এ ভাষার দারিদ্র্যে তাঁরা লজ্জা বোধ করতেন। এই ভাষাকে তাঁরা এমন একটি অগভীর শীর্ণ নদীর মতো মনে করতেন, যার হাঁটুজলে পাড়াগেঁয়ে মানুষের প্রতিদিনের সামান্য ঘোরো কাজ চলে মাত্র, কিন্তু দেশবিদেশের পণ্যবাহী জাহাজ চলতে পারে না।

তবু একথা মানতে হবে এই অহঙ্কারের মূলে ছিল পশ্চিম মহাদেশ হতে আহরিত নূতন সাহিত্য-রস-সম্ভোগের সহজশক্তি। সেটা বিস্ময়ের বিষয়, কেননা, তাঁদের পূর্ব্বতন সংস্কারের সঙ্গে এর সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ছিল। অনেককাল মনের জমি ঠিক মতো চাষের অভাবে ভরা ছিল আগাছায়, কিন্তু তার অন্তরে অন্তরে সফলতার শক্তি ছিল প্রচ্ছন্ন, তাই কৃষির সূচনা হবামাত্রই সাড়া দিতে সে দেরী করলে না। পূর্ব্বকালের থেকে তার বর্ত্তমান অবস্থার যে প্রভেদ দেখা গেল তা দ্রুত এবং বৃহৎ। তার একটা বিস্ময়কর প্রমাণ দেখি রামমোহন রায়ের মধ্যে। সেদিন তিনি যে বাংলা ভাষায় ব্রহ্মসূত্রের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হলেন, সে ভাষার পূর্ব্ব পরিচয় এমন কিছুই ছিল না, যাতে করে তার উপরে এত বড়ো দুরূহ ভার অর্পণ সহজে সম্ভবপর মনে হোতে পারত। বাংলা ভাষায় তখন সাহিত্যিক গদ্য সবে দেখা দিতে আরম্ভ করেছে নদীর তটে সদ্যশায়িত পলিমাটির স্তরের মতো। এই অপরিণত গদ্যেই দুর্ব্বোধ তত্ত্বালোচনার ভারবহ ভিত্তি সঙ্ঘটন করতে রামমোহন কুণ্ঠিত হলেন না।

এই যেমন গদ্যে, পদ্যে তেমনি অসমসাহস প্রকাশ করলেন মধুসূদন। পাশ্চাত্য হোমর মিলটন রচিত মহাকাব্যসঞ্চারী মন ছিল তাঁর। তার রসে তিনি একান্তভাবে মুগ্ধ হয়েছিলেন বলেই তার ভোগমাত্রেই স্তব্ধ থাকতে পারেন নি। আষাঢ়ের আকাশে সজল নীল মেঘপুঞ্জ থেকে গর্জ্জন নামল, গিরিগুহা থেকে তার অনুকরণে প্রতিধ্বনি উঠল মাত্র, কিন্তু আনন্দ চঞ্চল ময়ূর আকাশে মাথা তুলে সাড়া দিলে আপন কেকাধ্বনিতেই! মধুসূদন সঙ্গীতের দুর্নিবার উৎসাহ ঘোষণা করবার জন্যে আপন ভাষাকেই বক্ষে টেনে নিলেন। যে যন্ত্র ছিল ক্ষীণধ্বনি একতারা, তাকে অবজ্ঞা করে ত্যাগ করলেন না, তাতেই তিনি গম্ভীর সুরের নানা তার চড়িয়ে তাকে রুদ্রবীণা করে তুললেন। এ যন্ত্র একেবারে নতুন, একমাত্র তাঁরই আপন-গড়া। কিন্তু তাঁর এই সাহস তো ব্যর্থ হোলো না। অপরিচিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের ঘন-ঘর্ঘর-মন্দ্রিত রথে চ'ড়ে বাংলা সাহিত্যে সেই প্রথম আবির্ভূত হোলো আধুনিক কাব্য "রাজবহুন্নত

ধ্বনি,” কিন্তু তাকে সমাদরে আহ্বান করে নিতে বাংলাদেশে অধিক সময় তো লাগেনি। অথচ এর অনতিপূর্ব্বকালবর্ত্তী সাহিত্যের যে নমুনা পাওয়া যায়, তার সঙ্গে এর কি সুদূর তুলনাও চলে?

আমি জানি এখনো আমাদের দেশে এমন মানুষ পাওয়া যায়, যারা সেই পুরাতনকালের অনুপ্রাস-কণ্টকিত শিথিল ভাষার পৌরাণিক পাঁচালি প্রভৃতি গানকেই বিশুদ্ধ ন্যাশনাল সাহিত্য আখ্যা দিয়ে আধুনিক সাহিত্যের প্রতি প্রতিকূল কটাক্ষপাত করে থাকেন। বলা বাহুল্য অধিকাংশ স্থলেই সেটা একটা ভান মাত্র। তারা যে স্বয়ং যথার্থতঃ সেই সাহিত্যেরই রস-সম্ভোগে একান্ত নিবিষ্ট থাকেন, রচনায় বা আলোচনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। ভূনির্ম্মাণের কোনো এক আদিপর্ব্বে হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণী স্থিতিলাভ করেছিল, আজ পর্য্যন্ত সে আর বিচলিত হয় নি; পর্ব্বতের পক্ষেই এটা সম্ভবপর। মানুষের চিত্ত তো স্থাণু নয়, অন্তরে বাহিরে চারদিক থেকেই নানাপ্রভাব তার উপর নিয়ত কাজ করছে, তার অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি এবং অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটছে নিরন্তর, সে যদি জড়বৎ অসাড় না হয়, তাহোলে তার আত্মপ্রকাশে বিচিত্র পরিবর্ত্তন ঘটবেই, ন্যাশনাল আদর্শ নাম দিয়ে কোনো একটি সুদূরভূত কালবর্ত্তী আদর্শ বন্ধনে নিজেকে নিশ্চল করে রাখা তার পক্ষে স্বাভাবিক হোতেই পারে না, যেমন স্বাভাবিক নয় চীনে মেয়েদের পায়ের বন্ধন। সেই বন্ধনকে ন্যাশনাল নামের ছাপ দিয়ে গর্ব্ব করা বিড়ম্বনা। সাহিত্যে বাঙালীর মন অনেক কালের আচার-সঙ্কীর্ণতা থেকে অবিলম্বে মুক্তি যে পেয়েছিল, তাতে তার চিৎশক্তির অসামান্যতাই প্রমাণ করেছে।

নবযুগের প্রাণবান সাহিত্যের স্পর্শে কল্পনাবৃত্তি যেই নবপ্রভাতে উদ্বোধিত হোলো, অমনি মধুসূদনের প্রতিভা তখনকার বাংলাভাষার পায়ে-চলা-পথকে আধুনিক কালের রথযাত্রার উপযোগী করে তোলাকে দুরাশা ব'লে মনে করলে না। আপন শক্তির পরে শ্রদ্ধা ছিল বলেই বাংলাভাষার পরে কবি শ্রদ্ধা প্রকাশ করলেন; বাংলাভাষাকে নির্ভীকভাবে এমন আধুনিকতায় দীক্ষা দিলেন যা তার পূর্ব্বানুবৃত্তি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বঙ্গবাণীকে গম্ভীর স্বরনির্ঘোষে মন্দ্রিত করে তোলবার জন্যে সংস্কৃতভাণ্ডার থেকে মধুসূদন নিঃসঙ্কোচে যে সব শব্দ আহরণ করতে লাগলেন, সেও নূতন, বাংলা পয়ারের সনাতন সমদ্বিভক্ত আল ভেঙে দিয়ে তার উপর অমিত্রাক্ষরের যে বন্যা বইয়ে দিলেন সেও নূতন, আর মহাকাব্য খণ্ডকাব্য রচনায় যে রীতি অবলম্বন করলেন, তাও বাংলাভাষায় নূতন। এটা ক্রমে ক্রমে পাঠকের মনকে সইয়ে সইয়ে সাবধানে ঘটল না, শাস্ত্রিক প্রথায় মঙ্গলাচরণের অপেক্ষা না রেখে কবিতাকে বহন করে নিয়ে এলেন একমুহূর্ত্তে ঝড়ের পিঠে, প্রাচীন সিংহদ্বারের আগল গেল ভেঙে।

মাইকেল সাহিত্যে যে যুগান্তর আনলেন, তার অনতিকাল পরেই আমার জন্ম। আমার যখন বয়স অল্প, তখন দেখেছি কত যুবক ইংরাজী সাহিত্যের সৌন্দর্য্যে ভাববিহ্বল। সেক্‌স্‌পিয়র মিলটন বায়রণ মেকলে বার্ক তাঁরা প্রবল উত্তেজনায় আবৃত্তি করে যেতেন পাতার পর পাতা। অথচ তাঁদের সমকালেই বাংলা সাহিত্যে যে নূতন প্রাণের উদ্যম সদ্য জেগে উঠেছে, সে তাঁরা লক্ষ্যই করেন নি। সেটা যে অবধানের যোগ্য তাও তাঁরা মনে করতেন না। সাহিত্যে তখন যেন ভোরের বেলা কারো ঘুম ভেঙেছে, অনেকেরই ঘুম ভাঙে নি। আকাশে অরুণালোকের স্বাক্ষরে তখনো ঘোষিত হয় নি প্রভাতের জ্যোতির্ম্ময়ী প্রত্যাশা।

বঙ্কিমের লেখনী তার কিছু পূর্ব্বেই সাহিত্যের অভিযানে যাত্রা আরম্ভ করেছে। তখন অন্তঃপুরে বটতলার ফাঁকে ফাঁকে দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, কপালকুণ্ডলা সঞ্চরণ করছে দেখতে পাই। যাঁরা তার রস পেয়েছেন, তাঁরা তখনকার কালের নবীনা হোলেও প্রাচীনকালীন সংস্কারের বাহিরে তাঁদের গতি ছিল অনভ্যস্ত। আর কিছু না হোক ইংরাজী তাঁরা পড়েন নি। একথা মানতেই হবে বঙ্কিম তাঁর নভেলে আধুনিক রীতিরই রূপ ও রস এনেছিলেন। তাঁর ভাষা পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাকৃত বাংলা ও সংস্কৃত বাংলা থেকে অনেক ভিন্ন। তার রচনার আদর্শ কী বিষয়ে কী ভাবে কী ভঙ্গীতে পাশ্চাত্যের আদর্শের অনুগত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সেকালে ইংরাজী ভাষায় বিদ্বান ব'লে যাঁদের অভিমান, তাঁরা তখনো তাঁর লেখার যথেষ্ট সমাদর করেন নি, অথচ সে লেখা ইংরাজী শিক্ষাহীন তরুণীদের হৃদয়ে প্রবেশ করতে বাধা পায় নি, এ আমরা দেখেছি। তাই সাহিত্যে আধুনিকতার আবির্ভাবকে আর তো ঠেকানো গেল না। এই নব্য রচনারীতির ভিতর দিয়ে সেদিনকার বাঙালী-মন মানসিক চিরাভ্যাসের অপ্রশস্ত বেষ্টনকে অতিক্রম করতে পারলে,—যেন অসূর্য্যম্পশ্যরূপা অন্তঃপুরচারিণী আপন প্রাচীর-ঘেরা প্রাঙ্গণের বাইরে এসে দাঁড়াতে পেরেছিল। এই মুক্তি সনাতন রীতির অনুকূল না হোতে পারে, কিন্তু সে যে চিরন্তন মানবপ্রকৃতির অনুকূল, দেখতে দেখতে তার প্রমাণ পড়ল ছড়িয়ে।

এমন সময়ে বঙ্গদর্শন মাসিকপত্র দেখা দিল। তখন থেকে বাঙালীর চিত্তে নব্য বাংলা সাহিত্যের অধিকার দেখতে দেখতে অবারিত হোলো সর্ব্বত্র। ইংরাজী ভাষায় যাঁরা প্রবীণ তাঁরাও একে সবিস্ময়ে স্বীকার করে নিলেন। নবসাহিত্যের হাওয়ায় তখনকার তরুণী পাঠিকাদের মনঃপ্রকৃতির যে পরিবর্ত্তন হোতে আরম্ভ হয়েছিল সে কথা নিঃসন্দেহ। তরুণীরা সবাই রোমান্টিক হয়ে উঠছে এইটেই তখনকার দিনের ব্যঙ্গ-রসিকদের প্রহসনের বিষয় হয়ে উঠল। কথাটা সত্য। ক্লাসিকের অর্থাৎ চিরাগত রীতির বাইরেই রোমান্টিকের লীলা। রোমান্টিকে মুক্তক্ষেত্রে হৃদয়ের বিহার। সেখানে অনভ্যস্ত পথে ভাবাবেগের আতিশয্য ঘটতে পারে। তাতে ক'রে পূর্ব্ববর্ত্তী বাঁধা নিয়মানুবর্ত্তনের তুলনায় বিপজ্জনক এমন কি হাস্যজনক হয়ে উঠবার আশঙ্কা থাকে। দাঁড় থেকে ছাড়া পাওয়া কল্পনার পায়ে শিকল বাঁধা না থাকাতে ক্ষণে ক্ষণে হয়তো সে ঝাঁপিয়ে পড়ে অশোভনতায়। কিন্তু বড়ো পরিপ্রেক্ষণিকায় ছড়িয়ে দেখলে দেখা যায় অভিজ্ঞতার বিচিত্র শিক্ষার মুক্তি মোটের উপরে সকল প্রকার স্খলনকে অতিকৃতিকে সংশোধন করে চলে।

যাই হোক্ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গতিবেগ বাংলার ছেলেমেয়েকে কোন্ পথে নিয়ে চলেছে, এ সভায় তার আলোচনার উপলক্ষ্য নেই। এই সভাতেই বাংলা সাহিত্যের বিশেষ সফলতার যে প্রমাণ স্পষ্ট হয়েছে—সভার কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে সূত্রধাররূপে আজ তারই কথা জানিয়ে দেওয়া আমার কর্ত্তব্য বলে মনে করি।

এমন একদিন ছিল যখন বাংলা প্রদেশের বাইরে বাঙালী পরিবার দুই এক পুরুষ যাপন করতে করতেই বাংলা ভাষা ভুলে যেত। ভাষার যোগই অন্তরের নাড়ীর যোগ,—সেই যোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হোলেই মানুষের পরম্পরাগত বুদ্ধিশক্তি ও হৃদয়বৃত্তির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয়ে যায়। বাঙালী-চিত্তের যে বিশেষত্ব, মানব-সংসারে নিঃসন্দেহ তার একটা বিশেষ মূল্য আছে। যেখানেই তাকে হারাই সেখানেই সমস্ত বাঙালী জাতির পক্ষে বড়ো ক্ষতির কারণ ঘটা সম্ভব।

নদীর ধারে যে জমী আছে, তার মাটীতে যদি বাঁধন না থাকে, তবে তট কিছু কিছু করে ধ্বসে পড়ে। ফসলের আশা হারাতে থাকে। যদি কোনো মহাবৃক্ষ সেই মাটীর গভীর অন্তরে দূরব্যাপী শিকড় ছড়িয়ে দিয়ে তাকে এঁটে ধরে তা হোলে স্রোতের আঘাত থেকে সে ক্ষেত্রে রক্ষা পায়। বাংলা দেশের চিত্ত-ক্ষেত্রকে তেমনি করেই ছায়া দিয়েছে ফল দিয়েছে নিবিড় ঐক্য ও স্থায়িত্ব দিয়েছে বাংলা সাহিত্য। অল্প আঘাতেই সে খণ্ডিত হয় না। একদা আমাদের রাষ্ট্রপতিরা বাংলাদেশের মাঝখানে বেড়া তুলে দেবার যে প্রস্তাব করেছিলেন, সেটা যদি আরো পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বে ঘটত, তবে তার আশঙ্কা আমাদের এত তীব্র আঘাতে বিচলিত করতে পারত না। ইতিমধ্যে বাংলার মর্ম্মস্থলে যে অখণ্ড আত্মবোধ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তার প্রধানতম কারণ বাংলা সাহিত্যে। বাংলা দেশকে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় খণ্ডিত করার ফলে তার ভাষা তার সংস্কৃতি খণ্ডিত হবে, এই বিপদের সম্ভাবনায় বাঙালী উদাসীন থাকতে পারে নি। বাঙালী চিত্তের এই ঐক্যবোধ সাহিত্যের যোগে বাঙালীর চৈতন্যকে ব্যাপকভাবে গভীরভাবে অধিকার করেছে। সেই কারণেই আজ বাঙালী যত দূরে যেখানেই যাক্ বাংলাভাষা ও সাহিত্যের বন্ধনে বাংলা দেশের সঙ্গে যুক্ত থাকে। কিছুকাল পূর্ব্বে বাঙালীর ছেলে বিলাতে গেলে ভাষায় ভাবে ও ব্যবহারে যেমন স্পর্দ্ধা-পূর্ব্বক অবাঙালীত্বের আড়ম্বর করত, এখন তা নেই বললেই চলে, কেননা বাংলাভাষায় যে সংস্কৃতি আজ উজ্জ্বল, তার প্রতি শ্রদ্ধা না প্রকাশ করা এবং তার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতাই আজ লজ্জার বিষয় হয়ে উঠেছে।

রাষ্ট্রীয় ঐক্য সাধনার তরফ থেকে ভারতবর্ষে বঙ্গেতর প্রদেশের প্রতি প্রবাস শব্দ প্রয়োগ করায় আপত্তি থাকতে পারে। কিন্তু মুখের কথা বাদ দিয়ে বাস্তবিকতার যুক্তিতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে অকৃত্রিম আত্মীয়তার সাধারণ ভূমিকা পাওয়া যায় কিনা, সে তর্ক ছেড়ে দিয়েও সাহিত্যের দিক থেকে ভারতের অন্য প্রদেশ বাঙালীর পক্ষে প্রবাস সে কথা মানতে হবে। এসম্বন্ধে আমাদের পার্থক্য এত বেশী যে, অন্য প্রদেশের বর্ত্তমান সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলা সংস্কৃতির সামঞ্জস্য সাধন অসম্ভব। এ ছাড়া সংস্কৃতির প্রধান যে বাহন ভাষা সে সম্বন্ধে বাংলার সঙ্গে অন্য প্রদেশীয় ভাষার কেবল ব্যাকরণের প্রভেদ নয় অভিব্যক্তির প্রভেদ। অর্থাৎ ভাবের ও সত্যের প্রকাশকল্পে বাংলা ভাষা নানা প্রতিভাশালীর সাহায্যে যে রূপ এবং শক্তি উদ্ভাবন করেছে, অন্য প্রদেশের ভাষায় তা পাওয়া যায় না, অথবা তার অভিমুখিতা অন্যদিকে। অথচ সে সকল ভাষার মধ্যে হয়তো নানা বিষয়ে বাংলার চেয়ে শ্রেষ্ঠতা আছে। অন্য প্রদেশবাসীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে বাঙালী-হৃদয়ের মিলন অসম্ভব নয়, আমরা তার অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখেছি, যেমন পরলোকগত অতুলপ্রসাদ সেন। উত্তর-পশ্চিমে যেখানে তিনি ছিলেন, মানুষ হিসাবে সেখানকার লোকের সঙ্গে তাঁর হৃদয়ে হৃদয়ে মিল ছিল, কিন্তু সাহিত্য রচয়িতা বা সাহিত্য রসিক হিসাবে সেখানে তিনি প্রবাসীই ছিলেন, একথা স্বীকার না করে উপায় নেই।

তাই বলছি আজ প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন বাঙালীর অন্তরতম ঐক্যচেতনাকে সপ্রমাণ করছে। নদী যেমন স্রোতের পথে নানা বাঁকে বাঁকে আপন নানাদিকগামী তটকে এক ক'রে নেয়, আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্য তেমনি করেই নানা দেশ প্রদেশের বাঙালীর হৃদয়ের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তাকে এক

প্রাণধারায় মিলিয়েছে। সাহিত্যে বাঙালী আপনাকে প্রকাশ করেছে বলেই, আপনার কাছে আপনি সে আর অগোচর নেই বলেই যেখানে থাক আপনাকে আর সে ভুলতে পারে না। এই আত্মানুভূতিতে তার গভীর আনন্দ বৎসরে বৎসরে নানাস্থানে নানা সম্মিলনীতে বারম্বার উচ্ছ্বসিত হচ্ছে।

অথচ সাহিত্য ব্যাপারে সম্মিলনীর কোনো প্রকৃত অর্থ নেই। পৃথিবীতে দশে মিলে অনেক কাজ হয়ে থাকে কিন্তু সাহিত্য তার অন্তর্গত নয়। সাহিত্য একান্তই একলা মানুষের সৃষ্টি। রাষ্ট্রিক বাণিজ্যিক সামাজিক বা ধর্ম্ম-সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠানে দল বাঁধা আবশ্যক হয়। কিন্তু সাহিত্য সাধনা যার, যোগীর মতো তপস্বীর মতো সে একা। অনেক সময়ে তার কাজ দশের মতের বিরুদ্ধে। মধুসূদন বলেছিলেন, "বিরচিব মধুচক্র"। সেই কবির মধুচক্র একলা মধুকরের। মধুসূদন যেদিন মৌচাক মধুতে ভ'রছিলেন, সেদিন বাংলায় সাহিত্যের কুঞ্জবনে মৌমাছি ছিলই বা কয়টি? তখন থেকে নানা খেয়ালের বশবর্ত্তী একলা মানুষে মিলে বাংলা সাহিত্যকে বিচিত্র ক'রে গ'ড়ে তুলল। এই বহুস্রষ্টার নিভৃত তপোজাত সাহিত্য-লোকে বাংলার চিত্ত আপন অন্তরতম আনন্দভবন পেয়েছে, সম্মিলনীগুলি তারই উৎসব। বাংলা সাহিত্য যদি দল বাঁধা মানুষের সৃষ্টি হোত, তা হোলে আজ তার কী দুর্গতিই ঘটত তা মনে করলেও বুক কেঁপে ওঠে। বাঙালী চিরদিন দলাদলি করতেই পারে, কিন্তু দল গড়ে তুলতে পারে না। পরস্পরের বিরুদ্ধে ঘোঁট করতে, চক্রান্ত করতে, জাত মারতে তার স্বাভাবিক আনন্দ, আমাদের সানাতন চণ্ডী-মণ্ডপের উৎপত্তি সেই আনন্দোদ্ভাব। মানুষের সব চেয়ে নিকটতম যে সম্বন্ধ বন্ধন বিবাহ ব্যাপারে, গোড়াতেই সেই বন্ধনকে অহৈতুক অপমানে জর্জ্জরিত করবার বরযাত্রিক মনোবৃত্তিই তো বাংলাদেশের সনাতন বিশেষত্ব। তারপরে কবির লড়াইয়ের প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতি ব্যক্তিগত অশ্রাব্য গালি বর্ষণকে যারা উপভোগ করবার জন্যে একদা ভিড় করে সমবেত হোতো কোনো পক্ষের প্রতি বিশেষ শত্রুতাবশতঃই যে তাদের সেই তুয়ো দেবার উচ্ছ্বসিত উল্লাস তা তো নয়, নিন্দার মাদক রস-ভোগের নৈর্ব্যক্তিক প্রবৃত্তিই এর মূলে। আজ বর্ত্তমান সাহিত্যেও বাঙালীর ভাঙনধরানো মনের কুৎসা-মুখরিত নিষ্ঠুর পীড়ন-নৈপুণ্য সর্ব্বদাই উদ্যত। সেটা আমাদের ক্রূর অট্টহাস্যোদ্বেল গ্রাম্য অসৌজন্য সম্ভোগের সামগ্রী। আজ তো দেখতে পাই বাংলা দেশের ছোটো বড়ো খ্যাত অখ্যাত গুপ্ত প্রকাশ্য নানা কণ্ঠের তূণ থেকে শব্দভেদী রক্তপিপাসু বাণে আকাশ ছেয়ে ফেলল। এই অদ্ভুত আত্মলাঘবকারী মহোৎসাহে বাঙালী আপন সাহিত্যকে খান্ খান্ করে ফেলতে পারত, পরস্পরকে তারস্বরে তুয়ো দিতে দিতে সাহিত্যের মহাশ্মশানে ভূতের কীর্ত্তন করতে তার দেরী লাগত না—কিন্তু সাহিত্য যেহেতু কো-অপারেটিভ বাণিজ্য নয়, জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানী নয়, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন নয়, যেহেতু সে নির্জ্জনচর একলা মানুষের, সেইজন্যে সকল প্রকার আঘাত এড়িয়েও বেঁচে গেছে। এই একটা জিনিষ ঈর্ষাপরায়ণ বাঙালী সৃষ্টি করতে পেরেছে, কারণ সেটা বহুজনে মিলে করতে হয়নি। এই সাহিত্য রচনায় বাঙালী নিজের একমাত্র কীর্ত্তিকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছে বলেই এই নিয়ে তার এত আনন্দ। আপন সৃষ্টির মধ্যে বৃহৎ ঐক্যক্ষেত্রে বাঙালী আজ এসেছে গৌরব করবার জন্যে। বিচ্ছিন্ন যারা তারা মিলিত হয়েছে, দূর যারা তারা পরস্পরের নৈকট্যে স্বদেশের নৈকট্য অনুভব করছে। মহৎ সাহিত্য-

প্রবাহিনীতে বাঙালী চিত্তের পঙ্কিলতাও মিশ্রিত হচ্চে ব'লে দুঃখ ও লজ্জার কারণ সত্ত্বেও ভাবনার কারণ অধিক নাই। কারণ সর্ব্বত্রই ভদ্র সাহিত্য স্বভাবতঃই সকল দেশের সকল কালের, যা কিছু স্থায়িত্বধর্ম্মী তাই আপনিই বাছাই হয়ে তার মধ্যে থেকে যায়; আর সমস্তই ক্ষণজীবি, তারা গ্লানিজনক উৎপাত করতে পারে কিন্তু নিত্যকালের বাসা বাঁধবার অধিকার তাদের নেই। গঙ্গার পুণ্যধারায় রোগের বীজও ভেসে আসে বিস্তর, কিন্তু স্রোতের মধ্যে তার প্রাধান্য দেখতে পাইনে, আপনি তার শোধন এবং বিলোপ হোতে থাকে; কারণ মহানদী তো মহা নর্দ্দমা নয়, বাঙালীর যা কিছু শ্রেষ্ঠ, শাশ্বত, যা সর্ব্বমানবের বেদীমূলে উৎসর্গ করবার উপযুক্ত, তাই আমাদের বর্ত্তমান কাল রেখে দিয়ে যাবে ভাবী-কালের উত্তরাধিকার রূপে। সাহিত্যের মধ্যে বাঙালীর যে পরিচয় স্পষ্ট হচ্চে, বিশ্ব-সভায় আপন আত্মসম্মান সে রাখবে, কলুষের আবর্জ্জনা সে বর্জ্জন করবে, বিশ্ব দেবতার কাছে বাংলাদেশের অর্ঘ্যরূপেই সে আপন সমাদর লাভ করবে। বাঙালী সেই মহৎ প্রত্যাশাকে আজ আপন নাড়ীর মধ্যে অনুভব করছে ব'লেই বৎসরে বৎসরে নানাস্থানে সম্মিলনী আকারে পুনঃ পুনঃ বঙ্গভারতীর জয়ধ্বনি ঘোষণা করতে সে প্রবৃত্ত। তার আশা সার্থক হোক, কালে কালে আসুক বাণীতীর্থপথযাত্রীরা, বাংলা দেশের হৃদয়ে বহন ক'রে আনুক উদারতর মনুষ্যত্বের আকাঙ্ক্ষা, অন্তরে বাহিরে সকল প্রকার বন্ধন মোচনের সাধনমন্ত্র।

কলিকাতায় প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের দ্বাদশ অধিবেশনে উদ্বোধন-অভিভাষণ } রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৬

ম্যানেজার বিরাজ দত্ত মোটর লইয়া ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। বন্দনাকে সসম্মানে ট্রেণ হইতে নামাইয়া গাড়ীতে আনিয়া বসাইলেন।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, মা আজও বাড়ী এসে পৌছননি দত্ত মশাই ?

—না দিদি।

—মৈত্রেয়ী ?

—না, তাঁকে ত কেউ আনতে যায়নি।

—বাসু ভালো আছে ?

—আছে।

—মুখুয্যে মশাই ? দ্বিজুবাবু ?

—বড়বাবু ভালো আছেন, কিন্তু ছোটবাবুকে দেখলে তেমন ভালো বোধ হয় না।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, জ্বরটর হয়নি ত ?

দত্ত বলিলেন, ঠিক জানিনে দিদি। কিন্তু সমস্ত কাজকর্ম্ম করেইত বেড়াচ্চেন।

বন্দনা কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, দত্ত মশাই, আমার মনে হয় মা হয়ত এ দুঃখের মধ্যে আর আসবেননা। কিন্তু দুঃখ যতই হোক শ্রাদ্ধের আয়োজন ত করতে হবে। কিছু হচ্চে কি ?

—হচ্চে বই কি দিদি। কর্ত্তাবাবুর শ্রাদ্ধে যেমন হয়েছিল প্রায় তেমনি ব্যবস্থাই হচ্চে।

কথাটা ভালো বুঝিতে না পারিয়া বন্দনা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, কার মতো বলচেন, মুখুয্যে মশায়ের পিতৃশ্রাদ্ধের মতো ? তেমনি বড় আয়োজন ?

দত্ত বলিলেন, হাঁ প্রায় তেম্‌নিই। গেলেই দেখতে পাবেন। বড়বাবু ডেকে বললেন, দ্বিজু পাগলামি করিসনে, সব জিনিসেরই একটা মাত্রা আছে। ছোটবাবু বললেন মাত্রা আছে জানি, কিন্তু মাত্রা-বোধ তো সকলের এক নয় দাদা। বড়বাবু হেসে বললেন, কিন্তু তুই যে সকলের সকল মাত্রাই

ডিঙিয়ে যাচ্চিস দ্বিজু। ছোটবাবু বললেন, তাহ'লে আপনাদের কাছে মিনতি এই একটিবারের জন্যে আমাকে ক্ষমা করুন। আমি মাত্রা লঙ্ঘন করতে পারবো কিন্তু বৌদিদির মর্য্যাদা লঙ্ঘন করতে পারবো না। এরপরে আর কেউ কথা কয়নি, এখন আপনি যদি কিছু করতে পারেন। খরচ বিশ পঁচিশ হাজারের কমে যাবেনা।

—খরচ কি সব ছোটবাবুর?

—হাঁ, তাই তো।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, এ কি তাঁর পক্ষে খুব বেশি মনে হয় দত্ত মশাই? বিরাজ দত্ত বলিলেন, খুব বেশি না হলেও সম্প্রতি গেলও যে অনেক দিদি। এখন সাম্‌লে চলার প্রয়োজন। এর উপর নতুন বিপদ আসতেই বা কতক্ষণ?

—আবার নতুন বিপদ কিসের?

দত্ত ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন, আপনি কি শোনেননি জামাইবাবুর সঙ্গে মামলা বেধেছে? এ সব বস্তুর পরিণাম ত জানেন, ফলাফল বলতে কেউ পারে না।

—তবে নিষেধ করেননি কেন?

—নিষেধ? এতো বড়বাবু নয় দিদি, যে নিষেধ মানবেন। এঁকে নিষেধ করতে শুধু একজনই ছিলেন তিনি এখন স্বর্গে। এই বলিয়া বিরাজ দত্ত নিশ্বাস ফেলিলেন।

বন্দনা আর কোন প্রশ্ন করিল না। বাড়ীর কাছে আসিয়া দেখিল সুমুখের মাঠের একদিকে কাঠ কাটিয়া স্তূপাকার করা হইয়াছে। যে সকল চালা ঘর দয়াময়ীর ব্রতোপলক্ষ্যে সেদিন তৈরি হইয়াছিল স গুলা মেরামত হইতেছে, বাহির প্রাঙ্গণে বিরাট মণ্ডপ নির্ম্মিত হইতেছে, তথায় বহুলোক বহুবিধ কাজে নিযুক্ত। বিরাজ দত্ত অত্যুক্তি করে নাই বন্দনা তাহা বুঝিল।

গাড়ী হইতে নামিয়া সে সোজা উপরে গিয়া উঠিল। প্রথমেই গেল দ্বিজদাসের ঘরে। একটা মোটা বালিশে হেলান দিয়া সে বিছানায় শুইয়া ছিল, পর্দ্দা সরানোর শব্দে চোখ মেলিয়া উঠিয়া বসিল, লিল, বন্ধু আপনি এলো আমার ঘরের দোর গোড়ায়।

বন্দনা বলিল, হাঁ এলোই ত। কিন্তু এমন সময়ে শুয়ে কেন?

দ্বিজদাস বলিল, চোখবুজে তোমাকেই ধ্যান করছিলুম আর মনে মনে বলছিলুম বন্দনা, দুঃখের সীমা নাই আমার। দেহে নেই বল, মনে নেই ভরসা, বোধ করি ঠেলতে আর পারবোনা, নৌকো মাঝখানেই বে্‌বে। ও-পারে পৌঁছনো আর ঘট্‌বেনা।

বন্দনা বলিল, ঘটতেই হবে। তোমাকে ছুটি দিয়ে এইবার নৌকো বাইবার ভার নেবো আমি।

—তাই নাও। রাগ করে আর চলে যেওনা।

বন্দনা কাছে আসিয়া গড় হইয়া প্রণাম করিল, তাহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে জনের চোখ দিয়াই জল পড়িতে লাগিল। এমনভাবে প্রণাম করা তাহার এই প্রথম। বলিল, তোমার চোখেও জল আসে এ আমি জানতুমনা।

দ্বিজদাস বলিল, আমিও না। বোধকরি তার আসার পথটা এতকাল বন্ধ ছিল। প্রথম খুললো যেদিন মৈত্রেয়ীকে ডেকে এনে এ সংসারের ভার দিতে বলে তুমি চলে গেলে। আড়ালে চোখ মুছে ফেলে মনে মনে বললুম, এতবড় আঘাত যে স্বচ্ছন্দে করতে পারে তার কাছে কখনো ভিক্ষে চাইবোনা। কিন্তু সে পণ আমার রইলো না। বৌদিদি গেলেন স্বর্গে, শশধরের সঙ্গে মামলা বাধতে মা চলে গেলেন মেয়ের বাড়ীতে, দাদা জানালেন সংসার ত্যাগের সংকল্প, এক মিনিটের ভূমিকম্পে যেন সমস্ত হয়ে গেল ধূলিসাৎ। এ-ও সয়েছিল, কিন্তু শুনলুম যখন বাড়ী ছেড়ে বাসু যাবে কোন্ একটা অজানা আশ্রমে সে আর সইলোনা। একবার ভাবলুম যা কিছু আছে কল্যাণীর ছেলেদের দিয়ে আমিও যাবো আর একদিকে, তখন হঠাৎ মনে পড়লো তোমার যাবার আগের শেষ কথাটা—বলেছিলে বিশ্বাস করতে, বলেছিলে আমার একান্ত প্রয়োজনে বন্ধু আপনি আসবে আমার দোর গোড়ায়। ভাবলুম এইত আমার শেষ প্রয়োজন, আর প্রয়োজন হবে কবে? তাই লিখলুম তোমাকে চিঠি। সন্দেহ আসতে চায় মনে, জোর ক'রে তাদের তাড়িয়ে দিয়ে বলি আসবেই বন্ধু। নইলে মিথ্যে হবে তার কথা, মিথ্যে হয়ে যাবে বৌদিদির শেষের আশীর্ব্বাদ। যে-বোঝা তিনি ফেলে গেলেন সে-বোঝা বইবো আমি কোন্ জোরে! বলিতে বলিতে দুফোঁটা অশ্রু আবার গড়াইয়া পড়িল।

বন্দনা কহিল, সবাই বলে তুমি বড় অবাধ্য। একা বৌদির ছাড়া আর কারো কথা কখনো শোননি।

দ্বিজদাস বলিল, এই তোমার ভয়? কিন্তু কেন যে শুনিনি বৌদি বেঁচে থাকলে এর জবাব দিতেন। এই বলিয়া সে নিজের চোখ মুছিয়া ফেলিল।

বন্দনা কয়েক মুহূর্ত্ত তাহার প্রতি চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তার পরে বলিল, জবাব পেয়েছি দ্বিজুবাবু, আর আমার শঙ্কা নেই, এই বলিয়া সে দ্বিজদাসের হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া আবার কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বলিল, কেবল তোমার চারপাশেই যে ভূমিকম্প হয়েছে তাই নয়, আমার মধ্যেও এমনি প্রবল ভূমিকম্প হয়ে গেছে। যা ভূমিসাৎ হবার তা' ধূলোয় লুটিয়েছে, যা ভাঙবারও নয়, যা' অটল তাকেই আজ ফিরে পেলুম। চলো আমরা দাদার কাছে যাই। যাবার দিনে আমাকে তিনি আশীর্ব্বাদ করে বলেছিলেন বন্দনা, যে তোমার আপন, আমার আশীর্ব্বাদ যেন তাকেই একদিন তোমার হাতে এনে দেয়। সাধুর বাক্য আমি অবিশ্বাস করিনি, নিশ্চয় জেনেছিলুম এ কথা তাঁর সত্য হবেই। শুধু ভাবিনি সে আশীর্ব্বাদ এমন দুঃখের ভেতর দিয়ে সেই আপন জনকে এনে দেবে। চলো, গিয়ে তাঁকে প্রণাম করিগে।

—দ্বিজু, বন্দনা এসেছে না? এই বলিয়া সাড়া দিয়া অন্নদা আসিয়া প্রবেশ করিল।

—এসেছি অনুদি, বলিয়া বন্দনা ফিরিয়া চাহিল। অন্নদার গভীর শোকাচ্ছন্ন মুখের প্রতি চাহিয়া বন্দনা চমকিয়া উঠিল, কাছে গিয়া তাহার বুকের উপর মাথা রাখিয়া অস্ফুটে কহিল, তোমার ও মূর্ত্তি আমি ভাবতেও পারিনি অনুদি। তারপরেই হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। অন্নদার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল। ধীরে ধীরে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার পিঠের উপর হাত বুলাইয়া মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল, হঠাৎ আর চলে যেওনা দিদি, দিন কতক থাকো। আর তোমাকে কি বলবো আমি।

বন্দনা কথা কহিল না, বুকের উপর তেমনি মুখ লুকাইয়া মাথা নাড়িয়া শুধু সায় দিল। এম্‌নি ভাবে আবার বহুক্ষণ গেল। তার পরে মুখ তুলিয়া আঁচলে চোখ মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাসু কোথায় অনুদি?

—চাকররা তাকে পুকুরে স্নান করাতে নিয়ে গেছে।

—তাকে রেঁধে দেয় কে?

অন্নদা কহিল, দ্বিজু। ওরা দুজনে একসঙ্গে খায়, এক সঙ্গে শোয়। বলিতে বলিতে আবার তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল, মুছিয়া কহিল, মা তো শুধু বাসুর মরেনি, ওরও মরেছে। আবার চোখ মুছিয়া বলিল, সবাই বলে অকালে অসময়ে বাড়ীর বউ মরেছে, ছেলে মানুষের শ্রাদ্ধে এত ঘটা কেন? ওরে সবাই করে মানা,—বাহুল্য দেখে তাদের গা যায় জ্বলে, ভাবে এ যে বাড়াবাড়ি! জানেনা ত সে ছিল ওর আর এক জন্মের মা। কোন ছলে সে মর্য্যাদায় ঘা লাগলে ও সইবে কি করে?

দ্বিজদাস বন্দনাকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া কহিল, আর ভয় নেই অনুদি, বন্দনা এসেছেন, এবার সমস্ত বোঝা ওঁর মাথায় ফেলে দিয়ে আমি আড়াল হয়ে যাবো।

অন্নদা বলিল, পরের মেয়ে এত বোঝা বইবে কেন ভাই?

—পরের মেয়েরাই ত বোঝা বয় অনুদি। ওঁকে ডেকে এনে বলেছি, এত দুঃখের ভার বইতে আমি পারবো না এর ওপর বাসু যদি যায় ত, রইলো তোমাদের বলরামপুরের মুখুয্যে বাড়ী, রইলো তাদের সাতপুরুষের অভিমান,—শশধরের ছেলেদের ডেকে এনে সংসারে আমি ইস্তফা দেবো। দাদাই শুধু পারে তাই নয় দ্বিজুও পারে। সন্ন্যাস নিতে পারবো না বটে, ও আমি বুঝিনে—কিন্তু টাকাকড়ির বোঝা অনায়াসে ফেলে দিয়ে যাবো।

অন্নদা বন্দনার হাত দুটি ধরিয়া কহিল, পারবে না দিদি বিপিনের মত করতে? পারবে না বাসুকে বাড়ীতে রাখতে?

—পারবো অনুদি।

—আর এই যে বাধলো সর্ব্বনেশে মামলা জামাইবাবুর সঙ্গে,—পারবে না থামাতে?

—হাঁ, এ-ও পারবো অনুদি। ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিল, উনি কোনদিন আমার অবাধ্য হবেন না এই সর্ত্তেই এ-বাড়ীর ছোট বউ হতে রাজি হয়েছি অনুদি।

কথাটা অন্নদা ভালো বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। বন্দনা বলিল যা গেছে সে তো গেছেই। এর উপর কি মাকেও হারাতে হবে? মকদ্দমা না থামালে তাঁকে ফিরিয়ে আনবো আমি কি ক'রে?

দ্বিজদাস বালিশের তলা হইতে চাবির গোছাটা বাহির করিয়া বন্দনার পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া কহিল, এই নাও। অবাধ্য হবোনা সেই সর্ত্তই তোমার কাছে আজ করলুম।

বন্দনা চাবির গুচ্ছ তুলিয়া লইয়া আঁচলে বাঁধিল।

এইবার অন্নদা ইহার তাৎপর্য্য বুঝিল। বন্দনাকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া স্থির হইয়া রহিল, তাহার দুই চোখ বাহিয়া শুধু বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

বন্দনা বিপ্রদাসের ঘরে ঢুকিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। বলিল, বড়দা, এলুম।

এই নূতন সম্বোধন বিপ্রদাসের কানে ঠেকিল। কিন্তু এ লইয়া কিছু না বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, শুনেছিলুম তুমি আসচো, তোমার বাবার তার পাওয়া গিয়েছিল। পথে কষ্ট হয়নিত?

—না।

—সঙ্গে কে এলো?

—আমাদের দরওয়ান আর আমার বুড়ো চাকর হিমু।

—বাবা ভালো আছেন?

—হাঁ।

বিপ্রদাস একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, দ্বিজু কি পাগলামি করচে দেখ্‌লে?

বন্দনা কহিল, আপনি শ্রাদ্ধের কথা বলচেনত? কিন্তু পাগলামি হবে কেন বড়দা? আয়োজন এত বড়ই ত চাই। এ নইলে তাঁর মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হতো যে!

—কিন্তু সামলাতে পারবে কেন বন্দনা?

—উনি না পারলেও আমি পারবো বড়দা।

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিলেন, সে শক্তি তোমার আছে মানি, কিন্তু মেজাজ বিগ্‌ড়োলেই মুস্কিল। হঠাৎ রাগ করে চলে না গেলে বাঁচি।

বন্দনা বলিল, সেদিন এসেছিলুম পরের মতো, মাথায় কোন ভার ছিলনা। কিন্তু আজ এসেছি এ-বাড়ীর ছোট বউ হয়ে। রাগিয়ে দিলে রাগ করতেও পারি, কিন্তু আর চলে যাবো কেমন ক'রে বড়দা? সে পথ বন্ধ হয়ে গেল যে! এই বলিয়া সে চাবির গোছা দেখাইয়া কহিল, এই দেখুন এ বাড়ীর সব আলমারি সিন্দুকের চাবি। আপনি তুলে নিয়ে আঁচলে বেঁধেচি। আনন্দ ও বিস্ময়ে বিপ্রদাস নিঃশব্দে চাহিয়া রহিলেন। বন্দনা বলিতে লাগিল, আপনাকে আমার লজ্জা ক'রে বলবার, গোপন ক'রে বলবার কিচ্ছু নেই। ভগবানের কাছে যেমন মানুষের নেই লুকোবার ঠিক তেম্‌নি। মনে পড়ে কি আপনার আশীর্ব্বাদ বড়দা? যাবার দিনে আমাকে বলেছিলেন, যে তোমার যথার্থ আপন তাকেই তুমি পাবে একদিন। সেদিন থেকে গেছে আমার চঞ্চলতা, শান্তমনে কেবল এই কথাই ভেবেচি যিনি জিতেন্দ্রিয়, যিনি আজন্ম-শুদ্ধ সত্যবাদী সাধু তাঁর আশীর্ব্বাদে আর আমার ভয় নেই। যিনি আমার স্বামী তাঁকে আমি পাবোই। দুই চক্ষু তাহার অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

বিপ্রদাস কাছে আসিয়া তাহার মাথায় হাত রাখিয়া নীরবে আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং আজ এই প্রথম দিন বন্দনা তাঁহার পায়ের উপর বহুক্ষণ ধরিয়া মাথা পাতিয়া নমস্কার করিল। উঠিয়া দাঁড়াইলে বিপ্রদাস কহিলেন, আজ যাকে তুমি পেলে বন্দনা তার চেয়ে দুর্লভ ধন আর নেই। এ কথাটা আমার চিরদিন মনে রেখো।

বন্দনা কহিল, রাখবো বড়দা। একদিনও ভুলবো না।

একটু থামিয়া কহিল, একদিন অসুখে আপনার সেবা করেছিলুম আপনি পুরস্কার দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেদিন নিইনি,—মনে পড়ে বড়দা?

—পড়ে।

—আজ সেই পুরস্কার চাই। বাসুকে আমি নিলুম।

বিপ্রদাস হাসিমুখে বললেন, নাও।

—তাকে শেখাবো আমাকে মা বলে ডাকতে।

—তাই কোরো।

—আর একটি প্রার্থনা বড়দা। নিজেকে চিনতে না পেরে একদিন আপনার কাছে অপরাধ করেছিলুম। ভুল ভেঙেছে, আজ তার মার্জ্জনা চাই।

—মার্জ্জনা অনেকদিন করেছি বন্দনা, তোমার কোন লজ্জা নেই।

বন্দনার চোখে আবার জল আসিতেছিল, জোর করিয়া নিবারণ করিয়া বলিল, আর একটি ভিক্ষে। আমাদের সংসারে কি একদিনও থাকবেন না বড়দা? অভিমানে, সঙ্কোচে কোন দিন মন পূর্ণ করে আপনাকে যত্ন করতে পাইনি, কিন্তু সে বাধা ত ঘুচ্‌লো, আর ত আমার লজ্জা নেই—কিছুদিন থাকুন না বড়দা আমার কাছে? দুদিন সেবা করি। এই বলিয়া সে সজল চক্ষে চাহিয়া রহিল,—তাহার আকুল কণ্ঠস্বর যেন অন্তর ভেদ করিয়া বাহিরে আসিল।

বিপ্রদাস হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিলেন।

বন্দনা বলিল, ওই হাসি-মুখের মৌনতাকেই আমি সব চেয়ে ভয় করি বড়দা। কি কঠোর আপনার মন, একে না পারা যায় গলাতে না পারা যায় টলাতে। দেবেননা উত্তর?

বিপ্রদাস এবার হাসিয়া ফেলিলেন। যেমন স্নিগ্ধ তেমনি সুন্দর! তাহাকে এমন করিয়া হাসিতে বন্দনা যেন এই প্রথম দেখিল। বলিল, উত্তর পেলুম বড়দা, আর আপনাকে আমি পীড়াপীড়ি করবো না। কিন্তু মনকে শান্ত করি কি ক'রে বলে দিন। এ যে কেবলি কেঁদে উঠতে চায়।

বিপ্রদাস বলিলেন, মন আপনি শান্ত হবে বন্দনা, যে দিন নিঃসংশয়ে বুঝবে আমি দুঃখের মাঝে ঝাঁপ দিতে গৃহত্যাগ করিনি। কিন্তু তার আগে নয়।

—কিন্তু এ বুঝ্‌বো আমি কেমন ক'রে?

—শুধু আমাকে বিশ্বাস ক'রে। জানোত দিদি আমি মিছে কথা বলিনে।

বন্দনা চুপ করিয়া রহিল। মিনিট দুই পরে গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তাই হবে। আজ থেকে প্রাণপণে বোঝাবো নিজেকে, বড়দা সত্যি কথাই বলে গেছেন, সত্যবাদী তিনি, মিছে কথায় ভুলিয়ে চলে যাননি।

বিপ্রদাস কহিলেন, মনকে বুঝিয়ো যা' সব চেয়ে সুন্দর, সব চেয়ে সত্য, সব চেয়ে মধুর বড়দা সেই পথের সন্ধানে বার হয়েছেন। তাঁকে বাধা দিতে নেই, তাঁকে ভ্রান্ত বলতে নেই, তাঁর তরে শোক করা অপরাধ।

বন্দনার চোখে আবার জল আসিয়া পড়িল, তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, তাই হবে বড়দা, তাই হবে। এ জীবনে আর যদি কখনো দেখা না পাই তবু বলবো বড়দা ভ্রান্ত নয়, তাঁর তরে শোক করা অপরাধ।

পর্দার ফাঁক দিয়া মুখ বাড়াইয়া বিরাজ দত্ত বলিলেন, দিদি একটা জরুরি কথা আছে,—একবার আসতে হবে যে।

যাই বিরাজ বাবু। বড়দা, আসি এখন, বলিয়া বন্দনা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সতীর শ্রাদ্ধের কাজ ঘটা করিয়া শেষ হইল। ভিক্ষুক কাঙালী সতী-সাধ্বীর জয়গান করিয়া গৃহে ফিরিল, সকলেই বলিল, মুখুয্যে বাড়ীর কাজ এম্নি ক'রেই হয়, এর ছোট-বড় নেই।

সকালে স্নান সারিয়া বন্দনা প্রণাম করিতে বিপ্রদাসের ঘরে ঢুকিয়া বিস্ময়ে থমকিয়া দাঁড়াইল। তাঁহার পাশে বসিয়া দয়াময়ী। ভোরের ট্রেনে বাড়ী ফিরিয়াছেন, এখনো কেহ জানেনা। মায়ের মূর্ত্তি দেখিয়া বন্দনার বুকে আঘাত লাগিল। সোনার বর্ণ কালো হইয়াছে, মাথার ছোট ছোট চুলগুলি রুক্ষ, ধূলিমাখা, চোখ বসিয়াছে, কপালে রেখা পড়িয়াছে—দুঃখ শোকের এমন ব্যথার ছবি বন্দনা কখনো দেখে নাই। তাহার মনে পড়িল সেদিনের সেই ঐশ্বর্য্যবতী সর্ব্বময় কর্ত্রী বিপ্রদাসের মাকে। ক'টা দিনই বা! আজ সমস্ত মহিমা যেন তাঁহার পথের ধূলায়। কাছে গিয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইল—বলিল, কখন এলেন মা, আমি জানতে পারিনি ত।

দয়াময়ী তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন, বলিলেন, আমার আসার খবর কিসের জন্যে বন্দনা? তখন আসতো বিপ্রদাসের মা, তাই দেশের ছেলে বুড়ো সবাই টের পেতো। বিপিন, কাজ ত চুকে গেছে বাবা, চলনা মায়ে-পোয়ে আজই বেরিয়ে পড়ি।

শুনিয়া বিপ্রদাস হাসিল, কহিল, তোমার ভয় নেই মা, মায়ে-পোয়ের যাত্রার বিঘ্ন ঘটবেনা,—কিন্তু আজই হয় না। বন্দনার বাবা আসছেন কাল, তোমার ছোট বৌয়ের হাতে সংসার বুঝিয়ে না দিয়ে যাবে কেমন ক'রে?

দয়াময়ী অনেকক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিলেন, তাই হোক্ বিপিন। সহ্য হবেনা, এমন মিথ্যে আর মুখে আনবো না।

—কিন্তু ক'টা দিন আর বাকি?—কেবল ছ'টা দিন মা। আবার আজকের দিনেই আমরা যাত্রা সুরু করবো।

বন্দনা কহিল, মা, বাড়ীর ভেতর আপনার ঘরে চলুন।

দয়াময়ী মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিলেন—তোমার এই কথাটি রাখতে পারবোনা মা। যে ক'টা দিন থাকবো, এইখানেই থাক্‌বো, আবার যাবার দিন এলে এই বাইরের ঘর থেকেই দুজনে বার হয়ে যাবো। ভেতরে যা' কিছু রইলো সে সব তোমার রইলো মা।

বন্দনা পীড়াপীড়ি করিলনা, শুধু আবার একবার তাঁহার পদধূলি লইয়া নতমুখে বাহির হইয়া গেল।

বিপ্রদাসের পত্র পাইয়া রে-সাহেব এক সপ্তাহের ছুটি লইয়া বলরামপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মেয়েকে দ্বিজুর হাতে অর্পণ করিয়া আবার কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া গেলেন।

এ বিবাহে নহবৎ বাজিল না, বরযাত্রী-কন্যাযাত্রীর বিবাদ বাধিল না, মেয়েরা উলু দিল অস্ফুটে, শাঁখ বাজিল চাপা সুরে,—বাসর গৃহ রহিল স্তব্ধ, মৌন।

নিরালা কক্ষে দ্বিজদাসের বিষণ্ণ মুখের পানে চাহিয়া বন্দনা প্রশ্ন করিল, কি ভাব্‌চো বলোত ?

দ্বিজদাস বলিল, ভাবচি তোমার কথা। ভাবচি আমার চেয়ে তুমি অনেক বড়।

—কেন ?

—নইলে পারতে না। সর্ব্বনাশ বাঁচাতে কি-দুঃখের পথ হেঁটেই না তুমি আমার কাছে এলে।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, তুমি আসতে না ?

—না।

বন্দনা বলিল, মিছে কথা। কিন্তু আমি কি ভাবছিলুম জানো ? তোমার গলায় মালা পরিয়ে দিতে দিতে ভাবছিলুম আমি এমন-কি সুকৃতি করেছিলুম যাতে তোমার মত স্বামী পেলুম। পেলুম মাসুকে, মাকে, বড়দাকে। আর পেলুম এই বৃহৎ পরিবারের বিপুল ভার। কিন্তু যে সমাজের মেয়ে আমি তার প্রাপ্য কতটুকু জানো ?

দ্বিজদাস কহিল, না।

বন্দনা বলিতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। কহিল, কিন্তু আজ নয়। সৌভাগ্যের দিনে সে সব কথা দর্পের মত শোনাবে।

—শোনাবে না, তুমি বলো।

বন্দনা মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিল, কহিল, আজ তুমি ক্লান্ত, একটু ঘুমোও তোমার মাথায় আমি হাত বুলিয়ে দিই।

মিনিট দুই পরে বলিল, আমার মেজদির কথা মনে পড়চে। সেদিন বড়দার সঙ্গে তখনি চলে যেতে চাইলেন দেখে বল্‌লুম, তুমি ত ঝগড়া করোনি মেজদি, তুমি কেন যাবে ? মেজদি বললেন, যেখানে স্বামীর স্থান হয় না সেখানে স্ত্রীরও না। একটা দিনের জন্যেও না। তোর স্বামী থাকলে এ কথা বুঝ্‌তিস্। সেদিন হয়ত ঠিক এ কথা বুঝিনি, কিন্তু আজ বুঝ্‌চি তুমি না থাকলে আমি একটা দিনও সেখানে থাকতে পারি নে।

একটু থামিয়া বলিল, এইত মাত্র ঘণ্টা কয়েক আগে, পুরুতের সঙ্গে গোটা কয়েক শব্দ উচ্চারণ করে গেলুম, কিন্তু মনে হচ্চে যেন আমার দেহের প্রতি রক্ত কণাটি পর্য্যন্ত বদলে গেছে।

দ্বিজদাস চোখ মেলিয়া তাহার মুখের পানে চাহিল। তাহার হাতখানি নিজের বুকের উপর টানিয়া লইয়া আবার চোখ বুজিল। কোন কথা কহিলনা।

রবিবার ঘুরিয়া আসিল। বিপ্রদাস ও দয়াময়ীর যাবার দিন আজ। তীর্থ ভ্রমণ দয়াময়ীর একদিন সমাপ্ত হইবে, সেদিন গৃহের আকর্ষণ হয়ত এই গৃহেই আবার তাঁহাকে টানিয়া আনিবে, কিন্তু যাত্রা শেষ হইবেনা আর বিপ্রদাসের। এ কথা শুনিয়াছে অনেকে। কেহ বিশ্বাস করিয়াছে, কেহ করে নাই।

প্রাঙ্গণে মোটর দাঁড়াইয়া। কাছে, দূরে বাটীর সকলেই উপস্থিত। মেয়েরা দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়াইয়া চোখ মুছিতেছে, বিপ্রদাস উঠিতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দ্বিজুকে দেখচিনে কেন?

কে একজন বলিল, তিনি বাড়ী নেই, কি-একটা কাজে বাইরে গেছেন। শুনিয়া বিপ্রদাস হাসিয়া বলিলেন, পালিয়েছে। সেটা শুধু মুখেই গোঁয়ার, নইলে ভীতুর অগ্রগণ্য।

বন্দনার হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল বাসু। বলিল, তুমি আবার কবে আসবে বাবা? একটু শীগ্‌গির করে এসো।

বিপ্রদাস হাসিয়া তাহার মাথায় একবার হাত বুলাইয়া দিলেন, এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না।

বন্দনা শাশুড়ীর পায়ের ধূলা লইল। তিনি বলিলেন, বাসু রইলো ছোট বৌমা। ফিরে এসে তোমার কাচ থেকে নেবো। এই বলিয়া তিনি আঁচলে চোখ মুছিলেন।

বন্দনা দূর হইতে বিপ্রদাসকে প্রণাম করিল। তারপরে কাছে আসিয়া সজল চক্ষে বাষ্পরুদ্ধ স্বরে কহিল, কলকাতায় পূজোর ঘরে যে-মূর্ত্তি একদিন আপনার লুকিয়ে দেখেছিলুম বড়দা, আজ আবার সেই মূর্ত্তিই আমার চোখে পড়্‌লো। আর আমার শোক নেই, ঠিকানা আপনার না-ই বা পেলুম, জানি, মনের মধ্যে যেদিন ডাক দেবো আসতেই হবে আপনাকে। যতই না না বলুন, এ-কথা কোনমতেই মিথ্যে হবে না।

বিপ্রদাস শুধু একটু হাসিলেন। যেমন করিয়া ছেলের উত্তর এড়াইয়া গেলেন তেমনি করিয়া বন্দনারও।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

সমাপ্ত

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

"সুসোকানি"

শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র এম্ এ, ডি লিট্

খড়দহের নিকটে নদীর ধারে একখানি বাগান-ঘেরা একতালা বাঙলোর বারান্দায়, দেওয়ালে, মাঠে, ঘাসে, গাছে সর্ব্বত্র শরতের সকালবেলার রোদ এসে পড়েছিল,—ঢুকতে পায়নি কেবল বাড়ীর ঘরগুলির মধ্যে,—কেন-না, —বাড়ীর দরজা জানালা ছিল সব বন্ধ। বাড়ীর মালিক সুকুমার আজ মাসখানেক হ'ল বিলাত গিয়েছে।

পূজার ছুটির আরম্ভ। আশ্বিনের নব আনন্দে ধরণী জেগে উঠেছে। বেলা ন'টা আন্দাজ কলকাতা থেকে সুকুমারের তিন বন্ধু, সোমদেব, কানাই ও নিশীথ ফটক পার হ'য়ে বাগানের ভিতর প্রবেশ করল, উদ্দেশ্য বন্ধুর পরিত্যক্ত বাড়ীঘরদোরের একটু তদারক করা,—আর ছুটির দিনটা কলকাতার বাইরে উন্মুক্ত প্রকৃতির মাঝখানে উপভোগ করা।

সুকুমার থাকতে এই চার বন্ধুর এখানে সারাদিনব্যাপী উৎসব প্রায়ই হ'ত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত। কখনো বা নৈশ-উৎসব বসত ভবানীপুরে সোমদেবের বাড়ীতে,—সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্য্যন্ত। এমনিতে চারজনের দেখা সাক্ষাৎ যে ঘন ঘন ঘটত তা নয়। কিন্তু যখন চারজনে মিলত, তখন তাদের মিলনের মধ্যে তারা এমন একটা প্রাণ সঞ্চার করতে পারত, যে ক্রমশঃ ক্রমশঃ তাদের মিলনটা একটা জীবন্ত রূপপরিগ্রহ করেছিল। এবং সকলেই সেটা অনুভব করে তার নামকরণ করেছিল 'সুসোকানি।'

'সুসোকানির' স্থান ও কাল ছিল, সুকুমারের বাড়ীতে সারাদিন, কিংবা সোমদেবের বাড়ীতে সারারাত্রি। সুকুমারের বিলাত যাত্রার পর থেকে 'সুসোকানির' অঙ্গহানি ঘটায় 'সুসোকানি' যেন একটু নির্জীব হ'য়ে পড়েছে। তিনবন্ধু সুকুমারের বাড়ীর ফটকের মধ্যে প্রবেশ করেই যেন সেটা অনুভব করল।

ফটক থেকে একটা অনতিপ্রশস্ত রাস্তা বাগান ঘিরে প্রবেশ করেছে গাড়ী-বারান্দার মধ্যে,—আবার গাড়ীবারান্দা থেকে বেরিয়ে বাগান ঘিরে অন্য ফটক দিয়ে পড়েছে সাধারণ রাস্তার মধ্যে। এই অনতিপ্রশস্ত রাস্তাটির ধার দিয়ে অর্দ্ধগোলাকৃতি বাগানটীকে আড়াল করে রেখেছে একটা অনতিউচ্চ সবুজপাতায় ঘেরা গাছের বেড়া। তার একধারে একটা সরু প্রবেশ-পথ বাগানের মধ্যে চলে গিয়েছে।

সেদিন উজ্জ্বল প্রভাত। ফুলগুলির উপর গাছে গাছে পাতায় পাতায় ঘাসে ঘাসে রোদ ঝিক্ ঝিক্ করছে। ফুলগাছগুলিতে অযত্নের চিহ্ন লক্ষিত হ'লেও ফুলগুলি তখনো ঝরে যায়নি। আকাশের গাঢ় নীলরঙ, সবুজ মাঠের নবীনতা আর ফুলগুলির রঙ-বেরঙের ঝলক্ তখন পাখীর গানে মুখর হ'য়ে উঠেছিল; কিন্তু তার মাঝখানে সেদিন সুকুমার বসেছিল না বন্ধুদের অভ্যর্থনা করবার জন্য। সবই আছে,—তবুও কিছুই যেন নেই,—সবই যেন ফাঁকা,—এর বেদনা যেন অঙ্কিত আছে সবখানে,—তার সুর যেন ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে।

বাড়ীর সদর দরজা খুলিয়ে তিনবন্ধু ভিতরে প্রবেশ করল। ঘরের মধ্যে স্যাঁৎসেঁতে গন্ধ, আসবাবপত্রে ধূলো, দেওয়ালে ঝুল। মালীকে ডেকে তিনবন্ধু শাসিয়ে দিল, যে তারা মধ্যে মধ্যে প্রায়ই এখানে আসবে, এবং বাড়ী ঘর যদি এমন অপরিষ্কার দেখা যায় তবে তার কর্ম্মচ্যুতির আশঙ্কা আছে।

সুকুমারের শয়ন-ঘরের দরজা জানালা খুলতেই অদূরে কয়েকটি অশ্বত্থগাছের মাথা টপকে এক ঝলক্ রোদ এসে পড়ল সেখানে। দূরে দেখা গেল উন্মুক্ত আকাশের নীলোজ্জ্বল আভা আর নদীর জলের উপর রোদের ঝিকিমিকি। নিশীথ খাটের উপর পরিষ্কার বিছানা করার আদেশ করল মালীকে।

কানাই বলল,—"এখানে কেন,—বাগানে চল না।"

সোমদেব বলল,—"যেখানেই যাও না কেন,—আমি বলেছিলাম না—আজ 'সুসোকানি' কখনই জমবে না।"

নিশীথ বলল,—"এইখানে বস,—নিশ্চয় জমবে।"

বিছানা পাতা গেলো। সুকুমার থাকতে ঘরখানি যেমন ঝক্‌ঝক্ করত, তেমনি ঝক্‌ঝক্ করে উঠল। নিশীথ বলল,—"মনে কর না, সুকুমার পাশের ঘরেই আছে,—এখনি এসে পড়বে।"

কানাই বলল, "না,—অত কল্পনা আমার নেই।"

নিশীথ বললে,—"তবে এই শোনো সুকুমারের কথা।"

বলেই পকেট থেকে একটা চিঠি বার করে বললে,—"কাল পেয়েছি। Portsaid থেকে লিখেছে। চিঠিখানি আমাদের তিনজনকেই লেখা, তবে আমার ঠিকানায় Post করেছে।"

সোমদেব চিঠিখানা নিয়ে পড়তে লাগল—

ভাই সোমদেব, কানাই, নিশীথ,

তোমাদের তিনজনকেই যে এই একখানি মাত্র চিঠি লিখছি, এতে তোমরা কেহই ক্ষুণ্ণ হ'য়ো না। আমার এই যে একখানি চিঠি,—এ বস্তুত একখানি নয়,—তিনখানি,—কেন-না তোমাদের তিনজনের কাছে, এই একখানি চিঠি তিন রকমের বার্ত্তা বহন করবে। অথচ এই তিনখানি চিঠি যে আমার কাছ থেকে একটিমাত্র রূপ পরিগ্রহ করে তোমাদের তিনজনের কাছে গিয়ে হাজির হ'চ্চে,—তার কারণ আর কিছুই নয়,—তার কারণ, মানুষের মধ্যে সেই রহস্যময় নিভৃত দেবতার লীলা—যিনি প্রতিনিয়তই বিশ্বের বহুল বিচিত্রতাকে একের মধ্যে গ্রথিত করতে করতে,—আশেপাশের রাশি রাশি আবর্জ্জনা পরিষ্কার করে, অমিলকে মিলিয়ে দিয়ে,—আপনার মিতব্যয়িতার তালে, মানে, লয়ে ছন্দে আপনার জগৎখানি সৃষ্টি করে চলেছেন। তাই বলছিলাম,—তোমাদের তিনজনের কাছে এই একখানি চিঠির জন্যে তোমরা কেউ ক্ষুণ্ণ হ'য়ো না। তোমাদের প্রত্যেকের কাছে আমার যা বলবার,—তা সেই দেবতার মিতব্যয়িতায় এই একটিমাত্র রূপ প্রাপ্ত হ'ল। তোমাদের কাছে গিয়ে তোমাদের নিজ নিজ প্রয়োজন অনুসারে যে এই একটিমাত্র রূপ তিনটি রূপান্তর গ্রহণ করবে,—সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

চলেছি, লোহিত-সাগরের উপর দিয়ে। তোমরা জান নিশ্চয়ই,—যে পৃথিবীর মধ্যে এই জায়গাটায় সৃষ্টিছাড়া গরম। কেবিনের মধ্যে তো ঢোক্‌বারই জো নেই। প্রয়োজনের তাগিদে যখন ঢুকতে হয়, তখন প্রাণ বেরিয়ে যায়। আমি দিন-রাতই ডেকের উপর ইজিচেয়ারে শুয়ে থাকি। অফুরন্ত অবসর। কোনো কাজ নেই,—এখন আমার ছুটি। একটি কেবল কাজ আছে। মধ্যে মধ্যে বাঁশীর ডাকে ডেক ছেড়ে উঠে যেতে হয় সেই কাজে। কাজটি অবশ্য ভাল কিন্তু সুমধুর বংশী ধ্বনির অনুরূপ কিছুই নয়। সেখানেও অবশ্য পেয়ালা ভরা হয় কিন্তু পেয়ালার রসটুকু যায় উদরে, অন্তরে নয়।

যাহো'ক কাল রাত্রে সেই কাজটি সেরে এসে ডেকের উপর বসেছিলাম। আকাশ থেকে একটু ম্লান চাঁদের আলো সমুদ্রের উপর লুটিয়ে পড়েছিল, এবং তারই একটু ছিটে এসে পড়েছিল,—ডেকের যে নিভৃত কোণটি আমি অধিকার করে বসেছিলাম,—সেইখানটায়। তার একটু আগেই পেয়ালার উপর পেয়ালা চলেছিল,—তাই তখন আমার মনের সেইরকম একটা তরলের অবস্থা ছিল,—যে অবস্থায় আশে-পাশের কঠিন সত্যগুলি তরল হ'য়ে চোখের উপর ভাসতে থাকে,—তাদের কাঠিন্যগুলো দ্রবীভূত হ'য়ে এমন একটা অবস্থা প্রাপ্ত হয়,—যে অবস্থায় তুমি তাদের যেমন ইচ্ছে ভেঙে-চুরে গড়তে পার। আমার চোখের উপর সেই ম্লান জ্যোৎস্নার ছিটেটুকু এই দ্রবীকরণ ব্যাপারে বিশেষ সহায়তা করেছিল। আমি চুপটি করে ইজি-চেয়ারে শুয়ে শুয়ে চুরুটের পর চুরুট ধ্বংস করছিলাম,—আর আশে-পাশের জিনিষগুলিকে ভাঙছিলাম, চুরছিলাম, আবার গড়ছিলাম।

আমি যেটুকু বলেছি—তা' থেকেই তোমরা সহজেই কল্পনায় ধারণা করে নিতে পার,—তখন আমি ঠিক কী অবস্থায় ছিলাম। শ্রাবণের মেঘলারাতের একটুখানি ম্লান জ্যোৎস্না সমুদ্রের কিছুদূর পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল, তারপরে

দিগন্ত পর্য্যন্ত ঘন অন্ধকার। উপরে নীল আকাশের নিস্তব্ধ বিস্তার; তার নীচে বিশালকায় শান্ত স্থির সমুদ্র চুপটি ক'রে ঘুমিয়েছিল। আকাশের নক্ষত্রগুলো মিট্‌মিট্‌ করে স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়েছিল। জাহাজের এঞ্জিনের একটা শোঁ শোঁ শব্দ রজনীর নিস্তব্ধতা ভেদ করে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ঢেউয়ের কল্লোলের সঙ্গে মিশে একটা সুরের সৃষ্টি করছিল। আমি আকাশের তারাগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে সেই সুরে আপনাকে হারিয়ে ফেলে একটার পর একটা ক'রে কতগুলো চুরুট যে ধ্বংস করলাম, তার স্থিরতা নেই। ক্রমে হাতের ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম—রাত দশটা বেজেছে।

কতক্ষণ যে এইভাবে কাটল বলতে পারি না। সমুদ্রের ফুরফুরে হাওয়ার শীতল স্পর্শে আমার শরীরখানা ক্রমশ এলিয়ে পড়লো। আমার চুরুটটা আমার অলস হাতের আঙুলগুলোর অবশ আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ থেকে থেকে ক্রমশ নিভে গেল, তাকে আবার ধরাবার সামর্থ্যটুক্ আর রইল না। মনের এই তরতরে অবস্থায় আমার বিশ্বজগৎখানা আমার অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রের উপর বায়স্কোপের ছবির মত ভাসতে ভাসতে কত যে রূপ-রূপান্তর গ্রহণ করতে লাগলো, তার কোনো সংখ্যা নেই। ছবিগুলো সবই ছায়ার মত অস্পষ্ট তার কোনটাই যেন ঠিক ধরতে পারা যায় না। অবশেষ একজায়গায় এসে যে অবস্থায় সেই ছবিগুলো একটা স্পষ্ট সজীব বাস্তব প্রত্যক্ষ আকার ধারণ করলে, সে অবস্থাটা আমার বর্ত্তমান অবস্থার ঠিক উল্টো।

আমি অক্লান্ত কর্ম্মে ব্যস্ত। সকাল বেলায় উঠে, কোনরকমে স্নানাহার সেরে কলেজে বক্তৃতা দিয়ে এসেছি। কলেজ থেকে এসেই তখনি আবার যেতে হয়েছে আমাদের গ্রামের স্কুলের কাজে। সেখানে থেকে ফিরে তিলার্দ্ধ বিশ্রাম না করে গিয়েছি রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনতে। বক্তৃতা-শেষে আবার ছুটে গিয়েছি ভবানীপুরের কাছারি বাটীতে খাতাপত্র হিসাব দেখতে। সেখানে যখন পাই পয়সাটি পর্য্যন্ত হিসাব মিলিয়ে নেওয়ায় জন্য ব্যস্ত, ত্রাস্ত সরকার আমলারা আমার সামনে দাঁড়িয়ে, তখন বোধ হয় সরকারদেরই ভগবানের নিকট করুণ প্রার্থনায় সেখানে নিশীথ আর কানাই গিয়ে হাজির।

নিশীথ বলল,—"চল, সোমদেবের ওখানে,—আজ 'সুসোকানি'র নৈশ আড্ডা বসবে।"

আমি বললাম,—"তা-ও কি হয়? এখন যে রাত দশটা বেজে গেছে।"

নিশীথ বলল,—"এই ত আমাদের আড্ডার সময়।"

আমি বললাম,—"আরে—আড্ডা দেবার আমার সময় কোথায়? আমি বিলাত চলেছি,—আমার কত কাজ!"

নিশীথ বললে—"রাত দশটার পর আবার কেউ কাজ করে নাকি? এখন ত ঘুমোবার সময়"।

আমি বললাম্—"ঘুমোনোও ত একটা কাজ—এখন আড্ডা দিলে সেটাই বা সারি কখন?"

কিন্তু নিশীথ নাছোড়বান্দা। শেষ পর্য্যন্ত আমাকে টেনেই নিয়ে গেল,—সোমদেবের বাড়ীতে।

সেখানে খুব জমিয়ে আড্ডা চলল। এমন জমিয়ে আড্ডা খুব কমই দেওয়া হয়েছে। তোমরা স্বচ্ছন্দেই সেটা মনের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে পার,—তাই তার কোনো বর্ণনা তোমাদের কাছে নিষ্প্রয়োজন,—কিন্তু সত্য যদি তার একটা যথাযথ বর্ণনা দিতে পারতাম,—তাহ'লে আর একখানা "চার-ইয়ারী কথা"র সৃষ্টি হ'ত।

অবশেষে ঘড়িতে যখন রাত তিনটা বাজল তখন আমি বললাম,—"চল, এবার উঠি"। অবশ্য এর আগেও যে দু-চারবার 'উঠি উঠি'—না করেছি তা নয়—কিন্তু ওঠা হয়নি,—আবার আড্ডায় জমে গেছি।

কানাই বলল—"হ্যাঁ—চল,—এবার উঠি;—অনেক রাত হ'য়েছে।"

সোমদেব বলল,—"বস, বস! আর একটু বস,—বাজলই বা তিনটে।"

নিশীথ বললে,—"সোমদেব,—ওটা কি মন থেকে বলছ? তোমার ঘুম পায়নি?"

সোমদেব বলল,—"মন থেকে বলছি বই কি,—নিশ্চয়ই। ঘুম আমার পেয়েছিল—সে ছুটে গেছে। এখন আর ঘুম হবে না।"

নিশীথ বল্‌ল,—"তবে বসা যাক্। আমার বিশেষ আপত্তি নেই।"

সোমদেব বল্‌ল,—"কিন্তু সুকুমারের বোধ হয় কষ্ট হ'চ্ছে।"

আমি বল্‌লাম,—"কষ্ট কিছু হয় নি,—সেজন্য নয়। কিন্তু আমি যে বিলাত চলেছি;—আমার জাহাজ যে সেই Portsaid এর কাছাকাছি চলে গেছে।"

সকলে হো হো করে হেসে উঠল। আমি অবাক্ হ'য়ে সকলের দিকে একবার তাকালাম, বল্‌লাম—"হাসলে যে? সত্যসত্যই ত আমি বিলাত চলেছি,—Portsaid এর কাছাকাছি আমার জাহাজ গিয়ে পৌঁছেচে,—সামনেই Suez canalটি পেরোলেই ত Portsaid। মনে নেই সেদিন হাওড়া ষ্টেশনে তোমরা আমায় বিদায় করে দিয়ে এলে?"

কানাই আবার হেসে উঠল। বল্‌ল—"তুমি আজ রাতে ভবানীপুরে কাছারিবাড়ীতে থাক্‌ছ ত?"

আমি বললাম,—"ভবানীপুরে থাকব কি? আমি বিলাত চলেছি,—Portsaid এর কাছাকাছি আমার জাহাজ চলে গিয়েছে,—আর আমি রাত্রে ভবানীপুরে পড়ে থাক্‌ব?"

কানাই আবার হেসে বল্‌লে,—"আরে পাগল! এটা কল্‌কাতা সহর। এখান থেকে কি এই শেষ রাত্রে Portsaid-এর কাছাকাছি জাহাজে গিয়ে রাত কাটানো যায়?"

এতক্ষণে আমার চমক্ ভাঙ্‌ল। আমি খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। সোমদেবের ঘরের আসবাবগুলো, খাট, বিছানা, মশারি, বইএর আলমারী,—টেবিল, চেয়ার টেবিলের উপর বইএর রাশি,—পাশের ঘরের দেওয়ালে টাঙানো আয়নার ভিতর থেকে তার বোনের ছবিখানা সব যেন আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। আমি চুপটি করে বসে রইলাম।

খানিকক্ষণ পরে বলে উঠ্‌লাম,—"না—এসব নিশ্চয়ই মিথ্যা। আমি ত চলেছি বিলাত,—আমার জাহাজ ত সেদিন বম্বে ছেড়ে চলে গেল,—এই ত আজ সন্ধ্যার সময় Suez এর কাছাকাছি এসেছি।"

নিশীথ বল্‌ল,—"সুকুমার,—তুমি পাগল হ'লে নাকি?"

আমি বল্‌লাম,—"না—নিশ্চয় আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখ্‌ছি,—এ-সব মিথ্যা—আমাদের এ আড্ডা মিথ্যা, সব মিথ্যা।"

একটা দুষ্ট হাসি সোমদেবের চোখের উপর ভেসে উঠে,—ঠোঁটের মধ্যে মিলিয়ে গেল,—চোখের উপর রেখে গেল কেবল একটা কৌতুকপূর্ণ চাহনি।

আমি চীৎকার করে উঠলাম,—"ঘুম ভা—ঙ্—ঘুম ভা—ঙ্—ঘুম ভা—ঙ্"।

কিন্তু ঘুম ভাঙ্‌ল না। কানাই হো হো করে হেসে উঠল, সোমদেবের ঠোঁটে আবার সেই দুষ্ট হাসি ফুটে উঠ্‌লো,—নিশীথ অবাক হ'য়ে আমার দিকে চেয়ে রইল, আর সোমদেবের ঘরের আসবাবগুলো কঠিন প্রত্যক্ষের মত আমার দিকে চেয়ে চেয়ে আমায় বিদ্রূপ করতে লাগলো "আমরা এই রয়েছি,—তোমার সামনে—মিথ্যা নয়, সত্য—সত্য—সত্য।"

আমি স্তম্ভিত হ'য়ে আরো খানিক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম, তারপর আবার চীৎকার করে উঠলাম,—"না এসব মিথ্যা নিশ্চয়ই,—ঘুম ভা—ঙ্ ঘুম ভা—ঙ্ ঘুম ভা—ঙ্"।

তবুও ঘুম ভাঙ্‌ল না। নিশীথ ব্যথিত সুরে বলল, "সুকুমার—এ তুমি কী পাগলামি করছ? আমরা এমন চমৎকার—এমন জমিয়ে আড্ডা দিলাম, আর তুমি এগুলো সব মিথ্যা করে দিতে চাও?"

আমি কোন উত্তর দিলাম না। শুধু চেঁচিয়ে উঠ্‌লাম,—ঘুম ভা—ঙ্, ঘুম ভা—ঙ্—ঘুম ভা—ঙ্"।

তথাপি ঘুম ভাঙ্‌ল না। কানাই বল্‌লে,—"অতিরিক্ত পরিশ্রম করে করে ওর brain গরম হয়ে উঠেছে। ওর এখন সত্যি একটু ঘুমোনো দরকার। নিশীথ,—চল, তোমার গাড়ীতে করে ওকে একটু হাওয়া খাইয়ে কাছারি বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেবে।"

সকলে বাইরে এলাম। বাইরে তখন আকাশ ভেঙে ঝম্ ঝম্ করে শ্রাবণের ধারা নেমেছে। সোমদেব বিদায় নিয়ে বাড়ীর মধ্যে চলে গেল।

আমি গাড়ীতে উঠে শেষবারের জন্য আর একবার চীৎকার করে উঠ্‌লাম,—ঘুম ভা—ঙ্, ঘুম ভা—ঙ্, ঘুম ভা—ঙ্"। কিন্তু ঘুম ভাঙ্‌ল না।

কলকাতা নগরীর জনহীন নিশীথিনীতে তখন আকাশ ভেঙে শ্রাবণের ধারা নেমে এসেছে,—ঝম্ ঝম্ ঝম্। পথে জনমানব নেই,—শুধু আমরা তিনটি প্রাণী। কলকাতা নগরীর আলোকমালা মিট্ মিট্ করে একটুখানি পথ দেখিয়ে দিচ্ছিল।

পথে তখন একটা ত্রস্ত শান্তি। শ্রাবণের ধারার ঝর্‌ঝরাণি ব্যাকুল সুর। আমি গভীর শ্রান্তিতে গাড়ীর মধ্যে এলিয়ে পড়্লাম।

আমার কাপড়-চোপড় ভিজে গিয়েছিল। গা শির্ শির্ করে বুকের ভিতর পর্যান্ত যেন কেঁপে উঠ্ল। তাড়াতাড়ি একটু স'রে বস্তে গিয়ে দেখি, আমার জাহাজের ডেকের উপর সেই ম্লান জ্যোৎস্নাটুকু অন্তর্হিত হ'য়ে গেছে। চারিদিকে ঘন অন্ধকার। নিশীথিনীর বুকের উপর আকাশ ভেঙে শ্রাবণের ধারা নেমেছে ঝম্ ঝম্ ঝম্। সমুদ্রের বুকের উপর উতল হাওয়ার শন্ শন্ শব্দ,—জাহাজের এঞ্জিনের সেই অবিরাম শোঁ শোঁ ধ্বনি,—আর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঢেউগুলির সেই অবিশ্রান্ত কলরব। ডেকের উপর অদূরে একটা ইলেক্‌ট্রিক্ আলো জ্বল্‌ছিল,—তারই একটু রশ্মিতে হাতের ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখ্‌লাম,—তিনটা বেজে গিয়েছে।

তখনো আমার ঘুমের ঘোর ছাড়েনি। নিদ্রা-জড়িত স্পন্দনে, ইজি চেয়ারটা একটু টেনে নিয়ে আবার তাইতে শুয়ে পড়লাম। ডেকের উপর আমার আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল যেন নিশীথ আর কানাই। একবার চোখ চাইবার চেষ্টা করলাম,—আমার সেই আধ-চাওয়া চোখের উপর যেন ভেসে উঠ্ল,—নিশীথ, কানাই,—আর আকাশের তারাগুলো।

এখনো পর্য্যন্ত এই সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষের সঙ্গে আমার বর্ত্তমান প্রত্যক্ষের ঠিক সামঞ্জস্য বিধান করতে পারছি না। বল ত ভাই, সোমদেব, কানাই, নিশীথ,—আমি কি সত্যসত্যই বিলাত যাচ্ছি,—না,—কোন্ একটা মুহূর্ত্তে ভোরের হাওয়ার চঞ্চল শিহরণে চোখ চেয়ে দেখ্‌ব যে আমার খড়দহের সেই শোবার ঘরখানিতে সকালবেলাকার আলো এসে লুটিয়ে পড়েছে?

তোমাদের সুকুমার।

সোমদেব বলে উঠ্ল,—"সুসোকানি দীর্ঘজীবি হোক্।"

সুশীলচন্দ্র মিত্র
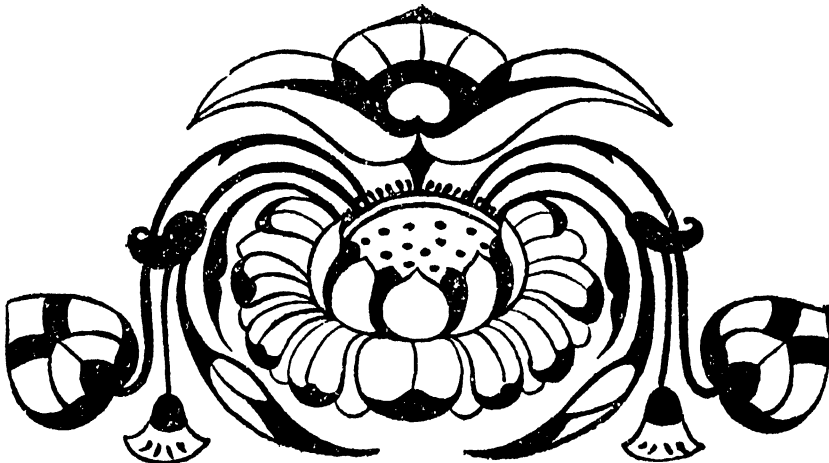
সে-কথাটি

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

সে কথাটি বলিব তাহারে ভাবিতেছি কতদিন হতে
অথচ যে কী বলিব তাহা ভাবিয়া না পাই কোনোমতে।
'ভালোবাসি', 'বড়ো ভালো লাগে'
বলে গেছে লোকে বহু আগে,
নীরবে মুখের পানে চেয়ে থাকা শুধু—তা-ও পুরাতন
ভাবি তাই কী-যে করি আর, করিবার কী আছে নূতন !

হাতখানি লবো হাতে তুলে, তাতে মন নহে তত খুসি,
খুসি করা তারে দূরে থাক্, আপন মনেরে কিসে তুষি !
ফুল দিয়ে ভরিব অঞ্জলি
গন্ধ তার বলিবে সকলি,—
সে রীতিও লাগে ধারকরা নাটকের অভিনয় সম,
আমি যা বলিতে চাহি তারে সে হবে অপূর্ব্ব অনুপম ॥

কভু ভাবি কবিদের মতো নামে তার বাঁধি কাব্যমালা,
সঙ্গীত রচিয়া তারি ভাবে দূর থেকে শুনাই নিরালা।
মন বলে, "ভালো বটে আশা,
কিন্তু কি পারিবে তাহা ভাষা !
আমি যারে ধ্যান করি' না পাইনু আভাসের লেশ,—
সে কথারে সুরে দিবে রূপ, নরকণ্ঠে আছে কি সে রেশ !"

নয়, তার মেখলার রঙে রাঙাইয়া আমারো উত্তরী,
যে পথে সে আসে যায় সেথা নিতি যদি আনাগোণা করি !
মোর চেলাঞ্চলের উচ্ছাস,
ব'য়ে বায়ু ফিরিবে উদাস,—
পথে পথে অদূরে তাহার তনুদেহে দিয়ে যাবে দোল,
মঞ্জুল সে বায়ুগুঞ্জরণে বোবা মন পাবে না কি বোল !

এ রীতি সুন্দরতরো বটে, তবু এতে আছে কারুকলা,
সচেতন যতনের ভারে ব্যাহত প্রাণের কথা বলা।
ভেবেচিন্তে আর যাহা করি,
বাজে কি গো মনের বাঁশরী ?
মরমের কথা যে আমার একা মোর মরমেই জানে,
সে কথা হবে না বুঝি বলা প্রাণ যদি না মিলে সে প্রাণে !

গ্রীক্‌-পঞ্চাশিকা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ এ (কলিঃ ও ক্যান্টাব)

(পূর্ব্বানুবর্ত্তন)

নারীর দুঃখ

পুরুষে কেমনে বুঝিবে নারীর দুখ,
সহিতে শকতি অবলার কতটুক্ ?
রয়েছে তাদের বন্ধু গণনাতীত,
নির্ভয়ে তারা অবারিত করে চিত।
স্বৈর-বিহার, কত ছবি কত গান,
রয়েছে তাদের পথেঘাটে অফুরান্।
রুদ্ধ এ ঘরে রবিকর নাহি পশে,
মোরা ঝ'রে মরি, পলে পলে দল খসে।

Agathias.

স্বদেশ

সৌভাগ্যের রবি হায় অস্তমিত যে দুর্ভাগা দেশে,
সেথা বাস করি মোরা এখনো কি মরিনি নিঃশেষে ?
মোরা কি জীবন-স্বপ্নে করি শুধু জীবন ধারণ ?
কিম্বা জীবনের শবে বহিতেছি সবে আমরণ ?

Palladas.

জলাতঙ্ক

পাগলা কুকুরে কাম্‌ড়ায় যে জনায়,
কুকুরের ছায়া দেখে সে সলিল পরে ;
প্রেম যে পাগল সংশয় নাই তায়,
দংশ তাহার মোরে উন্মাদ করে।
সুরা-ভৃঙ্গারে সরিৎসাগর জলে
প্রিয়ার মূরতি অনুখন ঝলমলে।

Paulus Silentiarius.

সহানুভূতি

আজি তব পক্ক কেশ, বাসনার আতপ্ত মূষল
হারায়েছে তীক্ষ্ণ মুখ, জীর্ণপ্রায়, তুহিন-শীতল।
তথাপি করিও শ্রদ্ধা যৌবনের উচ্ছ্বাস নবীন,
তরুণের বেদনায় হোয়ো না বিমুখ উদাসীন।
যৌবনসুলভ যাহা নির্ব্বিশেষে, রুষ্ট তার প্রতি
হোয়ো না মিনতি মোর। রচিয়াছে সযতনে অতি
তন্বী বালা যে কবরী, ছিন্ন দীর্ণ করিও না তারে।
পরম-আত্মীয় হ'তে প্রিয়-জ্ঞান করিত তোমারে
যে তরুণী একদিন, সে কি আজ বিধির বিপাকে
অপরের সমধিক অকরুণ হেরিবে তোমাকে ?

Agathias.

চুম্বন

চুমাটি তোমার মধু, মৌচাক্-ভাঙা,
আপেলের মত সৌরভভরা, রাঙা।
অধর আগলি' সে সুরভি রাখি ঢাকি,'
বন্ধুরা এলে বধির বিমুখ থাকি।

Anonymous.

তথাপি

'বিবাহিত পুরুষের ঝঞ্ঝাবাত ঘরে'
—এত বলি তবু নর পরিণয় করে !

Anonymous.

প্রবেশাধিকার

ধূপ-গন্ধী এ মন্দিরে চাও যদি প্রবেশাধিকার,
হ'তে হবে অকলুষ ; পবিত্র সে, সাধু চিত্ত যার।

Anonymous.

ভঙ্গুর

গোলাপ স্বল্লায়ু জেনো, ঝরিবে যখন,
কণ্টক লভিবে শুধু চাহিলে তখন।

Anonymous.

সমাধি

হে পথিক, এই পথে চলিতে চলিতে
দৃষ্টি তব পড়ে যদি মোর সমাধিতে,
হাসিওনা হেলাভরে, করি অনুনয়,
—যেহেতু কুকুর এক এ কবরে রয়।

শোকাতুর হয়েছিল প্রভু মোর তরে,
দিয়াছিল নিজ হাতে মাটি এ কবরে,
এ শিলা-ফলকে লিখা শ্লোক দুটি তার,
মোর লাগি অন্তিমের অশ্রু-উপহার।

Anonymous.

ভবিষ্যদ্বাণী

বলেছিনু আমি কত আগে
তখন সে মকুলিকা প্রায়,
—"পোড়াবে মোদেরে অনুরাগে।"
হাসিল সকলে সে কথায়।

আজি সে যে ফুটেছে গরবে,
পূর্ণ মোর ভবিষ্যৎ-বাণী।
কি করি ? কি দশা মোর হবে ?
সে পুরাণ জ্বর-জ্বালা জানি।

পুড়ে মরি তাহারে নেহারি,
না দেখিলে ভাসি আঁখি জলে,
কণা দানে কৃপণা কুমারী,
চলে যাই যাচিয়া বিফলে।

Antiphilus.

শ্মশ্রুতত্ত্ব

দাড়ি রেখে ভায়া ভেবেছ কি মনে, এবার হয়েছ জ্ঞানী ?
মাছি তাড়াবার পাখাটি ঝুলায়ে ঢেকেছ বদনখানি !
যদি রাখ কথা, বলি তবে শোন, দূর কর জঞ্জাল,
গজাবেনা জ্ঞান দাড়ির প্রসাদে, উকুনে ভরিবে গাল !

Ammianus.

সুখে ও দুঃখে

জানেনা যে জন বেদনা কাহারে বলে,
দীর্ঘ জীবন কাটে তার যেন পলে।
দুখীর জীবনে একটি রজনী মাঝে,
নিরবধি কাল কখনো ফুরায় না যে !

Lucianus

শ্লাঘা

নেশায় বেহুঁষ্‌ সবাই যখন, সাবধানী অবিচল।
ভাবে আর সবে ঠিক্‌ আছে তারা, সে-ই একা বেসামল !

Lucianus.

চিরায়মানা

'কাল পুন হবে দেখা !' নিরবধি কালে
সে 'কাল' দিল না দেখা এ পোড়া কপালে।
শুধু ফাঁকী মোর তরে, প্রণয়ের দান,
পায় তারা শ্রেষ্ঠ বর যারা ভাগ্যবান্‌।
'নিশীথে আসিব আমি !' সে নিশি প্রিয়ার
পলিত গলিত মূর্ত্তি, এ মোর জরার !

Macidonius.

কুরূপার প্রেম

রূপসীর রূপে যে নেশা নয়নে জাগে,
তারে ভালবাসা আমি কভু নাহি বলি।
কুরূপার তরে যে শিখা রক্তরাগে
জ্ব'লি ওঠে, বুকে ছুরি হানে, পড়ে ঢলি

আলিঙ্গনের উন্মাদনার বশে,
—তারি নাম প্রেম, অনল-আখরে লিখা
রূপের কুহক সবারি মরমে পশে,
নারীর আকারে সে মোর বহ্নিশিখা।

Marcus Argentarius.

ব্যাধ

কটাক্ষে যে বহ্নি ধর, চুমায় সাত নলি।
মেলিনু পাখা উড়ি পলা'ব বলি,
পড়িল পাখা অমনি হায়, আঠায় ঠোঁট্ জোড়া,
মরিনু আমি, বন্ধ হ'ল ওড়া।

Meleager

সম্মুখে ও আড়ালে

মুখপানে তার চাই,
আঁখি-বন্ধনে নিখিলেরে বুকে পাই।
শূন্য যে ত্রিভুবন,
আঁখির আড়ালে চলে যায় সে যখন!

Meleager

নারী

নারী,
—উৎপাত, মহামারী।
তবু সে দু'বার
চমৎকার!
প্রথম,—বাসর শয়নে,
দ্বিতীয়,—লভিলে মরণে।

Palladas.

পুনরায়

অকালে পেকেছে চুল, আঁখি মোর করে ছলছল,
নারাজ হোয়ো না ভাই, প্রণয়ের খেলা এ কেবল।
ব্যর্থ বাসনার ব্যথা, শরাঘাতে বিদীর্ণ হৃদয়,
নিদ্রাহারা বিভাবরী,—সবে মিলি করে মোরে ক্ষয়।
ত্রিবলি কপোলে ভালে, বিগলিত সুঠাম যৌবন,
পরাণের বহ্নিশিখা জ্বলে যত, দহে তনু মন
ভাবনার তুষানলে, তাই নিত্য জরাজীর্ণ হই।
ওগো অকরুণ মোর, তোমারে শপথ করি কই,
—করুণার্দ্র হয় যদি চিত্ত তব কভু মোর তরে,
কালো কেশে নবোন্মেষে বিকশিব পুলকশিহরে।

Paulus Silentarius.

শ্যামলী

হায় রে হায়,
কি মোহে শ্যামলী ভুলাল আমায়!
গলি ঘৃত সম রূপানলে তার,
রূপসীর সেরা কাজলি আমার।
কয়লা ময়লা, ক্ষতি কিবা তায়
ফোটে সে গোলাপে, বহ্নি শিখায়।

Asclepiades.

'সলিলে লিখা'

নিরমল নিশীথিনী, স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রদীপের আলো,
তোমরা দুজনে সাক্ষী, মোরা দোঁহে বেসেছিনু ভালো।
প্রেমভরে কি শপথ করেছিনু মোরা দুজনায়
শুনেছিলে সে প্রতিজ্ঞা নিত্যযুক্ত র'ব এ ধরায়।
'শপথ সলিলে লিখা' বলি' সে যে ছাড়ি গেল মোরে,
স্বচক্ষে দেখেছ দীপ, বন্দিনী সে কত বাহুডোরে!

Meleager.

বজ্র-বেত্তা

প্রেমোদ্দীপ্ত আঁখি কয়, 'বাসবের বজ্র মোর দান,'
রূপসীর বক্ষ বলে, 'স্পর্শে মোর গলে যে পাষাণ।'
কহে কবি, "জানি আমি কি অশনি নয়নের বাণে,
বাসনার তুষানল কোন্ স্পর্শে জ্বলে যে পরাণে!"

Meleager.

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

আবির্ভাব

সম্পূর্ণ উপন্যাস

শ্রীসুবোধ বসু

এক

দীপঙ্কর আবার জেলে ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছিল।

অবস্থাটা এই রকম দাঁড়াইল যে জেলের বাহিরে তাকে ধরিয়া রাখা প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিল। দীপঙ্কর বক্তৃতা করিলেই রাজদ্রোহ করে, স্বদেশী প্রচার করিতে গেলেই আইন ভাঙে। পিতা চিন্তিত হইয়া উঠিল।

গুরুপ্রসাদবাবু এক সময় জবরদস্ত ডেপুটী ছিলেন। ইংরেজের নিমক খাইয়া বড় হইয়া তার পুত্রই যে এমন বিভীষণ হইয়া উঠিবে তাহা তিনি কোনদিন কল্পনাও করেন নাই। কিন্তু ব্যাপার ঠিক তাহাই হইয়া উঠিল। দীপঙ্করকে কিছুতেই শাসন করা গেল না। দু-তিনবার সে স্বদেশী করিয়া জেলে গিয়াছে,—এখনো একটু দমে নাই।

কিন্তু বাপ-মার চিন্তার আর অবধি রহিল না। কিছুদিন মাত্র হইল দীপঙ্কর গুরুতর ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া উঠিয়াছে। তার উপর নাওয়া নাই, খাওয়া নাই, দীপঙ্কর আন্দোলন লইয়া মাতিয়া আছে।

এদিকে তৈলাভাবে দীপঙ্করের লম্বা চুলগুলিতে জটা বাঁধিবার উপক্রম হইয়াছে, খাওয়া প্রায়ই বাদ যায়, মোটা খদ্দরের পাঞ্জাবিটা বদলাইবারও সময় হইয়া ওঠেনা, এবং ওর চোখে শ্রান্তির ছায়াটাকে উৎসাহের আতিশয্যও গোপন করিতে পারিতেছেনা। নিজে দীপঙ্কর নাই বুঝুক কিন্তু আত্মীয়স্বজনের জানিতে বাকী রহিল না যে তাকে বাঁচাইতে হইলে এই যজ্ঞশালা হইতে তাকে জোর করিয়া ছিনিয়া নিতে হইবে। বিশ্রাম এবং উত্তেজনা-হীন শান্তিমাত্র তাহাকে সুস্থ করিয়া তুলিতে পারে,—আর কিছু নয়। কিন্তু দীপঙ্কর হাসিয়াই সেসব কথা উড়াইয়া দেয়।

দীপঙ্কর যে এক সময় সৌখীন ছিল, কবিতা লিখিত, মোটর হাঁকাইয়া পিয়ানো বাজাইয়া সুখে দিন কাটাইবার স্বপ্ন দেখিত, সে সব কথা সে এখন আর মনেই করিতে পারে না। জীবন তাকে আরো বড় কাজের জন্য দুঃখ-বন্ধুর পথে ডাক দিয়াছে।

দীপঙ্কর কাগজে প্রবন্ধ লিখিতেছে, অসংখ্য সভায় বক্তৃতা করে, পল্লীসংগঠন স্কীমের উদ্যোগী, দীপঙ্কর দার্শনিক, দীপঙ্কর অর্থনীতির ছাত্র, দীপঙ্করকে না হইলে কোনো অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয় না। কংগ্রেসে তার ডাক, তার ডাক স্বদেশী প্রদর্শনী খুলিতে, বন্যা সাহায্য সমিতিতে। ছেলের দল তার বাড়িতে ভিড় করে,—জামার বোতাম শিলাইয়া লইবার সময়ও দীপঙ্করের হয় না।

এই রকম মাতিবার, নিজেকে সম্পূর্ণ বিলাইয়া দিবার একটা গভীর উন্মাদনা আছে। দীপঙ্করকেও তাহা পাইয়া বসিয়াছে।

গুরুপ্রসাদবাবুর একমাত্র পুত্র দীপঙ্কর। এই পুত্রের জন্য অনেক সুখমণ্ডিত ভবিষ্যৎ তিনি কল্পনা করিয়াছিলেন। দীপঙ্কর এম-এ পাশ করিবার পর তার এমন চাকরী পাইবার সুযোগ ঘটে যাহা এসময়ে সচরাচর সম্ভব নয়। জীবনের সুখ-সম্ভাবনা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু দীপঙ্কর রাজী হইল না। অর্থকর চাকরীর বদলে সে দরিদ্র সংবাদপত্র সেবা গ্রহণ করিয়া লইল। দেশের প্রত্যেক নরনারীর মনে আলো জ্বালাইবার যারা ভার লইয়াছে তাদের দলে যোগ দিতে সে গর্ব্ব বোধ করে।

দীপঙ্কর এক সময় কবি ছিল। এখন কবির আন্তরিকতা ও তীব্রতা লইয়া দেশসেবায় নামিল। সাগর সঙ্গীতের কবি যখন দেশকে ভালোবাসিল, এমন তীব্র গভীর ভাবে কেহ আর কোনোদিন দেশপ্রেম অনুভব করে নাই,—সমস্ত

বিলাইয়া একেবারে বৈরাগী হইয়া গেল। সেই গভীর অনুভূতি লইয়াই দীপঙ্কর দেশকে ভালোবাসিল,—তার মাটী, তার হাওয়া, তার দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষ।

এমনি কঠোর পরিশ্রম, অজস্র উৎসাহ ও আপনাকে বিলাইবার একটা অপূর্ব্ব পুলকে দীপঙ্কর আগাইয়া চলিয়াছে। শরীরের পক্ষে যে কতকটা বিশ্রাম ও কিছুটা খাদ্য নিতান্তই অপরিহার্য্য তাহাতেও দীপঙ্করের খেয়াল নাই। মা হয়তো বলেন, দীপু, ভোরে না খেয়ে আজ তুই কিছুতেই বেরুতে পারবি না।

হাসিয়া দীপঙ্কর জবাব দেয়, আজ বড় কাজ মা, দুপুরে ফিরে এসে দুটো খাওয়াই একসঙ্গে খাব,—তোমার আর আক্ষেপ থাক্‌বে না।

'দীপু ?'

'কি মা।'

'দুপুরে ফিরতে তোর বড় দেরি হয় বাবা।'

'এবার থেকে তাড়াতাড়ি ফিরতে আমি চেষ্টা করব মা।'

'একটু বিশ্রাম করে নে বাবা,—মানুষের শরীর তো।'

'জানো মা, বাসে যেতে যেতে আমি চমৎকার ঘুমিয়ে নিতে পারি। সে ভারি মজার,—চম্‌কে হয়তো ঘুম ভেঙে দেখি, আমার ঘুমানো দেখে অন্যযাত্রী কেউ মুচ্‌কে হাস্‌চে।'

কাজে কাজেই দীপঙ্করের জীবনযাত্রার কোন উন্নতিই হয় না। তার প্রাণের উৎসাহে, দেশানুরাগের প্রাচুর্য্যে, কাজের ভিড়ে সে প্রকৃতিকে উপেক্ষা করিয়া চলিল। তাই তার শরীর ক্রমেই অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। এবং তার নানারকম উপসর্গ প্রকাশ পাইতে লাগিল।

এমন সময় একদিন ব্যাপার গুরুতর হইল। দীপঙ্কর সারাটা দিন ধর্ম্মঘটকারীদের সঙ্গে পাটকলের আয়তনে কাটাইল। কুলিদের অভিযোগ শুনিয়া, ওদের বুঝাইয়া, মিলের মালিকদের সঙ্গে দেখা করিয়া সারাটা দিন তার স্নানাহারের সময় ছিল না। ক্ষুধার্ত্ত পরিশ্রান্ত হইয়া বৈকালে দীপঙ্কর বাড়ী ফিরিল। কিন্তু আসিয়াই দেখে তার জন্য লোকজন অপেক্ষা করিতেছে,—আজ সন্ধ্যায় তার বক্তৃতা দিবার কথা আছে। কোনরকমে সামান্য কিছু খাইয়া দীপঙ্কর তাদের সঙ্গে বক্তৃতা করিতে চলিল।

তার স্বাস্থ্য যে কতটা খারাপ এবং শরীর যে কত পরিশ্রান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে আজ তাহা টের পাওয়া গেল। দীপঙ্কর তার প্রাণ ঢালিয়া বক্তৃতা দেয়,—আজও দিতেছিল। ভাবাবেগে দীপঙ্করের কণ্ঠ কখনো রুদ্ধ হইয়া যায়, কখনো তাহা জ্বলিয়া ওঠে। এমনি করিয়া বলিতে বলিতে অত্যন্ত অকস্মাৎ সে বক্তৃতামঞ্চের উপরেই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল।

কেবল আত্মীয়স্বজন নয়, এবার সে নিজেও বুঝিল, বাঁচিতে হইলে তাকে কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম নিতে হইবে। ডাক্তার বলিলেন অবিলম্বে কোনও স্বাস্থ্য-নিবাসে চলিয়া যাওয়া দরকার।

মা বলিলেন, দীপু, আর নয় বাবা। এইবার কিছুদিনের জন্য চল আমার সঙ্গে।

গুরুপ্রসাদবাবু কহিলেন, দীপ, তোকে আমি নিজেকে এমনি করে মারতে দিতে পারিনে। তোর যদি কিছু হয়, তোর মার কি হবে একবার ভেবে দেখিস্‌!

বন্ধুবান্ধব সবাই তাকে একই পরামর্শ দিতে লাগিল। নিজের মধ্যেও অস্বাস্থ্য ও অনেক অবসাদ জমা হইয়া উঠিয়াছে। দীপঙ্কর রাজী হইয়া গেল। তবে বলিল যে ফ্যাসানের স্বাস্থ্যনিবাসে সে যাইবে না। যাইতে পারে নিজেদের দেশের গাঁয়ে,—যেখানে মুক্ত আকাশে পাখী ওড়ে, যেখানে খালের জলে ছায়া ফেলিয়া নৌকা চলিয়া যায়, ছাতিমগাছে ঘুঘু ডাকে, খাঁটী দুধ ও তাজা মাছ যেখানে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। যেখানে আছে শান্তি, আছে ছায়া-ঢাকা বিশ্রাম, মধ্যযুগ যেখানে পরিপূর্ণ শান্তিতে ঘুমাইয়া আছে।

জ্ঞান হইবার পর দীপঙ্করের এই বাড়ীর সঙ্গে পরিচয় নাই। তবু তার বাবা-মার মুখে বাড়ীর গল্প শুনিয়া একটী সলজ্জ বধূর মত ছায়া-অবগুণ্ঠিত, পাখী-ডাকা, মাটীর গন্ধে ভরা গ্রামের কল্পনা সে করিত। খালের জলে ছেলেদের দাপাদাপি, একটা গাঙ-চিলের উড়ান দিয়া চলিয়া যাওয়া, নৌকার ছপাছপ্‌, একটু সন্ধ্যাবেলার শাঁখ তার স্বপ্নে অত্যন্ত সহজেই উড়িয়া আসিত। পাতার গন্ধে মিষ্ট বাতাস, দীঘির কালো জল, চন্দ্রালোকে শাপ্‌লাফুলের ছবি এই

সব মনের মধ্যে মায়া ফেলিয়া দিত। তার পূর্ব্বপুরুষের এই গ্রামের জন্য তার মনটা আকুল হইয়া উঠিত,—বলা যায় না এ নাড়ির টান।

দেশের কোঠা বাড়ী সংস্কারাভাবে জীর্ণ হইয়া আছে। ভিতরে সাপকোপের বাসা-বাঁধাও অসম্ভব নয়, কিন্তু কিছুতেই দীপঙ্কর দমিল না। সেগুলিকে কিছুটা মেরামত করিয়া লওয়া ছাড়া আর উপায়ান্তর রহিল না। গুরুপ্রসাদবাবুর চিঠি গেল দেশের গমস্তার কাছে। পূজা প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে,—গ্রামটাকে এখন আর ততটা পরিত্যক্ত নির্জ্জন মনে হইবে না। জায়গাটার স্বাস্থ্যও ভালো। গুরুপ্রসাদবাবুও তার শৈশবস্মৃতি-জড়ানো ছেলেবেলাকার আম-কুড়ানো, মাছ-ধরা, পাতার-বাঁশী-বাজানো, গ্রামে ফিরিয়া যাইবার সুযোগ পাইয়া মনে মনে আনন্দিত হইয়া উঠিল।

মা আনন্দময়ী সহরের মেয়ে। পাড়াগাঁয়ে কখনো সে থাকে নাই। দু-একবার বেড়াইতে গিয়াছে,—কিন্তু গ্রামের সম্বন্ধে নানা আতঙ্ক তার মোটেই কমে নাই। কিন্তু সে পর্য্যন্ত গ্রামে যাইবার প্রস্তাবে শেষপর্যান্ত খুসী হইল, —সেখানে দীপঙ্করের উত্তেজনার কোনও অবকাশই হইবে না, ছায়াসুশীতল শান্তির মধ্যেই পরিপূর্ণ বিশ্রাম পাওয়া সম্ভব হইবে।

অবকাশ পাইলেই দীপঙ্কর গ্রামের স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করিল। ধানক্ষেতে কচি শ্যামল ধানগাছ হইয়াছে। সেই ক্ষেতের দিগন্ত-প্রসারের মধ্য দিয়া একটা রূপালীরেখার মত খালটা আঁকিয়া-বাঁকিয়া দিগন্তে মিশিয়া গেছে। দিকচক্ররেখার কাছে একটা মসীছবির মত গ্রাম চোখে পড়ে। জলের পাশে একটা বক শিকারের আশায় অপেক্ষা করিতেছে। একটা মাছরাঙা পাখী জলে ডুব দেয়,— একটা নীলকণ্ঠ উড়ান দিয়া দিগন্তরে যাত্রা করিল। দীপঙ্করদের নৌকা সেই অলস সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া জলের বুকে দাঁড়ের শব্দ তুলিয়া, জেলেদের খাটানো জালের পাশ কাটাইয়া কাশক্ষেতের কোল ঘেঁসিয়া চলিয়াছে। একটা ঘুমন্ত গ্রাম আসিল,—লোকালয়ের খোঁজ পাওয়া গেল। তারপর আবার সেই আঁকা-বাঁকা খাল, ধানক্ষেত, পাখীর ডাক, জলের একটা গন্ধ···

দুই

প্রথমে সারাটা রাত রেল, তারপর ইষ্টিমার, অবশেষে নৌকায় ঘণ্টা তিন চলিয়া তবে দীপঙ্করদের গ্রামে পৌছান যায়। রাত্রি প্রভাত হইবার সঙ্গেই গাড়ি থামিয়া নদীর কিনারে পৌছিল। কী বিরাট নদী,—এত বড় যে নদী হইতে পারে দীপঙ্করের ধারণাই ছিল না। বর্ষার সৌভাগ্যস্ফীত নদীর পরপার চোখে পড়ে না। পাল তুলিয়া অজস্র নৌকা চলিয়াছে, মৃদু-তরঙ্গ-বন্ধুর জল টলটল করিয়া উঠিয়াছে। এইবার গাড়ি বদলাইয়া ইষ্টিমারে উঠিতে হইবে।

বাবা ও মা সেকেণ্ড ক্লাশে ছিলেন। দীপঙ্কর থার্ড ক্লাশ ছাড়া চড়ে না,—আজও তার অন্যথা নাই। জানলা দিয়া এতক্ষণ সে বাহিরের ছবি দেখিতেছিল, গাড়ি থামিলে সে তাদের বাড়ির আশ্রিত ও সহযাত্রী একটা যুবককে ডাকিয়া উঠাইয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িল। চাকর এবং বামুন অন্য গাড়ীতে ছিল,—বিড়ি টানিবার সুবিধা হইবে না বলিয়া তারা দীপঙ্করের সঙ্গে আসিতে রাজী হয় নাই,—তারাও আসিয়া জুটিল। রৌদ্র-না-ওঠা প্রভাত বেলায় নিদ্রালস এই ইষ্টিশানে যাত্রীর কলগুঞ্জন উঠিল। দীপঙ্করের কী অপূর্ব্ব যে লাগিতেছে তাহা আর বলা যায় না। ইষ্টিমারের উপর হইতে একটা খালাসী সূতায় শুধু মাত্র একটা বড়শি গাঁথিয়া টপাটপ্ ছোট ছোট নাম-না-জানা মাছ উঠাইতেছে, একটা লোক স্নান করিতে আসিয়া বারবার হাত দিয়া জল কাটিয়া হঠাৎ একবার ডুব দিল। ঘাটে নৌকার সারি নোঙ্গর করা,—নদীর উপরে তাদের অঙ্গার দিয়া আঁকা ছবির মত মনে হয়। কেহ চাল ধুইতেছে, কেহ সশব্দে মুখ ধুইতেছে। ও-দিকে পরপার শুধু মাত্র একটা মসীরেখার মত মনে হয়। কাছে দূরে অজস্র নৌকা শাদা বাদামী নানা-রকম ছোট বড় পাল তুলিয়া এই বিরাট নদীর নির্ভর-নির্ভয় সন্তানের মত জলে ক্ষণস্থায়ী আলপনা আঁকিয়া চারিদিকে স্বপ্নালসে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। মাটীর মধ্যে আছে স্নেহ, জলে আছে পুলক, নদীতে আছে অযুত তরঙ্গোচ্ছ্বাস, আছে নৃত্যলাস্য, শব্দ, উন্মাদনা,—সমস্ত মনে সাড়া জাগাইয়া তোলে।

ঘটাঙ ঘটাঙ করিয়া ষ্টিমারের শব্দ হইল। কালো ধুঁয়া

আকাশে কুণ্ডলী পাকাইল। এতক্ষণ পরে রৌদ্র উঠিয়াছে,—চারিদিকে কে যেন সুমধুর রৌদ্রের মন্ত্র পড়িয়া দিল। সেই সোনার রোদ গায়ে মাখিয়া জলযান যাত্রা করিল।

দীপঙ্করের জীবনে কে যেন কবিতা পড়িতেছে। এই জল, এই সুনীল আকাশ, এই রৌদ্র, জলকল্লোল, স্বপ্নের মত নৌকা, ভাঙা পাড়, রৌদ্রদীপ্ত বালুচর, জেলেডিঙি, এরা যেন বাস্তব নয়,—এরা যেন যন্ত্রযুগের জীবনে মধ্য-যুগের স্বপ্ন।

গ্রামের পর গ্রাম পার হইয়া গেল। ধানক্ষেত, কাশবন, বাজারগঞ্জ, কিছু লোকালয়, একটা ভাঙা মন্দির, তীরে জেলের জাল শুকাইতেছে। নদীর কাছাকাছি যারা আছে তারা কোথাও মাচার উপর ঘর বাঁধিয়াছে,—তাদের উঠানে জল, ঘরের নীচে জল, অন্তহীন জলের মধ্যে তারা বাস করে। বিপুল ষ্টিমারের তরঙ্গ লাগিয়া নৌকাগুলি ডুবিবার জোগাড়,—অথচ কখনো ডোবে না। যাদের ডিঙি বাড়ীর ঘাটে বাঁধা আছে তারাও ষ্টিমার দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া যটা সম্ভব সেটা টানিয়া উপরে উঠায়। জলকলোচ্ছ্বাসের আর অন্ত নাই। নদীস্রোতে কখনো ঝুপ করিয়া চড়া ভাঙিয়া পড়িতেছে। বড় ঘোম্‌টাটানা গ্রামের বধূ নদীতে কলস হইয়া আসিয়া ঘোম্‌টা ফাঁক করিয়া ষ্টিমারের দিকে সকৌতূহলে তাকাইয়া থাকে। কোথাও চর পড়িয়াছে,—অস্থায়ী ঘর তৈরী করিয়া সেখানে অনেকে চাষ সুরু করিয়াছে।

ইলিশমাছ-ধরা দেখার অভিজ্ঞতা দীপঙ্করের জীবনে এই প্রথম। লম্বা জেলেদের ছিপগুলি নদীর বুকে জাল টানিয়া লইয়া যায়,—তারপর উঠাইলেই কতগুলি ইলিশমাছ রৌদ্রে ঝলসিয়া ওঠে। এ ছবির আর তুলনা পাওয়া যায় না। বিরাট ক্ষুরধার নদী, লম্বা ডিঙি, বিশাল জলরাশি হইতে কতগুলি বন্দী রূপার-বর্ণ ইলিশমাছ, দূরে একটা বালুচর, সমস্ত মিলিয়া এই অপূর্ব্ব ছবির সম্ভার যোগায়। দূরের ছায়াশীতল গ্রাম, সুপারিগাছের সারি, নদীর কাঁচা ঘাটে ভিড় করিয়া ছেলেদের দাপাদাপি করিয়া সাঁতার দেওয়া, এই আকাশ, এই লোকালয়, এরা যেন এক অপূর্ব্ব আত্মীয়তার আকর্ষণে তাকে টানিতেছে। এক অজানা অতীতে সে এই মাটি, এই জল, এই হাওয়া, এই গাছপালার মর্ম্মরের সঙ্গে মিলাইয়া ছিল, আজও তার রক্তে সেই সব মিশিয়া আছে,—তার অ-দেখা দেশ তাকে ডাকিতেছে, ওরে তুই যে আমার একান্ত আপনার, তুই যে আমার বড় স্নেহের, আমার পরমাত্মীয় তুই,—কেমন করিয়া তবে এতকাল দূরে ছিলি।

পথে দুইটা ইষ্টিশানে ষ্টিমার থামিল। একটাতে ঠিক ঘাটে ভিড়িল না। খেয়ানৌকা করিয়া কিছু যাত্রী আসিল, কিছু নামিয়া গেল। ফেরিওয়ালারা আসিয়া হাঁকিয়া গেল, দৈ চাই, দুধ চাই, ক্ষীর চাই? এদের বলিবার ভঙ্গী, টানিয়া কথা বলিবার সুর দীপঙ্করের চমৎকার লাগিতেছে। স্নানরত কয়টা উলঙ্গ ছেলে ষ্টিমারের কাছ পর্য্যন্ত সাঁতরাইয়া আসিয়াছিল, দীপঙ্কর তাদের কয়টা পয়সা ছুঁড়িয়া দিল।

যে ছেলেটি দীপঙ্করদের সঙ্গে চলিয়াছে তার নাম সঞ্জয়। ছোটবেলাটা সে এই আবেষ্টনে কাটাইয়া গেছে। তারপর একদিন নিঃসহায় হইয়া এখান হইতেই সে দূর আত্মীয় গুরুপ্রসাদবাবুর শরণাপন্ন হয়। এখন সে বি-এ পড়িতেছে। হয়তো কলেজও ছাড়িয়া দিত, কংগ্রেস-আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িত,—কারণ দীপঙ্করের এত বড় ভক্ত খুব বেশি নাই, সঞ্জয় দীপঙ্করকে প্রায় দেবতা মনে করে। শুধু মাত্র গুরুপ্রসাদবাবুর জন্য সেটা সম্ভবপর হয় নাই এবং দীপঙ্করও তাকে দলে টানিতে চেষ্টা করিল না, এইজন্য যে বৃদ্ধ পিতামাতার অন্ততপক্ষে একজন সাহায্য করিবার লোক প্রয়োজন,—দুজনই জেলে গেলে তাদের বড় অসুবিধায় পড়িতে হইবে। এই সঞ্জয়ই এখন অনেক স্বল্পপরিচিত জিনিষের সঙ্গে দীপঙ্করের পরিচয় সাধন করাইতে লাগিল। এটা অর্দ্ধমগ্ন ঝাউগাছ, এই পাখীটা ফিঙে, স্রোত অত্যন্ত বেশি বলিয়াই ঐ মালবাহী নৌকাটাকে এমন করিয়া গুণ টানিয়া নিতেছে, এইখানে অমুক বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল, নদী ভাঙিয়া গিয়াছে, লোকের সঈর্ষ দৃষ্টির বিষ নষ্ট করিবার জন্যই ক্ষেতের মধ্যে খড়ের ঐ অদ্ভুত মনুষ্য-অনুকৃতি খাড়া করিয়া রাখা হইয়াছে প্রভৃতি অনেক তথ্যই সে দীপঙ্করকে দিতে লাগিল। দীপঙ্কর অধিকাংশই জানে, কিন্তু সঞ্জয়ের গর্ব্ব ক্ষুণ্ণ করিতে চায় না,—চুপ করিয়া সে শুনিয়া গেল।

'দীপদা, তুমি সাঁতার জানো?'

'জানি বৈকি।'

'কি করে শিখলে, গাঁয়ে তো কখনো থাকনি?'

'ছোটবেলায় সহরের বাগানের পুকুরে সাঁতার কাট্‌তুম।'

'আচ্ছা দীপদা?'

'বলো...'

'পাড়াগাঁ তোমার ভালো লাগ্‌বে তো?'

'না গিয়ে আগেই আর কি করে বলা যায়। তবে আমার সঙ্গে যার রক্তের টান, তাকে প্রিয় করে নিতে খুব বেশি দেরী হয় না।'

এমন সময় গুরুপ্রসাদবাবু আসিয়া কহিলেন, 'দীপ, ষ্টিমারেই ভাত খেয়ে নিলে হয় না?'

দীপঙ্কর কহিল, 'দরকার কি বাবা, ঘণ্টাখানিক পরেই তো নৌকায় উঠ্‌তে হবে,—তখন ইলিশমাছ রান্না করে নৌকাতে খেলেই ভাল হবে। কী চমৎকার ইলিশমাছ। এ দেখে কার আর মাংস খেতে ইচ্ছে হয়।'

দীপঙ্করের প্রস্তাবে ও উৎসাহে নৌকায় রাঁধিয়া খাইবার কথাই ঠিক হইল। তাজা ইলিশমাছ রাঁধিয়া নৌকার উপরে বসিয়া খালের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে খাওয়ার তুলনা হয় না।...

পদ্মাকে দেখিয়া দেখিয়া দীপঙ্করের আর তৃপ্তি হয় না। কীর্ত্তিনাশার সংহার-মূর্ত্তি কোথায় রহিল, আজ বিস্তৃত অঞ্চল মেলিয়া রৌদ্রকরোজ্জ্বল পদ্মা কূলে কূলে ঘুম-পাড়ানীয়া গান গাহিতেছে। কল্পনা করা যায় না, এই নদী বৈশাখী ঝড়ে অট্টহাসি করিয়া ওঠে, তার তাণ্ডবে নদীজল ক্রুদ্ধ সিংহের কেশরের মত ফুলিয়া ওঠে, ক্ষিপ্তোন্মত্ত তরঙ্গ হিংস্র ফুৎকারে দিগ্বিদিকে ছুটিয়া চলে, অসহায় তরণী টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া যায়।

দীপঙ্কর বার বার কপালে হাত ঠেকাইয়া পদ্মাকে নমস্কার করিল। হে মাতৃস্বরূপিণী নদী, তোমাকে নমস্কার,—তুমি সমস্ত বাঙ্‌লাটাকে আজও বাঁচাইয়া রাখিয়াছ।

সঞ্জয় কহিল, দীপদা!

'কেন?'

'তুমি তো একসময় কবিতা লিখতে। আজ যদি পদ্মার সম্বন্ধে কবিতা লিখতে হতো কী লিখতে তবে?'

'লিখতুম, হে পদ্মা, তুমি বাঙালীকে প্রাণবন্ত হইতে শিক্ষা দাও, এমন নির্জ্জীব ভীরু করিয়া রাখিয়ো না,—তোমার মন্ত্র ওর কানে কানে পাঠ করো।'

সঞ্জয় ইঙ্গিতটা বোঝে। দীপঙ্কর বলে, সমগ্র বাঙালি-জাতটা জীবন্মৃত হইয়া রহিয়াছে। বাঙ্‌লাদেশের জীবনে আত্মচেতনাবোধ জাগানোই একমাত্র সমস্যা। এর জন্য জ্ঞানদান এবং আঘাত দুইয়েরই প্রয়োজন রহিয়াছে।

সঞ্জয় কহিল, গ্রামে গিয়ে তুমি কি করবে?

'কিছুই না,—আমি একান্তই বিশ্রাম করতে এসেছি।'

'কিন্তু গ্রামে শীগ্‌গিরই হাঁপিয়ে পড়তে হয়,—বৈচিত্র্যের বড় অভাব।'

'খালের জল আছে, ছায়া আছে, ঝোপঝাড়, আঁকা-বাঁকা পথ, ধূসর অপরাহ্ন, জ্যোৎস্না, অন্ধকার,—এই সব দিয়ে আমি অন্তত কিছুকাল কবির বিলাসভোগ করতে চাই—অন্য কিছুর কথা ভাবতেই চাই না।'

'বেশ সেই ভালো'

দূরে কতকগুলি ছবির মত ঘর চোখে পড়িল। দু-একটা ষ্টিমার, জেটি ও ফ্লাটের একটা অস্পষ্ট আভাস পাওয়া গেল। দীপঙ্করদের পদ্মা-যাত্রার অবসান হইয়া আসিয়াছে। ষ্টিমারে কতগুলি পাখী উড়িয়া আসিল। নদীর জলে বিস্তর শুশুক একবার ভাসিয়া উঠিয়া আবার আত্মগোপন করিতেছে। নদীর পাড়ে কতগুলি নেঙটীপরা ছেলে ছোট ছোট ছিপ দিয়া মাছ ধরে।

ষ্টিমার বদ্‌লাইয়া দীপঙ্করেরা একটা বড়গোছের নৌকা ভাড়া করিয়া উঠিয়া পড়িল। দুইটা তাজা ইলিশমাছ কেনা হইল,—ভারি শস্তা। তারপর চাল ও হাঁড়ি এবং কিছু জ্বালানি কাঠ কিনিয়া তারা যাত্রা করিল।

সত্যি সত্যি দীপঙ্করের সেই কল্পনাকরা ধানক্ষেতের ভিতর দিয়াই খাল চলিয়া গিয়াছে। মোটেই চওড়া নয়,—এমন কি জায়গায় জায়গায় উল্টাদিকের দুইটা নৌকাকেও সাবধান হইয়া পাশ কাটাইতে হয়। পানকৌড়ি, জলো-হাঁস, গাঙ-চিল নৌকা দেখিয়া দূরে গিয়া উড়িয়া বসিল। খালের ধারে কোথাও অনেকগুলি করিয়া ছিপ পোঁতা,—

লোভী মাছগুলি তাতে বন্দী হয়। শালুক ফুটিয়া আছে, এবং কোথাও পদ্মও দেখা যায়।

পথে মাঝে মাঝে কোঠাবাড়ী দেখা যায়, হয়তো একটা মঠ, রং ধ্বসিয়া গিয়াছে, তারপর এক সারি টিনের চালা-ঘর,—হাট ও বাজার বসে। বেলা প্রায় একটা, এখনো গ্রামের লোকদের স্নান শেষ হয় নাই। কেহ গরুবাছুরও স্নান করাইয়া দিতেছে। তারপর আবার নির্জ্জনতা,—খাল আঁকিয়া বাঁকিয়া বিস্তৃত শস্যক্ষেত্রের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেছে, পারে কোথাও পাটকাঠি স্তূপ করিয়া রাখা হইয়াছে, কোথাও জেলেরা খালে জাল খাটাইয়া রাখিয়াছে। পাটপচার গন্ধ কিন্তু ক্রমেই বড় তীব্র হইয়া উঠিল। রূপালীজল পাটপচানর দরুণ কোথাও কোথাও লাল হইয়া গেছে।

পচা পাটের গন্ধ ও কচুরী শীঘ্রই দীপঙ্করের এই স্বপ্নছাওয়া পথের সৌন্দর্য্যকে খর্ব্ব করিতে লাগিল। কচুরির দৌরাত্ম্যে খালের জল জায়গায় জায়গায় প্রায় সম্পূর্ণ ঢাকিয়া গেছে। যে জলপ্রবাহ গ্রামের প্রাণস্পন্দনের মত, তাকে এরা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে। ইহারা শুধু অস্বাস্থ্য টানিয়া আনে নাই, দীপঙ্করের মনে হইল যে, যে-গ্রামের,—কোন্ গ্রামের নয়,—খাল কচুরি দিয়া ঢাকা সে গ্রামগুলিকে কেমন বিষণ্ণ নির্জ্জীব মনে হয়। যেন গ্রামের উৎসাহ ও আনন্দকে পর্য্যন্ত তারা বিলুপ্ত করিতে চায়।

নৌকার গন্ধ, জল ও পাটপচার গন্ধ, ইলিশমাছের ঝোলের গন্ধ, একটা বকের উড়িয়া যাওয়া, গাছের ছায়া-ঢাকা খালের কিনার দিয়া দাঁড়ের শব্দ তুলিয়া নৌকার মন্থর যাত্রা, হয়তো একটা বাঁধানো ঘাট, আত্মীয়তার সুরে নৌকা কোথায় যাইতেছে প্রশ্ন, ভবিষ্যতের পথে কচুরি কতটা জিজ্ঞাসা, মাঝিদের তামাক টানা এ-সব নাগরিকের পক্ষে অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন,—শুধু স্থান বদলানো নয়, আবেষ্টন পরিবর্ত্তন।

কোথাও দুর্গাপ্রতিমার কাঠামো তৈরি হইতেছে। গ্রামের ছেলেদের তাতেই উৎসাহের শেষ নাই। চলিতে চলিতে কোন বাড়ির আটচালায় দাবার আড্ডা বসিয়াছে তাহাও দেখা গেল। কিন্তু তা সত্ত্বেও দীপঙ্করের ক্রমেই মনে হইতে লাগিল, গ্রামগুলি যেন বড় বিষণ্ণ, প্রাণের বড় অভাব যেন। সঙ্গে সঙ্গে দীপঙ্করের মনে হইল, হইবে না কেন,—তাহাদের দোষেই এমন হইয়াছে। যারা কিছু সমৃদ্ধি পাইয়াছে তারাই মাটীর পাত্রের মত এইসব শান্তির সম্পদ গ্রাম পায়ে ঠেলিয়া চলিয়া যায়, একবার ফিরিয়াও তাকাইয়া দেখেনা। এই ছায়া-ঢাকা পথ, ঘুঘু-ডাকা মধ্যাহ্ন, নেবুফুলের গন্ধ, পুকুর, গাছ দিয়া আড়াল করা বাড়ি, বাউলের গান, কীর্ত্তনের সুর, পূজাপার্ব্বণের উৎসব, এখানকার ঠাকুরমার রূপকথা, এসব আর লোককে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। মানুষ হয়তো ক্রমেই সূক্ষ্মতাবোধ হারাইয়া ফেলিতেছে,—তীব্র উত্তেজনা না থাকিলে তার মনোরঞ্জন হয় না।

ক্রমে দীপঙ্করদের গ্রাম নিকটবর্ত্তী হইল। গুরুপ্রসাদবাবু তাঁর শৈশবের অনেক কিছুই মনে করিয়া রাখিয়াছেন। পূর্ব্ব-পরিচিতের জন্য তাঁর উল্লাসের অন্ত রহিল না। কহিতে লাগিলেন দীপ, এইটা গাড়নপুরের ইস্কুল, এর পরই সুবর্ণগ্রাম, এখানে শনি ও মঙ্গলবার হাট বসে, এইটা সুমন্ত হালদারের বাড়ি, গাবতলীর বাগান, ঐ শিবনগরের মঠ,—হয়তো একশো বছরের উপর বয়স হইয়াছে, এই গাজনতলা কত আমবাগানে, কত ছাতিম-ছাওয়া মাটির পথে, কত বেথুন-কুড়ানো বনে, কত ভাঙা পাঠশালায় তার সহস্র স্মৃতি জড়াইয়া রহিয়াছে।

নৌকা তাদের গ্রামে প্রবেশ করিল। কুমার ও জোলা পাড়ার ছায়াঢাকা চালাঘরগুলি ফেলিয়া, শিববাটী পিছে ফেলিয়া খালের বাঁক ফিরতেই চোখে পড়িল বিরাট এক দালান। খাল হইতে প্রশস্ত সিঁড়ি উঠিয়া তোরণ পর্য্যন্ত গিয়াছে। দুই পাশে দুইটা বড় চত্বর দেখা যায়। পুরাতন আমলের একটা দোতলা প্রাসাদ চোখে পড়িল। গুরুপ্রসাদ-বাবু বলিলেন, এইটা জমিদার বাড়ি। নৌকা এতক্ষণে তার খুব নিকটে আসিয়াছে। তখন চোখে পড়িল, নাটমন্দির, বহির্বাটী, বল্লালীআমলের খিলান দেওয়া দরদালান, বড় উঁচু অলিন্দ, তোরণের উপর নহবৎখানা। কিন্তু এটাও না লক্ষ্য করিয়া উপায় নাই যে ঘাট কিছুটা ভাঙিয়া গেছে, দালানের আস্তর কোথাও খসিয়া পড়িয়াছে ও রঙ চটিয়া গিয়াছে, নহবৎ-খানায় বাজনা বাজিবার কোন লক্ষণই

দেখা যায় না। জমিদারেরা গ্রামেই থাকে, তবে তাদের অবস্থা এখন আর তেমন ভালো নাই। যতটা না করিলেই নয় এখন মাত্র ততটা ক্রিয়াকাণ্ড বজায় রহিয়াছে।

মধ্যযুগের দুর্গের মত প্রাসাদটা ছাড়াইয়া বটগাছ ঢাকা বাঁকটা ফিরিতেই তাদের বাড়ি দেখা গেল। ঝাউগাছের ফাঁক দিয়া দালানটাকে চোখে পড়িতেছে,—যেন নিদ্রায় আচ্ছন্ন, যেন স্বপ্ন দেখিতেছে। এই দীপঙ্করদের বাড়ি,—তার পূর্ব্বপুরুষেরা এখানেই মানুষ হইয়াছে, তাদের হাসি ও অশ্রু, সুখ দুঃখ এখানে এককালে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল।

ঘাটে পাড়াপড়শী লোকজন জড়ো হইয়া গেছে...

তিন

পাড়াপড়শী আত্মীয়স্বজন যারা আসিয়াছিল, তাদের সবার সঙ্গে রীতিমত আত্মীয়তা করিয়া লইতে দীপঙ্করের দেরি হইল না। গ্রামকে জানিবার আগ্রহ তার এত বেশি যে, এতটা আসিবার পরিশ্রম সত্ত্বেও দীপঙ্করের অবসাদ নাই,—সঞ্জয়কে সাথী করিয়া গ্রামটার বড় সড়ক, শিবতলার বটগাছ, ক্ষীরদীঘির কাকচক্ষু জল এই সবার সঙ্গে সে পরিচয় করিয়া আসিল।

রাত্রি নিরন্ধ্র অন্ধকার লইয়া ঘনাইয়া আসে। ঝিঁঝিঁ ডাকিতে সুরু করে,—বেতঝোপে, আমবাগানে একরাশ রহস্য ঘনাইয়া ওঠে,—ঝাউগাছে হাওয়া আটকাইয়া করুণ বিলাপ আরম্ভ করিয়া দেয়। বনজঙ্গলে জোনাকী জ্বলে। নেবুফুলের গন্ধে বাতাস ভারি হইয়া উঠিল। জান্‌লা দিয়া বাহিরে তাকাইয়া তাকাইয়া দীপঙ্করের মনে হইল, আলোতে জীবন আছে সত্য, কিন্তু আন্ধিয়ারের বুকে বিপুল শান্তি ঘুমাইয়া রহিয়াছে।

গভীর রাত পর্য্যন্ত দীপঙ্করের ঘুম আসিল না। ভিজা মাটীর গন্ধ, গাছপালার শব্দ, মেঘের ডাক, ঘুমন্ত গ্রামের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দও যেন জান্‌লা দিয়া দীপঙ্করের কাছে আসিয়া পৌঁছিতেছে।

প্রভাতের আবির্ভাব গ্রামে এমন স্নিগ্ধ সুন্দর হয় যে তার আর তুলনা হয় না। অন্ধকার হইতে ছিটকাইয়া একটা ম্লান আলো গাছগাছালির ঘনান্ধকারের ফাঁক দিয়া এক সময় আসিয়া উপস্থিত হয়। অন্ধকার তরল হইয়া ওঠে। অজস্র নিদ্রিত পাখী কলরব সুরু করিয়া দেয়, এবং খালের জলে নৌকাচলার শব্দ শোনা যায়। তখনও আমবাগানের স্বপ্ন দেখা শেষ হয় না,—ভিজাবাতাসে শেফালিকার গন্ধ আসে। অন্ধকারের সাথে আলো মিশিয়া গিয়া ভাষাতীত হইয়া ওঠে।

দীপঙ্কর শেষরাত্রেই উঠিয়া বসিল। অনেক বিচিত্র গন্ধ ঝোপজঙ্গলের ভিতর হইতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, এবং অনেক ঝাপ্‌সা অস্পষ্ট ছবি চোখে বড় ভালো লাগিল।

ভোর হয় নাই,—চাঁদের আলো এখনো ম্লান আভা দেয়, একটু পাণ্ডুর মধুর হাসির মত। কিন্তু তবু দীপঙ্কর যাইয়া সঞ্জয়কে জাগাইয়া তুলিল। ঝাউগাছে-ঢাকা জ্যোৎস্নামাখানো মাটীর একটু পথ,—তারপরই খাল। ডিঙ্গিটা ঘাটেই বাঁধা আছে,—দুজনে চড়িয়া বসিল। ছাপ্‌রা ঘরটা হইতে ঘুমজড়িত প্রশ্ন আসিয়াছিল,—ঘরটায় দুইটা পাইক থাকে,—বাবুদের নাম শুনিয়া চুপ করিল। খালের নিস্তব্ধ কালো জলে ছপাছপ্‌ শব্দ জাগিয়া উঠিল,—বৈঠার আঘাতের শব্দ···

ঝোপঝাড়ে এখনও অন্ধকার আটকাইয়া রহিয়াছে,—খালের জল, পাড়ের ঘন গাছ, শিবমন্দিরের চূড়া, জমিদার-বাড়ির প্রাসাদগম্বুজ, এরা কেহই যেন ঘুম ছাড়িয়া ওঠে নাই,—সমস্ত গ্রামটাই যেন এখন পর্য্যন্ত ঘুমাইতেছে, স্বপ্ন দেখিতেছেও হয়তো। ম্লান আলো ও তরল অন্ধকার, জলের গন্ধ, খালের জলে শিউলিফুল ঝরিয়া-পড়া, এরা অপূর্ব্ব মনে হয়।

পথঘাট সমস্তই সঞ্জয়ের চেনা। ছোটবেলার বহুদিন সে এই গাছ ও ছায়া, খাল ও মাটীর বুকে কাটাইয়াছে,—অনেক সুখস্বপ্নও তার এইখানে জড়ানো। চলিতে চলিতে সে যতই চমৎকার বর্ণনা দিতেছে, ততই দীপঙ্করের কল্পনা দীপ্ত হইয়া উঠিল,—মনে হইল সে যেন এক গ্রাম্যকবিতার স্বপ্নালোকে আসিয়া পড়িয়াছে, এমন স্নিগ্ধসৌন্দর্য্যও যে থাকিতে পারে তাহা কল্পনা করাও যায় নাই।

জমিদারবাড়ির পূর্ব্বদিক দিয়া খালের যে শাখা বাহির হইয়া গেছে, গ্রামের ঠিক মধ্য দিয়াই তাহা চলিয়া গেছে।

বৎসরের অধিকাংশ সময়ই সেটা বড় শোচনীয় অবস্থায় থাকে,—কোথাও কোথাও মরিয়াও যায়। তারপর একদা শ্রাবণ আসিয়া তার বুকটা একেবারে ভরিয়া দিয়া যায়। দীপঙ্করদের ডিঙ্গি সেইদিকে অগ্রসর হইল।

প্রভাত শুধু মাত্র চোখ মেলিতেছে। খালের জলে একটু ঝিলিমিলি পড়িয়াছে। কতগুলি বক আসিয়া নলখাগড়া বনের কিনারে মাছের খোঁজ সুরু করিয়াছে—বৈঠা জলের ছিটা খাইয়া পাখা মেলিয়া কয়টা উড়ান দিয়া গেল। গাছের মাথায় রঙ আসিয়া লাগিল। কেমন ভীরুর মত যে আলো প্রথম আসে তাহা দেখিবার ও দেখিয়া অবাক্ হইবার মত। পাড়ের কুসুমিত বকফুলের মস্তবড় গাছটাকে এখন আর ভুল করিবার উপায় নাই। জমিদারবাড়ির একটা দিক দেখা যায়,—বহুকাল আগের আভাসের মত।

দীপঙ্কর যদিও বাড়িটাকে একটীবারমাত্র দেখিয়াছে, তবু এর ভিতর স্থাপত্যের যে বৈশিষ্ট্য আছে তাহা তাহার বড় ভালো লাগিয়াছে। যে-সব অভ্রঙ্কষ প্রাসাদ রাজধানীতে দেখা যায় তার সঙ্গে এর তুলনা হয় না সত্য, কিন্তু পুরাকালের খিলান, মণ্ডপ, অলিন্দ, দরদালানের নক্সা দিয় অতীত যেন স্বপ্ন দেখাইতেছে। এই রকম বয়সজীর্ণ প্রাসাদে, ক্ষুদ্র গবাক্ষপথে, কক্ষের প্রায়ান্ধকারে, অলিন্দের আশে-পাশে যেন বাঙলার অনেক কীর্ত্তিকলাপ, অনেক গৌরবজনক ইতিহাস অনাদরে পড়িয়া আছে, এবং শুধু তাহাই নয়, যেন একটা রহস্য এই অতীতকালের স্বপ্নের মাঝে অন্ধকোঠায় ও ঢাকাবারান্দায় সুড়ঙ্গপথে ও চোরকুঠিতে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে,—ঘনীভূত এক রহস্য। বল্লালীআমল এই সব প্রাসাদের মায়া কাটাইয়া এখনো যাইতে পারে নাই,—নহবৎখানার খুঁটিতে, অন্ধকার অন্তঃপুরে ও সুউচ্চ প্রাচীরতলে, প্রাণপণ করিয়া আঁকড়াইয়া আছে।

জমিদারদের উপর দীপঙ্কর সুপ্রসন্ন নয়। জমিদারের অস্তিত্ব না থাকিলেও কারুর কোনও অসুবিধা হইত বলিয়া তার মনে হয় না। জমিদারের অস্তিত্বের অধিকাংশটাই আগাছার মতন,—অন্যার্জ্জিত অর্থে পুষ্ট। শাসনব্যবস্থার ও রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য লর্ড কর্ণওয়ালিশ দেড়শত বছর আগে যে-ব্যবস্থা করিয়াছিল, দীপঙ্করের মতে আজ তাহা একান্তই অ-দরকারী হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আজ এই খালের জলে ভাসিতে ভাসিতে, প্রভাতের রূপালীক্রম আলোয়, জমিদারপ্রাসাদের ছবিটা তার মনে আক্রোশ বহন করিয়া আনিল না। ইহার উদার-গম্ভীর সৌন্দর্য্য, প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য, ইহার অবর্ণনীয় রহস্যাভাস তাকে অভিভূত করিল।

একবার চমকিয়া দেখে, তারা জমিদারবাড়ির ঘাটের একেবারে কাছে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে,—অতি সামান্যই ব্যবধান। এই অতিপ্রভাতে প্রকাণ্ড ঘাটের সিঁড়িতে পাঁচ সাতজন মানুষ দাঁড়াইয়া আছে। কপালে সিন্দুর পরিয়া একজন অতি-গৌরবর্ণা বর্ষীয়সী মহিলা, নামাবলী গায়ে একজন পুরোহিত উপবীতটা আঙুলে জড়াইয়া আছে, মাঙ্গল্য হাতে দুইটা দাসী, একজন সশ্মশ্রু বৃদ্ধ,—এবং সবার চাইতে বিস্ময়ের,—রূপকথার রাজকন্যার মত একজন অপূর্ব্ব সুন্দরী তরুণীমেয়ে অঞ্জলিতে বেলপাতা ও রঙীন ফুল লইয়া জলের উপর নত হইয়া মন্ত্র পাঠ করিতেছে।

দীপঙ্কর একেবারে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল,—এমন বিস্ময়ের যেন আর কিছু কোনো দিন দেখে নাই। ব্রতের কথা সে শুনিয়াছে বটে, কিন্তু সে কি এমন অপূর্ব্ব হয়! হাতের বৈঠা স্তব্ধ হইয়া গেল।

মন্ত্রপাঠ সমাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। পুরোহিত অনুজ্ঞা করিলে জমিদার রামনারায়ণ চৌধুরীর পৌত্রী উত্তরা পুষ্পাঞ্জলি খালের জলে বিসর্জ্জন দিয়া প্রণাম করিল।

সঞ্জয় ও দীপঙ্কর বৈঠা উঠাইয়া লইয়াছিল,—অগ্রসর হইবার ইচ্ছা ছিল না, তবু ডিঙ্গিটা ঘাটের ঠিক সমুখটায় আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রণাম সারিয়া মুখ উঠাইতেই উত্তরার দুই চোখ দীপঙ্করের প্রভাত আলোয় স্নিগ্ধ সতেজ মুখের উপর যাইয়া পড়িল। এবং ঘটনাটা এমন হইল যে দীপঙ্কর পর্য্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িল।

এতক্ষণ পরে সিঁড়ির সবাই অবাক্ হইয়া ডিঙ্গিটার পানে তাকাইয়াছে। বর্ষীয়সী মহিলাটী সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে দীপঙ্করের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। সমবেত সকলের মুখে একটা অস্ফুট কথাও যেন গুঞ্জরণ করিয়া উঠিল।

বৈঠা দিয়া দীপঙ্কর জলে আঘাত করিয়াছে,—ডিঙ্গিটা ঘাটের বাহির হইয়া গেল। ফিরিয়াও তারা আর পিছনে

চাহিল না;—বৈঠার আঘাতে মুক্তাবিন্দুর মত জল ছিটকাইয়া সাপ্‌লা পাতায় পড়িতেছে···

অনেকটা নিঃশব্দে চলিয়া দীপঙ্কর কহিল, এই বুঝি ব্রত?

'বোধ হয়,—কিন্তু কি ব্রত বলতে পারলাম না।'

'হঠাৎ ঐ রকম করে ওদের উপরে গিয়ে পড়াতে আমাদের অন্যায় হয়েছে,—নিশ্চয়ই ওদের বড় অসুবিধা হয়েছে।'

'আমরা তো ইচ্ছে করে গিয়ে পড়িনি।'

'না তা পড়িনি,—এই সকালে কেউ যে যাবে ওঁরাও হয়তো তা ভাবেন নি।'

নিঃশব্দে আবো পথ অতিক্রম করা গেল। ফুলগাছের উপর দিয়া আসন্ন সূর্য্যোদয়ের আভাস পাওয়া গেল। আন্ধিখালের মধ্য দিয়া নৌকা বাঁক ঘুরিয়া চলিল।

যদিও দীপঙ্করের কোনও কৌতূহল ছিল না তবু কথা জমিদারবাড়ির ঘাটের ঘটনায় টানিয়া আনিয়া সঞ্জয় পরিচয় দিতে লাগিল। ব্রত করিল জমিদার রামনারায়ণ চৌধুরীর পুত্র প্রসন্ননারায়ণ বাবুর কন্যা,—উত্তরা। সঞ্জয় তাকে দশ বৎসর পূর্ব্বে ছোট দেখিয়া গিয়াছিল,—কিন্তু আজও তরুণী উত্তরাকে চিনিতে কষ্ট হয় না,—এমনই বিশিষ্ট সে। এক সিঁড়ি উপরেই উত্তরার মা বধূরাণী দাঁড়াইয়া ছিলেন। অনেক স্নেহ তার মনে, অনেক উদারতা এবং গ্রামের সকলের উপকার করিতে অনেক ইচ্ছা, কিন্তু জবরদস্ত শ্বশুরের জন্য কিছুই প্রায় তার করা হয় না,—অন্তঃপুরের বাহির হওয়াও তার পক্ষে মুস্কিল। স্বামী প্রসন্ননারায়ণ শিক্ষিত, কিন্তু কিছুই তার ক্ষমতা নাই,—পিতার প্রকাণ্ড প্রতাপের কাছে সে সব সময় মাথা নীচু করিয়া থাকে।

রামনারায়ণ চৌধুরী এখনো দ্বাপর যুগে পড়িয়া আছে। খাওয়া ছোঁওয়া বাঁচাইয়া, হাঁচি ও টিকটিকিকে প্রভৃত সম্মান করিয়া বুড়া রামনারায়ণ চৌধুরী এখনো বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতি অক্ষরে পালন করিতেছেন,—শুধু বয়স খুব বেশি হইলেও বনে যান নাই। একসময় রায়বাহাদুর হইবার জন্য অনেক তদ্বির তোষামোদ করিয়াছিলেন, ফললাভ হয় নাই। কলের জল কথনো পান করেন নাই,—সহরে গেলেও নয়। গঙ্গাজল দিয়া তিনি আলবোলা টানিতেন, এবং গায়ে পরিতেন পুরাকালী কামিজ।···

ছায়াঢাকা খালের পথে কচুরি পানা কাটাইয়া আর একটু চলিয়া পাড়ে নৌকা লাগাইয়া সঞ্জয় কহিল, এই হরজ্যাঠার বাড়ি।···

তারা নামিয়া পড়িল।

চার

জমিদার বাড়ীর ঘাট ছাড়াইয়া দীপঙ্করদের নৌকা চলিয়া গেলেও সমবেত সবাই তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল। উত্তরা বিব্রত হইয়া জলের কাছ হইতে উঠিয়া মার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তার দিকে বধূরাণীর লক্ষ্যই নাই,—বিস্ময়ে তেমনি দুই চোখ দীর্ঘ করিয়া ক্রমদূরায়মান নৌকাটার দিকে শুধু তাকাইয়াই রহিলেন। দাসীরা পর্য্যন্ত কানাকানি করিতে লাগিল।

এইখানে যারা জড়ো হইয়াছে, এই মঙ্গলাচরণের তাৎপর্য্য কাহারো জানিতে বাকী নাই। অনূঢ়া উত্তরার উপযুক্ত স্বামীলাভ এই ব্রতের উদ্দেশ্য। উত্তরার বয়স হইয়াছে কুড়ির কাছাকাছি,—অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও এখন পর্য্যন্ত তার উপযুক্ত পাত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। পাত্রের অভাবই হইত না, শুধু পাত্রের উপযুক্ততা সম্বন্ধে রামনারায়ণ চৌধুরীর যে বল্লালী ধারণা আছে, তাহার সঙ্গে পাত্রেরা ঠিক রকম খাপ খায় না।

রামনারায়ণ চৌধুরীর নাত্নী জামাইয়ের সবচেয়ে প্রথম ও প্রধান যে জিনিষ থাকা প্রয়োজন তাহা ঠাসা মজবুত কুলীনবংশোদ্ভব,—বল্লালসেনের আমল হইতে যেন তাদের বংশের ভেজালহীন ইতিহাস পাওয়া যায়, এবং কৌলিন্যগর্ব্ব একটুমাত্র ম্লান করে এমন একটুমাত্র দাগও যেন তাতে না থাকে। তবে শুধুমাত্র এতেই চলিবে না, পাত্রকে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মী গভীর বিশ্বাসী হইতে হইবে, বেদপাঠী, নতচক্ষুবিনয়ী, এবং এমন আরো এত অনেক কিছু হইতে হইবে যে বিংশ-শতাব্দী যখন এতটা অগ্রসর হইয়াছে, তখন এমনটা খুঁজিয়া পাওয়া শুধু সুদুর্লভই নয়, রীতিমত বরাত জোর। পিতামহ উত্তরার যেন সেই বরাতের আশায় এতকাল অপেক্ষা

করিয়াছিলেন,—কিন্তু উত্তরার ভাগ্য মন্দ বলিতে হইবে, এমন আদর্শ স্বামী তার জন্ম আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।

এদিকে হতাশ হইয়া জমিদার বুড়া রামনারায়ণ চৌধুরী গ্রামেরই একটী যুবকের উপর দৃষ্টি দিলেন। ছেলেটি কুলীন-বংশোদ্ভূত,—তবে বল্লালী যুগের মধ্য হইতে তাদের বংশের বিশেষ কোনও একটা কীর্ত্তিকলাপ টানিয়া বাহির করা যায় না,—এবং কনোজের সেই পাঁচ সৎ-কায়স্থের কোনটী তার কে ছিল সে বিষয়ে তদ্বির করাও সহজ নয়। কিন্তু তা হইলে কি হয়, এই আটাশ বৎসর বয়সেই সেই কুলতিলক মহাচেষ্টায় প্রৌঢ় হইয়া উঠিয়াছে। মুখ গম্ভীর, চাপল্যের লেশটুকু নাই, হাসিপরিহাসের এমন শত্রু দুর্লভ।

যে-জিনিষটা রামনারায়ণ চৌধুরীকে বেশি আকৃষ্ট করিয়াছে সেটা কাশীপ্রসাদের ঐহিক বিষয়ে লিপ্সাহীনতা ও ধর্ম্মে সুগভীর আস্থা। কাশী প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করে,—স্নানান্তে পাড়ে উঠিয়া নিকটের তুলসী গাছটায় গিয়া ভিজা কাপড়ে পনর মিনিট ধরিয়া লুটাইয়া নমস্কার করে, তারপর সভয়ে তুলসীর গাছ ধরিয়া নাড়িয়া পাতা ঝরাইয়া জলভরা ঘটীটায় পাতা ভরিয়া দক্ষিণ বাম, পূর্ব্ব পশ্চিম নানাদিকে নমস্কার করিয়া বাড়ী ফিরে। এই নিষ্ঠা, এই শুদ্ধাচার জমিদার রামনারায়ণ চৌধুরী দেখিয়াছেন,—দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, গ্রামের শীতলামন্দিরে কাশীপ্রসাদ প্রতি সন্ধ্যায় এমন প্রার্থনা আরাধনা এবং কখনো নিবিড় ভক্তিতে দশাপ্রাপ্ত হয়, যে তাহা গ্রামের প্রতি বৃদ্ধের প্রশংসার্জ্জন করিয়া ছাড়ে।

কাশীপ্রসাদের পিতা টাকা ধার দিয়া ও শতকরা পাঁচ সাত ও ততোধিকশত সুদ আদায় করিয়া লক্ষ্মীকে অনেকটা সন্তুষ্ট করিতে পারিয়াছেন। কাশী উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত সন্তানরূপে আদায় তহশিল করিয়া থাকে,—এবং বাকী সময়টা অলস এবং অসার বিষয়ে মন না দিয়া ধর্ম্মাচরণ করিয়া কাটায়। মন্দিরে সে আরতি করে, কখনো ভাবাবেশে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করে, এমন কি তাকে 'মা' 'মা' বলিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িতেও দেখা গেছে। এইসব দেখিয়া শুনিয়া জমিদার রামনারায়ণ চৌধুরী পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়া গেলেন। কেবল তাই নয়, একদিন পুত্রকে ডাকিয়া তিনি তাঁর মনোগত বাসনা জানাইয়া দিলেন। প্রসন্ননারায়ণ বিনীত আপত্তি করিল,—কাশীর শিক্ষাভাব, সৌন্দর্য্যাভাব, আচারা-চরণের সৌজন্যের অভাব প্রভৃতি দেখাইয়া দিল। কিন্তু রামনারায়ণ চৌধুরী এসব আপত্তিকে আমলই দিলেন না।

বধূরাণীর পালা আসিল। বধূরাণীকে এখনো শ্বশুরের সমুখে দীর্ঘ ঘোমটা টানিতে হয়। তবু এই ভয়ঙ্কর প্রস্তাব শুনিয়া তিনি ঘোমটার ভিতর হইতেই অভিযোগ করিলেন। বধূরাণীর ছোটবেলাটা শহরে কাটিয়াছে,—এবং যতই না গ্রামের এই জমিদারবাড়ির অন্ধকার অন্তঃপুরে কাটান, তবু তার মধ্যে বর্ত্তমানকাল সজীব হইয়া আছে,—মরে নাই। বধূর আপত্তিতে রামনারায়ণ চৌধুরী প্রবুদ্ধ হইলেন না,—তবে নেহাৎই দয়া করিয়া কহিলেন যে, আর মাস তিন বড়জোর তিনি অপেক্ষা করিতে পারেন, এবং এই কালের মধ্যে তাঁর আদর্শ-অনুযায়ী কাশীর চাইতে যোগ্যতর পাত্র পাওয়া গেলে ভাল, নহিলে আর তিনি অপেক্ষা করিবেন না। উত্তরার বয়স হইয়াছে,—শুধুমাত্র কুলীনকন্যা ও জমিদারের পৌত্রী বলিয়া লোকনিন্দা তেমন তীব্র হইয়া ওঠে নাই।

উত্তরার মত অপূর্ব্ব সুন্দরী বড় একটা দেখা যায় না। পাড়াপ্রতিবেশীরা তাকে উপকথার রাজকন্যা বলে,—এবং সেটা সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্যের দুয়ারে চাটুবাদ নয়। উত্তরার বঙ্কিম ভুরুতে, স্বপ্নালস চোখে, উত্তরার নিটোল মুখশ্রীতে, একটা ভাষাতীত কমনীয়তার ইঙ্গিত আছে। এই রাজকন্যার মত মেয়ের জন্য এক সময় বধূরাণীর অনেক সুখস্বপ্ন ছিল। কিন্তু যতই দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ শ্বশুরের অভিলাষ সে জানিতে পারিল ততই শঙ্কায় ভয়ে মায়ের চিত্ত পূর্ণ হইয়া গেল। এ-বংশের প্রথার উল্টা, মেয়েকে তিনি স্বামীর সহায়তায় বাড়িতে পড়াইলেন,—এমন কি যন্ত্রসঙ্গীত সম্বন্ধে গোপনে গোপনে উত্তরার কিছুটা জ্ঞানলাভ হইল। মামাবাড়ি বেড়াইতে যাইয়া উত্তরা শহরের সংস্পর্শেও কিছু আসিয়াছে, এবং তার ভাবনাকল্পনাও যে অতীতকালের বাঙলায় পড়িয়া নাই, বরঞ্চ ভবিষ্যতের দিকেই পাখা মেলিয়াছে, তাহাও মার একেবারে অজানা নয়। বধূরাণীর

ভাবনা এইজন্য আরো বেশি হইল। শ্বশুর, মেয়ে এবং নিজের ইচ্ছাকে মিলানো আর সম্ভবপর রহিল না।

এই অসহায়, উপায়-খুঁজিয়া-নাপাওয়া অবস্থায় কুলপুরোহিত শিরোমণিমশায়কে ডাকিয়া বধূরাণী উত্তরার ব্রতের ব্যবস্থা করিলেন। ব্রতমন্ত্রে বধূরাণীর বিশ্বাস খুব প্রচুর না হইলেও একেবারে নাই এমন নয়। হয়তো মন্ত্রের অলৌকিক প্রভাবে অসম্ভব সম্ভব হইবে,—এক অজানা রাজপুত্র আসিয়া উত্তরাকে সকল সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইবে।

আজ অতিপ্রভাতে স্রোতজলে উত্তরার পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে একেবারে অদেখা হইতে দীপঙ্করের ডিঙ্গি যখন আসিয়া অকস্মাৎ সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখন এই বলিষ্ঠ তেজদৃপ্ত পুরুষটাকে দেখিয়া বধূরাণী এক অবর্ণনীয় শুভসূচনায় বারম্বার শিহরিয়া উঠিলেন,—এবং তাঁর বিস্ময়ের আর অন্ত রহিল না। সব কিছুই যেন অসম্ভব এবং অদ্ভুত মনে হইল। কিছুক্ষণ তাঁর মুখ দিয়া কথাই ফুটিল না।

ঘাট হইতে যখন তাঁরা ফিরিয়া গেলেন তখন বধূরাণী শিরোমণিমশায়কে বাড়ি ফিরিতে দিলেন না,—ডাকিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। অন্তঃপুরের তিনিই অধিশ্বরী, —শাশুড়ি মারা যাইবার পর হইতেই সব দায়িত্ব তাঁর কাঁধে আসিয়াছে। প্রভাতে কর্ত্রীর কাজ অনেক, তবু আজ সব কিছু উপেক্ষা করিয়া শিরোমণিকে নিজের ঘরে ডাকিয়া আসন পাতিয়া দিলেন।

একটুক্ষণ দ্বিধা করিয়া,—হয়ত এমন করিয়া নিজের মনের কথাটাকে প্রকাশ করিতে ভীরুতা করিয়া এক সময় বধূরাণী প্রশ্ন করিয়া বসিল যে শিরোমণিমশায় ছেলেটীকে জানেন কি না?

কোন্ ছেলেটীর কথা জিজ্ঞাসা করা হইতেছে সে-বিষয়ে শিরোমণিমশায়েরও কোন সন্দেহ রহিল না। ঘটনাটা মন্ত্রে-বিশ্বাসী এই পুরোহিতকেও দোলা দিয়াছিল। তাই আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া তিনি কহিলেন যে তিনি আর কোনও দিন তাকে দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না,—আজই প্রথম দেখিলেন। বোধহয় এই গ্রামের নয়, তবে গতকাল হাকিমবাড়ির গুরুপ্রসাদবাবু গ্রামে আসিয়াছেন,—সে বাড়ির কেহ হইতে পারে, নহিলে এ গ্রামের প্রায় কেহই তার অচেনা নাই।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বধূরাণী মন্তব্য করিলেন যে, ভোরবেলায় উত্তরার অঞ্জলি নিক্ষেপ করিবার সময়ই তার আসিয়া উপস্থিত হওয়াটা ভারী আশ্চর্য্যের বিষয়। শিরোমণিমশায়ের এ বিষয়ে কী মনে হয়?

শিরোমণি জবাব দিলেন যে ঘটনাটা আশ্চর্য্যের বিষয়ই বটে। এমন শেষরাত্রে এই জলপথে কেহই কখনো চলে না।

বধূরাণী কহিলেন যে, মনে হইয়াছিল যে অপরিচিত যেন মন্ত্রের বলে আসিয়া পৌছিল। বুকটা তার কেমন করিতেছে। কার যে এমন দেখিতে ছেলেটী, কে জানে! শুধু তাকে দেখিয়া বড় ভালো লাগিল,—বলিষ্ঠ মুখ, প্রশস্ত ললাট, বড় শক্তিমান মনে হয়। এমন একটী ছেলে যদি সত্যই উত্তরার জন্য পাওয়া যাইত, তবে ব্রত যে সত্যসত্য সার্থক হইয়াছে তাহাতে সংশয় থাকিত না।

শিরোমণি কহিলেন যে, কে জানে মা কী ঈশ্বরের মনে আছে। মন্ত্রের প্রভাব এখনো একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই।

বধূরাণী জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ছেলেটীর কি খবর নেওয়া যায় না।

শিরোমণি কহিলেন যে গ্রামে সেটা সহজেই হইতে পারে,—এবং যতটা মনে হইতেছে এই গ্রামেই থাকে। নহিলে এত ভোরে কি এখানে বেড়াইতে আসিতে পারে?

কিছুক্ষণ পরে একটা সুগভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বধূরাণী কহিলেন যে তার পরিচয় লইয়াই বা কোন্ লাভ। শিরোমণিমহাশয় তো তার শ্বশুরের মতামত জানেন। পাত্র যতই যোগ্য হোক, তার শ্বশুরের মতামত আদর্শ-অনুযায়ী হওয়া অসম্ভব। আজকাল কি ঐ রকম কোনও ভালো পাত্র পাওয়া যায়। মেয়েটার কপালে যে কত দুঃখ আছে ভগবানই জানেন।

শিরোমণি কহিলেন যে, কিছুই বলা যায় না। ভগবানের ইচ্ছায় কত কিছু অসম্ভব সম্ভব হয় তাহা ভাবিলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়।

বধূরাণী শ্বশুরের প্রতাপের কাছে ঈশ্বরের প্রতাপকেও

যথেষ্ট শক্তিমান মনে করে না,—তবু প্রাণের যা আশা তাকে বিশ্বাস করিতে সবারই দুর্ব্বলতা আছে। তিনি বলিলেন যে যদিও বিশেষ কোনও সার্থকতা নাই,—তবু যেন শিরোমণি-মশায় আজ একবার খোঁজ নিয়া দেখেন। কে জানে কি হইতে পারে, কিন্তু আজ সেই অপরিচিতের অকস্মাৎ আবির্ভাবে ঈশ্বরের ইঙ্গিত আছে এমন একটা কথা বিশ্বাস করিতে মন চায়।

শিরোমণিমশায় রাজী হইয়া বলিলেন যে তিনি আজই খোঁজ করিবেন, এবং যতটা সম্ভব শীঘ্রই বধূরাণীকে খবর দিয়া যাইবেন। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলে ব্যর্থ হইতে হয় না। এবং মন্ত্রও একেবারে মরিয়া যায় নাই।

সেদিন দুপুরে বধূরাণী পাঁচ সাতজন ব্রাহ্মণ ডাকিয়া খাওয়াইলেন, গৃহদেবতার কাছে যাইয়া বারম্বার প্রণাম জানাইল, শিববাড়ি ও শীতলামন্দিরে ভোগ পাঠাইয়া দিলেন। আকাশের সমস্ত দেবতার অখণ্ড আশীর্ব্বাদে তার প্রয়োজন হইয়াছে,—যেমন করিয়া হউক তাহা প্রার্থনা করিয়া লইতে হইবে। ভিখারী যারাই আসিল পেট ভরিয়া খাইল, পয়সা পাইয়া হাসিমুখে বিদায় হইল। দাসী-চাকরের উপর বধূরাণীর অযাচিত ও সচরাচরের চাইতে বেশি কৃপা বর্ষিত হইল। বধূরাণী যেন এক অপূর্ব্ব আশীর্ব্বাদ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইতেছে,—তার সমস্ত সুখকল্পনা হয়তো সার্থক হইয়া উঠিবে।

শিরোমণিমশায় সন্ধ্যার ঠিক পূর্ব্বেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন যে তার অনুমান মিথ্যা নয়,—হাকিম-বাড়ির গুরুপ্রসাদবাবু গত কাল দেশে আসিয়াছেন,—ছেলেটি তারই পুত্র দীপঙ্কর। যতটা জানিতে পারিয়াছেন তাতে শোনা গেল দীপঙ্কর অত্যন্ত পণ্ডিত,—বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষাই সে বিশেষ সম্মানের সঙ্গে সমাপ্ত করিয়াছে। এখন সে পত্রিকাসম্পাদনের ভার লইয়াছে,—দেশের লোককে প্রবুদ্ধ করিতে চায়, তাদের জাগাইয়া তোলায় দীপঙ্করের উদ্দেশ্য। শুনিয়াছেন, দীপঙ্করের নাম বাঙলাদেশে খুবই পরিচিত,—বাঙলার অনেক মহৎ প্রচেষ্টার সঙ্গে তার নাম জড়িত। হইবেও বা,—পাড়ার ছেলেরা তো দল বাঁধিয়া তার সঙ্গে দেখা করিতে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে।

শুনিয়া অকস্মাৎ বধূরাণীর দুই চোখ অশ্রুতে একেবারে আপ্লুত হইয়া গেল,—কেমন একটা অজানা বেদনা, কেমন এক অপূর্ব্ব, অনাস্বাদিতপূর্ব্ব পুলক।

শিরোমণি কহিলেন যে তিনি কিন্তু একটা বড় খারাপ সংবাদ শুনিয়াছেন,—সত্য কিনা ভগবান জানেন। স্বদেশী করিয়া নাকি দীপঙ্কর একাধিকবার জেলে গিয়াছে। সত্য হইলে ইহা বড় ভয়ঙ্কর কথা,—তবে এবিষয়ে সঠিক খোঁজ নেওয়া দরকার।

বধূরাণীর আর অন্য সমস্ত কিছু ভাবিবার ক্ষমতা বিলুপ্ত হইয়া গেছে,—শুধু তিনি এক অজানা ইঙ্গিতে বারম্বার শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন,—পুলক, বিস্ময় আশঙ্কার এক অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে বিমূঢ়ের মতন হইয়া গেলেন। একী মায়া, এ কি মন্ত্রবল,— কী এ,—হয়তো বা মায়ের দুঃখে দেবতার আশীর্ব্বাদ। হে পরমেশ্বর, উত্তরার উপর তুমি প্রসন্ন হও,—সে যেন শিবের মত স্বামী লাভ করে।

উত্তরার চিত্তে প্রভাতের আকস্মিক ঘটনা যে কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, কেহই তাহা জানিল না। তরুণ দেবতার মত দীপঙ্কর যখন আবির্ভূত হইয়া তার পূজাঞ্জলি গ্রহণ করিল, যখন সে জলপথে চলিয়া গেল, সমবেত সকলে যখন এক অজানার সূচনায় কণ্টকিত হইয়া উঠিল, তখনই উত্তরার মুখ পদ্মের মত আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছিল, তারপর দীর্ঘদিন চাহিয়া আর কিছুই সে ভাবিতে পারিল না। পতিলাভের জন্য এই ব্রতাচরণ করিতে এতটা বয়সে উত্তরার বড় লজ্জা করিত,—তীব্র একটা সরমকুণ্ঠা,—বধূরাণী ছাড়া আর কেউ তাকে এ-ব্রত করাইতেই পারিত না। কিন্তু আজ তার চিত্ত, তার কল্পনা এক অভাবনীয় সূচনায় দুরুদুরু করিতে লাগিল। হিন্দুর মেয়ে স্বামীলাভকে যুগযুগান্তরের তপস্যা ও সুকৃতির ফল বলিয়া বিশ্বাস করে,—আজ এই ব্রতমন্ত্রের মধ্য হইতে যখন এই অজানা দেবতা আবির্ভূত হইল তখন তার দুই চোখ বারম্বার অশ্রুজলে ঝাপসা হইয়া উঠিল। হে অজানা, হে অপরিচিত, তোমাকে আমি নমস্কার করি।

অন্তঃপুরের ঘেরা পুষ্করিণীতে আজ যখন উত্তরা স্নান করিতে গেল, তখন পদ্মকলি হাতে করিয়া আনমনা হইয়া

বহুক্ষণ সে জলের দিকেই তাকাইয়া রহিল। বিন্দী দাসী কি পরিহাস করিতে গিয়াছিল, উত্তরা শুনিতেই পাইল না,—বিন্দীকে গা নাড়িয়া দিবার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হইল। উত্তরা খাইতে বসিয়া খাইতে পারে না,—কেমন অরুচি হয়, খাওয়াটাকেই নিরস ও অবান্তর মনে হয়। উত্তরা সেদিন কাহারো সঙ্গে গল্প করিল না, পরিহাস করিল না,—একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন উন্মনতার মধ্যে ওর প্রভাত আসিয়া সূর্য্যাস্তকালে পৌঁছিল।

সেতারে কানাড়ার সুর বাজে,—ফুলের মত মীড় ও গমক সূর্য্যাস্তের মধ্যে যাইয়া বাসা বাঁধে। উত্তরার ঘরের বাতায়ন হইতে খালের সোনার জল টলটল করিতেছে দেখা যায়। উত্তরার চাঁপার কলির মত আঙুল তারের বুকে ছুটিয়া চলে,—একটা স্বপ্নাবেশের সৃষ্টি হয়। সুরের উপর পদভর করিয়া সন্ধ্যাতারা ফুটিয়া উঠিল।

এমন সময় বিন্দী ঘরে ঢুকিয়া চোখের ভুরুর নানা ভঙ্গিমা করিয়া, চোখ নাচাইয়া, বড় ছোট করিয়া সে কহিল যে, যে আজ ভোরে উত্তরার অঞ্জলির সমুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল সে আর কেহ নহে, হাকিমবাড়ির গুরুবাবুর পুত্র দীপঙ্করবাবু। তিনি না কি বড় পণ্ডিত, পত্রিকা ছাপেন, খুব বক্তৃতা দিতে পারেন। তারা কাল বৈকালে মাত্র বাড়ি আসিয়াছেন,—গ্রামের ছেলেরা দীপবাবুর নাম শুনিয়া না কি খুব হৈ-চৈ সুরু করিয়াছে,—তিনি নাকি খুব নাম-করা মানুষ। উত্তরা কি তার নাম কখনো শুনিয়াছে? উত্তরা বাঙলা খবরের কাগজ পড়াশুনা করে,—হয়তো বা জানিতেও পারে।

উত্তরা তার দ্বিসপ্তাহিক খবরের কাগজে দীপঙ্করের নাম বহুবার দেখিয়াছে। শুধু তাহাই নয়,—সব লোকের মত—পত্রিকায় প্রকাশিত কতগুলি চরিত্র তার কল্পনাকে খুব বেশি আবিষ্ট করে। এ চরিত্রগুলির মধ্যে ছিল দীপঙ্করের নাম। এই দীপঙ্কর যে তাদের গ্রামের, তাদের অদূরবর্ত্তী বাড়ির, তাহা উত্তরা কোনোদিন ভাবিতেও পারে নাই। শুনিয়া সে চমকিত হইল, কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

বিন্দীকে কহিল যে, তার এত সব আসিয়া বর্ণনা করিবার কোনই প্রয়োজন নাই,—এতটা উচ্ছ্বাস না দেখাইলেও হইবে। শুধু শুধু আসিয়া তার বাজনাটা মাটী করিল।

বিন্দী কহিল যে বধূরাণীর উৎসাহ দেখিয়া তারও উৎসাহিত না হইয়া উপায় নাই। শিরোমণিমশায়কে পাঠাইয়া আজই তিনি অনেক খোঁজখাজ নেওয়াইয়াছেন। কি কি সব পরামর্শও হইতেছে। সব সে শোনে নাই,—যতটা শুনিয়াছে ততটা জানাইয়া গেল।

উত্তরা তাকে তাড়া দিয়া ঘর হইতে বাহির করিল। কিন্তু পুনর্ব্বার যাইয়া সেতারটা তুলিয়া লইল না,—ছোট জানালাটা দিয়া মসীমাখা খালের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তারা, একটা নারিকেল গাছ, খালের কালো জল, এক ফোঁটা অশ্রু ·

পাঁচ

দীপঙ্করের অবসর যাপনের দুইটা ব্যসন হইয়াছে। ছাতিমছায়ে ইজিচেয়ার টানিয়া দুপুরে সে বই পড়ে, টেবিল টানিয়া হয়তো কখনো কিছু লেখে, তারপর এসব ভালো না লাগিলে ছিপ হাতে পুকুরে যাইয়া ছোট মাছ ধরে। সঞ্জয় মাছ ধরার এই উৎসাহ দেখিয়া কহিল যে দীপঙ্করদার মাছ মারিবার রীতিমত একটা বাতিক হইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যুত্তরে দীপঙ্কর পরিহাস করিয়া বলিল যে, যে-ঋষি মৎস্য মারিয়া সুখে খাইবার ও পড়াশুনা করিয়া দুঃখে মরিবার দর্শন প্রচার করিয়া গেছে, তার সঙ্গে সে সম্পূর্ণ একমত।

দীপঙ্করের দেশে আসিবার পর দিন পাঁচেক কাটিয়া গেছে। আত্মীয় ও জ্ঞাতিদের সঙ্গে তার পরিচয় সম্পূর্ণ হইয়াছে,—তবে গ্রামের অন্যদের সঙ্গে তার বিশেষ একটা জানাশোনা হয় নাই,—এখানে নিতান্তই সে বিশ্রাম করিতে আসিয়াছে, এইজন্য দীপঙ্কর বিশেষ একটা গরজও করে নাই,—যতটা সহজভাবে হইতেছে, ততটা হয় মাত্র।

আজ প্রভাতে নিজেদের বাড়ীর বাঁধানোঘাটের চত্বরে বসিয়া মৃদু রৌদ্রালোকে দীপঙ্কর মাছ ধরিতেছে। টপাটপ কয়টা পুঁটি ও ট্যাঙ্‌রা মাছ ধরিয়া তার উৎসাহ আরো বাড়িয়া গেল। ফাৎনার উপর গভীর তার মনোযোগ,—ডুবিলেই টান দিতে হইবে, ফস্‌কাইলে চলিবে না। চালাক

মাছগুলি বড়শীর আধার শুধু মাত্র ঠোক্‌রাইয়া যায়,—লোভীগুলি একেবারে গিলিয়া বসে। একটা গিলিয়া বসিয়াছে,—আর দেরি নয়, একটা হেঁচ্‌কা টান দিলেই হয়।

এমন ব্যাঘাত আসিল। পিছনের অনেকগুলি পদশব্দে চমকিয়া চাহিয়া দীপঙ্কর দেখে সঞ্জয়ের পিছনে একদল ছেলে। ঘাটের সিঁড়ি দিয়া তারা নিচে নামিয়া আসিতেছে। দীপঙ্করের মাছ পালাইবার অবকাশ পাইল,—এবং অন্তত একবারের জন্য প্রমাণ হইল যে লোভ করিলেই পাপ এবং পাপে মৃত্যু হয় না।

সঞ্জয় আসিয়া ইহাদের পরিচয় দিয়া কহিল যে, এরা অধিকাংশই কলেজের ছাত্র,—পূজার ছুটীতে বাড়ী আসিয়াছে। গ্রামের যত সদনুষ্ঠান সবই ইহাদের উৎসাহে হয়। দীপঙ্কর দেশে আসিয়াছে শুনিয়া ইহারা দেখা করিতে আসিয়াছে।

প্রভাত রৌদ্রের মত উদার হাসিতে দীপঙ্করের সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কত ভাল যে সে বাসে বাঙ্‌লাদেশের ছেলেদের তার তুলনা নাই। এদের সঙ্গে মিলিলে সে উৎসাহ পায়, অনুপ্রেরণা পায়,—ত্যাগ এবং মনের উদারতার স্পর্শ পায়। দীপঙ্কর বলিল যে তারা গ্রামের সকল সদনুষ্ঠানের মূলে, এই কথা শুনিয়া তার অতিশয় আনন্দ হইয়াছে। যৌবনকে সুখের খাঁচায় বাঁধিয়া রাখিলে যৌবনের অপমান করা হয়,—সেটা অমার্জ্জনীয়। যত কিছু নতুন, যত কিছু মহৎ, যাহা কিছু পাইতে হইলে দুঃখবন্ধুর দুর্গম পথে যাত্রা করিতে হয়, তাহা চিরকাল তরুণেরা করিয়াছে। গ্রামকে যদি বাঁচাইতে হয়, তাকে সুন্দর, সম্ভ্রান্ত ও মঙ্গলমণ্ডিত করিতে হয়,—তবে বয়স যাদের কম, তাদেরই করিতে হইবে।...

এতগুলি ছেলেকে অন্তরঙ্গ করিয়া লইতে দীপঙ্করের একটু মাত্র দেরি হইল না। যার অন্তরে সত্যকারের মধু আছে, মানুষকে বন্ধু করিতে তার কষ্ট হয় না। দীপঙ্কর বিখ্যাত মানুষ,—কিন্তু যেমন সহজ সরলতার সঙ্গে, যেমন অনাড়ম্বর সৌজন্যে ছেলেদের সে ডাকিয়া লইল তাহাতে দলের একজনও না মুগ্ধ হইয়া থাকিতে পারিল না। তারা পরে বলাবলি করিল যে খাঁটী সোনাকে চিনিয়া লইতে কাহারো বিলম্ব হয় না।

কিন্তু শুধু চেনাই নয়, ছেলেরা ফরমাস লইয়া আসিয়াছে। কাল গ্রামের লাইব্রেরীতে তাহাকে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইবে। জমিদারবাবু রামনারায়ণ চৌধুরীকে সভাপতি হইবার জন্য তারা আমন্ত্রণ করিতে যাইতেছে,—এবং কোনও সম্মানের পদ বুড়া হেলায় উপেক্ষা করে না। লোকটা অত্যন্ত বেশি রকম সেকেলে,—এবং মানুষও যে বিশেষ ভালো তাহা নয়। তবে আর্থিক সাহায্যের কথা চিন্তা করিয়াই তাহাকে ডাকা গেল। নহিলে এমন লোককে দূরে রাখাই ভালো।

রাজী না হইয়া দীপঙ্করের আর উপায়ান্তর রহিল না।

পরিপূর্ণ শান্তিতে দীপঙ্করের দিনগুলি কাটিতেছিল,—আলস্য বিলাস, তাজা টাট্‌কা জিনিষ যথেষ্ট খাওয়া, ছায়ায় ঘুরিয়া বেড়ান, অলস বৈকালে খালের অস্তসোনার রঙিন জলে ডিঙ্গীবিহার,—বাঁশবনের লাস্য, ঝাউডালে হাওয়ার আওয়াজ, এইসব তার অবসর বিনোদন করিবার পক্ষে যথেষ্ট। প্রতি সন্ধ্যায় যখন শঙ্খ বাজিয়া ওঠে তখন দীপঙ্করের মনে হয় যে ধরণীর ও গগনের এই বিরাট্ ও অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সহরের লোকের মত এখানের মানুষ উপেক্ষা করে না। খালের জলে তারার ছায়া কাঁপিতে থাকে,—মৃদু আলোজ্বালা একটা নৌকা হয়তো ছপাৎ ছপাৎ করিয়া স্বপ্নালস কালো জলের উপর দিয়া চলিয়া যায়। কাছে সঞ্জয় না থাকিলে নিঃশব্দে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দীপঙ্কর খালের পাড়ে বসিয়া কাটাইয়া দিতে পারে।

পরদিন বৈকালে ছেলেরা দীপঙ্করকে লইয়া যাইতে আসিল। গুরুপ্রসাদবাবুকে তাড়াতাড়ি লইয়া যাইতে চাহিল, কিন্তু তিনি আজ তিন দিন হইতে বাঁ পায়ের গোড়ালিতে বাতের ব্যথায় কষ্ট পাইতেছেন। দীপঙ্কর তাঁদের সাথে গল্প করিতে করিতে চলিল,—এমন করিয়া দলবল লইয়া বক্তৃতা করিতে যাওয়া তার জীবনে প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। অপরাহ্নের ছায়াস্নিগ্ধ পথে ঘুরিয়া ফিরিয়া তারা লাইব্রেরী ঘরে গিয়া পৌঁছিল। অন্যান্য আরো অনেকে আসিয়া দীপঙ্করকে অভ্যর্থনা করিয়া লইল।

লাইব্রেরীর বড় আটচালাঘরটায় তখন লোকজন জড়ো হইয়া গেছে। বুড়া রামনারায়ণ চৌধুরীও হাজির। গ্রন্থাগারের সম্পাদক তাকে পথ দেখাইয়া বক্তৃতা দিবার যায়গায় লইয়া গেল।

জমিদার রামনারায়ণ চৌধুরী পূর্ব্ব হইতেই সভাপতির আসনে এমন জমিয়া জাঁকাইয়া বসিয়াছেন যে, দেখিয়াই মনে হয় যে, তিনি বেশ সজ্ঞান যে এস্থান চিরকাল তাহার জন্যই মনোনীত থাকে। বয়স সত্তরের উপরে,—গালের পাকা দাড়ির বহর খুবই জবড়জঙ্গ রকমের, এবং বল্লালীপ্রথায় মাথার চুল লম্বা। গায়ে বল্লালীকালের আঙ্রাখা, পরণে ঢাকাই কাপড়,—এবং এতগুলি লোকের সম্মুখে দিল্লীর নাগ্রা-পরা পা দুইটা টেবিলটার উপর সগর্ব্বে উঠাইয়া দিয়াছে,—এবং আলবোলা টানার আর বিরাম নাই।

গ্রন্থাগারের প্রৌঢ় সম্পাদক চক্রবর্ত্তীমশায় দীপঙ্করের পরিচয় দিয়া রামনারায়ণ চৌধুরীকে কহিল যে, ইনিই দীপঙ্কর বাবু,—গুরুপ্রসাদবাবুর পুত্র ও আজিকার সভার বক্তা। দীপঙ্কর দুই হাত জোড় করিয়া নমস্কার জানাইল।

বুড়া রামনারায়ণের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না, এবং পরক্ষণে সেটা এক বিষম আক্রোশে রূপান্তরিত হইল। তার পা না ছুঁইয়া শুধুমাত্র হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া নমস্কার করে এ গ্রামে এমন কোন ব্রাহ্মণেতর মানুষ তিনি দেখেন নাই। এত বড় ধৃষ্টতা তার কল্পনারও অগোচর ছিল—এই জন্যই প্রথম তার বিস্ময় হইয়াছিল। জমিদারের আধিপত্য অসামান্য, এবং কোনও রূপ অবাধ্যতাই তিনি সহ্য করেন না, কিন্তু এ ক্ষেত্রে সরকার মহলে গুরুপ্রসাদবাবুর প্রভাবের কথা ভাবিয়াই হউক, দীপঙ্করের ব্যক্তিত্বের জন্যই হউক বা অন্য যে কারণের জন্যই হউক তিনি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন না;—দীপঙ্করের নমস্কারের বিনিময়ে শুধু ক্ষণকাল অসহ ক্রোধ চাপিয়া কটমট করিয়া তার দিকে চাহিয়া থাকিয়া অকস্মাৎ অত্যন্ত আক্রোশ ভরে গুড়্গুড়িতে টান লাগাইলেন।

দীপঙ্কর ইহা লক্ষ্যই করিল না। কিন্তু বক্তৃতা আরম্ভ হইলেও যখন জমিদারবাবু টেবিল হইতে নাগ্রাশোভিত পদযুগল নামাইল না এবং সভার মধ্যে সশব্দে নল টানিতে লাগিল, তখন ক্ষণকালের জন্য সে একবার বিরক্তিভরে সেদিকে তাকাইয়াছিল। মনে করিল, হয়তো ইহাই জমিদারী কায়দা, কিন্তু বড় অশোভন মনে হইল এই ব্যবহার।

দীপঙ্কর বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। তার সহজ সতেজ ভাষা মুহূর্ত্তে সবাইকে আবিষ্ট করিল। ভূমিকা সারিয়া কেবল সে বক্তব্য বিষয়ের মধ্যে অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় একটা শব্দ শুনিয়া চাহিয়া দেখে সগুম্ফ মোটা দেখিতে একজন মানুষ আসিয়া চৌধুরীমশায়ের দুই পায়ে মাথা লুটাইল। বক্তৃতা থামাইতে হইল,—শুধু থামান নয় অপেক্ষাও করিতে হইতেছে। আগন্তুক রামনারায়ণের পায়ের তলায় হাত বুলাইয়া কি সংগ্রহ করিল সে-ই জানে, কিন্তু গভীর শ্রদ্ধায় সে তাহা জিহ্বায় লাগাইয়া বুকে হাত ছোঁয়াইল। জমিদার চীৎকার করিয়া উঠিলেন যে, তার পাশে ইহাকে একটা টুল দিয়া যাওয়া হউক। টুল আসা এবং এই যোগ্য ব্যক্তির উপবেশন করা পর্য্যন্ত বক্তৃতা বন্ধ করিয়া রাখিতে হইল। শ্রোতারা, এবং বিশেষ যুবক-শ্রোতারা চাঞ্চল্য গোপন করিল না,—এবং বিস্মিত দীপঙ্করের কানে কানে চক্রবর্ত্তীমশায় কহিলেন যে আগন্তুক একজন সনাতনধর্ম্মী মাতব্বর যুবক,—এবং যদিও ইহাকে খুব রাশভারি দেখাইতেছে, বয়স কিন্তু বেশি নয়। নাম কাশীপ্রসাদ।

সভাপতি রামনারায়ণ চৌধুরী যদিও কাশীপ্রসাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেই লাগিলেন, তবু বক্তৃতা আরম্ভ হইল। দীপঙ্কর কিছুটা ক্ষুব্ধ হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তার শ্রোতাদের সে বঞ্চিত করিল না। চমৎকার তার বলিবার ভঙ্গি, তার বিষয়বস্তুর ব্যঞ্জনা,—কথা দিয়া সে ভাবায়, হাসির স্রোত তোলে, মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। দীপঙ্কর বলিল যে গ্রন্থাগারগুলি জ্ঞানাঞ্জনশলাকার মতন,—মানুষের জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া তোলে। এত বড় দৃষ্টিদান আর হইতে পারে না। পুস্তকের মধ্য দিয়া মানুষ জগতকে জানে, নতুনের সন্ধান পায়, কূপমণ্ডুকতার অন্ধকার হইতে সত্যের আলোতে মুক্তি পায়,—মানুষ জগতের জ্ঞানভাণ্ডারের চাবি পুস্তকের মধ্য দিয়াই মাত্র পাইতে পারে। পুস্তকাগার

স্থাপন করিয়া দেশের মানুষকে প্রবুদ্ধ করা, শিক্ষিত করার মত মহৎ কর্ম্ম খুব বেশি নাই।

সমবেত সবাই স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল,—তবে চৌধুরীমশায় তখনও কাশীপ্রসাদের কাছে তার বক্তব্য শেষ করিতে পারে নাই। হয়তো দীপঙ্করের প্রতি বিরাগ জানান ছাড়া তার বিশেষ আর কোনও উদ্দেশ্য ছিল না।

দীপঙ্কর পুনশ্চ বলিল যে গ্রামের গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য এবৎসর বিশেষ উদ্যোগ করার ব্যবস্থা হইয়াছে,—কর্ত্তৃপক্ষ বলিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা বিষয়ে একটু মনোযোগ দেওয়া দরকার হইয়া পড়িয়াছে। যারা পড়াশুনা কিছু জানেন তাদেরই শুধু গ্রন্থে প্রবেশাধিকার আছে, কিন্তু গ্রামে অধিকাংশই নিরক্ষর, তাদের বর্ণপরিচয় সাধন করাও বিশেষ দরকার হইয়া পড়িয়াছে। এবিষয়ে চৌধুরী-মশায়ের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় হয়ত অনাড়ম্বর কোনও ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, যদি গ্রামের অধিবাসীদের সহানুভূতি থাকে।

নিজের নামোচ্চারণ শুনিয়া রামনারায়ণ চৌধুরী কান পাতিয়াছিলেন, বক্তব্য শুনিয়া ভ্রূকুটী করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন,—এবং যাহারা কাছে বসিয়াছিল তাহারা এ ইঙ্গিত বুঝিল। রামনারায়ণ চৌধুরী সেই ধরণের লোক, যারা ছোটলোকদের লেখাপড়া শিখাইবার কথা শুনিলেই শিহরিয়া ওঠেন। তাহার মতে ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই ইহারা অজ্ঞ অশিক্ষিত,—সে-ব্যবস্থা উল্টাইতে গেলে লাভ শুধু এই হইবে যে ছোটলোকেরা সম্পূর্ণ অবাধ্য হইয়া উঠিবে।

দীপঙ্করের বক্তৃতা শেষ হইলে এমন হর্ষধ্বনি শোনা গেল যে, এ-ঘরে ইহার পূর্ব্বে তেমন আর কখনো শোনা যায় নাই। সভাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা আসিয়া তার চারিদিকে ভিড় করিল,—বৃদ্ধেরা কেহ আসিয়া আশীর্ব্বাদ করিল, গুরুজন কেহ স্নেহ, কেহ অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও আনন্দ জ্ঞাপন করিয়া গেল। চক্রবর্ত্তীমশায় ও তার সহকর্ম্মীরা দীপঙ্করকে লাইব্রেরীর গ্রন্থতালিকা ও ব্যবস্থা পত্র দেখাইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল,—এবং উৎসাহের ঘোরে সঞ্জয় পিছন হইতে আসিয়া একেবারে পায়ের উপরই ঢিপ করিয়া পড়িল। দীপঙ্কর গ্রামের ছেলেদের চিত্ত একটী বক্তৃতা দিয়াই জয় করিয়া লইল।

সভাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই বুড়া রামনারায়ণ চৌধুরী চাকরের হাতে-রাখা আলবোলার নল টানিতে টানিতে পাল্কীতে যাইয়া উঠিল। কাশীপ্রসাদ সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়া চলিল,—এবং যতই বেহারারা দ্রুত ছুটিল ততই তাহাকে প্রায় দৌড়াইতে হইল। জমিদারকে কোনও রকমে বিদায় করিয়া চক্রবর্ত্তীমশায় দীপঙ্করকে লইয়া ব্যস্ত হইলেন।

পাল্কীতে চলিতে চলিতে রামনারায়ণ চৌধুরী কাশীপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই যে ছোক্‌রা বক্তৃতা করিল এই বুঝি গুরুর পুত্র। এবং যদিও এই প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর ছিল তবু জবাব পাওয়ার পর তিনি কহিলেন যে, এমন ধৃষ্ট যুবক আর তিনি তার এই সুদীর্ঘ জীবনে কখনো দেখেন নাই,—কাশীপ্রসাদ শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে যে বেহায়া যুবক তাহাকে হাতজোড় করিয়া নমস্কার করিয়াছে, যেন তিনি আর সে সমান।

শুনিয়া কাশীপ্রসাদ অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া তারপর মন্তব্য করিল যে, স্বদেশী-করা ছেলেরা অমনিই হইয়া থাকে। কর্ত্তাবাবু বুঝি জানেন না যে ছোক্‌রাটা তিন তিনবার জেল খাটিয়াছে—পুলিশ সর্ব্বদা উহার পিছনে।

রামনারায়ণ চৌধুরী কহিলেন যে তিনি এই ভয়ঙ্কর খবর জানিতেন না। এই জন্যই এই রকম! অতিকষ্টে আজ এই ধৃষ্টতা তাকে সহ্য করিতে হইয়াছে। শুধু ছেলেই নয়, গুরুর পর্য্যন্ত পায়া বড় ভারী হইয়াছে,—দেমাকে আর পা পড়ে না,—একবার যে আসিয়া তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে, তা পর্য্যন্ত পারিল না। কাশীপ্রসাদ নিশ্চয়ই ছোটলোক ব্যাটাদের লেখাপড়া শিখাইবার প্রস্তাব শুনিয়া হাসিয়াছে। তবে ঠিক হাসিলেই চলিবে না,—এই সবের একটা ধুয়া উঠাইলেই কাণ্ডজ্ঞানহীন অনেকে মাতিয়া উঠিতে পারে। ছোটলোকদের পড়া লেখা শিখাইলে শাসন শাস্তি আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। চক্রবর্ত্তীকে ডাকিয়া তিনি বলিয়া দিবেন, গুরুর পুত্রকে পুনর্ব্বার যেন লাইব্রেরী ঘরে কিছু বলিবার জন্য না ডাকা হয়। 'স্বদেশী' ছেলে আসিয়া সমস্ত গ্রামটাকে শেষে মাটী করুক।...

ছয়

বধূরাণী আজ বেড়াইতে যাইবেন। উত্তরাকে সাজিয়া লইবার তাড়া দিয়া গেলেন,—এখন বৈকাল, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই পাড়ার দু-এক বাড়িতে দেখা সাক্ষাৎ করিয়া আসিবেন। জমিদার রামনারায়ণ চৌধুরী এসব পছন্দ করেন না,—তিনি মনে করেন, জমিদার বাড়ির বধুর কোন বাড়িতেই যাওয়াই সম্মানজনক নয়,—যাদের দরকার তারাই যাচিয়া এই প্রাসাদেই দেখা করিতে আসিবে। অনেক বৎসর পূর্ব্বে বধূরাণী গ্রামবাসী অনেকের বাড়িতেই যাইতেন, মেয়েদের সঙ্গে গল্প করিতেন, এমন কি কোনও কোনও দুঃস্থ পরিবারকে সাহায্যও করিতেন, তারপর একদিন কর্ত্তাবাবু সে খবর শুনিলেন এবং স্পষ্ট করিয়াই বধূরাণীকে জানানো হইল এটা তিনি পছন্দ করেন না,—তাতে জমিদারের সম্মানহানি হয়। তখন হইতেই বধূরাণীর চতুর্দ্দোলা গ্রামের পথে বিরল হইয়া গেছে।

উত্তরা যতই আপত্তি করিতে লাগিল, বিন্দীর চুল টানিয়া কান টানিয়া ঠেলিয়া, ঠুলিয়া তাকে একশেষ করিল, ততই বিন্দী বধূরাণীর আদেশ প্রতিবিন্দু পালন করিতে লাগিল। বাহির হইল কেয়ূর কঙ্কণ, হীরকাঙ্গুরীয়, বাহির হইল বেশর নূপুর কুণ্ডল। বেনারসী শাড়ি নয়, বধূরাণী বলিয়াছেন ঠাকুরমার কালের নীলকন্ধা শাড়ি পরাইতে। উত্তরা আপত্তি করিয়া কহিল, সে কি একেবারে সেকেলে না কি। বিন্দী বলিল যে, বধূরাণী বলেন এই উপকথাকালের সাজে উত্তরাকে বড় ভাল দেখায়,—চোখে কি উত্তরা অঞ্জন দিবে? উত্তরা শাসাইল যে সে প্রচেষ্টা করিতে আসিলে বিন্দীর মাথায় আর একগুছি চুলও অবশিষ্ট থাকিবে না,—একেবারে ঢোলের চামড়ার মত সাফ্ করিয়া দিবে।

খালের জল হইতে সমস্ত বক তখনো উড়িয়া যায় নাই,—পাড়ের ঝাউবনের মধ্যে দিয়া তখনও সূর্য্যাস্তের দু-একটা অবশিষ্ট রাগরেখা চোখে পড়ে। ঘনছায়ার ডাকে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। এমন সময় জমিদারবাড়ির দক্ষিণ দেউড়ীর পথে কিংখাবে-ঢাকা এক চতুর্দ্দোলা বাহির হইয়া গেল। গ্রামের অন্ধকারছায়াচ্ছন্ন মাটীর আঁকাবাঁকা পথ দিয়া বেহারারা ছড়া কাটিয়া চলে,—দূর হইতে কটা অস্পষ্টমূর্ত্তি দেখা যায়,—শুধু কখনো সামান্য একটু আলোর স্পর্শ পাইলে কিংখাব ঝলসিয়া ওঠে। এক সময় দেখা গেল অস্পষ্টায়মান চতুর্দ্দোলা হাকিমবাড়ির ফটক দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেছে।

ছোটবেলায় বধূবাণী যখন গ্রামে আসেন নাই, তখন দীপঙ্করের মা আনন্দময়ীর সঙ্গে তার বেশ জানাশোনা ছিল,—সে আজ অনেক বছরের কথা। তারপর দুয়েকবার যখন আনন্দময়ী গ্রামে আসিয়াছেন, তখনও প্রতিবার বধূরাণী শ্বশুরকে লুকাইয়া তার সঙ্গে দেখা করিয়া আসিয়াছেন,—তারপর আজ অনেক দিন গড়াইয়া গিয়াছে। আনন্দময়ীর বয়স যদিও কিছু বেশি তবু বধূরাণীর সঙ্গে তার সখীত্ব এককালে প্রথমে সহরে ও পরে দুজনেরই এই এক শ্বশুরবাড়ির গ্রামে, মঞ্জরী ফুটাইয়াছিল। আজ অনেক বছর পরেও সেই গন্ধমঞ্জরী সম্পূর্ণ শুকাইয়া যায় নাই। তবে বড় আব্ছা বড় স্বপ্নের মত মনে হয়। সেই পরিচয়েই আজ বধূরাণী হাকিমবাড়ি বেড়াইতে গেলেন,—অনেক বছর পরে, জীবনের অনেক দৃশ্য অভিনীত হইয়া যাইবার পর।

গ্রামের গ্রন্থাগারে দীপঙ্করের বক্তৃতা তখন সমাপ্ত হইয়া গেছে। লাইব্রেরীর পুস্তক ও সভ্যসংখ্যা, আর্থিক অবস্থা এইসব জানিয়া তবে সে বাড়ি ফিরিল। দীপঙ্করের সঙ্গে ছেলের দল ভিড় করিয়াছে,—এবং অন্ধকার গ্রামের পথ আজ সহসা সান্ধ্যনিদ্রা হইতে চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। দীপঙ্কর বাড়ির কাছে পৌছিতে পৌছিতে বিশেষ আর কেহ সঙ্গে রহিল না, এমন কি সঞ্জয় পর্য্যন্ত পাড়ার এক বাড়িতে রহিয়া গেল। সঙ্গে যারা বাড়ির ফটক পর্য্যন্ত আসিল তারা গ্রন্থাগারের উদ্যোগী কর্ম্মীরা। এই প্রতিষ্ঠানটীর উন্নতির জন্য তারা দীপঙ্করের সহায়তা চায়। দীপঙ্কর কবে ওসব প্রস্তাবে রাজী হয় নাই? পরদিন ভোরে পুনর্ব্বার আসিয়া দেখা করিবে বলিয়া তারাও বিদায় হইল।

এদিকের ফটক হইতেও কতটা আগাইয়া তবে বাড়িতে পৌছিতে. হয়,—ঝাউগাছের দেওয়ালদেওয়া, ঘাসঢাকা পথটা। বেশ খুসী হইয়াই দীপঙ্কর চলিয়াছে। তার নিজের গ্রামের লোকদের সঙ্গে এমন করিয়া পরিচয়

হইয়াছে যার স্মৃতি তার মনে চিরদিন বাঁচিয়া থাকিবে। কনকচাঁপার গন্ধ পাওয়া গেল। ঝাউশাখাগুলি যেন স্বপ্নের ঘোরে কথা কহিয়া উঠিতেছে। শুক্লাদ্বিতীয়ার চাঁদকে আকাশে আর দেখা যায় না,—তবে অতিপাণ্ডুর একটা জ্যোৎস্নার আভাস চারিদিকে স্পর্শ বুলাইয়াছে।

এমন অন্যমনস্ক হইয়া দীপঙ্কর চলিতেছিল যে প্রথমটা কিংখাবে জড়ান চতুর্দ্দোলার মত একটা বড় জিনিষও তার চোখে পড়ে না। বসিবার কোঠার সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে সর্ব্বপ্রথম সেটার উপর নজর গেল,—এবং আর কিছু ভাবিবার পূর্ব্বেই শোনা গেল শিঞ্জিনীর শব্দ, ভাসিয়া আসিল একটা মাথা-ঘষার গন্ধ, আসিল একাধিক নারী-কণ্ঠস্বর, তরুণ গলার একটু মৃদু হাসি, কাপড়ের শব্দ, কঙ্কণের ঝঙ্কার,—এবং পরক্ষণে ঘরের কেরোসিনের আলোর মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিল আনন্দময়ী, বধূরাণী, আসিল উত্তরা। দীপঙ্কর প্রথমটা একটু চমকিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া যাইতেছিল,—গ্রামে এ বিষয়ে বেশি সাবধান হইতে হয়, সে জানে। যাইতে হইল না,—মা ডাকিলেন। দীপঙ্কর যখন পুনর্ব্বার কাছে আসিল, তখন উত্তরার পায়ের নূপুর স্তব্ধ হইয়াছে, কঙ্কণ আর বাজে না,—দুইটী টানা চোখ নত নম্র হইয়া গেল, যেন সে জীবন্ত নয়, যেন প্রাচীন বাঙ্লা পটের স্বপ্ন। শুধু মৃদু আলোকে শাড়ির পদ্মকল্কাগুলি ঝলসিয়া উঠিল···

আনন্দময়ী পরিচয় দিয়া কহিলেন যে ইনি জমিদার বাড়ির বধূরাণী,—সারা গ্রাম একে শ্রদ্ধা করে। বধূরাণী তার বাল্যসখী ছিলেন, তারপর বিবাহের পর এই গ্রামেও কতবার তাদের দেখা হইয়াছে,—ছোটবেলার স্মৃতিতে স্বপ্নসুন্দর দুজনের আত্মীয়তা। দীপঙ্করকে তিনি প্রণাম করিতে বলিলেন।

দীপঙ্কর কোনও দ্বিধা না করিয়া পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিল।

কতটা আন্তরিকতা লইয়া যে বধূরাণী দীপঙ্করের মাথায় ডান হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন তাহা হয়তো কেহই সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিল না। কহিলেন যে, সেদিন অতিপ্রভাতে মেয়ে উত্তরা যখন খালের জলে ব্রতাচরণ করিতেছিল তখন দীপঙ্কর সে পথে ডিঙ্গী বাহিয়া যায়,—কিন্তু তিনি চিনিতে পারেন নাই,—এত বৎসর ব্যবধানে চেনা সম্ভবও নয়। কিন্তু প্রায় সাতাশ আটাশ বছর আগে এই দীপঙ্করকে তিনি কত কোলে লইয়াছেন, পিঠে করিয়াছেন, কত চুমা যে খাইয়াছেন তার ইয়ত্তা নাই। সেই দীপঙ্কর এত বড় হইয়াছে, এত নাম করিয়াছে এত সৎ হইয়াছে দেখিয়া আনন্দের আর তার অবধি নাই। তারপর ব্রীড়ানম্র উত্তরার দিকে চোখ পড়িতে তিনি কহিলেন যে ইনিই উত্তরার দীপদা,—দাদাকে এখনো সে প্রণাম করিল না?

উত্তরার সুগৌর মুখখানা যে এতক্ষণে রক্তিম হইয়া উঠিয়াছে, তাকাইয়া দেখিলে এই মৃদুদীপালোকেও তাহা চোখে পড়িতে পারিত। পায়ে মাথা ঠেকাইয়া,—দীপঙ্করের বিব্রত আপত্তি সত্ত্বেও উত্তরা প্রণাম করিল,—যেমন দেব-দেউলে যাইয়া দেবতাকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানায়।

বধূরাণী যেন দীপঙ্করকে ছাড়িয়া যাইতে চান্ না। তার আজকার বক্তৃতার কথা জিজ্ঞাসা করেন, কতদিন গ্রামে থাকিবে সে কথা জানিতে চান্, জল সিদ্ধ না করিয়া খাইতে সাবধান করিয়া দেন। যাকে এক সময় কোলে লইয়াছেন, পিঠে লইয়াছেন, তার জন্য এক অপূর্ব্ব বাৎসল্যরস তার কথায় তার ব্যবহারে ফুটিয়া ওঠে।

চতুর্দ্দোলার কিংখাব ঝলসিয়া ওঠে, ছয়ছয়টা বেহারার পাল্কীটানার ছড়া শোনা যায়···

এরা চলিয়া গেলে মা দীপঙ্করকে তাদের বিষয়ে আরো অনেক কথা বলিলেন। ছোটবেলায় পুতুল বিয়ে হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান পর্য্যন্ত,—বধূরাণীর শ্বশুরের প্রতাপ, তার গোঁড়ামির অন্ধতা, তার বল্লালী কায়দা-কানুন, অনেক কথা দীপঙ্কর জানিল। তারপর আনন্দময়ী কহিলেন যে প্রতিমার মত অসামান্য সুন্দরী এই মেয়েটীকে লইয়া বধূরাণী ভারি বিপদে পড়িয়াছে। শ্বশুরের খেয়ালের জন্য পৌত্রীর কী সর্ব্বনাশ ঘনাইয়া উঠিতেছে তাহার করুণকাহিনীও দয়াময়ী দীপঙ্করকে কহিলেন। এই শতাব্দীতেও যে মানুষ এত সেকেলে হইতে পারে তাহা প্রায় কল্পনা করা যায় না। কাশীপ্রসাদ নামে গ্রামেরই নাকি কে একটা অশিক্ষিত পূজা-আচমনকারী কুশ্রী যুবক আছে,—বয়সও না কি খুব বেশি,—

রামনারায়ণ চৌধুরীর অবশেষে তাকেই বড় পছন্দ হইয়াছে। মেয়েটার দুর্গতির কথা বলিতে বলিতে বধূরাণী সত্যসত্যই একেবারেই কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন।

শুনিয়া দীপঙ্কর কিছু বলিল না। কিন্তু রামনারায়ণের যতটা পরিচয় সে পাইয়াছে ও যে কাহিনী সে শুনিল দুইটী মিলাইয়া তার মনের মধ্যে একটা সহানুভূতি ঘনাইয়া আসিল। বিছানায় শুইয়া সে-রাত্রে দীপঙ্করের অকস্মাৎ মনে হইল যে, আমাদের গ্রামগুলিতে আধুনিকতা ও প্রাচীন অযৌক্তিকতার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ বর্ত্তমান,—শুধু বাহিরে নয়, চিন্তার মধ্যেও।

কেমন করিয়া যে উত্তরা ও তার মা বাড়ি ফিরিয়া গেলেন তাহা বলিবার নয়। দুজনের কেহ একটি কথাও উচ্চারণ করিল না,—মনে যেন অনেক কথা জমা আছে, কিন্তু সে পুঞ্জীভূত আষাঢ়-মেঘের বর্ষণ হয় না।

কিন্তু রাত্রে বধূরাণীর স্বামীর কাছে মনের কথা প্রকাশ করিলেন,—আর দেরী করা যায় না, দেরি করিলে সর্ব্বনাশ হইবে! উত্তরার ব্রতাঞ্জলির সম্মুখে তরুণ দেবতার মত দীপঙ্করের আবির্ভাব হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত কিছুই আজ বলিয়া ফেলিলেন।

শুনিয়া প্রসন্ননারায়ণ ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন। একরাশ শঙ্কা আসিল তার মনে ভিড় করিয়া। কহিলেন এ-প্রস্তাব যে কতটা অসম্ভব এবং বাবা শুনিলে যে কতটা ক্রোধোন্মত্ত হইয়া উঠিবে তাহা কি সে জানে না। দীপঙ্করেরা কৌলিন্যের দিক দিয়া উঁচু নহে,—চারঘর, তারপর সে আধুনিক শিক্ষিত, সহরবাসী যুবক।

বধূরাণী কহিল যে, যাহাই হউক, যত অসম্ভবই হউক তার প্রস্তাব, দেবতা যাকে নিজে পাঠাইলেন, তাকে আনিবার জন্য সকল ভয়ভ্রূকুটির মধ্যেও আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে। অন্তত একবার প্রথমে প্রসন্ননারায়ণ কর্ত্তাকে যাইয়া বুঝাইয়া বলুক।

প্রসন্ননারায়ণ জানেন সেটা কত বড় অসম্ভব ব্যাপার। তিনি কহিলেন যে ইহাতে লাভ শুধু এই হইবে যে পিতা ক্রোধোন্মত্ত হইয়া প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবে। তাছাড়া, বধূরাণী কি জানেনা যে দীপঙ্কর একাধিকবার জেলে গিয়াছে।

বধূরাণী বলিলেন যে তাহা সে জানে। কিন্তু দেবতা যাকে নিজে পাঠাগেন, ব্রতমন্ত্রের মধ্য হইতে যে আবির্ভূত হইল, সেই তার কন্যার একমাত্র বর। আর কোনও নীচ কাজ করিয়া তো দীপঙ্কর কারাগারে যায় নাই,—মহৎ কাজ করিয়া, আত্মত্যাগের গৌরবে মাথা উঁচু করিয়া, গিয়াছে।

বধূরাণীর মধ্যে যে অনেকটা আধুনিকতা আছে, তাহা প্রসন্ননারায়ণ জানেন। কিন্তু আজ তার কথা শুনিয়া তিনি পর্য্যন্ত বিস্মিত হইলেন। কিন্তু কহিলেন যে শুধু জেলে যাওয়াই নয়, ভবিষ্যতেও হয়তো দীপঙ্কর বহুবার জেলে যাইবে,—যে ভূমিকা সে বরণ করিয়া লইয়াছে, তাহাতে কারাবাস খুবই একটা স্বাভাবিক ঘটনা। স্বামীসঙ্গ হয়তো উত্তরার ভাগ্যে খুব কমই ঘটিবে।

শুনিয়া বধূরাণী ক্ষণকাল চুপ থাকিয়া গভীর স্বরে কহিলেন যে কাশীপ্রসাদের সঙ্গের চাইতে দীপঙ্করের স্বপ্নও তার কন্যার কাছে শতসহস্রগুণে প্রার্থনীয়।

প্রসন্ননারায়ণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কোনও একটা সমাধানও তার চোখে পড়িল না, কোনও আশ্বাসও খুঁজিয়া পাইলেন না। শুধু চুপ করিয়া নিদ্রার অভিনয় করিয়া শুইয়া রহিলেন। প্রহরের পর প্রহর পার হইয়া গেল। চীৎকার করিয়া বাড়ির পাইকেরা চারিদিকে ঘুরিয়া পাহারা দিতেছে,—ঘণ্টা বাজাইয়া কখনো প্রহর জানাইতেছে। উত্তরার ঘরে আলো দেখা যায়,—কে জানে কোন্ প্রয়োজনে উঠিয়াছে। খালের পাড়ের গাছগুলিতে হাওয়ার শব্দ হয়।

সাত

বাঙলাদেশের সমস্ত গ্রামের সারা বৎসরের পথচাওয়া-পূজা আসিয়া উপস্থিত হইল। ঢাক এবং ঢোলের শব্দে আমবাগান, মাটীর পথ, খালের জল পর্য্যন্ত পুলকিত হইয়া উঠিল। সহরের পূজায় আড়ম্বর বেশি, কিন্তু উৎসাহ এমন নাই। সমস্তটা গ্রাম একেবারে নতুন রূপে প্রকাশিত হইল।

নবমী পূজার দিন। শিববাড়ির বারোয়ারী পূজার কাছে চণ্ডীমণ্ডপে দীপঙ্করের কথা মত বৈকালে গ্রামের বাউল ও কীর্ত্তনীয়াদের আসর করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। গ্রামের

এই নিজস্ব অপূর্ব্ব সঙ্গীতগুলিতে গ্রামবাসীর বিরাগ দেখিয়া দীপঙ্করের বড় কষ্ট হয়। গ্রামের বৈষ্ণব ও বাউলদের ডাকিয়া গান শুনিয়া দীপঙ্কর এমন পারিশ্রমিক দিয়াছে যাহা পাইয়া এই ভিক্ষাপুষ্ট অনাদৃত সম্প্রদায়ের বিস্ময়ের আর অন্ত থাকে নাই। নিজে যাহাকে অপূর্ব্ব মনে করে, সেই বাউল, কীর্ত্তন, ভাটিয়ালী, সেই সব পাঁচালী শুনাইবার জন্যই দীপঙ্কর ছেলেদের গ্রামের এই লুপ্তপ্রায় সঙ্গীতের অনুষ্ঠান করিতে উৎসাহিত করিয়াছে।

তবে শুধু গান শোনাই নয়,—সেদিন সন্ধ্যায় দীপঙ্করের আরো বড় কাজ ছিল। দীপঙ্কর যে সেইদিন বক্তৃতা প্রসঙ্গে গ্রামে অবৈতনিক একটা প্রাইমারী স্কুল স্থাপনের ইঙ্গিত দিয়াছিল, ছেলেরা সেটা সাদরে গ্রহণ করে। এ-বিষয়ে দীপঙ্করের সঙ্গে তাদের অনেক আলাপ আলোচনা হইল। ঠিক হইল পূজা শেষ হইলেই কাজে লাগিয়া যাওয়া হইবে,—এবং জমিদারের কিছু সাহায্যও গ্রামবাসী সকলের সামান্ত অর্থ-সহানুভূতি পাইলে বাকীটা ছেলেরা সুগম করিয়া তুলিতে পারিবে। গ্রামের প্রধানদের কাছ হইতে কিছুটা উৎসাহও ছেলেরা পাইয়াছিল। এক সময় সম্ভাবনা এতটা উজ্জ্বল মনে হইয়াছিল যে দীপঙ্করের মত যারা এই সব সৎ-প্রচেষ্টার বহু দুর্গতি দেখিয়াছে, তারা পর্য্যন্ত আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল।

এমন সময় আসিল সংঘর্ষের আশঙ্কা। কাশীপ্রসাদের নেতৃত্বে একদল লোক এমন সময় একটা মহানুভব কাজের জন্য গ্রামে চাঁদা উঠাইতে সুরু করিয়া দিল। ব্যাপার আর কিছু নয়,—অর্থ উঠাইয়া গ্রামের মা শীতলাকে পাঁচ-সাতশো টাকার সোনার অলঙ্কার গড়াইয়া দিবে। এমন সৎকাজে গ্রামবৃদ্ধদের সহানুভূতিও কম আসিল না,—এবং বৃদ্ধারা ভক্তিমান কাশীপ্রসাদের জয় জয়কার এরই মধ্যে সুরু করিয়া দিল।

দীপঙ্কর যখন ছেলেদের মুখে এখবর শুনিল তখন তার বড় কষ্ট হইল। হায়রে দেশ, এখনো এখানে অযুত লোক পাওয়া যায়, যারা মানুষের চাইতে মূর্ত্তিকে বেশি ভালোবাসে। ব্যবস্থা হইয়াছে আজ সঙ্গীতানুষ্ঠানের পর চণ্ডীমণ্ডপে দীপঙ্করের বক্তৃতা হইবে,—তার অসাধারণ ক্ষমতায় যদি গ্রামবৃদ্ধদের মাথার স্বাস্থ্য ও মনের সহানুভূতি আবার ফিরাইয়া আনিতে পারে।

গ্রামের নিজস্ব ওই সঙ্গীতের সভায় সেদিন খুব বেশি একটা লোক পাওয়া গেল না,—যারা আসিয়াছিল অধিকাংশই প্রতিমা দেখিতে আসিয়াছিল, আয়োজন দেখিয়া বসিয়াছে মাত্র। বেশির ভাগ লোকই সন্ধ্যার পর জমিদার বাড়িতে থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টির অভিনয় দেখিতে যাইবে বলিয়া এখানে আর আসে নাই।

বাঙ্‌লার বাউল সঙ্গীতের তুলনা নাই। সহরে এর যতটা যায়, ঘি-এর মত তাতে বড় ভেজাল থাকে। অর্দ্ধ-শিক্ষিত লোকের বাঁধা এই সব পদগুলিতে এমন সব গভীর দর্শনের কথা অত্যন্ত সহজ ভাবে মিশিয়া আছে যে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়, বিস্ময়ের আর অবধি থাকে না। মনে হয়, আমাদের দেশের লোক নিরক্ষর বটে, অশিক্ষিত নয়। লোকে যদি এসব দার্শনিকতার রসাস্বাদ না করিতে পারিত, তবে এগুলির জন্মই হইত না।

সঙ্গীতের আসর উঠিল। অন্ধকার হইয়াছে,—আলো আনিতে হইল। এইবার দীপঙ্কর বক্তৃতা দিবে। এই বক্তৃতার জন্য গ্রামের অনেকের উৎসাহের চাইতে কৌতূহল বেশি,—এবং বক্তৃতার প্রারম্ভে আরো বেশ কিছু লোক আসিয়া জমা হইল।

দীপঙ্কর বলিতে আরম্ভ করিল। তখনও বিশেষ কিছু বলা হয় নাই,—শুধু বলিয়াছে যে মানুষের সেবা করিলেই দেবতাকে সব চেয়ে বড় সেবা করা হয়,—প্রত্যেক মানুষের মধ্যে নারায়ণ বাস করেন। দেবমূর্ত্তির অলঙ্কারের চাইতে দরিদ্রের ক্ষুধার অন্ন, অজ্ঞানের জ্ঞানের প্রদীপের প্রয়োজন বেশি।

এমন সময় ভিড়ের মধ্য হইতে কাশীপ্রসাদ সদলবলে হৈ-চৈ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। গণ্ডগোল পড়িয়া গেল, ঠেলাঠেলি, গালিগালাজ,—সহরের রাজনৈতিক সভায় বিপক্ষদল যেমন করিয়া সভাপণ্ড করে, তার প্রত্যেকটা অস্ত্রই ব্যবহৃত হইল। কাশীপ্রসাদ সভামঞ্চ অধিকার করিতে অগ্রসর হইল,—কে একজন লাঠি দিয়া বড় আলোটাকে পর্য্যন্ত টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া দিল।

ছেলেদের দল একেবারে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—একটা মারামারি বাঁধিবার আর দেরি হইত না। দীপঙ্কর আসিয়া কোনমতে তাদের থামাইল। বলিল যে গ্রামে এমন একটা কলহ সৃষ্টি করা অত্যন্ত অন্যায় হইবে,—এবং যারা অবুঝ তাদের জোর করিয়া বুঝাইয়া লাভ নাই। মঙ্গলকে এমন হীন আক্রমণ করিয়া জগতে কেহ কোনকালে দমাইয়া দিতে পারে নাই,—কাশীপ্রসাদের এই আক্রমণও পারিবে না, গ্রামের শুভবুদ্ধি ছেলেদের এই মহৎ প্রচেষ্টায় সহানুভূতি দেখাইবে।

সভামণ্ডপ ছাড়িয়া যখন এরা সব বাহিরে চলিয়া আসিয়াছে, তখন কিন্তু সভা ভাঙিয়া যায় নাই। অন্যদল তখন তার অধিকার পাইয়াছে। চলিতে চলিতে তারা শুনিল ভক্তিমান কাশীপ্রসাদের সচীৎকার কথা।...গ্রামের অবনতির আর অবধি নাই,—কতগুলি অর্ব্বাচীন যুবকের পাপে সমস্ত গ্রামবাসী ভগবৎ ক্রোধে জ্বলিয়া মরিবে। হায়, কী ম্লেচ্ছতা, কী অনাচার, দেবীর অলঙ্কারের চাইতে কিনা ছোটলোক চাড়াল ডোম, নমঃশূদ্র ছেলেদের জন্য ইস্কুল খোলা বড়। চারিপোয়া কলি পূর্ণ হইয়া আসিতে আর দেরি নাই।···

আঁকাবাঁকা গ্রামের জ্যোৎস্নাসিক্ত পথ দিয়া দীপঙ্কর বাড়ি ফিরিয়া আসিল। কাউকে সে তার সঙ্গে আসিতে দিল না। সে চায় না কেহ তার দুর্ব্বলতা দেখে,—তার দুই চোখে যে জল বারবার ঘনাইয়া আসিতেছে। প্রাচীনকালের যেদিকটা মরিয়া গেলে মঙ্গলের হইত তাহা মরে নাই,—যাহা বাঁচিয়া থাকিলে বাঙলার সম্পদবৃদ্ধি হইত, তাহা মরিয়া গেছে।

তখন দলে দলে লোক জমিদারবাড়িতে থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা দেখিতে চলিয়াছে···

আট

কোজাগরী পূর্ণিমার পরদিন সকাল বেলায় পাঁচ সাত জন ছেলে সঙ্গে করিয়া দীপঙ্কর সর্ব্বপ্রথম জমিদারবাড়ির ফটক পার হইল। জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া গ্রামে কোনও অবৈতনিক ইস্কুল স্থাপন করা প্রায় অসম্ভবের কাছাকাছি। নিজে দীপঙ্কর এই প্রস্তাবিত স্কুলের জন্য একশো টাকা দিয়াছে। জমিদার যদি শ' দুই তিন দেয় তবে পাঁচ ছয় শত টাকা উঠানো অসম্ভব হইবে না,—এবং বর্ত্তমানে ঐ টাকাটা হইলেই কোনও রকমে চলিয়া যাইতে পারে।

বেলা সাড়ে আটটা হইবে,—বুড়া রামনারায়ণ চৌধুরী বৈঠকখানায় উপস্থিত। কিংখাবের তাকিয়ায় হেলান দিয়া, গঙ্গাজলপূর্ণ আলবোলায় টান দিতে দিতে তিনি দুচারজন চাটুকারের সঙ্গে গল্পগুজব এবং বল্লালীকালের অশ্লীল পরিহাস করিতেছিলেন,—এমন সময় দলবল লইয়া দীপঙ্কর উপস্থিত হইল। কাশীপ্রসাদ কর্ত্তাবাবুর পায়ের কাছটা ঘেঁষিয়া বসিয়াছিল, দেখিয়া বিস্ময়োক্তি করিল, এবং তখন রামনারায়ণ চৌধুরীর দৃষ্টি পড়িল তাহাদের উপর।

দীপঙ্কর ফরাসের কাছে আগাইয়া আসিয়া দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া চৌধুরীমশায়কে নমস্কার করিল। প্রতি-নমস্কার দূরের কথা, কটমট করিয়া কিছুকাল তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া সম্মানীপুরুষ শ্রীল শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় গভীর অবজ্ঞায় ঘাড় ফিরাইয়া লইলেন। কেহ তাদের বসিতেও বলিল না,—চলিয়া যাইতেও বলিল না।

দীপঙ্কর তবু দাঁড়াইয়া রহিল। সে আসিয়াছে কাজ আদায় করিয়া নিতে, যাতে তাতে অভিমান করিলে তার চলে না। বড় মানুষকে ফুলাইয়া, তুষ্ট করিয়া সম্মানের লোভ দেখাইয়া তবেই তাদের সৎকার্য্যে উৎসাহ আদায় করিতে হয়,—বেশিভাগ ধনবানের দানের মধ্যে হৃদয় থাকে না, থাকে আত্মম্ভরিতা, আত্মশ্লাঘা।

দণ্ডায়মান দীপঙ্করকে না জমিদারবাবু না তার অনুগ্রহ-ভোজীরা লক্ষ্য করিল। বুড়া রামনারায়ণ প্রথমে ইংরেজী পড়িয়া দেশের সর্ব্বনাশের কথা আরম্ভ করিলেন এবং সেটা সমাপ্ত হইয়া আলোচনা শ্যালিকার পুত্র মধু হালদারের বিধবা ভ্রাতৃবধুর অসচ্চরিত্রতা ও তার প্রায়শ্চিত্তের দিকে অগ্রসর হইল।

এইবার দীপঙ্কর কহিল যে জমিদার মহাশয়ের কাছে তারা একটু জরুরী কাজে আসিয়াছে। কথার মধ্যে বাধা পাইয়া

রামনারায়ণ চৌধুরীর সম্মানে আবার আঘাত লাগিল। অকস্মাৎ তিনি হুকুমের স্বরে কহিয়া উঠিলেন যে রামাশ্যামা প্রত্যেকের দরকার থাকিলেই তিনি তার জন্য মূল্যবান সময় ব্যয় করিতে পারেন না।

দীপঙ্কর ইহাও সহ্য করিল। বিনীতভাবে সে কহিল যে সে নিজের কোনও কাজে আসে নাই,—সমস্ত গ্রামের কাজেই আসিয়াছে। গ্রামে তাহারা দরিদ্র লোকের জন্য এক অবৈতনিক প্রাইমারী স্কুল স্থাপন করিতে চায়,—এ বিষয়ে তাহারা গ্রামের সমস্ত শুভকর্ম্মের প্রধান হিসাবে জমিদারমশায়ের পৃষ্ঠপোষকতা চায়। পুরাকালে ধনীদের সহানুভূতিতেই সমস্ত শুভ অনুষ্ঠান বাঁচিয়া থাকিত, আজও বাঁচিতে চায়, আজও গ্রামের সমস্ত উন্নতির সংকল্প জমিদারের সাহায্য প্রার্থনা করে। জমিদারবাবুকে তাহারা সভাপতি মনোনয়ন করিয়াছে,—তিনি সে-পদ গ্রহণ করিলে সকলেই আনন্দিত ও অনুগৃহীত হইবে।

রামনারায়ণ চৌধুরী ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া শ্লেষতিক্ত কণ্ঠে কহিলেন যে তাহারা টাকা চায়, এই তো?

দীপঙ্কর কহিল যে টাকা অবশ্যই চায়, তবে সহানুভূতি আরো বেশি চায়। শ পাঁচেক টাকায়ই কাজ আরম্ভ করা যাইবে,—এবং এই অঙ্কের মধ্যে শ দুই টাকা তারা জমিদারবাবুর কাছ হইতে পাইবে, এমন আশা করিয়াছে।

এইবার রামনারায়ণ চৌধুরী তার বিক্রম দেখাইলেন। মুখ বিকৃত এবং দুই চোখ আরক্ত করিয়া তিনি কহিলেন যে টাকা মারিবার এই ফন্দী তিনি বেশ টের পাইয়াছেন। ইস্কুল? চাষাডোমের জন্য আবার ইস্কুল কি? গ্রামের মধ্যে স্বদেশী তিনি সহ্য করিবেন না। আর এই হিন্দুগ্রামে ম্লেচ্ছকাণ্ড সংঘটিত হইতে দেখিয়া তাঁর ক্রোধের আর সীমা নাই। মা শীতলার অলঙ্কারের জন্য টাকা উঠাইবার মত মহৎ কর্ম্মে যারা বাঁধা দিয়া ছোটলোকদের নাচাইয়া তুলিবার ষড়যন্ত্র করিতেছে, তাদের উচিত শিক্ষা কেমন করিয়া দিতে হয়, এত বৎসর জমিদারী চালাইবার পর তাহা তাঁর বেশ ভাল মতন জানা আছে। এ গ্রাম খুব শান্ত ও ধর্ম্মভীরু ছিল,—জেলের আসামী আসিয়াই অমঙ্গলের সৃষ্টি করিয়াছে। উদ্ধত, অবিনয়ী, অনাচারী,—ধৃষ্টতার সীমা নাই, প্রজাবিগড়াইবার কল তৈরী করিবার জন্য টাকা চাহিতে আসিয়াছেন। এই মুহূর্ত্তে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া না গেলে পাইকদের ডাকিতে হইবে,—গুণ্ডাকে শায়েস্তা করিতে তাঁর জানা আছে, এবং কি কি কড়া ওষুধ তাও জানেন। কাশীপ্রসাদের যে পদধূলির যোগ্য নয়, সে আসে তার সঙ্গে শত্রুতা করিতে। দীপঙ্কর যেন সাবধান হয়,—নহিলে পরিণাম গুরুতর। কী, এখনো এখানে দাঁড়াইয়া রহিল। কোন্ সাহসে সে ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল?

স্তব্ধবাক্ দীপঙ্করের দুই চোখে বিদ্যুৎ ঝলসিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সে ক্ষণকালের জন্য। এমন হীন যে লোক হইতে পারে একথা ভাবিয়া তার দুঃখের ও ঘৃণার অবধি রহিল না। সঙ্গী দলটীকে ইঙ্গিত করিয়া সে বাহির হইয়া ফটকের দিকে চলিল।

অনেকের সঙ্গে কাশীপ্রসাদের অট্টহাসি শোনা গেল।

দোতলাঘরের জানলা দিয়া উত্তরা দেখিয়াছিল তাহাদের আসিতে,—বহির্দালানে প্রবেশ করিতে। তখন চমকিয়া দেখিল, রক্তহীন পাংশু মুখে অসহ্য বেদনা ও অপমান বহন করিয়া দীপঙ্কর ছুটিয়া চলিয়াছে বাহিরের দিকে,—এবং পিছনে যে-ছেলের দলটী আসিল তাদের উত্তেজিত মুখ ও রুষ্ট ভঙ্গী উত্তরার চোখ এড়াইল না। কী যেন একটা বিপ্লব, একটা নিদারুণ বিপর্য্যয় এই কয়টা মিনিটে হইয়া গেছে, তাহাতে সন্দেহমাত্র রহিল না,—দীপঙ্করের পাংশু ম্লান মুখটা, তার চোখের আহত দৃষ্টি বড় অশুভ ইঙ্গিত করিতেছে।

উত্তরার ডাকে আসিল বিন্দী, উত্তরার আদেশে গেল সে খোঁজ নিতে। উত্তরার জানিতে দেরি হইল না,—কাশী-প্রসাদই বিন্দীকে সবিস্তারে জানাইয়াছে সব। বিন্দীকে উত্তরা প্রতিজ্ঞা করাইল এখবর সে কারুকেই আর জানাইবে না,—দীপঙ্করের অপমানের সমস্তটা যদি উত্তরার নিজের বুকে গোপন করিয়া রাখিতে পারিত তবে বাঁচিত। বিন্দীকে তাড়াইল ঘর হইতে, এবং তারপর অকস্মাৎ একেবারে হু হু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

জীবনে অন্যের অপমান এমন কখনো আর তার বুকে বাজে নাই। প্রবলপ্রতাপান্বিত জমিদারবংশের মেয়ে হইয়া জন্মিয়া অনেকের অনেক অপমান সে দেখিয়াছে। বয়সও তখন কম ছিল, নিজেরও অপমানিত হইবার অভিজ্ঞতা ছিল না। কিন্তু আজ নিজে অপমানিত না হইয়াও উত্তরা জীবনে সর্ব্বপ্রথম অপমানের তীব্র বেদনা সমস্ত শিরা-উপশিরায় অনুভব করিতে লাগিল।

ছেলেরা প্রস্তাব করিল যে আজ আর কোথাও যাইয়া প্রয়োজন নাই। দীপঙ্করই ইহাতে আপত্তি করিল,—তাহার অপমান যে ছেলেদের দমাইয়া দিবে তাহা সে চায় না। ছেলের দলের সঙ্গে দীপঙ্কর চলিল অন্যান্য গ্রাম-প্রধানদের কাছে,—বিশেষ তাদের কাছে যারা এক সময় এ প্রস্তাবে উৎসাহ দেখাইয়াছিল, এবং বক্তৃতার সময় হাততালি দিয়াছিল সজোরে।

হরজ্যেঠা শুনিয়া বলিলেন যে এ বিষয়ে যদিও তাঁর সহানুভূতি প্রচুর, তবু তিনি জমিদারের বিরুদ্ধে গ্রামের কোন কিছু করার পক্ষপাতী নহেন,—তাতে লাভ নাই, বিপদ যথেষ্ট। দীনু ভট্‌চায কহিলেন যে প্রস্তাবটা তিনি মন্দ মনে করেন না, এবং অবৈতনিক স্কুল হইলে তাঁর তিন পুত্রকেই ভর্ত্তি করিয়া সহানুভূতি দেখাইতে পারেন,—তবে চাঁদা দেওয়া বর্ত্তমানে তাঁর পক্ষে সম্ভবপর নয়। বিশেষ মা শীতলার গহনার জন্য কিঞ্চিৎ অর্থসাহায্য করিতে তিনি প্রতিশ্রুত,—ঠাকুরদেবতার উপরে কথা নাই, তাঁদের দিকেই আগে দেখিতে হয়। শ্রীনাথ বিশ্বাসের মত যাকে তাকে লেখাপড়া শিখাইয়া আস্কারা দেওয়া উচিত নয়,—হইত বামুন-কায়েতের ছেলেদের জন্য বাঁধা ইস্কুল, তবে না হয় কথা ছিল, তের জাতের ভিড়ের মধ্যে কে ছেলে পাঠাইবে! শিবুখুড়া চালাক মানুষ,—তিনি কাউকে অসন্তুষ্ট করিতে চান্ না,—কহিলেন যে তিনি এ বিষয়ে ভাবিয়া শীঘ্রই একটা জবাব দিবেন, এবং ব্যাপারটাকে যদি উপযুক্ত মনে করেন তবে চার ছ আনা চাঁদা দিতে তিনি কার্পণ্য করিবেন না, এটা ঠিক। দুয়ার হইতে দুয়ারে এমনি দীপঙ্কর ঘুরিয়া ফিরিল,—আশা এবং উৎসাহ যা ছিল তাহার বিশেষ আর অবশিষ্ট রহিল না।

মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রে অস্নাত অভুক্ত ইহারা ক্লান্ত দেহমনে বাড়ি ফিরিল।

সন্ধ্যার পরই বাঁশবাগানের উপর দিয়া মস্ত বড় একটা চাঁদ উঠিল। এমন জ্যোৎস্না গ্যাসজালা রাস্তায় পাওয়া যায় না,—এমন ছায়াঙ্কিত জ্যোৎস্না, এমন পাতাও মাটীর গন্ধ-লাগা আলো পাইতে হইলে গ্রামে আসিতে হয়। অথচ প্রকৃতির এই সর্ব্বপ্রকার দাক্ষিণ্যের মধ্যে মানুষের মন কি করিয়া যে ছোট হয় তাহাই দীপঙ্কর ভাবিয়া উঠিতে পারে না। এত সোনার রৌদ্র, এত রূপার জ্যোৎস্না, এত অপূর্ব্ব সূর্য্যাস্ত, এত স্বচ্ছন্দগতি জল, এত গন্ধ, এত বনমর্ম্মর গ্রামের অনেক লোকের মনের মধ্যে প্রবেশ করিতেই পায় না,—এবং কূপমণ্ডুক হওয়া ছাড়া এই সব মানুষের আর গত্যন্তর নাই।

মা ও বাবা উঠিয়া ঘরে গেছেন। শুধু জ্যোৎস্নামাখা ঘাসের উপর ইজিচেয়ার পাতিয়া, ছোট একটা টুলে পা তুলিয়া দিয়া দীপঙ্কর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মনে আসিল একে একে সারাদিনের কথা। একটা অবসাদ শুধু দেহ নয়, মনও আড়ষ্ট করিয়া আনিল। বাক্‌সহানুভূতি, ধর্ম্মান্ধতা, ঐশ্বর্য্যের ঔদ্ধত্য, একে একে সব মনে আসিয়া ভিড় করিল। যে দেশে মানুষের শিক্ষার জন্য সাহায্যের অভাব হয়, অথচ দেবমূর্ত্তির অলঙ্কারের জন্য চাঁদার অপ্রতুল হয় না, তার জন্য শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কিছু নাই।

আজ দীপঙ্করকে মা অনুযোগ দিয়াছেন যে বিশ্রাম ও স্বাস্থ্যের জন্য গ্রামে বেড়াইতে আসিয়া সে পুনর্ব্বার কাজে মাতিয়া উঠিতেছে, তখন দীপঙ্কর অস্বীকার করিবার কিছুই পাইল না, শুধু তার মনে হইল, তার বিশ্রাম, তার স্বাস্থ্য এসব দিয়াও কোনও কিছু সাহায্যই হয়তো সে করিতে পারিবে না,—গ্রামের জীবন তার চিহ্নিত পথে চলিবে, একটু এদিক ওদিক নড়চড় হইবে না। গ্রামের ভবিষ্যতের জন্য দীপঙ্করের শুধু একটী আশা,—নতুনকালের বার্ত্তা, স্বার্থত্যাগের আদর্শ, উদারতার স্বপ্ন নতুন যুগের মানুষের মধ্য দিয়া গ্রামেও আসিতেছে,—একদিন ফলবান হইয়া উঠিবে, গ্রামেরও যুগপরিবর্ত্তন না হইয়া উপায় নাই।

এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে দীপঙ্কর এমনই অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিল যে, টের পায় নাই যে জ্যোৎস্নাতে ঠিক সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে একজন স্ত্রীলোক। হঠাৎ চাহিয়া সে চমকিয়া উঠিল।

দীপঙ্করকে চাহিতে দেখিয়া সে নিজের পরিচয় দিয়া কহিল যে সে বিন্দী, জমিদারবাড়ীর উত্তরাদিদিমণির দাসী।

এই আত্মপরিচয়ে দীপঙ্করের বিস্ময় কমা দূরে থাকুক, তাহা একেবারে অসম্ভব রকম বাড়িয়া গেল। ভাবিল, আবার প্রশ্ন করিয়া পরিচয়টা জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু সেটা এমন স্পষ্ট করিয়াই শুনিয়াছে যে সন্দেহের আর কোনও অবকাশই রহিল না।

বিন্দী কহিল যে দিদিমণির কাছ হইতেই সে তার কাছে আসিয়াছে।

দীপঙ্কর কহিল, ওঃ।

বিন্দী তখন সযতনে আঁচলের অন্তরাল হইতে কতগুলি মুদ্রা বাহির করিল, বাহির করিল দুটী কঙ্কণ, বাহির করিল কেয়ূর। দেখিয়া দীপঙ্করের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না।

বিন্দী কহিল যে এই সব উত্তরা তাহার কাছে পাঠাইয়াছে,—গরীবদের লেখাপড়ার জন্য দীপদা যে স্কুল প্রতিষ্ঠা করিবে, তার সাহায্যের জন্য।

দীপঙ্কর কতক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। কী ভাবিল সে-ই জানে, তারপর বিন্দীকে কহিল যে এসব নেওয়া ঠিক হইবে কিনা সে ভাবিয়া পাইতেছে না।

বিন্দী কহিল যে উত্তরার একান্ত অনুরোধ যেন তার এই সামান্য সাহায্য দীপদা ফিরাইয়া না দেন। এ কঙ্কণ, এ কেয়ূর উত্তরার নিজের,—এগুলি দান করিবার অধিকার তার যদি না থাকিত, তবে সে এগুলি পরিতই না কখনো। উত্তরাকে সে অনেক বুঝাইয়াছে,—লাভ হয় নাই কিছু,—জোর করিয়াই বিন্দীকে পাঠাইয়া দিল।

দীপঙ্কর এবারও ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে হঠাৎ এমন করিয়া উত্তরা এসব পাঠাইল কেন,—এবং তাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য টাকার প্রয়োজন হইয়াছে তাহাই বা সে কী করিয়া শুনিল।

বিন্দী কহিল যে আজ ভোরবেলায় দীপঙ্কর যখন কর্ত্তাবাবুর সঙ্গে দেখা করিতে যায়, তখন উত্তরা জানালায় দাঁড়াইয়া দেখে,—তারপর যখন দীপঙ্কর অপমানিত হইয়া ফিরিয়া আসে, তখনও তেমনি সে দাঁড়াইয়াছিল। চীৎকার করিয়া সে ডাকিল বিন্দীকে, পাঠাইল তাকে খবর নিতে, শুনিয়া বিন্দীকে ঘর হইতে তাড়াইয়া ঘরে দুয়ার দিল। তারপর আর কিছু জানা নাই,—সন্ধ্যার সময় বিন্দীকে ডাকিয়া নিজ গা হইতে খুলিয়া পাঠাইয়া দিল কঙ্কণ, কেয়ূর।

শুনিয়া দীপঙ্কর স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল,—চাহিয়া আছে কিনা তাহাই বুঝা গেল না। বিন্দী আরো কি বলিল, কানে গেল না কিছুই,—শুধু সমস্ত দিনের অপমানের পর সমস্ত মনের মধ্যে একটা চন্দন প্রলেপের অপূর্ব্ব স্পর্শানুভূতি অনুভব করিতে লাগিল।

একসময় চাহিয়া দেখে বিন্দী চলিয়া গিয়াছে, টুলের উপর পড়িয়া আছে, কঙ্কণ, কেয়ূর, ও মুদ্রাগুলি···

নয়

বধূরাণী ক্রমশঃই উতলা হইয়া উঠিতেছিলেন,—তাঁর যেন আর সহ্য হয় না, অপেক্ষা করা সম্ভবপর নয়,—দেবতারা তাঁর কন্যার জন্য যাহাকে নির্ব্বাচিত করিয়া পাঠাইয়াছে, মানুষের কাছ হইতে তার সামান্য বিপক্ষতাও মনের অশেষ অধীরতা জাগাইয়া তোলে। গৃহদেবতার কাছে যখন তখন লুটাইয়া পড়িয়া প্রার্থনা করেন, রাত্রে ভালো করিয়া ঘুম হয় না,—মধ্যরাত্রে হয়ত অন্ধকার বারান্দায় পায়চারি করিতে থাকেন, প্রভাত হইতে চাহিয়া থাকেন খালের দিকে দীপঙ্করের ডিঙ্গি সে-পথে যায় কিনা সেই আশায়।

উত্তরার ঘরে কতবার যে তিনি ছুটিয়া যান, তার আর ইয়ত্তা নাই,—অধিকাংশবারই কিছু না বলিয়া শুধুমাত্র তার দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া চলিয়া আসেন। কতবার বালিশে মুখ গোঁজা, জান্‌লা দিয়া উদাস চোখে চাহিয়া থাকা', উত্তরাকে যে তিনি অপ্রস্তুত করিয়াছেন তার ঠিক নাই। সেতার বাজাইতে বাজাইতে অকারণে দুই চোখে যে-অশ্রু ভরিয়া আসে, উত্তরা তাড়াতাড়ি তাহা মুছিবার পর্য্যন্ত সব সময় সময় পায় নাই,—এমনি অকস্মাৎ হয় বধূরাণীর আগমন।

এদিকে সর্ব্বনাশ আরো ঘনাইয়া আসিল। প্রবল-প্রতাপান্বিত শ্বশুর মহাশয় ইহার মধ্যে একদিন পুত্রবধূকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন যে অনেক চিন্তার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন যে উত্তরার জন্য নিষ্ঠাবান কাশীপ্রসাদের মত উপযুক্ত পাত্র এই ম্লেচ্ছাচারদুষ্ট কালে আর খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভবপর নয়, এবং এই সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছিবার পর তিনি ঠিক করিয়াছেন যে কাশীর মত সৎপাত্রের হাতেই পৌত্রীকে সমর্পণ করিবেন,—আর কোনও দ্বিধা বা বিলম্ব করিবেন না। এই কারণে তিনি শিরোমণিকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছেন,—কোষ্ঠিকুষ্ঠি মিলাইয়া দেখিয়া একটা বিধিব্যবস্থা শীঘ্রই করিয়া ফেলিবেন।

শুনিয়া বধূরাণী প্রমাদ গণিলেন। উত্তরার জীবনে কতবড় যে একটা সর্ব্বনাশ গভীর করিয়া ঘনাইয়া আসিতেছে তাহা বধূরাণী আজ নয়, বহু আগেই জানিয়াছেন, কিন্তু আজ, যখন সর্ব্বনাশ এমন আসন্ন মনে হইল, তখন বধূরাণীর মনে হইল তিনি যেন চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিবেন,—মনের অসহায় প্রতিবাদ যেন আর বুকের ভিতর চাপিয়া রাখা যায় না।

প্রসন্ননারায়ণ স্বভাবতই শান্ত প্রকৃতির মানুষ। বিশেষ, তিনি শিক্ষিত লোক,—দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ পিতার দাপট, ও জমিদারী স্বেচ্ছাচারিতার সম্বন্ধে কোনও কথা বলিতে গেলেই যে লজ্জাকর অভিনয় করার প্রয়োজন তাহার পক্ষে তিনি সম্পূর্ণই অযোগ্য। তাই অত্যন্ত বিনীতবাধ্যতায় বল্লালী পিতার শাসন, অনুশাসন, প্রজাপীড়ন এবং সমস্ত অন্যায় হস্তক্ষেপ অসহ দাপট সহিয়া থাকেন,—পিতার জন্য সম্মান, ভয় ও নীরব প্রতিবাদ মিশিয়া তাঁর মধ্যে এক অদ্ভুত মনোবৃত্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু প্রকাশ্য ভাবে তিনি পিতার কথার উপরে কথা বলিবার কথা কল্পনাও করিতে পারেন না। বধূরাণী যতই তাকে প্ররোচিত করিতে লাগিলেন, ততই তিনি পিতার নির্ব্বাচনের শেষ পরিণাম একান্ত শুভ এই আশ্বাস এই অপ্রবুদ্ধ নারীকে দিতে লাগিলেন। কিন্তু লক্ষ্য না করিয়া উপায় নাই, বধূরাণী প্রতিদিন যেন কেমন অধীর, শ্রান্ত, কেমন আশঙ্কা-অবসন্ন, কেমন উন্মনা হইয়া উঠিতেছেন,—তাহা প্রসন্ননারায়ণের কাছেও প্রস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল। বধূরাণী খান না, রাত্রে নিদ্রা হয় না তার, ঠাকুরঘরে যাইয়া নিরন্তর মাথা কোটেন,—এসবও প্রসন্ননারায়ণের জানা হইল। অনেক অনুযোগ করিলেন,—লাভ হইল না কিছু।

স্ত্রীর জন্য সত্যই তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছিলেন। এমন সময় শ্বশুরের আদেশ শুনিয়া বধূরাণী উন্মাদের মত ছুটিয়া আসিলেন স্বামীর কাছে,—শ্বশুরের কথা যদি কাজে পরিণত হয়, তবে আত্মঘাতী হওয়া ছাড়া তাঁর আর উপায় নাই। তাঁহাদের নিজের মেয়েটার এমন সর্ব্বনাশ কি প্রসন্ননারায়ণ এমন মুখ বুজিয়াই মানিয়া লইবেন,—কোন প্রতিবাদই কি করিবেন না! পিতা হিসাবে কন্যার উপরে তাঁর গুরু কর্ত্তব্য আছে,—কেমন করিয়া বিনীত বাধ্যতায় মেয়েটাকে এমন বিসর্জ্জন দিতে পারেন। এর করুণতা কি তাঁহাকে স্পর্শ করে না। যে-যুগ মরিয়া গেছে তাহার সঙ্গে তাঁহাদের এত আদরের কন্যাকে গাঁটছড়া বাঁধিয়া মনে কি কোনদিন আর তাঁরা সুখ ও সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাইবেন,—চির দুঃখানলে প্রতিদিন প্রতি রজনী দগ্ধ হইতে হইবে মাকে, দগ্ধ হইতে হইবে পিতাকে। এমনটা প্রাণ থাকিতে তিনি ঘটিতে দিবেন না,—আর কিছু না পারেন মরিবেন। তাঁর কন্যার জন্য ঈশ্বর একজনকে আপন হাতে নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইয়াছেন,—তাঁর ইঙ্গিতকে অবজ্ঞা করার গভীর পাপের তুলনা নাই। দীপঙ্করের আবির্ভাব অবধি কন্যাও তাঁর কেমন হইয়া গেছে, কেমন একটা উন্মনস্কতা,—কেমন একটা আত্মবিস্মৃত ভাব, যাহা না দেখিয়া উপায় নাই। স্বামী কি সকলই উপেক্ষা করিবেন,—পিতার খামখেয়ালীর কি কোনও প্রতিবাদ তাঁর মুখ হইতে উচ্চারিত হইবে না? তবে বধূরাণীর মরাই ভাল,—সমস্ত জ্বালা এক নিমেষে জুড়াইয়া যাউক।

দীপঙ্করকে অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিবার দিন সন্ধ্যার পরে বুড়া রামনারায়ণ চৌধুরী যখন নিজের ঘরে আলবোলা টানিতে টানিতে চাকর দিয়া পা ডলাইতে ছিলেন তখন প্রসন্ননারায়ণ জড়সড় হইয়া পিতার কাছে উপস্থিত হইলেন।

কতক্ষণ পিতার শারীরিক অবস্থার কথা আলোচনা হইল, আদায়পত্রের কথা ও কোনও বিশেষ মহালের প্রজাদের গুরুতর রকম শাস্তি বিধানের প্রস্তাব উঠিল, ছোটলোক চাঁড়াল্‌ব্যাটারা যে দিন দিন বড় সাহস পাইতেছে এবং বামুন কায়েতকে তাদের উপযুক্ত সম্মান দেখাইতে কার্পণ্য করিতেছে, তাহাতে রামনারায়ণ উষ্মা প্রকাশ করিলেন। কথা থামিলে শুধু গুড়গুড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল। এমন সময় প্রসন্ননারায়ণ চাকরটাকে চলিয়া যাইতে আজ্ঞা করিয়া কহিলেন যে রামনারায়ণের কাছে তাঁর কিছু বলিবার আছে।

রামনারায়ণ বিস্মিত হইয়া পুত্রের দিকে তাকাইলেন,—যেন বুঝিতে পারিয়াছেন যে আগের কথাগুলি কোন একটা বিশেষ প্রসঙ্গ উঠাইবার ভূমিকা মাত্র ছিল। তারপর তাঁর গুড়গুড়ি শব্দ করিতেই লাগিল—গুরুগম্ভীর স্বরে।

প্রসন্ননারায়ণ কহিল যে উত্তরার বিবাহের প্রসঙ্গেই তিনি আসিয়াছেন। তারপর উত্তরার ব্রতাচরণের কথা, দীপঙ্করের নৌকা থামিয়া ঠিক অঞ্জলির সমুখে উপস্থিত হওয়া, শিরোমণিমহাশয়ের ইহাকে ঈশ্বরের ইঙ্গিত বলিয়া ব্যাখ্যা এবং সবার উপর বধূরাণীর আকুলতা, পিতার কাছে সমস্তই তিনি একে একে বলিলেন। কহিলেন যে দীপঙ্কর উচ্চশিক্ষিত, অবস্থা ভাল, সমস্ত বাঙ্‌লাদেশময় তার নাম আছে,—এমন অবস্থায় পাত্রও খুব উপযুক্ত বলিতে হইবে। পিতার আদেশ হইলেই গুরুবাবুর কাছে তিনি প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইতে পারেন।...

চুপ করিয়াই প্রতাপান্বিত রামনারায়ণ চৌধুরী শুনিলেন। কিন্তু এই নিশ্চুপতার পিছনেই কত বড় একটা ঝড় আসিতেছে তাহার সবটা কল্পনাও প্রসন্ননারায়ণের ছিল না। বিশেষ সেইদিন প্রভাতেই দীপঙ্করের উপরে জমিদার বাবু একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়াছিলেন,—মনের মধ্যে তার আগুন এখনো নিবিয়া যায় নাই। প্রসন্ননারায়ণ যদি ভোরের ঘটনাটার খবর জানিতেন,—তবে আজই পিতার কাছে এ প্রস্তাব লইয়া আসিতেন কিনা সন্দেহ।

শুনিয়া ক্ষণকাল রামনারায়ণ চৌধুরী বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া রহিলেন,—তাঁর মুখের উপর পুত্র এতটা কথা বলিতে পারে তাহা ধারণাতীত ছিল, এবং তাঁর পিতৃসম্মান এতটা গুরুতর ভাবে জখম হইল যে প্রথমটা তাঁর মুখ দিয়া কথাই ফুটিল না,—তাঁর আধিপত্যের, তাঁর বিবেচনার উপর পুত্রের হস্তক্ষেপ তাঁর স্বপ্নের অগোচর। কিন্তু বাক্‌হীনতা শুধু অল্পক্ষণের জন্য। পরমুহূর্ত্তে আগুনের স্পর্শ পাওয়া বারুদের মত তিনি ফাটিয়া পড়িলেন। বলিলেন যে পুত্রের এই ধৃষ্টতা অমার্জ্জনীয়,—পিতার ইচ্ছার উপর যে কথা কহিতে পারে সে সত্যই কুলাঙ্গার এবং পুত্রকে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়াতেই এতটা অনর্থ ঘটিতে পারিয়াছে। আর গুরুর পুত্র? কোন্ সাহসে প্রসন্ননারায়ণ তার কথা পিতার কাছে উঠাইতে পারিল। উদ্ধত, স্বেচ্ছাচারী, ধর্ম্মহীন পাষণ্ড সেইটা,—আজ সকালে শুধু দয়া করিয়াই তাহাকে জুতা পেটা করেন নাই। জেলের ফেরত আসামীকে বাড়ির জামাই করিয়া ঘরে আনিতে চায়, এত বড় নামী এক জমিদারবংশের বদনমণ্ডলে দুরপনেয় মসীলেপন করিতে চায় তাঁর নিজের পুত্র, এবং সে কথা পিতার কাছে আসিয়া জানাইতে সাহস পায়, এইজন্য তাঁর বিস্ময় ও ক্রোধের আর অন্ত নাই।

সম্মানী রামনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের ভ্রূকুটীবিকৃত বদনমণ্ডলে চোখ দুটী রাগে জ্বলিতে লাগিল, এবং গুড়গুড়ির নল মুখ হইতে পড়িয়া গিয়া এমন ভঙ্গী প্রকাশ পাইল যে ভয় পাইয়া যাওয়া খুবই স্বাভাবিক।

আজ কিন্তু প্রসন্ননারায়ণ ইহাতেও দমিলেন না,—কহিল যে উত্তরার পিতা হিসাবে তাঁরও কিছু কর্ত্তব্য রহিয়াছে। কাশীপ্রসাদকে তিনি একান্ত অপদার্থ মনে করেন, এবং তার হাতে কন্যা সম্প্রদানের চাইতে উহাকে হাত পা বাঁধিয়া জলে ফেলিয়া দেওয়া তাঁর বেশি অভিপ্রেত। এবং শুধু ঈশ্বরের ইঙ্গিতই নয়,—অন্য সমস্ত দিক দিয়া বিচার করিয়াও দীপঙ্করকে তিনি কন্যার জন্য শতসহস্র গুণে উপযুক্ত বিবেচনা করেন।

বুড়া গুড়গুড়ির নল ফেলিয়া লাফাইয়া উঠিল,—এবং এমন মনে হইল যে এই বিষম অবাধ্যতার জন্য সে পুত্রকে গুরুতর রকম শারীরিক শাস্তি দিতে চায়। কিন্তু অতটা দূরে অগ্রসর হইল না। চীৎকার করিয়া কহিলেন যে পুনর্ব্বার এসব কথা উচ্চারণ করিলে পুত্রকে তিনি ত্যাজ্য করিবেন,—

তাঁর জমিদারীর এক কাণাকড়িও তার হাতে আসিবে না কোনদিন। এই জন্য বুঝি বধূ কিছুদিন পূর্ব্বে মেয়ে লইয়া হাকিমবাড়ি বেড়াইতে গিয়াছিলেন,—সব খবরই তিনি পান! কী লজ্জা, কী বেহায়াপনা,—ছোটলোকের হাতে মেয়ে গছাইবার জন্য জমিদারবাড়ির বউ কিনা উপযাচিকা হইয়া অন্যের বাড়ি যায়। এ তিনি সহ্য করিবেন না,—বনিয়াদী বংশের এই অসম্মান, এই মাথা নীচু করা, তাঁর আর মুখ দেখাইবার উপায় রাখিল না। এই কাণ্ডজ্ঞান-হীনতার, নির্লজ্জতার, এই বাতুলতার যদি পুনরাভিনয় হয়, তবে তিনি আর ক্ষমা করিবেন না, ক্ষমা করিবেন না, ক্ষমা করিবেন না,—এই তিন সত্য করিলেন,—তাঁর হাতে এখনো কলকাঠি আছে।

অন্যায় ভাবে যে কাউকে আঘাত করিলেই তার মধ্যে বিদ্রোহ হয়,—প্রসন্ননারায়ণও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। তবু নিরুত্তরে মুখ নীচু করিয়াই ক্রোধোন্মত্ত পিতার সমুখ হইতে তিনি সরিয়া গেলেন,—কিন্তু তিরস্কারে বাধ্য হইয়া গেলেন না, মনের মধ্যে গভীর প্রতিবাদ লইয়া গেলেন।

দশ

পুত্রের অবাধ্যতাকে কঠিন করিয়া শাসাইলেও, তাহাকে ত্যাজ্য করা রামনারায়ণ চৌধুরীর পক্ষে সহজ ছিল না,—জবরদস্ত হইলেও পুত্রস্নেহ তাঁর কম নয়, শুধু তাঁর ইচ্ছা সবাই তাঁর কাছে সম্পূর্ণ নত হইয়া থাকিবে,—সামান্য মাত্র মাথা উঠানোকেও তিনি বরদাস্ত করিতে পারেন না।

সেদিন পুত্রকে শাসন করিবার পর রামনারায়ণের মনে হইল যে ব্যাপারটা বড় খারাপ হইয়া উঠিতেছে,—এবং কলিকালে পুত্রের বিদ্রোহ সম্পূর্ণ বিরল নয়। এখন তাঁর সমস্ত রাগটা গিয়া পড়িল দীপঙ্করের উপর। হতভাগা শুধু যে গ্রামে অধর্ম্ম এবং অশান্তি টানিয়া আনিতেছে, তাহাই নয়, তাঁর ঘরে পর্য্যন্ত অবাধ্যতা ও সবিশেষ অশান্তি টানিয়া আনিবার উপক্রম করিয়াছে।

কিন্তু প্রজা-ঠেঙ্গাইয়া যে চুল পাকাইয়াছে, জীবনের খাতায় তার কৃতিত্বের হিসাব অনেক চক্রান্ত করিবার গৌরব জমা আছে, তাহার পক্ষে এ সমস্যার একটা সমাধান করিতে বিশেষ দেরী হয় না। একদিন পরেই জমিদারবাড়িতে গ্রামপ্রধানদের ডাক পড়িল,—এবং অনেক আলাপ আলোচনার পর জমিদারবাবু স্বয়ং ও অন্যান্যের সহি লইয়া দুই গ্রাম দূরের থানার দারোগাবাবুর কাছে চিঠি গেল,—এবং সঙ্গে রামনারায়ণ চৌধুরী লিখিলেন এক ব্যক্তিগত চিঠি।

দীপঙ্কর তখন ইস্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে,—গ্রামপ্রধানদের কাছে ব্যর্থমনোরথ হইয়া যারা প্রধান নয়, তাদের সাহায্য লাভের আশায় সে ঘুরিতেছে। দীপঙ্কর ছেলেদের দল লইয়া জল হইতে কচুরি উদ্ধার করিতেছে,—গান গাহিয়া আনন্দ করিয়া তাহারা কচুরি তোলে। দীপঙ্কর গ্রামের ভিতর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দেয়, দীপঙ্কর অসুস্থের সেবা করে,—যে-বিশ্রাম লাভের জন্য সে ভিড়ের মধ্য হইতে পালাইয়া আসিয়াছিল, তাহা আর পাওয়া হইয়া উঠিল না।

এমন সময় একদিন খালের জলে পুলিসের নৌকা দেখা গেল,—এবং সমস্ত গ্রামটা এই শুভাগমনে একেবারে আশঙ্কায় পূর্ণ হইয়া উঠিল, এবং যতক্ষণে না সেটা জমিদারের ঘাটে যাইয়া ভিড়িল ততক্ষণ অনেকের বুকই দুরুদুরু করিতে লাগিল। জমিদার বাড়িতে পুলিসের ছিপ খুব বেশিক্ষণ রহিল না,—আধঘণ্টা পরেই সেটা ছাড়িয়া হাকিমবাড়ির ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

দীপঙ্কর বাড়ি ছিল না, যখন ফিরিয়া আসিল তখন রাত হইয়াছে। আসিয়া দেখে উদ্বিগ্ন ভীত পিতার চোখের সমুখে দারোগাবাবু বসিয়া আছেন,—এবং পিছনে দুই দুইজন সিপাই স্বমহিমার গৌরবে গোঁপ পাকাইতেছে।

প্রবেশ করিতে করিতেই উচ্চ হাসিয়া দীপঙ্কর কহিল যে, দারোগাবাবুর টুপি দেখিয়া আর সন্দেহ নাই যে তিনি তারই কাছে আসিয়াছেন। ভুল অনুমান হইতে পারে,—তবে দারোগাবাবুদের আবির্ভাব তার জীবনে এত বেশি যে আজকাল ভুল প্রায়ই হয় না।

দারোগাও কিছুটা হাসিয়া কহিলেন যে দীপঙ্করের এ অনুমান মিথ্যা নয়।

একটা চেয়ার টানিয়া দীপঙ্কর বসিয়া পড়িল। তার সত্যই বড় কৌতুক বোধ হইতেছে,—এমনই তার চোখের

চাউনি, এমনই গলার হালকা একটা সুর। জিজ্ঞাসা করিল যে এইবার অপরাধটা কোন্ জাতীয়,—রাজদ্রোহ, আইনভঙ্গ, বে-আইনী জনতাসৃষ্টি, ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ অবজ্ঞা না কি এ?

দারোগাবাবু কহিলেন যে অপরাধ এসবের কোনটাই নয়,—তবে তার উপর উপর হইতে চব্বিশঘণ্টার মধ্যে গ্রাম ত্যাগের আদেশ হইয়াছে,—তিনি জানাইতে আসিয়াছেন।

বিস্মিত হইয়া দীপঙ্কর কারণ জানিতে চাহিল। দারোগা কহিলেন যে জমিদার প্রমুখাৎ গ্রামের সমস্ত প্রধানরা থানায় তার বিরুদ্ধে গুরুতর সব অভিযোগ করিয়াছেন। দীপঙ্কর স্বদেশী প্রচার করিয়া গ্রামের লোক ক্ষেপাইয়া তুলিতেছে, দল পাকাইয়া বে-আইনী কাজের উদ্যোগ করিতেছে, দীপঙ্কর সমস্ত ছেলেদের বিগড়াইয়া দিতেছে,—কচুরি-তোলার অজুহাতে গ্রামে স্বদেশী গান গাহিয়া রাজদ্রোহের প্রচার করিতেছে। গ্রামের হিতের জন্য গ্রামের সবাই এই বিষময় কার্য্যকলাপে শঙ্কিত। এই সব গুরুতর অভিযোগ শুনিয়া পুলিশ আর নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না,—তাই,—যদিও দারোগাবাবু এর জন্যে দুঃখিত,—দীপঙ্করকে আর গ্রামে কোনমতেই রাখা যায় না। বিশেষ এই গ্রামটায় রাজনৈতিক গণ্ডগোল তেমন একটা নাই,—এবং দীপঙ্করের অতীত অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। গণ্ডগোলের সূত্রপাতেই তাকে নির্ম্মূল করা সহজ।

দারোগাবাবু দীপঙ্করের হাতে গ্রাম ত্যাগ করিবার হুকুম-পত্র দিলেন। কহিলেন যে তিনি আশা করেন যে দীপঙ্কর এই আদেশ-অনুযায়ী কার্য্য করিবে,—এবং দারোগাবাবুকে অপ্রিয়তর কাজ আর করিতে হইবে না।

কাজ শেষ করিয়া গ্রামের দণ্ডমুণ্ডের মালিক দারোগা-বাবু জমিদারবাড়ি ফিরিয়া গেলেন,—এবং সে-রাত্রে আতিথ্যের সমস্ত সৎকারই তাঁহার পাওয়া হইল।

যদি তাহাকে আইনভঙ্গের জন্য, গুরুতর শাস্তির অপরাধের জন্য গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাওয়া হইত, দীপঙ্করের দুঃখ তবে এতটা হইত না। কিন্তু দারোগার মুখ হইতে প্রচণ্ড অপরাধগুলির তালিকা শুনিয়া সে একেবারে হতবুদ্ধি ও স্তব্ধ হইয়া গেল। এই সব অসত্য এবং অর্দ্ধসত্য অভিযোগের যেন জবাব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তার মনে হইল গ্রামে নতুন যুগের নতুন মানুষের এবং নতুন মনোবৃত্তির আবির্ভাব না হইলে এ সমস্ত অর্দ্ধমৃত সঙ্কীর্ণমনা গ্রামের উদ্ধারের আর আশা নাই। বড় ভালোবাসিয়া তার পিতামহ-প্রপিতামহের গ্রামকে সে তার সমস্ত একাগ্র পরিশ্রম, তার সুদুর্লভ বিশ্রাম দান করিল, তার প্রতিদান যা পাইল, এমন দুঃখের অভিজ্ঞতা তার জীবনে আর কমই আছে।

দীপঙ্কর প্রথমে ঠিক করিল যে গ্রাম ছাড়িয়া যাইবে না,—অসত্য অভিযোগের উপর প্রতিষ্ঠিত অন্যায় আদেশ ভঙ্গ করিবে,—তার জন্য যাহা হইবার হোক্। কিন্তু আনন্দময়ী শুনিলেন না,—কাঁদাকাটা সুরু করিয়া দিলেন। গুরুপ্রসাদ-বাবুও কহিলেন যে দীপঙ্করের এবিষয়ে বিদ্রোহ করা ঠিক হইবে না,—কেননা প্রথমত তাঁরা শীঘ্রই চলিয়া যাইতেন, এবং দ্বিতীয়ত যে গ্রাম দীপঙ্করকে চায় না, নিঃস্বার্থ সেবায়ও শত্রুতা করে, সেখানে জোর করিয়া পড়িয়া থাকিলে শুধু মাত্র গ্লানির বোঝাই ভারি হইয়া উঠিবে,—বিশেষ আর কিছুই হইবে না। দীপঙ্কর ইহাতে প্রবুদ্ধ হইল কিনা সে-ই জানে, কিন্তু ক্রন্দনপরায়ণা মাকে আশ্বাস দিল কালই তারা সব গ্রাম ছাড়িবে।

খবর পাইয়া ছেলেরা সব ভিড় হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং উত্তেজনা তাহাদের মধ্যে উত্তরোত্তরই বাড়িতে লাগিল। দীপঙ্কর কাহারো নামেই নালিশ করিল না,—কিন্তু ইহা যে জমিদারের কাজ এবং এর জন্য তাকে ফল গ্রহণ করিতে হইবে, ছেলেরা এই সব উত্তেজিত ভাবে বলাবলি করিতে লাগিল। দীপঙ্কর তাদের বলিল যে বহিষ্কারের আদেশের মেয়াদ ফুরাইলেই সে আবার ফিরিয়া আসিবে,—ছেলেদের লইয়া কাজে লাগিয়া যাইবে।

বাজারের ঘাট হইতে বড় নৌকা আসিয়া হাকিমবাড়ির ঘাটে ভিড়িল।

গ্রাম ছাড়িতে সত্যই আজ বড় কষ্ট হইল। রহিল পড়িয়া এই সব ছায়াগাছ, রহিল পড়িয়া বনপথ, শিউলির গন্ধ, ঝাউগাছে হাওয়ার আওয়াজ, খালের জলে নৌকার স্বপ্নালস চলিয়া যাওয়া, অপূর্ব্ব সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত, রহিল পড়িয়া তার প্রাণের চাইতে প্রিয় ছেলের দল, রহিল পড়িয়া গ্রামকে উন্নত করিবার অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা,—এতগুলি অপূর্ব্ব

সঙ্গ ছাড়িয়া সে চলিয়া যাইতেছে। তার নিজের গ্রাম, পূর্ব্ব-পুরুষের সুখদুঃখেমেশা গ্রাম, যাহাকে সে প্রিয়ের চাইতে প্রিয় মনে করিয়াছিল, সে আজ তাহাকে দূর করিয়া দিল।

ঝাউগাছে বড় করুণ সুর বাজে,—ছাতিম গাছের ছায়া নৌকাভিমুখী যাত্রীদের দিকে ম্লানমুখে চাহিয়া রহিল,—এবং ছেলেদের দলে কাহারো চোখই সম্পূর্ণ শুষ্ক ছিল না।

নৌকা ছাড়ে ছাড়ে। এমন সময় একটা লোক ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া উপস্থিত। জমিদারবাড়ির বধূরাণীর কাছ হইতে চিঠি আসিয়াছে দয়াময়ীর কাছে। খামটা হাতে লইয়া আনন্দময়ী দেখেন খামের উপরেই লেখা আছে যে এ-চিঠি খুব তাড়াতাড়ি পড়িবার কোনও প্রয়োজন নাই,—আনন্দময়ী যেন অবসর মত পড়িয়া দেখেন।

নৌকা ছাড়িয়া দিল! আবার সেই আঁকা-বাঁকা খাল, সেই ধান ক্ষেত, সেই দিগন্ত রেখা,—যে-পথ দিয়া আসিয়াছিল অনেক আশা ও স্বপ্ন লইয়া, সে পথ দিয়াই সে ফিরিয়া গেল, নিরাশ, নিরুৎসাহ। বুকের মধ্য হইতে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।...

জমিদার রামনারায়ণ চৌধুরীর প্রাসাদে উত্তরার ঘর হইতে তখন বিন্দী ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে,—চীৎকার করিয়া বধূরাণীকে ডাকিল, জল লইয়া পাখা লইয়া দাসীরা ছুটিল, হুলস্থূল বাঁধিয়া গেল,—মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে উত্তরা—আঘাতাবলুণ্ঠিতা রজনীগন্ধার মত।

এগারো

যে-চিঠিটা বধূরাণীর কাছ হইতে আসিয়াছিল পথে আসিতেই আনন্দময়ী একাধিক বার সেটা পড়িয়া শেষ করিলেন। কলিকাতায় পৌঁছিয়াও আবার সেটাকেই তিনি পড়িয়া দেখিলেন,—এবং শীঘ্রই তাহা গুরুপ্রসাদবাবুরও পড়া হইয়া গেল।

সমস্ত চিঠিটা ব্যাপিয়া একটা করুণ সুর প্রতি পংক্তি ও প্রতি উক্তিতে মিশিয়া আছে,—যেমন শ্রাবণের মেঘচ্ছায়া সমস্ত পৃথিবীতে করুণতা মিশাইয়া দেয়। বধূরাণী লিখিয়াছেন যে তাঁর প্রস্তাবে আনন্দময়ী কি মনে করিবেন জানা নাই, কিন্তু বাল্যসখীর যদি কোনও দোষ, কোনও ত্রুটি হয়, তাহা যেন স্নেহপ্রশ্রয়ে বঞ্চিত না হয়। তার পর মধুর অকপট সরলতায় তিনি লিখিয়াছেন উত্তরার ব্রতের কথা, পুষ্পাঞ্জলির সমুখে অকস্মাৎ ডিঙ্গি চড়িয়া দীপঙ্করের আবির্ভাব, সমবেত সবার মনে এক মঙ্গলসূচনার শিহরণ, কুলপুরোহিত শিরোমণি মহাশয়ের এই সঙ্ঘটনার ব্যাখ্যা। ইহার পর হইতে বধূরাণী শান্তি পান নাই,—যতই তাঁর শ্বশুর উত্তরাকে এক মূর্খ গ্রাম্য ফোঁটা আচমনকারী যুবকের সঙ্গে বাঁধিয়া দিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, ততই ঈশ্বরের এই স্পষ্ট ইঙ্গিতের এত বড় অবমাননায় তাঁর অন্তর ভয়ে পূর্ণ হইয়া উঠিল। দীপঙ্করকে দেখা অবধি উত্তরার জন্য অন্য পাত্র আনিবার কথা তাঁর কল্পনাতেও আসিতে পারে নাই,—এবং শিশু দীপঙ্করের জন্য তাঁর যে স্নেহ ছিল, আজ পুনর্ব্বার তাহা তীব্র হইয়া তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। জগতে আর কোনও আশা কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা নাই,—শুধু উত্তরাকে দয়াময়ী গ্রহণ করুন,—তাঁর কন্যার জীবন সুন্দর, সফল ও সার্থক হইয়া উঠিবে, এর চাইতে মনের আর কী বড় আশা হইতে পারে। এক সময় তাঁর এই মেয়েটীর জন্য তাঁর উদ্বেগের আর অন্ত ছিল না,—এবং যতই কাশীপ্রসাদকে ঘৃণা করুন এবং যত বড় অপদার্থই মনে করিয়া থাকেন,—ইহাকে তাঁর কন্যা সম্প্রদান করা ছাড়া আর কোনও উপায়ান্তরই তাঁর দেখা ছিল না। মনের প্রচণ্ড হতাশায় বরপ্রার্থনা করিয়া উত্তরার ব্রতের ব্যবস্থা করেন। এমন সময় ব্রতমন্ত্রের মধ্য হইতেই যেন তাঁহার উমার যুগযুগান্তের তপস্যার মহাদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—তখন হইতে তাঁর দুই চোখে শুধু আনন্দের এবং বেদনার অশ্রু বহিয়াই চলিয়াছে,—সমস্ত আকাশ সমস্ত আলো, তাঁর সমস্ত মাতৃস্নেহ, বারবার বলিতেছে, ওরে, দেবতার এই ইঙ্গিত উপেক্ষা করিস্ না,—যা হয় হউক,—তোর কন্যার জীবন সার্থক ও সুন্দর করিয়া তোল্।

এখন আর বধূরাণীর ভয়ডর রহিল না। যে শ্বশুরকে তিনি যমের চাইতে বেশি ভয় করিতেন তার ভ্রূকুটী ও ক্রোধের ভয়ঙ্করতা তাঁর মনে রহিল না। স্বামীকে বধূরাণী বুঝাইলেন,—এবং তাঁর যে-স্বামী পিতার মুখের উপর একদিন একটা কথাও বলেন নাই,—তিনিও বুঝিলেন,

দেবতার ইঙ্গিত, কন্যার কল্যাণ তাকে নিয়া গেল পিতার কাছে, তাকে বুঝাইবার, তার মত করিবার আশায়। ঝড় আসিল,—ক্রোধের ঝড়,—শ্বশুরের সমস্ত বিরাগ তার স্বামীর উপর আসিয়া পড়িল। তিনি ভয় করিলেন না, অদৃষ্টকে ধিক্কার দিলেন, কারুর উপর তার অভিমান রহিল না,—গিরিরাজ স্বামী প্রশান্ত মাথা উঁচু করিয়া রহিলেন,—যদি উমার জন্য মহাদেবকে পাওয়া যায় তবে তার ভয় কি,—দুর্ভাবনা আর কিসের জন্য।

ঠিক হইয়া আছে বধূরাণীর স্বামীকে ত্যাজ্য করা হইবে,—পিতার সম্পত্তি হইতে তিনি সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইবেন। তাহাতে দুঃখ নাই, যদি উত্তরা তার উপযুক্ত স্বামী লাভ করে। হয়তো দু'চার দিনের মধ্যেই তাহারা গ্রাম ত্যাগ করিবেন,—স্বামী তো তাই বলিলেন। উত্তরার জন্য তারা সকল সুখ, সকল ভোগ স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া যাইতেছেন,—কিন্তু পাইবে কি উত্তরা তার তপস্যার ধন,—এমন ভাগ্য কি তার কন্যার,—এমন সুকৃতি কি তার পিতামাতার? তবু মনে করিতে ইচ্ছা হয়, সব সার্থক হইবে,—দুঃখ খেদ আর কিছুই রহিবে না। ঈশ্বর সে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন,—উত্তরার ব্রতমন্ত্রের পথ বাহিয়া যে আসিয়াছিল, আজ কন্যার জীবনের সব চেয়ে সন্ধিক্ষণে,—যখন তার পিতার গৃহ রহিল না, অর্থ রহিল না, নির্ভর করিবার কোনও কিছুই রহিল না,—তখনই কি সে মুখ ফিরাইয়া যাইবে? আজ এই দুর্ভাগ্যের মধ্যে দাঁড়াইয়া বধূরাণী প্রার্থনা করিতেছেন আনন্দময়ী তার এই সুলক্ষণা মেয়েটীকে গ্রহণ করুন,—দীপঙ্করের মত ছেলেকে স্বামী লাভ করা ও আনন্দময়ীকে শ্বশ্রূ পাওয়ার চাইতে শুভাদৃষ্ট অন্ততপক্ষে তিনি তার কন্যার জন্য কোনদিনই ভাবিতে পারেন না। এ কি সম্ভবপর নয়? কোনও মতেই কি দুই হইতে পারে না? তবে কেন দেবতা এমন করিয়া অঙ্গুলি তুলিয়া ইঙ্গিত করিলেন,—এমন করিয়া বধূরাণী একাগ্র মনে এ-ইঙ্গিত বিশ্বাস করিবেন,—কেন,—কেন তবে এমন সব জীবনে ঘটিয়া গেল? আজ শুধু সখীত্বের অধিকারে তিনি আনন্দময়ীকে এ প্রস্তাব করিতেছেন তাহা নয়, যাহা তিনি দেবতার ইঙ্গিত বলিয়া বিশ্বাস করেন, সেই তার অধিকার।

কতটা স্নেহ লইয়া দীপঙ্কর তার মনে যায়গা করিয়া বসিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিবার নয়। কন্যা শুধু স্বামীর জন্য নয়, মা ও কন্যার বর প্রার্থনা করিয়া অনেক তপস্যা করিয়াছেন,—সেই তপস্যার মত গ্রামের মধ্যে উপস্থিত হইল দীপঙ্কর,—এ বর যদি জীবনে লাভ না হয়,—তবে, কল্পনা করা যায় না, কী হইবে।

আনন্দময়ীর প্রত্যুত্তরের আশাপথ চাহিয়া প্রাসাদের নিরানন্দ শঙ্কা-উৎকণ্ঠিত আবেষ্টনে বধূরাণী পড়িয়া আছেন,—ঈশ্বরের কাছে বারবার মাথা কুটিতেছেন যেন ব্যর্থতা মৃত্যু-শেলের মত আসিয়া না উপস্থিত হয়…

কতটা আকুলতা, কতটা ভয় যে মায়ের প্রাণে, তাহা বুঝিতে আর কষ্ট হয় না। আনন্দময়ী লজ্জিত হইয়া পড়িলেন,—এমন করিয়া আকুতি করিয়া অন্তত তার কাছে চিঠি লেখার কোন প্রয়োজনই ছিল না। ছেলের যদি মত হয়, তবে উত্তরাকে ঘরে আনিতে কিছুমাত্র দ্বিধাও তিনি করিবেন না,—এমন সুন্দরী যে মেয়ে, এমন সুন্দর যার স্বভাব, এমন যার মা, তাকে পুত্রবধূ করিয়া আনিতে আনন্দময়ীর আগ্রহের অন্ত নাই। শুধু দীপঙ্করকে বুঝাইতে পারিলেই হয়। যেমন একগুঁয়ে ছেলে, কে জানে কী বলিয়া বসিবে! ঈশ্বরের এই ইঙ্গিতের কথা সে কি বুঝিবে না? উত্তরার বাবা ও মা, দীপঙ্করকে পাইবার জন্য কতটা যে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন, ইহার গৌরব, এই ইতিহাসের করুণতা কি দীপঙ্করকে অভিভূত মোটেই করিতে পারিবে না? দীপঙ্কর হৃদয়হীন নয়,—হয়তো সে বুঝিবে,—আনন্দময়ী বারম্বার দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাইলেন যেন দীপঙ্কর অবুঝ না হয়,—এতখানি বিশ্বাসের, এতটা ত্যাগের সে যেন সম্মান রাখে। কিন্তু আনন্দময়ীর ভয় কমিল না। দীপঙ্কর শুধু দেশ বোঝে, আর কিছু বোঝে না। এইবারও যদি সে তেমন কঠিন হইয়া থাকে তবে সর্ব্বনাশের আর অন্ত থাকিবে না।

দীপঙ্কর যখন এ-পত্র পড়িল তখন ক্ষণকালের জন্য তার দুইটা চোখ কেমন উদাস হইয়া উঠিল। মনে পড়িল দাম্ভিক রামনারায়ণের মুখটা, মনে পড়িল তার প্রতাপ,—এবং সবার চাইতে বেশি, মনে পড়িল বধূরাণীও উত্তরাকে।

সেই যে উত্তরা দেবতাকে প্রণাম করার মত তাহাকে প্রণাম করিয়াছিল, সেই যে প্রত্যাখ্যাগত অপমানিত তাহাকে উত্তরা নিজের অঙ্গের আভরণ খুলিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিল,—সেই সব কথা মনে ভিড় করিয়া আসিল। তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া যে একটা তীব্র আশা এবং বিষম দুঃখের কাহিনী ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার জন্য তার নিজের দায়িত্ব কিছু নাই থাকুক, তবু কিন্তু আজ সে উত্তরাকে গভীর ব্যর্থতা ও চিরদিনকার বেদনার মধ্যে ঠেলিয়া দিতে পারিল না। কেমন একটা করুণা হইল, কেমন একটা স্নেহ হইল, কেমন একটা শ্রদ্ধা আসিয়া উপস্থিত হইল,—এবং তার পর দীপঙ্করের রাজী হইয়া যাওয়া খুব কঠিন হইল না। ইহাতে শুধু করুণা এবং স্নেহ নয়, দীপঙ্করও একটা গৌরব বোধ না করিয়া থাকিতে পারিল না। আমাদের পুরাতনপন্থী গ্রামগুলিকে সে নতুনের সন্ধান দিতে চায়,—সেগুলিতে শুধু যে আর্থিক দারিদ্র্যই আছে তা নয়,—মানসিক দারিদ্র্য ও বিষম হইয়া উঠিয়াছে,—গ্রামের মধ্যে নতুন কালের মন্ত্র না পাঠ করিলে তার আর বাঁচিবার উপায় নাই। বধূরাণীর পত্র পড়িয়া দীপঙ্করের মনে হইল যে নতুন কালের ডাক গ্রামের এই অতিপ্রাচীন ও সংস্কারের অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবারের মধ্যে যদি প্রবেশ করিয়াছে, তবে মুক্তির দিন আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় আর জেলে যাইবার প্রয়োজন নাই। দীপঙ্কর অন্য নানা জনহিতকর প্রস্তাব লইয়া পড়িল। পল্লীসংগঠন যে কতটা প্রয়োজন, তার গ্রামের অভিজ্ঞতার পূর্ব্বে এতটা সে বুঝিত না। আজকাল গ্রামকে সে দেশের মস্ত বড় একটা সমস্যা মনে করে। দেশের অধিকাংশ লোক যেখানে বাস করে, তাদের যদি উন্নতি না করা গেল, তবে দেশের কোনও উন্নতিই হইল না বলিয়াই তার মনে হয়। এবং কেন জানি, উত্তরাকে উদ্ধার করাকে ক্রমেই তার গ্রামকে উদ্ধার করিবার রূপক বলিয়া মনে হইতেছে,—উত্তরার নতুনের প্রয়োজন হইয়াছে, অন্ধকারাচ্ছন্ন গ্রামেরও তাই।

উত্তরার কথাও দীপঙ্করের মনে পড়ে। কে জানিত সেই যে ব্রতপরায়ণা উত্তরাকে প্রথম দিন সে দেখিয়াছিল,—যাকে বধূরাণী ঈশ্বরের ইঙ্গিত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন,—তাহা মনে মধ্যে অগোচরে জমা হইয়া গিয়াছিল। কে জানিত উত্তরার কঙ্কণকেয়ূরধ্বনি বারম্বার এমনি করিয়া মনে আসিবে। করুণা হইতে প্রেম দূর নয়,—উত্তরাকে উদ্ধার করিবার গর্ব্ব, উত্তরার জন্য করুণা, উত্তরার পূতপবিত্র আননপদ্ম তার মনকে আবিষ্ট করিল।

শীঘ্রই বধূরাণী ও প্রসন্ননারায়ণের উত্তরাকে লইয়া গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিবার কথা। যাহার জন্য সকল কিছু বিসর্জ্জন দিতেই তারা দ্বিধা করেন নাই, তাহাকে যখন পাওয়া গেল, কিসের আর তবে ভয়, কিসের আর ভাবনা। এবং প্রসন্ননারায়ণকে সম্পত্তিচ্যুত করিবার সংকল্প যতই রামনারায়ণ চৌধুরীর স্থির হইয়া উঠিতে লাগিল, ততই জমিদারের প্রাসাদে বাস করা প্রসন্ননারায়ণ ও বধূরাণীর পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল।

এমন সময় ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের মত একদিন প্রবল-প্রতাপান্বিত জমিদার শ্রীল শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় পরকালের ডাক শুনিলেন, এবং কবিরাজ বৈদ্য আনিয়া যতই না তিনি না শুনিবার চেষ্টা করুন, পরম ডাক তাকে শুনিতেই হইল,—এবং এতকাল হাঁচি ও টিকটিকি মানার দরুণ ও সনাতন ধর্ম্মের নিশান উঁচু করিয়া রাখিবার পুণ্যে তার জন্য যে অনন্ত স্বর্গের ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন,—শুভাশুভ দিন বিচার করা হইল না, এবং আলবোলা বহন করিবার জন্য কোনও চাকরকেই সঙ্গী পাওয়া গেল না।

ঘটা করিয়াই তার শ্রাদ্ধক্রিয়া সুসম্পন্ন হইল—এবং পণ্ডিতেরা যে যেমন বিদায় পাইল সেই অনুপাতে মৃতের গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া বিদায় হইল। হিন্দু পুত্রের স্বভাব অনুসারে প্রসন্নসারায়ণের মনে অনুতাপ হইয়াছিল এই মনে করিয়া যে তার বিদ্রোহই তার পিতার মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করিয়াছে,—এবং এই কল্পিত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য দানধ্যানের সে কার্পণ্য করিল না। গ্রামের লোক ভোজন-তৃপ্ত হইয়া কহিল যে রামনারায়ণ চৌধুরীর মৃত্যুতে একটা ইন্দ্রপাত হইয়া গেল। কাশীপ্রসাদ শীতলাদেবীর সমুখে মাথা খুঁড়িয়া কহিল, দেবী এ কী করিলে,—তোমাকে ভূষণমণ্ডিত

করিবার জন্য এত যে পরিশ্রম করিলাম, এই কি তাহার পুরস্কার। চৌধুরী মশায়কে নেওয়ারই প্রয়োজন হইয়াছিল, তবে অন্তত আর কিছুদিন পরে নিলে আর এমন কি ক্ষতি হইত! দেবীর কৃপায় বরঞ্চ কাশীপ্রসাদের কিছু লাভ হইবার সম্ভাবনা ছিল।

পিতার পারলৌকিক কাজ মিটিবার পর মাসখানেক পরে একদিন প্রসন্ননারায়ণ দীপঙ্করদের বাড়িতে যাইয়া অতিথি হইল। আদায়পত্রের কোনও দরাদরিই কোনও পক্ষ কোনও প্রয়োজন মনে করে না,—তবে দিনক্ষণ ঠিক করিতে হয়, ব্যবস্থা বন্দোবস্ত সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। কিন্তু দেখা গেল দীপঙ্কর সাংসারিক বিষয়ে কম চালাক নয়,—বিবাহে পাত্রপক্ষের যে প্রাধান্য বেশি এটা সে বেশ বোঝে। এবং সবাইকে বিস্মিত করিয়া সে পণ চাহিয়া বসিল,—এবং তার পরিমাণ কম নয়, দশহাজার টাকাকে খুবই একটা বড় অঙ্ক বলিতে হইবে। কিন্তু প্রসন্ননারায়ণের আগ্রহ এত বেশি যে তাহাতেই সে রাজী হইয়া গেল,—যার জন্য সে সমস্ত উত্তরাধিকার ছাড়িতে উদ্যত হইয়াছিল, আজ সুসময়ে তার জন্য দশহাজারটাকা ব্যয় করা তিনি মোটেই বেশি মনে করিলেন না। শুভদিন ঠিক করিয়া তিনি গ্রামে ফিরিলেন। এবং তার ফিরিবার পরই দীপঙ্কর গ্রামের যুবকসঙ্ঘের প্রধানের কাছে চিঠি লিখিল যে, গ্রামের সেই প্রস্তাবিত পাঠশালা স্থাপনের তারা উদ্যোগ করিতে থাকুক,—জমিদার প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরীর কাছ হইতে সম্পূর্ণ দশ হাজার টাকা আদায় করা গিয়াছে।

গ্রামে একদিন বিষম উৎসাহের জোয়ার আসিল। সকলের মুখে এক কথা, জমিদারের কন্যা উত্তরার বিবাহ,—এবং সবার চাইতে বিস্ময়ের, বিবাহ দীপঙ্করের সাথে। জমিদার বাড়ির প্রাঙ্গণে বিশাল সামিয়ানা উঠিল। আসিল মাছ, আসিল পাঁঠা, তরকারির নৌকা আসিয়া ঘাটে ভিড় করিল,—বাজীওলা বাজী প্রস্তুতের ফরমাস পাইল, বাজনাদারেরা মহড়া সুরু করিয়াছে। লোকজন গমগম করিতেছে,—হৈ চৈ এর অন্ত নাই।

অন্দরমহলে শোনা গেল নূপুরের শব্দ। বাহির হইল অনেক জহরত, অনেক মণিঅলঙ্কার,—মেয়েদের কঙ্কণ বাজিল, রসনা ছুটিল। বাজিয়া উঠিল বাজনা, হুলুধ্বনি শোনা গেল—গাঁদা বোমার শব্দে গ্রাম সচকিত হইয়া উঠিল,—বরের নৌকা আসিয়া পৌছিয়াছে ঘাটে।

অঘ্রাণ মাসের এক কুহেলী-আচ্ছন্ন সন্ধ্যায় আজ বহু বৎসর পরে,—অতীতের অতি-গৌরব মধ্যাহ্নদীপ্তির মত চলিয়া যাইবার পর,—আজ সর্ব্বপ্রথম চৌধুরিবাড়ির অনাদৃত নহবৎখানায় সানাইকার গাল ফুলাইয়া ইমনের আলাপ তুলিল···

সমাপ্ত

শ্রীসুবোধ বসু
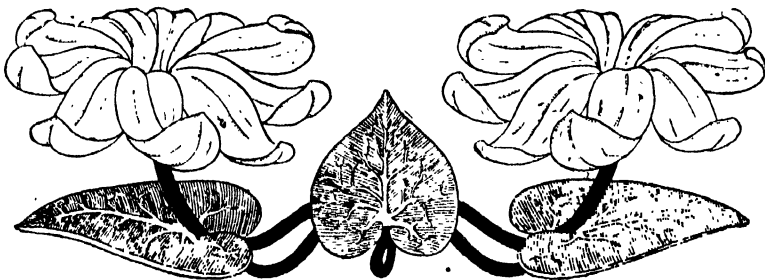
বাংলা গান *

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল B. Sc. (Glas) A. M. I. E.

আপনারা আমাকে এই শাখার সভাপতির পদে বরণ করে সম্মানিত করেছেন। বিব্রতও করেছেন, কারণ সঙ্গীতের কোন্ বিষয় এবং কোন্ দিকটি আপনাদের সামনে ধরলে আপনারা সুখী হবেন, সেটা ঠিক অনুমান করা আমার পক্ষে সুকঠিন। তবে যখন আমার উপর ভার দিয়েছেন তখন দু-চারটি কথা সঙ্গীতের বিষয়ে আমার বলা কর্ত্তব্য।

আপনারা হয়ত আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, সঙ্গীতের ক্ষেত্র অতি বিস্তীর্ণ, আমাদের সংস্কৃত শাস্ত্রের মত বিশাল ও মাতৃস্নেহের মত উদার। কিন্তু সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বিরোধেরও অভাব নেই। কেউ বলেন 'গান গাইলেই হোল, (যে হেতু সঙ্গীত বলতে সাধারণতঃ গানই বোঝায়) গানের আবার অত সুর তাল লয় কিসের? শুনতে ভাল হলেই হল।' কেউ বলেন 'গানের ভাষা ভাল হলেই হল।' কেউ বলেন 'ভাবময় জগৎ, ভাবই মূল।' আবার কেউ এমন পাগলও আছেন যাঁরা বলেন 'সুরই হল গানের প্রাণ, ভাষা ভাল হলে তাতে হয় মণিকাঞ্চনযোগ, আর ভাব ভাল হলে তো কথাই নেই।'

চিন্তা করে দেখলে বোঝা যায় যে, সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা করবার জন্যে সুর শিক্ষাই করতে হয়, ভাষা শিক্ষা করতে হয় না।

যে সুর আবালবৃদ্ধবনিতা নিঃসঙ্কোচে শুনতে বা গাইতে পারেন সেই সুরেই ভাষা যোজনা করলে সেটা ভিন্ন ভিন্ন বয়সের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। যথা প্রেমসঙ্গীত বালক-বালিকার উপযোগী থাকে না, পরমার্থসঙ্গীত যুবক-যুবতীর প্রীতি উৎপাদন করে না, আবার পরকালের সুবিধা না করে দিলে বৃদ্ধরা সে গানকে বাতিল করেন। তাহলে সঙ্গীতজ্ঞের দিক দিয়ে দেখতে গেলে ভাষা হল সুরের নিগড়। এটা সঙ্গীতশিক্ষক মাত্রেই অনুভব করেন। যখন তাঁরা বালক-বালিকাকে গান শেখাতে যান তখন তাঁরা, সুরের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, (সুকবি অতুলপ্রসাদ সেনের) 'বঁধুয়া নিদ নাহি আঁখিপাতে' শেখাবার কথা মনে এলে লজ্জিত বোধ করেন। আবার প্রণয়সঙ্গীতও যুবকদের বিশেষতঃ যুবতীগণকে শেখান এক বিভ্রাট। কারণ বাংলায় হয়ত "কানু ছাড়া গীত নেই" আজ আর খাটে না, কিন্তু সাধারণ হিন্দী গানে বেশীর ভাগ কৃষ্ণ-রাধিকার উল্লেখ আছে আর যেখানে কৃষ্ণ সেখানেই আদিরস। পক্ষান্তরে বৃদ্ধদের গান শোনাতে হলে অকূল পাথারে ভাসতে হয়, কারণ দেহতত্ত্ব বা পরমার্থতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক গান শিক্ষা করার সুযোগ সকলের সচরাচর ঘটে না। আবার জন্মোৎসবে এক রকম, বিবাহোৎসবে অন্য রকম ও শ্রাদ্ধবাসরে আর এক রকম গানের খোঁজ করতে হয়। বংশীবাদক বা বীণকারকে সে ভাবনা ভাবতে হয় না। তিনি মোটামুটি বাছা বাছা রাগের গতিনির্ব্বিশেষে, অর্থাৎ ধিমে বা দ্রুত লয়ে, বাজিয়ে বেশ সুবিধা করে নিতে পারেন। যখন কবি বা তাঁদের পৃষ্ঠপোষকেরা এই কথা বলেন যে, গানের এমন বহুল প্রচার হতেই পারত না যদি না ভাষা সহায়তা করত, তখন সঙ্গীতজ্ঞেরা একথার উত্তরে বলেন যে, কাব্য লেখাপড়া জানা লোকদের জন্যে, যাঁরা সাহিত্যিক তাঁরাই এর রস উপভোগ করতে পারেন। পরন্তু সেই

---

* প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের একাদশ অধিবেশনে গোরক্ষপুরে গত ২৮এ ডিসেম্বর ১৯৩৩ সঙ্গীত শাখার সভাপতি লক্ষ্ণৌ ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের এন্‌জিনীয়ার শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতা আমার দ্বারা লিখিত ও বক্তা কর্ত্তৃক সংশোধিত। বক্তা কয়েক জায়গায় আলোচ্য বিষয়টি পরিস্ফুট করবার জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ অনেকগুলি বাংলা ও হিন্দি গান গেয়ে দেখান। এবং সেগুলির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করে তাদের ভাবের সঙ্গে সুরের কেমন সঙ্গতি বা অসঙ্গতি সেটা বুঝিয়ে দেন। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে সে সব লেখা গেল না, যদিও ফলে বক্তৃতার চেয়ে এই লেখাটী অনেক কম সরস ও চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ হল। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র দে

কবিতাই কবিকে অমর করে রাখে যেটা সুরের সাহায্যে সকলের উপভোগ্য হয়ে ওঠে। একথা সর্ব্ববাদীসম্মত বলে বিবেচনা করতে হবে যে, কাব্য বা ভাষা গানের মুখ্য, উদ্দেশ্যই হচ্ছে কবিতাকে মধুর করে সকলের সামনে ধরে দেওয়া; আর সঙ্গীতের চেয়ে মধুর জিনিস মানুষ বা দেবতা কেউই সৃষ্টি করেন নি, তাই সঙ্গীতের সাহায্য নেওয়া ওরূপ গানের পক্ষে অপরিহার্য্য।

আমরা সকলেই জানি যে, উর্দ্দু কবি জওক, সওদা, ঘালিব প্রভৃতির রচনা এক বিশিষ্ট সুর সম্বলিত হয়ে প্রচারিত হয়ে থাকে, তাকে আমরা ঘজল বলি। তুলসীদাস, সুরদাস, কবীর, মীরাবাই, প্রভৃতির ঐরূপ রচনাকে আমরা ভজন বলি। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতির ঐরূপ রচনাকে আমরা কীর্ত্তন বলি। বাউল, সহজিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের দেহতত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্বের গানকে বাউল, রামপ্রসাদের ভক্তিমূলক শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীতকে রামপ্রসাদী বলি। এই ধরণের সৃষ্টির কাছে সঙ্গীতের দাবী অতি অল্প, কারণ ঘালিবের কবিতা সুরে শুনতে চাইলে—ঘজল, মীরাবাই এর রচনা সুরে গাইতে বললে ভজন এবং চণ্ডীদাস প্রভৃতির পদাবলী ফরমায়েস করলে আমরা কীর্ত্তনই আশা করে থাকি। বলা বাহুল্য এর প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে বৈচিত্র্য ও তালাদির জটিলতা এগুলিকে অতি উচ্চস্তরের অধিকারী করেছে।

ভারতের দুর্ভাগ্য যে সঙ্গীত অনেকদিন যাবৎ শিক্ষিত সমাজ থেকে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে পেশাদার ওস্তাদ ও বাইজীদের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। তাই তার মধ্যে এমন অনেক বিকৃতি এসেছে যা ঐ শিল্পকে বিশেষ অসুন্দর করেছে। কিন্তু বোম্বাইএর সাধু প্রকৃতির নীরব সঙ্গীতসাধক পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডের (ওরফে 'চতুর পণ্ডিত') মত কতিপয় কর্ম্মীর কল্যাণে প্রাচীন হিন্দুস্থানী সঙ্গীতশাস্ত্রের পুনরুদ্ধার, প্রচার ও শিক্ষার্থিদের সুবিধার জন্য স্তরানুযায়ী সাজান শিক্ষাসূচী প্রস্তুত, ও পুস্তক প্রণয়ন, সঙ্গে সঙ্গে সহজ ও সুন্দর স্বরলিপি প্রণালীর উদ্ভাবন, এবং অপর দিকে কতিপয় ইউরোপ প্রত্যাগত প্রতিভাশালী কবির, সেদেশের দৃষ্টান্তে, সমাজ ও পরিবারে সঙ্গীতের চর্চ্চায় উৎসাহী হওয়ায়, উত্তর ভারতে ও বাংলা দেশে সঙ্গীতের চর্চ্চা ইদানীং শিক্ষিত ও ভদ্র সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে। এখন আমাদের জানবার সময় এসেছে যে কি করে বাঙ্গালী সনাতন সঙ্গীতের দিকে অগ্রসর হয়ে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের পাশে এসে দাঁড়াতে পারে। আমার মতে এর এক মাত্রই উপায় আছে, আর সেটা হল পণ্ডিত ভাতখণ্ডের প্রণালী শিক্ষা ও এইরূপ শিক্ষার বহুল প্রচারের ফলে সঙ্গীতজ্ঞদের সৎসাহসের বৃদ্ধি।

বাংলা দেশের সঙ্গীতে কবির ভাষায় হয় সঙ্গীতজ্ঞ সুর যোজনা করেন, নতুবা কবি নিজেই নিজের কবিতা-বাঁধা সুরে বার করেন। আর বাংলা দেশের গায়কেরা ভাব ও ভাষার খাতিরে তাঁদের দেওয়া সুর ও অবিকল গ্রহণ করেন। এতে সঙ্গীতের অনেক সময় মর্য্যাদার হানি হয়। যে জিনিস কবির কবিতায় শোভা পায় সে জিনিস হয়ত সঙ্গীতজ্ঞের গানে শোভা না পেতে পারে। মোটামুটি জানা আছে যে কবিরা নিরঙ্কুশ। তারা বাঁধাধরা নিয়মের আনুগত্যের দায় থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন। কিন্তু সঙ্গীতজ্ঞের সে অধিকার নেই। তাকে মূর্ত্ত ভাষাকে প্রাণময় করে তুলতে হবে। আর এই জন্য তাঁর পক্ষে কাব্যের আনুগত্য ততক্ষণই স্বীকার করা শোভা পায় যতক্ষণ কবির ভাব ও ভাষা দিয়ে গড়া ছবিকে তিনি ধ্যান-গম্য করতে পারেন। যে মূর্ত্তি তিনি ধ্যানে আনতে পারেন না, তাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠার সাহস করবেন কেমন করে? উদাহরণ স্বরূপ আমাদের শ্রদ্ধেয় সভাপতি শ্রীযুক্ত অতুল প্রসাদ সেন মহাশয়ের 'রৈল কথা তোমারি নাথ তুমিই জয়ী হলে' এই গানখানি যদি কোন রসবোদ্ধা সঙ্গীতজ্ঞ, স্বাধীন চিন্তার দ্বারা, নিজের আদর্শে যাচাই করে গাইতে চান, তাঁর পর পর ভাবধারা কি রকম হতে পারে আমরা অনুমান করতে চেষ্টা করি। কবির গানের ভাষা এইরূপ :—

রৈল কথা তোমারি, নাথ! তুমিই জয়ী হলে।
ঘুরে ফিরে এলাম আবার তোমার চরণ তলে।
কুড়িয়ে সবার ভালবাসা,
ভবের ডালে বাঁধনু বাসা,
ঝড় এসে এক সর্ব্বনাশা,
ফেল্‌ল ভূমিতলে—হে নাথ।

পক্ষ আমার গেল ভেঙ্গে,
বক্ষ আমার গেল রেঙ্গে,
তুলতে যারে বলছি মেঙ্গে,
সেই চলে যায় দলে—হে নাথ।

নয়ত তোমার দুয়ার বন্ধ,
আমারই নাথ দুচোখ অন্ধ,
মিছে তোমায় বলি মন্দ,
আজ কে দিল বলে;—হে নাথ।

তাইত তোমায় দেখতে নারি,
দাও হে দেখা হে কাণ্ডারী,
দর্প আমার, দর্পহারী,
ফেলে এলাম জলে—হে নাথ।

আমাদের চোখের সামনে ভবরূপী গাছ দেখতে পাচ্ছি, তাতে ভালবাসারূপী তৃণনির্ম্মিত বাসার ধারণাও হয়, আর নিয়তির সর্ব্বনাশা ঝড়, যেটা ভালবাসার বাসাতে এই ভবের গাছে মানুষকে চিরদিন সুখে থাকতে না দিয়ে দুঃখ ও অশান্তির কঠোর জমিতে আছ্ড়ে ফ্যালে এও আমরা সকলে জানি। তাতে উদ্যমরূপী পক্ষ ভেঙ্গে যায় ও সাহস-রূপী বক্ষ রেঙ্গে ওঠে। এই অবস্থায় সাধারণ লোক ভগবানকেই ডাকে। বৈজ্ঞানিক, সাধক বা কবি এ অবস্থায় অন্য চিন্তা করতে পারেন, কিন্তু সাধারণের পক্ষে দুয়ার খোলা থাকলেই বা কি? পক্ষ ভাঙ্গা যাবে কেমন করে? আর কেবা বলে দিল, কিই বা বলে দিল, আর চোখই বা নষ্ট হল কেমন করে, এই নিয়ে এই পঙ্গু অবস্থায় সাধারণের চিন্তা চল্‌তে পারে না। সাধারণ লোক চেঁচিয়ে উঠে বলবেই:—

"কোথায় তুমি দীনের হরি, দাও হে দেখা হে কাণ্ডারী।" তার পরে এল দর্পের কথা। সাধারণতঃ এই মনে হয় যে, বেদনা ও দলনে এই অবস্থায় সে এত কেঁদেছে যে চোখের জলে দর্প ভেসে গিয়েছে। কারণ সাধারণের মনে এই কথাই উঠ্‌বে যে কাছাকাছি কোথাও জল নেই, আর নড়বার ক্ষমতাও নেই যে সেখানে এখন দর্প ফেলে আসবে। আর যদি সে আগে দর্প জলে ফেলে এসে থাকে, তাহলে এই পড়ার আগেই তাঁর চরণ তলে চলে এলেই হত। তাহলে তো এই অবস্থা আসতই না। তাহলে একটি সুসামঞ্জস্য ছবি পেতে হলে সাধারণ গায়কের জন্য গানখানিকে এই ভাবে বদলে নিতে হবে:—

রৈল কথা তোমারি নাথ…সেই চলে যায় দলে—হে নাথ!
কোথায় তুমি দীনের হরি।
দাও হে দেখা হে কাণ্ডারী!
দর্প আমার দর্পহারী,
গেল নয়ন জলে।

অনেকে বলতে পারেন যে সঙ্গীতজ্ঞদের হাতে পড়ে কবিদের ভাষার অনেক অহেতুক বদলও হতে পারে। যথা, লোকমুখে রবীন্দ্রনাথের 'গানের সুরের আসনখানি পাতি পথের ধারে, ওগো পথিক তুমি আসবে বারে বারে' হয়েছে 'গানের সুরের আঁচলখানি পাতি পথের ধারে, ওগো বঁধু তুমি আসবে বারে বারে।' অতুলপ্রসাদ সেনের 'উঠগো ভারতলক্ষ্মী' গানের 'কাল সাগর কম্পন দরশে' দাঁড়িয়েছে 'কাল সাগর কামান গরজে।' উত্তরে এই বলা যায় যে, যখন সঙ্গীতজ্ঞ জ্ঞানের ও সঙ্গীত-উদ্ভূত ভাবের অধিকারী হবেন, তখন প্রধানতঃ তিনি নিজেই সুরোপযোগী ভাষার সৃষ্টি করে নেবেন, যে ভাষা কাব্য না হয়েও সঙ্গীতের বেশী উপযোগী হবে, কিম্বা নিজের আভিজাত্য অক্ষুণ্ণ রেখে, কবির নিছক দাসত্ব না করে নিজের কার্য্যোপযোগী অংশ বেছে নেবেন। যাঁরা অভিনয়কলা সম্বন্ধে চর্চ্চা করেছেন তাঁরা জানেন যে, প্রতিভাশালী নাট্যকারদের লেখা নাটকে সুযোগ্য অভিনেতা আবশ্যক মত রদ বদল করে অভিনয়ের দিক থেকে নাটকের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করেন। এখানেও সেই একই কারণ বর্ত্তমান। অর্থাৎ, সেটা হয়ত লিখতে কলমে আটকায় না, যা পড়লে হয়ত গ্লানি উৎপন্ন হয় না, তা বলতে হয়ত মুখে আটকায় ও শ্রুতিপটে অত্যন্ত বাজে। সুপ্রসিদ্ধ নট স্যর হেনরি আরভিং কর্ত্তৃক শেক্সপীয়ারের ওথেলো নাটকের পরিবর্ত্তিত সংস্করণ এর দৃষ্টান্ত। আমাদের সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়ও প্রায় প্রত্যেক অভিনীত নাটককে আবশ্যক মত বদলে নিয়ে নাটকের সুনাম বৃদ্ধি করেছেন। এমন অনেক লোক আছেন সত্য যাঁরা শিব গড়তে

বানর গড়তে পারেন, তাই বলে আদর্শ নাট্যকারের নাটকে আদর্শ অভিনেতার পরিবর্ত্তন করবার অধিকার চলে যায় না তেমনই গ্রামোফোন গায়কের ত্রুটির কথা স্মরণ করে আমরা আদর্শ থেকে স্খলিত হতে পারি না। যেমন শেক্সপীয়ারের ওথেলোর পরিবর্ত্তন রামের কাজ নয়, ক্ষীরোদপ্রসাদের নরনারায়ণের পরিবর্ত্তন শ্যামের কাজ নয়, তেমনি রবীন্দ্রনাথ বা অতুলপ্রসাদের গানে পরিবর্ত্তন করা হবে যদুর কাজ নয়। তাই বড় বড় কবির গানে পরিবর্ত্তন করে সেগুলিকে আদর্শ সঙ্গীতের উপযোগী করবার জন্যে ঐরকম প্রতিভাশালী সঙ্গীতজ্ঞের আবির্ভাব আবশ্যক। যখন তা হবে তখন কাঁচা হাতের লেখা স্বরলিপির ঘরে ঘরে আদর হবে না, দুটো গালভরা অর্থহীন 'নাদ ব্রহ্ম' 'ব্যোম' 'পশ্যন্তি' 'বৈখরী' প্রভৃতি শব্দ সম্বলিত কথায় লোকের মন ভিজবে না। সঙ্গীতশেখর, সঙ্গীতকেশরী, সঙ্গীতমেরু, সঙ্গীতকৌস্তভ, সঙ্গীতসাগর প্রভৃতি আখ্যা প্রকৃতপক্ষে সঙ্গীত-অজ্ঞ, বা অসুরেরা পাবেন না।

বাংলাদেশে সঙ্গীত শিক্ষার বীজ গ্রহণ করার জমি অতি উর্ব্বর। এমন বোধ করি ভারতের আর কোন প্রদেশে নেই। এখনও বিষ্ণুপুর ধ্রুপদের মর্য্যাদা রক্ষা করছে। ঢাকা তবলায় নিজের প্রতিভার পরিচয় দিয়ে আসছে। বাংলার ঘরে ঘরে বালক-বালিকা যুবক-যুবতী রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, কাজী নজরুলের গান গেয়ে, সঙ্গীতের চর্চ্চা বজায় রেখে, উঁচুদরের হিন্দুস্থানী সঙ্গীত শিক্ষার সফলতা সম্বন্ধে আশা জাগিয়ে তুলছে। গত দশ বছরের মধ্যে বাংলা নিজের স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করে হিন্দী ঢংকে কোথাও কোথাও বরণ করেছে। *

এবার বাংলা গান কি করলে হিন্দুস্থানী খেয়াল সঙ্গীতের উপযোগী হতে পারে তাই বলবার চেষ্টা করব।

হিন্দুস্থানী সঙ্গীত বলতে বোঝায়, উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত। হিন্দী ভাষার সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নেই। এই সঙ্গীত মাত্র দক্ষিণ ভারতীয় বা কর্ণাটি-সঙ্গীত থেকে আলাদা। বাংলা নিজের ভাষার সাহায্যেই এই সঙ্গীতের অধিকারী হতে পারে। আর সেইদিনই বাংলা, সঙ্গীতে অন্য দেশের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে আমি স্বীকার করব, যেদিন হিন্দুস্থানী সঙ্গীত শিক্ষার বইতে (text book-এ) বাংলা গানও দেওয়া থাকবে, যেমন আজ মারওয়াড়ী, পাঞ্জাবী, উর্দ্দু, ফার্সি ও মারাঠি গান পণ্ডিত ভাতখণ্ডের ক্রমিক পুস্তকমালায় দেখতে পাওয়া যায়। তার জন্য বাংলা গানকে কতকগুলি সর্ত্ত পূরণ করতে হবে, যথা :— *

(১) ভাষার অর্থ সহজে বোধগম্য হওয়া উচিত।

(২) যুক্তাক্ষর ও হসন্ত যতদূর সম্ভব বর্জ্জন করতে হবে।

(৩) কথা অল্প হবে।

(৪) একটির বেশী অন্তরা সাধারণতঃ হবে না।

(৫) একই রাগের চটুল ও গম্ভীর তালের গান আলাদা আলাদা তৈরী করাতে হবে, যাতে বড় ও ছোট খেয়াল ('খ্যাল' নয়) স্পষ্টরূপে চেনা যায়।

(৬) আধুনিক শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুযায়ী রাগ ও রাগিনীর বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে হবে।

(৭) স্বরসঙ্গতি (harmony) বা চালের দিক থেকে ইউরোপীয় সঙ্গীতের আমেজ বর্জ্জন করতে হবে।

হিন্দুস্থানী সঙ্গীত শিক্ষার বহুল প্রচারের জন্য অবিলম্বে কতকগুলি কাজ আরম্ভ করতে হবে, যথা :—

(১) অল্প বয়স্ক বালক-বালিকাদের প্রকৃত সঙ্গীতজ্ঞ দ্বারা স্বরজ্ঞান শেখান উচিত। সেরূপ শিক্ষকের স্বরবোধক হস্ত-

---

* এখানে বক্তা তুলনার জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ, সেকালের ভৈরবী 'বিপদ বারণ তুমি নারায়ণ' ও একালের হিন্দী ঢংএর ভৈরবী 'রৈল কথা তোমারি নাথ', সেকালের বাগেশ্রী 'একি রূপ হেরি হরি, তুমি ধরেছ যোগীর বেশ' ও একালের 'কেমনে জানাব সুখি, কৃষ্ণ কত ভালবাসি' গেয়ে দেখালেন।

* বক্তা দৃষ্টান্তদ্বারা তাঁর এই 'সর্ত্ত'গুলি বিশদ করেন, যেমন নং (২) সম্পর্কে হসন্তপ্রধান গান, গাইবার সময় কেমন বিকৃত হয়ে যায় সেটা, 'আকাশ হতে দিনের আলো' গানটি গেয়ে দেখান। নং (৩) এর দৃষ্টান্তরূপে একই সুরের কথাবহুল একটি বাংলা গান ও অল্প কথার একটি হিন্দী গান গেয়ে দেখান। নং (৫) এর নমুনা স্বরূপ বাগেশ্রী রাগের ধীর গম্ভীর খেয়াল 'মান মনাওয়ে মোরি' ও দ্রুত খেয়াল 'রচি লাওরে, মালিনীয়া' গেয়ে দেখান। (এ দুটি গানই ভাতখণ্ডের ক্রমিক পুস্তক তৃতীয় ভাগে আছে।) নং (৭) সম্পর্কে বলেন যে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত ও ইউরোপীয় সঙ্গীতের স্বর আলাদা।

চিহ্ন জানা একান্ত আবশ্যক। কারণ, শিশুরা চোখে দেখলে সহজেই স্বরের পরিচয় লাভ করতে পারে। *

(২) হারমোনিয়ম বা পিয়ানোর অস্তিত্ব একেবারে ভুলে গেলে চলবে না, তবে ক্রমে ক্রমে এদের বর্জ্জন করতে হবে।

(৩) সহজ খাঁটি সুরের গান ও লক্ষণ সঙ্গীত গ্রামোফোন বা রেডিওর সাহায্যে প্রচার করতে হবে। †

(৪) প্রথম শিক্ষার্থীদের কাছে সঙ্গীতশাস্ত্রের তর্কের বিষয়গুলির অবতারণা না করে ও তাদের তর্ক করতে না দিয়ে, উপযুক্ত প্রণালী অবলম্বন করে ধাপে ধাপে শিক্ষা দেওয়া উচিত।

(৫) হিন্দীর মাত্র বর্ণপরিচয় ১ম ও ২য় ভাগ পড়াতে হবে, কারণ ঐ ভাষাতে অনেক গুণীর রচিত গান, স্বরলিপি ইত্যাদি লিপিবদ্ধ হয়েছে।

(৬) গানের প্রকৃত সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তোলার জন্য অবশ্য পালনীয় নিয়মগুলি ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে।

আমি এটা পরিষ্কার করে দিতে চাই যে, প্রচলিত ভাষা-প্রধান গানের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। আমি তাদের সঙ্গে একমত যারা বলে যে বাংলা দেশে ভাষাপ্রধান গানের আদর বেশী হয়। কিন্তু ভারতের সর্ব্বস্থানেই ভাষা-প্রধান গানই জনসমাজে আদৃত হয়। এ কথা অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, জনসাধারণ প্রকৃত সঙ্গীত বা উচ্চ সঙ্গীতের বোদ্ধা বা বিচারক নয়। সেই জন্য লোকসঙ্গীত কখনও প্রকৃত সঙ্গীতের স্থান দখল করতে পারে না। লোকসঙ্গীতের প্রধান উদ্দেশ্য কোন ভাব বা তত্ত্ব প্রচার বা সরল হৃদয়াবেগের প্রকাশ, একটা বাঁধা একঘেয়ে সুর গানের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব বা ভাব প্রকাশে সহায়মাত্র রূপে ব্যবহৃত হয়। পরন্তু প্রকৃত সঙ্গীতের উদ্দেশ্য সুর, তাল ও লয়ের বৈচিত্র্যে ও বিচিত্র সংযোগে অপূর্ব্ব মাধুরীর সৃষ্টি করা ও তার সাহায্যে মনে নানা ভাবের উদ্রেক করা।*

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, আপনারা যেন আমায় ভুল বুঝবেন না। আমি বাঙ্গালী। বাঙ্গালীর গৌরবে আমিও গৌরবান্বিত বোধ করি। বাঙ্গালীর সবই আমি সুন্দর দেখি। তবে আমি সাহিত্যিক নই, তাই অনেক কথা মিষ্টি করে বলে উঠতে পারি নি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আত্মোন্নতির একই পন্থা আছে, আর সেটা হচ্ছে নিজের ক্রটি দেখা ও সেগুলি পরিহারের চেষ্টা করা এবং উন্নত আদর্শের দিকে অগ্রসর হওয়া। এইজন্য আশা করি, যদি আমাদের বাংলা গানের কোন ক্রটি দেখিয়ে আপনাদের মনে দুঃখ দিয়ে থাকি, তার জন্য আমায় ক্ষমা করবেন। বাঙ্গালী শিল্পী হোক্, বাঙ্গালী সঙ্গীতজ্ঞ হোক্, বাঙ্গালী সৌন্দর্য্যের উপাসক হোক্, বাঙ্গালী সর্ব্ব বিষয়ে ভারতের আদর্শ হোক্, এই আমি প্রার্থনা করি।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল

---

* বক্তা এখানে স্বরগুলির হস্তচিহ্ন দেখালেন। এগুলি লক্ষ্ণৌর সঙ্গীত কলেজের (All India marris College of Hindusthani music এর) প্রিন্সিপাল শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকরের প্রণীত (হিন্দীতে লেখা) 'সঙ্গীত শিক্ষা' ১ ভাগে দেওয়া আছে।

† যে গানের কথায় কোন রাগের লক্ষণ (অর্থাৎ কোন্ কোন্ স্বর লাগে, কোন্‌গুলি লাগে না, বাদী, অনুবাদী, সম্বাদী, বিবাদী কোন কোন্ স্বর, আরোহণ ও অবরোহণে কোন্ কোন্ স্বর লাগে, অপর কাছাকাছি রাগগুলি থেকে পার্থক্য কি প্রভৃতি) বর্ণিত থাকে ও সেই রাগেই গাওয়া হয় তাকে লক্ষণ সঙ্গীত বলে। ভাতখণ্ডে অনেক রাগের বিস্তর লক্ষণ সঙ্গীত রচনা করেছেন। ক্রমিক পুস্তক ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ভাগে সেগুলি দেওয়া আছে।

* বক্তা এখানে হোলির বাংলা ও হিন্দী গান 'এস দুজনে খেলি হোলি' (অতুলপ্রসাদের) ও 'কওন খেলে তো সে' হোরী' গেয়ে ভিন্ন সুরে ভিন্ন রসের সৃষ্টির নমুনা দেখালেন। রামকেলী রাগের (ক্রমিক পুস্তক ৪র্থ ভাগের) 'ভোর কি চিরইয়াঁ' গেয়ে গানের ভাবের সঙ্গে সুরের সঙ্গতির দৃষ্টান্ত দেখান ও ব্যাখ্যা করেন। কথিত ভাষার চেয়েও যে তবলার ভাষা অর্থপূর্ণ সেটা কয়েকটি সহজ বোল বাজিয়ে দেখান। আর বলেন যে গান মিষ্টি করতে হলে (১) মুখ খুলে, (২) স্বাভাবিক স্বরে, (৩) স্বরবর্ণগুলি স্পষ্ট ও সঠিক ভাবে উচ্চারণ করে, গাইতে হবে কিন্তু বেশী হাঁ করলে নাকি আওয়াজ বেরোয়। নানারূপ দৃষ্টান্ত দিয়ে গেয়ে এ সব বুঝিয়ে দেন।

বানপ্রস্থ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র এম্-এ (কলিঃ এবং ক্যান্টাব্)
এ, আর্, সি, এস্, (লণ্ডন), আই, ই, এস্

দিব্যি বালাপোশ্‌টি মুড়ি দিয়ে গড়গড়ায় ধোঁয়া ছাড়্‌ছি আর ভাব্‌ছি Browning যে "A Womans Last Word"এ লিখেছিলেন

"I will speak thy speech, love,
Think thy thought"

সে কথাটি কি আমার আল্‌বোলাসুন্দরীর মর্ম্মবাণী? আমার চিন্তার জোয়ার ভাঁটার সঙ্গে ঠিক্ সুরে তালে মিল রেখে গুড়্‌কিনী কথা কয়। আমি যখন ধ্যানমৌন, সেও তখন মূক। আবার ভাবাবেগে উদ্বেলিত হয়ে যখন মুহুর্মুহু ধূম্রোদ্গার করি সেও অমনি সমসুরে মুখরিত হয়ে ওঠে। যা' হোক্, যখন হুক্কাদেবীর সঙ্গে নিরালায় বিশ্রম্ভালাপ চল্‌ছে এমন সময় ভাইপো এসে একধাক্কায় দিবাস্বপ্নের নেশা চটিয়ে বল্লে,—"খুড়ো, ওঠাও পাল্‌কি!" আমি চমকে উঠে বস্‌লাম। গড়্‌গড়ার নলটা পড়ে গেল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

লেখক পরিচয়

সাধারণতঃ যে সকল ব্যক্তি লোক-চক্ষুর অন্তরালে অবস্থান করতে ভাল বাসেন এই প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র সেই গোত্রের মানুষ। অল্পকাল হ'ল ইনি ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ অবস্থায় কর্ম্ম হ'তে অবসর গ্রহণ করেছেন। যদিও কবিতায় এবং গদ্যে মৌলিক এবং অনুবাদ রচনায় উভয়তই ইনি সিদ্ধহস্ত, তথাপি সাহিত্য-জগতে এ পর্য্যন্ত একরকম অজ্ঞাতবাসই ক'রে এসেছেন এ কথা অত্যুক্তি নয়। মাঝে কবিতা লিখে যেটুকু কবি-খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন তাও স্বনামে নয়, বেনামে। জনপ্রিয় কবি সুরেশ্বর শর্ম্মাই সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র।

বিচিত্রার পাঠকেরা সুরেন্দ্রবাবুর রচনার পরিচয় ইতিপূর্ব্বেই পেয়েছেন—এবার থেকে অধিকতর পাবেন। বিঃ সং

নদীতটস্থ শিলাফলক—মির্জ্জাপুর

উপলপর্ণা গিরিনদী—মির্জ্জাপুর

একটা ভবঘুরে আমার ভিতর বাস করে। সুতায় ঢিল বেঁধে ঘুরালে ঘূর্ণীর সঙ্গে সুতায় টান পড়ে। ঘূর্ণ্যাবেগ যত প্রবলতর হয় দড়ি ছেঁড়ার সম্ভাবনা ততই প্রত্যাসন্ন হয়। তারপর শুভ মুহূর্ত্ত আসে, কেন্দ্রাতীগ গতি কলুর বলদকে উদার মুক্তির মাঝে উদ্দাম করে দেয়।

বাল্যকালে Cowper এর Task এ পড়েছিলাম,—

"Fancy like the finger
of a clock
Runs the great circuit
and is still at home."

অর্থাৎ, ঘোরে কাঁটা চলে ঘড়ি নড়ে না যেমন,
কল্পনায় পরিক্রমা আমারো তেমন।

কিন্তু এই স্বপ্নপ্রয়াণটিকে রেলের পথে চালিত করার ভার কিছুদিন থেকে ভাইপো গ্রহণ করেছেন। তাঁর কল্যাণে এবার আমার বুন্দেলখণ্ড যাত্রা। আলস্য-পঙ্গু দেহের ভারে চির-চলিষ্ণু চিত্ত যখন অচল-প্রতিষ্ঠ, তখন এই রকম একটি ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়া জিন্-বন্দী হয়ে দুয়ারে দাঁড়ালে 'পঙ্গুঃ লঙ্ঘয়তে গিরিম্'।

এখানে একটা কথা বলে রাখি। ছুটি হ'লেই ভাইপো ভ্রমণে বাহির হন। আমি তাঁর চেলা—Don Quixote এর Sancho Panja। এবার তাঁর শারদীয় পূজাবকাশের জয়যাত্রা বুন্দেলখণ্ড অভিমুখে। তথাস্তু। আমি লোটাকম্বল নিয়ে অনতিবিলম্বেই প্রস্তুত হলাম। পন্থবীণার ঝঙ্কার কানে জাগ্‌ল। আর কি ঘরের কোণে মন টেকে?

নদীতটের প্রস্তর স্তর—মির্জ্জাপুর

১১ই অক্টোবর যাত্রারম্ভ। রাত্রি ৮-৩৫এ বম্বে মেলে রওনা হয়ে পরদিন সকালে মির্জ্জাপুরে পৌছলাম। বুন্দেলখণ্ডে যাবার আগে ফাঁকতালে মির্জ্জাপুরে একটু ঘুরে আসার ব্যবস্থা আমাদের ভ্রমণ-পঞ্জীতে ছিল।

Refreshment Roomএ আহারাদির বায়না দিয়ে এবং সহযাত্রী পাচকের জিম্মায় মালপত্র রেখে আমরা দুজনে বাহির হলাম। ষ্টেশনের পিছনেই এক্কার ভিড়। অনেক দেখে শুনে একটি এক্কা সংগ্রহ করা গেল। খুড়া ভাইপোয় ঘোড়ার দিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন ক'রে ত আসন গ্রহণ করলাম। কিন্তু দু কদম চলেই ঘোড়ার পোর মেজাজ্ গেল বিগ্ড়ে। চাবুকের পরে চাবুক, তথাপি 'নট্ নড়ন্ চড়ন্, নট্ কিচ্ছু।' নট্ কিচ্ছু ঠিক নয়। যথেষ্ট লম্ফঝম্ফ, এবং কুপোকাতের প্রস্তাবনা। একেই বলে stumbling at the threshold একেবারে চৌকাঠে হোঁচট্। বোধকরি ঘোড়াটি পক্ষীরাজ-জাতীয়। পুষ্পকসহ ব্যোমমার্গে উড্ডীন হওয়ার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় উদ্‌গ্রীব হয়ে, পিছনের পায়ে ভর রেখে সম্মুখে পদযুগলে পক্ষবিধূননের আস্ফালনে প্রবৃত্ত হ'ল। তখন আমাদের রথ ছেড়ে অগত্যা দাঁড়াতে হ'ল পথে। এক্কান্তর গ্রহণ করা গেল। এবার যাত্রা সহজ, সরল, নিরুদ্বেগ। হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচা গেল। ভাইপোকে বললাম, এ যেন বাক্‌দানের অব্যবহিত পরেই বাক্‌দত্তার প্রকৃতির পূর্ব্বাভাস পেয়ে বিবাহভঙ্গ। একবার মালাবদল হয়ে গেলে আর রক্ষা ছিল না।

আমাদের গন্তব্যস্থান Wyndham ঝরণা। ষ্টেশন থেকে ১০ মাইল দূরে। ছায়াঘন গাছের সারির মাঝখান দিয়ে একটানা পথ। দুধারে বট, আম, তেঁতুল, নিমগাছের শ্রেণী, নাতিশীতোষ্ণ সুমিষ্ট বাতাস, রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ, আর সারা পথখানি ভরা আলোছায়ার আলিপনা। আমাদের এক্কাওয়ালা বৃষস্কন্ধ স্থূলোদর বৃদ্ধ মুসলমান্। দিব্যি গাঁট্টা গোট্টা, নিরীহ প্রকৃতির। টেরা চোখে ঈষদ্বক্রিমদৃষ্টি, কাঁচা-পাকা দাড়ি ফাঁকে ঝক্‌ঝকে দাঁতে কচিৎ গাম্ভীর্য্য-ভেদী একটু হাসির আভাস। ঘণ্টা দেড়েক পরে যথাস্থানে উপনীত হওয়া গেল। নির্জ্জন নদীর ধারে সুগঠিত প্রশস্ত পাকা ডাক্-বাংলা। ছাদে উঠবার সিঁড়ি পর্য্যন্ত আছে। সূর্য্যের উদয়াস্তরাগ, শুক্লনিশীথের জ্যোৎস্নালোক আর কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার উপভোগ করিবার আসন সেই ছাদখানি। অশ্বিনীনন্দন এক্কাবন্ধন হ'তে মুক্তিলাভ করে তৃণচর্ব্বণে প্রবৃত্ত হ'ল, আমরাও গুল্মরাজি ভেদ করে ঝরণার দিকে অগ্রসর হ'লাম। ঝরণাটি বাংলার পাশে। পশ্চিমের পার্ব্বত্যনদী, উপলবহুল বালুকাবিস্তারে স্বচ্ছ নীলাভ ফেনোচ্ছল ক্ষিপ্রধারা। দুই তীরে বিপুলায়তন পাথরের স্তূপ, স্থানে স্থানে স্তরে স্তরে সজ্জিত, হালুয়াইএর দোকানে

ঝর্ণানশীন ফটোগ্রাফার—মির্জ্জাপুর

থাক্-বন্দী খাস্তা-গজার গাদার মত। ঝরণার প্রপাতটি উচ্চ নয়, সুপ্রশস্ত বটে। ধাপে ধাপে নেমে এসে মাঝে মাঝে ছোট ছোট পল্বলগুলি কানায় কানায় ভরে দিয়ে আবার আপনার পথে ছুটে চলেছে। মনের সাধে অবগাহন করা গেল। তারপর শিলাসনে বসে জঠরানলের আপাত

প্রাসাদ সংলগ্ন সরোবরের পরপারে সুরম্য হর্ম্ম্যরাজি—দাতিয়া

তাদের ঠোঁট্ গেল ভেঙে। বুড়ো মুরগীটা বুড়ীরই সমবয়সী হবে। তখন চিলের দল মুরগীটি বুড়ীকে ফিরিয়ে দিয়ে গড় করে বল্লে—'দে বুড়ী আমাদের ভাঙা ঠোঁট জুড়ে দে'। ইচ্ছা হল খান্সামাকে জিগেস্ করি মুরগীটা মেলনি ঠাকুরাণীর কাছ থেকে পেয়েছে কি না। পেটে ক্ষুধার অতৃপ্তি, মেজাজে বঞ্চনার বিরক্তি, তাই ভাইপোকে কিঞ্চিৎ কটূক্তি করা গেল, যেহেতু

নির্ব্বাপন করে ষ্টেশনে ফির্তে বেলা ৩টা বেজে গেল। খাশকাম্রায় হাজ্রি প্রস্তুত। কিন্তু সে অর্দ্ধসিদ্ধ মুরগী নরদন্তের আয়ত্তাতীত। অতএব ঘ্রাণেন নয়, লেহনেন অর্দ্ধ ভোজনং সমাধা হল। এক আইরিশ্ গল্প মনে পড়ে গেল। মেলনি বুড়ীর মুরগী চিলে ছোঁ-মেরে নিয়ে গিয়েছিল। একশ চিল মিলে সেটাকে ছিঁড়্তে ত পার্লেই না, অধিকন্তু

তিনি "গৃহস্থকুকার্"টি সঙ্গে এনেছেন বটে কিন্তু স্মৃতি-দৌর্ব্বল্যবশেই হোক্ বা বুদ্ধিবাহুল্য হেতুই হোক্, ষ্টোভ্টি এসেছেন ফেলে। ভাইপো অম্লানবদনে উত্তর কর্লেন, ভাঁড়ারের ভার খুড়োর উপর, তিনি কেবল পথের পাণ্ডা।

ঝাঁসি

এইবার কানপুর হয়ে ঝাঁসি যাত্রা। কানপুরে ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করে রাত্রি বারটার সময় ঝাঁসির গাড়ী ধরা গেল। দিব্যি আরামে ঘুমিয়ে পরদিন ভোরে ঝাঁসি পৌছলাম। একখানি লিলিপুটিয় ট্যাক্সির বারহাত কাঁকুড়ে তেরহাত বিচি হয়ে মালপত্র ভৃত্যসহ প্রবেশ লাভ করা গেল। ডাক বাংলা মাইল দুই দূরে। সেখানে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রাতরাশ সমাপনান্তে টাঙ্গা-বাহনে সহর প্রদক্ষিণ ও ঝাঁসির কেল্লা দর্শন।

রেলওয়ে প্ল্যাট্‌ফর্ম্—ঝাঁসি

কেল্লাটি পাহাড়ের চূড়ায়। ভিতরে প্রবেশের ছাড়্‌-পত্র সঙ্গে ছিল না, সুতরাং সিংহদ্বারে পৌঁছে ফিরে আস্‌তে হ'ল। তা' হোক্‌, কিন্তু বাহির থেকে দুর্গের বিরাট বিশাল অচলায়তন দেখে মুগ্ধ হ'লাম। আর ওই পাষাণ-ভিত্তির অস্থি-পঞ্জর ভেদ করে যেন ঝিল্লীমন্দ্রে ঝঙ্কৃত হ'তে লাগ্‌ল, —"মেরি ঝাঁসি নেহি দেয়গা।"

গিরিদুর্গ সংলগ্ন হ্রদ—বরোয়াসাগর

"এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত্ত্য ছেয়ে
সব চেয়ে পুরাতন কথা, সব চেয়ে
গভীর ক্রন্দন "যেতে নাহি দিব"। হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।"

রাণী লক্ষ্মীবাই যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছিলেন, প্রাণাধিক ঝাঁসি ছাড়েন নাই। বুন্দেলখণ্ডের 'বঁধু গিয়াছে কিন্তু বৃন্দাবন আছে'। আর বাংলার?

কেল্লায় বহির্মূর্ত্তি দর্শন করে, তার অতীত গৌরব স্মরণ কর্‌তে কর্‌তে টাঙ্গা বাহনে ছুট্‌লাম বাজারের দিকে গুহায়িত বুভুক্ষুর জন্য কিঞ্চিৎ রসদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। ফুলকপি, কলাই সুঁটি, দিব্য গব্যঘৃত ও রন্ধনের অনুপানাদির সঙ্গে ছ'গণ্ডা পয়সায় একটি লোহার উনান কেনা গেল। চুলার কড়া দুটিতে কাঠিম ঝুল্‌ছে, যেন মাকড়িতে মুক্তাফল। আমি ডাক্‌বাংলায় ফির্‌লাম রন্ধনের আয়োজনে, ভাইপো গেলেন মোটরের সন্ধানে। একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে বুন্দেলখণ্ডের দর্শনীয় স্থানগুলি এক সপ্তাহে যতটা পারা যায় ঘুরে দেখা যাবে এই স্থির হ'ল।

পরিচা

দুপুরে খিচুড়ি ভোগে অমৃত পারণা হ'ল। বেলা ৪টার সময় ট্যাক্সিতে পরিচার পয়োবন্ধ (Dam) দেখিবার জন্য

গিরিদুর্গ—বরোয়াসাগর
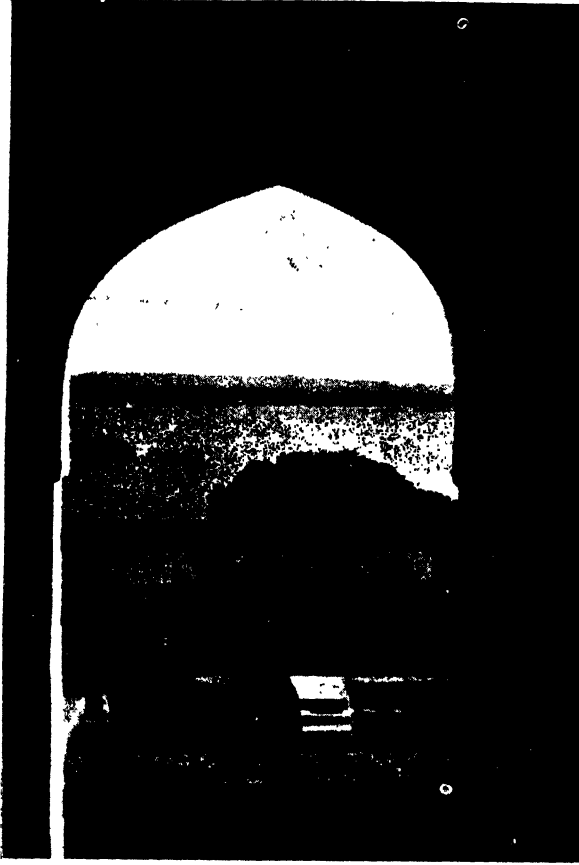
গবাক্ষ হইতে হ্রদের দ্বীপ—
বরোয়াসাগর

বাহির হ'লাম। পরিচা ঝাঁসির থেকে ১৪ মাইল দূরে। বেটোয়া নদীকে এইখানে শৃঙ্খলিত করা হয়েছে। স্থানটি শুন্‌লাম অতি মনোরম। পূর্ত্তবিভাগের (Irrigation Department) একটি সুন্দর ডাক্‌বাংলা সেখানে আছে। হায়, শনিবারের বারবেলায় যাত্রা! নয় মাইল পথ যেতে ছয়বার মোটরের দমবন্ধ হ'ল। তারপর, সাতবারের বার যখন টায়ার ফাট্‌ল সেই জনমানব-হীন প্রান্তরের পথে, তখন ফাল্‌তু চাকাখানা লাগিয়ে সটাং ঝাঁসি ফেরা গেল। আস্তাবল-মুখী ঘোড়ার মত মোটর এক নিঃশ্বাসে আমাদের ডাক্‌বাংলায় হাজির কর্‌ল। পরিচার সঙ্গে এ যাত্রা আর পরিচয় হ'ল না। ট্যাক্সির মালিক আমাদের মিষ্টভাষায় তুষ্ট হয়ে ভাড়ার জন্য আর হাত পাত্‌লেন না। তাহ'লে হাতাহাতি হয়ে যেত। রাত্রিটা ঝাঁসির ডাকবাংলায় কাটিয়ে পরদিন আর একখানি সুস্থ সবল মোটরে দাতিয়া যাত্রা কর্‌লাম।

দাতিয়া

দাতিয়া ঝাঁসির থেকে ১৬ মাইল। সেখানে বিশেষ দ্রষ্টব্য পাহাড়ের উপর রাজা বীরসিংহের

গিরিদুর্গে দেব মন্দির
বরোয়াসাগর

দেবমূর্ত্তি, গিরিদুর্গের ছাদে--
বরোয়াসাগর
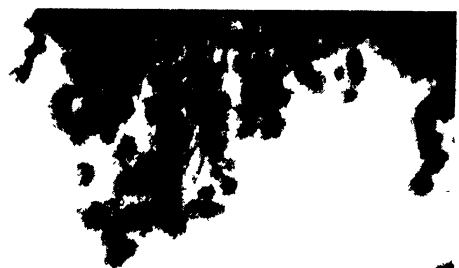
শূন্য প্রাসাদ। সাততলা ইমারত, পাথরে ও ইঁটে গাঁথা। পাহাড়ের নিচেই হ্রদ। বুন্দেলখণ্ডকে মধ্যভারতের Lake District বলা যেতে পারে। সর্ব্বত্রই ছোট বড় সরোবর পল্লীলক্ষ্মীর স্বচ্ছ তরল নীলনয়নের মত। চারিদিকের দৃশ্য অতি মনোরম। দূরে পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় এই রকম কত ছোট বড় দুর্গ প্রাসাদ ও মন্দির চোখে পড়ে।

রাজা বীরসিংহ দেব (১৬০৫-২৬) সম্রাট আকবরের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। কিন্তু যুবরাজ সেলিমের (উত্তরকালে জাহাঙ্গীর) প্ররোচনায় রাজমন্ত্রী ও বিখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল্ ফজ্লের হত্যাপরাধে দিল্লীর বাদশাহের চক্ষুশূল হয়ে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বে আবার পূর্ব্ব গৌরব ফিরে পেলেন বটে কিন্তু সাহ্জাহানের আমলে বিদ্রোহী হয়ে আবার বিপন্ন হলেন। দাতিয়ার এই বিপুল প্রাসাদ বীরসিংহের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। দুঃখের বিষয় এই প্রাসাদে বাস কর্বার সৌভাগ্য তাঁর আর হ'ল না। দাতিয়া সহরটি প্রাচীর বেষ্টিত। এ অঞ্চলের অনেক সহরই এইরূপ প্রাকার-রক্ষিত। বর্ত্তমান্ রাজার বাড়ী লেকের ধারে। বাগানে

স্নানের ঘাট—বরেয়োসাগর

একটি চিড়িয়াখানা আছে। ছাদশূন্য গরাদের ঘেরে সিংহ ও ব্যাঘ্রদম্পতীদের কারা-পরিক্রমা দেখলাম। পিছনে প্রকাণ্ড দীঘি, ওপারে সুদৃশ্য হর্ম্ম্যরাজি।

বরোয়াসাগর

১৪ই নভেম্বর। ডাকবাংলায় ফিরে এসে আহারাদির পরে এবার সাতদিনের সফরে মোটরে বাহির হ'লাম বেলা ৫টার সময়। প্রথম যাত্রা বরোয়াসাগরে। বরোয়াসাগর ঝাঁসির থেকে ১৪ মাইল দূরে। পথের দুধারের দৃশ্য রমণীয়। মাঝে মাঝে পাহাড়ের উপর প্রাচীন মন্দির অথবা প্রাসাদ। বেটোয়া নদীর তীরে যখন এলাম তখন সূর্য্যাস্তের আভা নদীর জলে সোনা ঢেলে দিয়েছে। একটা গাধাবোটে মোটর সমেত নদী পার হওয়া গেল। এবার অন্ধকার বন-বীথি দিয়ে মোটর ছুটে চলেছে। মাঝে মাঝে সুবিস্তৃত মাঠ, মেঘমুক্ত আকাশে সাহাহ্নের শশিকলা, আর মোটরাবেগ সঞ্চালিত স্নিগ্ধমধুর সান্ধ্যবায়ু। এক পাহাড়ের কোলে এসে আমাদের মোটর থাম্‌ল। এই পাহাড়ের চূড়ায় প্রাচীন দুর্গ। দুর্গের একটি কোণ অধুনা জীর্ণসংস্কারে রূপান্তরিত হয়েছে পান্থনিবাসে। এখানে স্থান পেতে হ'লে পূর্ব্বে অনুমতি-পত্র সংগ্রহ করতে হয়। বুড়ো খানসামা বোধ করি চেনাবামুনের কাছে পৈতার খোঁজ নিলে না, বিনা চিঠিতেই আমাদের আশ্রয় দিলে। প্রকাণ্ড সিংহদ্বার। দুপাশে গোলাকার মিনারস্তম্ভ। Torch এর আলোয় পাকদণ্ডী দিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়া গেল। বিশাল বিপুলপ্রাসাদ, জনমানবহীন, যেন দৈত্যপুরী। অধিত্যকায় প্রাচীর বেষ্টিত সুবিস্তীর্ণ চাতাল। পূর্ব্বদিকের ঘরগুলি পান্থশালায় পরিণত হয়েছে। বিলাতী আস্‌বাবে সুসজ্জিত। পশ্চিম দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত সমতল পাষাণ ভিত্তি। পাহাড়ের ঠিক গায়ে লাগা প্রকাণ্ড সরোবর দক্ষিণ দিকে। ছাদে বরাবর দক্ষিণমুখী সমুচ্চ প্রাচীর, তার মাঝে মাঝে মস্ত মস্ত খিলানের খোলা গবাক্ষ। প্রত্যেক ফাঁকের ভিতর দিয়ে হ্রদের অনেকখানি দেখা যায়। প্রতি খিলানটি যেন ফ্রেমে আঁটা হ্রদের একখানি দৃশ্যপট। উত্তরে দেবমন্দির। দেউলে দেবতা নাই। ছাদের দক্ষিণ প্রাচীরের খিলানের পাশে পাশে প্রস্তরমূর্ত্তির ভগ্নাংশ। চমৎকার কারুকার্য্য সেগুলিতে। আহারান্তে ছাদে এসে যখন বসলাম তখন পশ্চিমের আকাশে সপ্তমীর চন্দ্রকলা, আর কী প্রাণ জুড়ান ফুরে ফুরে পশ্চিমে হাওয়া, যেন চাঁদের তরল জ্যোৎস্না বহন করে আকাশ থেকে

চন্দ্রশালা হইতে গৃহীত গিরিদুর্গের একটি কোণ—বরোয়াসাগর

ভেসে আস্‌ছে। অনেক রাত পর্য্যন্ত একখানি চেয়ারে বসে ছিলাম। ধীরে ধীরে কখন প্রাচীরের কিনারে চাঁদ ডুবে গেল। তারপর,

> "কেহ নাই হেথা, তুমি আর আমি,
> অনন্ত বিজনে হে অনন্ত স্বামী।"

অন্ধকারের ধুক্‌ধুকানির মত অস্ফুট ঝিল্লীধ্বনি, আর আকাশভরা তারার ঝল্‌মলে আলো। সেও যেন নক্ষত্র-লোকের দীপ্তিময় ঝিল্লীমন্দ্র।

এই গিরি দুর্গটি ওড়্‌চার রাজা উদৎ সিং (১৭০৫-৩৭) এর আমলে নির্ম্মিত।

পরদিন প্রাতে প্রাসাদ সংলগ্ন সরোবরে অবগাহন করা গেল। হ্রদের বুকে ছোট ছোট দ্বীপগুলি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সম্ভার বহন করে যেন বজরার মত নোঙরবন্দী হয়ে আছে। পাহাড়ের উপর থেকে দুর্গ প্রাচীরের ফাঁকে ফাঁকে এই দ্বীপগুলি নীল জল নীল আকাশ আর পর্ব্বতবন্ধুর বনশ্রীর প্রচ্ছদপটে শ্যামোজ্জ্বল স্বপ্নচ্ছবি। শুধু তরুগুল্মের সমাহার ত নয়, একটা প্রাণময় রহস্যময় বহুস্মৃতি-মুখরিত কুঞ্জবিতান। স্নানের সময় ছোট ছোট মাছের ঝাঁকের সঙ্গে অনেকক্ষণ চোখ খুলে 'কানামাছি' খেলার আনন্দ উপভোগ করা গেল। গামছার জাল মেলে ধরতে গিয়ে কেবল গামছাখানাই বারবার ফিরে পেলাম, একটী খেলার সঙ্গীকেও গ্রেপ্তার করতে পারা গেল না।

নওগাঁ

দুর্গের নিকটবর্ত্তী গ্রাম, ফলের বাগান ইত্যাদি ঘুরে ফিরে দেখে বেলা ৪টার সময় নওগাঁ যাত্রা কর্‌লাম। বুন্দেলখণ্ডের সব চেয়ে বড় সৈন্য-নিবাস (Military Cantonment) ঝাঁসিতে। তারপরেই এই নওগাঁয়ে। এখানে ডাকবাংলায় রাত্রিযাপন করে পরদিন ১৬ই নভেম্বর প্রাতরাশের পর দীর্ঘ পথ উত্তীর্ণ হয়ে ছত্রপুরে বেলা সাড়ে নয়টায় পৌছিলাম। প্রবীন দেওয়ানজি পণ্ডিত চম্পারণ মিশ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল। সঙ্গে পরিচয়-পত্র ছিল। অতি অমায়িক লোক। আমাদের রাজ-অতিথি হওয়ার জন্য অনুরোধ কর্‌লেন। কিন্তু আতিথ্য-সম্ভোগ করবার অবসর কোথা? আমরা খাজুরাহ পৌছিবার জন্য উৎসুক। পথে বিলম্ব না করে যতশীঘ্র সম্ভব যাত্রা কর্‌তে চাই। খাজুরাহ ছত্রপুর ষ্টেটের অধীন। দেওয়ান্‌জি সেখানে বিশ্রাম কুটীরে আমাদের সুব্যবস্থার জন্য পত্র লিখে দিলেন। ছত্রপুর সহরটি মোটরে প্রদক্ষিণ করে আমরা খাজুরাহ অভিমুখে যাত্রা কর্‌লাম। বড় রাস্তা ছেড়ে ঘনগুল্মের মাঝখানে সিঁথিকাটা দুই মাইল পথ উত্তীর্ণ হয়ে বেলা আন্দাজ ১টার সময় মন্দির সংলগ্ন পল্লী-সরোবরের তীরে উপনীত হ'লাম। বিশ্রাম কুটীরে পুরিমিঠায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করে ছুটলাম মন্দির দর্শনে। ভাইপো ক্যামেরায় চিত্রশিকারে মাত্‌লেন, আমি দুচোখে বোবার স্বপ্ন সংগ্রহে তৎপর হ'লাম। (ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র
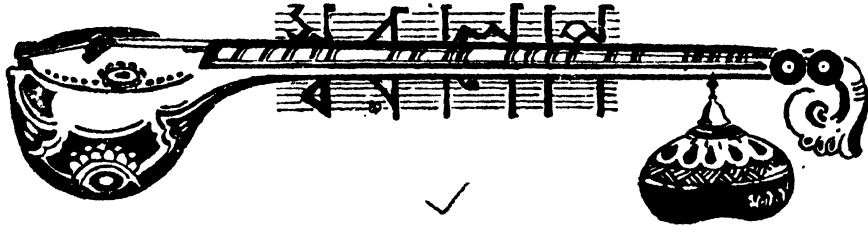
— সন্ধান —

আমার নয়ন তব নয়নের নিবিড় ছায়ায়
মনের কথার কুসুম-কোরক খোঁজে
সেথায় কখন্‌ অগম গোপন গহন মায়ায়
পথ হারাইল ও-যে।
আতুর দিঠিতে শুধায় সে নীরবেরে—
নিভৃত বাণীর সন্ধান নাই যে রে ;
অজানার মাঝে অবুঝের মতো ফেরে
অশ্রুধারায় মজে ॥

আমার হৃদয়ে যে কথা লুকানো, তার আভাষণ
ফেলে কভু ছায়া তোমার হৃদয় তলে ?
দুয়ারে এঁকেছি রক্ত-রেখায় পদ্ম আসন,
সে তোমারে কিছু বলে ?
তব কুঞ্জের পথ দিয়ে যেতে যেতে
বাতাসে বাতাসে ব্যথা দিই মোর পেতে—
বাঁশি কী আশায় ভাষা দেয় আকাশেতে
সেকি কেহ নাহি বোঝে ?

"মহুয়া"

কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শান্তিদেব ঘোষ

ন্‌ -সা -সা II সা -া -রা । সরা -জ্ঞা -রা I সা -া -া । মা -পা -া I
আমা র ন • • য় ৺ • ন • • ত ব •

I মা -া -পা । পমা -ণা ণধা I পমা -গা -া । মা -পা -ধা I
ন • • য় • • নে • • • • র্‌

I মা -মপা মা । জ্ঞরা -গা -গা I রা -রমা -জ্ঞা । রা -সা -রজ্ঞা I
নি বি ড় ছা• য়া য় ম নে র ক থা র

I রা রমা জ্ঞা । রা সা রা I না সা -া । মা -মা -পা I
কু সু• ম কো র ক খোঁ জে • সে থা য়

I পা পা মা । পা ধা ণা I র্সা র্সর্রা র্সণা । ণা ণর্সা ণা I
ক খ ন আ গ ম গো প• ন• গ হ• ন

I ধা পা -া । পা -পধা -পা I মা -গা মা । মা -জ্ঞা -া I
মা য়া র প থ• হা রা • ই

I রা জ্ঞা রা । সা সা রা I সরা জ্ঞা রা । সা -া -া II
ও যে • আ মা র ন• • য় ন • •

জ্ঞা -জ্ঞা -জ্ঞা । -জ্ঞা -া জ্ঞরা I জ্ঞর্মা -জ্ঞর্মা -জ্ঞা । -র্রা -র্সা -র্সা I
আ তু র দি • ঠি তে• •• • শু ধা য়

I র্সর্রা -া র্সা । র্সর্রা -া না I না র্সা -া । -া -া -া I
সে • • নি • র বে রে • • • •

I র্সা -র্সর্রা -র্রা । র্সা র্সনা না I ধা র্সা ণা । ধা -পা -ধা I
নি ভৃ ত বা ণী র স ন্ ধা ন না ই

I না র্সা -া । -া -া -পা I পা ধা ণধা । জ্ঞা র্রা র্সা I
যে রে • • • • অ জা না র্ মা ঝে

I র্সা র্সর্রা র্সণা । -ণা ণা ণা I ধা পা -া । -পধা -মা -া I
অ বু ঝে র্ ম ত ফে রে • • • •

I পা -র্সা ণা । ধা পা ধগা মা -জ্ঞা । জ্ঞা জ্ঞা রসা II
অ • শ্রু ধা রা য় ম জে • আ মা র•

II ণ্া ণ্া -ণ্া । ণা -ণা ণা I সা -া -া । -া -া -া I
আ মা র হৃ • দ য়ে • • • • •

I সা সপা পা । পা পধা পমা I পা দণা ণা । ণধা র্সা ণধপা I
যে ক• থা লু কা নো তা র্ আ ভা ষ ন্

I পধা পা পধা । পা মা জ্ঞা I মা -জ্ঞা -া । জ্ঞা জ্ঞা -রসা I
ফে লে ক ভূ ছা • য়া • • তো মা র্

I সা রা জ্ঞা । রা সা -া I পা পনা না । না -ধা ণা I
হৃ দ য় ত লে • দু য়া রে এঁ • কে

I না র্সা -া । -া -া -া I র্সা -না র্সর্রা । র্সা র্সণা -ণা I
ছি • • • • • র • ক্ত রে খা য়

I গধা	-র্সা	ণা	।	ধা	-পা	ধা	I	ধর্সা	র্সা	ণা	।	ধা	পা	পধা I
প°	°	হ্ন		আ	স	ন্		সে°	তো	মা		রে	কি	ছু°
I মপা	মা	-জ্ঞা	।	জ্ঞরা	জ্ঞা	রসা	I	সা	রা	রজ্ঞা	।	রা	সা	-া I
ব°	লে	°		তো	মা	র্		হৃ	দ	য়		ত	লে	°
I জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	।	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	I	র্রা	র্মা	জ্ঞা	।	র্রা	র্সা	র্রা I
ত	ব	কু		ন	জে	র		প	থ্	দি		য়ে	যে	তে
I না	র্সা	-া	।	না	না	-া	I	না	-া	-া	।	না	না	-া
যে	তে	°		বা	তা	°		সে	°	°		বা	তা	°
I র্সা	-া	-া	।	-া	-া	-া	I	র্সা	র্সর্রা	র্রা	।	-া	র্সা	-ণা
সে	°	°		°	°	°		ব্য	থা	দি		°	মো	র্
I গধা	র্সণা	-া	।	ধা	পা	ধা	I	না	-া	-া	।	না	-না	-া
পে	তে	°		বা	তা	°		সে	°	°		বা	তা	°
I র্সা	-া	-া	।	র্সা	র্সর্রা	র্রা	I	-া	র্সা	-ণা	।	ণধা	র্সণা	-া
সে	°	°		ব্য	থা	দিই		°	মো	র		পে	তে °	°
I ধপা	পমা	-া	।	পা	-া	-ধা	I	পা	-ণা	-ধা	।	ধপা	-া	-া
বাঁ	শী	°		কি	°	°		আ	°	°		শা	°	°
I পধা	মা	-া	।	পা	-া	ধা	I	পধা	ণা	ধা	।	পা	-া	-া
ভা°	ষা	°		দে	য়	আ		কা°	°	শে		তে	°	°
I না	র্মা	-া	।	র্সনা	র্সর্রা	র্রা	I	র্সা	ণা	ধা	।	পা	-মা	-জ্ঞা
সে	কি	°		কে	হ°	না		হি	বো	°		ঝে	°	°
I জ্ঞা	জ্ঞা	রসা	।	সা	-া	-রা	I	সরা	-জ্ঞা	-রা	।	সা	-া	-া II
আ	মা	রা°		ন										

১। বানান-সমস্যা

শ্রীঅমলানন্দ ঘোষ

(এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগ)

বাংলা ভাষার বানান-সমস্যা সমাধান করিবার জন্য কয়েকজন সাহিত্যিক ও ভাষাতত্ত্ববিদ্ মিলিয়া একটি সমিতি গঠন করিয়াছেন জানিয়া সুখী হইলাম। ধুরন্ধরদের সাহায্য করিবার মত বিদ্যা ও উৎকর্ষ আমার নাই। তবে যে কয়েকটি স্থূল সমস্যা মনে হয়, তাহাই লিখিতেছি।

বর্ণমালার সংস্কার আবশ্যক, এ একটি পুরাণো কথা। অন্তঃস্থ 'ব' লইয়া অনেকদিন হইতেই কথা চলিতেছে। ঐতিহাসিক দৃষ্টি লইয়া অগ্রসর হইলে অনেক কথা বুঝা যায়, এই জন্য একটি কথা এখানে বলি। খৃষ্টীয় নবম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর ভারতের সর্ব্বত্র যে সকল শিলালিপি ও তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহার অধিকাংশ হইতেই দেখা যায় যে বর্গীয় 'ব' ও অন্তঃস্থ 'ব' এই দুইটিতে কোনও প্রভেদ নাই। এ বিষয়ে প্রাচ্য, প্রতীচ্য ও মধ্যদেশের মধ্যে কোনও পার্থক্য দেখি না। লেখা যখন একই প্রকারে হইত, তখন উচ্চারণেও কোনও তফাৎ ছিল না বলিয়া মনে হয়, কারণ সাধারণ লোক সংস্কৃত ব্যাকরণের সূক্ষ্ম নিয়ম অনুসারে কোন স্থানে কিরূপ উচ্চারণ করিতে হইবে, তাহা না জানাই সম্ভব। অতএব দেখা যাইতেছে যে এতকাল পরেও অন্তঃস্থ 'ব'কে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবার কোনও কারণ নাই। '৯' সম্বন্ধেও কথাটি প্রযুজ্য।

আরও বহুতর সমস্যা আছে। বাংলা উচ্চারণে 'বাক্য' ও 'বিল্ব' এই দুইটি পদে 'ব'ফলা ও 'য'ফলার কাজ একই, পূর্ব্ব বর্ণের উচ্চারণকে দ্বিত্ব করা। এইগুলিকে বজায় রাখিয়া কি ভাষার জড়তা বৃদ্ধি করিতে হইবে? 'কাজ' ও 'কান' এই দুইটি শব্দকে 'কায' ও 'কাণ' লিখিয়া এখনও অনেকে সংস্কৃতের মানরক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা দেখেন না যে প্রাচীন ভারতের প্রাকৃত নামক কথিত ভাষাগুলি (যাহার একটি হইতে বাংলার উদ্ভব) বহুদিন পূর্ব্বেই এ বিষয়ে সংস্কৃতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল।

এইখানে একটি কথা বলিতে হয়। বাংলা লেখায় উচ্চারণানুগত বানান (phonetic spelling) চালাইবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে। বর্ত্তমান অব্যবস্থিততা দূর করিবার জন্য ইহার অনেকখানি দরকার আছে। কিন্তু বাংলায় যতগুলি ধ্বনি আছে, সবগুলিকে অক্ষরে বাঁধিতে গেলে বানানের সৌকর্য্য বাড়িবে না, বরং আরও অনেক জটিল হইয়া যাইবে। প্রাকৃত 'ও'র হ্রস্ব ও দীর্ঘ দুইটি ধ্বনি আছে। তাহাদের সকলের জন্য কি আলাদা আলাদা অক্ষর আবিষ্কার করিতে হইবে? শুধু স্বরবর্ণে নয়, ব্যঞ্জনেও একটি অক্ষরেরই দুই ধ্বনি হয়। 'উল্টা' ও 'আল্তা' দুইটি কথার 'ল'এর মধ্যে উচ্চারণগত ভেদ অনেকখানি। প্রথম 'ল'টি বেশ কিছু পরিমাণে মূর্দ্ধন্য; দ্বিতীয়টি পুরাপুরি দন্ত্য। এই সকল ধ্বনি দেখাইতে যদি ভিন্ন ভিন্ন অক্ষর ব্যবহার করিতে হয়, তাহা হইলে বাংলা লেখা বিভীষিকাময় হইয়া উঠিবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে উচ্চারণানুগত

বানানের একস্থানে সীমারেখা টানিতে হইবে। সেই সীমা কোথায়, সমিতির পণ্ডিতমণ্ডলী তাহার নির্দ্দেশ করিবেন।

আর একটি কথা মনে হইতেছে। 'প্রগল্‌ভ' প্রভৃতি দু'একটি কথা লিখিবার জন্য যদি 'ল্‌ভ'রূপ একটি অক্ষর দ্বিতীয় ভাগে স্থান পায়, তাহা হইলে, 'বোল্‌তা', 'সল্‌তে', 'বল্‌তে', 'চল্‌তে' প্রভৃতির জন্য একটি 'ল' এবং 'ত' এর সংযুক্ত অক্ষর থাকিবে না কেন? এরূপ আরও অনেক আছে।

শুধু বানানে নয়। পদরচনা (morphology) এবং পদবিন্যাস (syntax) এই দুইস্থলেও অনেক সংস্কার করিবার আছে।

আর একটি কথা বলিয়া শেষ করি। আনন্দবাজার পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় শ্রদ্ধেয় সুনীতিবাবুর একটি প্রবন্ধ পড়িলাম, তাহাতে তিনি রোম্যান অক্ষরে বাংলা লেখা ও ছাপা উচিত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। অনেক কারণে অনেক দিক হইতে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠিবে। আমার মনে হয়, সুনীতিবাবু রোম্যানের যে যে সুবিধা দেখাইয়াছেন, তাহার দু'একটি বাংলা টাইপের সংস্কার করিলেই পাওয়া যাইতে পারে। দু'একবৎসর পূর্ব্বে প্রবাসীতে বাংলা টাইপ্‌ ও কেস্‌ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পড়িয়াছিলাম, তাহা হইতে বাংলা ছাপার জটিলতা সম্বন্ধে কিছু আভাষ পাইয়াছি। একটু চেষ্টা করিলেই অনেকগুলি অসুবিধা দূর করা যায়। হ্রস্ব উ-কার, দীর্ঘ উ-কার, ঋ-কার, হসন্ত-চিহ্ন প্রভৃতি অক্ষরের পাশে আলাদা দিলেই অনেকগুলি অক্ষরকে কেস হইতে দূর করা যায়। প্রবাসীর রক্ষণশীলতা সম্বন্ধে একটা খ্যাতি আছে, কিন্তু কয়েকমাস হইতে দেখিতেছি তাঁহারাই এ বিষয়ে কিছু অগ্রসর হইয়াছেন।

✓ ২। বাঙ্‌লা সাহিত্যে একশত ভাল বই

কাজী দীন মোহাম্মদ বি-এ বি-টি

গত ফাল্গুন সংখ্যা 'প্রবাসী'তে অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয় "বাঙ্‌লা সাহিত্যে একশতখানি ভাল বই"য়ের তালিকা প্রকাশিত করিয়া "সাহিত্য-জগুতে" নাকি "এক অভিনব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছেন" এবং উহা নাকি তাঁহার "অত্যন্ত দুঃসাহসের কাজ হইয়াছে" ইহাই আমাদের রমেশচন্দ্র দাস মহাশয়ের অভিমত। কিন্তু সেই দুঃসাহসিক কাজে তিনি নিজে আবার যোগদান করিয়া অসম সাহসের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি ঝালে, ঝোলে, অম্বলে প্রিয়রঞ্জন বাবুকে কিছু মিষ্টিমুখ (?) করাইয়া নিজে আর একখানি পাল্টা তালিকা প্রস্তুত করিয়া বসিয়াছেন (বিচিত্রা-আষাঢ়)।

উভয় বাবুর বাছাই করা একশতখানি বাঙ্‌লা পুস্তকের নাম (ভাল করিয়া হিসাব করিলে প্রায় দুইশতখানি হইবে) আমরা দেখিয়াছি (আমরা'র ভিতরে যিনি না আসিতে চাহেন তিনি সসম্মানে সরিয়া পড়িতে পারেন)। এই প্রসঙ্গে রমেশবাবু প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছেন যে তাঁহার একটী ছোটখাট রকম পুস্তকাগার আছে—ইংরাজী, জার্ম্মানী ও ফরাসী ভাষায় লিখিত পুস্তক নাকি তাহাতে স্থান পাইয়াছে। আমার যখন বড় একটা কিছুর দোহাই দিবার নাই—এমন কি বাঙ্‌লা সমস্ত বইগুলি পড়িয়াছি এরূপ বলিবার মনের তেজও যখন আমার নাই তখন অন্ততঃ ত্রাহি মধুসূদনের একটা ইংরাজি বোল ঝাড়িয়া আপনাদিগকে একটু ভড়কাইয়া দেওয়াই শ্রেয় মনে করিতেছি। অনুরোধ, 'স্বদেশী' যাঁহারা তাঁহারা যেন ইংরাজী দেখিয়া আমার সহিত নন্‌কোঅপারেশান করিয়া না বসেন!

"No book has a right to exist which has not for its purpose the betterment of mankind by affording either useful information or healthful recreation." ইহার বাঙ্‌লা তর্জ্জমা করিয়া আমার মুরোদ বাড়াইতে চাহি না। আমার মতে পুস্তক নির্ব্বাচনের 'ভাল'র মাপকাঠী যে কী হওয়া উচিৎ তাহা এই ইংরাজী বাক্যটীর মধ্যেই পাওয়া যাইবে। রমেশ বাবুর মত আমিও বলি, Yes, "Prolificity is a sign of genius" এবং পুস্তক নির্ব্বাচনে "অক্লান্তকর্ম্মী সাহিত্য

সেবীদিগের প্রাণপাত পরিশ্রমের" দানকেই উপরে স্থান দিতে হইবে।

আমার বক্তব্য শুধু এইটুকু যে আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী নির্ব্বাচকেরা যদি একটু বিবেচনা করিয়া কয়েকখানি (উ) বাদ দিয়া শেরে হিন্দ ৺অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহোদয়ের "সিরাজুদ্দৌলা" মোওলানা আকরাম খাঁ সাহেবের "মোস্তফা চরিত" ৺অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের "ভক্তিযোগ" এয়াকুব আলি চৌধুরী সাহেবের 'শান্তিধারা' প্রভৃতি কয়েকখানি (ই) (ঐ, জী) এবং (প্র) গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে ভাল হইত। আর যে সব উপন্যাস, তাঁহারা তালিকায় স্থান দিয়াছেন মোহাম্মদ কাসেমের 'আগামীবারে সমাপ্য' বোধ হয় তাহাদের মধ্যকার খুব কম উপন্যাস হইতে নিকৃষ্ট। সমাজ সংস্কারক 'আগামীবারে সমাপ্যে'র ভাষার উপমালঙ্কারগুলি বাস্তবিকই বাঙ্‌লা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।

"ঠাকুর ঘরে কে? কলা খাই না" এইরূপ ধারণা যদি আপনারা না করেন তাহা হইলে আমি একটু সাফাই দিতাম—সেরকম সাফাই পূর্ব্ববর্ত্তী দুইজন লেখকই দিয়াছেন—তাঁহারা ব্যক্তি বা গ্রন্থবিশেষের বিজ্ঞাপন তৈয়ারী করেন নাই। আমিও বলি যে আমি শতকরা ৫৫এর দাবী লইয়া "মোস্তফা চরিত" "শান্তিধারা" ও আগামীবারে সমাপ্যের নাম, করিলাম না। প্রফেসর জে, এল ব্যানার্জ্জির মতে বাঙ্‌লা ভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক মোস্তফাচরিত—আচার্য্য রায় উহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। "শান্তিধারা" চারুবাবুর "সওগাত" প্রভৃতি পুস্তক হইতে কোন প্রকারে খাটো নয় শান্তিধারা ও সওগাত ঢাকা বোর্ডের আই-এ ক্লাসের পাঠ্য ছিল। আর আগামীবারে সমাপ্যের পরিচয় আনন্দ-বাজার, অমৃতবাজার, বসুমতী প্রভৃতি পত্রিকায়ও পাওয়া যাইবে। নির্ব্বাচকেরা নজরুল ইস্‌লাম ও কবি জসীমউদ্‌দিনকে স্থান দিয়াছেন—তাঁহারা হয়ত অন্যান্য কোন মোসলমানের বই পড়েন নাই—তাই তাঁহারা স্থান পান নাই, এইটাই আমাদের দুঃখ।

সহস্র সহস্র বহুমূল্যবান দলিল দস্তাবিজ নথিপত্র ঘাটিয়া ঘুটিয়া অজস্র অর্থব্যয় করিয়া অক্লান্ত কর্ম্মী অক্ষয় বাবুর সিরাজুদ্দৌলা ও আকরাম খাঁ সাহেবের মোস্তাফা চরিত লিখিত হইয়াছে। মোস্তাফা চরিত লিখিতে যে কত আরবী, উর্দ্দু ও ইংরাজী পুঁথি ঘাটিতে হইয়াছে তাহা অনুমান করিবার ক্ষমতাও অনেকের নাই। মোস্তফা চরিত বাঙ্‌লা ভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইতিহাস। অক্ষয়বাবুর চোটে অন্ধকূপ হত্যা উড়িয়া গিয়াছে, বাঙালীর কলঙ্ক-মোচন করিয়া তিনি ঐতিহাসিকের উপর মাতব্বরী করিয়াছেন। সিরাজুদ্দৌলা একশতখানি বাঙ্‌লা পুস্তকের মধ্যে স্থান পাইবার উপযুক্ত নিশ্চয়ই। বিশখানি ভাল বইয়ের ভিতরেও উহা স্থান পাইবে।

আমার শেষ কথা এই যে এক একজনের নিকট এক একখানা বই ভাল লাগিবে ইহা স্বাভাবিক। অতএব এরূপ নির্ব্বাচনে যিনি প্রথম হাত দিয়েছিলেন (মন নয়) এখন দেখিতেছি তিনি একটি অপকর্ম্ম করিয়া বসিয়াছেন। বাঙালী সমাজ অনেকদিন পর্য্যন্ত ইহার জের টানিবে। ছিরু না হারু খ্যাপা আবার একশতখানি মন্দ বইয়ের তালিকা প্রস্তুত করিয়া বসিয়াছে (ভারতবর্ষ—আষাঢ়)। ইহাকেই বলে Danger of setting the ball rolling on (ফুটবল খেলোয়াড়েরা ভয় পাইবেন না) আমি সাহিত্যিক নই—মনের কথা গুছাইয়া বলিতে না পারিলে কি নীরব থাকা ভাল? লক্ষ্মী পড়ুয়ারা কথাগুলি গুছাইয়া লইয়া বিবেচনা করিলে আমি নিজেকে সার্থক মনে করিব।

৩। বাঙালা বিধবার বৈশিষ্ট্য

শ্রীরাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাদ্র সংখ্যায় বিচিত্রায় শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু, এম, এ মহাশয়ের বাঙালী বিধবার বৈশিষ্ট্য বাস্তবিকই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

তাঁর প্রশ্ন হইতেছে বাঙলায় বিধবারা এতদিন ধরিয়া তাঁহাদের যে বৈধব্যের বৈশিষ্ট্য পালন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের বেশভূষা ও আহারের মধ্য দিয়া, তাহা এখনও

বাঙলায় বলায় "রাখ্‌বার বিশেষ দরকার আছে কি?" তিনি বলেন বাঙলার বাহিরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বিধবা সাধারণতঃ সধবার মতনই পোষাক ও আভরণ পরে থাকে, আর বাঙলায় আভরণহীন, বর্ণহীন, এবং সাধারণতঃ অন্তর্ব্বাস শূন্য বিধবার পোষাক তাহার হতভাগ্যটাকে সমাজে ঘোষণা করে। এজন্য বসু মহাশয় দায়ী করিতেছেন হয়তো সমাজকে এবং ইহার জন্য সমাজের উপর "নিষ্ঠুর" বিশেষণটী আরোপ করিতেছেন। এ বিষয়ে বসু মহাশয়ের সহিত আমার বিশেষ মত ভেদ নাই, কারণ বাঙলা সমাজের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙলা সমাজের প্রথম স্তরে সমাজ ছিল বড়ই নিষ্ঠুর এবং তাহার শাসনপাশও ছিল বড়ই কঠোর। তখনকার সমাজ ব্যক্তিতন্ত্রতার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া মানবের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য হরণ করিয়া কঠোর ভাবে আপনার প্রভুত্ব জাহির করিত। সে যুগে স্বামীর চিতায় স্ত্রীকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পুড়াইয়া মারা হইত। তারপর যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের ফলে রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি মনীষীগণের কৃপায় সতীদাহ প্রথা তিরোহিত হইয়া বিধবাদিগকে প্রাণে বাঁচান হইল বটে কিন্তু তখনও তাহাদিগের জীবন জেলখানার কয়েদীর মত পোষাক পরিচ্ছদে, আহার ও বিহারে নানারকম বিধি নিষেধের ডোরে বদ্ধ করিয়া নজরবন্দী করিয়া রাখা হইল। অবশ্য ইহার পশ্চাতে সমাজ শৃঙ্খলার জন্য নানারকম ধর্ম্মশাস্ত্রের যুক্তি আছে এবং তাহার উপকারিতাও অস্বীকার করা যায় না। তারপর অধুনা নারীসমাজের তৃতীয় যুগ আরম্ভ হইল বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনে। এটাকে আমরা নারী প্রগতির যুগ বলিতে পারি। গত পাঁচ সাত বৎসরের মধ্যে নারীদের মধ্যে বেশ একটা যুগান্তর আসিয়া গিয়াছে। নারীরা, বিশেষতঃ কুমারী ও সধবারা' এখন তাহাদের পুরাতন পর্দ্দা ফেলিয়া দিয়া গৃহের বাহিরে আসিয়াছেন এবং সময় সময় পুরুষদের সহিত প্রতিযোগিতায় নামিতেছেন। এ যুগে প্রবর্ত্তন হইল সহপাঠ, সরদাআইন প্রভৃতি আরও কত কি। শুধু ফাঁকে পড়িলে বেচেরা বিধবাদের দল। তাঁহারা এখনও তাঁহাদের বৈচিত্র্যহীন জীবনটাকে একই ভাবে চালাইয়া লইয়া যাইতেছে, তাই এখন দরকার ইহাদের কিছু পরিবর্ত্তন। ইঁহাদের বৈধব্যের শ্রীহীনতার দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া দয়ারসাগর ঈশ্বরচন্দ্র পূর্ব্বে একবার ইঁহাদের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছিলেন। আর আজ ইঁহারা আমাদের শ্রীযুক্ত বসু মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন।

যাহা হউক বর্ত্তমান যুগটীর দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে এইটী বিশেষ করিয়া ব্যক্তিস্বতন্ত্রতার যুগ। এই যুগে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য অল্প অল্প করিয়া সমাজ দিতেছে মানুষকে ফিরাইয়া, কাজেই এই পরিবর্ত্তনশীল যুগধর্ম্মের সহিত সামঞ্জস্য বজায় রাখিতে হইলে সনাতনী প্রথার কঠোর পাশ শিথিল করিতে হইবে এবং ইহার জন্য অবশ্য সুরুচি এবং সুনীতি বজায় রাখিয়া যদি ব্যক্তিগত ভাবে সনাতনী বেশের পরিবর্ত্তন চান তা তাঁহারা পাইবেন এবং সমাজ তাহার রোধ করিবে না। অপর দিক হইতে দেখিতে গেলে, অর্থ নৈতিক বিপর্য্যয়ে, পর্দ্দা প্রথার তিরোধানে যুগধর্ম্মের ফলে আরও নানাকারণে সকল শ্রেণীর নারীদের অনেক সময়ে বাহিরের পুরুষদের সম্মুখীন হইতে হয় এবং সময় সময় বাহিরের নানাকর্ম্ম প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে হয়। সে ক্ষেত্রে তাহাদের সনাতনী বৈশিষ্ট্য সম্বলিত বেশ ধারণ করিয়া সমাজে নামা চলে না, কাজেই দরকার পোষাকের সংস্কার। এখন এ ক্ষেত্রে পোষাক পরিচ্ছদ এমন হওয়া দরকার যাহা সাধারণ লোকের চক্ষে অপ্রীতিকর হইয়া উঠে না বা মনে ঘৃণার বা লজ্জার মনোভাব উদ্রেক করে না। অবশ্য ইহার জন্য আমি বলি না যে সাধারণের প্রীতিকর হইয়া উঠিবে বলিয়া বিধবাদের এয়োতির চিহ্ন শাঁখা সিঁদুর পরিতে হইবে। এইখানটায় শ্রীযুক্ত বসু মহাশয়ের সহিত একমত হইতে পারিলাম না কারণ তিনি বলেন "বিধবার সিঁদুর না থাকাটাও কেহ কেহ বিসদৃশ মনে করছে" এবং "মহারাষ্ট্রে কেহ কেহ বিধবাকেও সিঁদুর পরাবার জন্য আন্দোলন কচ্ছে"। সমাজে বিধবা সধবা ও কুমারীর মধ্যে পার্থক্য রাখিবার জন্য যাহা আবশ্যক তাহার ব্যতিক্রম না হয় বা বিধবার ব্যক্তিগত ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি না যায় তাহা

হইলে পোষাক ও আভরণ পরিবর্ত্তনের বিপক্ষে আমি নাই।

২

দ্বিতীয় প্রশ্ন হইতেছে বিধবাদের আহার লইয়া। বিধবাদের আহারের পার্থক্যের মূল উদ্দেশ্য, উহাদের ব্রহ্মচর্য্য ব্রতপালনের সহায়তা করা, কাজেই মুনিঋষিরা তাঁহাদের জন্য বিশেষ আহারের বিধি দান করিয়া গিয়াছেন। এখন উঁহারা যদি বৈধব্য-ব্রত পালন করিতে চান তাহা হইলে ব্রহ্মচর্য্য পালন আবশ্যক ও তাহা রক্ষার জন্য খাদ্যের এমন কিছু পরিবর্ত্তন করা উচিৎ নয় যাহা উঁহাদের উক্ত ব্রতের ব্যাঘাত জন্মায়। তবে খাদ্যাখাদ্যের বিচার কালে ব্যক্তি বিশেষের শারীরিক ও মানসিক সাধারণ অবস্থা (constitution) স্থানীয় জল বায়ুর প্রভাব (climatic effect) এবং জাতিগত বৈশিষ্ট্য (Racial peculiarities) বিবেচনা করিতে হইবে। একই দেশে একজনের পক্ষে যে খাদ্য মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা রক্ষা করে অপরের পক্ষে হয়ত তাহা নাও করিতে পারে, আবার একদেশের খাদ্য অপর দেশের পক্ষে ব্রত পালনের প্রতিকূল হইতে পারে, এবং ইহাও পরীক্ষাদ্বারা দেখা গিয়াছে যে বাঙলা সাধারণতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ তাই এখানে আমিষ ভোজন ব্রতাদিপালনের অনুকূল নহে। এই সব বিবেচনা করিয়া শাস্ত্র বিধবাদের জন্য যে বিশেষ আহার ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার পরিবর্ত্তন না করাই ভাল; তবে যদি কোন ব্যক্তি বিশেষের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা (constitution) নিষিদ্ধ আহার গ্রহণে তাঁহার সংযম রক্ষার প্রতিকূল না হয় বা শরীর রক্ষার্থ উক্ত নিষিদ্ধ আহার আবশ্যক হয় তাহা হইলে কাহারও আপত্তি থাকা উচিত নহে। এবং আমি ব্যক্তিগত ভাবে উহা সমর্থন করি।

৪। "ছালাম"

এ, কে, এস্, যহীরউদ্‌দীন আহ্‌মদ সৈয়দী

ইসলাম ধর্ম্মমতে একজন মুসলমানের সহিত অন্য একজন মুসলমানের দেখা হইলে অথবা একজন অপর জনের নিকট বিদায় লইতে হইলে তাহাদের পরস্পরকে দোয়া করিতে হয়; এই দোয়াই ছালাম। ছালাম কথা বড়ই ছওয়াবের কাজ। ছালাম দ্বারা নেকী (পুণ্য) লাভ ও (গোনাহ (পাপ) মাফ হয়। মুসলমানের মধ্যে আদবকায়দা এবং একে অন্যের মধ্যে মহব্বৎ (ভালবাসা) এই ছালাম দ্বারাই ঠিক থাকে।

এক জনের সহিত অন্য একজন পরিচিত কি অপরিচিত মুসলমানদের দেখা হইলে বা তাহার নিকট হইতে বিদায় লইতে হইলে প্রথমেই—"আচ্ছালামু আলায়কুম" অর্থ আপনার উপর খোদাতালার শান্তি হউক বলিতে হয়।

যাহাকে ছালাম করিতে হইবে তাহারও এই বলিয়া উত্তর দিতে হইবে "ওয়াআলায়কুম্ ছালাম্" অর্থাৎ আপনার উপরও (খোদাতালার) শান্তি হউক। সময় সময় সংক্ষেপে উত্তর দিতে হইলে কেবল "ওয়ালাইকুম্" বলিলেও চলে। ইহার অর্থ তোমার উপরও (খোদাতালার শান্তি) হউক। ইহাদের সহিত "ওয়ারাহ্‌মাতুল্লাহে" অথবা "ওয়ারহম-তুল্লাহে বারাকাতাহু" যোগ করিয়া বলিবার নিয়মও আছে। ইহার অর্থ—খোদাতা'লার স্নেহেরবাণী ও বরকৎ হউক। এই প্রকার ছালাম আরও ভাল। ছালাম করা ও লওয়ার সময় হাত উঠাইতে ও মাথা নোওয়াইতে হইবে না, কিন্তু বিনয়ের ভাব দেখাইতে হইবে। মাথা নত করিয়া ছালাম করা অন্যায়, কারণ আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও নিকট মানুষের মাথা নত করা যায় না।

অমুসলমানকে শুধু আদাব বলিলেই চলিবে কারণ আদাব শব্দ সকলেরই উপর চলিতে পারে। যেমন গুরুজনকে আদাব করা।

আমাদের আলেম সমাজ ছোট বড় প্রত্যেককেই উল্লিখিত ছালাম দেবার জন্য আদেশ করিয়া থাকেন, কিন্তু আমি বলি ইহা সম্পূর্ণ অন্যায়, কারণ ছেলে বাপকে, কোনে

প্রকারেই ছালাম দিতে পারিবে না। এই প্রকারে মাতা এবং অপর পূজনীয় ব্যক্তিকে কখনই ছালাম দেওয়া আমি অনুমোদন করিতে পারি না কারণ ছালাম সমবয়স্ক এবং অপরিচিত মুসলমানকেই দিতে হইবে—অতি নিকটের জন আর পূজনীয় ব্যক্তিকে শুধু "কদমবুচি" করিতে হইবে অন্যথায় ছালামের মর্য্যাদার হানি হইবে ইহা নিশ্চিত। এ বিষয় আমি মুসলমান আলেম সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। চিরকাল একঘেয়ে ভাব পরিহার করিতে আমি তাহাদিগকে আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি; ভবিষ্যৎ তাঁহারা যেন ছালামের মর্য্যাদার হানি না করেন।

৫। সাহিত্যে প্রাদেশিকতা

শ্রীস্বরূপ গুপ্ত

কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত সাহিত্যে কথ্যভাষা চালানো যাবে কিনা এই নিয়ে মহাগণ্ডগোল চলছিল। এখন যে সে গণ্ডগোল একেবারে মিটে গিয়েছে তা নয়, তবে অনেকটা কমে গিয়েচে। আজকাল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের প্রায় সকলেই কথ্যভাষায় লিখতে সুরু করেছেন এবং অদূর ভবিষ্যতে হয়ত' কথ্যভাষাই একমাত্র লেখ্যভাষা হয়ে দাঁড়াবে। বর্ত্তমানের সাধুভাষা এখন সাহিত্য পরিষদে স্থানলাভ ক'রবে। কথ্যভাষা সাহিত্যে ব্যবহার করা ভালো কি মন্দ সে আলোচনা এখানে ক'রব না। সাহিত্যে প্রাদেশিকতা সম্বন্ধে আমার কিছু ব'লবার আছে।

রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী মহাশয়-ই ব'লতে গেলে এই কথ্যভাষা সাহিত্যে প্রথম চালান। এঁরা দুজনেই পশ্চিম বঙ্গের ভাষাতেই সাহিত্য-চর্চ্চা করে এসেছেন এবং এঁদের অনুসরণকারী লেখকরাও তাই করেছেন। কিন্তু গত কয়েক বৎসর থেকে দেখা যাচ্ছে কয়েকজন পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্যিক ঐ অঞ্চলের ভাষাকে বঙ্গসাহিত্যে স্থান দেবার চেষ্টা করছেন। মুসলমান লেখকদেরও ফারসী আরবী শব্দ বাংলা লেখায় চালাবার উৎসাহ দিন দিন বেড়ে চলেছে। এই রকম বিভিন্ন দেশের ভাষায় যদি সাহিত্য সৃষ্টি চলে তা'হ'লে সাহিত্য ক্রমে সঙ্কীর্ণ হয়ে আসবে। এক দেশের লেখকের লেখা কেবল মাত্র তাঁর স্বদেশবাসীই বুঝতে পারবেন—সমস্ত বাংলাদেশের লোকের জন্যে তা নয়। কাজেই একটা standard book language থাকা দরকার নয় কি? এখন কথা উঠবে কোন্ দেশের ভাষাকে standard বলে ধরা যাবে? আমার মনে হয় পশ্চিম বঙ্গের ভাষা যেমন প্রসারতা লাভ করেছে তাতে একেই standard করা যেতে পারে।

এ বিষয়ে মতামতের জন্যে সাগ্রহ প্রতীক্ষায় রইলুম।

উল্কা

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই সি এস্

তারকার বক্ষ হতে মুক্ত হয়ে বিপুল প্রয়াসে
উদার ব্রহ্মাণ্ড মাঝে বাহিরিলে কী অতৃপ্ত আশে।
ত্রিভুবনে কোনোদিন কোনোখানে বাঁধিলে না ঘর—
সুনিবিড় পরিচয়ে কারো 'পরে হলে না নির্ভর।
অনিশ্চিত যাত্রাপথে বুকে লয়ে আগুনের জ্বালা
বাহিরিলে বালা!
অক্ষ নাই, কক্ষ নাই, নাহি কোনো নিয়মের পথ,
খেয়ালের আকর্ষণে নিয়ন্ত্রিত তব মনোরথ।
যাদের লেগেছে ভালো তাহাদের চলে গেছ ফেলে
যে ডেকেছে কাছে এস, তাহারে গিয়েছ অবহেলে।
কখনো দেখেনি কেহ শান্ত ধীর মূরতি তোমার—
বিচ্ছুরিত বহ্নিমালা, আলোকের উচ্ছ্বসিত হার—
হে উল্কা আমার!

এ ভুবনে যত গ্রহতারা
চলিয়াছে নিয়মের বাঁধা পথে, আদি অন্তহারা।
সকলে রয়েছি বসে আমাদের নিজ গণ্ডীমাঝে
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিয়মের বেড়াজালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজে।
আগে হতে আছে জানা আমাদের কোথায় আসন
পঞ্জিকায় লেখা আছে কোন্‌দিন গ্রহণ-লগন।
শুধু এ সবার মাঝে একমাত্র তুমি অনিয়ম,
তুমি অনিশ্চিত, তুমি সর্ব্ব ধর্ম্ম করি অতিক্রম
একমাত্র আপনার ইচ্ছা বলে চলেছ ছুটিয়া—
শৃঙ্খলা টুটিয়া!
তুমি পূর্ণ স্বাধীনতা, মুক্তি তুমি, মুক্ত তব দ্বার—
বন্ধনের বহ্নিময় প্রতিবাদ, অগ্নি-অভিসার
হে উল্কা আমার!

কী জ্বালা তোমার বালা, কী বেদনা বহ?
কেন তীব্র বেগে ছোটা চির অহরহ?
একদা যাহার অঙ্কে সুপ্ত ছিলে আপনা বিস্মরি,
কী দাগ দিয়েছে বুকে সে তোমারে ওগো মরি মরি!
সহসা সেদিন বুঝি চিত্তে তব জাগিল বারতা—
জীবনের ব্যর্থতার, রিক্ততার বন্ধনের ব্যথা?
তাই কি আকুল কণ্ঠে দিগন্তবিদীর্ণ হাহাকারে
ঘরে জলাঞ্জলি দিয়ে টানিয়া এনেছ আপনারে?
—সেই বেদনার স্মৃতি, সর্ব্বহারা রিক্ত ব্যর্থতার
আগুন জ্বেলেছে বুকে, তাই কি জ্বলিছ অনিবার—
হে উল্কা আমার!

অনন্ত শূন্যের মাঝে নিভে যাও স্ফুলিঙ্গের মত,
তবু তব রূপখানি রহে জাগি জগতে নিয়ত।
সহসা কুসুম গন্ধে ফাল্গুন আসে যে বনে বনে
সে তোমার ছবিখানি আনে মানুষের মনে মনে।
কত বর্ণ গন্ধ নিয়ে ফোটে ফুল ঝরিবার তরে
যৌবন বিকশি উঠে জরা মরণের অবসরে।
—আমার প্রেমের বহ্নি ছোঁয়ানু প্রিয়ায় অনুরাগে
মোদের জ্বলিতে দাও অচিরের নিভে যাওয়া আগে।
কে চাহে সুচির প্রাণ,—নীরস, নিয়মবদ্ধ ভার!
অচিরের স্বর্গ মাঝে প্রিয়ারে ডাকিব বার বার—
"হে উল্কা আমার"।

সবিনয় নিবেদন

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

কাননের বাড়ীর গেটে প্রদীপের গাড়ী এসে যখন লাগলো তখন গাড়ীতে কানন, পরাগ আর প্রদীপই ছিল; কাহিনীও ঝর্ণাকে আগেই তারা তাদের বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে এসেছিল। কানন একটা কথাও না ব'লে গাড়ী থেকে নেমে গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেল।

প্রদীপ বলেছিল, আচ্ছা, তা' হ'লে আসি কাননদা'।

কানন হয়তো তা শুনতে পেয়েছিল, কিন্তু উত্তরে কিছুই সে বলেনি।

কানন বাইরের ঘরের আলোটা জ্বলতে দেখে বরাবর বাড়ীর ভেতরে ঢুকে না গিয়ে বাইরের ঘরেই প্রবেশ করলো। হঠাৎ বৃদ্ধ জগদীশ বাবুকে সেখানে তারই জন্য অপেক্ষা করতে দেখে সে একটু চিন্তিত হ'লো। জগদীশ বাবু কাননের ছেলেবেলাকার প্রাইভেট্ টিউটার। কানন তাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে এবং সময় সময় তাকে অর্থের দ্বারাও সাহায্য করে।

কানন বললো, আপনি? কতক্ষণ এসেছেন?

জগদীশ বাবুর না জানি চোখে একটু তন্দ্রা লেগে এসেছিল, তিনি হঠাৎ একটু বিব্রত হ'য়ে উঠে বললেন, না, না, বেশীক্ষণ হয়নি। তা বাবা, কেমন আছ? ভাল 'তো?

কানন নত হ'য়ে জগদীশ বাবুকে প্রণাম ক'রে বললো, হ্যাঁ, একরকম ভালই। বিকেলের দিকে যদি আসতেন তো সীমার সঙ্গে দেখাটা হ'য়ে যেত। সীমা দু'দিন এখানে ছিল, আজ এই কিছুক্ষণ আগে তাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে এলাম, দেওঘর গেল।

কাননকে সপ্রাণ আশীর্ব্বাদান্তে জগদীশ বাবু বললেন, সীমা? আহা, মা'র সঙ্গে কতকাল যে দেখা হয় না! ওকে বড় দেখতে ইচ্ছে করে। দেখো কানন ছাত্র আমি জীবনে অনেক পড়িয়েছি, কিন্তু তোমার মত কৃতী ছাত্র আমার আর একটিও নেই। তুমি আজ পি, এইচ্, ডি হ'য়ে ইউনিভরসিটির প্রফেসর হ'য়েছ, কিন্তু যেটি হ'লোনা—সে ঐ আমার সীমা মা। আহা, এমন মেধা আমি তোমাতেও দেখিনি কানন। আমার আজও মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাস' কবিতাটি ও দু'বার প'ড়েই আমার কাছে নির্ভুল আবৃত্তি করেছিল। তখন ওর বয়েস আর কতই বা হবে!

কানন একটা চেয়ারে ব'সে বললো, সীমা যে আমার চেয়েও মেধাবী সে কথা আমিও জানি।

জগদীশ বাবু হঠাৎ ধ'রে ওঠা গলায় বললেন, কিন্তু তোমার বাবার কি যে দুর্ম্মতি হ'লো! অমন মেয়ের কি যে একটা বিয়ে দিলেন অত টাকা পয়সা খরচ ক'রে। মা আমার আজকাল আছে কেমন কানন?

কানন ক্ষণিকের জন্য দ্বিধা ক'রে তারপরে সহজকণ্ঠেই বললো, ভাল না। ওর শরীরের জন্যেই তো ওকে দেওঘরে পাঠাতে হ'লো।

ওর শরীর কি এতই খারাপ হ'য়েছে?

না, তেমন কিছু না, তবু আগে থেকে একটু সাবধান হওয়া ভাল ভেবেই।

তা বেশ করেছ', তা বেশ। ওর স্বামী পশুপতি আছে কেমন?

ভালই।—কাননের এ বিষয়ে কথা কইতে মোটেই ভাল লাগছিল না, কাজেই কথাটা অন্যদিকে ফেরাবার জন্যেই সে বললো, আপনি আছেন কেমন? আপনার বাড়ীর সব ভাল' তো?

জগদীশ বাবু একটা নিঃশ্বাস চেপে নিয়ে বললেন, একরকম ভালই আছি, আর এ বয়েসে এর চেয়ে কি বেশী

ভাল থাকবো ব'লে আশা কর' তোমরা? তারপরে আগামী মাসের পাঁচ তারিখে ছোট মেয়েটার বিয়ে—সে এক মহা ভজকোট! তোমার কাছে আসা আমার সে জন্যই। তোমাকে নেমন্তন্ন আর কি করবো বাবা—ওতো তোমার নিজের বাড়ীই। যেও, একটু দেখো শুনো, তোমরাই তো আমার আশা ভরসা। বিপদে পড়লেও তোমরা, সুখে থাকলেও তোমরা। সীমা মা দেওঘর চ'লে গেল—আহা, জানলে কি আর যেতে দিতাম।

কানন আগ্রহান্বিত হ'য়ে বললো, কার? পুতুলের বিয়ে? পুতুল কি এতবড় হ'য়েছে যে তার বিয়ে দেওয়া দরকার?

জগদীশ বাবু বললেন, তা মন্দ বড় হ'য়েছে কি কানন? বছর চৌদ্দ তো হ'লো। আর এখন যদি বিয়ে না দি' তবে দিয়ে যেতেই আর পারবো কিনা তাই বা কে জানে।

কানন কি যেন ক্ষণিকের জন্ম ভেবে নিয়ে বললো, ছেলে কেমন মাষ্টারমশাই? পুতুলের সঙ্গে তাকে মানাবে তো? ভাল কথা, পুতুলকে যে আমি তার বিয়ের সময় একটা হার দেব' বলেছিলাম। ভালই হ'য়েছে দু'দিন আগে খবরটা পেয়ে।

জগদীশ বাবু একটু কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললেন, তা, তা, পুতুলের সঙ্গে একরকম মানিয়ে যাবে'খন! ছেলেটির স্বভাব চরিত্র বড় ভাল। আর পড়েছেও আই, এ ক্লাশ পর্য্যন্ত। বাড়ীর অবস্থা একরকম ভালই বলতে হয়। পুতুলের খাওয়া-পরার জন্মে দুর্ভাবনা একরকল থাকবে না বললেও চলে।

তা' হ'লেতো আজকালকার দিনে এ-সম্বন্ধ ভালই বলতে হয়। কিন্তু তারা কি দাবী করেছে শুনি?

দাবীও যে খুব বেশী তা বলতে পারি না কানন। কিন্তু আমার পক্ষে সেও তো কম নয়। নগদ তিনশো এক টাকা আর গহনাপত্তর যেমন সাধারণে দিয়ে থাকে। তা তুমি যখন হারটা দিচ্ছ তখন ওর যা আছে তা'তেই একরকম ক'রে চ'লে যাবে। আমার আর একটি ছাত্রও কিছু টাকা দিয়েছে,—এই সবে মিলে একরকম ক'রে হ'য়ে যাবে। তোমরা সব আছ ব'লেই যা' হোক্ বুকে একটা বল পাই। কাল পরশু সময় হ'লে একবার যেও কানন, পুতুল অনেক ক'রে আমাকে ব'লে দিয়েছে।

কাল আর হবে না, পরশু নিশ্চয় যাব; পুতুলকে বলবেন। ওর কি হার পছন্দ হয় সেটাওতো আমাকে জানতে হবে।

যেও কানন, যেও—ব'লে জগদীশ বাবু লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই কানন আর একবার নত হ'য়ে তাঁ'কে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে বাইরের আলোটা জ্বেলে দিয়ে বললো, পুতুল কিন্তু পাকা গিন্নী হবে। ও যা হিসেবী—

তা ঠিক, তা ঠিক—ব'লে জগদীশ বাবু অত্যন্ত আনন্দ উপভোগ ক'রে হাসতে লাগলেন।

জগদীশ বাবুকে রাস্তা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে কানন ফিরে এসে হাঁক ছেরে ডাকলো শঙ্কর! ও শঙ্কর।

শঙ্করই কাননের একমাত্র সম্বল। আহার-বিহারের জন্ম শঙ্করের উপরেই তা'কে নির্ভর করতে হয়, আবার সেবা-শুশ্রূষা করতেও শঙ্করই। শঙ্করের দোষের মধ্যে সে একটু নিদ্রালু এবং গুণের মধ্যে সে পরম সত্যবাদী। শঙ্করের সেবাযত্নে কানন পরিতুষ্ট।

শঙ্কর চোখ রগ্‌ড়াতে রগ্‌ড়াতে উঠে এলো।

কানন বললো, ঘুমিয়ে পড়েছিলি বুঝি? আমি আজ আর কিছু খাব না শঙ্কর। আমার শোবার ঘরে কিছু মশলা, আর এক গ্লাস জল রেখে তুই ঘুমুগে' যা।

শঙ্কর তথাপি সেখানে দাঁড়িয়ে আছে দেখে কানন বললো, কি, দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

শঙ্কর বললো, দাদাবাবু, মোচার চপ তৈরী করেছি যে আজ। অন্ততঃ তার গোটা দুই—

না শঙ্কর, আজ আর কিছুই খেতে পারবো না।

শঙ্কর ব্যথিত মনে সেখান থেকে নীরবে বিদায় নিয়ে চ'লে যেতে যেতে আবার ফিরে এসে বললো, দাদাবাবু, জামাইবাবু এসেছিলেন। দিদিমণি ইষ্টিশনে গেছেন শুনে আবার চ'লে গেলেন।

সে আমি জানি—ব'লে কানন তার পড়ার ঘরের দিকে চ'লে গেল।

'গুড্ নাইট্ পরাগদা'!—ব'লে প্রদীপ যখন বিদায় নিল তখন রাত ন'টা।

পরাগ প্রদীপের কথার উত্তরে যন্ত্রচালিতের মত বললো, গুড্ নাইট্! তারপরে প্রদীপের মোটর শাঁ ক'রে একটা আওয়াজ—তুলে যখন রাস্তার মোড় পার হ'য়ে দৃষ্টির বাইরে চ'লে গেল তখন পরাগ বাড়ীর দরজা ঠেলতে গিয়ে সহসা একটু চমক খেয়ে থামলো। ষ্টেশনের ব্যাপারটা তার হৃদয় মনকে যে একটা বিশেষ দোলা দিয়েছে তা সে এই নির্জ্জন মুহূর্ত্তে যেমন স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করলো এমন ইতিপূর্ব্বে আর করেনি।

দরজা ভেজানো ছিল। ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। পরাগ আশ্বস্ত হ'লো এই ভেবে যে, কাউকে কিছু না জানিয়েই ওপরে উঠে নিজের ঘরে গিয়ে নীরবে শুয়ে পড়তে পারবে। কারও সঙ্গে কথা বলার প্রবৃত্তি সে নিজের মধ্যে তখন আর খুঁজে পাচ্ছিল না। নিজেকে যখন অত্যন্ত দুর্ব্বল ব'লে মনে হয় তখন দুনিয়ার কারও সঙ্গ বা সহানুভূতি মানুষের ভাল লাগে না—সে চায় তা এড়িয়ে চলতে, নির্জ্জনতা খুঁজে মরে তখন মানুষের আহত প্রাণ। পরাগ তা চাইছিল এবং একান্ত ভাবেই তা চাইছিল।

দ্বিতলের সবগুলো বাতিই তখন জ্বলছিল; এমন কি, অনুপস্থিত পরাগের শয়নকক্ষের বাতিটাও জ্বলছিল। পরাগ বুঝলো, মা তখনও জেগে ব'সে আছেন। কাজেই যে বিজনতার জন্ম তার হৃদয়মন ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছিল তা মোটেই সহজলভ্য নয়।

শয়নকক্ষে পা বাড়িয়েই সে চম্‌কে উঠলো।

পরাগের মা জাহ্নবী দেবী পরাগের শয্যায় ব'সে আছেন, আর তাঁরই সইয়ের মেয়ে মিনতি তাঁর কোলে মাথা রেখে গল্প ক'রে চলেছে। জাহ্নবী দেবী উদ্‌গ্রীব হয়ে তার গল্প শুনে চলেছেন এবং মিনতির ললাটে এমন সস্নেহ সমাদরে হাত বুলোচ্ছেন যে সে দৃশ্য উপভোগ্য হ'লেও পরাগের চোখে তখন তা অত্যন্ত দুঃসহ। জাহ্নবী দেবীর চোখে যে গভীর স্বপ্ন তা পরাগের কাছে নিতান্ত অপরিচিত নয়, আজ আরও তা সুস্পষ্ট রূপ নিয়ে পরাগের সামনে উপস্থিত। পরাগ তা বুঝেই চম্‌কে উঠলো বেশী।

জাহ্নবীদেবী আর মিনতি নিজেদের কথার মধ্যে এতদূর মেতে উঠেছিল যে পরাগের নিঃশব্দ আগমন তারা কেউ টের পায়নি। যখন টের পেল তখন মিনতি মুহূর্ত্তে যে কাণ্ডটি ক'রে বসলো তা মিনতির পক্ষেও দ্বিতীয়বারের জন্ম সম্ভব নয়। মিনতি তড়াক্ ক'রে শয্যা থেকে লাফিয়ে মেঝেয় নেমে পরাগকে পিছিয়ে যাবার কোন সুযোগ না দিয়ে তাকে এমন ভাবে জড়িয়ে ধরলো যে, মিনতি ভিন্ন অন্য কেউ করলে ব্যাপারটা যেমন হ'তো অসঙ্গত, তেমন হ'তো অশোভন। শুধু মিনতির পক্ষেই তা সম্ভব ও সাজে।

পরাগ সলজ্জ হেসে বললো, আচ্ছা পাগ্‌লি মেয়েতো তুই মিনু। এত বড় হ'লি, তবু তোর পাগ্‌লামি গেল না?

মিনতি ফিক্ ক'রে হেসে ফেলে বললো, স্বভাব কি কারও কোনদিন যায় নাকি আবার?

জাহ্নবী দেবীও মিনতির কথার ধরণে না হেসে পারলেন না। তারপরে বললেন, আচ্ছা মিনু, স্কুলের মেয়েরা তোকে গ্রাহ্যি করে?

মিনতি আবার জাহ্নবীদেবীর কাছে এসে ব'সে বললো, কেন গ্রাহ্যি করবে না শুনি? পরাগদা'র সঙ্গেও তো কত—সময় কত ছেলেমানুষি করি তা' ব'লে পরাগদা' কি আমাকে অগ্রাহ্যি করতে পারে নাকি? সেদিকে আমি ঠিক্ আছি মাসীমা, আমার শাসনের মূর্ত্তিতো দেখোনি। উঃ, আমার স্কুলের মেয়েরা আমাকে যমের মত ভয় করে। আমার স্কুলের যদি ছাত্রী হ'তে তুমি মাসীমা তো বুঝতে—মিনতিদি' কি সংঘাতিক হেড্‌মিস্‌ট্রেস্!

পরাগ হেসে ফেলে বললো, তা নয় মিনু, তারা তোকে মোটেই ভয় করে না। এ হ'তে পারে বরং যে তারা তোকে ভালবাসে। তোর অত সুন্দর মুখকে তারা কখনই ভয় করতে পারে না। তোকে রাগতে দেখলে আমার তো হাসি পায়। তোর ছাত্রীদের কি হয় ঠিক জানিনে অবশ্য।

জাহ্নবীদেবী পরাগের কথায় খুসি হ'য়ে বললেন, সে কথা সত্যি, মিনু তার মুখখানি দিয়েই সবার হৃদয় জয় ক'রে ব'সে আছে।

মিনতি লজ্জায় একটু রাঙা হ'য়ে উঠে বললো, বটেই তো, বটেই তো, আমার শাসনের মূর্ত্তিতো তোমরা কেউ দেখোনি কিনা—তাই।

পরাগ বললো, আচ্ছা মানলাম তারা তোকে ভয় করে। আর আমার কথা?—আমিও তোকে ভয় করি বই কি!

মিনতি আবার লাফিয়ে উঠে পরাগের সামনে গিয়ে তার একটা হাত ধ'রে খাটের কাছে টেনে এনে তাকে বসিয়ে বললো, আচ্ছা, আচ্ছা, থামো এখন। ব্যারাকপুর থেকে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে আসিনি নিশ্চয়ই। বাবা, তুমি যে কি হ'য়েছ' পরাগদা', এই এক মাসের ভিতরে একবার ব্যারাকপুর যেতে পারলে না। মা আমাকে জোর ক'রে তাই তোমাকে নিয়ে যেতে পাঠিয়েচেন। কাল ভোরে উঠেই আমার সঙ্গে রওনা হ'তে হবে। ২৪ ঘণ্টা আগে নোটিশ দেওয়া হয়নি ব'লে কোন আপত্তি করলে টিকবে না কিন্তু। দিন তিন-চার তো তোমার কলেজ বন্ধ? কাজেই আপত্তি কিছু থাকতেও পারে না। বি, পি, সি, সি'র মিটিং কি, অন্য কিছু শুনবো না। নেহাৎ সভাসমিতির জন্য যদি মন ভাল না লাগে তো ব্যারাকপুরে একটা সভার আয়োজন করা যাবে, সেখানে লেক্‌চার দিলেই চলবে।

জাহ্নবী দেবী হেসে বললেন, বাবা, মেয়ের কথার ছিরি দেখ' না।

মিনতি জাহ্নবী দেবীর একটা হাত চেপে ধ'রে বললো, তুমি এর মধ্যে কথা ক'য়ো না মাসীমা। একেই তো পরাগদা'কে কিছুতে রাজী করতে পারি না, তা'তে আবার তুমি যদি ব্যাগড়া দিতে সুরু কর' তা'লে আমি আর নেই।

জাহ্নবী দেবী বললেন, পরাগ যাবে, কাল নিশ্চয়ই যাবে, তুই নিশ্চিন্ত হ'য়ে এখন অন্য কথা ক'।

পরাগ বললো, আজ তুই নিতে না এলেও হয়তো কাল আমি যেতাম। চারদিন কলেজ ছুটি, সভাসমিতি দু'একটা না আছে যে তাও না, কিন্তু কলেজে আর পার্কে লেক্‌চার মেরে মেরে—হায়রাণ হ'য়ে উঠেছি—ক'দিন বিশ্রাম একান্ত দরকার।

মিনতি পরাগের একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে বললো, হুঁ, তুমি যা যেতে সে আমি জানি। চারদিন ছুটি—দিব্যি ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে, হাজারোবার পড়া মার্ক্সের 'ক্যাপিটাল' বইখানা—তোমার মতে যা নবযুগের গীতা—তাই খুলে দিনের পর দিন দিতে কাটিয়ে তবু ব্যারাকপুরের কথা তোমার ভুলেও একবার মনে হ'তো না। তোমাকে জানতে তো আর আমার বাকী নেই।

পরাগের ছোট ভাই ময়ূর—বয়স তার দশ বছরের বেশী হবে না—সে বারান্দা থেকে ডাকতে ডাকতে এসে ঘরে ঢুকলো, বৌদি, ও সুন্দর বৌদি, কানে শুনতে পাও না? মাষ্টার ম'শায় অনেকক্ষণ চ'লে গেছেন, এইবার—

ঘরে পা দিয়েই একছুটে আবার সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কিন্তু বেশী দূর সে যায়নি, ঘরের বাইরে বেকুবের মত দাঁড়িয়েছিল। মিনতি সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এসে তাকে বন্দী ক'রে ঘরের মধ্যে সকলের সামনে যখন এনে হাজির করলো তখন মুখ চোখ তার লাল হ'য়ে উঠেছে। মিনতিকে সে পরাগের অবর্ত্তমানে 'সুন্দর বৌদি' ব'লেই ডাকে, কিন্তু ও-নামে ডাকতে কেউ তাকে কোনদিন শিখিয়ে দেয়নি। বরং মিনতি এজন্যে কতদিন তা'কে সস্নেহ শাসন করেছে। তা'তে ফল ফলেছে উল্টো। সে মিনতির শাসনের পরেই আবার খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠে বলেছে, সুন্দর বৌদি, সুন্দর বৌদি, বলবোইতো, একশোবার বলবো—আমার খুসি।

ময়ূরের অবস্থা দেখে পরাগের হাসি পেল; হাসি চাপতেই সে কণ্ঠে কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য ফুটিয়ে বললো, এরই মধ্যে তোর পড়া হ'য়ে গেল ময়ূর?

ময়ূর হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো, বললো, রাত ন'টা বেজে গেছে এখন। মাষ্টার ম'শাই এসেছিলেন সেই সাতটারও আগে।···মিনুদি'! চল', খেতে চল'। উঃ, আমার এম্‌নি ক্ষিদেই পেয়েছে! আজ তোমার সঙ্গে খাব কিন্তু।

জাহ্নবী দেবী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, হুঁ, রাত হ'য়ে যাচ্ছে। পরাগ, হাত-মুখ ধুয়ে আয়। আমি ওদের নিয়ে ততক্ষণ নীচে যাই। ঠাকুর এতক্ষণে হয়ত রামায়ণ পড়তে পড়তে জানকীর দুঃখে ঘুমিয়ে পড়েছে।

প্রান্তর, বনানী, উঁচু-নীচু জলা জমি, টেলিগ্রাফের খুঁটি প্রভৃতি দু'পাশে রেখে হু হু ক'রে ছুটে চলেছে লুপ্‌লাইনের গাড়ী। ইণ্টার ক্লাশে যাত্রী ছিল না। কানন তারই এককোণে বসে ভাবছিল, না, কাজটা ভাল হ'লো না। মাষ্টার ম'শাইকে কথা দিলাম, পরশু তার ওখানে যাব, অথচ তাদের কোন খবর না দিয়েই দিব্যি বেরিয়ে পড়লাম। পুতুল হয়তো কত কছুই ভাববে। কিন্তু না বেরিয়েই বা উপায় কি! চারদিন ছুটি—কল্‌কাতায় ব'সে তা কাটিয়ে দিলে আপশোষের আর সীমা থাকতো না। আবার কবে ছুটি তা কে জানে। পুতুলের বিয়ের এখনও দশদিন দেরী আছে, ফিরে এসে তার হার কিনে দিলেই চলবে। ওকে একটা দামী হার দিতে হবে—ও বড় লক্ষ্মী মেয়ে, আমাকে অত্যন্ত ভালবাসে—হয়তো বড়লোক ভেবেই। যাক্, তবু ও আমাকে ভালবাসে। কাহিনী, ঝর্ণা, সীমা, কি রাঙাদি'র সঙ্গে ওর কোন মিল নেই, ও অত্যন্ত সাদাসিদে। ওর কত ছোট কামনা। ওকে একদিন লেখাপড়া শিখতে বলেছিলাম, ও উত্তরে বলেছিল, দেৎ, গেরস্তঘরের মেয়েরা বুঝি আবার লেখাপড়া শেখে, চিঠিটা লিখতে শিখলেই ঢের হ'লো। আমরা তো আর অপিসে চাকরি করতে যাব না, রান্না-বান্না ঘর-সংসারের কাজই হ'লো আমাদের কাজ। সেই পুতুলের বিয়ে। ও বেশ একটি পাকা গৃহিণী হবে। ওর স্বামী যদি সামান্য কেরাণীও হয়, তবু ও তাকে সুখী করতে পারবে। ও বেশ মেয়ে—আমার কেন জানি ওকে বড় ভাল লাগে। ও সাজতে না শিখেও সুন্দরী, ও আধুনিক মেয়েদের মত টয়লেট্ করতে শেখেনি, ওর সঙ্গে কথা বলতে গেলে তর্ক জুড়তে হয় না, মনস্তত্ত্বে বিশেষজ্ঞ ব'লে মনে মনে ওর বড়াই নেই, সব কিছু বোঝে ব'লেও ওর ধারণা নেই। ও মোটের ওপর ভাল! এক কথায় ও বেশ!···

এতক্ষণে কাননের মনে হ'লো, চ'লে আসার সময় শঙ্করকে দিয়ে পুতুলকে একটা খবর পাঠালেও তো চলতো। যাক, যা করা হয়নি তার জন্যে আর অনুতাপ ক'রে কি হবে। গন্তব্যস্থানে পৌঁছে পুতুলের নামে একখানা চিঠি লিখে দিলেই চলবে।

তারপরে মনে হ'লো সীমার কথা। সীমার সঙ্গে পশুপতির মিলন আবার সম্ভব কিনা? সম্ভব হ'লেও তা বাঞ্ছনীয় কিনা?···কানন তার সমস্ত বিদ্যা-বুদ্ধি-বিশ্বাস দিয়েও তার বিচার ক'রে উঠতে পারে না। সীমার কথা সে যতই ভাবতে যায় ততই তার মনে হয় যে, সীমার বর্ত্তমান অবস্থাকে একটা সুস্থ সুন্দর পরিণতি দেওয়া তার ক্ষমতার বাইরে। সীমার স্বাধীন ইচ্ছা—তা যত অন্যায়, যত ভীষণ, যত অবাঞ্ছনীয়ই হোক্ না কেন সে তা পূর্ণ করতে দিতে সাহসী হ'তে পারে, কিন্তু তার পরেও সীমা সুখী হ'তে পারবে ব'লে সে যে বিশ্বাস করতে পারে না।

নিরপরাধ পরাগ অকারণে সেদিন সবার সামনে আহত হ'লো। সে শুধু সীমারই দোষে। পরাগ স্বদেশ সেবক—তার সুনামের মূল্য আমাদের চেয়ে অনেক বেশী। পশুপতি যে এতবড় অপদার্থ তা সেদিন ষ্টেশনে উপস্থিত না থাকলে আমি কিছুতেই হয়ত বিশ্বাস করতে পারতাম না। সীমা সেদিন বলেছিল, দেখ মেজদা', অনেক স্বামীই স্ত্রীর ওপর অত্যাচার করে ব'লে শোনা যায়, সে-সব স্বামীরা হয় অশিক্ষিত, নয় মাতাল। মাতাল হ'লেও তাকে আমি ক্ষমা করতে পারতাম, আমার একটা সান্ত্বনা থাকতো।

হঠাৎ কাননের মনে হ'লো সীমা যদি রাঙাদি'র মত কঠিন কঠোর হ'তো, সংকল্প যদি তার তেমনি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হ'তো, অমন ভাবপ্রবণ না হ'তো,···তবে সে হয়তো এ দুশ্চিন্তা থেকে অনায়াসেই নিষ্কৃতি পেতে পারতো। সীমার জন্য তার ভাবনার কিছুই থাকতো না। সীমা শুধু জানে, ব্যথা কেমন ক'রে সৃষ্টি করতে হয়, কিন্তু রাঙাদি'র মত ও ব্যথাকে সমস্ত প্রাণ দিয়ে উপভোগ করতে জানে না।···

সেই মাঠের মাঝে ছোট ষ্টেশনটিতে এসে ট্রেণ থামতে কানন একটা পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালো।

অদূরে গোপীবাবু—দাঁড়িয়ে আছেন। বেঁটে, মোটা, গোলগাল মানুষটী, রঙ-নিকষ কালো, মাথায় ছোট একটু টাক, হাতে সেই হুঁকো, মুখে তেমনই বাক্যরাশি ও বিরক্তি। গায়ে কাল রঙের জীর্ণ একটি কোট—গলায়

কাছের বোতামটা আঁটা, আর বাকীগুলো খোলা—হয়তো ভুঁড়ির ক্রমবর্দ্ধিত পরিধি অধুনা তারা আয়ত্ত ক'রে উঠ্‌তে পারে না। বুকের রাশিকৃত লোম আত্মপ্রকাশ ক'রে ব'সে আছে।

গাড়ী থেকে নেমে কানন ব'ললো, এই যে—নমস্কার গোপীবাবু!

গোপীবাবু মালের হিসাব দেখছিলেন, মুখ না তুলেই বললেন, হুঁ নমস্কার! মরবার ফুরসুৎ নেই দাদা। এ উল্লুক রামভার্গব······

হঠাৎ মুখে তুলে বললেন, আরে ভায়া যে! তাই না বলি, গলাটা কেমন নতুন নতুন ঠেকলো! কান ঠিক আছে হে ভায়া, ঠিক আছে, এখনও গাড়ীর আওয়াজে বিগড়ে যায়নি। তারপরে ডাক্তারবাবুর তুমি যখন সম্বন্ধী তখন আমরাও দু'চারটে ইয়ারকি ঠাট্টা তোমার সঙ্গে করতে পারি হে, বুঝলে?

কাননের কর্ণ-মূল পর্য্যন্ত রাঙা হ'য়ে উঠলো, সে বললো, আবার সেদিনকার মতই ভুল করছেন যে গোপীবাবু, সম্বন্ধীর ওপর আপনার এত লোভ কেন বলুনতো?

কি জানি, কি জানি, ও কেমন এসে যায় ভায়া। হুঁ, হুঁ, এতক্ষণে মনে হ'য়েছে ঠিক। এত কাজের হিড়িকে সব গুলিয়ে যায়। কিছু মনে করোনা ভায়া। ওরে ও বেটা রামভার্গব, ঘণ্টি মার নারে বেটা, ট্রেণ যে পাঁচমিনিট লেট্ আছে।···ও, ও, তা ম'শাই, ইদিক দিয়ে যাবেন, ওটা পাব্‌লিক রাস্তা না, টিকিটটা দেখিয়ে যাবেন। মালের হিসেব নিচ্ছি ব'লে সে-হুঁস্ নেই তা যেন মনে করবেন না।

কানন বিরক্তি অনুভব ক'রে বললো, আচ্ছা, আসি তা'হলে।

তা আসবে বই কি! কিন্তু একটা কথা। দেখো, তোমাদের আনন্দ যে এতবড় ডাক্তার তা কি আগে জানতাম। আগে ভাবতাম একটা হোমোপাথী-টাথী হবেও বা, কিন্তু আমার স্ত্রীর যা চিকিৎসা করলো তা দেখে আমরা অবাক মেরে গেছি একেবারে। আমার স্ত্রীর এক আধ-দিনের ব্যায়রাম তো আর নয়—আজ দু'বছর ধ'রে ক্রমান্বয়ে ভুগছিল। কি বল, ডাক্তার বদ্যি দেখাতে আর কম করিনি, মায় কল্‌কাতা নিয়ে গিয়ে মেডিকেল কলেজে পর্য্যন্ত দেখিয়েছি। সব ভোঁ ভাঁ, কিছুতেই কিছু হ'লো না। শেষে আনন্দের হাতে প'ড়ে একমাসেই—বললে কেউ বিশ্বাস করে নাহে, বিশ্বাস করে না।—ব'লে গোপীবাবু একটু দম নিতে লাগলেন।

রামভার্গব ট্রেণ ছাড়ার ঘণ্টি মারলো।

কানন বললো, আসি এখন। কাল ভোরে এদিকে বেড়াতে এসে আপনার সঙ্গে দেখা করবো'খন। এই যে টিকিট—

না, না, তোমরা কি আর টিকিট না কেটে আসবে। ও বেয়াড়া লোকগুলোকে শুধু বলা। আচ্ছা, কাল ভোরে এদিকে এলে দেখা করতে ভুলো না ভায়া। এ শুক্কুর হো······কাঁহা ভাগলবারে······

কানন চ'লে গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

তোমারে বেসেছি ভালো

শ্রী অশোক মিত্র

তোমারে বেসেছি ভালো ; সেই গর্ব্বে অনুক্ষণ আমি
আত্মহারা।
নাই দিলে প্রতিদান—আমার একার প্রেমে আমি
গরীয়ান,
রচিনু যে কল্পলোক বহে সেথা সেই
প্রেম-মন্দাকিনী-ধারা—
তুমি তার একেশ্বরী বিরাজিছ ; দ্বিতীয়ার নাহি
সেথা স্থান।

গৃহের পরিধি মাঝে, হে অসীমা ! নাহি বা পেলাম
কভু তোমা,
চেতন লভিল মোর সে-জীবন আজি, সে তোমারি
আবিষ্কার ;
এ নব জাগ্রত-প্রাণ, সে তো তব দান, হে মোর
পরমতমা—
স্মরি তারে জানাই তোমারে মোর সকৃতজ্ঞ
প্রীতি-নমস্কার।

না-পাবার বেদনায় আমার এ-প্রেম কভু হবে
না'ক ম্লান,
তোমারে বেসেছি ভালো—সেই মোর জীবনের
শ্রেষ্ঠ সার্থকতা
স্বর্গের সুষমা আনে এ-ধরায় যেই প্রেম ঈশ্বরের দান
সে মোরে করিল ধন্য, ভরি দিল অন্তরের সর্ব্ব
অপূর্ণতা।—

সেই প্রেম জ্বালিলো প্রদীপ মম অন্ধকার অন্তর কন্দরে,
জীবনের যাত্রাপথে সেই মোরে চিরদিন দেখাইবে পথ ;
ধ্রুবতারা সে আমার রবে সাথে অচঞ্চল বনে বনান্তরে
পার হ'য়ে বিঘ্ন-বাধা চলিবে তীর্থের মুখে মোর
প্রাণ-রথ।

বাতায়ন তলে মোর সেই প্রাণ-প্রদীপের আলোখানি
জ্বালি
প্রতীক্ষায় বসি র'ব অনাগত যুগ যুগ বর্ষ-মাস ধরি,
এ-বিশ্বাস আছে মনে, একদিন অন্তরের করুণায় ঢালি
দিবে ধরা, হে কল্যাণী, সাধনার সিদ্ধি অন্তে লব
তোমা বরি।

জীবন-নৈবেদ্য মোর নিবেদিয়া দিনু তোমা,
ওগো সুচিস্মিতা,
তোমারে বেসেছি ভালো ! জন্মে জন্মে তুমি মোর
অন্তরের মিতা॥

সংস্কার ও সাহিত্য

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের, গত গোরক্ষপুর অধিবেশনে, নিজের-লেখা রচনা পাঠ করতে উঠে, বুঝেছিলুম,—আমি আর এ-কাজের উপযুক্ত নাই। পূর্ব্বের শক্তি-সামর্থ্য গিয়েছে, বয়স বাধা দিচ্ছে, শরীর সাহায্য করছে না, কণ্ঠ দুর্ব্বল, শব্দ সঙ্কুচিত। লেখায় যদি উপভোগ্য কিছু থাকে, সুধী পাঠকে তা সহজেই উপভোগ করেন, নিজের রস-সমৃদ্ধ মনের গুণে; কিন্তু শ্রোতাদের কাছে পাঠকের কণ্ঠই ধ্বনি-সামঞ্জস্যে, তাকে উপভোগ্য করায়,—শব্দের উচ্চারণভঙ্গী রস গ্রহণে সাহায্য করে,—বিতরণটা ব্যর্থ হয় না। কণ্ঠ আর সুরে বলেনা, তাই দুঃখের সহিতই প্রিয়-সম্মেলনের নিকট, মনে মনে, এবারকার মত বিদায় গ্রহণ করি।—ছুটির একটা সুখও আছে—শুনতে পাই উকীল এড্‌ভোকেটদের নাকি নেই—আমি তা নই বলেই, পেয়েছিলুম—দুঃখে সুখ।

নিউটন্ সাহেব ছিলেন বড় বৈজ্ঞানিক। আকর্ষণ তত্ত্বের আবিষ্কার ক'রে, নীচের টান্‌টার গুণ গেয়ে, বহুৎ বাহবা পেয়ে গিয়েছেন। বিদেশী বস্তু-ব্যাপারীর বৃদ্ধ হয়েও মাথায় আসেনি—ঊর্দ্ধদৈহিক আকর্ষণও আছে,—পরলোকটা ওপর দিকে।

সত্তরের পর (সাধারণ নিয়মটা—বহু পূর্ব্বেই) সেই দিকেই আমাদের টান্ ধরে। তাই শেষ খেয়ার ঘাট ঘেঁসে, কাশীতে বাসা নিয়ে,—কপি কড়াইসুঁটি কবে দর্শন দেবে, কবে ল্যাংড়া বাজারে আসবে, ইত্যাদি চিন্তায়—রাব্‌ড়ী মিশিয়ে দিন কাটাচ্ছিলুম। যেহেতু—"সাঙ্গ তো করেছি কাজ"!

এমন সময় "আবার আহ্বান", আমাকে চমকে দিলে। যে আর সক্ষম নেই—তাকেই ডাক্ পড়লো!—আমার দেশ, আমার দেশ-ভ্রাতা ও ভগ্নীরা তো আমাকে আশার অতিরিক্ত দিয়ে ঋণী ক'রে রেখেছেন; বিদায়ের পূর্ব্বে—কনকাঞ্জলির যে প্রথা আছে তাও আমি পেয়েছি। তাঁদের ভালবাসা কোনো-দিনই আমি ভুলতে পারব না। আমার উপর তাঁদের জোর আছে, সুতরাং আমাকে অত্যন্ত ইতস্ততের মধ্যে পড়তে হয়।

সবিনয়ে ক্ষমা ভিক্ষা ছাড়া উপায়ান্তর না দেখে, অপরাধীর মত সত্য অবস্থা জানাতে বসি। দেখি—সেই প্রীতির-আহ্বান-পত্রের শেষ দুই ছত্রে—মনুষ্যত্ব যাচায়ের কষ্টিপাথর রয়েছে! জানাচ্চেন—

"অনেকদিন হইতেই বাংলাদেশ আপনার সঙ্গলাভের আশা পোষণ করিতেছে। আশা করি—প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে, সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে!"

পাঠান্তে প্রাণটা কাতরে ব'লে উঠলো—"হার মানালে গো"!—একটা পুরাতন কথাও মনে পড়ে গেল।—ব্রাহ্মণেতর কোনো ধনীর মাতা, ব্রত-উদ্‌যাপনান্তে বিবিধ দ্রব্যপূর্ণ ভুজ্যি ব্রাহ্মণ-বাড়ী পাঠান। সকলগুলিই ফেরৎ আসে। মাতাকে অনুতপ্তা দেখে পুত্র বলেন,—"একটা জিনিষ দিতে ভুল হ'য়েছে যে মা, এবার আর ফিরবে না" ব'লে, প্রত্যেক ভুজ্যিতে দক্ষিণা স্থলে একটি ক'রে মোহর রেখে দেন। সেবার আর ভুজ্যি ফেরেনি। ঘটনাটি কলকাতারই। সেই পর্য্যন্ত তাঁরা কোনো-কাজে আর ভুল করেন না। তাই পরাজয়েও আনন্দ পেলুম। মনে পড়লো—

"তোমারে জিনিবে কেবা?"

কাজেই অক্ষমতাও জানালুম, আবার তাঁদের দেওয়া প্রীতির-পদ শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার করতেও বাধ্য হলুম। এখন আর তা'তে বিরুদ্ধতা-দোষ আসে না। আমাদের

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের দ্বাদশ অধিবেশনে কলিকাতায় সাহিত্য বিভাগের সভাপতির অভিভাষণ।

মহাসমিতি—"নিতেও পারি না, ফেলতেও পারি না" ব'লে, একটি দরকারী কথা সৃষ্টি ক'রে—আমাকে সাহায্য করেছেন।

বাংলা দেশের ও বাঙালীর যা-কিছু গর্ব্ব করবার বা গৌরবের জিনিষ আছে,—সভ্যতা, বিদ্যাবুদ্ধি, শিল্প সাহিত্য, ব্যবসা বাণিজ্য, অবদান প্রতিষ্ঠান,—এই কলিকাতা নগরীই তার জন্মস্থান—'কাল্‌চার-হাউস্'। এই শ্রেষ্ঠ নগরীর ভাবধারা, সমগ্র বাংলাকে ও বাঙালীকে পুষ্ট করছে! যেখানেই থাকি না কেনো, এই রাজধানীর শিক্ষাদীক্ষা প্রভাব প্রবাহ, আমাদের বাঙালী ব'লে পরিচয় দেবার শক্তি সামর্থ্য যোগায়।

আমাদের সেই মর্ম্মস্থানটিতে, 'প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন'কে আহ্বান ক'রে, আপনারা জাতির প্রতি, ভায়ের প্রতি, স্নেহ-ভালোবাসাই দেখিয়েছেন। সত্য বলতে কি, আমরা মায়ের কোল ছেড়ে দূরে থাকতে বাধ্য হওয়ায় তাঁর কাছে আজ অপরাধীর মত সশঙ্কে ও সসম্ভ্রমে উপস্থিত হয়েছি। বাঙালীর এই সর্ব্বমান্য মহাপীঠে, সাহিত্য-বিভাগের ভারার্পণ ক'রে, আমাকে আপনারা যে উচ্চাসন দান করেছেন, আমি অত্যন্ত সঙ্কোচে, কৃতজ্ঞ-চিত্তে,—আপনাদের ভালোবাসার মুখ চেয়েই, এ আসন স্বীকার করতে সাহস পেয়েছি। এ-কথাটি দয়া ক'রে স্মরণ রাখবেন।

গত কয়েক বৎসর মধ্যে, সাহিত্য সম্বন্ধে তার নব নব সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, তার রূপ গুণ প্রভৃতি সম্বন্ধে, সুধী লেখক বক্তা ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব সভাপতিগণ—যাঁরা সকলেই আমার শ্রদ্ধা-সম্মানের পাত্র, তাঁদের কাছে বারে ও বর্ণনায়, আপনারা এত পেয়েছেন যে, তার উপর কিছু বলতে যাবার বা নূতন কিছু বলবার সামর্থ্যও আমার নেই,—স্পর্দ্ধাও আমার নেই। পদে পদে পুনরুক্তি কাবো রুচিকর তো হবেই না, বরং তা অতিষ্ঠই ক'রবে। পুনরুক্তিতে শেষ পর্য্যন্ত তা আমাদের অতি-বৃদ্ধ ব্রহ্মের চেয়েও দুর্ব্বোধ্য ও জটিল হ'য়ে পড়বার ভয় করি। তাই প্রারম্ভেই তার ঠিকুজি বানিয়ে, গ্রহের গণ্ডীর মধ্যে আপনাদের ফেলতে চাই না। পরে সে সম্বন্ধে দু'এক কথা বলবার প্রয়াস পাব।

সর্ব্বাগ্রে প্রবন্ধের সম্মান রক্ষা করাই সমীচীন, তাই তার কথাই উত্থাপন করি। ও জিনিষটি বরাবরই অগ্নি-দেবতার মত আমার নমস্কার পেয়েছে। কখনো স্পর্শ করতে পারিনি, সম্মান দিয়েছি মাত্র। আজ আপনারা আমাকে যে আসন দিয়েছেন, তার পশ্চাতে রয়েছে অভিভাষণের কড়া শাসন, কারণ ও বস্তুটি প্রবন্ধেরই স্বগোত্র।

তরুণ বয়সেও চারটি বই পাঁচটি যুগ ছিল না। ক্রমে, বোধ করি তার বেম্পতির দশা পড়লো, যুগ এখন কথায় কথায় বাড়ে। বিশেষজ্ঞেরা মাটি খুঁড়েও যুগ বার করছেন, তাঁদের দয়ায়—প্রস্তর যুগ, লৌহ যুগও পেয়েছি। সুতরাং যদি বলি,—আমি ছিলুম প্রবন্ধ-যুগের মানুষ, কথাটা বিশেষজ্ঞের না হলেও, একেবারে অজ্ঞের হবেনা। প্রস্তর বা লৌহ যদি কাঠিন্যগুণে যুগের যোগ্যতা অর্জ্জন ক'রে থাকে, আশা করি প্রবন্ধ জিনিষটিকে কেহ মোলায়েম ভেবে বর্জ্জন করবেন না।

আমাদের তারুণ্য ও যৌবনের সন্ধি সময়ে রস-সাহিত্য কথা-সাহিত্য প্রভৃতি কথার প্রচলন হয়নি,—প্রবন্ধই ছিল প্রধান পাঠ্য। সংস্কৃতের কড়া-পাক্ মিশিয়ে তার গঠন হোতো, এবং তা আয়ত্ব করতে লোহারামের শরণ নিতেও হোতো। তাই তাকে প্রবন্ধের যুগ বলতে সাহস পেয়েছি। শ্রদ্ধেয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের প্রভাত-চিন্তা, নিভৃত-চিন্তা, নিশিথ-চিন্তা বাল্যে আমাদের অষ্টপ্রহরের দুশ্চিন্তার বস্তু ছিল। তিনি 'বান্ধব' বলে পত্রিকা প্রকাশ করলেও, আমরা তাঁকে বান্ধব ব'লে ভাবতে পারিনি। চন্দ্রনাথ-বাবুর ত্রিধারা, আইনের ধারার মতই সঙ্কট-পাঠ্য ছিল।

এখন সেই উগ্র-সাহিত্যের ক্লান্তি কাটাবার জন্যে, প্রতিক্রিয়া হিসেবে কথ্য-ভাষারূপ এই হোমিওপ্যাথির আশ্রয় নিয়েছি। তবে এ-কথা স্বীকার না করলে বেইমানী করা হবে যে, তাঁরা পাকা বনেদের পত্তন ক'রে দিয়েছিলেন বলেই আজ তার উপর সকল প্রকার গড়নই চলছে। সেই রাজবাড়ি লুটের ধনেই, প্রাসাদ ইমারৎ হতে সৌখিন প্রমোদ-কুটীর, মায় বাগান-বাড়ী খাড়া হ'চ্ছে। তাঁদের সম্ভার-প্রাচুর্য্যের কাছে—বাঙালী ও বঙ্গভাষা চিরদিনই ঋণী থাকবে।

ফলকথা প্রবন্ধই তখন ছিল শিক্ষার বাহন। সেই প্রবন্ধকে মোলায়েম ও সুখ-পাঠ্য করলেন রবীন্দ্রনাথ। ভয়

ভাঙ্তে সুরু হ'ল। প্রবন্ধের রূপ ফিরলো বটে, কিন্তু ভাবপ্রকাশে ইংরাজি কসরতে তাকে জটিল ও দুর্ব্বোধ্য করবার সখ যেন অজ্ঞাতে দেখা দিতে লাগলো। আজ সে ধারাও বদলে গিয়েছে,—সহজ ভাষায় ও ব্যঞ্জনায় প্রবন্ধ এখন অনেকেই আগ্রহের সহিত পড়েন। এখন আর সে—দর্শনের নিকট-আত্মীয়ের মত দর্শন দেয় না। গভীর বিজ্ঞান-বিষয়ক গবেষণা মূলক প্রবন্ধের কথা স্বতন্ত্র। অচিরে তাকেও একদিন সহজ সরস ভাবে পাবার আশা রাখি, কারণ বক্তব্যটি প্রকাশ করবার সরস ধারাই যে লোক-শিক্ষার সহায়।

য়ুরোপের প্রবন্ধ এখন প্রায় ওই পথ ধরেই চ'লছে। লেখকরা প্রবন্ধকেও রস-সাহিত্যের রূপ দিচ্ছেন। সেখানে Personal Essay ব'লে যে ধরণের প্রবন্ধ দেখা দিচ্ছে, আমাদের সাহিত্যে তার প্রচলন, বাঞ্ছনীয় বলেই মনে হয়। ছেলেরা প্রায়ই প্রবন্ধ এড়িয়ে চলে,—সে ভাবটা বদলে যাবে। যাওয়া দরকার।

১৯০৫ সালে চীন থেকে অনেক বিষয়ে অনেক কিছু দেখে শুনে, মর্ম্ম-পীড়া নিয়েই ফিরি। জল-হাওয়ার গুণেই হোক্, বা জগতের সব জাতিগুলির হাওয়া লেগেই হোক্, অথবা তাদের কর্ম্মকুশলতা স্ফূর্তি, অবাধ আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দাম গতি দেখেই হোক্ একটু উৎসাহ-উদ্যম প্রাণের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। ভেবেছিলুম—ফিরে তিন মাস ছুটি তো পাবই, নিষ্কর্ম্মার মত বসে থাকতে আর পারব না। গ্রামের বালিকা বিদ্যালয়, পাঠাগার, Rate Payers Association, প্রভৃতির কিছু কিছু কাজ এগিয়ে দেবার চেষ্টা পাব।—আর, জেলে-মালার ছেলেদের নিয়ে নৈশ-বিদ্যালয় খোলা যাবে। একবার চালিয়ে দিলে চলে যাবে, ইত্যাদি।

বন্ধু-বান্ধবেরা কয়েকদিন খুব আগ্রহে চীনের গল্প শুনলেন;—তারা কি-কোরে চণ্ডু খায়, ক'টা ক'রে আরসোলা খায়, ইঁদুর ভাতে দেয়, না ঝোলে? ইত্যাদি। গুড়ুকের সঙ্গে বেশ চ'লেছিল। এক সপ্তাহ বৃথা গেল ভেবে, যেই কাজের কথা পেড়েছি, সকলে চম্‌কে আমার দিকে চাইলেন। হেসে বললেন—"ও-সব বহুৎ শোনা হয়েছে বন্ধু! তিন বছর চিনে থেকে যে 'জুনিয়র' দত্তাত্রেয় বনে এলে দেখছি।—বাজে কথা রাখো,—তাস পাড়ো।" একজন বললেন—"দেশান্তরে গেলে, এই জন্যই মাথা মুড়িয়ে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা ছিল,—বিগড়ানো-মাথা ঠাণ্ডা হবে ব'লে।"

তাঁরা কখনো হাত না দিয়েই 'বাং'-সিদ্ধ ছিলেন। এখানে আমার সে ভয় নাই। তবে সাহিত্য-সম্বন্ধে কথা, প্রসঙ্গত কইবার চেষ্টা পাব। কারণ, সকলেই জানেন, আমার সাহিত্য-সেবা সম্পূর্ণ আকস্মিক। বরাবরই বাজে-কথা আশ্রয় ক'রে সেটা চলেছে,—শিক্ষা বা নীতির পথ সে মাড়ায়নি।

আপনাদের প্রীতি-পত্র 'সঙ্গলাভের' সুমধুর কথা শুনিয়ে আমার সাহস ও কর্ত্তব্য বাড়িয়ে দিয়েছে। তাই, অন্ততঃ সাহিত্য-সংশ্রবে সংক্ষেপে নিজের একটু পরিচয় দিলে, বোধ করি অবান্তর হবে না। সেটা 'ব্রাকেটের' বেড়ার মধ্যে রাখলেই হবে। প্রথম গৃহ-প্রবেশের অধ্যায়টা পরেই ব'লব।

লোকে কাশী আসে ধর্ম্ম-কর্ম্ম নিয়ে, শেষ-জীবনটা 'পার্ডন্' প্রার্থী হ'য়ে! সেবা-ধর্ম্ম ব'লে একটা ধর্ম্মও রয়েছে। ঘটনাচক্রে সাতান্ন বৎসরের সময়, সময় কাটাবার অবলম্বন-রূপে, মনকে চোখ ঠেরে, সাহিত্য সেবাকেই ধর্ম্ম-কর্ম্ম ব'লে নিয়ে বসি। তখন মনে পড়েনি—সাতান্ন সংখ্যাটি, ভারতে ইতিহাস প্রসিদ্ধ।

যৌবনের প্রারম্ভেই একবার সাহিত্যের ঝোঁক ধরেছিল। আমরা সেকেলে লোক—গুরুপন্থী। তাই সেই সনাতন নিয়ম রক্ষার্থে ব্যস্ত হয়ে বেড়াই, মনের-মতনটি পাইনা। এমন সময় নদীয়া-নিবাসী এক গোপালদাকে পাই। 'চারুপাঠের' সকল ভাগই তাঁর ভাগে পড়েছিল। সহজ কথা-বার্ত্তাতেও তিনি জিহীর্ষু রোচিষ্ণু, পলিক্লী, বৈক্লব্য, বিজিগীষা প্রভৃতি বিভীষিকা অনর্গল উদ্গীরণ করিতেন। অবাক হয়ে শুনতুম। ভয়ে ভক্তি ব'লে একটা কথা আছে,—দুর্ব্বোধ্য বস্তুর একটা আভিজাত্যও আছে। ভাবতুম কবে এমনটি আমার হবে! তিনি যখন পুত্রের নাম-করণ করলেন 'শ্রুতকীর্ত্তি',—আর থাকতে পারলুম না, তাঁকেই বরণ ক'রে ফেলি।

তাঁর উপদেশ 'অমরকোষ' হাতে করে হজম করতে হ'ত। তিনিও সুযোগ্য শিষ্য লাভ ক'রে একখানি মাসিক বার করলেন। লেখা বড়-কেউ বুঝতে পারতেন না। নদীয়া পণ্ডিতের স্থান, পণ্ডিত হ'য়ে সে-কথা কেউ স্বীকার করতেও পারতেন না। সুবিধা ছিল। ভীষণতার একটা মূল্য আছেই! সুখের বিষয়, তিন মাসের বেশী চলেনি; কোনো 'প্রেসই' সে-সব যুক্তাক্ষরের 'টাইপ' যোগাতে পারলে না। গ্রামে শান্তি এলো; আমার কিন্তু ক্ষোভের কারণই হয়েছিল, যেহেতু লোভ তখনো ঘোচেনি। মন-মরা হয়ে থাকি।

যৌবন-সুলভ সাহিত্যানুরাগ থাকায়—ভগবান দয়া করলেন। যাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব ছিল অবিসম্বাদী, অকস্মাৎ একদিন বালী ষ্টেসনে সেই মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পাই। বঙ্কিম বাবু উত্তরপাড়ায় এসেছিলেন এবং আমারই ভাগ্যে, ট্রেন্ ফেল্ ক'রে 'প্লাট্‌ফর্ম্মে' পাইচারী করছিলেন। একেবারে পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় দেওয়ায় ভূমিকা বাড়তে পেলে না,—সস্নেহে কথা কইলেন। নাম, ধাম, কি করা হয়, শেষ হ'লে বললেন,—"ও-ইচ্ছা যদি থাকে, খুব পড়ো, পুঁজি বাড়াও, এর পর বিতরণ সহজ হবে। Spectator পড়েছ কি? এডিসন্, ষ্টীল্, সুইফ্‌ট্ এঁদের লেখা ভালো ক'রে দেখো। * * দেখতে শেখাও চাই। যা জানো, বোঝো—তাই লিখো। লেখা বাড়াবার জন্যে ঘুরিয়ে বেঁকিয়ে লিখতে শিখোনা। * * * এক কাজ কোরো,—নিজের গ্রামের আর আশ-পাশের পরিচয়—গল্প হোক্ কাহিনী হোক্ যতটা পারো সংগ্রহ ক'রে, লেখবার চেষ্টা কোরো। আগে সেইটে করো দিকি। * * * দুর্ব্বোধ্য ভাষায় লিখতে যেও না, বৃথা শ্রম হবে, নিজের উদ্দেশ্যই নষ্ট হবে, কাজে লাগবে না। * * ষ্টাইল্? ষ্টাইল্ শেখাতে হয়না—যা নিজের হ'য়ে দেখা দেবে—তাই তোমার ষ্টাইল। অন্যের মত করে লিখতে যেও না, তাতে দু'কূল যাবে,—আমাদের সাহেব হবার মতো। * * ভালো শোনাবে ব'লে বেশী বিশেষণ ব্যবহার কোরো না। ঠিক্ বাছাই চাই,—একটিই যথেষ্ট।"

ট্রেন এসে গিয়েছিল, অন্য কথা কইতে কইতে—প্রথম শ্রেণীতে উঠে পড়লেন। আমি আবার পায়ের ধুলো নিলুম। * * "খুব পড়ো, এখন থেকে কল্পনা নিয়ে খেলা কোরো না। তার জন্য ঢের সময় আছে। লেখায় প্রেম জমলে, সে আপনি ফুটবে। তখন সে ওজন-বুঝে চলবে! ওজন বুঝ্‌তে দেরী হয়। সময় হয়েছে, গাড়িতে ওঠো গে।"—আমি তখন আনন্দে আত্ম-হারা।

আমার 'বিজিগীষা'র, নেশা ছুটে গেল!

আজ ভাবি, সেই কয়েক মিনিটের কথা-বার্ত্তায় যা পেয়েছিলুম, পঁয়তাল্লিস্ বৎসরেও তা পুরাতন বা অচল হয়নি। সেই অনন্যসাধারণ পুরুষটির দীপ্ত চক্ষুর স্নেহ-শাসন, আজো তাঁর কথাগুলি স্মরণ করিয়ে দেয়।

তিনি রবির উদয় দেখেই গিয়েছেন।—তাঁকে অভিনন্দিত করেও গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ সাহিত-ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছিলেন—সোনার-কাঠি হাতে ক'রে, যার স্পর্শে বাণীর মণি-মন্দির দ্বার খুলে গেল,—কল্প-লোকের হিরণ্ময়-কক্ষ দেখা দিলে। সুমধুর বীণা-ঝঙ্কার আমাদের চিত্ত হরণ করলে। এতদিন যা অপার্থিবের কোটায় ছিল, শব্দের সুমহান শক্তি তাদের সঙ্গে সহজ পরিচয় করে দিলে, তারা যেন আমাদের অজ্ঞাতে আমাদেরই মধ্যে সুপ্ত ছিল। অচেতন চেতনা লাভ করলে। সৌন্দর্য্যে, সুধায়, সুষমায় তারা মূর্ত্ত ও সজীব হয়ে, আমাদের মনোরাজ্যে প্রবেশ করলে। ভাব-লোকের পর্দ্দা খুলে দিলে। সাহিত্যে নূতন যুগ নূতন উপকরণ নিয়ে উপস্থিত হ'ল। শিক্ষিতের মনে নব নব আশা আকাঙ্ক্ষা ফুটিয়ে দিলে। তাতে, লেখক ও পুস্তক সংখ্যা বেড়ে চ'ললো। আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টা তৃপ্তি খুঁজতে লাগলো।

এইরূপ অবস্থায় শরৎ-চন্দ্রোদয়। সাহিত্য রসের অপূর্ব্ব আস্বাদ, নানা বিভাগে পাবার পর, শিক্ষিতেরা যেন আরো কিছুর জন্য উন্মুখ প্রতীক্ষাপন্ন ছিলেন। তাঁরা সাগ্রহে ক্ষমতাশালী মনীষী লেখকটিকে স্বাগত বলে নিলেন। তাঁর লিপি-চাতুর্য্য ও ভাষা-মাধুর্য্য সবিস্ময়ে উপভোগ করতে লাগলেন। পরে তিনি যখন আমাদের সমাজের অনেক কথাই, নির্ভীকভাবে, তাঁর বলিষ্ঠ ভাষায় প্রকাশ করতে লাগলেন, সে সব অনেকেই উপভোগ করলেও, তাঁর পরিণাম চিন্তা,—চিন্তাশীলদের বিচলিতও করতে লাগলো। কিন্তু বাস্তব সংমিশ্রণে, তাঁর বক্তব্যগুলি দুর্ব্বল নয়। শব্দ

প্রয়োগ শক্তিই যুক্তির আশ্রয়ে সাহিত্যের প্রধান বল। তিনি তার দক্ষশিল্পী, সুতরাং তাঁর সাহিত্যে সহজেই পাঠকদের চিত্ত জয় করলে। কোথাও কোথাও সংস্কারের মতভেদ থাকলেও রসোপভোগ কারো বাধেনি। বাঙ্গলাদেশ তাঁর শক্তিকে যোগ্য সম্মান না দিয়ে পারেনি। তিনি যে কত বড় সাহিত্যস্রষ্টা এইটাই তার প্রমাণ।

কোনো জাতিই সম্পূর্ণ সংস্কার-মুক্ত নয়। আবার বহু দিনের জাতিগত সংস্কার—স্বভাবেই পরিণত হয়। স্বভাব চিরদিনই বলবান। সাহিত্যের বাঙ্ময়ী মূর্ত্তি তাকে বেদাক মুছে দিতে সহজে পারে ব'লে মনে হয় না। তবে—সংস্কার বিশেষেও আছে, মূলে যা বিচার-সহ নয়, স্ত্রী-আচারের মত প্রক্ষিপ্ত বস্তু,—আমি তাদের কথা বলচি না। কিন্তু যে জাতি একদিন শিক্ষায় দীক্ষায়, ন্যায়ে, দর্শনে, সভ্যতার চরম স্তরে পৌঁছেছিল, ও বহুচিন্তার পর, যার সামাজিক ব্যবস্থাদি, নীতির পথ ধরে, নিয়মবদ্ধ হয়েছিল এবং যা বহুদিনের সমর্থন পেয়ে এসেছে,কাল তা ধীরে ধীরে আবশ্যক মত কালোচিত ক'রে নিয়ে থাকে ও নেবে।

আমাদের প্রায় সপ্ত-সুরই আজ বিলাতি সুরগ্রামে বাঁধা। বাল্য-কালেই We met a lame man! ইংরাজিতেই আমাদের পঠন-পাঠন, শিক্ষা-দীক্ষা, ভাবনা-চিন্তা; সে আমাদের অনেক-কিছু দিয়েছে, এবং আমাদের অনেক-কিছু নিয়েওছে,—জাত ধাত পর্য্যন্ত, ধর্ম্ম থাকলে—ধর্ম্মও। ভালো মন্দের কথা বলছি না। নিজেরটা জানা থাকলে তার যাচাই চলতো। তা জানবার সুযোগ পাইনি, আক্ষেপের কথা—চেষ্টারও আবশ্যক বোধ করিনি। আমাদের সাহিত্যও অনেকটা সেই ধাত নিয়ে গ'ড়ে উঠেছে, পুষ্ট হয়েছে। জ্ঞান ও রস, সেই জুগিয়েছে। সে ঋণ অস্বীকার করবার উপায় নেই।

কিন্তু এতোতেও সংস্কারমুক্ত কয়জন হ'তে পেরেছি? মায়ের দেওয়া, রক্তের সঙ্গে পাওয়া জিনিষ মজ্জাগত, তার একটা প্রচ্ছন্ন প্রভাবও আছে। জাতি ব'লে জিনিষটা জগৎময় রয়েছে, তাদের বিভিন্ন সংস্কারও রয়েছে। বিশ্বমানব মহাপুরুষেরাই হন,—সংখ্যায় তাঁরা কয়জন! পুরাণে বড় বড় উদাহরণ স্থলে দেখতে পাই—'যথা জনকাদি,' দ্বিতীয় নামে শোনাতে কাউকে বড় দেখতে পাই না।

জাতির পরিচয় মধ্যে বৈশিষ্ট্য হিসেবে,—ভাষা, গীত, বাদ্য, শিল্প, অনেক কিছুই থাকে,—মনে হয় সংস্কারটিও বড় গুলির মধ্যেও অন্যতম।

বাংলাদেশে বঙ্কিমচন্দ্রই উপন্যাসের প্রথম আবাদ আরম্ভ করেন,—সত্তর বৎসর পূর্ব্বে। মনে পড়ে তাঁর দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, আমাদের লেখা-পড়ার কি বিষম অন্তরায় হয়েই দাঁড়িয়েছিল। কপালকুণ্ডলা তরুণদের মনে কি করুণ ব্যথার সৃষ্টিই করেছিল। পরে, তাঁর 'বঙ্গদর্শনে' যখন বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, মাসে মাসে দেখা দিত,—মাসগুলোকে তখন যুগ বলেই মনে হ'ত! কমলাকান্তের কান্ত-রস আজো তেমনি উপভোগ্য হয়ে রয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা হারিয়েছি মাত্র চল্লিশ বৎসর। এরি মধ্যে শুনতে পাচ্ছি, তাঁর উপন্যাসাদি নাকি আদর্শ ও নীতি-মূলক, যা কাব্য বা সাহিত্য সৃষ্টি ক্ষেত্রের উৎকৃষ্ট রীতি নয়,—অর্থাৎ দোষস্থ। তাতে প্রকৃত বস্তুর বা সাহিত্যের বিকাশ ঘটে না, সুতরাং দেশ কিছু পায় না। তাঁর নায়ক-নায়িকারা সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে যে পথ বেছে নিত, তাকে সে পথে তিনি নিয়ে যাননি বা নিয়ে যেতে পারেন নি। অর্থাৎ তার লেখার পশ্চাতে উদ্দেশ্যের প্রভাব প্রকট; Art for art's sake নয়।

স্বীকার করতে আমার কিছুমাত্র লজ্জা সঙ্কোচ নেই যে, শেষের ওই ইংরিজি 'বয়েদ'টি আজো আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। একটা অবলম্বন ভিন্ন, কোন কিছুই দাঁড়ায়-না, স্বয়ং ভগবানও দাঁড়াতে পারেন বলে মনে হয় না। লেখক মাত্রেরই মনের পশ্চাতে বা নিভৃতে—একটা কিছু অন্ততঃ অগোচর ইঙ্গিৎ থাকেই, যাকে দর্শনশাস্ত্রে বোধ করি তন্মাত্র বা মাত্রা-স্পর্শ বলা হয়েছে। সে আমাদের ইস্কুলের X-এর মত সাহায্য করে।

'আর্ট' জিনিষটা বোধ হয় স্রষ্টার অজ্ঞাতেই জন্ম নেয়, "আপনি সে ফুল ফোটে",—সৌরভ পেয়ে আবিষ্কার করেন রসিকে। তার যশটা, ভাগ্যবান লেখকের উপরি পাওনা। ডাক্তারে রোগে ওষুধ খেতে দেন, সেটা জলের সঙ্গে

পেটে চলে যায়। রোগ নিজের ওষুধটিকে যথাস্থানে টেনে নিয়ে, কাজে লাগায়,—আরাম পায়। যশ বাড়ে ডাক্তারের।

বঙ্কিমচন্দ্র জন্মেছিলেন বাংলা ১২৪৫-এ বরেণ্য ভট্টপল্লী-ঘেঁষা সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ কুলে। এই মনো-বিকলনের দিনে, এটাও ভাববার কথা,—তিনি যদি তদানিন্তন সমাজের দিকেই দৃষ্টি রেখে সাহিত্য সৃষ্টি ক'রে থাকেন, সেটা কতটা অন্যায় ও অস্বাভাবিক হয়েছে।

আমাদের সমাজে ও সাহিত্যে যা কিছু বিশেষ বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা দিয়েছে, তা ঘটেছে তাঁর তিরোধানের পর, অর্থাৎ গত চল্লিশ বৎসর মধ্যে।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"সাহিত্যের মধ্যে দুই শ্রেণীর যোগী দেখা যায়—জ্ঞান-যোগী ও কর্ম্ম-যোগী। বঙ্কিম, সাহিত্যে কর্ম্ম-যোগী ছিলেন।" এইতেই বোধ হয় সব কথা ব'লা হয়ে গিয়েছে। তাঁর সাহিত্যে কর্ম্ম-প্রেরণাই সমধিক দেখতে পাই। তিনি সাহিত্যের সকল দিকেই বিচরণ করেছেন।—তাঁকে সমগ্রভাবে দেখতে গেলে, উপন্যাস তাঁর একটা বিভাগ মাত্র ছিল। তাঁর দান, তাঁর কমলাকান্ত, তাঁর প্রবন্ধাদি, আজো একাধিক কালজয়ী বার্ত্তা বহন করে। জাতি না আপনাকে হারায়, জাতি আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়, এই ইঙ্গিতই সর্ব্বত্র দেখতে পাই। পশ্চিমের প্রবল আকর্ষণ, জাতির বহুদিনের বহু সাধনালব্ধ সংস্কৃতিকে না ভাসিয়ে দেয়, নূতনের চাকচিক্য না আমাদের অন্ধ করে, এই সবই তাঁকে যেন বিচলিত ক'রেছিল। কিন্তু পশ্চিমের যা ভালো তাকে তিনি দৃঢ়ভাবে সমর্থন ক'রে গিয়েছেন।

দেশের ও জাতির ভাবনাই যেন তাঁকে লেখনী ধরিয়েছিল। তাই তাঁর সাহিত্য নিখুঁৎ কাব্য সৃষ্টির অবকাশ নাও পেয়ে থাকতে পারে। প্রাণ কেঁদেছে, উপায় চিন্তা ক'রেছেন,—উপায়ের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। পাঠকেরা সে-সব কাব্যের মতই উপভোগ করেছেন। বঙ্গভূমিকে এতো ভালোবেসেছেন কম লোকই। সেই আদর্শবাদী কর্ম্মযোগী, সেই বলিষ্ঠবাক্ ঋষি, যা দিয়ে গিয়েছেন তা আর কে দেবেন জানিনা। বার্ণাড্ শও আদর্শ ও উদ্দেশ্যবাদী।

দেশের প্রতি, জাতির প্রতি অনন্যসাধারণ ভালোবাসাই তাঁকে উপন্যাসে রীতিরক্ষার নিয়ম রক্ষা না করাতে পারে, কিন্তু প্রতিভা তার ধর্ম্মরক্ষা করতে ভোলেনি। সাহিত্য ব'লে রসাত্মক লেখার আস্বাদ আমরা তাঁর কাছেই প্রথম পাই ব'ললে বোধ করি বড় একটা ভুল করা হবে না। যেমন গ্রীষ্মের দিনে লোক গঙ্গায় অবগাহন ক'রে শান্তি পায়—যেটা ছিল তার মুখ্য উদ্দেশ্য, সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসীর কিন্তু পুণ্য লাভটাও ঘটে যায়; সেইরূপ বঙ্কিম-সাহিত্য স্বতন্ত্র দুটো জিনিষ দেয়।—আদর্শে নীতিমূলক ইঙ্গিত ও কাব্যরস। ভালো হোক্ মন্দ হোক্,—প্রথমটিতে সংস্কার কাজ ক'রে থাকতে পারে। জাতি থাকলেই সংস্কার থাকবে। জাতির পরিচয়ে, সংস্কারের স্থান অনেকখানি। পূর্ব্বেই বলেছি—কাঁচা সংস্কার, পাকা সংস্কার আছে। পাকা সংস্কারকে সহজে উপেক্ষা করা যায় না।

"তর্ক তা'রে পরিহাসে, মর্ম্ম তারে সত্য বলি জানে,
সহস্র ব্যাঘাত মাঝে—তবুও সে সন্দেহ না মানে।"

এ যে কত বড় সত্য, তা আমরা সকলেই বুঝি। তাই, তাঁকে বিচার করতে হলে,—তাঁর কাল, পারিপার্শ্বিক, জাতীয় সংস্কার প্রভৃতি সম্বন্ধে একটু অবহিত হ'লে, তাঁর প্রতি সুবিচার করা হবে।

উন্নতি-কামী জাতির জন্যে সমালোচনা জিনিষটি খুবই আবশ্যক। সে রচনার দোষগুণ দেখায়,—বিশুদ্ধ সৌষ্ঠব দানের পথ নির্দ্দেশ ক'রে দেয়, সুপ্রস্তাবে তার অগ্রগতি সূচিত করে। বিশ্লেষণে ও অভিমত প্রকাশে, ভালো রচনার—যাতে আশার আলোকপাত রয়েছে,—শ্রীবৃদ্ধি করে, প্রাণ প্রতিষ্ঠা ক'রে দেয়। তাই সমালোচনা analitic হ'লেই যেন ভালো হয়। দেখেছি, তাতে অনেক সময়, মূল রচনাটি অপেক্ষা সমালোচনাটি—হৃদ্য ও উপভোগ্য হয়েছে, রচনাটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, দশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাতে লেখক উৎসাহ পান, কৃতার্থ হন। সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়।

যাঁতে আশার ক্ষীণ সূচনাও আছে, তাঁকে রক্ষা করাই উচিত ব'লে মনে হয়, নচেৎ উল্লেখযোগ্য কিছু পাবো কি ক'রে? দেশে বা সমাজে যা মারাত্মক বিষ সঞ্চার করে,

রাখাল

আমি তার কথা বলছি না। কেহ আমাকে ভুল বুঝবেন না। লেখক গ'ড়ে ওঠবার দিকে আমাদের দৃষ্টি দেবার সময় এসেছে, প্রয়োজন হয়েছে, তাই এ কথার উত্থাপন করেছি।

আমাদের যে সাহিত্য অর্দ্ধশতাব্দী নিয়েছে গড়ে উঠতে, যা আজ আমাদের জগৎ সমক্ষে পরিচিত করেছে, এবং যা আমাদের একমাত্র গর্ব্বের বস্তু,—সম্বল বলাই উচিত, তাকে রক্ষা করার লোকও চাই। পরাধীন জাতি একেই পঙ্গু, তার একমাত্র সহায় তার ভাষা, তার সাহিত্য। তার ভেতর দিয়েই তাকে ফুটতে হ'বে, আত্মরক্ষা করতে হ'বে। যা-কিছু অভাব অভিযোগ, ব্যথা বেদনা, রূপ পাবে তারই সাহায্যে,—কি উপন্যাসে, কি গল্পে, কি প্রবন্ধে। দ্বিতীয় পথ কোথায়?

তাই বলেছি, যা পাওয়া হয়েছে, তাও রক্ষার জন্য লেখক চাই। তাঁদের গ'ড়ে তোলবার ভার, সমালোচকদের। দোষ থাকলে, তা দেখাতেও হবে, আবার কি হ'লে সঙ্গত হয় তার ইঙ্গিতও করতে হবে। সাহিত্যকে দেশের গৌরবের বস্তু করবার দৃষ্টি ও সদিচ্ছা নিয়ে, তাঁদের চিন্তাচর্চ্চা—প্রকাশ করতে হবে। তাঁরাই পথপ্রদর্শক হবেন। কৃষ্টি কথাটা কেমন মিষ্টি লাগে না, বোধ হয় অভ্যস্ত হইনি বলে;—'কাল্‌চারে'র দিকটা যাতে অশোভন না হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

যৌবনই নব নব উদ্ভাবনে, দানে, জগৎকে চির নূতন রেখেছে। নূতন কিছু যৌবনই দেবে। একটা কথা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অভিভাষণে বলেছি। উদ্দাম যৌবন যাঁকে যা লেখাক-না-কেনো, তাঁরাও দেশের লোকের সমর্থন চান। যশোলিপ্সা অস্বীকার করা চলে না, সে নীরব থাকলেও,—থাকে। কেহই চাননা তাঁর শ্রম নিরর্থক হয়। এটা মনুষ্যপ্রকৃতি,—তা তিনি যত বড়ই জবরদস্ত নির্ব্বিকার হউন না। সাধু মহাত্মারাও এটা স্বীকার করেন। সুতরাং,—শিক্ষিত শক্তিশালী লেখক, দেশের লোকমতকে বেশীদিন উপেক্ষা করবার শ্রম স্বীকার কোরে বিড়ম্বিত হ'তে পারেন না। তার সঙ্গে আর্থিক ক্ষতিও সহ্য করতে হয়। তা ব'লে কি কেহ নূতন কিছু দেবেন না? নিশ্চয়ই দেবেন। দেশ সেইটাই তো চায়। দেশ এখন শিক্ষায় দীক্ষায় অনেক অগ্রসর, নূতন না পেলে তার তৃপ্তি নেই।—ব্যতিক্রম থাকবেই, অতি বড় শক্তিশালীর কাছে—তাও আমরা পাব। প্রয়োজনীয় যা, তা সহসা নিতে না পারলেও, তার মূল্যও রয়েছে এবং থাকবে।

দেশের সাহিত্যকে যাঁরা নিয়মিত দানে পুষ্ট ক'রে চলেছেন, তাঁদের ক্ষমতা আমি স্বীকার করি। দেশ তাঁদের কাছেই চাচ্ছে, জাতিকে—চরিত্রে, মনীষায়, পৌরুষে, উপভোগ্য রচনার মধ্য দিয়ে—বলিষ্ঠ করবার মত সাহিত্য। চিন্তা, দর্শন ও অভিজ্ঞতাই, সেটা দিয়ে থাকে।

বলতে পারেন,—ঘুরে ফিরে সেই আদর্শমূলক সাহিত্যের কথাই তো এলো। আমি তা বলছি না। ক্ষমতাশালী লেখক,—উদ্দেশ্যের আশ্রয় নিতে যাবেন কেনো?

কিছুদিন থেকে একটা কথা প্রায়ই শুনতে পাচ্ছি,—"পূর্ব্ব পরিচয় আর দিও না, পূর্ব্বের কথা ভুলে যাও"। এও কি একটা কথা! তাঁরা বোধ হয়, কথাটা মনের দুঃখে বলেন। যে কিছু করে না, কেবল কথাই কয়, তার ভুলে যাওয়াই ভালো। তবে সবই কি বিদেশ থেকে নিতে হবে? নিজেদের যা ভালো, তাও ভুলতে হবে? আমাদের কিছুই নেই,—এত বড় দৈন্য ভারতের আজো আসেনি। আমাদের দেবার যা আছে, তাকে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। সেই তো আমাদের সত্যের পরিচয়। সেই পরিচয়ের প্রভাবই এ জাতটির বিলোপ সাধনে বাধা দিয়ে এসেছে ও দেবে।

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের কথা, তখনকার Hope ব'লে ইংরাজি সাপ্তাহিকের প্রবর্ত্তক ও সম্পাদক এবং ভূতপূর্ব্ব Tribune সম্পাদক, শ্রদ্ধেয় অমৃতলাল রায় মহাশয়, আমেরিকায় উপস্থিত হ'য়ে, অর্থাভাবে বিপন্ন হ'য়ে পড়েন। এক ইংরাজ বন্ধুর পরামর্শে,—সংবাদপত্রে লেখা পাঠান। সম্পাদক লিখে পাঠান—"ও-সব বিষয়ে লেখবার লোকের আমাদের অভাব নেই"। তখন তিনি রামায়ণ, মহাভারত আশ্রয় ক'রে লিখে—অর্থোপার্জ্জন করেন ও সত্বর জাহাজ ভাড়া সঞ্চয় ক'রে, দেশে ফিরতে সক্ষম হন।

হিন্দি সাহিত্যকে পুষ্ট করবার জন্যে, কাশীর 'নাগরী-প্রচারিণী' সভার উৎসাহ উদ্যম দেখলে অবাক্ হ'তে হয়।

তার একখানি বার্ষিক রিপোর্ট পড়'লে,—প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহকল্পে ব্যয়, পরিভাষা সৃষ্টি, বিভিন্ন দেশের বিখ্যাত লেখকদের, বাংলারও, পুস্তকানুবাদ এতদঞ্চলের লেখকদের উৎসাহদানকল্পে উল্লেখযোগ্য পুরস্কার দান, প্রভৃতি বিস্ময় উৎপাদন করে। ভালো উপন্যাসাদি লেখককে বিশেষ পারিশ্রমিক দান, পুস্তক-প্রকাশে সাহায্য, কিরূপ দ্রুত অগ্রসর হ'য়ে চলেছে, দেখলে স্তম্ভিত হ'তে হয়। এই প্রচেষ্টার পশ্চাতে বড় বড় ধনীর ও কর্ম্মীর প্রচুর অর্থ ও শ্রম, নিয়মিত ভাবে কাজ ক'রে, সাফল্যের দিকে এগিয়ে চ'লেছে। তাঁরা যেন একটা প্রতিজ্ঞা পূরণ কল্পে আত্ম-নিয়োগ ক'রেছেন। দেখলে বিস্ময়, আনন্দ ও আশঙ্কা যুগপৎ উদয় হয়। যে সাহিত্য নিয়ে আমরা যেন সমাপ্তি-রেখা টেনে নিশ্চিন্ত রয়েছি, তার জন্য যদি চিন্তার দিন না এসে থাকে, তা হ'লে আমাদের শেষ সম্বল ও পরিচয় বস্তুটির ভবিষ্যৎ ভাবতেও ভয় পাই। তাই আমাদের প্রাণবান সহৃদয় ধনিকদের, কর্ম্মীদের ও শিক্ষিতদের এ সম্বন্ধে অবহিত হ'তে প্রার্থনা জানাই।

এ সম্বন্ধে অনুরাগী ভক্তদের স্বপ্রণোদিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেষ্টার সংবাদ পাই। তন্মধ্যে 'চয়ন-সমিতি' অন্যতম। তাঁরা অপ্রকাশিত প্রাচীন-পুঁথি ও শিল্প-নিদর্শন সংগ্রহ ও সংরক্ষণে সচেষ্ট।—বাংলার বিলুপ্তপ্রায় পল্লী-সাহিত্যের উদ্ধার সাধনে যত্নবান হয়েছেন।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার প্রবেশলাভ ঘটায়, আমাদের পরম প্রীতিভাজন—শ্রদ্ধেয় ভাইস্-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, সেদিন বাংলার লেখকদের কাছে, যে প্রস্তাব উপস্থিত করে,—সাহিত্যের ও অন্যান্য বিভাগের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে, পুস্তকাদির প্রয়োজনের কথা শুনিয়ে,—সাহায্য আহ্বান করেছেন, সে অভাব পূরণের দিক থেকে দেশের কাজের সুযোগ রয়েছে।

ওই সঙ্গে একটা আক্ষেপের কথাও মনে আসে। বাণীর সেবকেরা প্রায়ই অবস্থাপন্ন নন। তাই ইচ্ছা ও শক্তি থাকলেও তাঁরা এমন রচনায় হাত দিতে পারেন না, যার প্রকাশক জুটবে না,—কারণ সে সব পুস্তকের চাহিদা কম। এমন কি সে জন্য অনেক বিশেষজ্ঞকেও, বিশেষ বিশেষ বিষয়ে লেখা বন্ধ রাখতে বাধ্য হ'তে হয়েছে। ক্ষমতাশালী বিশেষজ্ঞেরা অনাদর পেলে, বাঙলার বিভিন্ন বিভাগ পুষ্ট হ'বে কি ক'রে! এর প্রতিকার চিন্তার সময় বোধ হয় এসেছে।—সাহিত্যিকদেরও একটা সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের বিশেষ আবশ্যক।

আমাদের সাহিত্যে লেখকদের দান নিতান্ত কম নয়। সকলগুলি পাঠক পাঠিকাদের পড়তে পাওয়া সম্ভব নয়। তাদের মধ্যে অন্ততঃ শ্রেষ্ঠ দশখানির নাম, তাঁরা জানতে পারলে, যে কোনো উপায়ে, অনেকেই তা পড়তে পারেন। তাতে—সে বৎসরের ভালো বইগুলি দেখা হয়ে যায়। লেখকেরাও উৎসাহ পান। য়ুরোপে বৎসরের এই ফলাফল প্রকাশ করবার প্রতিষ্ঠান আছে, তাতে, শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলি, দেশের লোককে পড়িয়ে নিতে সাহায্য করা হয়। আমাদেরও পশুপতি থাকলে ভালো হয়।

আমাদের "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ", কখনো কখনো এ সম্বন্ধে চেষ্টা পেয়েছেন। এ গুরুভারটি, কর্ত্তব্য ব'লে, তাঁরা নিলেই বোধ হয় শোভন হয়। তার জন্যে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ থাকা আবশ্যক।

প্রগতি-প্রয়াসী জাতির এ সব গঠন-মূলক কথা ভাবতেও হবে। এ সব কথা আমাদের বাণী-মন্দিরের উত্তরাধিকারী রক্ষকদের জন্যে, যাঁরা তাঁর পূজা সম্ভার যোগাচ্ছেন ও যোগাবেন।

কথা-সাহিত্যে আজকাল অনেকেই কথ্য-ভাষা ব্যবহার করছেন। তাতে বানান-বিভ্রাট দিন দিন বেড়ে চলেছে এবং তা একটি সমস্যার সৃষ্টি ক'রেছে। সে সমস্যার সমাধান সত্বর করতে না পারলে বড় লজ্জার কথা দাঁড়িয়ে যাবে। যেমন 'করব' কথাটি, পুস্তকের দু' পৃষ্ঠায় দুই রকম রূপ নিয়ে নিত্যই ছেপে বেরিয়ে আসছে। এ সম্বন্ধে এই সম্মেলনের নাগপুর অধিবেশনে একটু বিস্তৃত আলোচনা করেছি। তারপর পাঁচ বৎসর গত হয়েছে; ইতিমধ্যে কিছু কিছু আলোচনাও হয়েছে, কিন্তু কিছু সাব্যস্ত হয়েছে কিনা, শুনিনি। কথ্য ভাষার প্রবর্ত্তক-প্রধানেরা এ সম্বন্ধে কথা কইলেই ভালো হয়।

আমাদের মাসিক সাহিত্য-পত্রিকাগুলি নিয়মিত ভাবে

সাহিত্যকে পুষ্ট করে চলেছেন। বিশেষ বিশেষ বিষয়ে প্রবন্ধাদি ছাড়া, প্রায়ই তাতে সাহিত্য বিষয়ক ও সাহিত্য-সম্বন্ধে চর্চ্চা ও তার রস-বিশ্লেষণ দেখতে পাই। প্রাচীন কবিদের অমর পদাবলী ও কাব্য ভাণ্ডারের সন্ধান ও রসাস্বাদ, পাঠকদের পক্ষে আজ সুলভ।

বাঙালী মুসলমান ভ্রাতাদের পরিচালিত ও সম্পাদিত 'মাসিক' কম কাজ করছে না। কবিদের উপভোগ্য পল্লী-কাব্যও পাচ্ছি। তাঁরা ফার্সি পড়ুন,—সে তো ভালো কথাই,—কিন্তু বাংলা যে তাঁদের মাতৃ-ভাষা, লিপি চাতুর্য্যে ও ব্যঞ্জনায়, তার প্রমাণ স্বপ্রকাশ।

পূর্ব্বে সংবাদ পত্রের ভাষা ছিল—সহজ, সরল, কর্ত্তব্য-কুশল। আজ লক্ষ্য করছি, তার ভাষাও ধীরে ধীরে সাহিত্যের আস্বাদ দিচ্ছে। সেও রস ও আনন্দের মধ্য দিয়ে বক্তব্য প্রকাশ করতে চাচ্ছে। আনন্দ পেতে ও দিতে—সকলেই চায়। সাহিত্যের প্রতি আমাদের তরুণদের টান তাই এতো স্বাভাবিক।

একটা নিজের কথাই বলি। কেহ কেহ থাকেন যাঁরা ছোট-কথা ক'ননা। আপনারা সেইরূপ একটি লোককেই ডেকেছেন। কথাটা বাহান্ন বৎসর পূর্ব্বের। আজ অতীতকে নমস্কার ক'রে ব'লতে হচ্ছে—

"এসে ছিল এক বসন্ত দিন"—

যৌবনের প্রারম্ভ। 'বঙ্গবাসী' তখন সাপ্তাহিক শ্রেষ্ঠ, তাতে শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের হাস্য ও বিদ্রূপ রস-প্রধান 'পঞ্চানন্দ', বাংলার পাঠকদের আনন্দ-উপভোগ তৃষ্ণা যে কতটা জাগ্রত করেছিল, আজ তা ব'লে বুঝান যাবেনা। পাঠক মাত্রেই তার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতেন।

সেই আনন্দ রস-দান প্রয়াস আমাকেও নেশার মত পেয়ে বসে। তাঁদের কাগজেই কিছুদিন মক্স করি। ইন্দ্রনাথবাবু দেখা করতে লেখেন। তখন গোঁফ্ ওঠেনি ব'লে, দেখা ক'রতে পারিনি,—বালক দেখলে পাছে দাম ক'মে যায়! এখনকার মত গোঁফ্ ফেলে, নিশ্চিন্ত হবার সুবিধা থাকলে, তাঁর সঙ্গে দেখাটা হয়ে যেত। যাই হোক্,—অপরিপক্ক বুদ্ধির পরিচয় বোধ হয় তিনি পেয়েই থাকবেন। তাঁকে একবার পত্র লিখে,—হাস্য-রস-ঘন একখানি উপভোগ্য মাসিক পত্রিকা প্রকাশের জন্য প্রস্তাব করে পাঠাই। উত্তরে তিনি লেখেন,—"এখনো তার সময় হয়নি,—লেখকের অভাব তৃতীয় মাসেই ঘটবে। দুইটি লেখক সম্বল ক'রে, মাসিক পত্রিকা চলেনা, অসাময়িক পত্রিকা চলে"; ইত্যাদি।—তখন ক্ষুণ্ণ হয়েছিলুম। আনন্দ বিতরণের, বা লোকের মুখে হাসি ফোটাবার কাজটি যে কত কঠিন,—অনেকদিন পরে সেটা বুঝি। এখন সে লেখকের উদয় হয়েছে; এতদিনে সে প্রচেষ্টা দেখাও দিয়েছে। তফাৎ এই—তখনকার লক্ষ্য ছিল—একটু আনন্দ দান। কঠিন বোধে তাও সাহসে কুলায়নি। এখন তার সঙ্গে 'কাজ' যোগ হয়ে, তাকে কঠিনতর করেছে।

বাল্যকালে আমাদের দিনগুলি কেটেছিল—বেতের দুর্ভাবনায়, আর রাতগুলি—গুরুমশাইকে স্বপ্ন দেখে,—আত্মরক্ষার উপায় চিন্তায়। পাঠশাল পালাবার প্রধান কারণই ছিল তাই। মাথাটাকে উত্তমাঙ্গ বলা হলেও, পা দুটাই সে পরিচয় দিত—প্রাণ বাঁচাতো। সহৃদয় সহপাঠীরাই তাই বোধ হয় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে, অপত্যদের নিরাপত্তা করবার উপায় চিন্তা করেন। তাতে দেশে শিশু-সাহিত্যের আবির্ভাব হয়। তখন রূপকথা, জীবজন্তুর কথা, ভূতের গল্প প্রভৃতির সাহায্যে ছেলেদের পড়বার আগ্রহ জাগে। পরে তাদের জন্যে সুন্দর সুন্দর রঙিন্ সচিত্র মাসিক পত্রিকাদির ও পূজা-বার্ষিকীর দেখা পাই,—যেমন সুদর্শন, তেমনি মনোজ্ঞ। হাসির কথা, শিকারের কথা, খেলার কথা, স্বাস্থ্য ও শরীর গঠনের কথা—সবই তারা পায়,— আনন্দসহ আগ্রহ সহকারে পড়ে। তাদের দিকে দৃষ্টি দিয়ে লেখকেরা দেশের সত্যিকার কাজ করছেন।

ক্রমে ধীরে ধীরে এখন তা Boys Book of Knowledge-এর কোঠায় এসে পৌছুচ্ছে। দেশ বিদেশের কীর্ত্তিমান পুরুষদের, মনস্বিনী নারীদের, জীবনী ইতিহাস তারা পাচ্ছে,—বিভিন্ন জাতির পরিচয় পাচ্ছে। বীর, বীরত্ব, আবিষ্কার, আবিষ্কারক, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য,—সবই তারা উপভোগ করছে। কি ক'রে সামান্য অবস্থায় থেকে খাওয়া-পরার অভাবের মধ্যে—ইচ্ছা ও অধ্যবসায় সম্বলে, তারা

কত বড় হয়েছে, দেশের কত কাজ, কত উন্নতি করেছে, এই সব অত্যাবশ্যকীয় কথায় শিশু-মন গঠিত হচ্ছে। এইটিই সবার বড় আনন্দ সংবাদ।

সাহিত্য-সম্বন্ধে বা সাহিত্য-সৃষ্টি সম্বন্ধে দু'এক কথা বলা, বোধহয় আমার কর্ত্তব্যের মধ্যে পড়ে। সুতরাং নিজের ধারণা মত সংক্ষেপে কয়েকটি কথা মাত্র সাহিত্যে নবীন ব্রতী, আমার প্রীতিভাজন তরুণদের বলি।

প্রথম কথা—আমরা যে-সময়ের লোক, তখন লেখায় বর্ণনা-বাহুল্য আমাদের বড়ই ভুগিয়েছিল। পড়ছি,—শয্যা ত্যাগান্তে চপলা দেখিলেন—প্রাতঃসূর্য্য দেখা দিতেছেন। তার পর তার রক্তিম আভা আমাদের রক্ত শোষণ করতে করতে, বিষয় বস্তুকে তিন পৃষ্ঠা পেছিয়ে দিলে। সূর্য্যদেবের দেখা দেবার বর্ণনাই প্রধান হয়ে আমাদের নানাকথা শোনালে। তাতে বিষয় বস্তু বাধা পায়, চপলার কাজ থেমে যায়। বর্ণনাটা দু'তিন ছত্রে সেরে ফেলাই ভালো।

দ্বিতীয়—উচ্ছ্বাস। উচ্ছ্বাস লেখকের মাথায় ভর করলে, সহজে থামতে চায়না। জড়োয়া-জহরাৎ পরাতে পরাতে, জিনিষটিকে ভারাক্রান্ত ক'রে ফেলে। সেও ওই বর্ণনারই বৈমাত্র। যত এড়ানো যায়, লেখা ততই স্বচ্ছ হয়, বলেই মনে হয়। অলঙ্কার-বর্জ্জিত হ'তে বলছি না, সেটা যেন সুসমঞ্জস হয়, শোভন হয়। বাহুল্যোক্তি না এসে পড়ে।

তৃতীয়—জীবন ও জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি নিয়ে সাহিত্য। তার মধ্যে চরিত্র সৃষ্টিই বোধ হয় প্রধান। অর্থাৎ—মানুষ-গড়া কাজ। মানুষ—দোষে গুণে। দুর্বৃত্ত বা নরহন্তা গড়ছি ব'লে, তার যে কোথাও দয়া স্নেহ মমতাদি কোমল ভাব একটু থাকবে না, সে 'মেসিন গনের' মত মানুষ-মারা লৌহ-যন্ত্রই হবে, তা না ক'রে ফেলি। ব্যাঘ্রের মধ্যেও বাৎসল্য আছে।

আদর্শ চরিত্রও গড়তে হয়। কিন্তু তিনিও মানুষ। কাম, ক্রোধ, লোভ, সাধুর মধ্যেও থাকে, তবে, সংযমের দ্বারা সংযত। তাই তিনি বড়।

এই কয়টির প্রতি দৃষ্টি থাকলে, বাইরের কাজ, মোটামুটি চ'লে যায়।

চতুর্থ,—সূক্ষ্ম যা—তা মনের ক্রিয়া। লেখকের নিজের মনই, অভিজ্ঞতা মত, ঈপ্সীত চরিত্রগুলি ফুটিয়ে তোলে। তাদের অবস্থা ও ক্রিয়াগুলির তখনি সুসঙ্গত রূপ তিনি দিতে পারেন, যদি সে সম্বন্ধে তাঁর দর্শন ও অভিজ্ঞতা তাঁর সত্যবোধ উদ্বুদ্ধ ক'রে থাকে। সেই সত্যাশ্রিত রসই—সাহিত্য-সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ উপাদান। লেখকের সংযত কল্পনাশক্তির সাহায্যে, সত্যানুভূতি-প্রণোদক যে সাহিত্য জন্ম নেয়, সেই সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করে। এই-ই আমার ধারণা।

আপনাদের সহিষ্ণুতাকে যথেষ্ট পীড়া দিয়েছি, সেজন্য ক্ষমা ভিক্ষা করি। এখন অশিষ্টতা হলেও পরিশিষ্টে বলি,—আমাদের যে বিভাগেই চাই—সকল বিভাগেই প্রধানদের শুকতারার মতই শুভ্র শান্ত দেখে শিউরে উঠি!—কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, চিত্র-শিল্পে অবনীন্দ্রনাথ, বিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্র, রসায়নে প্রফুল্লচন্দ্র, সম্পাদনে রামানন্দ—তেমন আনন্দ বর্দ্ধন করে না। শরৎচন্দ্র অবশ্য কেশে সাদা কলপ নিয়ে ভয় দেখাচ্ছেন!

এঁরা সকলেই অজস্র দানে ও অসম শ্রমে শ্রান্ত, ক্লান্ত। এঁদের কাছে শোনবার আকাঙ্ক্ষাই রাখি, শোনাবার স্পর্দ্ধা রাখি না। কেবল সবিস্ময়ে লক্ষ্য করি—এঁরা আজও যুবার মত, দেশের কর্ণধাররূপে অগ্রণী। এখনো দেশের দাবী মিটিয়ে চলেছেন। নিজের অশক্ত অবস্থার সপক্ষে কিছু বলতে তাই আমার বাধছে। তুলনা ক'রে নয় এখনো সে জ্ঞান হারাইনি। কিন্তু সত্য কথা এই,—সত্তরের পর আমি পুরো দেবোত্তর সম্পত্তি দাঁড়িয়ে গিয়েছি। আপনাদের কাছে কেবল ক্ষমা চাইবার জন্য উপস্থিত হয়েছি। প্রেমের আধার শ্রীচৈতন্যদেবের কথায় সাহস পেয়েই এসেছি। হরিদাস শেষ সময়ে, আর নিয়মিত নাম জপ করতে না পেরে বড় কাতর হচ্ছিলেন, তাতে চৈতন্যদেব নাকি বলেন,—"সাতাত্তর বছর, সাত মাস, সাত দিন হ'য়ে গেলে, ও-সব আর থাকে না,—না পারলে অপরাধ নেই।" সেটা পাঁচশো বছর পূর্ব্বের কথা। এখনকার জীবনের অনুপাতে সেটা অনেক পিছিয়ে এসে থাকবে। তার ত্রৈরাশিকই আমাকে সাহস জুগিয়েছে। জানি আপনারাও 'অচৈতন্য' নন,—হিসেবটা সহজেই বুঝবেন এবং আমার ক্রটী-বিচ্যুতি মার্জ্জনা করবেন।

একটি অপরাধ জ্ঞানতই করতে বাধ্য হয়েছি, শক্তিমান সাহিত্যিকদের নামোল্লেখ করা আমার কর্ত্তব্যের অন্যতম ছিল। নানা কারণে তা পারিনি। তাঁরা অনেকেই আমার পরিচিত ও প্রিয়। যাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয় নাই তাঁরাও আমার প্রীতিভাজন। স্মৃতির উপর নির্ভর ক'রে পাছে কারো প্রতি অবিচার ক'রে বসি, তাই সাহস পেলুম না, ব্যথাই পেলুম। তাঁদের ভাষা, তাঁদের কাব্য-মধুর উপভোগ্য প্রকাশভঙ্গী, নূতন সাড়া দিয়েছে।

এখন সকলকে শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ণ নমস্কার নিবেদন ক'রে ও ভালবাসা জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করি।

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বীমা ও বাণিজ্য

শ্রীপ্রদ্যোতকুমার বসু

জেনারেল এ্যাসিওরেন্স কোং লিঃ

(আজমীরে প্রতিষ্ঠিত)

জেনারেলের কথা বল্‌তে গেলেই মনে পড়ে একনিষ্ঠ কর্ম্মী মিঃ পি, ডি, ভার্গবের কথা। তাঁর একাগ্র চেষ্টায় জেনারেল বছর বছর যে ভাবে কাজ করে চলেছে তাতে আশা করা যায় অচির ভবিষ্যতে আমরা জেনারেল এ্যাসিওরেন্সকে একটী প্রথম শ্রেণীর বীমা প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখ্‌তে পাবো। এখনো এর অবস্থা বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধ। বছর বছর এঁদের যা কাজ হয়েছে, তার তালিকা দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে কষ্ট হবে না যে এঁদের অবস্থা ক্রমশঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ১৯৩১ সালে এঁরা নতুন কাজ করেছেন ৩১,৮৬,৫০০৲ টাকার। সে বছর প্রিমিয়াম বাবদ আয় ছিল, মোট ১২,৫৭,৯৫৯ টাকা। ১৯৩২ সালে নতুন কাজ করেছিলেন ৩৫,২২, ২৫০ টাকার। সে বছর বার্ষিক প্রিমিয়াম বাবদ আয় ছিল ১৩,২৯,৫০৪ টাকা। ১৯৩৩ সালে নতুন কাজ করেছেন, ৪৭,৭৬,০০০ টাকার। এ বছর প্রিমিয়াম বাবদ আয় ছিল, ১৪,৫৩,৭৮৯ টাকার। ১৯৩৩ সালে ঐ আয় থেকে সব জড়িয়ে ব্যয় হয়েছিল, ৮,১৫, ১৩৮ টাকা। ব্যয় বাদে মোট ৬,৩৮,৬৫১ টাকা জীবন-বীমা ফাণ্ডে জমা হয়েছিল। অবশ্য এ বছর তার আগের বছরের চেয়ে ব্যয় হারটী কিছু বেশী হয়েছিল। এ বছর ব্যয় হার ছিল ৩৫·৯%—তার আগের বছর ছিল ৩·৪% কম।

তা হোক্‌, যেমন আয়ের হার বেড়েছে তেমনই ব্যয়ের অঙ্কও বেড়েছে। কিন্তু অনুপাতে সন্তোষজনক অঙ্ক পাওয়া যাবে—আয়ের ঘরে। আমরা জেনারেল এ্যাসিওরেন্সের অধিকতর উন্নতি কামনা করি।

ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া এ্যাসিওরেন্স সোসাইটী কোং লিঃ

(সাঙ্গলী সিটি)

বীমা কোম্পানির কাজের আকর্ষণ অনেকটা নির্ভর করে তাঁদের বোনাসের হারের ওপর। অবশ্য এ আকর্ষণই সে প্রতিষ্ঠানের শেষ কথা নয়। তাহ'লেও বোনাস দেখ্‌লে পরিষ্কার দেখা যায় কর্ম্মকর্ত্তারা বীমাকারীর স্বার্থের দিকে কেমন নজর রাখেন।

সে হিসেবে ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া উল্লেখযোগ্য। তাঁদের বোনাসের অঙ্ক খুব উজ্জ্বল।

আজীবন বীমায় এঁরা হাজার করা পঁচিশ টাকা এবং মেয়াদী বীমায় হাজার করা কুড়ি টাকা বোনাস ঘোষণা করেছেন। ১৯৩১, '৩২, '৩৩ সালের কাজ এবং আয়ের পরিমাণ দেখ্‌লে এভাবে এঁদের বোনাস ঘোষণা করা অসঙ্গত বলে মনে হ'বে না। নীচে **হাজারের অঙ্কে** তাঁদের কাজের ও আয়ের পরিমাণ দেওয়া গেল :—

	১৯৩১	১৯৩২	১৯৩৩
নতুন কাজ,—	৩১,৫৩	৩৭,১৩	৩৭,৪৮
নতুন কাজ বাবদ প্রিমিয়াম আয় —	১,৬৭	১,৯৬	১,৯৮
মোট প্রিমিয়াম আয়—	৮,২৬	৯,৩৮	১০,৫১
তহবিল—	২৮,৪৭	৩৫,১৯	৪১,৯৬

এঁরা টাকা লগ্নিও করেছেন যথেষ্ট বিবেচনার সঙ্গে। সেটাও বীমা কোম্পানীর সারবত্তার পরিচায়ক। বীমাকারীর স্বার্থ যেমন, তেমনি অংশীদারদের স্বার্থ দেখাও কোম্পানীর সমান ভাবে প্রয়োজন। এঁদের টাকা লগ্নির

ব্যবস্থা সুসঙ্গত হওয়ায় অংশীদারদের স্বার্থ বিশেষ ভাবে সুসংরক্ষিত।

আসাম ও বাংলার প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা মিঃ এস, সি, দাস এ প্রদেশে প্রতিষ্ঠানটীর কাজের বিষয়ে বিশেষ চেষ্ট কচ্ছেন। কামনা করি তাঁর চেষ্টা সফল হোক।

ইনডিয়ান মিউচুয়াল লাইফ এসোসিয়েশান লিঃ

খুব বেশী আবেদন পত্র পাওয়া বা সেই মত খুব বেশী কাজের পরিমাণ হওয়াই বীমা কোম্পানীর শ্রেষ্ঠ পরিচয় নয়। আবেদন পত্র বাছাও একটা মস্ত কাজ। কারণ, একবার পলিসি ইস্যু হয়ে যদি বন্ধ হয়ে যায়, সেটা বীমা কোম্পানিরও যেমন বীমাকারীরও তেমনি অসন্তোষের ও অগৌরবের জিনিষ হয়ে ওঠে। ইনডিয়ান মিউচুয়াল এসোসিয়েশান দেখা যায় আবেদন পত্র নির্ব্বাচনে খুব সাবধান। ১৯৩২ সালে ৬২৬ খানা আবেদন পত্র পাওয়া সত্ত্বেও এঁদের কার্য্যত ৬,২৬,৭৫০ টাকার ওপর ৪৬২ খানা মাত্র বীমাপত্র ইস্যু হয়েছিল।

চোখে পড়ে, কাজের পরিমাণ বেড়ে গেলেও খরচের হার কেমন নেমে এসেছে। ১৯৩১ সালে প্রিমিয়াম বাবদ আয় হয়েছিল ৭৯,০৫৩ টাকা। সে জায়গায় ১৯৩২ সালে হয়েছিল, ৯৩,৩০৫ টাকা। আর মোট আয় ১৯৩১ সালে ছিল ৮২,৭৭৩ টাকা। কিন্তু ১৯৩২ সালে সেটা বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ৯৯,৫৩৬ টাকায়। মৃত্যুর হার অতি অল্প। হ'বেই তো। আবেদন পত্র দেখে শুনে গ্রহণ করলে, কেন অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হতে হ'বে?

কমন্ ওয়েলথ এসিওরেন্স লিঃ

যদিও বেশীদিন প্রতিষ্ঠিত হয়নি তবু আমরা জোর করে বলতে পারি, এত অল্পদিনে এমন সন্তোষজনক ফল পাওয়া বীমা-জগতে একটা গৌরবের কথা। সে গৌরব কমন্ ওয়েলথের ন্যায়তঃ প্রাপ্য। মাত্র ১৯২৯ সালে এঁদের কাজ আরম্ভ হয়েছে। তবুও, ইতিমধ্যে হাজার করা আজীবন বীমায় দশ এবং অন্য পদ্ধতির বীমায় বারো টাকা বোনাস ঘোষণা করা হয়েছে। ৩০শে এপ্রেল ১৯৩৩ সালে এঁদের যে বছর শেষ হয়েছে সে বছর দেখা যায় এঁদের নতুন কাজের পরিমাণ ছিল, ১২,৩১,২৫০৲ টাকার। তার আগের বছর ছিল, ১০,৫৪,০০০ টাকার। ৩০শে এপ্রেল ১৯৩৪ সালের যে বছর শেষ হয়েছে সে বছর কাজের পরিমাণ ছিল, ১৮,২৭,২৫০ টাকা। কেমন পরিষ্কার উন্নতি। আশা হয়, ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

সান লাইট অফ ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স

লাহোরে এঁদের হেড অফিস্। কাজ ভালভাবে অগ্রসর হচ্ছে তার পরিচয় আছে। বিভিন্ন প্রকার বীমা-পদ্ধতি এঁদের একটা বিশেষ আকর্ষণ। যেমন ডবল এনডাউমেন্ট। ছেলেমেয়েদের বিবাহ ও লেখাপড়ার জন্যে বীমা-পদ্ধতি আছে। বেশ ভালো বন্দোবস্ত। সকলের উপযোগী।

বীমার প্রসার হওয়া আমাদের দেশে কত প্রয়োজন আছে, এ ধারণা যাঁদের আছে, তাঁরা বুঝবেন নতুন প্রতিষ্ঠিত বা অল্পদিন প্রতিষ্ঠিত কোনো প্রতিষ্ঠানই নিরর্থক নয়। তাঁদের সাহায্য করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। সেদিন এসেছে।

শ্রীপ্রদ্যোতকুমার বসু
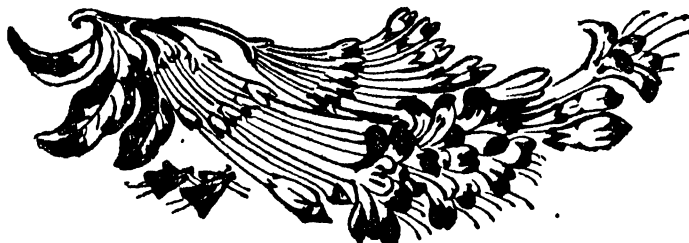
শ্রীসুশীলকুমার বসু

না-মঞ্জুরি পুলিশ ব্যয়

আমাদের ধন প্রাণ ও ন্যায়সঙ্গত স্বাধীনতা এবং অধিকার নিরাপদ রাখিবার জন্য, সমাজের সুশৃঙ্খল অগ্রগতির জন্য দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা অব্যাহত রাখা সবিশেষ দরকার। এই শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যেমন দেশবাসী সকলের কর্তব্য আছে তেমনি দেশের রাজসরকার যাহাতে এই দায়িত্ব পালনের পক্ষে শক্তিহীন হইয়া না পড়েন, এজন্য যথোপযুক্ত খরচ করিবার সামর্থ্য তাঁহাদের থাকে, তাহার জন্য করভার বহনও দেশবাসীকে করিতেই হইবে।

কিন্তু, এই করভার কতটা হইবে, কি ভাবে তাহা ব্যয় হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার মধ্যে দেশবাসীর হাত থাকা উচিত। আমাদের আইনসভাগুলির বিশেষ কোন ক্ষমতা না থাকিলেও বা নামমাত্র থাকিলেও দেশের পুলিশের ব্যয়ের জন্য এই সভার মঞ্জুরি লইতে হয়। এই আইন-সভার সিদ্ধান্ত সবক্ষেত্রে চরম না হইলেও, এখানকার আলোচনা ও তর্কবিতর্কের ফলে, সরকারকে জনমতের প্রভাব বিশেষভাবে অনুভব করিতে হয়, এবং প্রত্যক্ষ লাভ তাহার দ্বারা সব সময় না হইলেও, পরোক্ষলাভ নিতান্ত কম হয় না।

দেশের সামরিক এবং পুলিশ ব্যয়ের বরাদ্দ যে দেশের লোকের এবং আইনসভাগুলির সমালোচনার বিষয় হইয়াছে তাহার কারণ, ইহা নয় যে, বাহিরের বিপদ হইতে আত্মরক্ষায় অথবা আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষায় তাঁহারা—উদাসীন; দেশের অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজের জন্য ব্যয়ের তুলনায় এই ব্যয়ের অত্যন্ত মাত্রাধিক্যই এই অসন্তোষের কারণ। দেশের নিরাপত্তা এবং শান্তিশৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও, এই সকল ব্যয় বহুল পরিমাণে কমান যাইতে পারে এবং সেই উদ্বৃত্ত টাকার দ্বারা জাতিগঠনের পক্ষে অত্যাবশ্যক অন্যান্য কার্য্য করা যাইতে পারে, ইহাই তাঁহাদের বলিবার কথা।

বর্ত্তমানে প্রাদেশিক সরকার পুলিশের জন্য যে ব্যয় মঞ্জুর করেন, দেশের লোক তাহা অত্যধিক মনে করিলেও, পুলিশের খরচার জন্য তাহাই একমাত্র ব্যয় নহে। চৌকিদারি ট্যাক্সের আকারে প্রতি বৎসর দেশের লোকের নিকট হইতে বহুলক্ষ টাকা আদায় হয়, এবং তাহার দ্বারা বহুসহস্র চৌকিদারকে পোষণ করা হয়। চৌকিদারেরা গ্রাম্যপুলিশ এবং ইহাদের জন্য যে ব্যয় হয়, তাহাও পুলিশের বাবদ ব্যয় বলিতে হইবে। দেশের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যদি চৌকিদারের প্রয়োজন এবং তাহার জন্য ব্যয় অপরিহার্য্য হয়, তাহা হইলে, এই বাবদে যে আয় এবং ব্যয় হয় তাহা প্রাদেশিক সরকারের হাতে যাওয়া উচিত। কারণ এইরূপে পুলিশের জন্য যে ব্যয় হয় তাহা, সাধারণ ভাবে দেশের লোকের দৃষ্টি এড়াইয়া যায় এবং পুলিশের জন্য আমাদের যে ব্যয়ভার বহন করিতে হয়, তাহার হিসাব লইবার সময় আমরা এই বিপুল অঙ্কটা বাদ দিয়া থাকি। প্রদেশের শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করিবার তাহার ব্যয়ভার বহন করিবার এবং তাহার জন্য কর গ্রহণ করিবার অধিকার ও দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারের। যেভাবে এই ব্যবস্থা করিতে হইবে, যেভাবে এবং যত ব্যয় করিতে হইবে ও কর আদায় করিতে হইবে, তাহাকে সমালোচনা ও

জনমতের সম্মুখীন হইতে হইবে বলিয়া, তাহার অপব্যবহারের সম্ভাবনা কম থাকিবে। এই কারণেই এই ব্যবস্থার কোন আংশিক ভারও প্রাদেশিক সরকারের নীচে আর কাহারও হাতে থাকা যুক্তিযুক্ত নহে।

ইহা ব্যতীত, চৌকিদারদিগের দ্বারা গ্রামের শান্তিরক্ষার কাজ কিছুমাত্র হয় কিনা তাহাও দেখা দরকার। দাঙ্গা-হাঙ্গামা অথবা শান্তিভঙ্গের খুব ছোটখাটো সম্ভাবনায় লোকের থানায় খবর দিতে হয় এবং সম্ভাবনা গুরুতর হইলে খুব সচেষ্ট হইয়া সশস্ত্রপুলিশের সাহায্য লইতে হয় (অবশ্য অধিকাংশক্ষেত্রে সাহায্য পৌঁছিবার পূর্ব্বেই বিবাদ যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়া যায়)। চৌর্য্য, দস্যুতা প্রভৃতি নিবারণেও যে ইহারা বিশেষ সহায়তা করিতে পারে, এমন মনে হয় না। জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিবার জন্য অথবা থানায় কোনপ্রকার সংবাদাদি প্রেরণের যে কার্য্য বর্ত্তমানে ইহাদের দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে, তাহা অনেক কম লোকের দ্বারা চলিতে পারে।

ইহার অন্য একটা দিকও আছে। সহরবাসীদের অপেক্ষা পল্লীবাসীরা অনেক বেশী দরিদ্র, এবং সহরে নানাশ্রেণীর, নানাধর্ম্মের ও নানামতের লোকের একত্র সমবায় খুব বেশী হয় বলিয়া, ইহা সর্ব্বপ্রকারের ভাবপ্রচারের কেন্দ্র বলিয়া এখানে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা ও শান্তিরক্ষার দায়িত্ব অনেক বেশী; অথচ সহরবাসীদিগকে নূতন করিয়া ইহার জন্য কর দিতে হয় না।

ইউনিয়নবোর্ড সমূহের আয়ের সম্পূর্ণ বা অধিকাংশ যদি চৌকিদারদিগের মাহিনা দিতে ব্যয় হইয়া না যাইত অথবা এই আয়ের অধিকাংশ যদি পল্লীর রাস্তাঘাট, পানীয়-জল, জলনিকাশ, প্রভৃতির ব্যবস্থা করায় এবং কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে ব্যয় করা সম্ভব হইত তবে, পল্লীগুলির উপর সুবিচার হইত এবং বোর্ডগুলিও প্রকৃতপক্ষে জনহিতকর ও জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইত।

হিন্দু সমাজ সংস্কার ও পাঁজিয়া সারস্বত পরিষদ

যাহাকে উপলক্ষ্য করিয়াই দেশের মধ্যে যখন চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা থাকে তখন তাহার গতি জাতীয় জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রেই সঞ্চারিত হইয়া মানুষকে সর্ব্বপ্রকার ত্রুটি সংশোধন ও অগ্রগতির জন্য সচেষ্ট করিয়া তুলে। হিন্দু-সমাজের প্রথাগত যে সকল দোষ ত্রুটি এই সমাজকে ধ্বংসপথের যাত্রী করিয়াছে, ইহার বহুশত আভ্যন্তরীণ বিভাগ তাহার মধ্যে প্রধান এবং অস্পৃশ্যতা ইহার তীব্রতম অবস্থা। এই অবস্থা দূরীভূত না হইলে, সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর সম্পূর্ণ ঐক্যবিধান না ঘটিলে এই সমাজের শক্তি ও স্বাস্থ্যলাভ অথবা অবাধ অগ্রগতি একেবারেই অসম্ভব। রাষ্ট্রিক আন্দোলনের উত্তেজনা এই দুর্ব্বলতা দূর করিবার জন্য আমাদের মধ্যে কতকটা সচেষ্টতা আনিয়া দিয়াছিল। কিন্তু, আমরা যখন ক্রমে দেখিতে পাইলাম যে, রাষ্ট্রিক ব্যাপারেও আমাদের শক্তিহীনতার মূলে রহিয়াছে, আমাদের সাম্প্রদায়িক এবং জাতিগত সহস্র বিভাগ এবং হিন্দুসমাজের অনৈক্য ও দুর্ব্বলতাই ইহার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দায়ী, তখন ইহা দূর করিবার জন্য আমরা বিশেষভাবে সচেষ্ট হইলাম।

গোলটেবিল বৈঠকে এবং তাহারও পূর্ব্বে হিন্দুদের মধ্যে যে পরস্পর বিরোধী রাজনীতিক স্বার্থ ও আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়াছিল, প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় যখন তাহা স্থায়ী হইতে চলিল তখন, মহাত্মা গান্ধী তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া এই পাপ দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। বিপুল উত্তেজনার মধ্য দিয়া কাজ আরম্ভ হইল বটে, কিন্তু, ইহার পূর্ব্বে অনেকদিন ধরিয়া দেশে রাজনীতিক আন্দোলন চলিতে থাকায়, এইরূপ কার্য্যে লোকের উৎসাহ প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছিল; কাজেই এই উত্তেজনা অধিকদিন স্থায়ী হয় নাই। তাহা ছাড়া, এইরূপ কাজে একদিকে যেমন উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য চাই, অন্যদিকে আবার তেমনই ধীর এবং ধৈর্য্যশীল কর্ম্মশক্তি চাই। এইক্ষেত্রে উত্তেজনাকে অধিকদিন স্থায়ী করিবার জন্য শেষোক্তগুণসম্পন্ন যথেষ্ট সংখ্যক কর্ম্মীর প্রয়োজন। এই শেষোক্ত শ্রেণীর উপযুক্ত সংখ্যক কর্ম্মীর অভাবও উত্তেজনা থামিয়া যাইবার আংশিক কারণ।

কিন্তু, একথা মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের

নানাপ্রকারের ভেদ ও বিভাগ সমূহ দূর করিতে না পারা পর্য্যন্ত কোনক্ষেত্রেই আমাদের জাতীয় উন্নতি সম্ভব হইবে না। এই উদ্দেশ্যে হিন্দু ও মুসলমানের মিলনও অত্যাবশ্যক; কিন্তু, ইহারও জন্য এবং ইহারও পূর্ব্বে বিভিন্নশ্রেণীর হিন্দুর ঐক্যবিধান প্রয়োজন। হিন্দু ও মুসলমানের মিলন আবশ্যক ও সম্ভব হইলেও এই দুই সম্প্রদায়ের এক সমাজভুক্ত হইয়া সর্ব্ববিষয়ে এক হইয়া যাওয়া অনেকটা অসম্ভব—অন্ততঃ অদূর ভবিষ্যতে। মুসলমানেরা একটি সংঘবদ্ধ সম্প্রদায়,—হিন্দুরা বহু জাতিতে বিভক্ত। মুসলমানদের সহিত হিন্দুদের মিলনের অর্থ, হিন্দুদের কোন এক সম্প্রদায়ের মিলনমাত্র। ইহা ব্যতীতও হিন্দুদের বহুতর বিভাগ রাজনীতিকক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমান সমস্যা ব্যতীত অন্যান্য সমস্যারও উদ্ভব করিয়াছে। এই জটিলতাকে সরল করিবার জন্যও হিন্দুদের মিলন, সাম্প্রদায়িক নহে, জাতীয় মঙ্গলের পরিপোষক। হিন্দু মুসলমানের মিলনকেও সহজ ও সরল করিবার জন্য উভয় সম্প্রদায়েরই ভিতরের ছোট ছোট পার্থক্যগুলিকে প্রথম নষ্ট করিতে হইবে, তাহা হইলে এই দুই সম্প্রদায়ের মিলন অনেকটা সহজ ও সরল হইবে। কিন্তু, উত্তেজনার সময় যে কাজ আরম্ভ হইয়াছিল, শান্তির সময় যাহাতে তাহা থামিয়া না যায়, যতটুকু অগ্রসর হওয়া গিয়াছিল, সেখান হইতে যাহাতে পিছাইয়া না আসিতে হয়, তাহার জন্য কর্ম্মীদের দায়িত্ব বাড়িয়া গিয়াছে। সমাজকে আঘাত দিয়া, বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে সমাজের সংস্কারমূলক মনোভাব জাগাইয়া রাখিতে হইবে।

হরিজন আন্দোলনে অস্পৃশ্যতার যতটুকু সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেটুকু মাত্র লইয়া কাজ করিতে গেলে বাংলায় কিছুই করিবার নাই বলিতে হইবে। এখানে আর একটু অগ্রসর হইয়া কাজে নামিতে হইবে। অবশ্য সমাজকে আঘাত দিবার সময় একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে, এই প্রকার কাজের সাফল্য নির্ভর করিবে, সমাজ কতটা সহ্য করিতে পারিবে, তাহা সঠিক নির্দ্ধারণ করিবার উপর। আঘাত সহ্যের সীমা ছাড়াইয়া গেলে, সমাজ আঘাত কারীদের ঝাড়িয়া ফেলিতে পারে, এবং আঘাত কম হইলে কার্য্য সিদ্ধ হইতে বিলম্ব হইবে।

বর্ত্তমানে, লক্ষ্য করিলে একটা জিনিস দেখা যাইবে যে, ব্যক্তিগত জীবনে আহারাদি বিষয়ে কেহই পূর্ব্বনিয়ম পালন করিতেছেন না। জীবন সংগ্রামের তীব্রতা ও ছুটাছুটি যত বাড়িয়া যাইবে, আহারাদি সম্পর্কে নিয়মরক্ষা ততই অসম্ভব হইবে। এখনও সহরে, কর্ম্মস্থানে সর্ব্বত্র আমরা আচার লঙ্ঘন করিয়া শুধু যেখানে এবং যেভাবে তাহা লঙ্ঘন করিলে, কিছু সুফল পাওয়া যাইতে পারিত, সেখানেই কঠোরভাবে তাহা পালন করি। নূতনকালের পরিবর্ত্তিত অবস্থা আহারাদি সম্বন্ধে আমাদিগকে পূর্ব্বনিয়ম বর্জ্জনের দিকে লইয়া যাইতেছে এবং অনেকটা গিয়াছে। কাজেই, আশা করা যাইতে পারে সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে পরস্পরের অন্নগ্রহণের প্রচলন চেষ্টা সফল হইতে পারে—নূতন কালও এদিকে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

আবার অন্যদিকে দেখিতে পাই, একত্র ভোজন মানুষের ঐক্য প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সহায়তা করে। উৎসবে আনন্দে একত্র ভোজন আত্মীয়তা দৃঢ় করে, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন সকলে একত্র হইয়া ভোজনে আমরা বিশেষ তৃপ্তি পাই। এই একত্র ভোজনের নিষিদ্ধতাই আবার অনুন্নতদের পক্ষে নানাস্থানে বিশেষ অসুবিধা ও ফলে বিক্ষোভের কারণ হইয়া উঠে।

কাজেই, বাংলাদেশে হিন্দুসমাজের ঐক্যবিধানের পন্থাস্বরূপে কর্ম্মীরা সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর প্রকাশ্যে একত্র ভোজনের ব্যবস্থা প্রচলনের চেষ্টা করিতে পারেন। চেষ্টা অবশ্য পল্লীকেই কেন্দ্র করিয়া করিতে হইবে; কারণ, সহরের চেষ্টায় ভাব প্রসারিত হইলেও, সমাজকে তাহা স্পর্শ করে না। কর্ম্মীদিগকে এজন্য অবশ্য বিশেষ দৃঢ়তার সহিত বাধা অতিক্রম করিতে হইবে। ইহার সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ দিক হইতেছে যে, এই সংগ্রাম অপরের সহিত নহে, ইহা নিজেদের সহিত, নিজেদের স্বার্থের সহিত এবং অনেকক্ষেত্রে নিজেদের অন্তরের সহিত।

* যশোর জেলার পাঁজিয়া সারস্বত পরিষদ তাঁহাদের অন্যান্য নানাকাজের সহিত ধারাবাহিকভাবে সমাজসেবার জন্য যে সকল কাজ করিতেছেন তাহা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। গত বড়দিনের ছুটিতে ইঁহারা সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর একত্র

অন্নভোজনের যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাতে আমাদের যোগ দিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। সেদিন সর্ব্বশ্রেণীর বহুশত হিন্দুর একত্র ভোজনের মধ্যে যে ঐক্যোপলব্ধি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়াছিল এবং যে কর্ম্মোন্মুখ উৎসাহের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা সমগ্র সমাজ দেহে সঞ্চারিত হইলে, হিন্দুসমাজ রক্ষা পাইবে এবং সমগ্র জাতি শক্তিশালী হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িকতা

বাংলা সরকারের শিক্ষাবিভাগ কর্ত্তৃক মুসলমানদের শিক্ষা বিষয়ে পরামর্শদানের নিমিত্ত নিযুক্ত সমিতির রিপোর্টে, বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যানুপাতানুসারে সিনেটের ভারতীয় সভ্যদের মধ্যে মুসলমান সদস্যদের সংখ্যানুপাত দাবী করা হইয়াছে। সিণ্ডিকেটেও মুসলমান সদস্যদের জন্য রক্ষিত আসনের দাবী করা হইয়াছে।

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িকতা সম্বন্ধে আমরা ১৩৪০এর শ্রাবণসংখ্যা 'বিচিত্রা'য় যাহা লিখিয়াছিলাম, বর্ত্তমানক্ষেত্রে তাহার পুনরাবৃত্তি অন্যায় বা অসঙ্গত হইবে না।

সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন কোনক্ষেত্রেই শুভ ফলদায়ক নহে। ইহা ভেদবুদ্ধির সৃষ্টি করে এবং তাহা জাগাইয়া রাখে। সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিরা স্বভাবতঃই নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থ দেখেন,—এমন কি তাহা ন্যায়ধর্ম্ম ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের স্বার্থের বিরোধী হইলেও। সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনে যোগ্যতার সার্ব্বজনীন প্রতিযোগিতা থাকে না বলিয়া, পশ্চাদ্বর্ত্তী সম্প্রদায়ের যোগ্যতা লাভের প্রয়োজন এবং আকাঙ্ক্ষা কমিয়া যায় এবং ইহা তাঁহাদের প্রগতির পথে বিঘ্ন উৎপাদন করে। অন্যদিকেও যোগ্যতার উপযুক্ত ক্ষেত্রেও পুরস্কার না থাকায়, অগ্রবর্ত্তী সম্প্রদায়ের মধ্যেও যোগ্যতা লাভের ও রক্ষার জন্য চেষ্টা কমিয়া যায়। নির্ব্বাচনে সাফল্য লাভের জন্য যাঁহাদের শুধুমাত্র নিজ সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির উপর নির্ভর করিতে হইবে, তাঁহারা অবিরত ইহাকে শান দিতে থাকিবেন এবং নিজেদের সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক কার্য্যকে যোগ্যতার নিদর্শন বলিয়া প্রচার করিবেন। কাজেই, ইহা কোন সম্প্রদায়েরই হিত করিতে পারিবে না, এবং সকল সম্প্রদায়েরই ক্ষতির কারণ হইবে। শুধু তাহাই নহে, ইহার অনিষ্টকারিতা কখনই বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানার মধ্যে মাত্র আবদ্ধ থাকিবে না। তাহা সমগ্র জাতীয়চিত্তকে কলুষিত করিয়া বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িকতাকে আরও বাড়াইয়া তুলিবে।

সাম্প্রদায়িকতা রাষ্ট্রে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে

জাতীয় জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রেই সাম্প্রদায়িকতা ক্ষতিকর এবং অবাঞ্ছনীয়। কিন্তু, রাষ্ট্রে তবুও সাম্প্রদায়িকতা-বাদের একটা কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। যখন কোনও সম্প্রদায়ের মনে দেশের অন্যলোকদের সম্বন্ধে সন্দেহ ও অবিশ্বাস থাকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের যোগ্যতার উপর যথেষ্ট আস্থা না থাকে, তখন রক্ষাপ্রাচীরের অন্তরালে তাঁহারা এইজন্য আশ্রয় চাহিতে পারেন যে, অপর পক্ষের হাতে গেলে, তাহা তাঁহাদের স্বার্থ ও প্রগতির বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে। দেশের রাষ্ট্র ক্ষমতা যদি কোনও সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে নানাদিক দিয়া তাঁহাদের ক্ষতি হইতে পারে, স্থায়ী স্বার্থের ব্যাঘাত হইতে পারে এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতি নষ্ট হইতে পারে।

আবার এমনও হইতে পারে যে, কোনও সম্প্রদায়ের মনে এরূপ দুরভিসন্ধি আছে যে সাম্প্রদায়িকতার সাহায্যে তাঁহারা দেশের অন্যান্য লোকের উপর এমন কতকগুলি সুবিধা লইতে পারিবেন, যাহা অন্যপ্রকারে সম্ভব হইবে না। এবং সেই জন্যই তাঁহারা রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িকতার সমর্থন করেন।

রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভবের যে কয়টি সম্ভবযোগ্য কারণের কথা বলা হইল, তাহার ভিত্তি কতকগুলি ধরিয়া লওয়া জিনেষের উপর। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার কোনটিই প্রয়োজ্য নহে।

কিন্তু, বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িকতার সমর্থনে আপাত যুক্তিযুক্ত কোনও সম্ভবযোগ্য কারণও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কোনও একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের হাতেও যদি কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃত্ব পড়ে এবং তাহারা নিজ স্বার্থ দেখিতে ও অপর সম্প্রদায়ের ক্ষতি করিতে ইচ্ছুক থাকেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের তাহা করিবার সুযোগ কোথায়? জনমত এবং রাষ্ট্রবিধি উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা কোনও সম্প্রদায়ের

বিদ্যালয়ে প্রবেশ বা শিক্ষণগ্রহণে বাধাদান করিতে পারেন না; অথবা নিজ সম্প্রদায়ের ছেলেদের কোনও প্রকার অন্যায় সুযোগও দান করিতে পারেন না। ইচ্ছা করিলেই কোনও শিক্ষক কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের ছাত্রকে কম বা বেশী শিখাইতে পারেন না, অথবা কোনও সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় কোনও ধর্ম্ম-সাম্প্রদায়িক নীতির পক্ষে বা বিপক্ষে পরিচালিত হইতে পারে না। একমাত্র হয়ত বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বা কর্ম্মচারী নিয়োগে কিছু পক্ষপাতিত্বের স্থান থাকিতেও পারে। কিন্তু, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর গবর্ণমেণ্টের যথেষ্ট কর্ত্তৃত্ব থাকায় তাহাও সম্ভব হইবে না,—কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া কাহারাও গুণ বা যোগ্যতা অনাদৃত থাকিতে পারিবে না। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িকতার প্রতিষ্ঠা করিয়া কাহারও কোন প্রকার লাভ হইবে না, বরং অতিরিক্ত ক্ষতি এই হইবে যে একমাত্র শিক্ষার মধ্য দিয়া যাহা দূর হইতে পারিত, এখানেও তাহাকে টানিয়া আনিয়া জাতির ভবিষ্যৎকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করা হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে কাহাদের কর্ত্তৃত্ব থাকা উচিত

বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবিক পক্ষে কাহাদের? দেশের সর্ব্বসাধারণের, অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁহাদের স্বার্থ আছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁহারা শিক্ষালাভ করিয়াছেন, যাঁহারা শিক্ষার সহিত সম্পর্কিত আছেন এবং যাঁহাদের পুত্রকন্যা ও আত্মীয়েরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদের? দেশের জনসমষ্টির মধ্যে কোনও একটি সম্প্রদায়ের লোকের সংখ্যাধিক্য আছে বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃত্ব তাঁহাদের হাতে থাকা উচিত অথবা যাহাদের চেষ্টা, উদ্যম, ও উৎসাহে এবং যাহাদের অর্থে আত্মত্যাগে ও বিদ্যায় বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছে, জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সেই শিক্ষিত সাধারণের হাতে ইহার পরিচালন ভার থাকা উচিত তাহাও বিশেষ ভাবে ভাবিয়া দেখা দরকার।

বিশ্ববিদ্যালয়ে কাহাদের প্রতিনিধি থাকা উচিত সে সম্বন্ধে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় অনুসন্ধান সমিতির নিকট ঐ প্রদেশের ২৬ জন বিশিষ্ট শিক্ষা বিশেষজ্ঞ যে বিবৃতি দান করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহারা বলিয়াছেন, "আমাদের ধারণানুসারে যথাযথভাবে গঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে, (১) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের, (২) বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলেজ, বিশেষ করিয়া ডিগ্রীকলেজের শিক্ষকদিগের (৩) রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েটদিগের, (৪) অনুমোদিত উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদিগের, (৫) অনুমোদিত বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানগুলির কর্ত্তৃপক্ষের, (৬) এবং সিনেট কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত, বিভিন্নক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠ ও প্রতিনিধিস্থানীয় জননেতাদের মধ্য দিয়া জনসাধারণের উপযুক্ত প্রতিনিধি থাকা উচিত।

আমাদের বিবেচনায় এই প্রতিনিধি নির্ব্বাচন সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক স্বার্থবর্জ্জিত সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক নীতিতে হওয়া উচিত এবং ইহা এমন ভাবে ব্যবস্থিত হওয়া উচিত, যাহাতে কোনও প্রকার সাম্প্রদায়িক মনোভাবের সৃষ্টি না হইতে পারে।"

ইঁহাদের এই উক্তি সর্ব্বতোভাবে সত্য ও সঙ্গত এবং সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষেই প্রযোজ্য।

ইন্দো-জাপানী শিক্ষা সমাজ

জাপান ও ভারতের মধ্যে বহু প্রাচীন যে কৃষ্টিগত সম্পর্কের ফলে, সহস্র সহস্র মাইলের ব্যবধান সত্ত্বেও, এই উভয় দেশের, বহু জিনিসের মধ্যে যে সাদৃশ্য ও উভয় জাতির মধ্যে যে সহানুভূতির বন্ধন আছে, তাহা যাহাতে আরও ঘনিষ্টতর হয় তাহার জন্য শ্রীযুক্ত ডি-এন-কাপুরের পরিচালনায় ও শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসুর পরামর্শাধীনে ওসাকায় 'ইন্দো-জাপানী-শিক্ষা-সমাজ' নাম দিয়া একটি কৃষ্টিমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে।

কৃষ্টির দিক দিয়া জাপান ও ভারতবর্ষের লোকদের পরস্পরের অধিকতর নিকটবর্ত্তী করাই এই সমাজের উদ্দেশ্য হইবে। এইজন্য ইঁহারা যোগ্য ভারতীয় ছাত্রদের জাপানে পড়িবার জন্য বৃত্তি দিবেন, এবং ভারতীয় সাহিত্য দর্শনাদি পড়িবার জন্য জাপানী ছাত্রদের স্বীয় খরচায় ভারতে পাঠাইবেন। এই সমিতি উভয় দেশের অধ্যাপক বিনিময়ের ব্যবস্থা করিবেন। এবং উভয় দেশের কৃষ্টি বা অন্য বিষয়ক কৃতিত্ব সম্বন্ধীয় পুস্তক পত্রিকাদি প্রকাশ করিবেন। এতদ্ব্যতীত ইঁহারা ওসাকা বা তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে

ভারতীয় ছাত্র এবং ভ্রমণকারীদের সস্তায় থাকিবার মত একটি গৃহনির্ম্মাণ করিবেন।

বর্ত্তমান জগতে, রাষ্ট্রিক, বাণিজ্যিক, আর্থিক, ঔপনিবেশিক ও ছোট বড় আরও নানাপ্রকার স্বার্থের সংঘাত এত তীব্র হইয়া উঠিয়াছে যে, জাতিতে জাতিতে সম্পর্ক, লাভ লোকসানের দরকষাকষির, (অথবা ইহার সকল বা যে কোনও বিষয়ে পরস্পরের কার্য্যের সীমা-নির্দ্দেশক চুক্তির) বাহিরে বড় একটা আর অগ্রসর হয় না। এইজন্য এই সকল সম্পর্ক স্থাপনের কার্য্য বিশেষজ্ঞ, চতুর এবং কার্য্যদক্ষ লোকদের দ্বারা সম্পাদিত হয়। কিন্তু, তবুও মানুষের প্রকৃতির মহত্তর দিক এই বস্তুতান্ত্রিকতার চাপে সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয় নাই। মানুষের এই প্রকৃতি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তার জ্ঞান-বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, শিল্পে, ধর্ম্মবুদ্ধিতে এবং সর্ব্বোপরি জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ, ভাষা ও স্বার্থের দ্বন্দের বাহিরে আসিয়া সকল মানুষের মধ্যের ঐক্য ও আত্মীয়তাকে উপলব্ধি করিবার প্রবল আকর্ষণে। যদিও 'ধরার রণ-হুঙ্কার' ডুবাইয়া বা 'বণিকের ধন ঝঙ্কার' ভেদ করিয়া মানুষ ও মানুষের এই শাশ্বত সম্পর্ক আজও জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই তবুও, মানুষ ইহার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস হারাইতে পারে নাই, এবং ইহা জগতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রিক ও অন্যবিধ ইতিহাসকে যথেষ্ট প্রভাবিত করিবে।

বর্ত্তমানে এই স্বার্থের বুঝাপাড়ায় যাঁহারা বহুলোকের বঞ্চনার পরিবর্ত্তে নিজেরা সুখ সুবিধা ভোগ করিতেছেন, তাঁহারা নিজ স্বার্থ ও সুবিধা রক্ষার জন্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যস্ত থাকিলেও, ভারতবাসীদিগের স্বাধীনতা এবং অন্যান্য জাতির সহিত কাজের সম্পর্ক না থাকায়, তাঁহাদিগকে চারিত্রিক, মানসিক এবং নৈতিক শক্তির উপর দাঁড়াইতে হইবে এবং তাঁহারা যে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিবার মত মানুষ, মানব সভ্যতাকে যে তাঁহাদেরও অনেক কিছু দিবার আছে, তাঁহারা যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বর্ব্বর নহেন, অপরের অভিভাবকত্বের অপরিহার্য্য প্রয়োজন যে তাঁহাদের নাই, মানসিক যোগাযোগের মধ্য দিয়াই সেকথা তাঁহাদের জগতকে বুঝাইতে হইবে।

প্রাচ্য দেশের সকল জাতির মধ্যে জাপানই সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও প্রগতিশীল। জাপানের অভ্যুদয় প্রাচ্যবাসীদের মনে আশার সঞ্চার করিয়াছিল, যদিও জাপানের শক্তির দম্ভ, সাম্রাজ্যের লোভ এবং আত্মবিস্তারের চেষ্টা এই আশা বহুল পরিমাণে নষ্ট করিয়া দিয়াছে।

জাপান ও ভারতের দুই বিপরীত প্রান্তিক দুর্দ্দিনের মধ্যে পরস্পরের গভীর পরিচয়ের সাহায্যে আমাদের সম্পর্ক নিবিড় হয় তবে, শুধু ভারতের নহে, উভয় জাতির পক্ষেই তাহা মঙ্গলের কারণ হইতে পারে।

প্রাথমিক শিক্ষা ও গ্রন্থাগার

আমাদের দেশে নিরক্ষরতা দূর করিবার নিমিত্ত প্রাথমিক-শিক্ষার বহুল ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, এবং এজন্য যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন তাঁহারা সকলেই আমাদের ধন্যবাদার্হ। কিন্তু যাঁহারা শুধুমাত্র প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং পরে বিদ্যাচর্চ্চা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন নাই, মধ্য বা তৎপরবর্ত্তী জীবনে তাঁহারা শিশুকালে লব্ধ বিদ্যার অতি অল্পই মনে রাখিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যা, যদি অন্য কোন উপায়ে বিবর্দ্ধিত না হয় তবে আক্ষরিকতার হিসাব বাড়ান ভিন্ন অন্য কোন কাজে ইহা খুব কমই লাগে ; সুতরাং, এদিক দিয়া শুধুমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লব্ধ শিক্ষা অ-শিক্ষার নামান্তর মাত্র।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লব্ধ বিদ্যাকে ফলবতী করিতে হইলে, শিশুরা যাহাতে পরবর্ত্তী জীবনে, অন্য কোন উচ্চতর বিদ্যালয়ে পাঠ না করিলেও, নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী নানাবিধ জ্ঞান সঞ্চার করিতে পারে, তাহার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বর্দ্ধনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগার সমূহের সংখ্যাও বর্দ্ধিত হওয়া আবশ্যক। শিশুকালে চিত্ত যখন স্বভাবতঃই সর্ব্ববিষয়ে আগ্রহশীল থাকে, তখন অক্ষরজ্ঞান-বিশিষ্ট শিশুদিগের আগ্রহ নিরাকরণে তথা জ্ঞান সঞ্চয়ে শিশুদের উপযোগী গ্রন্থাগার অনেকটা সাহায্য করিতে পারে। অনেক সভ্য দেশই শিশুদিগের উপযোগী গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়াছে। বস্তুতঃ নিরক্ষরতা দূরীকরণে সমাজের সর্ব্বস্তরে

জ্ঞানবিস্তারকরণে ও লব্ধবিদ্যা-বিবর্দ্ধনে গ্রন্থাগার এক প্রকার অপরিহার্য্য।

নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মিলনী

আমাদের দেশে কি দেশবাসীর কি সরকারের গ্রন্থাগারের দিকে তাদৃশ মনোযোগ নাই। যে গ্রন্থাগারগুলি আছে তাহাও প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রেই আবার অবৈতনিক প্রণালীতে পরিচালিত। আহৃত পুস্তকাদির মধ্যেও আবার নভেল-নাটকাদির সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। অবশ্য উপন্যাসাদির আবশ্যকতা কেহ অস্বীকার করে না, এবং পাঠকেরাও বোধ হয় উপন্যাসাদি অধিক চাহেন বলিয়া এগুলির সংখ্যাধিক্য ঘটে। তথ্যপূর্ণ পুস্তক রক্ষণের আবশ্যকতা ও পাঠকদের মধ্যে ঐ সকল পুস্তকের চাহিদা বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই লেখকের উদ্দেশ্য।

সম্রাটের রজত-জুবিলী উৎসবকে স্মরণীয় করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার আয়োজন ও পরামর্শ হইতেছে। এ প্রসঙ্গে নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মিলনীর অষ্টম অধিবেশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে প্রতি মিউনিসিপ্যাল টাউনে ও প্রতি গ্রামে গ্রন্থাগার স্থাপনের পরামর্শ দিয়াছেন। আমাদের মতে, ভারতবর্ষের নিরক্ষরতার কথা বিবেচনা করিতে গেলে শ্রীযুক্ত রায় মহাশয়ের প্রস্তাবই সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন হইয়াছে।

কয়েদীদিগকে বিশেষতঃ রাজনৈতিক বন্দীদিগকে ও হাসপাতালের রোগীদিগকে যাহাতে পুস্তক-পত্রিকাদি পাঠের সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়, তৎপ্রতি শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। মাদ্রাজ এবিষয়ে অগ্রণী হইয়াছে।

বঙ্গদেশে ইউনিয়ন বোর্ড, লোকালবোর্ড, মিউনিসিপ্যালটি প্রভৃতির গ্রন্থাগারে সাহায্য করিবার পক্ষে বাধা নাই। কিন্তু, তৎসত্ত্বেও গ্রন্থাগারে ইঁহারা আশানুরূপ সাহায্য করেন না। মিউনিসিপ্যালটি ইচ্ছা করিলে গ্রন্থাগারও স্থাপন করিতে পারেন। কিন্তু, দুঃখের বিষয় বঙ্গদেশের ১১৭টি মিউনিসিপ্যালিটির ভিতর একমাত্র নারায়ণগঞ্জ মিউনিসিপ্যালটিই গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়াছেন।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত সে বিষয় শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় বলিয়াছেনঃ নিরক্ষরতা দূর, সমাজের সর্ব্বস্তরে জ্ঞান বিস্তার, দেশের কৃষ্টিগত অগ্রগতি, এবং জাতির উন্নতি, গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।

জ্ঞানবিস্তার যেমন পুস্তকের সাহায্যে তেমনি রেডিও প্রভৃতির সাহায্যেও করা সম্ভব। শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় গ্রন্থাগারে রেডিওএর ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন।

সমস্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট নিজ ব্যয়ে গ্রামে গ্রামে রেডিওর ব্যবস্থা করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। এবং বাঙ্গলা সরকারই এ বিষয়ে প্রথমে কাজে নামিয়াছেন। শীঘ্রই যশোহরের কয়েকটি গ্রামে সরকারী রেডিওর ব্যবস্থা হইবে।

সন্ত্রাসবাদের মূল কারণ ও তাহার প্রতিবাদ

যত সুশাসিত দেশই হউক, সরকারের কার্য্য সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না; প্রায় প্রত্যেক দেশেই সরকার বিরোধী একদল লোক অতীতেও ছিল এবং এখনও আছে। এবং সুযোগ, সুবিধা ও প্রয়োজন মত তাহারা সরকারের কার্য্যে প্রতিবাদ ও বিরোধিতা করিয়া থাকে। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের শাসন কার্য্যে যেমন ক্রমশঃ অধিক সংখ্যক লোকের হাত থাকিতেছে, তেমনি ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ ও সরকারের কার্য্যে নিয়মানুগ ভাবে বিরোধিতা করিবার ক্ষমতাও লোকে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত পরিমাণে লাভ করিতেছে। কিন্তু, নিয়মানুগ ভাবে যাঁহারাই বিরোধিতা করুন, তাঁহাদের কার্য্যের প্রতি দেশের লোকের সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে করিতে হয়। কারণ, তাঁহাদের কার্য্যে যতই অধিক সংখ্যক লোক অংশ গ্রহণ করিবেন বা সহানুভূতি দেখাইবেন, তাঁদের সাফল্যের আশাও ততই বাড়িবে। কিন্তু এরূপ চেষ্টাতে সময় আবশ্যক এবং বিরোধের বিষয় দেশের লোকের সহানুভূতি আকর্ষণের উপযোগী হওয়া উচিত। আর এক প্রকার সরকার বিরোধীদলও প্রায় সকল দেশেই দেখা যায়, তাঁহারা নিয়মানুগ আন্দোলনে বেশী লোক দলে পাঠাবেন না, বা, নিয়মানুগ আন্দোলন করিলে অচিরাৎ বা আদৌ ফললাভ

ঘটিবে না এ আশঙ্কা করিয়া নিয়মবহির্ভূত বা গুপ্তপন্থা অবলম্বন করেন।

সন্ত্রাসবাদ দ্বারা আমাদের দেশের কিছুমাত্র উন্নতি সম্ভব বলিয়া যে আমরা মনে করি না তাহা পূর্ব্বে বহুবার বলিয়াছি। যাঁহারা সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী বা সন্ত্রাসক দলভুক্ত, সন্ত্রাসবাদে দেশের উন্নতি সম্ভব কিনা তাহা যদি তাঁহারা পূর্ব্বে দেখিয়াও থাকেন, তাহা হইলেও এখন পুনরায় দেখিবার সময় আসিয়াছে। আমাদের দেশে, বিশেষতঃ বাংলায়, অনেক শিক্ষিত, স্বাস্থ্যবান্ চরিত্রবান্ এবং কেহ কেহ স্বদেশ প্রেমিকও বটেন, বিচারালয়ে সন্ত্রাসক বলিয়া প্রমাণিত হইয়া অকালে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছেন বা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইতেছেন। সন্দেহ বশে অনেক মেধাবী ও স্বাস্থ্যবান্ যুবককে আটক রাখা হইয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া মনে হইতেছে যতদিন পর্য্যন্ত সন্ত্রাসবাদের নাম-গন্ধও দেশে থাকিবে ততদিন সরকারের কঠোরতার কিঞ্চিন্মাত্রও লাঘব হইবে না।

সন্ত্রাসকেরা কি চাহেন তাহা তাঁহাদের দলভুক্ত কেহ স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। তবে তাঁহাদের কার্য্যাবলী দেখিয়া মনে হয় দেশের স্বাধীনতাই বোধ হয় তাঁহাদের কাম্য। তাঁহারা যে কার্য্যধারা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে স্বাধীনতা কিরূপে আসিবে তাহা তাঁহাদের কেহ বলেন নাই। অবশ্য তাঁহাদের কার্য্যাবলী সমস্তই গোপনে সাধিত হয় বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে হয়ত ইহা বলাও সম্ভব হয় নাই। কিন্তু, আমাদের মনে হয়, একটু বিচার করিয়া দেখিলে, এই পথে স্বাধীনতা লাভ যে অসম্ভব তাহা যে কেহ বুঝিতে পারিবেন। দু'চারিটা সাহেব বা পুলিশ কর্ম্মচারী হত্যা করিয়া বা দু'দশটা পিস্তল চুরি করিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অটল ভিত্তি যে একটুও নড়ান সম্ভব একথা যে কেহ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বনাম ভারতবাসীদের অবস্থার বা শক্তি সামর্থ্যের একটু-আধটু খোঁজ খবর রাখেন তাঁহারই নিকট বাতুলতা বলিয়া মনে হইবে। ওদিকে, ইংরেজদের স্বদেশ প্রেম ভারতবাসীদের স্বদেশ প্রেম অপেক্ষা এক তিলও নূন নহে। প্রায় পাদশতাব্দী কাল ব্যাপী সন্ত্রাসন কার্য্য দ্বারা সন্ত্রাসকেরা দেশের কোনও উন্নতি করিতে পারেন নাই; উপরন্তু ইহার অবাঞ্ছনীয়তা আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছি।

দেশ হইতে সন্ত্রাসবাদের মূলোচ্ছেদের চেষ্টা যেমন গবর্ণমেণ্টের তেমন স্বদেশের হিতকামী প্রত্যেক স্বদেশ বাসীরই করা উচিত। (সুখের বিষয়, দেশবাসীরা ইহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আগ্রহ দেখাইতেছেন)। যাঁহারাই ইহার মূলোচ্ছেদের চেষ্টা করিবেন, তাঁহাদেরই সন্ত্রাসবাদের মূল কি তাহা সঠিক ভাবে নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা উচিত।

প্রত্যেক কিশোরের মনেই শারীরিক (Physical) বীরত্বের প্রতি সমধিক ঝোঁক থাকে। যুদ্ধের কাহিনী, হিংস্র পশু শিকারের কাহিনী, দুর্ল্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত অতিক্রম করিবার কাহিনী, ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হওয়ার কাহিনী প্রভৃতি পড়িতে তাহারা অত্যধিক ভালবাসে। এসকল পাঠের ভিতর তাহারা এত রস পায় যে, অনেক সময় কাহিনীর নায়ক নিজেকেই মনে করে। কিশোর বয়সে ওয়াটার্লু যুদ্ধ জয় করা বা আল্পস্ অতিক্রম করা কোন বালকের কাছেই অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। একটি বালককে দাঁড়াইয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে দেখিয়াছি;—বড় হইয়া কতদিন যে অশ্ব-পৃষ্ঠে নিদ্রা পূরণ করিতে হইবে ইহাই ছিল তাহার ধারণা। কিন্তু আমাদের দেশের অভিভাবকরা যে ধরণে পুত্র-কন্যাদের সামান্যতম দুঃসাহসিক কার্য্যে অংশ গ্রহণ হইতে বিরত রাখেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। অথচ, মনের ভিতর যদি প্রেরণা ও প্রবণতা থাকে তবে বাহির হইতে বাধা দিলে বা বিরত রাখিলে প্রবণতা বৃদ্ধিই পায়। এবং কোনও সামান্যতম দুঃসাহসিক কার্য্যের নূনতম সুযোগ গ্রহণ করিতে সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকে। কিশোরদের বীরত্ব প্রবণতা ত প্রচুর পরিমাণেই আছে তদুপরি বঙ্গবাসিগণের সাধারণ গুণ ভাবালুতা আসিয়া যোগদান করিয়াছে। সাধারণ কবে নরহত্যা, পিস্তলচুরি ডাকাতি প্রভৃতি দূষণীয় বলিয়া গণ্য হয় বলিয়া এবং এসকল কার্য্য করিলে সরকার প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা করেন বলিয়া এসকল কার্য্যে কোন কিশোর কিংবা যুবকই উৎসাহিত হয় না। কারণ, বীরত্বের ভিতর একটা ভাল কার্য্য করিবার এবং তন্নিমিত্ত যে কোনও গুরু কষ্ট

বরণ করিবার ভাব থাকে। দেশের স্বাধীনতার নামে সরকারকে উৎসাদিত করিবার চেষ্টায় নরহত্যা প্রভৃতি যত দূষণীয়ই হউক না কেন ইহাতে প্রচুর বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। ফলে বয়স্কদের অপেক্ষা যুবকদের ও কিশোরদের এ কার্য্যে দলভুক্ত করিতে সন্ত্রাসকেরা সহজেই সক্ষম হন। এবং বীরত্বের প্রতি স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে বলিয়াই যুবকদের বা কিশোরদের এসকল কার্য্যে ব্রতী করাইতে বোধ হয় বেশী চেষ্টা করিতে হয় না; ফলে এসকল কার্য্য গোপনে চলিবার কোন বাধা হয় না।

সন্ত্রাসবাদের এ নিদানতত্ত্ব যথার্থ বলিয়া মনে হইলে, সন্ত্রাসবাদের মূলোচ্ছেদের প্রথম চেষ্টাই হওয়া উচিত— দুঃসাহসিক বা বীরত্বপূর্ণ কার্য্যে যুবকগণকে অংশ গ্রহণ করিতে দেওয়া। আমাদের দেশে এরূপ কার্য্যের সুযোগ খুব অল্পই আছে। সুতরাং, গবর্ণমেণ্ট ও দেশবাসীর এরূপ সুযোগ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করা উচিত। সেনাবিভাগে যুবকগণের প্রবেশলাভের সুবিধা করিয়া দেওয়া, বিপদ ও দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে বাঙালী যুবকদের নিয়োগ প্রভৃতির দ্বারা ইহা সম্ভব হইতে পারে।

উপরিলিখিত কারণটী সন্ত্রাসবাদের প্রধানতম কারণ বলিয়া আমাদের মনে হইলেও একমাত্র কারণ নহে। বেকারও সমস্যা অন্যতম কারণ। অবশ্য কেহ কেহ বলিয়াছেন যাঁহারা বিচারালয়ে সন্ত্রাসক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছেন তাঁহাদের অনেকেরই আর্থিক অবস্থা ভাল। কিন্তু কাযে নিযুক্ত থাকার একমাত্র কারণ যে আর্থিক অস্বচ্ছলতা এমন নহে। আমাদের দেশেও যাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত কাজ করিতে হয় না, তাঁহাদেরও চুপ করিয়া থাকিতে দেখা যায় না। নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী 'যাত্রাদল' প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া স্বদেশ সেবাও ইঁহারা করিয়া থাকেন। শিক্ষিত ও উচ্চাভিলাষী যুবকদের উপযোগী কার্য্য আমাদের দেশে খুব কমই আছে। দায়িত্বপূর্ণ ও উচ্চপদে দেশীয় ব্যক্তিগণের প্রবেশাধিকার নাই বলিলেই চলে। কিন্তু আর্থিক সচ্ছলতা সত্ত্বেও, হয়ত রুচি অনুযায়ী কার্য্যের সুযোগ আমাদের দেশে না থাকায়, ইঁহারা প্রকৃত পক্ষে বেকার থাকেন এবং স্বভাবতঃই অন্য পথে পরিচালিত হয়েন।

সন্ত্রাসকদের সকলেরই আর্থিক অবস্থা ভাল নহে। তদুপরি স্বাধীনতালাভ না ঘটিলে দেশের আর্থিক দুরবস্থার প্রতীকার নাই এ ধারণা অনেকে পোষণ করাতে, বেকারদের মনে স্বাধীনতালাভাকাঙ্ক্ষা তীব্র হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নহে। সুতরাং, বেকার সমস্যার সহিত যে সন্ত্রাসবাদের প্রসারতার কোন সংস্রব নাই একথা বলা চলে না। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশতঃ বাঙ্‌লা গবর্ণমেণ্ট বেকার সমস্যাকে অনেকদিন হইতেই অবহেলা করিয়া আসিতেছেন। অন্যান্য প্রদেশে স্ব-প্রদেশবাসী ব্যক্তিই যাহাতে চাকুরী পায়, তাহার প্রতি গবর্ণমেণ্ট লক্ষ্য রাখেন। সন্ত্রাসবাদ বিরোধী কনফারেন্সের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ঠাকুর বলিয়াছিলেন, বোম্বাই ও মান্দ্রাজে স্ব-প্রদেশবাসী ভিন্ন কাহাকেও মোটর চালকের লাইসেন্স দেওয়া হয় না। কিন্তু পক্ষান্তরে পঞ্জাবী মোটর চালকেরা বাঙ্‌লা দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। এতদ্ভিন্ন, বাঙালীর বিরুদ্ধে প্রত্যেক প্রদেশ-বাসীরাই দল বাঁধিতেছেন। প্রত্যেক প্রদেশেই চাকুরে বাঙালীর সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। প্রবাসী বাঙালী ব্যবসায়ীর মাল প্রবাসী বাঙালী ব্যতীত খুব অল্প লোকেই খরিদ করেন। বাঙালীরা কোন স্বাধীন ব্যবসা অবলম্বন করিতে গেলেই তাঁহাদের কোনঠাসা করিবার চেষ্টা করা হয়। এসব কারণে বেকার সমস্যার তীব্রতা অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশে অধিক। সন্ত্রাসবাদ নির্ম্মূলের জন্যই হউক বা দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্যই হউক গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের এদিকে আশু অবহিত হওয়া প্রয়োজন। বেকার সমস্যার তীব্রতা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের প্রসারতা হ্রাসের আশাও করা যায়।

শ্রীসুশীলকুমার বসু

রাত-খেয়া

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী

আয় খেয়া, আয় খেয়া!
আকাশ-গাঙ্গে বান ডেকেছে
চল্‌বে না আর ঘর নেয়া!
গুটো, গুটো, পাত্‌তাড়ি, ফুঁটো কর্ তোর ভাত-হাঁড়ি,
মিঠে তাত দিচ্ছে রাত,
মন পোড়ায় কোন্ আলেয়া?
চাইলাম যখন প্রাণে প্রিয়ে, চুপ করালি রূপ দেখিয়ে,
এখন এলি বিজয় নিয়ে অবেলায় তুই অজেয়া!

আয় খেয়া, আয় খেয়া!
আকাশ-গাঙ্গে বান ডেকেছে,
চল্‌বে না আর ঘর নেয়া!
না-দাবীর দায় খালাস, উড়ায় ফুরায় ফুল-বাস
সাথী সনে জাগে রাতি
ক্ষণে ক্ষণে বন-কেয়া,
অলির মুখে কার সাড়া? কলির বুকে কার তাড়া?
পিকের গলায় কে বলায় "নাই, কিছু নাই অদেয়া!"

আয় খেয়া, আয় খেয়া!
আকাশ-গাঙ্গে বান ডেকেছে,
চল্‌বে না আর ঘর নেয়া!
পাঁপড়িতে খোদ রং ধরেছে, জলে ইন্দ্রজাল পড়েছে,
এক রসের বশে জগত
যার আদি আখর স্বরে-আ
আনারজাদীর রাত-বেয়ালা, সাকীর হাতে
ভর-পেয়ালা,
উমারখায়ম-আদম-সুমার লাল-হালে শোধ
কুল্-বকেয়া।

আয় খেয়া, আয় খেয়া!
আকাশ-গাঙ্গে বান ডেকেছে,
চল্‌বে না আর ঘর নেয়া!
এলো হঠাৎ মালসাবাড়ী কোথা থেকে সালকাবারী?
করলি জড় মালগুজারী—
জাল! জাল! হা রূপেয়া!
বুকের মাঝে তাই-ত সুরু খট্‌কার সে দুরু-দুরু
অকাল ঝড়ের তাল তুলে' কি গুরু-গুরু ডাকে দেয়া?

পট ও মঞ্চ

ছবির কথা

আনন্দ

জীন্ হার্লো

পটে ও বাস্তবে দুরন্ত যৌবনের মূর্ত্ত প্রতীক জীন্ হার্লো তৃতীয়বার স্বামীত্যাগ করছে। জীন্ হার্লোর নিজস্ব একটী চরিত্র আছে; রূপে ভেলে অভিনীত ভূমিকাগুলির সঙ্গে তাদের যথেষ্ট প্রভেদ। জীন্ 'হিজ ব্রাদার্স ওয়াইফ্' শেষ করে 'চায়না সীজ্' ও 'স্পায়েল্ড্' ছবির কাজের জন্য তৈরী হচ্ছে। অভিনেত্রী হিসাবে জীনের প্রশংসা সকলেই করে থাকেন—বিশেষ করে যুবকরা। সম্প্রতি জীনকে 'গাওেড পারসেণ্ট পিওর' ছবিতে আমরা দেখেছি।

আমাদের ছায়াশিল্প

গতবারে আমরা অভিনয় ও প্রযোজনার কথা প্রসঙ্গে সাহিত্যরথীদের গ্রন্থের চিত্ররূপ সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলাম। বলা বাহুল্য আমরা মূল আলোচ্য বিষয় থেকে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলেও অবান্তর কিছু নিয়ে মাথা ঘামাইনি। কিন্তু সে কথা যাক্; অভিনয় ও প্রযোজনার কথা বলি।

যাঁরা মাত্র বছর তিনেক ছবি দেখছেন তাঁরাও খুব ভাল ভাবে বুঝেছেন যে অভিনয়ের ধারা পরিবর্ত্তিত হয়েছে কতখানি। পূর্ব্বে প্রাধান্য ছিল অভিব্যক্তির, এখন প্রধান হয়ে উঠেছে বাচন, মুখের চেয়ে স্বর হয়েছে বড়। ছায়াছবি যে খুব বেশী অগ্রসর হয়েছে এমন কথা বলা যায় না, পুরাতনেরই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। সবাকের প্রথম যুগে প্রধান হোল নৃত্যগীতাদির ছবি, পরে তার স্থান অধিকার করলে যৌনাবেদনের ছবি, তারপর অগ্রগণ্য হোল মৃত্যু ও রহস্য-মূলক ছবি, কিন্তু ইতিমধ্যে টেক্‌নিক্ অনেক উন্নত হয়েছে। ছায়াজগতের বিশিষ্ট মনীষী বর্ত্তমানে টোয়েনটিয়েথ্ সেঞ্চুরি পিক্‌চার্সের দ্বিতীয় কর্ম্মিষ্ঠ কর্ত্তা Darryl F. Zanuck দস্যুতস্কর প্রভৃতির ছবি তুলতে লাগলেন; এগুলিকে আমরা পুরাতন রোমাঞ্চকর সিরিয়াল ছবির উন্নত সংস্করণ বলতে পারি। Zanuck 42nd Srteet তুলে পুরাতন নৃত্য-গীতাদির ছবিকে আধুনিক উৎকর্ষের নূতন পোষাক পরালেন। ওদিকে Mae West থেকে ঘুরে এল যৌনাবেদনের যুগ। নূতনতর কিছু দেবার চেষ্টা হচ্ছে ঐতিহাসিক গল্প এবং সাহিত্যরথীদের গ্রন্থের ছায়ারূপের সাহায্যে। King Kong নূতন জিনিষ নয়, Lost Worldএর সে স্থান অধিকার করেছে। Cimmaronকে নূতন বলা চলে কিন্তু তার অনুকরণকে ঐ আখ্যা দেওয়া চলে না। আজকাল আমরা কি যে পেলে খুশী হই, এর যথাযথ উত্তর দেওয়া শক্ত হলেও এটুকু নির্ভয়ে বলা চলে যে থ্রিলের দিকে আমাদের ঝোঁক আছে এবং নৃত্যগীতাদিতে অরুচি নেই। Tabu, Eskimo প্রভৃতির মত ছবি আমাদের ভাল লাগে তবে Trader Horn ও Tarzan the Apeman এবং Africa speaks ও Bring'em Back Alive প্রভৃতি দেখার পর জংলী রোমান্স বা জঙ্গলের বাস্তবতার মোহ কেটে গেছে। কিন্তু ছায়াছবির গতি বৃত্তাকার হলেও টেক্‌নিক্ প্রভৃতির অসামান্য উন্নতি হয়েছে, সুতরাং অভিনয়ের ধারাও বদলে গেছে।

বাংলা এবং বিলাতি ছবিতে দেখা যায় নটনটী মুখাবয়বের সাহায্যে কয়েক দীর্ঘ সেকেণ্ড ধরে ভাবপ্রকাশ করছেন কিন্তু আমেরিকান ছবিতে সাধারণতঃ অত সুযোগ দেওয়া হয় না এবং এককোণ থেকে গৃহীত ছবি দু তিন সেকেণ্ডের বেশী পটে স্থায়ী হয় না। আলোকচিত্র এবং চিত্রকরের বাহাদুরির ফলে ছবির উপভোগ্যতা বৃদ্ধি পায় কিন্তু অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন না হলে নটনটীর পক্ষে যশ অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভবপর হয় না। আমাদের যুগ স্পীডের যুগ, প্রগতির যুগ। পুরাতনকে আত্মগরিমা বজায় রাখতে হলে নূতনের সঙ্গে রেসে জয়লাভ

করতে হবে। Lionel Barrymore যে আজ আর একছত্র রাজত্ব করছেন না তার কারণ তিনি যুগোপযোগী হতে পারছেন না। অবশ্য এছাড়া আরও দুটী বিশিষ্ট হেতু আছে; প্রথমতঃ কর্তৃপক্ষের যে-সে গল্পে তাঁকে বহুবার নামানো এবং দ্বিতীয়তঃ তাঁকে প্রচারের সুযোগ না দেওয়া। এই সুষ্ঠু প্রচার কার্য্য চালনার ফলে বিশেষ গুণবতী না হলেও Anna Stenএর আজ অশেষ নাম এবং এরই ফলে Garbo, Dietrich প্রভৃতি অসংখ্য অভিনেত্রী পূর্ব্ব কৃতিত্বের অধিক কিছু দেখাতে না পারলেও উত্তরোত্তর জনপ্রিয়া হচ্ছেন এবং শেষতঃ এই প্রচারবৃক্ষের অমৃতফল ভক্ষণের সুযোগ মাত্র অভিনেত্রীরাই পাচ্ছেন।

Josef Von Sternberg প্রভৃতি কয়েকজন অসাধারণ পুরুষ কণ্ঠস্বরকে প্রাধান্য না দিলেও বাস্তবিকই সুকণ্ঠের অধিকারীরা সমধিক আদৃত হচ্ছে। ছবিতে ঘন ঘন দৃশ্য ও কোণ বদলায় কিন্তু মঞ্চে ঐসব কিছুক্ষণ স্থায়ী। জানা গেছে আজ স্বরে লুকানো আছে দর্শককে সম্মোহিত প্রশংসা-মুখর করবার কৌশল।

World of Sports আমাদের রোমাঞ্চিত করতে পারতো না যদি না সেখানে থাকতো অন্তরীক্ষে Ford Bond এর কণ্ঠের যাদু। Goofy Movies দেখে হেসে হেসে পেটে ব্যথা ধরতো না যদি না নেপথ্যে শোনা যেত Pete Smith-এর গলা। বাস্তবিক World of Sport বা Goofy Movies প্রভৃতি ছোট ছবি পটে শুধু দেখা গেলেই তাদের আনন্দ দানের ক্ষমতা এত দিনে লোপ পেতো।

আমাদের দেশে মঞ্চ একটা চীজ বটে। পীঠের অধিকাংশ অভিনেতারা এক বিচিত্র প্রাগৈতিহাসিক ধরণে 'প্লে' করেন, তাঁদের সমস্ত অভিনয় যেন চীৎকার করে সর্ব্বদাই বলে: ওগো, আমরা 'অভিনয়' করছি দেখ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা স্থান ও কাল ভেদে বিভিন্ন চরিত্র সৃষ্টি করতে অক্ষম হওয়ায়—কারণ সব চরিত্রই তাঁরা নিজস্ব বিশিষ্ট ধারায় একই প্রকার রূপদান করেন—আমরা জীবনের বাস্তবতার রূপ দেখতে পাই না। আমাদের পীঠ মধ্য-যুগের মায়া কাটিয়ে উঠতে না পারায় চিত্রজগতে বিশেষ কিছু দান তার কাছ থেকে আমরা প্রত্যাশা করতে পারি না। কিন্তু মঞ্চাভিনয় প্রগতিশীল হলে ছায়াশিল্পকে সে বিশেষ সমৃদ্ধ করতে পারে। আমেরিকার চিত্রগগনের উজ্জ্বল তারকাদের অধিকাংশেরই আছে মঞ্চের অভিজ্ঞতা। নবীন ছায়ানট Claude Rains দেখিয়েছেন পীঠাভিনয়ের সার্থকতা। Invisible Man এ তাঁর কণ্ঠগুণে অসম্ভব হাস্যকর দৃশ্যাদিতে এসেছে রোমাঞ্চ ও ভয়াবহতা। Crime Without Passion এও Claude Rains একদিকে যেমন উৎকৃষ্ট ছায়াভিনয় করেছেন ভাববাঞ্জনায়, অপরদিকে তেমনি মঞ্চমার্জ্জিত কণ্ঠস্বরে এনেছেন রোমাঞ্চ,—অভিনয় শ্রবণের শিহরণ। এই মণিকাঞ্চন সংযোগের ফলে যে অভিনয় যে চরিত্র সৃষ্টি দেখা গেল কচিৎ তার তুলনা মেলে। আমাদের ছবির বাচন বড় অদ্ভুত। সর্ব্বসময় টেনে টেনে কথা বলা,

য়্যানা ষ্টেন্

'নানা'তে য়্যানা ষ্টেন্ আমাদের আশানুরূপ আনন্দ দিতে পারে নি। সত্য বলতে কি, য়্যানার অভিনয় কোনো বিপুল প্রতিভার পরিচয় মোটেই দিতে পারে নি। শুনছি 'উই লিভ্ এগেন্'এ য়্যানা ফ্রেড্রিক্ মার্চের সঙ্গে না-কি অতি সুন্দর অভিনয় করেছে। টলস্টয়ের 'রেসারেক্সন্'এর দ্বিতীয় সবাক্ সংস্করণে য়্যানা ষ্টেন্কে দেখার প্রতীক্ষায় রইলাম।

বরিস্ কার্লফ্

বহুকাল ধরে বিবিধ ভূমিকায় অভিনয় করে বরিস্ কার্লফ্ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেন নি। 'ফ্রাঙ্কেন্ষ্টেন্' চিত্রে দানবের ভূমিকাভিনয় করে তিনি চিত্রজগতে সুপরিচিত হয়েছেন। ভয়ঙ্কর কোনো দানবীয় চরিত্রকে রূপ দিতে হলে আগে বরিসের ডাক। 'ব্রাইড অব্ ফ্রাঙ্কেন্ষ্টেন্'এ তিনি তাঁর স্মরণীয় ভূমিকায় আবার দেখা দেবেন।

উত্তেজনার স্থলে বিরক্তিকর চীৎকার করা আর দুঃখের সময় দুঃসহ রকম ধীরে কথা বলা। শরীর যদি রেখাসঙ্কুল হোল ত' কণ্ঠে নেই আবেগ, কণ্ঠ যদি উৎরে গেল ত' অভাব হল ভঙ্গিমার। মঞ্চ ঘেঁষা অভিনয়—কথাটা আমাদের দেশে ভীষণ প্রযুক্ত হয় কিন্তু ষ্টেজ বা স্ক্রীন্ কোথায় যে চরিত্রগত সুষ্ঠু রূপটী ফুটে ওঠে তাই আমাদের জানা নেই!

নিজের রচনার প্রতি মানুষের অপত্যস্নেহ। তেমনি প্রয়োগশিল্পীই যদি চিত্রনাট্যকার এবং তদুপরি চিত্রশিল্পী হন তবে দর্শককে বয়ে বেড়াতে হয় বিরক্তির বোঝা। লেখককে সংস্কার করবার অধিকার যেমন সম্পাদকের তেমনি আলোকচিত্রকর ও আখ্যায়িকার প্রভৃতির ভুল চুক শুধরে নেবার ভার প্রযোজকের। বলা বাহুল্য ব্যক্তিত্ব একক হলে তা সম্ভবপর হয় না। প্রযোজকের সর্ব্ববিষয়ের ও বিভাগের ভালমন্দ জ্ঞান থাকা চাই। Josef Von Sternberg, Frank Borzage বা Cecil. B. Demille- এর মত ছবির ভিতর দিয়ে অলক্ষ্য থেকেও আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রয়োজন প্রয়োগোৎকর্ষ এবং পরিচালন ক্ষমতা, কিন্তু সে অনেক বড় কথা। সাধারণ ভাবে প্রযোজনা করাতেও যে অনেক শক্তির প্রয়োজন, সে শক্তি আমাদের কারুর নেই। আমাদের প্রযোজকরা মধ্য বা প্রাচীনযুগের গল্পকে ছায়ারূপ দেন কেন বুঝতে পারি না কারণ পট-ভূমিকার যাথার্থ্য বজায় রাখতে স্বেদসিক্ত হতে হলে অন্যান্য দিকে দেখবার অবসর হয় না। সুতরাং ব্যাক্‌গ্রাউণ্ডেই দোষ থাকে, তা অনুকুল আবহ সৃষ্টি করতে পারে না এবং অন্যান্য বিষয়ে প্রকাশ পায় ক্ষমার অযোগ্য দুর্ব্বলতা, অবহেলা ও অজ্ঞতা। আখ্যানভাগ যিনি রচনা করেন সংলাপ তিনি সমান সুন্দর লিখতে পারেন না কারণ আখ্যানেই থাকে অনেক পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনের বিষয়। তারপর আছে মহলা এবং তৎপূর্ব্বে নটনটীদের নিজ নিজ

চরিত্র বুঝিয়ে দেওয়া। ভাল গল্প আমরা নির্ব্বাচন করতে পারি না, ভাল চিত্রনাট্য ও ভাল ছবি হয় না এর ফলে। আধুনিক গল্পকে চিত্রীকৃত করার অনেক সুবিধা, কারণ বর্ত্তমান যুগের সাথে সকলেই সুপরিচিত। বলা ভাল, প্রযোজকের উপরও চলে সম্পাদকের নির্ম্মম কাঁচি।

পাশ্চাত্যে সিনেমার বিজ্ঞানের বিষয় আমরা শিক্ষালাভ করিনি কিন্তু অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির প্রভাবে আমরা চমৎকার ছবি করতে পারি, বিশেষতঃ বাঙালীদের উপলব্ধির ক্ষমতা খুব যখন বেশী। Ben Hecht ও Charles Mac Arthur নামে দু ভদ্রলোক Scarface, Temple Drake, Design for Living, Viva Villa, House of Rothschild, Twentieth Century প্রভৃতি অনেক সেরা ছবির গল্প ও চিত্রনাট্য লিখে যশস্বী হয়েছিলেন। বহুকাল সিনেমার সংস্রবে থেকে তাঁরা ছায়াশিল্পের সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞান সঞ্চয় করেছিলেন। মামুলি একটা গল্প লিখে এবার তাঁরা তার প্রযোজনা করলেন। পারিপার্শ্বিক অভিজ্ঞতা বলে নির্ম্মিত হলেও Crime Without Passion অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার নিদর্শন। এই চিত্রে নামকরা তারকা কেউই নেই কিন্তু Hecht ও MacArthur সব ফাঁক ভরিয়ে দিয়েছেন অভিজ্ঞতা-লব্ধ কলাকুশলতা দিয়ে। এমনটি ত' আমরাও করতে পারি।

অভিনয় ও প্রযোজনার ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় কথা এই যে সর্ব্বদা নটনটীদের শিক্ষা, পালিশ, সংযম ও অন্তর সৌন্দর্য্যের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। পল্লী বিশেষের মেয়ে আর 'নিজের (গুণহীন) লোক' দিয়ে কলাক্ষেত্রে নূতন অবদান দেওয়া যেতে পারে না বা আর্টকে সমৃদ্ধ করা যেতে পারে না। ছায়াছবির সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই সব সময় মনে পড়ে আমেরিকাকে এবং আমাদের বাংলা ছবিকে কিন্তু এই উভয়ের প্রভেদ এত বেশী—আমি ভৌগলিক অবস্থানহেতু দূরত্বের কথা বলছি না—যে আকাশ-পাতাল এপিথেট্ দিয়েও ঠিক বোঝান যায় না; একজন উন্নতির উচ্চতর শিখরে, অপরজন পর্ব্বতের সানুদেশেই উপস্থিত হয়নি। চিত্রশিল্পে কারো উন্নতি সম্বন্ধে বিচার করতে হলে আমরা আমেরিকার পরিণতির মাপকাঠিতেই করে থাকি। আমেরিকার চিত্রশিল্প অনুকরণীয় এবং আদর্শস্থানীয় হলেও তাকে আমরা সম্পূর্ণ দোষহীন বলতে পারি না। জার্ম্মান্ এবং রাশিয়ান্ ছবি আসে না, সুতরাং আমরা শ্যামখুড়োর ভক্ত হয়ে গেছি কিন্তু গোঁড়া নই। বাংলা ছবি এবং বহু ঢক্কানিনাদিত অন্তঃসারশূন্য ম্যাড়মেড়ে বিলাতি ছবি দাসের দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। প্রমোদ যেখানে পণ্য সেখানে জলো স্বদেশিকতা বা প্রভুভক্ত জীব বিশেষের মনোবৃত্তি শোভা পায় না। অর্থের বিনিময়ে আমরা চাই সেই অর্থের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমোদ ক্রয়ক্ষমতা, তার সম্পূর্ণ সার্থকতাই আমরা কামনা করি।

কিন্তু খুব চড়া পালিশ থাকলেও আমেরিকান্ ছবির সর্ব্বাঙ্গে পাঁচড়ার মত ফুটে উঠেছে ভীষণ অসভ্য বর্ব্বর মনোবৃত্তি, অকারণ নগ্নতা দেখাবার অসীম প্রয়াস। সুন্দরকে মানুষ পূজা করে কারণ তাকে সে পায়নি আর কারণ মনে মনে অনিচ্ছুকভাবে সে অসুন্দরের পক্ষপাতী। বীভৎস কিছু দেখার থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য আমরা চেষ্টা করে অন্যদিকে দৃষ্টি রাখি কিন্তু বিড়ম্বনা এই যে শেষ পর্য্যন্ত কুৎসিতের দিকে আমাদের বারবার ফিরে তাকাতে হয়। ইচ্ছা করে অন্যমনস্ক থাকলেও অনভীপ্সিত দৃশ্য আমাদের চোখে ও মনে পড়ে এবং এই ধরণের দৃশ্য ছাড়া কোন আমেরিকান্ ছবিই হয় না। সভ্যতম জাতি যে আদিম মানুষের বর্ব্বরতার পক্ষপাতী তা ওদেশে Mac West এর অদ্বিতীয় জনপ্রিয়তা থেকে প্রমাণিত হয়। Eddie Cantor, Maurice Chevalier প্রভৃতির ছবি বর্ব্বরতারই সভ্য ব্যঞ্জনা। এদের ছবির মাঝে উপভোগ করবার কিছু আছে কিন্তু অধিকাংশ ছবি Raw sex stuff—মানুষের অন্তরের পশুকে খেলিয়ে সে পয়সা লোটে।

যতদিন না আমাদের ছায়াশিল্প সম্পূর্ণ হতে পারছে ততদিন আমাদের আমেরিকারই অনুকরণ করতে হবে। আমাদের দেশে ছোট ছবি হয় না কিন্তু বহুক্ষেত্রে আমরা দেখেছি ছোট ছবিরও নিজের বিশেষ আনন্দদায়কতা আছে। সংবাদ, বৈচিত্র্য, হাসি, গান, খেলাধুলা, ভ্রমণ,

বিজ্ঞান, ব্যঙ্গ প্রভৃতি দশ বারো রকমের ছোট ছবি আমাদের চোখে পড়ে। এ সব ছবি তোলায় অধিক অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় না, বড় ছবির মত জোরালো ঘোরালো অভিনয়নের জন্ম কষ্ট স্বীকার করতে হয় না, প্রতিপদে বিচ্যুতির আশঙ্কায় শঙ্কিত থাকতে হয় না। কিন্তু এই ধরণের ছবি কেউ তুলতে চান না; ছ'বছরের পুরাণো বিদেশের সংবাদচিত্র দেখাবেন, সেও ভাল কিন্তু ছোট ছবি তুলবেন না। কাশ্মীর, নীলগিরি, খাইবার পথ প্রভৃতির কথা ছেড়ে দিলাম আমাদের ধানক্ষেত নিয়েও এমন ছবি হতে পারে যা সারা পৃথিবীতে আদৃত হবে। আমাদের ঘর দুয়ারের কথা আমাদের পল্লীর দুর্দশা ও তার প্রতিকার নিয়ে জগতের বিস্ময়কর ছবি হতে পারে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের, সংবাদের, বৈচিত্র্যের বেড়াবার জায়গার অভাব নেই আমাদের দেশে। আমাদের কবি বিশ্বের বরণীয়, আমাদের কবিতা সুন্দরতম। কিন্তু কারো ইচ্ছা দেখিনা যে এই সব নিয়ে ছোট সুন্দর সুন্দর ছবি হয়। দরদী কণ্ঠে কেউ করে যাবেন নেপথ্যে রবীন্দ্রকবিতা আবৃত্তি, যন্ত্রে ধরা পড়বে তার সুর, প্রকৃতিতে ফুটে উঠবে তার রূপ —কত চমৎকার, কত বাঞ্ছনীয় একটী ছবি হতে পারে। সংবাদ চিত্র পুরানো হয়ে যাবার ভয় আছে, হাসির ছবি নিরর্থক হতে পারে, কারণ খাঁটি স্বদেশী হিউমারের অভাব আছে, তার কারণ আমরা বাঙালীরা বড় ভাবুক বড় গম্ভীর, ব্যঙ্গচিত্রে অনেক মস্তিষ্কের প্রয়োজন কিন্তু Triaval Talk, Song Shorts এবং Stranger than Fiction প্রভৃতি আমরা নির্ভয়ে তুলে সারা পৃথিবীর বাজারে চালাতে পারি। বিশ্বের হাটে কেনাবেচা করতে হলে ছোট ছবির নেপথ্যে ব্যাখ্যা করতে হবে ইংরাজিতে এবং এখানেই এসে পড়ছে শিক্ষিতদের সুযোগ দানের কথা। এই সব ছবির সাফল্য নির্ভর করে আলোকচিত্র, শব্দগ্রহণ ও ব্যাখ্যাকারের পরে; প্রথম দুটী বিষয়ে আমরা নির্ভয় কিন্তু তৃতীয় বিষয়ের মূলে আছে ছায়াশিল্পের 'কর্ণধারদের' মর্জ্জি। পুরাণো নিউজ রীল্ World Moves Onকে সম্পূর্ণ হতে সাহায্য করে, একথা মনে রেখে আমরা সংবাদচিত্র সম্বন্ধেও আশান্বিত হতে পারি।

পার্ট্ কেল্‌টন্

চপল চটুল হাল্কা রসের অভিনয়ে পার্ট কেলটনের বিশেষ নাম। নাচে গানে খুসিতে ভরা পার্টকে সকলেরই ভাল লাগবে।

ডিসেম্বরের ছবি

গতমাসে সর্ব্বসমেত ইংরাজি ও বাংলা সাঁইত্রিশখানা (৩৭) ছবি মুক্তিলাভ করেছে, এর মধ্যে মাত্র তিনটি বাংলা। সব ছবিরই বিশদ আলোচনা করবার স্থান, অবসর ও উৎসাহ আমাদের নেই। আমাদের মতে (ক) শ্রেণীর ছবি হবে অসাধারণ, (খ)—সুন্দর, (গ) উপভোগ্য, (ঘ)—সাধারণ। (ছ) শ্রেণীর ছবি ছেলেরাও দেখতে পারে।

ওয়ান্ নাইট্ অব্ লাভ্ (ক)—গীতি-নাট্য বলতে যে জিনিষ বোঝায় তার সঙ্গে এর প্রভেদ আছে। গীতিনাট্যের মত এটী নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতহীন নয় বরং এর নাটকীয় রস যেমনি ঘন তেমনি উচ্চাঙ্গের। আশার কথা, এই যে 'মার্ডার এট্ দি ভ্যানিটিজ্' বা 'ওয়ান্ডার বার'এর মত হত্যাদি চালিয়ে গল্প জমাতে হয় নি। সঙ্গীত শিক্ষক ও ছাত্রীর প্রেমের কাহিনী। গ্রেস্ মুরের গীতি সম্পদে ছবিটী অতুলনীয়। অভিনয় পরম উপভোগ্য, সঙ্গীত শিক্ষকরূপে টুলিও কার্ম্মিনেটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রযোজনা ছন্দোবন্ধ-চমৎকার।

ম্যান্‌স্‌ কাস্‌ল্‌ (খ)—গল্পে, উপন্যাসে এবং মাঝে মাঝে বাস্তব জীবনেও আমরা এমন মানুষকে দেখতে পাই যে পৃথিবীর সমস্ত ভোগে নিমগ্ন থেকেও অন্তরে থাকে উদাসীন, নির্লিপ্ত—সেখানে বাজে অসীমের আহ্বান, আসে অসংজ্ঞেয়ের হাতছানি। একদিন পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর নির্ম্মোক ত্যাগ করে সে চলে নিরুদ্দেশ যাত্রায়, হয়ত সেখানেও শূন্যকামী বাঁধা পড়ে নীড়ের মায়ায়। এই রকম চরিত্রেই স্পেন্‌সার ট্রেসিকে মানায় চমৎকার—চোখে তার সুদূরের প্রয়াস, মুখ তার নির্লিপ্ততা ব্যঞ্জক। ট্রেসি একদিন লরেটা ইয়ংকে আশ্রয় দিলে, হলো তার গর্ভস্থ সন্তানের পিতা—কে জানে প্রেমে হয়ত সে পড়েনি। তারপর তার বন্‌ভোলা মানুষ ভোলেনি, লরেটাকে নিয়েই সে চললো। অদ্বিতীয় স্রষ্টা ফ্রাঙ্ক বোরজেগ্‌ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ প্রয়োগ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। 'সেভ্‌ন্‌থ্‌ হেভ্‌ন্‌'-এর অস্ফুট ছাপ আছে গল্পে ও treatment এ।

ক্রাইম্‌ উইদাউট্‌ প্যাশন্‌ (ক)—মামুলি গল্প নিয়েও যে প্রয়োগনৈপুণ্যে ছবিকে অসাধারণ করা যায় বেন্‌ হেচ্‌ট্‌ ও চার্লস্‌ ম্যাকার্থার তার প্রমাণ দেখালেন। এই ছবিতে তাঁরা যে কলাকুশলতার শিল্পিমনের পরিচয় দিয়েছেন স্বর্গত মার্ণু বা গ্রিফিতের মাঝে তার তুলনা পাই। তাঁরা ফুটিয়েছেন মানুষের অন্তরের শয়তান ও সুমতির দ্বন্দ্ব। গল্পের প্রাধান্য নেই, পুরোভাগে এসেছে প্রয়োজনা ও অভিনয়। ক্লড্‌ রেন্‌স্‌ এই চিত্রে যে অভিনয় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তারও তুলনা ক্বচিৎ মেলে।

ওয়ার্লড্‌ মুভস্‌ অন্‌ (খ)—একশত বৎসরের একটী মনোজ্ঞ কাহিনী। আধুনিক মানবতার সমস্যা-কণ্টকিত পথ, তার সব ভুলে অর্থোপাসনা ইত্যাদি ধ্বংস ও যুদ্ধের পথে নিয়ে যাচ্ছে, তাই এর প্রতিপাদ্য বিষয়। সমস্যা বিজড়িত থাকলেও ছবিটী খুব সফল হয়েছে। বর্ত্তমান জগৎ নিয়ে যখন কথা তখন অতীতের পৃথিবীকে প্রাধান্য দেওয়া চলে না এবং চলেও নি, তবে Colourful good old days এর প্রতি আমাদের প্রচণ্ড মোহ বলে মন পুরা খুসী হয় না। ফ্রাঙ্কট্‌ টোন্‌ চমৎকার অভিনয় করেছেন। ম্যাডিলিন্‌ ক্যারল্‌ অভিনয় ভালই করেছেন তবে তিনি প্রদত্ত অভিনয় সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারেন নি। জন্‌ ফোর্ড গুণী ব্যক্তি, প্রযোজনায় তিনি প্রভূত উৎকর্ষ দেখিয়েছেন, তবে তাঁর কাছ থেকেও সুযোগের অনুপাতে আরো সুন্দর প্রযোজনা চেয়েছিলাম।

গে ডিভর্সি (খ)—নাচ গানের সুন্দর ছবি, প্রচুর হাসির উপাদানও আছে। কন্‌টিনেন্‌টাল্‌ নাচে বাস্তবিকই উন্মাদনা আছে এবং দুয়েকটী গান গাইবার লোভ সংবরণ করা যায় না। ফ্রেড্‌ এষ্টেয়ার, জিঞ্জার রজার্স এবং এড্‌ওয়ার্ড এভারেট্‌ হর্টন্‌কে সাধুবাদ জানাচ্ছি। গল্পে হাসির খোরাক থাকলেও কিছু কৃত্রিম বলে মনে হয়। প্রযোজনা সুসঙ্গত।

সারভেন্টস্‌ এন্‌ট্রান্‌স্‌ (খ) ও (ছ)—আগাগোড়া উচ্চাঙ্গের প্রাণখোলা হাসির মধ্য দিয়ে পর্দায় ফুটে উঠেছে মধুর ও নূতন একটী প্রেমের কাহিনী। জেনেট্‌ গেনর, লিউ আয়ার্স, ওয়াল্‌টার কনোলি, সিগ্‌ফ্রায়েড রুম্যান্‌, লুইসি ড্রেসার প্রভৃতি সকলেই ভূমিকোচিত সু-অভিনয় করেছেন, টিম-ওয়ার্ক খুবই সুন্দর হয়েছে। গত-পূর্ব্ব বৎসরের শ্রেষ্ঠ প্রয়োগশিল্পী ফ্রাঙ্ক লয়েড্‌ সুসমঞ্জস প্রযোজনা করেছেন।

ব্যারেট্‌স্‌ অব্‌ দি উইম্‌পোল্‌ ষ্ট্রীট্‌ (খ) ও (ছ)—অমর কবি রবার্ট ব্রাউনিং ও এলিজ্যাবেথ্‌ ব্যারেটের প্রেমের কাহিনী। নায়ক ব্রাউনিং-এর চরিত্রে কিছু না থাকায় এবং সুযোগের স্বল্পতা হেতু ফ্রেড্‌রিক্‌ মার্চ মনে দাগ কাটতে পারেন নি। চার্লস্‌ লাফ্‌টনের অভিনয় ভাল হলেও তাঁর ভূমিকাটী বাঞ্ছনীয় নয়। নর্ম্মা শিয়ারার এলিজ্যাবেথ্‌রূপে অভিনয়ের সমস্ত সুযোগ পেয়েছেন এবং তার সদ্ব্যবহার করেছেন, তবু বারবার তাঁকে দেখার জন্য কিছু একঘেয়ে ঠেকে। সিড্‌নি ফ্রাঙ্কলিনের প্রযোজনা সুন্দর ও মধুর।

দি ব্ল্যাক্‌ ক্যাট্‌ (খ)—এড্‌গার এলান্‌ পোর লেখা গ্রন্থের চিত্ররূপে বরিস্‌ কার্লফ্‌ ও বেলা লুগোসি একত্র অভিনয় করেছেন। নাটকীয় সংঘাত বজায় রেখে ভীতিচিত্র করা দুষ্কর। আলোচ্য ছবিতে সব চেয়ে বেশি রোমাঞ্চ ও উত্তেজনা আছে প্রত্যেকটী দৃশ্যের উপস্থাপনায়। Presentation খুব effective। আমরা এড্‌গার আল্‌মালের প্রযোজনার প্রশংসা করি। সত্যই রোমাঞ্চকর ছবি।

পূর্ব্ববর্ত্তী পৃষ্ঠার ও এই পৃষ্ঠার চিত্র ও চিত্র-পরিচয় পরস্পর ক্রমিক হিসাবে দেওয়া আছে।

ক্লার্ক গেব্‌ল্

সিক্রেট সিক্স এ' ক্লার্ক গেব্‌ল্‌কে আমরা বোধ হয় প্রথম দেখি। তারপর গেব্‌ল্‌কে অনেক ছবিতেই দেখলাম কিন্তু প্রথম দিকে, সত্য বলতে কি, আমরা গেব্‌লের আকর্ষণে তার ছবি দেখতে যাই নি। কিন্তু আজ গেব্‌ল্ জনপ্রিয়তায় অদ্বিতীয়, তাকে না দেখলে তরুণীদের চঞ্চলতার অন্ত থাকে না এবং দেখলে উদ্বেগ বেড়েই যায়। চরিত্রানুগ অভিনয় করে ক্লার্ক গেব্‌ল্ অতুলনীয় নাম করেছে।

স্পেনসার ট্রেসি

স্পেন্‌সার ট্রেসি প্রায় সর্ব্ববিধ ভূমিকায় এ পর্য্যন্ত তাঁর অভিনয় ক্ষমতার গুণে প্রাণসঞ্চার করে এসেছেন। সম্প্রতি ট্রেসিকে 'ম্যান্‌স্ কাস্‌ল্' ছবিতে দেখলাম। অতি আসক্তির মাঝেও অন্তরে অন্তরে পরম উদাসিরূপে ট্রেসিকে মানিয়েছে অনবদ্য। প্রবোধ সান্যালের 'প্রিয় বান্ধবী'র জহরকে যাঁরা চেনেন স্পেন্‌সারকে তাঁরা সহজেই বুঝতে পারবেন।

ডেমস্ (খ)—এটীও উচ্চাঙ্গের হাল্কা হাসি, নাচ, গানের ছবি তবে প্রাণখোলা হাসির ভাগই কিছু বেশী। ডিক্ পাওয়েল্ চমৎকার গান গেয়েছেন, জোয়ান্ ব্লণ্ডেলের হাসির গান খুব উপভোগ্য। রুবি কিলারও চমৎকার। হাসিয়েছেন হিউ হার্ব্বার্ট, গাই কিব্বি ও জ্যাম্‌স পিট্‌স্ একযোগে।

তুলসীদাস—কালীফিল্মসের বাংলা ছবি। চিত্রনাট্য ও সংলাপ দুর্ব্বল। জ্যোতিষ মুখোপাধ্যায়ের প্রযোজনায় উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই, আলোকচিত্র উচ্চাঙ্গের তবে সর্ব্বত্র সমান নয়, শব্দগ্রহণ ও সজ্জাদি দোষমুক্ত নয়, নগেন্দ্রবালার অভিনয় চিত্রের প্রধান সম্পদ্, জহর গাঙ্গুলী ভক্ত কবিকে রূপ দিতে পারেন নি, রাণীবালার নির্ব্বাচন আদৌ যুক্তিসঙ্গত নয় এবং শেষতঃ গল্প mass মনোপন্থী হওয়ায় সাধক কবি তুলসীদাসের অন্তরের পরিচয় দিতে পারেনি।

রাজনটী বসন্তসেনা—রাধাফিল্মসের বাংলা ছবি। চিত্রনাট্য অত্যন্ত দুর্ব্বল, সংলাপ কোনো রকমে সমর্থনযোগ্য, প্রযোজক চারু রায়ের কয়েকটী কলাকুশলতার ছাপ থাকলেও অভিনয় পরিচালনায় তিনি কৃতকার্য্য হতে পারেন নি, অভিনয়ের অত্যধিক সুযোগ পেয়েও নাম ভূমিকায় বীণা কি বাচনে, কি ভাব প্রকাশে আমাদের সর্ব্বতোভাবে নিরাশ করেছেন, রবি রায়ের অভিনয় মঞ্চোপযোগী, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য ও ফণি বর্ম্মা অচল, চিত্রগ্রহণ দোষাবহ এবং শব্দগ্রহণ নিন্দনীয়।

শুভ ব্রাহ্মস্পর্শ—ভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্সের বাংলা ছবি। হাসির খোরাক বিশেষ কিছু নেই কারণ গল্প মামুলি এবং অভিনয়ে ভাঁড়ামি এসে গেছে, আশু বোসের উড়িয়া মঞ্চোপযোগী, চিত্তরঞ্জন গোস্বামীকে ভাল লাগেনি, ইন্দুবালাই কিছু হাসিয়েছেন, ছেলেদের অভিনয়ের কোনোটাই উল্লেখযোগ্য নয়, মন্মথ রায়ের পরিচালনায় কাঁচা হাতের ছাপ সুপরিস্ফুট, শব্দ ও চিত্রগ্রহণ অল্পবিস্তর দোষযুক্ত।

নিম্নলিখিত ছবিগুলি (গ) শ্রেণীর :—(১) চেন্‌ড্ (২) নাউ এণ্ড ফরেভার (৩) গিফ্‌ট্ অব্ গ্যাব্ (৪) লিট্‌ল্ মিস্ মার্কার (৫) বেল্ অব্ দি নাইন্‌টিজ্ (৬) নেল্ গুইন্ (৭) ম্যান্ অব্ আরান্ (৮) আওয়রে বেটার্স (৯) আউট কাস্‌ট্ লেডি এবং (১০) ক্যামেল্‌স্ আর কামিং।

(ঘ) শ্রেণীর ছবিগুলির উল্লেখ আর করিলাম না।

মন-অভিলাষ

শ্রীসুখরঞ্জন রায়

তোমার হিয়ার মাঝে আমি লভি বাস
এই মোর মন-অভিলাষ ;—
যেখানে পরাণ-পুটে
সুখ দুখ ফুটে উঠে,
প্রথম পায়ের ধ্বনি ফেলে শত আশ,
সেই খানে সুগোপনে আমি লভি বাস
এই মোর মন-অভিলাষ।

হারাণ' হিয়ার দেশে
তীর যেথা নীরে মেশে,
অলকে খেলিয়া যায় উদাস বাতাস,
সেই ঘর-ছাড়া হিয়া ঘরে আমি লভি বাস
এই মোর মন-অভিলাষ।
সেই যেথা তব চিতে
তোমারো অলক্ষিতে
কায়াহীন কানাকানি ফেলে মৃদু শ্বাস্
সে অচেনা মনোপুরে আমি লভি বাস
এই মোর মন-অভিলাষ॥

বৃহত্তর বাংলা

শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার

কলিকাতা মহানগরীর পৌরনায়ক হিসাবে নাগরিকগণের পক্ষ হইতে আপনাদিগকে আমি স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি। বহুদিন পরে আপনারা আবার নিজের দেশে ফিরিয়া নিজের দেশবাসীগণের সহিত মিলিত হইয়াছেন; আপনারা আমাদের পরম আত্মীয় ও বান্ধব; আপনাদের সহিত একান্তভাবে মিলিত হইবার এই সুযোগ লাভ করিয়া আমরা প্রত্যেকেই আজ নিবিড় আনন্দ অনুভব করিতেছি। আপনাদের উপস্থিতিতে আজ আবার বাঙ্গালীর ঐক্য ও গভীর মমত্ববোধ স্বতঃই উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। আজ এই সম্মেলন উপলক্ষে আমরা বাঙ্গালী বলিয়া যে গর্ব্ব অনুভব করিতেছি, তাহা যদি বাঙ্গালীর কর্ম্মে, ভাবনায় ও সাধনায় সার্থক হইয়া উঠে, তাহা হইলেই এই সম্মেলনের প্রয়োজন সিদ্ধ ও তাহার ফল সার্থক হইবে। আমি আশা করি, বাঙ্গালীর সমবেত আশা-আকাঙ্ক্ষা আপনাদের আলোচনা ও কর্ম্মের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া এই সম্মেলনকে সাফল্য-মণ্ডিত করিবে।

এই সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যখন বৃহত্তর বঙ্গশাখার উদ্বোধন করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন, তখন আমি অল্লাধিক সঙ্কোচ বোধ করিয়াছি; কারণ, বর্ত্তমানে 'বৃহত্তর ভারত' বা 'বৃহত্তর বাংলা' বলিতে ভারত বা বাংলার 'কাল্‌চার' বা সংস্কৃতিগত প্রভাবের কথাটাই সকলের আগে আমাদের মনে পড়ে; 'বৃহত্তর বাংলা' বলিতে সংস্কৃতির জগতে বাংলার যে অবদান সূচিত হয়, সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার অধিকার আমার আছে বলিয়া আমি দাবী করিতে পারি না। যাঁহারা এদেশের সংস্কৃতি ও সাধনার মর্ম্মকথা আহরণ করিয়া নিজের এবং অপর সকলের জ্ঞানের সীমা বাড়াইয়া দিতেছেন,—তাঁহারাই এই সকল বিষয় সম্পর্কিত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানাদির উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করিতে পারেন। কিন্তু আপনারা অকৃতীর হস্তে এই শাখা উদ্বোধনের গুরুভার অর্পণ করিয়াছেন; নিতান্ত অক্ষমতা সত্ত্বেও যে কারণে আমি এই দায়িত্ব শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছি, তাহাই আমাকে আজ সঙ্কোচমুক্ত করিয়াছে। জীবিকার জন্য আমাকে যে বিরাট কর্ম্মচক্রের আবর্ত্তনে ঘুরিতে হয়, তাহার পরিধি শুধু বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ নয়; বাংলার সীমা ছাড়াইয়াও তাহা শুধু নিখিল ভারতে কেন, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের প্রান্তেও গিয়া পৌছিয়াছে। ইহা ছাড়া কেবলমাত্র গ্রাসাচ্ছাদনের বাহিরেও আমি নিজের যে কর্ম্মক্ষেত্রের সন্ধান করিয়া লইয়াছি, তাহাও সমগ্রদেশের সহিত নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। এই কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াই অনেক সময় আমাকে ভারতীয় সমস্যার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। এই নিমিত্ত বৃহত্তর বাংলার কথাও যে মনে স্থান পায় নাই, এমন নহে। এই হিসাবে হয়ত আমার পক্ষে এই শাখার পৌরহিত্য করা নিতান্ত অযৌক্তিক নাও হইতে পারে। তবে বাংলাদেশে জ্ঞানী, বিবিধ বিষয়ে পারদর্শী এমন অনেকেই আছেন, যাঁহাদের পৌরহিত্যে এই শাখার সম্মান বৃদ্ধি পাইত। তবু আমার উপর এই ভার অর্পণ করিয়া অভ্যর্থনা সমিতি আমার প্রতি যে প্রীতি ও অনুগ্রহের পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

আপনারা যে উপলক্ষে এখানে মিলিত হইয়াছেন, তাহা মুখ্যতঃ সাহিত্যের সহিত সংশ্লিষ্ট। মিলনের বাণী বহন করাই সাহিত্যের প্রধান সার্থকতা, এবং সাহিত্যের মধ্য দিয়াই জাতির সহিত জাতির, সম্প্রদায়ের সহিত সম্প্রদায়ের এবং দেশের সহিত দেশের যোগসূত্র গ্রথিত হয়। স্বার্থের

সংঘাতে যেখানে আমাদের মিলন একান্ত অসম্ভব হইয়া উঠে, চিন্তার জগতে সাহিত্যের মধ্য দিয়া সেই মিলন সম্ভবপর হয়। সেক্সপীয়র ইংরাজ হইলেও আজ সমগ্র পৃথিবীর প্রিয়; রবীন্দ্রনাথ বাংলার হইলেও আজ নিখিল জগতের একান্ত আপনার। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তার জগতে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের দানও ভারতের কর্ম্মক্ষেত্র ছাড়াইয়া বিশ্বমানবের ঐক্যসাধন করিতেছে। ইঁহাদের বাণীর মধ্যে নিখিল মানবের গূঢ় মর্ম্মকথা অভিব্যক্ত হইয়াছে। সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই মিলন সাধনের শক্তিকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অন্তরের সহিত আমি ইহাকে শ্রদ্ধা করি; জাতীয় জীবনে ইহার প্রভাব সকল যুগে, সকল অবস্থায় স্বীকৃত হইবে। কিন্তু আমাদের দেশে এইরূপ প্রভাবশীল সাহিত্য গড়িয়া উঠিবার পক্ষে উপযুক্ত 'আবহাওয়া' আছে কিনা, তাহা ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। যে জাতির যুবক সম্প্রদায় উচ্চশিক্ষা পাইয়াও তাহাদের জীবনের উৎকর্ষ সাধনের সুযোগ লাভ করিতে পারে না, যে জাতির অধিকাংশ লোক নিরক্ষর, যে জাতির জীবিকা সংস্থানের পথ প্রতিদিন সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে, যাহার পরবশতা জনসাধারণের কল্যাণ সাধনের, এমন কি ব্যক্তিগত আত্মোৎকর্ষের প্রচেষ্টাকেও ব্যাহত করিতেছে, যে জাতিকে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব-কলহ ও অন্তর্ব্বিবাদের সংঘাত প্রতিনিয়ত ক্ষতবিক্ষত করিতেছে, তাহার সাহিত্যে যে মিলনের বাণী ধ্বনিত হয়, তাহা জাতীয় জীবনের সাধনায় যথেষ্ট প্রেরণা দিতে পারে না। আজ বাংলার জাতীয়-জীবনে যে ব্যক্তিগত স্বার্থমূলক ও সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, তাহার আক্রমণ হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যও রক্ষা পায় নাই।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত যে সকল মনীষী বাংলা সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সেবা করিয়া সমগ্র বাঙ্গালী জাতির গৌরববর্দ্ধন করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের নমস্য। আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশ-চন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন, আশুতোষ, শরতচন্দ্র প্রভৃতি সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ও রাজনীতিক্ষেত্রে শুধু বাংলার কেন, সমগ্র ভারতের গৌরব। কিন্তু বাঙ্গালী জাতির চিন্তা ও ভাবের বিভিন্নক্ষেত্রে এই কৃতিত্ব এখন এক প্রকার অতীত সমৃদ্ধির তুল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে এমন যে জীবন সংগ্রামের সমস্যা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে আশঙ্কা হইতেছে ভবিষ্যতে বাঙ্গালী জাতির সাহিত্য সেবার উদ্যমও যথেষ্ট প্রবল হইবে না। জীবনের সমস্যা হইতে তাহার সাহিত্য বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে চলিবে না। জীবনধারার রূপই আমরা সাহিত্যে দেখিতে পাই; তাই সাহিত্যকে প্রাণবন্ত করিতে হইলে জীবনকে যে সকল সমস্যা আজ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে তাহার প্রতি আমাদিগকে অবহিত হইতে হইবে। অতীতকে আমরা উপেক্ষা করিব না,—অতীতের গৌরব আমাদের শক্তি ও প্রেরণা দিবে। কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের সমগ্র জাতির সম্মুখে যে সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে বর্ত্তমান সমস্যাগুলির সমাধান কল্পে বাঙ্গালী মাত্রেরই আত্মনিয়োগের সময় আসিয়াছে। নতুবা এই জাতির আর্থিক ও সংস্কৃতিগত ভবিষ্যৎ ক্রমশঃ ইহাকে ধ্বংসের মুখে টানিয়া নিবে। বাঙ্গালীর এই জীবন সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজিয়া বাহির করিবার মূলে রহিয়াছে তীক্ষ্ণ আত্ম-বিশ্লেষণ। আজ আমাদের যে সকল অক্ষমতা জীবন যুদ্ধে জয়ী হইবার পক্ষে অন্তরায় ঘটাইতেছে, সেগুলিকে নির্ম্মম ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া নিজেদের চোখের সম্মুখে ধরিতে হইবে। এই প্রকার আত্মচেতনা না জাগিলে আমরা কখনও শক্তিলাভ করিতে পারিব না।

আজ প্রবাসী বাঙ্গালীর মধ্যে যাঁহারা এখানে সমবেত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে বাঙ্গালীর এই সমস্যা নিজেদের সমস্যা বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে এবং আমার আন্তরিক প্রার্থনা যে তাঁহারা এই সমস্যা সমাধানের জন্য আপন আপন শক্তি অকুণ্ঠচিত্তে প্রয়োগ করিবেন। আপনাদিগকে নিতান্ত আত্মীয়-জ্ঞান করিয়াই আজ বাংলার বর্ত্তমান জীবন সম্বন্ধে আপনাদের নিকট কয়েকটি কথা নিবেদন করিতে চাই; ইহা হইতে আপনারা আমাদের জাতীয় সমস্যার স্বরূপ অনেকটা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বাংলা দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার কথা বিস্তারিত আলোচনা করিয়া আজ এই সম্মেলনের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইতে চাই না। কিন্তু

এই সমস্যা বর্ত্তমানে এরূপ ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে এ সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা না বলিয়াও উপায় নাই। দেশে বেকার সমস্যা দিনের পর দিন বাড়িয়া যাইতেছে; ব্যবসায় ও বাণিজ্যের ক্ষেত্র বাঙ্গালীর হস্তচ্যুত হইয়া পড়িতেছে; কৃষি প্রায় মরণোন্মুখ; গ্রাম্য জীবন স্বাস্থ্য, শ্রী ও আনন্দহীন। নাগরিক জীবনে বাহ্যাড়ম্বর থাকিলেও তাহা অন্তঃসারশূন্য; উচ্চশিক্ষা ব্যর্থ, বিড়ম্বনা স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; লৌকিক ও সামাজিক ব্যাপারেও আজ বাঙ্গালীর মধ্যে সহজ আন্তরিকতা নাই। বাঙ্গালীর স্বগৃহে জীবন ধারণের যে একটা স্বাভাবিক মাধুর্য্য ছিল, তাহাও লোপ পাইতে বসিয়াছে। বৃত্তিহীনতা যদি বাংলার একমাত্র সমস্যা হইত, তাহা হইলে হয়ত তাহার সমাধান একেবারে অসম্ভব হইত না। কিন্তু চতুর্দ্দিক হইতে বিভিন্ন সমস্যা সমবেত শক্তি লইয়া আমাদের সামাজিক ও জাতীয় জীবন আক্রমণ করিয়াছে। আমরা নিজেদের ঔদাসীন্য ও শ্রমবিমুখতায় দেশের আর্থিক জীবনের উপর আমাদের ন্যায্য অধিকারটুকুও হারাইতে বসিয়াছি। বাংলা দেশে তাই আজ ভারতের সর্ব্বপ্রদেশের লোক জীবিকা অর্জ্জনের সুযোগ পায়, কিন্তু পায় না শুধু বাঙ্গালী। আমরা অন্যান্য দেশে যে দাবী ও অধিকার স্থাপন করিতে পারি না, বাংলাদেশে বাহিরের লোক আসিয়া সেই দাবী ও অধিকার স্থাপন করিতেছে। কাজেই দেশের মাটী হইতে আমাদের স্বাভাবিক অধিকার ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। আর্থিক জীবনের যখন এরূপ শোচনীয় অবস্থা, তখনও আমরা বাঙ্গালী জীবনের শক্তিহীনতার মূল কারণ সন্ধান করিতে তৎপর হইতেছি না। আমরা উচ্চৈঃস্বরে জাতীয়তার দাবী পেশ করিয়াছি, কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব ও বিচ্ছিন্ন কর্ম্মধারা আমাদিগকে অগ্রসর হইতে দেয় নাই; কাজেই আমাদের কোন প্রকার কাজের প্রচেষ্টা সুসঙ্গত ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে না; ফলে বাঙ্গালীর ব্যর্থতা একটা প্রবচন তুল্য হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালী জাতির এইরূপ মরণ-বাঁচন-সমস্যার জটিল মুহূর্ত্তে সাম্প্রদায়িকতার বিষও আজ সমগ্র জাতীয় জীবনকে মলিন করিয়া তুলিয়াছে। এই সাম্প্রদায়িকতা এতদিন রাজনীতি-ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এখন তাহা বাংলার ও বাঙ্গালী জাতির সমস্ত সমস্যাগুলিকেই বিপর্য্যস্ত করিতেছে। যে সাম্প্রদায়িকতার দাবী এতদিন শুধু চাকুরীর বাজারে ভাগবাঁটোয়ারা ও ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগুলীর সংখ্যা নির্দ্দেশে সীমাবদ্ধ ছিল, আজ তাহা অর্থনীতিতে, শিক্ষায়, এমন কি, সাহিত্যেও সংক্রামিত হইতেছে।

বাঙ্গালী জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই বিরোধ ও ভেদবুদ্ধি যে ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তাহাতে জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কিত হইবার যে কারণ আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনেও এই বিরোধ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। আজ কাল ব্যক্তিগত বিরোধ ও মতবৈষম্যে যে কোন অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের সাফল্য ব্যাহত হয়। দেশের এই সমস্ত সমস্যার প্রতি আমি সমগ্র বাঙ্গালী জাতির এবং আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আমি মনে করি, বাঙ্গালী বিদেশে গিয়াছে বিদেশী হইতে নয়, বিদেশকে স্বদেশ করিয়া লইতে। সুতরাং বাংলার বাহিরে বাঙ্গালী জাতির গৌরব এবং প্রভাব রক্ষা করিতে হইলে বাঙ্গালীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সংস্কৃতিগত সর্ব্বশক্তির উৎস যে বাংলাদেশ—সর্ব্বাগ্রে তাহাকে সকল প্রকারে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে হইবে। বাঙ্গালী জাতির তথা বাংলার যাবতীয় গঠনমূলক প্রচেষ্টায় আমাদের সমবেত প্রতিভা ও শক্তি নিয়োজিত করিতে হইবে। বর্ত্তমানে আমাদের পারিপার্শ্বিক ও আভ্যন্তরিক যে সকল বিপরীত শক্তি জাতির মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার পক্ষে বিরোধিতা করিতেছে, তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে হইলে আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন—সঙ্ঘশক্তির উদ্বোধন। বর্ত্তমান জগতে শক্তিমান দেশগুলির অধিবাসীগণের মধ্যে একটি শিক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হইবে যে কোন সমস্যা সম্পর্কে পরস্পর মতভেদ থাকিলেও তাহাদের মধ্যে এরূপ একটি ঐক্য আছে যাহা জাতীয় স্বার্থের অনুকূল যে কোন সমবেত প্রচেষ্টার শক্তি দান করিয়া থাকে। এই সঙ্ঘশক্তি অর্জ্জন করিতে হইলে আমাদেরও মনোভাবের আমূল

পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। ইহার মূলে বাঙ্গালীর প্রতি বাঙ্গালী মাত্রেরই তীক্ষ্ণ মমত্ববোধ থাকার প্রয়োজন। বাঙ্গালীর সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান ও কর্ম্ম-প্রচেষ্টাকে সাফল্য-মণ্ডিত করিয়া তুলিতে হইলে, প্রত্যেক বাঙ্গালীর পক্ষে স্ব স্ব ক্ষমতানুযায়ী তাহার পোষকতা করা অন্যতম কর্ত্তব্য। আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা আমাদের সহজ সাফল্যের অনুকূল নহে। একমাত্র সম্মিলিত শক্তিতেই বাঙ্গালী বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে আবার প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে—একথা আমাদে ত্যেকেরই উপলব্ধি করিবার সময় আসিয়াছে। আজ সমবেত প্রবাসী বাঙ্গালীগণেরও মনোযোগ আমি এই দিকে আকর্ষণ করিতেছি। আমাদের আরব্ধ কার্য্যে ত্রুটি বিচ্যুতি থাকিলে তাহার সংশোধনের প্রতি অবহেলা করিলে চলিবে না; কিন্তু এই কঠোর প্রতিযোগিতাপূর্ণ সংসারে বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নির্ভর করে—সমগ্র বাঙ্গালী জাতির সহানুভূতি ও সাহায্যের উপর। আপনারা এখন হইতে বাংলার নানাপ্রকার ভাব ও কর্ম্মধারার সহিত নিবিড় ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিবেন, ইহাই আমার আন্তরিক নিবেদন। এই প্রকার সহযোগিতায় আপনাদের পক্ষে যেমন দূরত্বের অন্তরায় রহিয়াছে, অন্য পক্ষে একটি বিশেষ সুবিধা আছে বলিয়াও আমি মনে করি। স্থানীয় ব্যক্তিগত মতবৈষম্য ও সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের প্রভাবমুক্ত থাকিয়া আপনারা দেশের হিতাহিত সম্বন্ধে নিরপেক্ষ বিচার করিবার সুযোগ পাইবেন। প্রবাসী বাঙ্গালীগণের মধ্যে যাঁহারা প্রতিভায়, জ্ঞানে ও গঠন-শক্তিতে শক্তিমান, তাঁহারা বাংলার সমস্যা সমাধানের পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারেন। বাংলার সমস্যা তাঁহাদেরও মুখ চাহিয়া আছে। আজ এই মিলনের সুযোগে যদি প্রবাসী বাঙ্গালীর সহিত দেশবাসীর সকল প্রকার কর্ম্মপ্রচেষ্টায় যোগাযোগ সৃষ্ট হয়, তাহা হইলে এই সম্মেলনের সহায়তায় বাংলার অনেক সমস্যা সমাধানের পথ প্রশস্ত হইবে বলিয়া আমি মনে করি। আমি আশা করি, এই সম্মেলন কি উপায়ে এই যোগসূত্র স্থাপিত হইতে পারে, সে সম্বন্ধে চিন্তা করিবেন। বাংলা দেশকে গড়িয়া তুলিবার সঙ্গে যে এইরূপ প্রয়াস ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে—তাহাই আপনাদের নিকট পুনরায় নিবেদন করিয়া আমি আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি।

শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার

দুই সন্ধ্যা

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস

সকলি সুন্দর আজি এ-সান্ধ্য বিপুল পৃথিবীর
তোমার তরুণ চোখে; সুখ-তপ্ত তব দিবাযামী;
হে সুন্দরী, তুমি রহ দুঃসহ পুলকে;—আর আমি
নিঃসঙ্গ আমারে লয়ে সঙ্গ খুঁজি তব বিস্মৃতির।

তব নব যৌবনের স্বপ্ন লয়ে গাঁথিছ প্রাচীর
তোমার জীবন ঘিরি'; তরুণ অতিথি আসে নামি'
দেহের দুয়ারে তব;—বাণী শোনো অযুত অনামী!
তোমারে ঘিরিয়া চলে প্রণয়ের সুখ-ঘন ভিড়।

হে সুন্দরী, হেথা মোরে তপঃক্লিষ্ট বিরহী পৃথিবী;
বিবশ বনজ-বায়ু; সন্ধ্যা মোর বন্ধ্যা ক্ষীণজীবি।
আমার গোধূলি লগ্ন বিস্মৃতির হোম-ধূমাঞ্জনে
রুদ্ধশ্বাস, নিরিন্দ্রিয়। স্পর্শ হানি' রোমাঞ্চিত নীপ
রাত্রির বাসর বনে দীপ-হীন মোর গৃহাঙ্গনে;
নক্ষত্র নিমেষ-হত জ্বালি' তব পূজার প্রদীপ।

২

ক বছর ধানে দর নাই, সথীসোনার চকে আদায়পত্র বড় মন্দা। আবার যা আদায় হয় বাঁধ মেরামতে ও আর দশটা বাবদে চলিয়া যায় তার অর্দ্ধেকের বেশী। এবারে তহশীল করিতে সদর নায়েব হরিচরণ চাটুজ্জে মহাশয় স্বয়ং চলিয়া আসিতেছেন। চিঠি আসিয়াছে, তিনি রওনা হইয়া গিয়াছেন; আরও তিন-চারটা মহাল পরিদর্শন করিয়া তারপর এখানে আসিয়া পৌঁছিবেন। দু'টা জেলা পার হইয়া এতদূর অবধিও হরিচরণের নামডাক। মালাধর কিঞ্চিৎ শঙ্কিত হইয়া উঠিল।

যথাকালে নায়েব আসিলেন। রং কালো, মাথায় টাক, খুব মোটাসোটা চেহারা, পৈতার গোছাও চেহারার অনুপাতে। হুঁকা, গড়গড়া, অনুকল্পে কলাপাতায় কলকে বসানো—সর্ব্বক্ষণ যা হোক একটা কিছু চাইই। মালাধরের চণ্ডীমণ্ডপে মহাসমারোহে কাছারী চলিতেছে। আহারাদির ব্যবস্থা মালাধরের বাড়ীতে। সেনগিন্নী সমস্ত আয়োজন করিয়া চড়াইয়া দেন, একটা হিন্দুস্থানী দরোয়ান আছে, সে-ই ভাত তরকারীগুলা নামাইয়া দিয়া জাতরক্ষা করে। মালাধর যেন রাজসূয় ব্যাপার লাগাইয়াছে। গোটা জেলার মধ্যে কইমাছ যত মোটা হইতে পারে, তাহারই বিপুল সংগ্রহ কলসী-ভর্ত্তি করিয়া জিয়াইয়া রাখা। ঘর কয়েক গোয়ালা প্রজা আছে, তারা সকাল-সন্ধ্যা দুধ-ঘি নিয়মিত যোগান দিয়া চলিয়াছে। ক্রমশঃ গঞ্জের দোকানের সন্দেশ-রসগোল্লাও দেখা দিতে লাগিল। আয়োজন পরম সুন্দর। হরিচরণ মাঝে মাঝে ভদ্রতা করিয়া অনুযোগ করেন—কি সুরু করলে বল দিকি, সেন মশাই। এত কি দরকার?

বিনয়ে গলিয়া গিয়া মালাধর বলে—আজ্ঞে না। এ কি আপনাদের যুগ্যি? ছাই ভস্ম—যা-ই হোক, মোটের উপর দু'টি পেট ভরে সেবা করবেন।

সেবা আকণ্ঠ পুরিয়াই চলিতে লাগিল। কিন্তু বিকালে জমাখরচ মিলাইবার সময় সমস্তই বোধকরি একদম হজম হইয়া যায়।

—এ যে ভয়ানক কাণ্ড! একেবারে পুকুর চুরি!—পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে হরিচরণ চমকিয়া ওঠেন।—চার মজুরে তিন পয়সার তামাক পুড়িয়ে ফেলল? এ কক্ষনো হতে পারে না, সেন মশাই।

মালাধর বিরক্ত হইয়া ওঠে। উত্তর দেয়—হয় মশাই হিসেব করে দেখুনগে—চারজন কেন এক একজনেই পাহাড় উড়িয়ে দিতে পারে—

একদিন সকালবেলা নায়েব নিজে বাঁধ দেখিতে গেলেন। আশ্চর্য্য কাণ্ড, পাঁচশ টাকার মাটি কাটা হইয়াছে, কড়াক্রান্তি অবধি হিসাব করিয়া দেখানো হইয়াছে, অথচ বাঁধের কোনদিকে মাটি কাটার চিহ্ন নাই একটু। মালাধর আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—গর্ত্ত থাকবে কি মশাই,—আট ন মাস পুরে গেল—জোয়ার-জলে সমস্তই ত ভরাট করে দিয়ে গেছে!—

—আর তোলা মাটি বুঝি বৃষ্টির জলে ধুয়ে মুছে পরিস্কার হয়ে গেছে—

—যে আজ্ঞে। বলিয়া মালাধর সপ্রতিভ হাসি হাসিল।

—শোন, সেন মশাই—হরিচরণ হাসিলেন না, রূঢ়কণ্ঠে কহিলেন—বাঁধ-মেরামত বন্ধ আজকে থেকে। ভবিষ্যতে বিশেষ হুকুম না নিয়ে কাজে নামবেন না।

—তাহলে চকে নোনা জল ঢুকবে—

হরিচরণ বলিলেন—কিন্তু তা না হলে যে গোটা চকসুদ্ধ তোমার ট্যাঁকে ঢুকে যাবে।

মালাধর চুপ করিয়া গেল।

শীতের রৌদ্র সমস্ত নদীজল এবং দূরের গ্রামের গাছপালার উপর ঝকমক করিতে থাকে। চাষার ছেলেরা ঠনঠন শব্দে ভাঁড় বাজাইয়া খেজুর রস পাড়ে। নদীর বালুতটের উপর দিয়া একদল বিদেশী যাত্রাদলের ছেলে জাগুলগাছি গ্রামের দিকে যায়,—কারো কাঁধে গদা, কেহ বা রাবণের দশমুণ্ড হাতে ঝুলাইয়া লইয়াছে, একজনে নাকিসুরে গান ধরিয়াছে, 'নাথ, রাম কি বস্তু সাধারণ?'—ক্রমে দূরবর্ত্তী হইয়া গান আর কানে আসে না। ইহারা তখন বাড়ি আসিয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ হরিচরণ প্রশ্ন করিলেন—তোমার মাইনে কত, সেন মশাই?

প্রশ্নটা ঠিক কি ভাবে হইল, ধরা গেল না। নায়েবের মুখের দিকে তাকাইয়া করুণ গদগদকণ্ঠে মালাধর কহিল—আজ্ঞে, আট টাকা মাত্তোর। ওরি মধ্যে খাওয়া।

হাসিয়া ফেলিয়া হরিচরণ বলিলেন—কিন্তু খাওয়া ত আট টাকার মতো নয়। আমাদের বাবুর বাড়িতেও যে এমনটা হয় না—

মালাধর তৎক্ষণাৎ জবাব দিল—ও সব শ্বশুর মশায় তত্ত্বে পাঠিয়েছিলেন—

—তত্ত্বে সম্বৎসর চলে নাকি?

—আজ্ঞে না, আর বেশী দিন চলবে না। বলিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া উদ্যত ক্রোধ সামলাইয়া মালাধর বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

একদিন যথারীতি কাছারী চলিয়াছে, এমনি সময়ে হুমহাম করিয়া নরহরি চৌধুরীর হাঙ্গরমুখো পাল্কী উঠানে আসিয়া নামিল। যে যেখানে ছিল, তটস্থ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। নরহরি হাসিমুখে সকলের দিকে একবার তাকাইলেন। তারপর হরিচরণকে বলিলেন—গিন্নীর বার্ষিক শ্রাদ্ধ। কয়েকটি ব্রাহ্মণ-ভোজনের বাসনা হয়েছে। দয়া করে দুপুরবেলা একটু পদধূলি দেবেন, নায়েব মশায়।

কাজকর্ম্মের তাড়া আছে জানাইয়া চৌধুরী আর বসিলেন না, সরাসরি আবার পাল্কীতে গিয়া বসিলেন।

হরিচরণ এতক্ষণ পরে একবার গড়গড়ায় টান দিয়া দেখিলেন, আগুন নিভিয়াছে। দেখিয়া আবার সাজিতে হুকুম করিলেন। সেবারের সেই পাইকটি উপস্থিত ছিল, নিঃশ্বাস ফেলিয়া যেন নায়েবেরই মনের কথাটা প্রকাশ করিয়া কহিল—সর্ব্বরক্ষে!

দাখিলা লিখিতে লিখিতে বাঁকাহাসি হাসিয়া মালাধর বলিল—তাই কি বলা যায় রে, ভাই?

প্রজাপাটক উপস্থিত সকলে হাসিতে লাগিল। মালাধর বলিতে লাগিল—হাসির কথা নয় রে, দাদা। পুরাণে পড়েছ, ভগবানের দশ অবতার। তার ন'টা হয়ে গেছে—শেষ নম্বর, ঐ উনি। আস্ত কলিঠাকুর। মাটি দিয়ে ছাঁচ তুলে রাখা উচিত।

দাখিলার বইটা হরিচরণের দিকে সহির জন্য আগাইয়া দিয়া মালাধর টাকাকড়ি বাজাইয়া গণিয়া হাতবাক্সে তুলিল। তারপর নায়েবকে লক্ষ্য করিয়া পুনশ্চ বলিতে লাগিল—বিদেশী মানুষ, চেনেন না তাই। বরকন্দাজ না পাঠিয়ে স্বয়ং সশরীরে ঐ যে আদর আপ্যায়ন করে গেলেন,—আমার কিন্তু সেই অবধি মোটে ভাল ঠেকছে না, মশাই—

—হয়েছে, হয়েছে—চুপ কর দিকি!—হরিচরণ সগর্ব্বে বলিতে লাগিলেন—নিজে আসবেন না কি! আমাদের বাবু যে চৌধুরী মশায়ের পিশতুত ভায়রা। খবর রাখো?

পিশতুতো ভায়রার নিমন্ত্রণে যে প্রকার উল্লাস হইবার কথা, মুখভাবে অবশ্য তাহার একটুও প্রকাশ পাইল না। কিন্তু একঘর লোকের সামনে আলোচনা আর অধিক বাঞ্ছনীয় নয়। থামিতে গিয়াও তবু মালাধর বলিয়া উঠিল—ব্রাহ্মণ-

সন্তান—বিদেশে এসেছেন। খেয়েদেয়ে এখন সুভালাভালি ফিরে আসুনগে। আমাদের আর কারো কিন্তু নেমন্তন্ন হয়নি—শুধু আপনার···

দুর্গানাম স্মরণ করিয়া হরিচরণ নিমন্ত্রণে চলিলেন। বেলা পড়িয়া আসিল। পাশের গ্রামে যাত্রা গীতাভিনয়, তারা বিশেষ করিয়া বলিয়া গিয়াছে। দু'জন পাইক পাগড়ী বাঁধিয়া লাঠি লইয়া গান শুনিতে যাইবার উদ্যোগে উঠানে দাঁড়াইয়া আছে, মালাধর তাড়াতাড়ি বাড়ির মধ্য হইতে বালাপোষটা কাঁধে ফেলিয়া আসিল। এমনি সময়ে হেলিতে দুলিতে হরিচরণ ফিরিয়া আসিলেন। দেখা গেল, আশঙ্কা অমূলক; দিব্য হাসিমুখে তিনি পান চিবাইতেছেন। হাসিয়া বলিলেন—বিদেশী লোক বলে খামকা একটা ভয় দেখিয়ে দিয়েছিলে, সেন মশায়?

মালাধর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

হরিচরণ বলিলেন—অতি মহাশয় ব্যক্তি। নরহরি চৌধুরীর নামডাকই শুনে আসছি, পরিচয় ত তেমন ছিল না। দেখলাম—হাঁ, মানুষ বটে একটা!

মালাধর সশঙ্কে জিজ্ঞাসা করিল—বৃত্তান্ত কি নায়েব মশায়?

গর্বিতসুরে নায়েব বলিলেন—চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য পেয়—আর কিছু নয়।

মালাধর গম্ভীর হইয়া ঘাড় নাড়িতে লাগিল। বলিল—কি জানি। শনির নজর পড়লে গণেশের মুণ্ড উড়ে যায়, এইত এতকাল জানা ছিল।···

কিন্তু সত্যই, বিস্ময়ের আর পারাপার নাই।

দিনকয়েক পরে পুনরায় হাঙ্গরমুখো পাল্কী এবং পুনশ্চ নিমন্ত্রণ। এবারে চৌধুরীর মেয়ের পুতুলের বিয়ে না অমনি কি একটা ব্যাপার। তারপর যাতায়াত সুরু হইল প্রায় প্রতিদিনই; উপলক্ষের আর বাছবিচার রহিল না। এদিকে বরিশালে জমিদারের নামে হরিচরণ মোটা মোটা লেপাফা পাঠাইতেছেন। মালাধর দাখিলা লেখে আর আড়চোখে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখে। শেষে একদিন মরীয়া হইয়া বলিয়া বসিল—কথাটা একটু ভাঙুন দিকি নায়েব মশায়—

—কি?

—আজ্ঞে, আমরাও ছিটেফোঁটার প্রত্যাশী—

না—না—সে সব কিছু নয়। হরিচরণ তখনকার মতো চাপা দিলেন বটে, কিন্তু মালাধর ছাড়িবার লোক নয়। অতঃপর প্রায়ই কথাটা উঠিতে লাগিল। একদিন শেষে চুপিচুপি নায়েব বলিলেন—সখীসোনার চক বাবুরা ছেড়ে দিচ্ছেন—

মৃদু হাসিয়া মালাধর বলিল—নিচ্ছেন নরহরি চৌধুরী—

বিস্মিত দৃষ্টি মেলিয়া হরিচরণ প্রশ্ন করিলেন—কোথায় খবর পেলে? তুমি জান্‌লে কি করে?

মালাধর বলিতে লাগিল—আর কার মাথা ব্যথা পড়েছে বলুন। চকের দক্ষিণে চৌধুরীর ঢালিপাড়া, আবার উত্তরের গ্রামেও ওঁর তালুক। চকটুকু গ্রাস করতে পারলে সব একশা হয়ে যায়। গরজ চৌধুরীর নয় ত কি আর গরজ হবে বরণডাঙাদের?

—গরজ, না ছাই। সে হিসেব-জ্ঞান থাকলে ত? তাচ্ছিল্যের সুরে হরিচরণ কহিতে লাগিলেন—চৌধুরীর হাঁক ডাক কেবল ঐ মুখে মুখে—হেনো করেঙ্গা, তেনো করেঙ্গা। বুদ্ধি-বিবেচনায় লবডঙ্কা। কত অজুহাত? বলে—ও আমার পোষাবে না, আজ বাঁধ ভাঙল, কাল নোনা চোঁয়াচ্ছে...। শেষকালে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলাম—কেন পোষাবে না, মশাই? পাঁচশ ঘর ঢালি চাকরাণ...সব ত ভাত গিলছে আর বগল বাজাচ্ছে; খাটিয়ে নিন একটু। বাবুকেও বুঝিয়ে সুজিয়ে লিখে দিলাম, আপদ-বালাই ঝেড়ে দিন চৌধুরীর ঘাড়ে, কাঁহাতক হাঙ্গামা করে বেড়াবেন বছর বছর?

মালাধর তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল—দরদস্তুর হয়ে গেছে নাকি?

হরিচরণ বলিলেন—তা একরকম। তিন—চারশোর এদিক-ওদিক আছে, হয়ে যাবে বৈ কি?

—আজ্ঞে, সে দরের কথা বলছি না—একটু হাসিয়া চোখ টিপিয়া মালাধর বলিল—বলি, গণেশ-পুজোর ব্যবস্থাটা হল কি রকম?

হরিচরণ বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইয়া চাহিলেন। হাসিতে হাসিতে মালাধর বলিল—ব্রাহ্মণ-সন্তান শাস্ত্রজ্ঞ

লোক আপনি; ঐ দুর্গা বলুন, কালী বলুন—সকল বড় পূজোর আগে গণেশ পূজো। বাচ্চাঠাকুর আগে খুসী হবেন তবে বড়দের ভোগে আসবে। আটটাকা মাইনে পাই মশাই, তা-ও তিন বচ্ছর বাকী; এই হাতবাক্স কোলে করে সেরেস্তায় বসে আছি, সত্যি সত্যি ত যোগ তপিস্যে করতে আসি নি।

শিহরিয়া নায়েব জিভ কাটিলেন—ঘুস ?

—আজ্ঞে না, পাওনা-গণ্ডা—

হরিচরণ গম্ভীর মুখে বলিলেন—তোমার চাকরী বজায় থাকে, চৌধুরীকে সেই অনুরোধ করতে পারি। তার বেশী এককড়াও নয়। পরক্ষণে হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন—শ্বশুর বাড়ীর মস্ত একটা তত্ত্ব ফসকে যায় বুঝি, মালাধর ?

মালাধর মনে মনে বলিল—শ্বশুরের বেটা একাই সাবাড় করছে যে। সে হচ্ছে না, মাণিক।

নিরুত্তরে সে নায়েবের পরিহাসটা পরিপাক করিল।

দিবানিদ্রার পর বেলাটা একটু পড়িলে হরিচরণ আজ কাল প্রায়ই যান পিশতুত ভায়রার খবরাখবর লইতে, মালাধরও সঙ্গে সঙ্গে বালাপোষ কাঁধে ফেলিয়া ভিন্ন পথে যাত্রা শুনিতে বাহির হইয়া পড়ে। অকস্মাৎ ঐ অঞ্চলে যাত্রাগানের অত প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিয়াছে কেন, এবং সে-ই বা দিনের পর দিন গীতাভিনয় কি রকম উপভোগ করিতেছে, কিছুরই সংবাদ পাওয়া যায় না। ইদানীং সে পাইকদেরও সঙ্গে লয় না। এদিকে চক বন্দোবস্তের সমস্ত ঠিকঠাক, দিনস্থির পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে, দলিলের মুশাবিদা করিতে দুদিন পরে সকলের সদরে যাইবার কথা, হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতো বরিশাল হইতে হুকুম আসিল, চক আপাততঃ বিক্রয় হইবে না,—কবলাপত্র স্থগিদ থাকুক।

মালাধরই পত্রের মর্ম্ম পড়িয়া শুনাইল। রুক্ষ দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া হারিচরণ প্রশ্ন করিলেন—কাণ্ডটা কি ?

মালাধর যেন আকাশ হইতে পড়িয়াছে। বলিল—আপনাদের বড় বড় ব্যাপার, আমি কি জানি মশাই ? আমি দাখলে লিখি, যাত্রা শুনে বেড়াই, ব্যস্—

হুঁ—বলিয়া নায়েব গুম হইয়া রহিলেন। সেই বিকালটায় আপাততঃ চৌধুরী বাড়ীর খবরাখবর লওয়া বন্ধ রাখিতে হইল, ভাবিয়া চিন্তিয়া মনের মধ্যে যা হোক কিছু খাঁড়া না করিয়া যাওয়া ঠিক নয়। সকাল বেলা কাছারীর দোর খুলিয়াই দেখা গেল সামনে সর্দ্দার রঘুনাথ। সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া রঘুনাথ জিজ্ঞাসা করিল—শরীর গতিক ভাল ত ? চৌধুরী মশায় উতলা হয়েছেন।

মালাধরও সবে ঘুম ভাঙিয়া কৃষ্ণের শতনাম আওড়াইতে আওড়াইতে বাহিরের দিকে আসিতেছিল, গলা খাটো করিয়া বোধকরি বাতাসকে শুনাইয়া শুনাইয়া কহিল—কুটুম্বিতে একে বলে। একটা দিন দেখেন নি, দুশ্চিন্তায় চৌধুরী মশায় একেবারে এক প্রহর রাত থাকতে লোক মোতায়েন করে দিয়েছেন।

রঘুনাথ কাপড়ের খুঁট হইতে চিঠি বাহির করিয়া দিল। সেই পুরাণো ব্যাপার—মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ। আর একদফা পদধূলি লইয়া রঘুনাথ বিদায় হইয়া গেল।

কাছারী বসিয়াছে। মালাধর ঝুঁকিয়া পড়িয়া একটা হিসাব মিলাইতেছে। মাঝে মাঝে আড়চোখে হরিচরণের দিকে তাকাইয়া দেখে। এতদিনের মধ্যে যা কখনো হয় নাই—এদিক ওদিক তাকাইয়া হঠাৎ নায়েব বলিয়া উঠিলেন—একটা সৎযুক্তি দাও ত, সেন মশাই—

মালাধর ঘাড় তুলিল না। তেমনি হিসাব করিতে করিতে বলিল—আজ্ঞে—

হরিচরণ বলিলেন—চৌধুরী মশায় নেমন্তন্ন করে পাঠিয়েছেন, কিন্তু শরীরটে বড় খারাপ লাগছে—

আজ্ঞে—বলিয়া মালাধর এবার আপন মনে দুর্গানাম লিখিতে লাগিল।

হরিচরণ রাগ করিয়া খাতাপত্র ঠেলিয়া দিয়া কহিলেন—কথাটা যে মোটে কানে নিচ্ছ না—

মালাধর সন্ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—আজ্ঞে, অসুখ করেছে নিশ্চয়, নয়ত শরীর খারাপ লাগবে কেন ?

নায়েব আরো রাগিয়া বলিলেন—তোমায় সেজন্য পাঁচন জ্বালাতে বলছি না, সেন মশাই। জিজ্ঞাসা করছি, চৌধুরীর নেমন্তন্নের কি হবে?

—যেতে হবে।

—অসুখ অবস্থায়?

—আজ্ঞে, বাঘাহরির ব্রাহ্মণভোজনের ইচ্ছে হয়েছে যে—

নায়েব বলিলেন—চিঠি লিখে পাইক পাঠিয়ে দেওয়া যাক একটা। নয়ত ভদ্রলোক অনর্থক যোগাড়-যন্ত্র করে বসে থাকবেন—

মালাধর এদিক-ওদিক বার দুই ঘাড় নাড়িয়া সংশয়ের সুরে বলিল—আস্তাকুড়ে গিয়ে বসলে কি যমে ছাড়বে মশাই? বিশ্বেস ত হয় না—তবে আপনাদের কুটুম্বিতের ব্যাপার—এই যা।

যা বলিল তাই। চিঠি লিখিয়া পাইক পাঠানো হইল। কিন্তু নিমন্ত্রণ মাপ হইল না। যথাকালে একেবারে পাল্কী বেহারা চলিয়া আসিল, সঙ্গে রঘুনাথ।

হরিচরণ বলিলেন—জ্বর হয়েছে।

রঘুনাথ হাসিয়া বলিল—তাইত চৌধুরী মশায় ব্যস্ত হয়ে পাল্কী পাঠালেন। মাটিতে সে হাতের লাঠিটা একবার অকারণে ঠুকিল। পিতলের আংটা ঝুন ঝুন করিয়া বাজিয়া উঠিল।

মালাধর চোখের ইসারায় নায়েবকে ডাকিয়া লইয়া কহিল—বেলা করবেন না, উঠে পড়ুন পাল্কীতে—

নায়েব বিস্মিতভাবে চাহিলেন। মালাধর বলিতে লাগিল—দেবদ্বিজে ওঁর অচলা ভক্তি। নেমন্তন্ন ওরা আজ খাওয়াবেই ঠেকছে। একবার বলরাম স্মৃতিরত্নকে পিছমোড়া বেঁধে নেমন্তন্ন খাইয়ে দিয়েছিল।

সাত পাঁচ ভাবিয়া হরিচরণ পাল্কীতে উঠিলেন। নামিয়া নরহরির বৈঠকখানায় ঢুকিয়া দেখেন, গম্ভীর মুখে চৌধুরী পায়চারী করিতেছেন। বরিশালের চিঠিটা হরিচরণ হাতে দিয়া বলিলেন—কিসে কি হল, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, হুজুর। আমার একবিন্দু গাফিলতি নেই।

পড়া শেষ করিয়া নরহরি ডাকিলেন—রঘু!

হরিচরণ বলিতে লাগিলেন—ঐ মালাধর বেটার হয়ত কোন রকম কারসাজি আছে। ওটাকে সায়েস্তা করা দরকার।

নরহরি আরো গম্ভীর উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন—রঘুনাথ!

হরিচরণ ছুটিয়া গিয়া রঘুনাথকে ডাকিয়া আনিলেন।

নরহরি বলিলেন—একে খাবার জায়গায় বসিয়ে দিয়ে আয়—

হরিচরণ তাড়াতাড়ি বলিলেন—কথাটা তাহলে খাবার পর হবে হুজুর—

নরহরি পুনশ্চ রঘুনাথকে বলিলেন—খাওয়া হলে দেউড়ী পার করে আসবি, বুঝলি?…

রঘুনাথ বিশেষ সম্বর্দ্ধনা করিয়া কহিল—আসতে আজ্ঞা হয়, নায়েব বাবু!

আবছা জ্যোৎস্নায় প্রহরখানেক রাত্রে ঢালিপাড়ার ঘাটে ছোট একখানা ডিঙি আসিয়া লাগিল। এবারে বোঝাই হইয়া আসিয়াছে ধান নয়—কোদাল। রঘুনাথ সর্দ্দার ডিঙি হইতে নামিয়া গিয়া ভানুচাঁদকে ডাকিল। বলিল—চটপট ঐগুলো বিলি করে দে ত, বাবা।

ভানুচাঁদ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—শেষকালে চৌধুরীমশায় কোদাল পাঠালেন, সর্দ্দার?

সর্দ্দার বলিল—নিয়ে এলাম। দীঘি কাটার সেই হাজার দু' হাজার কোদাল পড়ে পড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। ভানুর অপ্রসন্ন মুখের দিকে চাহিয়া রঘুনাথ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। যে রকম ঘোরপ্যাচ কোম্পানীর আইন…লাঠি-কোদাল দুইই রাখতে হয় রে—কখন কি লাগে। চৌধুরীমশায় তাই বললেন—নিয়ে যাও, সর্দ্দার।

চকের ধান আধাআধি আন্দাজ কাটা হইয়াছে। এখানে-ওখানে খামার করিয়া গাদা দেওয়া হইয়াছে। দিনতিনেক পরে মহা এক বিপর্য্যয় কাণ্ড হইয়া গেল। মালাধরের উত্তরের ঘরে হরিচরণ ঘুমাইয়াছিলেন। অনেক রাত্রি। হঠাৎ বহুলোকের চীৎকারে ঘুম ভাঙিয়া নায়েব বাহিরে আসিলেন। চাঁদ অস্ত গিয়াছে। বিশ-ত্রিশজন চাষী বুক চাপড়াইয়া মাথা কুটিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

তাদের সর্ব্বনাশ হইয়া যায় ; বাঁধ ভাঙিয়াছে, নদীর লোনাজল পাকাধান ডুবাইয়া নষ্ট করিয়া তাদের সম্বৎসরের আশা-ভরসা ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে।

চোখ মুছিতে মুছিতে মালাধরও আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার পর সেই ক্রোশখানেক পথ সকলে একরকম দৌড়িয়া গিয়া দাঁড়াইল। শেষরাত্রির অন্ধকার-নিমগ্ন বিদ্যাধরী। কোটালের মুখ ; জোয়ার নামিয়াছে। শীতের শীর্ণ নিস্তেজ বিদ্যাধরী জলতরঙ্গে এখন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। কল্‌কল্‌ করিয়া লোনাজল বিপুলবেগে চকের নয়ানজুলি বোঝাই করিয়া ফেলিতেছে। আট-দশহাত ভাঙন দেখিতে দেখিতে বিশ হাত হইয়া দাঁড়াইল। বিপুল সর্ব্বনাশের সম্মুখে হতভম্ব হরিচরণ ঠক্‌ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। চাষীরা উন্মাদের মতো হইয়া গিয়া ঝাঁপ দিয়া সেই জলস্রোতের মধ্যে গিয়া পড়িল, যেন বুক দিয়া ঠেকাইতে চায়। পারিবে কেন ? জল ধাক্কা দিয়া তাদের ফেলাইয়া দেয়, পড়িয়া গড়াইতে গড়াইতে ক্ষত রক্তাক্তদেহে কোনগতিকে উঠিয়া আবার জল ঠেকাইবার বৃথা আকুলি-বিকুলি করে।

মালাধর চেঁচাইতে লাগিল—উঠে আয়, বেটারা। গ্রামে গিয়ে বাঁশ কেটে নিয়ে আয় আমার ঝাড় থেকে। কান্নাতে কি আর জল ঠেকাবে ?

বাঁশ আসিয়া পৌঁছিল। পঞ্চাশ ষাটটা বাঁশের খোঁটা জলের মধ্যে পুতিয়া গোছা গোছা কাটাধান আনিয়া তার গায়ে দিতে অনেক কষ্টে জলের বেগ কমিল। রাত্রি শেষ হইয়া পূর্ব্বাকাশে রক্ত আভা দেখা দিয়াছে। জল-কাদা মাখিয়া চাষীদের সঙ্গে মালাধরেরও অদ্ভুত মূর্ত্তি হইয়াছে। তারপর নদীতে ভাঁটা পড়িয়া গেলে ঝপাঝপ মাটি কাটিয়া বাঁধ মেরামত হইল।

ক্রুদ্ধকণ্ঠে হরিচরণ বলিয়া উঠিলেন—এ চৌধুরী শালার কাজ, আমি হলপ করে বলতে পারি।

—চুপ, চুপ ! মৃদু হাসিয়া মালাধর কহিল—রাগ চেঁচিয়ে করবেন না, মনে মনে করুন। চৌধুরীর পাঁচ-শ লাঠি আর হাজারটা কান। একটু থামিয়া কহিল—আমি মশাই, রাতদিন মাথা কুটে মরছি, নিদেনপক্ষে গাঙের দিক্‌কার বাঁধটা জব্দ রাখুন। আপনি গেলেন সরকারী পয়সা বাঁচাতে। কোটালের টান—পুরাণো বাঁধ রাখতে পারবে কেন ? এখন চৌধুরীর দোষ দিচ্ছেন ; বাবু কি আর বিশ্বাস করবেন কুটুম্বের দোষ ?

—আলবৎ ? হরিচরণ রাগিয়া আগুন। বলিতে লাগিলেন—এই কাজে চুল পাকিয়ে ফেললাম সেন মশাই, কোনটা কোটালের ভাঙন আর কোনটা মানুষের কাটা—তুমি আমায় শেখাতে এসেছ ? বাবুকে আজই চিঠি লিখছি, বুঝে দেখুন তাঁর কুটুম্বের কাণ্ডটা।

নায়েব চিঠি লিখিলেন। মালাধরও বাড়ীর মধ্যে গিয়া গোপনে আর এক চিঠি লিখিল। সদর হইতে জবাব আসিল, কি আসিল হরিচরণ কাহাকেও দেখাইলেন না। ক'দিন পরে তল্পীতল্পা বাঁধিয়া বিদায় হইলেন। মনের আনন্দে মালাধর হরির লুঠের জোগাড় করিল।

এখন মালাধর একেশ্বর ; অতএব বাঁধ মেরামতে কৃপণতা নাই। কিন্তু বাঁধ ভাঙা বন্ধ হইল না। ধানকাটা শেষ হইয়াছে, কাজেই আশু ক্ষতি গুরুতর হইতেছে না ; কিন্তু নদী যেন মানুষের সঙ্গে দুষ্টামি লাগাইয়াছে। মালাধর লোকজন ডাকিয়া সমস্তদিন হৈ হৈ করিয়া নূতন মাটি ফেলিয়া আসে ; সকালে গিয়া দেখা যায়, বিদ্যাধরী পাশে আর এক জায়গায় মাথা ঢুকাইয়াছে। আর মজা এই, নদীর যত আক্রোশ ঐ রাত্রিবেলাতেই ; বিশেষতঃ কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি হইলে ত কথাই নাই। একদিন অমাবস্যার কাছাকাছি কি একটা তিথি, সমস্তটা দিন মেঘলা করিয়া সন্ধ্যার পরে টিপিটিপি অকালবর্ষা সুরু হইয়াছিল। খানিক রাত্রে একখানা বাঁশের লাঠি হাতে লইয়া মালাধর একাকী বিদ্যাধরীর কূলে বাঁধের আড়ালে গুঁটিসুটি হইয়া বসিল। তীক্ষ্ণদৃষ্টি বিসারিত করিয়া সে গাঙের দিকে তাকাইয়া রহিল। আন্দাজ ঠিকই করিয়াছিল—অনেকক্ষণ তাকাইয়া তাকাইয়া তারপর দেখিল, কূল ঘেঁসিয়া উজান ঠেলিয়া কালো রেখার মতো ছোট একটা ডিঙি চলিয়াছে। বিশকুড়িটা মরদ একহাতে কোদাল, আর একহাতে সড়কি—ডিঙি হইতে নামিয়া ঝপাঝপ বাঁধে কোদাল মারিতে লাগিল। পা টিপিয়া টিপিয়া মালাধর নদীর খোলে নামিয়া নৌকার কাছে গিয়া দেখিল, কাদায় লগি পুতিয়া নৌকা বাঁধা। নিঃশব্দে দড়ি খুলিয়া দিল, তীব্রস্রোতে

ডিঙি দেখিতে দেখিতে নিখোঁজ হইয়া গেল। তারপর আবার বাঁধের আড়ালে আড়ালে ঘরে গিয়া দিব্য ভালো মানুষের মতো নাক ডাকাইতে লাগিল।

পরদিন মালাধর নরহরির বাড়ী গিয়া ধর্ণা দিয়া পড়িল। প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের কণ্ঠে নরহরি কহিলেন—সেন মশাই, খবর কি?

মালাধর করজোড় করিয়া সবিনয়ে বলিল—রাজ্যের মালিক আপনি—আপনার অজানা কি আছে, হুজুর।

বাঁধ ভাঙার ঘটনা সে বলিতে লাগিল। বলিল—আপনার কুটুম্বের বিষয়, আপনি একটা বিহিত করে দিন, চৌধুরী মশায়।

নরহরি হাসিয়া বলিলেন—গাঙ ত আমার হুকুমের গোলাম নয়, আরও চওড়া করে নতুন বাঁধ দিয়ে দেখ দিকি—

মালাধর বিনয়ে আরও কাঁচু মাচু হইয়া কহিল—আজ্ঞে গাঙ নয়, মানুষ—

—কারা মানুষ? নরহরির দৃষ্টি একমুহূর্ত্তে প্রখর হইয়া উঠিল।

মালাধর বলিতে লাগিল—চিনব কি করে, হুজুর? যে অন্ধকার! আর কাছে এগুতেও সাহস হয় না। হাতে সব ঝকমকে সড়কী, শেষকালে এফোঁড়-ওফোঁড় গেঁথে ফেলে যদি—

হঠাৎ নরহরি সপ্তমে চড়িয়া উঠিলেন।

—ও ঠিক বরণডাঙার কাজ। চিরশত্রু আমাদের; জানে আমার কুটুম্বের বিষয়, তাই ওখানেও শত্রুতা সাধতে লেগেচে। বিহিত আমি এর করবই। লাভ হোক, লোকসান হোক—এ চক আমি নেবো। তুমি মধ্যবর্ত্তী হয়ে করে দাও ওটা। তারপর লাঠি-বৃষ্টি করব ঐখানে।

কিন্তু লাঠি-বৃষ্টি হোক আর যা-ই হোক, কাজ ভুলিবার পাত্র মালাধর নয়। বলিল—আজ্ঞে, তা ত ঠিক—কিন্তু দরদামের কথাটা—

হরিচরণের আমলে যে তিনশো টাকার কথাকথি চলিতেছিল, রাগের বশে সেটা একেবারে ধরিয়া দিয়াই নরহরি দাম বলিয়া দিলেন।

মালাধর মাথা নাড়িয়া বলিল—আর কিছু নয়?

ইঙ্গিতটা নরহরি কিন্তু এড়াইয়া গেলেন। বলিলেন—আর বেশী দিয়ে কে নিচ্ছে এই গোলমেলে মহাল? আমি রাজী হয়ে যাচ্ছি কুটুম্বিতের খাতিরে।

মালাধর বলিল—কে নেয় না নেয়, জানিনে। খবর দেব দিন পাঁচ-সাতের ভিতরে। আজ্ঞে, আসি তবে—

কিন্তু মালাধরের খবরের আগে খবর আনিল রঘুনাথ। ঢালিপাড়ার নীচে দিয়া সৌদামিনী ঠাকরুণকে নৌকাযোগে যাইতে দেখা গিয়াছে, সঙ্গে মালাধর। বিদ্যুৎ ঝলকের মতো একটা আশঙ্কা নরহরির মনে খেলিয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলেন—নৌকা সা'পাড়ার খাল দিয়ে উঠল?

হুঁ—

—সদরে গেল নাকি?

—তা জানিনে।

ক্রুদ্ধ বাঘের মতো গর্জ্জন করিয়া নরহরি বলিলেন—সবাই হাত-পা কোলে করে বসে রইলে? গলুইটা টেনে ধরে জিজ্ঞাসা করে নিতে পারলে না?

রঘুনাথ কৈফিয়ৎ দিয়া বলিল—করব কি চৌধুরী মশাই? বড্ড সকালবেলা; ছোঁড়াগুলো তখনো সবাই ঘুম থেকে ওঠেনি। নৌকোয় ছিল চিন্তামণি সর্দ্দার—ভাল তোড়জোড় না করে ত আর এগুনো যায় না।

ইহা যে কত বড় সত্য নিজে লাঠিয়াল হইয়া নরহরির চেয়ে বেশী জানে আর কে? তিনি আর তর্ক করিলেন না। রঘুনাথকেই সদরে উকীলের কাছে পাঠানো হইল। সন্ধ্যার সময় জবাব আসিল, উকীল জানাইয়াছেন, প্রায় পাঁচগুণ দামে সেইদিনই সৌদামিনী ঠাকরুণের সঙ্গে সখীসোনার চক বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে।

নরহরি রক্তচক্ষে ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তারপর সহসা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—ঠিক হয়েছে। পাটোয়ারী চাল চালতে গেছি আমি। ও কি আমার পোষায়? আচ্ছা ঠকিয়ে দিয়েছে মালাধর—

রঘুনাথ লাঠি ঠুকিয়া বলিল—তলে তলে ঐ বেটাই বরণডাঙার সঙ্গে যোগাড়যন্ত্র করেছে। ওকে একটু শিখিয়ে দিতে হবে।

নরহরি হাসিয়া বলিলেন—ছি-ছি। ছুঁচো মারতে যাবে কেন সর্দ্দার? আমার ঘোড়া সাজাতে বল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমনোজ বসু

আলোচনা

করচার আদর

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন

অজস্র প্রমাণ দ্বারা গোবিন্দদাসের করচার প্রামাণিকতা এখন দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। এখন এসম্বন্ধে আর দ্বিধার কোন কারণ নাই। নিম্নে করচার অনুরাগী কয়েকজন লেখকের নাম দিতেছি। (১) স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় তাঁহার অমিয় নিমাই চরিতের গোটা ষষ্ঠ খণ্ডটা গোবিন্দদাসকে আশ্রয় করিয়া লিখিয়াছেন। (২) শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণবচূড়ামণি শ্রীযুক্ত গৌরগুণানন্দ ঠাকুর তাঁহার লিখিত "শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে এই পুস্তক হইতে বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। (৩) স্বর্গীয় মতিলাল ঘোষ মহাশয় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় এই পুস্তকের যে উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা স্তবের মত শুনায়। (৪) স্বর্গীয় জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় তাঁহার "গৌরপদ-তরঙ্গিণী"র ভূমিকায় করচার প্রামাণিকত্ব বিশেষভাবে সমর্থন করিয়াছেন। (৫) প্রভুপাদ মুরারিলাল গোস্বামী তাঁহার "বৈষ্ণবদিক্‌দর্শনী" গ্রন্থে করচা-লেখক গোবিন্দদাসকে বিশিষ্ট স্থান দিয়াছেন। (৬) শ্রীহট্টের বর্ত্তমানকালের শ্রেষ্ঠ লেখক বৈষ্ণব-চূড়ামণি অচ্যুতচরণ তত্ত্ব-নিধি তদ্‌রচিত বিবিধ প্রবন্ধে করচার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন। (৭) "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ" পত্রিকা-সম্পাদক নবদ্বীপ বুড় শিবতলাবাসী শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী অধুনা বহু গ্রন্থ লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহার বিরাট পুস্তক "নীলাচল লীলার" তৃতীয় খণ্ডে তিনি গোবিন্দদাসকে অবলম্বন করিয়া মহাপ্রভুর লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। যাঁহারা এই করচার বিরোধী, তাঁহাদের তালিকায় ইঁহার নামও দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু অচ্যুতবাবু আমাকে জানাইয়াছেন "শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহাশয় আমাকে লিখিয়াছেন তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া তাঁহার নাম দেওয়া হয় নাই। (৮) শ্রীপাট পানিহাটী নিবাসী পণ্ডিত অমূল্যধন রায় ভট্ট তাঁহার সুবৃহৎ "শ্রীগৌরাঙ্গের ভারত ভ্রমণ" পুস্তক করচাকেই মূলতঃ অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন; ইহা এখন প্রকাশিত হইয়াছে কি না জানি না। (৯) বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় করচা অবলম্বনে চৈতন্যের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের একখানি মানচিত্র প্রকাশিত করিয়াছেন। ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি উড্‌রফ সাহেব প্রমুখ বহু পণ্ডিত এই মানচিত্রের প্রশংসা করিয়াছেন। (১০) স্বর্গীয় হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি তাঁহার বহু প্রবন্ধে করচার সশ্রদ্ধ উল্লেখ করিয়াছেন। (১১) যে যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ এখন করচার বিরোধী, তিনিই তাঁহার "শ্রীগৌরাঙ্গ" ও তাঁহার "ধর্ম্মগৌরব" পুস্তকে করচার হইতে অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। অচ্যুতবাবু "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ" পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন, "কৈ সে গ্রন্থ ত তিনি এ যাবৎ বাতিল করেন নাই।" (১২) বাঙ্গলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বঙ্গদেশের ইতিহাসের একটা সম্পূর্ণ অধ্যায় করচাকে অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন। (১৩) হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয় তৎকৃত "উৎকলে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য" পুস্তকে করচাকে বিশেষভাবে আশ্রয় করিয়াছেন। (১৪) শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ দাস মহাশয় তাঁহার ইংরাজীতে লিখিত বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে করচাকে বিশিষ্ট স্থান দিয়াছেন। (১৫) বিশ্বকোষ-অভিধানে করচার মৌলিকত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। (১৬) রাণাঘাট নিবাসী কুমুদ মল্লিক বিরচিত "নদীয়া কাহিনীতে" করচার প্রমাণ গৃহীত হইয়াছে। (১৭) নদীয়া জেলার রিফাইৎপুর গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত সুশীল

কুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার প্রায় চারিশত পৃষ্ঠা ব্যাপক "বৈষ্ণব সাহিত্য" নামক পুস্তকে করচাকে অবলম্বন করিয়াছেন; তিনি উপসংহারে লিখিয়াছেন 'গোঁড়া বৈষ্ণব-দিগের নিকট করচার বিশেষ আদর নাই। তাঁহাদের গোঁড়ামীর অনুকূল ও সমর্থক নহে বলিয়া করচার প্রতি তাঁহারা তাদৃশ শ্রদ্ধাবান নহেন। সাহিত্যসেবীর পক্ষে করচা অতি মূল্যবান সামগ্রী।' (১৮) ১৩৩৩ বাং জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা "শ্রীশ্রীসোনার গৌরাঙ্গ" পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ করচা হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া "গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য" নামক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

ইহা ছাড়া ছোট বড় আরও অনেক পুস্তকে করচার প্রামাণিকতা স্বীকৃত হইয়াছে। যাঁহারা করচার অতি প্রাচীন জরাজীর্ণ পুঁথিখানি দেখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এখনও জীবিত আছেন। ভূতপূর্ব্ব হাই কমিসনার, সিভিলিয়ান সার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহোদর রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি, এল, মহাশয় এই করচার সেই প্রাচীন পাণ্ডুলিপি নিজ চক্ষে দেখিয়াছিলেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি অশীতিপর বৃদ্ধ পণ্ডিতপ্রবর লক্ষ্মীনারায়ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও বইখানি দেখিয়াছিলেন। তাঁহাদের উভয়ের পত্রই মৎকৃত-সংস্করণের ভূমিকায় উদ্ধৃত হইয়াছে (১৯ পৃঃ)। ইহা ছাড়া অশীতিপর বৃদ্ধ কাব্যজগতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ শ্রীযুক্ত বনোয়ারীলাল গোস্বামী ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতারাও সেই জীর্ণ পুঁথিখানি দেখিয়াছিলেন। ভূতপূর্ব্ব স্কুল ইনেস্পেক্টর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল এম, এ মহাশয়ও আমাকে করচার প্রশংসা করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন।

আমাদের সংস্করণ প্রকাশের পর ইতিপূর্ব্বে কতকটা দ্বিধাযুক্ত কয়েকজন বৈষ্ণব আমাকে চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছেন, যে তাঁহাদের এ সম্বন্ধে আর কোন দ্বিধাই নাই। ইঁহাদের মধ্যে কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত মহাশয় এবং বৈষ্ণবজগতে সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রায় এম, এ মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাক্ত মহাশয় লিখিয়াছেন, ভূমিকা পড়িয়া তাঁহার সমস্ত দ্বিধা কাটিয়া গিয়াছে।

পদকল্পতরুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংস্করণের সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায়ের চিঠিখানির জন্য তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র একবৎসর পূর্ব্বে আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়া চিঠি লিখিয়াছিলেন। তখন সতীশবাবুর জন্য সাহিত্য পরিষৎ শোক সভা আহ্বান করিয়াছিলেন, চিঠিখানির এই জন্য প্রয়োজন হইয়াছিল। আমি তখন বহু সন্ধান করিয়াও চিঠিখানি পাই নাই। সম্প্রতি চিঠিখানি পাওয়া গিয়াছে,—তাহার কপি এতৎ সঙ্গে দেওয়া হইল।* মৎকৃত রয়েল আটপেজী ফর্ম্মার

---

* স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের পত্র

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্

ধামগড়
ঢাকেশ্বরী মিল, পোঃ
ঢাকা
২৪-৪-২৭

সবিনয় নিবেদন,

আপনার গোবিন্দ কর্ম্মকারের করচার সুদীর্ঘ ভূমিকা বিশেষ মনোযোগের সহিত পড়িলাম। করচায় গোবিন্দের প্রাচীন ভাষায় অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকিলেও বর্ণনীয় বিষয়ের বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, সুতরাং উহার লিখিত বিবরণ অপ্রামাণিক বা অবিশ্বাস্য মনে করার কোনও কারণ নাই,—আমার এই মত আপনার ভূমিকা পাঠে আরও বদ্ধমূল হইয়াছে। আপনি আপনার স্বভাবসিদ্ধ অসাধারণ সহৃদয়তার গুণে সম্পূর্ণ বিষয়টাকে এরূপ সুন্দর ও স্বাভাবিকরূপে প্রদর্শিত করিয়াছেন যে নিতান্ত গোঁড়া বিরুদ্ধবাদী ব্যক্তি ব্যতীত অতঃপর আর কেহই গোবিন্দ কর্ম্মকারের করচা গ্রন্থখানি অপ্রামাণিক বলিতে সাহসী হইবেন না। দুঃখের বিষয় যে এই গ্রন্থখানার দুইখানি প্রাচীন আদর্শ পুঁথির মধ্যে কোনখানাই খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। উহা পাওয়া গেলে এ সম্বন্ধে আর কাহারও কোন আপত্তি করার পথ থাকিত না। সে যাহা হউক স্বর্গীয় জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় এই অমূল্য গ্রন্থখানার আবিষ্কার ও প্রকাশদ্বারা বঙ্গসাহিত্যের যেরূপ মহোপকার করিয়া গিয়াছেন—এই গ্রন্থখানা সম্বন্ধে আধুনিক গোঁড়া বৈষ্ণব সমাজের ভ্রান্ত মত খণ্ডন করিয়া এবং উহার প্রকৃত মহত্ত্ব অপূর্ব্বভাবে প্রদর্শিত করিয়া আপনিও সেইরূপ আর একটা অক্ষয় কীর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। গোবিন্দের করচায় শ্রীমহাপ্রভুর চরিত্রে যে অপূর্ব্ব স্বাভাবিকতা পরিস্ফুট হইয়াছে, উহা একদিন অবশ্যই উহার অনিবার্য্য প্রভাব সঙ্কীর্ণ মতাবলম্বী বৈষ্ণবসমাজের উপরও বিস্তার করিবে। যখন সেই শুভদিন উপস্থিত হইবে, তখনই স্বর্গীয় জয়গোপাল গোস্বামী ও আপনার এই কার্য্যের প্রকৃত মহত্ত্ব সাধারণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। বিরুদ্ধবাদীদিগের অন্যায় আক্রমণ ও অযথা আলোচনার দ্বারা পরিণামে আপনাদের যশোবৃদ্ধি ব্যতীত ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, সুতরাং এক্ষেত্রে শ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় আপনারা যে সর্ব্বতোভাবেই জয়ী হইবেন এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। আমরা ভাল আছি আপনার কুশল প্রার্থনীয়। ইতি

ভবদীয়
শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

৮৩ পৃষ্ঠা ব্যাপক ভূমিকা পাঠের পর বিরোধীদলের গত দুই বৎসর যাবৎ কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় নাই, সম্প্রতি দুই একজন পুনরায় ক্ষীণস্বরে প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তন্মধ্যে একজন অমৃতবাজার পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন, প্রকাশ্য সভায় রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় নাকি বলিয়াছেন যে তিনি করচার প্রামাণিকতার বিরোধী। রায় বাহাদুরকে আমি শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন ঘোষের মোকাবেলা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, যে তিনি সেরূপ কিছু কখনই বলেন নাই।

বস্তুতঃ এখন এই অতি মূল্যবান পুস্তকের সত্যতা সম্বন্ধে গণ্যমান্য বৈষ্ণব সমাজের আর কোন সন্দেহের কারণ নাই। কাশীদাসের কথায় বলা যাইতে পারে—

"কতক্ষণ জলের তিলক রহে ভালে।
কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে॥"

এখন নানাবিধ প্রমাণের বলে এই সিদ্ধান্তই দাঁড়াইতেছে যে করচালেখক "গোবিন্দ দাস" ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতোক্ত "শ্রীগোবিন্দ" একই ব্যক্তি।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

বিহার

শ্রীকুড়নচন্দ্র সাহা

তাকিয়া হেলান দিয়া রায় বাহাদুর অম্বরি টানিতেছিলেন বনোয়ারি সসম্ভ্রমে একটি নমস্কার দিয়া দরজার দিকে পিছাইয়া আসিল। রায়বাহাদুর হাসিয়া বলিলেন,—কি রে তৈরি?

—হ্যাঁ, হুজুর!

সটকায় আরামের একটি টান দিয়া রায়বাহাদুর চোখ মুখ দিয়া খানিকটা ধোঁয়া ছাড়িলেন, দেয়ালের ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন,—বেলা যে খুব বেশি রে; রোদ্দুর হবেনা যেতে?

বনোয়ারি উত্তর দিল, হবে না হুজুর, পশ্চিম দিকে বড় বড় গাছ আর ঝোপ, রোদ্দুর আসতে পারবে না। তা ছাড়া আপনি ত থাকবেন ভেতরে।

—না বাপু ভেতরে আমি পারবনা, বেলা পড়ুক না হয়,—বলিয়া ফরাশ হইতে রায়বাহাদুর রোয়াকে নামিয়া দাঁড়াইলেন। বার কয়েক আকাশের পানে তাকাইয়া মনে মনে রৌদ্রের তেজ অনুমান করিলেন। তারপর প্রসন্ন দৃষ্টিতে বলিলেন, আচ্ছা চল্ আর দেরি করে লাভ কি?

—পান্সি দরবেশ ঘাটে ভিড়াব' হুজুর?

—হ্যাঁ দরবেশ ঘাটেই। রায়বাহাদুর অন্দরে ঢুকিতেছিলেন, বনোয়ারি তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া বলিল, খবর এসেচে কুসুমপুরের খালে দুটো কুমীর ঢুকেচে, বন্দুকটা সঙ্গে নেবেন হুজুর?

—কতদূর হ'বে কুসুমপুর?

—ক্রোশদুয়েকের বেশি নয়।

অন্দরে আসিয়া রায়বাহাদুর প্রসাধন করিলেন। পরণে কাঁচিপাড় ধুতি ও ফুরফুরে পাঞ্জাবি। কাঁধের উপর দিয়া কুঞ্চিত উড়ানি বক্ষলগ্ন হইয়া দুলিতেছে। মাথার চুলগুলি শাদা, যৌবনশেষেই তারা একে একে পাকিয়া গিয়াছে। আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া রায়বাহাদুর চুলগুলি একবার আঁচড়াইয়া লইলেন, তারপর দো-নলা বন্দুকটা হাতে লইয়া অন্যমনস্কভাবে ঘরের ভিতর পায়চারি করিতে আরম্ভ করিলেন। শিকারে বাহির হওয়ার পূর্ব্বে এমনিভাবে পায়চারি করা রায়বাহাদুরের অনেক দিনের অভ্যাস। শুনা যায়, এই সময়টা তিনি মনে মনে কি স্মরণ করেন।

জুতার মশ মশ শব্দ করিয়া রায়বাহাদুর ঘর হইতে বাইরে আসিতেই স্তম্ভিত হইলেন।

—লুকিয়ে লুকিয়ে যাচ্ছ যে,—জরদার কৌটোটা আজ আর দিচ্ছিনে তাই বলে'।

পকেটে হাত দিয়া রায়বাহাদুর একটু হাসিলেন, বাঁহাত খানা বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, দে মা নিতে ভুল হ'য়েচে।

—দিই আর কি, দেখচ ত তৈরি হ'য়ে এসেচি। ওটা কেন সঙ্গে নিলে, দাও রেখে আসি।

থাক্ মা, এনেচি যখন সঙ্গে করে;—বলিতে বলিতে মেয়ের আপাদমস্তক রায়বাহাদুর একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া লইলেন।

করবী হাসিয়া উঠিয়া বলিল, পোষাকটা আমার ঠিক্ হয়নি, কেমন? বল না হয় নতুন একটা পরে আসি।

—থাক্, ফিরতে রাত হবে করবী।

নিঃশব্দে করবী আগে চলিতে লাগিল।

পান্‌সি ভিড়ানো ছিল। বনোয়ারি মাঝি রায়বাহাদুরের হাত হইতে বন্দুকটি নিজের হাতে লইল। একজন শিকারী বন্দুক হাতে রায়বাহাদুরের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি দেখিয়া শুনিয়া নিরাশ হইলেন। বনোয়ারি পড়িল মুশকিলে। ভদ্রলোককে ডাকিয়া আনিয়াছিল সে নিজে। রায়বাহাদুরের মেয়ে আসিবে কে জানিত!

বনোয়ারি বলিল, দুষমন দুটোকে একা পেরে উঠবেন হুজুর?

—তোরা আছিস কেন তবে?

বনোয়ারি একটু হাসিয়া বলিল,—আমরা ত হুজুর শিকারী নই; বলিয়া সন্তর্পণে সে একবার ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকাইল। রায়বাহাদুরও একবার চাহিলেন মেয়ের দিকে। উদ্দেশ্য, শিকারী ভদ্রলোক সঙ্গে গেলে তার কোন অসুবিধা হয় কিনা।

করবী মৃদু হাসিয়া বলিল,—আপনারা যান বাবা, আজ আমি নাই গেলাম।

কথাটা রায়বাহাদুর বুঝিলেন। তিনি করবীর হাত ধরিয়া নীরবে নৌকায় আসিয়া উঠিলেন।

পাড়ের লোকগুলি রায়বাহাদুরকে বিদায় দিয়া চলিয়া গেল।

রায়বাহাদুর স্থিরদৃষ্টিতে এইবার নদীর দিকে চাহিলেন। বর্ষার নদী আবর্ত্ত রচিয়া তীরবেগে নামিয়া আসিতেছে। তীরের গাছগুলি জলের কোলে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া আছে, দরবেশ ঘাটের ঝোপগুলির তলে আসিয়া জল ঠেকিয়াছে, একটি নালার ভিতর দিয়া জল ঢুকিয়াছে গ্রামের পথে।

রায়বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন—জল এ দিকে কতদূর গিয়েচে রে?

—মন্‌সাকুরির শিমুলতলায়।

রায় বাহাদুর বিস্মিত হইলেন। এদিকে তিনি অনেক দিন আসেন নাই। ছেলেবেলায় তিনি নিত্য আসিতেন এই পথে। বর্ষায় একটু একটু করিয়া নদীতে জল বাড়িত। তীরে কাঠি পুঁতিয়া রাখিয়া পরদিন আসিয়া দেখিতেন কাঠির মাথা জলে ডুবিয়া গিয়েছে। শীর্ণ নদী দুইমাসে কুলে কুলে ভরিয়া উঠিত।

একদিনের কথা মনে হইতেই রায়বাহাদুর হাসিলেন। শীতের প্রথম। এইপথে সকালবেলায় একদিন ঢোল-শানাই বাজিয়া উঠিল। রায়বাবাহাদুর ছুটিয়া আসিলেন দেখিতে। ছোট একখানা পাল্কীর পাশে পাড়ার ছেলে মেয়ে জড় হইয়াছে। রায়বাহাদুর পাল্কীর দিকে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইলেন; দেখিলেন—পাল্কীর এককোণে টুকটুকে একটি মেয়ে,—মেয়েটি লজ্জায় জড় সড় হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

রায়বাহাদুর শুধাইলেন, কে গো—কেও মেয়েটি।

একজন বুড়া পাশে দাঁড়াইয়াছিল, উত্তর দিল—দেখ্‌চনা খোকা, কনে বউ; বড় হলে তোমারও অমনি টুকটুকে মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হবে।

রায়বাহাদুর আর তিলার্দ্ধ দাঁড়ান নাই। বুড়াকে একটি ঘুঁসি দেখাইয়া উর্দ্ধশ্বাসে ঘরে ফেরেন।

আর একদিনের কথা; তখন এই অশথ গাছটায় ছিল পাখীর আড্ডা। তীর ধনুক হাতে সেদিন আসিয়াছিলেন পাখী শিকারে। একটি নীল পাখীকে নিশানা করতেই পাখী সিঁড়ির কোলে উড়িয়া বসিল। রায়বাহাদুর তীর ছুঁড়িলেন—সঙ্গে সঙ্গে ঠং করিয়া এক বিচিত্র আওয়াজ। কোথায় পাখী, সিঁড়ির উপর কার শূন্য কলস চূর্ণ হইয়া ছিটকাইয়া পড়িয়াছে। যাহাহউক ব্যাপারটা বেশিদূর গড়ায় নাই—যে নারীমূর্ত্তি সেদিন তাঁর দিকে রুখিয়া আসিয়াছিল,—হাতের সোনার অঙ্গুরিটা খুলিয়া দিয়াই তাহার কবল হইতে রক্ষা পান।

অকস্মাৎ দাঁড়ের শব্দে রায়বাহাদুর চকিত হইলেন। দেখিলেন, দরবেশের ঘাট পিছনে পড়িয়াছে। করবী জলে হাত দিয়া কি তুলিতেছিল,—রায়বাহাদুর ব্যস্তকণ্ঠে শুধাইলেন,—ও কি রে?

—পাঁইফল, ও মাঝি ঐ গাছটা দাও দেখি ধ'রে, ওগো লগীটা এইদিকে ফেলনা গো!

—আপনি অমন ঝুঁকে বস্‌বেন না মা, আমরা দিচ্ছি তুলে।—মাঝি ডিঙির উপর একটি স্তূপ তুলিয়া দিল।

রায়বাহাদুর মেয়ের কাণ্ড দেখিয়া হাসিলেন। বলিলেন, —আর জলে হাত দিস্‌না মা, বলা যায় কি!

—তুমি খাবে বাবা, না ওনা দু'টি?

—পাগ্‌লি মেয়ে,—রায়বাহাদুর মাঝিদের সাম্‌নে একটু অপ্রতিভ হইলেন! লোকালয়ে তিনি হাকিম, মানুষের বিচারক। পথের মানুষ তাঁ'র স্নিগ্ধ একটু হাসির জন্য ভিড় করিয়া দাঁড়ায়, করবী কি তাহা ভুলিয়া গেল!

মেয়ের কথায় রায়বাহাদুর বিজ্ঞের হাসি হাসিলেন বাহিরে, অন্তরে কিন্তু কোমল হইয়া উঠিলেন!

বাঁকের কাছে আসিয়া নৌকা থামিল। দাঁড়ের আঘাতে ক্ষিপ্ত জল পাক খাইয়া নাচিতে লাগিল—স্রোত এখানে প্রবল। পাড়ের খানিকটা জায়গায় ভাঙন ধরিয়াছে। রায়বাহাদুর দেখিতে দেখিতে বলিলেন,—এখনও দ' ছাড়াতে পার্‌লিনি, পৌছুবি কখন বনোয়ারি?

—কি করি হুজুর, দেখ্‌চেন ত টান।

—থাক্ কাজ নেই, ঘুরিয়ে দে আজকের মত।

বনোয়ারী একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল,—এখনও ত সন্ধ্যা হয়নি হুজুর।

—নাই বা হ'ল, কুসুমপুর অনেক পথ; মরাগাঙে নামিয়ে দে তা'র চেয়ে, খানিকটা ঘুরা যাক্।

করবী বলিয়া উঠিল—এই বুঝি তোমার কুমীর শিকার!

রায়-বাহাদুর হো হো করিয়া হাসিলেন।

নদীর বক্ষ হইতে নৌকা নামিল মরাগাঙে। গাঙের জল তীব্র নয়, শান্ত। নদীর ইহাই পুরাতন পথ। গ্রীষ্মে জলহীন-গর্ভ শূন্য দৃষ্টিতে পড়িয়া থাকে,—পাশ দিয়া নূতন স্রোত রেখা বহিয়া যায়। ভাঙাচোরা দুইতীরে অনেককালের ধ্বংসস্মৃতি, বনজঙ্গলের ভিতর দিয়া চখে পড়িতেছিল।

—পাখির ঝাঁক দেখেচ বাবা।

—কই রে?

ঊর্দ্ধপথে এক ঝাঁক পাখি উড়িয়া আসিতেছিল। পালকের সাঁ সাঁ শব্দ রায় বাহাদুরের কাণে গেল, তিনি না দেখিয়াই উঠিয়া পড়িলেন।

করবী হাসিয়া বলিল,—সন্ধ্যা বেলাকার পাখি বুঝি মারতে আছে, দাও রেখে দিই,—বন্দুকটা করবী নিজের কোলের উপর টানিয়া লইল।

রায় বাহাদুর বসিলেন।

করবীর বিবাহের বয়স আজও পার হয় নাই;—কিন্তু ইহারই মধ্যে সে বিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে। মুখের প্রতিটি কথায় তা'র শাসনের ভঙ্গী ফুটিয়া উঠে,—কতদিন তিনি করবীর মুখে ছোটখাটো অনুযোগ শুনিয়াছেন,—প্রত্যুত্তরে শুধু হাসিয়াছেন।

কিন্তু আজিকার আকাশতলে একটি স্বাধীনচারী পাখির মৃত্যুলীলা শোভন হইত না ভাবিয়াই মনে মনে তিনি করবীর প্রশংসা করিলেন।

পাখিগুলি দূরে একটি কালো রেখার মত মনে হইতেছে। দুই তীরের ঝোপে ঝাড়ে ঝিল্লী ডাকিতে সুরু হইল করবীর কথা ভাবিতে ভাবিতে রায় বাহাদুর কখন শিকারের কথা ভুলিয়া গেলেন,—তাঁ'র যৌবনের ইতিহাস মনে পড়িল:—

দেউড়িতে ন'বত বসিয়াছে। দেবদারু পাতার সজ্জিত তোরণে বিচিত্র রঙের মালা হাওয়ায় উড়িয়া উড়িয়া দুলিতেছে। গৃহে শাঁখ বাজিয়া উঠিল। ঝালর-খচিত সুদৃশ্য সিংহাসনে রায় বাহাদুর নগর প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিয়াছেন,—পাল্কীতে বধূ।

যুবরাজের বেশে রায়বাহাদুর সিংহাসন হইতে নামিলেন। কপালে চন্দনের টিপ, মুখে সস্মিত কৌতুক, গুম্ফের পাশে বিন্দু বিন্দু স্বেদ রেখা; যেন দীর্ঘ পর্য্যটনে তিনি ক্লান্ত হইয়া উঠিয়াছেন, বিশ্রাম চান।

বধূ সুন্দরী—সবাই প্রশংসা করিয়া ঘরে ফিরিল।

ফুলশয্যার রাত্রে যুবরাজ চুপি চুপি কক্ষে ঢুকিলেন। বধূর কাছে সরিয়া আসিয়া ডাকিলেন,—রাণি!

নববধূ আনতনেত্রে উত্তর দিল,—যুবরাজ!

সঙ্গে সঙ্গে চারি চ'খের মিলন হইতেই দুজনে দুইদিকে ছিটকাইয়া পড়িলেন। যুবরাজ দিলেন প্রীতিউপহার,—রাণীর ওষ্ঠে ও চিবুকে। রাণীর কিশোর অন্তরের কূলে কূলে দোল লাগিল। রাণী কুলুঙ্গী হইতে শিশি আনিয়া যুবরাজের পা দুইখানি অলক্তরাগে ছোপাইয়া দিল।

—একি ছেলেমানুষি অলোকা?

—কিছু অন্যায় হয়নি যুবরাজ, এ আমার প্রথম প্রণয়-রাগ; বুকের রক্তে লেখা রইল।

যুবরাজের চ'খে জল,—অলোকার হাসিতে কক্ষ কাঁপিতেছে। দুজনে হাত ধরাধরি করিয়া পালঙ্কে উঠিলেন।

রায়বাহাদুর একটি নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

পূর্ব্বরাগের একটু ইতিহাস ছিল।

অল্পদিনের কথা,—যুবরাজ বাহির হন শিকারে। স্থানটা পদ্মার কাছাকাছি,—নৌকায় দিন কয়েকের বেশি নয়। নিরুদ্বেগ যাত্রায় আনন্দ ছিল ঢের, তা'র উপর ব্যাঘ্র শিকার! তৃতীয় দিনের দিন বাঘের স্থানে একটি বন্য বিড়াল শিকার করিয়া যুবরাজ পান্‌সিতে উঠিয়াছেন, এমন সময় এক কাণ্ড ঘটিল। গ্রামের বাঁধা ঘাটের উপর দাঁড়াইয়া একটি কিশোরী মেয়ে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। যুবরাজের নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগিল;—নিভৃতে দুজনের কি গুঞ্জন হইল কে জানে। পরদিন যুবরাজ কিশোরীর পিতৃসকাশে আসিয়া দেখা দিলেন। ব্যাপারটা তা'রপর এতদূর আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

যুবরাজ শুধাইলেন,—আগে আমাকে চিন্‌তে অলোকা?

অলোকা উত্তর দিল, না।

—অপরাধটা তোমারই বেশি দেখ্‌চি।

—কেন বল ত!

—না জেনেশুনে অমন ক'রে ধরা দেওয়া,—ঘাটে কেউ ছিল না বুঝি?

—থাক্‌লেই বা কি ক্ষতি ছিল।

—ওঃ, ওঁরা তোমায় পাঠিয়েছিলেন তা হ'লে?

অলোকা হাসিয়া বলিল, পাঠিয়েছিলেন তোমায় দেখ্‌তে, তুমি একেবারে শিকার না ক'রে ত ছাড়লে না।

যুবরাজ মনে মনে খুসি হইলেন। অলোকাকে বক্ষে ধরিয়া বলিলেন,—এড়াতে চেয়েছিলে, কেমন?

অলোকার মুখখানি নত হইয়া আসিল।

রায়বাহাদুরের চ'খ দুটি উৎফুল্ল হইল। বীরগতিতে পান্‌সি চলিতেছে। করবীর দৃষ্টি আকাশের দিকে। তিনি নিঃশব্দে করবীর কোলে মাথা রাখিলেন।

অলোকা চলিল পিতৃগৃহে। যুবরাজ বিরহে আকুল। সপ্তম দিনের দিন যুবরাজ অলোকার কক্ষে আসিয়া দেখা দিলেন। সবাই আশ্চর্য্য হইল। কারণ, কথা ছিল, মাস কয়েকের ভিতর যুবরাজের দর্শন মেলা সম্ভব নয়।

একটি মুখরা মেয়ে আসিয়া শুধাইল,—যুবরাজের কুশল ত?

—হ্যাঁ, আপাততঃ কুশলই।

সঙ্গে সঙ্গে হাসির ধাড়া,—মেয়েরা আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে।

যুবরাজ হটিবেন কেন? বলিলেন,—এখন আসা তাঁ'র ইচ্ছা নয়,—কেবল একটি দিনের জন্য আসিতে হইল। পার্শ্ববর্তী কয়েকটা গ্রামে প্রজারা বিদ্রোহী হইয়াছে। তিনি আসিয়াছেন, একটা বিহিত করিতে। গোলমাল চুকিলে কাল ভালোয় ভালোয় গৃহে ফিরিবেন।

মেয়েটি বলিল,—এবারও কি পান্‌সি ক'রে এসেচেন?

যুবরাজ উত্তর দিলেন,—পান্‌সিতে নয়, ঘোড়ায় এসেচি এবার।

মেয়েটি কৌতুকের ভঙ্গীতে অলোকার দিকে চাহিল,—অলোকার মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল।

কোথায় রহিল প্রজা বিদ্রোহ! পরদিন যুবরাজের মাথা ধরিল; পরের দিন শ্বশ্রূঠাকুরাণীর অনুরোধ, যাওয়া হইতে পারে না। তা'রপর অলোকার সখীরা আসিয়া ঘিরিল; পরের দিন প্রকাশ,—প্রজারা আপনা আপনিই বিদ্রোহ থামাইয়াছে।

অলোকা বলিল,—সংবাদ পেলে তা'রে বুঝি?

যুবরাজ হাসিয়া বলিলেন,—তা'রে নয়, সকালে আমার লোক এসেছিল।

—তা' হ'লে আরও দিন কয়েক থেকে যাও, যদি জরুরি কিছু না থাকে।

—জরুরি আর কি এমন, সঙ্গে ত তুমি যাবে।

অলোকা কথা কহিল না;—নীরবে একটু মুখ টিপিয়া হাসিল।

মাঝি বনোয়ারী হাল ধরিয়া ছিল,—বলিল, এবার ঘুরিয়ে দিই হুজুর, রাত হ'য়েচে।

—রাত কোথায়, চল্ আর একটু।

—নূতন জামাই, তা'র উপর বনেদি জমিদারের ছেলে! এ অঞ্চলে মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরির নাম কেই বা না জানে! ভুঁই-মালীর রাজার সহিত টেক্কা দিয়া একবার স্বগ্রামে তিনি মেলা বসাইয়াছেন,—তাঁহারই ত নাতি! লোকে সম্মান দেখাইবে বই কি! কুলবাড়ীর রামপ্রসাদ সারিঙ্গায় বোল্ ফুটাইয়া যুবরাজের হাতের অঙ্গুরি বক্‌শিস পাইল। পাঁচু সর্দ্দার সাহেব সাজিয়া আসিয়া যুবরাজের সহিত 'সেকহ্যাণ্ড' করিল,—যুবরাজ দিলেন দশটি টাকা।

পরদিন গ্রামবাসীদের কি আয়োজন ছিল কে জানে! সন্ধ্যা রাত্রে যুবরাজ অলোকার ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন,—ঘাটে পান্‌সি দাঁড়িয়ে আছে, যাবে ত উঠে এস এখনই।

অলোকা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রথমে স্বামীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল, তা'রপর বলিল,—কোথায় যাব, কি হ'য়েচে?

—হয়নি কিছুই, দেরি ক'রে লাভ নেই অলোকা, যাবে ত উঠে এস।

যুবরাজ পা বাড়াইলেন। অলোকা উঠিয়া আসিয়া তাঁহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। যুবরাজ স্পষ্ট করিয়া শুনাইলেন,—অলোকা না গেলে তাঁহার কোন ক্ষতি নাই, ভবিষ্যতে অলোকারই ক্ষতি,—সে গৃহে অলোকার দ্বার হয়ত চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইবে।

অলোকা কিছুই বুঝিতে পারিলনা,—শুধু বুঝিল, একটা কিছু ঘটিয়াছে, যে জন্য যুবরাজ এখনই চলিয়া যাইতে প্রস্তুত।

পাশের ঘরে অলোকা কিছুক্ষণের জন্য অন্তর্হিত হইল, তারপর ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—চল।

নদীর উপরে করবী এতক্ষণে ক্লান্তি অনুভব করিতেছিল। রায়বাহাদুরের মাথার চুলগুলিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল,—পানসি ঘুরিয়ে দিতে বলি বাবা, অনেক দূর এসেছি।

রায় বাহাদুর নিরুত্তর।

যুবরাজ ঘরে ফিরিলেন। ফেরার পথে অলোকার সঙ্গে দুই একটি কথা তিনি বলিয়াছেন,—বেশি নয়। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া অলোকাও কিছু শুধায় নাই। বুকের উপর একখানি ভারি পাথর তা'র নামিয়া আসিয়াছে।

দিন কয়েক পরে যুবরাজ একদিন কোন ভূমিকা না করিয়াই শুধাইলেন,—মণিবাবুর বিয়ের সম্বন্ধটা কে ভেঙ্গেছিল অলোকা?

অলোকা মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল,—দেওয়ানগঞ্জের মণিবাবু?

—হ্যাঁ, কেন তাঁর সঙ্গে তোমার বিয়ের সম্বন্ধ হয়নি?

—হ'য়েছিল, কিন্তু তা'তে আমি রাজি হইনি।

—তাই নাকি; যুবরাজের কথায় একটা বিদ্রূপের ভাব ফুটিয়া উঠিল। অলোকা তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিল।

যুবরাজ একটু হাসিয়া বলিলেন,—সব শুনেচি অলোকা, সে বিয়েয় ষোল আনা ইচ্ছে ছিল তোমার কিন্তু তোমার বাবার মত ছিলনা।

অলোকা বলিল,—তবে সম্বন্ধ করল কে? বাবা মণিবাবুকে খুব বেশি ভালবাসেন। এমন কি এখনও। এ বিয়ে না হওয়ায় তিনি বরং দুঃখিত।

—তুমি বুঝি সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান ক'রেছিলে?

—আমার হ'য়ে মা করেছিলেন, আমি করিনি।

যুবরাজ হাসিয়া বলিলেন,—তিনি করলেন বুঝি ভাল জামাই পাবেন বলে'?

—হ্যাঁ, মাতালের হাতে মেয়ে দেওয়া তাঁর ইচ্ছে নয়। তোমাকে এ সব বল্‌লে কে?

যুবরাজ কোন উত্তর দিলেন না, কিছু জিজ্ঞাসাও করিলেন না।

ভিতরে একটা বাষ্প জমিয়া রহিল। যুবরাজ আর তেমন করিয়া মেশেন না,—একটু একটু করিয়া ব্যবধান সৃষ্টি হয়।

একদিন অলোকা বলিল,—এ তোমার ভাল হ'চ্ছেনা জেনো।

—কি ভাল হচ্ছেনা অলোকা?

অলোকা দৃঢ়কণ্ঠে বলিল,—কিছুই আমি বুঝিনে? আমার চরিত্রের কথা ভেবে ভেবে দিন রাত তোমার ঘুম নেই। বুঝ্‌তে এখনও বাকী আছে?

যুবরাজের দৃষ্টিতে একটা বিদ্রূপের রেখা ফুটিল।

সে রাত্রির কথা। মেয়েকে পাশে শোয়াইয়া অলোকা বসিয়া আছে। দীপের ক্ষীণ আলোয় ঘরের ভিতর একটা আব্‌ছা অন্ধকার সৃষ্টি করিয়াছে। রাত ক'ত কে জানে? যুবরাজের চখে ঘুম নাই। একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া তিনি বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন। ঘরের ভিতর কিসের একটা শব্দ হইতেছে যেন। অলোকা দ্রুতপায়ে পায়চারি করিতেছিল, যুবরাজ চম্‌কিয়া উঠিলেন,—

—এখনও ঘুমোওনি অলোকা?

অলোকা মুখ ফিরিয়া উত্তর দিল,—ঘুম আছে নাকি যে ঘুমোব? আমার কথা ছেড়ে দাও। মেয়েটাকেও দেখ্‌লে তুমি সন্দেহের চোখে, কি ক'রে ঘুমুই বল ত!

ঘুমন্ত মেয়ের দিকে তাকাইয়া অলোকার বড় বড় দুটি চ'খ একবার স্নিগ্ধ হইয়া আসিল। ওষ্ঠ রেখায় করুণ একটি হাসি ফুটিল।

কিন্তু যুবরাজ দেখিলেন, অলোকা তাঁহারই দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া পৈশাচিক হাসি হাসিতেছে। নিঃশ্বাসে ঘরের হাওয়াটা বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে,—তাহার সান্নিধ্য অবধি যন্ত্রণাময়।

মুহূর্ত্তে যুবরাজ ক্ষিপ্রগতিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সে রাত্রে অলোকার হৃৎপিণ্ড দীর্ণ হইয়া মাটিতে লুটায়।

অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে। যে শিশু মেয়েটিকে সেদিন তিনি সন্দেহের চ'খে দেখিয়াছিলেন,—সে এই করবী। করবী যুবরাজের মুখের ছাঁচটি কাড়িয়া লইয়াছে; হাসিলে যুবরাজই হাসিতেছেন বলিয়া মনে হয়। নিমেষহীন দৃষ্টিতে যুবরাজ আজও করবীর দিকে তাকাইয়া থাকেন,—অলোকা সে মুখে কোন চিহ্নই রাখে নাই!

* * * *

সহসা রায় বাহাদুর আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিলেন,—অলোকা··তা'রপর চ'খ মেলিতেই করবীকে দেখিয়া লজ্জিত হইলেন। তীর হইতে তীক্ষ্ণ আলো আসিয়া পানসির উপর পড়িয়াছে, তাঁহারা দরবেশ ঘাটে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

করবী বলিল,—তুমি স্বপ্ন দেখছিলে বাবা?

—না মা, কই দেখিনি ত।

—দেখ্‌ছিলে বৈকি, স্বপ্নে তুমি কাঁদছিলে যে।

চ'খের প্রান্তদ্বয় মুছিতে মুছিতে রায়বাহাদুর নিঃশব্দে উঠিয়া দাড়াইলেন। একটি কথাও তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

কুমীর দেখার জন্য অনেকেই তখন দরবেশ ঘাটে জড় হইয়াছিল।

শ্রীকুড়নচন্দ্র সাহা
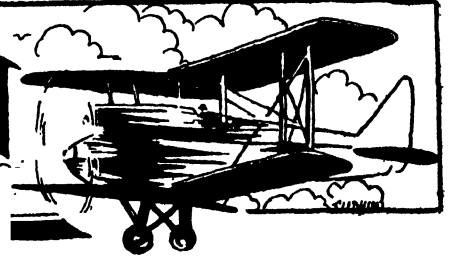
বাংলার অনুন্নত জাতির তালিকা

বঙ্গদেশের গভর্ণমেণ্টের নিয়োগ-বিভাগের শাসন-সংস্কার শাখার, এ-আর-৯১৫নং নির্দ্ধারণটি অনুরোধ ক্রমে সর্ব্ব-সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে মুদ্রিত হোলো—

কলিকাতা ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৩৪।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী তারিখের নং ১২২ এ, আর, নির্দ্ধারণ দ্বারা বঙ্গদেশের গভর্ণমেণ্ট তপশীলভুক্ত জাতিসমূহের একটি খসড়া তালিকা প্রকাশিত করিয়াছিলেন। অবনত শ্রেণীসমূহের ভোটাধিকার সম্বন্ধে সাম্প্রদায়িক মীমাংসায় প্রথমে যে সকল প্রস্তাব ছিল ও তৎপরে পুণাচুক্তি অনুযায়ী উহাদের যে পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যে প্রণালী অবলম্বন করা হইবে তাহার ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণার্থ ঐ তালিকা প্রস্তাবিত হইয়াছিল। ঐ সকল জাতির সামাজিক ও রাজনৈতিক অবনত অবস্থা ও উহাদের স্বার্থ রক্ষার্থ উহাদিগকে বিশেষ ভোটাধিকার দেওয়া আবশ্যক বোধে উক্ত তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছিল।

২। উক্ত তালিকায় কোন একটি বা একাধিক জাতিকে অন্তর্ভুক্ত করা বা না করা সম্বন্ধে মতামত জানাইবার জন্য গভর্ণমেণ্ট সাধারণ প্রতিষ্ঠান, জাতিবিশেষের সমিতি বা ব্যক্তিদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বিভাগীয় কমিশনার ও জেলার কর্ম্মচারীদিগকে তাঁহাদের বিভাগে বা জেলায় যে সকল জাতির লোক বেশী সংখ্যায় আছে সেই সকল জাতির বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখিতে ও গভর্ণমেণ্ট নির্দ্দিষ্ট আদর্শের হিসাবে ঐ সকল জাতি তালিকাভুক্ত করা সঙ্গত কি না সে বিষয়ে তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিতে বলা হইয়াছিল। তাঁহাদিগকে আরও বলা হইয়াছিল যে, যাহার নাম তালিকা-ভুক্ত করা হয় নাই কিন্তু তাঁহাদের মতে তালিকাভুক্ত হওয়া উচিত, তাঁহাদের বিভাগে বা জেলায় এরূপ কোন জাতি আছে কি না তাহা জানাইবেন।

৩। গভর্ণমেণ্টের আহ্বানের উত্তরে সাধারণ প্রতিষ্ঠান, জাতিবিশেষের সমিতি ও ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে গভর্ণমেণ্ট বহু আবেদন প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐগুলি এবং বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা কর্ম্মচারীদিগের মতামত এক্ষণে বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা হইয়াছে, এবং এতৎসংলগ্ন জাতিসমূহের তালিকাটি বঙ্গদেশের জন্য তপশীলভুক্ত জাতিসমূহের তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্য বলিয়া মহামান্য সম্রাটের গভর্ণমেণ্ট বিবেচনার জন্য সুপারিশ করিবেন বলিয়া গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন।

আদেশ।—এই নির্দ্ধারণ কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত করিবার জন্য ও কলিকাতা ও মফঃস্বলের সংবাদপত্রে পাঠাইবার নিমিত্ত আদেশ দেওয়া হইল।

সকাউন্সিল গভর্ণর বাহাদুরের অনুমত্যানুসারে,

স্বাঃ আর, এন, গিলক্রাইষ্ট,

রিফর্মস্ কমিশনার ও বঙ্গদেশের গভর্ণমেণ্টের জয়েণ্ট সেক্রেটারী।

তপশীলভুক্ত জাতিসমূহের তালিকা

আগরীয়া, বাগ্দী, বাহেলীয়া, বাইতী, বাউরী, বেদিয়া বেলদার, বেরুয়া, ভাতিয়া, ভুঁইমালী, ভুঁইয়া, ভূমিজ, বিন্দ, বিন্‌ঝিয়া. চামার, ধেনুয়ার, ধোবা, দোয়াই, ডোম, দোসাধ, গারো, ঘাসী, গোণরী, হাড়ী, হাজং, হালালখোর, হরি, হো, জালিয়া কৈবর্ত্ত, ঝালোমালো বা মালো, কাদার, কাণ, কাঁধ, কাঁদরা, কেওরা, কাপুরিয়া, করেঙ্গা, কাস্থা, কাউর, খয়রা, খাতিক, কোচ, কোনাই, কোঙার, কোঁড়া, কোটাল, লালবেগী, লোধা, লোহার, মাহার, মাহ্‌লী, মাল, মাল্লা, মাল পাহাড়িয়া, মেচ, মেথর, মুচী, মুণ্ডা, মুসহর, নাগেসিয়া, নমঃশূদ্র, নট, নুনিয়া, ওরাওঁ, পলিয়া, পাণ, পাসি, পাটনী, পোদ, রভা, রাজবংশী, রাজবার, সাওতাল, শুঁড়ি, সূত্রধর, তিয়র, তুরি।

একাডেমি অফ ফাইন আর্টস্ কলিকাতা

গত ডিসেম্বর মাসের শেষ ও জানুয়ারী মাসের প্রথম অংশে কলিকাতা মিউজিয়ম গৃহে একাডেমির দ্বিতীয় বার্ষিক প্রদর্শনী উন্মুক্ত ছিল। গত বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও প্রদর্শনীর উৎকর্ষের স্তর দর্শকমণ্ডলীর সন্তোষ উৎপাদন করতে সমর্থ হয়েছিল। ভারতবর্ষের বহু বিভিন্ন প্রদেশ হ'তে বহু শিল্পীদের অঙ্কিত চিত্র এবং গঠিত মূর্ত্তি প্রদর্শিত হয়েছিল। ৩রা জানুয়ারী ১৯৩৫ মহামান্য লর্ড উইলিংডন ভাইসরয় বাহাদুর প্রদর্শনী দর্শন করতে শুভাগমন করেন।

একাডেমি অফ্ ফাইন আর্টসের দ্বিতীয় প্রদর্শনীতে মহামান্য লর্ড উইলিংডন্ বড়লাট বাহাদুর ; বামে একাডেমির কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভাপতি মৌলভী এ, এস, এম, আবদুল আলি।

আগামী সংখ্যায় আমরা প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত কয়েকটি চিত্রের প্রতিলিপি প্রকাশিত করব।

নিখিল-ভারত সঙ্গীত মহাসম্মিলন

বিগত ২৭শে নভেম্বর হ'তে ২রা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কাশীধামে নাগরী প্রচারিণী সভাগৃহে উক্ত মহাসম্মিলনের সমারোহের সহিত ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন হ'য়েছে। বেনারসের মহারাজা বাহাদুর উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। সম্মেলন ভারতবর্ষের সকল অঞ্চল হ'তে বহুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ এবং শ্রোতা সমবেত হ'য়েছিলেন। বাংলাদেশের কয়েকজন খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ তাঁদের নিজ নিজ সঙ্গীত আবেদনের দ্বারা বাংলাদেশের মুখোজ্জ্বল ক'রেছিলেন। সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভৈরব ও আসাবরীর আলাপ ও গান শ্রবণ ক'রে সঙ্গীত বিষয়ে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও নৈপুণ্যে সভাস্থ শ্রোতৃবর্গ চমৎকৃত হয়েছিলেন, এবং ফলে সকলের অনুরোধে তাঁকে আর একদিন গান গাইতে হ'য়েছিল। বাংলাদেশের প্রধান মৃদঙ্গবাদক মৃদঙ্গাচার্য্য পণ্ডিত দুর্ল্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মৃদঙ্গবাদন ক'রেছিলেন, সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের খেয়াল গান উচ্চাঙ্গের হ'য়েছিল। সঙ্গীত রত্নাকর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুর-বাহার যন্ত্র শ্রবণ করে সকলেই তাঁকে আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ যন্ত্রী বলে স্বীকার করেন। যন্ত্রনায়ক মোস্তাকালী খাঁ সাহেবের অপূর্ব্ব সেতার বাদ্য শ্রবণ করে সভাস্থ সকলে বিমুগ্ধ হয়েছিলেন। সত্যকিঙ্কর বাবুর সেতার বাদ্যও সকলকে মুগ্ধ করেছিল। সংখ্যাধিক্য বশতঃ সকল সঙ্গীতজ্ঞের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গীতজ্ঞগণের, বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করা সম্ভব হ'ল না।

অধিবেশনের শেষ দিনে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত থেকে সভার গৌরব বৃদ্ধি করেন।

কয়েক বৎসর পরে নিখিল-ভারত সঙ্গীত সম্মিলনের পুনর্গঠন সকলেরই আনন্দের বিষয় হয়েছে, এবং এজন্য সম্মিলনের সেক্রেটারী ডক্টর মতিচাঁদ চৌধুরী মহাশয় সকল গৌরবের অধিকারী।

নিখিল-ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন

বিগত ২৪ ও ২৫শে ডিসেম্বর মাদ্রাজ কংগ্রেস গৃহে উক্ত সম্মেলনের নবম অধিবেশন সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়েছে। সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় এম্ এল্ সি। ভারতের সকল কেন্দ্র হ'তে প্রতিনিধিগণ সমবেত হয়েছিলেন। মাদ্রাজের ভূতপূর্ব্ব মেয়র মাননীয় দেওয়ান বাহাদুর জি, নারায়ণস্বামী চেটী সি, আই, ই, সম্মেলনের সংশ্লিষ্ট প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মিঃ নরসিংহ রাও কর্ত্তৃক সভা সম্বর্দ্ধিত হ'লে কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর পাঠাগারিক মিঃ আসাদুল্লাহ সম্মেলনের উদ্বোধন অভিভাষণ পাঠ করেন। সম্মেলনের সভাপতি কুমার মুনীন্দ্রদেবের অভিভাষণে ভারতবর্ষে এবং বঙ্গদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের
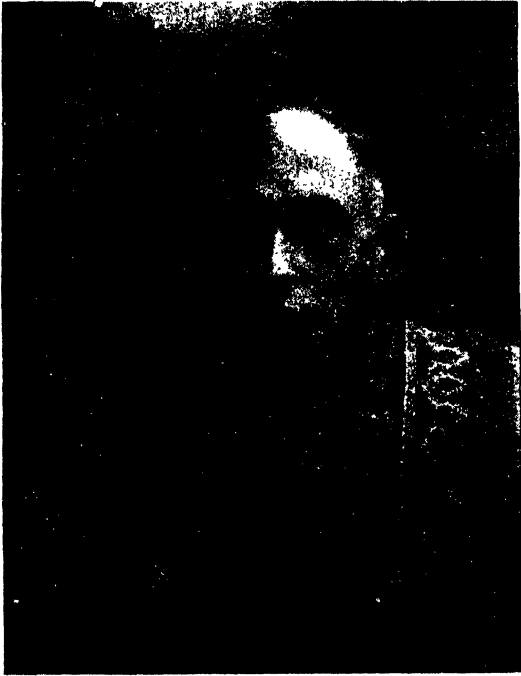
কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় এম, এল, সি

ইতিহাস বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের উদ্দেশ্য-বিবৃতি বিশেষ সার-গর্ভ হয়েছিল।

লিলুয়া রেলওয়ে ইন্‌ষ্টিটিউটে সঙ্গীত প্রতিযোগিতা

গত সোমবার ২২শে পৌষ তারিখে লিলুয়ায় ই, আই, রেলওয়ে ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউটে প্রথম সঙ্গীত প্রতিযোগিতা সুসম্পন্ন হয়েছে। মোট ৪৮ জন বালিকা ও ১৮ জন বালক প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিলেন; তন্মধ্যে কয়েকজন ইতিমধ্যে এলাহাবাদ ও কলিকাতায় কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছেন। মিঃ এইচ,সি, ওয়ালেস সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন ও মিসেস এল, পি, মিশ্র পুরস্কার বিতরণ করেছিলেন। সভাস্থলে মিঃ ও মিসেস্ এফ, এন, বসু, মিঃ আর, এম, সিংহ, মিঃ এল, পি, মিশ্র, মিঃ বি, বসু প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ভদ্রমণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন।

প্রফেসর আলাউদ্দিন খাঁ, সঙ্গীত নায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীহিতেন্দ্র নাথ বসু, প্রফেসর শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফেসর শ্রীসত্য কিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্যামলাল দত্ত, শ্রীহরিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ও বালীর কোটিবাবু পরীক্ষার ভার গ্রহণ করেছিলেন।

ডাক্তার শ্রীসুরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী সমাগত অতিথিবৃন্দকে ও প্রতিযোগিগণকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন ও মিঃ ওয়ালেস তাঁর বক্তৃতায় উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গীতের প্রশংসা করেন ও সকলকে ইন্‌ষ্টিটিউটের পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। প্রায় এক সহস্র দর্শক সাত ঘণ্টাকাল সাগ্রহে সঙ্গীত শ্রবণ করেছিলেন। অবশেষে ওস্তাদ আলা-উদ্দিন খাঁ ও তাঁর পুত্র আলি আকবর প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল স্বরদ ও কণ্ঠ সঙ্গীতের আলাপ করেন। শ্রীতিনকড়ি দত্ত ও শ্রীরামসত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় অনুষ্ঠানটি সাফল্য মণ্ডিত হয়েছিল।

নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান

দক্ষিণ কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়টী অল্পকাল মধ্যেই বেশ প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। ছাত্রীসংখ্যা আজকাল দুইশতের অধিক। ইহার বিশেষত্ব এই যে, এখানে অবিবাহিতা, বিবাহিতা ও বয়স্কা—সকলেরই পাঠের সুব্যবস্থা আছে, এবং বালিকা ও প্রাপ্তবয়স্কাদিগের জন্য বিভিন্ন শ্রেণী আছে। ধাত্রী বিভাগ থাকার জন্য এখানে জননীগণ নিশ্চিন্তচিত্তে পাঠে মনোনিবেশ করতে পারেন। সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং যানবাহনেরও বন্দোবস্ত আছে।

এই প্রতিষ্ঠানের একটী স্বতন্ত্র বিভাগে কুটীরশিল্পের বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। সেখানে বয়ন, সূচীশিল্প ও অন্যান্য নানাবিধ শিল্পকর্ম্ম অভিজ্ঞা শিক্ষয়িত্রীর তত্ত্বাবধানে শিক্ষা দেওয়া হয়।

এ বৎসর ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ছাত্রী প্রেরণের অনুমতি পেয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটীর উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

নেচার কিওর হোম

কলিকাতা নেচার কিওর হোমের চিকিৎসক ডাঃ অতুল রক্ষিত বি-এস সি, এম বি কিছুদিনের জন্য বিলাত যাত্রা করছেন। উদ্দেশ্য জটিল রোগের ঔষধবিহীন প্রাকৃতিক চিকিৎসায় এবং এক্সরে বিজ্ঞানে পারদর্শিতা লাভ। তাঁর এ শুভযাত্রায় আন্তরিক কল্যাণ কামনা করি।

Edited by Upendranath Ganguly, Printed by Saratchandra Mukherjee at The Sreekrishna Printing Works
259 Upper Chitpore Road, and published by the same from 27/1, Fariapooker Street, Calcutta.

বীণা বাদিনী

শিল্পী শ্রীযুক্ত ভি-আর চিত্রা
চিত্রাধিকারী শ্রীযুক্ত কান্তি চন্দ্র ঘোষের সৌজন্যে

অষ্টম বর্ষ, ২য় খণ্ড | ফাল্গুন, ১৩৪১ | ২য় সংখ্যা

আদিতম

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কে আমার ভাষাহীন অন্তরে,
চিত্তের মেঘলোকে সন্তরে,
বক্ষের কাছে থাকে তবুও সে রয় দূরে
থাকে অশ্রুত সুরে।
ভাবি বসে গাব আমি তারি গান,
চুপ করে থাকি সারা দিনমান
অকথিত আবেগের ব্যথা সই।
মন বলে কথা কৈ কথা কৈ!
চঞ্চল শোণিতে যে
সত্তার ক্রন্দন ধ্বনিতেছে
অর্থ কী জানি তাহা,
আদিতম আদিমের বাণী তাহা।
ভেদ করি ঝঞ্ঝার আলোড়ন
ছেদ করি বাষ্পের আবরণ
চুম্বিল ধরাতল যে আলোক,
স্বর্গের সে বালক
কানে তার বলে গেছে যে কথাটি
তারি স্মৃতি আজো ধরণীর মাটি
দিকে দিকে বিকাশিছে ঘাসে ঘাসে,
তারি পানে চেয়ে চেয়ে সেই সুর কানে আসে।

প্রাণের প্রথমতম কম্পন
অশথের মজ্জায় করিতেছে বিচরণ
তারি সেই ঝঙ্কার ধ্বনিহীন—
আকাশের বক্ষেতে কেঁপে ওঠে নিশিদিন;

মোর শিরাতন্তুতে বাজে তাই;
সুগভীর চেতনার মাঝে তাই
নর্ত্তন জেগে ওঠে অদৃশ্য ভঙ্গীতে
অরণ্য মর্ম্মর সঙ্গীতে।

ওই তরু ওই লতা ওরা সবে
মুখরিত কুসুমে ও পল্লবে—
সেই মহাবাণীময় গহন মৌন তলে
নির্ব্বাক্ স্থলে জলে
শুনি আদি ওঙ্কার
শুনি মূক গুঞ্জন অগোচর চেতনার।

ধরণীর ধূলি হতে তারার সীমার কাছে
কথাহারা যে ভুবন ব্যাপিয়াছে
তার মাঝে নিই স্থান,
চেয়ে থাকা দুই চোখে বাজে ধ্বনিহীন গান।

৮ বৈশাখ ১৩৪১

(৩)
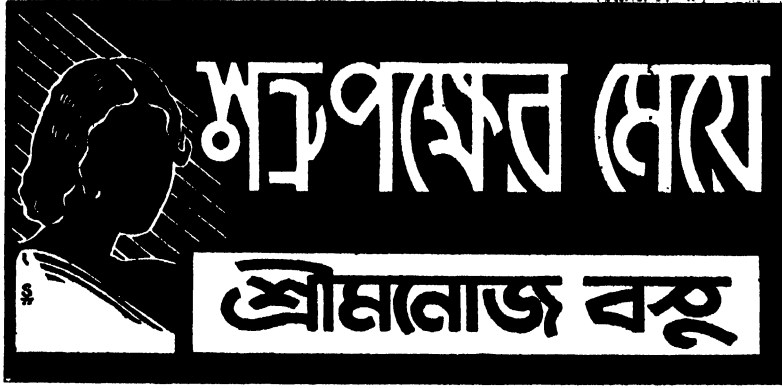
চাঁদ উঠিয়াছে। পাথরে বাঁধানো সুবিস্তৃত অলিন্দ, শীতের ঘোলাটে জ্যোৎস্নায় তাহারই উপর বড় বড় থামের ছায়া চিত্র-বিচিত্র ডোরা কাটিয়া দিয়াছে। গোলঘর, চণ্ডীকোঠা, রান্নাবাড়ী সমস্ত জনহীন। গম্ভীর আনত মুখে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বহিয়া নরহরি অলিন্দে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পিছে পিছে আসিতেছিল রঘুনাথ ও আরও পাঁচ-সাত জন। হাত নাড়িতে তারা সব বিদায় হইয়া গেল।

ঠিক এই রকম সময়টায় এক একদিন নরহরি থামে ঠেঁশ দিয়া ডাকাতের বিলের দিকে অলস দৃষ্টি বিসারিত করিয়া তাকাইয়া থাকেন। ভাঙা জ্যোৎস্নায় বিলের সে এক জ্যোতির্ম্ময় রূপ। এ রাত্রে বিলের পদ্মফুলের রাশি নজরে আসে না কিছুই। ওপারের দিকে যেখানে আজকাল ধানের আবাদ সুরু হইয়াছে,—সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিবার মুখে চাষীরা শুকনা ধানের গোড়ায় আগুন ধরাইয়া দিয়া যায়, সমস্ত রাত ধরিয়া সেই আগুন লাফাইয়া লাফাইয়া বেড়ায়।... রান্নাবাড়ীর ঠিক হাত দুই-তিন নীচে দিয়া চিক-চিক করিয়া নাককাটির খাল বহিয়া চলে, পাকা ফলের লোভে দেবদারু বনে বাদুড় পাখা ঝটপট করে, কেওড়া-ছায়ার নীচে ডোঙায় ডোঙায় ঠক করিয়া একবার বা বাজিয়া ওঠে।...এপারে এক বিচিত্র রহস্যলোক, আর ওপারের সংখ্যাতীত অগ্নিকুণ্ড; মাঝখানে নিঃসীম জনশূন্য বিল জ্যোৎস্নায় দেহ এলাইয়া দিয়া পড়িয়া পড়িয়া ঘুমায়।

ঝুমঝুম করিয়া মল বাজিয়া উঠিতে নরহরির সঙ্কল্প কঠোর মুখ স্নিগ্ধ হইয়া আসিল। হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন—লক্ষ্মী মেয়ে। অমনি জট নড়ে উঠেছে ত? কি করে টের পাস্ বল দিকি?

চোখ বড় বড় করিয়া সুবর্ণলতা কহিল—সত্যি বাবা, কালীর কিরে—আমি নই, বৌদিদি—

—কোথায় সে হারামজাদী? সুবর্ণের হাসি-হাসি চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া নরহরি পিছনে চাহিতেই বধূ দিল এক ছুট।

সুবর্ণলতার নালিশ চলিতে লাগিল—বৌদিদি মহা মিথ্যুক। শাঁখ বাজাচ্ছি পাল্লা দিয়ে, কে কত দম রাখতে পারে—বল্লে, ঐ দেখ্ নাককাটির খাল থেকে যক্ষি উঠে আসছে।

নরহরি মেয়েকে আদর করিয়া কোলের মধ্যে টানিয়া লইলেন। বলিলেন—বোকা মেয়ে। অমনি তুমি ছুটে এলে?

ছোট্ট মাথাটি সজোরে দুলাইয়া সুবর্ণলতা বলিল—বা রে আমি না দেখে এসেছি বুঝি। আলসের ফাঁকে তাকিয়ে দেখলাম, কালো মস্ত মস্ত ছায়ার মতো সব উঠে আসছে। এসে দেখি, সে সব কিচ্ছু না—তুমি।

খিল খিল করিয়া হাসিয়া মেয়ে লুটাইয়া পড়িল।

নরহরি বলিলেন—আচ্ছা মেয়ে তো। ভয় করল না? যক্ষি দেখছি তোরও নাক কেটে নেবে একদিন।

বাপের আদরে কি যে করিবে সুবর্ণ ঠিক করিতে

পারে না। বলিল—চাঁপাফুল নেবে বাবা—খাসা স্বর্ণচাঁপা? তুলে এনেছি। চক্ষের পলকে সে ছুটিয়া গেল। তখনই আবার আসিল। বলিল—ফুল নীচের। দুত্তোর—কি হবে ফুলে! শুকিয়ে গেছে, ও ভাল না। তারপর বলিল—বাবা, বৌদিদি কি করেছে জানো সে দিন? সে এক কাণ্ড।

হাত-মুখ নাড়িয়া স্বর্ণ বলিতে লাগিল—দুপুর বেলা। কেউ কোথাও নেই। আমি আর বৌদিদি বড় খাটে ঘুমুচ্ছি। পায়ের শব্দে কি রকমে ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখি, এদিক ওদিক চেয়ে চোরের মতো দাদা ঘরে ঢুকছে—

অলিন্দের পাশে কক্ষের মধ্যে ঝিন-মিন করিয়া গহনা বাজিয়া উঠিল। নরহরি হাসিয়া বলিলেন—থাম্—থাম্ দিকি।

—না শোনো, বাবা। নাছোড়বান্দা স্বর্ণ বলিতে লাগিল—কি দুষ্টু বৌদিদি, শোনো একবার। চুপচাপ শুয়েছিল, যেন কত ঘুমুচ্ছে। দাদা যেই এসেছে, চট করে অমনি উঠে দাঁড়াল। আমি চোখ মিটমিট করছি, দেখি কি করে! দাদা খাটের কাছে এসে বৌদিদির মুখের কাছে মুখ নিয়ে—

নরহরি বলিলেন—রাত হয়েছে, এখন শুতে যাও, মা, আর গল্প থাক্—

স্বর্ণ না বলিয়া ছাড়িবেই না। বলিতে লাগিল—মুখের কাছে মুখ না নিয়ে দাদা বল্লে—আর কামরাঙা আছে ঘরে? বৌদিদি ফিস ফিস করে বল্লে—না।

নরহরি হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন—বল্লে নাকি?

কথা বিশ্বাস করিতেছে না ভাবিয়া স্বর্ণলতা ক্ষুব্ধকণ্ঠে আরও জোরে মাথা ঝাঁকাইয়া উচ্চ কণ্ঠে বলিল—হ্যাঁ বাবা, সত্যি; কালীর দিব্যি। বৌদিদি স্পষ্ট বললে, আমি শুনলাম। তোমাদের সামনে কথা কয় না, ঘোমটা দিয়ে দিয়ে বেড়ায়। কিন্তু সেদিন বলেছিল, আমি শুনেছি।

নরহরি বলিলেন—বেশ করেছে। আর তাই লাগাতে এসেছ আমার কাছে? যক্ষিতে যদি নাক না-ও কাটে, আজকে বৌমা ঠিক নাক কেটে নেবে তোমার।

স্বর্ণ কক্ষের দিকে একবার দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া নির্ভীক কণ্ঠে বলিল—তোমার কাছে শোব তা হলে—

—ওরে বাস্ রে! ভুল করে অন্ধকারে আমার নাকটা যদি কাটা যায়?

স্বর্ণলতা কিন্তু আর হাসিল না; বড় বড় চোখ দুটি মেলিয়া বাপের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল। শেষে ধীরে ধীরে আগের কথাটাই আর একবার বলিল—আজকে আমি তোমার সঙ্গে শোব, বাবা।

হুহু করিয়া হঠাৎ এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া বহিয়া গেল। একটু পরেই উঠানে ঘোড়ার খুরের ধ্বনি। তীক্ষ্ণ চোখে নীচের দিকে চাহিয়া নরহরি সেই অলক্ষ্যের উদ্দেশে বলিলেন—ওখানে থাক ঘোড়া। চাঁদ ডুবে গেলে রওনা হব।

সকল আবদার এক মুহূর্ত্তে বন্ধ হইয়া গেল। বাবাকে স্বর্ণলতা ভাল করিয়া জানে। এক পা দু পা করিয়া সে ফিরিয়া গেল। দোরের কাছে গিয়া মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিল—লাজুক সপ্রতিভ ধরণের হাসিল—বলিল—তোমার সঙ্গে কালকে শোব, বাবা। হ্যাঁ?

একটা গল্প বলি, শোন—এই শ্যামগঞ্জ গ্রাম পত্তন হইবার গল্প। আগে এখানে বসতি ছিল না কিছুই, দক্ষিণে আগড়ভাঙার খাল আর উত্তর-পশ্চিমে ডাকাতের বিলের মাঝখানে পোড়ো মাঠ কেবল ধূ ধূ করিত। এই মাঠের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম আসিয়া পাঁজা সাজাইলেন শ্যামশরণ চৌধুরী মহাশয়। শ্যামশরণ আর নরহরির প্রপিতামহে সম্পর্ক ছিল সহোদর ভাই, কিন্তু মিল-মিশ ছিল না। ঐ শ্যামশরণের নামেই মাঠ আজ শ্যামগঞ্জ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পঁচিশ বিঘা জমির উপর ইটপাথরে তিনি প্রকাণ্ড চকমিলানো তিনমহল বাড়ী তুলিলেন। হাতী-ঘোড়া লোক-লস্কর কাছারীবাড়ী অতিথিশালা কোন কিছুর ত্রুটী রহিল না। এত দিন ত হইয়া গিয়াছে, আজও বাড়ীর একটুকরা মাল-মশলা খসে নাই—এমন মজবুত কাজ-কর্ম্ম। মানুষে কথা কহিলে এখনও কক্ষের মধ্যে যেন গমগম করিয়া বাজিতে থাকে।

শোনা যায়, শ্যামশরণ বিষম জেদী মানুষ ছিলেন। এক রাত্রে মশারী না পাইয়া মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া বাড়ী ছাড়িয়া যান, সে পৈতৃক বাড়ীতে জীবনে আর পা দিলেন না। মায়ের মৃত্যুকালে—তখন শ্যামশরণ মহা ধুমধাম করিয়া নগর পত্তন করিতেছেন—ভাইরা আসিয়া হাত পা ধরিয়া কত কান্নাকাটি করিল, শ্যামশরণ নিশ্চল; মাথা নাড়াইয়া বলিলেন—যাও তোমরা, ব্যস্ত হোয়ো না,—দেখা হবেই। তা হইল বটে। মায়ের শব শ্মশানে নামাইলে দেখা গেল, মলিন অবসন্ন মুখে সকলের পিছনে শ্যামশরণ একেলা বসিয়া কাঁদিতেছেন। চিতার আয়োজন হইতে লাগিল। যতক্ষণ না চিতায় তোলা হইল, শ্যামশরণ মৃতার পা দুখানির তলায় মাথা গুঁজিয়া নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিলেন। চিতার আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; তারপর শ্যামশরণ আর সেখানে নাই। আর আর ভাইরা পৈতৃক বাড়ীতে সাধ্যমত শ্রাদ্ধ-শান্তি করিল, শ্যামশরণ বিপুল সমারোহে নিজের বাড়ী দান-সাগরের আয়োজন করিলেন, ভাইদের কারও ডাকিলেন না; ভায়েরা নাছোড়বান্দা হইয়া ডাকাডাকি লাগাইলে বরকন্দাজ ডাকিয়া তাদের হাঁকাইয়া দিলেন—এমনও শোনা যায়।

রাত্রিবেলা এক কাপড়ে বাড়ী ছাড়িয়াছিলেন, তখন শ্যামশরণ একরকম শিশু বলিলেই হয়; আর একদিন হাঁকডাক করিয়া গ্রাম বসাইতে লাগিলেন, জমিদারী করিতে লাগিলেন, দেশের মধ্যে ভয় ও সম্ভ্রমের অন্ত রহিল না; শ্যামশরণের তখন গোঁফে চুলে পাক ধরিয়াছে। লোকে বলিত, সাত ঘড়া সোনার মোহর তাঁর শোবার দালানের মেজেয় পুতিয়া তার উপর বিছানা পাতিয়া বুড়া ঘুমাইতেন। কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে ঘরের দরজা-জানালা সমস্ত আঁটিয়া নিজের হাতে সাবলে মেজের পাথর উঠাইয়া বুড়া ঘড়াগুলি সমস্ত বাহির করিতেন; সমস্ত রাত্রি ধরিয়া পাথরের উপর সোনার মোহর ঢালিতেন, তুলিতেন, চটুল হাসি হাসিতেন, আপনার মনে কত কথা বলিতেন, গল্প করিতেন······জানলায় কান দিয়া বুড়ার কোন কোন কর্ম্মচারী একটু-আধটু তাহা শুনিতে পাইত। বৎসরের কেবল এই একটি মাত্র রাত্রি। পরদিন হইতে শ্যামশরণ আবার কঠোর, রুক্ষ, স্বল্পভাষী ভয়ানক মানুষটি; আর তিনশ চৌষট্টি দিনের মধ্যে মুখে তাঁর তিলার্দ্ধ বাচালতা নাই।

নিরন্ন গৃহহারা গ্রাম্যশিশুর ভাগ্যে কি করিয়া অবশেষে এত সোনা জুটিল, সঠিক তাহা জানিবার উপায় নাই। কেউ বলে, সীতারাম রায়ের বাড়ীর এক ভাঙা দেয়ালের উপর বেড়াইতে বেড়াইতে ইট খসিয়া তিনি মাটিতে পড়িয়া যান; হাঁটু ভাঙ্গিয়া গেল, তারপর খোঁড়া পায়ে কোন গতিকে উঠিয়া দেখিতে পাইলেন, দেয়ালে-পোতা কলসীর মধ্যে সোনা ঝিকমিক করিতেছে। ..কিন্তু বরণ-ডাঙা অঞ্চলে এই সব গল্প করিতে যাও, নাক সিটকাইয়া তারা বলিবে, ছাই! সেকালে বিদ্যাধরীতে আর ডাকাতের বিলে যত ডাকাতী হইত, তার সকল জিনিষ পত্র বেচিয়া সকল গহনা গলাইয়া জমিয়াছে ঐ সোনা। একলা শ্যামশরণ নিজের দুখানা হাতেই নাকি একশ একটা মানুষ মারিয়া ডাকাতের বিলের হোগলা-কলমী কেউটে-ফণার দামের নীচে চালাইয়া দিয়াছিলেন।

সে যাই হোক, নগণ্য এক পথের ভিখারী কি করিয়া-ছিল, কি করিয়া বেড়াইত কে-ই বা তার খবর রাখে,—কিন্তু দালান-ইমারত করিবার পর জমিদার শ্যামশরণকে একটি দিনও কেউ রাত্রে বাহির হইতে দেখে নাই। সন্ধ্যা হইতে না হইতে শোবার ঘরের চারিপাশে খুব উজ্জ্বল অনেক আলো জ্বালিয়া শ্যামশরণ দরজা আঁটিয়া দিতেন। সেই দিনের-মতো আলোয় বাহিরে ঢালিরা ঢাল-সড়কী লইয়া সমস্ত রাত্রি টহল দিয়া ফিরিত। কিন্তু চৌধুরীর শত্রুরা রটনা করে, একশ এক সেই বিদেহী আত্মা তাদের হকের ধন পাছে কাড়িয়া লইয়া যায়, তাই তাঁর এ সতর্ক ব্যবস্থা।

রাতের পর রাত কাটিয়া যাইত, বুড়া কখনো ঘুমাইতেন না। বাহিরের ঢালিদের এক মুহূর্ত্ত যদি ঝিমুনি আসিত, পদক্ষেপ ক্ষীণ হইয়া উঠিত, বজ্রকণ্ঠে বুড়া অমনি চীৎকার করিয়া উঠিতেন—কোথা? রাত্রির নিস্তব্ধতা সে বজ্রস্বরে কাঁপিয়া উঠিত। ঢালির খড়ম আবার চলিতে সুরু করিত, খট্-খট্-খট্—

শ্যামশরণের ভাব যা ছিল, কেবল একটু দয়াময় ঘোষালের সঙ্গে। দয়াময় ছিলেন দেওয়ান। একদিন কথায় কথায় বয়সের কথা উঠিল। দয়াময় বলিলেন—কি আর এমন বয়স আপনার চৌধুরীমশায়! ওর দুনো বয়সে মানষে চতুর্থ পক্ষে নামছে। আপনি একটী বিয়ে করুন।

রুক্ষদৃষ্টি মেলিয়া শ্যামশরণ বলিলেন—কেন?

সে দৃষ্টির সামনে একটু ঘাবড়াইয়া গিয়া দয়াময় বলিলেন—মানে আপনার অতুল ঐশ্বর্য্য দেখ্‌বে কে? দু একটা ছেলেপুলে না থেকে বাড়ী যেন আঁধার হয়ে থাকে।

কেমন একধরণের অদ্ভুত হাসিতে শ্যামশরণের মুখ ভরিয়া গেল। অনেকক্ষণ ধরিয়া হাসিতেই লাগিলেন, তারপর বলিলেন—দু-একটা নয় দয়াময়, আমার সাত-সাতটা ছেলে। আবার বলিলেন—তারা আমার ঘর আলো করে রেখেছে। দেখবে? একদিন দেখিয়ে দেব তোমায়—

সে দেখানো কোন দিন হইয়াছিল কিনা, কে জানে! তখন হাসিয়া দয়াময়ের কথাটা উড়াইয়া দিলেন বটে, কিন্তু শ্যামশরণের মুখের হাসি বেশীক্ষণ থাকিল না। তাঁর মনে নিরন্তর ঐ ভাবনাটাই কাঁটার মতো ফুটিতে লাগিল, তাঁর অবর্ত্তমানে এ বিপুল স্বর্ণ রক্ষা করিবে কে? রাতের ঘুম ত ছিলই না, দিনের কাজকর্ম্মও অতঃপর সমস্ত ঘুচিয়া গেল। বিবাহে রুচি হইল না; সমস্ত জীবন পথে পথে ঘুরিয়া বিয়ে-থাওয়া সংসার-ধর্ম্মে এমনি আতঙ্ক জন্মিয়াছিল যে সেটাও বোধকরি ডাকাতের বিলের স্বর্ণলিপ্‌সু ঐ একশ এক আত্মার চেয়ে একবিন্দু কম নয়। দিন-রাত ভাবিয়া ভাবিয়া শ্যামশরণ এক অতি ভীষণ বিচিত্র সঙ্কল্প করিলেন।

ডাকাতের বিলে আজ কাল অজস্র পদ্ম ফুটিয়া থাকে, সেকালের মতো গভীর জল নাই, জলে ঢেউ নাই, জলের চেয়ে ইদানীং পাঁকই বেশী, নৌকার পথ নাই—ডোঙা চলে মাঝে মাঝে, আর বারমাসই নানারকম ফুলে বিল আলো হইয়া থাকে;—কলমী ফুল, সাপলা ফুল, কেউটেফণার ফুল, লাল ও সাদা রঙের বড় বড় পদ্ম,—যেন তার সীমা নাই, দৃষ্টি যতদূর যায় কেবল ঐ ফুলের সমুদ্র।*

ঐ ডাকাতের বিলের ধারে—আজকাল যেখানটা নরহরি চৌধুরীর গোলাবাড়ী ওরই কাছাকাছি কোনখানে—শ্যামশরণ মাটির নীচে সারি সারি সাতটা পাথরের কুঠারী তৈয়ারী করিলেন, দরজাগুলা তার লোহার। শ্যামশরণের বাড়ীর কোন্ একটা গোপন জায়গা হইতে সুড়ঙ্গ আসিয়া সেই সাত দরজার মুখে লাগিয়াছে। সে-সুড়ঙ্গের মুখও পাথরে বাঁধা, বাহির হইতে দেখিয়া কিছুই টের পাইবার জো নাই।

এত সব কাণ্ড হইয়া গেল, কতদিন ধরিয়া কত লোকজন খাটিল, অথচ বাহিরে কাক-পক্ষীতেও টের পাইল না। এই কাজে দয়াময় ঘোষাল নাকি দশক্রোশ বিশক্রোশ দূর হইতে রাতারাতি রাজমিস্ত্রি আনিয়াছিলেন। নৌকা বাহিল, শ্যামশরণের সাবেক আমলের সাকরেদের দল; গলা কাটিয়া তাদের মারিয়া ফেলা যায়, কিন্তু কথা বাহির হয় না। মিস্ত্রিদের অন্দর মহলে ঢুকাইয়া দিয়া দয়াময় খালাস। তারপর শ্যামশরণ নিজের হাতে একটি একটি করিয়া সমস্ত দরজা জানালা আঁটিয়া দিলেন, বাহিরে ক্ষীণতম শব্দটিও আসে না। মাস খানেক পরে আবার এক রাত্রিবেলা সেই দরজা খুলিয়া গেল। উঠান জুড়িয়া পড়িয়া রহিয়াছে মিস্ত্রিগুলার লাস; কাজের শেষে তারা বখশিষ পাইয়াছে। দরজা খুলিয়া শ্যামশরণ ইঙ্গিত করিলেন। বিদ্যাধরীর তখন ভরা জোয়ার, বিপুল স্রোত। গরুর গাড়ী-বোঝাই লাস ঢালা হইল সেখানে। সেই স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া হতভাগারা বোধকরি বা নিজেদের দেশেই ফিরিয়া চলিল। দয়াময় ঘোষাল আগাগোড়া অন্দরবাড়ী খুঁজিয়া দেখিলেন, আরও অনেকে দেখিল, আশ্চর্য্য! মিস্ত্রিগুলা এত দিন ধরিয়া কি যে করিল, কোনখানে এক বিন্দু তার খোঁজ পাইবার জো নাই। অবিকল সেই আগেকার উঠান, একটি পাথরের কণিকা কোথাও খসে নাই, দেওয়ালে জমাটে ক্ষীণতম রেখাটি পড়ে নাই। সুড়ঙ্গের গোপন মুখ জগতের মধ্যে জানিয়া রাখিলেন একমাত্র শ্যামশরণ।

গ্রীষ্মকাল। দুপুরবেলা আকাশ হইতে যেন আগুন

বৃষ্টি হইতেছে। এমন সময় একদিন এক ব্রাহ্মণ হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া শ্যামশরণের অতিথিশালায় উঠিলেন, সঙ্গে বার বছরের ফুটফুটে নধরগোছের একটি ছেলে। কথায় কথায় প্রকাশ হইল, ছেলেটি মামার বাড়ী থাকিয়া পড়াশুনা করে, মামা অধ্যাপক মানুষ;—সম্প্রতি বাপকে পাইয়া জেদ করিয়া দিন কয়েকের জন্য তাঁর সঙ্গে বাড়ী চলিয়াছে। এতপথ রৌদ্রে হাঁটিয়া আসিয়া কচি কচি মুখখানা জবাফুলের মতো টকটক করিতেছে। শ্যামশরণ তাড়াতাড়ি হাকডাক করিয়া বাড়ীর মধ্য হইতে তরমুজের সরবৎ আনাইয়া বাপছেলেকে খাওয়াইলেন। খাওয়া দাওয়া শেষ হইতে বেলা প্রায় পড়িয়া আসিল। অচেনা পথঘাট, সামনে অন্ধকার রাত্রি—সেদিন রাত্রিটাও ঐখানে কাটাইয়া দেওয়া হইবে, এই রকম সাব্যস্ত করিয়া শ্রান্ত ব্রাহ্মণ ছেলে লইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। ঘুম যখন ভাঙ্গিল, তখন ঘোর হইয়া গিয়াছে। ছেলে পাশে নাই। কোথায় গেল? কোথায় গেল? কেউ সে খবর বলিতে পারে না। আগে ভাবিয়াছিলেন, দুষ্ট ছেলে কোন দিকে হয়ত কোন এক ছেলের দলের সঙ্গে ভাব করিয়া খেলাধুলায় মাতিয়াছে। কিন্তু রাত্রি গভীর হইল, ছেলের সন্ধান নাই। বাবা শেষে পাগলের মতো হইয়া উঠিলেন। আর আর যারা খুঁজিতে গিয়াছিল, অবসন্ন হইয়া তারা ফিরিয়া আসিল; সমস্ত রাত্রি কেবল একটি লণ্ঠন হাতে বিপন্ন ব্রাহ্মণ অশ্রান্ত কণ্ঠে ডাকিয়া ডাকিয়া ফিরিতে লাগিলেন।

তখন ছেলে রুদ্ধ-দ্বার পাতাল পুরীতে; বাপের ডাক সেখানে পৌছায় না। শ্যামশরণ মাটির নীচে পাষাণ কক্ষে কোমল করিয়া শয্যা বিছাইয়া রাখিয়াছিলেন, টানিতে টানিতে একটা ঘড়া-বোঝাই সোনা আনিয়া এখন শয্যার শিয়রে রাখিলেন; তারপর ঘুমন্ত ব্রাহ্মণ-শিশুকে সুড়ঙ্গের পথে লইয়া সেখানে শোয়াইয়া যেই পিছু ফিরিয়াছেন, অমনি আলো বায়ুহীন কক্ষমধ্যে বোধ করি বা নিঃশ্বাস ফেলিবার কষ্টেই বালক জাগিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। দ্রুত ছুটিয়া বাহির হইয়া শ্যামশরণ ঘড়াং করিয়া লোহার দরজা বন্ধ করিলেন—চিরদিনের মতো বন্ধ করিলেন। তারপর কান পাতিলেন, শব্দ কিছুই বাহিরে আসিবার ফাঁক নাই। কিন্তু বুকের মধ্যে সেই সদ্য জাগ্রত অসহায় বালকের আর্ত্তকণ্ঠ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। একটু স্থির হইয়া থাকিয়া তারপর সুড়ঙ্গ ধ্বনিত করিয়া উন্মাদের মতো শ্যামশরণ হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন—জেগেছিস্? বেশ, বেশ—বাবা, জাগলি ত খুব সজাগ হয়ে ঘড়া আগলে বসে থাক। যে নজর দেবে একটা মোচড় দিয়ে তার ঘাড় ফিরিয়ে দিবি এদিকে······

দীর্ঘ ক্ষণ ধরিয়া একলা এমনি হাসিয়া আবার শ্যামশরণ সহজ সাধারণ মানুষ হইয়া উপরে উঠিয়া আসিলেন।

ছেলেধরার ভয়ে ও-অঞ্চলের মানুষ তখন আর ছেলেপেলে ঘরের বাহির হইতে দেয় না, দিন রাত চোখে চোখে সামাল করিয়া রাখে, তবু এমনিভাবে ব্রাহ্মণ বালক আরও ছয় ছয়টা চুরি হইয়া গেল। পৃথিবীর নিরন্ধ্র তলদেশে না খাইয়া তৃষ্ণায় শুকাইয়া দিনের পর দিন কঙ্কালসার হইয়া অবশেষে সেই কঙ্কাল গলিয়া পচিয়া গুঁড়া হইয়া কি প্রক্রিয়ায় তারা যে অবশেষে পাতাল-রাজ্যের ধন-রক্ষক হইয়া দাঁড়াইল, কে জানে! কিন্তু সাতটা যক্ষ সজাগ থাকিয়া ডাকাতের বিলের কাছাকাছি কোন এক অনির্দ্দেশ্য জায়গায় শ্যামশরণের বিপুল ধন আজিও দিনরাত পাহারা দিয়া বেড়াইতেছে, এ খবর এ দিককার সকল লোকে নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখিয়াছে।

আরও মাস কয়েক ঘুরিয়া আবার কোজাগরী পূর্ণিমা আসিল—পরিস্কার মেঘশূন্য রাত্রি। এ রাত্রে বিজন কক্ষে শুইয়া শুইয়া শ্যামশরণের ঘুম আর আসে না। কোথায় অনেক দূরে মাটির সুগভীর নিম্নে অবরুদ্ধ কক্ষতলে সাতঘড়ার সকল সোনা ঝন ঝন করিয়া বাজিয়া যাইতেছে, সাতটি সোনার শিশু সারা বৎসরের ঘুম ভাঙিয়া বিজন অন্ধকারের মধ্যে কত কান্না কাঁদিতেছে! অনেকক্ষণ ছটফট করিয়া অনেক ইতস্তত করিয়া শ্যামশরণ অবশেষে নিযুপ্ত মধ্যরাত্রে দ্বার খুলিলেন। ইদানীং বাহিরে ঢালির পাহারা বন্ধ, আর তার প্রয়োজন নাই। জ্যোৎস্নালোকিত জনহীন উঠানের প্রান্তে গুপ্ত

সুড়ঙ্গের দ্বারে দাঁড়াইয়া কম্পিত হস্তে শ্যামচরণ একটা মশাল জ্বালিয়া লইলেন, তারপর পাথর সরাইয়া ধীরে ধীরে সোপান বহিয়া পাতালে নামিলেন। এমনি কতদুর চলিয়াছেন—দপ করিয়া হঠাৎ মশাল নিভিল, দম আটকাইয়া আসিল, অন্ধকারের মধ্যে কে যেন লোহার মত ভারী হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া গুড়াইয়া দিতেছে। শ্যামশরণের চেতনা লোপ হইয়া আসিল; তাহারই মধ্যে একবার উপরের দিকে তাকাইলেন, জ্যোৎস্নার যে ক্ষীণ রশ্মি সুড়ঙ্গের প্রবেশ-পথে ঢুকিয়াছিল, কোথাও তার একবিন্দু চিহ্ন নাই, সর্ব্বনাশ! পাথর পড়িয়া গিয়া মুখ ইতিমধ্যে কখন আটকিয়া গিয়াছে, বাহিরের বাতাসেরও ঢুকিবার ফাঁক নাই। অতদূর উঠিয়া আসিয়া কাঁধে তুলিয়া মুখের সে পাথর সরাইয়া দিবেন সে শক্তি শ্যামশরণের নাই, মুখ থুবড়াইয়া সেইখানে পড়িয়া গেলেন। সেই রাত্রে সোনার প্রহরী সাত যক্ষের সঙ্গে মিতালিটা তাঁর কি রকমের হইল, বাহিরের মানুষ কোনদিন তার তিলার্দ্ধ জানিতে পাইল না।

কিন্তু শ্যামশরণের এই রকম মৃত্যুর কাহিনী চৌধুরী বাড়ীর কাহাকে কোন দিন শুনাইও না, শুনিলে তোমাকে আস্ত রাখিবেন না। পুরানো জমাখরচেও প্রমাণ রহিয়াছে, শ্যামশরণের চিতায় দশমণ চন্দন কাঠ এবং আড়াইমণ ঘি পুড়িয়াছিল। শত্রুপক্ষেরা কিন্তু নাক সিটকাইয়া বলে, ঐ ঘি এবং চন্দনকাঠ পর্য্যন্ত—আর কিছু নয়। যে-ভাইদের একদা শ্যামশরণ অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, খবর পাইয়া তারা তাড়াতাড়ি আসিয়া বিদ্যাধরীর কূলে লোক-দেখানো প্রকাণ্ড এক চিতা সাজাইল। কিন্তু শব ছিল না তাহাতে। তারপর তারা শ্যামশরণের জমাজমি বিষয়-সম্পত্তির দখল লইয়া বসিল। সুড়ঙ্গের খোঁজে একবার উঠানের সমস্ত পাথর খুঁড়িয়া তোলা হইল, আন্দাজমতো দেয়ালেরও দুএক জায়গা খোঁড়া হইয়াছে; তিন পুরুষ ধরিয়া কমবেশী এমনি বাড়ীময় খোঁড়াখুঁড়ি চলিয়া এখন সমস্ত নরহরিতে আসিয়া বর্ত্তাইয়াছে। বাপের আমলেই নরহরি বাপকে বুঝাইতেন—কি হবে মাটি খুঁড়ে, বাবা? সোনা আবার আমি জন্মাবো।

নরহরি আমলে আসিয়া বাড়ী খোঁড়া বন্ধ হইয়াছে। এবং সোনা কলসী কলসী না হোক সিন্দুক ভরিয়া অনেক যে জমিয়া উঠিয়াছে—তাহাতে সন্দেহ নাই।

আবার কেউ কেউ বলে, সুড়ঙ্গের নীচে শ্যামশরণের সেই সোনা এখন আর নাই, চাঁদামাছ হইয়া বিদ্যাধরীর স্রো ত কবে ভাসিয়া গিয়াছে। সে অনেক কালের কথা। তখন নাককাটির খাল ছিল না, বিদ্যাধরীর সঙ্গে কোন সংযোগই ছিল না ডাকাতের বিলের। একদিন খর দুপুরে জনমানবহীন বিলের প্রান্তে হঠাৎ পাতাল ভেদ করিয়া সাত যক্ষ মাটির উপরে উঠিয়া বসিল। সাতটি বড় বড় মলিন পিতলের কলসী—কিন্তু জীবন্ত, চলনশীল। এত কাল পরে পৃথিবীর আলো বাতাসের এতখানি আকস্মিক তৃষ্ণার হেতুটা কি বলা শক্ত, কিন্তু যক্ষেরা উঠিয়া বসিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়া রহিল না—গড়াইতে গড়াইতে ধীরে ধীরে বিদ্যাধরীর দিকে চলিল। এক বুড়ী ওদিককার গ্রামে দুধ বেচিতে গিয়াছিল, দুধ বেশী বিক্রী হয় নাই, ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া আসিতেছিল, মাঠের মধ্যে অপরূপ কাণ্ড দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। আরও আশ্চর্য্য কাণ্ড, যক্ষ বুড়ীকে ডাকিয়া কথা কহিল; সকলের আগে যেটি চলিতেছিল, তার সেই কলসীর দেহ হইতে মিষ্ট রিণরিণে ছেলেমানুষের করুণ আওয়াজ বাহির হইল—তেষ্টা পেয়েছে, বুড়ীমা,—দুধ দাও—খাই। বুড়ীর বিস্ময়ের ভাব তখন একরকম কাটিয়া গিয়াছে; কি করি—কি না করি—মনের অবস্থাটা এই রকম। কলসীর মধ্য হইতে পুনশ্চ কথা আসিল—মুখে ঢেলে দাও না একটু দুধ। সাত-পাঁচ ভাবিয়া বুড়ী এক পো দুধ মাপিয়া কলসীর মুখের মধ্যে ঢালিয়া দিয়া বলিল—দাম? কলসী বলিল—আমার পিছে যে আসছে দাম দেবে সেই। পরের জন আগাইয়া আসিলে বুড়ী বলিল—বাবা, আমার এক পো দুধের দাম? সে বলিল—আমার পিছে। এমনি করিতে করিতে সবার শেষের কলসী বলিল—আমার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দাও। একেবারে দু'হাতে যত সোনা ধরে নিয়ে নাও। আনন্দে বুড়ী কি করিবে ভাবিয়া পায় না। কোঁচড় পাতিয়া তাড়াতাড়ি দু'হাত

ভরিয়া সোনা একবার তুলিল। আবার ভাবিল, এত সোনা রয়েছে, নিই না আর একবার—কি আর হবে। আর একবার যেই হাত ঢুকাইতে গেছে, কলসী গড়াইয়া অমনি তার ঘাড়ের উপর আসিল, বুড়ী পড়িয়া গেল, কলসীর কানায় নাক তার দুই খণ্ড হইয়া গেল। কোঁচড়ের দিকে তাকাইয়া দেখে, সমস্ত সোনা চাঁদা মাছ হইয়া লাফাইতে সুরু করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে মাঠের উপর দিয়া অনতিগভীর এক খাল নামিয়া গেল, সাতটা যক্ষ উপুড় হইয়া সমস্ত সোনা ঢালিয়া দিল, সোনা চাঁদা মাছ হইয়া লাফাইতে লাফাইতে খালে নামিল, বুড়ীর আচলের গুলাও খালের জলে পড়িয়া গেল। সে খাল আজও আছে—নাককাটির খাল উহার নাম। নরহরির রান্নাবাড়ীর ঠিক পাশ দিয়া বাদাম বনের ছায়ায় ছায়ায় বিদ্যাধরীতে গিয়া পড়ে।

এই ডাকাতের বিল, বিদ্যাধরী নদী, নাককাটির খাল, শ্যামশরণের সুপ্রাচীন অমসৃণ পাথরের প্রাসাদ লইয়া সম্ভব অসম্ভব কত যে গল্প চলিয়াছে তার সীমা নাই। মা-হারা ছোট্ট মেয়ে সুবর্ণলতা, বাড়ীর মধ্যে তার সঙ্গে দুটা ভাল মন্দ গল্প জমাইবার মানুষ কেবল বৌদিদি। আর কোন কোন দিন হাতে কাজ না থাকিলে, মনে তেমন কোন কাজের ভাবনা না থাকিলে নরহরি চৌধুরী উহাদের সঙ্গে ছেলে মানুষ হইয়া আসিয়া বসেন। কিন্তু সেও কালেভদ্রে কদাচিৎ। নরহরির ছেলে শ্যামকান্ত; সে প্রায়ই বাড়ী থাকে না। আঠারো ক্রোশ দূরে দৌলতপুর গ্রাম, অনেক বিদ্বান লোকের বসতি, কলেজ আছে, চতুষ্পাঠি আছে, কুস্তির আখড়াও আছে, সেইখানে সে মানুষ হইতেছে। কতদূর কি হইতেছে তার খোঁজ লইবার অবসর নরহরির বড় নাই। শ্যামকান্তও দু-এক দিনের জন্য বাড়ী যখন আসে, পারতপক্ষে বাবার সামনে ঘেঁসে না, ফাঁকে ফাঁকে বেড়াইয়া মেয়াদ অন্তে ফিরিয়া যায়। বধূ সরস্বতী আর মেয়ে সুবর্ণলতার মলের বাজনায় হাসি-ঠাট্টার কলশব্দে গম্ভীর বাড়ীখানার মধ্যে সমস্তটা দিন যেন গানের সুর বহিতে থাকে। কিন্তু রাত্রে আর এক জগৎ—এই পাষাণ গৃহের সে এক অপূর্ব্ব রহস্যময় রূপ!

এক একদিন মাঝরাত্রে ঘুম ভাঙিয়া সুবর্ণলতা অবাক হইয়া থাকে, হঠাৎ এ কোন নূতন দেশে আসিয়া পড়িয়াছে সে। জ্যোৎস্না তেরছা হইয়া মেজেয় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে; শুইয়া শুইয়াই খণ্ড চাঁদের খানিকটা দেখা যায়, খিলান-করা ছাতে কালো ছায়া স্তূপাকারে জমিয়াছে, বিস্তৃত মেহগ্নি খাটের আর এক পাশে ঘুমন্ত সরস্বতীর চুল খুলিয়া গিয়াছে, শিথিল গৌর বাহুর উপর, চুলের রাশির উপর, সাড়ীর চওড়া পাড়ের উপর, এখানে সেখানে টুকরা টুকরা জ্যোৎস্না পড়িয়া সে যেন মায়া-লোকের নূতন বাসিন্দা হইয়া গিয়াছে, দিনের বেলাকার চেনা মানুষ সে বৌদিদি আর নাই। উঠিয়া একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া চারিদিকের সঙ্গে নূতন করিয়া পরিচয় করিতে ইচ্ছা করে। অপূর্ব্ব—অভাবিতপূর্ব্ব সমস্ত; দিনেরবেলাকার কোন কিছুই মেলে না ইহাদের সঙ্গে। নাককাটির খালের জলের মধ্য বগ-বগ করিয়া কত কি যেন এক একবার মাথা চাড়া দিয়া উঠে...জল ছিটাইতে ছিটাইতে মাঝখান দিয়া কি যেন তীর বেগে ছুটিয়া চলে...চাঁদাকাটার ঝাড়ের মধ্য দিয়া ঝির ঝির করিয়া ভাটার জল ঝরিয়া পড়ে। আবার ওদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া ডাকাতের বিলে দেখ, কত অনুপম সুন্দরী তরুণী বিল-ঝাঁঝির মধ্য দিয়া চোখ চাহিয়া রহিয়াছে...হীরার আংটী হাতে সোনার মতো ঝকমকে মুখ কত জমিদারের ছেলে...কত ছোট্ট শিশু জলতল হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ওঠে, মা—মা—মা...কচি মেয়ের পায়ে পায়ে জলতরঙ্গ মল বাজিয়া ওঠে জলে বুদ্বুদ ওঠে, কারা ওখানে নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া নাকানি-চুকানি খাইতেছে। বাদামবনে খড় খড় করিয়া পাতা নড়ে, কারা যেন ঘুরিয়া বেড়ায়, চোখের তারা বাঘের মতো অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়া দিয়া তারা আগাইতেছে।... বনঝোপের মধ্যে অজানা ফুল, শিশির-সিক্ত মাটি, সমস্ত মিলিয়া অদ্ভুত ধরণের এক মাদক গন্ধে সুবর্ণ লতার চোখ আবার ঝিমাইয়া আসে।

সে রাত্রে সরস্বতীর সঙ্গে বড় খাটে শুইয়া ঘুমের মধ্যে সুবর্ণ শুনিতে পাইল, খট-খট করিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া নরহরি চলিলেন। প্রাসাদ-সীমা শেষ হইয়া নরম মাটিতে ঘোড়ার খুর আর বাজে না, তবু তার কানে তালে তালে আরো অনেকক্ষণ ধরিয়া খুরের শব্দ বাজিতে লাগিল। শব্দহীন জগৎ, নির্নিমেষ নক্ষত্রমণ্ডলী, তন্দ্রাচ্ছন্ন রাত্রি—সেই তন্দ্রার রাজ্য বিমথিত করিয়া ঘোড়া দূর হইতে কত দূরে ছুটিয়া চলিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমনোজ বসু

অত্যাশা

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

জীবন যদি যমুনা হ'ত মরি !
শ্যামের বাঁশি রবের তানে তানে
অসীম নীল গগণ বুকে ধরি'
উজান বাহি' চলিত গানে গানে ;
দু'কূল ভরি' ফুটায়ে ফুলে ফুলে
আকুল-পাখা লুটায়ে অলিকুলে
চলিত গাহি' নাচিয়া দুলে দুলে
অমরা-স্মৃতি হৃদয়ে স্মরি' স্মরি'।
উজান বাহি' চলিত গানে গানে
জীবন যদি এমনি হ'ত মরি !

জীবন যদি যমুনা হ'ত মরি'
দু'তীর ছাওয়া শ্যামল বনে বনে
দুলিত লতা তমাল তালী ধরি'
শিহরি যেত দখিণা সমীরণে,
পাখীরা যত গাহিয়া কল-গীতি
সুধার ধারা ঝরায়ে নিতি নিতি
রাখিত ধরি' কেবল সুখ-প্রীতি
দুখেরে যত গোপনে হরি' হরি'।
দু'তীর ছাওয়া শ্যামল বনে বনে
জীবন যদি এমনি হ'ত মরি !

জীবন যদি যমুনা হ'ত মরি !
দু'তীরে মাঠে চরিত যত ধেনু,
বটের ছায়ে উদাসী হিয়া ভরি'
রাখাল হাতে বাজিত মধু বেণু ;
তৃণের বুকে সবুজ হিয়াখানি
দু'চোখে দিত শীতল মায়া টানি',
দু' তীরে হ'ত গোপন কানাকানি
গোধূলি-বেলা যখন যেত সরি'।
রাখাল-হাতে বাজিত মধু বেণু
জীবন যদি এমনি হ'ত মরি !

জীবন যদি যমুনা হ'ত মরি !
মাঘের শেষে জাগাত শিহরিয়া
ফাগুন-বেলা কত যে বল্লরী
ফুলের সাজে কত যে বন-হিয়া।
নিদাঘ-দিনে গাহিয়া কল-গীতি
ছড়ায়ে দিকে আপন প্রাণ-প্রীতি
শীতল করি তৃষিত-হিয়া ক্ষিতি
বহিয়া যেত বেদনা যত হরি'।
ফাগুন-বেলা জাগিত শিহরিয়া
জীবন যদি এমনি হ'ত মরি

জীবন যদি যমুনা হ'ত মরি!
বাদল-দিনে ডাকিত গুরু দেয়া,
ভ্রমর-কালো মেঘেরে বুকে ধরি'
ফুটাত তীরে কদম কম কেয়া;
করবী-বাস মিশায়ে সমীরণে
কবরী-পাশ খুলিয়া শিহরণে
বিরহ-ভাষ জাগাত তনু মনে
বালার কত নয়ন জলে ভরি'।
ফুটিত তীরে কদম কম কেয়া,
জীবন যদি এমনি হ'ত মরি!

জীবন যদি যমুনা হ'ত মরি!
বেলার শেষে আসিত গোপ-বালা,
গাগরি জলে ভাসায়ে দিয়া গোরী
দেখিত কোথা চলে লহরী মালা;
কপোল রাখি আপন করতলে
শুনিত মোর হিয়ার ছল ছলে
মুছিয়া নিয়া নীরব আঁখিজলে
রহিত চাহি' কোন্ যে স্মৃতি স্মরি'।
বেলার শেষে আসিত গোপ-বালা,
জীবন যদি এমনি হ'ত মরি!

জীবন যদি যমুনা হ'ত মরি!
শ্যামের বাঁশি-রবের তানে তানে
অসীম নীল গগন বুকে ধরি'
উজান বাহি' চলিত গানে গানে;
দু'কূল ভরি' ফুটায়ে ফুলে ফুলে
আকুল-পাখা লুটায়ে অলিকুলে
চলিত গাহি' নাচিয়া দুলে দুলে
অমরা-স্মৃতি হৃদয়ে স্মরি' স্মরি'।
উজান বাহি চলিত গানে গানে
(আহা) জীবন যদি এমনি হ'ত মরি!

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

অভিজ্ঞান

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১৪

প্রত্যেক মানুষের অন্তরের মধ্যে এমন একটা-না-একটা অবলম্বনের বস্তু থাকেই যার সন্ধান খুঁজে বার করতে পারলে সুখে-দুঃখে সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থাতেই তার মধ্যে সে আশ্রয় লাভ করতে সমর্থ হয়। কতকটা সমুদ্র উপকূলের বন্দরের মত,—সুখের দিনে মৃদু-মন্দ সমীরণে সেখান থেকে সমুদ্রের মধ্যে পাড়ি জমানোও চলে, আবার ঝড়-ঝাপটার দিনে তার আশ্রয়ে ফিরে এসে নোঙ্গর ফেলে আত্মরক্ষা করাও সম্ভবপর হয়। সেই অবলম্বনের বস্তু কারো জীবনে সাহিত্য, কারো জীবনে শিল্প, কারো জীবনে ধর্ম্ম। সন্ধ্যার জীবনে হয় ত তা সঙ্গীত, সে কথা যেন সে সেদিন লাউঞ্জ ঘরে গান গাইতে গাইতে সহসা কোন্ এক মুহূর্ত্তে উপলব্ধি ক'রে বস্‌ল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে গান হ'য়ে উঠ্‌ল সজীব,—তার সুরের অপরূপ ব্যঞ্জনার মধ্যে আশ্রয় লাভ ক'রে বিগত দুঃখময় জীবনের সকল গ্লানি সকল বেদনা ফিকে হ'য়ে এল। প্রত্যেকটি গান, প্রত্যেকটি রাগিণী যেন নব নব চেতনার প্রকাশ, সুখ-দুঃখের মিশ্রণের উদাস বৈরাগ্যে স্তিমিত।

বিমুগ্ধ বিস্ময়াবিষ্ট শ্রোতা দুটিও সঙ্গীতের এই অনন্য-সুলভ স্পর্শ লাভ ক'রে আত্মহারা হ'য়ে গিয়েছিল। একটির পর আর একটি ক'রে দশ বারো খানা গানের মধ্য দিয়ে কখন যে রাত দশটা বেজে গিয়েছিল তা কেউ যেন বুঝ্‌তেই পারেনি। একটা গানের শেষে সন্ধ্যা যখন হারমোনিয়মের ডালা বন্ধ ক'রে মৃদুস্বরে বল্‌লে, আজ আর থাক্, তখন তাকে আর গাইবার জন্যে কেউ অনুরোধ করতে পারলে না। ও জিনিষ শেষ হওয়ার পর আর ফরমায়েস চলে না, উপরোধ অনুরোধের দ্বারা তার মেয়াদ বাড়ানো যায় না। সে ত' শুধু গানই নয়, সে যেন কতকগুলা সুরকে আশ্রয় ক'রে একটা অবরুদ্ধ জমাট ক্ষোভের বিমুক্তি,—গানের ভাষায় সে যেন প্রাণের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী!

সন্ধ্যার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে সবিতা বল্‌লে, "কি চমৎকার গাস্‌রে তুই সন্ধ্যা! কি অদ্ভুত তোর গলা!"

সন্ধ্যার তখন চোখ ফেটে অশ্রুপাত হবার উপক্রম হয়েছিল, কোনো রকমে একটা হাসির দ্বারা সবিতার কথার উত্তর দিয়ে সে আসন ত্যাগ ক'রে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দুঃখার্ত্ত কণ্ঠে সবিতা বল্‌লে, "এমন রূপ, এত গুণ, কিন্তু অদৃষ্টে কি আছে কে জানে! হয়ত' কিছুই কাজে আসবে না, সবই অসার্থক হবে।"

প্রকাশ বল্‌লে,"মানুষের জীবন কিসে সার্থক হয়, অথবা হয় না, আগে থাক্‌তে কিছুই বলা যায় না সব্। কোনো জিনিষকে রূপ দিয়ে সার্থক করতে হ'লে আঘাত তার একটা প্রধান উপায়। যত মর্ম্মরমূর্ত্তি দেখে মুগ্ধ হয়েচ সবগুলিরই উপরে ছেনি আর হাতুড়ির নির্ম্মম আঘাত পড়েছে। রূপ দেবার জন্যে আমাদের কারখানায় আগুন আর আঘাতের কি ভীষণ রুদ্রলীলা চলে দেখেছ ত। সন্ধ্যার মনের উপর এই যে প্রচণ্ড আঘাত পড়েছে, এর জন্যে তার জীবন অসার্থক হবে এ কথা জোর ক'রে বলা চলে না,—হয়ত তার মনের উপর এই হাতুড়ির আঘাত তার জীবনকে সার্থকতারই দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।"

মতভেদের শিরশ্চালনা ক'রে সবিতা বল্‌লে, "তা কি ক'রে হবে? স্বামীর আশ্রয় হারিয়ে ওর জীবন সার্থক হ'তেই পারে না।" দাম্পত্য গণ্ডীর বাইরে নারী-জীবনের যে কোথাও সার্থকতা থাক্‌তে পারে এ কথা সবিতা বিশ্বাসই করে না। বল্‌লে, "বিয়ে হয়ে গেলে মেয়েদের স্বামীর ঘর ছাড়া আর উপায় নেই।"

প্রকাশ বল্‌লে, "কিন্তু মীরার কথা ভেবে দেখ। জীবনকে সফল করবার জন্যে তাকে স্বামীর ঘরই ছাড়তে হয়েছিল।"

"স্বামীর ঘর নয়,—শ্বশুরের ঘর।"

প্রকাশ বল্‌লে, "সে একই কথা। তা ছাড়া, এ ক্ষেত্রেও শ্বশুরেরই ঘর।"

স্বামীর এই দুর্ব্বল যুক্তিতেই তর্কের একটা দিক পরিত্যাগ ক'রে সবিতা বল্‌লে "বেশ তা যেন হল। কিন্তু শুধু শুধু ত' আর জীবন সার্থক হবে না, একটা কিছু অবলম্বন ত' চাই।" তারপর একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ায় স্মিতমুখে বল্‌লে, "কি ? গান দিয়ে না-কি ?"

মৃদু হেসে প্রকাশ বল্‌লে, "অসম্ভব কি ? গান ত' আর সামান্য জিনিষ নয়। আমাদের শাস্ত্রে বলে, গানাৎ পরতরং নহি।"

প্রকাশের এই একান্ত অযৌক্তিক প্রসঙ্গটাকে চাপা দেবার উদ্দেশ্যে সবিতা বল্‌লে, "আচ্ছা, সে হল অনেক দূরের কথা। আপাতত আজ গান গেয়ে বেচারা যেন সত্যিই একটু তৃপ্তি পেয়েছে। কি আগ্রহ ভরে গান গাচ্ছিল দেখলে ? মনে হচ্ছিল প্রত্যেক গান দিয়ে যেন ওর দুঃখের বোঝা একটু একটু করে হাল্কা হ'য়ে যাচ্ছে। শেষকালে প্রায় কেঁদে ফেলবার উপক্রম করেছিল; দেখেছিলে ?"

প্রকাশ বল্‌লে, "দেখেছিলাম। ওটা শুভ লক্ষণ। বর্ষণের দ্বারা আকাশ আর মন দুই-ই পরিষ্কার হয়।"

সবিতা বল্‌লে, "রোজ সন্ধ্যাবেলা ওকে একটু করে গানে বসালে হয়,—গান গেয়ে তবু যদি নিজেকে খানিকটা ভোলাতে পারে।"

প্রকাশ প্রফুল্লমুখে বল্‌লে, "বেশত, বসালেই হবে,—তাতে আমাদের নিজের লাভও ত' নিতান্ত কম হবে না।"

এই পরামর্শ অনুযায়ী প্রত্যহ সন্ধ্যা বেলা খুব উৎসাহ ভরে সন্ধ্যার গান-বাজনা চল্‌ল। প্রথম কয়েকদিন এ বিষয়ে সবিতার যথেষ্ট উৎসাহ দেখা গিয়েছিল, কিন্তু যখন সে দেখলে যে গানের দ্বারা সন্ধ্যা নিজেকে কতটা ভোলাতে পেরেছে সে বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু তার স্বামীকে যে বিশেষ রূপে ভুলিয়েছে তা নিঃসন্দেহ, তখন থেকে তার উৎসাহ দ্রুত গতিতে ক'মে আস্‌তে লাগল। গান শোনবার আগ্রহে প্রকাশ বৈকালে বেড়ানো ছেড়ে দিয়েছে, রাত্রে বই পড়া কমিয়ে দিয়েছে, ছুটির দিনে এক মাত্র গান শোনা ছাড়া আর সব-কিছুকেই ছুটি দিতে পারলে ভাল হয় এম্‌নি মতলব্। সন্ধ্যা যখন গান গায় তখন প্রকাশ এমন বিভোর হ'য়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে যে, দাম্পত্য জীবনের আদিতম যুগেও কোনও আবেগ-মদির মুহূর্ত্তে সে এমনি ক'রে সবিতার মুখের দিকে তাকিয়েছিল ব'লে মনে পড়ে না। সন্ধ্যার গানের প্রতি প্রকাশের এই অনির্ব্বেয় আসক্তির মধ্যে সবিতা বিপদের রক্তপতাকা দেখ্‌তে পেলে। এ বিষয়ে অগ্নি ও ঘৃতের প্রাচীন উপদেশ মনে পড়ল। মনে মনে স্থির কর্‌লে এ বিপদ থেকে অচিরে উদ্ধার পেতেই হবে; সহজে যদি হয় ত ভালই, নচেৎ যেন তেন প্রকারেণ।

সন্ধ্যা তার মাসতুত বোন সত্য, কিন্তু স্বামীর ক্ষেত্রে সবিতা এতই শক্ত যে, সন্ধ্যা সহোদরা বোন হ'লেও সে কিছুমাত্র ইতস্তত: করত না। যে মহলে প্রজাবিলি চলে না সেখানে অপর ব্যক্তির প্রবেশ মানেই বেদখল হওয়া, এবং বেদখল হওয়ার আশঙ্কায় সতর্ক দৃষ্টিকে নিন্দুক ব্যক্তিরা যদি ঈর্ষা অভিহিত করে ত করুক,—তা'তে সবিতার চক্ষুলজ্জা নেই।

প্রকাশ তখন অফিসে। সন্ধ্যা নিজের ঘরে শয্যার উপর শয়ন ক'রে বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিল, সবিতা এসে প্রবেশ করলে।

সবিতাকে দেখে সন্ধ্যা শয্যার উপর উঠে বস্‌ল। সন্ধ্যার পালঙ্কের নিকট একটা চেয়ার টেনে নিয়ে উপবেশন ক'রে সবিতা বল্‌লে, "কি বই পড়ছিলি রে সন্ধ্যা ? উপন্যাস না কি ?" তারপর বইখানা টেনে নিয়ে খুলে দেখে বল্‌লে, "কবিতার বই। ভাল ?"

"মন্দ না।"

"কোথায় পেলি ?"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "মুখুজ্জ্যে মশায়ের টেবিলে ছিল, সেখান থেকে নিয়ে এসেছি।"

দুই একটা অবান্তর কথার পর সবিতা আসল কথা উত্থাপিত করলে; বল্‌লে, "তোর বিষয়ে একটা ভাল রকম পরামর্শের দরকার হয়েচে সন্ধ্যা।"

সবিতার প্রতি উৎসুক জিজ্ঞাসু দৃষ্টি স্থাপিত ক'রে সন্ধ্যা বল্‌লে, "কি পরামর্শ সবি দিদি?"

মনে মনে একটু চিন্তা ক'রে নিয়ে সবিতা বল্‌লে, "তোর শ্বশুরকে আর মেসোমশাইকে উনি কত ভাল ক'রে বড় বড় চিঠি লিখ্‌লেন, তার উত্তর যা এল তা'ত জানিস্। তুই এখানে আমাদের কাছে আছিস সেই ভরসায় উভয় পক্ষেই একটু ভেবে-চিন্তে কাজ করবার সুবিধে পেয়েছেন। হঠাৎ ওঁদের মধ্যে কেউ এসে তোকে নিয়ে যাবেন, তা মনে হয় না। আমার মনে হয়, তুই যদি একেবারে হুড়মুড় ক'রে সেখানে গিয়ে পড়িস, তা হ'লে তোকে কখনই ফেরাতে পারবেন না।"

একটু চুপ ক'রে থেকে ইতস্ততঃ সহকারে সন্ধ্যা বল্‌লে, "কিন্তু ও-রকম চিঠি পাওয়ার পর আর কি তাঁদের দোরে গিয়ে দাঁড়ানো চলে সবিদিদি?"

একটু দৃঢ়স্বরে সবিতা বল্‌লে, "চলে। ও তোদের আজকালকার মেয়েদের বাজে সেন্টিমেণ্ট শিকেয় তুলে রাখ্ সন্ধ্যা। অভিমান যদি করতে হয় ত' নিজের জায়গায় কায়েম হ'য়ে ব'সে তার পর করিস্, এখন যেমন ক'রে পারিস্ দিন কিনে নে। পরের উপর রাগ ক'রে নিজের চিরদিনকার আশ্রয়ের পথ চিরদিনের মতো বন্ধ করিস্‌নে!"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "কিন্তু তাঁরা যদি আমাকে স্থান না দেন? আশ্রয় যদি না পাই?—"

সবিতা ব্যস্ত হ'য়ে মাথা নেড়ে বল্‌লে, "তাঁরা ত স্থান দিচ্ছেনই না। আশ্রয় তোকে যেরকম ক'রে হোক ক'রে নিতে হবে। সাধ্য সাধনা ক'রে, মাথামুড় খুঁড়ে, তাঁদের পা জড়িয়ে ধ'রে সেখানকার মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকবি। এতে যদি আত্মসম্মানের হানি হয় ত' এ ছাড়া যা করবি তা'তে এর শত গুণ হানি, তা জেনে রাখিস্। একথা কখনও ভুলিস্‌নে সন্ধ্যা,—স্বামীর আশ্রয় ছাড়া সধবা মেয়েমানুষের আর দ্বিতীয় আশ্রয় নেই।"

অন্ততঃ কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্বামীর আশ্রয়ের প্রতি সন্ধ্যার শ্রদ্ধার এবং লোভের অন্ত ছিল না। এখনো যে একেবারে নেই তা নয়, কিন্তু ঘটনার জটিলতায় অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে অনেক প্রশ্নই মনের মধ্যে আজকাল উদয় হয়, প্রাচীন সংস্কারের জীর্ণ অট্টালিকা যেন সময়ে সময়ে ন'ড়ে ওঠে, তবুও সে-সব নিয়ে এখন আলোচনা করতে প্রবৃত্তি হ'ল না; জিজ্ঞাসা করলে, "মুখুজ্যে মশাইয়েরও কি এই মত?"

সবিতা বল্‌লে, "হাজার হোক তিনি পুরুষমানুষ, তাঁদের মতের সঙ্গে আমাদের মেয়েদের মত সব সময়েই যে এক হ'তে হবে এর কোনো মানে নেই সন্ধ্যা। আমাদের শুভাশুভ আমরা যতটা বুঝব তাঁরা ততটা কখনই বুঝবেন না—হয়ত' একটা সাধারণ উদার নীতির দোহাই দিয়ে সমস্ত জিনিসটার ভুল বিচার ক'রে বসবেন। হয় ত বল্‌বেন, কেন? কি এমন তাড়া পড়েছে যে আশ্রয় ভিক্ষের জন্যে ছুটতেই হবে এখন কলকাতায়? থাক্‌না ও আমাদের কাছে, যতদিন না ওরা নিজে এসে ওকে নিয়ে যায়। এমন কথা ত' আমিও প্রথম দিন আকস্মিক দুঃখের মুখে বলেছিলাম, কিন্তু মনে মনে তখন একথাও জানতাম যে, আদতে ওটা প্রবোধ বাক্য, ওতে তোর প্রকৃত মঙ্গল নেই।"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "আজকালের মধ্যে এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে মুখুজ্যেমশাইয়ের কোনো কথা হয়েচে কি সবিদিদি?"

সবিতা বল্‌লে, "না, তা হয়নি। আমি প্রথমে তোর সঙ্গেই পরামর্শটা ক'রে নিতে চাইছিলাম। তবে আমার মনে হয়, কথা উঠলে তিনি আমার মতেই মত দেবেন, কারণ এ কথা নিশ্চয় যে, বেশীদিন এ রকম ছাড়াছাড়ি থাকার ফলে চক্ষুলজ্জাটা ক্রমশঃ কেটে গেলে তখন হয়ত তাঁরা আর সহজে তোকে ফিরে নিতে চাইবেন না। তা ছাড়া, আর একটা কথা আমি তোর মঙ্গলের জন্যে খুব স্পষ্ট ক'রেই বল্‌ছি, তুই অন্য কোনো রকমই কিছু মনে করিসনে ভাই। আমার এ বাড়ীও তোর পক্ষে পুরোপুরি পাকা আশ্রয় নয়। এ সংসারে একমাত্র স্ত্রীলোক আমি;

আমার সঙ্গে একত্রে তুই যতদিন ইচ্ছে থাক্‌তে পারিস, কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু জীবনের কথা ত কিছু বলা যায় না ভাই, ধর, হঠাৎ যদি ম'রেই গেলাম,—সে কথা ছেড়ে দিলেও, বাপের বাড়ীও ত দু-চার মাসের জন্যে মাঝে মাঝে যেতে পারি,—তখন তোর একা এ বাড়িতে ওঁর সঙ্গে থাকা চল্‌বে কি ? আমি তোর বোন, কিন্তু উনি ত' সত্যিসত্যিই তোর ভাই নন্।"

বিচার-বিবেচনার দিক থেকে দেখলে সবিতার কথার মধ্যে হয় ত রূঢ় কিছুই ছিল না, কিন্তু তবু একটা কোন্ অনির্ণেয় কারণে আঘাত পেয়ে সন্ধ্যার দুই চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন হ'য়ে এল। তাড়াতাড়ি বস্ত্রাঞ্চলে চোখ মুছে ফেলে বল্‌লে, "আমার নিজের মত যাই হোক না কেন সবিদিদি, তোমার উপদেশেই আমি চল্‌ব। তুমি আমার আপনার জন, বয়সে বড়, তুমি যা আদেশ করবে আমার পক্ষে নিশ্চয়ই তা শুভ হবে,—কলকাতায় আমি যাব। অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় তোমরা আমাকে আশ্রয় দিয়েছ,—তোমার স্নেহের কথা, মুখুজ্যে মশাইয়ের দয়ার কথা জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আমার অন্ধকার মনের একটা দিক্ আলো ক'রে থাকবে। কিন্তু আমার অন্তরের একটা অকপট কথা শোনার পরও যদি আমাকে ক্ষমা করো তা হ'লে আমি বলি যে, তোমাদের এ আশ্রয়ও আমি ঠিক সহ্য করতে পারছিনে, এর মধ্যে আমি কিছুতেই সহজ হ'তে পারছিনে, এ-কে ছেড়ে যাবার জন্যে মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছি। এ যে কেন, তা হয়ত আমি তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব না, এ আমারই কাছে আমার মনের এক অদ্ভুত আচরণ! কিন্তু একে অকৃতজ্ঞতা ব'লে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও ভুল কোরো না সবিদিদি, এ অপরিসীম কৃতজ্ঞতারই একটা রূপ। অযাচিত দানের ঋণ বাড়িয়ে চল্‌বার ক্ষমতা হয়ত আমার নেই, এ হয়ত তাই!" সহসা সন্ধ্যার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হ'য়ে এল, দুই চক্ষু হ'তে ঝর ঝর ক'রে এক রাশ অশ্রু ঝ'রে পড়ল।

চেয়ার থেকে উঠে এসে সন্ধ্যার পাশে ব'সে তাকে জড়িয়ে ধ'রে সবিতা দুঃখার্দ্র কণ্ঠে বল্‌লে, "আমি তোকে কষ্ট দিয়েছি সন্ধ্যা, আমাকে তুই ক্ষমা কর।"

অঞ্চলে চক্ষু মার্জ্জিত ক'রে সন্ধ্যা বল্‌লে, "না সবি দিদি, তুমি সহানুভূতি দিয়ে আমার মনকে আলগা ক'রে দিয়েছ, তাই কাঁদছি। তুমি আমাকে কষ্ট দাও নি।"

আত্মরক্ষার্থে অথবা পরোপকারার্থে, যত সাধু উদ্দেশ্যেই হ'ক না কেন, সন্ধ্যাকে গৃহচ্যুত করবার প্রস্তাবের নির্ম্মমতা সবিতাকে একটু পীড়িত করছিল। তাই, যে ভাবেই হোক, তার অভিপ্রায়ের সহিত সন্ধ্যার অভিপ্রায়ের একটা কোনো ঐক্য খুঁজে পাওয়া গেলে মনটা অনেকটা হালকা হ'তে পারে সেই আশায় সবিতা জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা সন্ধ্যা, তুই যে বলছিলি আমাদের বাড়ি ছেড়ে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিস্, তাহ'লে তার মানেই ত' শ্বশুরবাড়ি যাবার জন্যেই তুই ব্যস্ত হয়েছিস ?"

একটু কি চিন্তা ক'রে সন্ধ্যা বললে, "না, তা ঠিক নয় সবিদিদি। আমি ব্যস্ত হ'লে কি হবে, তাঁরা যদি ব্যস্ত না হন। খাওয়া পরাটা কোনো রকমে চ'লে যেতে পারে এরকম একটা সামান্য লেখাপড়া বা গান শেখানোর কাজের জন্যে আমি মুখুজ্জেমশাইকে কয়েকবার অনুরোধ করেছি। তাঁর কথা থেকে মনে হয় সে-রকম একটা কাজ-কর্ম্ম আমাকে জুটিয়ে দেওয়া তাঁর পক্ষে খুব কঠিন নয়। তা যদি দিতেন তা হ'লে যেখানে হোক থাকবার একটা জায়গা হয়ত ক'রে নিতে পারতাম। কিন্তু সেইখানেই তাঁর আপত্তি। তা নইলে মেয়েদের স্কুলে বোধ হয় একটা কিছু সুবিধে হ'তেও পারত।"

"কিন্তু কোন্‌খানে তাঁর আপত্তি তা ত' ঠিক বুঝতে পারলাম না সন্ধ্যা? এ বাড়ি ছেড়ে তোর অন্য জায়গায় যাওয়াতেই কি তাঁর আপত্তি ?"

সন্ধ্যা বললে, "হ্যাঁ, তাই। মুখুজ্জেমশাই বলেন, জামসেদপুরে এ বাড়ি ছাড়া আমার অন্যকোনো জায়গায় থাকা হ'তেই পারে না।"

সংশয়ের অন্ধকার মনের মধ্যে আবার একটু ঘনিয়ে এল। বেদনায় করুণায় যে মন শিথিল হয়ে এসেছিল, আবার তা সঙ্কুচিত হ'তে আরম্ভ করলে। ঈষৎ অসরস কণ্ঠে সবিতা বল্‌লে, "জামশেদপুর ছেড়ে অন্য জায়গায়

যাওয়াতেও তোর মুখুজ্যেমশাইয়ের আপত্তি আছে না-কি? কলকাতা যাওয়ায়?"

কি ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে সন্ধ্যা বল্‌লে, "তা আছে কি-না, তা ঠিক জানিনে।' পরমুহূর্ত্তে নিজের অসতর্ক কথার সঠিক অর্থ উপলব্ধি ক'রে সবিতার প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে তাড়াতাড়ি বল্‌লে, "তা নিশ্চয়ই নেই,—তা কেন থাক্‌বে?"

"তা হ'লে তোর কল্‌কাতা যাওয়ার কথা তাঁকে বল্‌ব?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয় বল্‌বে। আজই বোলো,—আর, যত শীঘ্র যাওয়ার ব্যবস্থা হয় তা কোরো। তোমার সুপরামর্শে আবার আমার মনকে জাগিয়ে দিয়েছ সবিদিদি!"

প্রসন্নকণ্ঠে সবিতা বল্‌লে, "সেখানে গিয়ে তোর নিজের অধিকারের জায়গা জোর ক'রে দখল করবি; কিছুতে ছাড়বিনে। নিজে শক্ত না হ'লে কেউ সহজ হবে না। জীবনের এত বড় গুরুতর ব্যাপার নিয়ে ভালোমানুষি ক'রে কোনো লাভ নেই সন্ধ্যা,—চিরজীবন তার ফলে দুঃখের বোঝা বইতে হবে।"

"কবে তা হ'লে আমার কলকাতা যাওয়া হবে সবিদিদি?"

"দিন দুই পরে অফিসের কাজে ওঁর তিন চার দিনের জন্যে কলকাতায় যাবার দরকার আছে, সেই সঙ্গে তুই যেতে পারবি।"

সন্ধ্যা ঘাড় নেড়ে বল্‌লে, "আচ্ছা।"

সেই দিন রাত্রেই আহারের পর শয়ন কক্ষে প্রবেশ ক'রে সবিতা কথাটা প্রকাশের কাছে উত্থাপন করলে। সমস্ত কথা ধীরভাবে শুনে প্রকাশ বল্‌লে, "এ পরামর্শ যে ভাল নয়, তা বলছিনে, কিন্তু এতে সন্ধ্যা সত্যিসত্যিই রাজি হয়েছে ত?"

"তার মানে?"

"তার মানে, চক্ষু লজ্জায় প'ড়ে শুধু মুখের কথায় রাজি হয়েছে কি-না তাই জান্‌তে চাইছি। এর মধ্যে একটা একটু সূক্ষ্ম কথা আছে সবু। তোমার বাড়ীতে যদি কোনো লোক কতকটা আশ্রিতরূপে বাস করে, যার মনে আত্মসম্মান জ্ঞানের অভাব নেই, তার কাছে যদি তুমি এমন কোনো প্রস্তাব কর যেটা পালন করলে তোমার বাড়ী ত্যাগ ক'রে তাকে যেতেই হয়, তা হ'লে সে প্রস্তাবে অস্বীকৃত হওয়া তার পক্ষে একটু কঠিন।"

প্রকাশের কথা শুনে সবিতা অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠ্‌ল; একটু তীব্রকণ্ঠে বল্‌লে, "কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ যে, সন্ধ্যা আমার একেবারে পর নয়, সে আমার বোন; তার মঙ্গলের জন্যে তাকে যেমন আমি বাড়িতে আশ্রয় দিতে পারি, তেম্‌নি বাড়ি ছাড়া করতেও পারি।"

প্রকাশ বল্‌লে, "তুমিও ভুলে যাচ্ছ যে, সন্ধ্যা আমারও একেবারে পর নয়, সে আমার শ্যালী, সুতরাং তার নিজের আন্তরিক ইচ্ছার অভাবে তাকে বাড়ি ছাড়া করতে আমার মনের মধ্যে আপত্তি হ'তে পারে।"

সবিতা একেবারে উষ্ণ হয়ে উঠ্‌ল, বললে, "তবে কি তুমি বল্‌তে চাও যে, চিরকালই সে তোমার ভাত কাপড়ে মানুষ হ'য়ে তোমাকে গান শুনিয়ে এখানে প'ড়ে থাক্‌বে?—আর তা হ'লেই তার জীবন সার্থক হবে?"

প্রকাশ বল্‌লে, "না, তা আমি বল্‌তে চাইনে। কিন্তু এ কথাও বল্‌তে চাইনে যে, কলকাতায় তাকে নিয়ে গিয়ে বাড়ি বাড়ি অপমানিত করিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এলেই তার জীবন সার্থক হবে।"

সবিতা সজোরে গর্জ্জন করে উঠ্‌ল, "ফিরিয়ে তুমি তাকে আনবে না!"

প্রকাশ বিস্মিত নেত্রে ক্ষণকাল সবিতার দিকে চেয়ে থেকে বল্‌লে, "কিন্তু ওর বাপ-শ্বশুরের মধ্যে কেউ যদি ওকে না নেয় ত' কোথায় ওকে রেখে আসব?"

"যেখেনে হয় সেখেনে। কোথাও না হয়, পথে। ওর বাপ-শ্বশুরেরা যদি ওর ভার না নেয় ত' তোমারই কি এমন মাথাবাথা পড়েছে শুনি?"

"কিন্তু, আমি যদি ঠিক ওর বাপ-শ্বশুরের শ্রেণীর লোক না হই সবিতা?"

"না, না, তুমি নিজেকে অত অসাধারণ ব'লে মনে

কোরো না! তোমারও সমাজ আছে, সংসার আছে,—শুধু তাদেরই নেই!"

আলোচনাটা কলহে রূপান্তরিত হয়ে আস্‌ছে দেখে প্রকাশ বল্‌লে, "রাত অনেক হয়েছে, এখন এস শুয়ে পড়া যাক্। কাল সকালে উঠে যখন দেখা যাবে যে, বিশ্রাম কোরে দুজনেরই বুদ্ধি পরিষ্কার হয়েচে, তখন আবার পরামর্শটা ভাল ক'রে চালানো যাবে। তখন মীমাংসা হ'তেও বিলম্ব হবে না।"

সকালে উঠে সত্যই দেখা গেল, গতরাত্রের কলহটা দাম্পত্য কলহের পরিণতিই লাভ করেছে। ফলে স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের অভিমত দ্রুতগতিতে নিকটবর্ত্তী হ'য়ে আস্‌তে লাগ্‌ল এবং অচিরকালের মধ্যে স্থির হ'য়ে গেল যে, সন্ধ্যার কলিকাতা যাওয়াটাই সর্ব্বতোভাবে যুক্তিযুক্ত।

তিন দিন পরে রাত্রি এগারটার সময়ে প্রকাশ ও সন্ধ্যা নাগপুর প্যাসেঞ্জারের একটা প্রথম শ্রেণীর কামরা অধিকার ক'রে বস্‌ল। সে কামরায় অন্য কোনো আরোহী ছিল না।

গাড়ী ছাড়লে প্রকাশ বল্‌লে, "সন্ধ্যা, কাল সকালে ত' রীতিমত যুদ্ধং দেহির মতো একটা ব্যাপার আছে। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়, বিশ্রাম নিয়ে কালকের জন্যে প্রস্তুত হ'তে হবে।"

উত্তরে সন্ধ্যা কিছু বললে না, শুধু একটু হাস্‌লে। মন তার তখন সেই অবস্থায় যেখানে ভাল-মন্দ সুখ-দুঃখ উৎসাহ-আলস্যের সব অনুভূতি আসন্ন অনিশ্চিতের প্রত্যাশায় স্তব্ধ হয়ে থাকে। বাহিরের গাঢ়নিবদ্ধ তমিস্রের প্রতি আর একবার দৃষ্টিপাত ক'রে সে শুয়ে পড়ল।

প্রত্যুষে যখন ঘুম ভাঙল তখন গাড়ি কোলাঘাট ষ্টেশন ছাড়িয়ে রূপনারায়ণের পুলের উপর দিয়ে গভীর শব্দ করতে করতে চলেছে।

প্রকাশ বল্‌লে, "রাত্রে ঘুম হয়েছিল সন্ধ্যা?"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "একরকম হয়েছিল।"

"প্রথমে কোথায় যাবে? শ্বশুর বাড়ীতে, না বাপের বাড়ীতে?"

"আপনি কোথায় বলেন?"

"আমি বলি, প্রথমে মেসোমশায়ের বাড়ি যাওয়াই ভাল।"

এক মুহূর্ত্ত কি চিন্তা ক'রে সন্ধ্যা বল্‌লে, "তবে তাই।"

হাওড়া ষ্টেশনে পৌছে একটা ট্যাক্সি ভাড়া ক'রে প্রকাশ যখন সন্ধ্যাকে নিয়ে তার পিত্রালয়ের সম্মুখে এসে উপস্থিত হ'ল তখন বেলা সাড়ে সাতটা।

(ক্রমশঃ)

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা

শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র এম্‌-এ, ডি-লিট্

১

রবীন্দ্র-সাহিত্যের উদ্ভব-ক্ষেত্র ও পারিপার্শ্বিক

ফরাসী দেশে রবীন্দ্র-দর্শন সম্বন্ধে আলোচনার প্রস্তাবে প্রথমেই কিছু বাধা অতিক্রম করতে হ'য়েছিল; তার কারণ কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের জগৎ-জোড়া খ্যাতির জয়োল্লাসের মধ্যে তাঁর অন্য কীর্ত্তির জয়গান অতি ক্ষীণ স্বরে শোনা যায়। তাই অনেকেই ভুল ধারণা করে বসেন যে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একমাত্র আলোচনার বিষয় বুঝি তাঁর কবিতা। রবীন্দ্রদর্শন সম্বন্ধে যিনিই আলোচনা কর্‌তে চাইবেন, পাঠকের সন্দেহসূচক শিরশ্চালনা প্রথমেই তাঁকে সইতে হ'বে,—দমে গেলে চলবে না। সেজন্য আমরা আমাদের আলোচনার আরম্ভেই পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রায় অর্দ্ধেকের বেশি রচিত হ'য়েছে, ছন্দে নয় গদ্যে; তারও আবার বিষয়-বস্তু যতদূর সম্ভব বিচিত্র,—যেমন, ইতিহাস, শিল্প, ধর্ম্ম, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সাহিত্য-সমালোচনা, শব্দতত্ত্ব ইত্যাদি—অসংখ্য গল্প, উপন্যাস নাটকের কথা ত ছেড়েই দিলাম। এখানে আমরা কি গদ্য, কি পদ্য রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনাই আলোচনা করতে চাই সমগ্রভাবে, তাদের পরস্পরের সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে,—বিচ্ছিন্নভাবে কোনো রচনারই আলোচনা করার ইচ্ছা আমাদের নেই। আমাদের উদ্দেশ্য সমগ্রভাবে রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রধান ও গভীর সুরটি ফুটিয়ে তোলা,—যাতে ক'রে এমন বিচিত্র রচনাবলীর যে প্রাণ, অর্থাৎ যে আদর্শ চিত্ত তাদের অনুপ্রাণিত করেছে, সেই চিত্তের কিছু সাক্ষাৎ পরিচয় পাওয়া যায়। সে চিত্ত একদিকে যেমন সত্যের মধ্যে গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে সমৃদ্ধ, অন্যদিকে তেমনি প্রেমের মধ্যে সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে মিলনে ও সঙ্গতিতে কমনীয়।

তাছাড়া 'কাব্যে'র যদি সর্ব্বোচ্চ সংজ্ঞাটি ধরা যায় এবং 'দর্শন' কথাটির একটা সঙ্কীর্ণ অর্থ না ক'রে, তার ব্যাপক অর্থে যদি তাকে গ্রহণ করা যায়,—তা'হলে কাব্য ও দর্শনের মধ্যে একটা সুপরিস্ফুট সীমানা নির্দ্দেশ করা সম্ভব বলে আমাদের মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে 'দর্শন' কথাটা কতকগুলি তত্ত্বের সমষ্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়;—স্থূলজগৎ, সূক্ষ্মজগৎ, মনোরাজ্য, জ্ঞানাহরণের প্রক্রিয়া ইত্যাদি সম্বন্ধে গবেষণা করে যে-সব তথ্য ও তত্ত্ব আমরা সংগ্রহ করি,—দর্শন কথাটি সে সমস্তই অতিক্রম করে আরও কিছু বোঝায়। একথা বললে মোটেই অসঙ্গত হ'বে না—যে 'দর্শন' মানে মানুষের মনের মধ্যে সেই চিন্তা-প্রবাহ যার উদ্ভব মানুষের সঙ্গে বিশ্বের সম্বন্ধ থেকে,—যা' মানুষকে তার জীবন-পথে পরিচালিত করে,—এবং সুদূরদৃষ্টি দিয়ে যা' কতকটা পরিমাণে মানুষকে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের শক্তি ও স্বাধীনতা দেয়। এককথায় যে-বিশ্ব মানুষের সমস্ত জ্ঞান, অনুভূতি ও আকাঙ্খার উৎস, সেই বিশ্বের প্রতি মানব-চিত্তের প্রতিক্রিয়ার সমষ্টিই 'দর্শন'।

তা-ই যদি হয়,—তবে কাব্যই বা এই প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কি? তবে যে-চিত্তের প্রতিক্রিয়া থেকে কাব্যের উদ্ভব,—তা' কবি-চিত্ত,—অর্থাৎ সাধারণ মানুষের চেয়ে তাঁর দৃষ্টি অনেক বেশি তীক্ষ্ণ, আবেগ অনেক বেশী গভীর, অনুভূতি অনেক বেশি উদার, আকাঙ্ক্ষা অনেক বেশি তীব্র। প্রকৃতপক্ষে কোনো লেখকের কাব্য আলোচনা গভীর ভাবে করতে হ'লে তার অন্তর্নিহিত দার্শনিক চিন্তাকে উপেক্ষা করা চলে না। ওয়ার্ডসওয়ার্থ বা ভিক্টর হিউগোর কাব্য আলোচনা কি সম্ভব,—তাঁদের দার্শনিক চিন্তাধারাকে বাদ দিয়ে? কবির কাব্যই বল, আর দার্শনিকের চিন্তাই বল,—দুটোরই উৎস ব্যক্তিগত জীবনের নিবিড় অনুভূতিগুলির মধ্যে; আর

সেইগুলোরই আমাদের সন্ধান করতে হবে এবং পর্য্যবেক্ষণ করতে হ'বে,—তাদের পারিপার্শ্বিক ও উদ্ভবক্ষেত্রের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচার করে।

অতএব একথা স্পষ্টই স্বীকার্য্য যে কাব্যই আলোচনা করি, কিম্বা দর্শনই আলোচনা করি, রবীন্দ্রনাথকে সম্যক্ বুঝতে হ'লে প্রথমেই প্রয়োজন ভারতবর্ষের চিত্তের গভীর গহনের মধ্যে আলোক-সম্পাত করা, যেন তার ভিতরকার প্রেরণাটি,—যা' অন্তরতম তল থেকে তার সমস্ত আকাঙ্খাকে রূপায়িত করছে, সেই প্রেরণাটি বোধগম্য হয়, যেন তার বহু-বিচিত্র চিন্তাধারার পরষ্পর বিরুদ্ধতা ভেদ ক'রেও যে-ঐক্যসূত্রটি চলে গিয়েছে সেইটেকে ধরতে পারা যায়। দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষের ইতিহাস-লেখক তার চিত্তের এই গভীর দিকটা,—তার চিত্ত-বিকাশের পথে নানা বিরোধের এই নিবিড় সমন্বয়ের দিকটার বেশি খোঁজ রাখেন নি—যদিচ ভারতবর্ষের জীবন-ধারার মধ্যে যা' কিছু সত্য, মহৎ ও চিরন্তন,—তা প্রবাহিত হ'য়েছে বড় বড় সহরে নয়, সুরম্য হর্ম্ম্যমালার বিলাসৈশ্বর্য্যে নয়, সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা আর সাম্রাজ্য-ধ্বংশের লীলাভূমিতেও নয়,—পরন্ত শান্তিপূর্ণ তপোবনের সুশীতল তরুচ্ছায়ায়, সন্ন্যাসীর নির্জ্জন আশ্রম-কুটীরে। সেইখানেই প্রাচীন ঋষিদের শতাব্দীব্যাপী ধ্যান ও সাধনায় উদ্‌যাপিত হ'য়েছে ভারতের ইতিহাস-বিশ্রুত সেই কর্ম্মটি যার জন্য ভারতবর্ষ গৌরব করতে পারে, অর্থাৎ এমন একটা বিস্ময়কর সংযোগ ও মিলনীকরণ ব্যাপার—এমন একটা সঙ্ঘাত, সম্মিলন ও পরস্পর সমীকরণের প্রক্রিয়া যার মধ্যে বহু জাতি, তাদের অসংখ্য ভাষা, আচার-ব্যবহার ও ধর্ম্ম-বিশ্বাস নিয়ে—তাদের পরস্পর-বিরুদ্ধ আদর্শ ও সংস্কৃতি নিয়ে এক সঙ্গে মিলে গিয়েছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের যেগুলি বিশিষ্ট লক্ষণ, এইখানেই তার প্রস্রবণ,—অর্থাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠানে অবাধ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, রাষ্ট্রলীলা থেকে ব্যক্তিগত জীবনের আদর্শের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ, এবং অন্যদিকে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের উপর ভাবনা ও সংস্কাররাজির একটা অটল সুদৃঢ় ও সর্ব্বশক্তিমতী প্রতিষ্ঠা। এই শেষের লক্ষণটি অবশ্য স্বীকার করতেই হ'বে, অনেক সময় দারুণ অসুবিধার কারণ হ'য়ে দাড়িয়েছিল; সে-কথা আমরা পরে বলব, এখন এই বলতে চাই যে এই সংযোগ-ক্রিয়া, যার কথা এইমাত্র বলমাম,—সেটা বহু শতাব্দী পূর্ব্বেই সহজ হ'য়ে গিয়েছিল,—তার কারণ একটা পরিপূর্ণ আত্মিক স্বাধীনতার মধ্যে ভারতের মানস-দৃষ্টি সহজেই নিগূঢ় বিশ্ব-সত্ত্বার পানে উন্মুক্ত হ'য়ে গিয়েছিল,—এবং সেইজন্যই ভারতবাসী শিখেছিল বিশ্ব-সত্ত্বার মধ্যে মানুষের জীবনটাকে দেখতে যেমনই সহজভাবে তেমনই সমগ্রভাবে। ভারতের মাটিতে এসে মিলল কত জাতি, কত সম্প্রদায়,—তাদের মধ্যে ব্যবধানের ছিল না অন্ত; প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিভিন্ন আদর্শের জন্যে করল ভীষণ লড়াই, ব'য়ে গেল রক্তগঙ্গা,—তার সঙ্গে মিশ্‌ল অশ্রুজল; তারপর শেষ পর্য্যন্ত কেউ কারো আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ করল না,—অথচ সকলেই মিলে গেল একটা সর্ব্বসাধারণ সংস্কৃতির মধ্যে,—যার নাম হিন্দুত্ব। এই হিন্দুত্ব কথাটি যখন প্রয়োগ করা হয় একটা বিশাল লোক-সমষ্টির উপর,—যারা বলে নানা ভাষা, অনুষ্ঠান করে বিবিধ আচার, উপাসনা করে বিভিন্ন দেবতার,—তখন কথাটা যতই বহুব্যাপক ও ধারণা-দুরূহ হোক না কেন,—তার অর্থ নিয়ে যতই টানাটানি চলুক না কেন, একটা অখণ্ড সমগ্রতা-সূচক বাক্যের মতই তার সুস্পষ্ট বোধগম্যতার কোনও হানি হয় না। এক ধর্ম্ম-বিশ্বাসের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে হিন্দুত্ব সকল মানবকেই অমৃতের পুত্র ব'লে আহ্বান করে,—যেমনই হোক না কেন তাদের দৈনন্দিন জীবন। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ চমৎকার বলেছেন, "উপনিষদ-যুগের প্রাচীন ঋষি থেকে আরম্ভ ক'রে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী পর্য্যন্ত, হিন্দুমাত্রেই সর্ব্বদা স্বীকার করেছেন যে সত্য রঙ-বেরঙের সাজ পরে এবং অনেক সময় দুর্ব্বোধ্য ভাষা বলে থাকে"।

হিন্দুত্বের এই যে বিরাট একীকরণের অত্যাশ্চর্য্য সাধনা, এর গুপ্ত মন্ত্রটি নিহিত আছে ধর্ম্মানুষ্ঠানের অবাধ স্বাধীনতার মধ্যে। একে ত ধর্ম্মপ্রাণতার বাহ্য বিকাশের কোনো পথেই কোনো দিকে কোনো বাধা নেই,—তার উপর আবার সেই ধর্ম্মপ্রাণতা মানুষের ব্যক্তিগত জীবনকে ওতপ্রোতভাবে আচ্ছন্ন করে আছে। একথা

স্বচ্ছন্দেই বলা যায় যে হিন্দুর দৈনিক জীবনের প্রতিটি তুচ্ছ-তম ব্যাপারের মধ্যেও আছে একটা ধার্ম্মিক অনুপ্রেরণা,—তার প্রাত্যহিক স্নানে শুধু যে তার শরীর নির্ম্মল হয় তা' নয়,—তার আত্মাও হয় পবিত্র,—এবং সেইটেই স্নানের উদ্দেশ্য এবং তার গোড়াকার কথা। শুধুই পূজা-অর্চ্চনা, দান-ধ্যান প্রভৃতি চিত্তশুদ্ধিকর কাজে নয়,—তার সমস্ত সত্বার প্রতিদিকে প্রতিক্ষণে প্রতিটি কর্ম্মে হিন্দুর চেষ্টা তার ভগবানকে প্রকাশ করা—অবশ্য যেভাবে ভগবানকে সে ধারণা করেছে তেমন ভাবে। বলা বাহুল্য, বিশেষ করে আত্ম-চৈতন্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এই যে হিন্দুধর্ম্ম,—এর নানা বিরুদ্ধ প্রকাশের সমন্বয়-প্রক্রিয়ার মধ্যে মানুষকে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করানোর প্রচেষ্টার নামগন্ধও নেই। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ আবার বলেছেন, "হিন্দুর চিন্তার মধ্যে আমাদের ব্রহ্মজ্ঞানের ক্রমবিবর্ত্তনের কথা আছে। ব্রহ্ম সম্বন্ধে আমাদের ধারণার ক্রমাগত পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয়, যতক্ষণ না পর্য্যন্ত সেই সকল ধারণা থেকে বিশ্ব-সত্বা সম্বন্ধে আমরা যা কিছু জ্ঞানলাভ করি, সে-সকলই অতিক্রম করে আমরা বিশ্ব-সত্বার অন্তরে প্রবেশ করতে পারি। হিন্দুধর্ম্ম মানুষের ব্রহ্ম-ধারণাগুলি সম্বন্ধে, এটি সত্য, ওটি মিথ্যা,—এমন প্রভেদ করে না, বা কোনো একটা বিশেষ ধারণা দিয়ে সর্ব্ব মানবজাতির ব্রহ্ম-ধারণার মূল্য যাচাই করবার চেষ্টা করে না। প্রত্যেক মানুষই যে বিভিন্ন স্তর থেকে সহস্র রকমের পন্থা অবলম্বন ক'রে ভগবানকে অন্বেষণ করে, একথা হিন্দুধর্ম্ম স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নেয়; এবং এই ঈশ্বর-সন্ধানের প্রত্যেকটি প্রচেষ্টার প্রতিই সমবেদনা অনুভব করে।"

মানুষকে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করানোব চেষ্টা হিন্দু যে কোনো দিন করে নি, বরং একই হিন্দু-সংস্কৃতির ক্রোড়ের মধ্যে ধর্ম্মপ্রাণতার বহু-বিচিত্র প্রকাশের স্বাধীনতা ও অবসর দিয়েছিল, বোধ হয় এই জন্যই সভ্যতার ঊষাকালেই হিন্দু জাতির মধ্যে বুদ্ধি-বৃত্তির ক্রিয়া উদ্দীপিত হ'য়েছিল। কারণ ধর্ম্মমতে ধর্ম্মমতে যখন বেধেছিল সংঘর্ষ, তখন প্রত্যেক মতকেই আত্মরক্ষার জন্য ও প্রতিপক্ষকে আক্রমণের জন্য আশ্রয় নিতে হ'য়েছিল যুক্তি-সঙ্গত তর্কের। অতি প্রাচীন যুগে বেদের ব্রাহ্মণাংশে অনেক অনুষ্ঠানের—এমন কি অনেক অসঙ্গত অনুষ্ঠানেরও বুদ্ধি-বৃত্তির সাহায্যে সমর্থনের প্রচেষ্টা দেখা যায়। হো'ক না কেন এই সকল প্রচেষ্টার অধিকাংশই দুর্ব্বল,—এমন-কি বালোচিত—হয়-ত বা তারা প্রত্যক্ষজীবনের অভিজ্ঞার উপর ভিত্তি না করে সকল সময়েই শ্রুতির আশ্রয় খোঁজে—তথাপি সভ্যতার ঊষাকালে তারা উদ্রিক্ত করেছিল, এবং জাগ্রত ও জীবন্ত রেখেছিল এমন একটা মানসিক কৌতূহল—কালক্রমে যার পরিণতি হ'ল উপনিষদের প্রথম দার্শনিক ধারণাগুলির মধ্যে। ভারতবর্ষের বহু বিচিত্র দার্শনিক মতবাদের এই উপনিষদই হ'ল প্রথম প্রস্রবণ।

এমনি ভাবে—এমন মুক্ত মানসিক আবহাওয়ার মধ্যে উদ্রিক্ত হোলো যে দার্শনিক চিন্তা—স্বভাবতই তা' নিয়ে পড়ল মানুষের আত্মাকে। বাহ্যবস্তুর ভঙ্গুরতা, মানসিক অবস্থার ক্ষণস্থায়িতা, জীবনের মধ্যে সুখ অপেক্ষা দুঃখের প্রাধান্য,—এই সবের আলোচনা মানুষের চিন্তাকে ঠেলে দিতে লাগল গভীর হ'তে গভীরতর গহনে, এবং শেষ পর্য্যন্ত তাকে উপনীত করল এই নিবিড় উপলব্ধিতে,—যে সকল পদার্থই চৈতন্যর দ্বারা আবৃত, এবং চৈতন্যের আলোকেই সব কিছুকে বুঝতে এবং ব্যাখ্যা করতে হ'বে। এর মধ্যে একটা মজার কথা এই—ভারতবর্ষের যে-দার্শনিক চিন্তার আরম্ভ হোলো—'দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ'—তারই অচিরাৎ পরিণতি একটা নিবিড় আনন্দোপলব্ধিতে—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,—ইত্যাদি"।

দুঃখের আঘাত থেকে আনন্দের এই নিবিড় উপলব্ধি পর্য্যন্ত যে ব্যবধান,—তা সত্যই প্রকাণ্ড, এবং তা লঙ্ঘন করতে হিন্দু-চিত্ত একটা অসাধারণ মানসিক বল ও প্রাণশক্তির পরিচয় দিয়েছে। অদম্য মানসিক তেজ সহকারে সুচারুরূপে বিধিবদ্ধ প্রণালীতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মানব-জীবন, মানব-চিত্ত ও বহির্জগৎ সম্বন্ধে সকলদিক থেকে এমন গভীর গবেষণা আরম্ভ হ'ল, যার প্রতি আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক তাঁর কঠোর সমালোচনা-প্রবৃত্তি নিয়েও মাথা নত না করে পারবেন না। সত্য-সন্ধানী, মানসিক স্বাস্থ্য-ব্যঞ্জক যে দর্শন, তার শুধুই অন্তরের ধ্যানের

উপর নির্ভর করলে চলে না, দৈনন্দিন ইন্দ্রিয়-গত জীবন থেকেও এমন সব সাক্ষ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন,—এমন সব তথ্য আহরণ আবশ্যক, যা পর্য্যবেক্ষণ করা যায় এবং তত্ত্বের যাথার্থ্য যাচাই করবার জন্যও প্রয়োগ করা যায়। তাই এই সকল তথ্য সর্ব্বদিক থেকে আহরিত ও আলোচিত হ'তে লাগল এবং ক্রমশঃ ক্রমশঃ গড়ে উঠল একটা সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ বিপুল সংস্কৃতি। শুধুই যে আধ্যাত্মিক সত্ত্বার একটা সোজাসুজি অন্তর-বোধ এই সংস্কৃতির অঙ্গ ছিল তা নয়, পরন্তু এর মধ্যে ছিল জ্ঞাতব্য সকল বিষয়েই বৈজ্ঞানিক গবেষণা,—যথা পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন শাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, উদ্ভিদ্-তত্ত্ব, প্রাণি-বিদ্যা, জীব-বিদ্যা, শারীর-বিদ্যা, ন্যায়-শাস্ত্র, প্রণালী-তত্ত্ব ইত্যাদি। সঙ্গে সঙ্গে নানা-বিধ দর্শনের আবির্ভাব হ'ল এবং বিশ্ব-সত্ত্বার অন্তর-স্বরূপ আলোচনার যা অবশ্যম্ভাবি ফল, তা-ও ঘটল,—অর্থাৎ বিভিন্ন মতবাদ ও তত্ত্বের ঠোকাঠুকি। অন্যদিকে বিচিত্র শিল্প, সাহিত্য, সাহিত্য-সমালোচনা ইত্যাদি এই সবের সঙ্গে মিলে একটা পরিপূর্ণ রূপ দিল ভারতীয় জাতির মেধাকে, যে জাতির অন্তরে ছিল যেমন ঐক্য, বাইরে ছিল ঠিক তেমনি ভেদ।

এই সকল সাহিত্যিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক গবেষণার যা' প্রধান অনুপ্রেরণা, এমন একটা বিভিন্ন জাতিকে এক করার কাজে যে অনুপ্রেরণা বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালিনী,—সেটা ছিল,—আমরা আগেই বলেছি,—পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলনের ভিতর দিয়ে নিবিড় আত্মোপলব্ধির দিকে একটা আকুল আধ্যাত্মিক বেগ। দার্শনিক চিন্তার সহিত সংস্পর্শের ফলে, এই অনুপ্রেরণারই সঙ্গে মিশে গিয়েছিল,—প্রাচীন ভারতের ধর্ম্মপ্রাণতা যার প্রথম প্রকাশ হয়েছিল,—যথা সর্ব্বত্র তথা ভারতেও—কতক-গুলি অন্ধ বিশ্বাসের মধ্যে আর দেবতাকে খুসী করে বর লাভ করবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠানের মধ্যে। তারপর যতই মানুষের বুদ্ধি বাহ্যবস্তুর অন্তর-স্বরূপের গভীরে গভীরে প্রবেশ করতে লাগল, ততই স্পষ্ট হ'তে স্পষ্টতর ভাবে প্রতীয়মান হ'তে লাগল যে এই বিশ্বকে নিয়ন্ত্রিত করছে একটা চিরন্তন ও অলঙ্ঘ্যনীয় নিয়ম যার প্রয়োগ শুধু বাহ্য-বস্তুর গতিশীল জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, পরন্তু চিত্তের অন্তর্জগতে ও মানুষের নৈতিক জীবনেও পরিব্যাপ্ত হ'য়ে আছে। এই নিয়মকে বলা হয় 'কর্ম্মবাদ'—এর শাসন এতই কঠিন ও সর্ব্বব্যাপী যে মনে হয় এর ক্রিয়া থেকে কারো নিস্তার নেই,—তাই অনেকে মনে করেন, এর ক্রিয়াকে অতিক্রম করে মানুষের স্বাধীনতাই বা কোথায়, আর ন্যায়-অন্যায় ভেদের অবসরই বা কোথায়? মানুষের নৈতিক জীবনের মূল্যই বা কি থাকতে পারে? এমন আশঙ্কা অবশ্য অমূলক; যথাযথ ব্যাখ্যা করলে কর্ম্মবাদ মানুষের স্বাধীনতাও অস্বীকার করে না, বা তার নৈতিক জীবনের মূলোচ্ছেদও করে না; কিন্তু সে যা-ই হো'ক, এ কথা অস্বীকার করা চলে না যে কর্ম্মবাদের এই কঠিন, চিরন্তন ও অলঙ্ঘ্যনীয় শাসনের কাছে মাথা নত করাটা হিন্দুর ধর্ম্মপ্রাণতার ছিল একটা অচ্ছেদ্য অঙ্গ, যদিও সেটা হিন্দুধর্ম্মের উল্টো দিক ছাড়া কিছুই নয়। প্রত্যেক মানুষের মনে সর্ব্বদাই বর্ত্তমানের সীমা অতিক্রম করবার একটা তীব্র তাগিদ থাকে, সেই তাগিদ থেকেই মানুষের ধর্ম্মের উদ্ভব, এবং সেইটেই হ'ল ধর্ম্মের সোজা দিক। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক ধর্ম্মেরই এই দুটো দিক আছে। যেমন খৃষ্টধর্ম্মের উল্টো দিক হ'চ্চে মানুষের আদিম পাপক্ষয়ের বাসনা, আর সোজা দিক হ'চ্চে প্রেমের শক্তিতে ভগবানের নিকট গৃহীত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। তেমনি, ভারতবর্ষের ধর্ম্মের উল্টো দিক হ'চ্চে,—মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, অর্থাৎ যে-জীবনে কর্ম্মদেবতার নিকট অকুণ্ঠিত চিত্তে মাথা নত করা ছাড়া আর কিছুই নেই, সেই জীবন থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা,—আবার সোজা দিক হ'চ্চে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার পরিপূর্ণ মিলনের ভিতর দিয়ে এমন একটা আনন্দাবস্থা-প্রাপ্তির স্পৃহা,—যার মধ্যে কর্ম্মের শাসন থেকে মানুষের মুক্তির বাণী আছে,—শূন্যতার মধ্যে বিলীন হ'য়ে নয়, কর্ম্মবাদের আদি উৎস যেখানে সেইখানে আপনার আসনটি গ্রহণ করে।

বলা বাহুল্য, ধর্ম্মপ্রাণতার এই যে দুটো দিকের কথা বলা হ'ল, এর জন্য তার অখণ্ডতার হানি হয় না। একটা দিক আর একটা দিক থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ত নয়ই, বরঞ্চ

তাদের মধ্যে একটা নিবিড় অচ্ছেদ্য যোগ আছে; বদ্ধাবস্থা থেকে মুক্তাবস্থায় জীবাত্মার যে জয়-যাত্রা তারই ধারাবাহিক প্রগতির পথে এই দুটো দিক হ'চ্চে দুটো বিভিন্ন স্তর। প্রকৃত পক্ষে সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে সর্ব্ব ধর্ম্মেরই পিছনে,—শুধু ধর্ম্মের কেন,—বলা যেতে পারে মানুষের সমস্ত সৃজনশীল চিন্তারই পিছনে রয়েছে—এই অনুপ্রেরণা,—মুক্তির জন্য এই তীব্র আকাঙ্ক্ষা, বৃহত্তর ও মহত্তর জীবনের জন্য এই গভীর আকুলতা।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের মধ্যে সর্ব্বত্রই এই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে। তন্মধ্যে উত্তর-কালীন চিন্তার উপর বোধ হয় বেদান্তমত ও বৌদ্ধমতেরই প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব সব চেয়ে বিস্তৃত, গভীর ও শক্তিশালী। বেদান্তমতের মধ্যে মানুষের বুদ্ধি, চিন্তা ও যুক্তিরই একাধিপত্য, অন্তত শঙ্করাচার্য্য তার যেমন ভাবে ব্যাখ্যা ও প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেই ভাবে গ্রহণ করলে। মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হবার জন্যে মানুষকে বুঝতে হ'বে যে—কি বহির্জগৎ, কি অন্তর্জগৎ কিছুই সত্য নয়; এ জগতে যা' কিছু আমরা দেখি, সবই অবিদ্যা বা মায়া দ্বারা সৃষ্ট। অতএব এই অবিদ্যার বন্ধনপাশ জীবাত্মাকে ছেদন করতে হ'বে পরমাত্মার মধ্যে প্রবেশ করে। একমাত্র সত্য—তিনি হ'চ্চেন ব্রহ্ম,—'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। সুতরাং ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মতা সম্পাদন করতে যদি পারি তবেই আমরা সত্য হ'ব। অপরদিকে বৌদ্ধ মতের মধ্যে নীতি-শাস্ত্রেরই প্রাধান্য বেশি। বৌদ্ধমত এই প্রত্যক্ষগোচর জগতের অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করে না, কিন্তু আমাদের চোখের সামনে তাকে ধরে গাঢ়তম কালিমায় লেপন ক'রে। দেশ, কাল, ও কার্য্য-কারণের দৃঢ় বন্ধন মানুষকে না-কি কেবলই অতি ভয়ঙ্কর, অনবদ্য ও ধারণাতীত যন্ত্রণার মধ্যে নিক্ষেপ করে। তবে বর্ত্তমান অবস্থাটাই মানব-জীবনের শেষ কথা এমন দাবি বৌদ্ধমত মানে না। তাই যে-মানুষ মুক্তি চায়, তাকে কঠোর নীতি-সঙ্গত জীবন-যাপনের বিধান দেওয়া হ'য়েছে; এবং তা'হলেই না-কি এমন একটা শ্রেষ্ঠ অবস্থান্তরে তার জীবনের পরিণতি ঘটবে, যার সঙ্গে বর্ত্তমান অবস্থার কোনো তুলনাই হয় না,—অর্থাৎ সেটা মানব-সত্ত্বার একটা আদর্শ অবস্থা যা'কে বলা হ'য়েছে 'নির্ব্বাণ'। '**নির্ব্বাণ**' কথাটির অবশ্য ভুল ব্যাখ্যা করে এর প্রতি অনেক কটূক্তি করা হ'য়েছে।

তথাপি এ সত্য জাজ্জ্বল্যমান যে মানুষকে বর্ত্তমান অবস্থায় যতই নারকীয় যন্ত্রণা ভোগ করতে হোক না না কেন, জীবনকে তাই বলে সে কিছু কম ভালোবাসে না। তাই বৌদ্ধমতে যে মহান্ নৈতিক আদর্শের কল্পনা আছে, তার শক্তি যতই থাক্ না কেন,—সাধারণ মানব-চিত্তের মধ্যে তার প্রতিষ্ঠা ক্রমশ শিথিল হ'য়ে এল,—অন্তত এই কারণে, যে মানব-জীবনের উপর তার শাসন বড়ই কঠিন ও নিষ্ঠুর। মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনে নিয়তই যে সান্ত্বনার প্রয়োজন, শাঙ্কর-বেদান্তের চিন্তা-সর্ব্বস্ব মায়াবাদেও তা মেলে না,—অথবা বৌদ্ধমতের আকার-সর্ব্বস্ব হিম-শীতল নীতি-শাস্ত্রেও তা মেলে না। অতঃপর এই চিন্তা ও যুক্তি-সর্ব্বস্বতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ দার্শনিক ও ধার্ম্মিক চিন্তার আর একটি ধারার উদ্ভব হ'ল, যা' প্রগাঢ় ভক্তি-রসে আপ্লুত, এবং যা' ভগবানকে ব্যক্তির আকারে ধারণা করে, ভক্তি করে এবং উপাসনা করে। এই চিন্তাধারার প্রবর্ত্তক ছিলেন রামানুজ,—বেদান্তের অন্য একটি নূতন দলের প্রতিষ্ঠাতা।

দক্ষিণ ভারত থেকে নিঃসৃত এই নূতন চিন্তাস্রোত শীঘ্রই সারা দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। শাঙ্কর-বেদান্তের ন্যায়, এই নূতন বেদান্ত মতও একত্ব-বাদী,—অর্থাৎ এক-মাত্র ব্রহ্মকেই এখানেও সত্য বলে মানা হয়; তবে প্রভেদ এই যে ব্রহ্মকে এখানে একটা নৈর্ব্যক্তিক সত্তা বলে কল্পনা করা হয় না। এটাকে বলা হয় বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ। এদের মতে, পরমাত্মারই প্রকাশ এই যে সব আমরা জীবাত্মা—আমাদের সঙ্গে আমাদের সৃষ্টি-কর্ত্তার একটি নিবিড় ব্যক্তিগত যোগ আছে;—তাঁর চেয়ে আমরা কিছু কম সত্য নই। প্রকৃত-পক্ষে, কি সসীম কি অসীম,—কেউই পরস্পরকে ছেড়ে একাকী

থাকতে পারে না, একের অন্যকে প্রয়োজন। সসীম যেমন থাকতে পারে না অসীমকে আশ্রয় না করে, অসীমও তেমনি থাকতে পারে না সসীমের মধ্যে ব্যক্ত না হ'য়ে।

মানুষ ও তার ব্যক্তিভাবাপন্ন ভগবানের মধ্যে এই নিবিড় সম্বন্ধ প্রকাশ লাভ করেছে যে ভক্তিতত্ত্বের মধ্যে, মধ্য যুগ থেকে আরম্ভ করে আমাদের বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত সেই ভক্তিতত্ত্বই ভারতবর্ষের সমস্ত চিন্তাকে অধিকার করে আছে,—কি সাহিত্যে, কি ধর্ম্মে, কি দর্শনে। এই ভক্তিতত্ত্বে অনুপ্রাণিত হ'য়েই কত মরমী কবি ও ধর্ম্মপ্রচারক জগতকে শুনিয়েছেন প্রেমের বাণী, এবং যে ধর্ম্মাবলম্বীই হোক না কেন সকল মানুষকেই বাঁধতে চেষ্টা করেছেন একটা ভ্রাতৃভাবের বন্ধনে। ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকার পার্থক্য-বোধ থেকে, সাম্প্রদায়িক সকল রকমের গোঁড়ামি থেকে আপনাদিগকে মুক্ত করে নিয়ে তাঁরা অতি প্রশংসনীয় সাহস সহকারে চেষ্টা করেছিলেন, ইস্‌লাম ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ভেদ বিস্মৃত হ'য়ে পরস্পরকে পরস্পরের সান্নিধ্যে আন্‌বার। মনে রাখা দরকার যে এই সময়ে ভারতবর্ষ,—বিশেষ করে উত্তর ভারত মুসল-মানের শাসনাধীনে চলে গিয়েছিল; এবং হিন্দু-মুসলমানের মিলন সমস্যা বর্ত্তমান যুগের সমস্যার চেয়েও জটিলতর ভাবেই তখন দেখা দিয়েছিল, কেন-না আজকাল তবু বিদেশীর শাসনাধীনত্বে হিন্দু-মুসলমানের একটা মিলনের ক্ষেত্র রয়েছে। একথা মনে রাখলে,—সে সকল সৎসাহসী মনীষি দর দর ভক্তিধারার স্রোতে আকণ্ঠ নিমগ্ন হ'য়ে প্রেমের পতাকাতলে বিশ্বমানবকে পুনর্মিলিত করবার জন্য দৃঢ় চিত্তে সকল রকম অত্যাচারেরই সম্মুখে বুক পেতে দিয়েছিলেন, তাঁদের সেই বিরাট প্রচেষ্টা ও সাধনাকে যথার্হ সম্মান করতে সহজেই মন অগ্রসর হয়। এই ভক্তিধারাকে দক্ষিণ ভারত থেকে উত্তর ভারতে আনয়ন করেন রামানুজের শিষ্য রামানন্দ। আবার তাঁর শিষ্যদের মধ্যে সব চেয়ে খ্যাতি লাভ করেছেন একজন অশিক্ষিত দরিদ্র মুসলমান তাঁতি,—কবীর, যাঁর মরমী কবিতাগুলি সাধারণ মানুষের জীবনে প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছে। রবীন্দ্রনাথ তন্মধ্যে একশোটি কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। কবীরের কবিতা সম্বন্ধে কিছু বলাই শক্ত, আবেগে অভিভূত না হ'য়ে। রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক অনূদিত "কবীরের একশত কবিতা"র ভূমিকায় আণ্ডারহিল বলেছেন,—"কবীরের কাব্য তাঁর অন্তদৃষ্টি ও প্রেমের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রকাশ; এবং মানব-চিত্তের প্রতি তাঁর আবেদন যে মৃত্যুজয়ী, তা এই কাব্যেরই জন্যে, তাঁর নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নীতিপূর্ণ উপদেশ বাণীগুলির জন্যে নয়। এ কাব্য বহু-বিচিত্র সকল রকমেরই মরমী আবেগের লীলায় চঞ্চল; অমূর্ত্তের শ্রেষ্ঠতম উপলব্ধি ও অনন্ত-সঙ্গমের জন্য ইহকালাতীত তীব্রতম বাসনা থেকে আরম্ভ করে ভগবানের সঙ্গে একটা নিবিড় ও ব্যক্তিগত যোগ পর্য্যন্ত সকল রকম আবেগই অতি সাধারণ উপমার সাহায্যে, এবং কখনো হিন্দু-ধর্ম্ম থেকে কখনো বা মুসলমান ধর্ম্ম থেকে আহরিত রূপকের সাহায্যে প্রকাশ করা হ'য়েছে। এই কাব্যের লেখক সম্বন্ধে বলা অসম্ভব যে তিনি ব্রাহ্মণ না স্ফী, বৈদান্তিক না বৈষ্ণব। কবীর নিজেই বলেন যে তিনি একাধারে আল্লারও সন্তান রামেরও সন্তান।"

যে মরমী কাব্যের এতখানি প্রসার ও বিস্তৃতি, আর যে আন্দোলন তাকে অনুপ্রাণিত করেছিল,—বলা বাহুল্য যে তা' রবীন্দ্রনাথের মনকে গভীরভাবে স্পর্শ না করেই পারে না। "ব্রহ্মের মধ্যেই জীব, জীবের মধ্যেই ব্রহ্ম, চিরদিন তারা পৃথক, চিরদিন তারা এক"; "ব্রহ্মের সৌন্দর্য্য দেখা যায় না চোখে, তাঁর বাণী শোনা যায় না কাণে,—কবীর বলে একই সঙ্গে যে জানে প্রেম, যে জানে ত্যাগ, তার কখনও মরণ হয় না"; "আকারের মধ্যেই নিরাকার, তাই আমি করি আকারের জয়গান"—এমনি সব সুরের অশ্রান্ত ঝঙ্কার কবীরের গানের মধ্যে বারে বারে শোনা যায়। অক্লান্ত তাঁর চেষ্টা ব্রহ্মের মধ্যেই একাধারে দেখ্‌তে—অদ্বৈতবাদীর সেই 'একম'কে যিনি সব কিছুই অতিক্রম করে বিরাজ করছেন,—আবার, মানবাত্মার গোপন প্রাণের সেই ব্যক্তি-ভাবাপন্ন ভালোবাসার ধনকে যিনি প্রত্যেক জীবের কর্ণ-

কুহরে একটি বিশিষ্ট বাণীর মধু বর্ষণ করেন। রবীন্দ্র-দর্শনের ভিত্তি গঠিত হ'য়েছে যে উপকরণ দিয়ে তার অনেকখানির সন্ধান এইখানে পাওয়া যায়। কারণ বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রমুখ বহু বৈষ্ণব কবি-পরম্পরার দ্বারা এবং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের দ্বারা প্রচারিত হ'য়ে এই ভক্তির ধারা সারা বাংলা সাহিত্যের অণুতে অণুতে প্রবেশ করেছে, এবং এই স্রোত এখনো পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যকে প্লাবিত করে রেখেছে। এই বৈষ্ণব সাহিত্য মানুষকে শেখাতে চায় এই কথাটি,—যে হৃদয়ের সমস্ত বাসনারই পরিতৃপ্তি হয় ভগবানের প্রতি প্রেমের শক্তিতে। সৃষ্টিকর্ত্তার সঙ্গে মানবাত্মার প্রণয়ের সম্বন্ধ। সৃষ্টিকর্ত্তার প্রয়োজন হয় প্রণয়িনীকে—আত্ম-প্রকাশের জন্য,—আবার আত্মাও তার প্রভুর নিকট আত্ম-সমর্পণ না করে শান্তি পায় না।

অতিরঞ্জন দোষ থেকে মুক্ত হ'তে চাইলে এখানে বলা দরকার যে মধ্যযুগের এই যে অত্যাশ্চর্য্য আধ্যাত্মিক জাগরণ, প্রশংসা করে যার শেষ করা যায় না,—এই যে ভক্তিধারার স্রোত,—এর মূল্য তার বাস্তব ইন্দ্রিয়-গোচর ফলের মধ্যে ততটা নয়,—যতটা তার অন্তর্নিহিত অনুপ্রাণনার মধ্যে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও ইস্‌লাম ধর্ম্ম—এতখানি বিভিন্ন এই দুই সংস্কৃতির সংযোগ-সাধন,—নিঃসন্দেহই এ কাজ অতীব দুরূহ। একাজে যাঁরা হাত দিয়েছিলেন,—ফল যদি তাঁরা নিতান্ত অল্পই পেয়ে থাকেন, তথাপি আমাদের সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধা-অর্ঘ্যের প্রতি তাঁদের দাবি কমে না; কারণ যে অনুপ্রাণনা তাঁরা আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন, তা' মৃত্যুঞ্জয়ী, এবং আজও পর্য্যন্ত তার লক্ষ্যের প্রতি স্থির দৃষ্টি রেখে কাজ করছে। অপরদিকে যতই কূট ও দুর্ব্বোধ্য মনে হোক না কেন, একথা অস্বীকার করা যায় না যে মধ্যযুগটা ছিল একাধারে আধ্যাত্মিক জাগরণ ও অন্ধকারের যুগ। সত্য কথা বলতে কি, বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য-স্থাপন করার মত অসাধ্য সাধন করে হিন্দু সংস্কৃতির ক্রিয়াশক্তি ক্ষীণ হ'য়ে এসেছিল, এবং শেষ পর্য্যন্ত ইস্‌লামের মত একটা বিরুদ্ধ সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে, না পারল তা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে, না পারল তা-ই দিয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করে তুলতে। হিন্দু মুসলমান—এই দুই সম্প্রদায়ের বিরোধ এতই তীব্রভাবে দেখা দিল, যে আত্মরক্ষার জন্য প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তার ধর্ম্মবিশ্বাসের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে ক্রমশই দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর ভাবে আবদ্ধ রেখে অপর সম্প্রদায়কে করতে হ'ল আক্রমণ। ফলে উদ্‌গীর্ণ হ'ল ঘৃণার বিষ, যুক্তির স্বচ্ছ দৃষ্টি হ'ল আচ্ছন্ন, এবং রামানন্দ প্রমুখ বহু ধর্ম্ম-প্রচারকের বিপুল প্রয়াস সব ব্যর্থ করে দিয়ে যত কিছু যুক্তি-বিহীন ধারণা, অসঙ্গত আচার, কুসংস্কারাচ্ছন্ন অনুষ্ঠান স্থূল প্রাচীর তুলে দিল দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে, মানুষকে মানুষ থেকে করে দিল পৃথক।

ভারতবর্ষের জনসাধারণের জীবনের উপর তার ভাবরাজির যে সুদৃঢ় ও সর্ব্বশক্তিময়ী প্রতিষ্ঠা, আমরা পূর্ব্বেই তার উল্লেখ করেছি; এবং বোধ হয় এই জন্যই হিন্দু সংস্কৃতির পক্ষে সহস্র ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের থেকে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হ'য়েছিল। কিন্তু এই তমসাবৃত যুগে,—ওই সব দুরতিক্রম্য কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস মানুষের বিচারশক্তিকে কয়েক শতাব্দী ধ'রে মোহ ও তন্দ্রাচ্ছন্ন করে রেখেছিল; যতদিন পর্য্যন্ত না পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রচণ্ড শক্তি এসে তাকে দিল সজোরে ধাক্কা।

মর্ম্মস্পর্শী ব্যথা ও লজ্জা লাগে উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের দিনে ভারতবর্ষের দুরবস্থার বর্ণনা করতে। কি মানসিক উৎকর্ষে, কি স্বাধীন চিন্তার দ্বারা জীবন-সমস্যার সমাধানে, কি সংগঠন ক্রিয়ায়, পূর্ব্বের দুটো শতাব্দীর দৈন্যের ছিল না অন্ত। চিত্তের এই অলসতার জন্য ভারতবর্ষকে জরিমানা দিতে হ'য়েছে নিদারুণ। তার আত্মা হয়ে পড়েছিল প্রায় স্পন্দনহীন, বস্তুরাজির যা যথার্থ মূল্য সে বিষয়ে বোধরহিত,—আঁকড়ে ধরেছিল, শুধুই অনাবশ্যক ও অসঙ্গত জিনিষকে নয়, মনুষ্যত্বের রীতিমত হানিকর ও অকল্যাণকর জিনিষকেও। যথা, বর্ণাশ্রম—হ'তে পারে তার উদ্ভব হ'য়েছিল, আদিম সমাজ-সংগঠনের কিছু প্রয়োজনের মধ্যে; কিন্তু বহু শতাব্দী ধরে মৃত সংস্কারের যত আবর্জ্জনা কুড়িয়ে কুড়িয়ে কঠিন হ'য়ে শেষ

পর্য্যন্ত, জাতিগত, ধর্ম্মগত ও ভাবগত ঐক্য সত্ত্বেও মানুষকে মানুষ থেকে পৃথক করা ছাড়া অন্য কোনো কাজে লাগে নি। তা ছাড়া পর্দ্দার আড়ালে নারী-নিষ্পেষণ থেকে আরম্ভ করে সতীদাহ পর্য্যন্ত দুষ্কর্ম্মের একটা লম্বা ফিরিস্তি দেওয়া যেতে পারে যার জন্য ভারতবর্ষকে বিদেশী অধীনতার শাস্তি বহন করতে হ'য়েছে—ভগবানই জানেন আরও কতদিনের জন্য।

যা হো'ক,—মুক্তির ক্ষীণ আলো দেখা যায় সুদূরে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারত-অধিকার যখন প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে,—তখন বাংলা-দেশে এমন একজন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন যাঁর মেধা তাঁর পারিপার্শ্বিক সকল কিছুই অতিক্রম করে গিয়েছিল। তাঁর নাম রামমোহন রায়,—বর্ত্তমান যুগে যে সব মনীষিরা সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের স্বপ্ন দেখেন, তাঁদেরই অগ্রণী। বোধ হয় কয়েক শতাব্দী এগিয়ে ছিলেন তিনি তাঁর সময় ও পারিপার্শ্বিকের সকল কিছুকেই,—তাই জীবনের প্রারম্ভেই, তার পরিবারের সঙ্গে, বন্ধুদের সঙ্গে, দেশবাসীদের সঙ্গে লাগল বিরোধ। ষোলো বছর যখন সবেমাত্র তাঁর বয়স হ'য়েছে তখনই তাঁর প্রথম রচিত পুস্তিকায় মূর্ত্তিপূজাকে করলেন আক্রমণ। ফলে মাথার উপর এসে পড়ল পিতৃ-রোষ। সংস্কারের বেড়াজালে আচ্ছন্ন তখনকার হিন্দুসমাজে এটা কম ভীতিপ্রদ ব্যাপার নয়, কিন্তু রামমোহনের ন্যায় সাহসী চিত্তের পক্ষে এ বাধা তুচ্ছ। তেমনি তুচ্ছজ্ঞান তিনি করেছিলেন সমস্ত জগতের বিরুদ্ধতাকে,—সমাজে ও ধর্ম্মে যা' কিছু দোষ দেখেছিলেন তার বিরুদ্ধে করেছিলেন প্রাণপণ যুদ্ধ। দূরদৃষ্টি দিয়ে তিনি বুঝেছিলেন যে দেশোদ্ধার করতে হ'লে ইংরাজের সঙ্গে মিলে মিশে একজোটে কাজ করা দরকার, এবং এই উদ্দেশ্যে কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন দেশবাসীকে ইংরেজি শিক্ষা দিবার জন্য। জাতীয় শিক্ষার দিকেও তাঁর চেষ্টা কম ছিল না; বাংলা ভাষায় বেদান্ত অনুবাদ করে বাংলায় গদ্য-সাহিত্যের ভিত্তি গেঁথে দিলেন। কিন্তু তাঁর সব কীর্ত্তিকে ছেয়ে আছে তাঁর ব্রাহ্ম-সমাজের পরিকল্পনা ও প্রতিষ্ঠাপনা,—সেই একেশ্বর পূজার মন্দির, যেখানে অন্য কোনো মূর্ত্তি বা ব্যক্তিবিশেষের ঈশ্বরত্ব স্বীকার করা হয় না।

এমনিভাবে স্ফূর্ত্তিলাভ করল যে-সব মানসিক শক্তি, তা' থেকে স্বভাবতই উঠল একটা উদ্দাম প্রতিক্রিয়া,—সনাতন সকল রকমের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে, সকল রকমের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, নির্ব্বিবাদে মেনে-নেওয়া সকল রকম নির্ব্বোধ আচারের বিরুদ্ধে, যা' নাকি বহুকাল ধরে পুরুষ-পরম্পরায় নেমে এসেছিল, অসঙ্গত ধারণায় ও অজ্ঞানে ভারাক্রান্ত প্রাণহীন একটা সংস্কারের ধারা বেয়ে। বিদ্রোহীরা ছিলেন অধিকাংশই—রামমোহন ও ডেভিড হেয়ারের চেষ্টায় ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত—হিন্দুকলেজের ছাত্র, স্বনামখ্যাত অধ্যাপক রিচার্ডসন ও ডিরেজিওর সুযোগ্য শিষ্য। এঁদের কাছ থেকে য়ুরোপীয় সাহিত্যে তাঁরা পেয়েছিলেন যে দীক্ষা, তারই ফলে তাঁরা উত্তীর্ণ হ'য়েছিলেন যেন একটা অন্ধকার লোক থেকে আর এক আলোকিত লোকে। অন্ধকার জগৎটাতে যুক্তি-বিহীন খামখেয়ালি সহস্র রকমের নিষেধ-বিধানে চিন্তাস্রোত রুদ্ধ; আলোকিত জগৎটাতে চিত্তের অযথা ভয় ডর কিছুই নেই,—অবাধ স্বাধীনতায় চিত্তের স্বচ্ছন্দ-গতি। যথা,—সুরাপান ছিল নিষিদ্ধ,—খাও সুরা; মুসলমান-পরিচালিত ভোজনাগার থেকে মাংস খাওয়া ছিল নিষিদ্ধ,—খাও তাই; কুল-দেবতার উপাসনা ছিল অবশ্য করণীয়,—কদাপি তৎ ন কর্ত্তব্যং। বাড়াবাড়ি অনেক সময় এতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হ'য়েছিল, যে শুদ্ধাচারী পবিত্র-স্বভাব গোঁড়া ভদ্রলোকদের টেঁকাই হ'য়ে উঠেছিল দায়—এমন কি যা' কিছু স্বদেশজাত,—কি সাহিত্যে, কি শিল্পে, সবেরই প্রতি যেন উদ্রিক্ত হ'য়েছিল একটা ঘৃণার ভাব। অবশ্য এ সব বাড়াবাড়ির জন্যে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকদের দায়ী করাটা অন্যায় হ'বে—কেন-না নবজাগ্রত সবুজ চিত্তের উদ্দাম উদ্দীপনারই ফল এ সমস্ত নিঃসন্দেহ; সকল দেশেই অনেক দিন ধরে চেপে-রাখা শক্তির স্বতঃস্ফুরণে এমনটা হ'য়েই থাকে।

রামমোহন রায় ভারতবর্ষের জীবনের যে আমূল পরিবর্ত্তন কল্পনা করেছিলেন, মিথ্যা ও বিপরীতমুখী হ'লেও

এটা তারই প্রথম সূচনা। অচিরেই তাঁর সাধনা থেকে বহুধা নিঃসৃত হ'ল নানা চিন্তা ও নানা কর্ম্মের স্রোত; অনেক সময় একটা অন্যটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হ'য়েছে। এই সব চিন্তা ও কর্ম্মস্রোতের মধ্যেই আধুনিক ভারতের জন্ম। মোটামুটি সেগুলোকে দু'টি বিভাগে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে—

(১) ধার্ম্মিক ও সামাজিক চিন্তাস্রোত।

(২) সাহিত্যিক ও রাষ্ট্রীয় চিন্তাস্রোত।

খৃষ্টধর্ম্ম, ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম ও ইস্‌লামধর্ম্ম,—এই তিনেরই প্রগাঢ় জ্ঞানের অধিকারী রামমোহন রায় ছিলেন ভারতীয় সংযোগ-মেধার একটা মূর্ত্ত জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত; শুধু যে একটা সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের স্বপ্নই তিনি দেখেছিলেন,—তা নয়,—তার একটা মূর্ত্ত সুপরিস্ফুট আকারও কল্পনা করেছিলেন,—যা' আজ একশো বছর টিঁকে আছে এবং খুব সম্ভব, ভবিষ্যতের মধ্যেও টিঁকে থাকবে। সেই এক চিরন্তন অনন্ত অপরিবর্ত্তনীয় সত্ত্বা যিনি বাঙ্‌মানসের দ্বারা অনধিগত এবং এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং রক্ষাকর্ত্তা—সেই এক অদ্বৈত ব্রহ্মের উপাসনার জন্য উৎসর্গীকৃত, ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে আজ একশো বছরের কিছু বেশি হ'ল।

কেউ যেন না মনে করেন, যে এটা হিন্দুধর্ম্ম, ইস্‌লাম ধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্মের একটা সংমিশ্রণ, তাদের পার্থক্যগুলো বিস্মৃত হ'য়ে। তা মোটেই নয়। সকল ধর্ম্মের মধ্যেই যে-চিত্ত উন্মুখ হ'য়ে থাকে অনন্তসঙ্গমের জন্য, এ সেই জীবন্ত চিত্তের ধর্ম্ম-প্রাণতারই প্রকাশ একটা একত্ববাদী মন্দিরের মধ্যে। এ সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করানোর প্রচেষ্টা ছিল না একেবারেই, মন্দিরের দান-পত্রের মধ্যে অন্যান্য কথার মধ্যে লিপিবদ্ধ ছিল,—"কোনো আলেখ্য বা প্রতিকৃতি বা প্রতিমূর্ত্তি পূজার জন্য মন্দিরের মধ্যে স্থাপিত হ'বে না, বা সমাজের মন্ত্র বা প্রার্থনার মধ্যে কোনো ধর্ম্মের প্রতিই কোনো কটাক্ষ, ঘৃণা বা অন্য রকমের আক্রমণ থাকবে না; কোনো বিশেষ রকমের উপদেশ, প্রচার বা বক্তৃতা, বা কোনো বিশেষ রকমের প্রার্থনা বা মন্ত্র উচ্চারিত হ'বে না; —এ মন্দিরের একমাত্র উদ্দেশ্য হ'চ্চে,—এক নিরাকার ব্রহ্ম-সত্বার ধ্যানের সাহায্য করা এবং সকল ধর্ম্মাবলম্বী মানুষের মধ্যেই মিলনের গ্রন্থি সুদৃঢ় করা।"

মনীষি রোঁমা রোঁলা যা বলেছেন,—তা একেবারেই ঠিক,—যে-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন রামমোহন রায়, তা' সত্য সত্যই সার্ব্বজনীন। দুঃখের বিষয় তাঁকে ঠিকমত বুঝল না কেউই,—না তাঁর স্বদেশবাসিরা, না বিদেশী খৃষ্টান মিশনারিরা। বরং তারা তাঁর উপর চটেই গেল; তাদের চোখে রামমোহন প্রতিভাত হ'লেন যেন একাধারে হিন্দু ও খৃষ্টান,—তাদের সাম্প্রদায়িক একদেশিতা তাইতে হ'ল আহত। তারা বুঝল না যে এই দুটো ধর্ম্ম থেকেই নির্ভয়ে ও বিনা দ্বিধায় সত্যগুলি সংগ্রহ করে রামমোহন মে'টেই কৃত্রিম উপায়ে বাইরে থেকে দুটো ধর্ম্মকে মিশিয়ে দিতে চান নি, তিনি চেয়েছিলেন শুধু জীবন্ত ও প্রবল বিশ্বাসের উপর তাঁর সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করতে। তাঁর সম্বন্ধে সত্যই বলা হ'য়েছে, "রামমোহনের চিত্ত-বিকাশের ধারাটি যদি অনুসরণ করা যায় তবে দেখা যাবে তিনি অতীতের প্রাচ্য সংস্কৃতি থেকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে নয়,—পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ভিতর দিয়ে পার হ'য়ে এসে একটা নূতন সভ্যতার দিকে অগ্রসর হ'চ্ছেন,—যা' প্রাচ্যও নয়, পাশ্চাত্যও নয়, পরন্তু দুটোকেই অতিক্রম করে গিয়েছে,—উদারতায় ও প্রসারতায়"।

এমন ধর্ম্মের মূল্য অতিরঞ্জিত করা যায় না। অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং অযথা ভ্রান্ত ধারণা সকল সামাজিক জীবনে যত কিছু দোষের সঞ্চার করেছিল এক শতাব্দীর মধ্যে তার অনেকটা উৎপাটিত হ'য়েছে এরই প্রভাবে। কিন্তু সেটাই সব নয়। সকল জাতির সমন্বয়-চেষ্টার যে ধারা ভারতবর্ষে যুগ যুগ অতিক্রম ক'রে প্রবাহিত হ'য়ে এসেছে, সেই ধারাই অব্যাহত রাখতে চায় রামমোহন-প্রবর্ত্তিত এই নূতন ধর্ম্ম। এরই অনুপ্রেরণায় পরাধীন ভারতবর্ষও বিশ্বের কাছে বলে,—মহামিলনের যে সৃজনশীল আদর্শ, তারই কথা। রবীন্দ্রনাথ এই বাণীই বিশ্বের সমস্ত জাতির নিকট বহন করেছেন।

প্রবর্ত্তনার পর থেকে এই নূতন ধর্ম্মের একশো বছরের

ইতিহাসের বিস্তৃত আলোচনার এখানে আমাদের প্রয়োজন নেই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কর্ম্ম কতখানি ও কেমনভাবে এই নূতন ধর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করেছিল, আমরা এখানে শুধু সেইটুকুরই একটু আলোচনা করব ; তাহ'লেই রবীন্দ্রনাথ যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তারই কতকটা ধারণা করা যাবে।

ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পর রামমোহন রায় আর বেশি দিন বেঁচে ছিলেন না। যে বৎসর ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় তার পর বৎসরই ইংলণ্ড যাত্রা করেন এবং সেইখানেই দেহত্যাগ করেন বৎসর দুই পরে। কাজেই এত অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর নূতন ধর্ম্মের প্রভাব তেমন ভাবে বিস্তৃত করবার স্থযোগ পান নি তিনি। প্রায় নয় বৎসর পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ বেঁচেছিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পিতা দ্বারকানাথের অর্থ সাহায্যে। তারপর মহর্ষি নিলেন তাকে তার মহৎ লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করবার ভার। প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্ম সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন রামমোহন, তাকে লালিত ও বর্দ্ধিত করেছিলেন মহর্ষি। আজ ভারতবর্ষের নবজীবনে, নব-উদ্দীপনায় রয়েছে যে অনুপ্রেরণা, যে সৃজনবেগ,—তার আদি উৎস মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথেরই মধ্যে।

রামমোহনের জীবন ও কর্ম্মের দ্বারা মহর্ষি প্রভাবিত হ'য়েছিলেন অনেক পূর্ব্বেই,—কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের কথা বোধহয় প্রথমে জানতেন না ; তাই ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্ম-সমাজেরই অনুরূপ আদর্শে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' নামে আর একটি সভা প্রতিষ্ঠিত করেন,—উদ্দেশ্য ছিল,—সত্যজ্ঞানের প্রচার, মূর্ত্তিপূজার নিবারণ এবং এক ঈশ্বরের আরাধনা। তিন বৎসর পরে এই সভা মিশে যায় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে। এতদিন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ ছিল একটা নাতিবৃহৎ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ,—যার পূজারীরা একসঙ্গে মিলে এক পরমপুরুষের ধ্যান ও উপাসনা করবার স্থযোগ অন্বেষণ করতেন। সত্যজ্ঞানের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ক'রে,—সকল রকমের অযথা ধারণা থেকে চিত্তকে মুক্ত ক'রে,—তাঁরা এই নিরাকার ব্রহ্ম-আরাধনার মধ্যে অনুসন্ধান করতেন অনির্ব্বচনীয় আনন্দ, সত্যের উপলব্ধি, এবং মানুষ ও তার সৃষ্টিকর্ত্তার মধ্যে নিবিড় যোগ। কিন্তু মনুষ্যত্বের উপকারের জন্য তাঁদের নবোপলব্ধ এই সত্য প্রচার করার কথা তাঁরা কখনো চিন্তা করেন নি। মহর্ষি এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন,—এবং ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে এক প্রচার-বিভাগ জুড়ে দিয়ে তাঁর নব-প্রতিষ্ঠিত সভা 'তত্ত্ব-বোধিনী'কে দিলেন সেই প্রচার কার্য্যের ভার। অচিরে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' নামে এক মাসিক পত্রের প্রচলন হ'ল। এবং ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই এই সভা এমন খ্যাতি অর্জ্জন ক'রে ফেলল,—যার দ্বারা তার প্রগাঢ় প্রভাব ও প্রতিপত্তি বেশ বিস্তৃত ভাবেই পরিলক্ষিত হ'তে লাগল, ভারতের ধার্ম্মিক ও সামাজিক জীবনে।

অথচ এই তরুণী সভার কর্ম্মপথ মোটেই সহজ ও কণ্টকবিহীন ছিল না। যে সব মূঢ়তা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এ-কে যুদ্ধ করতে হয়েছিল, সাধারণ জীবনের গভীরে গভীরে তাদের শিকড় ছিল গাঁথা ; সেগুলিকে উৎপাটিত করা কম কষ্টকর ব্যাপার নয়। মিশনারিদের ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করানোর প্রচেষ্টাকে বাধা দেবার জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন ক'রে মহর্ষি বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভদ্রলোকদের অনুরোধ করলেন ছেলে-মেয়েদের তাঁর স্কুলে পাঠাবার জন্য। অন্যদিকে খৃষ্টীয় মিশনারি প্রচার-কার্য্য পূর্ব্বেই অনেকখানি সফলতা লাভ করেছিল,—এখন তাকে রোকা দায়। কাগজে চলল তুমুল তর্ক-বিতর্ক। বিশেষ ক'রে আলেকজান্দার ডফ্ তাঁর "India and India's Missions" বইখানিতে হিন্দুধর্ম্ম ও বেদান্ত দর্শনকে করলেন আক্রমণ ; মহর্ষি দিলেন উত্তর, কয়েকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধে, প্রথমে'তত্ত্ববোধিনী'তে পরে 'Vedanta Doctrines Vindicated' নাম দিয়ে পুস্তকাকারে। এই সব তর্ক-বিতর্কে তুমুলভাবে নাড়া খেয়েছিল ভারতের চিত্ত। সমাজ-সংস্কারের তুমুল আন্দোলনে ব্রাহ্ম-সমাজ হ'ল ত্রিধা বিভক্ত, ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্যের অধীনে ; তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। এ আন্দোলনের বিস্তৃত ইতিহাসের মধ্যে প্রবেশ করার আমাদের প্রয়োজন নেই, শুধু এইটুকু বললেই হবে, যে রবীন্দ্রনাথ যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন,

সামাজিক ও ধার্ম্মিক আন্দোলনে সারা ভারতবর্ষ তখন সচকিত ও মুখরিত।

মনে রাখতে হবে যে এ আন্দোলন অতীতের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। রামানুজ-প্রবর্ত্তিত বেদান্তমতে আর ভক্তিতত্ত্বে ছিল এর অনুপ্রেরণা, কিন্তু সর্ব্বোপরি এর সারথি ছিল মানুষের যুক্তি। এই যুক্তি অবশ্য প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল, আপ্তবাক্য হিসাবে বেদান্তের প্রামাণ্য সম্বন্ধে অনেক তর্ক-বিতর্কের পর। "বেদান্ত"* কথাটির অর্থ মনের মধ্যে পরিষ্কার না থাকায় এই তর্কের অনেকখানি ছিল অস্পষ্ট ও গোলমেলে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বেদান্তের ঐশ্বরিক প্রামাণ্য অস্বীকারই করা হ'য়েছিল। কিন্তু এই অস্বীকৃতিটা হ'ল বেদান্তের একটা বিশেষ ব্যখ্যা সম্বন্ধে: শঙ্করাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত চিন্তা-সর্ব্বস্ব হিম-শীতল অদ্বৈতবাদই এই নূতন ব্রাহ্মধর্ম্ম করেছিল প্রত্যাখ্যান; এ কথা বলেনি যে যা-কিছু দার্শনিক মতবাদ 'বেদান্ত'-আখ্যা দাবি করে সবই অস্বীকার্য্য। বরঞ্চ বেদান্তের ভিত্তিভূমি যে উপনিষদ, তা-ই থেকেই নানা শ্রুতি আহরণ ক'রে মহর্ষি তাঁর "ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম" শীর্ষক পুস্তকখানি প্রণয়ন করেছিলেন, যে-পুস্তক সকলেই প্রামাণ্য ব'লে স্বীকার করেন, এবং যার মধ্যে ব্রাহ্মদের দৈনিক জীবনের পদ্ধতি নির্ণীত আছে।

এদিক দিয়ে দেখলে, বাইবেল যেমন খৃষ্টধর্ম্মের আশ্রয়, বেদান্ত ঠিক তেমনি ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় নয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম নির্ভর করে, প্রথমত ও প্রধানত, যুক্তির উপর,—অথচ সকল ধর্ম্মের অন্তরতম প্রাণ যে 'বিশ্বাস' সেই বিশ্বাসকেও ত্যাগ করে না। অন্য কথায় ব্রাহ্মধর্ম্মের আবেদন, একাধারে মানুষের যুক্তিতে ও হৃদয়ে। তার শিক্ষা হ'চ্চে, শ্রুতি ব'লে কিছু গ্রহণ ক'রো না, যতক্ষণ না পর্য্যন্ত যুক্তি, হৃদয়ের সঙ্গে মিলে, তাতে সাড়া দেয়। তলিয়ে দেখলে প্রাচীন ভারতেরও ধর্ম্ম-বিশ্বাস এই প্রকারেরই। ধর্ম্ম-বিশ্বাসটা যুক্তিবিহীন বা সম্প্রদায়গত কোনো বিশ্বাস নয়;– চেতনার গভীরে গভীরে এর বাসা বা শিকড়;—এক কথায় আত্মাকে ঘিরে আছে যে বিশ্ব-সত্তা তারই প্রতি আত্মার প্রতিক্রিয়া।

মধ্যযুগের তমসাচ্ছন্ন শতাব্দীগুলি বেয়ে এই ধরণের ধর্ম্ম-বিশ্বাস, বিশ্ব-সত্তার প্রতি মানব-চিত্তের এই ভাব তন্দ্রালস ভারতবর্ষের মর্ম্মের মধ্যে গোপন ছিল; শুধু মাঝে মাঝে বিজলীর চমকের মত আত্মপ্রকাশ করেছে কবিদের মর্ম্মকাব্যের মধ্যে। বর্ত্তমান যুগে মহর্ষির উপর ভার পড়ল এই বিশ্বাসকে উজ্জ্বল বর্ণে পুনরুদ্দীপিত করবার—এবং তারই আলোকে বিশ্বের সকল মানবের পুনর্মিলনের মহতী আশা মানব-চিত্তে সঞ্চারিত করবার। মহর্ষির অধিকাংশ দেশবাসিদের চিত্তে অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুক্তির যে বিদ্রোহ, তা একটা উৎকট বাড়াবাড়ি রকমের খরধার আকার ধারণ করেছিল; যুক্তি চেয়েছিল জীবনের সকল রাজ্যই অধিকার করতে, বিশ্বাসকে কিছুই না ছেড়ে। মহর্ষির চিত্তে কিন্তু এই বিদ্রোহ দ্রবীভূত হ'য়েছিল, এমন একটা বিশ্বাসের দ্বারা যা তাঁর অন্তরের তলদেশ থেকে উত্থিত হ'য়ে বহুদিনের বেদনা-সমৃদ্ধ ধ্যান ও আয়াস-সাধ্য গবেষণার ফলে পরিণত হয়ে'ছিল একটা জীবন্ত শক্তিতে। তাঁর 'মহর্ষি' নামেরই উপযুক্ত গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তিনি বুঝেছিলেন যে শুধুই যুক্তির দ্বারা সত্যকে ঠিক পাওয়া যায় না, যা' পাওয়া যায় তার মূল্য অবশ্য অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু তা' আমাদেরকে দেয় একটা নৈর্ব্যক্তিক জ্ঞান। যুক্তি ছাড়াও চাই আমাদের একটা অন্তর-বোধ, জীবন্ত বিশ্বাস দিয়ে যা পরিমার্জ্জিত, এবং অন্তর্ভেদী ধ্যান দিয়ে যা সুপরিণত। যুক্তি দিয়ে মহর্ষি যা জ্ঞানলাভ করতেন তাতে তৃপ্ত হ'তে পারতেন না,—যতক্ষণ না অন্তর-বোধের সমর্থন পেতেন। 'আত্ম-জীবনী'র একজায়গায় তিনি বলেছেন, "কতদিন ধরিয়া এইটি আমার বুদ্ধির আলোচনায় স্থির করিলাম; কত সাধনার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম। তথাপি আমার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। জ্ঞান-পথ অতি দুর্গম

* 'বেদান্ত' কথাটির প্রকৃত অর্থ বেদের অন্ত। উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত যে দার্শনিক মতবাদ বাদরায়ণ ব্রহ্ম-সূত্রের মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাকেই বলা হয় 'বেদান্ত'। এই ব্রহ্ম-সূত্রের শঙ্কর, রামানুজ, মাধ্ব, নিম্বার্ক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্যকারের ভিন্ন ও বিরুদ্ধ ভাষ্য আছে, এবং প্রত্যেকটা ভাষ্যই 'বেদান্ত'-আখ্যা দাবি করে।

পথ; এ পথে সাহস দেয় দেয় কে? আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম তাহাতে সায় দেয় কে?"

এই সমর্থন মহর্ষি পেয়েছিলেন উপনিষদের মন্ত্রগুলির মধ্যে। সেগুলি তিনি যত্ন সহকারে পাঠ ক'রে প্রয়োজনমত সংগ্রহ করেছিলেন। সেগুলির নিগূঢ় অর্থের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন এমন গভীরভাবে যে, তাদের রচয়িতাদের সঙ্গে অনুভব করতেন আপনার একাত্মতা। সেই সব প্রাচীন মন্ত্র-রচয়িতাদের সঙ্গে তাঁর একাত্মতা-বোধটি তিনি পরিবারের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন। তাইতে যে আবহাওয়ার সৃষ্টি, তারই মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জন্ম; এবং তারই মধ্যে তাঁর চিত্তের বিকাশ। মহর্ষির চিত্তেরই অনুরূপ সে চিত্ত,—তেমনই যুক্তি-নির্ভর, তেমনই বিশ্বাসের আলোকে উদ্ভাসিত,—যে আলোকে সহজেই বিশ্ব-সত্তার অন্তর-স্বরূপের প্রতি দৃষ্টি উন্মুক্ত হয়। 'যুক্তি' ও 'বিশ্বাসে'র মহামিলন,—এইটেই হ'ল বিপুল সম্পত্তি—উত্তরাধিকার সূত্রে যা' পেয়ে রবীন্দ্রনাথের মেধা তাকে এত গৌরবের সঙ্গে ব্যবহার করেছে।

এমনি ক'রেই পাশ্চাত্যের সংস্পর্শ যতই প্রবল শক্তিতে আলোড়িত করুক না কেন ভারতবর্ষের চিন্তাকে, তা' ভারতবর্ষকে জাগ্রত করেছিল, প্রগাঢ় ভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল, কিন্তু তার নিজস্ব সংস্কৃতির মূল স্বরূপকে বিনাশ করতে পারেনি। তার কারণ পাশ্চাত্যের এই আঘাত রাজা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছিলেন ভারতবর্ষের নিজস্ব মেধা দিয়ে, যা' বাইরের সব কিছুই গ্রহণ করতে পারে. কিন্তু আপনার জাতীয়তা হারায় না। অবশ্য আমরা একথা মোটেই বলতে চাই না যে ভারতবর্ষের চিত্ত অতি প্রাচীন কালে যেখানে ছিল, আজও ঠিক সেইখানেই আছে। যুগে যুগে অপরিবর্ত্তিত থাকাটা শুধু মৃত চিত্তের পক্ষেই সম্ভব,—এবং ভারতবর্ষের চিত্ত নিঃসন্দেহই জীবন্ত ও জাগ্রত। আমরা শুধু এখানে দেখাতে চেয়েছি কোন দিকে,—ইংরেজি শিক্ষার আলোকে জাগরিত হ'য়ে ভারতবর্ষের এবং বিশেষ ক'রে বাংলাদেশের মেধা পরিণতি অনুসন্ধান করেছে।

কোনো জাতিরই মেধার পূর্ণ বিকাশ হ'তে পারে না, তার মাতৃভাষার মধ্যে দিয়ে না হ'লে। ঋষির অভ্রান্ত দূরদৃষ্টি দিয়ে এই সত্য রামমোহন বুঝেছিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলেছি, ইংরেজি শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি জাতীয় সাহিত্যের পুনরুদ্বোধনের চেষ্টা করেছিলেন বাংলা ভাষায় বেদান্ত অনুবাদ করে।

কোনো কিছুতেই তাঁকে নিরুদ্যম করতে পারেনি। তাঁর সময়কার বাংলা ভাষায় গদ্য সাহিত্য ছিল না,—তিনি লেগে গেলেন তা' সৃষ্টি করতে, এবং বেদান্তশাস্ত্রের বঙ্গানুবাদের ভূমিকায় পাঠকদের জন্য নির্দ্দেশ ক'রে দিলেন, কেমন ক'রে বাংলা গদ্য পড়তে হ'বে এবং বুঝতে হ'বে। অবশ্য মনে রাখতে হ'বে, উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির জটিল ভাবরাজি প্রকাশের ক্ষমতা প্রথম সৃষ্টিতেই বাংলা গদ্যের হয়নি; ততটা পরিণতি লাভের জন্য কিছু সময়ের প্রয়োজন। অথচ তরুণ বাংলার নবজাগ্রত চিত্ত য়ুরোপীয় চিন্তার মোহে পড়ে অতখানিটা সময় অপেক্ষা করতে পারল না; হাতের কাছেই ছিল বেশ ব্যবহার-যোগ্য একটা পন্থা,—অতএব, ইংরেজি ভাষারই আশ্রয় সে গ্রহণ করল, তার আকাঙ্ক্ষাকে একটা যৌবনোদ্বেল আকার দিতে। তার মধ্যে খানিকটা ছিল ভারতীয় প্রথা ও প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি ঘৃণা,—কতকটা হয়ত অধৈর্য্য ও অন্ধতা প্রসূত, কতকটা বা মিশনারীদের প্রভাবজনিত। এমনি করেই প্রাগ্-রবীন্দ্র যুগের শ্রেষ্ঠতম কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রথমে ইংরেজিতেই তাঁর কাব্য-বীণা বাজিয়েছিলেন,—পরে ভুল বুঝতে পেরে মাতৃভাষার কোলে ফিরে এসেছিলেন এবং প্রভূত ধনে মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। তাঁর কথা যাই হোক, এই কারণে বাংলা সাহিত্য অনেক কৃতী লেখককে হারিয়েছে, যাঁরা ইংরেজি ভাষায় রচনা করাই সুবিধা মনে করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে তরু দত্ত ও মনমোহন ঘোষের নাম উল্লেখ-যোগ্য। এই ক্ষতির অবশ্য অন্য একটা দিক আছে, এবং এর জন্য ভারতবর্ষের যে কিছু সুবিধাও হয়নি, তা নয়। ইংরেজি ভাষায় আত্ম-প্রকাশের এই বিপুল চেষ্টার ফলে য়ুরোপীয় চিত্তের সঙ্গে একটা নিবিড়তর যোগসাধন করবার সুযোগ পেয়েছিল ভারতবর্ষ—অথবা বলা যেতে পারে,—যে,

পাশ্চাত্য মেধার যা' বিশিষ্ট গুণাবলী, অর্থাৎ ভাবের স্বাধীনতা, যুক্তির সুনির্দ্দিষ্ট প্রণালী, ভাষার প্রকাশশক্তি,—সে-সব চমৎকার মিলে গিয়েছিল,—ভারতীয় মেধার যা' বিশিষ্ট গুণ তার সঙ্গে,—অর্থাৎ একটা মরমী ও অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি, অনায়াসেই বিশ্ব-সত্তার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ-ক্ষমতা। এই সংমিশ্রণের রাসায়নিক ক্রিয়ায় উৎপন্ন হ'য়েছিল যে নূতন চিত্ত, তার বিপুল শক্তি মাত্র ত্রিশ বৎসরের মধ্যে সম্পন্ন করেছিল সেই কাজ যা' স্বচ্ছন্দে ছুটো শতাব্দীর কাজ বলে ধরা যেতে পারে। এই জন্যই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও যে-সব লেখকেরা মাতৃভাষার চর্চ্চাতেই প্রবৃত্ত হ'য়েছিলেন,—তাঁরা অসাধ্য-সাধনই করেছিলেন। রাম-মোহনের মৃত্যুর মাত্র ত্রিশ বৎসরের মধ্যে, বাংলা গদ্যে তাঁর প্রথম ভাব-প্রকাশের চেষ্টা পরিণত হ'ল একটা বিপুল আন্দোলনে। সাহিত্যে জীবনের যে প্রকাশ তার আকার এমন পূর্ণতা প্রাপ্ত হ'ল, এবং ভাবরাজি ওজস্বিনী ভাষায় এমন একটা সতেজ রূপগ্রহণ করল, যে জাতির উন্নতি-বিধায়ক কর্ম্মক্ষেত্রে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'তে আর একটুও বিলম্ব হ'ল না। একদিকে কাব্যাবেগ সকল বিকশিত হ'য়ে উঠল মধুসূদনের গম্ভীর ছন্দের ঝঙ্কারে, এবং তাঁর পরেই সেই তানে সুর মেলালেন আরও অনেক কবি; তাঁদের মধ্যে বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর কাব্য রবীন্দ্র-নাথকে ব্যক্তিগতভাবে অনেকখানি স্পর্শ করেছিল; অন্য দিকে 'তত্ত্ব-বোধিনী'র প্রথম সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর থেকে আরম্ভ করে অনেক লেখক গদ্য-সাহিত্যের আকারকে এমন একটা পূর্ণতার দিকে অগ্রসর করে দিলেন—যা', বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে বিপুল শক্তি সঞ্চয় করে সমস্ত জাতিকে জাগ্রত ও চঞ্চল করে তুলল,—কি সাহিত্যিক চিন্তাক্ষেত্রে, কি সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও ধার্ম্মিক কর্ম্মক্ষেত্রে। এই বঙ্কিমচন্দ্রের নামেই প্রাগ্-রবীন্দ্র যুগের নামকরণ করা হ'য়েছে। তিনি বাংলা দেশকে এমন কতকগুলি উপন্যাস ও ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ দান করে গিয়েছেন যার মধ্যে জীবন্ত ভাবরাজির একটা চঞ্চল শিহরণে দেশের সপ্তকোটি সন্তান জাগ্রত হ'য়ে উঠল, সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠল, কম্পিত হ'য়ে উঠল; তাদের মিলিত কণ্ঠ দিয়ে সমস্বরে উদ্গীত হয়ে উঠল তাঁরই রচিত জাতীয় মন্ত্র,—'বন্দে মাতরম্'। ভাগবদ্গীতার যে শিক্ষা,—দৈনিক জীবনের মধ্যে বুদ্ধি, আবেগ ও ইচ্ছাশক্তির পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য ও সমন্বয় বিধান কর,—সেই বাণী এই ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র আবার দেশবাসীকে শোনালেন, এবং দেশের নবপ্রারব্ধ রাষ্ট্রীয় আন্দালনকে ও নবজাগ্রত জাতীয় চেতনাকে রাঙিয়ে দিলেন একটা পবিত্র ধর্ম্মভাবের রঙে। প্রকৃতপক্ষে আমরা আগেই বলেছি,—ভারতবর্ষকে চিরকাল অনুপ্রাণিত করেছে একটা ধার্ম্মিক অনুপ্রেরণা, এখনো তাকে আলোড়িত করে, সেই ধার্ম্মিক অনুপ্রেরণা; এবং পাশ্চাত্যের সংস্পর্শ থেকে সে যে-শিক্ষাই গ্রহণ করুক না কেন, এখনো পর্য্যন্ত তার সমস্ত আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত ও রূপায়িত করে সেই অনুপ্রেরণা। বিশ্বের সমক্ষে আজ যে-সমস্ত সমস্যা উত্থাপিত হয়েছে, তার সমাধানের জন্য পৃথিবীর সকল জাতিকে রবীন্দ্রনাথ যে-আদর্শের কথা বলেছেন, প্রেমের সেই সৃজনশীল আদর্শ,তারও মূলে এই ধার্ম্মিক অনুপ্রেরণা।

সামাজিক, ধার্ম্মিক, সাহিত্যিক, রাষ্ট্রীয় এই সমস্ত আন্দোলনের মাঝখানে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৬১ সনের ৬ই মে, এমন একটা পরিবারে যার উপর দিয়ে এই সকল ভাবের ধারা প্রবল বন্যায় বয়ে গিয়েছিল। অর্দ্ধ শতাব্দী ব্যাপী তাঁর নানা রচনার মধ্যে তিনি এর প্রধান ও গভীর ইঙ্গিতপূর্ণ সুরটি ধরেছেন; কত সহস্র বৎসর ধরে, ভারতবর্ষের গোপন প্রাণে যে বেদনা বেজেছে,—তার কম্পন তিনি অনুভব করেছেন প্রাণের মধ্যে এবং সুরে, ছন্দে, কথায়, রচনায়, রেখায় রঙে তাকে একটা গভীর আকুল ও প্রাণস্পর্শী প্রকাশ দিয়েছেন। রাম্‌সে ম্যাকডোনাল্ড তাঁর সম্বন্ধে যা' বলেছেন,—তা' অক্ষরে অক্ষরে সত্য—"রবীন্দ্র নাথের কাব্য,—সে-ই ত ভারতবর্ষ। সে ত ব্যক্তিবিশেষের আবেগ নয়,—একটা সমগ্র জাতির আত্মা। তার মধ্যে শুধু একটা কাব্যিক মনোভাব নেই, আছে সমগ্র জীবনের একটা সুসম্বদ্ধ দৃষ্টি,—তার চেয়েও বেশি, একটা সংস্কৃতি,—যা' তাঁর যুগকে অতিক্রম করে গিয়েছে"।

(ক্রমশঃ) শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র

উল্কা

সম্পূর্ণ উপন্যাসিকা

শ্রীমতী ইলা দেবী

এক

রাজনারায়ণ বাবু অনেক দিন হল বিপত্নীক। তাঁর অনেকগুলি পুত্রকন্যার ভিতর শ্রীলতা ছিল সকলের হতে একটু পৃথক। বড় মেয়ে সংসার দেখা-শোনা করে; অনেকগুলি ভাইবোনের ভার তার ওপরে। আর একটি মেয়ে স্কুলে পড়িয়ে কিছু উপার্জ্জন করে,—গৃহস্থসংসারের অভাবের আকর্ষণ তাতে একটু শিথিল হয়। শ্রীলতা তৃতীয়া; নামের সঙ্গে চেহারার সামঞ্জস্য বিরল প্রায়, কিন্তু শ্রীলতাকে দেখে মনে হয় ওর অন্য নাম যেন হতেই পারত না। জীবনভরা একঘেয়েমিকে টোটাবার সে যেন এক নবতর ছন্দ,—অপরাজেয় অবসাদের মাঝে অনন্ত আনন্দের বিজয়গাথা। শ্রীলতা মেডিক্যাল্ কলেজে ডাক্তারি পড়ছে—প্রথম বৎসর সবে সেখানে তার।

কলেজের অধ্যাপক জ্যোতিষের সঙ্গে শ্রীলতার পরিচয় কতকটা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। জ্যোতিষ বিলাত হতে মেডিক্যাল সার্ভিসে নিযুক্ত হয়ে এসেছেন। গম্ভীর প্রকৃতির লোক, যৌবনসীমা শেষ হয়ে এলেও বার্দ্ধক্যের বিলম্ব আছে। জ্যোতিষ শ্রীলতাকে তাঁর মোটারে গৃহে পৌছে দিয়ে আসতেন প্রায় নিত্য। কোনদিন পৌছবার পথকে দীর্ঘায়িত করে গড়ের মাঠ বা লেকের ধার দিয়ে ঘুরে বিলম্বে ফিরতেন। শ্রীলতার শিশু ভাইবোনের সঙ্গে অর্থহীন গল্পে অকারণ সময় নষ্ট করতেন। ছাত্ররা এই নিয়ে অন্তরালে কৌতুক করতে ছাড়ত না। কিন্তু শ্রীলতার এসবে খেয়াল ছিল কি-না বোঝা যেত না। পরিণত একটি ফলের মত জীবন তার তখন বর্ণগন্ধরস-প্রচুর, তার নিজের রঙীন অন্তরলোকের রং মিলিয়ে সে স্বপ্ন বোনে, তার নিজের অগণিত অশান্ত কল্পনায় সে সুদূর মায়ালোকে উধাও হয়ে যায়। তার চিত্তে চলেছে সমারোহ—তাই জীবনে তখন এমন একটি প্রাচুর্য্যের শুভমুহূর্ত্ত, যখন বাহির হয়ে গেছে অপ্রয়োজনীয়। নিজের মাঝেই নিমগ্ন সে—বাহিরের সংসারে তার যে দৃষ্টি সে দৃষ্টির প্রতিফলিত ছায়া অন্তরে কায়া লাভ করতে পায় না।

কিন্তু শ্রীলতা যখন নিজের স্বপ্নে বিভোর জ্যোতিষ তখন তাকে স্বপ্ন দেখতে সুরু করেছেন। তিনি ক্রমে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। সেদিন মাঘের শেষের একটা দিন। দুএকটা কৃষ্ণচূড়া গাছ ফুলের ফাগে সবে লাল হয়ে উঠেছে, নারকেল পাতা আন্দোলিত করে মিষ্টি একটা বাতাস—উত্তরে হাওয়ার উদাস-করা সুর তাতে শেষ হয়নি তখনো, আর দক্ষিণে হাওয়ায় যৌবনঘন নেশা লেগেছে এসে। লেকের ধারে নরম সবুজ ঘাসের ওপর বসে শ্রীলতা ঝুঁকে জলের দিকে চেয়ে আছে—একএকবার আঙ্গুল দিয়ে স্পর্শ করছে জলকে। মৃদুল গোধুলির আলোয় এই মেয়েটির ঝুঁকে বসা ভঙ্গী, তার শিথিল কপোলস্পর্শী কুন্তলগুচ্ছ—কবরীর ফুল—তার রঙীন শাড়ীর লুটিয়ে পড়া অঞ্চল,—সবে মিলে সম্পূর্ণ সুন্দর একটি চিত্র রচেছে। জ্যোতিষ পাশে বসে নীরবে দেখছিলেন তাকে।

শ্রীলতা বললে, "চলুন যাওয়া যাক এবার।"

জ্যোতিষ বললেন, "এত শিগ্‌গির?"

শ্রীলতা বললে, "আমার পড়তে হবে যে গিয়ে।" তারপর একটা তৃণগুচ্ছ ছিঁড়ে নিয়ে বললে, "আপনার ভারি একলা লাগে বাড়ীতে, না?"

"ভয়ানক।" জ্যোতিষ একটু থেমে বললেন, "একটা কথা আজ শুনবে শ্রীলতা?"

"কি কথা, বলুন না।"

জ্যোতিষ অনেকক্ষণ নীরব রইলেন। এতদিন ধরে তিনি ওই কথাটাই ভাবছেন, তবু বলতে দ্বিধা লাগে। নিরাশ হবেন, মুহূর্ত্তের জন্যও একথা ভাবতে ইচ্ছা করে না, অথচ আশাও যেন ঠিক হয় না। শ্রীলতা যেন এক

উচ্ছল নির্ঝর,—তুষারমৌলি পাহাড়ের বরফগলা মর্ম্মবাণী,—পাত্রে ভরে বদ্ধ রাখা যায় কি ওকে? যখন সে দূরে থাকে বোঝা যায় না, কাছে এলে পার্থক্য নির্ম্মম হয়ে ওঠে—মনে হয় এ যেন অত্যন্ত তরুণ, তরল।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর জ্যোতিষ বললেন, "কত একলা লাগে জান কি? এতদিন পড়াশোনা কাজকর্ম্মে কোথাদিয়ে কেটেছে বুঝতেই পারিনি, অবসর ত ছিল না। তারপর তোমায় যখন দেখলাম, কী যেন ভুলে এসেছি এতদিন মনে হয়। কাজ সবই বাজে হয়ে যায় তার চরিতার্থতা না আসে যদি। আমার সে চরিতার্থতা কবে আসবে?"

শ্রীলতা রহস্যবিস্ময়ভরা দুই চোখ মেলে স্থির হয়ে বসে ছিল, কিছু বললে না।

জ্যোতিষ গম্ভীর স্বরে বললেন, "তুমি আমার শূন্য ঘরে এসো শ্রীলতা। আমার সব কাজ সার্থক হবে তাহলেই। এই কথাটাকে এতদিন আমি দিনরাত ভাবছি।"

শ্রীলতা উদাস দৃষ্টিতে জলের দিকে চেয়ে ছিল, বললে, "আশ্চর্য্য, কেন আপনি আমায় এভাবে দেখলেন।"

"যেদিন তোমায় দেখলাম শ্রীলতা, এই সত্যটি দিলে তুমি,—তাই এত ভালবাসলাম তোমায়।"

হাতের তৃণগুচ্ছটা ছিন্ন করে ফেলে দিয়ে শ্রীলতা বললে, "কিন্তু কেন আপনি বাসলেন,—আমিত কখনো ওভাবে দেখিনি আপনাকে।"

জ্যোতিষের মুখ আঁধার হয়ে গেল। বহুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বললেন, "কিন্তু চেষ্টা করলেও কি কখনো বাসতে পারবে না?"

শ্রীলতা দুহাতে জড়ানো জানুর ওপর চিবুক রেখে বসে ছিল,—দৃষ্টি তার আঁধার, গভীর। ধীর স্বরে বললে, "তা কখনো হতে পারে না। আপনি আমার শিক্ষক, আমি ছাত্রী, এ ছাড়া অন্য সম্বন্ধ একেবারে অসম্ভব। আপনিও আমায় সেই ভাবে দেখবেন।" সে উঠে পড়ল।

দুজনে সারা পথ নীরবে এল। গৃহে পৌছবার আগে শ্রীলতা কোমল স্বরে বল্‌লে, "আমারি অন্যায় হয়েছে, আগে বোঝা উচিত ছিল। ক্ষমা করবেন।"

জ্যোতিষ বললেন, "ক্ষমার এতে কিছু নেই। কাউকে ভালবাসা না বাসা এর জন্যে কাউকে দায়ী করা আমার স্বভাব নয়।"

শ্রীলতা নিজের ঘরে চলে গেলে জ্যোতিষ বারান্দায় অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। শ্রীলতার ভাইবোনেরা কতগুলো ছবি নিয়ে আনন্দ কোলাহল করছিল। তাঁকে দেখতে পেয়ে তারা ছুটে এল,—একটি মেয়ে হাত ধরে টেনে বললে "দেখুন না টেবি নিজে পাচখানা ছবি রেখেছে, আর আমায় মোটে একখানা দিয়েছে! আপনি ওকে বকে দিন না।"

জ্যোতিষ ছবিগুলো হাতে নিয়ে বললেন, "কোথায় পেলে এ সব?"

"ওসব বিলেত থেকে দেবব্রত বাবু পাঠিয়েছেন।"

"দেবব্রত বাবু কে?"

পারুলের বয়স বছর বার-তের, একটু পাকা গোছের মেয়ে, বললে, "ওমা জানেন না, দেবব্রত বাবুর সঙ্গে যে ছোটদির বিয়ে হবে, কবে থেকে ঠিক হয়ে আছে। বিলেত থেকে তিনি ফিরলেই হবে।"

জ্যোতিষ খুব বড় একটা ধাক্কা সামলে নিলেন। প্রত্যাখ্যানে আঘাত ছিল, জ্বালা ছিল না, প্রতিবন্ধকতার সন্ধানে সব আশার সমাপ্তি হয়ে যায়, বাকি থাকে একটা তুলনামূলক ঈর্ষা। কি নির্বোধ তিনি! শ্রীলতা তার মনের সমস্ত মমতায় আর একজনের চিন্তাকে লালন করছে এটা তাঁর বোঝবার বুদ্ধি হল না,—আর বোকার মত তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করে নিজেকে হাস্যাস্পদ করলেন! নিজের মনোভাবটা জ্যোতিষ নিজেই ঠিকমত বুঝে উঠতে পারছিলেন না;—শ্রীলতা যে তাঁকেই বিয়ে করবে এমন কোন কথা ত ছিল না—তবে তাঁর আত্মাভিমান এমন আহত—মন এত ক্রুদ্ধ কেন? অন্তরভরা তাঁর এ জ্বালা, এত হিংসা কিসের? কিন্তু যুক্তির দিকে অন্তর দেখে না, অত্যন্ত অবুঝ আদিম ঈর্ষাটা কিছুতেই পরাভব মানে না। গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত সেদিন জ্যোতিষ মুক্ত ছাদে পদচারণা করে কাটালেন।

দুই

"এবার নতুন জায়গা ক্রমে ক্রমে ভাল লাগছে ত? কাজকর্ম্ম কিরকম বলুন?" জ্যোতিষ অতিথিকে এক-পেয়ালা চা ঢেলে দিয়ে পাইপে অগ্নিসংযোগ করে প্রশ্ন করলেন।

পেয়ালাটা তুলে নিয়ে দেবব্রত বললে, "লাগছে মন্দ নয়, তবে একেবারে ছোট কলেজ, prospect কিছু নেই। আর ভারি dull—তবু ভাগ্‌গিস্ আপনি ছিলেন।"

"হ্যাঁ, প্রথমটা dull লাগবে। আমার ত কলকাতা ছেড়ে এসে বেজায় ফাঁকা মনে হত, তারপর অভ্যাস হয়ে গেল।"

"কিন্তু আপনি কলকাতা ছাড়লেন কেন বলুন ত? ইচ্ছে করে লোকে এই নির্বাসনে আসে!"

"কলকাতা থাকতে আর ইচ্ছে হলনা, এই আর কি।" কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, "তারপর, আপনার বিয়ের কবে ঠিক হচ্ছে? তখন আর নির্বাসন বলে মনে হবে না।"

দেবব্রত স্মিতমুখে বললে, "এবার কলকাতায় গেলে সে সব ঠিক হবে। আপনি যাবেন বলেছেন, মনে থাকবে ত?"

"হ্যাঁ সময় পেলে যাওয়া যাবে বৈকি। আপনার হয়ে গেছে, আপনাকে গাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসি চলুন।"

"না না, আপনি কেন কষ্ট করবেন।"

"কষ্ট কি, আপনার বাড়ীতে যাইনি, বাড়ীটাও দেখা হয়ে যাবে।" দেবব্রত হেসে বললে "দেখার মত Warwick Castle ত নয়, আমি বরং হেঁটে যাই, খানিকটা বেড়ান হবে।"

সে চলে গেলে জ্যোতিষ নিবন্ত পাইপটা দাঁতে চেপে অনেকখন চুপ করে বসে রইলেন। দেবব্রত সম্প্রতি এখানের কলেজে অধ্যাপনায় এসেছে। প্রথমে এসে সে যখন প্রথানুযায়ী জ্যোতিষের সঙ্গে দেখা করতে গেল, চারুদর্শন এই যুবাকে জ্যোতিষের ভারি ভাল লেগে গেল। তারপর হতে তাকে তিনি প্রায়ই নিমন্ত্রণ করে এনেছেন, তাঁদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। দেবব্রতের চাকরীর এই প্রথম অভিজ্ঞতা, আশা উৎসাহে সে ছাপিয়ে আছে। সতেজ একটি পল্লববহুল তরুর মত তার সারা চিত্ত সামান্য কিছুতেই মর্ম্মরিত হয়ে সাড়া দিয়ে ওঠে। ভাবী বধূর আগমন সম্ভাবনায় সে উন্মুখ, উদ্‌গ্রীব। জ্যোতিষেরও একদিন সেদিন গেছে। তিনিও অমনি উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন, বিবাহের স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু দেবব্রতের সঙ্গে তাঁর কোথায় যেন মেলে না। বিবাহে তিনি চেয়েছিলেন সুন্দরী পত্নী, পুত্রকন্যা, সুশৃঙ্খল সংসার,—সাধারণ স্থূল বাস্তব। আর দেবব্রতর চাওয়ার মাঝে রয়েছে তার দুর্ব্বার যৌবনের অশান্ত শক্তিকে সংহত করে নিজেকে দান করার নিগূঢ় সাধনা। কথার মাঝে সে সাধনাকে বাঁধা যায় না—জীবনরসের যোগান দিয়ে তাকে পলে পলে মূর্ত্ত করে তুলতে হয়। জ্যোতিষ বোঝেন, কিন্তু এ মনোভাবকে গ্রহণ করার সঙ্গতি দেখেন না। শ্রীলতা তাঁকে বিয়ে না করলেও সে ছাড়া বিবাহযোগ্য মেয়ের অভাব ছিল না দেশে। কিন্তু শ্রীলতার প্রত্যাখ্যানে জ্যোতিষের আন্তরিক অহমিকা অত্যন্ত গভীর ভাবে আহত হয়েছিল, অভিমানের চেয়ে অপমানটা তার হয়েছিল বেশী। তিনি স্থির করলেন যেচে গিয়ে আর কারো কাছে নিজেকে সস্তা করবেন না,—ঢের হয়েছে, পুনর্ব্বার আর হাস্যাস্পদ হওয়া নয়। মেয়েরা কি পুরুষের জীবনে এমনি প্রয়োজনীয় যে তাদের জন্যে বারম্বার নিজেকে খেলো করতে হবে? এ দুর্ব্বলতা আর যার থাক জ্যোতিষের থাকবে না। পাইপ ফেলে উঠে পড়ে তিনি টেনিস্ খেলতে চলে গেলেন।

তিন

জ্যোতিষ দিনকয়েকের জন্যে টুরে গেছলেন। ফিরে এসে শুনলেন দেবব্রতর অসুখ করেছে। সংবাদ পেয়ে তিনি ব্যস্ত হয়ে তাকে দেখতে গেলেন। ভৃত্যকে দিয়ে শয়নকক্ষে দেবব্রতকে খবর পাঠিয়ে তিনি ক্ষুদ্র বসবার ঘরটায় অপেক্ষা করছিলেন। হঠাৎ একখানা ছবিতে দৃষ্টি পড়ায় চমকে উঠলেন। শ্রীলতার ছবি! এতদিন পরে! এখানে শ্রীলতা! এই দেবব্রতর ভাবী বধূ শ্রীলতা!—তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। ব্যাপারটার মাঝে এমন কিছু

আশ্চর্য্যের ছিল না দেখতে গেলে, কিন্তু জ্যোতিষের কাছে এটা ভীষণ বিপরীত রূপ নিয়ে দেখা দিলে। দেবব্রতকে তাঁর এত ভাল লেগেছিল, এত আলাপ তাঁদের,—দেবব্রতের বিয়েতে নাকি যেতেই হবে তাঁকে,—দেবব্রত করবে শ্রীলতাকে বিয়ে, আর তিনি গিয়ে প্রত্যক্ষ করবেন তাঁর পরাজয়! সমস্তটা তাঁর কাছে অত্যন্ত হীন এবং ইচ্ছাকৃত বিদ্রূপ বলে বোধ হল। তাঁর আত্মাভিমানকে অপমান করতে এরা দুজনে ষড়যন্ত্র করে পুনঃ পুনঃ তাঁকে প্রতারিত করছে—কী স্পর্দ্ধা! কতদিন আগের নিদ্রাহীন রাতের সেই ক্রুদ্ধ ঈর্ষাটা আজ হঠাৎ অতর্কিতে আঘাত পেয়ে জেগে উঠে উন্মত্ত হয়ে তাঁকে দংশন করলে,—তাঁর সমস্ত মনুষ্যত্বকে বিষাক্ত করে দিলে। তাঁর ঐশ্চর্য্য, অর্থকে পরিত্যাগ করে শ্রীলতা এই অপরিসর গৃহের নগণ্য সংসারের গৃহিণীরূপে আসছে সেও ভাল। এতই অবজ্ঞা বারে বারে! কেন তাঁকেই এদের পরিহাসের পাত্র হতে হবে?……

ভৃত্য এসে জ্যোতিষকে শয়নকক্ষে আহ্বান করে নিয়ে গেল। দেবব্রত তাঁকে দেখে হাসিমুখে বললে, "আপনি এসেছেন, বাঁচা গেল।"

তার দিকে না চেয়ে জ্যোতিষ বললেন, "কি হয়েছে?"

"কি জানি, সুধীর বাবু দেখছেন। তিনি ধরতে পারছেন না ঠিক করে, আর নানা রকম রোগ suspect করে আমায় ত রীতিমত ঘাবড়ে দিচ্ছেন।"—দেবব্রত হাসলে।

জ্যোতিষ ঔষধ তালিকায় চোখ বোলাচ্ছিলেন, কোন কথা বললেন না।

দেবব্রত বললে, "আর কিছু না, বেজায় দুর্বল লাগছে। আমি ঠিক করেছি আপনার কাছে থেকে medical certificate নিয়ে ছুটীর দরখাস্ত করে দেব। দিয়ে কালই কলকাতায় চলে যাই।" স্বল্প হেসে বললে, "আমার ভাবী পত্নীও ছোট খাট রকমের ডাক্তার কিনা।"

তাদের দুজনের যথেষ্ট আলাপ হলেও দেবব্রত তার ভাবী বধুর সম্বন্ধে আলোচনা জ্যোতিষের সঙ্গে করে নি কখনো,—বয়সের ব্যবধানের সঙ্কোচ জাগত একটা। তাছাড়া জ্যোতিষ তেমন খোলাখুলি ভাবে মিশতে জানতেন না।

তিনি নিরুত্তরে বসে ছিলেন, লেখনীর প্রান্তভাগটা দাঁতে চেপে, ললাটে কয়েকটা মোটা মোটা কুঞ্চনচিহ্ন, চোখে একটা নির্ম্মম তীক্ষ্ণতা। গম্ভীর ভাবে বললেন, "ছুটী নেওয়ার জন্যে আমি সাহায্য করতে পারি না।"

দেবব্রত সবিস্ময়ে বললে, "সে কি! আমি যাব বলে wire করে দিয়েছি, তাঁরা অপেক্ষায় আছেন যে।"

"অপেক্ষায় থাকলে নিরাশ হওয়া ছাড়া উপায় কি!"

"সুধীর বাবু বললেন আপনাকে বললেই আপনি recommend করে certificate দেবেন।"

"অত সহজে ছুটি নিলে চাকরীতে চলে না। ম্যালেরিয়ার touch মনে হচ্ছে, heavy does এ কুইনীন দিয়ে যাচ্ছি, খেয়ে ফেলবেন।"

"সুধীর বাবু ত টাইফয়েড্ suspect করছিলেন, তার ওপর কুইনীন?"

জ্যোতিষ নতমুখে লিখছিলেন, বললেন, "আমি যা বুঝেছি, করেছি, আমার চেয়ে সুধীর বাবুর ওপর আপনার আস্থা বেশী থাকলে তাঁর ওষুধই খাবেন।" লেখনি বন্ধ করতে করতে বললেন, "আমি চললাম এখন তাহলে।"

সুস্থ থাকলে সমস্তটার অস্বাভাবিক রূঢ়তা দেবব্রত যতটা উপলব্ধি করত, অসুস্থ শরীরে ততটা বোঝবার শক্তি ছিল না, তবু অনেক খানি বিস্মিত হয়ে বললে "কাল আসবেন ত?"

"কাল বোধ হয় আমি tourএ যাচ্ছি।"

তিনি চলে গেলেন। নিরাশ হবে শ্রীলতা,—হোক্ না, তাঁকে যখন বিমুখ হয়ে ফিরিয়ে দিলে, তাঁর নৈরাশ্যের কথা ভেবেছিল সে? দেবব্রতর জন্যে সাগ্রহ প্রতীক্ষা তার, সমবেদনা-সুন্দর সেবা ব্যর্থ হোক্, বিফল হোক্। তারাই কেবল তাঁকে পরিহাস করে নি,—সে যখন শুনবে, বুঝবে তিনিও একবার শোধ নিয়েছেন।...

বাড়ী ফিরে জ্যোতিষ তৎক্ষণাৎ tourএ যাবার বন্দোবস্ত করে ফেললেন। Tourএ গিয়ে সেখান হতেই

দীর্ঘ ছুটি নিয়ে চলে গেলেন, দেবব্রতর সম্মুখীন আর যাতে না হতে হয়।

চার

বালুতটে হেঁটে হেঁটে জ্যোতিষ ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলেন, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গোচ্ছ্বাসের পানে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন। জলের খুব কাছে একটা মেয়ে বসে ছিল, আলোকিত আকাশপটে কালির তুলিতে আঁকা ছবি। সমুদ্রের ঢেউ তার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে, সে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত তাতে। মেয়েটীর বসে থাকার একটা পরিচিত ভঙ্গী জ্যোতিষকে আকৃষ্ট করলে। তিনি একটু কাছে গিয়েই তাকে চিনলেন। চিনতে পেরে তখুনি সেখান হতে চলে যাবার ইচ্ছাটা প্রবল হয়ে উঠল, কিন্তু প্রবলতর আর একটা অনুভূতি তাঁকে আটকে রাখলে। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে মেয়েটী মুখ ফিরিয়ে তাঁকে দেখতে পেল। প্রথমে দৃষ্টি তার ছিল অন্ধের মত কঠিন, শূন্য, তারপর দপ করে চোখ দুটো ঝলসে উঠল,—একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছিট্‌কে এসে পড়ল যেন। সে উঠে এসে তাঁকে নমস্কার করলে, বললে, "কতদিন পরে আপনার সঙ্গে দেখা, চিনতে পারেন ?"

জ্যোতিষ একদৃষ্টে তার দিকে চেয়েছিলেন,—চিনতে পারা কিছু কঠিন বটে, কোথায় কী যেন একটা পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। বললেন, "তুমি অনেক বদলে গেছ, অনেক রোগা হয়ে গেছ।"

সে হেসে উঠল। জ্যোতিষ চমকে উঠলেন, এমন শাণিত হাসি তিনি শোনেন নি। সে বললে, "বদলে যাব না বাঃ!"—আবার হাসলে, "কতদিন হয়ে গেল, বয়স হয় নি ?"

জ্যোতিষ কি বলবেন ভেবে পেলেন না। দেবব্রতর মৃত্যু সংবাদ তিনি শুনেছিলেন, টাইফয়েডে সে মারা গেছে। তারপর আর তিনি এদের কোন সংবাদ জানেন না, সংবাদ নেবার প্রবৃত্তি হয়ে উঠত না। ওদের কথা মনে এলেই তাঁর আহত অভিমান জ্বালা করে ওঠে, ওদের প্রতি অন্তর তাঁর আড়ষ্ট কঠিন হয়ে যায়। সঙ্গতির সঙ্গে যখন বিমুখ অন্তরকে বশীভূত করতে কিছুতেই পারতেন না, তিনি ওদের সমস্ত চিন্তাকে চাপা দিয়ে রাখতেন, এড়িয়ে যেতেন। দেবব্রতর মৃত্যুসংবাদকেও তিনি মনের মাঝে চেপে গেলেন। ওদিকে দেখলেই দেবব্রতর প্রতি তাঁর ব্যবহারের ন্যায় অন্যায়ের বিচার-তর্ক জেগে উঠতে চায়, তাই ও বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করবার সাহস হত না তাঁর, ওসব ভেবে দেখবার ক্ষমতা ছিল না।

শ্রীলতা বললে, "আসুন, বসা যাক।"

বালির ও'র দুজনে বসলে জ্যোতিষ বললেন, "তোমার সঙ্গে হঠাৎ এমন ভাবে দেখা হবে মোটেই ভাবি নি। এখানে কদিন থাকবে তুমি, কোথায় আছ ?

"আমার এক মাসীর কাছে দিনকয়েকের জন্যে বেড়াতে এসেছিলাম।"

"তুমি এত রোগা হয়ে গেলে কি করে শ্রীলতা ?"

শ্রীলতা আবার হেসে উঠল। সে হাসির এমন অস্বস্তিকর সুর,—জ্যোতিষকে ছুরির মত আঘাত করলে, তিনি সরে বসলেন। শ্রীলতা বললে, "আপনি কোথায় এতদিন ছিলেন ? আপনার ত খোঁজই মেলে না।"

"আমার খোঁজ কর না কি কখনো ?" একটু বিদ্রূপ না মিশিয়ে জ্যোতিষ পারলেন না।

শ্রীলতা বললে, "করেছি বৈ কি। ভাগ্যিস আপনার সঙ্গে দেখা হল। আমি ত আজ রাত্রেই এখান থেকে চলে যাচ্ছি।"

"আজ রাত্রেই ?—তোমার সঙ্গে দেখা হয় শুধু বিচ্ছেদ হবার জন্যে।"

শ্রীলতা মুহূর্ত্তে গম্ভীর হয়ে গেল। খানিকক্ষণ সে স্তব্ধ হয়ে রইল, নিজেকে যেন সংযত করে নিচ্ছে, তারপর বললে, "বিচ্ছেদ যাতে না হয় তাই চান আপনি এখনো ?" অকুণ্ঠ কঠিন তার প্রশ্ন।

"শ্রীলতা ?"

"একদিন আপনি আমায় বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। আমি রাজি হই নি। আজও কি আপনি আমায় বিয়ে করতে রাজি আছেন ?"

জ্যোতিষ বিস্ময়ে বাক্‌শূন্য হয়ে গেছলেন, বললেন, "তুমি আমায় ফিরিয়ে দিয়েছ, কিন্তু আমি তোমায় চিরকাল চেয়েছি, আজও চাইছি।"

একমুহূর্ত্ত নীরব থেকে শ্রীলতা বললে, "পাবেন আমায়, আমি রাজি হচ্ছি। কিন্তু ভবিষ্যতে আমায় দোষ দেবেন না।"—দূর দিক্‌চক্রবালে দৃষ্টি রেখে অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে প্রতিটি কথা স্পষ্ট করে বললে, যেন কোন শপথ গ্রহণ করলে। তারপর হেসে উঠে বললে, "এবার দেবী প্রসন্ন হয়ে বরদান করলেন, দেখুন কবিত্ব ঠিক হয়েছে কি না।"

"শ্রীলতা তুমি সত্যি বলছ, না এটা তোমার আর একটা পরিহাস?"

"পরিহাসকে আপনি ভয় করেন নাকি?—জীবনটাই ত একটা প্রকাণ্ড পরিহাস। কিন্তু সত্যই বলছি, বিয়ে করতে আমি প্রস্তুত আছি।" জ্যোতিষের দিকে চেয়ে বললে, "এবারে কি বলবেন বলব? —'You have made me the happiest man in the world'—কি বলুন, মিলছে ত?"

জ্যোতিষ শ্রীলতার একটা হাত চেপে ধরে বললেন, "যতই তুমি ঠাট্টা কর আজ আমায়, আমার আর কোনো দুঃখ নেই, আমার এতদিনের ইচ্ছে পূর্ণ হল, সব ক্ষোভ জুড়োল এবার।"

হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে শ্রীলতা বললে, "জুড়োল কি আরম্ভ হল কি করে জানলেন?"

"আরম্ভ হল! তুমি বল কি? এতদিন ধরে যাকে চেয়েছি তাকে যখন পেলাম, আর আমার অভিযোগের কিছু রইল না জীবনে।"

"অভিযোগের থাকবে কি না তা জানার এখন বাকী রইল। আপনি জীবনটাকে এখন নিজের তৈরী ছাঁচে দেখছেন। কিন্তু কল্পনায় জীবনকে আমরা যতই মনোমত ছাঁচে গড়ি, বাস্তবে ঠিক তার বিপরীত দাঁড়ায়, এই ত জীবনের ট্র্যাজেডি। তাই বলে রাখছি, তখন আমায় দোষ দেবেন না।"

একটু বিস্ময়-সংশয়িত মনে জ্যোতিষ বললেন, "কিন্তু আমাদের বিয়েটা যে ট্র্যাজেডিই হবে, এমন তুমি ধরে নিচ্ছ কেন?"

"আপনি ওদিকটা একেবারেই ধরছেন না বলে, আর কেন। যদি তা না হয় তাহলে আমার পরাজয় মেনে নেব, আপনারই সম্পূর্ণ জয়।"

জ্যোতিষ প্রফুল্ল হয়ে বললেন, "তাই হবে দেখো। কিন্তু তুমি আর আমায় আপনি বোলো না।"

"আচ্ছা"। একটু চেষ্টার সঙ্গে জোর করে বললে, "তুমি এবার ফিরে যাও, আমায় এখুনি যেতে হবে।"

"আমি তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি।"

"না, না, মোটেই দরকার নেই, তুমি যাও, কলকাতায় দেখা হবে।"

"আমি কালই কলকাতায় রওনা হব। আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম, এমন ভাবে তোমায় পাব কে জানত! আশা না করতে যা আসে তার আনন্দ সব থেকে বেশী।"

"আর সেটা যদি আনন্দ না হয়ে দুঃখ হয়? জান, সেও ভারি মজার ব্যাপার হয়।" লঘুস্বরে বললে, "এবার কিন্তু উঠতে হবে।"

জ্যোতিষ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "কালই আমি কলকাতায় যাচ্ছি, পরশু আবার দেখা হবে। এর মধ্যে তোমার মত বদলাবে না ত?"

"মোটেই না। এতদিন ভেবে যা ঠিক করেছি—এত শিগ্‌গির তা বদলায় কি?"

"আচ্ছা আসি।" দীর্ঘ পদক্ষেপে জ্যোতিষ চলে গেলেন। দুএকবার ফিরে চেয়ে দেখলেন শ্রীলতা তখনো সেখানে বসে আছে।

দিনের আলো নিষ্প্রভ করুণ, সমুদ্রতীর জনহীন হয়ে আসছে। শ্রীলতা একদৃষ্টে জলের দিকে চেয়ে ছিল। জীবনটা তার অমনি অতল আঁধার; উদ্দাম তরঙ্গদলের মত কেবলি আবর্ত্ত সৃষ্টি করা, আর প্রতি মুহূর্ত্তে বিচূর্ণিত হওয়া, শেষ নেই, শান্তি নেই, সার্থকতা নেই।......হঠাৎ উদ্বেল-রোদনোচ্ছ্বাসে শ্রীলতার সারাদেহ কেঁপে উঠল, আয়ত চোখ দিয়ে বড় বড় ফোঁটায় জল

ঝড়ে পড়ল।—বালির ওপর সে লুটিয়ে পড়ল। তার দীর্ঘ চুল খুলে গিয়ে তিমির স্রোতের মত পিঠ বেয়ে বালির ওপর ছড়িয়ে গেল। বহুক্ষণ ধরে শ্রীলতার অবলুণ্ঠিত দেহে সমুদ্রের স্নেহ-সজল স্পর্শ লাগতে লাগল এসে।

পাঁচ

বিবাহের পর জ্যোতিষ কলকাতায় ফিরে এলেন শ্রীলতার ইচ্ছায়। শ্রীলতা মফঃস্বলে থাকতে পারে না, কলকাতায় তার এখন অসংখ্য আলাপী, অগণ্য engagement—এক মুহূর্ত্তও অবসর নেই। পূর্ব্বের জীবনযাত্রাকে সে পুরাতন পরিধেয়ের মত পরিত্যাগ করে এসেছে। বিবাহের আগে জ্যোতিষ যখন শ্রীলতার দেখা পেলেন, তিনি তার কি একটা পরিবর্ত্তন অনুভব করেছিলেন। এখন শ্রীলতার সমস্তটাই পরিবর্ত্তন,—কোনো একটা সাদৃশ্য খুঁজলেও মেলে না আর। পাহাড়ী ঝর্ণার সে আনন্দধারা ভীষণা পদ্মার নির্ম্মম খেয়ালে মিলিয়ে গেছে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তীব্র ইলেকট্রিকের আলো-উদ্ভাসিত আলাপন কক্ষে ঘর ভরা লোক। শ্রীলতার high tea চলেছে। একটা সুখাসনে শ্রীলতা বসে, আসনের কোমল উপাধানের মাঝে প্রায় ডুবে গিয়ে। চারিপাশে তার প্রশংসকের দল। সিনেমা জগতে নতুন কোন্ রুষিয় অভিনেত্রী এসেছে, একজন বললে, "Nanaর roleএ তার অভিনয় superb হয়েছিল।"

আর একজন বললে, "Garbo ওটা করলে আরো expression দিতে পারত।"

শ্রীলতা বললে, "Garbo !—I simply hate that woman !"

যে লোকটী Garboর প্রসংসা করতে গেছল, সে দমে গিয়ে বললে, "কিন্তু Garboর ফিল্মগুলো ত এখনো সবচেয়ে বেশী success হয়।"

আর একজন বললে, "কে জানে। যেদিন থেকে Mrs. Mukherjea কলকাতায় এসেছেন, I have ceased to take any interest in any other thing."

শ্রীলতা অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে সিগারেটের ধূমজাল রচনা করছিল। চোখটা আর একটু খুলে বলল, "তাই নাকি ! তাহলে ত অবস্থা সঙ্গীন ! সন্ন্যাসের আর দেরী নেই। কিন্তু হিমালয়ের তপস্যা-গুহার ঠিকানাটা আপনার wine-dealerদের দিয়ে যেতে ভুলবেন না।"

চারিদিকে অট্টহাস্য উঠিল। যে বলেছিল সে নিষ্প্রভ হয়ে গেল।

সবুজ সাড়ীপরা একটী মেয়ে একজনকে উদ্দেশ করে বল্‌লে "আচ্ছা আপনি শুধু এত চুপ করে থাকেন কেন ?"

একজন ভদ্রলোক বল্‌লেন, "অন্য সময় সুমনের কথার খরচা এত বেশী, তাই বোধ হয় এখানে ও একটু economise কর্‌ছে।"

একজন মহিলা চশমাটা একটু ঠিক করে নিয়ে বললেন, "সত্যি শ্রীলতা, তোমার এখানে এলেই ওঁর কথা বন্ধ হয়ে যায় কেন বলত ?"

"কেমন করে বলব বলুন, আমি ত ওঁর কথার custodian নই।"

"না না, তাহলেও—" তিনি একটু ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হাসলেন।

শ্রীলতায় দৃষ্টি এড়ালনা সেটা।—তার মুখ নিমেষের জন্য কঠিন হয়ে উঠল, বললে, "হয়ত এখানে কোনো মেডুসার মুখ দেখে উনি বাক্যহারা হয়ে যান।"—তার পর উঠে বসে সুমনকে বললে "ছবিখানা কতদূর হল ?"

সুমন বললে, "খানিকটা হয়েছে, দেখলে চেনা যায় এখন।"

"তাহলে ত দেখতে হচ্ছে। কাল আমি যাব দেখতে।"

"কটার সময় ?"

"আচ্ছা, সাড়ে চারটায়।"

"Right O."

চশমাধারিণী মহিলা মনে মনে বেজায় চটেছিলেন শ্রীলতা তাঁকে মেডুসা বলে ইঙ্গিত করেছে বলে। রাগ চেপে নিয়ে অন্যকথায় মন দিলেন।

কুমার সূর্য্যপ্রসাদ বললে, "আপনি আজ রাত্রে Empire এ আসছেন ত ? নতুন একটা play এসেছে।"

শ্রীলতা সিগারেট শেষটা ভস্মপাত্রে নিক্ষেপ করে বললে, "আজ রাতে ? আজ রাতে ত হবে না।"

"কেন ? Dr. Mukherjee তখনো ফিরবেন না বলে ?"

শ্রীলতার ওষ্ঠরাগরঞ্জিত ঠোঁটে একটু বাঁকা হাসি দেখা দিল, বললে, "ঠিক ধরেছেন, সেই জন্যেই ত যাচ্ছি না।—কি রকম পাতিব্রত্য দেখছেন ?"

কুমার সাহেব একটু ধাঁধায় পড়ে বললে, "আজ চমৎকার playটা ছিল কিন্তু।"

"Very Sorry, কিন্তু আমি কথা দিয়েছি আজ Colonel Mc. Cardyর সঙ্গে Firpoতে danceএ যাব বলে।"

জ্যোতিষ যখন গৃহে ফিরলেন, অনেক রাত হয়ে গেছে। কলকাতায় তাঁর পরিশ্রম পড়েছে অনেক বেশী, অবসর বিরল। ক্লান্ত দেহে তিনি নিজের কক্ষে গেলেন, ভৃত্য এসে বেশপরিবর্ত্তনে সাহায্য করলে। তিনি স্নানে গেলেন। জ্যোতিষকে দেখলে মনে হয় তাঁর বয়সটা হঠাৎ যেন বহুগুণ বেড়ে গেছে, রুগ্ন চেহারা, মুখে বলিরেখা, মাথা ভরা টাক পড়েছে। স্নানান্তে বেরিয়ে এসে তিনি ভৃত্যকে জিগ্যেস করলেন, "মেমসাব কাহাঁ ?"

"মেমসাব আপনা কামরামে হুজুর।"

জ্যোতিষ পত্নীর সন্ধানে গেলেন। শ্রীলতা প্রসাধন শেষে প্রকাণ্ড মুকুরে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখছিল দাঁড়িয়ে। জ্যোতিষের ছায়া দেখে মুখ না ফিরিয়ে বললে, "এই যে তুমি।"

জ্যোতিষ বিরক্তির স্বরে জিগ্যেস করলেন, "তুমি আবার বেরুচ্ছ নাকি ?"

শ্রীলতা তার ছোট করে ছাঁটা চুলের তরঙ্গটা হাত দিয়ে ঠিক করতে করতে বললে, "হ্যাঁ।"—তার দীর্ঘ-ঘন কেশ, যা দেখে দেবব্রত বলত', "তোমার খোলা চুলে হাত দিলে মনে হয় রাতের নিবিড় শান্তিকে হাত দিয়ে বোধ করছি।"—সে চুলকে কেটে ফেলে সে বব্ করেছে।

জ্যোতিষ বললেন, "এত রাতে কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি ?"

"Firpoতে।"

"সঙ্গে কোন ভাগ্যবানটি যাচ্ছেন ?"

শ্রীলতা ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "একি cross-examination ?"

জ্যোতিষ কটুকণ্ঠে বললেন, "Yes, why not ?"

শ্রীলতা ফিরে পুনর্ব্বার মুকুরে মনোনিবেশ করে বললে, "Indeed !" সামান্য একটা কথাকে এতখানি বিদ্রূপ-বিষাক্তও করা যায় !

জ্যোতিষ জ্বলে উঠে বললেন, "তুমি বড় বাড়াবাড়ি করেছ, না ? যত কিছু বলছি না, তত মাথায় চড়ে বসেছ। এত নবাবি হত কোথা থেকে, জন্মে কখনো চোখে দেখে-ছিলে এসব ? গরীব ঘর থেকে এনে তোমায় রাজরাণী করেছি, সে কথা ভুলে গেছ ?"

"আর আমার চেয়ে তুমি কুড়ি বছরের বড়, তোমায় বিয়ে করেছি—সে কথাটা ভুলেছ নাকি ?"

জ্যোতিষ ভ্রূকুটি করে একটু নীরব রইলেন। বৈদ্যুতিক আলোয় শ্রীলতার ছবি মুকুরে ঝলমল করছে। নীলে আর রূপালিতে মেশান সাড়ী তার, সাড়ীর সাথে মিলিয়ে নীলা আর হীরার কণ্ঠী, কর্ণভূষা, ক্ষীণ একগাছা কঙ্কণ হাতে—মেঘের রহস্যনীলে আর বিদ্যুতের ঝলকে প্রখর মনোহর যেন সে। তার পাশে জ্যোতিষের চিন্তাজীর্ণ মুখ নিষ্প্রভ চোখ, ক্লিষ্টমূর্ত্তি—অসামঞ্জস্যকে অনুক্ষণ পরিস্ফুট রেখেছে, ভোলবার উপায় কোথায় ?

জ্যোতিষ বললেন, "আমার টাকাটাকেই তুমি বিয়ে করেছিলে তা হলে ?"

"সে কথাটা এতদিনে জানলে ? অত hypocrisyর দরকার কি,—you married me because you desired me, and I—" সে একবার থেমে নিয়ে বললে, "আমি টাকা ছাড়া আর কিসের জন্যে তোমায় বিয়ে করব ?"

জ্যোতিষ অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইলেন; তারপর বললেন, "আমি ভালবেসে তোমায় বিয়ে করেছিলাম,

তখন কি জানি তুমি এই বস্তু! ভালবাসার শক্তিই তোমার নেই।" শ্রীলতা হেসে উঠল, তার বাঁকান নিষ্ঠুর হাসি, বললে, "বুড়োবয়সে আবার এসব নাটুকেপানা শিখেছ কোথা হতে? এ বয়সে আর তোমার মুখে ওসব কথা শোভা পায় না, বড় ludicrous মনে হয়।"

জ্যোতিষ ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, "তুমি আমায় পেয়েছ কি যে বাঁদর নাচাবে? আমার টাকায় নবাবি করে আমাকেই মারছ চাবুক! তোমার তেজ আমি ভাঙ্গছি দাঁড়াও। তোমাকে এমন জব্দ করব যে মজাটি দেখবে—" ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে কক্ষ হতে তিনি চলে গেলেন। শ্রীলতাকে তখুনি জব্দ করার কোনো উপায় না দেখতে পেয়ে তিনি হুইস্কির পাত্র নিয়ে গাত্রদাহ মেটাতে বসলেন।

জ্যোতিষ বেরিয়ে গেলে শ্রীলতা আর একটু হাসলে। ভালবাসার শক্তি নেই তার! সত্যিই নেই আর। অত বেশী ভালবেসেছিল বলেই ত আজ এত হিংসা পোষণ করতে পারছে। একদিন সেও সহজ সরল ছিল, অত্যন্ত সহজে অত্যন্ত নিবিড় প্রেমে নিমগ্ন ছিল। জীবনটাকে পাত্রভরা মধুর মত মনে হয়েছিল। প্রতিটি বসন্ত বয়ে আনত তার দ্বারেও নূতনতর চেতনা, নূতন স্বপ্ন, কত সূক্ষ্ম নূতন অনুভূতি যা বলা যায় না, বোঝান যায় না, শুধু সপ্রতীক্ষ সন্ধ্যায় ভেসে আসা মালতীর ঘন-গন্ধে, উতল দখিন হাওয়ায়, অকারণে মন আনন্দ চঞ্চল-হয়ে ওঠে। বৈশাখী পূর্ণিমার নিদ্রাহীন রাতে আকাশে কয়েকটি তারা চিক্‌মিক্ করছে, গাছপাতা কালো রঙে আঁকা,—কোন দূর হতে তৃপ্তিহীন এক পাপিয়ার সকরুণ উচ্ছ্বাসে সমস্ত অনুভূতি সাড়া দিয়ে ওঠে। রাত্রিশেষে যখন স্বচ্ছ তরল আকাশে শুকতারা দপ্‌দপ্ করে, অস্তমিত চাঁদ গন্ধহীন রজনীগন্ধার মত ম্লান হয়ে যায়, শ্রীলতা বাতায়ন পথে দেখে পূবের আকাশে নরম গোলাপি রং লেগেছে, সে রং তার সমস্ত চিত্তে লিপ্ত হয়ে সারাজীবনে ব্যাপ্ত হয়ে গেল; মনে হত সে যেন উষার রঙের করবী, —প্রাতপূজার নির্মাল্য হয়ে ফুটেছে, জীবন তার শুচি সুন্দর। নিত্যকার অতি তুচ্ছতাগুলোও তখন তৃপ্তিমধুর ছিল,—প্রভাতে কলরব করে পাঠাভ্যাস করা,—রান্নাঘরে বোনেদের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে রান্না করা, দশটা না বাজতেই তপ্ত ভাতে খানিকটা ডালের জল দিয়ে কোন মতে আহার সমাপন করে ছুটোছুটি করে কলেজে যাওয়া। সন্ধ্যায় লণ্ঠনের ম্লান লাল আলোয় ভাইবোনদের নিয়ে গল্প বলত, তার দিদি টবের মল্লিকা কটায় জল দিতেন, তাদের পুরাণো দাসী ধূনচি ভরে ধূনো দিয়ে বেড়াত ঘরে,— সে সব স্মৃতি এখনো সৌরভময় রয়েছে।···

শ্রীলতা জানালার কাছে সরে এসে বহুক্ষণ বাহিরে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। শ্রাবণ রাতে বাদলধারা যখন উতল হয়ে ঝরে পড়ত, বাতায়ন দিয়ে বৃষ্টির ছাঁট এসে লাগত বিছানায়, শয্যা সিক্ত হয়ে যেত,—বৃষ্টিতে ভিজে উঠত চুল, তবু জানালা বন্ধ করা হত না। খানিকটা মেঘেমাখা আকাশ আর বিদ্যুতের বিকাশ, এছাড়া সারা জগৎ আঁধারে অবলুপ্ত, বৃষ্টির একটানা ঝিম্ ঝিম্ সুর শুধু, তাছাড়া বসুন্ধরা বাণীহীন—অন্তরে তখন কী বেদনাবিধুর সমারোহ। অন্ধকারে কেশরকীর্ণ কদম্বতলে নিভৃতে ফোটা কেতকী বৃতিকায়, নদীর তৃণঘন তটে তটে, সুদূর বেতস বনে সজল হাওয়ার সাথে সাথে মনের অভিসার। একজনের গভীর অনুরাগের মণিপ্রদীপে তার চিত্তকোষের সবগুলি অনুভূতি বর্ষায়, বসন্তে, শীতে, শরতে সাতরঙে ঝল্‌মল্ করত, শ্রীলতার সমস্ত চেতনা তার অজানিতেই মধুসরস হয়ে থাকত দিবানিশি। দুফোঁটা চোখের জল শ্রীলতার নয়নপল্লবে টলটলিয়ে উঠল,—প্রদীপ নিভে গেছে আজ।······

এখন ওসব ভাবুকতার অবসর নেই। রাতের শেষ প্রহরে শুতে এসে মধ্যাহ্নের আগে ঘুম ভাঙ্গে না। তারপর কত যে নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রণ, Indian dinner, Russian, lunch, fancy dress dance, flower show, exhibition, জীবনটা যেন ঘূর্ণী একটা। কোন্ সাড়ীর সঙ্গে কি অলঙ্কার, কোন চরণাবরণ পরবে, কোন্ সাড়ীতে কি পাড় বসাবে, কোন্ গাত্রাবরণ কি ছাঁদে তৈরী হবে, এসব ভেবে ঠিক করতেই কতটা সময় যায়। তখন কয়েকখানা লালপাড় কালোপাড় সাড়ী ও কয়েকটা সাধাসিধা জামা নিয়ে দুর্ভাবনায় পড়তে হত না। যাক্, সে জীবনের

যবনিকা নিজে সে নামিয়ে দিয়েছে। সে অধ্যায় শেষ করে জীবনের এই অভিনয় স্বীকার করে নিয়েছে,—নিজেকে এখন সম্পূর্ণ না ভোলে যদি, অভিনয় তার সম্পূর্ণ সুন্দর হবে কি করে। ক্রন্দন-মথিত করুণ একটা হাসি আসে শ্রীলতার।…

সেদিন অনেক বিলম্বে শ্রীলতা যখন নৃত্যসভায় পৌছল, কর্ণেল Mc. Cardyর অনুযোগে উত্তরে অনায়াসে বললে পথে তার মোটর খারাপ হয়েছিল তাই এত দেরী।

ছয়

পরের দিন। রাত অনেক হয়ে গেছে তখন। শ্রীলতা গৃহে ফিরে দ্রুত লঘুপদক্ষেপে ওপরে উঠে গেল। আলাপন কক্ষ পেরিয়ে তার ঘরে যেতে হয়। আলাপনকক্ষে প্রবেশ করে সে থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল। সুমন বসে একটা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিল, তাকে দেখে উঠে দাঁড়াল। সুমনের ছবি দেখে আসার প্রতিশ্রুতি শ্রীলতা একেবারেই ভুলে গেছল। মধ্যাহ্নে নিউমার্কেটে গেছল, সেখানে মিসেস্ পালিতের সঙ্গে দেখা। তাঁদের বাড়ীতে ছোট ছেলেমেয়েদের দিয়ে কি একটা অভিনয়ের মহলা চলছিল, তিনি সেখানে শ্রীলতাকে ধরে নিয়ে গেলেন। কথাবার্ত্তায় কখন সময় কেটে গেছে শ্রীলতা জানতে পারে নি, রাত্রিভোজনের ঘণ্টাধ্বনিতে তার খেয়াল হল। মিসেস্ পালিত তাকে ছাড়লেন না, 'pot luck খেয়ে যেতে হবে।' পালিত মহাশয় আমোদপ্রিয় রসিক লোক হাসি গল্পের মাঝে ভোজন সমাধা হতে অনেক বিলম্ব হয়ে গেল।

শ্রীলতা অপ্রস্তুত হয়ে বললে "সত্যি। ভয়ানক অন্যায় হয়ে গেছে আমার—"

সুমন শাসনভঙ্গীতে বললে, "পি, জি, এফ্ ফাইভ্, অর্থাৎ চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের 'সামারি' বিচারে pleads guilty fined Rs. 5/। যা হোক, গেছলে কোথায়?"

"মিসেস্ পালিতের ওখানে দেরী হয়ে গেল,—তুমি এতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছ?"

সুমন তার দৃষ্টি এড়িয়ে বলল, "এতক্ষণ যখন হয়েই গেল তখন তোমার দেরী কেন এত একেবারে জেনে যাব বলে বসেছিলাম।"

"এতক্ষণ একলা বসে খুব আমায় গালাগালি দিচ্ছিলে নিশ্চয়—"

সুমন হেসে বললে "না না, একলা কেন, আমি ত এতক্ষণ ডাক্তার মুখার্জ্জির সঙ্গে গল্প করছিলাম।"

"তাই নাকি? এখন ত ওঁর বোধ হয় অর্দ্ধেক রাত।" শ্রীলতার জন্যে অপেক্ষায় জ্যোতিষ কোনদিন সময় নষ্ট করতেন না, সে সম্বন্ধে শ্রীলতা নিশ্চিন্ত ছিল।

সুমন বললে, "আমি এবার যাই, তোমার দেরী হয়ে যাচ্ছে।"

শ্রীলতা তার সঙ্গে সিঁড়ি অবধি এল। সুমন নীচে নেমে যেয়ে ওপরে তাকালে, শ্রীলতাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অল্প হেসে বললে,

"Good night"

"Good night"

শ্রীলতা অন্যমনস্ক হয়ে তার ঘরে এল। শ্রীলতার সঙ্গে সুমনের দেখা হয় সাধারণ ধরণে, কোথায় একটা পার্টিতে। জীবনপথে লোকের সাথে দেখা হয় নিত্য, কিন্তু সে দেখার বারতা অসাধারণ হয়ে অন্তরে পৌছায় দৈবাৎ। তারপর হতে ওদের পরিচয় দিনে দিনে ঘনিষ্ঠ হয়ে এসেছে। সুমন সম্প্রতি ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরেছে, কিন্তু প্র্যাকটিস্ করতে দেখা যায় না। লোকে বলে ও যদি রোজগার করে, ওর বাপের টাকাগুলো খরচ করবে কে। ছবি আঁকা শিখেছিল যত্ন করে, কিন্তু আঁকল না, বললে বলে 'সময় কোথা'। শ্রীলতা যেখানে যায় সর্ব্বত্র সেখানে সুমনকে দেখা যায়। কখনো শ্রীলতা লক্ষ্য করেছে সেটা, কখনো করেনি। সুমনের ব্যবহার দেখে অনেকের ঈর্ষার উদ্রেক হ'য়েছিল, বিশেষ করে বিবাহযোগ্যা-কন্যা-জননীদের। হিংসাগত নিন্দা বিবর্ত্তিত হয়ে শ্রীলতার কানে পৌছে তাকে ক্রুদ্ধ করে তুলত। কখন সে বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবত সাধারণ বন্ধুত্বকে কেন লোকে সহজ ভাবে দেখতে পারে না। সুমন তার বন্ধু, এ সত্যটাকে কেন যে লোকে নিন্দাই করে তোলে। মনের দৈন্য কি এখনো এতই বেশী যে সঙ্কীর্ণ

সীমার বাহিরের অন্য কোন সত্যাসত্য কোন হৃদয়বোধকে বিকৃত না করে, স্বীকার করে নেবার উদারতা নেই। কখনো কখনো শ্রীলতা অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। চাপাহাসি বাঁকা চাউনির মাঝে নিহিত নিন্দার ইঙ্গিত তার অন্তরকে বিদ্রোহী করে তুলত। যুক্তি তর্ককে দূর করে ঠেলে দিয়ে অন্যায় অপবাদের প্রতি সুগভীর অবহেলা তার উদ্ধত হয়ে প্রকাশ পেত সকলের সামনে। সুমনের সঙ্গে সে ঘনিষ্ঠতা বিশেষ করে দেখাত। তাতে অনেকে আমোদ পেত প্রচুর। লোককে উত্যক্ত করে ক্ষেপিয়ে তুলে তার ক্রোধটাকে উপভোগ করার আনন্দ।

আর সুমন কি মনে করত সেই জানে। শ্রীলতার বন্ধুবান্ধব ও স্তাবকদলের সঙ্গে সুমনের ঠিক খাপ খেত না। ওদের মত সপ্রতিভ প্রশংসাবাণী তার মুখে মুখে লেগে থাকে না। শ্রীলতা ভাবত কিন্তু ও অমন অন্যমনস্ক হয়ে তার পানে তাকিয়ে কী ভাবে! শ্রীলতার দৃষ্টির তীক্ষ্ণাঘাতে চকিত হয়ে কখনো সে চোখ ফিরিয়ে নেয়, কখনো তাও ভুলে যায়। তার সকল ভাবে ভঙ্গীতে সে এটাই শ্রীলতাকে যেন বলতে চায়,—তুমিত এমন নও, তোমার আসলরূপ গোপন আছে, তারই সন্ধান দাও।......

কিন্তু সেখানেই শ্রীলতার যত অন্তরাল।—অস্বস্তিতে ভরে ওঠে তার মন।

সাত

"ওমা কি সুন্দর! খুব চমৎকার হয়েছে সত্যি, না?" সুমনের শিল্পাগারের একধারে শ্রীলতার প্রায়সমাপ্ত ছবিখানা চিত্রাধারে রাখা রয়েছে। শ্রীলতা ঝুঁকে পড়ে দেখছিল।

সুমন বললে, "ভাল হয়েছে মনে হয় তোমার? ওর মধ্যে মস্ত একটা অভাব আছে কিন্তু এখনো—"

"কিসের অভাব?"

"দেখো ভাল করে।"

শ্রীলতা একটু দূরে সরে যেয়ে মনোযোগ দিয়ে দেখলে। একঝলক আলোয় ছবির মুখের খানিকটা, চোখের নতদৃষ্টি, কয়েকগুচ্ছ চুল স্পষ্ট হয়ে আছে। হলদে রঙের সাড়ীটা একটু দেখা যায়, কর্ণভূষার কতকটা, গলার মালার একটু অংশ। বাকিটা মৃদু আঁধার রঙ এ মিলিয়ে গেছে।

সুমন বললে, "দেখছ ওর মাঝে প্রাণশক্তি আড়ালে রয়ে গেছে। টানাটানা চোখ মুখ কিম্বা লাল নীল রঙ হলে ত হয় না, বাইরের রেখাগুলো অন্তরে প্রাণের সঙ্গে মিশতে পারে যদি, প্রাণের ব্যঞ্জনা তবেই রেখার মাঝে ধরা পড়বে, তা না হলে ওত নেহাতই ছবি।"

শ্রীলতা হেসে বললে, "তোমার আজ মুখ খুলে গেছে যে সুমন। তা প্রাণের সঙ্গে রেখার মিলনে বাধা দিলে কে?"

"তুমিই দিলে। মনটাকে তোমার আড়ালে রেখেছ, তাই আমি আবরণকে শুধু এঁকেছি।"

শ্রীলতা কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যে থমকে গেল, ওর গোপন অন্তরের আভাস কি সুমন পেয়েছে?—তারপর সামলে নিয়ে সহজ ভাবে বললে, "বা রে নিজে আঁকতে না পেরে আমার দোষ দেওয়া, কিছুতেই আমি মানব না তা।"

"মানবে না?" তুলিটা রংএ ভেজাতে ভেজাতে অত্যন্ত ধীরে সুমন বললে, "ওদের মত আমাকেও তুমি ভুল বোঝাতে পারবে না শ্রীলতা।"

মনে মনে অস্বস্তি বোধ করে শ্রীলতা বললে, "ভুল বোঝালাম কিসে, আচ্ছা মুস্কিল ত।"

সুমন শ্রীলতার সামনে ফিরে দাঁড়াল। বললে, "আমার কি মনে হয় জান শ্রীলতা? এ সমস্তটাই তোমার অসঙ্গতি,—সত্যরূপ তোমার সার্থক হয়ে উঠছে না।"

অন্যদিকে চেয়ে শ্রীলতা বললে, "বেশ যাহোক্— বাড়ীতে আনিয়ে খুব নিন্দে করে নিচ্ছ—"

"নিন্দে আমি করছি না, জান তুমি। কিন্তু এই যে তোমার জীবন, এ যেন তোমার vengeance, এর মাঝে আনন্দ পাওনা, খুসী হয়ে ওঠ না, নিজেই অস্থির হয়ে থাক তুমি। এমন ভাবে তাই আগাগোড়া cynic তৈরী হয়েছ।"

শ্রীলতা একবার ভেবে নিয়ে বললে, "এসব ত যুগধর্ম্ম সুমন—আমি তা থেকে বাদ পড়ব কি করে। শিল্পীর কাছে হয়ত কোনো জিনিষের বিক্ষুব্ধরূপকে দেখলে তাকে

সম্পূর্ণ দেখা হল না, কিন্তু আজকের দিনে জগতের কোন্ দেশে কোন্ জাত অস্থির অতৃপ্ত নয় বল?"

"একটা সমস্ত জাতির যদি অতৃপ্তি হয় ideal, অস্থির হয়ে তারা যদি ধ্বংসও করে নিজেকে তবু তাদের হার হল না,—ইতিহাসে তাদেরই জয় আবার একদিন দেখা যাবে হয়ত। কিন্তু individual-এর পক্ষে এ নিয়ম খাটে না, সেখানে এ নিয়ম গরুর নূন আর তুলোর বোঝার ব্যাপারে দাঁড়ায়।"

"তাহলে ব্যক্তি বিশেষের ব্যবস্থা কি রকম হবে শুনি?"

"শুনবে? Clearer ideal—নিজেকে যে স্পষ্ট করে তুলতে পারে অমৃতে অধিকার তারই হয়। এই ত মনে হয়।"

অধৈর্য্য হয়ে শ্রীলতা বললে, "রাখ তোমার philosophising—কিচ্ছু হল না তোমার সুমন। একের যা ধর্ম্ম বহুরও তাই হতে বাধ্য—এককে নিয়েই ত বহুর সৃষ্টি।"

সুমন তার চিত্রে ঠোঁটের একটা রেখা টেনে বললে, "ওটা অনেকটা arguing in a circle—নিজেকে জানার চেয়ে বড় কথা নেই। নিজেকে জানতে পারলে একের স্থান বহুর অনেক ওপরে হয়ে যায়। যারা নিজেকে জেনেছে তারা জগৎকেও সম্পদ দিতে পেরেছে। আর এই যে তোমার অতৃপ্ত জগতের বহু এরা নিজেকে কিছুতে জানতে পারছে না, সেই ত হল ট্র্যাজেডি।"

শ্রীলতা অন্যমনস্ক ভাবে বললে, "নিজেকে জানলেও সম্পদ দেবার সুযোগ সকলের জীবনে আসে না। সাধারণ লোকের ত সে শক্তি থাকে না।"

"থাকে বই কি। যার জীবনধারা যেমনই হোক না মনের আসল রূপটাকে প্রকাশ করতে পারলেই আসে তৃপ্তি। তৃপ্তি হতে সম্পদ। নিজের সত্যকে সার্থক করে তোলা, এই হল গোড়ার কথা।"

শ্রীলতা কিছু বললে না, অনেকক্ষণ বাহিরে চেয়ে রইল। বাতায়ন পথে সৌধতরঙ্গ দেখা যায়। শেষ সূর্য্যের আলোয় উজ্জ্বল, দু'একটা বৃক্ষের সবুজ শীর্ষ; ধূসর আকাশে চিল উড়ে চলেছে।

সুমন বললে, "রাগ করলে বুঝি? চুপ করে রয়েছ যে?" শ্রীলতা দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলে, বললে, "না ভাবছিলাম। এবার আমায় উঠতে হবে।"

"কাজ আছে?"

"কাজ না থাকলেও, তোমার এখানে যতক্ষণ থাকব অনেকের পরচর্চ্চার সরস খোরাক জুটবে কিনা।"

তুলি ফেলে দিয়ে সুমন কাছে সরে এল, উদ্বিগ্ন হয়ে বললে, "সত্যি শ্রীলতা, তাহলে তোমার এখানে না আসাই ভাল হয় ত।"

"কেন, তুমিও কি ওদের দলে নাকি? বন্ধুতাকে স্বীকার কর না?"

সুমন হাস্যচ্ছলে বললে, "মেয়ে পুরুষে বন্ধুত্ব হতে পারে না। জাননা Oscar Wilde বলেছেন—"

"জানি, জানি, রেখে দাও তোমার কোটেশান। আমি ত বাংলাদেশের পাঠকদলের নই যে বিজ্ঞার বহর দেখাতে হবে আমার কাছে। নিজের মনোভাব থেকে বিচার কর।"

সুমন কথাটা এড়িয়ে যেয়ে বললে, "আমার কথা ছেড়ে দাও। এদেশের পুরুষ হয়ে জন্মে সবগুলো advantage আমার দিকে, নিন্দের ভার তোমার কাঁধেই পড়বে। লোকে যদি তোমার মনোভাব না বোঝে, তোমার convention অনুযায়ী চলতে হবে। তোমার সুনামের দাম আছে।"

শ্রীলতা উঠে পড়ল, বললে, "বদনাম সুনামের জন্যে দুশ্চিন্তা অনেকদিন আমার শেষ হয়ে গেছে।" সুমন তা জানে না, তার নামে যতই কালি লাগুক, গ্লানি ঘুচবে তার, দ্বন্দ্ব তত সহজ হবে। কৌতুক কণ্ঠে হেসে বললে, "কবির ভাষায় নির্ভাবনায় আমি বলতে পারি এখন, 'তোমার লাগিয়ে কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ'।"

সুমন হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে তুলিটা তুলে নিয়ে ছবির ওপর ঝুঁকে পড়ল। বললে, "ঠাট্টা করো না শ্রীলতা।"

শ্রীলতা তার আহত গভীর কণ্ঠে চমকে উঠে স্তব্ধ হয়ে গেল। আগুনের খেলায় একবার সে দগ্ধ হয়েছে। এবারে ভুল হল না, বুঝলে সে।......

আট

জ্যোতিষ রেগে ছিলেন। শ্রীলতা আসামাত্র ঝড়ের মত এসে বললেন, "সর্ব্বক্ষণ মজলিস্ চলেছে। যাওয়া হয়েছিল কোথায়? এখানে জেনারেল সায়েব স্ত্রীকে নিয়ে এসে বসে বসে চলে গেলেন—তোমার জন্যে কোথাও আমার মুখ থাকে না। জেনারেল মনে মনে চটেছেন, চাকরীটা যাবে তবে তুমি ছাড়বে,—এতক্ষণ ধরে আড্ডা চলছিল কোথায়?"

"ওঁরা আসবেন তাত হাত গুণতে পারি না। আমি সুমনের ওখানে গেছলাম।"

"সুমনের ওখানে। ওঃ, বড্ড প্রেম হয়েছে যে—ওখানেই ঘরবাড়ী এবার হবে নাকি! তোমার জন্যে আমার মুখ দেখান দায় হয়েছে বাইরে।"

"তাই নাকি?" শ্রীলতার মনটা নিমেষে কঠিন হয়ে বেঁকে দাঁড়াল,—"আর তুমি যখন মদের ঝোঁকে রাস্তায় গড়াগড়ি যাও, লোকে হাততালি দেয় প্রশংসায়, না?"

জ্যোতিষ উচ্চস্বরে বললেন, "চুপ করে থাক। তুমিই আমার—যত দুর্দ্দশার মূল,—আবার বলতে লজ্জা হচ্ছে না। আমায় তুমি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাচ্ছ দিনরাত, সর্ব্বনাশ করে তবে ছাড়বে। আমার যা খুসী তাই করব। খবরদার তুমি কথা বলবে না।"

শ্রীলতা তাচ্ছিল্যভরে বললে, "তোমার কথায় কথা বলার চেয়ে দরকারি কাজ আমার আছে। তবে তুমি আমায় খোঁচাতে এসো না।"

"নিশ্চয় খোঁচা দেব। তুমি আমার কথামত চলতে বাধ্য তা জান? বড় বেশী স্পর্দ্ধা পেয়ে গেছ। এটা আমার বাড়ী, আমার হুকুমমত চলতে হবে।" একবার থেমে দম নিয়ে বললেন, "তোমার জন্যেই যত অশান্তি। আমার মানসম্ভ্রম গেছে, বিষয় আশয় যাচ্ছে, সর্ব্বস্বান্ত হতে বসেছি, বাইরে শুদ্ধ বদনাম। সকলে আমায় আড়ালে বলে 'Oh the husband of that notorious Mrs. Mukherjee'—কেন, কিসের জন্যে আমি এত সহ্য করতে যাবো, কারো তোয়াক্কা রাখি না,—এর একটা বিহিত করব এবার আমি।"

"কর না, কে মানা করছে?" শ্রীলতা নিজের ঘরে যেয়ে পরদা টেনে দিলে। জ্যোতিষ ক্রোধে গর্জ্জাতে লাগলেন।......

নয়

বেশীদিন এমন ভাবে চলল না। দুজন লোকের মনে যখন সঙ্ঘাত সুরু হয়, ছেদ পড়ার মুহূর্ত্ত হঠাৎ কখন না জানিয়েই এসে পৌঁছায়।

জ্যোতিষের চারিধারে নানা অশান্তির উপদ্রব চলেছে। আর্থিক অবস্থা তাঁর ভাল ছিল। কিন্তু এখন নিজের অনেক রকম অপব্যয়ে এবং পত্নীর বিলাসে ব্যয়ের মাত্রা আয়কে অতিক্রম করেছে বহুগুণে। ব্যয়কে বাড়ান সহজ, সংক্ষেপ করা সঙ্কট ব্যাপার। ঋণের মাত্রা তাই বেড়ে চলেছে দিনে দিনে, পরিশোধের প্রচেষ্টা কিছু হয় না। পাওনাদারেরা তাগাদা দিয়ে অবশেষে নালিশ করেছে। নিজের কাজকর্ম্মে জ্যোতিষ একেবারে মনোযোগ দিতে পারেন না, কর্ম্মশক্তি তাঁর লোপ পেয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে। নিম্নতন কর্ম্মচারিরা জ্যোতিষের অমনোযোগের সুযোগ নিয়ে ফাঁকি এবং চুরি দুটোই পুরোমাত্রায় চালিয়েছে। সব দিকে বিশৃঙ্খল, প্রতিপদে ত্রুটি। এসবের জন্যে ওপর হতে জ্যোতিষকে বিশেষ গঞ্জনা সহ্য করতে হচ্ছে। এরকম অবহেলা বেশীদিন চললে কর্ম্মচ্যুতিও হতে পারে এমন আভাস এসেছে। কিন্তু এসব দোষ সংশোধন করে নিয়ে পুনর্ব্বার কর্ত্তব্য পরিচালনার ক্ষমতা তাঁর নেই আর। কিছু করতে পারবেন না বুঝতে পেরে জ্যোতিষ নিজেকে আরো উৎসন্নের পথে এগিয়ে দেন।...

এসবের জন্যে বাইরে তাঁর অপযশ দুর্নাম, সব তিনি জানেন, কলঙ্ক কর্ণগোচর হয়। তাঁর মানসম্ভ্রম নষ্ট হচ্ছে; আগের সে স্বভাব হারিয়ে এখন দিনে দিনে অধঃপতন হচ্ছে, এটা এখনো অনুভব করেন তিনি। কিন্তু নিজেকে

সামলে নেবার শক্তি তাঁর অনেক দিন হারিয়ে গেছে। ভাবতে গেলে ধৈর্য্যচ্যুতি হয়,—আরো বেশী করে নিজেকে পানপাত্রে নিমগ্ন রাখেন। সমস্ত দুর্ভাবনাকে ফাঁকি দিয়ে—এড়াবার তাঁর কাছে এই হল সহজতম উপায়।

জ্যোতিষ সেদিন শয্যায় অস্থির হয়ে এপাশ ওপাশ করছিলেন। শুয়ে থাকতে তাঁর অত্যন্ত বিরক্তি বোধ হচ্ছিল, মাথার দারুণ যন্ত্রণায় যেতেও পারছিলেন না। কিছুদিন থেকে তাঁর শরীর অত্যন্ত খারাপ হয়েছে। ডাক্তাররা বলেছেন তাঁর শরীরের রক্ততেজ থেকে আরম্ভ করে স্নায়ুগুলো পর্য্যন্ত সব নাকি জট পাকিয়ে বিকল হতে বসেছে। অনেকদিন ধরে অনিয়মে ও অত্যাচারে যা ঘটিয়ে তুলেছেন, এখন বিশেষ সাবধানে থেকে সারাতে হবে। তাঁর ওঠাহাঁটা থেকে পান আহার সমস্ত পরিমিত না করলে বেশীদিন বাঁচতে হবে না। এসব বলে চিকিৎসকবর্গ অনেক কষ্টে কয়েকদিন তাঁকে সাবধানে রেখেছেন। ওসব অত বিশ্বাস করতে না চাইলেও তাঁর মিতাচারে থাকার প্রয়োজন একথা জ্যোতিষ নিজেও বোঝেন। তিনি খানিকক্ষণ চোখ বন্ধ করে স্থির হয়ে শুয়ে থাকতে চেষ্টা করলেন। আলাপন কক্ষ হতে কথাবার্ত্তার কলরব, উচ্চহাসির ধ্বনি আসছিল। অনেকে এসেছিল তিনি কেমন আছেন জানবার অছিলা করে। কে একজন শুভার্থী তাঁর গ্রামোফোনে একটা ক্ল্যারিওনেটের রেকর্ড লাগিয়ে দিলে। জ্যোতিষ অস্থির হয়ে উঠে বসলেন। ভৃত্যকে ডেকে বললেন একবার শ্রীলতাকে তাঁর কাছে আহ্বান করে আনতে।

একটু পরে ভৃত্য ফিরে এসে জানালে মেমসাহেব এখন ব্যস্ত আছেন, তাঁর ফুর্সৎ নেই, আসতে পারবেন না। জ্যোতিষ বিরক্ত হয়ে শুয়ে পড়লেন। তাঁর উক্ত শুভার্থী ক্ল্যারিওনেট রেকর্ড শেষ করে একটা jazz ব্যাণ্ডের রেকর্ড দিলেন। জ্যোতিষ মাথার যন্ত্রণায় বেশীক্ষণ স্থির থাকতে পারলেন না, উঠে শয্যালগ্ন টেবিলটায় অডিকলোন্ খুঁজলেন, পেলেন না। সেও বোধ হয় শ্রীলতার কাছে। ক্রুদ্ধ হয়ে জ্যোতিষ শয্যা ছেড়ে উঠে পড়ে নিজের অফিস কক্ষে প্রবেশ করলেন। টেবিলের ওপর কদিনের কাগজপত্র জমেছিল। জ্যোতিষের যত বিরক্তি সেগুলোর 'পরেই প্রকাশ পেল। কোনো খানাকে টেনে, কোনো খানাকে দেখে ছিঁড়ে ফেলে দিতে লাগলেন। একখানা চিঠি বোধহয় দিনদুয়েক আগে এসেছিল খোলা হয়নি। জ্যোতিষ খুলে পড়ে সেখানা কুচি কুচি করে ফেলে দিলেন। চিঠিখানি একজন পাওনাদারের, কাগজখানা ছিন্ন করলেও কথাগুলোর জ্বালা মন থেকে ঘুচল না। আলাপন কক্ষে গ্রামোফোনে তখন মিস্ গজমোতীর গান চলছিল 'আমার মনটি করিয়ে চুরি'। জ্যোতিষ ভীষণ রকম ভ্রূকুটি করে বসে রইলেন। দ্বারবান দ্বারের কাছে উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখছিল। সামনে পেয়ে তাকেই প্রচণ্ড তাড়া দিয়ে উঠ্‌লেন। সে সঙ্কুচিত ভাবে বললে যে শশীবাবু অনেকক্ষণ বসে আছে একবার যদি হুজুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। জ্যোতিষ কয়েক মুহূর্ত্ত ভেবে বললেন, "আচ্ছা, আনে বোলো।"

শশীপদ লোকটি পরের মকদ্দমার তদ্বিরে জীবনপাত করেছে। কোন উইলের তারিখ কতখানি বদলাতে হবে, কোন্ দানপত্র কি ভাবে জাল প্রতিপন্ন করা যায়, বাদীর সইকরা কাগজে বক্তব্য অংশটুকু ছেঁটে ফেলে দিয়ে প্রতিবাদীর সুবিধাজনক উক্তি কেমন করে লিখে দেওয়া যেতে পারে, এ সবে সে সবিশেষ পরিপক্ক। বাপের বিষয়ে মেয়েকে বঞ্চিত করে দূরতম জ্ঞাতিপুত্রকে পাইয়ে দিয়ে নিজের পাওনার অঙ্কটা কি হিসেবে দীর্ঘ করতে হবে এই কয়ে করেই তার চুল পাকল। সম্প্রতি একটা মকদ্দমায় জমিদার পুত্রের বয়সের কাল্পনিক নবীনতা সম্বন্ধে একজন ডাক্তারের সার্টিফিকেটের প্রয়োজন আছে। দুপক্ষ ধনী, মামলা বিলাসে অর্থের অনটন নেই। জমিদার পুত্রের আক্কেল দাঁতটি যে এখনো ওঠেনি এটি প্রমাণ করতে পারলেই জাজ্‌মেণ্ট পাওয়া যায় শশীর মক্কেলের স্বপক্ষে।

শশীপদ এর পূর্ব্বেও কয়েকবার এসেছে, কিন্তু জ্যোতিষের কাছে ঘেঁসতে সাহস পায়নি। ঘরে ঢুকে সে এত ঝুঁকে নমস্কার করলে যে টেবিলে তার মাথাটা গেল ঠক্ করে ঠুকে। ছাতাটি দেওয়ালে ঠেসিয়ে রেখে সঙ্কুচিতভাবে একটা চেয়ারের প্রান্তভাগে আড়ষ্ট হয়ে বসল।

জ্যোতিষ বললেন, "কি চাই আপনার?"

অনেক রকম ভূমিকা করে শশীপদ যোড়হাতে বললে ডাক্তার ঢের হয়েছে বটে কিন্তু মুখুয্যে সাহেবের মতন ডাক্তার হতে এখনো লোককে সাতজন্ম তপস্যা করতে হবে। রোগীর মুখ দেখে তিনি রোগ ধরে দিতে পারেন, মুখুয্যে সাহেব বোধ হয় জানেন না, কালীপদ বলে একটা লোক একদিন মুখুয্যে সাহেবের নিন্দা করেছিল বলে শশী ঘুঁসি মেরে তার নাক ভেঙে দিয়েছে, পুলিশ কেস্ হয় আর কি, ডাক্তার মুখুয্যের ওপর শশীর এম্‌নি ভক্তি। লোকটি বকেই চলল, আসল কথাটি আর ভাঙে না।

অসহিষ্ণু হয়ে জ্যোতিষ জিগ্যেস করলেন, "আমায় কি করতে হবে?" "আজ্ঞে কিছুই নয়। শুধু কুমার বাহাদুরের বয়েসটা একটু কম বলে লিখে দেন যদি। ওরা বলে আমরা কার হুকুমে এস্‌টেট থেকে দশ হাজার টাকা খরচ করেছি। কুমার বাহাদুরের খুড়ো দিলেন গার্জেন। তখনো কুমার বাহাদুর সাবালক হন নি, ওরা বলছে হয়েছে। আরে বাপু, ভাইয়ের ছেলে আর নিজের ছেলে কি তফাৎ হল? যদি খরচ করেই থাকেন খুড়োমশায়, কুমারের এই নালিশ করাটি কি ভাল হল? আপনিই বলুন না সার! পিতৃসত্য পালনের জন্যে রামচন্দর বনে গেলেন, আর আজ কাল কী দিনই পড়েছে! ঘোর কলি! খুড়োর ওপর নালিশ করা! সাক্ষাৎ বাপের আপন পিস্‌তুত ভাই! আপনিই বিচার করুন না।"

জ্যোতিষ ভাল করে শোনেন নি, বললেন, "তা আমি কি করব! বিচারের ভার আমার ওপর নেই।"

"বললেই হল নেই! আমরা আপনি ছাড়া আর কাকেও যে চিনিনা সার! আপনিই আমাদের হাইকোর্ট, আপনিই আমাদের প্রিভিকাউন্সিল! ঐটা কি সোজা কথা! আপনি থাকতে,—আমাদের এমন মুরব্বি থাকতে খুড়োমশায় দাঁড়িয়ে অপমান হবেন! সে ত হতে দেব না। দেখুন বয়েস কাঁচাবার জন্যে কত লোক কত কি করে, আর আমরা নিজে থেকে ওর বয়স কাঁচিয়ে দিচ্ছি, এতে ওর কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। আপনিও যেমন, আক্কেল দাঁত উঠছে পড়ছে, কে তার হিসেব রাখে। আপনাকে খালি লিখে দিতে হবে এককলম যে আপনি ওকে পরীক্ষা করে দেখেছেন ওর আক্কেল দাঁতটি ওঠেনি।"

"উঠেছে কিনা কি করে জানব?"

"বিলক্ষণ! আক্কেল থাকলে কি আর খুড়োর সঙ্গে মামলা করে।" তারপর একটু চোখ ঠেরে বললে, "আর এতে আপনার মুস্কিলেরও কিছু নেই, ধরুন যদি কথার কথা বলছি—যদি, আপনাকে ওরা ফ্যাসাদে ফেলবার চেষ্টাই করে, আপনি তখন স্বচ্ছন্দে বলে দিতে পারবেন আপনি যাকে পরীক্ষা করেছেন সে নাম ভাঁড়িয়ে কুমার বাহাদুর বলে পরিচয় দিয়েছিল, আসল কুমার বাহাদুর সে নয় একথা পরে জানতে পেরেছেন। কাজেই দেখছেন সার এতে আপনার পক্ষে মুস্কিলের কিছুই নেই!"

সর্ব্বনাশ! লোকটা যে বেজায় ধূর্ত্ত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সব রকম উপায়ই এর জানা আছে দেখা যাচ্ছে! তবু জ্যোতিষ ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। ব্যাপারটা তাঁর কাছে নতুন, এ পথে আগে ত নামেন নি।

লোকটা পকেট থেকে মলিন রুমালে বাঁধা একতাড়া নোট বার করে জ্যোতিষের সামনে রেখে দিল।

আলাপন কক্ষ হতে আবর্ত্তিত হয়ে মিস্ গজমোতীর অভ্রভেদী স্বর ছুঁচের মত তীক্ষ্ণ হয়ে কানে এসে আঘাত করে। চিঠিখানার অপমান তখনো পুরাণ হয়নি। জ্যোতিষের যন্ত্রণাময় মস্তিষ্কে আগুন ধরে উঠল। প্রলোভন-স্পর্দ্ধার হীন অপমান আজ তাঁকে আহত করল না। মনে হল জীবনের এই ঘূর্ণাবর্ত্তকে লোকে কেন যে কতগুলো অর্থহীন নীতিবাক্যে জটিলতর করে তোলে! কি হবে এই মানসিক শুচিগ্রস্ততা আর দম্ভদায়ক সততার! কিসের দাম মেলে কার কাছে এ দুনিয়ায়?—তিনি উৎকোচ গ্রহণের অপরাধে দণ্ডিত হন যদি লোকে ঘৃণা করবে। কিন্তু তিনি আজ দেনার দায়ে—দেউলিয়া হন যদি কেউ কি সাহায্য করতে আসবে? কী ব্যবস্থা সমাজের! সত্যের অসত্য অভিনয় নিয়ত। তাছাড়া লোকটা যে পথ বাৎলে দিয়েছে তার মধ্যে যুক্তির সারবত্তা আছে, আত্মরক্ষার উপায় আছে। জ্যোতিষ নোটের তাড়াটা না গুণেই দেরাজে বন্ধ করে রাখলেন, বললেন, "কি লিখতে হবে আমায়?"

শশীপদ সাফল্যে উৎফুল্ল হয়ে বললে, "হুজুরের অসীম দয়া। আজ্ঞা দেন যদি, কাল আমি একটা খসড়া তৈরি করে নিয়ে—এমনি সময় আসব। এর মধ্যে আর তৃতীয় ব্যক্তিকে রাখতে চাই না।"

মাথাটা চেপে ধরে জ্যোতিষ বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই আসবেন, এখন যান তবে।"

শশীপদ খুব ঝুঁকে নমস্কার করে পিছু হঠ্‌তে হঠ্‌তে হাত বাড়িয়ে ছাতাটি নিয়ে ছাতাশুদ্ধ আর একবার নমস্কার করে বেরিয়ে গেল।

জ্যোতিষ উঠে শয়ন কক্ষে ফিরে এলেন। শয্যায় শুয়ে পড়ে হাঁক দিলেন, "কোই হায়!"

ভৃত্য ছুটে এল।

"পেগ্ লে আও!"

ব্যাপারটা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে ভৃত্য ইতস্ততঃ করতে লাগল। জ্যোতিষ প্রচণ্ড ধমক দিয়ে জানিয়ে দিলেন বেয়ারার দাঁড়ানোর ভঙ্গীটা কোনো জানোয়ার বিশেষের মতন।

সে ত্রস্ত হয়ে আনতে চলে গেল।

হ্যাঁ যত খুসী তিনি পান করবেন, ভাবনা কিসের। যতদিন বাঁচবেন, নিজের তৃপ্তি হলেই হল, তারপর যা হয় হোক না—তাঁর কিসের চিন্তা।

দশ

সন্ধ্যা হতে বাদল নেমেছে। পথিক-বিরল বারিধৌত পথ পথবর্ত্তী আলোয় সাপের দেহের মত কদাকার কালো দেখাচ্ছে। শ্রীলতা জানালার কাছে বসে শূন্য নয়নে বাহিরে চেয়েছিল। পায়ের ওপর একটা নরম রেশমের চাদর, রুক্ষ চুলগুলো মুখের চারপাশে ছড়িয়ে আছে। ক'দিন ধরে তার অল্প জ্বর হয়েছে, মুখে একটা কৃশতা, চোখের তলে কালির রেখা। কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে বসে থেকে মুখ ফিরিয়ে সে ভৃত্যকে ডাকতে যাচ্ছিল। কী ভেবে নিজেই আস্তে উঠে গেল, অন্যঘর থেকে একটা এসরাজ নিয়ে এল। তন্ত্রীগুলো সুরে বেঁধে নিয়ে ধীরে সে বাজাতে আরম্ভ করলে। বহুদিনের অব্যবহারে শিথিল-তন্ত্রী যন্ত্র করুণ সুরে বেজে উঠল। শ্রীলতা দুর্ব্বলকণ্ঠে মৃদুগুঞ্জনে গাইলে:—

"কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো
বিরহানলে জ্বালোরে তারে জ্বালো।
রয়েছে দীপ না আছে শিখা—
এই কি ভালে ছিলরে লিখা—
ইহার চেয়ে মরণ সে যে ভালো—
বিরহানলে প্রদীপখানি জ্বালো।"

প্রায়ান্ধকার বাদল সন্ধ্যায় একলা ঘরে এসরাজের ব্যথিত মূর্চ্ছনার সঙ্গে শ্রীলতার গানের সুর একটি ব্যথা প্রদীপের সকম্প্র শিখার মত কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল—

বেদনা দূতী গাহিছে "ওরে প্রাণ
তোমার লাগি জাগেন ভগবান
নিশীথে ঘন অন্ধকারে—
ডাকেন তোরে প্রেমাভিসারে—
দুঃখ দিয়ে রাখেন তোর মান
তোমার লাগি জাগেন ভগবান।"

নিস্তব্ধ গৃহ, ভৃত্যেরা কোথায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছে। শ্রীলতার সকরুণ গান সুগভীর এক দীর্ঘশ্বাসের মত সারা ঘরে ঘুরে ফিরতে লাগল—

"গগনতল গিয়েছে মেঘে ভরি—
বাদল জল পড়িছে ঝরি ঝরি।
এ ঘোর রাতে কিসের লাগি—
পরাণ মম সহসা জাগি—
এমন কেন করিছে মরি মরি—"

বহু সঞ্চিত বেদনা আজ যেন মনের আগল খোলা পেয়ে গানের মাঝে বিধুর হয়ে প্রকাশ পেল। অঞ্জলিভরা অশ্রুর মত সুরধারা বিগলিত হয়ে ঝরতে লাগল।

গান শেষে শ্রীলতা এস্‌রাজটা মাটিতে নামিয়ে রেখে পায়ের ওপর হতে চাদরখানা ঠেলে দিয়ে উৎক্ষিপ্ত বাহুর ওপর ক্লান্তভাবে মাথাটা রেখে বসল।—এ দ্বন্দ্ব সংগ্রাম শেষ হবে কবে! জীবনটাকে এই গানের মত সহজ, অশ্রুর মত স্বচ্ছ করা যায় না কি আর! শ্রান্ত চোখ তার বন্ধ হয়ে এল।……

কতক্ষণ শ্রীলতা অমন করে বসে ছিল কে জানে। ললাটে একটা স্পর্শ পেয়ে সচকিত হয়ে চোখ খুললে। উঠে বসে চারিদিকে চাইলে, কাউকে দেখতে পেলে না। একবার ভাবলে চাকরকে ডেকে জিজ্ঞেস করে কেউ এসেছিল কিনা। কিন্তু এমন স্নিগ্ধ নীরবতাটাকে ভাঙতে তার আলস্য লাগল। হয়ত তন্দ্রায় স্বপ্ন দেখছিল, ঘর ত শূন্য। শ্রীলতা মুখের ওপর হতে চুলগুলো সরিয়ে দিলে, একটা উপাধান টেনে নিয়ে পুনর্ব্বার চোখ বন্ধ করলে।

শ্রীলতা জানতে পারলে না, সুমন অনেকক্ষণ এসে বারান্দা হতে তার গান শুনছিল। এ রাগিনী যেন অনাদি অতৃপ্তির অনন্তকালের অন্বেষণ। সুমনের সমস্ত চিত্ত আর্দ্র উদাস হয়ে উঠেছিল। গান শেষ হয়ে গেল, সুরের রেশ সজল সন্ধ্যায় সিক্তভাবে লিপ্ত হয়ে রইল।

শ্রীলতা জানলে না সুমন বহুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে থেকে তারপর ধীরে ঘরে এল। ম্লান আলোয় দেখলে শ্রীলতার ক্লান্ত অর্দ্ধশায়িত মূর্ত্তি। কালো কেশের ঝালর মুখের ওপর ঝুঁকে রয়েছে, জ্যোৎস্নার মত শুভ্র গানের পরে ঘনদীর্ঘ পল্লব ছায়া করে আছে, তীব্র লাল ওষ্ঠরাগের অভাবে ঠোঁটের ঘন গোলাপী দুটি রেখা।

শ্রীলতা জানলে না আজ হঠাৎ কি করে সুমনের সংহত উচ্ছ্বাস আগল টুটে পাগল হয়ে উঠল। রক্তশিখা শিমূলের মত হঠাৎ কি করে তার অনুরাগের সবগুলি পাপ্‌ড়ি একসঙ্গে খুলে যেয়ে লালে লাল হয়ে উঠল। শ্রীলতার এই শ্রান্তির সহজ ভঙ্গীর মাঝে কোমল হয়ে এতদিনে স্বরূপ তার ধরা দিল যেন,—কৃত্রিমতা ঘুচে গেল, সরে গেল ব্যবধান। ভুলে গেল সুমন প্রত্যহের পরিচয় সীমা —শ্রীলতার ললাট প্রান্তে যেখানে একগুচ্ছ কেশ বাঁকা রেখায় নেমে এসেছে—নত হয়ে সে ওষ্ঠস্পর্শ করলে সেখানে। দেহ দিয়ে তার একটা রঙীন অগ্নিশিখা নিমেষের তরে উদ্দীপ্ত হয়ে চলে গেল। নিবিড়তর আঁধারে ভরে উঠল পরমুহূর্ত্ত। কেন এমন করলে সে! সুমন ত জানে তার কাছে যা একান্ত আদরের, শ্রীলতার কাছে তা পরম কৌতুক মাত্র। নূতন করে এ উপলব্ধি তাকে নিদারুণ বেদনায় বিবর্ণ করে দিলে। শরাহত বন্যমৃগের মত তড়িৎ গতিতে সে বেরিয়ে চলে গেল,—তার নিভৃত মনের খবর শ্রীলতার কাছ হতে গোপনই থাকবে। সুমন ত জানে শ্রীলতার মাঝে এসব মাধুর্য্যের অবকাশ স্নিগ্ধ মুহূর্ত্ত নেই,—কার প্রতি অভিমানে ও যেন জমে যাওয়া তুষার-স্তূপের মত তীক্ষ্ণ কঠিন হয়ে গেছে। কার অবিচারে ও কী করে নীড় হারিয়েছে, তাই সে ভ্রষ্টনীড়ের পরিশোধ নিতে এ নিষ্ঠুর সংগ্রাম চলেছে তার সারাজীবনে। লক্ষ্যহারা তারার মত কক্ষহারা হয়ে সে জ্বলে উঠেছে—যে ওর পরিধির মাঝে আসবে তাকেও ও জ্বালিয়ে নিঃশেষ করবে বলে। অন্যলোকে না বুঝুক, সুমনের ব্যাকুল অন্তরে শ্রীলতা স্বচ্ছ হয়ে ধরা পড়েছে অনেক দিন।

অন্যদ্বার দিয়ে জ্যোতিষ ঘরে ঢুকলেন। রুক্ষস্বরে শ্রীলতাকে প্রশ্ন করলেন "সুমন কি করছিল এখানে?"

"সুমন এসেছিল? আমি দেখিনি।"

জ্যোতিষ ব্যঙ্গভরে বললেন, "নাঃ, দেখনি! ন্যাকা সাজা হচ্ছে! চোখে দেখনি ত চোখ বন্ধ করে বাক্য সুধা পান করা হচ্ছিল?"

"ইতরামি করো না"—গম্ভীরস্বরে শ্রীলতা বললে

জ্যোতিষ তখন ঠিক প্রকৃতিস্থ ছিলেন না; আজকাল raceএ যেয়ে রাতারাতি ধনপতি হবার বা'নাটা তাঁকে পেয়ে বসেছে। অনেকগুলো টাকা সেখানে তাঁর লোকসান হয়ে গেছে আজ। অর্থের শোক ভুলতে তিনি অনেকগুলি হুইস্কির আধার নিঃশেষ করে বাড়ী ফিরেছেন। গৃহে পৌছে সুমনকে অমন ত্রস্ত হয়ে ছুটে চলে যেতে দেখে মনটা তার চট্ করে ক্রোধে সন্দেহে ঘুলিয়ে উঠল। শ্রীলতার কথায় একেবারে প্রজ্জ্বলিত হয়ে বললেন,—"কী আমি ইতর! তোমার স্পর্দ্ধার একটা সীমা ছিল ভেবেছিলাম। ও ছোঁড়াটাকে এবার বাড়ীর ত্রিসীমানায় যদি দেখি ঘাড় ধরে বার করে দেব। ফের যদি তুমি ওর সঙ্গে মেশ, মজা দেখবে। তার জন্যে তোমায় অনুতপ্ত হতে হবে।"

শ্রীলতা সোজা হয়ে উঠে বসল, জ্যোতিষের মুখের ওপর দৃষ্টি রেখে বললে, "আমিও বলে দিচ্ছি, লোকের

সঙ্গে মেলামেশা আমার নিজের ইচ্ছামত হবে, কারো হুকুমের অপেক্ষায় থাকব না সেজন্যে।”

“বটে! এতবড় স্পর্দ্ধা!” জ্যোতিষ ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে হাতের কাছ থেকে একটা কাঁচের পুষ্পাধার তুলে নিয়ে শ্রীলতার ললাট লক্ষ্য করে সজোরে নিক্ষেপ করলেন। দেওয়ালে লেগে পুষ্পাধারটা চূর্ণ হয়ে গেল,—একটা চূর্ণাংশ শ্রীলতার ভুরুর কাছে লেগে কেটে গেল।

জ্যোতিষ দাঁড়িয়ে চীৎকার করতে লাগলেন, “দূর হও তুমি দূর হও, আমার শনি ছাড়ুক। আমার সর্ব্বনাশ করে ছেড়েছ, এবার রেহাই দাও, বাড়ী থেকে বিদায় হও।” তিনি টলতে টলতে পড়ে গেলেন।

ভৃত্যরা হৈ হৈ করে ছুটে এল। জ্যোতিষের চোখে মুখে জল দিয়ে তাঁকে ধরাধরি করে শয়নকক্ষে নিয়ে গেল।

কপালের কাটাটা আঁচলে চেপে নিয়ে শ্রীলতা নিজের ঘরে উঠে এল।

হাতে লাগা রক্তটার পানে অনেকক্ষণ সে চেয়ে রইল। অনেক দিনের অশ্রুধারায় যার সঞ্চয়, আজকের এই রক্ত-রেখায় তার সমাপ্তি। এই কী তার জীবনযুদ্ধের জয়টীকা! গভীর একটা নিঃশ্বাস আস্তে আস্তে সে ফেললে।··· অনেকদিনের অভিনয়ের রঙ আজকের এই রক্ত রঙে ধুয়ে গেল,পরিশোধ খেলা এবার তার পূর্ণ হল। শ্রীলতা লেখবার টেবিলে এসে বসল। একখানা চিঠির কাগজ টেনে নিয়ে দ্রুতহস্তে লিখলে, “দেবব্রতকে তুমি ভুলে গেছ বোধ হয়। তাকে আমি কতটা ভালবেসেছি বুঝেছিলে তুমি। তোমারি জন্যে সে প্রাণ হারালে। ছুরি যে বুকে বিঁধে দেয় তার সঙ্গে তোমার কোনো তাফৎ নেই। আমার জীবনকে স্বার্থপরতার ঈর্ষায় এমনভাবে বিফল করলে,—তোমার জীবনকে বিষিয়ে তুলব এই ছিল আমার পণ। তোমার অবনতির কিছু বাকী রইল না এখন, ভিতর বাহির নষ্ট হয়ে গেছে। জীবনের জয়সম্ভাবনা আর নেই তোমার। আমার কাজ শেষ হয়েছে, এবার তোমায় নিষ্কৃতি দিয়ে যাচ্ছি। আমার পণ হয়ত পূর্ণ হল, কিন্তু এতে পরিতৃপ্তি এল কিনা বুঝতে পারি না। মনে হচ্ছে দুঃখকে ভোলার জন্যে আমি নষ্ট করার কাজ নিলাম কেন। এতে মনের শূন্যতা ভরে উঠল জঞ্জালে।”

চিঠিখানা খামে ভরে সে জ্যোতিষের নাম লিখে রাখলে।

এতদিন ধরে সে ভাঙতে চেয়েছে যত, নিজেকেও ভেঙেছে তত। আঘাত সে করেছে যত, তার কলঙ্ক তাকেও অব্যাহতি দেয়নি। পরিশোধ বুদ্ধির প্রাধান্যে চেতনা ছিল পরিম্লান। এবার এসেছে অবসর। বহু-বিলম্বিত মুক্তির এ নৈবেদ্য সুমনের দ্বারা দ্বারে তার পাঠালেন ভাগ্যবিধাতা। লেখনীপ্রান্তটা গালে ঠেকিয়ে অনেকক্ষণ শ্রীলতা অন্য মনে বসে রইল। তার জীবনের বাহিরটা, যেখানে জোর করে ডেকে আনা আনন্দের নিষ্ঠুর সমারোহ, সেখানে সুমনের সঙ্গে পরিচয় নয়। এ সবের আহ্বানে যেখানে নিভৃতে ফাল্গুনদিনের শিরীষ শাখার মত শ্রীলতার চিত্ত সহজে ফুল্ল সেখানেই সুমনের সঙ্গে তাঁর সত্যকার পরিচয় যোগ। দিনযাত্রার নিত্য সংঘর্ষের মধ্যে কেমন করে জানে না কিন্তু ওর কাছ থেকেই শ্রীলতা একটা শান্ত সম্পূর্ণতার আশ্বাস পেত নিয়ত।

সুমনকে লিখলে, “বন্ধু, এবার আমার এল যাবার বেলা। আমার ছড়িয়ে যাওয়া শান্তি মুহূর্ত্তগুলিকে কুড়িয়ে নিয়ে মালা গাঁথার দিন। নিজেকে জানার অবসর আমার এসেছে এতদিনে। জানতে হবে আজও কিছু সত্য বাকি আছে নাকি মনের মধ্যে। সে পরিচয়ের পরিণতি কীরূপ নেবে তা বলতে পারি না এখনো। যদি কোনোদিন তোমায় আমায় আবার দেখা হয়, তখন হয়ত দেখবে নেহাৎ সাধাসিধে বেশে আমি Stethoscope লাগিয়ে রোগীর বক্ষ পরীক্ষায় ব্যস্ত আছি, কিম্বা apron চড়িয়ে অস্ত্রোপচারে লেগেছি। আমার সে prosaic অধঃপতন দেখলে কলকাতার বন্ধুবর্গ আতঙ্কে আধমরা হয়ে যাবে। কিন্তু তোমার ছবি আঁকার খেয়াল তখনো যদি শেষ না হয়ে থাকে তবে তোমার অসমাপ্ত ছবির সমাপ্তির জন্যে আর সমস্যায় পড়তে হবে না।”

তার পরদিন শ্রীলতা যখন চলে গেল, জ্যোতিষের চেতনা তখনো নেশা হতে মুক্তি পায়নি।

শ্রীইলা দেবী

স্বপ্ন ও কল্পনা

শ্রীমৃণাল সর্ব্বাধিকারী, এম্-এ

রজনীতে কাল চাঁদ জেগেছিল মোর খোলা বাতায়নে,
হেনার গন্ধ এসেছিল ভেসে মন্দ পবন সনে।
একা একা আমি শয্যায় শুয়ে জ্যোৎস্না পরশ পেয়ে
আপনার মনে আনমনা হোয়ে উঠেছিনু গান গেয়ে।
ওগো প্রিয়তমা সে গানের সুর বুঝিবা তোমার কানে
গিয়েছিল ভেসে সুরে বাঁধা ঐ তোমার স্বর্গ পানে।
স্তব্ধ চরণে কখন আসিয়া ব'সেছিলে মোর পাশে,
লুটাইয়াছিলে অঙ্গ-মাধুরী বাসর-বিছানা-বাসে।
টের পাই নাই সেই কথাটুকু বিভোর ছিনু যে গানে,
ফিরে গেলে তাই নীরবে আবার তুর্জ্জয় অভিমানে।
তুয়ারের পাশে দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে আবার আসিলে ফিরে
আঁখি তুটি মোর ডুবে গেছে যবে ঘুমের সাগর তীরে।
গালে গাল রেখে শুয়েছিলে সুখে তুমি মোর পাশে এসে,
উপাধানটুকু দিয়েছিলে ঢেকে ঘন কালো তব কেশে।
বেঁধেছিলে মোরে বাহু দিয়ে তব নিবিড় আলিঙ্গনে,
ভ'রে দিয়েছিলে অধর আমার চুম্বনে চুম্বনে।
ঘুম ভেঙে যেতে দেখি তুমি নাই আছে শুধু চাঁদ জেগে,
হেনার গন্ধ ফিরিছে বাতাসে তোমার সঙ্গ মেগে।
মনে হোল মোর ওত নহে চাঁদ, ও নহে হেনার গন্ধ
তোমারি অঙ্গ সুরভিত ওযে দেহের পুলক ছন্দ।

পট ও মঞ্চ

—আনন্দ—

ক্যাথরিন্ হেপ্‌বার্ণের রূপ নেই, চাম´নেই, কিন্তু তার অভিনয় ক্ষমতা বিশ্ববন্দিত। ক্যাথরিন্ জেম্‌স্ ব্যারির Little Minister শেষ করে Quality Street এর জন্য তৈরি হচ্ছে। গত বছরে Little women এবং Morning Glory দেখার ফলে অনেকেই এই টম্‌বয়কে ভালবেসে ফেলেছেন।

আমাদের ছায়াশিল্প

প্রথমেই বলে রাখা ভাল আমরা ইকনমিষ্ট নই; আমি চিত্রবিলাসী—ছবি দেখে আনন্দ আহরণ করাই লক্ষ্য আমার। আর্থিক প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা বাণিজ্য সম্পাদকের কাজ, কিন্তু বর্ত্তমানক্ষেত্রে আমরা অনধিকার চর্চ্চা করতে বাধ্য হচ্ছি এবং কেন বাধ্য হচ্ছি, তার উত্তরও এই প্রবন্ধের মধ্যে দেওয়া গেল।

বাংলা ছবিকে আমরা ভালবাসি। বাংলা ছবি একখানাও দেখতে ভুলি না। সব বাংলা ছবি দেখার ফল যে আনন্দদায়ক নয়, একথা খুবই সত্য কারণ বাংলা ছবি দেখে অধিকাংশক্ষেত্রে অপ্রসন্ন মনেই ফিরে আসি—আক্ষেপ করি নামজাদা বিদেশী ছবি ছেড়ে অনিশ্চিত বাংলা ছবি দেখার মোহকে। কিন্তু তবু বাংলা ছবি ছাড়তে পারি না—এমন কি দুঃখ করি বাংলার ছবির সংখ্যা বড় অল্প, আশানুরূপ সংখ্যায় বাঙালীর কলানৈপুণ্যের পরিচয় পাই না।

আমরা আরও বাংলা ছবি চাই—উন্নততর দেশী ছবি চাই। আমাদের ছবি উন্নততর করতে হলে প্রয়োজন, তার দোষ কোথায় জেনে নেওয়া—শুধু চিত্র বিশেষের নয়, সমগ্র ছবির ব্যবসার বিচ্যুতি কোথায় কোথায় সেটা জানাও বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই প্রয়োজনের তাগিদ চিত্রপ্রতিষ্ঠানের মালিকরা হয়ত অন্তরে অন্তরে অনুভব করেন কিন্তু বাহ্যতঃ প্রকাশ করেন না। আমরা বিশ্বাস করি আপনার সৃষ্টির উৎকর্ষ মানুষ মাত্রেরই কাম্য। কিন্তু এই প্রয়োজন মেটাবার ক্ষমতা থাকলেও বিজ্ঞাপনপুষ্ট সাপ্তাহিকের দ্বারা ও কাজটী সম্ভব

Cimmaron-এই প্রথম জগৎ আইরিন্ ডানের প্রতিভার পুরস্কার দেয় তাকে ১৯৩১ সালের সেরা অভিনেত্রী মনোনীত করে। কিন্তু তারপর এক Back Street ছাড়া ডান্ আর কোথাও তেমন সুবিধা করতে পারে নি। শ্রীমতীর গানের গলা এবং নাচের পা আছে। সে পরিচয় Secrets of Madam Blancheতে পেয়েছি, এবার Robertaতেও পাবো। Irene Dunne goes musical.

রাজধানীতে কোন প্রেক্ষাগারই সম্বৎসর বাংলা ছবি দেখাতে পারে না এবং গড়ে মাসিক দুএকটী বাংলা ছবি মুক্তিলাভ করে। কিন্তু কেন এমন হয়? হিন্দি ছবি পাঁচ ছ' সপ্তাহ চলে কিন্তু মনের মত বাংলা ছবি হলে দর্শক সারা বৎসরই টিকিট ঘরে ভীড় করে থাকে। খুব কম বাংলা ছবিই একাদিক্রমিক সপ্তম সপ্তাহের পূর্ব্বে বিদায় নিয়েছে। দ্বিতীয় প্রেক্ষাগৃহেও চার পাঁচ সপ্তাহ বেশ চলে থাকে। তবু কেন বাংলা ছবি আশানুরূপ সংখ্যায় পাই না?

বাংলা ছবির বাজার বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ—বিশেষ করে কলকাতা সহরে। বাংলার বাইরে বাংলা ছবির চল নেই এবং বাংলার অন্তর্গত ঢাকা চট্টগ্রাম বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থান হতে বাংলা ছবি যে অর্থ আনে তার অঙ্কটা প্রায় উপেক্ষণীয়। একটী বাংলা ছবি একমাত্র কলকাতাতেই যে অর্থ পায় বাংলার অন্য সর্ব্বত্র থেকে তার এক তৃতীয়াংশ পায় কিনা সন্দেহ। সুতরাং একমাত্র একটী সহরে যে ছবির বাজার পর্য্যবসিত সে রকম ছবি তোলা দুঃসাহসিক ব্যাপার। কলকাতাতে ছবি যদি দাঁড়াতে না পারে, তবে অর্থের সলিল সমাধি।

অপর পক্ষে হিন্দি এবং উর্দ্দু ছবির বাজার খুবই ভাল। বম্বেতে 'পূরণভকৎ' রেকর্ড সৃষ্টি করেছে; পাঞ্জাবে ছবিঘরের মালিকরা ভাল ছবি হাত করবার জন্য মোট আয়ের শতকরা সত্তর ভাগ চিত্রনির্ম্মাতাকে দিয়ে থাকে; অধিক কি, 'আমিনা'র মত ছবিও দিল্লীতে প্রচুর পয়সা পিটেছে। সারা ভারতে হিন্দি ও উর্দ্দু ছবির বিস্তর চাহিদা। কলকাতাতে এগুলি যে ভাল চলে একথা পূর্ব্বেই বলেছি পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দি, বিশেষ করে, উর্দ্দু ছবি অনেক সময় বাংলা হয়ে উঠে না। অপ্রিয় সত্য ভাষণের আজ সুতীব্র প্রয়োজন উপস্থিত।

আমাদের এই সহরে ছয়-ছত্রিশ জাতের বাস হলেও বাঙালীর সংখ্যা সব চেয়ে বেশী। লজিক অনুযায়ী বাংলা ছবির সংখ্যা সব চেয়ে বেশী হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে চড়াপালিশের বিদেশী ছবির সংখ্যা সব চেয়ে বেশি, তারপর হিন্দি বা উর্দ্দু এবং সব শেষে বাংলা। হিন্দি ছবিঘরের সংখ্যা দিন দিন বেশ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতাও প্রচুর। প্রতি সপ্তাহে দুএকটী হিন্দি ছবি মুক্তিলাভ করছে এবং পাঁচ ছটী ছবিঘর সারা-বৎসর হিন্দি ছবি দেখাচ্ছে। অথচ বাংলা দেশের

জিন্‌জার রজার্স যে রাতারাতি নাম করে ফেলেছে তার কারণ শুধু সে মিষ্ট নয় বলে, নাচে গানে অভিনয়ে মনোহরণে সে অদ্বিতীয়। ফুটফুটে ছোকরা লিউ আয়ার্সকে সে সেদিন বিয়ে করেছে কিন্তু মধু চন্দ্রিমার ছুটি মিলেছে পাঁচদিন, কারণ কায়িক ভাবে সে অপরের হলেও ছায়াতে সকলেই তাকে চায়। সম্প্রতি জিন্‌জার Raberta শেষ করেছে। এবার Top Hat-এ নামবে।

ছবির চেয়ে বেশী লভ্যাংশ দিয়েছে। তারপর বাংলা ছবি কলানুগ হওয়া চাই। কেবল Mass appeal বিশিষ্ট ছবি বাঙালী চায় না—সূক্ষ্ম ও কারুকলার পরিচয় তার কাছে আগে দেওয়া চাই। অর্থাৎ ছবির গুণাগুণ জ্ঞান বাঙালীর অন্যান্য জাতের চেয়ে এত বেশী যে সে ফাঁকি বরদাস্ত করতে পারে না। বাঙালীর মনের মত ছবি তুলতে হলে প্রযোজককে বেশী মাথা ঘামাতে হয় এবং পরিচালককে বেশী অর্থ ব্যয় করতে হয়। এক কথায়, বাংলা ছবিতে সময়, শ্রম ও অর্থ প্রচুর লাগে। আবার ব্যয়ের অনুপাতে আয় হয় না।

কিন্তু হিন্দি বা উর্দ্দু ছবিতে মস্তিষ্কের বেশী প্রয়োজন হয় না। ভাল হিন্দি বা উর্দ্দু ছবি করতে হলে দেখতে হবে (১) ছবিটী যাতে দশহাজার ফিটের বেশী হয় (২) গল্পে যাতে সকল মানুষের জীবনে যতকিছু ঘটনা ঘটতে পারে, সে সবই থাকে; stunt এবং thrill প্রচুর থাকা চাই (৩) অভিনেতৃদের যাতে ভাবপ্রকাশের কিছু ক্ষমতা থাকে এবং (৪) শব্দ ও চরিত্রগ্রহণ যাতে বোধগম্য হয়। গল্পে অসামঞ্জস্য থাক, যাই থাক, ছবিতে Mass appeal-ই প্রধান। এ রকম ছবি তুলতে প্রকৃতিতঃ কলাকুশল বাঙালীর পরিশ্রম সামান্যই এবং যে সময়ে একটী বাংলা ছবি তৈরী হয় তার মধ্যে দুটী হিন্দি ছবি তোলা যেতে পারে। বাংলা সাহিত্য সুসমৃদ্ধ হলেও হিন্দি ও উর্দ্দু ছবি তোলার মরসুমে উক্ত সাহিত্যদ্বয় (তেমন কিছু থাকলে) intriguing storyতে ভরে উঠছে। অনেক বাঁচিয়ে পরিশ্রম করে বাংলা ছবি তোলার চেয়ে অধিকতর অর্থকর হিন্দি ছবি প্রায় চোখকাণ বুজে তোলা-ই লাভজনক।

'চণ্ডীদাসে'র কথা আলাদা। তাতে আছে ধর্ম্মের আবেদন, যৌন এবং পরিচিত কাহিনীর আবেদন। ধর্ম্ম, পুরাণ ও যৌনতত্ত্ব—এই তিনটীর একটী থাকলেই বাংলা ছবি চলে, 'চণ্ডীদাসে' তিনটীই বিদ্যমান।

'চণ্ডীদাসে'র অপ্রত্যাশিত এবং অস্বাভাবিক অর্থভাগ্য পুরোভাগে না থাকলে কটা ষ্টুডিয়োর কর্তৃপক্ষ বাংলা ছবি তুলতেন, তাই ভাবি। বাংলা ছবি একটু ভাল হলেই তার আর্থিক সাফল্য অনিবার্য্য। Mass appeal থাকলে সাফল্যের বিষয় নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। 'চণ্ডীদাস' 'তরুণী' প্রভৃতি নিতান্ত সাধারণ ছবির অত্যধিক আদর দেখে ষ্টুডিয়োর মালিকরা আবার বাংলা ছবি তুলতে লেগেছেন।

বাংলা ছবির সাফল্য অবশ্যম্ভাবী যদি চিত্রগ্রহণ সুস্পষ্ট হয়, শব্দগ্রহণ বোধগম্য হয় এবং প্রধানতঃ যদি Mass appeal থাকে। অবশ্য বাংলা ছবিতে অভিনয় একটু দ্রষ্টব্যরকম হওয়া চাই। কিন্তু হিন্দি বা উর্দ্দু ছবিতে সাফল্য অর্জ্জন করতে হলে এতগুলি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখতে হয় না।

আমরা চিত্রব্যবসায়ীদের বাংলা ছবি তুলতে বারণ করবার উদ্দেশ্যে বাংলা ছবির আর্থিক প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে বসিনি। আমরা আরো বাংলা ছবি চাই এবং বাঙালীর ছবির উন্নতি চাই। বাংলা ছবি অর্থপ্রসূ নয় আমরা এমন কথা বলি না; নূতন কিছু থাকলে বাংলা ছবি আশাতীত অর্থাগমের সাহায্য করে থাকে। প্রতিটী বাংলা ছবিতে নূতন কিছু দেবার প্রয়াস থাকলে বাংলা ছবি সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে, শিল্পের উন্নতি হবে এবং চারুকলার উৎকর্ষ আসবে। ব্যবসার দিক থেকে হিন্দি ছবি তোলা ভাল কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে বাঙালীর আরো সম্মানসূচক পরিচয় সে কলা-কমলার পূজারী। গতানুগতিকতা এবং পুনরাবৃত্তি বাঙালীকে মানায় না। লোককে সে যা মনে প্রাণে দিতে চায়, তার ছবিতে থাকবে তারই পরিচয়। রুচির সে প্রবর্ত্তক। কলাকুশলতার নব পরিচয় দিতে গিয়ে হয়ত বারেক সে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে কিন্তু অপরপক্ষে হিন্দি বা উর্দ্দু ছবি সুদসমেত সেই পরিমাণ অর্থ তুলে আনবে। রুচির পরিবর্ত্তন ও প্রবর্ত্তনের অশেষ প্রয়োজন এবং তা বহুল পরিমাণে নির্ভর করে গল্পের 'পরে। গল্পের কথা আমরা পূর্ব্বেই বলেছি।

মঞ্চের কথাঃ নাট্যকার শরৎচন্দ্র

মঞ্চের সমস্যা একটী আধটী নয়, অনেকগুলি এবং কোনোটারই সমাধান সহজসাধ্য নয়। মঞ্চের ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িয়েছে সবাক্ চিত্র, স্বল্পব্যয়ে উন্নত অভিনয়-কলা উপভোগের লোভ বড় কম নয়। সমস্যাকণ্টকিত পীঠের সম্বন্ধে আলোচনা করতে, সত্য কথা বলতে কি, আমরা এতাবৎকাল উৎসাহিত বোধ করিনি; কিন্তু আজ ঘন মেঘে অন্ধকার মঞ্চের আকাশে আশার ও নবজীবনের বিদ্যুৎ বিকাশ দেখেছি, এখন মঞ্চের কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে ইচ্ছা আসছে।

নাটক হচ্ছে পাদপ্রদীপের সামনে অভিনয়ের প্রাণ। কিন্তু ধর্ম্মাত্মক পৌরাণিক নাটক ছাড়া অন্যবিধ নাটক ভাল জমছিল না। পূর্ব্বে আমাদের নাটকে প্রয়োজন ছিল নিছক অভিনয়ের, অদ্ভুদ আবৃত্তির এবং sob-stuff এর। সর্ব্বসময় আমরা রূপকথা শুনতাম; আমাদের দৈনন্দিন সংস্থানের সংগ্রাম, আমাদের হানাহানির রোমান্স, আমাদের নিষ্ঠুর বাস্তবজীবনের মনোরম কাহিনী—কোনোটাই পেতাম না। পৌরাণিক গল্প, ঐতিহাসিক রূপকথা এবং আধুনিক সামাজিক কল্পনাগাথা সবগুলিই ছিল কৃত্রিম, তাতে প্রাণের আনন্দ ছিল না—ছিল কেবল কল্পনা বিলাস। আধুনিক লেখিকাদের উপন্যাসের নাট্যরূপ অর্থকর হয়েছে কিন্তু সে সবেও ছিল sob-stuff, ঘরকন্নার খুঁটিনাটি এবং 'অভিনয়ের' উপযোগী লম্বা লেকচার। তিন চারটে মৃত্যুদৃশ্য এবং মুমূর্ষুর মুখে মর্ম্মন্তুদ লেকচার ছাড়া নাটক জমতো না। আমরা মানুষকে দেখতাম না, পেতাম না শুনতে তার অন্তরের কথা, তার বদলে পেতাম—চচ্চড়ি ভাল হয়নি, চাল বাড়ন্ত। sob-stuff বা ঘরদুয়ারের চেয়ে বড় জিনিষ মানুষের প্রাণ। আমরা কাল্পনিক আনন্দ উপভোগ করতাম, বিনিয়ে বিনিয়ে প্রেমের পাতিব্রত্যের লেকচার শুনতাম—মানুষের দৈনিক কাজকর্ম্মের কথাবার্ত্তার মাঝে কোনো ইঙ্গিত সেখানে মিলতো না, সবই 'অভিনয়ের' উপযোগী করে ঢেলে সাজা হোত—য়্যাক্টিং, য়্যাক্টিং চাই; সস্তা হাততালির খোরাক অবশ্যই থাকবে নাটকে। দীর্ঘ স্বগতোক্তি, দীর্ঘতর লেকচার, দুর্ব্বিষহ নীতি ও ধর্ম্মের উপদেশ, হৃদয়বিদারক দৃশ্য এবং প্রেমিক নায়ক ও প্রেমিকা নায়িকার 'সুখাবহ' মিলনের মাঝে কেটেছে এতকাল। এসব ছাড়া এবং এ সবের চেয়ে ভাল জিনিষ যেন ছিল না।

পীঠের যে সব বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করলাম আসলে সেগুলির থেকে আনন্দ আহরণ করবার জন্য আমরা মঞ্চাভিনয় দেখতে যেতাম, এমনি বিকৃত হয়ে পড়েছিল শ্রোতৃবর্গের মনোবৃত্তি। এই সব দুঃসহ ও আনন্দদায়ক বিষয় থেকে পূর্ব্বে শরৎচন্দ্রই আমাদের নিষ্কৃতি দিয়েছিলেন।

'রমা' 'ষোড়শী'র কথা আমরা ভুলিনি। কিন্তু 'দেনাপাওনা' বা 'পল্লীসমাজের' নাট্যরূপ মঞ্চের দুষ্ট প্রভাব সম্পূর্ণ পরিহার করতে পারেনি। একমাত্র শরৎচন্দ্রই সর্ব্বজনবোধ্য এবং তাঁরই গ্রন্থ সকল মনকে রসাবেশে বিভোর করতে পারে। আমরা মনীষীকে ধন্যবাদ দিই যে তিনি নাটক রচনায় হস্তক্ষেপ করেছেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে শরৎচন্দ্র যখন নাটক না লেখার কারণ বলেছিলেন তখন 'নাটক' কথায় অনেকেই বুঝেছিলেন সেই সব জিনিষ যা মঞ্চে এতকাল অভিনীত হয়ে আসছে এবং এজন্য অনেকে দু'কথা শুনিয়েও দিয়েছিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র নাটকের নূতন মনোজ্ঞ সংজ্ঞা দিলেন। সম্পূর্ণ নূতন টেক্‌নিক্ অবলম্বন করলেন তিনি নাটক রচনায় এবং তার ফল দেখা গেল 'বিজয়া'য়। 'বিজয়া' যে নাট্যজগতে নবযুগের সূচনা করেছে তা অনস্বীকার্য্য। শরৎচন্দ্র 'বিজয়া'কে রূপায়িত করবার ভার দিয়েছেন শিশির সম্প্রদায়ের 'পরে যাঁরা প্রগতির পক্ষপাতী এবং গতানুগতিকতার মুখাপেক্ষী নন, নূতন কিছু সৃষ্টি করবার ক্ষমতা যাঁদের আছে। শরৎচন্দ্র দীর্ঘসংলাপের ধার ধারেন না, sobstuff এর প্রতি তাঁর মোহ নেই কিন্তু তবু তাঁর নাটকের (উপন্যাসেরও) প্রত্যেকটী চরিত্র আমাদের আত্মীয়, সবাইকে যেন আমরা দেখেছি, সকলকেই যেন আমরা সহজে বুঝতে পারি। মা বাবা যেমন শিশুকে বাড়তে দেবার জন্য স্বাধীনতা দেন শরৎচন্দ্রও তেমনি তাঁর উপন্যাসের প্রত্যেকটী লোককে ছেড়ে দিয়েছেন সংসারের ঘটনার মাঝে, তারা নিজেরাই নিজেদের চরিত্র বদলায় এবং গঠন করে—শরৎবাবু তাদের কালির আঁচড়ের সীমারেখার মধ্যে বদ্ধরেখে পাঠককে বুঝিয়ে দেবার প্রয়াস পান না। বিলাসকে আমরা চিনি, রাসবিহারী আমাদের অপরিচিত নয়, নরেনের সাথে আমাদের বহুদিনের আলাপ, বিজয়া আমাদের একান্ত আপন—সকলকেই আমরা ভালভাবে জানি, জানি তাদের কাজকর্ম্ম, কথাবার্ত্তা, ধরণ-ধারণ। শরৎবাবুর লোকেরা তেল, নুন, লুচি, আলুরদমের কথা বলে না, তারা প্রেমের কথা বলে না—তারা ঘটনানুযায়ী আলাপ করে আর তাদের আলাপের মাঝেই তারা পরিচয় দিয়ে থাকে যে তারা সজীব প্রাণবন্ত মানুষ। শরৎচন্দ্রের চরিত্রকে ফোটাবার প্রয়োজন হয় না, বিবিধ ঘটনার সংঘাতে সে আপনিই ফুটে থাকে। শিল্পিশ্রেষ্ঠের সংলাপের গুণেই শ্রোতা থাকে প্রশংসায় ও বিস্ময়ে মূক হয়ে। আমরা শিশির সম্প্রদায়ের প্রতিভাকে অভিনন্দিত করি যে তাঁরা প্রত্যেকটী চরিত্রকে মনের মত করে ধরেছেন, যে তাঁরা নাটক-কুশলতা সত্ত্বেও আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন।

চিত্র পরিচয়—গত জানুয়ারি মাসে সর্ব্বসমেত তেইশখানি ছবি মুক্তিলাভ করেছে কিন্তু দুঃখের বিষয় বিংশাধিক ছবির মধ্যে একটীও বাংলা ছবি নেই এবং আরো দুঃখের কথা এই যে এবারে (ক) শ্রেণীর ছবি একটিও নেই। আমাদের মতে (ক) শ্রেণীর ছবি অসাধারণ, (খ) শ্রেণীর ছবি সুন্দর, (গ) উপভোগ্য এবং (ঘ) সাধারণ। (ছ) শ্রেণীর ছবি ছেলেরাও দেখতে পারে।

মাডাম্ ড্যুবারি (খ)—পূর্ব্বতন দুটী সংস্করণ থেকে এ ছবির যথেষ্ট পার্থক্য আছে কারণ এতে ড্যুবারি কামনাতুরা নয়, সে কূটনীতিজ্ঞ প্রেমিকা। কিন্তু শুধু ড্যুবারি বলে নয় সব কটি চরিত্রই চমৎকার আঁকা হয়েছে; বাস্তবিক treatment উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। উইলিয়াম্ দিয়াত্রিলের প্রযোজনা আরো সুন্দর। নামভূমিকায় ডলোরেস্ ডেল্‌রিও সুন্দর অভিনয় করেছে, রেজিনাল্ড ওয়েনের লুই খুব স্বাভাবিক হয়েছে। অন্যান্য সব ভূমিকাই সু-অভিনীত।

কাউণ্ট অব্ মণ্টি ক্রিষ্টো (খ) ও (ছ)—আলেকজেণ্ডার ডুমার লেখা, আখ্যানের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। নাম ভূমিকায় রবার্ট ডোনাটের অভিনয় হয়েছে অপূর্ব্ব। ক্লড্ রেন্‌সের রোমাঞ্চকর কণ্ঠে মাধুর্য্য থাকলে যেমন হয় তেমন গলা আছে ডোনাটের। সুস্পষ্ট তার উচ্চারণ, সুন্দর তার ভাবব্যঞ্জনা, কণ্ঠে তার প্রাণে শিহরণ জাগে। রবার্ট ডোনাটের অভিনয় এত চমৎকার হয়েছে যে এলিসা ল্যাণ্ডি, সিড্‌নি ব্ল্যাক্‌মার, লুই কল্‌হিয়ার্ণ প্রভৃতি সকলেই তার পাশে নিতান্ত ম্লান হয়ে গেছে। প্রযোজক রোলাণ্ড লী ছবির অল্প দৈর্ঘ্যের মাঝে মূলগ্রন্থের সব ঘটনা না চালালেই ভাল করতেন কারণ সংক্ষিপ্ত হওয়াতে কয়েকটী ঘটনার নাটকীয় রস ঘন হয়ে উঠতে পারে নি।

মেরি উইডো (খ)—'মেরি উইডো'র সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে ফ্রান্‌জ লেহারের সুর-সুধা। আর্ন্‌ষ্ট লুবিশ্‌ 'মেরি উইডো'কে নূতন করে সাজালেও বহুদূর অনাবিল উচ্চহাসির মধ্যে অগ্রসর হয়ে মাঝে ছবি এমন সীরিয়াস্‌ দাঁড়িয়েছে (এবং গল্পের দরুণ তা দাঁড়াতে বাধ্য) যে শেষের পরিবেশিত হাল্কা রস উপভোগ্য হয়নি। মরিস্‌ শ্লেভালিয়ে, জেনেট্‌ ম্যাক্‌ডোনাল্ড্‌ ও এড্‌ওয়ার্ড এভারেট্‌ হর্টনের অভিনয় পরম উপভোগ্য হয়েছে। জর্জ্জ বার্ব্বিয়ার ও উনা মার্কেলও ভাল। নাচগুলি নয়নানন্দকর এবং গানগুলি তৃপ্তিদায়ক। শেষ পর্য্যন্ত 'ওয়ান্‌ আওয়ার উইথ্‌ ইউ'ই দেখছি লুবিশ্‌ মরিস্‌ বা জেনেটের শ্রেষ্ঠ ছবি।

পার্স্যুট অব্‌ হ্যাপিনেস্‌ (খ) ও (ছ)—এই ছবিতে আর একটী sensational তারকার দেখা পাওয়া গেল। ফ্রান্সিস্‌ লিডারারের জেকোশ্লোভাকীয় টানের উচ্চারণ মিষ্ট, মনোহর তার হাসি এবং অসামান্য তার চরিত্রকে জীবন্ত করে তোলার ক্ষমতা। ওদেশের মেয়েদের নূতন heart-throbকে আমরা অভিনন্দিত করছি। চার্লি রাগল্‌স্‌, মেরি বোলাণ্ড জোয়ান্‌ বেনেট্‌ প্রভৃতি সকলেরই অভিনয় হয়েছে পরম উপভোগ্য। অব্যাহত প্রাণখোলা হাসির ছবি। Polished humour সর্ব্বত্র বজায় রেখেছেন বলে আমরা প্রযোজক আলেকজেণ্ডার হল্‌কে সাধুবাদ জানাচ্ছি।

অব্‌ হিউম্যান্‌ বণ্ডেজ্‌ (খ)—সমারসেট মুঘামের গল্পের ছায়ারূপ বাস্তবিকই লোভনীয় হয়েছে। নায়ক লেস্‌লি হাওয়ার্ডের অভিনয় হয়েছে অনবদ্য কিন্তু মনে সবচেয়ে গভীর রেখাপাত করে বেট্‌ ডেভিসের অভিনয়। প্রেমকে পরিহার করে দেহলালসা এবং অর্থ নিয়ে কারবার করতো কাফের এক পরিচারিকা: বেট্‌ ডেভিসের শিল্পনৈপুণ্যে ফুটে উঠেছে এই মেয়েটীর চরিত্র এবং অভিনেত্রীর গুণেই বিপথচারিণীর পরিণাম মর্ম্মন্তুদ হয়েছে। অন্যান্য ভূমিকায় ফ্রান্সেস্‌ ডী, রেজিনাল্ড ডেনি, রেজিনাল্ড ওয়েন, কে জন্‌সন্‌ প্রভৃতি সকলেই চরিত্রোপযোগী অভিনয় করেছে এবং জন্‌ ক্রম্‌ওয়েলের প্রযোজনা অনুরূপ হয়েছে।

রোমান্স ইন্‌ দি রেন (গ)—হাল্কা নাচ, গান এবং হাসির ছবি। নাচগান সম্পূর্ণ বিশেষত্ব বর্জ্জিত না হলেও তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। দোষের কথা এই যে ছবিটী মাঝে মাঝে বেশ dull হয়ে গেছে। রজার পাইরর এবং হিদার এঞ্জেলের অভিনয় বেশ উপভোগ্য তবে সকলকে ছাপিয়ে উঠেছে ভিক্টর মুরের অসাধারণ হাসাবার ক্ষমতা। ভিক্টর মুরের স্বরটীও বেশ হাস্যকর রকম করুণ এবং ধীর। এস্থার রাল্‌ষ্টনের অভিনয়ে বিশেষ কিছু নেই আর ষ্টুয়ার্ট ওয়াকারের প্রযোজনাগুণ সর্ব্বত্র সমান উন্নত নয়।

মেরি গ্যালাণ্ট (গ)—এই ছবির প্রথম অধিকাংশই নিতান্ত অসংলগ্ন এবং ভূমিকা করতে গিয়ে নষ্ট হয়েছে। তবে শেষে খুব জমে উঠেছে। হেন্‌রি কিংয়ের হাতে গ্রাম্য tender romanceই ফোটে ভাল দেখছি। ফরাসী মঞ্চের নবাগতা তারকা কেটি গ্যালিয়ান্‌কে আমাদের ভাল লাগে নি। অভিনয়ের অশেষ সুযোগ পেয়েও কেটি নিজের প্রতিভার প্রমাণ দিতে পারে নি; য়্যানা ষ্টেনেরই জুড়িদার। তবে কেটির কণ্ঠ এবং মুখাবয়ব মিষ্ট। স্পেন্‌সার ট্রেসির খুব স্বাভাবিক অভিনয় হয়েছে এবং সিগ্‌ফ্রায়েড্‌ রুম্যান, লেস্‌লি ফেন্‌টন, নেড্‌স্পার্কস্‌, আর্থার বায়রন্‌ প্রভৃতি সু-অভিনয় করেছেন। হেলেন মর্গানের অভিনয়ে দেখবার কিছুই নেই।

নো গ্রেটার গ্লোরি (গ) ও (ছ)—ছেলেদের খেলার মাঠের দখল এবং দু দল ছেলের মারামারি নিয়ে এই ছবির আখ্যানভাগ। প্রযোজক ফ্রাঙ্ক বোরজেগ্‌কে অনেকে sob-stuff director বলে থাকেন কারণ তিনি তাঁর ছবির জন্য করুণ চিত্রনাট্য পছন্দ করে থাকেন। কিন্তু সে যাই হোক্‌ তাঁর মত কলাকুশলী চিত্রজগতে কমই আছেন। আলোচ্য চিত্রে তাঁর প্রতিভার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল। তিনি দেখিয়েছেন, আজ যে ছেলেরা খেলার মাঠ নিয়ে মারামারি করে কাল তারাই মৃত্যুময় মহাসমরে সৈনিক সাজে। এ জিনিষটি ফোটাবার কৌশল চমৎকার কিন্তু এর আগে কতকটা এই জিনিষই World Moves on এ দেখা গেছলো। রাল্‌ফ্‌ মর্গান ভিন্ন নামকরা নটনটী কেউই নেই কিন্তু বোরজেগের ছবির উৎকর্ষ তারকার মুখ চেয়ে থাকে না।

এ ছাড়া নিম্নলিখিত ছবিগুলিও আমাদের মতে (গ) শ্রেণীর :—

(১) ওয়ান্‌ মোর রিভার (২) রেডিও প্যারেড অব্‌ ১৯৩৫ (৩) রিটার্ণ অব্‌ টেরর।

(ঘ) শ্রেণীর ছবিগুলির এবারে আংশিক উল্লেখ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে কারণ অনেক নামজাদা তারকার অন্তঃসারশূন্য ছবি আমরা দেখেছি :—

(১) প্রাইভেট লাইফ অব ডন্‌ জুয়ান (২) ক্যাট্‌স্‌ প (৩) ওয়াইল্‌ড্‌ গোল্ড (৪) লেডিজ শুড লিশন (৫) ষ্ট্রেট ইজ দি ওয়ে (৬) ষ্ট্রিক্‌টলি ডিনামাইট (৭) ডেথ্‌ অন দি ডায়মণ্ড। ইত্যাদি

বিচিত্রা
ফাল্গুন, ১৩৪১

তীরন্দাজ

শ্রীনির্ম্মল চট্টোপাধ্যায়

বাংলায় উচ্চসঙ্গীতের প্রসার

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

বাংলাদেশ কাব্যভারতীর একটি প্রধান পীঠ কিন্তু সঙ্গীত-সরস্বতীর প্রসাদ বিশেষভাবে পাইয়াছে হিন্দুস্থান। সঙ্গীত বাংলায় কলাবিদ্যার মুখ্য প্রকাশরূপে কখনই গৃহীত হয় নাই—চিরদিনই আমরা দেখিয়াছি, সুরের রঞ্জিনীশক্তিতে কবিতাকে অলঙ্কৃত করিতেই যেন বাংলাগানের আদর অথবা ভক্তি; বা প্রেমের স্বতঃউৎসারিত আবেগকে সুরের ঝঙ্কারে মুখরিত করিতেই যেন উহার উদ্ভব। বৈষ্ণবযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল অবধি বাংলাগীতিতে সঙ্গীতবিদ্যা কবিতার দাসীরূপে বা সহচরীরূপেই স্থান পাইয়াছে—কখনও রাণীর আসন পায় নাই।

কীর্ত্তনসঙ্গীতে সুরের উন্মাদিনী শক্তির পরিচয় আমরা না পাইয়াছি তাহা নয়, কিন্তু কীর্ত্তনের পদাবলীর সুললিত কাব্যরস বাদ দিলে শুধু কীর্ত্তনের সুরে শ্রোতার প্রাণে সেই আকুল উচ্ছ্বাস জাগাইয়া তুলিতে পারে কি? কীর্ত্তনেও সুরের ব্যবহার পদাবলীর মধুর ভক্তিরসের বিকাশের জন্য, সুর সেখানে স্বয়ংসিদ্ধ নহে।

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে কিন্তু রসের মুখ্য প্রকাশ সুরই করিয়াছে। সুরের বিভিন্ন বিভিন্ন গতিভঙ্গীর মধ্য দিয়া সেখানে মধুর শান্ত প্রভৃতি রস স্বতঃই নিঃসৃত হইতেছে। পদ সেখানে উপলক্ষমাত্র—রাগ রাগিণী অর্থাৎ বিভিন্ন ভাব ও রসপ্রকাশক স্বর বিন্যাসই সেখানে মুখ্য।

কিন্তু আজ দেখিতেছি বাংলাদেশও সুরের সাধনায় হিন্দুস্থানের পশ্চাৎপদ থাকিতে চাহিতেছে না, সঙ্গীতের নিজস্ব গৌরব যেখানে সেদিকেও বাঙালী প্রতিভার দৃষ্টি পড়িতেছে। সঙ্গীতের সাধনা ও সেবার জন্য অগণিত সাধক সাধিকা আজ যে সঙ্গীত সরস্বতীর মন্দির দ্বারে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন, ইহা বাংলার কলাবিদ্যার এক যুগান্তরেরই পূর্ব্বাভাষ। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মাধুর্য্য বাংলার রসপিপাসুর অন্তঃকরণে সত্যই এক অভিনব তরঙ্গ তুলিয়াছে। অতি আধুনিক বাংলা গানে কথার চেয়ে সুরের আদর আজ কম দেখিতেছি না।

বর্ত্তমানযুগের পিছনে রহিয়াছে একটা অতি বড় অমাবস্যার অন্ধকার কালরাত্রি—সবে পূর্ব্বদিকে আশাসূর্য্যের উন্মেষ সূচিত হইতেছে। এই যুগসন্ধির পিছনের দিকে তাকাইলে দেখি—অন্যান্য সর্ব্বকলার ন্যায় সঙ্গীতকলারও অবনতির ক্রম-পরিণাম। এমন কি উনবিংশ শতাব্দীতেও যে সকল সঙ্গীত-আচার্য্য ও গুরুগণ জন্মিয়া গিয়াছেন—তাঁহাদের স্থান কখনও পূর্ণ হইবে কি? প্যার খাঁ, বাসৎ খাঁ, বাহাদুর সেন, ওমারাও খাঁ ও উজীর খাঁর ন্যায় সঙ্গীত-প্রতিভার অবতারগণের সহিত বর্ত্তমান সঙ্গীত-আচার্য্যদের তুলনা করিলেই ইহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। তাঁহাদের সৃষ্টি তাঁহাদের জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্হিত হইয়াছে। তাঁহাদের কলাবিদ্যার পরিচয় পুঁথিপত্রে বা স্বরলিপির সাহায্যে আমরা পাইলেও সেই কলাসৃষ্টির প্রাণকে তো আমরা ফিরিয়া পাইব না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও একটা বড় আশার কথা এই যে বর্ত্তমান সময়ে সঙ্গীত যেরূপ সার্ব্বজনীন আকার ধারণ করিয়াছে তাহা পূর্ব্বে কখনও ছিল না। পূর্ব্বে কতিপয় অসাধারণ গুণী ও প্রতিভাশালী কলাবিদ্‌গণের মধ্যেই সঙ্গীতের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ছিল ও কয়েকটি তীর্থের দেবমন্দিরে বা কতিপয় রসিক রাজন্যবৃন্দের সভায় সঙ্গীতের সাধনা ও চর্চ্চা চলিয়াছিল। আজ কিন্তু সঙ্গীতের স্রোত ঘরে ঘরে বহিতেছে, কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের সুমধুর ধ্বনি প্রতি পল্লী ও নগরের পথে পথে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ইহাতেই বুঝি সঙ্গীতের আগ্রহ আজ কত ব্যাপক, সঙ্গীতের ক্ষেত্র আজ কত সুবিস্তৃত।

বাংলাদেশে বিশেষ করিয়া ইহা লক্ষ্য করিতেছি—সঙ্গীতের এই নব অভ্যুদয়ের সময় আমাদের প্রথমে প্রকৃত

পথের সন্ধান করিতেই হইবে-যাহাতে এই সদ্যউদ্বুদ্ধ উৎসাহ সার্থক হয় তাই করিতে হইবে। বাংলা গানে সঙ্গীতের সর্ব্বোচ্চ বিকাশ আমরা চাই—তাহার অল্পে আমরা তৃপ্ত হইব না। কি করিয়া তাহা সম্ভব? অনেকে চাহিতেছেন বাংলা সঙ্গীতে পাশ্চাত্য হার্ম্মনির প্রবর্ত্তনা করিতে, কেহ বা ঠুংরির অনুকরণে রাগ রাগিণীর সংমিশ্রণে বাংলাগীতিকে সাজাইতেছেন। কীর্ত্তনের সুর, ঠুংরি ও ইংরাজী সুরের মিশ্রণেও অনেকে সঙ্গীতের নূতন নূতন পথ খুলিতেছেন—এ সকল প্রয়াসই প্রশংসার্হ—কিন্তু বাংলাদেশের সঙ্গীতকে ভারতের সঙ্গীতে পরিণত করিতে হইলে, বাংলাগীতিতে বিশ্ব-বীণার কলধ্বনি মুখরিত করিতে হইলে—বাংলায় classical সঙ্গীতের নব বিকাশ ভিন্ন দ্বিতীয় পন্থা নাই। তাই সর্ব্বাগ্রে আমাদের হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সুবর্ণযুগের স্মৃতি ও সাধনা জাগাইতে হইবে। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি ও কৃষ্টি মোগলযুগে মিয়া তানসেন হইতে আরম্ভ করিয়া শাহ সদারঙ্গ পর্য্যন্ত আসিয়া শেষ হইয়াছে। সঙ্গীতে রসের সে প্রগাঢ়তা ও বিশালতা মোগলযুগের পরবর্ত্তীকালে ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হইয়াছে—বৈচিত্র্য বাড়িয়াছে কিন্তু গভীরতা লোপ পাইয়াছে।

হিন্দুস্থানী classical সঙ্গীতের অনুকরণের কথা আমি বলিতেছি না, কিন্তু বাংলাসঙ্গীতকে সমুন্নত স্তরে তুলিতে হইলে ধ্রুপদী ও কলাবন্তী সঙ্গীতের সৃষ্টি-উৎসের সহিত ইহার যোগ সাধন করিতেই হইবে।

সুরসঙ্গতি বা হার্ম্মনি হয়তো বাংলার অভিনব সৃষ্টিতে সমৃদ্ধি আনিতে পারে কিন্তু হার্ম্মনি হইবে কিসের? সেই মৌলিক রাগ রাগিণীর পুনরুদ্ধার অগ্রে চাই। বর্ত্তমানে বাংলা গানে যে রাগ সংমিশ্রণের পরিচয় পাইতেছি তাহাতে রসের পরিপুষ্টি বিশেষ করিতেছে আমার মনে হয় না। বস্তুত রাগসংমিশ্রণ আমরা করিতেছি না—একই গীতে পর পর কতকগুলি রাগের কলি নিয়া সংযুক্ত করিতেছি মাত্র। প্রকৃত রাগসংমিশ্রণে হয় নব-রাগের সৃষ্টি—দুই তিনটি বা চারিটি রাগের বিভিন্নমুখী স্বরধারা একত্র হইয়া সুরের এক অভিনব পথ খুলিয়া দেয়। ইহাই প্রকৃত প্রতিভার বিশেষত্ব। হিন্দুস্থানী কালবিদগণ ইমন্ কল্যাণ তিলক কামোদ বিভিন্ন ভৈরোঁ বিভিন্ন মল্লার বা কানাড়ায় রাগ ও সুরের সংমিশ্রণের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। তদ্ভিন্ন একই রাগে কত রসের কত ভাবের বিভিন্নমুখী বিকাশ সম্ভব তাহাও তাঁহারা দেখাইয়াছেন—বাংলাসঙ্গীতে আমরা তাহার পরিচয় চাই। বস্তুত হিন্দুস্থানী প্রাচীন সঙ্গীতের আদর্শকে বাংলার নিজস্বরূপে বর্ত্তমান যুগোপযোগী গঠন দিতে পারিলেই বাংলাসঙ্গীত ভারতসঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ আসরে প্রকৃত আসন পাইবে, তখন হিন্দুসঙ্গীতের শিক্ষা ও সাধনার জন্য বঙ্গভারতীর মন্দিরেই সকলকে আসিতে হইবে। এজন্য চাই অসাধারণ ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়, আর চাই প্রাচীন ও নবীনের দ্বন্দ্বের পরিবর্ত্তে প্রাচীনের শ্রেষ্ঠ সম্পদের সহিত নবীনের বৈচিত্র্যময় সৃষ্টির আন্তরিক সংযোগ।

বর্ত্তমান সঙ্গীত সম্মিলনে সমবেত সাধকমণ্ডলীর মধ্য হইতে বাঙ্গালীর ভাবী সঙ্গীতে প্রতিভার এই মহৎ বিকাশ হোক্ ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

১৯৩৪ সালের নিখিল-বঙ্গ সঙ্গীত সম্মিলনে পঠিত।

স্নেহ

শ্রীবিমলজ্যোতি সেনগুপ্ত

তোমার অন্তর-মাঝে যা'র তরে স্নেহ আছে জমা,
তা'র কোনো অন্যায়েরে কভু তুমি করিওনা ক্ষমা।

অতীতের ছবি

শ্রীমণিকা দাস বি-এ

তারপাশা ষ্টেশনে ষ্টীমারখানি যাত্রী তুলে নেবার জন্য অপেক্ষা করছিল। চারিধারে বিচিত্র কোলাহল। ফেরিওয়ালার দল চীৎকার করে রকমারী সুরে হাঁক্‌ছে; কুলীরা ব্যস্ত হয়ে ছুটাছুটী কর্‌ছে। একটী ভদ্রলোক ষ্টীমার ছাড়্‌বার সময় জিজ্ঞেস করায় টিকিটচেকার গর্ব্বভরে বারবার রিষ্টওয়াচ্‌ দেখ্‌ছেন,—মুখে তাঁর ফুটে উঠ্‌ছে আপ্যায়নের হাসি। যাত্রীর দল লট্‌বহর নিয়ে ব্যস্তভাবে যাওয়া আসা কর্‌ছে। যাদের উঠানামার কোন বালাই নেই, তারা ডেকের উপর আরামে বসে পরম নিশ্চিন্তভাবে সেই বৈচিত্র্যময় দৃশ্য উপভোগ কর্‌ছে; কেউ কেউ বা পাশের যাত্রা-সঙ্গীদের সাথে গল্পে মত্ত। ষ্টীমার বোঝাই হয়ে ক্রমশঃ বিপুলাকার ধারণ করছে; প্রতি ষ্টেশনে যথেষ্ট পরিমাণে যাত্রীর দল নেমে যাওয়া সত্ত্বেও তার ক্ষীণ দেহের ওজন কম্‌বার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে না।

ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ল। শত কোলাহলের মাঝে ষ্টীমার আপন জলদ-গম্ভীর সুরে বাঁশী বাজিয়ে দিয়ে আবার গন্তব্য পথে পাড়ি দিল। প্রথম শ্রেণীর ক্যাবিনের সম্মুখের ডেকে রেলিং ধরে অশোকা একলাটি চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছিল,—দুইধারে গ্রামের সুপ্ত শ্যামল সৌন্দর্য্য, ঘাট, শস্যক্ষেত্র, চর,—বিচিত্র ছবি দেখা দিয়ে আবার চলে যাচ্ছে; প্রকৃতিদেবী কুতূহলী গ্রামের মেয়ের মত উঁকি মার্‌ছেন আবার পালিয়ে যাচ্ছেন। এই বিশাল পদ্মার বক্ষে ছোট ছোট নৌকাগুলি মোচার খোসার মত ভাস্‌ছে; জেলেরা মাছ ধর্‌ছে। কোথাও বা পদ্মার খরস্রোতে ঝুপ্‌ঝাপ্‌ করে পাড় খসে পড়্‌ছে। ছেলেবেলা থেকে আরম্ভ করে কতবার কত আশা নিরাশার মাঝে সে এই রাস্তা দিয়ে গেছে; দুই তীরের মাঝখানে এই নদী দিয়ে ভেসে যাবার যেন একটা বিশেষ আনন্দ প্রতিবারেই নূতনভাবে দেখা দেয়; দুই পারের অভিনব দৃশ্যের সাথে সাথে মনে নব নব আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠে। বাস্তব ছেড়ে মন কল্পনার জাল বুন্‌তে আরম্ভ করে।

রোদ এসে গায়ে পড়্‌ছে দেখে অশোকা ক্যাবিনের ভিতর যাবে ভাব্‌ছিল, এমন সময় তার অষ্টম বর্ষীয় পুত্র ছুটে এসে বল্‌ল,—"হ্যাঁ মা, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ, খুকী যে ঘুম থেকে উঠে কাঁদ্‌তে সুরু করেছে।"

অশোকা ব্যস্তসমস্তভাবে ক্যাবিনে প্রবেশ করে বিস্মিত হয়ে দেখ্‌ল যে ইতিমধ্যে অপর একজন সহযাত্রিনী তার পাঁচ ছয়টী ছেলেমেয়ে নিয়ে সেখানে আশ্রয় নিয়েছেন এবং চাকরের সাহায্যে জিনিষপত্র গোছগাছ করছেন। তার বিপুল দেহ কাজের ব্যস্ততায় ও ভিড়ের গোলমালে হাঁপিয়ে উঠেছে। ক্যাবিনের দরজা থেকে দেখা যাচ্ছে তার বিশাল বপুর পশ্চাৎভাগ ও অনাবৃত বাহুর কিয়দংশ। মূল্যবান রেশমী শাড়ী দ্বারা সে দেহ সজ্জিত। অতি স্থূল বাহুতে ট্রাইসিকেলের চাকার মত পনর ভরি ওজনের আড়াই প্যাঁচ বাঁক নিবিড়-ভাবে আবেষ্টন করে আছে। প্রথম দৃষ্টিতে দর্শকের মনে যুগপৎ কৌতুক ও শঙ্কা জেগে উঠে,—প্রশ্ন আসে মনে,—কি করে এই চক্র মাংসপিণ্ডরূপ বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করবে। অতি ক্ষিপ্রতার সহিত তিনি তাঁর সন্তান-বাহিনীর শয্যা রচনা সমাপন করে ফিরে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখের দিকে দৃষ্টি পড়্‌তেই অশোকা ক্ষণকাল বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে রইল। বহুদিন পূর্ব্বের কতগুলি মধুর স্মৃতি তার মানসপটে স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠ্‌লো। অনেক দিনের মর্চ্চে-পড়া একটী তারে বেজে উঠ্‌লো বড় করুণ অথচ বড় পরিচিত একটু সুর। কত সুখ-দুঃখের কাহিনী ঠিক আলো-ছায়ার মত তার মনের মধ্যে খেলে গেল।

অশোকা তখন ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়ে। স্কুল ছেড়ে সবে

কলেজে ঢুকেছে। কলেজের বিশাল সৌধচত্বরে দাঁড়িয়ে তার মনে পড়ে যেত স্কুলের ক্ষুদ্র নীড়টীর কথা। নানা বৈচিত্র্য ও ব্যস্ততার মাঝে একটু অবসর পেলেই তার মনটা ঘুরে বেড়াত স্কুলের সেই চির-পরিচিত ঘরগুলির চারিধারে। স্কুলের কথা বলতেই তার স্মৃতির পটে জেগে উঠ্‌ত আনন্দভরা জীবনের একটী পরিপূর্ণ ছবি। কলেজের সবটুকু বড় অপরিচিত, বড় নির্ম্মম মনে হ'ত। চারিদিকে স্বার্থের সংঘাত; সকলে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। একফোঁটা সহানুভূতিও কারু কাছে পাওয়া যায় না। এখানে প্রতি পদক্ষেপে কত বাধা, কত বিঘ্ন, কতই না ঘাত প্রতিঘাত এসে দাঁড়ায়। কলেজ-জীবন তার কাছে বড় অসহায়, বড় কঠোর বোধ হত। এখানকার সুরের সাথে অশোকার জীবনের সুর মিলত না। চারিধারের একটা কৃত্রিম আবহাওয়ার মধ্যে তার সহজ সরল ছন্দভরা গতিটুকু হারিয়ে যেত। তার সহপাঠিনী কলেজের মেয়েদের সাথে সে মিশতে পারত না,—কেউ তাকে ভাবত ভাবুক, কেউ ভাবত খেয়ালী, কেউ বা ভাবত অহঙ্কারী। কলেজের অন্য মেয়েদের সাথেও তার মিশ খেত না। তার এ সাথী-হারা জীবনে সঙ্গ দিচ্ছিল,—লাইব্রেরীর বাঁধান বইগুলি আর কল্পনা।

বোর্ডিং তার একটুও ভাল লাগত না। তার বাল্য-সুলভ চঞ্চল মনের সাথে বোর্ডিংএর বাঁধাধরা নিয়ম কিছুতেই খাপ খেত না। ভোর হ'তে-না-হ'তেই কানে এসে পৌঁছত ঘুম-ভাঙ্গানো ঘণ্টার কর্কশ ধ্বনি। গুরুগম্ভীর মূর্ত্তি নিয়ে মেট্রণ বেড্‌রুমে এসে ঢুকতেন ও মেয়েদের বিছানা ছেড়ে উঠবার জন্য ঘণ্টা বাজিয়ে তাড়া দিয়ে যেতেন। মেয়েরা তাড়াতাড়ি শয্যার উপর উঠে বসত। সদ্য-জাগ্রত তাদের মুখে লেগে থাকত আধ-ভাঙ্গা ঘুমের জড়িমা। কেউ ঘুম-না-ভাঙ্গার ভাণ করে চোখ বুজে পাশ ফিরে শুয়ে থাকত। কেউ বা মেট্রণ বেড্‌রুম থেকে অদৃশ্য হওয়ার সাথে সাথে আবার শয্যায় আশ্রয় নিত—একটু মধুর আলস্য উপভোগ ক'রে নিতে। অশোকা চুপটী ক'রে শুয়ে শুয়ে সব দেখত। তার তরুণ মনের চাপল্য এই নিয়মানুবর্ত্তিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হতে চাইত। তার অবাধ্য মন ঘুরে বেড়াত, শত-স্মৃতিবিজড়িত নিজের বাড়ীর চারিপাশে। মেট্রণের মূর্ত্তির পাশে তার মনে পড়ত স্নেহাপ্লুতা জননীর মূর্ত্তিখানি। কত উপদ্রব, কত আব্দার তিনি হাসিমুখে সহ্য করেন,—কি ক্ষমাপূর্ণ সে হাসিটুকু। একে একে সবাই বেড্‌রুম থেকে চলে যাওয়ার পর উঠবার পালা আসত অশোকার। একটী ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলে সে শয্যা ত্যাগ ক'রত ও বেড্‌কভার দিয়ে বিছানা ঢেকে নীচে নেমে যেত। তারপর হাতমুখ ধুয়ে আয়নার কাছে চুল ঠিক করে নিয়ে চায়ের টেবিলে উপস্থিত হ'ত। মনটাকে আগেই শক্ত ক'রে নিয়ে প্রস্তুত হ'ত,—আজ হয়ত মেট্রণের অজস্র বকুনি কপালে জুটবে; নয় ত বা সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তার মুখস্থ-করা উপদেশগুলি ঝাড়তে আসবেন। কোন দিন হয় ত চা'এর টেবিল প্রায় শূন্য থাকত; মনটা সেদিন সোয়াস্তিতে ভরে উঠত,—আজ আর কারু কাছে তার দেরী হওয়ার কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। এক পেয়ালা চা ঢেলে তা চট্ ক'রে শেষ ক'রে উঠে প'ড়ত। ঝি এসে জিজ্ঞেস ক'রত,—দিদিমনি, কিছু খেলে না? ডিম টোষ্ট সব প'ড়ে রইল যে। অশোকা উত্তর দিত,—তুমি ওটা খেয়ো ঝি। তারপর বইএর রাশি নিয়ে সটান ষ্টাডি (study)তে গিয়ে উপস্থিত হ'ত।

এমনি ক'রেই তার দিনগুলো কাটছিল। তারপর একদিন এল অশোকার জীবনের একটী শুভ মুহূর্ত্ত। সেদিন তখনো কলেজের টিফিনের ঘণ্টা পড়েনি। একটা জমাট-বাঁধা অসহ্য গরম বৃষ্টিপাতের অগ্রদূত হ'য়ে বিশ্বজগৎ আচ্ছন্ন ক'রে আছে; মেঘে সূর্য্য ঢেকে ফেলেছে; গাছের পাতা নড়্‌ছে না; চারিদিক থম্‌থম্ করছে। শীঘ্রই সবাইকে বিপর্য্যস্ত ক'রে এলো একটা ঘূর্ণী হাওয়া; তার সাথে বৃষ্টি সুরু হ'ল। প্রথমে বড় বড় ফোঁটা; তারপর ঝরঝর বাদল-ধারা। মেয়েরা ক্লাশে আবদ্ধ হ'য়ে মনোযোগী ছাত্রীর মত লেক্‌চার শুনছিল বটে, কিন্তু তাদের তরুণ মন বারবার চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ছিল,—বৃষ্টির সাথে খানিকটা মাতামাতি ক'রে আসতে। ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা হুড়্‌হুড়্ ক'রে ক্লাশ থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়াল। কেউ থামের আড়াল থেকে হাত বাড়িয়ে খানিকটা বৃষ্টির জল হাতে নিল এবং সমবয়সীদের গায়ে ছিটিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেল। অপর

পক্ষও তার প্রতিশোধ নেবার জন্য জল হাতে নিয়ে পেছনে ছুটলো ; কিন্তু যখন তার নাগাল পেল তখন বেচারীর হাতের জল ঝরে গেছে। কেউ বা দৌড়ে গিয়ে খানিকক্ষণ বৃষ্টিতে ভিজে আবার ছুটে বারান্দায় ফিরে এসে দাঁড়াল। তাদের কলহাস্য ও চীৎকার বৃষ্টির শব্দের সাথে পাল্লা দিচ্ছিল। প্রকৃতির এই আনন্দভরা চঞ্চল গতিটুকুর দেখা পেয়ে অশোকার মনের বহুদিনের সঞ্চিত তিক্ততা মুছে গেল। একটা অকারণ হাসিতে তার দেহ মন ভরে উঠল। বারান্দা থেকে কিছুক্ষণ বৃষ্টির সাথে খেলা ক'রে তার মন তৃপ্ত হ'ল না। তার অবাধ্য চঞ্চল মন ছুটে যেতে চাচ্ছিল সেখানে,—যেখানে টিফিন-শেডের কাছে অবিরাম কলতান তুলে অপ্রতিহত গতিতে বৃষ্টি পড়্ছিল। কিন্তু ততদূর যাওয়া মুস্কিল,—কেউ দেখ্তে পেলে অজস্র বকুনি শুন্তে হবে। কোন রকমে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে সে টিফিন-শেডের দিকে বৃষ্টিতে ভিজে চঞ্চল-পদে এগিয়ে চল্ল। কিন্তু বেশী দূর যেতে সমর্থ হ'ল না। সহসা ঝম্ ঝম্ শব্দে আরো জোরে বৃষ্টি নামল। সন্ সন্ শব্দ ক'রে দেবদারু-সারি আন্দোলিত হ'য়ে উঠ্ল। একটা গাছের তলায় অশোকা আশ্রয় নিল। তার সমস্ত দেহ থেকে তখন অঝোরে জল ঝর্‌ছিল। দুরন্ত মন তার খেলা কর্‌ছিল প্রচণ্ড ঝড়ের সাথে।

টিফিন-শেড থেকে অশোকার সহাধ্যায়িনী মঞ্জুলা ছুটে আস্‌ছিল। অশোকাকে গাছের গোড়া ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজ্তে দেখে তার পাশে এসে দাঁড়াল,—পরিপূর্ণ আনন্দে তার মুখ উজ্জ্বল ; বসন সিক্ত ও বিপর্য্যস্ত। দীপ্ত-কণ্ঠে বল্ল,—"অশোকা ভাই, কী সুন্দর বিষ্টি, দেখেছিস।"

মঞ্জুলার কাঁধের উপর হাত রেখে অশোকা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বল্ল,—"হাঁ৷ ভাই, আজকের দিনটী ভারি সুন্দর।"

মঞ্জুলা বল্ল,—"যা ভয়ানক ভিজেছি আমরা, টিফিনের পর ক্লাশ ক'রব কি ক'রে ?"

অশোকা উত্তর কর্‌ল, "একদিন না হয় নাই ক্লাশ কর্‌লুম ; কিন্তু এমন দিনটী ত আর ফিরে পাব না।"

বৃষ্টির ঝুপ্ ঝাপ্ শব্দের সাথে সাথে তাদের দেহ মন কানায় কানায় ভরে উঠছিল। দু'জনেরই প্রাণের ফোয়ারা খুলে গেল। মাঝে মাঝে এক সঙ্গে বলে উঠছিল, "কী চমৎকার বৃষ্টির শব্দ ; শুন্তে বড্ড ভাল লাগছে।" তাদের অজস্র হাসি ও কথা ভেসে এসে বৃষ্টির সাথে মাতামাতি কর্‌ছিল।

বৃষ্টির বেগ ক্রমে কমে আস্‌ল। মঞ্জুলা সচকিত হয়ে বল্‌ল, "ভেজা ত যথেষ্ট হল ; এবার ক্লাশে যাওয়া যাক্। চারটের আগেত আর বাড়ী যেতে পারব না আশোকা ; যা ভাই বোর্ডিংএ গিয়ে ভিজে কাপড় ছেড়ে আয়। যা ডেলিকেট তুই, আবার জ্বর না বাধালে বাঁচি।"

অশোকা মঞ্জুলার হাত ধরে একটু টেনে বলল, "তুইও চল না ভাই, কাপড় ছাড়বি। সেই কখন বাস বেরুবে ; এতক্ষণ ভিজে কাপড়ে থাক্‌লে তোরও ত অসুখ হতে পারে।"

দু'জনে হাত ধরাধরি করে কলেজ-বোর্ডিংএর দিকে এগিয়ে চল্‌ল।

ড্রেসিংরুমে ঢুকে তারা কাপড় ছেড়ে নিল। অশোকা আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে তার লম্বা ভিজে কালো চুলের রাশি একটা তোয়ালে দিয়ে নিংড়াতে নিংড়াতে জিজ্ঞেস করল, "ক'টা বেজেছে বল্‌তে পারিস্ ?"

মঞ্জুলা তার রিষ্টওয়াচের দিকে একবার দৃক্‌পাত করে বলল, "প্রায় তিন্‌টে। এখনো ত ছুটীর ঘণ্টাখানেক বাকী রয়েছে। চল্ একটু গল্পগুজব করা যাক্ ; আজ আর ক্লাশ করে না।"

ড্রেসিংরুম থেকে বেরিয়ে তারা দোতলায় উঠে কোণের ছোট বারান্দায় একটী মাদুর বিছিয়ে বস্‌ল।

বৃষ্টি থেমে গিয়েছে, আকাশ ক্রমে মেঘমুক্ত হচ্ছে। মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্য্যের একটুক্‌রো আলো এসে লম্বা গাছগুলির মাথায় স্পর্শ কর্‌ছে। মৃদু হাওয়ায় ভিজে মাটীর গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। মঞ্জুলা ক্ষণকাল চুপ করে একটু উদাস ভাবে বল্ল, "এমন দিনে আমার মেঘদূতের যক্ষের কথা মনে পড়ে।" অশোকা উঠে গিয়ে সেল্‌ফ্ থেকে একখানা মেঘদূত এনে মঞ্জুলার হাতে দিয়ে একটু আব্দারের সুরে বল্‌ল, "মঞ্জু ভাই, আমায় একটু মেঘদূত পড়ে শানাবি ? আমার একলা মেঘদূত পড়তে একটুও ভাল লাগে না।"

মঞ্জুলা একটু দুষ্টামির হাসি হেসে বল্‌ল, "তা তোকে একটা সাথী জুটিয়ে দিতে হবে নাকি।"

অশোকা একটু লজ্জিত হ'ল কিন্তু পরক্ষণেই সাম্‌লে নিয়ে উত্তর কর্‌ল, "কেন, তুইই তো আছিস্‌।"

মঞ্জুলা হেসে বল্‌ল, "আমি তো আর চিরদিন তোর সাথী হয়ে থাক্‌তে পারব না!"

অশোকা মঞ্জুলার গালে আঙুল দিয়ে একটা মৃদু আঘাত করে বল্‌ল, "আর বাজে বক্‌তে হবে না ; এবার পড়তে আরম্ভ কর্‌ দিকিন্‌।"

মঞ্জুলা পড়তে আরম্ভ করল। তার সুমিষ্ট কণ্ঠ থেকে বিরহী যক্ষের করুণ আবেদন বেরিয়ে এসে আকাশে বাতাসে জলে স্থলে উদাস ভাবে বিচরণ কর্‌তে লাগল।

চার পাঁচ দিন পরে।

সেদিন বৃষ্টিতে অত্যধিক ভেজার ফলে অশোকা জ্বরে ভুগ্‌ছে। জ্বর ক্রমে গুরুতর আকার ধারণ করে নিউমোনিয়াতে দাঁড়িয়েছে। অসহ্য যন্ত্রণায় অনবরত ছটফট কর্‌তে কর্‌তে অশোকা ক্রমশঃ নিঝুম হয়ে পড়ে আছে। এই ক'দিন ধরে মঞ্জুলা একবারও অশোকার কাছছাড়া হয়নি'। তার ঐকান্তিক সেবা ও পরিচর্য্যায় অতি মৃদুগতিতে অশোকা আরোগ্যের পথে এগিয়ে আস্‌ছিল।

বোর্ডিং থেকে টেলিগ্রাম পেয়ে অশোকার বাবা অস্থির হয়ে ছুটে এসেছেন। কন্যার অবস্থা দেখে তিনি নার্স নিযুক্ত কর্‌তে চেয়েছিলেন। কিন্তু মঞ্জুলা যখন দৃঢ়তার সঙ্গে বল্‌ল,—"নার্স দিয়ে কি হবে, আমার চেয়ে নার্স আর কি বেশী কর্‌তে পারবে?" তখন তিনি আশ্বস্ত হয়ে মঞ্জুলার উপর তার পরিচর্য্যার ভার ছেড়ে দিলেন এবং সস্নেহে মঞ্জুলাকে বল্‌লেন, "মঞ্জু মা, আমার অশোকাকে তোমার হাতেই দিলাম।"

দীর্ঘকাল ভুগে অশোকা ক্রমে আরোগ্য হয়ে আস্‌ছে ; কিন্তু দুর্ব্বলতা তখনো মোটে সারেনি। অশোকা একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা কর্‌ছিল আর এক এক বার চেয়ে দেখছিল সেবানিরতা মঞ্জুলার শান্ত মূর্ত্তিখানি। কিছুক্ষণ পরে অশোকা ডাক্‌ল, "মঞ্জু, একবারটী আয় না ভাই আমার কাছে।"

মঞ্জুলা সস্নেহে তার কাছে গিয়ে বস্‌ল ও তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্‌ল, "আমি ত সব সময়ই তোর কাছে আছি, আর বাড়ী যাব না। এখন থেকে আমিও বোর্ডিংএ থাকব। এখন একটু ঘুমো দিকিন্‌।"

অশোকা পরম আনন্দে তার হাত দু'টী ধরে নির্ভরশীল শিশুর মত চোখ বুঝ্‌লো।

মঞ্জুলা সেই থেকে বোর্ডিংএ আছে। এজন্য তাকে কম কথা শুন্‌তে হয় না। তার দাদা ও দিদিরা তাকে ক্ষেপিয়ে তুলেন, বলেন,—মঞ্জু বন্ধুর জন্য বাড়ীছাড়া হয়ে বোর্ডিংবাসী হয়েছে। মঞ্জুলা প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পায় না। মাঝে মাঝে বলে,—বাড়ীতে মোটেই পড়াশুনা হয় না। কিন্তু ভাইবোনের যুক্তির কাছে তার কথা ভেসে যায়। অশোকাকে নিয়ে প্রত্যেক week end এ সে তাদের বালীগঞ্জের বাড়ীতে গিয়ে ভাইবোনদের সাথে ক'টা দিন কাটিয়ে আসে। তাদের আগমনে বাড়ীতে আনন্দের বাণ আসে। তাদের অজস্র হাসিগানে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠে। তারপর সব শূন্য করে দিয়ে সোমবারে আবার তারা বোর্ডিংএ ফিরে আসে। বোর্ডিংএর চিরন্তন একঘেয়ে নিয়মের মধ্যে তারা নূতনত্বের আভাস খুঁজে পায়। পরস্পরের সাথীত্বে তাদের জীবন হয়ে উঠে ছন্দভরা, মধুময়।

চার বছরের পরের কথা। অশোকাদের টেষ্ট্‌ পরীক্ষার আর দেরী নেই। পরীক্ষার পরই অশোকা চলে যাবে তার বাবার কাছে। সেখান থেকেই সে ফাইন্যাল দেবে। আসন্ন বিচ্ছেদ সম্ভাবনায় দু'জনেই ম্রিয়মাণ ; বাণী তাদের হয়ে গেছে মূক,—অফুরন্ত হাসির ফোয়ারা তাদের শুকিয়ে গেছে। তারা জান্‌তো ভবিষ্যৎ জীবনে হয় ত আর তারা পরস্পরের দেখা পাবে না কারণ পরীক্ষার পর মঞ্জুলার বিয়ে হয়ে যাবে—তারপাশার নিকটস্থ কোন গ্রামের রাজা উপাধিকারী এক জমীদারের সাথে।

অশোকাদের টেষ্ট্‌ আরম্ভ হয়ে গেছে। আর দু'টো

পেপার হ'লেই শেষ হয়ে যাবে। সেদিন অশোকা পরীক্ষা দিয়ে হল থেকে বেরিয়ে মঞ্জুলার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছিল। কিছুক্ষণ পরে মঞ্জুলা মলিন মুখে বেরিয়ে এসে অশোকার পাশে দাঁড়াল। একটু চুপ করে থেকে তারপর ধীরে ধীরে বল্‌ল, "অশোকা, আজকের পেপার আমার বড় খারাপ হয়ে গেছে; পাশ করতে পারব না। বাকীগুলো আর দেব না ভাব্‌ছি।"

অশোকা প্রথমে তাকে বারবার বোঝাতে চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুক্ষণ বোঝাবার পর যখন দেখ্‌ল যে মঞ্জুলা কিছুতেই তার সঙ্কল্প ত্যাগ কর্‌বে না তখন সে আস্তে আস্তে বল্‌ল, "আমার শরীরটা বড্ড খারাপ লাগ্‌ছে হয় ত জ্বর উঠ্‌বে। আমিও বোধ হয় কাল থেকে আর পরীক্ষা দিতে পারব না।"

মঞ্জুলা বন্ধুর চাতুরী ধর্‌তে পেরে ম্লান হেসে বল্‌ল, "বুঝেছি, আমার জন্যে তুই পরীক্ষা দিতে চাস্‌ না। কিন্তু তোর ক্যারিয়ার (career) নষ্ট হতে দেব না। তোকে পরীক্ষা দিতেই হবে।"

কিন্তু অশোকার দৃঢ়সঙ্কল্প,—সে আর পরীক্ষা দেবে না।

* * * * * * *

আজ অশোকা ও মঞ্জুলা ব্যথার সঙ্গে অনুভব করছিল,—পনর বছর আগেকার তাদের সেই অনাবিল, পবিত্র বন্ধুতার মাঝে কে যেন এক বিরাট প্রাচীর তুলে দিয়েছে। এক ষ্টীমারের, এক ক্যাবিনের সহযাত্রী তারা; কত কাছে রয়েছে, অথচ কতদূরে সরে গেছে। পনর বছর পরে ভাগ্যচক্রে হঠাৎ তারা পরস্পরের দেখা পেয়েছে; কিন্তু প্রাণে কোন সাড়া দিচ্ছে না। আনন্দের চেয়ে মনে বিস্ময় জাগ্‌ছে বেশী। হয়ত বা মানবপ্রকৃতির রীতি এই,—নূতনকে পেলে সেই পাওয়ার আনন্দে ভরপুর হয়ে পুরাতনকে ভুলে যাওয়া। তাই শীতের প্রয়াণে মানুষ প্রসন্নবদনে বরণ করে নেয়—বসন্তের ফুল-সম্ভার, দখিন হাওয়া, কোকিলের কুহুতান।

শ্রীমণিকা দাস

নীরব ভাষা

শ্রীমতী তরলিকা দেবী

নদীতে ঢেউ খেলে যায়
তটেতে আঘাত দিয়ে,
বুকেতে জাগিয়ে ব্যথা
আঘাতের স্মৃতি নিয়ে!
আঁধারের বুকটি চিরে
নী-রব গোপনতা
হৃদয়ের মর্ম্ম কোষে
জাগালে আকুলতা!
গোপনে কুঁড়ির বুকে
সুবাসের রুদ্ধ জ্বালা
ফোটাতে চায় সে নিতি
বিলাতে গন্ধ ডালা!
বকুলের শুক্‌নো ফুলে
সুষমার দহন আনে
লুটিয়ে অভিমানে
ব্যথা তার জানায় গানে।
বনেতে গন্ধ ঢালা,
সুরে আজ ঝরার পালা,—
গোপন হৃদয় তলে
লুকানো অশ্রু মালা!
নীরবের বুকের মাঝে
কেন এ ব্যথার বাঁশী
কেন এ মর্ম্ম ছেঁড়া
কেন এ করুণ হাসি!
কেন এ অনুভূতি
হৃদয়ে দেয় গো সাড়া
কাহারে পাবার লাগি
কাহারে পেয়ে হারা?

সোনার সুষমা

শ্রীবিমল মিত্র

Though I remain as faithful as befere,
And wet my pillow with unceasing tears,
I never more shall see what I have seen,
Or find again that love which I have lost.

W. H. Howell.

কাল তুমি চলে' গেছ নূতন স্বপ্নের স্বর্গ—নূতন গৃহিণী,
দীর্ঘতর লাগে তাই সুদীর্ঘ দিবস মোর সুদীর্ঘ যামিনী !
হাতে কোনও কাজ নাই, আজো আমি কাব্য রচি বাতায়নে বসি'-
আকাশের শেষ-প্রান্তে হেরিতেছি খণ্ড চাঁদ—ম্লান একাদশী।
সেদিনের স্বপ্নগুলি লঘুপক্ষ বিহঙ্গের ডানায় ডানায়,
অরণ্যের নীড় ছাড়ি' স্মরণ-সীমান্তে আসি' করে হায় হায়।
দক্ষিণের সমীরণে চঞ্চল চৈত্রের বনে ফুটিত কুসুম,
তাহার সঞ্চয় ভারে রজনীর কালো চক্ষে আজো নাই ঘুম !
কাল তুমি চলে' গেছ ;···তোমার নূতন গৃহে আনন্দ উৎসব ;
হেথায় রাত্রির তীরে মৃত্যুর প্রসাদ লভে দিবসের শব !
কাল তুমি চলে গেছ ঃ সুদূর পথের মাঝে প্রথম বিশ্রাম !
তোমার যাত্রার কালে দু'টি আঁখি শূন্যে রাখি' স্তব্ধ রহিলাম !
কাল তুমি চলে' গেছ—এ-রাত্রির মর্ম্মতলে এতো দীর্ঘশ্বাস !
তবু আজ ভালো লাগে এই স্বপ্ন, গন্ধ, গান, এ অশ্রু-বিলাস !
আমার শয্যার প্রান্তে কতো শুক্লা চৈত্র রাতে—শ্রাবণ সন্ধ্যায়—
তোমার দেহের গন্ধ মুগ্ধ-স্মৃতি-বসন্তের কাহিনী শুনায় !
তুমি তো আমার ছিলে, নিভৃত অন্তর-তীর্থে সোনার সুষমা
তোমার বিদায়-সন্ধ্যা সেই গর্ব্বে নত নেত্রে করিলাম ক্ষমা !
কাল তুমি চলে' গেছ, কাল তুমি চলে' গেছ, বিদায় বিদায়—
তোমার বিদায়-স্মৃতি ব্যাথায় বিধুর হোক্ মোর কবিতায়।

বঙ্গ-সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব

শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

পাশ্চাত্য শিক্ষা সভ্যতা ও সাহিত্যের সহিত সংস্পর্শের ফলে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বৈচিত্র্যময় বঙ্গ-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। ইংরেজি সাহিত্যের ভিতর দিয়াই সমগ্র পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব বাংলা সাহিত্যে প্রবাহিত। ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব এবং বিশেষতঃ মুদ্রাঙ্কণের সহায়তাই যে বিশ্ব-সাহিত্যের ভাব-জগৎ উদ্ঘাটিত করিয়া বঙ্গসাহিত্যকে স্থিতি ও দৃঢ়তা প্রদান করিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-সাহিত্য ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শে নিয়ন্ত্রিত হইয়া রসসৃষ্টি ও রূপসৃষ্টির নব নব পন্থা আবিষ্কার করিয়া সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকল প্রতিভাবান সাহিত্যিক পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে সাহিত্যসৃষ্টির অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছেন। চেষ্টা করিলেও ঐ সব সাহিত্যিকগণ পাশ্চাত্য প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারিতেন কি না সন্দেহ।

পাশ্চাত্য সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিবার পূর্ব্বে বাংলা-সাহিত্যে বিষয়-বৈচিত্র্য অথবা রচনা-রীতির বিচিত্রতা ছিল না। বিষয়-বৈচিত্র্য ছিল না বলিয়া একই বিষয়ের উপর ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন কবি রঙ্ ফলাইয়াছেন। তাহার উপর, কেবল কতকগুলি ধর্ম্মপ্রসঙ্গ অবলম্বনে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য পরিপুষ্ট হইয়াছে। জার্ম্মাণ দার্শনিক ফিক্‌টে কবিতার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন—"Poetry is ultimately an expression of a religious idea," কবিতা মানবজীবনের ধর্ম্মভাবের স্ফুটপ্রকাশ মাত্র—ইহা প্রাচীন ও মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কিন্তু পাশ্চাত্য প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইবার পরে বঙ্গসাহিত্যে বিষয়ের দিক দিয়া বৈচিত্র্য তো আসিয়াছেই, ভাবগত ও কল্পনাগত বিচিত্রতাও আসিয়াছে। পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি বাঙালীর মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং উহা বাংলা সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য প্রভাব সূচিত হওয়ার পূর্ব্বে বাংলা সাহিত্যে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বিষয় লইয়া রচনা হইত। সেই যুগের সাহিত্যসৃষ্টির প্রধান বিষয় ছিল 'গীতিকাব্য', 'অনুবাদ-সাহিত্য', দেবদেবীগণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া 'মঙ্গলকাব্য' ও 'চরিতাখ্যান'। এই কয়টি বিষয়ের মধ্যে বাঙালী কবিগণের প্রতিভা আবদ্ধ ছিল। ভাব-গভীরতা ও ভাষা-সৌষ্ঠবে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রধান ও একমাত্র গৌরবস্থল গীতিকাব্য। মঙ্গলকাব্য সমূহে দেব-দেবীর চরিত্রই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এবং সেইজন্য সেখানে মানব চরিত্রের স্বাভাবিক ও স্বাধীন বিকাশ হয় নাই। আধুনিক কালের মতো জীবনচরিতও তখন রচিত হইত না। শ্রীচৈতন্যদেব অথবা তাঁহার পার্ষদগণের যে-সব জীবন বৃত্তান্ত পাওয়া যায় তাহার প্রায় সবগুলিতেই বর্ণিত চরিত্রের উপর অলৌকিকত্ব ও দেবত্ব আরোপ করা হইয়াছে। ইহাই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের জীবন-চরিতের বিশেষত্ব। এইজন্য 'মঙ্গলকাব্য' 'জীবনচরিত' প্রভৃতিতে human interest নাই বলিলেও চলে। মঙ্গলকাব্য সমূহে দেবতাগণকে বিজয়ী করিবার চেষ্টা এতো প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল যে মানব-চরিত্র-বিশ্লেষণ সে যুগের সাহিত্যে অসম্ভব ছিল।

ইহার উপর সেই যুগের বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃতের খুব প্রবল প্রভাব দেখা যায়। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বঙ্গভাষার একখানি অতি প্রাচীন গ্রন্থ। উহাতে জয়দেবের প্রভাব ও ভাগবতের আখ্যানের ছায়া দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে চণ্ডীদাসের বর্ণনা-কৌশলও সংস্কৃত কবিদের মতো।

শূন্যপুরাণও বাংলা সাহিত্যের একখানি প্রাচীন পুস্তক। ইহাতে সংস্কৃত ধর্ম্মতত্ত্বের প্রভাব সুস্পষ্ট। জীবনচরিত সমূহেও সংস্কৃত প্রভাব অনুভূত হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী লেখক বৃন্দাবন দাস ভাগবতের আখ্যান অনুযায়ী চৈতন্যদেবের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন। চৈতন্যচরিতামৃত লেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার গ্রন্থে ভাগবত প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে ভাব আহরণ করিয়া সেই আদর্শে চৈতন্যদেবের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থের প্রারম্ভেই কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং কয়েকটি অধ্যায় সেই শ্লোকের ব্যাখ্যাতেই পূর্ণ। তাঁহার রচনা-ভঙ্গীও সংস্কৃত লেখকদের মতো। বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিও সংস্কৃত পুরাণ ও মহাকাব্যের মিশ্রিত আদর্শে রচিত।

কিন্তু ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হওয়ার পর বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাবের সূত্রপাত হইল এবং তখন হইতে বঙ্গ-সাহিত্যের নব-আশাপূর্ণ জীবন আরম্ভ হইয়াছে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও শ্রীরামপুর মিশন বাংলা সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্ত্তনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আর শ্রীরামপুর মিশন স্থাপিত হয় ধর্ম্মপ্রচারের জন্য। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে স্থাপিত হইলেও সাহিত্যসৃষ্টিতে সহায়তার দিক দিয়া উভয়ের প্রচেষ্টা ও দান অনুরূপই হইয়াছিল।

এই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও শ্রীরামপুর মিশনের ইংরেজদের দৃষ্টান্তে বাঙালী লেখকগণ গদ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে তৎপর হইয়াছিলেন। বাংলা কাব্যের ইতিহাস বেশ প্রাচীন ও সমৃদ্ধ হইলেও বাংলা গদ্যের ইতিহাস তত প্রাচীন নহে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম বর্ষ হইতে মাইকেল মধুসূদনের অভ্যুদয় পর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস প্রকৃত প্রস্তাবে ইহার গদ্য পরিপুষ্টির ইতিহাস।

ইংরেজের আগমনের পূর্ব্বে বাংলায় যে গদ্যের উদাহরণ পাওয়া যায় তাহার রচনাপ্রণালী হৃদয়গ্রাহী নহে। চণ্ডীদাস লিখিত 'চৈতন্যরূপ-প্রাপ্তি', 'শূন্যপুরাণে'র ভিতরের গদ্য-ভাগ, কতিপয় চিঠি এবং দলিল পত্র ও সহজিয়া সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থ ইহাই প্রাক্ ব্রিটিশযুগের গদ্য। এই গদ্য যেমন উৎকট শব্দে পরিপূর্ণ সেইরূপ পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ বিরহিত। কিন্তু ইংরেজের সময় হইতে প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলা গদ্য রচনার সূত্রপাত হয়। শ্রীরামপুর মিশনের কেরী, মার্শম্যান, হল্‌হেড্ প্রমুখ পাদ্রীগণ বাইবেলের অনুবাদ করিলেন, অভিধান লিখিলেন, ব্যাকরণ ও সংবাদপত্র ছাপাইলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ইংরেজ শিক্ষকবৃন্দও গদ্য রচনার দিকে বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া রহিয়াছেন। ইঁহারা নিজেরা বাংলায় গদ্য রচনা করেন। কিরূপে ইতিহাস বিজ্ঞান ব্যাকরণ প্রভৃতি লিখিতে হয়, কিরূপে রচনার বিষয়-সন্নিবেশ করিতে হয়, কিরূপে গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে হয় তাহা ইংরেজের শিক্ষার দ্বারাই বাঙ্গালীর হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে।

১৮০১ খৃষ্টাব্দ হইতে বাংলায় মুদ্রিত গদ্যগ্রন্থ প্রচারের সময় গণনা করা যাইতে পারে। কিন্তু বহুদিন পর্য্যন্ত বাংলা রচনা অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য এবং সংস্কৃত ও পার্শী প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিল। বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমার বঙ্কিমচন্দ্র এবং কালীপ্রসন্ন প্রভৃতির অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেকার যুগের গদ্যের ভাব-প্রবাহ যেন একটু আড়ষ্ট ও মন্থর। সেইযুগে গদ্য রচনার কোনও বিশিষ্ট পদ্ধতি তখনও গড়িয়া উঠে নাই। অনুবাদ ও অনুকরণের মধ্যে সেই যুগের গদ্য-রচনা আবদ্ধ ছিল। তথাপি এই অনুবাদের বিচিত্র ও বহুমুখী গতি সাহিত্যকে সজীবতা ও ভাবপ্রবাহ দান করিতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে।

ইংরেজের আগমনে ও পাশ্চাত্য প্রভাবে বাংলা গদ্যের উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে রচনার বিভিন্ন দিক খুলিয়া গিয়াছে। সংবাদপত্র পরিচালনা, নাট্য-সাহিত্য, উপন্যাস-সাহিত্য, প্রবন্ধ-সাহিত্য প্রভৃতি পাশ্চাত্য প্রভাবের ফল। এইভাবে বাংলা সাহিত্যে বিষয়-বৈচিত্র্য আসিয়াছে।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া বাঙালী সংবাদপত্রের উপকারিতা উপলব্ধি করিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ-ভাগে ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। সেই সুযোগে সকল শ্রেণীর সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য দেশময় উৎসাহ জাগিয়া উঠিল—বিশেষতঃ সংবাদপত্র প্রকাশে। এই সব সংবাদ-

পত্রের সাহায্যে বাংলা গদ্যের ক্রমোন্নতি সাধিত হইয়াছে। বাংলা গদ্য ইতিহাস, ভূগোল, জীবনচরিত ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি সকল প্রকার রচনার উপযোগী সবলতা লাভ করিতে লাগিল এবং বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে বাংলা গদ্য সুবিন্যস্ত হইয়া উঠিল। এক কথায় বলিতে গেলে বঙ্কিমচন্দ্রের সময় হইতে বাংলা গদ্য জীবন্ত-সাহিত্যের বাহন হইয়াছে—তখন হইতে বাংলা গদ্যে স্বচ্ছন্দ গতিবেগ দেখা দিয়াছে। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস, সমালোচনা, প্রবন্ধ-সাহিত্য, রাজনৈতিক সাহিত্য এবং সাহিত্য-সেবার উদ্দেশ্যে মাসিক পত্রিকার প্রচলন এ সমস্তই প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্কিমচন্দ্র হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে দীক্ষিত। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো রবীন্দ্রনাথেরও বহুমুখী প্রতিভা বিকাশে পাশ্চাত্য সাহিত্য যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে।

ইংরেজ প্রভাবে আমাদের দেশীয় রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হইয়াছে এবং পাশ্চাত্য আদর্শের নাটক রচনা আরম্ভ হইয়াছে। নাট্য-সাহিত্য জাতির পরিণত অবস্থার ছবি। যে কোনও জাতির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে জাতি যখন উন্নতির, গৌরবের ও মহত্ত্বের উচ্চতম শিখরে অধিষ্ঠিত তখনই নাট্য-সাহিত্য সম্যক স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। জাতির শৈশবে সৌন্দর্য্যবোধের সঙ্গে সঙ্গে গীতিকবিতা, জাতির যৌবনে নাটক।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে বাংলা সাহিত্যে নাটক রচনা আরম্ভ হইয়াছে। প্রথমে রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রভৃতি সংস্কৃত আদর্শে নাটক রচনা করিতেছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য আদর্শের নাটক রচনা আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক বাংলা নাট্য-সাহিত্যের সূত্রপাত হইল।

বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য আদর্শের প্রথম নাটক তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জ্জুন' নাটক। ইহার পরে মাইকেল মধুসূদন দত্ত পাশ্চাত্য আদর্শে খুব সাফল্যের সহিত 'শর্ম্মিষ্ঠা' 'পদ্মাবতী' ও 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক রচনা করেন। মাইকেলের 'শর্ম্মিষ্ঠা' ইংরেজি ভাব ও রীতি অনুসারে রচিত। তাঁহার পদ্মাবতীতে তিনি গ্রীক পুরাণ হইতে নাট্যবস্তু গ্রহণ করিয়াছেন। মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী' পাশ্চাত্য আদর্শের রচিত বঙ্গসাহিত্যে প্রথম ট্র্যাজেডি। বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য আদর্শের রোমান্টিক নাটকের সূত্রপাত মাইকেল হইতে। মাইকেল ছিলেন প্রধানতঃ কবি এবং তাঁহার মন ছিল অত্যন্ত ভাবপ্রবণ, সেইজন্য তাঁহার নাটকগুলিও তাঁহার কবিপ্রতিভায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্যই Idealism বা ভাবপ্রবণতা এবং রোমান্স বা কল্পনার বৈচিত্র্যটুকু তাঁহার নাটকের বিশেষত্ব।

এই যুগের নাট্য-সাহিত্য মাইকেল এবং দীনবন্ধুর হাতে রূপান্তরিত হইয়া গিরিশচন্দ্র ঘোষে এক নূতন রূপে ও ভঙ্গীতে বিকশিত হইয়াছে। ইঁহারা সকলেই পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদর্শে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য প্রভাবে আধুনিক বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও যুগান্তর আসিয়াছে। মাইকেল আধুনিক যুগের কাব্য-সাহিত্যের স্রষ্টা। রবীন্দ্রনাথ মাইকেল সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "আধুনিক বাংলা কাব্য সুরু হয়েছে মাইকেল মধুসূদন দত্ত থেকে। তিনি প্রথমে ভাঙ্গনের এবং সেই ভাঙ্গনের ভূমিকার উপরে গঠনের কাজে লেগেছিলেন খুব সাহসের সঙ্গে। ক্রমে ক্রমে নয় ধীরে ধীরে নয়। পূর্ব্বেকার ধারাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে তিনি এক মুহূর্ত্তেই একটা নূতন পন্থা নিয়েছিলেন। এ যেনো ভূমিকম্পে একটা ডাঙা উঠে পড়লো জলের ভিতর থেকে। আমরা কি দেখলুম? কোনো একটা নূতন বিষয়? তা নয় একটা নূতন রূপ।" বঙ্গভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি আবিষ্কার করিয়া তাহার মধ্যে ইউরোপীয় ভাবধারার প্রতিষ্ঠা মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রধান কীর্ত্তি। বঙ্গভাষার অভ্যন্তরে যে গূঢ় শক্তি নিহিত ছিল অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগর মহাশয়েরা তাহা গদ্যে আবিষ্কার করেন, আর পদ্যের শক্তি আবিষ্কার করেন মধুসূদন। কেবল পদ্যে কেন, নাটক প্রভৃতি গদ্য রচনাতেও তিনি বঙ্গভাষার শক্তি আবিষ্কার করিয়া দেখাইয়াছেন। মাইকেল তাঁহার রচনায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবের সম্মিলন করিয়া যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। মাইকেলই ইহা সর্ব্বপ্রথমে প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন যে সংস্কৃত ও ইউরোপীয় ভাবের সামঞ্জস্যময় সম্মিলনেই ভবিষ্যৎ যুগের বাংলা সাহিত্য গঠিত হইবে এবং তবেই তাহা বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে আসন

পাইবার যোগ্য হইবে। মধুসূদনের প্রতিভা গ্রন্থিরূপে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে সংযুক্ত করিয়াছে।

মাইকেলের কাব্যে ইংরেজ কবি সেক্‌স্‌পিয়ার, মিল্‌টন, গ্রীক কবি হোমার ও ইটালীর ভার্জ্জিল দান্তে ও তাসো প্রভৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট। মাইকেলের কাব্যের অন্তর্নিহিত ভাবধারার উপর উক্ত কবিগণের যথেষ্ট প্রভাব আছে। ছন্দ সৃষ্টিতেও মাইকেল পাশ্চাত্য কবি হইতে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা লাভ করেন। মাইকেল তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দসৃষ্টিতে ইংল্যাণ্ডের সমুদ্রচ্ছন্দা কবি মিল্‌টনের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। মাইকেল একবার বলিয়াছিলেন "ইটালীর মিশ্র-ছন্দকে বাংলায় আনা যায় না কি?" তাঁহার পক্ষে অসম্ভব কিছুই ছিল না। তিনি ইটালীর মিশ্র-ছন্দের সৌকর্য্যে ও মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া বাংলার প্রসারধর্ম্মী পয়ার ও নৃত্যধর্ম্মী লাচাড়ী এই দুই ছন্দের সমন্বয় করিয়া এক নূতন বাংলা মিশ্র-ছন্দের উদ্ভাবন করেন। মাইকেলের সনেটের ছন্দও পাশ্চাত্য প্রভাবের ফল।

পাশ্চাত্য কাব্য-সাহিত্যের বৈচিত্র্যময় রূপ ও আদর্শের অনুপ্রেরণায় মাইকেল সর্ব্বপ্রথম বঙ্গভাষায় মহাকাব্য, অমিত্রাক্ষর ছন্দ, ওড্‌ রীতি, ও সনেট প্রবর্ত্তন করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যকে বিচিত্রতার আস্বাদন দিয়াছেন। তাঁহার মধ্য দিয়াই ইউরোপীয় সাহিত্য-শিল্পের আদর্শ বঙ্গসাহিত্যে সর্ব্ব-প্রথম সচেতন ভাবে প্রবেশ করিয়াছে। সাহিত্যশিল্পের যে-সব রীতি বা পদ্ধতি বাঙালী পূর্ব্বে জানিত না বা বঙ্গসাহিত্যে যাহা প্রচলিত ছিল না, মধুসূদন তাহাকে বঙ্গসাহিত্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া বাঙালীর চোখ খুলিয়া দিয়াছেন এবং তাহার পর হইতে বঙ্গসাহিত্য সেই নব-আবিষ্কার-পথে পরিপুষ্টি লাভ করিয়া চলিয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলা কাব্যে সেক্‌স্‌পিয়ার, মিল্‌টন, পোপ, গোল্ডস্মিথ, স্কট, মুর প্রভৃতি কবিগণের প্রবল প্রভাব ছিল। মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি কবিগণের শিক্ষার মধ্যে পাশ্চাত্য মহাকাব্যের বীজ ছিল। ইহার উপর, সেই যুগের কবিগণের মনের মধ্যে ভাবরাশি পুঞ্জীভূত হইয়াছিল। এই পুঞ্জীভূত ভাবরাশি প্রকাশ করিবার জন্ম গদ্যের প্রবাহ ও প্রকাশ-শক্তি তখনও সবল হইয়া উঠে নাই। সেইজন্য সেই যুগের কবিগণ মহাকাব্য রচনার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে কয়টি বাংলা মহাকাব্য রচিত হয় সেগুলি পাশ্চাত্য মহাকাব্যের আদর্শে রচিত, কারণ তখন শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেই ইংরেজি সাহিত্যের কাব্যরসের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ইংরেজি মহাকাব্যের ভিতরে যে ধরণের কবি-দৃষ্টি ও কলা নৈপুণ্য আছে তাহাকে বঙ্গসাহিত্যে প্রবর্ত্তিত করিবার প্রচেষ্টা সকল কবির ভিতরে বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাঙালী কবিগণ পুনর্ব্বার গীতিকাব্য রচনায় মনোনিবেশ করিলেন তাহার প্রধান কারণ দুইটি। প্রথমতঃ, মহাকাব্যের আখ্যায়িকা ও গল্পের তৃষ্ণা বঙ্কিমের নবজাত উপন্যাসে তৃপ্ত হইল। দ্বিতীয়তঃ, যখন শেলী, কীট্‌স্‌, প্রভৃতি ইংরেজ রোমাণ্টিক কবিদের সহিত বাঙালী কবিগণ পরিচিত হইলেন তখন বাঙালী তাহার নিজের স্বাভাবিক গীতিকাব্যের জগতে ফিরিয়া আসিবার পথ দেখিতে পাইল। কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী ও তাঁহারই সমসূত্রে রবীন্দ্রনাথ বাংলা গীতিকাব্যে এক নূতন সুর চড়াইয়া লোকের মন সেইদিকে আকৃষ্ট করিয়াছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধেই এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ হইতে বাঙালী কবির কল্পনা রোমাণ্টিক কাব্যের আদর্শে প্রভাবান্বিত হইয়াছে। রোমাণ্টিসিজ্‌ম্‌ বাংলা গীতিকাব্যে কল্পনার পরিধিকে বিস্তৃত করিয়াছে—কাব্য ও সাহিত্য সৃষ্টির আদর্শে পরিবর্ত্তন সাধিত করিয়া বাঙালীর কবিমানসকে আর্টিষ্টিক মনোহারিত্বের প্রতি উন্মুখ করিয়া তুলিয়াছে। বিহারীলাল এবং রবীন্দ্রনাথের লিরিক প্রতিভা এই রোমাণ্টিক কবিগণের আদর্শে পরিপুষ্ট হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে রোমাণ্টিসিজ্‌মের সকল লক্ষণ অনুভূত হয়, এবং তাঁহার উপর রোমাণ্টিক কবিগণের প্রভাব সুস্পষ্ট। শেলীর স্বাধীনচিত্ত-বৃত্তি, অতীন্দ্রিয়তা ও ভাবোন্মত্ততা, কীট্‌সের ভোগসর্ব্বস্ব সৌন্দর্য্যচেতনা, ব্রাউনিঙের মিস্‌টিসিজ্‌ম্‌, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের অতি সাধারণ বস্তু-গুণে গভীর আনন্দ উপলব্ধি, টেনিসনের শব্দশিল্পের সৌষ্ঠব এ সমস্তই রবীন্দ্র-নাথের কাব্যে অনুভূত হয়। রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতি পর্য্যায়ে রোমাণ্টিসিজ্‌মের আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে। রোমাণ্টিক

কবিদের প্রভাব তাঁহার সাহিত্যকে বিচিত্রতার রূপ দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের রূপক-গীতি-নাট্য সমূহও আধুনিক লেখক মেতারলিঙ্কের রূপক নাটকের আদর্শে রচিত বলিয়া মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য কাব্যরীতি ও ভাবের অপূর্ব্ব সমন্বয় দেখা যায়। বৈষ্ণব সাহিত্যের ভাবাবেগ ও আধ্যাত্মিক ভক্তিপ্রেরণা যেমন তাঁহার সাহিত্যে প্রকাশ পাইয়াছে, ইউরোপীয় গীতিকাব্যের কল্পনা-বৈচিত্র্যও তাঁহার সাহিত্যকে অপূর্ব্ব সৌষ্ঠব দান করিয়াছে।

পাশ্চাত্য প্রভাবে আমাদের সাহিত্যে দেশাত্মবোধ জাগিয়া উঠিয়াছে,—বাংলা গীতিকাব্যে Subjective বা স্বানুভাবাত্মক বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে। উপন্যাস-সাহিত্যে মানবচরিত্র-চিত্রণের দিকে সাহিত্যিকগণের দৃষ্টি পড়িয়াছে। নরনারীর হৃদয় রহস্য বিশ্লেষণ করিয়া উপন্যাস ও কাব্যরচনা আরম্ভ হইয়াছে। মানব-জীবনের সমালোচনা বঙ্গসাহিত্যের একটি প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাশ্চাত্য রীতির প্রকৃতি বর্ণনার দ্বারাও বাংলা কাব্যে একটি নূতন জগৎ খুলিয়া গিয়াছে।

ইংরেজি কাব্য-সাহিত্যের প্রভাব আমাদের সাহিত্যে আসিবার পূর্ব্বেকার কবিদের ভিতর প্রকৃতির স্বতন্ত্র বর্ণনা নাই। ঐ সব কবিগণ প্রসঙ্গক্রমে প্রকৃতির যে-সব বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে প্রকৃতির প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় না। সেই যুগের কবিদের কাছে প্রকৃতি ছিল জড়জগতেরই বৈচিত্র্য মাত্র। বিখ্যাত সমালোচক Stopford Brooke অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজি সাহিত্যে প্রকৃতি বর্ণনা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "The nature has no sentiment of its own"—ইহা উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বেকার সকল বাঙালী কবি সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যায়। কারণ কোনও কবি প্রকৃতিকে প্রাণবান মনে করিয়া প্রকৃতির সহিত নিবিড় আত্মীয়তা অনুভব করেন নাই। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের উপর ইংরেজি রোমান্টিক কাব্য-সাহিত্যের প্রভাব সূচিত হওয়ার পর হইতে প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য্যসম্ভারকে কেন্দ্র করিয়া প্রকৃত কবিত্বের রসধারা উৎসারিত হইয়াছে। তখন হইতে প্রকৃতির ব্যক্তিত্বের ধারণা বাঙালী কবিগণের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে।

ইংরেজি কাব্য-সাহিত্যের রোমান্টিক যুগ শেলী কীট্‌স্ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রভৃতি কবিগণের রচনায় প্রকৃতির প্রভাব ওতঃপ্রোতভাবে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছিল। তাহার ফলে উক্ত কবিগণ প্রকৃতি ও মানবহৃদয়ের ভাবগুলিকে আপন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং প্রকৃতিকে প্রাণবান মনে করিয়াছিলেন। এই সব ইংরেজ কবিগণের প্রভাবে বাঙালী কবিগণও মানব-মনের উপর প্রকৃতির নিগূঢ় ও রহস্যময় প্রভাবকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং প্রকৃতিকে প্রাণবান মনে করিয়া প্রকৃতির প্রাণস্পন্দন অনুভব করিয়াছেন। মানুষের আনন্দ-বেদনার সহিত প্রকৃতির যে একটি যোগ-সম্বন্ধ আছে তাহাও বাঙালী কবিগণ উপলব্ধি করিয়াছেন। কবির ভাবের সহিত প্রকৃতিকে ঘনিষ্ঠ-সংযুক্ত রূপে দেখা—(Interpenetrative affinity between Nature and the Poet) রোমান্টিসিজ্‌মের একটি প্রধান লক্ষণ। বিশ্বপ্রকৃতির সহিত এইরূপ একাত্মতাবোধ ইউরোপীয় রোমান্টিসিজ্‌মকে এক অভিনব রূপ দান করিয়াছে। কবি রবীন্দ্রনাথের 'বসুন্ধরা' 'অহল্যার প্রতি', 'প্রবাসী' প্রভৃতি কবিতাতে রোমান্টিসিজ্‌মের এই লক্ষণটি খুব স্পষ্ট। মানব-মনের সহিত প্রকৃতির মনের মিলন ও অভিন্ন আত্মীয়তাবোধ এবং ভাবের আদান-প্রাদান কবি রবীন্দ্রনাথের কবিতায় খুব বেশী সফলতা লাভ করিয়াছে।

পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যের গতি বিভিন্নমুখী হইয়াছে এবং বঙ্গসাহিত্যের প্রকৃতি উন্নততর হইয়াছে। আধুনিক বাংলা কাব্যে, ছোট গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে ইউরোপীয় সাহিত্যের যে মূল সুর তাহার বিচিত্র প্রকাশ দেখা যায়। বাংলা কাব্যের বৈচিত্র্যময় রূপ পাশ্চাত্য প্রভাবের ফল। কাব্যের অন্তর্নিহিত ভাবের উপরেও পাশ্চাত্য কাব্যসাহিত্যের প্রেরণা বর্ত্তমান। উপন্যাস, ছোট গল্প ও নাটক রচনার আর্ট পাশ্চাত্য আদর্শের এমন কি অনেক চরিত্রও পাশ্চাত্য আদর্শে সৃষ্ট হইয়াছে। আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে সাহিত্যশিল্পের যে অপরূপ রূপচ্ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা বঙ্গভারতীর কলাভবনে ইতিপূর্ব্বে দেখা যায় নাই।

মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিহারীলাল এবং রবীন্দ্রনাথকে পাইবার সৌভাগ্য হইয়াছিল বলিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিয়া বাংলা সাহিত্য ক্রমশঃ রচনা-রীতি, বিষয়, ভাব প্রভৃতি সকল দিক দিয়া উত্তরোত্তর উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে—কাব্যসৃষ্টি ও সাহিত্যসৃষ্টি সম্বন্ধে বাংলা সাহিত্যে নূতন নূতন অভিজ্ঞতা আসিয়াছে।

শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়

ঝরা মুকুল

শ্রীনরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী

উষা দরজাটা ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়্লো। অনিতাকে বল্লে—ওমা একি লো! আধঘণ্টা আগে দেখে গেছি আঠারোর পাতা এখনও সেই আঠারোর পাতা।

অনিতা ঝাঁ করে কতকগুলো পাতা বাঁ দিকে ঠেলে দিয়ে বল্লে—বাঃ কই! এতো ছাপ্পান্নর পাতা, হাওয়ায় তখন উল্টে গেছলো পাতাটা।

উষা সে কথায় কোন জবাব না দিয়ে বল্লে—তোর পেন্‌টা একবার দিবি ভাই, আমার পেনের কালি ফুরিয়ে গেছে।

অনিতা ফাউন্‌টেন পেনটা উষার হাতে দিয়ে বল্লে—কালি ফুরিয়ে ফেল্‌লি! ক' পাতার চিঠি দিচ্ছিস্ রে!

উষা কলমটা যেন ছোঁ মেরে নিয়েই চলে গেল, যাবার সময় অনিতাকে উপহার দিয়ে গেল এক ঝলক হাসি।

অনিতা আবার শুয়ে পড়্লো নভেলটা হাতে করে······ প্রায় আধঘণ্টা কেটে গেল, উষা যদি এখন আবার ঘরে ঢুক্‌তো কলমটা ফেরত দিতে তা হ'লে দেখ্‌তে পেতো এই তিরিশটা মিনিট অনিতা ছাপ্পান্নর পাতাটাকেই আঁক্‌ড়ে ধরে আছে। আজ আর অনিতার মন নভেলের পাতার উপর ছিল না, সারাক্ষণ চলাফেরা করছিল তার জীবনের অতীত ও বর্ত্তমানের পথে।

জ্ঞান হ'য়ে অনিতা দেখেছে সংসারে মাত্র তার পিতাকে। অত্যন্ত অব্যবস্থিতচিত্ত পুরুষ ছিলেন তিনি। উপায় যথেষ্ট করতেন এবং নষ্ট করতেন সে অনুপাতে অনেক বেশি। মাতা বিদায় নিয়েছেন যখন অনিতার বয়স মোটে পাঁচ বছর। সংসারে পিতা এবং জনকয়েক দাসদাসী ছাড়া কেহই ছিল না, পিতাও সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন খুবই কম—এই রকম অবস্থাতেই অনিতা বেড়ে উঠ্‌ছিল, হঠাৎ একদিন পিতা গেলেন মারা।

অনিতা দেখতে পেলে পিতার দেনার দায়ে বাড়ী ঘর আসবাবপত্র সমস্তই বিক্রী হ'য়ে যাচ্ছে। পিতার এক বন্ধুই সেগুলি কিনে নিলেন এবং অনিতাকে নিজের কাছে রাখ্‌তে চাইলেন। অনিতা রাজী হ'লো না পরের আশ্রয়ে যেতে। কিন্তু যায় কোথায়? অবিবাহিতা নারীর ভরণপোষণের ভার নেয় কে, সে-ই বা কোথায়, কার আশ্রয়ে নিজেকে নির্ভর করতে পারে। তার চোখ ফেটে জল ঝরতে লাগ্‌লো—হায় রে! জীবনের এই আঠারোটা বছর সে বৃথাই কাটিয়েছে, স্বাধীনভাবে জীবন যাপনের কোন উপায়েরই সে সংস্থান করতে পারেনি। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল নার্সিং শেখার কথা। অনিতার পিতৃবন্ধুই সে ব্যবস্থা করে দিলেন।

অনিতা আজ প্রায় তিন বছর হ'লো হাসপাতালে নার্স হ'য়েই আছে।

নিয়ম মত হাসপাতালে রোগীদের সে নার্স করে—ওষুধ দেয় তাদের মুখে, তাদের স্নান করায়, তাদের পথ্য দেয়। এই সব নিয়েই তার দিনগুলো এক রকম কেটে যায়। অন্য সময়টা সে সেলাই আর নভেল নিয়েই কাটিয়ে দেয়। তার বন্ধু অন্য নার্সদের প্রেমাস্পদরা আসে তাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করতে, তারা চিঠি লেখে তাদের, তাদের কাছ থেকে পায় উত্তর। অনিতাকে তারা পড়তে দেয় সেই প্রেম-পত্রগুলি। অনিতা পড়ে, মনে মনে হাসে, ভাবে এত প্রেম এদের আসে কোথা থেকে! এই নীরস কঠোর কর্ত্তব্যের মাঝে প্রেমতো শুকিয়ে মরে যাওয়াই স্বাভাবিক।

কিন্তু মাত্র সে দিন তার এ ভুল ভেঙে গেছে। তার অন্তরের নিদ্রিত প্রেম চোখ মেলেছে।

···হগ্ মার্কেট থেকে ফেরবার সময় বাস্ থেকে নেমে তাড়াতাড়ি যখন অনিতা চলেছে হাসপাতালের দিকে তখন

সহসা পেছন থেকে কে বলে উঠ্‌লো—দয়া করে একটু দাঁড়াবেন, প্যাকেটটা বোধ হয় আপনারই।

অনিতা চম্‌কে ফিরে দেখলে তারই ফেলে আসা প্যাকেটটা হাতে করে একটি যুবক তারই দিকে চেয়ে মুচ্‌কে হাস্‌ছে।

অপ্রতিভ অনিতা বল্‌লে—আজ্ঞে হ্যাঁ, বাসে ভুলে ফেলে এসেছিলুম, ধন্যবাদ।

দু'একটা কথা বল্‌তে বল্‌তে যুবক চল্‌লো হাসপাতালের দ্বার পর্য্যন্ত।

পরদিন বিকেলে অনিতা একটু বেড়াতে বেরুচ্ছে, সাম্‌নেই দেখ্‌তে পেলে সেই কাল্‌কের দিনে দেখা যুবক কোথা থেকে আস্‌ছে। নমস্কার করে যুবকটি অনিতার সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো, জিজ্ঞাসা করলে—বেড়াতে যাচ্ছেন বোধ হয়? অনিতাও নমস্কার ফিরিয়ে দিলে একটু মৃদু হেসে।

যুবক বল্‌লে—বেড়াতেই যখন যাচ্ছেন, চলুন না ইডেন-গার্ডেনের দিকে। আপত্তি আছে কি?

অনিতা আপত্তি জানালো না।

অনিতা বাড়ী ফিরে কেবল ভাব্‌তে লাগ্‌লো—মানস নামটিতে কবিত্ব ভরা। তার সারা কাজের মধ্যেও মনের পাতায় এঁকে উঠ্‌লো কত মধুর প্রেমের আখর, তার মনের আনন্দ-মন্দিরে গীত হ'তে লাগ্‌লো অজানা কবির প্রণয়-গীতি।

সে তো আজ মাত্র ক'দিনেরই কথা।

তারপর কাল সন্ধ্যার ঘটনা। অনিতা আর মানস গেছ্‌লো সিনেমাতে 'মরকো'র অভিনয় দেখ্‌তে। অভিনয়ের শেষে মানস বলেছিল - তুমিও আমায় এমনি ভালবাস্‌তে পারবে অনি'। জীবনে কারও ভালবাসা পাইওনি—চাইওনি কারও ভালবাসা, কিন্তু এতদিন পরে, জীবনের যা কিছু সবই যাকে দিয়ে ফেলেছি তার কাছ থেকে যদি ফিরে পাই অবজ্ঞা, ফিরে পাই প্রত্যাখ্যান তা হ'লে—তা হ'লে—

অনিতা কথা শেষ করতে দেয়নি। ছল ছল চোখে মানসের হাত দুটি বুকের ওপর টেনে এনে বলেছিল—ওগো —না, না, ওকথা বোলো না—ওকথা বোলো না, সর্ব্ব-হারাকে তুমি যে আজ আপনহারা করেছ, বনলতাতে তু[illegible] আজ ফুল ফুটিয়েচ অপরাজিতার।...

ছাপান্নর পাতায় ছিল অনিতার চোখ আর সেই চোখের ওপর খেলে যাচ্ছিল এই সকল চিন্তার রামধনু-রঙ। অনিতাকে কাল কথা দিতে হ'বে মানসের কাছে তাদের বিবাহদিনের। কাল বিকেলে তার সঙ্গে দেখা হ'বে এস্‌প্ল্যানেডে।

...মানস বলেছে—প্রেমে যে এতো তৃপ্তি তা তার জানা ছিল না, মনে তার প্রতিজ্ঞা ছিল জীবনে সে কোন নারীকে ভালবাস্‌বে না—কোন নারীর সম্পর্কে আস্‌বে না। কিন্তু অনিতাকে দেখে তার সে গর্ব্ব চূর্ণ হ'য়ে গেছে। অনিতার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠ্‌লো—তারও তো ছিল একই প্রতিজ্ঞা, কিন্তু মানস কি তার সে প্রতিজ্ঞা বজায় রাখ্‌তে দিলে!

টেবিলের ওপর টাইম্‌পিস্‌টায় চোখ্‌ পড়তেই অনিতা দেখ্‌লে তার তখন ডিউটিতে যাবার সময় হ'য়েছে। সে তাড়াতাড়ি ছাপান্নর পাতাটা মুড়ে ফেলে উঠে পড়্‌লো।

* * * *

হাসপাতালে রুগী দেখ্‌তে দেখ্‌তে অনিতা একটা বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালো।

রোগী তার দু'টি চোখের ব্যাকুল দৃষ্টি তার চোখের ওপর রেখে জিজ্ঞাসা করলে—ভাই, আমার খোকা?

অনিতা বল্‌লে—সে যে এখন ঘুমুচ্চে ভাই, তুমিও এখন একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো দীপ্তি।

দীপ্তি কাতর স্বরে বল্‌লে—ঘুম আস্‌চে না। খোকাকে একবার নিয়ে এস না ভাই?

অনিতা বল্‌লে—ডাক্তার বলেন, ছেলে এখন রুগ্ন কিনা, বেশী নাড়া চাড়া যেন না হয়। তুমিও ভালো হ'য়ে ওঠ ভাই, খোকাকে কোলে নিয়ে বাড়ী যাবে।

জবাব দিতে অনিতার বুক ফেটে যাচ্ছিল।

এই দীপ্তি মেয়েটি যেদিন হাসপাতালে এল তার পর দিনই এক মৃত সন্তান প্রসব করে নিজেও মৃত্যুপথে এগিয়ে যাচ্ছিল। অনিতা স্থির জেনেছিল যে দীপ্তি আর বাঁচবে না, তাই মায়ের মনে সান্ত্বনা জাগাবার জন্যেই এই মিথ্যা কথা

অনিতা রোজই তাকে শোনাতো। এটা অনেকটা তার কর্ত্তব্যের মধ্যেই···কিন্তু আজ দীপ্তির মুখের দিকে চেয়ে অনিতার চোখ দু'টো জলে ভরে উঠ্‌লো—হায়রে, প্রণয়ের প্রথম স্বাদ পেতে না পেতেই তাকে পৃথিবীর সকল স্বাদ হ'তেই বঞ্চিত হ'তে হ'চ্ছে!

দীপ্তি বল্‌লে—দেখ ভাই অনিতা, তোমাকে আমার বেশ লাগে, তুমি বোধ হয় আমারই সমবয়সী হ'বে - নয়?

অনিতা মৃদু হেসে দীপ্তির চুলের ভেতর হাত বুলোতে বুলোতে বল্‌লে—হ্যাঁ।

দীপ্তির কথা চল্‌লো—দেখ ভাই, আমার মনে হচ্চে আমি বোধ হয় আর বাঁচবো না, হ্যাঁ ভাই, আমার মন বল্‌চে। আচ্ছা, সেতো ভাই একবার দেখ্‌তে আস্‌তেও পারতো! তোমরা কি কাউকে আস্‌তে দাও না এখানে?

অনিতা জিজ্ঞাসা করলে—কার কথা বল্‌চো, তোমার স্বামীর?

দীপ্তির ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠ্‌লো হাওয়ায় দোলা তুলসী মঞ্জরীর মতো—তার মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠ্‌লো, নির্জ্জন পরিত্যক্ত দেউলে কে যেন একটি মাটির প্রদীপ জ্বেলে দিলে।

দীপ্তি বল্‌লে—হ্যাঁ; তবে ভাই আমাদের এখনো বিয়ে হয় নি; হাসপাতাল থেকে ফিরে গেলে বিয়ে হ'বে ঠিক আছে। কারো মা বাবার এ বিয়েতে মত নেই, সে ব্রাহ্মণ আর আমি কায়স্থ কিনা! কিন্তু সে বলে—কি হ'বে তাদের জাতের মিলনে দীপ্তি, মনের মিলন যাদের বেঁধে রাখে? কত উঁচু মন ভাই!

দীপ্তির মুখে আজ যেন কথার খই ফুট্‌চে।

সে বল্‌তে লাগ্‌লো—আমি ভাই তাকে দেখেই ভালবেসেছিলুম, সেও ভাই; বলে তার অন্তরে প্রেমের বীজ আমিই প্রথম বপন করেছি—পৃথিবী রূপ ধরেচে তার কাছে উর্ব্বশীর নৃত্যশালায়।

অনিতা সারা মন দিয়ে দীপ্তির কথাগুলি উপভোগ করছিল। অনিতা জিজ্ঞাসা করলে—তোমার স্বামীর নাম কি ভাই?

দীপ্তি হাস্‌তে হাস্‌তে জবাব দিলে—অনুপম; বেশ নামটি, নয়! দেখ ভাই, যে ভালো হয় তার সবই যেন ভাল হ'তে হয়—নামটি পর্য্যন্ত।

পরক্ষণে দীপ্তির চোখ দুটি ম্লান হ'য়ে এল, শুষ্ক মুখে বল্‌লে—কিন্তু আমাকে ছাড়্‌তে হ'বে তাকে। আমার মরতে কষ্ট হ'চ্চে ভাই, তাকে যে আর দেখতে পাবো না—হয়তো সে আমার শোকে পাগল হ'য়েই যাবে।

অনিতার হাত দুটি ধরে দীপ্তি বল্‌লে—তুমি ভাই আমার একটি অনুরোধ রেখো। আমি মরে গেলে খোকাকে তুমি নিজে তার বাপের কোলে দিও, বোলো, আমার এই উপহার বুকে রেখে সে যেন আমার দুঃখ ভুল্‌তে চেষ্টা করে। আর—আর—আমার মৃত্যুর পর আমার গলা থেকে এই লকেট্‌টা খুলে নিয়ে তাকে দিয়ে জানিও তার মূর্ত্তি আমি মৃত্যু পর্য্যন্ত বুকে রেখেছিলুম—এই-ই ছিল আমার মৃত্যু-যাতনার একমাত্র শান্তি-প্রলেপ!

দীপ্তির আর অনিতার দুজনেরই চোখ দিয়ে জলধারা নাম্‌লো।

দীপ্তি বল্‌লে—হ্যাঁ ভাই, আমার খোকাকে বোধ হয় তার বাপের মতোই দেখ্‌তে হ'য়েচে? দেখতো ভাই ঠিক মেলে কি না?

দীপ্তি তার গলার হার থেকে লকেট্‌টা খুলে অনিতাকে দেখালে।

অনিতার চোখ যেন ইলেকট্রিকের তার স্পর্শ করলে, তার দেহ মন এক সঙ্গে কেঁপে উঠ্‌লো, ঘর, খাট আসবাব-পত্র, দীপ্তি, সব মিশে তার চোখের সাম্‌নে শুধু কতকগুলো কালো সাদার ঢেউ খেল্‌তে লাগ্‌লো।

*　*　*

দীপ্তি মারা গেছে।

…　…　…　…

অনিতা দীপ্তির লকেটটি নিয়ে চল্‌লো এস্‌প্ল্যানেডের মোড়ে। মানস তখন সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়্‌তে ছাড়্‌তে সেখানে পায়চারি করছিল, অনিতাকে দেখ্‌তে পেয়ে এক রকম ছুটেই তার কাছে এসে বল্‌লে—এত দেরী হ'লো যে? বিরহে যে কতো জ্বালা সে তুমি কি করে বুঝ্‌বে বলো? বোঝে সে, যে প্রাণ দিয়ে প্রেম চায়। আমি প্রায়…

অনিতা মানসের হাতে লকেটটি দিয়ে বল্‌লে—দীপ্তি মরণ পর্য্যন্ত এটি বুকে রেখেছিল, মৃত্যুর পর আপনাকে ফেরত দিতে বলেচে।

…　…　…　…

মানস যখন তার ফ্যাকাসে মুখটা তুলে চাইলে তখন দেখ্‌তে পেলে শ্যামবাজারের ট্রামে একটা ভীড় জমেছে।

তার কাণে এল কে যেন বল্‌চে—মশাই, একটু জলের ঝাপ্‌টা দিন্‌ তো জোরে—নিশ্চয় মেয়েটির ফিটের ব্যামো আছে।

শ্রীনরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বানপ্রস্থ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র এম্-এ (ক্যাল এবং ক্যান্টাব্) এ, আর, সি, এস্ (লণ্ডন) আই-ই-এস্

খাজুরাহ

একদা চাণ্ডেল রাজাদের রাজধানী ছিল এই খাজুরাহ। এখন ইহা সে প্রাচীন সমৃদ্ধির কঙ্কালাকীর্ণ প্রেতভূমি মাত্র। তবু এখানে আশে পাশে এমন সব মন্দির আছে (সংখ্যায় আন্দাজ ত্রিশটি হবে) যেগুলি স্থাপত্য-গৌরবে ও শিল্পনৈপুণ্যে হিন্দুস্থানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্দিরগুলির মধ্যে পরিগণিত হয়। অনুমান একাদশ খ্রীষ্টাব্দে ইহাদের সৃষ্টি, গুটিকতক প্রাচীনতর। কারণ হিউয়েন্ সাংএর বৃত্তান্তে (সপ্তম খ্রীষ্টাব্দ) ইহাদের উল্লেখ আছে। এখানে শৈব, বৈষ্ণব, আর জৈন মন্দিরগুলি যেন পরস্পর গলাগলি ক'রে আছে। গাভীর সঙ্গে বৎসের মত এক একটি বড় মন্দিরের কাছে ছোট ছোট শিশু-মন্দির। ভিতরের বিগ্রহ ও বিশিষ্ট দেবতাগুলি বাদ দিলে মোটের উপর আপাতদৃষ্টিতে সব মন্দিরগুলি যেন এক ছাঁচে ঢালা। তিনটী বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ত্রিধারায় যে কলানৈপুণ্যের তরঙ্গ উঠেছে, তা' দেখে মনে হয় এখানে শিল্পীদের মধ্যে কোনো গোষ্ঠিভেদ নেই। সবাই সতীর্থ। আর যে-রাজা বা রাজাদের আমলে এই সব মন্দির রচিত হয়েছিল তাঁর অথবা তাঁদের সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার কোনো বালাই ছিল না। এই সব পীঠ-স্থানগুলি ধর্ম্মের যতটা হোক্ না হোক্ ঐশ্বর্য্যের নন্দনভূমি, চারুশিল্প-কলার ত্রিদিবলোক। মন্দিরগুলি চূড়ার থেকে ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত বাহিরে এবং ভিতরে, তোরণে ও স্তম্ভে, রত্নখচিত অলঙ্কারের মত চিত্র-কর্ব্বুর। যুগল-মূর্ত্তিও রূপসীর দেহ-তরঙ্গভঙ্গে স্তরে স্তরে উদ্বেলিত। দেব দেবীর একক ও যুগলমূর্ত্তি, পৌরাণিক ইতিচিত্র, যুদ্ধ-যাত্রা, নটনটীর নৃত্যভঙ্গী, নাগরিক নর্ম্মলীলার মধুর ও বীভৎস প্রতিকৃতি, একদিকে যেমন রূপদক্ষ ভাস্করের চারুনৈপুণ্যের মূর্ত্ত পরিচয়, অপরপক্ষে সত্ত্বরজঃতমের বিচিত্র সংমিশ্রণে সেই মধ্যযুগের রহস্যজটিল মানবপ্রকৃতির একটি কৌতূহলোদ্দীপক

ছত্রপুরের দেওয়ানজি পণ্ডিত চম্পারণ মিশ্র ও লেখক

মোহন সেন A. R. C. A.। গত বৎসর Art Exhibitionএ Gwalior Gold Medal পেয়েছিলেন, এবৎসরও একাডেমির স্বর্ণপদক পেয়েছেন। আমরা খুড়ো ভাইপো প্রবীণনবীনে বুন্দেলখণ্ডে লাঙল টানছি। ইনি মোটর বাইকে একাকী চক্র-পরিক্রমায় বাহির হয়েছেন লক্ষ্ণৌ থেকে। বুন্দেলখণ্ড জনবিরল স্থান। ক্রোশের পর ক্রোশ জনমানবের চিহ্নলেশ নাই। এরূপ স্থানে সঙ্গীহীন উল্কাযাত্রা তাঁর পক্ষেই সম্ভব উনপঞ্চাশ বায়ুর বল্‌গা যাঁর মুঠির মাঝে। গুণীর সাহচর্য্যে আমাদের পান্থশালাটি আনন্দমুখর হয়ে উঠ্‌ল। পথশ্রান্তি ও অনশনের নিদান স্বরূপ তিনি এখানে পদার্পণ করেই নিকটস্থ পল্লীর থেকে একজোড়া নধরকান্তি মুরগী ও আটটি আণ্ডা সংগ্রহ করে এনেছেন। সুতরাং সেনমশাই শুধু শিল্পী নন কর্ম্মীও বটে। আমাদের ট্যাক্সি-সারথি লেগে গেল তার মোটর-বাইকের অভ্যঙ্গে এবং আমি বাহাল হলাম বাবুর্চ্চির পদে। ভাইপো ললিতবাবুর সহিত ললিতকলার আলোচনায় মশ্‌গুল হলেন। রাত্রে গুরুভোজনের পর নবীনরা শয্যালীন হলেন। আমি বাংলার সাম্‌নের মাঠে কেদারায় কাৎ

শৈব মন্দির—খাজুরাহ

আলেখ্যপুঞ্জ। প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক ও মনোবিজ্ঞান-বিৎ-দের দৃষ্টি এই সব পুরাকীর্ত্তির দিকে আহ্বান করে আমি মোসাফিরের রোজ্‌ নাম্‌চায় ফিরে যাই।

মন্দির দর্শন ও প্রদক্ষিণ সেদিনকার মত শেষ করে আমাদের বাংলায় ফিরে এসে দেখি এক নবাগন্তুক উপস্থিত। ইনি লক্ষ্ণৌ School of Arts and Carftsএর অধ্যাপক ললিত-

মন্দিরের উপকণ্ঠে শিশু-মন্দির—খাজুরাহ

যুগল মূর্ত্তি—খাজুরাহ
শিল্পী—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেনের সৌজন্যে
তাঁহার গৃহীত ফটো হইতে

হয়ে বড় বড় গাছের সারির ফাঁকে লেকের উপর জ্যোৎস্নার হাসি দু'চোখ ভরে দেখ্‌লাম। বকরূপী ধর্ম্ম যুধিষ্ঠিরকে যে প্রশ্ন করেছিলেন, জ্যোৎস্নারাত্রি এই সরোবরের তীরে আমাকে সেই প্রশ্ন কর্‌ল। আমি বল্লাম, এত শোভা দুনিয়ার পথে ঘাটে, তবু সহুরে আমরা ঘরে বসে থাকি—'কিমাশ্চর্য্যমতঃ-পরম্‌?

মনে মনে সাধু সঙ্কল্প জাগ্‌ল, আর গৃহ-কোণ নয়। এইবার ভবঘুরে হ'তে হবে। সারাটা জীবন ধরে এতকাল রোজ গড়ে আধঘণ্টা ঘুমিয়ে প্রতিদিনই ত মহানিদ্রার জন্য একটু করে নিদ্রা সেধে এসেছি, কিন্তু মহাযাত্রার জন্য চল্‌তি পথে পদচারণা বড় একটা করিনি। সুতরাং সে অভাবটা যতটা পারি মিটিয়ে নিতে হবে। এই চলাই ত পথ এবং পাথেয়, গন্তব্য স্থানও বটে। প্রত্যেক জীবনধারা চলেছে নদীর মত তার নিজের স্রোতে। অন্ধ আবেগে আকাঙ্ক্ষার ধন খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে, পেতে পেতে, হারাতে হারাতে চলি। চলি বলেই পাই, আবার পাই না বলেই আরো ছুটি সন্ধানে। অলস মন মন্থর হয়ে আসে, থাম্‌তে চায়। চলিষ্ণু মন বলে,

"হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনখানে।"

সে স্থিতির ঠাঁই এই চলন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা কেউ পেল না, আর আমরা পাব?

খাজুরাহে একটি Museum আছে। বৃদ্ধ Curator আমাদের সযত্নে সব দেখালেন। বল্লেন, এ অঞ্চলে বনে বাদাড়ে বহু জীর্ণ মন্দিরের ভগ্নাংশ ছড়ান আছে। গ্রামের লোকেরা এই সব পাথরের টুক্‌রা কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ঘর

ঘণ্টাই মন্দির—খাজুরাহ

বাঁধে। এম্‌নি করে বহু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ক্রমশঃ ফুরিয়ে আস্‌ছে। তবু এখনও বহুমন্দির আছে যেগুলিকে উদ্ধার
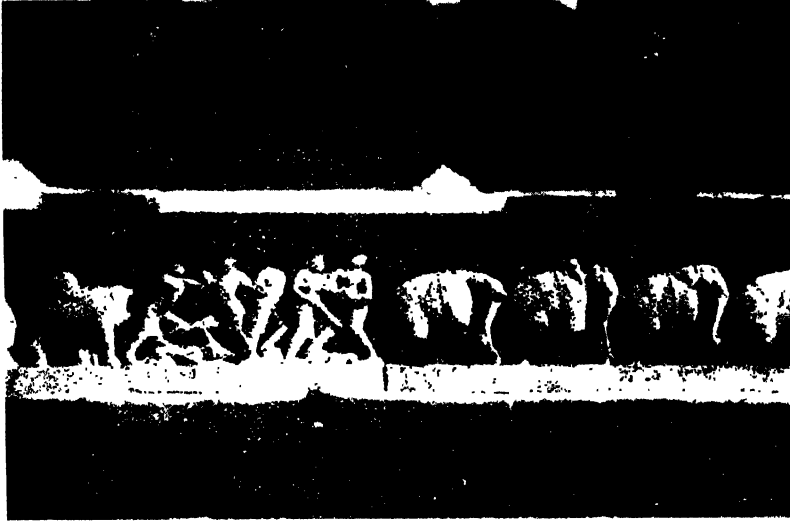
মন্দিরগাত্রে যুদ্ধযাত্রা—খাজুরাহ

করা যেতে পারে। কিন্তু কোথায় সে ধনকুবের আর কোথা বা সে তরুণ ঐতিহাসিক, যিনি এই ছিন্নপত্রগুলি সংগ্রহ করে অতীতের একটি অধ্যায় সুসম্বদ্ধ কর্‌বেন?

বৈজ্ঞানিক যুগ বক্র-হাসি হেসে বলে, "ইঁট-পাথুরে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ে কাজ নাই। তাতে শবাস্থিতে প্রাণ সঞ্চার হবে না। 'নতুন কিছু কর।' শিব শিঙে ফুঁকে হৃৎস্পন্দ হারিয়েছেন। শেষ শয্যা ত্যাগ করে বিষ্ণু অতলে ডুবেছেন। দশচক্রে ভগবান্ পর্য্যন্ত ভূত হয়ে অন্ধকার আশ্রয় করে ছিলেন, সম্প্রতি আমার হাতে পিণ্ড লাভ করে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়েছেন। ভয়ে ভয়ে বলি, "তা' বটেই ত, তা' বটেই ত।" তবু মন বাগ্ মানে না। নিঃশব্দে 'রাম' নাম আওড়াই আর বলি "তমেববিদিত্বাতি-মৃত্যুমেতি, নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

১৭ই অক্টোবর। আজ বিজয়া দশমী। দুর্গাপূজা বিশেষ ভাবে বাংলার হ'লেও এ অঞ্চলে শারদোৎসবের পরিচয় পেলাম। সকালে উঠে দেখি একদল স্ত্রীপুরুষ মিছিল বেঁধে মন্দিরের দিকে চলেছে। পুরুষরা আগে, হাতে কোষমুক্ত কৃপাণ, আর বাদকদের ঢোল-কর্‌তাল-ভেঁপুর ঝগঝম্প। মেয়ের দল গান গাইতে গাইতে চলেছে, প্রত্যেকের মাথায় ব্রীহি-যবের পসরা, শিশুর দলও চলেছে, কেউ মার কোলে কেউ বা মার হাতে হাত রেখে। আশ্‌পাশের পল্লী থেকে এরা এসেছে, মন্দিরগুলি প্রদক্ষিণ করে সরোবরে ওই নবমঞ্জরীর ডালিগুলি বিসর্জ্জন দিতে। আমরা ছুটে গেলাম দেখ্‌তে। ললিতবাবুর হাতে

সরস্তীরে—খাজুরাহ

ক্যামেরা। তিনি চিত্র-মৃগয়ায় চক্ষু সংযোগ কর্‌লেন, আমি সজীব, মঞ্জুবাক্‌ সিনেমা দেখতে লাগ্‌লাম। পল্লীবধূদের পরণে লাল সাড়ী, কিন্তু দশহাত সাড়ীর বারো হাত ঘোম্‌টা। কচিৎ ঘোম্‌টা-উন্মুক্ত একটিমাত্র চোখে চকিত দৃষ্টি। তবু ঘোম্‌টা-ঢাকা মুখে নৃত্য হ'ল মন্দিরের কন্দরায়। নিছক্‌ নাচ হিসাবে সে নৃত্যকলার উৎকৃষ্টতা কতকটা ছিল না ছিল জানিনা। তবে পারিপার্শ্বিক বেষ্টনের মধ্যে এদের আনন্দ-নর্ত্তনটি বড় মধুর লেগেছিল। আর সেই ঘনগুণ্ঠনের অন্তরালটুকু প্রত্যেক

পদারিণীদের মন্দির প্রদক্ষিণ—খাজুরাহ

নর্ত্তকীকেই একটা অজানা সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করেছিল। এরা যেন ওই মন্দিরের ভিত্তি খোদিত পাষাণ-সুন্দরী। শরতের এই ভোরের আলোর সোণার কাঠির স্পর্শে উচ্চকিত হয়ে শিলাবন্ধন ঘুচিয়ে বহুযুগের স্তম্ভিত নৃত্যাবেগটি আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত করে দিল লজ্জাবাসের অসঙ্কোচ অন্তরালে। আবার যখন কঠিন বিবসনে পাষাণ ভিত্তির মূর্ত্তি জটলায় নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, তখন একটা রহস্যময় প্রশ্ন ছাড়া আর কিছুই দ্রষ্টার নৃত্যতরঙ্গদোদুল অন্তরে থাক্‌বে না!

পঞ্চাশ বছর আগে নৃত্য গীতবাদিত্র ছিল অষ্টাদশ ব্যসনের 'তৌর্য্যত্রিক'। "ওল, কচু, মান,—তিনই, সমান," অর্থাৎ নিষিদ্ধ। আমাদের দেহটা হামাগুড়ি দিয়ে সুরু করে তারপর অনেক টালমাটাল খেয়ে চল্‌তে শিখেছে। বাজিকর দড়ির উপর দিয়ে যখন হেঁটে যায় তখন আমরা তার দোদুল্যমান্‌ ভার সামঞ্জস্যের তারিফ্‌ করি; ভুলে যাই, আমাদের চলাফেরার মধ্যেও বড় কম সমতা রক্ষা করি না। সদাচারে যা শুদ্ধ ও শোভন, ব্যাভিচারে তা' হয় দুষ্ট ও কদর্য্য। শুধু গান বাজ্‌না নাচ কেন, ধর্ম্মের আবরণে অধর্ম্মের যে পৈশাচিকতা প্রশ্রয় পায়, তার দৃষ্টান্ত সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে অপ্রতুল নয়। কিন্তু তাই বলে ধর্ম্ম পরিহর্ত্তব্য নয়। নৃত্য গীতাদি দেহমনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত উচ্ছ্বাস, স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তারাও সর্ব্বথা বর্জ্জনীয় নয়। নাচ ত দূরের কথা, আমাদের বাল্যকালে গান পর্য্যন্ত অনেক স্থলে কম দূষনীয় বলে বিবেচিত হ'ত না। অসভ্য বর্ব্বরদের নৃত্যগীত পশু-পক্ষীদের নর্ম্মলীলার মত নীতির এলেকার বহির্ভূত ছিল। আর সুসভ্য পাশ্চাত্য জাতিদের পারিবারিক ও সামাজিক তৌর্য্যত্রিক ছিল দুর্নীতির প্রতীক আমাদের চোখে। তারপর কাল ধর্ম্মে দেশে একটা নূতন আব্‌হাওয়ার সূত্রপাত হয়েছে। শুক্‌নো ডালে নব মঞ্জরীরা দেখা দিয়েছে। এটা জীবনের লক্ষণ, বিভীষিকা নয়, এ কথা পঞ্চাশোর্দ্ধদের একবার প্রণিধান করে দেখলে মন্দ হয় না। আমাদের অন্তরে যা কিছু মহৎ, যা কিছু সুন্দর, তা' ভগবৎ-স্বরূপ বলে মনে করি, দেবদেবীর মূর্ত্তিকল্পনায় আকার দান করে তৃপ্ত হই। মহাদেব শুধু শূলপাণি ছিলেন না, তিনি ছিলেন নটরাজ। মা সরস্বতী ছিলেন বীণাপাণি। প্রাচীন ভারত, গ্রীস, মিশর সর্ব্বত্র ও সর্ব্বযুগে ইহার নিদর্শন আছে। নৃত্যগীতের মূল শিকড় মানব প্রকৃতির অন্তর্নিহিত। ছন্দসুরের সম্মোহ জীব মাত্রেরই আছে, আমাদের নাড়ী যে সুরে বাঁধা। এই নৃত্যগীত সহজ আনন্দের সঙ্গে আমাদের

প্রতিদিনের অবকাশের মধ্যে যদি আপন স্থানটি লাভ করে তবে তার শুভফল আমরা কায়মনে লাভ করতে পারি, কারণ ইহারা যে জীবনের মূলে অমৃতের সঞ্চার করে। প্রাণের আনন্দ যখন উৎসারিত হয় কণ্ঠে, তরঙ্গিত হয় দেহ-

ঘোমটা-টানা নাচের অনুলেখা, শিল্পিতুলিকায়—খাজুরাহ মন্দিরে
চিত্রশিল্পী শ্রীললিতমোহন সেনের সৌজন্যে

ব্যঞ্জনায় তখন জীবনে একটা অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের উন্মেষ হয়। এই মাধুর্য্য নরনারীকে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করে। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে একটা মধুর গ্রন্থিসূত্র রচনা করে।

যাহাদের দেহ ও মনে স্বাস্থ্য ও শক্তি আছে নৃত্যগীতে বোধ করি তাদের অজীর্ণ ও অম্লোদ্গার হয় না। আমাদের কবি বহুপূর্ব্বে একদিন গেয়েছিলেন,

"হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মত নাচে রে!"

তাঁর চিত্তের 'নিতি নৃত্যের' তরঙ্গভঙ্গ বাংলার ঘরে ঘরে দোলা দিয়েছে। তিনি নৃত্যকে কাব্যলোক থেকে দেহ-লোকে উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন। 'ব্রতচারী' প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা মিঃ গুরুসদয় দত্তের আনুকূল্যে বাংলার আনাচে কানাচে নাচের যে ক্ষীণ ফল্গুধারাটি লুক্কায়িত ছিল তার মরাগাঙে এবার বান ডেকেছে। আশা করি তরুণদের জীবনে ব্যায়াম সংযম ও আনন্দে এই বন্যা একটা নূতন অনু-প্রাণনা আনয়ন করবে।

বলা বাহুল্য, নৃত্যের ব্যাভিচার আমাদের দেশে আছে। সেইজন্যই ত যাঁরা সদাচারী তাঁদের আরও বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত যাতে ইহার ধারাটি অম্লান নবীন থাকে। অসহযোগে বা অভি-সম্পাতে অনিষ্টের নিরাকরণ হয় না। বুন্দেলখণ্ডের ধানভানুতে গিয়ে থানিকটা শিবের গান হয়ে গেল। আমাদের হাতে অনেক সময়ে দেখি শিব গড়্তে গিয়ে বাঁদর হয়ে যায়। সেটা যে আমাদের হাতের গুণে, মাটির দোষে নয়, এই কথাটি বিশেষভাবে মনে এল নাচের স্বপক্ষে ওকালতি করতে গিয়ে। খাজুরাহে সেই পল্লীলক্ষ্মীদের উৎসবনৃত্যের সঙ্গে বোম্বাই সহরে সম্ভ্রান্ত গুজরাটি মহিলাদের যে 'গর্‌বানৃত্য' দেখেছিলাম তাহার স্মৃতি সম্মিলিত হয়ে আমাকে ভ্রাম্যমাণের যাত্রাপথ থেকে থানিকটা উন্মার্গগামী করে দিল। আবার চল্‌তি পথে ফিরে যাই।

শা-ঘাট ও রাজগড়

ছত্রপুরে দেওয়ান্‌জি আমাদের ফিরবার পথে শাঘাট, রাজগড় ও গাঙ্গো দেখে আস্‌বার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। খাজুরাহে একরাত্রি কাটিয়ে পরদিন (১৭ অক্টোবর) বেলা মাইল দূরে। নদীর তীরে পাহাড়ের চূড়ায় বিপুলায়তন দুর্গ-প্রাসাদ এই রাজগড়। জয়পুরের 'অম্বর'-প্রাসাদের কথা মনে হ'ল। আমরা বিনা সম্বাদে উপস্থিত হয়েছি। দরজা তালাবন্ধ। তবু পাহাড়ে চড়ে প্রাসাদের উঠানে বারাণ্ডায়

ঘোমটা-নাচের আলো-ছায়া

চিত্রশিল্পী শ্রীললিতমোহন সেনের সৌজন্যে

তিনটার সময় বাহির হলাম যাত্রাপথে। একঘণ্টার মধ্যেই মোটর শা-ঘাটে পৌছল। নদীর তীরে শা-ঘাটের ডাক্‌ বাংলা। ওপারে পর্ব্বতশ্রেণী। নির্জ্জনবাসের এমন্‌ মনোরম স্থল সুদুর্ল্লভ। শাঘাট থেকে রাজগড় মাত্র তিন নহবৎখানায় চারিদিকে ঘুরে বেড়ালাম। আজ যাহা জনশূন্য শ্মশানের মত, একদিন সেখানে কত লোকলস্কর সেনাসামন্তের জটলা ছিল! ব্রাউনিংএর সেই লাইনগুলি মনে পড়ল,—

প্রাসাদ হইতে পার্ব্বত্য শোভা—রাজগড়

বেলা পড়ে আস্ছে, সন্ধ্যার আগেই আমাদের গাঙ্গোয় পৌছতে হ'বে। সুতরাং রামগড়ের গিরিদুর্গটি ভাল করে দেখ্‌বার আর অবসর ছিল না। ছুটলাম গাঙ্গোর পথে, পৌছলাম সেখানে ঠিক্ গোধূলি লগ্নে। রাজগড় থেকে গাঙ্গো আন্দাজ সতেরো মাইল। পথের শেষাংশ নিবিড় জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। শেষ পাচ মাইল আঁকাবাঁকা চড়াইপথে পর্ব্বতারোহণ।

But he looked upon the city, every side,
Far and wide
All the mountains topped with temples,
All the glades,
Colonnades,
All the causeys, bridges, aqueducts,--and
All the men !

সে রামও নাই আর সে অযোধ্যাও নাই! কিন্তু ছিল একদিন যেদিন রাজগড়ের রাজার চোখে যা পড়্‌ত, ব্রাউনিংএর লাইন ক'টির মধ্যে তাদের চলচ্চিত্র অচল হয়ে আছে। সেই দিগন্তবিস্তৃত জনপদ, মন্দির-চূড় গিরিতরঙ্গ, তোরণ পরম্পরা, বনবীথি, সেতুবন্ধ আর হর্ষোৎফুল্ল প্রজাপুঞ্জ। Love among the Ruinsএ ইতালীর লুপ্তরাজশ্রীর পাশে বুন্দেলখণ্ডের রাজলক্ষ্মী যেন নীরপদসঞ্চারে এসে দাঁড়ালেন, যমজ সহোদরার মত অভিন্নরূপা। ট্রুবাদুর্‌দের গানের সঙ্গে চারণ-দের দোঁহাবলি মিলিত হয়ে একটা অশ্রুতপূর্ব্ব সঙ্গীতধ্বনি শ্রুতিপথে রচনা করল।

গাঙ্গো

আমাদের মোটরের আওয়াজ পেয়ে দ্বাররক্ষী অনতিবিলম্বে পাশের গ্রাম থেকে ছুটে এল। কিন্তু

প্রাসাদ হইতে বহির্দৃশ্য—রাজগড়

দু'তিনটে, যাকে বলে একেবারে Hairpin turns, অর্থাৎ, মোড়াহাতের কুনই বাঁক্।

ডাক্‌-বাংলা—গাঙ্গো

অধিত্যকায় গিয়ে যখন পৌঁছিলাম তখন হঠাৎ একটা অপূর্ব্ব দৃশ্যপট চোখের সাম্‌নে উদ্‌ঘাটিত হ'য়ে গেল। পাহাড়ের চূড়ায় ডাক্‌বাংলা। সম্মুখে কেন্ নদী। নদীর ওপারে আভুগ্ন চন্দ্রকলার মত গিরি-বেষ্টনী, আর এপারে ডাক্‌বাংলাটি যেন সেই চন্দ্রবিন্দুর কেন্দ্রবিন্দু। পুষ্পকারোহণে যেন নন্দনে এসে উপস্থিত হলাম সশরীরে। বাতাসে মধু, শুক্লা-দশমীর জ্যোৎস্নায় মধু, আর চারিদিকের জ্যোৎস্নফুল্ল বনশ্রীর তরঙ্গায়িত অঙ্গে অঙ্গে অনুপম মধুরিমা। কালিদাস কুমারসম্ভবের প্রথম ছত্রে বলেছেন,

"অস্ত্যুত্তরস্যাংদিশি দেবতাত্মা
হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।"

উত্তরাঞ্চলে দেবতাধিষ্ঠিত এক পর্ব্বতরাজ বিরাজমান্, নাম হিমালয়। শুধু হিমালয় কেন, গিরিশিখর মাত্রেই আমাদের মত নিম্ন স্থলচর জীবের চক্ষে সুরধাম, সেখানে দেবতার বাস। স্বর্গ নরক আমাদের মনে, আর আমরাই ত যুগপৎ দেবতা ও দানব। পাহাড়ের চূড়ায় যখন উঠি স্বর্গ যেন নেমে আসে উর্দ্ধলোক হ'তে, অসুরের সুপ্ত দেবতার ঘুম ভাঙে সেই শুভ মুহূর্ত্তে। তাই আমাদের প্রতি-দিনের তুচ্ছতার বহু ঊর্দ্ধে এই 'দেবতাত্মা' দেবভূমির কল্পনা করি। এ কল্পনা আমাদের অভিজ্ঞতার বাহিরে নয়।

হরপালপুর রেলওয়ে ষ্টেশন গাঙ্গোর নিকটবর্ত্তী। এখানকার ডাক্‌বাংলাটি Irrigation Departmentএর উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের জন্য নির্ম্মিত, তাই সুসজ্জিত আস্‌বাবে বিলাতী হোটেলের মত সুরম্য। খাজুরাহের তহশীলদার আমাদের একখানি পত্র দিয়েছিলেন, তাই এখানে স্বচ্ছন্দে প্রবেশ লাভ করা গেল। আমরা পূর্ব্বে

কেন্ নদীর পয়োবন্ধ—গাঙ্গো

কোনো সংবাদ দিয়ে আসি নাই। এসে দেখি ডাক্‌বাংলার খান্‌সামা বিজয়াদশমী উপলক্ষ্যে french leave নিয়েছে। বাবুর্চ্চিখানা বন্ধ। আমাদের সঙ্গে রশদ মজুৎ। ডাক্‌বাংলার বারাণ্ডায় পাকশালা স্থাপন করা গেল। গ্রামে লোক ছুটল খান্‌সামার সন্ধানে। হাতে বল্লম ও লণ্ঠন, বাঘের ও ভালুকের ভয় আছে। যা'হোক্‌, খান্‌সামা সাহেবের আসতে বিলম্ব হ'ল না। বাংলার রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত হ'ল, ঘরে বাতি জ্বলল, গরম জলের ধূমায়মান ভৃঙ্গার যথাস্থানে সন্নিবেশিত হ'ল। আহারান্তে সম্মুখের মাঠে ইজি-চেয়ারখানি টেনে নিয়ে উদার আকাশের তলে বসলাম। বিদ্যাপতির সেই গানটি মধুর বাতাসে মধুর জ্যোৎস্নায় এমনি আর

পয়োবন্ধ—গাঙ্গো

একটি রাত্রির স্মৃতি নিয়ে যুগাযুগান্তর থেকে ভেসে এল। "দশদিক্‌ ভেল নিরদ্বন্দা!"

ভাইপো অকৃতদার। বল্লাম, বৌমাকে যখন ঘরে আন্‌বি, তখন কাউকে না বলে এখানে এসে Honeymoon করে যাস্‌। আর যদি বেঁচে থাকি ত তোর্‌ খুড়ীমাকে নিয়ে এখানে এসে শুভোদ্বাহের Diamond Jubilee করে যাব, দেখিস্‌।

নতুন আবেষ্টনের ভিতর আমরা নিজেকে এবং প্রিয়জনদের নতুন করে পাই। মানুষ "বৃন্তহীন পুষ্প" নয়। সে যেখানে থাকে আশপাশের সঙ্গে তার ব্যক্তিত্বটা জড়িয়ে যায়, একটা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে আমরা গাছপালা আকাশ বাতাসের সঙ্গে বাঁধা পড়ি। "তাজ-হ্‌ ব-তাজ-হ্‌ নও ব-নও"। তাই যা পুরাতন তা হয় 'চির নবীন চিরসুন্দর।' সাপ খোলষ্‌ বদলিয়ে চিক্কণ শ্রী পায়। মানুষের মন বাহির থেকে নির্ম্মোক্‌ সংগ্রহ করে অভিনব কান্তি লাভ করে। তাই মনে হ'ল এই গাঙ্গো যেন গাঙ্গ-প্রবাহ। এখানকার আলো বাতাসে অবগাহন করে প্রাণের উপর যেন একটা সুচিক্কণ জ্যোতির্ম্ময় পলি পড়ে গেল। ঝরণায় স্নান করে উঠ্‌লে সর্ব্বাঙ্গে এই রকম বালি চিক্‌ চিক্‌ করে।

১৮ই অক্টোবর। আজ সকালে পাঞ্জাবী ওভার্‌সিয়ারটি আমাদের যত্ন করে Dam প্রদক্ষিণ করিয়ে আন্‌লেন। পয়োবন্ধটি কত বড় তার কতকটা আন্দাজ নিম্নলিখিত পরিমাপগুলিতে পাওয়া যাবে।

নির্ম্মাণকাল—১৯০৭—১৯১৫। দৈর্ঘ্য ২৬২০ ফিট্‌। পয়ঃপ্রণালী-গুলি দিয়ে প্রতি মিনিটে সাড়ে তিনহাজার ঘন-ফিটের উপর জল-ধারা নিষ্ক্রান্ত হয়। বান্দা জেলার ৮০,০০০ হাজার একার জমি এই জলে নিষিক্ত হয়। পয়োবন্ধ বেষ্টিত হ্রদের গভীরতা ৫০॥ ফিট। এই সেতুবন্ধে সব শুদ্ধ ২৬২টি লোহার দরজা আছে। ইচ্ছামত সেগুলিকে খোলা ও বন্ধ করা যেতে পারে। একটি কল টিপ্‌লে প্রতি মিনিটে ৮৫টা দ্বার উদ্‌ঘাটিত বা অবরুদ্ধ করা যায়। জলস্রোত এই লৌহকবাটগুলির ভিতর দিয়া প্রবাহিত হয়।

পাঞ্জাবী ওভার্‌সিয়ার, আমাদের আরও দুএকদিন থাকবার জন্য অনুরোধ কর্‌লেন। তাঁর সাদর নিমন্ত্রণ ও আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও ঘূর্ণীবায়ুর টানে এ স্বপ্নপুরী ত্যাগ করে আবার যাত্রাপথে বাহির হ'তে হ'ল। কেন্‌ নদীর স্বচ্ছ নীল জলে অবগাহন করে, একটা অনির্ব্বচনীয় স্বপ্নচ্ছবি প্রাণে এঁকে নিয়ে ছত্রপুরে ফির্‌লাম বেলা ৩টার সময়। দেওয়ান্‌জিকে আমাদের ভ্রমণ বৃত্তান্তের কিঞ্চিৎ আনন্দস্মৃতি নিবেদন করে ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বেলা ৩॥০ টার সময় মহোবার পথে রওনা হ'লাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

বিচিত্রা
ফাল্গুন ১৩৪১

বিদায় বেলা

শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর
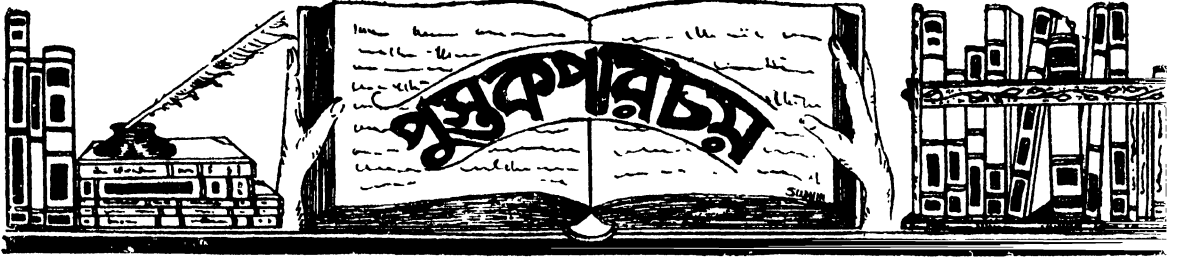
হাদীছের আলো। শ্রীযুক্ত মুহাম্মদ আজহার উদ্দীন এম, এ, সঙ্কলিত।

শ্রীযুক্ত মুহাম্মদ মনসুর উদ্দীন এম, এ, কর্ত্তৃক ৮৬।১০ ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

গ্রন্থকার ইতিপূর্ব্বে "কোর আনের আলো" লিখে সাহিত্য-সমাজে প্রতিষ্ঠাভাজন হ'য়েছেন। ইসলাম বিধানানুযায়ী কোর আনের পরেই হাদীছের স্থান। হাদীছের সাধারণ অর্থ কথা বা ঘটনা। গ্রন্থকার বলেন, "কিন্তু ইছলামিক পরিভাষায় সেইগুলিই হাদীছ নামে পরিচিত, মহানবী মুহাম্মদ (দঃ) নিজে যাহা বলিয়াছেন বা করিয়াছেন অথবা অপরে যাহা তাঁহার সম্মুখে করিয়াছে এবং তিনি তাহা গ্রহণ করিয়াছেন।" এই হাদীছগুলির বঙ্গানুবাদ করিয়া গ্রন্থকার হিন্দুমুসলমান নির্ব্বিশেষে সমস্ত বাঙ্গালীরই কৃতজ্ঞতাভাজন হ'য়েছেন। অনুবাদের ভাষা প্রাঞ্জল, সুন্দর এবং গ্রন্থকারের সাহিত্য-সংস্কৃতির পরিচায়ক। ভূমিকা এবং আলোচনাতেও গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। পুস্তকে হজরত মহম্মদের একটী জীবনী গ্রথিত ক'রে দিয়ে গ্রন্থকার পুস্তকের মর্য্যাদা বৃদ্ধি ক'রেছেন। এরূপ পুস্তক যত প্রকাশিত হয়, বঙ্গসাহিত্যের পক্ষে ততই মঙ্গল এবং শুধু মুসলমানেরা নয় বাঙ্গালী হিন্দুরাও এইরূপ পুস্তকের সাহায্যে ইস্‌লামের মহান্ আদর্শের সঙ্গে সহজেই পরিচিত হ'তে পারবেন। এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

সরস্বতী, প্রথমখণ্ড—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সঙ্কলিত। ৩১ নং তেলিপাড়া লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রকুমার ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য তিন টাকা।

দেবতত্ত্ব গ্রন্থমালার প্রথম পুস্তক। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের পাণ্ডিত্য সর্ব্বজনবিদিত। সরস্বতী সম্বন্ধে তাঁর গবেষণার পরিচয় আলোচ্য পুস্তকখানির প্রতি পৃষ্ঠায় বর্ত্তমান। সাধারণ পাঠকের মনেও পুস্তক বর্ণিত বিষয় কৌতুহলের সৃষ্টি করবে। ইহাই অমূল্যবাবুর লেখার বিশেষত্ব। আশা করি, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। এরূপ পুস্তক সচিত্র হওয়াই উচিত, এবং সে বিষয়ে প্রকাশক মহাশয়ের ত্রুটী বিচ্যুতি ঘটে নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ চন্দ্রিকা—ব্রহ্মচারী প্রজ্ঞাচৈতন্য প্রণীত। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য একটাকা বার আনা।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী আলোচনা। এই আলোচনায় একটু নূতনত্বের আভাষ আছে। স্বামী অভেদানন্দের রামকৃষ্ণ স্তোত্র অবলম্বন ক'রে ইহাতে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশ একটা বিশেষ দিকে অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হ'য়েছে। এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। স্বামী অভেদানন্দ গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন এবং গ্রন্থখানি চিত্রশোভিত। এই পুস্তকখানি রামকৃষ্ণ-ভক্ত সম্প্রদায়ের তথা সর্ব্বসাধারণের কাছে বিশেষ আদরণীয় হবে, এরূপ আশা করা যায়।

চন্দ্রকেতু

"নীললোহিতের আদিপ্রেম"—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী, দাম একটাকা। সরস্বতী লাইব্রেরী, ৯, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর লেখার বৈশিষ্ট্য আজকের দিনে আর বিশ্লেষণ করে কারুকে বুঝিয়ে দেবার প্রয়োজন আছে

ব'লে মনে হয় না। তাঁর লেখার পিছনে যে সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি, বিদগ্ধ মন ও গভীর অথচ সরস পাণ্ডিত্য, এবং তাঁর ভাষার যে অসামান্য স্বচ্ছতা ও ঔজ্জ্বল্য, তা কোন্ বাঙালী সাহিত্যরসিকের কাছে আজ অবিদিত? কিন্তু অনেক গল্প লেখা সত্ত্বেও তিনি প্রধানতঃ প্রবন্ধকার হিসাবেই সাধারণের কাছে পরিচিত। তার কারণ হয়ত এই যে "সবুজপত্রের" আবির্ভাব যখন আমাদের সাহিত্যের ছিল সর্বপ্রধান ঘটনা, তখন "সবুজ পত্রে"র সম্পাদক দেখা দেন প্রবন্ধকার রূপেই। তাঁর সেদিনকার খ্যাতির দীপ্তি আজও অম্লান; কিন্তু ইতিমধ্যে যে তিনি সাহিত্যের আরেক ক্ষেত্রেও তাঁর আসন পাকা করে নিয়েছেন, সে কোন্ গুণে, তার বিশদ আলোচনার প্রয়োজন আছে। এ স্বল্পপরিসর পুস্তক পরিচয়ে অবশ্য সে আলোচনার অবসর নেই। বাঙলা উপন্যাস ও ছোটগল্পের ধারাবাহিক আলোচনা একমাত্র শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ই আজ পর্য্যন্ত করেছেন, তাঁর ন্যায় শক্তিশালী ও রসগ্রাহী সমালোচকের কাছে প্রমথ বাবুর ছোট গল্পের যথাযথ বিচার ও বৈশিষ্ট্য নির্দ্দেশের আশা আমরা রাখি।

এই বইখানিতে "ভাববার কথা" ছাড়া আর সবই গল্প। তার মধ্যে "অবনীভূষণের সাধনা ও সিদ্ধি"র পটভূমি বড়; অন্য গল্পগুলি শুধু ক্ষুদ্রকায় নয়, এক একটি ক্ষুদ্র ঘটনাংশকে আশ্রয় করে লেখা। প্রথম গল্পে আমাদের সুপরিচিত ও অতিপ্রিয় নীললোহিতকে দেখি, এবং তার আদিপ্রেম বা আদি বীরত্বের কাহিনী অত অপ্রত্যাশিত ভাবে হঠাৎ থেমে যাওয়ায় যুগপৎ বিস্মিত ও দুঃখিত হই। নীললোহিতকে এই হয়ত আমাদের শেষ দেখা (লেখক সে ভয় দেখিয়াছেন) মনে করে ব্যথিত হয়ে উঠতে হয়। নীললোহিত প্রমথবাবুর একটি অত্যাশ্চর্য্য সৃষ্টি। তিনি নিজের জীবনে ও লেখায় সস্তা রোমান্টিসিজ্‌মকে চিরদিন খানিকটা সন্দেহ এবং খানিকটা বিদ্রূপের চোখে দেখে এসেছেন। আমাদের মজ্জাগত ভাবালুতাকে তিনি বরাবর পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন, এবং তার পরিবর্ত্তে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন চিন্তার কাঠিন্য ও বুদ্ধির বিচার। এক কথায় emotionalismএর বিরুদ্ধে rationalismএর হয়ে তিনি চিরদিন লড়ে এসেছেন, এবং "ক" শব্দ উচ্চারণ করতে না করতেই কেঁদে ভাসিয়ে দেওয়ার যে প্রবণতা আমাদের চরিত্রের প্রধান দুর্ব্বলতা, তার হাত থেকে আমাদের বহু পরিমাণে মুক্ত করেছেন।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও প্রমথবাবুর মনের গভীর গহনে যে romanticism প্রচ্ছন্ন আছে, আমার মনে হয় নীললোহিতের গল্পগুলির মধ্যে তা ফুটে বেরিয়েছে।

এ বইয়ের প্রথম গল্পের সঙ্গে "নীললোহিতের" অন্য গল্পগুলি মেলালে দেখা যায় লেখক প্রথমে করেছেন এই অদ্ভুত চরিত্রসৃষ্টি, তার পর তাকে কয়েকটি অত্যাশ্চর্য্য ঘটনার মধ্যে ফেলেছেন। এমন সুকৌশলে তাঁর নায়ককে গড়েছেন যে, যদিও সে সাধারণ মানুষ নয়, যদিও কোনোদিন তাকে রাম শ্যাম যদু বলে ভুল করবার কোন সম্ভাবনাই নেই, তবু সে যে উদ্ভট বা অসম্ভব তা মোটেই মনে হয় না। সে অবশ্য অসাধারণ, কিন্তু রক্তে মাংসে গড়া জীবন্ত মানুষও বটে। একবার যেই তাকে মেনে নিলাম, তখন আশ্চর্য্য ঘটনার মধ্যে তার অদ্ভুত কার্য্যাবলী বিশ্বাস করতে আর বাধে না। নীললোহিত যে planeএর মানুষ তার কথায় বা কার্য্যে সে planeএর logic কোথাও নষ্ট বা খণ্ডিত হয়নি।

অন্য গল্পের মধ্যে "অ্যাডভেঞ্চার—জলে" আমাদের খুব ভালো লেগেছে। দুবার আঁচড়ে প্রকৃতির এক একটা বিশেষ চেহারার অতি সুন্দর চিত্র এতে আছে। গল্পের মূল ঘটনাটি ক্ষুদ্র, কিন্তু এমন ভাবে তার উপর ঝোঁক দেওয়া হয়েছে যে পাঠকের মনে তা গেঁথে যায়।

আমাদের সাহিত্য ছোটগল্পে বিশেষ সমৃদ্ধ। তবু একথা অকুণ্ঠিতভাবে বলা যায় যে গঠনের যে কৌশল, কল্পনার যে চমৎকারিত্ব, অন্তর্দৃষ্টির যে সূক্ষ্মতা এবং প্রকাশের যে অভিনব ভঙ্গী প্রমথবাবুর **শ্রেষ্ঠ** গল্পগুলিতে পাওয়া যায়, শুধু আমাদের নয় যে কোন দেশের সাহিত্যে তার তুলনা মেলা ভার।

শ্রীসোমনাথ মৈত্র

অভিনব—শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস

প্রণীত। প্রকাশক মেসার্স এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স, ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা। মূল্য একটাকা মাত্র।

শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার হালদার আই সি এস প্রণীত 'অভিনব' কাব্য পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিলাম। 'অভিনব' দুইখানি ব্যঙ্গ কাব্যের সমষ্টি—একখানি মেঘদূত, অপরখানি 'কর্ত্তার কানমলা'। মেঘদূতের মত অতুলনীয় কাব্যের প্রচ্ছন্ন ভূমিতে লেখক কি করিয়া হাস্যরসের এমন চিত্র আঁকিলেন তাহা ভাবিয়া পাই না। কিন্তু হাস্যরসে তুলিকা ডুবাইয়া ইনি মেঘের গায়ে এক অপূর্ব্ব রঙ ফলাইয়াছেন। কল্পনাটি যে একান্তই মৌলিক, সে কথা স্বীকার করিতেই হইবে। কর্ত্তার কানমলাতে নন্দর প্রেমকাহিনী হাসির মাঝে বেশ একটু নীতি কবিতার রস আমদানী করিয়াছে। হাসির অন্তরালে লেখকের কবি প্রতিভা অনেকবার উঁকি মারিয়া পাঠককে যে চমকিত করিবে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালা সাহিত্যে হাস্যরসের যে খুব প্রাচুর্য্য নাই একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। একজন সমালোচক সত্যই বলিয়াছেন যে হাস্যরসের পরিণতির দ্বারা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব অনুমান করিতে পারা যায়। আমাদের বঙ্গসাহিত্যে এই হাস্যরসের ধারা ভারতচন্দ্র হইতে দীনবন্ধু এবং দ্বিজেন্দ্রলাল পর্য্যন্ত কিভাবে রহিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

আটপণে আধসের আনিয়াছি চিনি।
অন্যলোকে ভূরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি॥

মালিনীর এ চিত্র বঙ্গসাহিত্যে ব্যঙ্গরসের এক অতি অভিনব সৃষ্টি। ইহার পরে আমরা কতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছি তাহা চিন্তনীয়। আগে যেমন কাব্যে একজন ভোজনবিলাসী বাক্যসর্ব্বস্য বিদূষকের সৃষ্টি করিলেই ব্যঙ্গরসের পরকাষ্ঠা হইত, এখন আর কেহ তাহা মনে করেন না। মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সংস্কৃতির ধারার সঙ্গে সঙ্গে ব্যঙ্গরসের নূতন নূতন মূর্ত্তি আমাদের সাহিত্যে দেখা দিতেছে। হালদার মহাশয়ের 'অভিনব' সত্যই ব্যঙ্গরসের এক অভিনব মূর্ত্তি লইয়া সাহিত্যের মন্দির দ্বারে উপনীত হইয়াছে।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

চিন্ময়সি—শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত ও শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক ৯নং রুস্তমজী ষ্ট্রীট, বালিগঞ্জ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৫৬, মূল্য পাঁচ সিকা।

সাধারণের কথা বলিতেছি না, বাংলার উচ্চশিক্ষিত অধ্যাপক সম্প্রদায়ের মধ্যেও ধূর্জ্জটিবাবুর মত পড়াশোনা খুব অল্পজনেরই আছে। আধুনিক ইউরোপীয় চিন্তাজগতের খুব recent খবর তাঁহার মত কয়জনে রাখেন জানি না। "আমরা ও তাঁহারা" ও "রিয়ালিষ্ট" গ্রন্থদ্বয় লিখিয়া তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। তিনি লেখেন অল্প, সাধারণ সভাগুলীতে বক্তৃতা দেন আরো অল্প, কিন্তু তিনি যাহা লেখেন ও যাহা বলেন, তাহা পড়িলে ও শুনিলে শুধু এই কথাটাই বারে বারে মনে হয়—পড়েন ত অনেকে অনেক রকম বই, কিন্তু এমন গভীর ও ব্যাপকভাবে সত্যের সন্ধান কয়জনে করেন? মনে পড়ে, কিছু দিন আগে আমরা হার্ডিঞ্জ হোষ্টেলে একদিন শরৎবাবুকে আনি। সে সভায় লোক ছিল খুব অল্প, কারণ বাহিরে কাহাকেও খবর দেওয়া হয় নাই। সেদিন সন্ধ্যায় ধূর্জ্জটীবাবু শরৎবাবুর লেখার সম্বন্ধে বিশেষতঃ তাঁহার "শ্রীকান্ত"র চতুর্থ খণ্ড সম্বন্ধে যে কয়েকটী কথা বলেন, তাহা হইতেই বুঝিতে পারি তিনি হইতেছেন একজন সূক্ষ্ম প্রকর্ষচিত্ত সমালোচক। "শ্রীকান্ত"র চতুর্থ খণ্ড আগেই পড়িয়াছিলাম, তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া আবার পড়িলাম। দেখিলাম, প্রথম অভিযানে অনেক কিছুই চোখে পড়ে নাই। "চিন্ময়সি" পুস্তকখানির মধ্যে 'বিজ্ঞান ও মানবধর্ম্ম', 'সাহিত্যিকা' 'দেশ ও প্রগতি' শীর্ষক অনেকগুলি সুচিন্তিত প্রবন্ধ আছে। এ গুলি নানা মাসিক পত্রিকায় ভিন্ন ভিন্ন সময় প্রকাশিত হইয়াছিল। স্থানে স্থানে লেখা দুর্ব্বোধ্য হইলেও, তাঁহার লেখা হইতে ভিতরের মানুষটীকে বেশ বোঝা যায়। এমন passion for reading ও এমন অদ্ভুত retentive memory—যে প্রত্যেক প্রবন্ধের প্রত্যেক লাইনের মধ্যে তাঁহার জ্ঞান ভাণ্ডারের সমস্ত সঞ্চিত রত্ন একে একে সাজাইয়া গেছেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলেই একটী কথাই কেবল মনে হয়। চরম উৎকর্ষতা লাভ না করিলেও বাংলা সাহিত্যে আছে ভালো উপন্যাস, ভালো গল্প, ভালো কবিতা, ভালো

নাটক ;—নাই শুধু দুইটা জিনিষ। প্রথম ভালো ইতিহাস, দ্বিতীয়, ভালো সমালোচনা। সমালোচনা ত অনেকেই লেখেন, কিন্তু তাহা শুধু কথার সমষ্টি ও Sentimentalityর নামান্তর মাত্র। G. K. Chesterton, Legouis, Le Gallienne, Herford, Murray, Ruskin, Carlyle, Emerson এর মত সমালোচক আমাদের দেশে কই? Prescott, Motley, Macaulay, Froude, Greene, Freeman, Napier এর মত ঐতিহাসিকই বা কোথায়? বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক এখনো হয় নাই। আর সমালোচনা ক্ষেত্রে এক প্রমথ চৌধুরী ব্যতীত (অবশ্য রবীন্দ্র নাথ ছাড়া, Palgraveএর কথায় তিনি হইতেছেন 'always excepted', কারণ 'always exceptional) আর কাহাকেও দেখিতে পাই না। ধূর্জ্জটীবাবুর 'চিন্তয়সি'র আর একটী বিশেষত্ব এই যে তিনি প্রবন্ধগুলির মধ্যে তাঁহার বক্তব্য ছাড়া উপরন্তু একটী সুষ্ঠু সবল সমালোচনা গঠনের উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'চিন্তয়সি' সাধারণ পাঠকের জন্য নয়। শিক্ষিত সম্প্রদায় এই পুস্তক পাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন—সমাজ, সাহিত্য, ধর্ম্ম, কাব্য এবং স্বদেশ ও বিদেশ সম্বন্ধে অনেক নূতন খবরই তাঁহারা পাইবেন। প্রবন্ধগুলির সব চেয়ে বড় গুণ এই যে এই গুলি পড়িতে পড়িতে মনের প্রসারতাও যেমন বাড়িতে থাকে, পাঠকের চিত্তবৃত্তির গতিও একটী বিশিষ্ট ধারা অবলম্বন করে।

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস

অন্তর-বাহির

অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

বহুদিন পরে হেরিনু তোমারে, তবুও চিনিতে পারি।
অদ্ভুত তুমি নারী!
ও-দুটি নয়নে বিশ্বের বিস্ময়
আজও হয়ে আছে তেম্‌নিই অক্ষয় ;
আজিও তোমার কলকণ্ঠের কথা
সারা দেহমনে জাগায় বিহ্বলতা ;
ঘন কালো চুলে পিঠ ছেয়ে আছে আজও,
নীল শাড়ী আর আল্‌তা সিঁদুরে সাজো ;
একদা যা ছিলে, ইঙ্গিত পাই তারই
কেশে বেশে আজও ; অদ্ভুত তুমি নারী!

চিনিনু তোমারে বাহিরের রূপে, জানিনা মনের বাণী।
প্রেমের প্রদীপখানি
মানস-দেউলে কা'র লাগি আছে জ্বালা!
কা'র লাগি আজও গাঁথ শেফালির মালা!
কা'র পথ চাহি' বাতায়নে থাকো বসি'
এত আনমনা আঁচল পড়ে যে খসি'!
দিন চ'লে যায়, গাঢ় হ'য়ে আসে রাতি,
ভুলে যাও, ঘরে হয় না যে জ্বালা বাতি!
কার ধ্যানে তব কাটিছে দিবস যামী,
অনন্যমনা, সে কি আমি, সে কি আমি!

গ্রন্থাগার। *

শ্রীহরিহর শেঠ

মানুষের জ্ঞানার্জ্জন, বিদ্যা সাধনা, সাহিত্যালোচনা প্রভৃতির দ্বারা উৎকর্ষ লাভের জন্য যে কয়টী মার্গ আছে, যাহা অবলম্বন করিয়া সহজে অগ্রসর হইতে পারা যায়, তাহার মধ্যে গ্রন্থই সর্ব্বপ্রধান। পৃথিবীর আদিকাল হইতে না হউক, মানব সভ্যতার বিকাশের পর যখন মনের ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য ভাষা ও অক্ষরের প্রবর্ত্তন হয় নাই, ছবি অাঁকিয়া মানুষ যখন মনোভাব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে, তাহাকে যদি ভাষা আখ্যা দেওয়া যায়, তবে বহু প্রাচীন কাল হইতেই গ্রন্থরচনা আরম্ভ হইয়াছে বলা যাইতে পারে।

বর্ত্তমানে গ্রন্থ বলিতে যাহা বুঝায় আদিমকালে অবশ্য ঠিক তাহা ছিল না। কিন্তু তাহা হইলেও ভাষা ও অক্ষরের একটা বাঁধা ব্যবস্থা না থাকিলেও, মনোভাব প্রকাশের জন্য পাথর অথবা মৃত্তিকা টালির উপর জীবজন্তু বৃক্ষলতা প্রভৃতির ছবি অাঁকিয়া গ্রন্থরচনার পদ্ধতি তখনকার যুগেও ছিল। এবং এইরূপ প্রস্তর ও মৃত্তিকা অঙ্কিত টালিগুলি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া সেকালে পাথুরে গ্রন্থাগার সৃজিত হইত। লেখার জন্য তালপাতা ও ভূর্জ্জপত্রের ব্যবহার তাহার অনেক পরে প্রচলিত হয়। তখনকার রাজারা উক্ত গ্রন্থাগার সমূহের পৃষ্ঠপোষক থাকিলেও, সাধারণতঃ পুরোহিত ও ধর্ম্মযাজকগণই উহার রক্ষক ছিলেন এবং উহার সহায়তায় নিজের জ্ঞানার্জ্জনের সহিত লোকশিক্ষার কার্য্যে ব্রতী থাকিতেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণের গবেষণা ও আয়াসের ফলে প্রাচীনকালের এইরূপ গ্রন্থাগারের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে লেয়ার্ড (Layard) নামক এক ব্যক্তি নিনিভা নগর খনন করিতে মৃত্তিকা নিম্নে একটী প্রকাণ্ড কক্ষ মধ্যে প্রায় দশ হাজার খানি এক ইঞ্চি হইতে এক ফুট আকারের পাথরে অঙ্কিত টালি প্রাপ্ত হন। তৎকালে বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করিয়াছিলেন, তথায় আরও বিশ হাজার খানি ঐরূপ লিখিত প্রস্তর মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত থাকিতে পারে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা মনে করেন উহা এসিরিয়ার অসুর-বাণী-পাল্ (assar-bani pal) রাজার সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

এসিরিয়ার অপেক্ষাও পুরাতন লাইব্রেরী ছিল ব্যাবিলনে। মিশরেও অতি প্রাচীনকালে যখন সুপ্রসিদ্ধ পিরামিড্ গুলি পৃথিবীর আশ্চর্য্যরূপে ধরাপৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তাহার পূর্ব্বে ঐরূপ চিত্রাক্ষর লিপিপূর্ণ পাথুরে লাইব্রেরীর অস্তিত্বের নিদর্শন আছে। সে অন্ততঃ ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বের কথা। মিশরে শুধু মন্দিরে নয় রাজাদের কবর স্থানেও গ্রন্থ রক্ষা করিবার ব্যবস্থা ছিল। খ্রীষ্ট পূর্ব্বচতুর্দ্দশ শতাব্দী পূর্ব্বে ওসিম্যাণ্ডাস্ (Osymandyas) নামক রাজার রাজত্ব-কালে তথায় সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত গ্রন্থাগারের কথা জানা যায়। এ সব গ্রন্থ কি ভাবে রচিত হইয়াছিল তাহার উল্লেখ পাই নাই। ভূমধ্য সাগরের উত্তর দিকস্থ দেশ সমূহেই প্রথম কথ্য-ভাষা অক্ষরে লিখিয়া প্রকাশের প্রবর্ত্তন হয়। কথিত আছে তথাকার চ্যালডিয়ন্ ভাষাই প্রথম লিখন পঠনের ভাষা। উহা চিত্রাক্ষরলিপির যুগের কত পরে তাহা ঠিক নির্ণয় করা দুরূহ।

প্রাচীন গ্রীসেও বড় বড় পুস্তকাগারের কথা জানা যায়। কথিত আছে পিসিস্ট্রেটস্ (Pisistratus) নামক এক ব্যক্তি তথায় প্রথম গ্রন্থগার প্রতিষ্ঠা করেন। প্লেটো, এরিসটল্, ইউক্লিডেরও পুস্তকাগার ছিল। রোমের সমৃদ্ধিকালে সেখানেও কতিপয় উল্লেখ যোগ্য গ্রন্থাগারের কথা জানা যায়। তথায় সাধারণের ব্যবহারের

* ২৫শে, ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪ চুঁচুড়া, দেশবন্ধু হাইস্কুলে বিশেষ অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ।

জন্য লাইব্রেরী অনেকগুলি ছিল। কথিত আছে আগষ্টস্ সর্ব্ব প্রথম সাধারণের ব্যবহারের জন্য পাঠাগার স্থাপিত করেন। কনষ্টান্টিনোপলের গৌরবময় যুগে তথায় কতিপয় বড় পুস্তকাগারের প্রতিষ্ঠা হয়। সেখানে কোন কোনটিতে লক্ষাধিক পুঁথি সংগ্রহ ছিল। রোম সাম্রাজ্য পতনের পরও পোপেরাও বড় বড় লাইব্রেরী করিয়াছিলেন। তখন তথাকার বৃহৎ বৃহৎ মঠে কতিপয় বিরাট গ্রন্থশালার কথা জানা যায়। পুস্তকাগার হইতে বাড়ীতে বই লইয়া যাইবার ব্যবস্থা তথায় সেই সময়েই প্রবর্ত্তিত হয়। এলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার গ্রন্থাগার প্রাচীন জগতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিল। সেখানে প্রধান পুস্তকাগারটিতে প্রায় পাঁচ লক্ষ গ্রন্থের সমাবেশ ছিল বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। কথিত আছে মহাবীর আলেক্‌জেণ্ডারের সেনাপতি টলেমিই ইহার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। এই সময় "টেপিরাস্" নামক এক প্রকার বৃক্ষের ত্বকে লেখা হইত।

প্রাচ্যদেশ সমূহের মধ্যে চীন দেশে গ্রন্থের আদর খুব বেশী ছিল। সেখানে পাঠের তীব্র অনুরাগই শুধু তাহার কারণ নহে। পুস্তক সংগ্রহ ও রক্ষণের সহিত সেখানে ধর্ম্মের সম্পর্ক বিবেচিত হইত, এজন্য অনেক নিরক্ষর লোককেও গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে দেখা যাইত। তদ্ভিন্ন চীনবাসীরা কাব্য সাহিত্যেরও আদর জানিত। অতি প্রাচীনকালে সেখানে সাধারণ পুস্তকাগার বোধ হয় ছিল না, কিন্তু প্রায় প্রত্যেক রাজা ও সমৃদ্ধিশালী লোকেদের নিজস্ব গ্রন্থালয় ছিল। চীনেরাও দেবমন্দিরে পর্ব্বত গুহায় গ্রন্থ রক্ষা করিত। শত্রু ভয়ে তাহারা গুহামুখ পাথর দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিত।

চীনরা শুধু তাহাদের দেশীয় ভাষাতেই যে অনুরাগী ছিল তাহা নহে, তাহারা সাগ্রহে হিন্দুদের সাহিত্য শিক্ষা করিত। সংস্কৃত প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষাতেও ব্যুৎপত্তিলাভের জন্য উৎসুক ছিল। সেখানে লোয়াঙনামক স্থানের বিহারেই এই শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। হান্‌দের রাজত্বকালেই চীনে হিন্দু সাহিত্যের প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এখনও চীন দেশে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় হিন্দুধর্ম্মের যে সকল পুঁথি আছে, সম্ভবতঃ সে সমস্তই হান্ রাজাদের রাজত্বকালে হিন্দুস্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। হিন্দু সাহিত্যের অনুবাদে চীনভাষা যে বিশেষ রূপে সমৃদ্ধ হইয়াছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। দক্ষিণ চীনের রাজধানী "কিয়েন্ রে" নামক স্থানটী তৎকালে হিন্দু সাহিত্যের অনুবাদের একটী কেন্দ্র হইয়াছিল। কথিত আছে ধর্ম্মফল নামক এক হিন্দু হিন্দুস্থান হইতে হান্ রাজত্ব সময়ে কতকগুলি পুঁথি সংগ্রহ করিয়া চীনে লইয়া যান।

চীনে ভারতীয় সাহিত্যের আলোচনা করিলে প্রায় চৌদ্দ শত ভারতীয় গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। অনুবাদকদিগের মধ্যে "চা-চিয়েন্' নামক একজন চৈনিক পণ্ডিতের নাম উল্লেখ পাওয়া যায়। তৎপ্রণীত "অবদান শতক" "মাতঙ্গীসূত্র" "সুখাবতী" বা "অমিতায়ু" নামক পুস্তকগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। কুমারজীব নামক যে আর একজন অনুবাদকের নাম পাওয়া যায় তিনি হিন্দু সন্তান ছিলেন। বংশানুক্রমে রাজমন্ত্রিত্ব করাই তাঁহাদের পেশা ছিল। তিনিই অনুবাদকদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইতেন এবং এখনও চীন দেশে তাঁহার নাম শুনিতে পাওয়া যায়।

অতি পুরাকালের গ্রন্থালয় সমূহের বিস্তৃত ইতিহাস সংগ্রহ করা সহজ নহে। পণ্ডিতেরা এ বিষয় গবেষণা দ্বারা যাহা নির্ণয় করিয়া গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। তাঁহাদের লেখা হইতে জানা যায় যে অতি আদিম যুগ হইতেই গ্রন্থাগারের আদর ছিল। যখন শিক্ষার জন্য সুব্যবস্থিত কোন বিদ্যায়তনের উল্লেখ পাওয়া যায় না, তখন তদানিন্তন কালের উপযোগী গ্রন্থ প্রায় সকল সুসভ্য দেশেই বিদ্যমান ছিল এবং উহাই তখন শিক্ষা বিস্তারের অন্যতম প্রধান পথ ছিল। সুতরাং গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব ও স্থান বিদ্যালয়ের পূর্ব্বে ইহাই প্রতীয়মান হয়।

গ্রন্থের সঙ্গে পাঠক সাধারণের নিবিড় ভাবে পরিচয় ভিন্ন জ্ঞান বিজ্ঞানে মহিমামণ্ডিত হওয়ার অন্য সহজ পথ আর নাই। এই পরিচয় সাধন করিয়া দেওয়াই পুস্তকাগারের প্রধান কাজ। ব্যবসায় জগতে নূতন পণ্য প্রচলনের জন্য যেমন উহার বাজার অর্থাৎ চাহিদা সৃষ্টি করার দরকার হয়, ক্রেতাকে আকৃষ্ট করিবার জন্য কোন কোন পন্থা অবলম্বন

কিশলয়

শ্রীমতী উমা দেবী

তার নাম অমল। কিশোর সে।

তার চোখের দৃষ্টি ব্যেপে বিস্ময়ের ঘোর—সমস্ত চেতনা ঘিরে মোহময় এক আচ্ছন্নতা।

পৃথিবীকে ভাল ক'রে দেখ্‌বার কিংবা বোঝ্‌বার পালা তার শেষ হয়ে যায়নি', শুধু সুরু হয়েছে মাত্র। তাই পারিপার্শ্বিক ঘটনার প্রত্যেকটিকে গভীরভাবে জান্‌বার আগ্রহেরও তার অন্ত নেই।

রূপকথা পড়্‌তে তার ভাল লাগে, কিন্তু তা' স্বীকার কর্‌তে পৌরুষত্বে বাধে যে! চোখ মুদে মাঝে মাঝে শুধু ভাবে, ঐ যে সোনালি মেঘ, সত্যিই কি তার ওপরে ঘুমের দেশের রাজকন্যা নিদ্রামগ্না?···মুদিত আঁখির পাতা খুলে যায় কৌতূহলের আঘাতে, বিস্ফারিত লোচনদ্বয় সুদূরদিগন্তে মেলে দিয়ে সে ভাবে, কই, রাজকন্যা কোথায়?...মনে হয়, রূপকথার রাজপুত্তুর হ'তে পার্‌লে বেশ হ'ত।···রাজকন্যার এক অস্পষ্ট মূর্ত্তি তার চোখের সাম্‌নে ভেসে ওঠে, কিন্তু তার মুখটি সে পরিষ্কার দেখ্‌তে পায় না। দেখা যায় শুধু শ্বেত কমলিকার মত দুটি শুভ্র বাহু, তারই হাতছানির আহ্বান তার সমস্ত মন পাগল ক'রে দেয়। নিজের প্রসারিত বাহুর ওপর মাথাটিকে নুইয়ে দিয়ে আবার সে ভাবে, পক্ষীরাজ ঘোড়া নেই তো!···অবসাদে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্লান্ত হ'য়ে আসে।

রাজকন্যার সাথে সাক্ষাৎ আর অমলের ঘটে না। তাই অদৃশ্য এক রূপবতীর চারদিকে কল্পনার জাল বুনে রঙীন্ ক'রে সে তাকে দেখে। সেই নানা রংএর আভা প্রতিফলিত হয়ে তারও সর্ব্বদেহমনে এসে লাগে।···রাজকন্যার কথা ভাব্‌তে গেলে তার সকল শরীরে জাগে রোমাঞ্চ, অজানা এক উদ্বেগে মুখটি হয়ে উঠে রক্তাক্ত। যদি কোনদিন দৈবক্রমে কোন মেয়ের সাথে সাক্ষাৎ ঘট্‌বার অবসর হয় তা হ'লে তার মুখের দিকে চাইবার কথা ভাব্‌তেও বুক দুরদুর করে। মুখ দিয়ে অমলের কথা সরে না। কোনক্রমে সকলের হাত থেকে নিজকে মুক্ত করে নিয়ে পালিয়ে যায় এককোণে, লোকচক্ষুর অগোচরে। চুপ ক'রে গালে হাত দিয়ে বসে ভাবে, ওঃ, বড্ড বাঁচা গেছে।

* * *

অবশেষে একদিন কোন্ এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে অমলের সাথে দেখা হ'ল রমার। রমার সঙ্কোচবিহীন ব্যবহার অমলের অহেতুকী লজ্জার আবরণ ভেদ করে আসল মানুষটি টেনে বের ক'রে নিল; অমলের সম্পূর্ণ অজান্‌তে।

রমা অমলের চাইতে বড়—বয়সের চেয়েও মনটা ওর এগিয়ে গেছে অনেকখানি। কিন্তু অমল সেকথা কিছুতেই মেনে নিবে না। সে বলে, আমার চাইতে বড় হতে তোমায় দেব না আমি কিছুতেই।

রমার ঠোঁটের কোণে মৃদু কৌতুকের হাসি ফুটে ওঠে। অমলের সব দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ভেসে যায়, মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে সে শুধু ভাবে, বিধাতার কোন্ বরে আমার চাইতে ও হ'ল বড়?

অমলের কাছে রমা এক বিস্ময়।

রমা বাগ্‌দত্তা বধূ। স্বামীর কোন ইঙ্গিত মাত্রেই সে লজ্জারুণ হয়ে ওঠে।···অবাক্ বিস্ময়ে অমল ভাবে, কোথা থেকে এত রং এসে ওর গালে লাগে?···সে চুপ করে রমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে, কোন কূলকিনারা খুঁজে পায় না।

বিয়ের দিন যতই এগিয়ে আসে রমা ততই শান্ত হয়ে পড়ে। তার বাইরের সব চঞ্চলতা যে ভেতর দিকে পথ পেয়েছে!

অমলের বিস্ময়ের মাত্রা আরও বাড়ে। রমার শুষ্ক মুখের

মধ্য থেকে কোন ভাষা সে খুঁজে পায় না। অমল কেমন যেন চাঞ্চল্য অনুভব করে। রমাকে ঠিক নিজেরই মত চঞ্চল ছোট্ট একটি মেয়েতে পরিণত করে নিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু উপায় তো নেই!

রমা ছবি আঁকে, গান গায়, সেতার বাজায়। অমল সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। সুদূর ভবিষ্যতের মাথায় ঘোমটাটানা ছোট্ট একটি রাঙা বৌএর কথা মাঝে মাঝে মনের আশেপাশে উঁকিঝুঁকি মারে। নিজের মনকে ভাল করে তলিয়ে সে ভেবে দেখে। প্রশ্ন করে, বৌ তার কেমন হবে?…রমার মত গান গাইতে জানা চাই, আর ছবি আঁকা, সেতার বাজানো, সে তো জানা চাই-ই।…কিন্তু মুখখানা কল্পনা কর্‌তে গেলেই সব গোলমাল হয়ে আসে। কার মত যে বৌ হবে সে কথা কিছুতেই ঠিক হয় না। হাল ছেড়ে দিয়ে অবশেষে সে বলে, দুর হোক্‌গে ছাই, যেমন হোক্ হবে এখন!

রমাকে যে তার কেমন লাগে সেকথা কিছুতেই কাউকে সে বোঝাতে পারে না।…তার সাথে যখন সে তার খেলা-ধুলোর গল্প করে তখন সে তার বন্ধু। আবার যখন রমার বুকে মাথা দিয়ে সে শোয় তখন তাকে একটু বড় মনে হয় বই কি! আর যখন সে অমলের কোন কাজ করে দেয় তখন তার মনে হয় যে ওকে তার নিতান্তই প্রয়োজন!

দিনকয়েকের জন্যও রমা যদি কোথায়ও গিয়ে থাকে তখন অমল ক্ষুব্ধ হয়—ওকে ছাড়া যে তার কিছুতেই চলে না!

কিন্তু এসব কথা নিয়ে সে মাথা ঘামায় না। মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের বয়স তার হয়নি'—সে শুধু এটুকু বোঝে যে রমাকে সে বড্ড ভালবাসে, ঠিক এরকমটি ক'রে যেন আর কাউকেই সে ভালবাসেনি'।

*
* *

দিনের পর দিন কেটে যায়। আসন্ন বিবাহের চিন্তায় রমা অন্যমনা হয়ে পড়ে। তার সর্ব্বদেহে যেন জোয়ার এসেছে—পুলকেরই জোয়ার বুঝিবা। তার চোখে নেমে এসেছে আবেশের ঘোর।

অমল রমাকে প্রতিদিন নতুন করে আবিষ্কার করে। তার প্রতি কথায় ভাবের তরঙ্গ দেখে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, তার সঙ্গ হয়ে ওঠে তার কাছে অত্যাজ্য।

তারপর একদিন রমার বিয়ের দিন এল।

সেদিন ছিল আষাঢ়ের এক বর্ষণ ভারাক্রান্ত ম্লান সন্ধ্যা। সানাই বাজ্‌ছিল করুণ বেহাগ।…আর কোলাহল মুখরিত বাড়ীর একটি কোণে বধূবেশে সজ্জিতা নতমুখী রমার হয়েছিল সে এক অপরূপ মূর্ত্তি। অমল বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে দেখ্‌ছিল।

শুভক্ষণে শুভলগ্নে রমার বিয়ে হয়ে গেল।

অমলের কেমন যেন লাগ্‌ছিল। ভাল লাগেনি, একথা সে বল্‌তে পারে না, কারণ রমা যে সেদিন বড় সুখী। তবে এ ভাল লাগার মধ্যে কোনখানে যেন একটু ভীরু বেদনা তার বুকটাকে মাঝে মাঝে নাড়া দিচ্ছিল। তার কারণ তার নিজের কাছেই অজ্ঞাত।

রমার বিয়ে হ'ল। তারপর এল তার যাবার পালা।

বিদায়ের দিন উষার আলো কী এক অব্যক্ত বেদনা ব[illegible] এনেছিল কেউ জানে না, কিন্তু তার সেই বেদনা প্রতিবিম্বি[illegible] হয়ে পড়েছিল অমলের মনের ওপর।

ভোরবেলা থেকেই অমলের মন ভারী। কেন মন ভারী হ'ল বার বার তার মনকে প্রশ্ন করেও অমল কো[illegible] সদুত্তর পায়নি'। বোধ করি বা অহেতুকী, কারণ রমা তো একেবারে চলে যাবে না, দু'দিন বাদেই ফিরে আসবে। তবু ব্যথা লাগছিল।

রমা মাঝে মাঝে দু'একবার অমলের মাথায় হাত দিয়ে আদর করতে এসেছিল, কিন্তু কী এক দুর্জ্জয় অভিমানে অমল প্রতিবারই তার হাতখানাকে সরিয়ে দিচ্ছিল। রমার কাছ থেকে কোন রকম সমবেদনা অথবা সহানুভূতি সেদিন হয়ে উঠেছিল তার কাছে অসহ্য।…অথচ তাকে সরিয়ে দি[illegible] সে শান্তি পাচ্ছিলনা। অমলের অন্তরবেদনায় সহানুভূতির যে নিতান্তই প্রয়োজন!

যাবার বেলায় রমা অমলের মুখ চেয়ে কী যেন বল্‌তে চেয়েছিল, কিন্তু তার কণ্ঠ থেকে কোন কথা বেরোয় নি'। অমলের চোখ ছাপিয়ে জল আস্‌ছিল, কিন্তু তার পৌরুষত্বের গর্ব্বহানির দুর্ব্বলতাকে প্রাণপণ বলে দমন করে রমাকে সে হাসিমুখেই বিদায় দিল।

কিন্তু রাতের বেলায় একলা ঘরে অমলের অশ্রুর বন্যা আর বাঁধ মান্‌লনা। মূক নিশীথিনীর বুকে উজার করে দিল সে তার অসহ্য ব্যথার বোঝা। তখন যে তার লজ্জা করবার কারণ ছিল না—নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে নিজের কাছেই যেন সে হারিয়ে গিয়েছিল। রাত্রের রোরুদ্যমান অমলের মধ্যে দিনের বেলাকার অভিমানী অমলকে সত্যিই যেন আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিলনা।

*　　*　　*
*　　*

রমার কথা তার সমস্ত সত্তা অধিকার করে থাকে যে! রমা সুন্দর নয় দেখ্‌তে, কিন্তু তাকে কল্পনা করতে গেলে এ কী অভিনব মূর্ত্তিতে সে এসে অমলের সাম্‌নে দেখা দেয়! অমল মন্ত্রমুগ্ধের মত ধীরে ধীরে উচ্চারণ করে, মণি, আমার মণি!

কিন্তু শেষ কথাটি আর বলা হয় না। তার আগেই অশ্রুর আকুল প্রবাহে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। উপাধানের মধ্যে মুখ গুঁজে অমল তার মনের এ স্থৈর্য্যহীনতার কারণ খোঁজে।

কে সে যার জন্য তার এত ব্যথা?…বিবাহিতা রমা গেছে তার স্বামিগৃহে, নতুন জীবনের উন্মাদনায় ভরপুর। তার সাথে অমলের সম্পর্ক কী? তার মনের মধ্যে অমলের স্থান কোথায়?…নেই, নেই, রমার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই।

কিন্তু কুমারী রমার সাথে ত তার সম্পর্ক ছিল! কিসের সে সম্পর্ক?…স্নেহের? রমার দিক থেকে এতদিন সে নিবিড় স্নেহ পেয়ে এসেছে, কিন্তু কেবল স্নেহ। আর তার প্রতিদানে অমল তাকে কী দিয়েছে?—শ্রদ্ধা, ভক্তি? না, রমাকে সে তো তা' দেয়নি'!

তবে?

অমল আর ভাব্‌তে পারে না, কষ্ট হয়। তার সব চিন্তা সব ভাবনা ছাপিয়ে চোখের সাম্‌নে ভেসে ওঠে একখানা মুখ। সেই মুখখানার কোমলতায় তার সব কষ্টের লাঘব হয়ে যায়, তার চোখের পাতা মুদে আসে। আস্তে আস্তে কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়ে তা সে নিজেই টের পায় না।

কেবল ভোরের আলো ফুট্‌বার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় ঘুমন্ত অমলের ঠোঁটের কোণায় তৃপ্তি-মেশানো মৃদু হাসির রেখা, আর চোখের কোণে বড় বড় দু' ফোঁটা জলের চিহ্ন।

শ্রীউমা দেবী
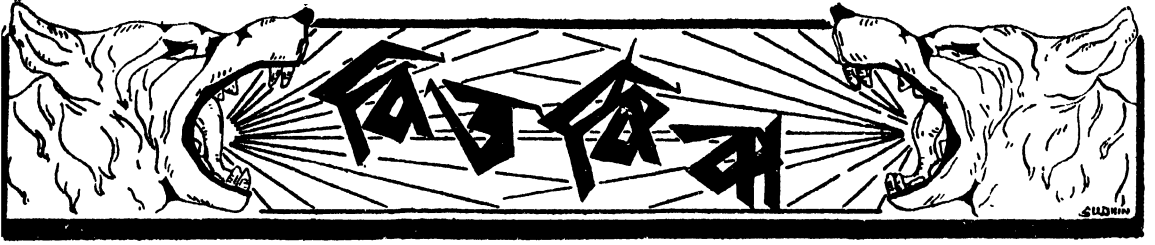
১। ছন্দ-মীমাংসা

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, এম্-এ

আশ্বিন মাসের বিচিত্রায় শ্রীমতী মমতা মিত্র বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দের গঠন সম্বন্ধে আমাকে দুটি প্রশ্ন করেছেন। আমি তাঁর এই প্রশ্ন-দুটি সম্বন্ধে যথাসম্ভব পরিষ্কার ক'রে আমার মতামত জানাচ্ছি। তবে 'বিতর্কিকা'য় বিস্তৃত আলোচনার স্থান নেই, তাই ওবিষয়ে আমার বক্তব্য সংক্ষেপেই প্রকাশ করছি।

তাঁর প্রথম প্রশ্ন এই যে, বাংলা চতুঃস্বরপর্ব্বিক স্বরবৃত্ত ছন্দে স্থলে স্থলে ব্যতিক্রম হিসেবে পাঁচ সিলেব্‌ল্-এর পর্ব্ব চালানো যায় কিনা। তিনি রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা'-র 'অতিথি' নামক কবিতা থেকে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

পায়ে পায়ে | বাজিয়োনাক | মল

এখানে 'বাজিয়োনাক' শব্দে "চার সিলেব্‌ল্ ধরবার কোনো উপায় আছে কিনা" তাই হচ্ছে প্রশ্ন। আমার উত্তর এই যে, উপায় অবশ্যই আছে। বাংলায় অন্তঃস্থ বয়ের উচ্চারণ আছে, কিন্তু তার জন্যে কোনো স্বতন্ত্র অক্ষর নেই। বাংলা বর্ণমালার অন্তঃস্থ ব ও বর্গীয় বয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য রক্ষিত হয় না, অন্তঃস্থ ব-কেও বর্গীয় বয়ের মতোই উচ্চারণ করা হয়। কিন্তু বাংলা ভাষায় অন্তঃস্থ ব-য়ের উচ্চারণ আছে। তাই অন্তঃস্থ ব-য়ের উচ্চারণ প্রকাশ করতে হ'লে দুটি স্বতন্ত্র অক্ষরের সাহায্য নিতে হয়। যথা—ওয়ালা। এখানে ওয়া হচ্ছে অন্তঃস্থ ব। কিন্তু বাংলায় এক অক্ষরের দ্বারা প্রকাশ করবার উপায় নেই ব'লে ও এবং য়া এই দুটি অক্ষরের সাহায্য নিতে হচ্ছে। তাতে সিলেব্‌ল্-সংখ্যা নির্ণয়ের বেলাও আপাতদৃষ্টিতে কিছু সংশয় হয়। ওয়ালা শব্দে দেখ্‌তে তিন সিলেব্‌ল্, কিন্তু শুন্‌তে দুই সিলেব্‌ল্। কেননা ওয়া-তে এক সিলেব্‌ল্-এর বেশি নেই। এ শব্দটাকে ইংরেজি হরফে রূপান্তরিত করলেই তার আসল রূপটি ধরা পড়বে। ওয়ালা-তে তিন সিলেব্‌ল্ কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ হবার সম্ভাবনা থাকলেও wala-তে যে দুই সিলেব্‌ল্ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না। তাই হাওয়া (hawa), নাওয়া (nawa) প্রভৃতি শব্দেও দুই সিলেব্‌ল্। সে জন্যেই—

ফেরিওয়ালার | ডাক শোনা যায় | গলির ওপার | থেকে

—রবীন্দ্রনাথ, পরিশেষ, বালক

এখানে প্রথম পর্ব্বে চার সিলেব্‌ল্‌ই গণনা করতে হবে।

বাংলা ছন্দের আলোচনায় অন্তঃস্থ য়য়ের স্বরূপ সম্বন্ধেও সচেতন থাকা প্রয়োজন। ইংরেজি w যেমন অন্তঃস্থ ব, ইংরেজি yও তেমনি অন্তঃস্থ য়। লক্ষ করলে দেখা যাবে বাংলা অন্তঃস্থ য বা য় উচ্চারণে বহুরূপী। বহুস্থলেই অন্তঃস্থ য়য়ের উচ্চারণ বর্গীয় জয়ের উচ্চারণ থেকে সম্পূর্ণ অভিন্ন (যথা—যদি, যখন ইত্যাদি), একথা সর্ব্বজনবিদিত। অনেক স্থলে এ বর্ণ টি সংস্কৃত অন্তঃস্থ য বা ইংরেজি y-এর মতোই উচ্চারিত হয়, যথা—বায়ু, ময়ূর, হায়, পায় ইত্যাদি; আর এইটেই হচ্ছে অন্তঃস্থ যয়ের ব্যাকরণ সঙ্গত খাঁটি উচ্চারণ। তা-ছাড়া, বাংলায় এক রকম রং-চোরা অন্তঃস্থ য়য়ের ব্যবহার দেখা যায়, তাকে নিয়েই যত গোলমাল। এই অন্তঃস্থ য়-টি বাংলা অন্তঃস্থ বয়ের মতোই দুটি অক্ষরের মধ্যে আত্মগোপন ক'রে থাকে। পূর্ব্বে দেখেছি বাংলায় অনেক সময় ওয়া এই দুটি অক্ষরের সাহায্যে অন্তঃস্থ বয়ের উচ্চারণ প্রকাশ

করা হ'য়ে থাকে। কিন্তু ওয়া ছাড়া উয়া, উয়ে, ওয়ে প্রভৃতিও অন্তঃস্থ বয়ের উচ্চারণ প্রকাশ ক'রে থাকে। যথা—

(১) গেরুয়া যাহার | ব্যক্ত হ'ল | রক্ত চেলীর | ভিতর থেকে
—সত্যেন্দ্রনাথ, অভ্র-আবীর, ঊর্দ্ধবাহুর প্রেম

(২) ধুলোয় ফেলিস। মহুয়া-ফুলের। ভর্ত্তি পিয়া- | লা
—ঐ, বিদায় আরতি, মধুমাধবী

(৩) পাটোয়ারী-গোছ | বুদ্ধি যাদের | দাও উঠিয়ে |
তাদের পাট —ঐ, অভ্র-আবীর, মৃত্যু-স্বয়ম্বর

(৪) ব্রিটন দেছে | ক্রমোয়েল আর | ভারত জাম- |
দগ্ন্য রাম —ঐ, বিদায়-আরতি, দাবীর চিঠি

(৫) ঢেউয়ের পরে | ঢেউ চলেছে, | শুধু ঢেউয়ের | মেলা
—ঐ, অভ্র-আবীর, পুরীর চিঠি

(৬) ক্ষুব্ধ ঢেউই | লাঙল তব | মুষলধারী | হে ক্ষত্রিয়
—ঐ, ঐ, সমুদ্রাষ্টক

আর দৃষ্টান্ত বাড়াবার প্রয়োজন নেই। উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিতে গেরুয়া, মহুয়া, পাটোয়ারী, ক্রমোয়েল, ঢেউয়ের, ঢেউই প্রভৃতি শব্দের রং-চোরা অন্তঃস্থ ব-কে চিনে নিতে পারলেই দেখা যাবে কোনো পর্ব্বেই পাঁচ সিলেব্‌ল্ নেই, সর্ব্বত্রই চার সিলেব্‌ল্। এ শব্দগুলিকে (বিশেষত' ক্রমোয়েল শব্দটিকে) w-র সাহায্যে ইংরেজিতে রূপান্তরিত করলেই এদের স্বরূপ আত্মপ্রকাশ করবে।

বাংলায় অন্তঃস্থ ব-কে যেমন উয়া, উয়ে, ওয়া, ওয়ে প্রভৃতি নানাভাবে প্রকাশ করা যায়, অন্তঃস্থ য়-কেও তেমনি ইয়া, ইয়ে, ইয়ো, এয়া প্রভৃতি নানা উপায়ে প্রকাশ করা হ'য়ে থাকে। আসল কথা এই যে, বাংলায় অন্তঃস্থ ব্-য়ের মূলরূপকে প্রকাশ করা হয় উয়্ এবং ওয়্-এর দ্বারা, আর অন্তঃস্থ য়্-কেও তেমনি অনেক সময় ইয়্ এবং এয়্-এর দ্বারা প্রকাশ করা হ'য়ে থাকে। দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টা স্পষ্ট হবে। যথা—

(১) পাপিয়া মাতাল | মনের ভুলে | বকছে অনর্- | গল
—সত্যেন্দ্রনাথ, বিদায়-আরতি, একটি চামেলীর প্রতি

(২) ছুটল প্রজা | করতে নালিশ | ছুটল গুলি।
ফরিয়াদীদের | পরে
—ঐ, বেলা শেষের গান, ফরিয়াদ

(৩) নিজের জ্ঞানের | দীপটি দিয়ে | কতই প্রাণের | সুপ্ত দীপ
জ্বালিয়েছে সে | জাগিয়েছে গো | পরিচয় দেছে |
তারার টিপ। —ঐ, অভ্র-আবীর, আলোর তোড়া

(৪) দয়া ক'রে | করতে দয়া | পাঠিয়ো না আর |
ডাম্বার ওড়া- | য়ারে —ঐ, বেলা শেষের গান, ফরিয়াদ

(৫) বকেয়া হিসাব | চুকিয়ে দেরে | বছর-শেষের |
শেষ দিনেতে —ঐ, ঐ, আখেরী

(৬) আলেয়াগুলো | দপ্‌দপিয়ে | জ্বল্‌ছে নিবে | নিব্‌ছে
জ্বলে — ঐ, বিদায়-আরতি, দূরের পাল্লা

এরকম আরও বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আর প্রয়োজন নেই। এই দৃষ্টান্তগুলিতে পাপিয়া, ফরিয়াদী, জ্বালিয়েছে, পরিয়ে, পাঠিয়ো, বকেয়া, আলেয়া প্রভৃতি শব্দের ইয়্ এবং এয়্, হচ্ছে আসলে অন্তঃস্থ য়্ অর্থাৎ y। ইয়া, ইয়ে, ইয়ো, এয়া প্রভৃতির ভিতরে এক সিলেব্‌ল্-আত্মক অন্তঃস্থ য়টি আত্মগোপন ক'রে রয়েছে। এই রহস্যটুকু ধরতে পারলেই বোঝা যাবে এ দৃষ্টান্তগুলিতে কোথাও পাঁচ সিলেব্‌ল্ নেই, সর্ব্বত্রই চার সিলেব্‌ল্। সুতরাং "পায়ে পায়ে | বাজিয়ো নাক | মল" এই পংক্তির 'বাজিয়ো' শব্দে কেন তিন সিলেব্‌ল্ না ধ'রে দুই সিলেব্‌ল্ ধরতে হবে, আশা করি এতক্ষণে সে কথা বোঝাতে পেরেছি। লক্ষ্য করার বিষয় উপরের চতুর্থ দৃষ্টান্তের 'পাঠিয়ো' শব্দেও 'বাজিয়ো' শব্দের ন্যায় দুই সিলেব্‌লই ধরা হয়েছে। 'বাজিয়ো-'র আসল উচ্চারণরূপ হচ্ছে বাজ্‌য়ো বা Baj-yo। সুতরাং এ শব্দটিতে কেন দুই সিলেব্‌ল্ গণনা করতে হবে তা অতি সুস্পষ্ট।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে, উয়্ এবং ওয়্-মূলক ধ্বনিকে যে সর্ব্বদাই একস্বরাত্মক অন্তঃস্থ ব-এর সামিল ব'লে গণ্য করতে হবে তা নয়। উয়্ এবং ওয়্-মূলক ধ্বনিগুলির দুটি রূপ আছে। এক তার দ্রুতোচ্চারিত সংশ্লিষ্ট রূপ আর তার বিলম্বিত উচ্চারণের বিশ্লিষ্ট রূপ। দ্রুতোচ্চারিত সংশ্লিষ্ট রূপে উক্ত ধ্বনিগুলি একস্বরাত্মক অন্তঃস্থ বয়ের মর্য্যাদা পায়, আর বিশ্লিষ্ট রূপে ওগুলি দুই সিলেব্‌ল্ ব'লেই গণ্য হয়। যথা—

পরোয়ানা ভাই | পেইছি যখন | কুছ্ পরোয়া | নেই
—সত্যেন্দ্রনাথ, বেলা শেষের গান, বাঙালী পল্টন

এখানে প্রথম ওয়া-টির উচ্চারণ দ্রুত ও সংশ্লিষ্ট, তাই এটি এক সিলেব্‌ল্‌-এর বেশি মূল্য পায়নি। কিন্তু দ্বিতীয় ওয়া-টির উচ্চারণ বিলম্বিত ও বিশ্লিষ্ট, তাই তার ধ্বনি মূল্যও দুই সিলেব্‌ল্‌।

ইয়্‌ এবং এয়্‌-মূলক ধ্বনিগুলিরও তেমনি দুই রূপ। দ্রুত ও সংশ্লিষ্ট রূপে এগুলি একস্বরাত্মক অন্তঃস্থ য়-য়ের সমতুল্য। কিন্তু বিলম্বিত ও বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে এগুলি দ্বিস্বরাত্মক ব'লেই গণ্য হয়। উপরের ষষ্ঠ দৃষ্টান্তের আলেয়া শব্দে এয়া র দ্রুত ও সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ, তাই এটি একস্বরাত্মক। কিন্তু,

শিবানী তুই | তুই করালী | আলেয়া তোর | খর্পরে

—সত্যেন্দ্রনাথ, অভ্র-আবীর, গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি

এখানে আলেয়া শব্দে এয়া-র বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ; তাই এটি দ্বিস্বরাত্মক। উপরের ষষ্ঠ দৃষ্টান্তে দপ্‌দপিয়ে শব্দের 'ইয়ে'ও বিশ্লিষ্ট ও দ্বিস্বরাত্মক।

সাধারণতঃ দেখা যায়, ইয় বা এয়-মূলক ধ্বনি পর্ব্বমধ্যে স্থাপিত হ'লে একস্বর এবং পর্ব্বান্তে স্থাপিত হ'লে দ্বিস্বর ব'লে গণ্য হয়। কিন্তু এই সাধারণ রীতিরও ব্যতিক্রম দেখা যায়। যথা—

বালিশতলে | বইটি চাপা | টানিয়া লয় | তারে

—রবীন্দ্রনাথ, ক্ষণিকা, যথাস্থান

এখানে ইয়া পর্ব্ব মধ্যবর্ত্তী হওয়া সত্ত্বেও দ্বিস্বরাত্মক। উপরের দৃষ্টান্তে 'আলেয়া তোর' পর্ব্বে এয়া-ও পর্ব্ব মধ্যবর্ত্তী অথচ দ্বিস্বরাত্মক। ইয়্‌-মূলক ধ্বনি পর্ব্বান্তস্থিত হ'য়েও কখনও কখনও একস্বরাত্মক হয়, এবার তারই দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

(১) লুকিয়ে লুকিয়ে'। আমি
মেয়ের মায়ের | স্বামী—
লুকিয়ে আমি | কবি
তুলে নিলাম | ছবি।

—দ্বিজেন্দ্রলাল, আলেখ্য, তৃতীয় চিত্র

(২) হঠাৎ ধরা | হঠাৎ 'ছড়িয়ে' | ফেলা

—রবীন্দ্রনাথ, পরিশেষ, অবুঝ মন

(৩) লুকিয়ে লুকিয়ে | কী যে লেখে | হয়তো বা সে | কবি

—ঐ, ঐ, স্পাই

এখানে লুকিয়ে ছড়িয়ে এবং লুকিয়ে শব্দে ইয়-মূলক ধ্বনি পর্ব্বান্তস্থিত হওয়া সত্ত্বেও একাস্বরাত্মক হয়েছে অর্থাৎ এক সিলেব্‌ল্‌ মর্য্যাদা পেয়েছে। মনে রাখা প্রয়োজন বাংলা কাব্যসাহিত্যে এরকম দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। যাহোক, এ বিষয়ে মূল নিয়মটি হচ্ছে এই যে উয়, ওয়, ইয় বা এয়-মূলক ধ্বনি পর্ব্বমধ্যবর্ত্তীই হোক বা পর্ব্বান্তস্থিতই হোক যখনই তার উচ্চারণ দ্রুত ও সংশ্লিষ্ট হবে তখনই সেটি এক সিলেবল্‌ বলে গণ্য হবে; কিন্তু উচ্চারণ বিলম্বিত বা বিশ্লিষ্ট হলে উক্তপ্রকার ধ্বনি সর্ব্বত্রই দুই সিলেবল্‌-এর মর্য্যাদা পায়।

শব্দের তথা পর্ব্বের আদিস্থিত ইয়্‌, এয়্‌, উয়্‌, এবং ওয় মূলক ধ্বনির (যথা নিয়ে, দিয়ে, খেয়া, নুয়ে, ছোঁয়া ইত্যাদি) ছন্দোগত মূল্য সম্বন্ধেও একটি কথা বলা দরকার। পর্ব্বাদিস্থিত উক্ত প্রকার ধ্বনি সর্ব্বদাই দুই সিলেবল্‌ বলে গণ্য হয়ে থাকে। তার একটু কারণও আছে। সেটি হচ্ছে এই। স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রত্যেক পর্ব্বের প্রথম স্বরটির উপর একটি করে এক্‌সেণ্ট বা ঝোঁক থাকে। প্রথম ধ্বনিটির উপর ঝোঁক থাকাতে তৎপরবর্ত্তী ধ্বনিগুলি সঙ্কুচিত বা সংশ্লিষ্ট হবার অবকাশ পায়। কিন্তু স্পষ্ট একসেণ্ট-ওয়ালা প্রথম স্বরটির সঙ্কুচিত হবার কিছুমাত্র অবকাশ থাকে না। তাই, ছিনিয়ে শব্দ সঙ্কুচিত হয়ে দ্বিস্বরাত্মক হতে পারে অর্থাৎ ছিন্‌য়ে রূপ ধারণ করতে পারে। কিন্তু নিয়ে শব্দের ইকারের উপর ঝোঁক থাকাতে ইকারের স্পষ্ট উচ্চারণ হয়, সুতরাং নিয়ে শব্দ সঙ্কুচিত হয়ে ন্‌য়ে রূপ ধারণ করতে পারে না। অর্থাৎ নিয়ে এবং তজ্জাতীয় শব্দ সাধারণতঃ দ্বিস্বরাত্মকই থাকে একস্বর হয় না। তবে 'নিয়ে' শব্দ যদি পর্ব্বের প্রথমে স্থাপিত না হয়ে পর্ব্বের মধ্যে স্থাপিত হয় তাহলে এ শব্দটির পক্ষে একস্বরাত্মক হওয়া অসম্ভব নয়। যথা—

ছিপ্‌ নিয়ে গেল | কোলা ব্যাঙে | মাছ নিয়ে গেল | চিলে

এখানে নিয়ে শব্দ একস্বরাত্মক এবং তার আসল রূপ হচ্ছে ন্‌য়ে। কিন্তু এরকম প্রয়োগ সাধারণত' ছড়াতেই দেখা যায়, কাব্যসাহিত্যে দেখা যায় না।

শ্রীমতী মমতাদেবী 'ক্ষণিকা'-র "যাত্রী" কবিতা থেকে আরেকটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। যথা—

এলে যদি | তুমিও এস | যাত্রী আছে | নানা

এখানে দ্বিতীয় পর্বে পাঁচ সিলেব্‌ল্ 'দেখা' যাচ্ছে। সুতরাং চতুঃস্বর স্বরবৃত্তে পাঁচ সিলেব্‌ল্-এর পর্ব চালানো যায় কি না, এইটেই প্রশ্ন। আমার উত্তর, চালানো যায় না এবং উপরের দৃষ্টান্তের দ্বিতীয় পর্বেও পাঁচ সিলেব্‌ল্ নেই —আছে চার সিলেব্‌ল্। কেমন ক'রে চার সিলেব্‌ল্ শুন্‌ছি তা স্পষ্ট ক'রে বলা দরকার। মমতা দেবী নিজেই বলেছেন দিও, নিও প্রভৃতি শব্দকে দিয়ো, নিয়ো রূপেও লেখা যায়। অর্থাৎ দিও, নিও এবং দিয়ো, নিয়ো-র মধ্যে উচ্চারণগত পার্থক্য নেই। তেমনি করিও, বাজিও, পাঠিও এবং করিয়ো, বাজিয়ো, পাঠিয়ো উচ্চারণে অভিন্ন। কেন এমন হয়? ভারতবর্ষের প্রাকৃত ভাষাগুলির তথা বাংলা ভাষার একটি সাধারণ নিয়ম এই যে, কোনো শব্দে বা শব্দগুচ্ছে যদি দু'টি স্পষ্টোচ্চারিত স্বর পর-পর থাকে তবে ঐ দু'টি স্বরবর্ণের মধ্যে একটি অন্তঃস্থ য়-য়ের ধ্বনি এসে পড়ে। এই অন্তঃস্থ য়-য়ের ধ্বনিকেই বলা হয় "য়-শ্রুতি"। গত আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন (পৃঃ ৩০৮-৯)। এস্থলে য়-শ্রুতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। আমাদের শুধু এটুকু বল্‌লেই যথেষ্ট হবে যে,—ওই আগন্তুক য়-ধ্বনিকে বাংলায় আমরা কখনও স্পষ্ট ক'রে লিখে প্রকাশ করি (যথা—দিয়ো, বাজিয়ো), আবার কখনও ঐ য়-ধ্বনি লেখায় প্রকাশিত হয়না শ্রুতিতেই থেকে যায় (যথা— দিও, আজিও, যদিও)। স্পষ্ট প্রকাশিত না হ'লেও ঐ য়-ধ্বনি যে থেকে যায় তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। দুয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলেই এবিষয়ে আর কোনো সন্দেহ থাক্‌বে না।

(১) জয়মাল্য বিরচিয়া রেখে গেলে গানের পাথেয়
বহ্নিতেজে পূর্ণ করি; অনাগত যুগের সাথেও, ইত্যাদি।
—রবীন্দ্রনাথ, পূরবী, সত্যেন্দ্রনাথ

(২) গানের সাজি এনেছি আজি
ঢাকাটি তার লওগো খুলে
দেখো তো চেয়ে কী আছে।
যেখানে মনে স্বপন-বনে
ছায়ার দেশে ভাবের কূলে
সে বুঝি কিছু দিয়াছে।
—ঐ, ঐ, গানের সাজি

পাথেয় এবং সাথেও, কী আছে এবং দিয়াছে, এই শব্দগুলির উচ্চারণ-সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য করলে অনায়াসেই বোঝা যাবে বাংলায় য়-শ্রুতির প্রভাব কত গভীর। তাই দিও কে দিয়ো, করিও-কে করিয়ো, বাজিও-কে বাজিয়ো লিখ্‌লেই বাংলা ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতিকে স্বীকার করা হয়। তেম্‌নি আজিও, তুমিও, যদিও প্রভৃতি শব্দে য়-ধ্বনির স্পষ্ট প্রকাশ না থাক্‌লেও এ শব্দগুলির আসল ধ্বনিরূপ হচ্ছে আজিয়ো, তুমিয়ো, যদিয়ো ইত্যাদি। এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

আর আজিও, তুমিও প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণগত আসল ধ্বনিরূপ আজিয়ো, তুমিয়ো—এ কথা স্বীকার করলেই এদের সিলেব্‌ল্-গত মূল্য নির্ণয় করাও সহজ হ'য়ে আসে। আমরা দেখেছি ইয়-মূলক ধ্বনি স্থল বিশেষে একস্বরাত্মক হ'য়ে থাকে। অতএব আজিও, তুমিও প্রভৃতি শব্দ যেহেতু আসলে আজিয়ো, তুমিয়ো, সেইজন্যেই এ শব্দগুলিকে স্থল-বিশেষে অনায়াসেই দ্বিস্বরাত্মক অর্থাৎ দুই সিলেব্‌ল্ ব'লে গণ্য করা যায়। ইয়ে, ইয়ো প্রভৃতির ন্যায় ইও-কেও একস্বর বা এক সিলেব্‌ল্ ব'লে গণ্য করার দৃষ্টান্ত বাংলা কাব্যসাহিত্যে প্রচুর আছে। যথা—

(১) তোমার মাপে | হয়নি সবাই | তুমিও হওনি |
সবার মাপে।
—রবীন্দ্রনাথ, ক্ষণিকা, বোঝাপড়া

(২) আপনি নাকি | বাঁশী বাজান | আমিও বাজাই | ভেঁপু।
—সত্যেন্দ্রনাথ, বেলা শেষের গান, কবিজুবিলি

(৩) এর তুলনায় | 'ওগো' আমার | খাসা,
যদিও, মানি | একটু ঈষৎ | মাঠো।
—ঐ, কুহু ও কেকা, "ওগো"

এখানে তুমিও, আমিও, যদিও প্রভৃতি শব্দে বাজিয়ো, পাঠিয়ো প্রভৃতি শব্দের ন্যায় দুই সিলেব্‌লই গণনা কর্‌তে হবে।

ইও-তে অন্তঃস্থ য়-ধ্বনির সাক্ষাৎ পাই ব'লেই তাকে সঙ্কুচিত বা সংশ্লিষ্ট ক'রে এক সিলেব্‌ল্ ধরা যায়। তেমনি উও-তেও পাই অন্তঃস্থ ব-ধ্বনির সাক্ষাৎ এবং সেজন্যে উও-কেও বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দে এক সিলেব্‌ল্ ব'লে গণ্য করা সম্ভব। যথা—

(১) তবুও কেন | ভরল না মন, | হায় তৃষিত | চায় কারে ?

—সত্যেন্দ্রনাথ, অভ্র-আবীর, কবর-ই-নূরজাহান্

(২) গর্ভ হ'তে | মুক্ত শিশু | তবুও যেন | মায়ের বক্ষে | কোলে

বন্দী থাকে | নিবিড় প্রেমের | বাঁধন দিয়ে।

—রবীন্দ্রনাথ, পূরবী,

এখানে তবুও-র আসল রূপ হচ্ছে তবুয়ো। আর উয়্-মূলক ধ্বনি হচ্ছে অন্তঃস্থ বয়ের সামিল, তা আমরা পূর্ব্বেই দেখেছি। আর, এরকম ধ্বনি যে স্থলবিশেষে দ্রুত উচ্চারণ হেতু সঙ্কুচিত বা সংশ্লিষ্ট হ'য়ে একস্বরাত্মক হ'তে পারে তাও পূর্ব্বেই আলোচনা করেছি। গেরুয়া, মহুয়া যে ভাবে দ্বিস্বরাত্মক হ'তে পারে ঠিক সে ভাবেই এস্থলেও 'তবুও' শব্দকে দ্বিস্বরাত্মক ব'লে গণ্য করতে হবে।

'বাজিয়োনাক,' 'তুমিও এস' প্রভৃতি পর্ব্বে কেন পাঁচ সিলেব্‌ল্ না ধ'রে চার সিলেব্‌ল্ই ধরতে হবে, আশা করি সে কথা আমি এতক্ষণে স্পষ্ট বোঝাতে পেরেছি। কিছুকাল পূর্ব্বে বিচিত্রার বিতর্কিকায় (১৩৪০, কার্ত্তিক, পৃঃ, ৫১৫) শ্রীযুক্ত বিভাস নাগও বলেছিলেন যে, স্বরবৃত্ত ছন্দে পাঁচ স্বরের পর্ব্ব সহজেই চলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বাজিয়োনাকো, লুকিয়েছি মা, পালিয়ে গেছে প্রভৃতি পর্ব্বের উল্লেখ করেছিলেন। আশা করি এ আলোচনায় তাঁর প্রশ্নেরও উত্তর দেওয়া হয়েছে। ইয়্, এয়্, উয়্, ওয়্-মূলক ধ্বনি অর্থাৎ অন্তঃস্থ য় এবং অন্তঃস্থ ব-ধ্বনিকে ছেড়ে দিলে দেখা যাবে স্বরবৃত্ত ছন্দ কিছুতেই পাঁচ সিলেব্‌ল্-এর পর্ব্বকে সহ্য করে না। আর ইয়ে, ওয়া প্রভৃতিও যে মূলত' একস্বরাত্মক তা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। আমি তো আধুনিক কাব্যসাহিত্যে স্বরবৃত্ত ছন্দে একটিও খাঁটি পাঁচ স্বরের পর্ব্ব দেখিনি। শ্রীযুক্ত বিভাসবাবু দেখাতে পারেন কি ? তা-ছাড়া বাজিয়োনাকো, পালিয়ে গেছে পর্ব্বে তিনি মাত্রা-বৃত্তের মন্থরতাই বেশি লক্ষ্য করেন। এবিষয়ে কিন্তু আমি তাঁর সঙ্গে একমত হ'তে পারিনে। আমার কানে বাজিয়োনাক, পালিয়ে গেছে প্রভৃতি পর্ব্বের দ্রুতগতিটা অত্যন্ত স্পষ্ট, মন্থরতার আভাস মাত্রও পাইনে। আর, 'পালিয়ে গেছে' এই পর্ব্বটির আসল রূপ হচ্ছে পাল্‌য়ে গেছে। তাই আমার মতে এই পর্ব্বটির গোড়াতেই একটি যুগ্মধ্বনি রয়েছে, আর এই আদিস্থিতি যুগ্মধ্বনিটি স্বরবৃত্তের প্রকৃতিকে স্পষ্ট ফুটিয়ে তুলছে। দৃষ্টান্ত—

লাজুক তারা | তাই কি সবে | পালিয়ে গেছে | দিগ্বিদিক্

—কান্তি ঘোষ, ওমর খৈয়াম

এখানে তৃতীয় পর্ব্বের পা-ধ্বনিটির উপর একটি স্পষ্ট ঝোঁক রয়েছে। তার হেতু পালিয়ে শব্দটি এখানে আসলে হচ্ছে পাল্‌য়ে। 'পালিয়ে গেছে' না লিখে যদি লেখা যায় 'গেছে পালিয়ে' তাহ'লেই ছন্দের শৈথিল্য স্পষ্ট ধরা পড়বে। একথা বোধ করি বিভাসবাবু স্বীকার করবেন। অথচ তাঁর হিসাবে 'পালিয়ে গেছে' এবং 'গেছে পালিয়ে' দুই পর্ব্বেই পাঁচ সিলেব্‌ল্। তাই যদি সত্য হয় তাহ'লে স্বরবৃত্ত ছন্দে এ দুই পর্ব্বের ধ্বনিগত এত পার্থক্য কানে স্পষ্ট লক্ষিত হয় কেন ? বিভাসবাবু এ পার্থক্যের কি কৈফিয়ৎ দিবেন ?

মমতা দেবীর প্রথম প্রশ্নের উত্তরটাই যথেষ্ট দীর্ঘ হ'য়ে গেল। অথচ বিতর্কিকায় দীর্ঘ আলোচনার স্থানাভাব। তাই এখানেই নিরস্ত হচ্ছি। তাঁর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর বারান্তরে দেবার ইচ্ছে রইল। তবে এ স্থলে শুধু এটুকু ব'লে রাখ্‌ছি যে, চতুঃস্বর স্বরবৃত্ত ছন্দে ত্রিস্বর পর্ব্বও যে চালানো যায় এ বিষয়ে বহু পূর্ব্বেই (প্রবাসী—১৩২৯, মাঘ, পৃঃ ৪৯৯-৫০০ দ্রষ্টব্য) আমার মতামত সংক্ষেপে ব্যক্ত করেছি এবং দিলীপকুমারের সঙ্গেও এ বিষয়ে আমার অনেক আলোচনা হয়েছে। চতুঃস্বর ছন্দে ত্রিস্বর পর্ব্ব প্রয়োগের নিয়ম কি, এ বিষয়ে এবার আলোচনা করব না। আরও বলা দরকার যে, চতুঃস্বর ছন্দে দ্বিস্বর পর্ব্ব প্রয়োগেরও বহু দৃষ্টান্ত আছে। যথা—

(১) আকাশতলে | দলে দলে | মেঘ যে ডেকে | যায়,

আয় আয় | আয়,

জামের বনে | আমের বনে | রব উঠেছে | তাই,
যাই যাই | যাই ।
—রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান (৩য় খণ্ড), পৃঃ ৭০১

(২) বলে "নীল অতলের | কোলে
সুদূর অস্তাচলের | মূলে
বেলা যায় যায় | যায় ।"
—ঐ, প্রবাহিনী (ঋতুচক্র), নং ৮০

(৩) সে কহিল | ভাই
নাই নাই | নাই গো আমার ।
কিছুতে কাজ | নাই ।
—ঐ, ক্ষণিকা, কূলে

(৪) সারিয়ে দেবে | বলেছিলে | দাও এঁটে ইস্ | ক্রুপ্ ।
আমি বল্লে | কানে কানে | চুপ্ চুপ্ | চুপ্ ।
—ঐ, পরিশেষ, নূতন শ্রোতা

আর দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। আশা করি এর থেকেই বোঝা যাবে যে, চতুঃস্বর ছন্দে শুধু ত্রিস্বর নয়, দ্বিস্বর পর্ব্বও চলে। এ বিষয়ে আরও আলোচনা করা বাঞ্ছনীয়। বারান্তরে তা করবার ইচ্ছে রইল।

আমরা দেখলাম স্বরবৃত্ত ছন্দে কখনও দুই সিলেব্ল্-এর দ্বারা চার সিলেব্ল্-এর কাজ চালানো যায়। ইংরেজি ছন্দেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত আছে। যথা—

(১) Break' | break' | break'—Tennyson,

(২) Hark', | hark', | this hor' | rid sound'
—Dryden

এ দৃষ্টান্ত দুটীতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে অবস্থা বিশেষে ইংরেজিতেও বাংলার ন্যায় এক সিলেব্ল্-এর দ্বারা দুই সিলেব্ল্-এর কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়।

বিচিত্রার পাঠক পাঠিকারা এ আলোচনায় যোগ দিলে বাংলা ছন্দের তত্ত্ব নির্ণয়ে খুবই সহায়তা হবে ব'লে আশা করি।

২। বাঙ্গালা ভাষার বানান্ সমস্যা

শ্রীশম্ভুচন্দ্র চৌধুরী

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়,

আপনার মাসিকে গত পৌষসংখ্যায় বাঙ্গলা ভাষার বানান্-সমস্যা সম্বন্ধে যে বিতর্কিকার সৃষ্টি করা হইয়াছে সেই সম্পর্কে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি।

শব্দের উচ্চারণ ও বানানতত্ত্ব ভাষাতত্ত্বের বিষয়ীভূত একটী জটিল সমস্যা। পৃথিবীর ভাষাতাত্ত্বিকগণ এ বিষয়ে গবেষণা করিয়াছেন এবং করিতেছেন। উচ্চারণতত্ত্বের সহিত বানানসমস্যার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। যেমন মানুষের প্রতিকৃতি আলোকচিত্রে অনেকাংশে বন্দী করা যায় সেইরূপ বানানের মধ্যেও শব্দের ধ্বনি বা উচ্চারণকে ধরিয়া রাখা যায়। ধ্বনিই অক্ষরের প্রাণ—এবং বিভিন্ন ধ্বনির অর্থযুক্ত সমন্বয়ই ভাষা। এই ধ্বনিপ্রাণ ভাষার রেখাচিত্রকেই বানান বলা যাইতে পারে। মানবের মন এই ধ্বনির সমাবেশকে প্রধানতঃ নিয়ন্ত্রিত করে। কাজেই ভাষার ধ্বনিবিজ্ঞান ভাষাভাষীর মনোবিজ্ঞানের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে সম্পৃক্ত। এই মনোবিজ্ঞান অত্যন্ত জটিল। সুতরাং ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব তথা বানানসমস্যা যে আরও জটিল হইবে তাহাতে বিস্ময়কর কিছুই নাই।

"বাঙ্গালা ভাষা তৃণাদপি সুনীচ এবং তরোরিব সহিষ্ণু জাতির ভাষা"। কাজেই এখানে যথেচ্ছাচারিতা কিছু বেশী হইবেই ত।

কোনও শব্দের বানান সমস্যা সম্পর্কে কোনও কথা উঠিলেই সর্ব্বপ্রথমে সেই শব্দটীর উৎপত্তি এবং ক্রমবিবর্ত্তনের ইতিহাস আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে সমস্যার নিরাকরণের পন্থা কোন্ দিকে? একটি বিশিষ্ট পদ লইয়া আলোচনা আরম্ভ করা যাউক। 'নোতুন' শব্দটী 'নোতুন' 'নতুন' জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে। এই গৃহবিবাদের সুযোগে 'নূতন' কিছু বেশী দাবী করিয়াছে। 'নূতনে'র প্রচারাধিক্যের

হেতু বঙ্গভাষাভাষীর অনেকে মনে করিয়াছেন 'নোতুন' 'নতুন' 'নূতনের'ই অপভ্রংশ। কাজেই যত অনাসৃষ্টি! কিন্তু সমস্যার গোড়ায় চলুন, দেখিবেন সব পরিষ্কার। নোতুন বা নতুন শব্দটীর প্রাচীনরূপ 'নৌতুন' এবং যেমন সুপ্রাচীন বটবৃক্ষ মস্তকে জটিল জটাভার লইয়া যুগযুগান্ত দণ্ডায়মান থাকে ঠিক সেইরূপ 'নোতুন' ঔ-কার মস্তকে বহন করিয়া আজিও হিন্দীতে সকলের নিকট সুপরিচিত আছে। আধুনিক চলিত ভাষায় 'নৌতুন' তাহার ঔ-কার-ভার নামাইয়া রাখিয়া 'নোতুন' বা নতুনরূপে নবজীবন লাভ করিয়াছে। "নূতন" ত খাঁটী সংস্কৃত। নোতুন বা নতুনের সহিত তাহার কোনও রক্তসম্পর্ক নাই। কাজেই স্পষ্ট বোঝা গেল যে নতুনকে অস্বীকার করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। "নোতুন"ই পুরাতন নোতুন। কাজেই তাহাকেই আমরা মান্য করিব। ভাষাতত্ত্বের সূত্রসম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানের অভাবের জন্য এইরূপ শব্দের বানানে [গোরু, গরু ; মোতি মতি] গোলযোগের ভূমি পত্তন হয়। ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাষাতাত্ত্বিক বাঙ্গালা ভাষাবিজ্ঞানের একনিষ্ঠসাধক অধ্যাপক সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"বাঙ্গালা উচ্চারণের একটী বিশিষ্ট নিয়ম এই যে পরবর্ত্তী অক্ষরে 'ই' 'উ' 'বা' 'য' ফলা থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী অক্ষরের উচ্চারণ ও হইয়া যায়। ভাষাতত্ত্বের এই সূত্র ধরিয়া বিচার করিলে যেখানে 'ও' কার লেখা উচিত, তাহা না করিয়া এইরূপ শব্দ সম্বন্ধে প্রাচীনরীতি ও ইতিহাসকে অবহেলা করিয়া 'ও' কার না লিখিয়া পরে ই বা উ থাকিলে মাত্র অকার দ্বারাই বানানে এই ও কারের ধ্বনি সূচিত করা হইয়া থাকে। শব্দের উৎপত্তি বিচার করিলে ওকার স্থলে অকার লেখা এইরূপ বানানকে ভুলই বলিতে হইবে।" [বাঙ্গলাভাষাতত্ত্বের ভূমিকা] [এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শব্দতত্ত্ব দ্রষ্টব্য] কাজেই আমরা এইরূপ শব্দের বানানে ওকার ব্যবহার করিলে ভাষাতত্ত্বের মর্য্যাদাও অক্ষুণ্ণ থাকে এবং আমাদেরও প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা কমিয়া যায়। আমরা লিখিব নোতুন গোরু মোতি ইত্যাদি।

আলোচনার উদ্বোধক প্রভাসবাবুর প্রস্তাবিত 'কায' শব্দ। 'কায' এই বানান্ আধুনিক বঙ্গভাষায়, চলে নাই। প্রভাসবাবুর এবিষয়ে দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়াছে। যদিও কায পুরাতন শুদ্ধ বানান তবু শব্দটীর বিবর্ত্তনে য স্থানে জ হইয়াছে এবং বঙ্গভাষাভাষীকর্ত্তৃক সাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছে। কার্য্য। কয্য। কাজে। কাজ্জ।

হ'য়েছে, হয়েছে, হোয়েছে ; কোরে, ক'রে, করে ; কোর্‌বো, কোর্ব্বো, ক'রবো, করব। জোলো, জ'লো, জলো। এই সম্পর্কে বলা যায় যে ও [ো, কোরে] দ্বারা উচ্চারণ করাই ভাষাবিজ্ঞানসম্মত। ['] দ্বারা [ক'রে, জ'লো ইত্যাদি] বানানে স্বরপতন দেখান হয় ; কিন্তু ইহাতে ধ্বনিসমন্বয়ের ব্যাখ্যা সুপরিস্ফুট হয় না। পক্ষান্তরে ['] বিযুক্ত 'অ' দ্বারা [করে, জলো, করব ইত্যাদি] বানান করিবার প্রবৃত্তি ও পদ্ধতি একেবারে নিরর্থক। যদিও ['] দ্বারা বানান করিবার অসংযত প্রবৃত্তি, যেখানে সেখানে ড্যাস [—] ব্যবহার করার ন্যায়, বঙ্গভাষায় আজকাল খুবই নিরঙ্কুশ, তবু এ পদ্ধতি ত্যাগ করাই বিধেয়। যেখানে 'ও'র উচ্চারণ অত্যন্ত স্পষ্ট ও ধ্বনি-তত্ত্ব-সম্মত সেখানে কেন 'ও' কার ব্যবহার করিব না? 'মেজো' কে ত আমরা মেজ' লিখিনা, অথচ এখানেও ত স্বরপতন হইয়াছে। কাজেই আমরা লিখিব, মেজো, সেজো, গেছো, কোরে, হোয়ে, কোরব, হোয়েছিল ইত্যাদি। এই উপায়ে 'ও' কায়ের ব্যবহারে আমরা অধুনা-প্রাপ্ত বঙ্গভাষার বহু জটিলতার সরল মীমাংসা করিতে পারি না কি?

প্রভাসবাবুর 'ষ্ট্রীট্' এবং 'ষ্টেসন'। ইহারা ইংরাজী 'Street' এর 'Station' সমুদ্র পার হইয়া গিরি লঙ্ঘন করিয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছে। কাজেই আমাদের দেশে বিভিন্ন লোকের মুখে ইহারা বিভিন্ন আকার ধারণ করিবে তাহাতে বিচিত্র কিছুই নাই। ইংরাজী উচ্চারণের সহিত যাঁহারা অপরিচিত তাঁহারা 'ইষ্টিসন' বা 'ইষ্টিসান' বা 'টেসান' ব্যবহার করিবেন, পক্ষান্তরে যাঁহারা ইংরাজী উচ্চারণে জ্ঞানী তাঁহারা 'ক্লাইভ ষ্ট্রীটই' বলিবেন 'কেলাইভ ইসটাট্' বলিবেন না। 'স্‌টেশন' বা 'স্‌ট্রীট্' এর পক্ষে কোনই যুক্তি নাই। উচ্চারণের সুবিধার জন্য 'ষ্ট' (St) এর পূর্ব্বে স্বরসংযোগ বা স্ (S) এর বিলোপের যুক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু 'স্‌টে' র কোনও যুক্তি নাই। প্রথমে হসন্ত স্ এর উচ্চারণের অসুবিধা ও কষ্ট এড়াইতে গিয়া অনেকে এই নিমিত্তই

'স্‌টেশন্‌' লেখা থাকিলে "সটেশন" (Station) পড়িয়া ফেলেন। বস্তুতঃ বঙ্গভাষায় বৈদেশিক শব্দের উচ্চারণ বিষয়ে এখনও কোনও চরম নিষ্পত্তির সময় আসে নাই। কোন্‌ কোন্‌ বৈদেশিক শব্দের কোন্‌ কোন্‌ উচ্চারণ অধিকসংখ্যক লোক মানিবে তাহার উপরই সমস্ত নির্ভর করিতেছে। তবে আধুনিক সময়ে এই সমস্ত ধার করা শব্দের বানানের পদ্ধতি নিরাকরণের নিমিত্ত কতকগুলি বিশিষ্ট সূত্রের খসড়া প্রস্তুত করা যাইতে পারে। আমরা 'ষ্টেসন্‌', 'ষ্টীট্‌', 'ইষ্টেসন' বা 'ইষ্টিসান' 'ষ্টীমার' বা 'ইষ্টিমার' 'অফিস' বা 'আপিস' দুই রকম রূপই অনুমোদন করি। এ বিষয়ে বিশদ বিবরণের জন্য সুনীতিবাবুর 'Origin and development of the Bengali language' এর প্রথম খণ্ডের ৫৬৯—৬৪৮ পৃষ্ঠা ধৈর্য্যসহকারে পঠিতব্য।

'কোন' এবং 'তবু' শব্দ দুইটীর বানান-সম্বন্ধেও জটিলতা আছে। (১) কোন [তুলনামূলক, কোন্‌টা চাই ?] এবং (২) কোন [যে কোন জিনিষ, যে কোন জায়গা] দুই শব্দই একপ্রকারে লিখা হয়। ফলে অর্থ প্রকাশের অসুবিধা হয়। প্রথম 'কোন' কে 'কোন্‌' এবং দ্বিতীয় 'কোন' কে কোনও' করিলে আর কোন্‌টা 'কোন্‌' আর কোন্‌টা 'কোনও' এ বিষয়ে কোনও দ্বন্দ্ব রহিবে না। 'তবু' লিখিতে অনেকে 'ও' দিয়া থাকেন যথা—তবুও। ইহাতে বানানকে অযথা ভারাক্রান্ত করা হয় 'তবু' লিখিলেই আর গোলযোগ থাকে না।

এইরূপ আরও অনেক বানানের অসুবিধার নিরাকরণ করা যাইতে পারে। তবে কোন্‌টা টিকিবে এবং কোন্‌টা টিকিবে না, এ প্রশ্নের মীমাংসার জন্য কোনও নোতুন উপায় সৃষ্ট হইবে কিনা, তাহা এখন স্থির করিবার উপায় নাই। তবে একটা কথা বোধ হয় জোর করিয়াই বলা যায় যে এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ আবশ্যক হইয়াছে। 'বাঙ্গালা' পরীক্ষায় ৩৩ বা ৩৬ নম্বর বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে একেবারে অর্ব্বাচীনও অনায়াসে লাভ করিতে পারে। ইহাতে শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যেও, যাঁহারা বিশেষরূপে বাঙ্গালা না শিক্ষা করেন, তাঁহাদের বঙ্গভাষা জ্ঞানের অভাব মজ্জাগত হইয়া পড়িতেছে। কাজেই এ ক্ষেত্রে অসংযত উত্তম ব্যতীত আর কি হইবে !'

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বভারতীর' বানান-পদ্ধতির আলোচনা বেশ সুখ-সেব্য হইবে। সেই আশায় রহিলাম।

বানান সমস্যা

শ্রীকামাখ্যা চরণ বসু

বিচিত্রায় কিছুদিন থেকে বানান সমস্যা সম্বন্ধে নানা আলোচনা হচ্ছে, কিন্তু বানান সমস্যা সমাধানের জন্য কেউ কিছু চেষ্টা করছেন না। একথা সত্যি যে আগে সমস্যাগুলি সঠিক না জানলে তাদের সমাধান হ'তে পারে না। সেই জন্যেই বোধ হয় যাঁরা বিচিত্রায় বানান সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন, তাঁরা সমস্যাগুলিকে প্রকট ক'রে দেখাতে চেষ্টা ক'রেছেন। এতদিন আলোচনার পর সমস্যাগুলি আমরা অল্পবিস্তর বুঝতে পেরেছি। এইবার সমস্যাগুলি সমাধানের চেষ্টা ক'রতে হবে।

সমস্যাগুলি সমাধান ক'রতে হ'লে আগে সেগুলিকে ভাগ ক'রে নেওয়া ভালো। বাংলা ভাষার বানান সমস্যাগুলিকে মোটামুটি ৮ ভাগে ভাগ ক'রেছি। (১) 'এ'কার ও 'য়্যা'কার সমস্যা। যথা—দেখ, দ্যাখ। (২) 'অ'কার ও 'ও'কার সমস্যা। যথা—মন, মোন। (৩) 'ই'কার ও 'ঈ'কার সমস্যা। যথা—একটি, একটী; বেশি, বেশী। (৪) 'শ' 'স' ও 'ষ' সমস্যা। যথা—খুসি, খুশি (খুশী); আকৃষী, আঁকষী। (৫) 'জ' ও 'য' সমস্যা। যথা—কাজ, কায; জাতী, যাতী। (৬) 'ন' ও 'ণ' সমস্যা। যথা—কান, কাণ;

সোনা, সোপা। (৭) বিদেশী ও দেশী শব্দের বানান সমস্যা যথা—(বিদেশী) চাবি, চাবী; (দেশী) ঢেঁকি, ঢেঁকী। (৮) মহাপ্রাণ বর্ণের অল্পপ্রাণ হ'য়ে যাওয়া। যথা—পাথর, পাতর; করছি, করচি। এ কটি সমস্যা ছাড়া আরো কতকগুলি সমস্যা আছে যেমন 'বিসর্গ' সমস্যা, 'ক্ষ' সমস্যা ইত্যাদি।

উক্ত সমস্যাগুলির একে একে আলোচনা ক'রলে আমরা হয়ত সঠিক উপসংহারে পৌঁছুতে পারব। প্রথমেই সমস্যাগুলি আলোচনা করবার আগে কতগুলি কথা বলে রাখা ভাল। বানান সমস্যার উদ্ভব হ'য়েছে উচ্চারণ অনুযায়ী বানান করতে যেয়ে। কিন্তু উচ্চারণ অনুযায়ী বানান হয় না বা কেউ করেন না। এর থেকে এই বোঝায় না যে, যে শব্দগুলির উচ্চারণ অনুযায়ী বানান হয় না, সে শব্দগুলির উচ্চারণ অনুযায়ী বানান না ক'রলেও চ'লবে? অন্তত এও ত বোঝায় যে উচ্চারণ অনুযায়ী বানান না হ'য়েও এখনও চ'লচে। যে শব্দগুলির উচ্চারণ অনুযায়ী বানান না হ'য়েও চলতি ভাষায় চ'লচে তাদের দু একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। যেমন—মন. বন, আহ্নিক, লক্ষ। এই শব্দগুলি যথাক্রমে উচ্চারণ হয়—মোন, বোন, আন্হিক, লোক্খো। এই শব্দগুলির এ রকম উচ্চারণ হওয়া সত্ত্বেও চলতি ভাষায় সাধু ভাষার বানানই প্রচলন আছে। আজকালকার চলতি ভাষার কিন্তু দেখা, খেলা, এত্দিন ইত্যাদি বানানগুলির দ্যাখা, খ্যালা, য়্যদ্দিন এইরকম রূপ দেখতে পাওয়া যায়। বাংলা ভাষার ক্রিয়াপদগুলিতে বানান সমস্যা উৎকটভাবে দেখা দিয়েছে। যেমন চোলে (চলে) বোলে (বলে), হোল (হল)। এখন কথা হ'চ্চে যে এক জায়গায় উচ্চারণ অনুযায়ী বানান আর অন্য জায়গায় সাধু ভাষার মতো বানান করা, একি ভালো? যা ক'রব তা এক রকম হওয়া ভালো, নইলে সামঞ্জস্য থাকে না। তার মানে আমি এই ব'লতে চাই, যেখানে সাধু ভাষার মতো বানান ক'রলেও উচ্চারণ চলতি ভাষার মতো হয়, সেখানে উচ্চারণ অনুযায়ী বানান না করাই ভালো। তা'বলে কি আমি বলচি 'শোনা' (to hear) বানানটাকে 'শ'না' এরকম করতে? তা নয়; কেননা 'শনা' লিখলে আমরা 'শোনা' পড়ি না। কিন্তু 'লেজ' লিখলে আমরা 'ল্যাজ' পড়ি, 'গেল' লিখলে আমরা 'গেলো' পড়ি। এই রকমের শব্দগুলিকে উচ্চারণ অনুযায়ী বানান না ক'রলেও বাস্তবিক কোন ক্ষতি হবে না। এই বারে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে যদি, যেখানে সাধু ভাষার মতো বানান করেও উচ্চারণ চলতি ভাষার মত হয়, সেখানে উচ্চারণ অনুযায়ী বানান না করা হয়, তাহলে পূর্ব্বোক্ত ১নং ২নং সমস্যার সমাধানের প্রয়োজন কি? প্রয়োজন একটা আছে। বিদেশী বা ভিন্ন ভাষা ভাষী এবং প্রথম শিক্ষার্থীদের ভাষা শিক্ষার জন্যে ১নং ২নং সমস্যার উচ্চারণ বিকৃতির একটা নিয়ম গড়া উচিৎ।

এই রকম নিয়ম গড়া কি করে সম্ভব তার একটা উদাহরণ নিই। যেমন—**ব্যঞ্জনান্ত একার-যুক্ত ব্যঞ্জন পূর্ব্ব দ্ব্যক্ষর বিশিষ্ট শব্দগুলির পূর্ব্ব 'এ'কার 'য়্যা' রূপে বিকৃত হয়ে যায় না।** এই হল সাধারণ নিয়ম। এ নিয়মের ব্যতিক্রমও আছে। যেমন—লেজ্, ফেন্ (ভাতের) আর অনুজ্ঞা জ্ঞাপক দেখ্, খেল্, ফেল্ ঠেল্। এই রকম নিয়ম থাকলে ভিন্ন ভাষা ভাষী ও প্রথম শিক্ষার্থীদের উচ্চারণ শেখবার সুবিধে হবে।

এ ত গেল ১নং ২নং সমস্যার কথা, বাকি সমস্যাগুলির আলোচনা করতে অনেক কথা লিখতে হবে। এই সমস্যাগুলির এবং ১নং ২নং সমস্যার বিশদভাবে আলোচনা প্রবন্ধান্তরে করবার ইচ্ছা রইল। বাকি সমস্যাগুলি আলোচনা করতে অনেক কথা বলতে হ'বে এই জন্যে বলচি যে আমাকে কতকগুলি শব্দের উৎপত্তি স্থল, বাংলা ভাষার প্রচ্ছন্ন নিয়মগুলি, সংস্কৃত ভাষার নিয়ম যা বাংলা ভাষার ওপর আরোপ করা যেতে পারে, খুঁজে বার করতে হবে এবং প্রত্যেকটা সমস্যার পৃথক পৃথক আলোচনা করতে হবে।

এইভাবে আলোচনা করলে বানান সমস্যার সমাধান হয়ত হতে পারে।

সবিনয় নিবেদন

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

ঘ

মিনতিদের ব্যারাকপুরের বাড়ী শুধু সুন্দর বললে সব বলা হয় না, সেখানে সব কিছুর মধ্যেই একটি সহজ কবিপ্রাণের স্পর্শ আছে। একেবারে গঙ্গার ওপরেই। সামনে সুগোছাল' একটি বাগান—ফুলেফলে সুশোভিত। বাগানের মাঝে একটি প্রস্তরের নারীমূর্ত্তি। দ্বিতলের উন্মুক্ত বারান্দা সেই বাগানের ওপরেই ঝুঁকে পড়েছে—সম্মুখে তার সুবিস্তৃত গঙ্গা। বারান্দায় খানকয়েক আরাম কেদারা পাতা আছে। আর বারান্দার চার কোণে চারটি রঙ-মিলানো ফুলের টব—তা'তে প্যারীর গোলাপ গাছ বসানো হ'য়েছে—এখনও ফুল ধরেনি। আর বারান্দার দু'পাশে ছেয়ে দু'টো চাঁপা ফুলের গাছ উঠেছে নীচেকার সিঁড়ির দু'পাশ থেকে।

জ্যোৎস্না রাতে এই বারান্দাটির আর তুলনা হয় না।

পরাগ বলে, আমি একলাটি রাতের পর রাত এখানে ব'সে জেগে কাটিয়ে দিতে পারি।

মিনতি বলে, এ আর বেশী কথা কি! বাবাতো তাই দেন। বাবাকে ডেকে ঠাণ্ডার ভয় দেখিয়ে ঘরে না নিয়ে গেলে তিনি কখনও নিজে থেকে ওঠেন না।

সেদিনও সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে পরাগ আর মিনতি সেই বারান্দার আরাম কেদারায় এসে বসলো।

পরাগ বললো, বহুদিন তোর কবিতা শুনিনি মিনু, আজ শুনবো। যা, তোর কবিতার খাতাটা নিয়ে আয়। নুতুন কি লিখলি দেখি।

মিনতির এ বিষয়ে কারও কাছেই কোন লজ্জা বা সঙ্কোচ নেই। বিশেষতঃ পরাগের কাছেতো নেইই। কবিতার সুন্দর বাঁধানো খাতাটা এনে পরাগের হাতে তুলে দিয়ে বললো, এই নাও।

পরাগ আবার তা মিনতির হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললো, তুই নিজে পড়্। তোর মুখে তোর কবিতা শুনতে আমার বেশ লাগে।

মিনতি বললো, যাও, আমি ভাল পড়তে পারিনে।

তারপরে মিনতি পাশের একটা আরাম কেদারায় ব'সে কণ্ঠ যথাসাধ্য পরিষ্কার ক'রে নিয়ে প'ড়ে যেতে লাগলো। পরাগ মুগ্ধ বিস্ময়ে তা শুনছিল।

···প্রিয়তমাকে হারিয়ে প্রেমিক যখন একান্তে অশ্রুর ডালি সাজাচ্ছিল সেই প্রিয়তমার স্মৃতির উদ্দেশ্যে তখন সহসা প্রেমিকের একবিন্দু অশ্রু থেকে জেগে উঠলো এক অপরূপা নারীমূর্ত্তি—প্রিয়তমার প্রতীক। তাঁকে শরীরী মূর্ত্তি ব'লে ভুল ক'রে প্রেমিক যেমন তাকে বাহুর আবেষ্টনের মাঝে ধ'রে রাখতে গেল অমনি সেই অশরীরী মায়ামূর্ত্তি আবার অশ্রুবিন্দুতে রূপান্তরিত হ'য়ে গেল। প্রেমিক তখন তার অনুচিত অতিরিক্ত আশার জন্যে বিলাপ করতে লাগলো, হায়! সে যে আজ আমার স্পর্শের অতীত! কেন ভুল ক'রে তাকে আমি ধরতে গেলাম! তাকে দেখার যে তৃপ্তি—তা থেকেও আমি নিজে কেন নিজেকে বঞ্চিত করলাম!···অশ্রুবিন্দু আবার মূর্ত্তি পেল। বললো, হে প্রিয়! হে প্রিয়তম! আমার জন্যে তোমার বিলাপ করা তো সাজে না। তুমি আমার দুঃখ একবার ভেবে দেখলে তোমার নিজের দুঃখের জন্য কখনই বিলাপ করতে না। তুমি যে-কোন মুহূর্ত্তে এখনও ইচ্ছা করলে আমাকে মূর্ত্তি দিতে পার। আমি তোমার কল্পনায় আজও ধরা প'ড়ে আছি। কিন্তু আমার মানুষী রূপ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমার সে শক্তি লোপ পেয়ে গেছে। আমি তোমাকে হারিয়েছি সর্ব্বপ্রকারে, কিন্তু তুমি শুধু স্পর্শের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছ মাত্র। একদিন মূর্ত্তিতে

ছিলাম তোমার সম্মুখে, আজ মানসী হ'য়ে আছি, তবু তো তুমি আমাকে একপ্রকারে পাচ্ছ, কিন্তু আমি যে সে অধিকারেও বঞ্চিত। কাজেই হে মম অতীত-প্রিয়তম, এ বিলাপ তোমাকে সাজে না, বরং বিলাপের একমাত্র অধিকার যদি কারও থাকে তো সে আমার।

প্রেমিক সলজ্জ হ'য়ে চেয়ে দেখলো, অশ্রুবিন্দু শুকিয়ে উঠেছে।......

মিনতি সলজ্জ একটু হেসে থামলো। পরাগ নীরবে তখনও আকাশের দিকে উদাস দৃষ্টি তুলে নিস্তব্ধ হ'য়ে বসেছিল। কিছুক্ষণ নীরবতার মধ্য দিয়ে কেটে গেলে সহসা সে চমকে উঠে বললো, চমৎকার!

মিনতি লজ্জিত হ'য়ে বললো, যাও! তোমার যত মনরাখা কথা। তুমি তো সব কবিতাই আমার চমৎকার বল', কিন্তু সব কবিতা মাসিকপত্রের সম্পাদকের মনোমত হয় না কেন?

পরাগ বললো, তা জানিনে, কিন্তু বহুকাল এমন কবিতা বাংলা মাসিকে দেখেছি ব'লে আমার স্মরণ হয় না।

থাক্, খুব হ'য়েছে!—ব'লে মিনতি সশব্দে খাতাটা বন্ধ করলো।

পরাগ বললো, বাঃ—

এমন সময় মিনতির পিতা হৃষীকেশ বাবু তাদের সামনে এসে বললেন, না মা, আজ আর আমার অপিসের বোটটা পাওয়া যাবে না। তা আগে থাকতেই আর একজন ঠিক ক'রে ফেলেছে। ইচ্ছে করলে আনতে পারতাম, কিন্তু সে বড় খারাপ দেখায়। আর পরাগ, তুমি তো এ তিনদিন এখানেই আছ, কাল থেকে তোমাদের জিম্মায় বোট্ থাকবে, কারুর তা'তে অধিকার থাকবে না।

পরাগ বললো, তা বোট্ কাল পেলেও চলবে। এখানেই তো বেশ আছি। ব'সে ব'সে মিনুর কবিতা শুনছি। বেশ লাগছে।

হৃষীকেশ বাবু মিনতির দিকে ফিরে বললেন, দাও তো মা পরাগকে তোমার সেই নতুন কবিতাটা শুনিয়ে, সেই যে 'অশ্রুকণা' কবিতাটা।

পরাগ বললো, সে কি আর এখনও শুনতে বাকী আছে ব'লে মনে করেন মেসোমশাই?

শুনেছ'? শুনেছ'? কেমন লাগলো শুনি?—ব'লে হৃষীকেশ বাবু একটা আরাম কেদারায় ব'সে পড়লেন।

পরাগ কি যেন বলতে যাচ্ছিল, মিনতি তাকে বাধা দিয়ে বললো, তবে কিন্তু এই পর্য্যন্তই।...আচ্ছা থাক্, আর একটা শোন' পরাগ দা'।

মিনতি আর একটা কবিতা পড়তে লাগলো।

বোটের উপর পরাগ আর মিনতি।

এমন বহু প্রদোষ-তিমিরে গঙ্গাবক্ষে ইতিপূর্ব্বে তারা ভাষা বিনিময় করেছে। পরস্পরকে একান্ত আপনার ব'লে অনুভব করেছে। কথা একবার আরম্ভ হ'য়েছে তো আর তা শেষ হ'তে চায়নি। কি যেন পরস্পরের কাছে বলার তাদের ছিল—বলা হয়নি। কথায় কথায় সে কথা গেছে ভুলে। অনাগত ভবিষ্যতে একদিন তা অতি অসাবধান মুহূর্ত্তে উভয়ের অজ্ঞাতে হয়তো বা হ'য়ে পড়তে পারে প্রকাশ—তারা ভেবেছে। হয়তো তা কোনদিন হবে না প্রকাশ। হয় তো বা তা ইতিপূর্ব্বেই গেছে প্রকাশ হ'য়ে—তারা তা ধরতে পারেনি। মানুষের জীবনও এমনি হেঁয়ালি। মানুষ যা বলতে চায়—তা বলে না; যা বলতে চায় না—তাই বলে। কোথায় জীবন-নাট্যের তাল কাটা যাবে সেই ভয়েই সে অস্থির, অথচ প্রতি পদে পদে তা'কে চলতে হয় তাল কেটে কেটে—নান্যঃ পন্থা! মানুষ তা জানে, আর জানে ব'লেই অসংখ্য পাকে পাকে আপনাকে সে জড়িয়ে চলে—কোথায় যাবে তা সে নিজেও জানে না।

পরাগের প্রতি মুহূর্ত্তে তাই ভয় হচ্ছিল, হয়তো যা সে মিনতিকে আজ বলতে চায় তা ব'লে উঠতে পারবে না, আর যদিই বা পারে তো তা এমন রূঢ় আঘাত দেবে তাদের জীবনের গতিতে যে, তা স্তব্ধ হ'য়ে যাওয়াও কিছু বিচিত্র না। পরাগ অনেকক্ষণ থেকেই তাই স্তব্ধ হ'য়ে বসেছিল। আর মিনতি ওপারে শ্রীরামপুরের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে দিয়ে ভাবছিল, কাল পরাগদা' চ'লে যাবে। একদিন কি যে তাকে বলবো ভাবছিলাম, কিন্তু কই বলাতো হ'লো না। আচ্ছা, আবার একদিন

এলে পরেই না হয় যা বলার তা গুছিয়ে বলবো। আজ খাপছাড়া ক'রে ব'লে লাভ নেই।......

আকাশে এককালি চাঁদ উঠলো—সে যেন কতকটা উদাসী ফকিরের একতারার মত।

পরাগ প্রথম কথা কইলো।—মিনু, কাল আর এমন ক'রে বেড়াতে পারবো না দু'জনে। ভাবতেও ভয় হয়। একটা ভাল কবিতা পড়তে পড়তে হঠাৎ যদি কোথাও দেখি যে তার ছন্দ কাটা গেছে অমনি মনকে তা যেমন আঘাত দেয়—এও ঠিক আমাকে তেমনি আঘাত দিচ্ছে। তাই মাঝে মাঝে মনে হয় যে, মানুষের সৌন্দর্য্য বোধ যদি না থাকতো তো দুনিয়াটা অনেক সহজ হ'তে পারতো।

মিনতি সহসা বললো, সহজ না হ'তেও পারতো পরাগদা'। জন্তু জানোয়ারের দুনিয়া—যাদের সৌন্দর্য্য বোধ নেই ব'লেই আমাদের ধারণা—তাদের কাছে কি সহজ ব'লে তুমি মনে কর'? মানুষের সঙ্গে জন্তু-জানোয়ারের অনুভূতির পার্থক্য থাকতে পারে—ব্যথা-বেদনার মাপকাঠি আলাদা হ'তে পারে, কিন্তু তাদের কাছে তাদের দুনিয়া সহজ এ ধারণা করাতো চলে না। হ'তে পারে তাদের দুনিয়াটা মানুষের চোখে সহজ।

পরাগের আবার সব গোলমাল হ'য়ে গেল। সে নীরবে দীপমালা শোভিত ওপারের দিকে চেয়ে ব'সে রইলো। হঠাৎ সেদিকে চেয়ে তার মনে হ'লো, ওপারে অত আলো জ্বলছে তবু কিছুই নির্দ্দিষ্ট ক'রে চেনবার উপায় নেই, তেমনি মানুষের জীবনেও দেখতে পাই কথার ঘাত-প্রতিঘাতে অনেক কিছুই দীপ্তি পায় সত্য, তবু সুনির্দ্দিষ্ট কোন রূপে সে ধরা দেয় না, বরং অনেক সময় চোখের দৃষ্টিকে দেয় সে আরও ঘোলাটে ক'রে।

পরাগের বুক ঠেলে একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো, মিনতি স্পষ্ট তা শুনতে পেল।

পরাগ হঠাৎ কখন যে বলতে সুরু ক'রে দিয়েছে তা সে নিজেও জানে না। আমি বিপন্ন আজ মিনু। সীমাকে যে একদিন ভালবাসতাম তা তোকে বহুদিন পূর্ব্বেই বলেছি। সীমাকে আজও ভালবাসিনে বললে মিথ্যে বলা হবে, আজও ভালবাসি। আমাদের বিয়ে কেন হ'লো না সে তো তুই ভাল ক'রেই জানিস্ মিনু। তারপরে সীমার যেদিন বিয়ে হ'য়ে গেল সেদিন থেকে সীমাকে ভালবাসি শুধু আমাদের অতীতের ভালবাসাকে ভালবাসবার জন্তেই। একবার যাকে ভালবাসা যায় তাকে মানুষ কোনদিনই ভুলতে পারে না। যারা বলে, পারে, তারা হয় আত্মপ্রবঞ্চনা করে, নয় মিথ্যে কথা বলে। আমি তা পারিনে। আর তা' ছাড়াও এসব তোর কাছে বলার আজ আমার প্রয়োজন হ'য়েছে। কারণ, সেদিন মা যখন তোর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা তুলে বসলো—তাঁরা দুই সইয়ে মিলে নাকি কথা পাকাপাকি ক'রে ফেলেছেন—আমি সম্মতি দিয়ে ফেললাম। অবশ্য, কথা তাদের পাকাপাকি না হ'লেও আমি অসম্মতি দিতাম না। আর এতো আমরা দু'জনেই আশা করেছি। সীমার চেয়ে কোন অংশেই তোকে অনীপ্সিত ব'লে কোনদিনই আমি মনে করতে পারিনি। সীমা আমাকে প্রথম আকৃষ্ট করেছিল—তাই দাবী তার প্রধান হ'তে পারে ; কিন্তু ভাগ্যচক্রে তা যখন অপ্রধান হ'য়ে গেল তখন তোর দাবীরই মর্য্যাদা হ'লো আমার চোখে সর্ব্বাগ্রে রক্ষণীয়। আমি ত্রুটি কিছু করিনি। সহসা অপ্রত্যাশিত ভাবে সেদিন সীমা তার হারানো দাবী আবার সঞ্জীবিত ক'রে এসে আমার সামনে দাঁড়ালো। সীমার অন্যায় সত্য, কিন্তু সহজে তা অস্বীকার করবারও উপায় আমার নেই।......

তারপর পূর্ব্বাপর সকল ঘটনা—এমন কি ষ্টেশনে পশুপতির সেদিনকার হীন আচরণ পর্য্যন্ত সবিস্তারে বিবৃত ক'রে পরাগ বললো, সহানুভূতি বা করুণা আমার কাম্য নয় মিনু, আমি চাই তোর নিরপেক্ষ অকৃত্রিম সাহচর্য্য। তোর বিদ্যা-বুদ্ধি-শিক্ষায় আমার প্রগাঢ় বিশ্বাস আছে। আমি চাই একজনার কাছে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করতে, এক কথায় আমি বাঁচতে চাই মিনু—আমার সুনাম সুযশ দেশপ্রীতি অক্ষুণ্ণ রেখে।

পাছে কণ্ঠস্বর বিকৃত শোনায় সেই ভয়ে মিনতি অনেকক্ষণ নিশ্চুপ নির্ব্বাক হ'য়ে বসেছিল পরাগের একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে।

তারপরে কথা যখন সে বলতে গেল তখন বলার মত

কিছুই সে খুঁজে পেল না। শুধু পরাগের হাতখানায় অতি নিবিড় সস্নেহ পরশ বুলিয়ে চললো—কতকটা ঠিক ঝড়ের পরের পাখীকে আশ্রয় দেবার মত ক'রে।

পরাগ মুগ্ধবিস্ময়ে নীরব হ'য়ে রইলো। আর কিছুই সে বলার প্রয়োজন অনুভব করলো না।

* *
*

পরদিন ভোরে একটা ট্রেনে পরাগকে তুলে দিয়ে হৃষীকেশ বাবু আর মিনতি তার কামরার পাশেই প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়িয়েছিল।

হৃষীকেশ বাবু হঠাৎ বললেন, পরাগ, তোমরা হ'লে প্রফেসর মানুষ—তোমাদের ছুটিছাটার অভাব কি, ছুটি পেলেই ছুটে চ'লে আসবে—ভাবাভাবি আবার কি! তোমাদের সঙ্গে দু'টো কথা ক'য়েও সুখ আছে। মিনুকে রোজই বলি, পরাগকে আসতে লিখে দে'—তা ও লেখে কিনা সে ঐ জানে।

মিনতি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কাল রাতের কথাই হয়তো সে ভাবছিল,—তাইতো, পরাগদা'র কথার উত্তরে তো কিছুই বলা হ'লো না, বলা যায়ও না যে।

মিনতি সহসা পিতার অভিযোগে ফিরে দাঁড়িয়ে বললো, লিখি, কি না লিখি—সে কথা পরাগদা'কে জিগ্যেস্ করলেই তো পার বাবা। কি পরাগদা', লিখি না?

হৃষীকেশ বাবু মিনতির মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসলেন, তারপরে বললেন, ফস্ ক'রে মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়ে গেছে ব'লেই অভিমান করতে হবে বুঝি? দেখো পরাগ, ওর মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখো।

পরাগ ইতিপূর্ব্বেই একবার মিনতির মুখের ভাব লক্ষ্য করেছিল, কিন্তু সেখানে অভিমানের কোন চিহ্ন ছিল না, ছিল যা তা শুধু পরাগ অন্তর দিয়ে অনুভব করতে পারে, প্রকাশ করতে পারে না। কাজেই পরাগ মিনতির মুখের দিকে চাইতে সাহসী পর্য্যন্ত হ'লো না।

হৃষীকেশ বাবু বিচক্ষণ ব্যক্তি। পরাগ ও মিনতির হয়তো কিছু পরস্পরের কাছে বলার থাকতে পারে ভেবে তিনি 'এখুনি আসছি' ব'লে অন্যত্র চ'লে গেলেন।

পরাগ তাড়াতাড়ি অনুচ্চকণ্ঠে বললো, তোকে অত্যন্ত উত্তেজিত দেখাচ্ছে মিনু।

মিনতি বললো, তোমার কথার কোন উত্তর খুঁজে পাচ্ছি না ব'লেই হয়তো। যাক্, আর ভাবতে পারি না পরাগদা'। গিয়ে চিঠি লিখো কিন্তু।

লিখবো, এবার আর ভুল হবে না, দেখিস্।

এবার ভুল হ'লে আর ক্ষমা করবো না জেনো।

পরাগ একটু হাসতে চেষ্টা করলো।

এমন সময় হৃষীকেশ বাবু গোটা দু'তিন দৈনিক সংবাদ-পত্র হাতে ক'রে এসে হাজির হ'লেন। তারপরে সেগুলো পরাগের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, ট্রেনে এদের চেয়ে প্রিয়বন্ধু আর নেই। কি বল' পরাগ?

তারপরে ট্রেন চলতে সুরু করলো।

পরাগ বললো, নমস্কার মেসোম'শাই।······মিনু, আসছে সপ্তাহে নেহাৎ না পারি তো তার পরের সপ্তাহে নিশ্চয় আসবো।

মিনতি বললো, না এলে দুর্ভোগটা আমারই। মা'র অনুরোধে আবার কল্‌কাতা ছুটতে হবে।

দেখে নিস্ এবার আর ছুটতে হবে না।

ভোরের বাতাস মন্দ লাগছিল না। ট্রেন ছুটে চলেছে। পরাগ বাইরের দিকে চেয়ে কি যেন ভাবতে গেল—মিনতির কথা নয়, কিন্তু মিনতির কথাই তাকে ভাবতে হয়; অন্য কারও কথা—এমন কি, নিজের কথাও মিনতিকে বাদ দিয়ে তখন আর ভাবা চলে না। তার মনে হ'লো, মিনতিকে এই দুর্য্যোগের মধ্যে টেনে না আনলেও তো তার চলতো। মিনতি তার জীবনের সঙ্গে অনেকটা তখনই জড়িয়ে গেছে সত্য, কিন্তু এমন ক'রে তা'কে না জড়ালেও হয়তো চলতো। মিনতি দরদী হ'তে পারে, কিন্তু ব্যথা সহনের শক্তি তারও পরাগের মতই নেই। মিনতিকে আঘাত সইবার মত ক'রে মাসীমা বা মেসোম'শাই তৈরী করেননি, শুধু তাদের উদার হৃদয়ের মাধুর্য্যটুকু ভ'রে দিয়েই তারা তৃপ্ত ছিলেন, কিন্তু, দুনিয়ায় শুধু তা ভাঙিয়েই আপনাকে বাঁচিয়ে রাখা চলে না। আরও কিছু চাই। আমরা দুনিয়াকে যত নির্ম্মম ব'লে

জানি—তার চেয়েও সে নির্ম্মম। মিনতি উত্তরে কিছুই বলেনি, কিন্তু সম্মতি মানুষ এর চেয়ে ভাল ক'রে আর দেয় কেমন ক'রে? মিনতি যদি রাজী না হ'তো, আমাকে সাহচর্য্য দিতে—সে বেশ হ'তো, আমি আঘাত পেতাম সত্য, দুনিয়ার ওপর শ্রদ্ধা হারাতাম সত্য, কিন্তু মিনতি বেঁচে যেত। ও বাঁচুক—এও আমি চাই, কিন্তু ওকে ঠকাতেওতো আমি পারি না। হয়তো এখন ওকে ঠকালে আরও একটা বড় আঘাতের জন্য ওকে প্রস্তুত হ'তে হ'তো। আমার উপায় ছিল না।

পরাগ আর ভাবতে পারলো না, তার অসহ্য বোধ হচ্ছিল। তাড়াতাড়ি হৃষীকেশ বাবুর দেওয়া দৈনিক পত্রের একখানা তুলে নিয়ে তা'তে চোখ বুলোতে লাগলো। সেখানা বাঙ্গলা দৈনিক সংবাদ পত্র। পরাগের প্রথমেই চোখে পড়লো,—

নিরুদ্দেশ! নিরুদ্দেশ!

আমার পুত্র শ্রীমান নিলাদ্রিশেখর রায় গত ৩১শে আষাঢ় হইতে হঠাৎ কোথায় উধাও হইয়া গিয়াছে। তাহার বয়স ১৪।১৫ বৎসর, গায়ের রঙ ফরসা, চেহারা মাঝারি রকম গোল, চোখ বড় বড়, মাথার চুল ঈষৎ কটা। গায়ে সাদা ডোরা জামা আছে। যদি কেহ অনুগ্রহপূর্ব্বক উক্ত ছেলেটিকে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে বা তাহার সংবাদ আমাকে জানাইতে পারেন। তবে তাহাকে ৫০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে। শ্রীকেদারনাথ রায়, নং—মহিম হালদার ষ্ট্রীট, পোঃ কালীঘাট, কলিকাতা।

পরাগের অমনি মনে পড়ে মুকুটের কথা। মুকুটও একদিন এমনই নিরুদ্দেশ হয়েছিল। তখন তারও বয়স ১৪।১৫ই হবে। সে আজ প্রায় ১০।১২ বছর আগেকার কথা। মুকুট পরাগের ভাই—পরাগের ছোট এবং ময়ূরের বড়। মুকুটের জন্যেও সংবাদপত্রে এমনই একদিন বিজ্ঞাপন ওর পিতা দিয়েছিলেন, কিন্তু মুকুটের কোন সন্ধানই পাওয়া যায়নি। তারপরে পরাগের পিতার মৃত্যু হ'লো-সেও আজ প্রায় বছর পাঁচের কথা। কিন্তু মুকুটের এ-যাবৎ কোন সংবাদ মেলেনি। বেঁচে আছে কিনা সে বিষয়েও সকলে সন্দিহান।

পরাগের নূতন ক'রে আজ আবার মুকুটের কথা মনে পড়ে। সে যদি বেঁচেই থাকে,—আর যদি ফিরে আসে। সে বেশ হয়, সে বেশ হয়! মুকুট এক বগ্‌গা, একটু দুরন্ত, একটু উচ্ছৃঙ্খল—তা' হোক্, মুকুট বে-হিসাবী, মুকুট বে-পরোয়া, কিন্তু মুকুট সুন্দর। মুকুট ফিরে আসুক।

আবার ভয় হয়,—হয়তো মুকুট এসবের অতীত তীরে চ'লে গেছে, হয়তো তার কানে এ-জগতের আহ্বান আর পৌঁছ'য় না। তার উদ্দামতা হয়তো চিরদিনের মত শান্ত হ'য়ে গেছে।

পরাগের অজ্ঞাতে এক ফোঁটা অশ্রু সংবাদ পত্রের গায়ে গড়িয়ে পড়ে। পরাগ সচকিত হ'য়ে ওঠে।

পরাগ বিস্মিত হ'য়ে ভাবে, কে নিরুদ্দেশ নীলাদ্রি—তা কে জানে! কিন্তু সেই অজানা অখ্যাত নীলাদ্রি মুকুটের জন্য আমার চোখ থেকেও অশ্রু ঝরাতে সক্ষম। ওরা যেন আত্মার আত্মীয়, পরস্পরের দরদী বন্ধু।...

পরাগ বাইরে থেকেই নিজের বাইরের ঘরের রূপ দেখে বিস্মিত হ'লো। একি! এমন ক'রে সহসা তার রূপ পাল্টে দিল কে? এ যে স্বদেশ সেবক পরাগের বৈঠকখানা ব'লে আর চেনাই যায় না। কোন সাহেব-সুবার ব'লেই ভুল হয়।

পরাগ ভেতরে ঢুকে আরও চম্‌কে গেল, কিন্তু কোনও রূপ অভিব্যক্তির পূর্ব্বেই সাহেবী পোষাক পরা যে যুবকটি ইজি চেয়ারের হাতলের ওপরে ব'সে একটি পার্শী ধরণে সজ্জিতা বাঙালী মহিলার সঙ্গে গল্প করছিল সে চকিতে লাফিয়ে এগিয়ে এসে তাকে ভাবাতিশয্যে দু'হাত বাড়িয়ে অত্যন্ত নিবিড় ক'রে জড়িয়ে ধ'রে বললো, বড়দা', বড়দা'......

আর কিছু বলা হয়তো যায়ও না।

পরাগের সম্বিৎ ফিরে আসতেই সে যুবকটিকে সঘন নিশ্বাসের সঙ্গে বুকের মাঝে পিষ্ট ক'রে বললো, মুকুট—তুই?

আমাকে স্বপ্নেও আশা কর'নি নিশ্চয়? কেউ করতে পারেও না।

আশা করিনি বললে মিথ্যা বলা হবে মুকুট। কিন্তু কি Strange Coincidence—ব্যারাকপুর থেকে ফেরার পথে ট্রেনে ব'সে বাঙলা একটা কাগজ পড়ছিলাম, প্রথমেই চোখে পড়লো একটা নিরুদ্দেশ ছেলের জন্যে তার বাবা যে বিজ্ঞাপন দিয়েছে সেটা। অমনি মনে প'ড়ে গেল তোর কথা। কিন্তু তোর ফিরে আসার কথা এখনও যে বিশ্বাস করতে ভরসা হয় না মুকুট।

বিশ্বাস করা খুবই শক্ত বটে! মা'তো এখনও বিশ্বাস করতে পাচ্ছেন না। ভেবে ভেবে দু'দিন হ'লো শয্যা নিয়েচেন।

বলিস্ কি! মা'র কি অসুখ?

অসুখ নয়, তবে এতবড় ঘা সহজে সামলাতে পাচ্ছেন না। হয়তো বাবার শোকটাই আবরে নূতন ক'রে—দেখা দিয়েছে।...হুঁ, ঠিক কথা, লিপির সঙ্গে তোমার পরিচয়টা আগে ক'রে দি'। তারপরে লিপির দিকে হাত দেখিয়ে সে ব'লে চললো, ওর নাম লিপি রক্ষিত—ওর সঙ্গে আলাপ লণ্ডনে, ও তখন অক্সফোর্ডে বি, এ, পড়তো, আর আমি ম্যানচেষ্টারের একটা কারখানায়—হাতুড়ি পিটতাম। আমরা দু'জনে ডিগ্রী নিয়ে এক সঙ্গেই আবার ভারতে ফিরলাম। তারপরে লিপির দিকে ফিরে—বললো, বড়দা'র পরিচয় তোমার কাছে আর বিশেষ কি দেব—সবইতো শুনেছ' তুমি।

লিপি উঠে এগিয়ে এসে একটা হাত বাড়িয়ে ধ'রে বললো, আপনার নামের সঙ্গে আমার বহুপূর্ব্বেই সংবাদপত্রের ভেতর দিয়ে পরিচয় হয়েছিল, তারপরে—সবই শুনেছি, যেটুকু বাকী ছিল তাও সম্পূর্ণ হ'য়ে গেল।

পরাগ লিপির বাড়িয়ে ধরা হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে সলজ্জ একটু হাসির সঙ্গে আস্তে তা'তে একটা নাড়া দিয়ে বললো, আপনার সঙ্গে পরিচয়ে আমি বিশেষ সুখী হ'লাম।

লিপি হেসে একেবারে উপ্‌চে পড়ে বললো, আপনি নয়, তুমি বলুন। ওতে আপনার নামে মানহানির ম'কদ্দমা দায়ের করবো না নিশ্চয়ই।

পরাগ হেসে লজ্জা কাটিয়ে বললো, আচ্ছা এখন্ থেকে বলবো।

মুকুট পরাগকে একটু ঠেলে দিয়ে বললো, যাও বড়দা, ওপর থেকে মা'কে আগে দেখে এসো, তারপরে অনেক কথা হবে। এক আধ বছরের কথাতো আর নয়—আরম্ভ হ'লে আর শেষ হ'তে চাইবে না। একটু তাড়াতাড়িই ওপর থেকে নেমে এসো আমাদের চায়ের আসরে ভাগ বসাতে হ'লে।

এখনও তোদের চা খাওয়া শেষ হয়নি। বেলাতো হ'য়েছে মন্দ না।—পরাগ বললো।

লিপি তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলো, সে দোষ আপনারই পরাগ বাবু। আপনি আসবেন আশাতেই। কিন্তু আমার আবার রোদ ওঠার আগে চা না খেলে মাথাটা কেমন একটু ধ'রে ওঠে।

মুকুট বললো, সে জানি ব'লেইতো তোমাকে চা'টা খেয়ে নিতে বলেছিলাম লিপি, কিন্তু শুনলে কই?

পরাগ চ'লে যেতে যেতে বললো, আমি যাব আর আসবো, তোরা আরম্ভ ক'রে দিলেও আমি এসে যোগ দিতে পারবো।

পরাগ চ'লে গেলে লিপি বললো, ওঃ, এই তোমার দাদা পরাগবাবু। আমি ভেবেছিলাম, না জানি একটা বিদ্যাসাগর গোছের লোক-টোক হবে। একে প্রফেসর, তায় আবার স্বদেশী নেতা—ভয় হবারই কথা বটে! যাক্, আশ্বস্ত হওয়া গেল।

আমারও কি ভয় ছিল কম। ১০।১১ বছর দেখা নেই—এমন কি, চিঠি-পত্তর লেখা-লেখি নেই পর্য্যন্ত!

সাধে কি আর তোমাকে Dear Gypsy ব'লে ডাকতাম লণ্ডনে।

মুকুট হাসতে লাগলো। মুকুটকে সে হাসিতে মানায়ও।

* *

*

ছুটি ফুরিয়ে গেল। কাননকেও আবার কল্‌কাতা ফিরতে হ'লো।

রাঙাদি' কিন্তু বলেছিল বেশ।—কানন, পুতুলকে

বিয়ে করলি না কেন? তা' হ'লে গরীব মাষ্টার মশায়ের ঋণ শোধ করা হ'তো ভাল ক'রেই। এখনও সময় থাকলে চেষ্টা ক'রে দেখিস্। আর পুতুল এমনই বা মন্দ মেয়ে কি? তোর মুখে পুতুলের কথা যা শুনি তা'তেতো বেশ ভাল ব'লেই ধারণা হ'য়েচে আমার।

কানন হেসে বলেছিল, এখন দেরী হ'য়ে গেছে। দু'দিন আগেও যদি এ খেয়াল আমার হ'তো রাঙাদি, তো চেষ্টা করতাম বই কি!

সেই পুতুলের বিয়ে ব্যাপারেই কেন জানিনা কানন কল্‌কাতা ফিরেই খুব উঠে প'ড়ে লেগে গেল।

কাহিনী ফোনে তা'কে ডেকে ডেকে হয়রাণ। উত্তরে কেবলই শোনে, পুতুলের বিয়ের ব্যাপারে একটু ব্যস্ত আছি, সময় পেলেই দেখা করবো।

কাননের বাড়ীতে এসেও তার দেখা মেলে না। একদিন শেষে বিরক্ত হ'য়েই কাহিনী ফোনে বললো, পুতুলের বিয়ে তা তোমার এত মাথা ব্যথা কিসের কাননদা'?

কানন উত্তরে বললো কি জানি! মাথা ব্যথা এতদিন ছিল না সত্যি, হঠাৎ দেখা দিয়েছে। মানুষের মনকে মানুষ হঠাৎই একদিন চেনে। এখন মনে হয়, পুতুলকে আমি হয়তো সত্যিই ভালবাসতাম, এতদিন তা বুঝ্‌তে পারিনি।

কানন আর কিছু বলার প্রয়োজন আছে ব'লে মনে করলো না।

রাত বেশ হয়েছিল।

পুতুলদের বাড়ী থেকে ফিরতে কাননের রাত হ'য়ে গিছলো। পরশু পুতুলের বিয়ে। কাজেই সে বাড়ী থেকে ফিরতে আজকাল তার রাত একটু হয়ই। বাড়ী ফিরেই কানন বরাবর তার পাঠাগারে গিয়ে ঢুকলো। কাল অকে Y. M. C. A. তে কি একটা নূতন বিষয়ে বক্তৃতা করতে হবে। সেজন্যে একটু প্রস্তুত হওয়া দরকার। এ ক'দিন হেলাফেলায় তা আর হ'য়ে উঠেনি। কানন তার পাঠাগারের আরাম কেদারাটা একবার দখল করে বসলে যে সহজে উঠবে না তা তার ভৃত্য শঙ্করের খুব ভাল করেই জানা ছিল। কাজেই কাননের চিরদিনের নির্দ্দেশ মত শঙ্কর তার রাতের আহার্য্য পাঠাগারের এককোণের মেঝেতে ঢেকে রেখে পাশের একটা আলমারির গায়ে ঠেস্ দিয়ে ঝিমোতে লাগলো। অল্পকাল মধ্যেই তার নিদ্রাকর্ষণ হয়েছিল। কানন কিন্তু তা লক্ষ্য করেনি।

হঠাৎ গেটের কড়াটা একটা রূঢ় ঝাঁকানি খেয়ে বিকট শব্দে আলোড়িত হ'য়ে উঠলো। কানন তা শুনতে পেল। কিন্তু একথাও কানন বুঝলো যে গেটের কড়াটা ইতিপূর্ব্বে আরও কয়েকবার আলোড়িত হ'য়েছে। তাড়াতাড়ি শঙ্করকে ডেকে তুলে বললো, যা, দেখে আয়, এত রাত ক'রে কে আবার এলো। আঃ আর পারি না।

শঙ্কর দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল। কানন শঙ্করের প্রত্যাগমনের আশায় বইটাকে বন্ধ ক'রে দু'হাত দিয়ে দু'চোখ চেপে অস্বস্তি প্রকাশের অতি সহজ একটি ভঙ্গীতে ব'সে রইলো। সে ভাবছিল,……হয়তো বা পশুপতিই।

কিন্তু যে এলো সে পশুপতি নয়, কাহিনী।

কানন তখন ভাবলো, রাত একটু বেশী হ'য়েছে এই যা নইলে কাহিনীর আগমন আশা করাই হ'তো তার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক। কাজেই বিস্ময় প্রকাশ করবার মত কিছু তার আর ছিল না। অত্যন্ত স্বাভাবিককণ্ঠে সে প্রশ্ন করলো, এত রাত করে হঠাৎ এলে যে?

কি করবো নইলে যে তোমার দেখা পাওয়া যায় না। এরই মধ্যে দুদিন এসে ফিরে গেছি। কেন, শঙ্কর কিছু বলেনি বুঝি?—ব'লে কাহিনী কাননের আরাম কেদারাটার হাতলের ওপরেই বসে পড়লো। পাশের চেয়ারটা কাহিনী লক্ষ্য করলেও সেখানে বসা তার অভিপ্রেত নয়—আর লক্ষ্য না করার কারণও কিছু থাকতে পারে না; কারণ এ ঘর কাহিনী বহুদিন এসে স্বহস্তে সাজিয়ে দিয়ে গেছে।

কানন মৃদু একটু হেসে উত্তরে বললো, শঙ্কর বলেছে, কিন্তু তোমার যে এত বেশী প্রয়োজন আমাকে তা আমি ভাবতেই পারিনি কাহিনী। আমাকে কারও এত প্রয়োজন হ'তে পারে এ ধারণা সত্যি আমার ছিল না।

কাহিনীরও যে তেমন বিশেষ প্রয়োজন কাননকে দিয়ে

ছিল এমন নয়, কাজেই কাননের কথার উত্তর দিতে গিয়ে কাহিনী বিপদে পড়লো। কি যেন সে জড়িয়ে জড়িয়ে বলতে যাচ্ছিল, কানন বাধা দিয়ে তার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে বললো, এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই কাহিনী। যৌবনের ধর্ম্মই এমন যে, বিশেষ প্রয়োজন না থাকলেও তার গরজ দেখিয়ে বেড়ানো চাইই চাই। নইলে কি অমূল্য পদার্থ যেন ফস্কে যাবে বলে ভয় হয়। ফস্কে যে না যায় এমনও না। আর তোমার তো সত্যিই প্রয়োজন আছে। পুতুলের বিয়েয় আমার এতদূর মেতে ওঠাটা তুমি যে বরদাস্ত করতে পারবে না সে তো আমি জানিই। সেই জন্যেই তোমার আসা, তাই না?

কাহিনী হঠাৎ কাননের হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, খুব হয়েছে কাননদা'। আজকালকার ছেলেদের অপ্রিয় সত্য বলে বাহবা পাবার একটা সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিয়েছে, কিন্তু আসলে তারা অপ্রিয় কথাই বলে, সত্য তাতে থাকে না একবর্ণও। তোমার আবার সে ব্যাধিটা একটু অতিমাত্রায়। পুতুলের বিয়ের তোমার মাতাতো দূরের কথা, পুতুলের সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'য়ে গেলেও আমার মাথা ব্যথা হ'তো না।

কানন তার বাক্যশেষের সঙ্গে সঙ্গে এত জোর দিয়ে হেসে উঠলো যে কাহিনী রীতিমত ভয় পেয়ে গেল। কাননের দুঃসাহস যে কতখানি তা সে জান্‌তো কাজেই সে ব'লে উঠলো, না, তুমি দেখছি আজকাল সাধারণ শীলতা জ্ঞানেরও বাইরে চ'লে গেছ। আমি ব'লেই তাই,—অন্য কোন মহিলার মুখের ওপর যদি তুমি এমন করে হেসে উঠতে তো সে কি ধারণা করতো বল'তো?

কানন মৃদু একটু হেসে বললো, কি ভাবতো? ভাবতো একটা ব্রুট্‌?

কাহিনী অকারণে জোর দিয়ে বললো, না।

কানন আবার হেসে বললো, কিন্তু অন্য কোন মহিলা আর তোমাতে যে অনেক তফাৎ কাহিনী। তোমার সামনেই শুধু অমন ক'রে হাসতে পারি, পুতুলের সামনেও না, ঝর্ণার সামনেও না, আর পারি রাঙাদি'র কাছে—যার কাছে কিছুই আমার বাধে না।

কাহিনী কেদারার হাতল ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, তুমি সবার কাছেই পার কাননদা', তোমার দুঃসাহসের আর সীমা নেই।······ওকি, তোমার খাবার ঢাকা দেওয়া রয়েছে যে। এখনও খাওনি, আর খাবে কত রাত্তিরে শুনি? এম্‌নি রোজই খেতে আজকাল রাত হয় বুঝি? শরীরের ওপর তোমার একটুও যত্ন নেই আজকাল। শঙ্কর বুঝি হাল ছেড়ে দিয়েছে?

তারপরে শঙ্করকে চীৎকার ক'রে ডাকলো। শঙ্কর নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাহিনীর সঙ্গে আগত কাহিনীদের বাড়ীর চাকর নসীরামের সঙ্গসুখ পরিহার করতে বাধ্য হ'য়ে কাহিনীর কাছে এসে দাঁড়ালো। কাহিনী শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করলো, শঙ্কর, আজকাল রোজই কি বাবুর রাতের খাবার এম্‌নি ঢাকা থাকে?

কানন তাড়াতাড়ি শঙ্করকে বিদায় দিয়ে বললো, তা ওকে ডাকা কেন কাহিনী? আমাকে জিগ্যেস্ করলেই তো উত্তর পেতে। ও বেচারী একেই বেকুব, তা'তে আবার মেয়েদের ধমক-ধামকে মোটেই অভ্যস্ত নয়, আর একটু হ'লেই কেঁদে ফেলতো হয়তো। এই মেয়েদের ভয়েই ও বেচারী আর কোথাও চাকরী বজায় রাখতে পারলে না, বিয়ে কখনও ও করবে না।

কাহিনী বললো, থাক্ কাননদা', শঙ্করের জন্য আমার কিছুমাত্র মাথা ব্যথা নেই। তুমি উঠে এখন খেয়ে নাও। তারপরে আমি এখান থেকে উঠবো।

কানন বললো, কিন্তু খেয়ে দেয়ে আমি যে আর পড়তে পারি না কাহিনী। কাল আবার Y. M. C. A.তে একটা লেক্‌চার দিতে হবে, অথচ কিছুই তৈরী হয়নি।

কাহিনী বললো, তা এতদিন হুঁস্ ছিল না? আচ্ছা, খেয়ে নাওতো আগে, তা'পর সে বোঝা যাবে'খন।

ব'লে কাননের খাবারের ঢাকাটা তুলে আসনটা ঠিক ক'রে পেতে দিয়ে পাশেই মেঝের ওপরে এমন ভাবে ব'সে পড়লো যে কানন আর আপত্তি তুলতে সাহসী হ'লো না। ধীরে ধীরে আসন গ্রহণ ক'রে ব'সে বললো, তোমার যে ওদিকে রাত হ'য়ে যাচ্ছে কাহিনী। বাড়ীতে সবাই ভাববে না তো আবার?

কাহিনী বললো, বাড়ীতে ব'লে এসেছি যে তোমার এখানে আসছি, তা ভাবনার আবার কি আছে ?

কানন মুখে তখন লুচি পুরে দিয়েছিল, কাজেই মুখ চেপেই একটু হেসে বললো, কিন্তু আমি যদি তোমার অভিভাবক হ'তাম কাহিনী তা' হ'লে ভাবনার আমার সীমা থাকতো না।

কাহিনী উঠে যাবার ভাণ ক'রে বললো, তবে আমি চল্লাম কাননদা'।

কানন বললো, তা যাও, আমি বারণ করবো না। এর পরে যদি আবার ঘুম পাড়িয়ে যাবার সঙ্কল্প কর' তা' হ'লে কাল আমার লেক্‌চার দেওয়াই আর হবে না।

না, আমি যাব না। তোমাকে ঘুম পাড়িয়েই তবে যাব। ব'লে কাহিনী আবার ঠিক হ'য়ে বসলো।

কানন বললো, লক্ষ্মীটি, যাও।

না, আমি কিছুতেই যাব না।

কানন হেসে উঠলো। কি ভেবে—তা সেই জানে। কাহিনী কিছুক্ষণ মাথা নীচু ক'রে নীরবে ব'সে রইলো, তারপরে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আচ্ছা, চল্লাম কাননদা'।

না, যেওনা কাহিনী। তা' হ'লে আমি খাব না কিন্তু। এই হাত তুলে ব'সে রইলাম। ব'লে কানন হাত তুলে অদ্ভুত একপ্রকার ভঙ্গীতে ব'সে রইলো।

কাহিনী ফিরে দাঁড়ালো। আবার এসে পূর্ব্বস্থানে বসলো। তারপরে বললো, তুমি যেন কি কাননদা'। তোমার ভেতরে মায়া-মমতা ব'লে কোন জিনিষ নেই।

কানন আবার হাসতে গিয়ে থামলো, বললো, এ অপবাদ আমার অতি বড় শত্রুতেও কোনদিন দেয়নি কাহিনী।

থাক্, তোমার সঙ্গে আর তর্ক করবো না কাননদা'। তর্ক ক'রে কোন লাভ নেই। তর্ক করতে গিয়ে মাঝে থেকে কাজের কথা যাই ভুলে। যে জন্যে আমার আসা,—পরাগদা'র ভাই মুকুট যে ফিরে এসেছে তা শুনেছ ? ব'লে উত্তরের আশায় কাননের মুখের দিকে উৎসুক হ'য়ে তাকিয়ে রইলো।

কানন নীরবে আহার ক'রে চলেছিল। কাহিনী আবার বললো, আমার কথার উত্তর দাও কাননদা'।

কানন তখন বললো, ওকথার উত্তর দিলেই অনেক কথা উঠে পড়বে। এই যেমন,—লিপি রক্ষিতকে তোমার কেমন মনে হয় ? ওদের বিয়ে হ'য়েছে কিনা ? না হ'য়ে থাকলে হবে কিনা ? ইত্যাদি, আরও কত কিছু।

কাহিনী বললো, তা' হ'লে ওদের খবর তুমি পেয়েছ ?

হুঁ, পেয়েছি। কিন্তু এখনও ওদের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। মুকুট কাল ফোন করেছিল, তা'তেই সব জানতে পেলাম। লিপি রক্ষিতের সঙ্গে ফোনে কথা হ'লো। বেশ মেয়ে কিন্তু। ওদের চায়ের আসরে আমার নেমন্তন্নও কাল হয়েছিল, কিন্তু পুতুলদের বাড়ী গিয়ে আটকে পড়েছিলাম, কাজেই যাওয়া আর হয়নি। লিপি রক্ষিত একটু চটেছে হয়তো। তা চটুক।

তোমার এমনি স্বভাব কাননদা' যে মেয়েরা তোমার ওপর না চ'টেই পারে না।······না, না, ও লুচিখানাও তোমাকে খেয়ে উঠতে হবে, পাতে রাখলে চলবে না, তা' হ'লে আমি রাগ করবো কিন্তু।

কানন অবশিষ্ট লুচিখানা নিঃশেষ ক'রে হেসে ফেলে বললো, এখন শঙ্করকে কি ক'রে মুখ দেখাবো বল'তো ? ও কত সাধ্য-সাধনা ক'রে আমাকে ছ'খানার বেশী লুচি গেলাতে পারে না, আর আজ একেবারে আটখানা। ও বেচারীর স্ত্রীলোক-ভীতি আরও বেড়ে যাবে এতে।

কাহিনী লজ্জিত হ'য়ে বললো, তোমার মুখে আর কিছুই আটকায় না। নাও, উঠে এখন হাত ধোও। পানতো খাওনা, শঙ্কর মশলা কিছু রেখে যায়নি ?

আছে বোধ হয় টেবিলের ওপর।

কাহিনী টেবিলের ওপর একটা প্লেটে মশলা ধ'রে দেওয়া আছে দেখে বললো, আসি তবে কাননদা'। পরশু আমাদের philosophyর এক paper পরীক্ষা হবার কথা আছে, কিছু পড়াশুনো হয়নি দেখেই তোমার কাছে বুঝতে এসেছিলাম, কিন্তু তোমার তো মোটেই সময় নেই দেখছি। আচ্ছা, আসি।

কানন তার পিছনে ডেকে বললো, বাড়ী ফিরে গিয়ে—ফোনে একথা জানালেইতো হ'তো ভাল। থাক্, এখন রাত

হ'য়ে গেছে, আজ আর হবে না। কাল সকালে আমি যাব'খন তোমাদের ওখানে কাহিনী।

কাহিনী ফিরে বললো, সত্যি যাবে তো?

হুঁ, যাব। না গেলে নিশ্চয় ফোন করবো।

হুঁ, যেও। নইলে সত্যি পাশ করতে পারবো না। এক অক্ষরও এ পর্য্যন্ত পড়িনি।

আচ্ছা যাব, নিশ্চয় যাব।

তারপরে শঙ্করকে ডেকে কাহিনী ও নসীরামের সঙ্গে তাদের বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছ খবরটা এনে দিতে ব'লে কানন আবার তার পাঠাগারে গিয়ে ঢুকলো। আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিতেই তার মনে পড়লো, সীমার কথা, রাঙাদি'র কথা, মুকুট-লিপির কথা, ঝর্ণার কথা, প্রদীপের কথা, আরও অনেকের কথা, কাহিনীর কথাতো আছেই; কিন্তু একবারও তার আগামী কাল Y. M. C. A.তে যে বিষয়ে বক্তৃতা দিতে হবে তা মনে পড়লো না। ঘরের বাতিটা অকারণে জ্বলছিল। কখন যে শঙ্কর ফিরে এসে বাতিটা নিবিয়ে দিয়েছে তা সে জানেও না।

* *

*

ওভারটুন্ হল থেকে বক্তৃতা শেষ ক'রে কানন যখন বেরুতে যাচ্ছিল তখন কাহিনী ও লিপি রক্ষিত তার সামনে এসে দাঁড়ালো। লিপি রক্ষিতকে কানন চিনতে পারেনি নিশ্চয়ই। লিপি রক্ষিতই প্রথম কথা কইলো, আপনার নাম আমি অনেক শুনেছি। ওঃ, আপনার কি চার্মিং ডেলিভারি! আমি হাঁ ক'রে আপনার বক্তৃতা শুনছিলাম। সত্যি, কাহিনী যা বলেছে তা' তো ঠিকই। আপনার আজকের বক্তৃতা না শুনলে আজীবন এর জন্যে আমাকে আপশোষ করতে হ'তো।

কানন মৃদু একটু হেসে বললো, আপনার ভাল লেগেছে তা' হ'লে? কিন্তু আপনি শুনতে আসবেন জানলে আর একটু তৈরী হ'য়ে আসতাম।

লিপি হেসে বললো, আমি যে কে সে পরিচয় তো আপনি নিলেন না কাননবাবু।

কানন বললো, ফোনে আপনার সঙ্গে কথা ব'লেই আপনাকে কতকটা চিনে নিয়েছিলাম, আর আজ কাহিনীর সঙ্গে দেখে চিনতে একটুও কষ্ট হয়নি, কাজেই অপ্রয়োজন-বোধে আর জিজ্ঞাসা করিনি।

লিপি মৃদু একটি হেসে বললো, একটা কথা কাননবাবু, 'আপনি' ব'লে কেউ আমার সঙ্গে কথা চালালে আমি ভারী বিপদে প'ড়ে যাই, 'তুমি' বললে স্বস্তি বোধ করি।

কাহিনী লিপির হাতের কনুইয়ের কাছে ধ'রে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললো, ওসব ঘরোয়া আলাপ এখন থাক্, পরে হবে।

কানন তাড়াতাড়ি বললো, একটা ট্যাক্সি ডাকি কাহিনী? তোমরা কোথায় এখন যাবে শুনি? তোমাদের সঙ্গে মুকুট আসেনি?

কাহিনী উত্তরে বললো, ডাক'। তোমার যদি কোন কাজ এখন না থাকে তো চল' একবার লেক থেকে বেড়িয়ে আসি। প্রদীপের গাড়ীতে উঠে ঝর্ণা আর মুকুটদা' বোধ হয় লেকেই গেছে।

কানন একটা ট্যাক্সি ডেকে কাহিনী আর লিপিকে তা'তে উঠিয়ে নিজেও উঠে ব'সে বললো, আমি কিন্তু তোমাদের সঙ্গে বেশীক্ষণ থাকতে পারবো না। পুতুলদের বাড়ীতে আমাকে একবার যেতেই হবে।

লিপি হাতের ভ্যানিটি ব্যাগটা কোলের ওপর রেখে বললো, কাননবাবু, আপনার আজকের বক্তৃতার প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে আমার মতের মিল থাকলেও আপনার কতকগুলো reasoning আমি কিছুতেই মেনে নিতে পাচ্ছি না।

কানন একটু চকিত হ'য়ে আবার নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, আমি তো মেনে নিতে কাউকে বলিনি। Reasoning লোক হিসেবে vary করে, কাজেই না মিললেও দুঃখিত হবার কিছু নেই। আমার আসল কথাটার সঙ্গে তোমার মতের মিল থাকলেই যথেষ্ট। তাও খুব বেশী লোকের নেই ব'লেই আমি জানি। কাহিনী তাদেরই দলের একজন।

লিপি কাহিনীর গা টিপে কৌতুক-হাসিতে উপ্‌ছে

প'ড়ে বললো, তাই নাকি কাহিনী ? এসব ultra modern ideas এর সঙ্গে থাপ থাওয়াতে পারিস্ না বুঝি ?

কাহিনী লিপিকে আঘাত করবার জন্তেই বললো, পারি কেমন ক'রে ? তোদের মত অনাগত যুগের লোক তো আর আমি নই।

কানন তাড়াতাড়ি লিপির পক্ষ নিয়ে ব'লে উঠলো, যাদের স্বীকার করবার সাহস আছে তারাই হ'লো অনাগত যুগের লোক তাদের চোথে যাদের স্বীকার করবার সাহস পর্য্যন্ত নেই।

এমনি নানা তর্ক-বিতর্কের মাঝ দিয়ে তারা লেকে এসে যথন পৌছলো তথন লিপির হাত-ঘড়িতে আটটা বেজে পাঁচ মিনিট হ'য়েছে। ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়ে তারা পাইচারি ক'রে বেড়াতে বেড়াতে হ্যাঙ্গিং ব্রীজটার ওপর এসে দাঁড়ালো। সেথান থেকে লেকের দৃশ্য অতি মনোরম দেথাচ্ছিল। ছু'পারের স্তিমিতাভ আলোকমালা, আকাশের মস্ত চাঁদ ও সুবিস্তৃত জলরাশি···এমন একটা মায়ারাজ্য সৃজন ক'রে বসেছিল যে তাদের কথাবার্ত্তা আলাপ-আলোচনা আপনিই বন্ধ হ'য়ে গেল। সকলেই সবার উপস্থিতির আনন্দটুকু অনুভব ক'রে তৃপ্তিলাভ করছিল। মাঝে মাঝে তাদের সে নীরব নিবিড় অনুভূতির তাল কেটে যাচ্ছিল মোটরের হর্ণ ও মোটর-বাইকের রোম্যান্টিক আর্ত্তনাদে। মাঝে মাঝে আবার ও-পারের মোটরের মাথার ধারালো আলোগুলো ঝক্ ক'রে এসে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তাদের চম্‌কে তুলছিল।

লিপি হঠাৎ ব'লে উঠলো, এ ব্রীজটার ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার ভেনিসের কথা মনে পড়ছে।

কানন সবার অলক্ষ্যে একটু হেসে নিয়ে বললো, আমাদের দেশের বাড়ীর পেছনে একটা বাঁশ বাগান ছিল, তার পাশ দিয়ে একটা থাল গিছলো, আর সেই থালের ওপর ছিল একটা সাঁকো, কত ছোটবেলায় দেথা, সেই সাঁকোটার কথাই আমার মনে পড়ছে।

কাহিনী হেসে ফেলে বললো, তোমার ঠাট্টা রাথ' কাননদা'। লিপি তোমার ওসব ঠাট্টা ঠিক ধরতে পারে না। ও ভাবে, তুমি বুঝি সত্যি কথাই ব'লে চলে'ছ।

কানন বললো, তার মানে ? ঠাট্টা আমি মোটেই করছি না। মিস্ রক্ষিত ভেনিস্ দেথে এসেছে, কাজেই তার মনে ভেনিসের কথা জাগচে ; আর আমি দেশে থাকতে থাল দেথেছি, কাজেই দেশের কথাই আমার মনে জাগছে। এর মধ্যে ঠাট্টা কোথায় ? বরং মিস্ রক্ষিতের হাত থেকে তার ভ্যানিটি ব্যাগটা দেথার নাম ক'রে চেয়ে নিয়ে যদি জলে ফেলে দিয়ে বলতাম, হায় ! হায় ! প'ড়ে গেল যে ! তবেই হ'তো তা ঠাট্টা !

লিপি রক্ষিত একটু বিশেষ বিব্রত হ'য়ে তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলো, ভ্যানিটি ব্যাগটা আমার পক্ষে luxury মোটেই নয়, একটা মস্ত necessity, কিন্তু কেউ তা বিশ্বাস করে না। আর ভেনিস্ যারা দেথেছে একবার তারা ভেনিসের কথা না ব'লে থাকতেই পারে না কাননবাবু।

কানন মনে মনে হাসলো। তারপরে বললো, বেশ উপভোগ করছিলাম, কিন্তু আর তো আমার পক্ষে থাকা চলে না। তোমরা যাবে তো চল', পথে আমি নেমে যাব'থন। পুতুলদের বাড়ী আমাকে একবার যেতেই হবে।

পুতুল কে কাননবাবু ?—ব'লে লিপি ব্রীজ থেকে নেমে দাঁড়ালো।

কানন বললো, আমি যথন স্কুলে পড়তাম তথন জগদীশবাবু ব'লে আমার একজন প্রাইভেট্ টিউটার ছিলেন, তাঁরই ছোট মেয়ের নাম পুতুল। সেই পুতুলের কাল বিয়ে। আমি তার বিয়ের ব্যাপারেই একটু ব্যস্ত ; নইলে এমন জায়গা ছেড়ে এথন কারও যেতে ইচ্ছে করে কি ?

তবে তো আপনাকে এতক্ষণ ধ'রে রাথা আমাদের উচিত হয়নি। চলুন, একটা ট্যাক্সি দেথা যাক্। ব'লে লিপি কাহিনীর হাত ধ'রে এগিয়ে চললো।

ট্যাক্সি ডেকে যথন তারা উঠতে যাচ্ছে তথন হঠাৎ একথানা চলন্ত মোটর থেকে কে একজন চীৎকার ক'রে উঠলো, হ্যালো কাননদা'।

কানন ফিরে দেথলো, সেথানা প্রদীপের মোটর, আর তা থেকে মুথ বাড়িয়েছে মুকুট।

কানন তাড়াতাড়ি কাহিনী ও লিপিকে প্রদীপের মোটরে তুলে দিয়ে অল্প ছু'একটা কথা যা না বললেই নয়—ব'লে

ট্যাক্সিতে উঠে পুতুলদের বাড়ীর উদ্দেশ্যে বিদায় নিয়ে চ'লে গেল। আর, যাবার সময় মুকুট ও লিপিকে ব'লে গেল, একদিন তোমরা দু'জনে আমার ওখানে গেলে তোমাদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রাণ ভ'রে শুনতাম। লিপি, তোমার ভেনিসের অভিজ্ঞতা সেদিন শোনবার জন্যে আমি উদ্‌গ্রীব হ'য়ে রইলাম। যেও কিন্তু একদিন।

ট্যাক্সি চ'লে গেলে লিপি ক্ষণিকের জন্য স্তম্ভিত হ'য়ে ছিল। তারপরে সহসা কাহিনীর দিকে ফিরে বললো, কাননবাবু একটা মস্ত হাম্‌বাগ্, না?

কাহিনী তার কথা শুনে মনে মনে হাসলো। কিন্তু ঝর্ণা, প্রদীপ ও মুকুট একসঙ্গে উচ্চ হেসে উঠলো। ঝর্ণা হাসি থামিয়ে বললো, তোমার কিছু দোষ নেই লিপিদি', প্রথমদর্শনে ও লোকটাকে সবাই কিন্তু তোমার মতই ভাবে, আমরাও একদিন ভাবতাম।

•

পুতুলের বিয়ে নির্ব্বিঘ্নে শেষ হ'য়ে গেল।

বিদায়ের কালে বাপ-মাকে প্রণাম ক'রে কাননকে যখন সে প্রণাম করতে এলো তখন কানন তার মুখের দিকে চেয়ে হাসি আর কিছুতেই চাপতে পারলো না। পুতুল তার হাসির অর্থ ঠিক না ধরতে পেরে আরও লজ্জিত হ'য়ে উঠলো।

কানন হাসতে হাসতেই বললো, বাঃ, তোকে কি চমৎকার আজ দেখাচ্ছে পুতুল!

যাও। ব'লে পুতুল একটু নেতিয়ে প'ড়ে বললো, বিয়ের পরে অমন সবাইকেই একটু কেমন দেখায়।

কাননের হাসি আরও বেড়ে গেল। কানন তা চাপতে চেষ্টা ক'রেই বললো, তুই বড্ড বোকা পুতুল। মুখে যে খুসি তোর উপ্‌চে পড়ছে একেবারে। কিছুই তুই ঢাকতে শিখিস্‌নি এখনও। হরেনকে খুব ভালো লেগেছে, না?

যাও!—ব'লে পুতুল অতর্কিত কাননকে এমন ভাবে ঠেলে দিল যে, কানন আর একটু হ'লেই প'ড়ে যেত—যদি না পিছনের দেয়ালটায় বাধা পেত। পুতুল তাতে আরও লজ্জা পেয়ে ঝুপ্ ক'রে কাননের পায়ের কাছে মাথাটা নুইয়ে একটা প্রণাম ক'রে ত্রস্তে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, কাননদা', সময় পেলেই যেও কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা করতে; নইলে এমন রাগ করবো—

থাক্, আর রাগ ক'রে কাজ নেই। সময় পেলেই যাব। যা, সেখানে গিয়ে ভাল ক'রে গিন্নীপনা সুরু কর্, তারপরে একদিন গিয়ে হাজির হব'। দেখে আসবো গিন্নীপনার কেমন হাত পেকেছে তোর। ব'লে কানন ভাল ক'রে একবার পুতুলের সর্ব্বাঙ্গে দৃষ্টি বুলিয়ে এত তৃপ্তি, এত শান্তি পেল যা ইতিপূর্ব্বে সে কোন মেয়েকে দেখেই অনুভব করতে পারেনি। এমন অখণ্ড আনন্দ-ঘন পরিতৃপ্ত মূর্ত্তি সে ইতিপূর্ব্বে আর কোন নারীতেই দেখেনি।

পুতুল চ'লে যেতে যেতে হঠাৎ ফিরে এসে আবার কাননের একটা হাত চেপে ধ'রে ডাগর আনন্দ-উপ্‌ছানো দু'টো চোখ কাননের মুখের দিকে তুলে ধ'রে বললো, তোমাকে বলা হয়নি কাননদা', তোমার দেওয়া হারটার একজন যা সুখ্যাতি—

আর কিছু না বলেই সে ছুটে ঘর থেকে পালিয়ে গেল। কানন তাকে ডেকে ফেরানো প্রয়োজন বোধ করেনি, কিন্তু পুতুলে মুখটা আর একবার দেখার ইচ্ছা তার মধ্যে অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠলো। বাইরে এসে কানন দেখলো, পুতুল হরেনের পিছু পিছু গাড়ীতে উঠে বসলো। পুতুলের মুখ একটা মস্ত ঘোমটার নীচে চাপা পড়ে আছে।

কাননের মনে হ'লো, এমন আনন্দ-উপ্‌ছানো মুখ বাংলা দেশে দুর্লভ, তা'কে ঢেকে চলা বে-আইনী ক'রে দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

দেশের কথা

শ্রীসুশীলকুমার বসু

স্বামী বিবেকানন্দ

আধুনিক বাংলা তথা আধুনিক ভারতকে যাঁহারা আধুনিক পর্যায়ে আনিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের নাম বিশেষ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করিবার যোগ্য। বাংলাদেশে বিবেকানন্দের অনেক ভক্ত আছেন; তাঁহার ত্রিসপ্ততিতম জন্ম দিবসে তাঁহারা এবং ভারতীয় মাত্রেই যদি তাঁহার বাণী স্মরণ করিয়া থাকেন, তাঁহার ইচ্ছা ও কার্যকে অগ্রসর করিতে চেষ্টা করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবেই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রকাশ অকপট ও তাঁহার প্রতি ভক্তি কতকটা সার্থক হইয়াছে।

আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, "নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর" আজও আমাদের 'রক্ত ও ভাই' হইয়া উঠে নাই। মনে রাখিতে হইবে, "যাহাদিগকে আমরা নিত্য প্রবাহিত অমৃত নদী পার্শ্বে বহিয়া যাইলেও, তৃষ্ণার সময় পয়ঃপ্রণালীর জলপান করিতে দিয়ে আসিয়াছি··· যাহাদিগকে আমরা অদ্বৈত বাদের কথা শুনাইয়াছি, প্রাণপণে ঘৃণা করিয়াছি,···যাহাদের বিরুদ্ধে আমরা লোকাচারের মতবাদ আবিষ্কার করিয়াছি, যাহাদের আমরা মুখে বলিয়াছি সকলেই সমান, সকলেই সেই এক ব্রহ্ম, কিন্তু, উহা কখনও কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করি নাই," তাহাদের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য আজও করিতে পারি নাই। আজও যে দেশের লক্ষ লক্ষ লোক অজ্ঞতা, দারিদ্র্য ও মনুষ্যত্বনাশকারী নিত্য অসম্মানের মধ্যে জীবনযাপন করিতেছে সেকথা আমরা ভুলিয়া রহিয়াছি।

যাঁহারা বিদ্বান, জ্ঞানী, বুদ্ধিমান বা ধার্ম্মিক, এমন লোকদের জীবিতকালে আমরা শ্রদ্ধা ও সম্মান করি, এবং তাঁহাদের অভিজ্ঞতা, উপদেশ ও শিক্ষা সমাজের উপকারে লাগে। কিন্তু তাঁহাদের মৃত্যুর পরে সাধারণতঃ আমরা সেই সব লোকেরই পূজা করিয়া থাকি, যাঁহারা পুরাতনকে অস্বীকার বা অতিক্রম করিয়া নূতন পথে যাত্রা করিয়াছেন বলিয়া সমাজ ও দেশের অগ্রগতি সম্ভব হইয়াছে; যাঁহারা চিন্তার রাজ্যে বিপ্লব আনিয়াছেন বলিয়া জাতীয় চিত্তে গতি-বেগ সঞ্চারিত হইয়াছে; যাঁহারা গতানুগতিক জীবনযাত্রাকে মমতা এবং ভয় না করিয়া আঘাত করিতে পারিয়াছেন বলিয়া লোকে নূতন নূতন সত্যের সাক্ষাৎ পাইয়াছে।

তবুও, সাধারণ ক্ষেত্রে মানবপ্রকৃতি রক্ষণশীল। যদিও, সভ্যতার সমগ্র ইতিহাসই পুরাতনকে পরিত্যাগ করিয়া নূতনকে গ্রহণ করিবার কাহিনী, যদিও বর্ত্তমানে আমরা যাহাকে পুরাতন ও চিরদিনের বিশিষ্টতা বলিয়া মনে করিতেছি তাহাকেও আরও অধিকতর পুরাতন বৈশিষ্ট্যকে বহু বাধাবিঘ্নের মধ্যে স্থানচ্যুত করিয়া তবে প্রবর্ত্তিত হইতে হইয়াছিল তবুও, এই ইতিহাসের জ্ঞান বর্ত্তমান কাল সম্পর্কে আমাদের অধিকাংশ লোকেরই বিশেষ কোন কাজে আসে না।

এইজন্য বর্ত্তমান কালের উপর যাঁহাদের গভীর প্রভাব আমরা অনুভব করি, আমাদের অনেক উন্নতি ও গৌরবের জিনিসের জন্য, যাঁহাদের নিকট আমাদের অপরিশোধ্য ঋণের কথা আমরা স্মরণ না করিয়া পারি না, নূতন যুগের, নূতন চিন্তার এবং নূতন ধারার প্রবর্ত্তক সেই সব মহাপুরুষদের যে সকল চিন্তা বা চেষ্টা আজও সম্পূর্ণভাবে আমাদের হইয়া উঠে নাই বা সমাজে সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই, তাঁহাদের জীবনকথা স্মরণ করিবার সময় তাঁহাদের সে সকল চিন্তা বা চেষ্টার কথা আমরা মনে করিতে চাহি না।

তাই, বিদ্যাসাগরের স্মৃতি সভায় এমন ঘটনা ঘটে যে, তাঁহার অনেক গুণের কথা হয়ত বিস্মৃতভাবে এবং অলঙ্কারের সহিত বলা হইল, কিন্তু, যে বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য তাঁহাকে অনেক ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে হইয়াছিল, সাহসের পরিচয় দিতে হইয়াছিল, নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল এবং সমাজের উপর যাহার ফল সম্ভবতঃ সর্ব্বাপেক্ষা দূর-প্রসারী, তাহার কথা আদৌ উল্লেখ করা হইল না, বা নিয়ম রক্ষা করিবার মত কোনপ্রকারে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইল মাত্র। কিন্তু, আমাদিগকে এই দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের অনেকদিনের জড়তাগ্রস্ত সুপ্ত মনকে নানাদিক দিয়া নাড়া দিয়াছিলেন; 'ছুঁৎমার্গ' পরিহারের কথা তাহার মধ্যে অন্যতম। এই কথাটি সুবিধামত আমরা অনেকে ভুলিয়া যাইতেছি।

মাদাম হালিদা এদিব হানুম

তুরস্কের নবভাবের একজন প্রভাবশালী প্রতিনিধি, বিখ্যাত লেখিকা এবং শিক্ষাব্রতী মাদাম হালিদা এদিব হানুম সম্প্রতি ভারতে অবস্থান করিতেছেন। পৃথিবীর গতিশীল মনের সহিত আমাদের সংযোগ যত ঘনিষ্ঠ হইবে, ততই আমাদের জাতীয় জীবনে শক্তি সঞ্চারিত হইবে, সংকীর্ণতা ও জড়ত্ব ঘুচিবে। তুরস্কের সহিত আমাদের সংযোগের অন্যদিক দিয়াও একটু বিশেষ মূল্য আছে। তুরস্ক মুসলমান দেশ এবং প্রগতিশীল মুসলমান দেশ; এই দেশের সহিত সম্পর্ক আমাদের শিক্ষিত মুস্‌লিম তরুণদের মধ্যে সংকীর্ণতা বর্জ্জন ও অগ্রগতির জন্য নূতন প্রেরণা আনিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ তুরস্কের পূর্ব্বের অবস্থা আমাদের ন্যায় নানাদিক দিয়া (পরাধীনতা ব্যতীত) শোচনীয় ছিল; যে যাদুর স্পর্শে, তুরস্ক বহুশত বৎসরের জীর্ণতা অত্যল্প কালের মধ্যে ত্যাগ করিয়া আধুনিক উন্নতিশীল জাতিগুলির পর্য্যায়-ভুক্ত হইল, তাহার সন্ধান রাখিবার ও তাহার ফলাফল লক্ষ্য করিবার প্রয়োজনও আমাদের আছে। মাদাম হালিদা যে দেশ হইতে আসিতেছেন সেখানে কিছুদিন পূর্ব্বেও নারীদের কঠোর অবরোধের মধ্যে জীবনযাপন করিতে হইত আর আজ সেখানে নারীরা সর্ব্বপ্রকারে পুরুষের সহিত সমান অধিকার লাভ করিয়াছেন; শিক্ষিতা মেয়েদের সংখ্যা শিক্ষিত পুরুষদের সমান; সর্ব্বপ্রকার কাজকর্ম্মে তাঁহাদের প্রবেশাধিকার আছে; বর্ত্তমানে সেখানে মহিলা বিচারক, পুলিশ কর্ম্মচারী, চিকিৎসক, আইনজীবি এমন কি মহিলা সরকারি উকিলের অভাব নাই। এই সকল সামাজিক সংস্কারই তুরস্কের রাজনীতিক শক্তিলাভ সম্ভব করিয়াছে। আমাদের রাজনীতিক দুর্ব্বলতার পশ্চাতে যে আমাদের বহুবিধ সামাজিক দুর্ব্বলতা আছে, এবং তাহা দূর না হইলে যে আমাদের রাজনীতিক শক্তিলাভ সম্ভব হইবে না, সেকথা ভুলিলে চলিবে না।

দিল্লীর জামিয়া মিলিয়া ইস্‌লামিয়ার উদ্যোগে মহাত্মা গান্ধী শ্রীযুক্তা নাইডু, ডাঃ আন্‌সারি প্রভৃতির ন্যায় ভারতের বিশিষ্ট মনীষিদের সভাপতিত্বে ইনি কয়েকটি বক্তৃতা দিয়াছেন। ফেব্রুয়ারী মাসে, ইঁহার কলিকাতা আগমন কালে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইঁহাকে এক্‌স্‌টেন্‌সন্ লেকচারার নিযুক্ত করিয়া বিশেষ সুবিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ও কংগ্রেস

জেনোয়া হইতে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু (বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক) সরকার ও কংগ্রেস নেতাগণ যুগপৎ বাংলার উপর যে অবিচার করিতেছেন একই সময়ে তাহার বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য বাংলা কংগ্রেসের সকল দলের কর্ম্মীদের আত্মকলহ ভুলিয়া একযোগে কাজ করিতে আহ্বান করিয়াছেন। অন্য প্রদেশের লোকদের বাঙ্গালী বিদ্বেষে বাঙ্গালীদের ক্ষুব্ধ বা শঙ্কিত হইবার কারণ নাই বরং গৌরবের কারণ এইজন্য আছে যে, যোগ্যতা এবং শ্রেষ্ঠতাই অপরের মনে ঈর্ষার উদ্রেক করে। কিন্তু, যদি আমাদের আত্মকলহ এবং একযোগে কাজ করিবার ক্ষমতার অভাবে কেহ আমাদের উপর অন্যায় সুযোগ লইবার সুবিধা পায় তবে তাহা লজ্জার কারণ হইয়া উঠে, এবং এই আত্মকলহের ফলে যদি বাহিরের লোকের নিজেদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ও শালিশী করিবার অবসর ঘটে তবে, এই লজ্জা,

গ্লানিতে গিয়া পৌছায়। বাংলার কংগ্রেসকর্ম্মীদের অনৈক্যের ফলে বারবার বাংলার ভাগ্যে এই লজ্জা ও গ্লানি ঘটিয়াছে। সুভাষবাবুর এই ঐক্যের আহ্বান যদি তাঁহাদের নিকট ব্যর্থ না হয়, ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থ যদি দেশের বৃহত্তর স্বার্থের উপরে স্থান না পায়, যদি **'দল-গঠন'** অপেক্ষা **'দল-পাকান'**কে বড় করিয়া তুলিয়া সকল দলেরই মূলনীতিকে ক্ষুণ্ণ করিবার ইচ্ছা তাঁহাদের না থাকে তবে, দেশের বর্ত্তমান দুর্গতি দূর হইতে পারে।

বাধ্যতামূলক খাদি পরিধানের সর্ত্তকে সুভাষবাবু অনাবশ্যক ও প্রগতি-বিরোধী বলিয়াছেন। যাহার বৃহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বহুলোকের সহযোগিতা অত্যাবশ্যক এমন কোন বড় প্রতিষ্ঠানের খুঁটিনাটি নিয়মের কঠোরতা থাকা কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নহে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলি সম্বন্ধে আমাদের পরমুখাপেক্ষিতা না ঘুচিলে আমাদের আর্থিক উন্নতি ও তাহার প্রতি নির্ভরশীল রাষ্ট্রিক উন্নতি যে সম্ভব নহে সে কথা অনেকটা সর্ব্ববাদীসম্মত। এই সকল প্রয়োজনীয় জিনিষের মধ্যে বস্ত্রই যে প্রধান, তাহাতেও সংশয় নাই। কিন্তু, এমন লোকের সংখ্যা কম নহে, সম্ভবতঃ অনেক বেশী, যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, বর্ত্তমান প্রতিযোগিতার দিনে বহুসংখ্যক কলের প্রতিষ্ঠার দ্বারাই মাত্র এবিষয়ে স্বাবলম্বী হওয়া সম্ভব। কারখানার যেসব কুফল, কিরূপ ব্যবস্থায় তাহা কম হইতে পারে বা কিরূপে তাহার প্রতিকার হইতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখিবার প্রয়োজন থাকিলেও, কল বর্জ্জন করিয়া চলা সম্ভব হইবে না। এই যে মতদ্বৈধ, ইহা দেশের আভ্যন্তরীণ আর্থিক ব্যবস্থা সম্পর্কে, ইহা কংগ্রেসের প্রধান লক্ষ্য সম্পর্কে নহে। অথচ, এই দফাটিকে আবশ্যিক করিয়া খদ্দরের উপর আস্থাহীন স্বাধীনতা-কামী বহুলোকের পক্ষে বাধা উপস্থিত করা হইয়াছে।

কংগ্রেসের বর্ত্তমান গঠনবিধিকে সুভাষবাবু নিন্দা করিয়াছেন। ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার পথে তিনি বম্বে বলিয়াছিলেন যে, কংগ্রেসের বর্ত্তমান ব্যবস্থাপকগণ একটি বিশেষ দলের লোক; যতই দেশপ্রেমিক হউন, এই দলের বিরোধীদের কংগ্রেস ব্যবস্থাপক সভায় স্থান নাই। এইজন্য মহাত্মার কংগ্রেস ত্যাগ তিনি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই, কারণ তাঁহার গোঁড়া ভক্ত ও অনুচরদের দ্বারাই এখনও কংগ্রেস অধিকৃত।

নিখিল-ভারত পল্লী-শিল্প সঙ্ঘ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, শুধুমাত্র খদ্দর প্রচারের দ্বারা পল্লীসংগঠনের কাজ অধিক দূর অগ্রসর হইবে না; অন্যান্য ম্রিয়মান শিল্পেরও পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা বলিয়াছিলাম এবং এখনও বলি, শুধুমাত্র ম্রিয়মান শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠার দ্বারাও কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে না। মানুষের রুচি এবং প্রয়োজন পরিবর্ত্তিত হইয়া যাওয়ায় মৃত বা ম্রিয়মান অনেক শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা সফল হইবে না, অথচ, নূতন নূতন দিকে চেষ্টা করিবার অনেক ক্ষেত্র রহিয়াছে। বুদ্ধিকে সকল সময় মুক্ত ও সজাগ রাখিয়া সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক পন্থাই আমাদের অনুসরণ করিতে হইবে। আমাদের দেশের অনেক দিনের প্রাচীন জিনিষ বলিয়া কোন কিছুর উপর অহেতুক মমতা ক্ষতির কারণ হইবে।

এই সকল নূতন প্রতিষ্ঠানের দ্বারা কংগ্রেসের কার্য্য কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে কিনা, সেকথা পরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

কলিকাতা কর্পোরেশনে বাঙ্গালী নিয়োগ

কলিকাতা কর্পোরেশনের হেল্‌থ্‌-অফিসারের জন্য যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইবে তাহাতে যেন এই কথার উল্লেখ থাকে যে, আবেদনপত্র মাত্র বাঙ্গালীদের নিকট হইতেই গৃহীত হইবে, এই মর্ম্মে শ্রীযুক্ত মদন মোহন বর্ম্মণ কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় উক্ত বিষয় বিবেচনার সময় এক সংশোধক প্রস্তাব আনয়ন করেন। মেয়র ও অন্য কয়েকজন কাউন্সিলরের অনুরোধে শ্রীযুক্ত বর্ম্মণ এই বলিয়া প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করেন যে, তিনি এবিষয়ে একটি বিতর্ক উত্থাপন করিবার জন্য প্রস্তাবটি আনয়ন করিয়াছিলেন।

বিতর্ক উত্থাপিত হইয়া কর্ম্মকর্ত্তাদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হওয়ায় ভালই হইয়াছে। বিজ্ঞাপনে শুধুমাত্র বাঙ্গালী প্রার্থীদের নিকট হইতে আবেদনপত্র চাওয়াটা হয়ত একটু অশোভন প্রাদেশিকতার পরিচয় হইত, তবে, কার্য্যতঃ বাঙ্গালী

নিয়োগের নীতি সর্ব্বতোভাবে অনুসৃত হওয়া উচিত, —অবশ্য যোগ্য বাঙ্গালী পাওয়া গেলে। কলিকাতা বাংলার সহর হইলেও বাঙ্গালীর সহর নহে। এখানে পৃথিবীর বহুদেশের এবং বিশেষ করিয়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বহুলোক স্থায়ী এবং অস্থায়ীভাবে বাস করেন। ইঁহাদের খুব বেশীর ভাগ ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতি কার্য্যের জন্য অর্থাৎ নিজেদের স্বার্থের জন্য এখানে অবস্থান করেন এবং এখনও এই প্রদেশের অধিবাসী হন নাই। ইঁহারা এখানে যে টাকা পয়সা খরচ করেন বা ট্যাক্স, কর প্রভৃতি দেন, তাহা ইঁহারা এইদেশ হইতেই আয় করিয়াছেন এবং তাহা বাঙ্গালীরা পাইতে পারিতেন। কিন্তু, কলিকাতা কর্পোরেশনের ব্যবস্থার সুবিধা অসুবিধার ফলভোগ ইঁহাদিগকেও করিতে হয় বলিয়া, তাহার ব্যবস্থায় ইঁহাদের কিছু হাত থাকা বাঞ্ছনীয় হইতে পারে। তবে, ইহার চাকরিগুলি যথাসম্ভব বাঙ্গালীদেরই পাওয়া উচিত।

সাম্প্রদায়িকতা বনাম প্রাদেশিকতা

পূর্ব্ব আলোচিত প্রস্তাবের বিরোধিতা করিতে যাইয়া খান্ বাহাদুর আবদুল মমিন, বাঙ্গালী নিয়োগের চেষ্টাকে সাম্প্রদায়িকতা বলিয়া অভিহিত করেন, এবং বলেন, প্রাদেশিকতাও এক প্রকারের সাম্প্রদায়িকতা।

মানুষে মানুষে যেখানেই কোন পার্থক্য সৃষ্টির চেষ্টা হয়, সেখানেই নিঃসন্দেহ তাহাকে সঙ্কীর্ণতা বলা যায়। এই সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিয়া চলিতে পারা কোনপ্রকারে সম্ভব হইলে তাহাও সর্ব্বতোভাবে ভাল হইত। কিন্তু, তাই বলিয়া প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতাকে এক বস্তু বলা যায় না; এই উভয়ের পার্থক্য মূলগত। বর্ত্তমান জগতে জীবনযুদ্ধের প্রতিযোগিতাকে অস্বীকার করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার উপায় নাই; একথা ব্যক্তির পক্ষেও যেমন সত্য, জাতির পক্ষেও তেমনই সত্য। প্রত্যেক জাতিরই অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থা এই প্রতিযোগিতায় জয়ী বা পরাজিত হইবার মূল কারণ। এই অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থাকে একটা ভৌগলিক সীমা মানিয়া চলিতে হয়; অর্থাৎ বিশেষ কোন দেশের লোকের আর্থিক সুবিধা অসুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। আমাদের অর্থনীতির প্রধান সীমা সমগ্র ভারতবর্ষ হইলেও, অনেক ব্যাপারে একটা প্রাদেশিক উপসীমা মানিবার যে প্রয়োজন আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; সকল প্রদেশই এদিকে সজাগ ও সচেষ্ট হইয়াছে। কিন্তু, সাম্প্রদায়িকতার এই প্রকার কোন স্বাভাবিক ভিত্তি নাই, ইহা সম্পূর্ণ কৃত্রিম ও কল্পিত। কোন হিন্দু বড়লোক হইলে, তিনি টাকা এদেশেই খরচ করিবেন (অধিকাংশ ক্ষেত্রে) এবং তাহা প্রতিবাসী মুসলমানেরও ঘরে যাইবে; আবার মুসলমান বড়লোক হইলে তাঁহার টাকার ভাগও হিন্দুর ঘরে যাইবে। কোন লোকের, তিনি যে সম্প্রদায়েরই লোক হউন না কেন, আর্থিক অবস্থা ভাল হইলে, তাঁহার জীবনযাত্রার মান বাড়িয়া যাইবে এবং তিনি এমন অনেক জিনিসপত্র কিনিবেন যাহা প্রস্তুত করিয়া অথবা যাহা তাঁহার নিকট বিক্রয় করিয়া চারিপাশের সকল ধর্ম্মের লোকই তাঁহার নিকট হইতে অর্থ পাইবেনই। তাহা ব্যতীত, এই লোকের অর্থ যখন কোন সাধারণ প্রতিষ্ঠানে যায় এবং কোন জনহিতকর কার্য্যে তাহা ব্যয়িত হয় তখন তাহার উপকার সেই স্থানের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হয়। আমাদের অর্থনিতীর প্রথম সীমা বাংলাদেশ বলিয়া যে কোন বাঙ্গালীর ভাল অবস্থার পরোক্ষ সুফল সমগ্র দেশের অবস্থার উপর প্রতিফলিত হয়।

কিন্তু, অন্য কোন প্রদেশের লোকের আর্থিক অবস্থা ভাল হইলে, বাঙ্গালীর এই প্রকার কোন লাভের সম্ভাবনা নাই এবং বর্ত্তমান প্রতিযোগিতার দিনে এই লাভকে অস্বীকার করিয়াও বাঁচিয়া থাকিবার উপায় নাই।

অন্যদিকে সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা যেমন এই প্রকার কোন লাভের সম্ভাবনা নাই তেমনই প্রাদেশিকতায় যতটুকু লাভ দেখা গেল, সাম্প্রদায়িকতায় ততটুকু অতিরিক্ত ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কারণ পাঞ্জাবের একজন হিন্দু বা মুসলমান ধনী হইলে বাংলাদেশের কাহারও পূর্ব্বোক্ত কোন লাভ হইবে না। অথচ, বাংলার টাকাটা বাংলার বাহিরে চলিয়া যাওয়ায়, প্রত্যক্ষতঃ যিনি ইহার দ্বারা লাভবান হইতেন তিনিও বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া, বাংলার সকল সম্প্রদায়ের লোকের উপর বোঝা হইয়া থাকিবেন এবং কোন না কোন উপায়ে

তাহাদের আয়ের অংশ গ্রহণ করিবেন। ইহার পরোক্ষ কুফল সমগ্রদেশের অবস্থার উপরও প্রতিফলিত হইবে।

হ্যালেট্‌ সার্কুলার

শ্রীযুক্ত এম-জি-হ্যালেটের (সেক্রেটারি) নামে ভারত সরকারের নিকট হইতে একখানি গোপনীয় বিজ্ঞপ্তিপত্র প্রাদেশিক সরকারগুলির নিকট প্রেরিত হইয়াছিল; দৈবক্রমে এই বিজ্ঞপ্তিপত্রখানা বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। আইন পরিষদে এ সম্বন্ধে বিতর্ক উত্থাপিত হওয়ায় ইহার সত্যতা নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে এবং দেশে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

কিন্তু, এই বিজ্ঞপ্তিপত্রখানাকে শুধু নিন্দা করা ব্যতীত ইহার সম্বন্ধে আমাদের ভাবিয়া দেখিবার বিষয়ও অনেক আছে। প্রতিপক্ষের চক্ষু দিয়া নিজেদের কার্য্যাবলী দেখিবার ও তাহার দোষ-গুণ নির্ণয় করিবার বিশেষ মূল্য আছে। অবশ্য মহাত্মা গান্ধীর নীতি ও কার্য্যের ভিতর যে হীন অভিসন্ধি আছে বলিয়া ইহাতে সন্দেহ করা হইয়াছে, মহাত্মাজী নিজে তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা বলিয়াছেন, তিনি না বলিলেও, লোকে ইহা মিথ্যা বলিয়াই ধরিয়া লইত। মহাত্মার চরিত্র এবং কার্য্যাবলী সম্বন্ধে যাহাদের বিন্দুমাত্র জ্ঞান আছে, সেই জানে যে, মুখে একপ্রকার বলিয়া ভিতরে অন্য কোন অভিসন্ধি পোষণ করা এবং তদনুযায়ী কার্য্য করা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। নিজের প্রিয়তম অনুচরদের সামান্যতম মিথ্যাচারের জন্য যিনি বারবার জীবন বিপন্ন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, দীর্ঘদিনের অনুসৃত কর্ম্মপন্থা পরিত্যাগ করিয়াছেন, বহু আকাঙ্ক্ষিত বহু সাধনার সিদ্ধির দৃষ্টিসীমার মধ্যে আসিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তন করিয়াছেন, কোন প্রকাশ্য কার্য্যকে কোন গুপ্ত উদ্দেশ্যের আবরণ হিসাবে ব্যবহার করাটা যে তাঁহার পক্ষে কতটা অসম্ভব তাহা এ দেশের সকল লোকের এবং বিদেশেরও বহুলোকের জানা আছে। কিন্তু, মহাত্মার কার্য্যের ফলে যে পক্ষের অসুবিধা হইতে পারে, সে পক্ষ তাঁহার কার্য্যকে কি ভাবে দেখিতেছেন এবং তাহার কি প্রকার ফল আশা করিতেছেন, তাহা বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। দেশের বিগত রাষ্ট্রিক আন্দোলন বিফল হইবার সর্ব্বপ্রধান কারণ যে দেশের জনসাধারণের সহিত এই আন্দোলনের যোগ না থাকা, সে কথা এই আন্দোলনের গতি যাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিয়াছেন। দেশের জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইলে, এবং দেশের বর্ত্তমান রাজনীতিক মনোভাবসম্পন্ন লোকদের ও দেশের জনসাধারণের মধ্যের ব্যবধান নষ্ট হইলে যে জাতির শক্তিবৃদ্ধি হইবে ও আমাদের রাজনীতিক প্রগতি অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে, সে কথা সুনিশ্চিত। যাঁহারা মনে করিয়াছেন যে, মহাত্মা গান্ধী রাজনীতির ক্ষেত্র হইতে সমাজনীতির ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের এই কথাটা বিশেষ লক্ষ্য করিবার যে, রাষ্ট্রিক প্রগতির চাকা যেখানে আসিয়া আটকাইয়া গিয়াছিল, মহাত্মাজীর বর্ত্তমান নীতি সফল হইলে, সেখান হইতে তাহার উদ্ধারের পক্ষে ইহা বিশেষ সহায়তা করিবে। আমাদের দেশের অর্থ-নীতিক ও সামাজিক সংস্কার না হইলে, রাজনীতিক আরও শক্তিলাভ অসম্ভব হইবে। কাজেই, ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক যাঁহারাই দেশের আর্থিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করিবেন, তাঁহারাই রাষ্ট্রিক প্রচেষ্টাকে অগ্রসর করিয়া দিবেন।

রবীন্দ্রনাথ ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশ

রবীন্দ্রনাথকে অতিথিরূপে পাইয়া এবং সম্মান দান করিয়া পৃথিবীর যে কোন দেশ বা জাতি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করিতে পারে; তিনি ভারতবর্ষের লোক বলিয়া এবং বাহিরের লোকে তাঁহাকে ভারতীয় কৃষ্টির প্রতীকস্বরূপ মনে করে বলিয়া, বাহিরের গুণীলোকদের নিকট তিনি ভারতের মর্য্যাদা অনেকগুণ বাড়াইয়া দিয়াছেন বলিয়া, ভারতের যে কোন প্রদেশে এই সঙ্গে বিশেষ গৌরবও অনুভব করিতে পারে।

বর্ত্তমানে রাজনীতি আমাদের চিত্তের প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে বলিয়া কোন লোকের মূল্য আমরা তাঁহার রাজনীতিক কার্য্যাবলীর মাপকাঠিতে মাপিয়া থাকি। সম্ভবতঃ এই জন্য রবীন্দ্রনাথ ভারতের অন্যান্য প্রদেশে

তাঁহার প্রাপ্য সমাদর পান নাই। তাঁহার নিজপ্রদেশেও পাইয়াছেন বলিয়া মনে করি না। যদিও বাঙ্গালী তরুণদের মনোরাজ্যে তাঁহার একাধিকার তবুও, তরুণবঙ্গের সর্ব্বপ্রকার প্রগতির পশ্চাতে তাঁহার সাহিত্য ও আদর্শ অলক্ষ্যে থাকিয়া যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে ও করিতেছে তাহার সঠিক পরিমাপ আমরা আজও করি নাই।

তাঁহার সান্নিধ্যের ফলে, অন্যান্য প্রদেশের লোক তরুণ বাংলার আদর্শ, আশা এবং বুদ্ধি ও মনের ঝোঁকের পরিচয় পাইবেন। তিনি সকল দিক দিয়া তরুণ বাংলার প্রতিনিধি।

অল্প কিছুদিনের মধ্যে তিনি দক্ষিণভারতের নানাস্থানে গিয়াছেন এবার উত্তর ভারতের কয়েকটি স্থানে যাইবেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারি তিনি লাহোরে পাঞ্জাব যুবসম্মিলনের সভাপতিত্ব করিবেন। সেখানে তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা করিবার আয়োজন হইতেছে। এখান হইতে ফিরিবার পথে কবি দিল্লী যাইবেন। ৮ই ফেব্রুয়ারি কবি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণী সভায় বক্তৃতা করিবেন পরে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলর পণ্ডিত ইক্‌বল্ নারায়ণ গর্ত্তুর নিমন্ত্রণানুসারে সেখানে যাইবেন।

আইন পরিষদের কংগ্রেসী সদস্যদের জীবনযাত্রা

কংগ্রেসের সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ কংগ্রেস পার্লামেণ্টারি বোর্ডের নিকট এই মর্ম্মে একটি পত্র দিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ যে, যে সকল কংগ্রেস সদস্য পরিষদের কার্য্যের জন্য দৈনিক ২০৲ করিয়া পাইতেছেন, তাঁহাদের জীবনযাত্রার মান, তাঁহাদের পল্লীস্থিত সহকর্ম্মীদের জীবনযাত্রার সমপর্য্যায়ের হওয়া উচিত এবং উদ্বৃত্ত অর্থ কংগ্রেস তহবিলে প্রদত্ত হওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে পার্লামেণ্টারি বোর্ড কোন সিদ্ধান্ত অবশ্য গ্রহণ করেন নাই।

যাঁহারা আইন পরিষদে দেশের লোকের প্রতিনিধি হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কোনও অতিরিক্ত সুখ, সুবিধা বা সম্মান ভোগের জন্য গিয়াছেন বলিয়া দেশের লোকে মনে করিবে না। তাঁহারা দেশের সেবার জন্য, দেশবাসীর স্বার্থরক্ষার জন্যই সেখানে গিয়াছেন বলিয়া আমরা ধরিয়া লইব। যাঁহারা আইন পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে তাঁহাদের সকলকেই বিপুল অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছে, কাজেই তাঁহারা সকলেই ধনী এবং আইন পরিষদের কাজের জন্য অতিরিক্ত কয়েকটি টাকা তাঁহাদের না লইলেও অসুবিধার কারণ হইবে না। উদ্বৃত্ত টাকাটা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধারণানুসারে দেশের কাজে ব্যয় করিলে, করদাতাদের প্রতি অধিকতর সুবিচার করা হইবে। নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে ইঁহারা যে অর্থব্যয় করিয়াছিলেন, তাহা অংশতঃ বা সম্পূর্ণভাবে পরে উঠিয়া আসিবে এ আশায় কেহ অর্থব্যয় করিতে পারেন নাই কারণ, নির্ব্বাচনে সাফল্য লাভ কাহারও সুনিশ্চিত ছিল না।

যে কথা সাধারণ সদস্যদের সম্বন্ধে বলা হইল, কংগ্রেসী সদস্যদের পক্ষে যে কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কংগ্রেস দেশের রাজনীতিক শক্তিবৃদ্ধি এবং অধিকার লাভ এবং স্বার্থরক্ষার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকারের কার্য্যতালিকা গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার জন্য ইহার কর্ম্মীদিগকে নানাপ্রকারের স্বার্থত্যাগ ও দুঃখভোগ করিতে হইয়াছে। এই স্বার্থত্যাগ এবং দুঃখভোগের মধ্য দিয়াই দেশসেবার আদর্শ কংগ্রেস তাহার দীর্ঘদিনের ইতিহাসে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। দুঃখভোগ এবং স্বার্থত্যাগ ব্যতীত পরাধীন কোন দেশে দেশসেবা অবশ্য অসম্ভব।

কংগ্রেস দেশসেবার অন্যতম পন্থা হিসাবেই পার্লামেণ্টারি কাজের সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। যাঁহারা কংগ্রেসের প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়াছেন অর্থাৎ যাঁহাদের উপর কংগ্রেসের এই বিভাগের ভার পড়িয়াছে কংগ্রেসের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং তাহার আদর্শের অনুগামী হইয়া তাঁহাদিগকে কাজ করিতে হইবে। কংগ্রেসের নামের এবং দলের সাহায্য লইয়া নির্ব্বাচনে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, অন্যদের অপেক্ষা তাঁহাদের হাঙ্গামা এবং অর্থব্যয় কম হইয়াছে, এজন্যও কংগ্রেসের প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য রহিয়াছে। তাঁহারা কংগ্রেসের যে শক্তির সহায়তা লইয়াছেন যে শক্তি শুধুমাত্র অর্থশালী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের চেষ্টায় বা স্বার্থত্যাগে লাভ হয় নাই। বহু অখ্যাত, দরিদ্র কর্ম্মীর আত্মত্যাগে তাহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কংগ্রেসের যে নাম, প্রতিপত্তি এবং কর্ম্মপ্রচেষ্টা দেশে এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং যাহার ফলে কংগ্রেসী সদস্যেরা দেশের লোকের নিকট হইতে অন্যান্য সদস্যদের অপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা ও সম্মানের অধিকারী হইয়াছেন, কংগ্রেসের সেই প্রতিপত্তি এবং সম্মান বহু দরিদ্র কর্ম্মীর চেষ্টা ও ত্যাগের উপর দাঁড়াইয়া আছে। যে গঠনমূলক কর্ম্মসমূহ কংগ্রেসের সর্ব্বপ্রধান প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কর্ম্মতালিকাভুক্ত সেই সকল কাজ কর্ম্মীদের প্রাণপণ কায়িক চেষ্টা সত্ত্বেও অর্থাভাবে অগ্রসর হইতেছে না।

বাংলাদেশে মেয়েদের শিক্ষা

১৯৩২-৩৩ সালের শেষে সমগ্র বাংলাদেশে ভারতীয় মেয়েদের সর্ব্বপ্রকারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ১৮,৫৩৮; এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীসংখ্যা ছিল ৫,০০,৩০৭। বালকদের স্কুলে যাহারা পড়িত তাহাদের ধরিয়া মোট ছাত্রীসংখ্যা ছিল ৬,০২,৩৬১; ইহাদের মধ্যে

হিন্দু ছিল ২,৫৬,০৮৭ এবং মুসলমান ছিল ৩,৩১,১০৫ জন।

এই সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য এবৎসর মোট ব্যয় হয় ৪৩,৫৪,২৮৩ টাকা; ইহার মধ্যে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পাওয়া যায় ১৪,১৯,৯৪৪ টাকা। ছেলেদের কলেজে এবং স্কুলে যে সকল ছাত্রী পড়িতেন তাঁহাদের জন্য একবৎসরে গড় হিসাবে জনপ্রতি যথাক্রমে ১৬৩'৩ টাকা ও ৩৮'৪ টাকা ব্যয় হইয়াছে। মেয়েদের কলেজে ও স্কুলে যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহাদের জন্য যথাক্রমে হইয়াছে ২৮০'২ টাকা ও ৮৪'৬ টাকা।

মেয়েদের মধ্যে ভালভাবে শিক্ষাবিস্তারের জন্য আরও অনেক বেশী টাকা ব্যয় করিতে হইবে তবে, সহশিক্ষার ব্যবস্থা থাকিলে ব্যয়িত টাকায় আরও অনেক বেশী সুফল পাওয়া যাইত।

আলোচ্য বর্ষে সমগ্র বঙ্গে মেয়েদের জন্য উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৩৯টি, এবং ইহার ছাত্রীসংখ্যা ছিল ১১,৪৫২। মধ্য ইংরাজী স্কুলের সংখ্যা ছিল ৫৭টি, এবং ছাত্রীসংখ্যা ছিল ৯,০৮৩; মধ্য-বাংলা-স্কুলের সংখ্যা ছিল ১১ এবং ছাত্রীসংখ্যা ছিল ৯৮২।

১৯৩৩ সালে ৮১৩টি ছাত্রী প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন, তাঁহাদের মধ্যে ৫৪৭ জন ছাত্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

একটি মজার কথা এই যে, সমগ্র ব্রিটীস ভারতের মেয়েদের জন্য মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অর্দ্ধেকের উপর বাংলায় অবস্থিত, যদিও স্ত্রীশিক্ষায় বাংলা সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী প্রদেশ নহে।

তদ্ব্যতীত, অন্ততঃ মধ্য শিক্ষাটা শেষ না করিলে সে শিক্ষা মানুষের পরবর্ত্তী জীবনে কার্য্যকরী হয় না। কিন্তু, পূর্ব্বে যে ছাত্রীসংখ্যার উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার অধিকাংশই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। ইহাদের সংখ্যা ৫,৮০৩০৯।

তবে, মেয়েরা যে ক্রমেই শিক্ষার দিকে ঝুঁকিতেছেন তাহা নিম্নের তুলনামূলক হিসাব হইতে দেখা যাইবে।

	১৯২২	১৯২৭	১৯৩২	১৯৩৩
কলেজে	২২৮	৩৮৪	৭৭০	৯২৪
স্কুলের উচ্চশ্রেণীতে	১,০৪৪	১,৪৮৪	৩,৮৫৫	৪,১৩৮
ঐ মধ্য-শ্রেণীতে	১,৭১৬	২,২৪৩	৪,৯১৬	৫,৫৫৬
প্রাথমিক স্কুলে	৩,৩৩,৭০৪	৪,০৯,৫২১	৫,৩৫,১১০	৫,৮০,৩০৯

মোট ছাত্রীসংখ্যা ধরিয়া হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান ছাত্রীসংখ্যা অনেক অধিক দেখা গিয়াছে, কিন্তু, ইঁহাদের অধিকাংশই শিশু ও প্রাথমিক শ্রেণীর, উচ্চশ্রেণীর ছাত্রী সংখ্যা খুবই কম; হিন্দুদেরও অনেকটা তাহাই হইলেও, উচ্চশ্রেণীর ছাত্রী অপেক্ষাকৃত বেশী। মোট মুসলমান ছাত্রীর মধ্যে শিশু ও প্রাথমিক শ্রেণীর অনুপাত হইতেছে ৯৮'১৯; আর হিন্দুদের ঐ শ্রেণীর অনুপাত হইতেছে ৯৬'১৩। সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর অনুপাত ১'২; মুসলমানদের '০৩।

১৯৩২ সালে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য

বাংলার জন্ম, মৃত্যু ও স্বাস্থ্যের হিসাব অনেকের নিকটই চিত্তাকর্ষক হইতে পারে। ১৯৩২ সালের বাংলার স্বাস্থ্যের সরকারি হিসাবের কয়েকটি সংক্ষিপ্ত অংশ, ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেটের ডিসেম্বর সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত ও আবশ্যক মত মন্তব্য করা হইল।

মৃতজাতের সংখ্যা বাদ দিয়া, ১৯৩২ সালে বাংলাদেশে ১৩২৮৩৩৪টি শিশু জন্মগ্রহণ করে; তাহার মধ্যে ছেলের সংখ্যা ৬৯১৭৩৭ এবং মেয়ের সংখ্যা ৬৩৬৫৯৭। ১৯৩১ সালের উক্ত সংখ্যাগুলি যথাক্রমে, ১৩৮৮২১৯; ৭২২০৯৪; এবং ৬৬৬১২৫। প্রতি ১০০ জন মেয়েতে ১০৮টি ছেলে জন্মগ্রহণ করে (১৯৩১—৩২ উভয় বৎসরেই)।

১৯৩২ সালে এই প্রদেশে মোট ১০২২২১৯টি মৃত্যু তালিকাভুক্ত হইয়াছে; ১৯৩১ সালের সংখ্যা ১১১৩৩১২। ইহার মধ্যে ১৯৩২ সনে ৫২৭৯৬৮ পুরুষ এবং ৪৯৪২৫১ জন স্ত্রীলোক; এবং ১৯৩১ সনে ৫৭২৮০০ জন পুরুষ এবং ৫৪০৫১২ জন স্ত্রীলোক মারা যান। প্রতি একশত মেয়েতে ১০৬ জন ছেলে মারা যায়।

অর্থাৎ ১৯৩১ ও ১৯৩২ এই দুই বৎসরে বাংলার মোট জনসংখ্যা বাড়িয়াছে ৫৮১০২২; ইহার মধ্যে ২৬৭৯৬৪ জন মেয়ে এবং ৩১৩০৫৮ জন ছেলে। মেয়ের সংখ্যা ত পূর্ব্বেই কম রহিয়াছে এই দুই বৎসরে মেয়ে আরও ৪৫০৯৪ জন কম হইল।

প্রতি হাজারে ১৯৩২ সালে জন্মের হার হইতেছে ২৬'৬; ১৯৩১ সালে ছিল ২৭'৮; পূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচ বৎসরে জন্মের হার ২৮'৬। ১৯৩২এ মৃত্যুর হার প্রতিহাজারে হয় ২০'৫, ১৯৩১এর হার ২২'৩; পূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচ বৎসরে ২২'৬। জন্ম এবং মৃত্যু দুয়ের হারই সমভাবে কমিলে অপচয় কম হয়; মৃত্যুর কিছু বেশী কমায় সেটা লাভের দিকে গিয়াছে।

সম্প্রদায় হিসাবে, ১৯৩২ সালে হিন্দুদের মধ্যে মৃত্যুর হার হইয়াছে প্রতিহাজারে ২০'৪; এবং মুসলমানদের মধ্যে ২০'১ হইয়াছে। ১৯৩১ সালে হিন্দুদের প্রতিহাজারে মৃত্যু ঘটিয়াছে ২১'৮ হারে মুসলমানদের ঘটিয়াছে ২২'৩ হারে।

বাংলার জনসংখ্যার বৃদ্ধি অন্যান্য সকল প্রদেশ অপেক্ষা

কম। এখানকার জন্মের হার অন্য সকল প্রদেশের নীচে, অথচ মৃত্যুর হার বর্ম্মা, আসাম ও উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ অপেক্ষা বেশী—অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অবশ্য কম। শিশুমৃত্যুর হার মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ এবং বর্ম্মা অপেক্ষা কম হইলেও, অন্য সকল প্রদেশ অপেক্ষা বেশী। এখানকার জনসংখ্যার বৃদ্ধি আলোচ্য বর্ষে মাত্র হাজারকরা ৬·১ হইয়াছে; ইহাতেও বাংলা সকল প্রদেশের পশ্চাতে। ১৯৩১ সালে বৃদ্ধি হাজারকরা ৫·৫ হইয়াছিল। নীচে, জন্ম, মৃত্যু, বৃদ্ধি ও শিশুমৃত্যুর একটি তুলনামূলক হিসাব (অন্যান্য প্রদেশের সহিত) দেওয়া গেল।

প্রদেশ	জন্মের হার হাজার প্রতি ১৯৩২	মৃত্যুর হার হাজার প্রতি ১৯৩২	প্রতি হাজারে বৃদ্ধি+ হ্রাস— ১৯৩২	প্রতি হাজারে শিশু মৃত্যু ১৯৩২		
				ছেলে	মেয়ে	মোট
বাংলা	২৬·৬	২০·৫	+৬·১	১৮৪·৮	১৭২·৪	১৭৮·৯
মাদ্রাজ	৩৬·০৩	২১·৯৬	+১৪·০৭	১৯৬·৬২	১৭১·৭৮	১৮২·৫৮
বম্বে	৩৫·৮৯	২৩·০৪	+১২·৮৫	১৬৪·০১	১৪৮·১২	১৫৬·৩৯
যুক্তপ্রদেশ	৩৪·৬৬	২২·২৩	+১২·৪৩	১৬৯·১৬	১৫৫·৪৯	১৬২·৭২
পাঞ্জাব	৪১·৩৬	২৪·৭০	+১৬·৬৬	১৮২·৮০	১৭৩·৭২	১৭৮·৫২
মধ্যপ্রদেশ	৪৫·২০	২৬·৮৯	+১৮·৩১	২১৫·১৬	১৮৬·৪০	২০১·১২
বিহার ও উড়িষ্যা	৩৩·৮	২০·৬	+১৩·২	১৩৮·২	১১৯·০	১২৮·৮
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	২৮·৮৯	২০·০০	+৮·৮৯	১২৯·৯৩	১২৮·৫৭	১২৯·৩৪
বার্ম্মা	২৭·৭৫	১৭·৩০	+১০·৪৫	১৯৬·৬৪	১৭১·৮৫	১৮৪·৫০
আসাম	৩০·০৬	১৮·৯৬	+১১·১০	১৬৬·০৫	১৪৬·৫১	১৫৬·৫৮

বাংলাদেশে জন্মের হার কম হইবার কারণ সম্ভবতঃ দেশ ও বর্ষব্যাপী ম্যালেরিয়া। বাংলায় জলপ্লাবন ও দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে। জন্মহারের উপর ইহারও প্রভাব থাকা সম্ভব। এদেশে যেসকল মৃত্যু ঘটে তাহার অধিকাংশ নিবার্য্য ব্যাধিতে—অন্যান্য সভ্য দেশ ইহার অধিকাংশ ব্যাধির হাত হইতে আংশিক বা সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে কোন্ কোন্ প্রধান রোগে কত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে নীচে তাহারও একটা তালিকা দেওয়া গেল।

রোগে নাম।	মৃত্যু ১৯৩১।	মৃত্যু ১৯৩২।
বসন্ত … …	৯২০৭	৭৯১০
সর্ব্বপ্রকারের জ্বর …	৭৩১৭৮৪	৬৯১৫১৩
ম্যালেরিয়া … …	৩৪৯১১১	৩২৭৩৮৬
কালা-আজর …	১০১৯৯	১০৭২০
আন্ত্রিক জ্বর …	১২৬০৮	১০১৭৬
আমাশা ও পেটের পীড়া	৪২৭৬৪	৩৯৫৬২
শ্বাসযন্ত্রের পীড়া …	৬২৩৫১	৬২২৪৯
ইনফ্লুয়েঞ্জা … …	× ×	× ×
যক্ষ্মা … …	× ×	১১৮০১
নিউমোনিয়া …	× ×	২৮১৫৮

যশোহর, নদীয়া, দিনাজপুর এবং মালদহে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর অপেক্ষা জ্বর বেশী হইয়া থাকিলেও লোকে কম কুইনাইন্ খাইয়াছে। অজ্ঞতা ও দারিদ্র্য উভয় কারণে প্রয়োজনানুরূপ কুইনাইনের ব্যবহার এদেশে হয় না। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা কম হইবার নিশ্চিত কারণ দারিদ্র্য।

ভারতবর্ষে জাত শিশুর জীবনের আশা

ভারতবর্ষে জীবনের অপচয় সুবিপুল। গড়হিসাবে এখানে প্রতিটি শিশুর জীবনের আশা মাত্র ২৩ বৎসর; আমেরিকার যুক্তরাজ্যের কোন কোন স্থানে এই আশা ৬০ বৎসর। ৯২ বৎসরের অধিক বয়স্ক লোকের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা নরওয়েতে বেশী। এখানে ৯২ বৎসরের অধিক বয়স্ক পুরুষের সংখ্যা ভারতবর্ষ অপেক্ষা হাজার গুণ এবং মেয়ের সংখ্যা দেড় হাজার গুণ অধিক।

আমাদের এই স্বল্প আয়ুষ্কালের মধ্যেও আমরা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম সুস্থ, কর্ম্মঠ ও বলিষ্ঠ থাকি। এ দেশের বিপুল জনসংখ্যা ভারতবর্ষের শক্তির পরিচায়ক নহে।

শ্রীসুশীলকুমার বসু

বীমা ও বাণিজ্য

শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার বসু

দি মিউচুয়াল লাইফ এ্যাসিওরেন্স করপোরেশান লিঃ

হেড অফিস—ব্যাঙ্ক রোড, বরোদা।

জীবন-বীমা প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য করবার জিনিষ হচ্ছে, হিসাব। প্রিমিয়াম রেট নির্দ্ধারিত করা থেকে আরম্ভ করে প্রতিষ্ঠানের সমস্ত আয় ব্যয়ের হিসেব দেখার ওপর প্রতিষ্ঠানের আসল ওজন নির্ভর করে। মিঃ জি, এস, মারাথে যে প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে নিজে সেই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন সে প্রতিষ্ঠানের ওপর টাকাকড়ির বা হিসাব নিকাশের দিক দিয়ে আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারি। তিনি বিবেচনা করে এঁদের প্রিমিয়াম হার এমন ধার্য্য করেছেন যাতে করে, এঁদের কাছে প্রায় বারোশো টাকার ইন্‌সিওর করতে যে প্রিমিয়াম দিতে হয়, অন্য যে কোনো কোম্পানিতে সেই টাকায় মাত্র হাজার টাকা বীমা করা যায়। আমাদের দেশে প্রিমিয়াম হার কম না হলে বীমার কাজ চলতেই পারে না। ক্ষমতা না থাকলে, হাজার ভাল বুঝলেও কেউ কোনোদিন জীবন-বীমা করতে পারবে না। আমাদের দেশী প্রতিষ্ঠানগুলি যদি শুধু বেশী বোনাসের চটক না দেখিয়ে প্রিমিয়াম হার অল্প করেন, তা হ'লে, আমার মনে হয়, কাজ সবচেয়ে ভালো হয়। তাহ'লে কাজ বিস্তার লাভ করবার উপযুক্ত ক্ষেত্র পায়। তা না হ'লে বীমা গুটিকয়েক সক্ষম ব্যক্তির ভেতর আবদ্ধ হ'য়ে থাকতে বাধ্য হ'বে। বরোদার মিউচুয়াল লাইফ এ্যাসিওরেন্স সেই দিকে নজর দিয়ে বীমাজগতের একটী প্রকৃত অভাব মোচন করেছেন। আমাদের দেশে, বলতে গেলে, বীমা-প্রতিষ্ঠানের খুব বেশী অভাব নেই। অভাব আছে সাধারণের উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের। তার মানে, আমাদের দরকার, এমন কতকগুলি প্রতিষ্ঠান, যাদের প্রিমিয়াম হার হ'বে খুব অল্প এবং যেখানে শুধু, হাজার বা তদ্দূর্দ্ধ নয়, পাঁচশো টাকার অবধি বীমা করবার ব্যবস্থা থাকবে। বরোদার এ প্রতিষ্ঠানটী গোড়া থেকেই সে বিষয়টী ভেবেছেন। তাই এঁদের প্রিমিয়াম হারও যেমনি লঘু তেমনি অল্প টাকা, অর্থাৎ পাঁচশো অবধি ইন্‌সিওর করা যায়। এ ব্যবস্থা সময়োপযোগী এবং সে জন্যে খুবই প্রশংসনীয়।

বীমা প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বপ্রধান দায়িত্ব বীমা-কারীদের কাছে। সংগৃহীত টাকা থেকে যা লাভ দাঁড়াবে, তার সমস্তটাই না হোক, উপযুক্ত পরিমাণ বীমাকারীদের ভেতর লাভ-সহ চুক্তি পত্রের ওপর বণ্টন করা দরকার। মিউচুয়ালের যা লাভ দাঁড়ায় তাঁর অতি অল্প পরিমাণ রিজার্ভ ফাণ্ড ইত্যাদিতে জমা রেখে বাকী টাকার শতকরা ৯০% বীমা কারীদের মধ্যে বিতরিত হয়। বাকী ১০% সেয়ার-হোল্ডারদের ডিভিডেণ্ড হিসাবে প্রাপ্য হয়। পলিসি-হোল্ডারদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখা প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। এখানে পলিসি-হোল্ডারদের ভেতর থেকে একজন করে ডিরেক্টার বেছে দেবার ব্যবস্থা আছে।

পাঁচশো টাকা ইন্‌সিওর করা যেতে পারে শুনে, হঠাৎ মনে হ'তে পারে, বাংলার তাবৎ প্রভিডেণ্ট ইনসিওরের মত বুঝি। কিন্তু মিউচুয়াল মোটেই তা নয়। এঁরা ১৯১২ সালের ইণ্ডিয়া লাইফ এ্যাসিওরেন্স কোম্পানির আইন অনুযায়ী বরোদা সরকারের কাছে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট-নির্দ্ধারিত ২৫,০০০ টাকার সিকিউরিটী জমা দিয়েছেন। কাজও তাই সুশৃঙ্খলায় অগ্রসর হচ্ছে দিনে দিনে।

১৯৩৩ জুলাই মাসে যে বছর শেষ হ'য়েছে, সে বছরের হিসেব দেখলে দেখা যায়, আগের বছরের কাজ ও তার প্রিমিয়াম বাবদ আয় যথাক্রমে শতকরা ১৪৫% ও ১৭৫% বেড়ে গেছে। সে বছর প্রিমিয়াম ইত্যাদি বাবদ আয়

হ'য়েছিল মোট ২২,২৬২-৪-৫ টাকা। দাবীর টাকা মিটিয়ে এবং অন্যান্য খরচ বাদ দিয়ে রিজার্ভ ফাণ্ডে জমা হয়েছিল মোট ৫,০৫২-১২-৩ টাকা। ১৯৩১, '৩২, '৩৩ সালে সেয়ার হোল্ডারদের ১০% ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করা হয়।

দাবীর টাকা মিটিয়ে দিতে এঁরা খুবই তৎপর। তার পরিচয় আমরা পেয়েছি। এঁদের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

দি কো-অপারেটিভ এ্যাসিওরেন্স কোম্পানি লিঃ

লাহোর

১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত লাহোরের কো-অপারেটিভ এ্যাসিওরেন্স কোম্পানি লিঃ আর একটী সম্পূর্ণ দেশী প্রতিষ্ঠান। এঁদের বিশেষত্ব, প্রচুর পরিমাণে কাজ করে বাহাদুরী নেওয়া নয়, এঁরা চান ধীরে ধীরে নিরাপদে অগ্রসর হ'তে। খুব বেশী কাজই কোম্পানির সারবত্তার লক্ষণ নয়। কার্য্যের গভীরতাই দ্রষ্টব্য।

জীবন-বীমায় কাজ আদায় করতে যা খরচ হয়, সেটাও লক্ষ্য করা দরকার। যে প্রতিষ্ঠানের খরচের হার কম তাঁদের কার্য্য-নির্ব্বাহের প্রণালীও সুনিয়ন্ত্রিত বুঝতে হবে। এঁদের কাজের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে খরচের হারও খুব বেড়ে না গিয়ে বেশ প্রত্যক্ষ ভাবে কমে গেছে, দেখা যায়। ১৯৩৩ সালের ত্রৈবার্ষিক হিসাব পরীক্ষায় দেখা যায় খরচের হার ছিল ১৭·৫%। তার আগের ত্রৈবার্ষিক হিসাব পরীক্ষার সময় দেখা যায় ছিল, ২৪·৬%। কিন্তু ১৯৩৪ সালের জুলাই মাসে যে বছর শেষ হয়েছে, সে বছর দেখা যায় খরচের হার কিছু বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ২৪·৭%এ। কিন্তু কাজেরও প্রসার হ'য়েছে প্রচুর। ১৯৩২-৩৩ সালের কাজের চেয়ে ১৯৩৩-৩৪ সালে ২৩৬% কাজ বেশী হয়েছে। এখানে খরচের হারের বৃদ্ধি নামমাত্র।

এঁদের সম্পত্তি মোট ১৪,৮২,৫৮৯-১০-৫ টাকার। এঁদের কাজ যে ভাবে চল্‌ছে তার তুলনায় ফাণ্ড প্রচুর পরিমাণে সন্তোষজনক।

১৯৩৩ সালে এঁদের প্রিমিয়াম বাবদ আয় হ'য়েছিল, ১,৪৫,৮৪৩-৯-৭ টাকা। সুদ ইত্যাদি বাবদ আয় হয়েছিল মোট ৬৬,১৯০-৭-৬ টাকা। এ যাবৎ এঁরা মোট ৯,০০,০০০ টাকার ওপর দাবী মিটিয়েছেন। চল্‌তি কাজের পরিমাণ ৪০,০০,০০০ টাকার ওপর।

এঁদের সমস্ত টাকাই গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীতে আবদ্ধ। গত ত্রৈবার্ষিক হিসাব পরীক্ষায় এঁদের ১,৪৫,৬৪৩ টাকা উদ্বৃত হয়। সে টাকায় হাজার করা বাইশ টাকা বোনাস ঘোষণা করা যেতে পারতো। কিন্তু এঁরা এত নিরাপদে অগ্রসর হ'তে ইচ্ছুক যে বাইশ টাকার জায়গায় মাত্র হাজার করা ষোল টাকা বোনাস ঘোষণা করেছেন।

নামমাত্র প্রিমিয়ামের ওপর এইভাবে বোনাস ঘোষণা করা মানে বোঝায় শুধু খরচের হার কম নয় কার্য্য নির্ব্বাহ প্রণালীও সুনিয়ন্ত্রিত।

দেশের বিশিষ্ট ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানটী বছর বছর যে ভাবে সুশৃঙ্খলায় কাজ করে যাচ্ছে, আশা হয়, অদূর ভবিষ্যতে ভারতের শ্রেষ্ঠ বীমা কোম্পানিদের ভেতর লাহোরের কো-অপারেটিভ এ্যাসিওরেন্সকে উপযুক্ত সম্মান ও গৌরবের পদ অধিকার করতে দেখ্‌তে পাবো।

শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার বসু

৮

সাঁতার

শ্রীশান্তি পাল

ট্রাজান-ক্রল্ বা চার-পদী ডুন্

এতাবৎকাল যত প্রকার ডুন্-পাড়ি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে চার-পদী ডুন্ কম ক্লান্তিজনক। শোনা যায় "ট্রাজান্"

মিঃ এন্ এন্ ভোস্—বার-এট্-ল
সম্পাদক—বেঙ্গল অলিম্পিক (সন্তরণ বিভাগ)
সহকারী সভাপতি—সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাব
ইনি আধুনিক সাঁতারের উন্নতির জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

নামক কোন এক ইংরেজ নিজের নামানুসারে পাড়ির নাম রাখিয়াছিলেন। মিঃ ট্রাজান আমেরিকার অসভ্য আদিম অধিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানদিগের সাঁতার অনুকরণে ১৮৯৫ সালে ইংলণ্ডে প্রথম কাঁচি-পাড়ির প্রবর্ত্তন করেন। তিনি এই কাঁচি-পাড়ির সাহায্যে তদানীন্তন ইংলণ্ডের বড় বড় নামজাদা সাঁতারু—জার্ভে, ওয়েব্স্ ও নাটাল প্রভৃতি—সকলকেই পরাজিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তখনকার দিনে ইংলণ্ডে দোহাতি-পাড়ির বিশেষ প্রচলন ছিল না। অনেকেই পার্শ্ব-পাড়ি অর্থাৎ এক হাতি পাড়িতে এবং বুক-পাড়িতে সাঁতার কাটিতেন। ইংলণ্ডে ১৯০৫ সাল পর্য্যন্ত ট্রাজান প্রবর্ত্তিত কাঁচি-পাড়ির রেওয়াজ জোর চলিয়াছিল। কোন একটি বিশেষ সন্তরণ প্রতিযোগিতায় অষ্ট্রেলিয়ান ও আমেরিকান সাঁতারুবৃন্দ আহূত হইয়া ইংলণ্ডে ক্রল্ বা ডুন্-পাড়ির প্রবর্ত্তন করেন।

আমাদের দেশে মিঃ জেফর্ড, শ্রীযুক্ত মুরলীধর মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ দত্ত, জ্ঞান চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সাঁতারুগণ পূর্ব্বে এই ধরণের পাড়িতে সাঁতার কাটিতেন। কিন্তু আজকালকার দিনে এই কাঁচি-পাড়ির সাহায্যে নিকট পাল্লার প্রতিযোগিতায় (অর্থাৎ ৫৫ গজ হইতে এক মাইল পর্য্যন্ত) স্থান পাইবার সম্ভাবনা আদৌ নাই। আজকাল ডুন্-পাড়ির যুগ আসিয়াছে; অতএব আমি এখানে কাঁচি-পাড়ি সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া উহারই রূপান্তরিত চার-পদী ডুন্-পাড়ি লইয়া বিশদভাবে আলোচনা করিব। এই পাড়ির সাহায্যে কি নিকটপাল্লা, কি দূর-পাল্লা, সমান ক্ষিপ্রতা, গতিবেগ, আরাম ও স্বচ্ছন্দতার সহিত অনায়াসে যাইতে পারা যায়। শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষার অব্যবহিত পরেই এই পাড়ির অনুশীলন করিবে। যদি প্রকৃতিদত্ত স্বাভাবিক পাড়ির মিল থাকে তাহা হইলে স্থলানুশীলনের আবশ্যক করে না। সাঁতারু নিজের সুবিধামত একমাত্র পাড়িতে সাধনা করিবে। নিত্য পাড়ি পরিবর্ত্তন কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে। এই সমস্ত বিষয় সন্তরণ-শিক্ষক-দিগের লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

শিক্ষক

সন্তরণ সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয় আলোচনা করিবার পূর্ব্বে শিক্ষকদিগের সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলা একান্ত আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করি। অন্যান্য স্থল-ক্রীড়ার তুলনায় সাঁতারের বিশেষত্ব এই যে, শিক্ষার্থীরা নিজের দোষ দুষ্ট পাড়ি স্বচক্ষে দেখিতে না পাইয়া অনেক সময় মারাত্মক ভুল করিয়া বসে। যদি ইহা শিক্ষার প্রথম হইতে সংশোধন করা না হয়, তাহা হইলে সেই দোষ চিরস্থায়ী হইয়া যায় এবং ভবিষ্যতে তাহা সংশোধন করিতে বিশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হয়। আমাদের দেশে শতকরা নিরানব্বুই জন

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সাধুখাঁ

ইনি ১৯১৪ সালে বাঙালী সাঁতারুদিগের মধ্যে দূর-পাল্লায় (৪৪০ গজে) সর্ব্বপ্রথম হাত পাড়ি প্রদর্শন করেন এবং ১৯১৫ সালে নিখিলভারতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় সর্ব্বপ্রথম ইংরেজ সাঁতারু মিঃ জেফর্ডকে ৪৪০ গজে পরাস্ত করেন।

অশুদ্ধ বা অবৈজ্ঞানিক কৌশলযুক্ত পাড়িতে সাঁতার দেয়। তাহাদের মনে মনে এইরূপ ধারণা যে সাঁতারের মধ্যে শিক্ষা করিবার কিছুই নাই। এটা সম্পূর্ণ ভুল। অপর দিকে তাহাদের সহজ ও সরল পথ প্রদর্শন করাইবার উপযুক্ত শিক্ষকও পরিদৃষ্ট হয় না। শিক্ষার্থী যদি সুদক্ষ শিক্ষক না পায়, তাহা হইলে তাহার কর্ত্তব্য প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর উত্তম সাঁতারুর সাঁতার কাটিবার কায়দা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পুস্তকের উপদেশানুযায়ী চলা। সুদক্ষ শিক্ষকের অধীনেই শিক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলজনক। শিক্ষকের কর্ত্তব্য প্রথমতঃ পাড়িগুলির ব্যাখ্যা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া পরিশেষে নূতন শিক্ষার্থীদিগকে দোষ-গুণ প্রদর্শন করাইয়া সংশোধন করা। সাঁতারুর দেহে, গতিবেগের কোন্ অংশে দোষ হইতেছে বা কোন অংশ নিয়মিতরূপে সঞ্চারিত হয় না, বা কি উপায়ের দ্বারা সহজপথ সরলভাবে প্রদর্শিত করা যায় তাহা জানা চাই। এই জন্যই বলিতেছি সাঁতারুর উচিত সুদক্ষ শিক্ষকের অধীনে শিক্ষা করা।

পাড়ি

বাহুর ক্রিয়ার জন্য দেহকে জলের উপর ঋজুভাবে ভাসাইয়া, হাত দুটি মাথার উপর লম্বাভাবে নিক্ষেপ করিবে। জল টানিবার সময় হাতের আঙ্গুলগুলি জুড়িয়া, তালু দিয়া গভীরভাবে শেষ পর্য্যন্ত—অর্থাৎ যতদূর পিছন দিকে যাইতে পারে টানিবে। ইহাই পাড়ির প্রথম ও শেষ। জল ধরিবার সময় দেহকে কিঞ্চিৎ গড়াইয়া দিয়া, মাথা হেলাইয়া মুখ জলের উপর আসিলেই নিশ্বাস গ্রহণ করিবে। এই সময় হাতের কনুই শক্ত রাখিয়া, কব্জি অল্পমাত্রায় নীচের দিকে বাঁকাইয়া সোজাসুজি উরুদেশের শেষ পর্য্যন্ত হাত আনিবে, অবশেষে কনুই বাঁকাইয়া জলের উপর টানিয়া তুলিবে। সমস্ত পাড়িটি টানিবার সময় এই নিয়মগুলি পালন করা বিধেয়। পাড়ি কোন্ স্থান হইতে কি ভাবে সুরু হইবে তাহা 'চ' চিহ্নিত চিত্রে প্রদর্শন করা হইতেছে। যদি দক্ষিণ দিকে মুখ রাখা হয় তাহা হইলে বাম পদের আঘাতের সহিত পাড়ি সুরু করিবে।

বাম হস্তের দিকে মুখ রাখিলে দক্ষিণ পদের আঘাতের সহিত সুরু করিবে। প্রতিক্ষেপে চারটী করিয়া পায়ের আঘাত ও দুইটী করিয়া হাত পাড়ি চলিবে। এখানে **'চ'** চিহ্নিত ছবিতে দক্ষিণ হস্তের দিকে মুখ রাখা হইয়াছে, অতএব বাম পদের দ্বারা পাড়ি সুরু করা যাক্। প্রথমতঃ দেহটী জলের উপর ঋজুভাবে রাখিয়া বাম পদটী ৮ হইতে ১০ ইঞ্চি পৃথক করিয়া জোরে **এক** বলিয়া একটী আঘাত দিয়া সঙ্গে সঙ্গে ২, ৩, ৪ আঘাত দিবে। এই আঘাতগুলি এক হইতে চার পর্য্যন্ত মনে মনে গণনা করিতে পারিলে ভাল হয়।

সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা উচিত এক হইতে পাড়ি সুরু হইতেছে। এক আঘাতের সময় দক্ষিণ হস্তটী চিত্রানুযায়ী উরুর নিকট রাখিবে। যে মুহূর্ত্তে পায়ের এক আঘাত হইবে সেই মুহূর্ত্তে দক্ষিণ হস্ত লম্বাভাবে নিক্ষেপ করিয়া বাম হস্তের দ্বার জল

চিত্র—"চ"
চারপদী ডুব পাড়ির প্রথম ভঙ্গী
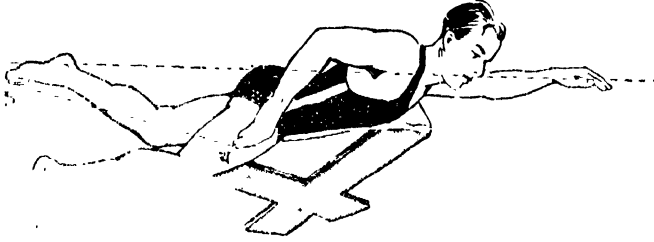
টানিতে সুরু করিবে। সাঁতারুর স্মরণ রাখা উচিত, সাঁতারের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রতিক্ষেপে পায়ের এক আঘাতের সহিত দক্ষিণ হস্ত নিক্ষেপ করিবে এবং (২, ৩, ৪) অর্থাৎ পায়ের চারটী আঘাতের সময়ের মধ্যে দুই হস্তের টানা শেষ করিয়া দক্ষিণ হস্ত যথাস্থানে আনিতে হইবে। এই নিয়মে ধীরে ধীরে পাড়ি বসাইতে হইবে। দ্রুত যাইবার জন্য কখনও ব্যস্ত হইবে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যদি সাঁতারুর জলে অসুবিধা হয়, তাহা হইলে পৃথকরূপে স্থলে ও জলে অনুশীলন করিয়া পরে একসঙ্গে মিলাইয়া লইবে।

পার্শ্ব-নির্ব্বাচন

পার্শ্ব-নির্ব্বাচনের কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম নাই। দেহের কোন্ পাশ দিয়া সাঁতার কাটিতে হইবে, তাহা অনেক সময় শিক্ষার্থীর নিজের সুবিধার উপর নির্ভর করে—যদি সাঁতারুর মনে হয়, দক্ষিণ দিক সুবিধাজনক ও আরামপ্রদ, তাহা হইলে ঐ দিক নির্ব্বাচন করিবে। যদি দুই পার্শ্বই বষ্ট ব্যতিরেকে ব্যবহার করিতে পারা যায় তাহা হইলে দক্ষিণ স্কন্ধ নিম্নে রাখিয়া, অর্থাৎ বাম দিকে মুখ রাখিয়া সাঁতার কাটা বিধেয়; কারণ এইরূপে সাঁতার কাটিলে হৃৎপিণ্ডের উপর চাপের মাত্রা অন্যান্য প্রণালীর তুলনায় অনেক পরিমাণে লাঘব করিয়া দিবে। তবে সাঁতারুর স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, দূর-পাল্লা সাঁতার কাটিবার সময় দেহ রীতিমত হেলিতে দুলিতে থাকে, ইহাতে ভীত হইবার কোন কারণ নাই। সুতরাং এই সময় স্কন্ধদেশ হইতে মস্তক দ্রুতগতিতে ঘুরাইয়া একহস্তে নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া অপর হস্তে তাহা ত্যাগ করিবে। পাড়ির গতিবেগ বাড়াইবার জন্য কনুইকে কিঞ্চিৎ বাঁকাইতে পারিলে ভাল হয়। এই সময় সোজা নিম্নে না টানিয়া কনুই দু'টী পার্শ্বে কিঞ্চিৎ টানিয়া উরুদেশের নীচে পরিবর্ত্তে উরুর পার্শ্বে শেষ করিতে পারিলে ভাল হয়। ইহাই হাত-পাড়ির প্রথম ও শেষ।

শ্রীশান্তি পাল
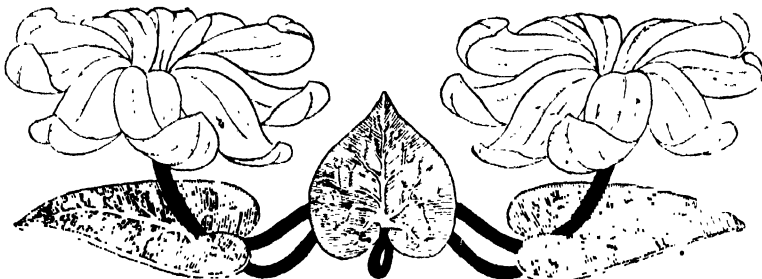
মহাবীর বসন্তকুমার

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশ

শুনিয়াছিলাম ভীম ভবানী ও রাম মূর্ত্তির কথা; যাঁহারা নিজের শারীরিক শক্তির দ্বারা জগতের বীর সমাজে অভিনব চিত্তচাঞ্চল্যকর ব্যাপারের সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আজ আমাদের চক্ষুর সম্মুখে বিশ্ববরেণ্য মহাবীর বসন্তকুমারের বীর মূর্ত্তিখানি প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে; তিনি অমানুষিক ক্রীড়া কৌশল ও শারীরিক কসরৎ দেখাইয়া ব্যায়াম জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন।

মহাবীর বসন্তকুমার

মাষ্টার বসন্তের নাম জানেন না এমন লোক খুব কমই আছেন। বর্ত্তমান যুবভারতের নিকট তিনি "ব্যায়াম সম্রাট" বলিয়া সুপরিচিত।

তাঁহার ব্যায়াম অভিনয়ের শক্তিও অপূর্ব্ব; ক্রীড়াকালে তাঁহার সমস্ত অঙ্গই যেন অভিনয় করিতে থাকে। তাঁহার প্রত্যেক ঘোরফের অপরূপ মাধুর্য্য-মণ্ডিত। ক্রীড়া প্রাঙ্গণের আবহাওয়া তাঁহাকে মাতাইয়া তোলে তাঁহার চির উজ্জ্বল ও চির নূতন ক্রীড়াকলাকৌশল।

শৈশবকাল হইতেই বসন্তকুমারের ব্যায়ামের দিকে বড়রকমের ঝোঁক্ দেখিতে পাওয়া যায়। বীরশিশু বসন্তকুমার কখনও বালকদিগের সঙ্গে অলস খেলায় যোগ দিতেন না। যখন তাঁহার বয়স ৭।৮ বৎসর মাত্র, সেই সময়েই তিনি ২ মন ভার দাঁতে করিয়া তুলিতে পারিতেন। ৪।৫ জন পূর্ণবয়স্ক লোক্‌কে কাঁধে করিয়া অনায়াসে হাঁটিয়া বেড়াইতেন।

স্কুলে তিনি কৃতিত্ব দেখাইয়া লেখাপড়ায় সে-রকম নাম কিনিতে পারেন নাই—নাম কিনিয়াছিলেন স্কুলের ব্যায়াম প্রাঙ্গণে তাঁহার ক্রীড়ার বিশেষত্বে। যখন কেবল মাত্র তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র সেই সময় ব্যায়াম চর্চ্চায় সত্যকার শক্তি দেখাইয়া তিনি প্রভূত যশ ও খ্যাতি অর্জ্জন করেন। তিনি তাঁহার স্কুল অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বলেন, "আমি ছেলেবেলা থেকেই ব্যায়াম পাগল, স্কুলে নিত্যই যেতুম তবে ওটা জেলখানা বলে মনে হ'ত। কি করব বাপ মায়ের তাড়না, লেখাপড়া শিখ্‌তেই হবে। আমি স্কুলে বেঞ্চেতে বসে থাকতুম বটে, কিন্তু আমার মন সদাই খেলার মাঠের মুক্তবায়ুতে ঘুরে বেড়াত নতুন আলোকের সন্ধানে। শিক্ষকেরা আমাকে বেশ

জান্‌তেন ও ভালবাস্‌তেন। ২।১ জন ছাড়া সকলেই আমাকে ব্যায়ামে উৎসাহ দিতেন। লেখা পড়া যে একেবারে করিনি তা বল্‌তে পারিনি। শ্রেষ্ঠ ছাত্র না হলেও ছোট বড় সকল ছাত্রই আমাকে ভালবাস্‌ত ও আমার কথামত চল্‌ত। তারা বোধ হয় মুগ্ধ হয়েছিল আমার বীরত্বে। স্কুলের সকল ব্যায়াম উৎসবে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের জয়মাল্য সব সময় আমারই ললাটতটে শোভা পেত।"

তাঁহার ব্যায়ামের বিশেষ উন্নতি দৃষ্টিগোচর হইল যখন তিনি ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। বয়স ১৫ বৎসরের বেশী নয়। সরস্বতী পূজা উপলক্ষে স্কুলের ব্যায়াম প্রাঙ্গণে খেলা দেখাইলেন। স্যার্ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর (তখনকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার) সভাপতিত্বে। ৩।৪ জন ছেলেকে লইয়া পায়ে করিয়া ছুঁড়িয়া নানা ভঙ্গিতে অগ্নিকুণ্ডের মধ্য দিয়া ডিগ্‌বাজী খাওয়াইয়া লোফালুফি করিলেন। পায়ের উপর সিঁড়ির খেলা এবং বাহু ও পৃষ্ঠের অদ্ভুত খেলা ও শক্তির পরিচয় দেখাইলেন। সভাপতি মহাশয় ও স্কুলের হেড্‌মাষ্টার ২ খানি স্বর্ণপদক তাঁহাকে দেন এবং স্কুলের ছাত্র বলিয়া তাঁহার সম্মানার্থে একদিন স্কুল বন্ধ থাকে।

তখন হইতে কলিকাতা সহরে সকল বিশিষ্ট উৎসবে বসন্তকুমার সাদরে আমন্ত্রিত হইতে লাগিলেন তাঁহার অভাবনীয় ক্রীড়াকৌশল দেখাইবার জন্য। তাঁহার মাতুল ব্যায়ামাচার্য্য স্বর্গীয় রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় তাঁহার হইয়া খ্যাতনামা বীরগণকে প্রায়ই চ্যালেঞ্জ (challenge) করিতেন। কিন্তু কেহই বসন্তকুমারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াইতে সাহস করেন নাই।

সে আজ প্রায় ১০ বৎসরের আগেকার কথা বসন্তকুমারের কতিপয় "রেকর্ড জিম্‌নাষ্টিক" (World's record gymnastic feats) দেখিয়াছিলাম অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট রায়বাহাদুর আশুতোষ ঘোষের বাড়ী। প্রায় ৫ ঘণ্টাব্যাপী বেনিয়াটোলা আদর্শ ব্যায়াম সমিতির ব্যায়াম প্রদর্শনী হইয়াছিল। উৎসবে উপস্থিত ছিলেন কলিকাতা সহরের সমস্ত গণ্যমান্য সাহেব ও বাঙালী। বসন্ত প্রথমে দেখান কাঁধের উপর ব্যালান্স্। একটি ১৬ ফুট উচ্চ বাঁশের মাথায় একটা ১২ ফুট লম্বা মই শোয়ান আছে—সেই বাঁশটা তিনি কাঁধে করিয়া একখানি ২ ফুট চৌকা কাঠের উপর দাঁড়াইলেন; আর বাঁশে মোটেই হাত দিলেন না। বাঁশের উপরের সেই মইটার শেষ দিকে একটী দোলা ঝুলিতেছিল। ২ জন বাঁশ বাহিয়া উঠিয়া সেই দোলায় বসিয়া নানারূপ খেলা করিতে লাগিল ও দোলাও দুলিতে লাগিল। কিন্তু বসন্তকুমার পাহাড়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া টাল কাটাইতে লাগিলেন—একইঞ্চিও পা নাড়িলেন না। ইহার পর দেখাইয়াছিলেন কামান ও কামানের গোলা লইয়া খেলা। এই খেলা দেখিয়া সকলে শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন। বড় বড় কামানের গোলা উর্দ্ধে ছুঁড়িয়া শরীরের যে কোন অংশে ফেলিতে লাগিলেন। বৃহদাকার কামানটা পায়ে ও হাতে করিয়া ভাঁজিতে ও ঘুরাইতে লাগিলেন খুব সহজে; এই ৬।৭ মন কামানের গোলা প্রায় ২০ ফুট উচ্চ হইতে পড়িল বসন্তকুমারের পিঠের উপর। শুইয়া পায়ে করিয়া ১ খানি ২৪ ফুট উচ্চ মই ধরিলেন; তাঁহার উপরিভাগে উঠিয়া বসিল একটী ১৬ বৎসরের ছেলে। বসন্তকুমার সজোরের পায়ের ধাক্কায় ছেলেশুদ্ধ মইখানি ছুঁড়িয়াদিলেন এমন কৌশলে যে শূন্যে ছেলেটী উঠিয়া গেল আর মইখানি পিছনদিকে পড়িয়া গেল। এই সময় ব্যাঘ্রের ন্যায় তীব্র দৃষ্টিতে তলায় শায়িত বসন্তকুমার আর ৩২ ফুট উচ্চে শূন্যমার্গে অবলম্বনহীন নির্ভীক বালক। চক্ষের নিমেষে বালক আসিয়া পড়িল বসন্তকুমারের পায়ের উপর। বসন্তকুমার বালকটীকে অনায়াসে লুফিয়া পুনরায় শূন্যে ছুড়িয়া দিলেন। বালক শূন্যে ২।৩টী ডিগ্‌বাজী খাইয়া জমিতে দাঁড়াইল।

তারপর বসন্তকুমার খালি কপালের উপর একটী লম্বা বাঁশ রাখিয়া তাহার উপর দুই জন ব্যায়ামকারী বালক সহ অপূর্ব্ব নিপুণতার সহিত দুঃসাহসিক ক্রীড়া দেখাইলেন। কপালে ক্রীড়ারত বালক সহ বাঁশ লইয়া তিনি সিড়ি দিয়া উঠিয়া টেবিলের উপর বসিলেন, শুইলেন ও আবার দাঁড়াইয়া পোষাক পরিবর্ত্তন করিয়া পুনরায় সিড়ি দিয়া নামিলেন।

এ সব খেলায় বসন্তকুমার ব্যতীত আর দ্বিতীয় ব্যক্তি পৃথিবীতে নাই। তিনি শেষে ঘাড় ও পৃষ্ঠের পেশী শক্তির পরিচায়ক একটি খেলা দেখান। ভূমির উপর কেবল মাথা ও পা রাখিয়া সর্ব্বশরীর সাঁকোর আকারে রাখিয়া অবস্থান করিলে তাঁহার বুকের উপর কাষ্ঠ স্তম্ভ রাখা হয়। তাহার উপরে ৮জন ব্যক্তি আড়াই মিনিট কাল ঐক্যতান বাদন করেন।

২।৩ বৎসর পূর্ব্বে রয়াল সার্কাসে তাঁহার অতিকায় বন্য রয়াল বেঙ্গল ব্যাঘ্রের সহিত শুধুহাতে যুদ্ধ বাঙ্গলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। শোনা যায় পাশ্চাত্যবীর ইউজিন স্যাণ্ডো একবার এক পোষা সিংহের সহিত লড়াই করিয়াছিলেন। সেই সিংহটার নখ কাটিয়া দেওয়া হইয়াছিল শূরকেশরী বসন্তকুমার কিন্তু একেবারে অপরিচিত বন্য জন্তুর সঙ্গে লড়াই করিয়া অভূতপূর্ব্ব বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।

বহুকাল হইতেই জগতের বুকের উপর দিয়া একটী পথহারা ব্যায়ামের হীন প্রবাহ ছুটিতেছিল। বসন্তকুমার আজ সেই প্রবাহকে নূতন আলোকের পথে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। আমরা যশোহর জেলার আঠারখাদার যুবক-বৃন্দ মিলিত হইয়া একটী ব্যায়াম সমিতি খুলিয়াছি, তাঁহারই অনুপ্রেরণায়। জীবনের ধারাকে নূতনের মহিমায় মহিমান্বিত করিয়া তুলিতে হইলে চাই দেশবাসীর আগ্রহ ও উদ্দীপনা। দেশের ভ্রাতাদের নিকট আমাদের এই অনুরোধ যে তাঁহারা বসন্তকুমারের উৎসাহানল বর্দ্ধিত করিবার জন্য যেন দেশের স্থানে স্থানে ব্যায়াম সমিতি খুলিয়া তাঁহার কর্ম্ম-পথকে সুগম করেন। তাহা হইলে মনে হয় ভগবানের কৃপায় শীঘ্রই তিনি মৃতপ্রায় ভারতকে নব জীবনের স্পন্দনে স্পন্দিত করিতে পারিবেন।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশ

চুম্বন

শ্যামসুদ্দীন মণ্ডল

সীমাহীন অম্বরের অনাদি চুম্বনে
জন্মেছিল ক্ষিতি;—তাই প্রতি ধমনীতে
সে চুম্বন জাগে তার প্রণব সঙ্গীতে।
আজিও অবশ অঙ্গ রোমাঞ্চে উন্মনে।
শিরা-উপশিরা মাঝে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
চুম্বনাক্ত রক্তকণা হ'য়ে নাচে অসমৃতে।
দেহ মন ধরণীর নিরান্ত নিভৃতে
পরিপূর্ণ চুম্বনের নিবিড় কম্পনে

স্বষ্টিলীলা দেহখানি করি লীলায়িত
চলিয়াছে অনন্তের পানে ভঙ্গীভরা,—
চুম্বনপীড়নাক্রান্ত। মুগ্ধ রেণুবাশ
আকর্ষিছে পরস্পরে সৃজন-ঈপ্সিত।
চুম্বনবিলাসী স্রষ্টা আলিঙ্গিয়া ধরা
চুম্বনে অরূপ-রূপ করে কি প্রকাশ?

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-স্মৃতি—

যে কোনো বৃহৎ ব্যাপারের প্রতিষ্ঠা-দিবস এবং প্রতিষ্ঠা-অনুষ্ঠান সর্ব্বতোভাবে স্মরণীয় বস্তু। কত চিন্তা, পরিশ্রম এবং অর্থব্যয়ের ফলে তবে একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সূচনা হয় শুধু সেই কথা স্মরণ ক'রে কৃতজ্ঞতা স্বীকারের জন্যই নয়, মধ্যে মধ্যে পাদমূলে স্মৃতি সলিল সেচন করলে নূতন প্রেরণার সাহায্যে শাখা প্রশাখা বিস্তারের সুবিধা হ'তে পারে, এই অতি প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও প্রতিষ্ঠা-স্মৃতি উৎসবের প্রয়োজন। সুদীর্ঘ ৭৭ বৎসরের বিস্মরণের পর বিগত ২৪শে জানুয়ারী এই অনুষ্ঠান পালনের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান কর্তৃপক্ষ সকলের প্রশংসাভাজন হয়েছেন। আমরা আশা করি ভবিষ্যতে এই অনুষ্ঠানটি আরও বৃহৎ এবং ব্যাপক হ'য়ে উঠবে, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন এবং প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে সুদৃঢ় যোগসূত্র স্থাপনের দ্বারা একটি সংস্কৃতিগত ঐক্য সঞ্চার করবে।

শিবচন্দ্র স্মৃতি উৎসব ও পাঠচক্র বার্ষিক—

গত ৬ই জানুয়ারী রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় কোন্নগর বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মহাত্মা শিবচন্দ্র দেবের স্মৃতি উৎসব ও কোন্নগর পাঠচক্রের ষষ্ঠ বাৎসরিক উৎসব একত্রে অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। শিবচন্দ্র দেবের জন্মভূমি কোন্নগরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক তাঁর চিত্রপটে শ্রদ্ধাঞ্জলি সহ মাল্যদান করা হয় এবং পাঠচক্রের জন কয়েক সভ্য তাঁর জীবনী ও এই উৎসবের জন্য রচিত তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে ভক্তি উপহার প্রভৃতি পাঠ করেন। পাঠচক্রের সম্পাদকের বাৎসরিক বিবরণী পাঠের পর সভাপতি মহাশয় "প্রকৃত জীবন" সম্বন্ধে ইংরাজীতে সারগর্ভ একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। ডাঃ সুশীলচন্দ্র মিত্র এম্-এ, ডি-লিট, "রবীন্দ্র সাহিত্যের ভিত্তিভূমি" শীর্ষক একটী সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন।

সভা শেষে প্রায় ২০০০ নিমন্ত্রিত ব্যক্তি সঙ্গীতে এবং হীরেন্দ্রনাথ বসুর "নটরাজ" প্রভৃতি প্রাচ্য নৃত্যে পরম পরিতোষ লাভ করেন।

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের শতবার্ষিক উৎসব

বিগত ২৮শে জানুয়ারী ১৯৩৫ কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের শতবার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হয়েছে। এই উপলক্ষে সংগৃহীত এবং স্বীকৃত অর্থের সাহায্যে একটি দুর্ঘটনা বিভাগ স্থাপিত হয়েছে। উৎসবের দিন বাংলার গভর্ণর উক্ত বিভাগের গৃহভিত্তি স্থাপন করেন। দ্রুতগামী মোটর, লরি, বাস্ প্রভৃতির নিত্যবর্দ্ধনশীল সংখ্যাধিক্য হেতু কলিকাতার পথে ঘাটে দুর্ঘটনার সংখ্যা প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং দুর্ঘটনা-পীড়িত ব্যক্তিদের আশু সাহায্যের জন্য এরূপ একটি ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এই বিভাগের দ্বারা উপকৃত ব্যক্তিগণ সকৃতজ্ঞ অন্তরে ১৯৩৫ সালের শতবার্ষিক উৎসবকে স্মরণ করবে।

১৮৩৫ সালের ২৮শে জানুয়ারী কলিককাতা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়। প্রায় এক বৎসর পরে কলেজের অন্যতম ছাত্র মধুসূদন গুপ্ত প্রথম মনুষ্য-শব ব্যবচ্ছেদ করেন। শতবর্ষ পূর্ব্বের সামাজিক এবং আনুষ্ঠিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে এই সৎসাহস প্রদর্শনের জন্য মধুসূদনের সম্মানার্থে শবব্যবচ্ছেদকালে ফোর্ট উইলিয়াম্ দুর্গে তোপধ্বনি হয়েছিল।

পরলোকগত পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

গত ৬ই মাঘ ১৩৪১ সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষার অধ্যাপক পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কাশীধামে পরলোক গমন করেছেন। কিছুকাল হ'তে রক্তচাপ রোগে তিনি ভুগ্‌ছিলেন এবং ৬১ বৎসর বয়সে ঐ রোগেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ ২২ বৎসর কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে এবং কিছুকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। কর্ম্ম হ'তে অবসর গ্রহণের পর কাশীবাসার্থে গমন করেও তথায় তিনি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের তিনি একজন উৎসাহশীল কর্ম্মী ছিলেন। তিনি কয়েকটি বাংলা পুস্তকের রচয়িতা ছিলেন। 'কালিদাস ও ভবভূতি' 'দত্তকবিধিবিচার' প্রভৃতি পুস্তক তিনি রচনা করেন।

ধর্ম্ম এবং সামাজিক অনুষ্ঠানাদি ব্যাপারে রাজেন্দ্রনাথ ছিলেন উদার নীতির সমর্থক। বাল্যবিবাহ এবং পণপ্রথার বিরুদ্ধে, শারদা আইন এবং বিধবা বিবাহের সপক্ষে তিনি বহু আলোচনা এবং আন্দোলন করেছিলেন। তিনি সদ্বক্তা এবং ন্যায়নিষ্ঠ আলোচক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে বঙ্গদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল।

স্যার আবদুল্লা সুহ্‌রাবর্দ্দী

স্যার আবদুল্লার মৃত্যু সমগ্র বঙ্গদেশের পক্ষে শোচনীয় হয়েছে। তিনি একজন বহুভাষাবিৎ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উদারনীতির অনুসারী ছিলেন। সর্ব্বধর্ম্মের সুসমঞ্জস সমন্বয়ে তাঁর আস্থা এবং বিশ্বাস ছিল। তিনি বহুবৎসর বঙ্গীয় এবং ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কে তিনি বহুকাল অধ্যাপকের কার্য্যও করেছিলেন।

পরলোকগত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আলিপুরের পাব্‌লিক প্রসিকিউটার প্রসিদ্ধ আইন-ব্যবসায়ী নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিগত ২৬শে মাঘ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। ২৬শে মাঘ সন্ধ্যায় তিনি সুস্থ শরীরে কাছারী হইতে বাড়ি আসেন এবং সেইদিন রাত্রেই সাংঘাতিক মেনিন্‌জাইটিস্ রোগে আক্রান্ত হন,—চতুর্থ দিনে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

নগেন্দ্রবাবুর মৃত্যুতে বাংলাদেশ একজন উচ্চশ্রেণীর কর্ম্মী হ'তে বঞ্চিত হ'ল। তাঁর কর্ম্মশীলতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল তাঁর নিবাস বীরনগর গ্রামের সংস্কার অনুষ্ঠানে। উলা-বীরনগর পূর্ব্বে বাংলাদেশের একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম ছিল বটে, কিন্তু বর্ত্তমানে জঙ্গলাকীর্ণ হ'য়ে ম্যালেরিয়ায় এবং অবহেলা অনাদরে ধ্বংস পেতে বসেছিল। সেই মৃত্যুপথ-যাত্রী গ্রামের বন-জঙ্গল কাটিয়ে আধুনিক পদ্ধতি অনুযায়ী প্রশস্ত বড় বড় রাজপথ, সাধারণ পুষ্করিণী, পার্ক ইত্যাদি স্থাপন ক'রে তিনি বীরনগর গ্রামকে স্বাস্থ্যে এবং সৌন্দর্য্যে সমৃদ্ধ ক'রতে উদ্যত হয়েছিলেন। তাঁর মনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল যে বীরনগরকে তিনি পাশ্চাত্য আধুনিকতম পদ্ধতি অনুসারে বাংলাদেশের আদর্শ গ্রামে পরিণত করবেন। এজন্য তাঁর পরিশ্রম অধ্যবসায় এবং অর্থব্যয়ের বিন্দুমাত্র কার্পণ্য ছিল না। তিনি নিজেই এবিষয়ে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় ক'রেছিলেন। বাঙ্গলার গভর্ণর বাহাদুর, অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী এবং দেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হয়ে বীরনগরেরর ভবিষ্য অভিনব মূর্ত্তির আভাষ লাভ ক'রে চমৎকৃত হ'য়েছিলেন। কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের অভিপ্রায়ে তদঞ্চলবাসী পণ্ডিতগণ নূতন বীরনগরের নাম নগেন্দ্রপত্তম্ করবেন স্থির করেছিলেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি নগেন্দ্রবাবুর আরব্ধ এই মহৎ কার্য্য অর্থ ও উদ্যমের অভাবে অসম্পূর্ণ থাকবে না। ভারতবর্ষের এই আত্মপ্রতিষ্ঠার যুগে এরূপ ভাবে গ্রাম-সংস্কার গঠন-নীতির একটি প্রকৃষ্ট বাস্তব উদাহরণ।

দরিদ্র দুঃখার্ত্তের প্রতি ব্যক্তিগত নিঃশব্দ দানও নগেন্দ্রনাথের কম ছিল না। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিজনবর্গকে আমাদের সমবেদনা জানাচ্ছি।

অর্দ্ধোদয় যোগ

এবার অর্দ্ধোদয় যোগ উপলক্ষে কলিকাতায় অনুমিত পাঁচ লক্ষ স্নানার্থীর সমাগম হয়েছিল। আশঙ্কা হয়েছিল যে স্নানের সময় নানাবিধ দুর্ঘটনা এবং যোগ-দিবসের পূর্ব্বে এবং পরে কলেরা প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব অনিবার্য্য। কিন্তু অতিশয় সুখের বিষয় আশঙ্কা একেবারেই সত্যে পরিণত হয় নি। নগরের স্বাস্থ্য অটুট রাখবার জন্য করপোরেশানের ব্যবস্থা এবং স্নান ঘাটে যাতে দুর্ঘটনা না হয় তজ্জন্য স্বেচ্ছাসেবক এবং অপরাপর প্রতিষ্ঠানের বন্দোবস্ত উৎকৃষ্টতম হয়েছিল। আগন্তুক এবং কলিকাতাবাসী স্নানার্থী উভয় মিলিয়ে ৯।১০ লক্ষ লোক সেদিন গঙ্গাস্নান করেছিল। তন্মধ্যে একটি মাত্রও প্রাণহানি ঘটে নাই স্বেচ্ছাসেবকগণের পক্ষে এ বড় অল্প কৃতিত্বের কথা নয়। আমরা এই গৌরবজনক সাফল্যের জন্য সানন্দে তাঁদের অভিনন্দিত করছি।

Edited by Upendranath Ganguly, Printed by Saratchandra Mukherjee at The Sreekrishna Printing Works
259 Upper Chitpore Road. and published by the same from 27/1, Fariapooker Street, Calcutta

বিচিত্রা
চৈত্র ১৩৪১

সতীর মৃত্যু

শ্রীচিন্তামনি কর

অষ্টম বর্ষ, ২য় খণ্ড	চৈত্র, ১৩৪১	৩য় সংখ্যা

পলাতকার প্রতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গেলে কোথা চাপিয়া মোটরে
সহরের গলির কোটরে,
এক্‌জামিনেশনের তাড়া।
কেতাবের পরে ঝুঁকে থাকো,
বেণীর ডগাও দেখি না কো,
দিনেরাতে পাইনে যে সাড়া॥
আমার চায়ের সভা শূন্য,
মনটা নিরতিশয় ক্ষুণ্ণ,
সুমুখে নফর বনমালী।
"সুমুখ" তাহারে বলা মিছে,
মুখ দেখে মন যায় খিঁচে,
বিনাদোষে দিই তারে গালি॥
ভোজন ওজনে অতি কম,
নাই রুটি, নাই আলু-দম,
নাই রুই মাছের কালিয়া।
জঠর ভরাই শুধু দিয়ে
দু পেয়ালা Chinese tea-এ
আধ সের দুগ্ধ ঢালিয়া॥

উদাস হৃদয়ে খাই একা
টিনের মাখন দিয়ে সেঁকা
রুটি-তোস্ শুধু খান তিন।
গোটা দুই কলা খাই গুণে',
তারি সাথে বিলিতি-বেগুনে
কিছু পাওয়া যায় ভিটামিন॥
মাঝে মাঝে পাই পুলি পিঠে,
পার ক'রে দিই দু চারিটে,
খেজুর গুড়ের সাথে মেখে।
পিরিচে পেরাকি যবে আনে
আড় চোখে চেয়ে তার পানে
পরে খাব ব'লে দিই রেখে॥
তারপরে দুপুর অবধি
না ক্ষীর, না ছানা সর দধি,
ছুঁইনেকো কোফ্‌তা কাবাব।
নিজের এ দশা ভেবে ভেবে
বুক যায় সাত হাত নেবে,
কারে বা জানাই মনোভাব॥

করছিনে exaggerate,
কিছু আছে সত্য নিরেট,
কবিত্ব সে-ও অল্প না।
বিরহে যে ব্যথা বুকে মারে
সাজিয়ে বলতে গেলে তারে
অনেকটা লাগে কল্পনা॥
অতএব এই চিঠি পাঠে
পরাণ তোমার যদি ফাটে
বেশি তার র'বে না প্রমাণ।
চিঠির জবাব দেবে যবে
ভাষা ভ'রে দিয়ো হাহারবে
কবি নাতিনীর রেখো মান।

পুনশ্চ :—
"বাড়িয়ে বলাটা ভালো নয়,"
যদি কোনো নীতিবাদী কয়,
কোস্ তারে, "অতিশয় উক্তি
মসলার যোগে যথা রান্না,
আব্দারে ছল ক'রে কান্না,
নাকিস্থর যোগে যথা যুক্তি॥
ঝুম্‌কোর ফুল ফোটে ডালে
চোরেও চায়না কোনো কালে,
কানে ঝুম্‌কোর ফুল দামী।
কৃত্রিম জিনিষেরই দাম,
কৃত্রিম উপাধিতে নাম
জমকালো করেছি তো আমি॥

অতএব মনে রেখো দড়ো,
এ চিঠির দাম খুব বড়ো,
যে হেতুক বাড়িয়ে বলায়
বাজারে তুলনা এর নেই,
কেবলি বানানো বচনেই
ভরা এযে ছলায় কলায়॥
পাল্লা যে দিবি মোর সাথে
সে ক্ষমতা নেই তোর হাতে,
তবুও বলিস্ প্রাণপণ
বাড়িয়ে বাড়িয়ে মিঠে কথা,
ভুলিবে, হবে না অন্যথা,
দাদামশায়ের বোকা মন।
যা হোক এ কথা চাই শোনা,
তাড়াতাড়ি ছন্দে লিখো না,
না হয় না হোলে কবিবরা,
অনুকরণের শরাহত
আছি আমি ভীষ্মের মতো,
আরো স্বর কেন যোগ করা?
যে ভাষায় কথা কয়ে থাকো
আদর্শ তারে বলে নাকো,
তবুও আমার সেই ঢের,
flatter করিতে যদি পারো
গ্রাম্যতা দোষ যত তারো
একটু পাব না আমি টের॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মাদাম কুরি

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

যে সকল নর-নারী জগতের কল্যাণ সাধনায় নিজেদের জীবন নিবেদন ক'রে লোকসমাজে অমরত্বের দাবী রেখে গেছেন, মাদাম কুরি তাঁদের মধ্যে অন্যতমা। কিছুদিন আগে তিনি তাঁর জীবনের কাজ সমাপ্ত ক'রে মরলোক থেকে বিদায় নিয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁর দেশবাসীর কাছে, সাত সমুদ্র-তেরো নদীর পারে অবস্থিত আমাদের কাছে, তথা সারা জগতের কাছে তাঁর বিজ্ঞান সাধনার ভিতর দিয়ে তিনি অমর হ'য়ে থাকবেন চিরদিন।

মাদাম কুরির জীবনী আলোচনা করলে দেখা যাবে, অতি শিশুকাল থেকেই তাঁর অন্তরে একটি প্রবল অনুসন্ধিৎসা এবং সেই সঙ্গে জ্ঞান ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছিল। ১৮৬৭ সালে পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ারশতে তাঁর জন্ম। বাল্যাবস্থাতেই তিনি তাঁর পিতার সঙ্গে শহরের একটি গুপ্ত বিদ্রোহী দলে যোগ দিয়ে দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে নিজের ক্ষুদ্র শক্তিকে নিয়োজিত করেছিলেন। কর্তৃপক্ষ সেই দলের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হবার পর মারি ও তাঁর পিতা দেশ ছেড়ে অন্যত্র প্রস্থান করতে বাধ্য হন। পিতামাতার দেওয়া নাম তাঁর ছিল—মারি স্ক্লোডোসকা।

কিছুদিন পরে একদিন রাত্রে মারি যখন এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশ পরিধান ক'রে জ্ঞান এবং অর্থ উপার্জ্জনের জন্য প্যারিস অভিমুখে রওনা হলেন তখন তাঁর বয়স কৈশোরের সীমানা অতিক্রম করেছে মাত্র। প্যারিসে তাঁর না ছিল কোন বন্ধু বা আত্মীয়, না অর্থের প্রাচুর্য্য। মারি স্ক্লোডোস্কা অত্যন্ত দীনভাবে প্যারিসের দরিদ্রপল্লীতে ছোট একটি ঘরে বাস করতে লাগ্‌লেন। সরবন্ রাসায়নিক কর্ম্মশালায় ডিশ্‌বাটী পরিস্কার ক'রে এবং ছোটখাটো ফরমায়েস খেটে তাঁর দিন চল্‌ত। রুটি এবং দুধ ছাড়া অন্য আহার সংগ্রহ করবার মতো সঙ্গতি তখন তাঁর ছিল না—মাসের পর মাস তাঁর এমনি অবস্থায় কেটেছে।

বছর দুই পরে ভাগ্য ঈষৎ সুপ্রসন্ন হল। যে পরীক্ষাগারে তিনি কাজ করতেন তথাকার পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের কর্ত্তা গ্যাব্রিয়েল লিপম্যানের সুনজরে প'ড়ে তাঁর কৃপায় মারি পদার্থবিজ্ঞানে পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগলেন।

১৮৯৪ সালের বসন্তকালের এক পরিণাম-রমণীয় সন্ধ্যায় এক বন্ধুর গৃহে পায়রে কুরি এবং মারি স্ক্লোডোসকা পরস্পর পরিচিত হন। পরিচয় নিবিড়তরো হ'লে উভয়ে উপলব্ধি করলেন যে উভয়ের মধ্যে একটি গভীর সামঞ্জস্য আছে এবং সে সামঞ্জস্যের ক্ষেত্র হচ্ছে বিজ্ঞান।

শুধু তাই নয়; তাঁরা দেখলেন, উভয়ের অন্তরের এমন অনেকগুলি দিক আছে যেখানে তাঁরা এক। দুজনের প্রকৃতিই ছিল স্থির গম্ভীর এবং একনিষ্ঠ। পরস্পর পরস্পরের জন্য প্রথম থেকে একটি নিবিড় সহানুভূতি অনুভব করতে লাগলেন। মনের এই প্রেরণার অন্তরালে প্রীতির মাধুর্য্যও যে কিছু পরিমাণে সঞ্চিত হ'য়ে ওঠেনি তাই বা কে বলবে ?

মারি তখন লিপ্‌ম্যানের কাছে কাজ শিখ্‌ছিলেন। লিপ্‌ম্যান তাঁর এই প্রতিভান্বিতা ছাত্রীটিকে কুরির কাছে গচ্ছিত করে দিলেন এবং দুজনকে একসঙ্গে কাজ করবার সুবিধা দান করলেন। সুতরাং কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল লিপ্‌ম্যানের পরীক্ষাগারে অল্পভাষী একাগ্রচিত্ত কুরির অধীনে তাঁর চেয়েও অল্পভাষী এবং একাগ্রচিত্ত মারি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় নিযুক্ত আছেন।

কয়েক মাস পরে পায়রে কুরি তাঁর সহকর্ম্মিণীকে পত্র লিখলেন :

"What a grand thing it would be to unite

our lives and work together for the good of Science and Humanity!"

মারি স্ক্লোডোস্কা এই ভীরু লাজুক প্রস্তাবটির জন্যই বোধ করি এতদিন অপেক্ষা করছিলেন; নম্রমুখে তিনি সম্মতি দান করলেন।

অতঃপর স্বামীস্ত্রীতে বিজ্ঞানের সাধনায় মগ্ন হ'য়ে নানা প্রকারের গবেষণা ও পরীক্ষায় নিযুক্ত হলেন। তাঁদের সেই অনন্যসাধারণ সাধনার পরিণতি হচ্ছে আধুনিক কালের চিকিৎসা জগতের যুগান্তকারী রঞ্জন রশ্মি (X Ray বা Radium Ray)

১৮৯৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ইউরেনিয়ম সল্ট্ নামক এক প্রকার খনিজ পদার্থ নিয়ে বহু পরীক্ষার পর তাঁরা তার চেয়ে বহুগুণে শক্তিশালী এবং দ্যুতিবিস্ফুরণক্ষম এক পদার্থ আবিষ্কার করলেন এবং তার নাম দিলেন—রেডিয়ম। এই রেডিয়াম থেকে যে কিরণ নির্গত হয় তারই নাম—X Ray।

১৯০০ সালে প্যারিস শহরে পদার্থবিজ্ঞানের মহাসম্মেলনে এই নব-আবিষ্কার আলোচিত হয়েছিল এবং সেই দিন কুরি-দম্পতি সারা বিজ্ঞান জগতের অভিনন্দন লাভ করেছিলেন।

ঐ বছরের শেষে জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ কুরি সাহেবকে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপকের আসন প্রদান করবার ব্যবস্থা করেন এবং সেই সঙ্গে মাদাম কুরিকেও একটি মোটা মাহিনার পদ প্রদান করতে স্বীকৃত হন। প্রস্তাবটি কুরি-দম্পতির পক্ষে বিশেষ লোভনীয় হয়েছিল সন্দেহ নেই। সুইজারল্যাণ্ডের শান্ত সুখময় জীবন, বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম্মের প্রচুর সুবিধা এবং সর্ব্বোপরি এতদিনের আর্থিক দুর্ভোগ থেকে মুক্তিলাভ—এই সকল সুযোগ-সুবিধার স্বর্ণরশ্মি তাঁদের চক্ষুকে ক্ষণকালের জন্য সম্মোহিত করেছিল—তাঁরা প্যারিস পরিত্যাগ করবার উদ্যোগ করতে লাগলেন।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কুরি-দম্পতির সুইজারল্যাণ্ড যাওয়া ঘটে ওঠেনি। যাবার প্রাক্কালে কুরি সাহেব একটি ছোটখাটো অধ্যাপকের পদ পেলেন এবং মাদাম কুরিও সেই সঙ্গে একটি মেয়ে স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ যোগাড় করলেন। সুতরাং, আয় যখন কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হল তখন তাঁদের দেশ ছেড়ে অন্যত্র গমন করবার সঙ্কল্পের জোরও ধীরে ধীরে হ্রাসপ্রাপ্ত হ'ল।

১৯০২ সালে মাদাম কুরি পদার্থবিজ্ঞানে গবেষণা ক'রে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ডক্টর অফ্ সায়ান্স' উপাধির দ্বারা সম্মানিতা হলেন। ১৯০৩ সালে কুরি দম্পতির শিরে নোবেল পুরস্কারের জয়মাল্য বর্ষিত হ'ল। তাঁদের এ সম্মানে আর একজন অংশীদার ছিল। তিনিও তখনকার দিনের একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। তাঁর নাম—M. Becquerel।

নোবেল পুরস্কার পাবার পর বিলাতের রয়েল ইনষ্টিটিউশনের সাগ্রহ আমন্ত্রণে কুরি-দম্পতি লণ্ডনে গমন করেন।

তাঁদের জন্য একটি বিশেষ সভা আহ্বান করা হয়। সেই সভায় তাঁরা তাঁদের বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্বন্ধে বক্তৃতা দান করেন। শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে দেশের বড় বড় বৈজ্ঞানিকগণ উপস্থিত ছিলেন; যথা: ক্রুক্স্; র‍্যামসে; অলিভার লজ; টমসন; এবং রাদারফোর্ড। কয়েকমাস পরে রয়েল সোসাইটি কুরি-দম্পতিকে ডেভি-পদক দান ক'রে তাঁদের প্রতিভাকে স্বীকার করেন।

পরের বছর ফরাসী চেম্বার অফ্ ডেপুটিজ বিশেষ ক'রে পায়রে কুরির জন্য একটি অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করলেন এবং তার খরচ বাবদ সর্ব্ববাদীসম্মত ভাবে আঠারো হাজার ফ্রাঁ নির্দ্ধারিত ক'রে দিলেন।

ভাগ্য যখন সুপ্রসন্ন হয় তখন চারিদিক থেকে এমনি ভাবেই সম্মান ও অর্থের জোয়ার ব'য়ে আসে; ১৯০৫ সালে পায়রে কুরি দেশের সর্ব্বোচ্চ বিদ্যা-প্রতিষ্ঠান অ্যাকাডেমি অফ্ সায়ান্স-এর সভ্যপদে নির্ব্বাচিত হলেন। সে নির্ব্বাচন যুদ্ধে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ দাঁড়াতে সাহস করেনি।

এমনি ক'রে কয়েক বছরের মধ্যে কুরি-দম্পতি দেশের তথা সারা জগতের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানসাধক রূপে খ্যাতিলাভ করলেন। তাঁদের আর্থিক অস্বচ্ছলতা দূর হ'ল; স্বাধীনভাবে তৃপ্তিপূর্ণ অন্তরে তাঁরা অধিকতর উৎসাহে বিজ্ঞানের নব নব ক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিভা ও শক্তি নিয়োজিত করলেন।

কিন্তু কুরি-দম্পতির জীবনে এ সৌভাগ্য-সূর্য্য বেশীক্ষণ স্থায়ী হ'ল না; হঠাৎ একদিন একান্ত অকালে ও অসময়ে সে-সূর্য্য অস্তমিত হ'ল। সে ঘটনা যেমন নিদারুণ তেমনি অপ্রত্যাশিত। সেই অচিন্ত্যপূর্ব্ব দুর্ঘটনায় সারাদেশ স্তম্ভিত বিহ্বল হ'য়ে পড়েছিল।

১৯০৬ সালের ১৯শে এপ্রিল তারিখে পীয়রে কুরি অধ্যাপক-সঙ্ঘের দ্বারা অনুষ্ঠিত একটি উৎসব-সভা থেকে প্রত্যাবর্ত্তন করছিলেন। পরীক্ষাগারে যাবার পথে Rue Dauphine নামক রাস্তা পার হবার সময় অকস্মাৎ তিনি পা পিছলে প'ড়ে যান এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রকাণ্ড মাল-বোঝাই গাড়ী তাঁর ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে। চাকার তলায় তাঁর দেহ যায় পিষে; সংঘর্ষের অব্যবহিত পরেই তিনি মারা যান।

এই মর্ম্মঘাতী দুর্ঘটনার কথা যখন মাদাম কুরির কাছে পৌঁছলো তখন সেকথা শোনার পর বহুদিন পর্যন্ত তিনি অচৈতন্য হ'য়ে শয্যাশায়ী ছিলেন; এমন কি, ডাক্তারেরা তাঁর প্রাণের আশঙ্কায় রীতিমতো ত্রস্ত হ'য়ে উঠেছিল।

যাই হোক, অবশেষে তিনি শয্যা ছেড়ে উঠে বসলেন এবং ক্রমে কতক পরিমাণে সুস্থ হয়ে উঠ্‌লেন।

স্বামীর অধ্যাপকের আসনটি তাঁকে দেওয়া হ'ল; তিনিও সাগ্রহে তা গ্রহণ ক'রে স্বামীর আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করবার জন্য আত্মনিয়োগ করলেন; কিন্তু তাঁর দুই চোখের সে খর-দীপ্তি ম'রে গেল; তাঁর সারা দেহ এবং সমস্ত ভঙ্গিমার মধ্যে শোকের একটি অনুচ্চারিত বাণী যেন সকল সময় অব্যক্ত ভাষায় বেদনা প্রকাশ করত; তিনি যেন সম্পূর্ণ এক আলাদা মানুষে পরিণত হলেন।

১৯১১ সালে পুনরায় তাঁকে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। ইতিপূর্ব্বে দু'বার ধ'রে এ পুরস্কার আর কেউ পায় নি।

মাদাম কুরির নাম বিজ্ঞান জগতের আকাশে উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের মতো দীপ্ত হ'তে লাগ্‌লো। তাঁর জীবনে সে দীপ্তি এতটুকুও ম্লান হয়নি।

১৯১৪ সালে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় যে রেডিয়ম ইনষ্টিটিউট্ নির্ম্মাণ করেন মরণকাল পর্য্যন্ত মাদাম কুরি তার যাবতীয় কাজ দেখাশুনা করতেন; প্রতিষ্ঠানটির সকল ভার তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল।

দুটী কন্যা নিয়ে মাদাম কুরি Rue Pierre Curie নামক পল্লীতে বাস করতেন। স্বামীর মৃত্যুর পর সাধারণের কাছে তিনি নিজেকে বিশেষ প্রকাশ করতে চাইতেন না।

স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি মাত্র একবার একটি বিশেষ সভায় বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন। সে বক্তৃতা শোনবার জন্য উপস্থিত ছিলেন, ফরাসী রাজ্যের প্রেসিডেণ্ট্; পর্ত্তুগালের সম্রাট; লর্ড কেল্‌ভিন; স্যর ডব্লু র‍্যামসে এবং অলিভর্ লজ্। র‍্যামসে, কেলভিন এবং লজ সাহেবেরা ইংলণ্ড থেকে প্যারিসে গিছলেন শুদ্ধমাত্র সেই সভায় নিজেদের উপস্থিতি জ্ঞাপন করবার জন্য। মাদাম কুরি যখন বক্তৃতাগৃহে প্রবেশ করলেন তখন সমবেত জনতা দাঁড়িয়ে উঠে মাথা নুইয়ে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলে।

মাদাম কুরিকে দেখলে বোঝবার উপায় ছিল না যে এই ক্ষীণদেহা সাধারণ চেহারার মহিলাই জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিভান্বিতা রমণী। পোষাক পরিচ্ছদ তাঁর ছিল অত্যন্ত সাধারণ—একটি কালো গাউন সকল সময় তাঁর দেহ ঘিরে থাকতো। তাঁর দুই চোখের দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত শ্রান্ত; মনে হ'ত যেন কোন এক তীর্থ-পথিক তার যাত্রা শেষ ক'রে অবসন্ন হ'য়ে পড়েছে, যে কোন মুহূর্ত্তেই পথের পরে সে লুটিয়ে পড়তে পারে।

আজীবন বিজ্ঞানের সাধনায় রত থেকে তিনি যে সম্পদ পৃথিবীকে দান ক'রে গেলেন মানব সমাজের কল্যাণ সাধনে তার মূল্য অপরিমেয়। তাঁর দান পৃথিবীকে সমৃদ্ধতর করেছে।

শত দুঃখ কষ্ট, সহস্র বাধা বিপত্তির মধ্যেও তিনি যে অদম্য কর্ম্মনিষ্ঠা ও অবিচলিত অধ্যবসায়ের দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন, তাঁর জীবনের সেই পবিত্র প্রাণময় আদর্শ জগতের কাছে তাঁকে চির-পূজনীয়া ক'রে রাখবে।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

"দাঁতের আলো"

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১

আমার ভাই ঝি "মৈয়া"র সম্প্রতি তিনটি দাঁত উঠিয়াছে, তাইতে তাহার নাকি মাটিতে পা পড়ে না। অবশ্য ঝিয়ের কোলে কোলেই কাটে, পা পড়িবার বয়স হয় নাই, তবে যাহারা বোঝে তাহারা বলে—যদি বয়স হইতই মাটিতে পা পড়িত না—এমনই তেজ।

আমার সঙ্গে মা-ছেলের সম্বন্ধ—ডাকি—"মৈয়া"। কথাটা "মা"-র মত কোমলও নয়, সরলও নয়। এ-প্রান্তে ছোট ছোট পশ্চিমা শিশুরা—"মৈয়া গে" বলিয়া আবদার ধরে। ও হইয়া অবধি কি যাদুবলে আমার বয়সের গোটা ৩০।৩৫ বৎসর ছাঁটিয়া দিয়া আমায় এই সব শিশুদের সামিল করিয়া দিয়াছে। আফিসে ইয়া-ইয়া জোয়ানদের উপর হুকুম চালাইয়া, আফিস কাঁপাইয়া সন্ত্রস্ত করিয়া বাড়ীর চৌকাঠ না ডিঙাইতে ডিঙাইতে আমি বদলাইয়া যাই। হাঁকি—"মৈয়া, ভুখ্ লেগেছে—বড্ড···"

আমার বিশ্বাস "মৈয়া" যে একজন মা তাহা ওর বেশ স্পষ্টভাবে জানা আছে। ঝিয়ের কালকুষ্টি কোলের মধ্যে সে ব্যস্ত হইয়া ওঠে—রাখা দায়—ফুটফুটে হাত পা, টুকটুকে মুখখানি চঞ্চল হইয়া ওঠে—পঙ্কিল জলে বায়ুচালিত পদ্মফুলটির মত। মৈয়ার ছেলে আসিয়াছে, তাহার 'ভুখ' লাগিয়াছে, স্তন্য দিতে হইবে, আর কি সে থাকিতে পারে?

বলি—"কোলে নাও মৈয়া।"

সঙ্গে সঙ্গে কোলে লয়,—বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া গলা জড়াইয়া ধরে। সঙ্গে সঙ্গে প্রবালের মত রাঙা-ঠোঁটের মাঝখানে সেই তিনটি দাঁতের বিকাশ।

প্রশ্ন হইতে পারে—"তিনটি দাঁত, এমন কি ব্যাপার, যাহার জন্য এত?"

বিজ্ঞমাত্রেই ঐ কথাই বলিবে। উদাহরণ স্বরূপ ওর বড় বোন রাণুর কথাই বলি। বলে—"হ্যাঁ, বুঝতাম হাতি হ'য়েছে, ঘোড়া হ'য়েছে, মোটরকার হ'য়েছে—দেমাকও হ'য়েছে। তিনটি দাঁত এমন কি সম্পত্তি মেজকা' যে মৈয়ার তোমার ঠ্যাকার রাখতে জায়গা নেই?—আমি তো বুঝি না বাপু।"

বলি—"একেবারে ঠ্যাকার হ'য়ে গেল, রাণু?"

"হ্যাঁ, ঠ্যাকার বৈকি। তোমার মৈয়াকে নিয়ে কিছু ব'ললেই তোমার লাগে; কিন্তু দাঁত হ'য়ে পর্য্যন্ত যা' সব কাণ্ড তা' দেখে ঠ্যাকার বলব না তো বলব কি?—উনি আজকাল দুধ খাবেন না···দুধ খেতে যাব কেন?—ওতে কি দাঁতের দরকার হয়?···আমি খাব কয়লা, চায়ের টিকাপ, খোলামকুঁচি, দাদুর খড়ম,—কুট্ কুট্ করে শব্দ হবে, লোকে বলবে—হ্যাঁ, ছবুরাণীর দাঁত হ'য়েছে। অথচ পুঁজি তো সবে তিনটি।···আর গজর গজর ক'রে বকেই বা কেন এতো? বড় যে মৈয়াকে তোমরা চেনো, বকবার মতলবটা কি বল দিকিন?"

রাণুকে এই তালে শিশুতত্ত্ব শিখাইবার লোভটা সংবরণ করিতে পারি না, বলি—"ওটা আপনি-আপনিই হয়, রাণু, বকবার জন্যে ওকে বড় একটা চেষ্টা করতে হয় না। ইংরাজিতে একে অটোমেটিক্ একশন্ বলে, আর একটু বড় হ'লে তোমায় এসব বুঝিয়ে দোব'খন। ওর দ্বারা ওদের জিভের এক্সারসাইজ হয়, তারপর ক্রমে···"

রাণু হাসিয়া বলে—"তুমি কিছুই ধরতে পারনি মেজকা। তোমরা মায়ে পোয়ে ঠিক এক রকম—কি যে কতকগুলো আউড়ে গেলে···ছবিরাণীর কথায় আবার ইংরিজি এলো কোত্থেকে বুঝতে পারি না।···না জানো তো, আমার কাছে শোনো। বকে, কিনা দাঁত তিনটি ঝিক্‌মিক্ করবে;

না হলে কথার মাথা নেই মুণ্ড নেই—অত আবল-তাবল বকতে যাবে কেন বলতো?"

আমি অজ্ঞতার নীরব হাসি হাসিয়া কথাটা জানিয়া লই।

প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারিতেছি দেখিয়া রাণু আবার প্রশ্ন করে—"দাঁতে দাঁত দিয়ে, এক একবার ঘ'ষে কেন বলতে পার—কুর্-র্—কুর্-র্ ক'রে শব্দ করে?"

বলি—"তিনটি দাঁত ঝিক্‌মিক্ করবে বলে।"

রাণু ধমক দিয়া ওঠে—"ব্যস, এইবার ঐ এক কথাই চলবে—'ঝিক্‌মিক্ করবে বলে', দাঁতের ওর যেন আর অন্য কাজ নেই। দাঁত ঘষবার আর কোন হেতু নেই;—শুধু কখন কুট্ করে কামড় দিতে হবে, তার জন্যে ঘষেমেজে তোয়ের করে রাখা; ওকে তুমি কম মানুষটি মনে কর নাকি? একবার যদি বাগিয়ে ধরতে পারলে তো তিনটি ছাপ না দিয়ে ছাড়বে না। আমি বাঘের মুখে হাত দিতে রাজী আছি, কিন্তু ও মেয়ের কাছ থেকে একেবারে সাত হাত তফাতে থাকব, এই ব'লে দিলাম তোমায়।"

সাতহাতের প্রতিজ্ঞা সাত মিনিটও টেঁকে না। হাসিতে মুক্তাবৃষ্টি করিতে করিতে মৈয়া আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই ঝিয়ের কোল, সেই রাঙা ঠোঁটে বাঁধান তিনটি দাঁত, কিন্তু এত পরিচয়েও এতটুকু পুরাণ নয়।

রাণু গিয়া ঝাঁপাইয়া পড়ে, ঝিয়ের কোল থেকে যেন ডাকাতি করিয়া কাড়িয়া লয়। হাসিতে, গৌরবে একশা হইয়া বলে—"দেখ, মেজকা, দেখ কি চমৎকার মানায় হাসলে।"

মৈয়ার দাঁতে আঙুল টিপিয়া বলে—"আর কতটুকু দাঁত মেজকা; কুর্‌কুর্ করে হাতে এমন চমৎকার!..."

ভীত হইয়া তাড়াতাড়ি বলি—"হাত দিও না, দেবে এক্ষুনি কামড়ে রক্তপাৎ করে..."

"হ্যাঃ, তোমার যেমন কথা, ছবুরাণী আবার নাকি কামড়ায়!—ক্ষিরে ঠেকলে দাঁতগুলি ভেঙে যাবে—এত নরম। তোমরা সবাই আমার ছবুরাণীর একটা বদনাম তুলে দিয়েছ; এতে যে তোমরা কি সুখ পাও!...কি ছেলে তোমার ছবিরাণী—শুধু মায়ের নিন্দে—কি ছেলে তোমার?..."

রাণু শেষের কথাগুলো, মাথার একটা ঝাঁকানির সঙ্গে কপট গাম্ভীর্য্যে ও হাসিতে মিলাইয়া এমন ভাবে বলে যে মৈয়া হঠাৎ হাসিতে একেবারে কুটি কুটি হইয়া পড়ে। তিনটি দাঁতে আলো ঠিকরাইয়া পড়িতে থাকে, কচি শরীরের কূল ছাপাইয়া লহর ওঠে। থামিবার অবসর পায় না, থামিলেই রাণু সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ করিয়া দেয় —হাসির স্রোত দ্বিগুণ উচ্ছ্বাসে ঝাঁপাইয়া যেন চারিদিকে ছিটকাইয়া পড়ে।

২

বাড়ির নবীনতম সংবাদ, কাল বাবুলবাবুর শুভাগমন হইয়াছে। জন্মস্থান পূর্ণিয়া, বয়স ছয় মাস।

মানুষটি গম্ভীর প্রকৃতির। কপালটি প্রশস্ত হওয়ায় এবং মাথায় চুলের ভাগ অল্প হওয়ায় ভাবটি যেন একটু মুরুব্বি গোছের। আসন-পিঁড়ি হইয়া বসিয়া, পাতলা ঠোঁট দু'টি চাপিয়া শান্তভাবে সংসারের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতে থাকেন, এবং রহিয়া রহিয়া, অনেকক্ষণ পরে পরে সমস্ত শরীরটি দুলাইয়া এক একবার উল্লাসে হাততালি দিয়া ওঠেন;—দেখিলে মনে হয় হঠাৎ যেন জগৎবিধানের কোন গম্ভীর তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন।

শিমলায় বাণিজ্য বৈঠকে জাপানী প্রতিনিধিদের সঙ্গে কি রফা হইল দেখিতেছিলাম, রাণু আসিয়া একটি গুরুতর সমস্যা হাজির করিল, বলিল—"আচ্ছা মেজকা, আমরা বড়রা ভাবি কচি ছেলেমেয়েরা সুন্দর হয়, ভাল চুল হ'লে, ভাল চোখ হ'লে, মোটা সোঁটা নাদুসনুদুস্ হ'লে—এই তো?—কিন্তু ওরা নিজেরা কি ভাবে বলতো?"

এই রকম কোন প্রশ্ন উপস্থিত করিলে আমি রাণুর কাছে একটু ভয়ে ভয়েই উত্তর দিই, কারণ, ও যেমন একদিকে শিশুদেরও শিশু বলিয়া জানে, অপর দিকে আমাকেও একটি শিশুবিশেষ বলিয়া ধরিয়া লয়।...তবুও বলিলাম—"ওদের সুন্দর কুৎসিত সম্বন্ধে কি কোন ধারণা আছে রাণু? ও ধারণাটা ফুটতে অনেক দেরি লাগে—

বিশেষ ক'রে নিজের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে। সব প্রথমে ওদের জ্ঞান ফোটে খাওয়া নিয়ে। তোমায় একদিন বুঝিয়ে দোব যে সেটা আত্মরক্ষা অর্থাৎ নিজেকে বাঁচাবার যে ইচ্ছা—ইংরিজিতে যাকে বলে···"

রাণু হো—হো করিয়া হাসিয়া বলিল—"তুমি যখন ঐরকম ক'রে কি সব ব'লে যাও, আমার এত মিষ্টি লাগে মেজকাকা,—ফুরসৎ থাকলে ব'সে ব'সে শুনতে ইচ্ছে করে।···ছেলেরা নিজেদের কিচ্ছু জানে না, যত জানো তুমি। কোনদিন ব'লে ব'সবে ঐ চিলটা যে উড়ে যাচ্ছে তা ও নিজে জানে না।···ওমা! শঙ্খচিল, প্রণাম কর মেজকা', মাথায় বুদ্ধি দেন, ওমা! শঙ্খচিলকে বুঝি ঐ ক'রে প্রণাম করে? হাত দুটো একত্তর ক'রে এই রকম শাঁখের মত কর···হয়নি···হ্যাঁ এইবার হ'য়েছে···অথচ ব'লবেন ওঁর মতন কেউ কিচ্ছু জানে না।···হ্যাঁ, কি যে ব'লছিলাম,—আমরা ভাবি চোখে, চুলে, রঙে ছেলেরা সুন্দর হয়, ওরা কিন্তু ভাবে দাঁত যদি না রইল তো কিছুই নয়। হ্যাঁ মেজকা', ঠিক, আমি ভেবে সারা বাবুল সব্বদা অমন ঠোঁট বুজে থাকে কেন, একটু ফিক্ ক'রে হাসলেও কখন তো, অমনি টপ্ ক'রে ঠোঁট বুজে ফেললে। কোন হদিস পাই না; তারপরে বুঝতে পারলাম—আহা বেচারির একটি মাত্তোর দাঁত ব'লে এত লজ্জা গো! আহা! তার ওপর দাদু যখন একদন্ত, হেরম্ব, লম্বোদর, গজানন' বলে ঠাট্টা করেন ওবেচারির যেন মনে হয় মা পৃথিবী, দ্বিধে হও, আর কত সইতে হবে? আহা!—না বিশ্বাস হয় এই দেখ···"

ছুটিয়া গিয়া বাবুলকে লইয়া আসে, আদর করিতে করিতে এবং আদরের অধিক আশ্বাস দিতে দিতে—"না যাদু, তোমায় কেউ ঠাট্টা ক'রতে পারবে না, চল তুমি··· আমার সোণার মত একটি দাঁত কা'র আছে গা? ··"

কাছে আসিয়া বলে—"দেখি কেমন দাঁত,—হাঁ করতো যাদু আমার···বড় লক্ষীছেলে গো···বাবুলের মত লক্ষীছেলে ···করতো হাঁ।···"

বাবুল অল্প এক রকম হাসির সহিত মুখটা গোঁজ করিয়া, ঠোঁট দুটি চাপিয়া ধরে,—কোন মতেই ঠোঁট খুলিবে না। একটা খেলা চলিতে থাকে,—রাণু গাল দুটি টিপিয়া ধরে, আঙুলের মধ্যে ঠোঁট দুটি জড় করিয়া ধরে, চুমা খায়, শেষে কৃত্রিম রোষে ধমক দেয় পর্য্যন্ত; অবশেষে বিজয়িনীর ভঙ্গিতে আমার দিকে চাহিয়া বলে—"দেখলে তো?—একটা গোটা রাজ্যি দিলেও হাঁ ক'রবে না। আর তাও বলি মেজকা, দোষই বা দোব কি করে?—কেউ কি নিজের খুঁৎ নিজে দেখাতে চায় মেজকা?—তুমিই বল?"

বাবুলকে বুকে চাপিয়া দোল দেয় খানিকটা, তাহার পর বলে—"ওদিকে তোমার মৈয়ার গুমর তিনটি দাঁত বলে, আর এদিকে বাবুল বাবুর লজ্জা একটি দাঁত নিয়ে; তা'হ'লে আর কি সন্দেহ রইল মেজকা' যে কচ্ছেলেরা নিশ্চয় ভাবে যে দাঁত নিয়েই তাদের যা' কিছু বাহার?"

হাতে আপাততঃ একটা দরকারী কাজ ছিল, অব্যাহতি পাইবার জন্য হাসিয়া বলিলাম—"না, আর মোটেই সন্দেহ রইল না।"

অভিমতটা যে রহস্য মাত্র রাণুর মত মেয়ে তাহা না বুঝিয়াই পারে না; মুখটা একটু ভার করিয়া কহিল—"বেশ, ক'রো না বিশ্বাস; নিজেই সব জানো যখন...'

বাবুলকে লইয়া চলিয়া গেল। জানি ও হারিবার পাত্রী নয়; এর পরে আরও গুরুতর প্রমাণ লইয়া হাজির হইবে, তখন ধীরে সুস্থে ওর থিওরিটা মানিয়া লইয়া সন্তুষ্ট করা যাইবে। কাজের তাগিদে সে সময়টা অন্যমনস্ক করিয়া দিতেছিল।

৩

দিন দশেক হইল কর্ম্মস্থানে আসিয়াছি। যতক্ষণ কাজের ভিড়ে থাকি একরকম কাটিয়া যায়। তাহার পর নিষ্কর্ম্মতার সুপ্রচুর অবসরের মধ্যে মনটা যেন হাঁফাইয়া ওঠে; দূরত্বের সমস্ত ব্যবধান ডিঙাইয়া বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হয়। সেখানে স্মৃতি-বিস্মৃতির আলো-ছায়ায়-ব্যাকুল অনুসন্ধান চলিতে থাকে···উঠানের মাঝখানে যেন কোথা থেকে অনেকক্ষণ পরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি; ডাকিলাম—"মৈয়া কোথায় গা?" ঘরের ছায়ার মধ্যে যেন খানিকটা আলো ফুটিয়া ওঠে—মৈয়াকে কোলে লইয়া,

মুখে মুখ চাপিয়া রাণু বাহির হইল—"ও ছবু, তোমার ছেলে ডেকে ডেকে খুন হ'ল আর তুমি কিনা দিব্যি…এ কেমনতর মা বাপু!…"

বিদ্যুৎ রেখার মত মেয়ে কোলে ঝাঁকিয়া পড়ে; ও আর থাকিবে না। কতক্ষণ পরে ছেলে আসিয়াছে…দৃশ্যটা মিলাইয়া যায়। স্মৃতিমঞ্চে বাবুলের আবির্ভাব। গম্ভীর, নতদৃষ্টি; নিজের পায়ের বুড়া আঙ্গুলটা ভক্ষণ করিতে হইলে মাথাটা নামাইয়া আনা দরকার কি পা'টা তুলিয়া ধরা সে-সমস্যা মিটাইয়া উঠিতে পারিতেছে না—উভয় রকম পরীক্ষাই চলিতেছে…মেয়ে আমার কোল হইতে ঝিয়ের কোলে যাইবে না, এক একবার ঘাড় বাঁকাইয়া দেখে আর প্রবল আপত্তিতে আমার গলা জড়াইয়া ধরে…হঠাৎ সব মিলাইয়া যায়—যতই বেশী চেষ্টা করি ততই সমস্তকে আড়াল করিয়া আমার বাসার সামনের তালগাছ দুইটার নির্ম্মম রুক্ষতা স্পষ্ট হইয়া ওঠে, কোন পথে যে মনটা বাড়ি গিয়া উঠিয়াছিল কোন মতেই ঠাহর করিয়া উঠিতে পারি না।

বাড়ি হইতে চিঠি আসিয়াছে, প্রয়োজনীয় খবর এক একটি করিয়া দেওয়া আছে; কিন্তু নব প্রবাসীর মন যে-সব অপ্রয়োজনীয় খবরের জন্য বেশী কাতর তাহার বিন্দু-বিসর্গও উল্লেখ নাই।

কয়েকদিন এইভাবেই কাটিল। মনটা নিজের নির্জ্জীবতায় ক্রমেই ভারী হইয়া—কর্ম্মের স্রোতে তলাইয়া যাইতে লাগিল।

এমন সময় একদিন ডাকপিওন আফিসের চিঠি আর তিনখানা আমার নিজের চিঠি দিয়া একটা আকণ্ঠ-ঠাসা সবুজ লেফাফা বাহির করিল। বলিল—"দেখুন তো বাবু, এটা কি আপনার চিঠি? একেবারে আণ্ডারপেড্; না আছে পুরো ঠিকানা, না আছে কিছু, শুধু বাঙ্গলা অক্ষর দেখে নিয়ে এলাম। ভাবলাম এখানে বাঙ্গালী তো এক আপনিই আছেন—দেখি জিগ্যেস ক'রে।"

প্রথমটা নিতে চাহিলাম না। ডাক বিভাগের দয়ায় এক আনার কন্সেসন্ টিকিট হওয়া পর্য্যন্ত রোজই গড়ে তিন চারটা করিয়া পয়সা দণ্ড দিতে হইতেছে। একটা খাম ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে অন্যমনস্ক ভাবেই বলিলাম—"না, ও ফেরৎ দিগে।"

পিওন একটু দূরে গেলে কেমন একটা কৌতূহল হইল। —ঠিকানা নাই কিছু নাই—এ আবার কেমন ধারা চিঠি। একবার দেখিতে হয় তো। ডাক দিয়া ফিরাইলাম।

ঠিকানাটা পড়িয়া হাসিয়া বলিলাম—"হ্যাঁ, আমার চিঠিই বটে।" পকেট হইতে আড়াই আনা পয়সা বাহির করিয়া দিয়া তাহাকে বিদায় করিলাম। রাণুর চিঠি। ঠিকানার মধ্যে সুধু ছোট বড় অক্ষরে—"মেজকাকা" আর নীচে রাণুর নিজের ধ্যাকরণের পদ্ধতিতে গ্রামের নামটা। সহরের পোষ্ট আফিসের কোন বাঙ্গালী কেরাণি সেটাকে লাল কালিতে ইংরাজিতে লিখিয়া দিয়াছে। গ্রাম আর পোষ্ট আফিস একই হওয়ায় চিঠিটা আসিয়া নির্ব্বিঘ্নে পঁহুছিয়াছে।

অন্য পত্র ছাড়িয়া আগ্রহের সহিত রাণুর পত্রই আগে খুলিয়া ফেলিলাম। হাতের লেখার খাতা থেকে ছেঁড়া; বড় বড় রুল টানা চারখানা পাতায় ঠাসা লেখা একখানি বৃহৎ লিপি। যথাযথ তুলিয়া দিলে সকলের বোধগম্য হইবে না বলিয়া বানান প্রভৃতি একটু আধটু পরিবর্ত্তিত করিয়া দিলাম।—

মেজকা, তোমার আর সব ভাল, কিন্তু টপ্ করে আমার কথা বিশ্বাস করতে চাওনা ঐ এক কেমন রোগ। কচি ছেলেরা যদি দাঁত সব্বার চেয়ে ভাল না ভাববে তো ছবুরাণী অমন ক'রে কথায় কথায় হাসতে যাবে কেন আর বাবুলই বা মুখটি বুজে থাকবে কেন? বেশ, আমার কথাটা না হয় মিথ্যে, কিন্তু সেদিনে যে কাণ্ডটা হোল তা কিসের জন্যে বলতো? দাদু বাইরে যাননি, সমস্তদিন বেচারিকে খেপিয়েচেন একদন্ত গজানন, একদন্ত গজানন বলে। সমস্তদিন মুখটি চুণ, কিচ্ছু খাবে না—শুধু বায়না আর বায়না। সন্ধের পরে কাকীমা ব'ল্লেন বড্ড গরমে ছেলেগুলো সেদ্ধ হচ্চে, রাণু চল ছাতে নিয়ে যাই। কাকীমা, আমি, ছবি, ছোটকাকা আর বাবুল। জোছনা ফুট ফুট করচে আর তেমনি হাওয়া। আমি বললুম মিথ্যে বলনি কাকীমা। তোমার মেয়ে তক্ষুণি ঘুমিয়ে পড়ল। উনি একটু আবার আয়েসী কিনা।

মাদুরে শুইয়ে দিলাম। কি যে সুন্দর দেখাচ্ছিল তা যদি দেখতে মেজকা! মুখটি একটু ফাঁক হয়ে গেচে। চাঁদের চেয়েও সাদা তিনটি দাঁত বলে চাঁদ ফেলে আমায় দেখ্। ছোটকাকা বললে চল বৌদি আলসের ওপর বসি খুব হাওয়া লাগবে, অত চেপে-মরা পর্দ্দা মানি না। বাবুলকে ছবুরাণুর কাছে ঝুনঝুনিটা দিয়ে বসিয়ে ওদিকে আলসের ওপর উঠে বসলাম। বসবে কি লোকে ছাই, তার কি জো আচে?—ছেলে হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল। ছুটে গিয়ে সবাই দেখি চোরের তিনটি আঙুল জাঁতিকলে আটকে রয়েচে। দাঁত যে উপড়ে ফেলা যায় না সে আর ও ছেলেমানুষ কি করে জানবে বলো? ভাবলে দাঁতের গেরস্ত ঘুমুচ্চে এই ফাঁকতালে একটা চুরি করে নি। আমারও তাহলে ছুটি হবে দিব্যিটি। শয়তানিটা বোঝ একবার! এদিকে গেরস্ত ছবিরাণী যে কি হুঁসিয়ার মেয়ে তাতো আর জানেন না বাবু। না বিশ্বাস হয়—দাদুকে জিগ্যেস করে পাঠিও। তিনিই তো বললেন এ ডাহা চুরির চেষ্টা।

আহা মেজকাকা লজ্জানিবারণ হরি সত্যিই সব দেখতে পান। বললেন—হ্যাঁ তোর দাঁতের জন্যে এত হেনস্তা? রোস্। তার পরদিন বাবুলের জ্বর, পেটের অসুক, ছেলে যেন নেতিয়ে পড়ল। বললে পেত্যয় যাবে না তার পরের পরের দিন নীচে একটি দাঁত! আমিই প্রথমে দেখে সবাইকে বললাম। বাবুল আর সে বাবুল নেই মেজকাকা। কথায় কথায় হাসি, কথায় কথায় হাসি আর কি দুরন্ত! ছবুরাণীর মত আর একটি দাঁত হোলে ও ছেলে যে কি করবে ভেবে পাই না।

পাঁচটি কচি দাঁতের হাসিতে বাড়ি একেবারে আলো করে রেখেচে মেজকাকা। কি যে চমৎকার না দেখলে পেত্যয় যাবে না। তুমি শিগ্গির একবার ছুটি নিয়ে এসো। সায়েবকে সব কথা খুলে বললেই ছুটি দিয়ে দেবে। তাদেরও কচি ছেলে আচে তো? আর তাদেরও তো এই রকম একটি দুটি করে দাঁত ওঠে?

আজ উনিস দিন ধরিয়া এই চিঠিরই প্রতীক্ষা করিয়াছি। এর অযথা কাকলী আমায় এক মুহূর্ত্তেই আবার বাড়িতে, আমার নিজের জায়গাটিতে লইয়া গিয়া দাঁড় করাইল,—সেখানে গম্ভীর সাংসারিকতার বাহিরে মৈয়া, বাবুল, রাণু, আরও ওদের দলের যত সব অকেজোরা দিবারাত্র তাহাদের অর্থহীন খেয়াল খুসীর স্রোত বহাইয়া চলিয়াছে।

মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। ডাক রহিল পড়িয়া। সেগুলা সহকারীর ওখানে পাঠাইয়া দিতে হইবে। আপাতত সাহেবের নিকট দু'টা দিনের ছুটি লইতে হয়।·· শেফালি-স্তবকের মত, রাঙায়-সাদায় আলো করা দু'টি কচী মুখের হাসি আমায় প্রবল আকর্ষণে টানিতেছে।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বাসন্তিকা

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

দিকে দিকে বসন্তের পূর্ণ আয়োজন,
একদিকে অর্দ্ধস্ফুট একটি যৌবন।
এসেছে অতনু বটে ধনুঃশর হাতে।
আজো মম দূরাগত স্মৃতির ছায়াতে
যে বাঁকা নয়নখানি আভাসে ঝলকে,
সহিতে সম্মোহ তার পারিবে বলো কে!

ভ্রূ-বিভ্রম-ভঙ্গী তব যেবা খরধার
কৃপা হয় ও মন্মথে,—না মরে আবার!
ফাল্গুনের ফাগ মেখে রাঙিল কিংশুক,
তব গণ্ড-আভা আরো বাড়াল হিংসুক—
পলাশের লাস্য দেখো আরক্ত অধরে!
মানিনী, প্রচ্ছন্নগর্ব্ব ঔদাস্যের ভরে

কেবলি প্রত্যক্ষ হতে রাখো ব্যবধান!
কারো পানে নাহি চাও, নাহি দাও কান,
কিছুতে বলোনা কিছু! রক্ত ওষ্ঠ দুটি
বর্ণরাগ ঠিকরে না ঝলকিয়া উঠি'
কোনো পরিহাসে,—তাহা না ঠিকরে,—ভালো,
কেন সব হাসি মুখ মিছে হবে কালো!
তাল তমাল শাল পিয়ালের ডালে
শ্যামলা দোলায় বাহু হোলি-নৃত্য তালে;
কেবল যে কোলে প'ড়ে ও করপল্লব
তাতেই জিনিয়া আছ ছন্দের গৌরব।
পুঞ্জ পুঞ্জ মঞ্জরীর অজস্র বিকাশে
রসালের বক্ষস্ফীত সৃজন উচ্ছ্বাসে!
তোমার অজ্ঞাতে তব বয়স বিরলে
যে ভাব মুকুলি' চলে স্খলিত অঞ্চলে,—
তুমি তার কী বুঝিবে—বাহ্যউদাসীনা,
তার আবেদন সাধে সুন্দরের বীণা।
কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পিক, ভৃঙ্গ গুঞ্জে ফুলে,—
সব ছাপি' আছে লেগে শ্রবণের মূলে
সেই এক সুধাকণ্ঠনিঃস্যন্দিত বাণী,
ভালো নাহি মনে পড়ে কোথা কবে জানি
কে ছিল আলাপে মগ্ন কোন্ বন্ধু সনে
যেতে পথে অন্য মনে শুনিনু কেমনে
বাক্যের বিচ্ছিন্ন অংশ, স্বরের মূর্চ্ছনা;
পিছে তার কেবা রবে, সেটুকু বোঝোনা!
পাখী এরা প্রকৃতির সভার গায়ক,
কোথা পাবে আমাদের [illegible]বিহারক
সুখদুঃখ আবেদনে মানুষের সুর।
বাহিরের দূর তব তাই সুমধুর
অন্তরের স্পর্শরসে—অন্তরে অন্তরে।
পাখীরাও কাছে বটে, তবু শাখা পরে।
বন ঢালে মুঠি মুঠি পুষ্পের পরাগ,
রঙের পিচ্‌কারী মারি, উদায়স্তরাগ
শূন্যেরো ভাসাল বক্ষ। দক্ষিণ সমীর
গন্ধের নির্ঝর খুলি' বহে ঝির্‌ঝির্।
আজ কোনো অনুষ্ঠানে থাকিবে না ত্রুটি
সবে তাই ব্যস্ত,—শুধু তোমারি কি ছুটি?
ক্লান্ত ভালে জ'মে ওঠে বিন্দুবিন্দু ঘাম;
যায় বেলা, অবহেলে লভিছ বিশ্রাম।
তবু কেহ বোঝে না যে বসন্তের রাণী
তোমাতেই সুপ্ত আজ। এ প্রতিমাখানি
শুধু যোগ্য-পূজারীর স্পর্শের অভাবে
রহিল মৃণ্ময়ী আজো, জাগেনি স্বভাবে।
রূপকথা শুনিয়াছি, তারো রাজপুরী
এমনি শোভায় পূর্ণ; অনিন্দ্যমাধুরী
রাজকন্যা ঘুমে তাহে থাকে একেলাটি,
কোথা তার রাজপুত্র কোথা রূপকাঠি!
তোমারে দেখেছি; তাই করি তা বিশ্বাস;
আজ ওই বক্ষ হতে একটি নিশ্বাস
কোন দৈবক্ষণে পড়ে তারি প্রতীক্ষাতে
ভরা ডালি শুষ্ক ওই পৃথিবীর হাতে॥

অভিজ্ঞান

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১৫

শেষরাত্রি থেকেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হ'য়ে ছিল, কিছুক্ষণ থেকে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ হয়েছে। আশ্বিন মাসের প্রথম, সুতরাং আসল বর্ষাকাল অনেকদিন হ'ল শেষ হয়ে গিয়েছে,—এ অসময়ের বাদল, আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে দুচার দিনের জন্য প্রায় প্রতিবৎসরই এক-আধবার দেখা দিয়ে থাকে।

ট্যাক্সি থেকে নেমে প'ড়ে প্রকাশ বল্‌লে, "এস সন্ধ্যা, নেমে এস।"

একটু ইতস্ততঃ করে সন্ধ্যা বল্‌লে, "প্রথমে একবার খবর দিলে ভাল হয় না?"

মাথা নেড়ে প্রকাশ বল্‌লে, "আরে না না,—এ তোমার নিজের বাড়ি,—এখানে আবার খবর দেবে কিসের জন্যে। এস, নেমে এস।"

প্রকাশের কথায় আর দ্বিরুক্তি না ক'রে সন্ধ্যা ট্যাক্সি হতে অবতরণ করল। গৃহদ্বারে একটি দশ বারো বৎসরের বালক দাঁড়িয়ে ছিল, সে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সন্ধ্যাকে একবার ভাল ক'রে দেখেই 'ওমা মেজ দিদি, এসেছে!' ব'লে উচ্চস্বরে চিৎকার ক'রে দ্রুতপদে গৃহমধ্যে প্রবেশ করল।

সন্ধ্যার জননী সুবর্ণলতা নীচের তলায় নিকটেই গৃহকর্ম্মে রত ছিলেন, পুত্র পরেশের কথা শুনে যুগপৎ আনন্দে এবং উদ্বেগে চকিত হয়ে উঠলেন। 'কই সে, কই?' ব'লে ফিরে তাকাতেই প্রশ্নের উত্তরের প্রয়োজন হ'ল না,—দেখলেন পর্দ্দা সরিয়ে সন্ধ্যা প্রবেশ করছে, মুখ আরক্ত দুই চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন। সুবর্ণলতার সহিত দৃষ্টি বিনিময় হওয়া মাত্র কিন্তু নিমেষের মধ্যে মুখের সমস্ত রক্তিমা অন্তর্হিত হ'য়ে মুখ পাংশু বর্ণ ধারণ করলে, চক্ষুর দৃষ্টি স্তিমিত হয়ে এলো, একবার অস্ফুট স্বরে মাগো ব'লে সন্ধ্যা পাশের বারান্দার সিঁড়ির উপর ধপ ক'রে ব'সে পড়ল।

ক্ষিপ্র বেগে সন্ধ্যার কাছে উপস্থিত হয়ে তার পাশে ব'সে প'ড়ে সুবর্ণলতা ব্যাকুলভাবে দুই হস্তে সন্ধ্যার তন্দ্রাচ্ছন্ন দেহ কোলের উপর তুলে নিলেন। তারপর উপর দিকে তাকিয়ে কন্যা সাধনার উদ্দেশ্যে উচ্চস্বরে বললেন, "সাধু, শিগ্‌গির একবার নীচে নেমে আয়।"

মাতার আহ্বান কানে যেতেই সাধনা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এসে সন্ধ্যাকে দেখতে পেয়ে দ্রুতপদে নীচে নেমে এল। সুবর্ণ তখন সন্ধ্যাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে নিঃশব্দে রোদন করছিলেন; বললেন, "সাধু, শিগ্‌গির একটু জল আর একখানা হাত-পাখা নিয়ে আয়!"

কিন্তু ততক্ষণে সন্ধ্যা তার অসংবৃত অবস্থা থেকে অনেকটা মুক্তিলাভ করেছিল; বল্‌লে, "দরকার নেই মা, আমি উঠছি।"

তারপরে সহসা দুই বাহু দিয়ে সুবর্ণলতার কণ্ঠ জড়িয়ে ধ'রে উচ্ছ্বসিত হয়ে রোদন করতে লাগল। চাপা কান্নার উগ্র তাড়নায় তার সমস্ত দেহ আলোড়িত হয়ে উঠল।

দুষ্পরাজেয় অভিমানের দ্বারা মনকে কঠিন ক'রে সন্ধ্যা জামসেদপুর থেকে কলিকাতা পর্য্যন্ত সমস্ত পথটা প্রস্তুত হয়ে এসেছিল। মনে মনে এই সঙ্কল্প সে বারবার স্পষ্ট করে নির্ণীত করে নিয়েছিল যে, যে-প্রতিশ্রুতি সে সবিতার কাছে জামশেদপুরে দিয়ে এসেছে সংযত মনের সমস্ত শক্তির সাহায্যে তা পালন করবে; কিন্তু তাই বলে নিজের মধ্যে নিজে কখনই ভেঙ্গে পড়বেনা, সকল সময়ে সর্ব্বাবস্থায় চিত্তকে সে নিজের বশীভূত রাখবে। এমন কি মিনিট দুই পূর্ব্বে ট্যাক্সিতে ব'সে সে যখন প্রকাশের কাছে সংবাদ দিয়ে গৃহে প্রবেশ করবার প্রস্তাব করেছিল তখনও তার মনের সেই

অবস্থাই ছিল। কিন্তু পিতৃগৃহে পদার্পণ করবা মাত্র এক নিমেষে কি রকম ক'রে সমস্তই ওলট-পালট হয়ে গেল। যে অভিমানকে শিখিয়ে পড়িয়ে প্রহরীরূপে সে আত্মরক্ষার্থে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল, মাতৃমূর্ত্তির জাদুর সম্মুখে সেই এমন বিশ্বাসঘাতক হয়ে দাঁড়াল যে, জননীর কণ্ঠলগ্ন হয়ে গভীর অভিমানের স্বরে সন্ধ্যা বললে, "কি করে মা, তোমরা এমন ক'রে আমাকে ভুলে ছিলে? কি করে এতদিন আমাকে জামসেদপুরে ফেলে রেখেছিলে?"

অভাগিনী কন্যার এই সকরুণ অনুযোগে সুবর্ণলতার অন্তর বিদীর্ণ হয়ে গেল। গভীর আবেগের সহিত প্রবলতর বন্ধনে তাকে জড়িয়ে ধ'রে বললেন, "ওরে সন্ধ্যা, এ কথা তুই আমাকে- তোর নির্ব্বোধ মাকে—জিজ্ঞেস করিসনে। ইচ্ছে হয় তোর বাপকে জিজ্ঞেস করিস, তিনি জ্ঞানী মানুষ, অনেক বুদ্ধি বিবেচনা আছে, তিনি হয়ত তোকে এ কথার উত্তর দিতে পারবেন।"

জননীর এই বাক্যের মধ্যে বেদনার যে মর্ম্মন্তুদ পরিচয় প্রচ্ছন্ন ছিল সে কথা সন্ধ্যার কাছে ধরা পড়ল কি-না বলা কঠিন। মনে মনে একটু কি চিন্তা করে সে বললে, "মা, বাবা কোথায়? বাবা কি বাড়ি নেই?"

সুবর্ণ বললেন, "তিনি ঘরে শুয়ে আছেন। আজ তিন দিন শয্যাগত। কাঁধের কাছে একটা বড় ফোড়া অস্ত্র হয়েচে, ব'সে থাকতে পর্য্যন্ত পারেন না।"

পিতার অসুখের কথা শুনে সন্ধ্যা উদ্বিগ্ন হ'ল; বললে, "এত অসুখ? চল মা, বাবাকে দেখি গে।" ব'লে উঠে দাঁড়াল। তারপর হঠাৎ একটা কথা মনে ভেবে বললে, "মা, আমাকে দেখে বাবা অসন্তুষ্ট হবেন না ত?"

সন্ধ্যার কথা শুনে সুবর্ণলতার মুখ বেদনায় বিবর্ণ হয়ে উঠল; দুঃখার্ত্ত কণ্ঠে বললেন, "হ্যাঁ রে সন্ধ্যা, আমরা কি তোর এতই পর হয়ে গেছি ব'লে মনে করিস?"

সন্ধ্যার দুই চক্ষু আবার সজল হয়ে এল; বললে, "আমার মনের মধ্যে কত দুঃখ কত ভয় তা ত তোমরা জান না মা! তা যদি জানতে তা হ'লে আমার কথা শুনে তুমি কখনই রাগ করতে না।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে সুবর্ণলতা বললেন, "রাগ কেন করব সন্ধ্যা, তোর ওপর। রাগ করি আমার অদৃষ্টের ওপর, আর পোড়া সমাজের ওপর।"

চলতে চলতে সাধনা এবং পরেশের সঙ্গে এক-আধটা কথা কইতে কইতে দ্বিতলে এসে সন্ধ্যা তার পিতা বেণীমাধবের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করলে। সন্ধ্যার আগমন সংবাদ বেণীমাধব পরেশের মুখে পূর্ব্বেই অবগত হয়েছিলেন। সন্ধ্যাকে দেখে তিনি শয্যার উপর উঠে বসবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না।

"তুমি উঠোনা বাবা শুয়ে থাক।" ব'লে সন্ধ্যা ত্বরিতপদে বেণীমাধবের শয্যা-প্রান্তে উপস্থিত হলো, তারপর সহসা হাঁটু গেড়ে মেঝের উপর ব'সে প'ড়ে মুখখানা বেণীমাধবের পায়ের উপর গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

বেণীমাধব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন; দুই বাহু প্রসারিত ক'রে অধীর কণ্ঠে বললেন, "সন্ধ্যা, আয় মা, আয় মা, আমার কাছে আয়! শান্ত হ', কাঁদিস নে!" তারপর অর্দ্ধোত্থিত হয়ে কোনরূপে সন্ধ্যার বাম বাহু ধারণ ক'রে তাকে নিকটে টেনে নিলেন। মাথাটা বুকের কাছে জড়িয়ে ধ'রে সহসা হু হু ক'রে কেঁদে উঠলেন।

চোখে চোখে জল, মুখে মুখে বাষ্পাবরুদ্ধ অসম্বদ্ধ দু-চারটে বাক্য। এমনি ভাবে পাঁচ সাত মিনিটে অশ্রু বর্ষণের পালা শেষ হল। তখন হঠাৎ মনে পড়ল একটা কথা যা পূর্ব্বেই মনে হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এরূপ গুরুতর অবস্থার আকস্মিকত্বে প্রথমটা প্রায়ই ভুল হয়ে যায়। মনে পড়ল বেণীমাধবেরই; ব্যস্ত হয়ে বললেন, "তুমি কার সঙ্গে এলে সন্ধ্যা? প্রকাশেরই সঙ্গে বোধহয়?"

সন্ধ্যা বললে, "হ্যাঁ মুখুজ্জে মশায়ই আমাকে নিয়ে এসেছেন।"

সুবর্ণলতা অপ্রতিভ হয়ে বললেন "ওমা! ওঁর কথা আমরা একেবারে ভুলে আছি! কাউকে দেখতে না পেয়ে চ'লে গেলেন না ত?"

সন্ধ্যা ঘাড় নেড়ে বলল, "না, তা যাবেন না। বোধহয় জিনিষপত্র নিয়ে ট্যাক্সিতেই ব'সে আছেন।" মনে মনে এ কথা সে ভাল করেই জানে যে, অভাগিনী সন্ধ্যার গতি কি হল তা সঠিক না জেনে চ'লে যাবার পাত্র প্রকাশ নয়।

সাধনার প্রতি দৃষ্টিপাত করে বেণীমাধব বললেন, "সাধু, তুমি গিয়ে প্রকাশকে এখানে ডেকে নিয়ে এস।"

সাধনার সঙ্গে প্রকাশ যখন কক্ষে প্রবেশ করল তখন সকলের চোখে চোখে অশ্রু শুকিয়ে গেছে, কিন্তু কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সে বিষয়ে যে একটা অভিনয় হয়ে গিয়েছে তার পরিচয় চক্ষুপল্লবাদি থেকে তখনো সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয় নি। বেণীমাধব এবং সুবর্ণলতাকে প্রণাম ক'রে প্রকাশ একটা চেয়ারে উপবেশন করল। প্রথমে বেণীমাধবের অসুস্থতার এবং পরে সবিতার কুশলাদির বিষয়ে দু-চারটা মামুলি কথা হবার পর আসল কথা উঠল।

বেণীমাধব বললেন, "সন্ধ্যার আমরা বাপ-মা, কিন্তু তুমি যে আমাদের চেয়েও তার আত্মীয়, তার প্রমাণ দিয়েছে তুমি প্রকাশ!"

শুনে প্রকাশ মৃদু মৃদু হাসতে লাগল; বললে, "প্রমাণটা কিন্তু খুব পাকা নয় মেসোমশাই। সের দুই তিন চাল, সের খানেক ডাল, আর কিছু মাছ তরকারী। এর বেশি এমন কিছু নয়,—তুমি কি বল সন্ধ্যা?" ব'লে প্রকাশ সকৌতুকে সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে।

উত্তরে সন্ধ্যা শুধু একটু হাসলে,—কিছু বললে না।

বেণীমাধব বললেন, "কথাটা তুমি এড়িয়ে যেতে চাও বাবাজি। তুমি যে তাকে কয়েকদিন আহার দিয়েছ সে কথা আমি মোটেই বলতে চাচ্ছিনে। অমন বিপদের দিনে তুমি যে তাকে আশ্রয় দিয়েছ, আমি সেই কথাই বলছি।"

প্রকাশ বললে, "কিন্তু আশ্রয় না দিয়েই বা কি করি বলুন? বলা নেই কওয়া নেই রাত দুটোর সময়ে এসে দোর ঠেলাঠেলি ক'রে ঘুম ভাঙ্গালে। সঙ্গে একটি মুসলমান ছেলে ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। সেও একটি কথা কইবার অবসর দিলে না, সন্ধ্যাকে দিয়ে আমাদের সনাক্ত করিয়ে নিয়ে অমনি মুহূর্ত্তের মধ্যে মোটর ক'রে ছুটে পালাল। এখন সে রকম অবস্থায় বাড়ীর বার ক'রে দিয়ে গেট বন্ধ না ক'রে বেশি কিছু বাহাদুরী করেছি কি? তা যদি করতাম তাহ'লে ত আমাকে পাষণ্ড বলতে পারতেন!"

বেণীমাধব বললেন, "কিন্তু তাহ'লে ত' আমাকে তুমি পাষণ্ড বলতে পার প্রকাশ! আমি ত' তাকে জামসেদপুর থেকে নিয়ে এসে নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দিইনি!"

প্রকাশ বললে, "ও কথা কেন বলছেন মেসোমশায়?—আপনার আশ্রয় না দেওয়া সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার;—তার যুক্তি আছে, সদুদ্দেশ্য আছে। গুণ্ডার ছুরি আর ডাক্তারের ছুরি দুই-ই এক বস্তু, দুই-ই মানুষের দেহে রক্তপাত করে, কিন্তু উভয়ের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ পৃথক। গুণ্ডার ছুরি মানুষের জীবন নেবার চেষ্টা করে, আর ডাক্তারের ছুরি মানুষের জীবন দেবার চেষ্টা করে।"

ক্ষণকাল নীরবে থেকে বেণীমাধব বললেন, "সে কথা ঠিক, কিন্তু আমার এ বাড়ীতে একটি লোক আছেন যিনি আমার ছুরিকে গুণ্ডার ছুরি ব'লেই মনে করেন। তাঁর ধারণা বাপ-শ্রেণীর জীবেরা প্রধানতঃ পাষণ্ড প্রকৃতির, সঙ্গে সঙ্গে মা-শ্রেণীর জীবেরা যদি না থাকতেন তাহ'লে ছেলে-মেয়েদের জীবনধারণ সঙ্কটাপন্ন হ'ত।"

বেণীমাধবের কথা শুনে প্রকাশ স্মিতমুখে বললে, "এ কথার মধ্যে সত্যি মিথ্যে দুই-ই আছে মেসোমশায়। আসলে এ হ'ল স্নেহ আর বিবেকের চিরকেলে ঝগড়া। আমার মনে হয় ছেলে-মেয়েদের মঙ্গলের জন্য এ দুয়েরই প্রয়োজন আছে। এই দুটি বিভিন্নমুখী শক্তির টানে তাদের জীবন একটি শুভ মধ্য-পথ অবলম্বন ক'রে চলে। মায়ের স্নেহাধিক্যকে সামলাবার জন্যে বাপের দৃঢ়তার দরকার আছে বইকি।"

প্রকাশের কথায় বেণীমাধবের মুখে হাসি দেখা দিল; বললেন, "তাহ'লে বাপ-শ্রেণীর জীবেরা সত্যিসত্যিই পাষণ্ড নয়!"

এ কথার উত্তর দিলেন সুবর্ণলতা; বললেন, "কে তোমাকে কবে পাষণ্ড বলেছে যে, তুমি ও-কথা বলছ! আমি কোনোদিন বলেছি কি?"

বেণীমাধব স্বীকার করলেন যে, উক্ত বাক্যটি সত্য সত্যই কোনোদিন তাঁর প্রতি প্রয়োগ করা হয়নি, কিন্তু একথাও বললেন যে, সন্ধ্যা সম্পর্কে তাঁর আচরণাদির বিষয়ে এমন সব মন্তব্য প্রকাশ করা হয়েচে যাতে উক্ত বাক্যটি প্রয়োগ করলে এমন কিছু অপপ্রয়োগ হোত না। কিন্তু তা'তে কিছু যায় আসে না, কারণ সন্ধ্যার প্রকৃত মঙ্গলের জন্য কোন কার্য্য

করার ফলে পাষণ্ড আখ্যাটি যদি সত্যসত্যই তাঁকে গ্রহণ করতে হয় ত' কোন দুঃখ নেই, কারণ তাঁর যশ-অপযশের কথা মুখ্য বস্তু নয়, মুখ্য বস্তু সন্ধ্যার হিতাহিতের কথা। এবং এক মাত্র সেই মুখ্য বস্তুরই প্রতি দৃষ্টি স্থাপিত ক'রে অবিলম্বে যে কার্য্য করবার আভাষ দিলেন তা'তে শুধু সুবর্ণলতাই নয়, প্রকাশ পর্য্যন্ত চিন্তিত হ'য়ে উঠ্‌লেন।

বিবর্ণমুখে সুবর্ণলতা বল্‌লেন, "তুমি এখনি সন্ধ্যাকে বিদেয় করতে চাও না কি?"

"বিদেয় করতে চাই বল্‌লে ভুল বলা হবে, রাখ্‌তে চাইনে।"

"তার মানে?"

বেণীমাধব একটা তাকিয়ার সাহায্যে অতি কষ্টে কোনো-রকমে উঠে ব'সে বল্‌লেন, "তার মানে তুমি অনেকবারই আমার কাছে শুনেছ, কিন্তু সন্ধ্যা আর প্রকাশের সাম্‌নে আর একবার ভাল ক'রে শুন্‌লে মন্দ হয় না।" সাধনার দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন, "সাধনা, তুমি আর পরেশ এখন এখান থেকে একটু যাও।" তারা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে বল্‌লেন, "সন্ধ্যা, তুমি মা আমার কথাগুলো খুব মন দিয়ে শুনো, আর সঙ্গে সঙ্গে তোমার মুখুজ্জেমশায়ের ডাক্তারের ছুরির চমৎকার উপমাটি মনে রেখো, সুবিধে হবে।" তারপর প্রকাশকে সম্বোধন ক'রে বল্‌লেন, "তোমার কাছে সন্ধ্যা উপস্থিত হওয়ার পর এই সতের-আঠার দিনের মধ্যে অন্ততঃ বার দশেক আমি জহরলালের কাছে গিয়েছি, কিন্তু কিছুতে তাকে রাজি করতে পারিনি। ভারি চাপা লোক, কোনো কথাই স্পষ্ট ক'রে খুলে বলে না। মুখে প্রতিবারই একটি বাঁধা গৎ—'আপনি নিয়ে এসে কিছুদিন রাখুন—আমি একটু ভেবে দেখি।' আমি কিন্তু হলফ ক'রে তোমাকে বল্‌তে পারি প্রকাশ, যেদিন জহরলাল শুনবে আমি সন্ধ্যাকে নিয়ে এসেছি সেইদিনই তার সব ভাবনার শেষ হবে,—আর কোনোদিনই আমার সঙ্গে সে দেখা পর্য্যন্ত করবে না। এখন এ রকম অবস্থায় তুমি আমাকে কি করতে বল?—সন্ধ্যাকে এ বাড়ীতে রেখে তোমার মাসিমাকে খুসি করতে বল?—না, সন্ধ্যাকে তোমার সঙ্গে জহরলালের গাড়িতে এখনি পাঠিয়ে তার একটা তার গতি করতে বল? তুমি বিদ্বান বুদ্ধিমান,—তুমি যা পরামর্শ দেবে তাই আমি করব,—এখন পরামর্শ দাও,—বল, কি করা উচিত।"

গভীর ভাবে ক্ষণকাল চিন্তা ক'রে প্রকাশ বল্‌লে, "মাসিমা, আপনি কি বলেন? আপনার কি মত?"

ব্যথিত কণ্ঠে সুবর্ণলতা বল্‌লেন, "আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করো না বাবা, আমার না আছে বিদ্যে, না আছে বুদ্ধি,—থাকবার মধ্যে আছে একটা পোড়া অবুঝ মন, যা নিয়ে জ্ব'লে পুড়ে মরছি। তোমরা যা ভাল বোঝ তা কর।"

সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে প্রকাশ বল্‌লে, "তোমার কিছু বল্‌বার আছে সন্ধ্যা?"

নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে সন্ধ্যা জানালে বলবার তার কিছুই নেই।

প্রকাশ বল্‌লে, "তাহ'লে সন্ধ্যাকে জহরমামার বাড়িই নিয়ে যাই।"

তাকিয়াতে ভর দিয়ে উঁচু হ'য়ে উঠে বেণীমাধব বল্‌লেন, "এখনি। জহরলাল তোমার ত আত্মীয়—যে রকম ক'রে পার মেয়েটাকে গছিয়ে দিয়ো প্রকাশ,—তোমার পুণ্য হবে। এখানে এসেছিলে সে কথা যেন জান্‌তে না পারে, যদি জিজ্ঞাসা করে অসময়ে কেন, বোলো ট্রেণ লেট্ ছিল।"

হাতঘড়িতে সময় দেখে প্রকাশ বল্‌লে, "আর আধ ঘণ্টাটাক পরে গেলে অসময় হবে না মেসোমশায়। ও লাইনের গাড়ির সময় মামার খুব জানা আছে, মনে করবেন বম্বে মেলে আমরা এলাম। কিন্তু কথা হচ্চে, আমি ত' যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করব না, তা সত্ত্বেও যদি ওঁরা সন্ধ্যাকে রাখ্‌তে রাজি না হন তাহ'লে আপনাদের কাছেই তাকে রেখে যাব ত?"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে ক্ষণকাল চিন্তা ক'রে বেণীমাধব বল্‌লেন, "আমার যে কত দিকে কত বিপদ তা আর কি বল্‌ব বাবা! সন্ধ্যার বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে সাধনার একটি ভাল পাত্র পাওয়া গেছে—ছেলেটি ইম্পীরিয়াল্ সারভিসে চাকরি করছে—বাপের এক পয়সার কামড় নেই। আমার মত দরিদ্র লোকে এ সুযোগ ছাড়ে কি ক'রে বল? তাই মনে করছি অগ্রাণ মাসে দায় থেকে উদ্ধার হয়ে যাই। ততদিন সন্ধ্যা যদি তোমার কাছে থাকে তাহ'লে বড় ভাল হয়। তারপর সাধনার

বিয়ে হ'য়ে গেলে আমি আর কাউকে গ্রাহ্য করিনে। খুকির বিয়ে? সে ভাবনা আমার নেই,—ততদিনে আমি ডঙ্কা বাজিয়ে চ'লে যাব।"

প্রকাশ কঠোর নেত্রে ক্ষণকাল বেণীমাধবের দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, "দরকার হ'লে সন্ধ্যা চিরদিনই আমার কাছে থাকবে, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন,—কিন্তু এ বিষয়ে পাত্র পক্ষ কি কোনো রকম সর্ত্ত করেছে?"

"একরকম করেইছে?"

"আর, সেই সর্ত্তে আপনাকে রাজি হ'তে হয়েচে?"

প্রকাশের কথার ভঙ্গি দেখে বেণীমাধবের মুখ শুকিয়ে উঠ্‌ল; বললেন, "রাজি না হ'য়ে কি করি বল? সমাজের যে কি জুলুম তা'ত তোমরা ঠিক জান না বাবা" বলে হিন্দু সমাজের একটা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যাপারে উদ্যত হলেন।

প্রকাশ সহসা আসন ত্যাগ ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "এ-সব আলোচনা এখন থাক মেসোমশায়—এ ভারি painful। আমি রাস্তায় বেরিয়ে একটা ট্যাক্সির চেষ্টা দেখি—সে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়েছি।" ব'লে প্রস্থান করলেন।

"ওমা, একটু চা-জলখাবার না খেয়ে কেমন ক'রে যাবে!" ব'লে সুবর্ণলতা ব্যস্ত হয়ে প্রকাশের পিছনে পিছনে বেরিয়ে গেলেন।

সন্ধ্যা মেঝে থেকে বেণীমাধবের পদপ্রান্তে উঠে বস্‌ল। পায়ে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে, "তোমার এত অসুখ বাবা, ভাল ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাচ্ছ ত?"

বেণীমাধব বললেন, "সে ভয় নেই মা, এখনো অনেক দুঃখ ভোগ করবার বাকি আছে। ভাল ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা না করালেও কোনো ক্ষতি হবে না।" তারপর একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বললেন, "সন্ধ্যা, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না মা!"

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে সন্ধ্যা বললে, "তুমিও মাকে ভুল বুঝোনা বাবা। মা সবই বোঝেন, কিন্তু হাজার হোক মেয়েমানুষ ত?"

ট্যাক্সি এনে জিনিস উঠিয়ে প্রকাশ ভিতরে এসে বললে, "আর দেরি ক'রে কাজ নেই, সন্ধ্যাকে ডেকে দিন মাসিমা।"

সুবর্ণলতা বললেন, "মুখ ধুয়ে একটু চা খেয়ে নাও প্রকাশ!"

প্রকাশ সজোরে মাথা নেড়ে বললে, "ওরে বাস্‌রে! আমার এখন অনেক হাঙ্গাম বাকি। আমি ত' এখনি হোটেলে গিয়ে উঠ্‌ব,—আপনি বরং সন্ধ্যাকে কিছু খাইয়ে দিন।"

সন্ধ্যা কিন্তু কিছুতেই রাজি হ'ল না; বললে, "এবার যেদিন আসব সেদিন তুমি নিজের হাতে আমাকে খাইয়ে দিয়ো মা, আজ কিন্তু এখন একটু জল পর্য্যন্ত আমার গলা দিয়ে তলাবে না।"

মলিনমুখে সুবর্ণ বললেন, "তুই আমাদের ওপর রাগ ক'রে যাচ্ছিস সন্ধ্যা!"

সন্ধ্যার মুখে একটা ক্ষীণহাসি দেখা দিলে; বললে, "তোমাদের ওপর বলছ কেন মা? আমারও ত' একটা অদৃষ্ট আছে—তার ওপরও ত' রাগ করতে পারি।" ব'লে সোজা গিয়ে ট্যাক্সিতে প্রকাশের পাশে বস্‌ল।

জহরলালের বাড়ি পৌঁছানো পর্য্যন্ত পথে একটা কথাও হোল না—উভয়েরই মনের অবস্থা চিন্তায় স্তব্ধ হ'য়ে ছিল। গৃহদ্বারে ট্যাক্সি স্থির হ'য়ে দাঁড়ালে গৃহরক্ষী উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম করলে।

প্রকাশ জিজ্ঞাসা করলেন, "বাবু ঘরমে হ্যাঁয়?"

"বড়া মহারাজ তো কোই দশ মিনিট নিকল্ গয়ে।"

"কব আবেঙ্গে মালুম হ্যায়?"

"দশ বজে।"

"মাই লোক ভিতর হ্যাঁয়?"

"হ্যাঁয় হুজুর।"

মুখ ফিরিয়ে সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে প্রকাশ চিন্তিত হয়ে উঠ্‌ল। তার মুখ জবাফুলের মত আরক্ত, দৃষ্টি অর্থহীন কঠোর,—যেন সাধারণ চৈতন্যের সীমা হঠাৎ অতিক্রম করেছে! ভয়ে ভয়ে প্রকাশ বললে, "তা হ'লে কি করা যায় সন্ধ্যা?"

সন্ধ্যা বললে, "কি আর করা যাবে? আমি ভিতরে যাচ্ছি।"

"কিন্তু দশটা পর্য্যন্ত আমার অপেক্ষা করা ত' চলবে না,—কাউলি সাহেবের সঙ্গে বেলা ১১টায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট!"

"আপনি পরে বেলা দুটো তিনটের সময়ে আস্‌বেন।"

"মামিমার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যাব?"

"তাড়াতাড়ির দরকার নেই, পরে দেখা করবেন।"

"তোমার সুটকেসটা?"

"নামিয়ে দিয়ে যান।"

সন্ধ্যা ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়ে দ্রুতপদে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করল।

সন্ধ্যাকে কোনও রকম পরামর্শাদি দেবার সময় পাওয়া গেল না, পাওয়া গেলেও পরামর্শ গ্রহণ করবার মত মনের অবস্থা তার ছিলনা। সুটকেসটা দারোয়ানের জিম্মা ক'রে দিয়ে চিন্তিত মনে প্রকাশ বললে, "ক্যালক্যাটা হোটেল।"

ট্যাক্সি ক্যালক্যাটা হোটেল অভিমুখে ধাবিত হল।

(ক্রমশঃ)

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

একাডেমি অফ্ ফাইন্ আর্টস্

(দ্বিতীয় প্রদর্শনী – ডিসেম্বর ১৯৩৪)

চিলিংহ্যাম্ ক্যাট্‌ল্

স্যার এড্‌উইন্ ল্যাণ্ডসীয়ার্ আর্ এ

[মহারাজা বাহাদুর স্যর প্রদ্যোতকুমার ঠাকুরের সদয় অনুমতিক্রমে]

গত ডিসেম্বর মাসে (২২শে ডিসেম্বর ১৯৩৪ হইতে ৬ই জানুয়ারী ১৯৩৫) কলিকাতা একাডেমি অফ্ ফাইন্ আর্টসের দ্বিতীয় বার্ষিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল, এ কথা বিচিত্রার পাঠকগণ অবগত আছেন। শিল্পীগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত চিত্র ও মূর্ত্তির মোট সংখ্যা এবার ৮৪০। ইহার মধ্যে কতকগুলি পুরস্কার অথবা বিক্রয়ের জন্য প্রার্থী ছিল না। ভারতবর্ষের শিল্পসঞ্চয়ী-গণের অধিকারে যে সকল উৎকৃষ্ট শিল্পবস্তু আছে প্রতি বৎসর বার্ষিক প্রদর্শনীতে লোন্ কলেক্‌শন্ নামক বিভাগে তন্মধ্যে কিছু কিছু প্রদর্শিত করবার ব্যবস্থা একাডেমির কর্ত্তৃপক্ষ করেছেন। এ বৎসর উক্ত লোন্ কলেক্‌শন্ বিভাগে সর্ব্বশুদ্ধ ২৭টি চিত্র প্রদর্শিত হয়েছিল।

পুরস্কারকামী শিল্পবস্তুর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৪টিকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। এ বৎসরের প্রদর্শনীবস্তুর উৎকর্ষের স্তর গত বৎসর অপেক্ষা কিছু উন্নততর ব'লেই মনে হয়েছিল। আশা করা যায় প্রতি বৎসরই একাডেমির প্রদর্শনী উন্নতির পথে অগ্রসর হবে। নিম্নে আমরা প্রদর্শনীস্তে প্রদর্শিত ১৪টি চিত্র ও ভাস্কর্য্যের প্রতিলিপি প্রকাশিত করলাম,—সেগুলি বিচিত্রার পাঠকগণের মনোরঞ্জন করতে সমর্থ হ'লে সুখী হব।

সম্পাদক
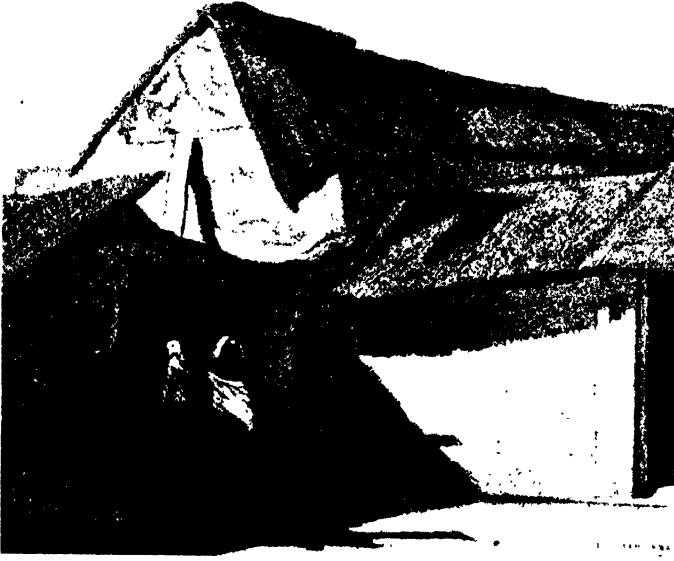
পল্লীকুটির
The Village Hut
শিল্পী
শ্রীললিতমোহন সেন এ আর সি এ

মন্দিরদর্শনাভিলাষী বুদ্ধ
Buddha going to Visit a Temple
শিল্পী
শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়

তিব্বতী কণিকা
Tibetan Titbit
শিল্পী
শ্রীঅতুল বসু
[Mr. Johan van Manen C. I. E.
মহোদয়ের সদয় অনুমতিক্রমে]

ধোবি ঘাট –
শ্রীনগরপত্তন
The Dhobi Ghat,
Srinagarpatan
শিল্পী
Mr. C. F. Barry এবং
Mrs. S. Goldsmith

পথে
On the Way
শিল্পী
শ্রীসত্যব্রত সাহা
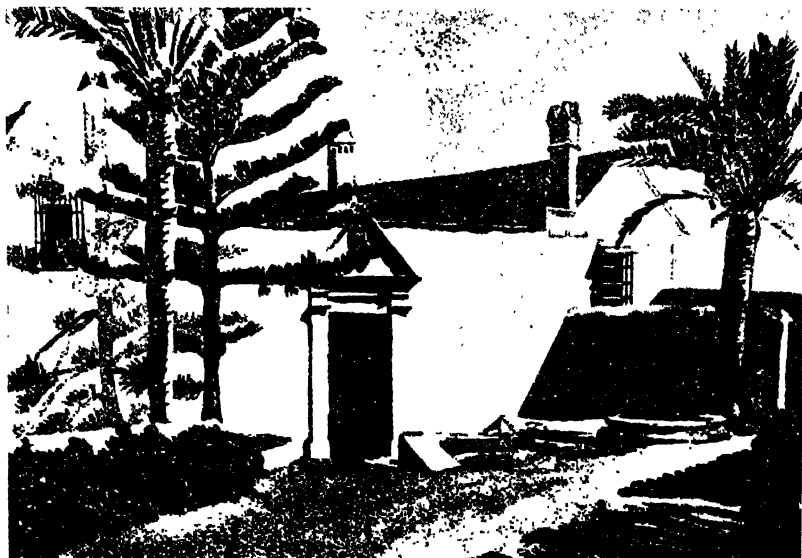
স্যাণ্টা ক্লারা
Santa Clara
শিল্পী
Mrs. Norah Vivian

বাস্তব জীবন হইতে একটি ভঙ্গী
A Pose from Life
শিল্পী
মিঃ পি মল্লিক

নৈরাশ্য
Despair
শিল্পী
শ্রীভবেশ সান্ন্যাল

দুঃখ
Grievance
শিল্পী
শ্রীগোবর্দ্ধন আশ

দ্বিপ্রহরে
At Noon
শিল্পী
শ্রীবিমল দে

মাছ ধরা—Fishing
শিল্পী—শ্রীত্রিপুরেশ্বর মুখোপাধ্যায়
[বাঙলার গভর্ণর মহামান্য স্যর জন অ্যাণ্ডারসন্ মহোদয়ের সদয় অনুমতিক্রমে

নাগোয়া গ্রাম—Nagwa Village
ী—শ্রীগোবর্দ্ধন আশ

মুখাকৃতি চর্চ্চা
Head Study
শিল্পী— অবনী সেন

একেলা

শ্রীবিমলজ্যোতি সেনগুপ্ত

সুদূর সীমানায় সরসী নীরে
ঘনায় ঘনছায়া তটিনী তীরে।
তমাল তরু' পরে ধূসর বালুচরে
আকাশ মিশে আসে কাশের শিরে।
আঁধার নভ তলে বলাকা ফিরে চলে
নিবিড় নিরালায় নিজের নীড়ে।

একেলা নির্জ্জনে দুয়ার-পাশে
নীরবে ব'সে আছি তোমার আশে;
মনের কোণে কোণে কুটীর-প্রাঙ্গণে
আমারে ঘিরে কেন আঁধার আসে?
নয়ন ঝর ঝর অধর থরথর
মুরছি' পড়ে হিয়া দীর্ঘশ্বাসে।

আমার বেশবাস হ'য়েছে সাদা,
শিথিল কেশপাশ আপন হারা,
তোমার ভরসায় উতল অসহায়
ব্যাকুল বাহুদুটি পাগলপারা;
পথের সীমাশেষে তাকাই অনিমেষে,
কেমনে ভেঙে যাই প্রাচীর-কারা?
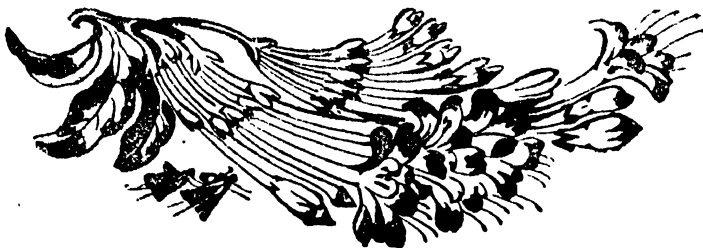
ব্রাউনিং চতুষ্টয়

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ এ
(ক্যাল ও ক্যাণ্টাব), এ আর সি এস্ (লণ্ডন), আই ই এস্

১। কল্যাণ-কোহিনূর

সারা বরষের সৌরভ মধুভার,
বহে মৌমাছি মধুকোষটিতে তার।
যত গৌরব বিস্ময় খনিভরা
একটি মণিতে আছে সে সকলি ধরা।
একটি মুকুতা রাখে যে বক্ষ ভরি'
সাগর ঢেউ-এর আলোছায়া সাতনরী।
গন্ধ, সুষমা, দীপ্তি, কাজল ছায়
বিস্ময় আর ঋদ্ধির গরিমায়,
ফেলিয়া নিম্নে সুদূর উর্দ্ধলোকে
আবিঃ সম সত্য ভাতিছে চোখে।
বিশ্বাস সেথা কলুষের লেশ হারা,
মুক্তায় নাই শুচিতা অমনধারা।
বিশ্বের মাঝে সত্য দীপ্ততম,
বিশ্বাস যার শুভ্রতা নিরুপম,
মিশেছিল সব যেন শুধু মোর তরে
একটি চুমায় তার সে অধর 'পরে।

Summum Bonum.—Robert Browning.

২। বিচ্ছেদ,—প্রত্যুষে

সহসা পড়িল সিন্ধু চক্ষে মোর অন্তরীপ বাঁকে,
তরুণ তপন হেরি উঁকি মারে পাহাড়ের ফাঁকে।
সম্মুখে রয়েছে তার সোনালী সরল পথখানি,
মোর তরে ধরাভরা মানবের দাবী আছে, জানি।

Parting at Morning—Robert Browning.

৩। ছায়া-দ্যুতি

শুক্নো মরা ঘাসে ভরা মাটি।
গ্রীষ্ম গেল কাটি,
নামিল বাদল,
সবুজে নীলার কুচি করে ঝলমল!
শ্যামলীরে কে পরাল দুল?
—তৃণে তৃণে ফুটেছে যে ফুল!

কী বেদনা গগনে উথলে
মেঘল কাজলে!
ঘোম্টা খুলি' কে
হানে আলো নয়নের ঝিলিকে ঝিলিকে?
—আকাশে ফুটেছে সন্ধ্যা তারা,
আঁখি তার ঢালে দীপ্তিধারা।

চারিদিকে পাষাণ প্রাচীর
এই ধরণীর।
গ্লানির কারায়
এ জীবন ছিল বন্দী; উছল ধারায়
দেবতার হাসি এল ভাসি'?
—তুমি এসে দাঁড়ালে যে হাসি'!

Apparitions—Robert Browning.

৪। মিলন,—নিশীথে

ধূসর সিন্ধু, তিমির-তুলিকা-বুলান কাজল রাতি,
আধ-খানি চাঁদ ধরণীর কোলে সোনার আঁচল পাতি।
পাড়ী হ'ল শেষ ; খাড়ির ভিতরে নৌকার মুখ ঠেলি'
ভিড়ানু তরীরে ভিজা সিকতায় ; ঘুম-ভাঙা আঁখি মেলি'
ছোট ঢেউগুলি উঠিল উছলি' অনল-ঘূর্ণীপাকে,
বলয়িত জলকল্লোলমালা ঘেরিল সে নৌকাকে।

আধ-ক্রোশ পথ সিন্ধু-সুরভি পার হনু সে তিমিরে,
তিনখানি মাঠ উত্তরি' পরে পহুঁছিনু সে কুটীরে।
মৃদু করাঘাত বাতায়নে মোর, ক্ষিপ্র হর্ষভরে
দেশালাই কাঠি উঠিল জ্বলিয়া হেরিনু ক্ষণেক পরে।
তারপর দুটি বক্ষে বক্ষে স্পন্দন বিনিময়,
তার চেয়ে মৃদু চুপি চুপি কথা সুখ ভয় করি জয়।

Meeting at Night—Robert Browning.

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ব্রাউনীং কাব্যের একজন বিশেষ ভক্ত। ব্রাউনীং কাব্য মধুর কিন্তু দুরূহ,—সুতরাং সে রাজ্যের প্রবেশদ্বার উন্মোচিত করা নিতান্ত সহজ কথা নয়। সুরেন্দ্রবাবু সেই প্রবেশদ্বারের চাবিটি বাঙালী পাঠকের পক্ষে সহজলভ্য ক'রে দিচ্ছেন ব্রাউনীং-এর বহু কবিতার অনুবাদ ক'রে। এই অনুবাদগুলি এমন সুন্দর ও সহজ যে, মনে হয় সেগুলি আদিম সৃষ্টি, কিন্তু মূলের সহিত মিলিয়ে পাঠ করলে মূল ও অনুবাদের আশ্চর্য্য ভাব-সান্নিধ্য দেখে মন খুসি হ'য়ে ওঠে। বিঃ সঃ।

শিশু-সাহিত্য

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দেব

শিশু-সাহিত্য বলতে যা বোঝায় আমাদের দেশে সেটার আমদানী হয়েছে খুব হালে। সংস্কৃত ভাষাই যখন এখানে শিক্ষার বাহন ছিল তখন বিষ্ণুশর্ম্মার "পঞ্চতন্ত্র" ও "হিতোপদেশ" ছিল শিশু শিক্ষার প্রধান উপকরণ। বলা বাহুল্য যে হিতোপদেশে ছেলেদের উপযোগী অনেক হিতকথাই গল্পচ্ছলে বর্ণিত হয়েছে। 'মিত্রলাভ' 'সুহৃদ্ভেদ,' 'বিগ্রহ' ও 'সন্ধি' এই চারটি বিষয়কে ভিত্তি ক'রে পণ্ডিত বিষ্ণুশর্ম্মা এই গ্রন্থে গল্পের আকারে যে নীতিকথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন তা থেকে অনেকে অনুমান করেন যে তিনি ছিলেন কোনো উচ্চশিক্ষিত রাজা। আপন পুত্রগণের সুশিক্ষার জন্য শিশু সাহিত্যের একান্ত অভাব দেখে তিনি স্বয়ং ছেলেদের পাঠোপযোগী এই নীতিগ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। পণ্ডিত বিষ্ণুশর্ম্মার 'পঞ্চতন্ত্রে' এর প্রমাণ আরও সুস্পষ্ট পাওয়া যায়। কারণ 'পঞ্চতন্ত্রে' তিনি গল্প ও উদাহরণচ্ছলে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, অর্থনীতি, ব্যবহারনীতি প্রভৃতি রাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়ের সমাবেশ করেছেন। রাজ-পুত্রগণের পক্ষে এ সকল বিষয়ে শিক্ষালাভের প্রয়োজন যতটা ছিল গৃহস্থের ছেলের ততটা নয়, তথাপি বাঙ্‌লা ভাষায় যখন শিশুশিক্ষার প্রয়োজন উপস্থিত হ'য়েছিল, তখন শিশুসাহিত্য বলতে আমাদের নিজস্ব কিছু না থাকায় এই বিষ্ণুশর্ম্মার 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'হিতোপদেশই' বঙ্গভাষায় অনূদিত হয়ে সেদিন শিশুসাহিত্যের শূন্য স্থান পূর্ণ করেছিল। পণ্ডিত তারাকান্ত কাব্যতীর্থ 'পঞ্চতন্ত্র' অনুবাদ করেছিলেন এবং পণ্ডিত তারা কুমার কবিরত্ন মহাশয় 'হিতোপদেশ' অনুবাদ ক'রে সেকালে আমাদের শিশুসাহিত্যের অভাবজনিত লজ্জা দূর করেছিলেন। তারপর আমরা পেয়েছিলেম বটতলার প্রকাশিত শিশুবোধক। এই বটতলার প্রকাশিত শিশুবোধক সেকালে যেমন করে শিক্ষার সঙ্গে শিশুদের মনোরঞ্জনে সমর্থ হয়েছিল এমন আর সেদিন কিছুতে হয়নি। সেই প্রচ্ছদপটের উপর নগ্নগাত্র চাণক্য পণ্ডিতের দীর্ঘ শিখা সংযুক্ত প্রতিকৃতি আজও মনে পড়ে! সেই 'বন্দেমাতা সুরধুনী পুরাণে মহিমা শুনি'—মকরবাহিনী গঙ্গার এই সুমধুর বন্দনা আমরা আজও ভুলিনি। দাতাকর্ণের মহান ত্যাগ এমন করে আমাদের মনে আর কেউ দেগে দিতে পারেনি।

কিন্তু, সে যাই হোক, 'শিশুবোধক'কে তথাপি ঠিক শিশু-সাহিত্যের পর্য্যায় ভুক্ত করা চলে না। কারণ ওর মধ্যে আরও এমন অনেক শিক্ষণীয় বিষয়ের সমাবেশ ছিল যার সঙ্গে সাহিত্য বিভাগের কোনো সম্বন্ধ নেই, কাজেই ও বইখানি তদানীন্তন পাঠ্যপুস্তকের তালিকার মধ্যেই থেকে যাবে, যেমন থেকে যাবে পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা' ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বোধোদয়' 'আখ্যানমঞ্জরী' প্রভৃতি। এঁরা ছিলেন ইংরাজী জানা প্রগতি-পরায়ণ পণ্ডিত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজী সাহিত্য পূর্ণ-বিকশিত হ'য়ে উঠেছিল। সেদিন সিড্‌নী স্মিথ, কোলরীজ, সাদে, ল্যাম্ব, কার্লাইল, মেকালে, থ্যাকারে, নিউম্যান রাস্কিন, ডিকেন্স্‌, ম্যাথু আর্ণল্ড, হাক্সলে, আর এল ষ্টিভেন্সন্‌, লর্ড টেনিসন্‌ প্রভৃতি একাধিক মনীষী শুধু ইংরাজী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ নয়, শিশু চিত্তকে বলিষ্ঠ ও নির্ভীক এবং তাদের চরিত্রকে আদর্শ করে গড়ে তুলতে ব্রতী হয়েছিলেন।

পণ্ডিত মদনমোহন ও বিদ্যাসাগর এই সময় নানা ইংরাজী পুস্তকের সাহায্যে বাঙ্‌লা ভাষায় শিশু সাহিত্য সৃষ্টি করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। স্কুলপাঠ্য হিসাবে রচিত হ'লেও ঈশপের গল্প নিয়ে রচিত বিদ্যাসাগরের 'কথামালা'কেই বোধহয় বাঙলা ভাষায় শিশুসাহিত্যের প্রথম অবদান বলা যেতে পারে।

ভাসুরকো নামঃ সিংহ এবং পাপবুদ্ধি ও ধর্ম্ম বুদ্ধির সংসর্গ

পরিত্যাগ করে অর্থাৎ সংস্কৃত সাহিত্যের আবহ ও প্রভাব কাটিয়ে শিশুসাহিত্য এখন থেকে বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠতে সুরু করে। শুষ্ক নীরস পাঠ্যপুস্তকের প্রবন্ধের প্রতি শিশুর মনোযোগের একান্ত অভাব, অথচ গল্পচ্ছলে লেখা সরস সচিত্র নীতিগ্রন্থ তারা আগ্রহের সঙ্গে পড়ে—'বোধদয়কে' তারা ভয় করে কিন্তু, কথামালার সঙ্গে তাদের একান্ত অন্তরঙ্গতা,—'পদার্থ কয়প্রকার ?' এ প্রশ্নে তাদের কচিমুখ বাসিফুলের মত শুকিয়ে বিবর্ণ হ'য়ে ওঠে এসব জটিল তত্ত্বের খবর তারা রাখতে না পারলেও ধূর্ত্ত শৃগালের নিমন্ত্রণে সারস পক্ষী এসে কি ভাবে ঠকে গিয়ে তার প্রতিশোধ নিয়েছিল—হাসিমুখে ও প্রফুল্ল কণ্ঠে তারা সে বিবরণ দিতে পারে। শিশু মনস্তত্ত্বের এ পরিচয় অবগত হবার পর ক্রমে পাঠ্যপুস্তকের রূপ পরিবর্ত্তন হ'তে থাকে। ক্রমে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এদেশেও শিশু সাহিত্যের গোড়াপত্তন সুরু হয়।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কঙ্কাবতী' ছোটদের জগতে একটা সাড়া এনে দিয়েছিল। যোগেন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসি খুসি' ও 'খুকুমণির ছড়া' শিশুরাজ্যে এক আনন্দ উৎস উৎসারিত করেছিল। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' নিয়ে এখনো ছেলে মেয়েরা কাড়াকাড়ি করে। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাদের হাতে 'ক্ষীরের পুতুল' গড়ে দিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথের নদী ও শিশু রাজা ও মুকুট তাদের মন ভুলিয়েছে। ৺উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কুলদারঞ্জন রায়, ৺মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, ৺সুকুমার রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রভৃতি একাধিক সুলেখক বাঙ্‌লা ভাষায় শিশুদের মনোরঞ্জনে সিদ্ধহস্তের পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীমান্ সুনির্ম্মল বসুর ছন্দের টুং টাং ইত্যাদি বহু পুস্তক ছেলে মেয়েদের হাতে ভাষার ধ্বনিমধুর ঝুমঝুমি তুলে দিয়েছে। শ্রীমান অখিল নিয়োগী নানা চিত্রে ও কথায় তাদের কলকণ্ঠে হাসি ফুটিয়েছেন।

এই সময়ে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ছেলেদের জন্য বাংলা মাসিকপত্রও দেখা দিয়েছিল। ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেনের 'সখা'ই বোধ হয় বাঙ্‌লা ভাষায় ছেলেদের প্রথম মাসিকপত্র। ১৩০০ সালে প্রকাশিত ভুবনমোহন রায়ের 'সাথী' ১৩০১ সালে 'সখা'র সঙ্গে মিলিত হ'য়ে 'সখা ও সাথী' নামে প্রকাশ হ'য়েছিল। স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় ১৩০২ সালে 'মুকুল' প্রকাশিত হয়। তারপর, বিংশ শতাব্দীর যুগ। এ যুগে "সন্দেশ", "মৌচাক", "শিশু-সাথী", "খোকাখুকু", "রামধনু" প্রভৃতি একাধিক মাসিকপত্র বাঙলার শিশুদের চিত্তবিনোদনে সচেষ্ট রয়েছে। আজকাল ছেলে মেয়েদের জন্য বিবিধ 'বার্ষিক'ও প্রকাশ হ'তে দেখা যাচ্ছে। ছোটদের 'গল্প সঞ্চয়ন', 'ছোটদের চয়নিকা' 'ছোটদের বার্ষিকী' প্রভৃতি সংগ্রহ পুস্তকও আমাদের শিশু সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলেছে। কালে হয়ত ওদেশের মত এদেশেও ছেলেদের জন্য বিচিত্র সুন্দর 'সাপ্তাহিক' ও 'দৈনিক পত্রিকা'ও দেখা দেবে। য়ুরোপ ও আমেরিকায় এরূপ পত্রিকা একাধিক প্রকাশিত হয়। অধুনা জাপান তুরস্ক, চীন প্রভৃতি প্রাচ্য দেশেও এর প্রয়োজন ও উপকারিতা বুঝতে পেরে ছেলেদের জন্য বিশেষভাবে সাময়িক পত্র ও পত্রিকা প্রকাশ করতে সুরু করেছে।

এদেশের শিশু সাহিত্যের এই অর্দ্ধ শতাব্দী কালের নিদর্শন আমাদের কাছে এই তথ্যটিই আজ সুস্পষ্ট রূপে উদ্‌ঘাটন ক'রে ধরেছে যে—শুষ্ক পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞানগর্ভ নিবন্ধ অপেক্ষা সরস সাহিত্যের অন্তর্নিহিত সহজ শিক্ষাই শিশুদের সমধিক আকর্ষণ করে। তারা পড়ার বই পড়ে যা না শেখে তার চেয়েও অনেক বেশী শেখে ছড়া ও গল্পের বই পড়ে। 'টেক্‌ষ্ট বুক' অপেক্ষা 'আউট বুকের' প্রতিই তাদের অনুরাগ অধিকতর। 'কুজ্ঝটিকা' বানান করতে বললে যে ছেলের চোখের সামনে পৃথিবীর আলো ঝাপসা হয়ে আসে, ভুবনের মাসীর কথায় কিন্তু তার মুখে হাসি ফোটে। 'একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল' এ খবর সেদিনের সকল ছেলেই রাখতো। 'জল পড়ে', 'পাতা নড়ে' এমন কি 'লাল ফুল' ও যে ছেলে ভুলে যায়, 'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল' কিন্তু তার আদ্যোপান্ত মুখস্থ থাকে। আমাদের 'শুভঙ্কর' এ সংবাদ জানতেন, তাই কঠিন অঙ্ক শাস্ত্রকে তিনি করেছিলেন কবিতার সাহায্যে ছন্দের বন্ধনে সহজায়ত্তকর।

"কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিজ্জে

কাঠায় কুড়বা কাঠায় লিজ্জে—"শুভঙ্করের ছাত্রেরা আজও কেউ ভোলেনি।

পাঠাভ্যাসের সময় খেলায় রত ছেলেদের ভর্ৎসনা ক'রে পড়তে বললে তারা যে যার বই খুলে বসে দুলে দুলে সুর ক'রে পড়তে সুরু করে—

"রাতি পোহাইল উঠ প্রিয়ধন
কাক ডাকিতেছে কররে শ্রবণ—"

কেউ বা অকারণ উচ্চৈস্বরে কণ্ঠস্থ করে—

"কি খাব মা কি খাব মা
বড় ক্ষুধা পেয়েছে—"

কেউ বা একান্ত গদগদ কণ্ঠে আওড়ায়—

"রামেদের বুধি গাই প্রসব হইল,
রাম শ্যাম দুই ভাই দেখিতে আসিল—"

পণ্ডিত যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় ও মনোমোহন বসুর "পদ্যমালা" ও 'পদ্যপাঠেরই' সেদিন থেকে আজও পর্য্যন্ত শিশু মহলে জয় জয়কার!

'ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী রেডিং নগরে' বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কেউই স্বেচ্ছায় যেতে চাইতো না। 'সিন্ধু ঘোটক' বা 'বিবরের' সন্ধানে পাঠ্যপুস্তকে মনঃসংযোগ ক'রে কোনো ছেলেই তখন ডুবাল হয়ে উঠতে অগ্রসর হ'ত না। অক্ষয় কুমার দত্তের চারুপাঠ শিশু মনোরঞ্জনে পদ্য পাঠের কাছে হার মেনেছে। এতে যে ব্যাপারটা আমাদের কাছে বেশ স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল সেটা হচ্ছে এই, যে—ছেলেরা স্বভাবতঃই ছন্দলোভী ও গদ্যভীরু!

শিশুমনস্তত্ত্বের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে বর্ত্তমান জগতে শিশুশিক্ষার জন্য নানা নূতন বৈজ্ঞানিক উপায় প্রচলিত হয়েছে এবং হ'চ্ছে। 'কিণ্ডার গার্টেন্'-প্রণালী জার্ম্মানী থেকে জগতে ছড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু তার পরীক্ষা সর্ব্বত্র শেষ হ'তে না হ'তে আজ আবার অভিনব 'মণ্টেসেরী' পদ্ধতির প্রসার ও প্রতিপত্তি দেখা যাচ্ছে। শিক্ষার নব নব ধারার সঙ্গে য়ুরোপে আধুনিক শিশু সাহিত্যের গতি ও প্রকৃত পরিবর্ত্তিত হ'তে সুরু হ'য়েছে। কিন্তু, আমাদের দেশের শিশু সাহিত্য আজ এই বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এসেও এখনও ওদেশের ঊনবিংশ শতাব্দীর নাগাল ধর'তে পারেনি। এটা দুঃখের বিষয় হ'লেও একথা ভুললে চলবে না যে শিশুদের জন্য বিশেষ ভাবে সাহিত্য গড়বার দিকে আমাদের লক্ষ্য পড়েছে অতি অল্পদিন মাত্র। কাজেই আমাদের শিশুসাহিত্য এখনও ওদের সহযাত্রী হ'তে পারেনি।

সুকুমারমতি বালক বালিকারা যে অল্প বিস্তর পেটুক এ খবর বোধ করি কারুর অবিদিত নেই। কিন্তু, এই রসনা পরিতৃপ্তির প্রলোভনের মতই তাদের মনের ক্ষুধা ও জ্ঞানের লালসাও যে অত্যন্ত প্রবল এ খবর হয়ত' আমরা অনেকেই রাখিনি। কেন যে তারা চিড়িয়াখানায় যাবার জন্য বায়না ধরে, সার্কাস্ দেখবার জন্য কাঁদে, ইংরাজী বাজ্‌নার আওয়াজ পেলেই শত নিষেধ থাকা সত্ত্বেও কেন যে তারা ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে এ নিয়ে আমরা কোনোদিনই মাথা ঘামাইনি। কিন্তু, এ সব নিয়ে ভাবা এবং এর কারণ জানা এদেশের প্রত্যেক ছেলেমেয়ের অভিভাবকদের একান্ত কর্ত্তব্য। পুষ্টিকর খাদ্য যেমন শিশুর দৈহিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যাবশ্যক, তার মানসিক শক্তির উন্নতি ও বিকাশের জন্যও সেই রকম শিশুমনেরও প্রয়োজনীয় খাদ্য তাদের সরবরাহ করাও সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। শিশুমনের উপযোগী পুষ্টিকর আহার্য্য সে তার স্কুলপাঠ্য কেতাবে খুঁজে পায় না। সে আহার্য্য তাকে যোগায় যোগ্যতর শিশুসাহিত্য।

বিশুদ্ধ আলো বাতাস এবং খাদ্য ও পেয় যেমন শিশুর দেহকে সুস্থ সবল পুষ্ট ও পরিণত ক'রে তোলে, সুকুমার সৎসাহিত্যও তেমনি শিশুর সকল প্রকার মানসিক উন্নতি ও কল্যাণবুদ্ধি জাগ্রত করার পক্ষে সবিশেষ উপযোগী। কিন্তু, পড়ার বই ছাড়া অন্য কোনো বই পড়তে দেখ্‌লে এখনও অনেক অভিভাবকেরা ছেলেমেয়েদের তিরস্কার করেন। কারণ, তাঁরা মনে করেন—ওটা শুধু ছেলেদের মূল্যবান সময়ের অপব্যয় নয়, অন্যায়ও বটে। কিন্তু, তাঁদের জানা উচিত যে কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তকের গণ্ডীর মধ্যে ছেলেদের আট্‌কে রাখলে তাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঙ্কীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ হ'য়ে পড়ে। তবে এ কথাটাও ঠিক যে তা' ব'লে নির্ব্বিচারে

যে কোনো বই ছেলেদের হাতে তুলে দেওয়া উচিত নয়। শিশুর খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে যেমন বিধি নিষেধ মেনে চলতে হয়, অন্যথায় শিশুর স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে, তেমনি শিশুর পক্ষে অপাঠ্য কোনো বইও তাকে পড়তে দেওয়া উচিত নয়। পাঠ্য পুস্তকের তালিকার বাইরে কেবলমাত্র সেই সাহিত্যই তাদের পড়তে দেওয়া যেতে পারে যা তাদের শিশু মনের রসবোধের অনুকূল এবং তাদের মানসিক কল্যাণ ও শুভবুদ্ধির উদ্বোধনের সঙ্গে জ্ঞানোন্মেষেরও সহায়ক।

অতএব শিশুসাহিত্য এমন হওয়া প্রয়োজন যা উত্তর-কালে শিশুকে তার জীবনে আদর্শ নির্ব্বাচনে সাহায্য ক'রতে পারবে। তার কল্পনাকে জাগ্রত ও বিচিত্র করে তুলবে। তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে উদ্বুদ্ধ ও বিকশিত করে দেবে। তার চরিত্র ও প্রকৃতিকে মহৎ ও উদার ক'রে গড়ে তুলবে। শিশু সাহিত্যই শিশুদের চিত্তবৃত্তির স্ফূর্ত্তি বিকাশ পরিপূর্ণতা ও শ্রীবৃদ্ধির সাধনে সবচেয়ে বেশী সহায়তা করে। জাতি গঠনের প্রথম সোপান এই শিশুসাহিত্য। সুতরাং শিশু সাহিত্যের উৎকর্ষ বিধানে সাহিত্যিক মাত্রেরই যত্নবান হওয়া উচিত।

আমাদের এখানে শিশু সাহিত্যের নামে যা কিছু এ পর্য্যন্ত চলেছে তাতে দেখা যায় যে অতি শৈশবকাল থেকে কিশোর বয়স পর্য্যন্ত এ দেশের ছেলেরা এতদিন যা শিখে এসেছে তা' শুধুই 'রোম্যান্স্!' নিরর্থক ভাব-সর্ব্বস্ব কল্পনা-বিলাস মাত্র। কুঁড়ে ঘরের মেটে দাওয়ার উপর ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে আমাদের পল্লীর ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা সন্ধ্যা প্রদীপের স্তিমিত আলোকে শোনে "এক যে ছিল রাজা তার ছিল দুই রাণী—দুয়োরাণী আর সুয়োরাণী।" কিম্বা রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র ও কোটালপুত্র এই তিন বন্ধুর বনে শিকার করতে গিয়ে পথ হারাণো, রাজকন্যার স্বপ্ন দেখা, রাক্ষস খোক্কস্ দৈত্য দানার কথা—শেষ পর্য্যন্ত হয়ত' তারা পায় সেই সরোবরে ডুব দিয়ে কৌটার ভিতর 'ভোম্‌রা ভুম্‌রী' নয়ত তালপত্রের খাঁড়া পক্ষীরাজ ঘোড়া অথবা সোনার কাঠি ও রূপোর কাঠির যাদুস্পর্শ।

ফলে আমাদের দেশের ছেলেরা হ'য়ে ওঠে কল্পনাবিলাসী ও ভাবপ্রবণ। আজ তাই কবি ও সাহিত্যিকের ভীড় জমে উঠেছে দেশে, কিন্তু, নিরলস ও অক্লান্ত কর্ম্মীর সন্ধান পাওয়া যায় না বেশী। আজ বাঙালীর ছেলেরা কেউ দুঃসাহসী বীর হ'য়ে উঠবার স্বপ্ন দেখে না। বিপদকে তুচ্ছ ক'রে মরণের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বার মত নির্ভীক হ'য়ে ওঠে না তার মন; মেরু আবিষ্কারে অজানার উদ্দেশে যাত্রা করবার কোনো উৎসাহ নেই তার বুকে। গৌরী শৃঙ্গে উঠতে সে এগিয়ে যায়নি আজও! মোটের উপর আজও তার আত্মবিশ্বাস এবং আপন শক্তির উপর অটুট নির্ভরতা জাগেনি। নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস হারিয়ে তারা শেখে দৈব-নির্ভরতাটাই প্রাণপণে আঁকড়ে ধরতে! তাই পরবর্ত্তী জীবনে তার সংসার যাত্রাপথে যদি কখনো তেপান্তরের মাঠ উত্তীর্ণ হবার প্রয়োজন হয় সে তখন পক্ষীরাজ ঘোড়ার আশায় দৈবের মুখ চেয়ে খোঁড়া হ'য়ে বসে থাকে। নিজের পায়ের উপর ভর দিয়ে এগিয়ে যেতে ভয় পায়! সে জানে সাতশ ভরা ডিঙি নিয়ে বাণিজ্যযাত্রা করলেও ঝড় তুফানে সাগর তলে সওদাগরের সব তরণীই ডুবে যাবে যদি না মা লক্ষ্মী কৃপা করে মুখ তুলে চান। সে জানে যে ভাগ্য মন্দ হ'লে পোড়া শোলমাছও নিশ্চিত তার মুঠোর ভিতর হ'তেও পালিয়ে যাবে। কারণ আশৈশব তার সুকুমার মনের উপর এই দৈবাধীন বিশ্বাসই বারম্বার দেগে দেওয়া হয় যত কিছু রূপকথা, ব্রতকথা, অতীত কাহিনী ও পুরাণের গল্পের ভিতর দিয়ে।

তাই, আমাদের ছেলেরা রবিন্সন ক্রুশোকে সহসা অবস্থা-বিপর্য্যয়ে সর্ব্ববিষয়ে আত্মনির্ভরশীল হ'তে দেখেও মনে প্রাণে সেটাকে তার কৃতিত্ব ব'লে মেনে নিতে পারে না। ভাবে সে নিতান্ত ভাগ্যবান! তার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন তাই প্রয়োজন মত সেই নির্ব্বান্ধব দ্বীপে সবই তার কপালে জুটে গেল।

এই যে কপালে জুটে যাওয়ার আশায় ভাগ্যের উপর বরাত দিয়ে বোকার মত বেকার বসে থাকা—এদেশের ছেলেদের একেবারে মজ্জাগত স্বভাব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—এর কারণ অনুসন্ধান করলে জানতে পারা যাবে যে, এদেশের শিশুসাহিত্যই ছেলেদের এই দুর্ব্বলতার জন্য

অনেকখানি দায়ী। তারা যে ইচ্ছা করলে স্বাধীন ভাবে কিছু করতে পারে—ভাগ্যকে জয় করা যে তাদের সাধ্যায়ত্ত এ শিক্ষা তারা পায় না।

সকল ছেলেরই 'রূপকথা' বা ফেয়ারীটেল্‌সের বিশিষ্ট ধারা ও পর্য্যায়ের অনুকূল একটা নির্দ্দিষ্ট বয়স আছে। তার আগে 'নার্সারী রাইম্' বা 'ছেলে ভুলানো ছড়া' ও 'ঘুমপাড়ানী গান'ই শিশু দস্যুদের শান্ত রাখে। কিন্তু শিশুর মন তার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যেমন বাড়তে থাকে শিশু সাহিত্যের রূপ ও রং-ও যে তেমনি তার সঙ্গে সঙ্গে বদ্‌লে যাওয়া ও অগ্রসর হওয়া দরকার একথা ভুলে থাকলে চলবে না। চাণক্য পণ্ডিত বলে গেছেন :—

"—লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তেতু ষোড়শে বর্ষে পুত্র মিত্র বদাচরেৎ॥"

চাণক্য পণ্ডিতের এই উপদেশ যদি আমরা ঠিক অনুসরণ করতেম তা'হ'লে বাঙ্‌লা দেশের ছেলেরা হয়ত অনেকেই এমন অমানুষ হত না। কিন্তু ছেলে মানুষ-করা সম্বন্ধে এ দেশের অভিভাবকেরা অধিকাংশই অজ্ঞ। তাঁরা নিজেদের খেয়াল খুসি অনুসারে চলেন। ছেলেদের সঙ্গে ব্যবহারের তাঁদের কোনো সুনির্দ্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। তাঁরা কেউ হয়ত' পুত্রকে 'পঞ্চবর্ষ' 'দশবর্ষ' ছেড়ে একেবারে ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত নিতান্ত শিশুর মতই লালন করেন; সে ছেলে বড় হয়েও আদুরে খোকাই থেকে যায়। আবার কেউ হয়ত আমরা 'লালয়েৎ'টার পরিবর্ত্তে 'তাড়য়েৎ'টাই পছন্দ করি বেশী, এবং সেইটেই নির্দ্দয় ভাবে চালিয়ে যাই 'ষোড়শ বর্ষের' অনেক অধিক বয়স পর্য্যন্ত! কাজেই 'পুত্র' আমাদের 'মিত্র' না হ'য়ে শত্রুই হ'য়ে ওঠে অধিকাংশ স্থলে।

পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত শিশুর যে লালনের বয়স নির্দ্দিষ্ট আছে তারই মধ্যে শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির সম্যক বিকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত তাকে শোনানো উচিত ওই ছেলে ভুলানো ছড়া ও ঘুমপাড়ানী গান, অর্থাৎ যার মাথামুণ্ড কোনো অর্থ নেই, কিন্তু সুরের একটা সুমধুর ধ্বনি ও তান মান দিয়ে মেলা ছন্দের একটা অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনা আছে, যা শিশুর অবোধ চিত্তকেও আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করে। ছড়ার ছন্দ ও গানের সুর শিশুর কানে যে ঝঙ্কার তোলে তারই রেশ থেকে কালে একদিন তার সুরবোধ ও ছন্দজ্ঞানের উন্মেষ হয়। তারপর ধীরে ধীরে যখন তার বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হ'তে থাকে তখন সে আশে-পাশে যা দেখে সেগুলির পরিচয় সবিশেষ জানবার জন্ত তার মনের মধ্যে একটা ব্যগ্র কৌতূহল অনুভব করে। এই সময় শিশু তার অভিভাবকদের নিত্যনিয়ত সহস্র প্রশ্নের দ্বারা শুধু বিরক্ত নয়, বিপন্ন করেও তোলে। এই সময় অনেক অভিভাবক ছেলেদের ধমক দিয়ে নিরস্ত করতে চান। "ও সব তুমি বুঝতে পারবে না" বলে এড়াতে চান, কিম্বা "বড় হ'লে জানতে পারবে'' ব'লে ভুলিয়ে রাখেন। কারণ ছেলেদের সেই অনন্ত জিজ্ঞাসা—মেঘ ডাকে কেন? বাতাস বয় কেন? বিদ্যুৎ চম্‌কায় কেন? বৃষ্টি পড়ে কেন? আলো জ্বলে কেন? সূর্য্য রাত্রে কোথায় থাকে? চাঁদ দিনের বেলা ওঠে না কেন? রামধনু সাতরংয়ের হয় কেন? এই অসংখ্য 'কেন'র উত্তর মা, ঠাকুরমারা দূরে থাকুন, বিজ্ঞ জ্যাঠামশাই, দাদামশাইরাও চট ক'রে দিয়ে উঠতে পারেন না। মা, ঠাকুরমারা এক্ষেত্রে প্রায়ই বরুণদেব পবনদেব প্রভৃতির শরণাপন্ন হন; কিন্তু বাবা খুড়ারা এত সহজে পরিত্রাণ পান না। 'প্রকৃতি পরিচয়' প্রকৃষ্ট রূপে পড়া নেই যাঁদের, ছেলেদের এ প্রশ্নজালে তাঁরা একান্ত বিব্রত হ'য়ে পড়েন এবং কোনো রকমে যা'হোক একটা কিছু তাদের ভুল বুঝিয়ে দিয়ে নিজেদের মান বাঁচাবার চেষ্টা করেন। এগুলো আরো খারাপ, কারণ এর ফলে ছেলেরা অনেক কিছু ভুল শেখে যা সহজে তাদের মন থেকে মুছ্‌তে চায় না। স্নেহ ও সহানুভূতির সঙ্গে সহিষ্ণুভাবে এই সময় ছেলেদের সকল প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর দিয়ে তাদের নানা বিষয়ে সহজ শিক্ষা লাভ সুগম ক'রে দেওয়া কর্ত্তব্য।

পাঁচ বছরের ছেলের হাতে খড়ি হয়। এই সময় ছেলেদের কল্পনা-শক্তিরও বিকাশ হ'তে দেখা যায়। তারা চোখে দেখা সব কিছু ছাড়া, তাদের কানে শোনা অনেক কিছুরও সঠিক খবর জানবার জন্ম ব্যস্ত হয়। তারা বনের বাঘ ভালুকের গল্প শুনতে চায়। শুক সারীকে খুঁজে ফেরে! আলোর পরিকে দেখবার জন্ম আকাশের পানে চোখ মেলে চেয়ে থাকে। পাতাল পুরীর বন্দিনী রাজকন্যার দুঃখে

তাদের দুই চক্ষু সমবেদনার জলভারে ছল ছল করে ওঠে। তাদের এই কিশোর কোমল কল্পনা-প্রবণ তরল মনের উপর এই সময় এমন অনেক কিছু শুভ ও সুন্দর অভিজ্ঞান মুদ্রিত ক'রে দেওয়া যেতে পারে, যা উত্তর কালে তাদের চরিত্র গঠনে বন্ধুর মত সহায়তা করবে এবং জীবনের ভবিষ্যৎ গতি-পথ সত্যের দিকে নির্দ্দেশ করে দেবে।

এই উদ্দেশ্যই শিশু সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

বর্ণ পরিচয়ের প্রথম মুখপাতেই সুকুমার মতি শিশুকে যদি 'সুষমা' বানান করতে তালব্য মূর্দ্ধাণ্য ও দন্ত্য এই ত্রিবিধ শ'কারের বিভ্রাটে পড়তে হয় এবং তদুপরি হ্রস্ব না দীর্ঘ উ'কার দিলে তবেই সুষমার 'সু' ঠিক সু হয়ে উঠবে না এই নিয়ে উদভ্রান্ত হ'তে হয়, দু'টো 'জ'য়ের যাঁতায় ঘুরে—দু'টো 'ণ'য়ের খোঁচা খেয়ে প্রতিপদে যদি তাকে কাঁদতে হয়, তাহ'লে এ দেশের শিশুদের কাছে পাঠশালাত' কারাগারের অধিক বিভীষিকা উৎপাদন করবেই, এ আর বিচিত্র কি? সুতরাং, শিশুদের জন্য এখন নূতন করে আমাদের এমন সরল ও সুখপাঠ্য বর্ণ পরিচয় লেখা চাই, যার আস্বাদ গ্রহণে তারা ভয় না পেয়ে, চকোলেট্ ও লজেঞ্জেসের অনুরূপ আসক্তি নিয়ে সমান আগ্রহেই অগ্রসর হবে। তাহ'লে আর কোনো অভিভাবককেই 'লেখা পড়া' তাঁর ছেলের পক্ষে 'বাঘ' হয়ে উঠেছে ব'লে আক্ষেপ করতে হবে না।

কি 'রূপ-কথায়', কি 'শিশু সাহিত্যে' কোথাও কখনো এমনতর কোনো ভূত প্রেতের গল্প থাকা উচিত নয় যা শিশুচিত্তকে ভীতবিহ্বল ক'রে ফেলে। ভয় প্রাণী মাত্রেরই একটা সহজাত দুর্ব্বলতা। এই ভয়কে জয় করাই মানুষের সাধনা হওয়া উচিত। শৈশব হ'তে শিশু যাতে 'অভীঃ' হ'তে শেখে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা চাই। সেকালে ভূতের ভয় থেকে শিশু চিত্তকে মুক্ত রাখবার জন্য তাদের এই মন্ত্র শেখানো হ'ত—

"ভূত আমার পুত, শাঁক চুন্নী আমার ঝী—
বুকে আছেন রাম লক্ষ্মণ—ভয়টা আমার কি?"

রূপকথার ভিতর দিয়ে তাদের এই বিশ্বাস উৎপাদন করা হ'ত যে ভূত প্রেত দৈত্য দানা প্রভৃতি আলৌকিক জীবেরা শক্তি-শালী মানুষের কাছে পরাজয় মেনে নিয়ে তার দাসত্ব স্বীকার করতো। ছেলেদের কাছে 'মনুষ্যত্বকে' যদি এইভাবে সকল দিক দিয়ে সবার বড় ক'রে তুলে ধরে নির্ভয় হ'তে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহ'লে সে ছেলেকে মানুষ হ'তেই হবে। শিব গড়তে আর বানর হবে না। ভয় মানুষের চরিত্রকে অত্যন্ত দুর্ব্বল করে দেয়। এই দুর্ব্বলতাই কাপুরুষতার নামান্তর। সুতরাং ঘোর অন্ধকারময় তিমির রাত্রির ভয়াবহ রহস্যের মধ্যে শিশু মনের যে একটা স্বাভাবিক গূঢ় আকর্ষণ আছে, শিশু সাহিত্যের কর্ত্তব্য নয় তাই নিয়ে কারবার করা। কিন্তু এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে আজকাল ছেলেদের জন্য রচিত একাধিক গল্পের বই ও মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় কাটতির প্রলোভনে এই অপকর্ম্মই করা হচ্ছে।

অনেকে মনে করেন শিশুসাহিত্য সৃষ্টি করা খুব সহজ কাজ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর চেয়ে বড় দায়িত্ব ও কঠিন কর্ত্তব্য আর নেই। সমস্ত জাতির চরিত্র গঠিত করে এই শিশু সাহিত্য। শৈশবে যে বীজ বপন করা হবে শিশুর মনে উত্তরকালে তাই অঙ্কুরিত হ'য়ে উঠবে তাদের জীবনে। যিনি দেশ জাতি সমাজ ও মনুষ্যত্বের উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত নন, শিশুমনস্তত্ত্বের সঙ্গে যাঁর নিবিড় পরিচয় নেই, শিশুর রসবোধের মাপকাঠি যাঁর অজানা, তেমন লোকের পক্ষে শিশু সাহিত্য রচনা করতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। যাঁরা শিক্ষিত যাঁরা চিন্তাশীল যাঁদের নিপুণ হস্ত সতত দক্ষতার সঙ্গে লেখনী পরিচালনায় সুপটু শিশু সাহিত্যে হাত দেওয়া তাঁদেরই সাজে। অপটু অশিক্ষিত লেখকের এ কাজ নয়। কারণ তাঁরা শুধু শিশুমনস্তত্ত্বেই অনভিজ্ঞ নন, শিশুর শিক্ষা বিষয়ক বৈজ্ঞানিক কোনো পদ্ধতি ও রচনা প্রণালী তাঁদের আয়ত্তের বাইরে। শিশুর বুদ্ধিবৃত্তি ও রসবোধের ক্রমবিকাশ এবং তদনুকুল জ্ঞান ও শিক্ষার স্তরভেদ অনুসারে শিশু সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যায় সম্বন্ধে যাঁরা একান্ত অজ্ঞ শিশু সাহিত্য রচনার পক্ষে তাঁরা সম্পূর্ণ অযোগ্য। এই জন্যই শিশু সাহিত্যের নামে আজকাল এখানে যা চলছে তার অধিকাংশই নিছক আবর্জ্জনা মাত্র। এ সব নির্ব্বিচারে শিশুদের হাতে তুলে দেওয়া কোনো অভিভাবকেরই উচিত নয়।

য়ুরোপ ও আমেরিকার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এদেশে অধুনা শিশু পাঠাগার স্থাপনা সুরু হ'য়েছে। যদিও আমাদের এখানে ঠিক পাঠাগার খোলা যেতে পারে এমনতর শিশু সাহিত্যের প্রাচুর্য্য দেখা দেয়নি, ইংরাজ ও মার্কিনের কাছে এ জন্য আমাদের হাত পাততেই হবে, তবু, সদ্দৃষ্টান্তের এই সাধু অনুসরণ প্রশংসনীয়ই বলতে হবে। এই সব পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালকদের লক্ষ্য রাখা দরকার যাতে বিভিন্ন বয়সের শিশুদের পাঠোপযোগী বিভিন্ন স্তরের পুস্তকাদি সংগ্রহ ক'রে রাখা হয় এবং পর্য্যায় ভেদে সতর্কতার সঙ্গে তা গ্রন্থাগারের শিশু-সভ্য শ্রেণীর মধ্যে বিভাগ ক'রে দেওয়া হয়।

ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর গল্পে মনোযোগ দেবার বয়স যে ছেলে উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে তাকে আর রূপকথা দিয়ে ভোলানো উচিত নয়। তার বুদ্ধি ও কল্পনাশক্তি তখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উজ্জ্বল ও পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, এই সময় তাকে গল্পচ্ছলে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বীরত্ব গাথা এবং মহাপুরুষদের মহত্ত্বের কাহিনী জানতে দেওয়া চাই। দেশ-বিদেশের প্রাকৃতিক ভৌগলিক ও অন্যান্য নানা পরিচয় চিত্তাকর্ষক ভ্রমণ কাহিনীর ভিতর দিয়ে শেখাতে হবে। বিবিধ বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন ও আবিষ্কার সম্বন্ধে তাদের জানবার কৌতূহল জাগ্রত করে তোলা উচিত। জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষ যারা তাদের জীবনী ও চরিত্র নিয়ে ছেলেদের আলোচনা করার সুযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। শিশু পাঠাগারের কর্তৃপক্ষদের কেবলমাত্র শিশু সাহিত্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করলেই তাঁদের কর্ত্তব্য শেষ করা হবে না। চলচ্চিত্র অথবা অভাবে ম্যাজিকলণ্ঠনের সাহায্যে মাঝে মাঝে তাদের আনন্দবর্দ্ধনের সঙ্গে সঙ্গে নব নব জ্ঞানার্জ্জনের ব্যবস্থা করতে হবে। কখনো কখনো বা গ্রন্থাগারের শিশু সভ্যদের নিয়ে শিশুদের উপযোগী নাটকের অভিনয় আয়োজন করতে হবে। এর ফলে তারা ইতিহাস বা পুরাণোক্ত মহাপুরুষদের জীবনী ও কার্য্য সম্বন্ধে হাতে কলমে প্রত্যক্ষ ভাবে অনেক কিছু জ্ঞান লাভ করতে পারবে। তাছাড়া অভিনয়ের অনুষ্ঠান উপলক্ষে নৃত্য গীত-বাদ্য প্রভৃতি ললিতকলার প্রতি তাদের একটা স্বতঃস্ফূর্ত্ত অনুরাগ জন্মাবে। দৃশ্যপট আঁকা ও রঙ্গমঞ্চ সাজানো নিয়ে চিত্রবিদ্যা ও শোভা সংরচনের প্রতি তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হবে। পোষাক পরিচ্ছদ নির্ব্বাচন নিয়ে প্রাচীন যুগ ও তৎকালীন মানুষদের জীবনযাত্রার প্রথা সম্বন্ধে কতকটা জ্ঞানলাভ হবে। মাঝে মাঝে তাদের ডেকে নূতন কোনো ভালো বই বা প্রসিদ্ধ কোনো পুরাতন বই পড়ে শোনানো ও বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা, রচনা-প্রতিযোগিতা, সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা, শিল্প-প্রতিযোগিতা এবং ক্রীড়া কৌশল ব্যায়াম ও শক্তি প্রতিযোগীতা প্রভৃতি কল্যাণকর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা চাই।

শিশুপাঠাগারের সঙ্গে ছেলেদের জন্য গ্রামে গ্রামে ছোটখাটো এক একটি 'মিউজিয়ম' প্রতিষ্ঠা করতে পারলে খুবই ভাল হয়। শিক্ষিত জগতে ছেলেদের আজকাল এই মিউজিয়মের সাহায্যে খেলাধুলা ও আমোদপ্রমোদের ভিতর দিয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হ'য়েছে। এতে বিদ্যালয়ের বিভীষিকা ও গুরুমশা'য়ের আতঙ্ক থাকে না ব'লে ছেলেরা সহজেই মনের আনন্দে অনেক কিছু শিখতে পারে। তাদের সেখানে ইচ্ছামত হাতে কলমেও কাজ করতে দেওয়া হয়। কেউ গাড়ী তৈরি করে, কেউ বাড়ী তৈরি করে, কেউ মূর্ত্তি গড়ে, কেউ কাটা ছবি নিয়ে জোড়া দেয়, কেউ ঘড়ীর কলকব্জা খুলে আবার বসায়, কেউ ইঞ্জিন চালায়, কেউ বন্দুক চালায় এমনি ক'রে তারা খেলার ছলে নানা প্রয়োজনীয় বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে।

শরীর-চর্চ্চা ব্যায়াম ও স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি এ দেশের ছেলে, সবচেয়ে বেশী মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে। এখানে এই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যাপারটার দিকে দেখি আমাদের সবচেয়ে বেশী অমনোযোগ ও অবহেলা। ফলে আমাদের ছেলেরা হয়ত' লেখাপড়া শেখে অনেকেই কিন্তু স্বাস্থ্যবান ও শক্তিমান হ'য়ে উঠতে পারে না কেউ।

এমনিতর আদর্শ শিশুপাঠাগার যেদিন এ দেশের গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠবে সেদিন বাঙ্গালী জাতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হ'য়ে দেখা দেবে।

শ্রীনরেন্দ্র নাথ দেব

শ্রীযুক্ত তিনকড়ি দত্তর ব্যবস্থায় বাঁশবেড়িয়ায় রবি-বাসরের অধিবেশনে পঠিত।

প্রাক্‌প্রগতি*

শ্রীঅপরাজিতা দেবী

শুনেছিনু নারী প্রাচীন ভারতে
অশ্ববল্‌গা ধরেছিল রথে—
দ্রুত পলাইতে প্রিয়তম সহ।
কাব্যে কেবা তা' রচে নাই, কহ?
পদগতি নয়, রথগতিশীলা
আজো বহু কবি গাহে সেই লীলা।
মণিপুরসুতা দুহিতা রাজার—
করে লয়ে ধনু পিঠে তূণভার,
পুরুষের বেশে ছুটেছে যখন,
গজগামিনী কি ছিল সে তখন?
পদগতিবেগ কে মেপেছে তার,—
ঘনবনে যবে খুঁজেছে শিকার?—

অতীতে একদা ধনু তরবারী
ধরেছে শুনেছি একাধিক নারী!
অশ্বপৃষ্ঠে ছুটিয়াছে বেগে
গেয়েছে নেচেছে সারানিশি জেগে।
দেখেছি তাদের কুঞ্জগলিতে
ক্ষিপ্রচরণে একাকী চলিতে।
দুর্য্যোগরাতে গভীর আঁধারে
কত সাহসিকা গেছে অভিসারে।
মরালগামিনী,—হলে প্রয়োজন
মৃগগামিনী কি হন্‌নি তখন?
গৌড়ে না হোক্, আর্য্যাবর্ত্তে—
হেন বীর নারী ছিল এ মর্ত্ত্যে।

সেই গজ বাজি রথ-পথ যুগে
কবি কালিদাসও গিয়েছেন ভুগে।
নূপুরহীনার চপল চরণ
করেছে সমানই হৃদয় হরণ।
অপ্সরী চেয়ে তাপসীরা তাই
তাঁহার কাব্যে ছোটো হন্ নাই।
নারীপ্রগতির প্রার্থিত দিনে
ধরে যদি গাড়ী, ছুটে পথ চিনে
কোনো আধুনিকা নবীনা তরুণী,
কেন বিস্ময় সে ঘটনা শুনি?···
পাদুকামুখর চরণ শব্দ
করেনি তো কোনো কবিকে জব্দ?···

চুপি চুপি শোনো বলি কানে কানে
জাগায় কাব্য অনুভূতি প্রাণে
রম্য মধুর যাদের সঙ্গ,
তাদের কোমল চরণভঙ্গ
নূপুর ত্যজিয়া, হল সম্প্রতি
পাদুকামুখর,—তাহে কী বা ক্ষতি?
স্নিগ্ধচ্ছায়া সে প্রাচীন দিবা
ছিলনা রবির খর-কর-বিভা!
মেঘদূত তাই রচিত অতীতে
বিদ্যুৎদূত রচিবেন গীতে—
আধুনিকাদের আধুনিক কবি,—
আলোক দীপ্ত উজ্জ্বল রবি!

* রবীন্দ্রনাথের 'নারীপ্রগতি' পাঠে।

বিরহী

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম্‌-এ

১

সন্ধ্যা হয় হয়। পটুয়াটোলার মেসের বাবুরা প্রায় সবাই কর্ম্মস্থল হইতে মেসে ফিরিয়াছেন এবং বৈকালিক জলযোগের পর পুনরায় সান্ধ্য ভ্রমণের উদ্যোগ করিতেছেন।

সুবেশ ভট্টাচার্য্য এই মেসেরই বোর্ডার, বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ, সওদাগরী অফিসের কেরাণী—অথচ বিবাহ হয় নাই। সুতরাং তাহার কাব্য লিখিবার বাতিক আছে। অফিস হইতে ফিরিয়া সে প্রতি সন্ধ্যায় মেসের ছাদে পায়চারী করিয়া inspiration সংগ্রহ করে এবং রাত্রে খাতাকলম লইয়া বসিয়া যায়। মেসের অন্য বোর্ডারদের সঙ্গে তাহার মেলামেশা খুব বেশী নাই কিন্তু কেহ কেহ উপযাচক হইয়া তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে ছাড়ে না।

বৈকালিক চা পান শেষ করিয়া সুবেশ ছাদে উঠিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে এমন সময় তাহার রুম-মেট সমর বোস ঘরে ঢুকিয়া কহিল—মিষ্টার ভট্‌চারিয়া ওপরে যাচ্ছ নাকি? সামনের বাড়ীতে আজ ভাড়াটে এসেছে হে।

ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া সুবেশ কহিল—তাতে আমার কি?

সহাস্যে সমর কহিল—এ পেয়ার অব তরুণী। খুব অপটুডেট্ বলে মনে হ'লো। ছাদে যাচ্ছ কিনা—তাই সাবধান করে দিলাম।

এ রকম রসিকতা সুবেশ পছন্দ করিত না—সে মুখ গম্ভীর করিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল।

একটি ঘরে দুইটি সিট্ মাত্র। রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর আলো নিবাইয়া যে যার বিছানায় শুইয়াছে। সমরের সবে মাত্র নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছে—এমন সময় সহসা তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

—হুস্, হুস্!

সমর দেখিতে পাইল পূবের জানালা দিয়া ত্রয়োদশীর জ্যোৎস্না বিছানায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং সে হাত দিয়া বিছানার চাদর ঝাড়িতে ঝাড়িতে চাপা গলায় বলিতেছে—হুস্, হুস্।

সমর উঠিয়া বসিয়া কহিল—ও কি হে, মিষ্টার ভট্‌চারিয়া, ও কি হচ্ছে?

সশব্দে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সুবেশ কহিল—এসব উৎপাত আমার কাছে কেন বলতে পার মিষ্টার বোস? এর তো এ স্থান নয়।

সুবেশের কণ্ঠস্বরের অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখিয়া সমর বিস্মিত হইল, কহিল—ব্যাপার কি হে?

—আচ্ছা বল দেখি ভাই, চাঁদের আলোর কি এই উপযুক্ত স্থান? কি প্রয়োজন তার এখানে?

হো—হো করিয়া হাসিয়া সমর কহিল তাই বুঝি হুস্ হুস্ করে চাঁদের আলো তাড়ানো হচ্ছে। সাবাস্—originality আছে।

পরদিন সংবাদটা মেসের বোর্ডারদের মধ্যে প্রচার হইল। কিন্তু দিনের আলোকে সুবেশ অতিরিক্ত গম্ভীর হইয়া যায়, ঠাট্টা বিদ্রূপে তাহার ভ্রুকুঞ্চিত হইয়া উঠে বটে—কিন্তু কোনও উত্তরই সে প্রদান করে না। চা পান করিয়াই সে কবিতা লিখিতে বসে—সেদিনও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। কিন্তু একটি লাইনের পর আর তাহার লেখা ঘটিয়া উঠিল না। এক একজন 'হুস্' 'হুস্' শব্দ করিতে করিতে তাহার কক্ষে প্রবেশ করে এবং 'হুস্' 'হুস্' শব্দ করিতে করিতে বাহির হইয়া যায়। চলন্ত ট্রেণের ইঞ্জিনে বসিয়া যদি সুবেশের কবিতা লিখিবার অভ্যাস থাকিত তাহা হইলেও হয় তো সে আজ অগ্রসর হইতে পারিত। কিন্তু সে অভ্যাস যখন তাহার নাই—তখন সে মুখমণ্ডল যথাসম্ভব গম্ভীর এবং যুগল ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া কলমের ডগা দংশন করিতে লাগিল মাত্র। রাত্রে

তাহার আবেগ যে এই বর্ব্বররা বুঝিতে পারে নাই, বুঝিবার চেষ্টাও করে নাই—ইহা ভাবিতে মন তাহার পীড়িত হইয়া উঠিল। তাহার জীবনের ফিলজফি যে কত উচ্চ, কত মহান তাহা সে কি করিয়া ব্যক্ত করিবে? কি করিয়া সে বুঝাইবে—তাহার প্রেমিক মন কি চাহিয়া দিনরাত গুমরিয়া মরিতেছে? ইহারা ভাবে সে বোধ হয় নারী-দেহের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে—বিবাহের জন্য লালায়িত হইয়াছে—কিন্তু ইহাদের ভুল কি তাহার সাধনা দিয়া ভাঙ্গিতে পারিবে না? সে কি তাহাদের কার্য্যের দ্বারা বুঝাইতে পারিবে না যে পৃথিবীর কোনও নারীই তাহাকে তৃপ্তি দিতে পারিবে না—যদি না সে স্বেচ্ছায় তাহাকে বরণ করিয়া লয়। নারীর ভালবাসা তাহার চাই বটে কিন্তু জুলুম জবরদস্তি করিয়া নয়—সে তাহার সাধনা দ্বারা নারীর চিত্ত জয় করিবে—নারী উপযাচিকা হইয়া তাহাকে বরমাল্য প্রদান করিবে।

সেদিন অফিস হইতে সুবেশ একটু তাড়াতাড়ি মেসে ফিরিল এবং কোনও রকমে বৈকালিক চা-পান শেষ করিয়া ফিটফাট হইয়া রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা' হাতে লইয়া ছাদে উঠিল। হাতে বই লইয়া পায়চারি করিতে করিতে সে ধীর মৃদুস্বরে কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিল।

বর্ষার অপরাহ্ণ। পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ আকাশে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। মেঘের অন্তরাল হইতে দিনান্তের সূর্য্য লুকোচুরি খেলিতেছে। বর্ষার মেঘের পানে চাহিয়া সুবেশ পড়িতে লাগিল:—

"দিনের আলো নিবে এল, সূর্য্যি ডোবে ডোবে।
আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে চাঁদের লোভে লোভে।
মেঘের উপর মেঘ করেছে, রঙের উপর রঙ।
মন্দিরেতে কাঁসর ঘণ্টা বাজল ঠং ঠং।
ওপারেতে বিষ্টি এল, ঝাপসা গাছপালা।
এ পারেতে মেঘের মাথায় এক শ' মাণিক জ্বালা।
বাদলা হাওয়ায় মনে পড়ে ছেলেবেলার গান—
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে'য় এল বান।"

পড়িতে পড়িতে সুবেশের ছোটবেলাকার স্মৃতি মনের কোণে ভাসিয়া উঠিল। শৈশবে কতদিন সে ধারাবর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে হাত তালি দিতে দিতে ছড়া কাটিয়াছে—"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান। শিব ঠাকুরের বিয়ে হ'ল তিনটি কন্যা দান।"

শিব ঠাকুরের সৌভাগ্যে তাহার সেই অল্প বয়সেই হিংসা হইত। একটি নয়—দুইটি নয়—তিন তিনটি কন্যা তিনি দান পাইলেন—ইহা তাহার নিকট পরম লাভজনক বলিয়া মনে হইত। তাহার স্পষ্ট মনে পড়ে একদিন তাহার খেলার সঙ্গিনী—রেবাকে সে ঐটুকু বয়সেই মনের আবেগে বলিয়া ফেলিয়াছিল—রেবা, তুই আমাকে বিয়ে করবি?

রেবা ভ্রূকুটি করিয়া বলিয়াছিল—ধ্যেৎ! তাহার কথা শুনিয়া সুবেশের মন নিতান্ত দমিয়া গিয়াছিল; এমন কি মনের কষ্টে সে তাহার সঙ্গে সাত আট দিন কথা পর্য্যন্ত বলিতে পারে নাই।

তাহার পর সে ক্রমশঃ বড় হইয়াছে, তিন তিনবার ম্যাট্রিকুলেসন ফেল করিবার পর পাশ করিয়াছে; খাতা বোঝাই করিয়া প্রেমের কবিতা লিখিয়াছে; পল্লীতে, সহরে, রাস্তায়, ঘাটে কত তরুণীকে দেখিয়া সে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে—কতদিন উৎসুকচিত্তে তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে—কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। প্রেম নিবেদন করিবার সুযোগ সে কাহারও কাছে কোনও দিন পায় নাই।

সহসা সুবেশ পাশের বাড়ীর ছাদে দৃষ্টিপাত করিতেই বুকটা তাহার ধ্বক করিয়া উঠিল—একটি নয়, দুই দুইটি সুসজ্জিতা তরুণী ছাদের উপর পায়চারি করিতেছে এবং মাঝে মাঝে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিতেছে। সুবেশের বুক দ্রুত তালে নাচিতে লাগিল। এক একবার আড়চোখে সে ঐ দিকে চায়—আর একবার আকাশের পুঞ্জীভূত মেঘের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে থাকে। এমনি ভাবে কিছুক্ষণ কাটিবার পর সে চাহিয়া দেখিল—পাশের বাড়ীর ছাদ শূন্য। সশব্দে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে ধীরে অন্যমনস্ক ভাবে ছাদ হইতে নামিয়া আসিল এবং নিজের ঘরে আসিয়া আলো জ্বালিয়া খাতা কলম লইয়া কবিতা লিখিতে বসিল।

কিন্তু কবিতা-সরস্বতী আজ অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল—দুইটির মধ্যে কোনটির

তাহার মানসী প্রতিমার সাথে অবিকল মিল আছে। দুইটিরই কি? দুধে আলতা রং, লাল টুকটুকে ঠোঁট, যুগ্ম ভুরু, ঘনকৃষ্ণ কবরীর খোঁপা—এতো দুজনেরই সমান। জাফরাণি রংয়ের সাড়ি পরিহিতা তরুণীটিই বয়সে বড়—আসমানি রংয়ের সাড়িতে সজ্জিতা তরুণীটি নিশ্চয় তাহার ছোট বোন। দুইজনের মুখ চোখ, গায়ের রংয়ের পার্থক্য সে ধরিতে পারে নাই। এইটুকু সে বুঝিয়াছে—বড়টি ছোট অপেক্ষা ঈষৎ স্থূলকায়া—ছোটটি তন্বী কিশোরী। বড়টি বোধ হয় ষোড়শী—ছোটটি চতুর্দ্দশী হইবে নিশ্চয়।

বিপদ হইল—কোনটিকে সে প্রিয়রূপে মনোনীত করিবে। বড়টির হয়তো বিবাহ হইয়া গিয়াছে—সুতরাং সে ছোটটিকে মনোনীত করাই অবশেষে সাব্যস্ত করিল এবং একটা মীমাংসা হইয়া যাওয়ায় তাহার মনটাও অনেক হাল্কা হইয়া গেল। সে মনের উৎসাহে শিস দিতে লাগিল—অনেকদিন তাহার মনে এমন স্ফূর্ত্তির উদয় হয় নাই।

সমর বোস ঘরে ঢুকিয়া বিস্মিত হইয়া কহিল—এত স্ফূর্ত্তি যে মিষ্টার ভট্‌চারিয়া?

সুবেশ হাসিয়া কহিল—কেন আমার কি স্ফূর্ত্তি করবার বয়স নেই?

—আরে বাপরে! তোমার বয়স নেই? দিনরাত মস্‌গুল হয়ে থাক—এ তো জানি। কিন্তু বাহিরে এ আমেজ কেন? ও বুঝেছি—এ পেয়ার অব তরুণী। হাঃ হাঃ হাঃ!

সুবেশ গম্ভীর হইয়া গেল। গম্ভীর স্বরে কহিল—দেখ মিষ্টার বোস—ভদ্রলোকের মেয়েদের সম্বন্ধে একটু সম্ভ্রম রেখে কথা ব'লো। হয় তো তাঁরা অপরের পরিণীতাও হতে পারেন।

আবার অট্টহাস্য করিয়া সমর কহিল—শ্লীলতার হানি কোথায় করলাম মিষ্টার ভট্‌চারিয়া। তুমি যে ছাদে উঠে দিব্বি দৃষ্টিবাণ মেরে তাদের ঘায়েল করে এলে—তাতে কিছু হলো না—আর আমি এ পেয়ার অব তরুণী বলতেই চটে লাল!

গম্ভীর স্বরে সুবেশ কহিল—দেখ মিষ্টার বোস, ওঁদের তুমি তরুণী বল তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই, কিন্তু ঐ 'পেয়ার' কথাটাতেই আমার খারাপ লাগে। ওতে যেন অশিষ্টতার গন্ধ আছে। কিন্তু যাক্। এ নিয়ে আমি তোমার সাথে তর্ক করবো না। ভদ্রলোকের মেয়েদের নিয়ে আলাপ আলোচনা করা আমি দূষণীয় মনে করি। এই বলিয়া সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল।

কিছুক্ষণ পর সমর কি ভাবিয়া কহিল—ওহে, ওদের নাম জানতো?

—উঁহু।

সমর সহসা কহিল—আচ্ছা মালবিকা আর মঞ্জুলিকা এই দুইটি নামের মধ্যে কোনটি তোমার বেশী প্রিয় মিষ্টার ভট্‌চারিয়া?

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সুবেশ কহিল—মঞ্জুলিকা নামটি বেশ—অবশ্য মালবিকাও মন্দ নয়।

সুবেশের পিঠ চাপড়াইয়া দিয়া সমর কহিল—Right you are. তবে চেষ্টা দেখ হে মিষ্টার ভট্‌চারিয়া। বড়টির নাম মালবিকা—ওদিকে বোধ হয় তেমন সুবিধে হবে না—শুনছি তার বিয়ে নাকি ঠিক হয়ে গিয়েছে। ছোটটি মঞ্জুলিকা—দেখেছ তো? বিদ্যাপতির কিশোরী বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মেলে—শৈশব যৌবন দুঁহু মেলি গেল।

সুবেশ শুইয়াছিল—তড়াক করিয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল—সত্যি ছোটটির নাম মঞ্জুলিকা?

সহাস্যে সমর কহিল—মিষ্টার ভট্‌চারিয়া—আজ বোধ চতুর্দ্দশী, জানলাটা বন্ধ করে রেখো। চাঁদের আলোর উৎপাত যেন আজও আবার সহ্য করতে না হয়।

গম্ভীর স্বরে 'হু' বলিয়া আবার সুবেশ শয্যাশায়ী হইল।

২

দিন সাত আট পরে মেসের লেটার বক্সে একখানি গোলাপী রঙের এনভেলাপে সুবেশ ভট্টাচার্য্যের নামে চিঠি দেখা গেল। চিঠিখানি লেটার বক্স হইতে সন্তর্পণে তুলিয়া সুবেশ নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। খামে চিঠি—তাহার নামে? তাহার উপর রঙ্গিন খাম! সুবেশের বুকটা দুরু দুরু করিতে লাগিল।

সুবেশ চিঠিখানি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কিছুক্ষণ দেখিল। উপরে স্পষ্টাক্ষরে ইংরাজীতে লেখা—বাবু সুবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। গোটা গোটা অক্ষর দেখিয়া মনে হয়—লেডিজ্ হ্যাণ্ডরাইটিং।

কম্পিত বক্ষে চিঠিখানি খুলিতেই মৃদু সুগন্ধে সুরেশের মন পুলকিত হইয়া উঠিল। সে নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া চিঠিখানি পড়িল। একবার পড়িয়া সে তৃপ্তি পাইল না—সে বারংবার পড়িতে লাগিল। চিঠিতে লেখা ছিল,—

সুরেশবাবু, আপনার নামটি কার দেওয়া? তা যারই দেওয়া হোক্—ভারী মিষ্টি আপনার নাম। নামটির মত—হৃদয়খানাও মধুর কিনা আমার জান্‌তে এমন ইচ্ছে হয়।

চিঠিখানি খুলবার পর নিশ্চয়ই আপনি যে আপনাকে চিঠি লিখেছে তার নামটা দেখে নিয়েছেন—বোধ করি চিন্‌তেও আপনার বিলম্ব হয়নি। আমি নিশ্চয় জানি—আপনার নামের আমি যেমন তারিপ করছি, আমার 'মঞ্জুলিকা' নামেরও আপনি তেম্‌নি তারিপ করবেন। কেমন আমার কথা সত্যি নয়?

আচ্ছা, ছাদে উঠে পায়চারি করতে করতে 'চয়নিকা' না পড়লেই কি নয়? আপনি নিশ্চয় কবি—হয়তো সুযোগ পেলে রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বড় কবি হতে পারবেন। এখন থেকে আপনার লেখার খাতাখানি নিয়েই পায়চারি করবেন—আর মাঝে মাঝে আপনার দু'একটা কবিতা পড়বেন। শুনতে পাব নিশ্চয়ই।

দিদি মুখপুড়ীর ঠাট্টার জ্বালায় আর আমি বাঁচিনে। সে বলে—আমি নাকি আপনার প্রেমে পড়েছি প্রথম দর্শনেই। সত্যই কি আপনাকে ভালবেসে ফেললুম? কি জানি। কিন্তু আপনার নামটি আমার বেশ লাগে।

আপনি নিশ্চয়ই আমাকে প্রগল্‌ভা ভাবছেন। তা ভাবুন। মেয়েদের এমন একটা সময় আসে যখন তার একজনের কাছে প্রগল্‌ভা হতেই হবে। তা না হয় আপনার কাছেই হলুম।

আচ্ছা, আমাদের দুটি বোনের কোনটিকে আপনার বেশী পছন্দ? দিদি বলেন—কিন্তু দিদি যা বলেন তা শুনলে আপনি সন্তুষ্ট হবেন না, তাই আর লিখলুম না। কিন্তু সত্যিই কি আমার উপরেই আপনার নজর বেশী?

আমার এই চিঠিখানি কাউকে দেখাবেন না। আর একটা অনুরোধ—আমাকে চিঠি লিখবেন না। আমার বাবা বড্ড কড়া লোক—মার্চেন্ট অফিসের বড়বাবু কিনা। বাবা জানলে—আমাকে জ্যান্তে পুঁতে ফেলবেন—আপনারও বিপদ হতে পারে।

তার চেয়ে আমি একটা উপায় বাতলে দিই। আপনি একখানা খাতায় আমার চিঠির জবাব লিখে রাখবেন। যখনই সুবিধে হবে—আমি আপনাকে চিঠি দেব। আমার প্রত্যেক চিঠির উত্তর আপনার খাতায় কিন্তু লেখা থাকবে। তারপর যখন আমাদের মিলন হবার আর কোনও বাধা থাকবে না—তখন আমি সেগুলো পড়ে দেখবো। কেমন, এ যুক্তি আপনার পছন্দ হলো তো?

স্কুল থেকে মাথা ধরার ছল করে ছুটোয় ফিরছি। দিদির ক্লাস চারটা অবধি। একা একা আজ ছাদে উঠবো—বেলা তিনটায়। আপনি যদি সে সময় আসতেন। কিন্তু অফিস যে! মার্চেন্ট অফিসের কেরাণী তো আপনি? কোনও ছল করে আসতে পারেন না? এলে কিন্তু ভারী মজা হ'তো! কিন্তু খবরদার—কথা বলবার চেষ্টা করবেন না। কেউ যদি দেখে ফেলে—কেলেঙ্কারী হবে নিশ্চয়। কেন, দৃষ্টি কি কথার চাইতে কম মধুর? চোখের দৃষ্টিতেই তো মধু ঝরে বেশী!

অনেক বকেছি। কিন্তু, তবু মনে হচ্ছে আপনি আমার ওপর অসন্তুষ্ট হতে পারবেন না। আজকের মত শেষ করলুম।

মঞ্জুলিকা

সুরেশের মনে হইতে লাগিল—একবার রুদ্ধ কক্ষের মধ্যে নৃত্য করিয়া লয়। আঃ, এতদিনের সাধনা তাহার সফল হইল? নারীর ভালবাসা অযাচিত ভাবে তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া গেল? শুধু কি নারী—মঞ্জুলিকা যে রমণী-রত্ন!

তিনটার সময় আসিতে পারিবে কি? আজ যা কাজের চাপ। লেজার পোষ্টিং অপটুডেট্ করিতে অনেক বাকি। বিপিনবাবু শাসাইয়াছেন—আজকের মধ্যে হাতের কাজ শেষ করিতে না পারিলে বড়বাবুর কাছে রিপোর্ট করিবেন। ধুত্তোর ছাই! পরের চাকুরী কি মানুষে করে? মন তাহার অত্যন্ত দমিয়া গেল।

—আচ্ছা, আজ যদি সে অফিসেই না যায়? কি আর হইবে—একদিনের মাহিনা কাটা যাইবে। কিন্তু বড়বাবুর

মেজাজ বড় সুবিধে নয়। না জানাইয়া কামাই করিলে হয়তো বা ডিসমিসই করিয়া দেয়। বিচিত্র কি? তার কোন এক সম্বন্ধীর ছেলে নাকি এখনও বেকার বসিয়া আছে। না, ওসব ফ্যাসাদে কাজ নেই।

একখানা খাতা আজ তাহাকে কিনিয়া আনিতেই হইবে। মঞ্জুলিকার যুক্তি চমৎকার। তার চিঠির জবাব খাতায় লিখিয়া রাখিব—সুযোগ হইলে সে দেখিবে। চমৎকার বুদ্ধি মেয়েটার। কোনও রকমে ইহাকে পাইলে সে মাথার মণি করিয়া রাখিতে পারে।

কল্পনা আর বেশীদুর অগ্রসর হইতে পারিল না—সহসা দুমদুম্ করিয়া দ্বারে করাঘাত হইতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সমর বোসের আওয়াজ শোনা গেল।

ত্বরিত হস্তে সুবেশ চিঠিখানি বিছানার তলায় গুঁজিয়া রাখিয়া ধীরে দরজা খুলিয়া দিল। সমর ঘরে ঢুকিয়া কহিল—ব্যাপারখানা কি হে? সূর্য্যের আলোও অসহ্য হয়ে উঠলো নাকি?

সুবেশ সহাস্য মুখে কহিল—না হে না—এই একটুখানি।

—প্রণয় চর্চ্চা? প্রণয়িনীর প্রতি প্রেম নিবেদন? নায়িকার রূপ বর্ণনায় কি খাতার পৃষ্ঠা ভরে উঠ্‌লো?

সুবেশ অন্যদিন হইলে বিরক্তি বোধ করিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিত—কিন্তু আজ সে জয়ী বীর। ইচ্ছা করিলে সে তাহার কৃতিত্ব সমর বোসকে দেখাইয়া দিতে পারে। নারীর প্রণয় সে লাভ করিয়াছে—তাহার সারা জীবনের সাধনায় সে সিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

সমর কহিল—ব্যাপার কি হে? আজ কি অফিসও নেই? ঘড়িতে যে দশটা বাজে।

ঘড়ির দিকে চাহিয়া সে তড়াক করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। হাসিভরা মুখে সে সমরকে কহিল—তাইতো হে মিষ্টার বোস, সত্যিই আজ আমার খেয়াল নেই।

৩

সন্ধ্যার পর সুবেশ একখানি সুদৃশ্য মোটা খাতা লইয়া লিখিতে বসিয়াছিল। তাহার মুখের ভাব গম্ভীর—ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস পড়িতেছে। চোখের ভাব দেখিয়া মনে হয়—দুই চারি ফোঁটা অশ্রুবর্ষণও হইয়া গিয়াছে।

খাতার প্রথম পৃষ্ঠায় লিখিল—

উৎসর্গ
শ্রীমতী মঞ্জুলিকা দেবী
শ্রীকরকমলে—

তারপর সে লিখিতে লাগিল—

প্রথম লিপি

প্রাণপ্রিয়া আমার,

তোমার চিঠি আজ পেয়েছি। স্বর্গের পারিজাত মর্ত্ত্যভূমির কেউ যদি হাতে পায়—তার কি আনন্দ হয় আমি জানিনা—কিন্তু তোমার চিঠি পেয়ে আমার মনে হল—এমন আনন্দ বুঝি স্বর্গের অধীশ্বর হলেও পেতুম না। কিন্তু আমি কি জানি—আমার আনন্দ এমন ক্ষণস্থায়ী হবে! ছোটবেলা থেকে আশা নিরাশার অনেক দ্বন্দ্ব সয়ে এসেছি, উপেক্ষা অনাদর অনেক পেয়েছি—কিন্তু আজ তুমি আমাকে এ কি করলে? আমাকে এক নিমেষে স্বর্গের তোরণ দ্বারে নিয়ে গিয়ে—আবার এ কোথায় নামিয়ে আন্‌লে? গাছে তুলে দিয়ে মই টেনে নেওয়া বলে বাংলা ভাষায় একটা কথা আছে—এ যে তাই হ'লো। ওগো আমার মানসী, এতদিন মনে মনে তোমাকেই ধ্যান করেছি। যখন তোমাকে চোখের দেখাও দেখিনি—তখনও যে ঠিক তোমাকেই মনে মনে গড়ে তুলেছিলুম। যদি বা আমার মানসীকে বাস্তবরূপেই দেখতে পেলুম—তবে কেন সে এমন অকরুণ হ'লো?

আমার মনের ভাব যে আজ কি হয়েছে—সে কি তোমাকে বোঝাতে পারবো? কি যে অসহ্য জ্বালায় জ্বলছি—কি করে তা তোমায় জানাব?

ওগো পাষাণী—কেন তুমি আশা দিয়েছিলে? অফিস থেকে যে কি লাঞ্ছনা ভোগ করে আজ দুটোর সময় ছুটি নিয়েছি—সে আমার ভগবান জানেন। বিপিন বাবুর হাতে পায়ে ধরেও যখন তাঁর দয়া হ'লো না—বলির পাঁঠার মত বড়বাবুর কাছে গেলুম। মিথ্যে কথা বলতে হয়েছিল বৈ কি—কিন্তু তোমার জন্য শত পাপ করতেও আমার বাধে না—সামান্য মিথ্যে কথায় কি আসে যায়। বল্লুম—সার জ্বর হয়েছে—আজকের কয়েক ঘণ্টার মত ছুটি দিন।

বড়বাবু মুখ খিঁচিয়ে বল্লেন—জ্বর হয়েছে—তাতে ছুটি কিসের হে ছোক্‌রা? কেন চেয়ারে বসে তুকলম লেখা যায় না?

আমার চোখ ছল ছল করছিল—বল্লুম—সার, বড্ড মাথা ঘুরছে—।

বড়বাবু তেম্‌নি সুরে বল্লেন—বটে! মাসের মধ্যে কবার জ্বর হয়েছে তোমার?

আমি কাঁদো কাঁদো সুরে বল্লুম—আমি তো কখনো অফিস কামাই করিনে সার।

বড়বাবু বল্লেন—কামাই করো না—কিন্তু লেজার পোষ্টিং আপ-টু-ডেট্ হয় না কেন হে? আবার শুনি অফিসে বসে কবিতা লেখাও চলে।

ভাবলুম—বড় বাবু অন্তর্যামী নাকি? তার পরেই মনে হলো বিপিনবাবু নিশ্চয় লাগিয়েছে। হাত জোড় করে বল্লুম—তুই দিনের মধ্যে সব ঠিক করে দেব সার। আজকের দিনটে দয়া করে—।

বড়বাবু আমার কান্নাভরা মুখের দিকে চেয়ে কি ভাবলেন, তারপর বল্লেন—আজকের মত যাও—কিন্তু মনে থাকে যেন ওসব কৈফিয়ৎ আর চলবে না।

বড়বাবুকে লম্বা নমস্কার করে বেরিয়ে এলুম। বিপিন-বাবুকে বলতেই তিনি গরম হয়ে বল্লেন—ঘোড়া ডিঙিয়ে তো ঘাস খেয়ে এলে—কিন্তু এর ফল তোমাকে পেতে হবে ভট্টাচাজ্যি তা বলে রাখছি।

কিন্তু মন তখন আমার পাখীর পালকের মত হাল্‌কা হয়ে গিয়েছে—বিপিনবাবুর শত গালাগালিও আমাকে কাবু করতে পারলে না।

অফিস থেকে বেরিয়ে মনে হলো—তোমার চিঠির কথা। মাথা ধরার ছল করে তুমি স্কুল থেকে ফিরবে—আমিও আর একটা ছল করে অফিস থেকে চলে এলুম। ভগবানের কাছে জানালুম—আমাদের এই ছলনা যেন তিনি তুজনার মনের ভাব বুঝে ক্ষমা করেন।

তারপর গেলাম দপ্তরীর দোকানে। অনেক ঘুরলুম কিন্তু ভাল একখানা খাতাও খুঁজে পাইনে। অনেক কষ্টে অনেক ঘুরে তবে তুটি টাকা খরচ করে এইখানা কিনেছি।

আজ যে ভাবে তোমাকে প্রথম চিঠি লিখ্‌বো বলে ভেবেছিলুম—তা' যে হ'লো না। আমার কল্পনার স্বর্গ কেন তুমি ভেঙ্গে দিলে মঞ্জুলিকা?

ছাদে উঠেছিলুম—তিনটেয়, আর নেমেছি সন্ধ্যে সাতটায়। তোমাদের ছাদের দিকে চেয়ে চেয়ে চোখ ঠিক্‌রে গিয়েছে—চোখ দিয়ে অজস্রধারে জল পড়েছে। কিন্তু ওগো হৃদয়হীনা পাষাণী মঞ্জুলিকা দেবী—তোমার ঐ সুধামাখা মুখখানি আজ কোথায় লুকিয়ে রাখলে? একি পরিহাস আমার সাথে? এম্‌নি করেই কি আমার তুর্ব্বল বুক ভেঙ্গে দিতে হয়। উঃ!

এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই সুরেশ নামিল—নিজের লেখাগুলি সে মনযোগ দিয়া কয়েকবার পড়িল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে মনে মনে বলিল—আজ এই পর্য্যন্তই থাক। লেখার শেষে তাহার নামটি লিখিয়া খাতাখানি বন্ধ করিল।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া সুরেশ মনের যাতনায় ছটফট করিতে লাগিল। হায়, একজন যদি ব্যথার ব্যথী থাকিত যাহাকে অকপটে মনের সব কথা খুলিয়া বলা যায়। সমর বোস তাহার রুম মেট, কিন্তু সে অত্যন্ত হাল্কা প্রকৃতির লোক—সব কথায় তার বিদ্রূপ। তাহার মনের ভাব কি জগতে কেউ বুঝিবে না?

সমর সেদিন কোনও ঠাট্টা বিদ্রূপ করিল না। বরং বিছানায় শুইবার কিছুক্ষণ পরে সে কোমলকণ্ঠে ডাকিল—মিষ্টার ভট্চারিয়া?

সুরেশ কহিল—কি?

—একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া গিয়া সুরেশ বলিল—বল।

—আজ তোমাকে এমন মন-মরা দেখ্‌ছি কেন? কি হয়েছে তোমার?

—কৈ কিছুই তো হয়নি ভাই!

সমর তেম্‌নি সহানুভূতি মাথা সুরে কহিল—মিষ্টার ভট্চারিয়া, অনেক সময় তোমাকে বিদ্রূপ করি বটে—কিন্তু তোমার প্রেমিক মনের উপর সত্যই আমার শ্রদ্ধা আছে।

সমর বোসের মুখে এমন দরদ মাথানো কথা যে সুরেশ শুনিতে পাইবে—ইহা সে কোনও দিন ভাবিতেও পারে

নাই। আজ তাহার মন কঠিন আঘাত পাইয়াছে—সমরের কথায় তাহার মন গলিয়া গেল, কহিল—মিষ্টার বোস, সত্যই আজ বড় কষ্ট পেয়েছি।

সমর কোমলকণ্ঠে কহিল, তোমার কষ্টের ভাগ কি আমি নিতে পারিনে, মিষ্টার ভট্‌চারিয়া?

সুবেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া বসিয়া কহিল—আচ্ছা, তোমাকে সব কথা বল্‌ছি। না, আমার মুখে বলবারও দরকার হবে না। এই বলিয়া তাহার বালিশের তলা হইতে রঙিন খামের চিঠিখানি বাহির করিয়া সুবেশের হাতে তুলিয়া দিল।

সুবেশ চিঠিখানি পড়িয়া গদ্‌গদস্বরে কহিল—মিষ্টার ভট্‌চারিয়া,—বড় ভাগ্যবান তুমি। তোমার মত ভাগ্য নিয়ে যদি আমি জন্মাতুম। সত্যি তোমার মর্য্যাদা আমরা বুঝতে পারিনি—তাই তোমাকে বিদ্রূপ করি।

সুবেশ ম্লান হাসিয়া কহিল—না মিষ্টার বোস, আমার মত ভাগ্যহীন এ সংসারে কেউ নাই। তার প্রমাণ এই দেখ। এই বলিয়া সে তাহার খাতাখানি বাহির করিয়া সমরের হাতে দিল। সমর খাতা খুলিয়া পড়িতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে সংযত হইয়া থাকা তাহার কঠিন হইল। কোনও রূপে হাসি দমন করিয়া সবটুকু পড়িয়া কহিল—মিষ্টার ভট্‌চারিয়া, তোমার কোনও শঙ্কা নাই। মঞ্জুলিকার চিঠিতে যা পেলুম—তাতে আমার মনে হয় সে তোমার সঙ্গে সত্যিই ছলনা করতে চায় নি। নিশ্চয় কোনও বিপাকে পড়ে সে কথা রাখতে পারেনি। হয়তো কালই তার মনের ভাব জানতে পারবে।

উৎসুক সুরে সুবেশ কহিল—কি রকম?

—হয়তো কৈফিয়ৎ দিয়ে কালই সে তোমাকে আর একখানি চিঠি লিখবে। ভেবোনা—কথা রাখতে না পেরে সেও খুব অসুখী হয়েছে।

শয্যায় শুইয়া সুবেশ ক্ষীণকণ্ঠে কহিল—কি জানি ভাই, তার মনের ভাব কি!

সমর শয্যায় শুইয়া পড়িয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে লাগিল। তার পর কহিল—মিষ্টার ভট্‌চারিয়া, তোমার চিঠিখানি চমৎকার লেখা হয়েছে।

সুবেশ কহিল—চমৎকার হয়ে আর লাভ কি ভাই, তার হাতে তো পৌছলো না। কোনও দিনে পৌছিবে কি না কে জানে!

—অত হতাশ হয়োনা মিষ্টার ভট্‌চারিয়া। তোমার মত ভাবুক লোককে বেশীদিন কষ্ট ভোগ করতে হবে না। ভগবান নিশ্চয় সুদিন দেবেন।

সুবেশ ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বোধকরি একবার তাহার মনের ব্যথা জানাইল।

কিছুক্ষণ পরে সমর কহিল—তোমার চিঠিখানির কোন জায়গাটায় সব চেয়ে ভাল লাগলো জানো?

উৎসুক ভাবে সুবেশ কহিল—কোন জায়গায়?

কোনও রকমে হাস্য সম্বরণ করিয়া সমর কহিল—গাছে তুলে দিয়ে মই টেনে নেওয়ার কথাটা বড় সুন্দর খাপ খেয়েছে মিষ্টার ভট্‌চারিয়া!

'হুঁ'—বলিয়া সুবেশ পাশ ফিরিয়া শুইল।

৪

পরদিন আবার একখানি রঙিন খামে চিঠি! সুবেশ চিঠিখানি লইয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিল। চিঠিখানি খুলিয়া সে পড়িতে আরম্ভ করিল—

প্রাণপ্রিয় আমার,

বড় ব্যথা দিয়েছি কি? কথা কেন রাখতে পারিনি—তার কারণ জান্‌লে নিশ্চয়ই আমার উপর রাগ করতে পারবে না। কথা আমি ঠিক রাখতুম কিন্তু তোমাকে তো আগেই জানিয়েছি—দিদি মুখপুড়ির জ্বালায় আমার কিছু হবার জো নেই। মাথা ধরার ছল করে আমি চলে আসছিলুম—কিন্তু দিদি যে অমন বাদ সাধবে সে কি জানি! আচ্ছা, আমার মাথা ধরেছে—তাতে দিদির কেন এত দরদ? আমার জন্য তাকেই বা ছুটি নিতে হবে কেন? আমার যা রাগ হয়েছিল—কি আর বলবো। স্কুল ফাঁকি দেওয়ার মতলব আর কি! বোনের উপর যে তার কত মায়া—সে তো আমার জানা আছে।

বাড়ীতে এসেই কি রঙ্গে আছে। দিদি তো সবিস্তারে আমার মাথা ধরার কথা মাকে বল্লো। মা ব্যস্ত হয়ে

গায়ে হাত দিয়ে দেখলেন—জ্বর-টর হয়েছে কি না। আমার অসুখ কি দেহে যে ওরা ঠিক পাবে? বাবা বাড়ীতেই ছিলেন, বল্লেন—ও কিচ্ছু না। চল্ তোদের নিয়ে ইডেন্-গার্ডেনে ঘুরিয়ে প্যালেস্ অব ভ্যারাইটিতে বায়স্কোপ দেখিয়ে আনি। বাবার কথায় আমি আকাশ থেকে পড়লুম। আকাশ থেকে পড়া নয় তো কি? তোমার কাছে মিথ্যেবাদী হলুম—এর চাইতে যে আকাশ থেকে পড়াও ভাল ছিল।

আমি বল্লুম—বড্ড মাথা ধরেছে বাবা।

বাবা বল্লেন—ঘুরে এলে সব সেরে যাবে।

উপায় নাই! আমি আর একবার আপত্তি করতেই দিদি বল্লো—থাম থাম—ভারী তো মাথা ধরা। ও-সব চালাকি আমি কি আর বুঝিনে। তারপর আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বল্লে—কেন তোর আপত্তি শুনি? ছাদে ওঠা হবে না বলে?

এর পরও কি আপত্তি চলে—তুমিই বল সুবেশবাবু। সব কথা খুলে বল্লুম—রাগ তোমার যাবে না কি?

আচ্ছা, আমার কথামত খাতা কিনে আমার উদ্দেশে চিঠি লিখ্ছো তো? যে দপ্তরীর কাছে খাতা কিনেছ, তার নাম যদি জানতুম—তার কাছে আমিও একখানা খাতা কিনে তোমার উদ্দেশে কিছু কিছু লিখতুম। চিঠিতে কি সব মনের কথা এখন লিখ্তে পারি? আজে-বাজে কত কথাই যে মনে হয়।

আমার প্রথম চিঠি পেয়ে তার উত্তরে কি লিখেছ আমার ভারী জান্তে ইচ্ছে হচ্ছে। আচ্ছা—কি সম্বোধন কর্লে?—প্রিয়তমে? প্রিয়ে? প্রাণের অধিক প্রিয় আমার? প্রাণ-প্রিয়ে? আচ্ছা আমি যে সম্বোধন করলুম এবার তোমার পছন্দ হলোতো? ওতেও কি তোমার অভিমান দূর হবে না? 'আপনি' ছেড়ে এত শীগ্‌গিরই যে 'তুমি' ধরলুম—মনে কিছু কর্লে না তো? কিন্তু আমি যে চিরকালের জন্মজন্মান্তরের, তোমারই—

"মঞ্জুলিকা"

পুঃ—একটা কথা লিখ্তে কিন্তু ভারী লজ্জা করছে। আজকাল ল্যাংড়া আম ভারী সস্তা—একঝুড়ি পাঠাতে পার? আম খাওয়ার আমার ভারী সখ। কিন্তু বাবা এসব বিষয়ে ভারী কৃপণ—খাবার জিনিষে তিনি মোটেই পয়সা খরচ করতে চান না। বাবার নিন্দে তোমার কাছে করছি—কিছু মনে করো না; তোমার কাছে সব কথাই আমি খুলে বল্‌তে পারি। যদি পাঠাও—বুদ্ধি করে পাঠিও—কেউ যেন সন্দেহ না করে। দেখ্‌বো তোমার কত বুদ্ধি!

—'মঞ্জু'—

চিঠি পড়িয়া সুবেশের মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। তাহা হইলে মঞ্জুলিকা মিথ্যা দরদ দেখায় নাই। সত্যই সে তাহাকে ভালবাসে। আঃ! তাহার মন জুড়াইয়া গেল। চিঠিখানিতে পরম স্নেহে হাত বুলাইয়া সে একবার বুকের কাছে চাপিয়া ধরিল—একবার ঠোঁটের উপর স্থাপন করিয়া গভীর ভাবে চুম্বন করিল।

মঞ্জুলিকা আম খাইতে চাহিয়াছে—আহা, কি তাহার সৌভাগ্য! আজ অফিসের ফেরতা আম কিনিয়া সে পাঠাইবে। কিন্তু কি ভাবে গোপনে এ কাজ সমাধা করিবে? একটা পরামর্শ যে জিজ্ঞাসা করিবে—এমন লোকও নাই। সমরকে বলিবে কি? কিন্তু তাহার ভাব দেখিয়া সন্দেহ হয়—সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায় কিনা কে জানে।

সে ভাবিতে ভাবিতে অফিসে গেল। অফিস ছুটি হইবার কিছু পূর্ব্বে একখণ্ড কাগজে লিখিল 'ইয়াকুব দপ্তরী ২নং হলওয়েল লেন।' কাগজখানি পকেটে ফেলিয়া পাঁচটা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে সে প্রসন্ন আননে অফিস হইতে বাহির হইল। ভাবিল—আমের ঝুড়ির মধ্যে দপ্তরীর ঠিকানা দেওয়ার বুদ্ধি তাহার চমৎকার হইয়াছে। মঞ্জুলিকা আমের ঝুড়ি নাড়াচাড়া করিবে নিশ্চয়। কাগজে দপ্তরীর নাম ও ঠিকানা দেখিয়া সে বুঝিতে পারিবে এবং নিশ্চয়ই তাহার বুদ্ধিরও তারিপ করিবে।

সে জোরে জোরে পা ফেলিয়া হগ্‌সাহেবের বাজারে উপস্থিত হইল। আম অবশ্য সর্ব্বত্রই মেলে কিন্তু অন্য জায়গায় আম কিনিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সে ফুটপাথে ঘুরিয়া ফিরিয়া আম দেখিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া একজন দোকানদারকে কহিল—ওহে? ভাল ল্যাংড়া আম আছে? বাছাই করা আম চাই।

দোকানদার বড় দুটী আম দেখাইয়া কহিল, টাকায় দশটা—বড় ন্যাংড়া আছে বাবু!

—টাকায় দশটা? বল কি? আজকাল তো সস্তা চল্‌ছে দর। তোমার আমও তো তেমন বড় মনে হচ্ছে না।

বাবুটির মুখের দিকে চাহিয়া দোকানদার আম দুটি ঝুড়িতে রাখিয়া ঝাঁকানো সুরে কহিল—সস্তা খুঁজছো তো সোজা পোস্তায় চলে যাও। অনেক রকম আম মিলবে।

দোকানদারের কথায় সুবেশের আত্মমর্য্যাদায় ঘা লাগিল। সে সম্প্রতি মাহিয়ানা পাইয়াছে—অর্থের টানাটানি নাই। কহিল,—আমি চাচ্ছি ভাল ন্যাংড়া আম। এক বড়লোকের বাড়ী পাঠাতে হবে কিনা! বাছাই করা আম চাই যাতে অপছন্দ না হয়। টাকায় দশটা কেন আটটাতেও আপত্তি নাই।

দোকানদার আর একবার তার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া কহিল—বড়লোকের বাড়ী পাঠাবেন? লিন্ না বাবু ক' টাকার চাই? এই বলিয়া সে ঝুড়ি হইতে আম বাছিয়া তুলিতে লাগিল।

সুবেশ কহিল—টাকা দশেকের দাও। কিন্তু বুঝেছ হে ভাল হওয়া চাই। ওরা বড্ড সৌখিন লোক বাপু। খারাপ জিনিষ পছন্দ হবে না। যদি একবার পছন্দ হয় তাহলে নিত্যি তোমার দোকানে থেকে—বুঝলে না? বড় বড় ঘরের খদ্দের থাক্‌লে তোমাদেরই সুবিধে হে!

সুবেশ দপ্তরীর ঠিকানা লেখা স্লিপটি আম বোঝাই ঝুড়ির তলায় রাখিয়া ঝুড়িটি মুটের মাথায় দিয়া লইয়া চলিল।

রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া সে কুলিকে বাড়ীর নম্বর দিয়া কহিল—ঐ বাড়িতে আমের ঝুড়ি পৌঁছাইয়া দিয়া তাহাকে সংবাদ দিলেই সে বকশিস্ পাইবে। কুলিটি বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া ঝুড়ি লইয়া প্রস্থান করিল।

মিনিট দশ পনেরো পর সে ফিরিয়া আসিতেই উৎসুক ভাবে সুবেশ কহিল—ঠিক বাড়ী চিনেছিস্ তো?

কুলি কহিল—হুঁ বাবু।

—ভুলটুল হয়নি তো রে?

—না বাবু। ভুল কেন হবে। দশ নম্বরের লাল রঙের বাড়ী তো?

নিশ্চিন্ত হইয়া সুবেশ কহিল—কাকে দিলি?

—কড়া নাড়তেই এক মোটা ভঁচ্‌কা মেয়েমানুষ—।

সুবেশ বাধা দিয়া কহিল—মোটা মেয়েমানুষ? সে কিরে? বাড়ীর ঝি টি হবে বোধ হয়—কি বলিস্? কোনও তরুণীকে—মানে অল্প বয়সের সুন্দরী মেয়েকে দেখ্‌লিনে।

কুলি বোধ হয় ব্যাপার বুঝিতে পারিল। সে সুবেশের মুখের দিকে চাহিয়া ফিক করিয়া হাসিয়া কহিল—হাঁ বাবু, একজন অল্প বয়সের মেয়ে তো ছিল। সেই তো বল্লো—কে আম পাঠিয়েছে?

ব্যগ্র হইয়া সুবেশ কহিল—বটে, বটে! তুই কি বল্লি?

কুলি সহাস্যে কহিল—বল্লাম, তোমাদের বাবু পাঠিয়েছে গো!

সুবেশ অত্যন্ত খুসী হইয়া কুলিকে নগদ এক টাকা বকশিস্ দিতেই সে সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল।

৫

আমের ঝুড়ি পাঠাইয়া অত্যন্ত লঘুচিত্তে সুবেশ মেসে ফিরিল। ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার অত্যন্ত ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল—মেসে আসিয়াই আট আনার খাবার আনিয়া খাইয়া ধীরে সুস্থে মঞ্জুলিকার পত্র দুখানি বাহির করিয়া কয়েক বার পড়িল। তারপর দুইখানি চিঠিতে উপর্য্যুপরি বার কয়েক চুম্বন করিয়া সযত্নে ভাঁজ করিয়া রাখিয়া দিল।

হ্যাঁ, এইবার সে তাহার বাঁধানো খাতা লইয়া বসিবে। তাহার হৃদয়ের সমস্ত দরদ ঢালিয়া মঞ্জুলিকার উদ্দেশে তাহার দ্বিতীয় পত্র লিখিতে হইবে। প্রথম পত্রে সে মঞ্জুলিকার প্রতি অবিচার করিয়াছিল, তাহার প্রেমে সন্দিহান হইয়াছিল; তাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে বৈকি! মনের মধ্যে কবিজনোচিত ভাব আনিবার জন্য সে কিছুক্ষণ রবীন্দ্রনাথের কবিতা বাছিয়া বাছিয়া পড়িতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথের বর্ষার দিনের কবিতাটা সে বারংবার আবৃত্তি করিতে লাগিল—

"এমন দিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘনঘোর বরিষায় !
এমন মেঘস্বরে, বাদল ঝর ঝরে
তপনহীন ঘন তমসায় !
সে কথা শুনিবে না কেহ আর,
নিভৃত নির্জ্জন চারিধার।
দুজনে মুখোমুখী গভীর দুখে দুখী
আকাশে জল ঝরে অনিবার।
জগতে কেহ যেন নাহি আর।
সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব !
কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে'
হৃদয়ে দিয়ে হৃদি অনুভব ;
আঁধারে মিশে গেছে আর সব !"

কবিত্ব-রসে মনকে পূর্ণ করিয়া সুবেশ খাতা লইয়া বসিল। আবেগময়ী ভাষায় সে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখিয়া যাইতে লাগিল। উপসংহারে লিখিল—

"আম পাইয়াছ তো? আম খাইয়া তুমি সন্তুষ্ট হইয়াছ তো? যদি কখনও তোমাকে বুকের কাছে পাই, যদি তোমার অধরে অধর স্পর্শ করিবার যোগ্যতা লাভ করি—তাহা হইলে প্রাণের সাধে তোমাকে আম খাওয়াইব। আম্ররসসিক্ত অধরে চুম্বনের পর চুম্বন বর্ষণ করিব। আমার তৃষিত হৃদয় শান্ত করিব। দেবী আমার কবে সে সাধ পূর্ণ হইবে?"

লেখা শেষ করিতে না করিতেই সমর আসিয়া উপস্থিত। সে মৃদু হাসিয়া কহিল—কি হে, চিঠি লেখা হচ্ছে বুঝি?

সুবেশ খাতা বন্ধ করিয়া সহাস্যে কহিল—একে কি আর চিঠি লেখা বলে? দুধের সাধ ঘোলে মেটানো আর কি!

সমর গম্ভীর হইয়া কহিল—এ যে কত বড় জিনিষ সৃষ্টি করছো তা তুমি না জানতে পার কিন্তু আমি বেশ বুঝেছি মিষ্টার ভট্চারিয়া। বিরহী মন মেঘকে দূত করে প্রিয়ার কাছে বার্ত্তা পাঠিয়েছিল। তোমারও মেঘদূতের চেয়ে কম কিছু নয়। সোনার জলে বাঁধানো এ খাতা কালিদাসের মেঘদূতকে পরাস্ত করবে মিষ্টার ভট্চারিয়া।

সমরের কথায় শ্লেষ নাই বিদ্রূপ নাই। সুবেশ অত্যন্ত খুশী হইল—না, সমর তাহা হইলে সত্যই তাহার বন্ধু!

সুবেশ কহিল—পড়তে চাও সমর?

সজোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সমর কহিল—না, মিষ্টার ভট্চারিয়া, তুমি আমাকে অবিশ্বাস করো—এটুকু আমি বুঝতে পারি। তোমার জিনিষ তোমারই থাক। ইচ্ছা ছিল তোমার সুখ দুঃখের ভাগ নেব। কিন্তু যে অবিশ্বাস করে—বন্ধুত্বের দাবী কি তার কাছে শোভা পায়।

সমরের কথায় সুবেশের অন্তর স্পর্শ করিল। সে গদ্‌গদ স্বরে কহিল না ভাই, মিষ্টার বোস, তোমাকে আর আমি কোনও দিন অবিশ্বাস করবো না। আমি জানি তোমার মত হিতৈষী আর আমার কেউ নাই।

সমর হাসিয়া কহিল—তাহলে এখন থেকে আমরা অভিন্ন হৃদয় বন্ধু মনে থাকে যেন!

সমর অত্যন্ত মনযোগ দিয়া মঞ্জুলিকার দ্বিতীয় পত্র এবং সুবেশের লেখা পড়িল। পাঠ শেষ করিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া সে কহিল—মিষ্টার ভট্চারিয়া, সত্যই তুমি কবি। তোমার মত লেখা আর কেউ লিখতে পারতো কিনা সন্দেহ হয়। এ মেঘদূতকে ছেড়ে গিয়েছে। তোমার লেখার সব চেয়ে সুন্দর কোথায় হয়েছে জান?

ব্যগ্রস্বরে সুবেশ কহিল—কোথায়?

গম্ভীর স্বরে সুবেশ কহিল—আম্র-রস-সিক্ত অধর চুম্বনের কথা এমন beautifully put করা হয়েছে, সত্যি মিষ্টার ভট্চারিয়া তোমার originality আছে।

ইহার পর দিন সাতেক সুবেশের অত্যন্ত বিশ্রীভাবে কাটিল। ছাদে ওঠানামা করিয়া, গার্লস্ স্কুলের গাড়ী আসিবার সময় রাস্তায় ধন্না দিয়া, মঞ্জুলিকার বাড়ীর সম্মুখের রাস্তায় পায়চারি করিয়া হয়রাণ হইয়া কোনও মতেই সে মঞ্জুলিকার দর্শন পাইল না। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে তাহার বুক বিদীর্ণ হইয়া গেল—কবিতা লিখিতে গিয়া চোখের জলে তাহার খাতার কাগজ ভিজিয়া যাইতে লাগিল, মঞ্জুলিকার উদ্দেশ্যে পত্র লিখিতে লিখিতে দপ্তরীর খাতা প্রায় পূর্ণ হইয়া গেল—কিন্তু মঞ্জুলিকাকে না চোখে দেখা যায়—না তাহার ইঙ্গিতপূর্ণ কোনও চিঠি আসে। সমরের

সহানুভূতির অভাব নাই—সে নানাভাবে তাহাকে সান্ত্বনা দেয়, বুঝাইতে চেষ্টা করে নিশ্চয়ই মঞ্জুলিকার কোনও অসুখ করিয়াছে। সুবেশ অশ্রুসিক্ত স্বরে বলে—ওকথা ব'লো না ভাই। সে সুস্থ থাক, সুখে থাক—আমাকে ভুলে থাক তাতে কোনও ক্ষতি নাই।

সাতদিন পর আবার একখানি চিঠি। কিন্তু চিঠি পড়িয়া সুবেশ অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। চিঠিতে লেখা ছিল—

প্রাণের অধিক প্রিয় আমার,

আমি বন্দী। বাড়ীর সবাই ঠিক পেয়েছে তাই ছাদে উঠ্‌তে পারিনে, এমন কি ইস্কুল যাওয়াও বন্ধ। দিদি হয়েছে আমার গার্ড। তোমাকে যে দু'কলম লিখবো—এমনও ফুরসুৎ নাই। কোনও রকমে সুযোগ পেয়ে লিখতে বসেছি কিন্তু বেশী লিখতে পারবো না। বাপ মা উঠে পড়ে লেগেছেন—এই মাসের মধ্যে বিয়ে দেবেন। অন্যের সাথে বিয়ে হলে আমি গলায় দড়ি দেব—না, বিষ খাব—না, জলে ডুববো। আচ্ছা, কোনটা তোমার পছন্দ সই হবে বল্‌তে পার? আচ্ছা, একবার বাবার কাছে প্রপোজ করেই দেখনা—তিনি কি বলেন। মার্চ্চেণ্ট অফিসের বড়বাবু—মনে থাকে যেন, তোমার কথায় রাগ করতে পারেন। কিন্তু তাই বলে কি তুমি একবার চেষ্টা করেও দেখবে না? তোমাকে আমার চাই-ই। শেষ পর্য্যন্ত হয়তো elopeই করতে হবে। সাহস আছে তো?

—মঞ্জুলিকা—

চিঠি পড়িয়া সুবেশ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল—তাইতো এখন কি করা যায়? মঞ্জুলিকার বাবার কাছে যাইবে কি?

সমর আসিতেই সুবেশ ব্যগ্রভাবে তাহাকে চিঠি দেখাইল। সমর চিঠি পড়িয়া কহিল—মিষ্টার ভট্‌চারিয়া, এখন তুমি কি করতে চাও?

সুবেশ ব্যগ্রভাবে কহিল—তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু। এ বিপদে তোমার পরামর্শ চাই—মিষ্টার বোস।

সমর তাহার পিঠ চাপড়াইয়া দিয়া কহিল—কোনও চিন্তা নাই ভট্‌চারিয়া, সোজা মঞ্জুলিকার বাপের কাছে চলে যাও। তোমার মত প্রেমিক জামাই পাওয়া তাঁর ভাগ্যের কথা। কিন্তু তোমার সাজ পোষাকের জন্য কিছু খরচ করবে তো?

সুবেশ উৎসাহিত হইয়া কহিল—নিশ্চয়! কত লাগবে বল দেখি।

সমর হিসাব করিয়া কহিল—গোটা পঁচিশেক টাকাই দাও। ওতেই কোনও রকমে চলে যাবে।

সুবেশ অম্লান বদনে বাক্স হইতে পঁচিশ টাকা বাহির করিয়া দিল।

৬

সেদিন অপরাহ্নে সুসজ্জিত সুবেশ দুরুদুরু বক্ষে দিলীপ বাবুর বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। দিলীপ বাবু বৈঠকখানা ঘরে খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন, সুবেশ ঘরে ঢুকিতেই মুখ তুলিয়া কহিলেন—কি চান?

সুবেশ নমস্কার করিয়া কহিল—আজ্ঞে, আপনার কাছে একটু প্রয়োজনে এসেছি।

—আচ্ছা বসুন। বলিয়া তিনি একখানি চেয়ারে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন।

সুবেশ বসিলে তিনি কহিলেন—আপনার কি প্রয়োজন? এই পাশের মেসেই আপনাকে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে যেন!

বিনীত ভাবে সুবেশ কহিল—আজ্ঞে হাঁ। আমি ঐ মেসেই থাকি। আপনারা আমার প্রতিবেশী। তাই আলাপ পরিচয় করতে এসেছি।

দিলীপবাবু কহিলেন—বেশ তো। আপনার কি করা হয়?

—আজ্ঞে, আমি মার্চ্চেণ্ট অফিসে কাজ করি। সম্প্রতি চল্লিশ টাকা করে পাই। গ্রেড্ চল্লিশ থেকে আশি পর্য্যন্ত। Higher grade এ প্রমোশন পেলে দেড়শো পর্য্যন্ত হতে পারে।

দিলীপ বাবু কহিলেন—ও। আপনার বাড়ীতে কে কে আছেন?

এই প্রশ্নে অত্যন্ত খুসী হইয়া সুবেশ কহিল—বাড়ীতে

এক বৃদ্ধ বাবা ছাড়া আপনার বল্‌তে কেউ নাই। মা আমার আট বছরের সময়েই মারা গিয়েছেন। আমি এখনও অবিবাহিত।

দিলীপবাবু মৃদু হাসিয়া কহিলেন—এখনও আপনি বিয়ে করেন নি কেন?

সুবেশ ভাবিল—ভগবান বোধ করি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন—নহিলে প্রথমেই বিয়ের কথা উঠিবে কেন! সে কহিল—আজ্ঞে, বাঙ্গালীর অধঃপতনের কারণ এই যে তার self-supporting হবার আগেই একটা বোঝা ঘাড়ে করে বসে। যাহোক, ভগবান আমাকে সে কুমতি থেকে রক্ষা করেছেন। অবশ্য এখন আমি নিজের ভরণ-পোষণ নিজেই করতে সক্ষম হয়েছি। এখন আমার বিয়ে করতে আপত্তি নাই।

দিলীপবাবু ইহার কথায় মনে মনে অত্যন্ত কৌতুক অনুভব করিলেন। কিন্তু কোনও উত্তর দিলেন না।

সুবেশ ভাবিতে লাগিল—এইবার তাহার মনের অভিপ্রায় খুলিয়া বলিবে কি না। একটু থামিয়া সে পুনরায় বলিতে লাগিল—আমি বুঝেছি যে বাঙ্গালীর ঘরে বিয়ে মানেই নিজেকে বলি দেওয়া। যার সাথে পরিচয় নাই, চোখের দেখা নাই—ভালবাসা তো দূরের কথা—তাকেই একদিন জীবনসঙ্গিনী করে নেওয়া যে কতদূর মূর্খতা এ আমি চিন্তা করে দেখেছি বলেই—ও দিকে পা মাড়াইনি। কিন্তু—। এই বলিয়া সে থামিয়া গেল।

দিলীপবাবু সহাস্যে কহিলেন—কিন্তু কি?

সুবেশ হাত কচলাইতে কচলাইতে কহিল—আজ্ঞে, আপনার কাছে যা নিবেদন করতে চাই—যদি অভয় দেন তা হলেই বলতে পারি।

বিস্মিত হইয়া দিলীপবাবু কহিলেন—বেশতো বলুন।

তেম্‌নি হাত কচলাইতে কচলাইতে সুবেশ কহিল—আপনার কাছে যে জন্যে এসেছি—তা আমার নিজের মুখ দিয়ে ব্যক্ত করা হয়তো শোভন নয়। কিন্তু আমার হয়ে একটা কথা বলে এমন লোক একজনও নাই। আপনি হয়তো মনে করতে পারেন—আমি চল্লিশ টাকা মাইনের কেরাণী, আমার এতটা স্পর্দ্ধা হওয়া উচিত নয়। কিন্তু আপনি ইচ্ছা করলে—আমার অবস্থার উন্নতি হতে একটুও বাধবে না।

এইটুকু বলিয়া সুবেশ একবার দিলীপবাবুর মুখের দিকে চাহিল। দিলীপবাবু মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন। সম্ভবতঃ ভাবিতেছিলেন—লোকটির মাথায় কিছু ছিট্ আছে নাকি!

সুবেশ পুনরায় বলিতে লাগিল—আপনি রবার্টসন এণ্ড কোম্পানীর বড়বাবু—সে আমি শুনেছি। আপনার উদারতার কথা কে না জানে। অনেক গরীব লোকের অন্ন সংস্থান যে আপনি করেছেন—এও আমি অবগত আছি। দয়া করে যদি আপনার আণ্ডারে একটা ভাল কাজ দেন—তাহলে অভাব আর কিছুই থাকে না। শ' খানেক মাইনে হলেই আপাততঃ চলে যাবে।

দিলীপবাবু মৃদু হাসিয়া কহিলেন—হুঁ, তারপর।

সাহস পাইয়া সুবেশ বলিতে লাগিল—আমার উপায় নাই—তাই নিজেকেই বলতে হচ্ছে। আমাকে সন্তান জ্ঞানে ক্ষমা করবেন। আপনার দুইটি কন্যা সন্তান—বড়টির বিয়ের কথাবার্ত্তা ঠিক হয়েছে—সে আমি শুনেছি। যদি মঞ্জুলিকাকে আমার হাতে দেন—তাহলে—

দিলীপবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন—কি বল্‌ছো হে ছোক্‌রা—তোমার মাথা খারাপ না কি?

হাত জোড় করিয়া সুবেশ কহিল—আজ্ঞে না। মাথা আমার খারাপ নয়, যদিও আমার কথা শুনে আপনার তাই মনে হতে পারে বটে। আমি জানি এ আমার দুরাশা—কিন্তু দুইজনের মনের দিকে তাকিয়ে আপনাকে দয়া করতেই হবে। মঞ্জুকে আমার হাতে দিলে আপনাকে কোনও দিন অনুশোচনা করতে হবে না—এ আমি বলে দিচ্ছি।

দিলীপবাবু এইবার ক্রুদ্ধস্বরে কহিলেন—থাম হে ছোক্‌রা—এটা ইয়ারকির জায়গা নয়!

কিন্তু আজ সুবেশ দৃঢ়সংকল্প করিয়া আসিয়াছে। মার্চ্চেন্ট অফিসের বড়বাবু, রাগ তো ইঁহার হইবারই কথা। কিন্তু ইহাকে কাবু করিবার অস্ত্র তাহার কাছেই আছে। মেয়ের প্রেমপত্রগুলির কথা একবার উত্থাপন করিলেই—জোঁকের মুখে চুণ পড়িবে নিশ্চয়। কিন্তু সে অস্ত্র এখনই

নিক্ষেপ করিবে না। তোষামোদে ফল না হইলে পরে দেখা যাইবে!

মাথা নত করিয়া সে বলিতে লাগিল—আজ্ঞে, রাগ আপনার হতে পারে বটে। কিন্তু দুইজনের মনের দিক দিয়ে দয়া করে আপনি বিবেচনা করুন। আপনার উপরই আমাদের মনের শান্তি নির্ভর করছে।

দিলীপবাবু এবার নিশ্চয় ধারণা করিলেন—লোকটির মাথা খারাপ। তিনি মৃদু হাসিয়া কহিলেন—অনেক বক্তৃতা তোমার শুনলাম। এখন আমার দুটো কথা শোন। প্রথম কথা হচ্ছে—আমি মার্চ্চেন্ট অফিসের বড়বাবু নই।

তাঁহার মুখের হাসি দেখিয়া সুবেশের মনে পুনরায় আশার সঞ্চার হইল, মনে মনে কহিল—হুঁ, আমার সঙ্গে চালাকি! আমিও মার্চ্চেন্ট অফিসে লেজার পোষ্টিং করি—বড়বাবুর ধাত কি আর জানি না। কহিল—আজ্ঞে, কিন্তু আমি সঠিক জানি যে—

দিলীপবাবু কহিলেন—তুমি যা জান সে আমি শুনেছি। এখন আমার দ্বিতীয় কথা এই যে—আমার ছোট মেয়ের নাম মঞ্জুলিকা নয়।

সুবেশ চমকাইয়া উঠিল, তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। ঢোঁক গিলিয়া কহিল—তার মানে?

তার মানেও আবার কিছু আছে নাকি হে ছোক্‌রা! আমার মেয়ের নাম মঞ্জুলিকা নয়—এর জন্যও কি আবার কৈফিয়ৎ দিতে হবে?

সুবেশের সমস্ত দেহ অবশ হইয়া গেল, মনে হইল সে যেন এখনই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবে। কোনও রকমে অস্ফুট স্বরে সে কহিল—মিথ্যে কথা!

দিলীপবাবু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কঠোর স্বরে কহিলেন—তুমি তো আচ্ছা বেয়াদপ হে! নেশাটেশা করার অভ্যাস আছে নাকি? এইবার ভাল চাও তো সরে পড়—নইলে অপদস্থ হতে হবে।

সুবেশের আত্মমর্য্যাদায় অত্যন্ত আঘাত লাগিল, তাহার একনিষ্ঠ প্রেমের এত বড় অপমান! সে সোজা দাঁড়াইয়া কহিল—দেখুন, আপনার পয়সা থাকতে পারে—কিন্তু আমাকে অপমান করবার আপনার কোনও অধিকার নাই।

দিলীপবাবুও চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া অঙ্গুলি দিয়া বহির্দ্বারে নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন—বেরিয়ে যাও এক্ষুনি—নইলে চাপরাশিকে ডেকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেব।

সুবেশ ক্রুদ্ধস্বরে কহিল—যাচ্ছি, যাচ্ছি। আপনার অফিসে আপনি বড়বাবু—কিন্তু এটা অফিস নয়। একথা মনে রাখবেন। আর এও বলে যাচ্ছি—আপনার কন্যা আমাকে ভালবাসে—তার গাদা গাদা চিঠি আমার বাক্সে আছে। তাকে আমার চাই-ই। একদিন আপনাকেই সেধে আমাকে কন্যাদান করতে হবে—এও আজ বলে যাচ্ছি।

উত্তেজিত কণ্ঠে দিলীপবাবু হাঁকিলেন—চাপরাশি! সুবেশ তখন দ্রুতপদে ঘরের বাহির হইয়া গিয়াছে।

৭

দিন দুই পর সুবেশ বিডন্‌ষ্ট্রীট দিয়া এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে চলিয়াছিল। তাহার মুখ চোখ শুষ্ক। চুল এলোমেলো, কাপড় জামার কোন পারিপাট্য নাই। একস্থানে সাইনবোর্ডে লেখা—শ্রীঅবনীকান্ত বিদ্যাবাচস্পতি, জ্যোতিষার্ণব। সুবেশ সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিল। কক্ষের ভিতর একখানি ফরাস পাতা—তাকিয়ায় হেলান দিয়া একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বসিয়াছেন। সুবেশকে দেখিয়াই তাঁহার চোখ দুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কহিলেন—কি চাই আপনার?

সুবেশ কহিল—বাচস্পতি মহাশয়ের কাছে একটু প্রয়োজন আছে।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক সোজা উঠিয়া বসিয়া কহিলেন—বলুন না, কি প্রয়োজন। কোষ্ঠী করাবেন? অভ্রান্ত কোষ্ঠী চান তো আমার কাছে পাবেন। হাত গোণাবেন? আপনার হাতের রেখা দেখে ত্রিকালের সঠিক সংবাদ দিতে পারবো। প্রশ্নের উত্তর চান? প্রতি প্রশ্নের উত্তরে এক টাকা করে ফি। তবে আজকাল কিছু কম রেট করেছি—আট আনাতেই হবে। তিনটি প্রশ্নের উত্তর পাঁচসিকা। এক ডজন হলে আরও কমে ছাড়ি—তিন টাকাতেই হবে। বশীকরণের মন্ত্র চান? এমন মন্ত্র বাতলে দেব যার শক্তিতে যাকে আপনি ভালবাসেন তিন দিনে সেধে সে আপনার কাছে

উপস্থিত হবে। বসুন—বেশ আরাম করে বসুন। এই বলিয়া তিনি ফরাসের চাদর হাত দিয়া ঝাড়িয়া বসিবার স্থান নির্দ্দেশ করিলেন।

সুবেশ বসিয়া কহিল—আপনার নাম শুনেই আসা। যদি দয়া করে—

—হাঁ্যা আপনার ভবিষ্যৎ আমি গণনা করে দেব—সেজন্য কিছু চিন্তা করবেন না। কলকাতা সহরে জ্যোতিষী নামে অনেক জোচ্চোর আছে মশায়—কিন্তু আমার কথা আলাদা। আপনার ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান—আমি যদি সঠিক বলে দিতে না পারি—দুশো টাকা আমি আপনাকে গণে দেব।

সুবেশ শুষ্ক মুখে কহিল—আজ্ঞে হাঁ্যা, সে আমি জানি। বড় বিপদে পড়েই—

তাহার কথা লুফিয়া লইয়া বাচস্পতি মহাশয় কহিলেন—বিপদ? সে আমি জানি—সব আপনাকে বল্‌ছি। বর্ত্তমানে আপনার কিছু অসুবিধা আছে বটে—কিন্তু সে বেশী দিন স্থায়ী নয়। আচ্ছা, দুটো টাকা প্রথম দিন। আরে মশায় এই নিয়ম করেছি কিছুদিন থেকে। অনেকে এসে হাত গুণোচ্ছেন—ভদ্রলোক সব, অবিশ্বাস করি কি করে। কিন্তু যেই নিজের কাজ গুছিয়ে নিলেন—অমনি কি দর কসাকসি! তাই আগাম টাকা নিয়ে হাত গুণি আজকাল।

সুবেশ পকেট হইতে মণিব্যাগ বাহির করিয়া দুইটি টাকা জ্যোতিষীর হাতে দিলে তাঁহার মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল।

—দেখি, হাতখান বের করুন দেখি।...তারপর করতল নিজেই টানিয়া লইয়া দেখিতে লাগিলেন।

—মার্চ্চেণ্ট অফিসে কাজ করেন তো? মাইনে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। আপনার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বড় একটা কেউ নেই। পিতামাতার মধ্যে মাত্র একজন আছেন। খুব সম্ভব মাতা আপনার জীবিত নাই।

সুবেশের মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, কহিল—ঠিক বলেছেন আপনি। আমার—

—না, না আপনাকে কিছু বলতে হবে না, যা বলবার আমিই বল্‌ছি। সম্প্রতি আপনি বড় মনকষ্টে আছেন। স্ত্রীলোক ঘটিত ব্যাপার বলে বোধ হচ্ছে। এ ভোগ কিছুদিন চলবে আপনার। কিন্তু শেষটায়—এই বলিয়া থামিয়া গিয়া সুবেশের করতল অনেকক্ষণ নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিলেন।

সুবেশ শুষ্ক মুখে কহিল—শেষটায় কি হবে?

হুঁ বল্‌ছি।...তারপর হাতখানি ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন—স্ত্রীভাগ্য আপনার খুব প্রবল মশায়—তবে বর্ত্তমানে একটু গোলযোগ আছে। রাহুর অন্তর্দ্দশাটা কেটে গেলেই—আপনি অভীষ্ট স্ত্রী-রত্ন লাভ করবেন।

সুবেশ উৎসাহিত হইয়া কহিল—কতদিনে সময় ভাল পড়বে বলুন দেখি?

—হাত দেখে মনে হয় এক মাস নয় দিন পনরো মিনিট বার সেকেণ্ডের পর আপনার শুভযোগ উপস্থিত হবে। আপনি যাকে মনে মনে অভিলাষ করছেন—তাকেই আপনি পাবেন।

ব্যগ্র হইয়া সুবেশ কহিল—সত্যি বলেছেন বাচস্পতি মশায়?

বাচস্পতি সহাস্যে কহিলেন—আমার গণনা অভ্রান্ত মশায়।

সুবেশের উত্তেজিত মন শীতল হইল, কহিল—আচ্ছা, আচ্ছা একটা মন্ত্র-টন্ত্র দেবেন—যাতে করে—

জ্যোতিষার্ণব কহিলেন—দিতে পারি বৈকি—কিন্তু আপনার তার দরকার হবে না। কারণ হাত বলছে, যাকে আপনি চান—সেও আপনাকেই চাচ্ছে। কিন্তু মাঝ থেকে—

উৎসাহিত হইয়া সুবেশ কহিল—আপনি ঠিক বলেছেন। মঞ্জুলিকা আমাকে মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসে—কিন্তু—।

বাচস্পতি বাধা দিয়া কহিলেন—আহা-হা। ও নাম তো আমিই বলে দিতুম মশায়, গণনার জোর আমার এম্‌নি। সে যে আপনাকে ভালবাসে—সে কি আর জানিনে—তবে তার বাপ মাঝ থেকে বাগড়া দিচ্ছে। কোনও চিন্তা নাই মশায়। এমন মন্ত্র দেব যে মঞ্জুলিকার বাপ পায়ে সেধে আপনাকে কন্যা দান করবে।

অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া সুবেশ কহিল—আঃ, আপনি

বাঁচালেন বাচস্পতি মশায়। আপনার আমি কেনা গোলাম হয়ে থাকবো।

বিশেষ কিছু নয়—মাত্র কয়েকটি কথার সমষ্টি। দিনের মধ্যে যতবার ইচ্ছা এবং রাত্রে শুইবার সময় ঐ কয়েকটি কথা মনে মনে আবৃত্তি করিলে আর রক্ষা নাই। এক মাসের মধ্যে অভীষ্ট লাভ হইবে নিশ্চয়—এমন কি প্রতি রাত্রে স্বপ্নে প্রার্থিত ব্যক্তিকে দেখা যাইবে পর্য্যন্ত। দক্ষিণা বেশী নয়—আপাততঃ পনরো। পরে অভিলাষ পূর্ণ হইলে পূজার জন্য যাহা দেওয়া হইবে বাচস্পতি মহাশয় তাতেই সন্তুষ্ট।

ইদানীং টাকার টানাটানি পড়িয়াছে—তবু দক্ষিণার বহর দেখিয়া সুবেশ ঘাবড়াইল না। পকেট হইতে পনরোটি টাকা বাহির করিয়া বাচস্পতি মহাশয়ের হাতে তুলিয়া দিল। বাচস্পতি মহাশয় মন্ত্রটি কাগজে লিখিয়া দিয়া বলিয়া দিলেন—মন্ত্রটি কণ্ঠস্থ হবা মাত্র কাগজ ছিঁড়ে ফেলতে হবে, কারণ এই মন্ত্র যদি আর কেউ জানতে পারে তাহলে অভীষ্ট সিদ্ধ হবে না।

বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট হইতে বিদায় লইয়া হৃষ্টচিত্তে সুবেশ মেসে ফিরিল। লেটার বাক্সে—তাহার নামে একখানি চিঠি। চিঠি দেখিয়াই সুবেশের গা জ্বালা করিয়া উঠিল—মনে মনে কহিল,—বুড়ো বাপ্ টাকার তাগিদ দিয়েছে নিশ্চয়। দুত্তোর!

তাহার বাবা লিখিয়াছে:—ইদানীং তোমার কুশলবার্ত্তা জ্ঞাত নহি, লিখিয়া নিশ্চিন্ত করিবে। উপর্য্যুপরি দুই মাস তুমি কোনও টাকা পাঠাও নাই। এই বৃদ্ধ পিতার কি করিয়া যে দিন চলিতেছে—তাহা কি একবার ভাবিয়াও দেখ না। যাহা হউক, আমার জন্য তোমাকে জ্বালাতন করিতে ইচ্ছা হয় না—তবে তোমার কুশল সংবাদ মাঝে মাঝে না পাইলে বিশেষ চিন্তান্বিত থাকি। আমার বাতের ব্যথা সম্প্রতি বাড়িয়াছে। ঔষধপত্র ব্যবহার করি কিরূপে—কারণ পয়সার অভাব।

অপর লিখি, তুমি আমার একমাত্র পুত্র। তোমার বিবাহ এ পর্য্যন্ত দিতে পারি নাই—ইহাতে আমি মর্ম্মান্তিক ক্লেশ পাই। যাহা হউক, ভগবান এবার বোধ হয় মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। নকুড় চক্রবর্ত্তীর কন্যার সহিত তোমার বিবাহের কথাবার্ত্তা একরূপ ঠিক করিয়া ফেলিয়াছি। যদি ভগবানের দয়া থাকে—আগত মাসেই বিবাহের দিন স্থির করিব। মেয়েটি বড় সুলক্ষণা, একটু ময়লা বটে, কিন্তু বাঙ্গালীর ঘরে অত দেখিলে চলে না। দিন স্থির হইলে—তুমি অন্ততঃ দশটি দিনের ছুটি লইয়া চলিয়া আসিবে।

যদি পার তাহা হইলে কিছু টাকা পাঠাইও। বড় কষ্টে আছি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক—
শ্রীহরিপদ দেবশর্ম্মা

চিঠি পড়িয়া সুবেশ মনে মনে খুব এক চোট হাসিয়া লইল—হ্যাঁ, নকুড় চক্রবর্ত্তীর মেয়েকে বিয়ে না করিলে কি তাহার চলিবে! বাবার পছন্দ বটে! চিরকাল পাড়াগাঁয়ে পড়িয়া আছেন—তাঁহার উচ্চাশা আর কতদূর হইবে। হ্যাঁ, গণৎকার বটে বাচস্পতি মশায়। এখন মন্ত্রের জোরে যদি রবার্টসন কোম্পানীর বড়বাবু মিঠা হয় তবেই রক্ষে। আচ্ছা, মঞ্জুলিকাকে বিবাহ করিয়াই বাপের কাছে লইয়া যাইবে—না বিবাহের পূর্ব্বেই সংবাদ দিবে? উঁহু, আগে সংবাদ দেওয়া হইবে না—সেকেলে প্যাটার্ণের বাপ তাহার, কি জানি কোথায় আবার বিঘ্ন ঘটিয়া বসে!

সেদিন রাত্রে শয্যায় বসিয়া অত্যন্ত আবেগ ভরে সে একশত আট বার বাচস্পতির দেওয়া মন্ত্র মনে মনে আবৃত্তি করিল, তারপর মঞ্জুলিকার মুখ ধ্যান করিতে করিতে সে ঘুমাইয়া পড়িল। সহসা মধ্যরাত্রে 'মঞ্জুলিকা' বলিয়া চীৎকার করিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল।

সমরের ঘুমও তৎক্ষণ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সে কহিল—ব্যাপার কি হে মিষ্টার ভট্চারিয়া?

সুবেশ কহিল—মন্ত্রের জোর অসাধারণ। সে এসেছিল।

সমর সহাস্যে কহিল—মাথা খারাপের লক্ষণ।

—না ভাই, মাথা খারাপ নয়, সত্যই সে এসেছিল।

সমর ভাবিল—না, ব্যাপার সুবিধের নয়। আর বেশীদূর অগ্রসর হইলে নিশ্চয়ই ইহার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিবে—এই খানেই যবনিকাপাত করা ভাল। সে কহিল—আচ্ছা আজ ঘুমোও তো—কাল গবেষণা করে দেখা যাবে কে

এসেছিল। কিন্তু শুনতে পাচ্ছি—দিলীপবাবু দুই মেয়েরই বিয়ে ঠিক করে ফেলেছেন। পরশু না কি বিয়ে।

সুবেশ হাসিয়া কহিল—আচ্ছা, দেখা যাক্। এই বলিয়া সে শুইয়া পুনরায় মনে মনে মন্ত্র আবৃত্তি করিতে লাগিল।

পরদিন সত্যই শোনা গেল—সম্মুখের বাড়ীতে রসুন-চৌকির আলাপ চলিতেছে। সুবেশের বুক টিপ টিপ করিয়া উঠিল। কিন্তু বাচস্পতি মহাশয়ের মন্ত্রকে সে অবিশ্বাস করিতে পারে না—কাল সে স্পষ্ট মঞ্জুলিকাকে দেখিতে পাইয়াছিল। দিলীপবাবু যদি সত্যই তাঁহার কন্যার বিবাহ অন্য জায়গায় স্থির করিয়া থাকেন—তাহা হইলে তাহার ফল তিনিই ভোগ করিবেন।

সমর আসিয়া কহিল—ওহে তাজ্জব ব্যাপার। দিলীপ বাবু আমার মেসোমশায়। তাঁর দুই মেয়ের বিয়েতে আমাদের মেস শুদ্ধ নিমন্ত্রণ করে গেলেন কিনা। না, না তোমার কিছু ভয় নাই, মিষ্টার ভট্টচারিয়া—আগাগোড়া আমাদেরই ভুল হয়েছে। মেসোমশায়ের মেয়ে দুটির নাম—সুধা আর বিন্দু। নাম দুটো তেমন poetic নয়। মালবিকা আর মঞ্জুলিকা—নাম দুটো কিন্তু বেশ। আমাদের মেসের মণি মিস্তিরের নাম select করবার ক্ষমতা আছে। আর ওহে, মেসোমশায় রবার্টসন কোম্পানীর বড়বাবু নয়—তিনি নাকি আলিপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট! আচ্ছা ঠকিয়েছে যাহোক আমাদের। কিন্তু আশ্চর্য্য ভাই, অতীন সান্যাল লেডি হ্যাণ্ড ফার্ষ্ট ক্লাস লেখে—কে বলবে চিঠি ঠিক মঞ্জুলিকা নাম ধেয়ে কোনও তরুণী লেখেনি। মেসোমশায় আর যাই করুন মেয়ে দুটোর বিয়েতে খরচ করবেন মন্দ নয়—আহারের আয়োজন প্রচুর হয়েছে দেখতে পাচ্ছি।

সুবেশের মাথা ঝিম ঝিম করিয়া উঠিল—তবু মনে মনে সে বাচস্পতি মহাশয়ের মন্ত্র আবৃত্তি করিতে ভুল করিল না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মন্ত্র আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে পড়িয়া গেল—নকুড় ভট্যাচার্য্যের মেয়েটি কি রকম? তাহার নাম মঞ্জুলিকা নয় তো? বাচস্পতি মহাশয়ের মন্ত্র কি আর মিথ্যা হইবে!

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায়

কর্ণেল গার্ডনার

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, পি আর এস

আয়ার্লণ্ডের অন্তঃপাতী কোলেরেণ সহরের অধিবাসী কর্ণেল উইলিয়ম গার্ডনারের (১৬৯১-১৭৬২) পাঁচপুত্র ছিল। তন্মধ্যে পঞ্চম পুত্র অ্যাডমিরাল ব্যারণ অ্যালেন হাইড গার্ডনারের (১৭৪২-১৮০৯) নাম ইতিহাসে সমধিক প্রসিদ্ধ। লর্ড গার্ডনার ইংলণ্ডের একজন সুবিখ্যাত নৌযোদ্ধা ছিলেন। তখনকার দিনের অনেক জলযুদ্ধে সবিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শনের ফলে তিনি ক্রমে বৃটিশ নৌবিভাগে এডমিরাল পদ এবং ব্যারনেট (১৭৯৪ খৃঃ) আয়র্লণ্ডের ব্যারণ (১৮০০ খৃঃ) এবং যুক্তরাজ্যের ব্যারণ (১৮০৬ খৃঃ) এই সকল মহাগৌরবময় উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা মেজর ভ্যালেণ্টাইন গার্ডনার স্বদেশের সেনাবিভাগে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং ১৬শ গণিত পদাতিকদলের সহিত ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পনের বৎসর কাল আমেরিকায় কর্ম্মনিরত ছিলেন। মার্কিন স্বাধীনতা সংগ্রামের অনেক যুদ্ধে তিনি উপস্থিত ছিলেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধের নায়ক বিখ্যাত ভাগ্যান্বেষী সৈনিক কর্ণেল উইলিয়ম লিনিয়স গার্ডনার ইঁহারই জ্যেষ্ঠপুত্র। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জুন তারিখে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। বাল্যকালে উইলিয়ম ফরাসীদেশে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন এবং মাত্র দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে ৭ই মার্চ্চ ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ৮৯তম পদাতিক রেজিমেণ্টে 'এনসাইন' পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

যশোবন্ত রাও হোলকর
(মেজর বামনদাস বসু মহাশয়ের "Rise of the Christian Power in the East" গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই উক্ত সেনাদল ভাজিয়া দেওয়া হইলে তাঁহাকে অর্দ্ধ বেতনে অবসর দেওয়া হয়। ইহার কয়েক বৎসর পরে ৭৪ সংখ্যক হাইলাণ্ডার রেজিমেণ্টে পূর্ণ-বেতনে এনসাইন' পদে নিযুক্ত হইয়া তিনি ভারতবর্ষে আগমন করেন (৬।৩।১৭৮৯)। ঐ বৎসরই অক্টোবর মাসে তিনি ৫২ সংখ্যক পদাতিক দলে লেফটেনাণ্ট পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ইহার পর তিনি আবার ইংলণ্ডে ফিরিয়া গিয়াছিলেন, কারণ রেজিমেণ্টের অসম্পূর্ণ নামের তালিকা হইতে প্রকাশ যে ১৭৯১-৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ডিপো কোম্পানীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া স্বদেশে বাস করিতেছিলেন। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে গার্ডনার ৩০শ গণিত পদাতিক দলে কাপ্তেন পদলাভ করেন। কিন্তু তাঁহার রেজিমেণ্ট ভারতবর্ষে প্রেরিত হইলেও তিনি সেই সময় তাহাদের সহিত এদেশে আসেন নাই; অর্দ্ধ-বেতনে অন্য এক কোম্পানীতে কর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়াছিলেন। পর বৎসর ফ্রান্সের পশ্চিম প্রান্তে কুইবেরণ উপসাগরে Sombreuil এবং জেনারেল লর্ড ময়রার*-এর নেতৃত্বে ফরাসী রাজতান্ত্রিক ও বৃটিশসেনার যে সম্মিলিত অভিযান প্রেরিত হইয়াছিল, গার্ডনারও সেই দলে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু এই আক্রমণ-প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছিল।

* উত্তরকালে আর্ল ময়রা বা মার্কুইস অব হেষ্টিংস নামে সুপ্রসিদ্ধ ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল।

জেনারেল হোশ্ পরিচালিত ফরাসী সাধারণতন্ত্রী সেনাদল অনায়াসেই উহাদের পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়াছিল। এই উপলক্ষ্যে লর্ড রডনের সহিত গার্ডনারের প্রথম পরিচয় সংঘটিত হয়। দীর্ঘকাল পরে ভারতবর্ষে আবার তাঁহাদের উভয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

ইহার প্রায় এক বৎসর কাল পরে গার্ডনার ভারতবর্ষে আসিয়া নিজ রেজিমেণ্টে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহার অবশিষ্ট জীবন অতঃপর এই দেশেই অতিবাহিত হইয়াছিল; তিনি আর স্বদেশে ফিরিয়া যান নাই। কিন্তু ভারতবর্ষে আসিবার পর গার্ডনার আর অধিককাল ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের অধীনে কার্য্য করেন নাই। কি জন্য তিনি কোম্পানীর সেনাবিভাগ পরিত্যাগ করিয়া দেশীয় দরবারে কর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার প্রকৃত কারণ আজিও অজ্ঞাত। এ সম্বন্ধে সম্ভব অসম্ভব বহুবিধ কাহিনীর প্রচলন আছে। তাহার মধ্যে কোন্‌টি প্রকৃত, অথবা কোনটী আদৌ প্রকৃত কিনা তাহা সঠিক নির্দ্ধারণের কোন উপায় নাই। সুতরাং বাহুল্যবোধে তাঁহার কর্ম্মত্যাগ সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনীগুলির কোন উল্লেখ না করিয়া সংক্ষেপে এখানে বলা ভাল যে, অতঃপর আবার যখন তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায় তখন তিনি সিন্ধিয়ার সহিত বলপরীক্ষায় লিপ্ত যশোবন্ত রাও হোলকরের অধীনে পাশ্চাত্য সমরপদ্ধতিতে শিক্ষিত এক পদাতিক ব্রিগেডের অধিনায়ক।*

ইতিপূর্ব্বে হোলকরের সৈন্যাধ্যক্ষ শ্লেভালিয়ে দুদ্রেনেক প্রসঙ্গে যশোবন্তরাওয়ের ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। সিন্ধিয়ার সহিত তাঁহার বিরোধের কাহিনী; উজ্জয়িনী, ইন্দোর ও পুণাযুদ্ধের বিবরণ; তাহার ফলে পেশবার ইংরাজদিগের আশ্রয় গ্রহণ এবং তাহা হইতে ইঙ্গ-মারাঠা সমরের সূত্রপাত সকল কথাই সবিস্তারে বলা হইয়াছে,—পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু উক্ত ঘটনাবলীর সহিত গার্ডনারের কতদূর সম্বন্ধ ছিল অর্থাৎ হোলকরের কর্ম্মাধীন থাকা কালে তাঁহার জীবন সম্বন্ধে কোন কথা জানা যায় না। যশোবন্তের মনে প্রথম হইতেই দুরভিসন্ধি ছিল। সম্মিলিত মারাঠা নৃপতিগণের ইংরাজদিগের সহিত আসন্ন সমরে তাঁহার সেনাদল কোন পথে কি ভাবে অভিযান করিবে তাহা স্থির হইলেও তিনি কিন্তু মনে মনে প্রথম হইতেই যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকিবেন স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি মনে ভাবিয়াছিলেন যে যুদ্ধে একপক্ষ পর্য্যুদস্ত হইলে এবং বিজেতৃদলও কতকটা দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে উহাদের উভয়কে নির্জ্জিত করিয়া সমগ্র দেশে আধিপত্য বিস্তার করা তাঁহার পক্ষে কিছুমাত্র আয়াসসাধ্য ব্যাপার হইবে না। এই হীন স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া যশোবন্ত রাও শেষ পর্য্যন্ত স্বজাতীয়গণের সহিত স্বদেশের শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন না; সমরসজ্জায় সজ্জিত হইয়া রঙ্গভূমি হইতে অদূরে উদাসীন দর্শকবৎ নিশ্চেষ্ট রহিলেন এবং তাঁহার নিষ্ক্রিয়তার মূল্যস্বরূপ ইংরাজদিগের সহিত একটা বন্দোবস্ত স্থাপনে সমুৎসুক হইয়া তাহাদের প্রধান সেনাপতি লর্ড লেকের নিকট একজন প্রতিনিধি পাঠাইলেন। বোধহয় সেনাপতি মহাশয়ের স্বদেশীয় বলিয়া তিনি গার্ডনারকেই দৌত্যকার্য্যের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। অতঃপর যাহা ঘটিয়াছিল তাহা গার্ডনারের নিজের ভাষাতে বলা যাইতেছে;—"আমাকে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। আমার পরিবারবর্গ শিবিরে অবস্থান করিতে লাগিল। আমার দীর্ঘ অনুপস্থিতি সন্দেহের উদ্রেক করিয়াছিল এবং যে দিন আমার ফিরিবার কথা তাহার তৃতীয় দিনেও আমি না আসাতে হোলকরের দরবারে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনীত হইয়াছিল। দরবার ভাঙ্গিবার পূর্ব্বেই আমি আসিয়া পঁহুছিয়াছিলাম। আমাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মহারাজ ক্রুদ্ধস্বরে আমার বিলম্বের কারণ জানিতে চাহিলেন। আমি সে কথা তাঁহাকে বলিলাম এবং কি জন্য ইতিপূর্ব্বে প্রত্যাবর্ত্তন করা সম্ভব হয় নাই তাহাও জানাইলাম। ইহাতে হোলকর মহাক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "আজ যদি তুমি না আসিতে তাহা হইলে আমি তোমার শিবিরের কানাৎকে ফেলাইয়া দিতাম।" আমি

* ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে সার জন শোরের শাসনকালে কোম্পানীর বেতনভোগী সৈনিকগণের মধ্যে বিষম অসন্তোষের স্রোত বহিয়াছিল। বহু সৈনিক সেই সময় কোম্পানীর কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দেশীয় নৃপতিবৃন্দের সেনাদলে প্রবেশ করিয়াছিল। ইহাই এদেশের তৃতীয় "হোয়াইট মিউটিনি।" সম্ভবতঃ গার্ডনারও এই সময় কর্ম্মত্যাগ করিয়াছিলেন।

তৎক্ষণাৎ আমার অসি কোষমুক্ত করিয়া তাঁহাকে কাটিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার নিকটে যাহারা উপস্থিত ছিল তাহারা বাধা দিল। আমার আচরণজনিত বিস্ময় ও বিশৃঙ্খলা হইতে তাহারা সকলে আত্মসম্বরণ করিবার পূর্ব্বেই আমি সবেগে শিবির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম এবং এক উল্লম্ফনে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অনতিকাল মধ্যে বহুদূরে পলায়ন করিয়াছিলাম।

শিবিরের কাণাৎ সমভূমি করিয়া দিবার নামে গার্ডনারের ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইবার কারণ এখানে বলা প্রয়োজন। তিনি এক মুসলমান নবাবজাদীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। একে তাঁহার বিশ্বস্ততায় সন্দেহ, তাহার উপর আবার তাঁহার "জেনানা"র অবমাননা ;—এই উভয়বিধ কারণে তিনি সম্বিৎ হারাইয়াছিলেন, "যাহা কোন এশিয়াবাসী কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইলে কোন ইউরোপীয় রক্ষা করিতে পারে না।"

গার্ডনারের বিবাহের বিচিত্র কাহিনী তাঁহার নিজের ভাষাতেই দেওয়া ভাল। "আমার বয়স যখন অল্প ছিল তখন একবার কাম্বেপ্রদেশের জনৈক নৃপতির সহিত সন্ধি স্থাপনের ভার আমার প্রতি সমর্পিত হইয়াছিল। দরবার এবং আলোচনা কার্য্য অনেকদিন ধরিয়া চলিয়াছিল। একটা দরবারের সময়,—আমি তাহাতে উপস্থিত ছিলাম—আমার সমীপবর্ত্তী একটি যবনিকা ধীরে ধীরে আন্দোলিত হইল এবং আমার মনে হইয়াছিল বুঝি বা জগতের মধ্যে সুন্দরতম দু'টি কালো চোখ আমি দেখিলাম। সন্ধির কথা চিন্তা করা অতঃপর সম্ভব হইল না। সেই উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ চাহনি, সেই দু'টি কৃষ্ণতার নয়ন আমাকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল।

ঘনকৃষ্ণ মনোরম ঐ দুটি চোখের সুন্দরী অধিকারিণী আমাকে দেখিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন এ কথা মনে ভাবিয়া আমি যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে লাগিলাম। দরবারে উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ যদি যবনিকার আন্দোলন দেখিতে পাইত তাহা হইলে ঐ রহস্যময়ী সুন্দরীর অদৃষ্টে কি বিপদ না ঘটিত কে জানে! দরবার কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আমি সন্ধান লইয়া জানিলাম যে উজ্জ্বলনয়না সুন্দরী স্বয়ং নবাবের কন্যা। পরবর্ত্তী দরবারে আর একবার সেই উজ্জ্বল চোখ দুটি,—যাহা দিবসে আমার ধ্যানের এবং নিশিতে আমার স্বপ্নের বিষয়ীভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—দেখিবার জন্য আমার উৎকণ্ঠার অবধি রহিল না। পর্দ্দা আবার ধীরে ধীরে নড়িয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার ভাগ্যও নির্ণীত হইয়া গেল।

আমি নবাবজাদীর পাণিপ্রার্থনা করিলাম। প্রথমটায় তাঁহার আত্মীয়বর্গের ক্রোধ-বিরাগের সীমা রহিল না, তাঁহারা দৃঢ়ভাবে আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন। কিন্তু পরে সবিশেষ পর্য্যালোচনার পর রাজদূতের ন্যায় প্রভাবশালী ব্যক্তির অনুরোধ রক্ষা না করা উচিত হইবে না * বিবেচনা করিয়া তাঁহারা নবাবজাদীর কর প্রদানে সম্মত হইয়াছিলেন। বিবাহের আয়োজন চলিতে লাগিল। আমি বলিলাম 'স্মরণ রাখিও, আমাকে প্রতারণা করার চেষ্টা বৃথা হইবে। ঐ দুটি চোখ আমি দেখিলেই চিনিব। আমি অপর কাহাকেও বিবাহ করিব না।"

বিবাহের সময় আমি বধূর মুখ হইতে অবগুণ্ঠন অপসারিত করিলাম। মুসলমান বিবাহপদ্ধতি অনুসারে আমাদের উভয়কার মধ্যে রক্ষিত দর্পণমধ্যে আমি আবার সেই উজ্জ্বল নয়ন দুইটির ছায়া দেখিলাম যাহা আমাকে যাদু করিয়াছিল। আমি মৃদু হাসিলাম। বালিকা বধূও হাসিলেন।"

এখানে বলা আবশ্যক নবাবজাদী তখন ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা মাত্র ছিলেন। উপাধিসহ তাঁহার প্রকাণ্ড নামটী এইরূপ, "ফরজন্দ আজিজা জুবদেহ্-তুল আরাকিন উমদেহ্-তুল আস্সাতিন নবাব সাহ্ মঞ্জিল উন্নিসা বেগম দেহ্লসি"। সম্রাট দ্বিতীয় আকবর সাহ এবং তাঁহার মহিষী উহাঁর সহিত ধর্ম্মকন্যা সম্বন্ধ পাতাইয়াছিলেন। সে হিসাবে গভর্ণর মোগল বাদসাহের, তা তাঁহার অবস্থা যত শোচনীয়ই হউক না কেন, জামাতা ছিলেন!

গার্ডনারের পলায়নের কাহিনী আবার বলা যাইতেছে।

* ইহা হইতে কমটন মনে করেন গার্ডনার তখন কোম্পানীর কর্ম্মনিরত ছিলেন। কিন্তু ভারত সরকারের দফতরে রক্ষিত কাগজ পত্র হইতে জানা যায় যে এই ঘটনার পূর্ব্বেই তিনি তাঁহাদের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন।

হোলকয়ের শিবির হইতে পলায়নকালে তিনি পথিমধ্যে পেশবার ভ্রাতা অমৃতরাওয়ের হস্তে পড়িয়াছিলেন। তিনি গার্ডনারকে মারাঠাপক্ষে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে আদেশ দিলেন এবং জানাইলেন ঐ কার্য্যে অসম্মত হইলে তাঁহাকে তোপের মুখে উড়াইয়া দেওয়া হইবে। গার্ডনার স্বজাতির বিরুদ্ধে অস্ত্র পরিগ্রহণে কিছুতেই সম্মত হইলেন না; তখন তাঁহাকে ভয় দেখাইবার জন্ম একটি তোপের মুখে বাঁধা হইয়াছিল, তথাপি তিনি অচঞ্চল রহিলেন। তখনকার মত তাঁহাকে হত্যা না করিয়া অমৃতরাও তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিলেন; আশা করিয়াছিলেন পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে ভীতি প্রদর্শনের ফল ফলিতে পারে। তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্ম একদল প্রহরী নিযুক্ত হইয়াছিল, উহাদের আদেশ দেওয়া হইল যেন এক মুহূর্ত্তের তরেও তাঁহাকে দৃষ্টির বাহিরে যাইতে না দেওয়া হয়। কিন্তু গার্ডনার এক আশ্চর্য্য কৌশলে তাহাদের কবল হইতে পলায়ন করিলেন। একদিন অমৃতরাওয়ের সেনাদল পর্ব্বতের এক উচ্চ সানুদেশ দিয়া যাইতেছিল। সুযোগ বুঝিয়া গার্ডনার উপর হইতে লম্ফ দিয়া প্রায় পঞ্চাশ ফুট নিম্নে সমতল ভূমিতে নিপতিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া অদূরবর্ত্তী খরস্রোতা তাপ্তীর সলিলপ্রবাহ লক্ষ করিয়া ধাবিত হইলেন। ঐ পথে রক্ষীসৈন্যগণ তাঁহার অনুসরণ করিতে সাহস করিল না। গোলমালে কতকটা সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। তাহারা অন্য পথে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে সমর্থ হইবার পূর্ব্বে তিনি নদীবক্ষে সন্তরণ করিয়া অনেকটা চলিয়া গেলেন। কিন্তু তাহারা ক্রমশঃ নিকটে আসিয়া পড়িতেছে দেখিয়া পরিশ্রান্ত গার্ডনার কূলের সমীপে এক গুপ্তস্থানে সর্ব্ব শরীর জলমধ্যে নিমজ্জিত করিয়া শুধু মুখটি বাহির করিয়া রহিলেন। উহারা তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়া গেলে গার্ডনার অপর পারে গিয়া উঠিলেন এবং সাধারণের ব্যবহৃত পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্য এক পথে অদূরবর্ত্তী এক নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানকার কিল্লাদারের সহিত তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই পরিচয় ছিল। তাহার আশ্রয়ে কিছুকাল একান্ত অপরিহার্য্য বিশ্রামসুখ লাভ করিয়া ক্লান্তি অপনোদিত হইলে পরে গার্ডনার ঘেসেড়ার ছদ্মবেশে আবার বাহির হইলেন এবং দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া পরিশেষে লর্ড লেকের সৈন্যদলে আসিয়া পহুঁছিয়াছিলেন। তখন মারাঠাদিগের সহিত সংগ্রামের অবসান হইয়াছিল। মারাঠা সেনাদলভুক্ত বৃটিশজাতীয় সৈনিকগণকে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট যে পেন্সন দিয়াছিলেন তাহার তালিকাদৃষ্টে জানা যায় যে গার্ডনার তাঁহাদের নিকট হইতে মাসিক ৯০০৲ টাকার পেন্সন লাভ করিয়াছিলেন।

পর বৎসর হোলকরের সহিত ইংরাজদিগের আবার সংগ্রাম বাধিল। লর্ড লেক এই যুদ্ধে তাঁহাদের মিত্র জয়পুরাধিপতির অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্ব গার্ডনারকে প্রদান করিয়াছিলেন। উহাদের সহিত তিনি অন্যতম ইংরাজ সেনাপতি কর্ণেল মনসনের সহযোগিতা জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। যশোবন্তরাওয়ের হস্তে মনসনের লজ্জাস্কর পরাজয় এবং কলঙ্কের ডালি শিরে লইয়া প্রত্যাবর্ত্তনের কথা ঐতিহাসিকের নিকট সুপরিচিত। ভারতবর্ষে ইংরাজ সেনার ঐরূপ পরাজয় খুব কমই ঘটিয়াছে।

অতঃপর গার্ডনার কর্ণেল স্কিনার গঠিত Skinner's Horse-এর অনুরূপ একদল অনিয়মিত অশ্বারোহী সৈন্য সংগঠনে আদিষ্ট হন। সিন্ধিয়ার ভূতপূর্ব্ব সৈনিকগণের মধ্য হইতে প্রধানতঃ ঐ দুই দল গঠিত হইয়াছিল। তাঁহার নামে ঐ সৈন্যদল Gardener's Horse নামে অভিহিত হইত। উহাদের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ইটা জেলায় কাসগঞ্জে জায়গীর দিয়াছিলেন। প্রধানতঃ আগ্রা প্রদেশে শান্তিরক্ষা ও রাজস্ব সংগ্রহ কার্য্যে ঐ সৈনিকগণ নিযুক্ত ছিল। গার্ডনারকে উক্ত রেজিমেণ্টের কর্ণেল পদ প্রদত্ত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য কোম্পানীর নিয়মিত সেনা বিভাগে তাহাকে উক্ত বা অপর কোন পদ তখনও স্থায়ীভাবে দেওয়া হয় নাই। যশোবন্তরাও গার্ডনারের বেগমের প্রতি কোন অসদ্ব্যবহার করেন নাই। যথাকালে তিনি কাসগঞ্জে স্বামী সকাশে আসিয়া মিলিত হইয়াছিলেন। অতঃপর কাসগঞ্জই তাঁহাদের ভবিষ্যৎ বাসস্থানে পরিণত হইয়াছিল। এইখানে নিজ সুবিশাল জমিদারীর তত্ত্বাবধান করিয়া ও নিজ ভারতীয় ভাবাপন্ন পরিবারবর্গকে লইয়া গার্ডনারের অবশিষ্ট জীবন পরম সুখে অতিবাহিত হইয়াছিল।

অতঃপর আবার নেপাল যুদ্ধের সময় রণস্থলে গার্ডনারের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ইংরাজদিগের পক্ষে উক্ত বিষম সময়ে সাফল্যলাভ এবং তাহার ফলে নেপাল রাজ্যের সহিত চিরকালের মত সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি এবং সিমলা, মুশুরী, ডেরাডুন, আলমোরা, রাণীক্ষেত, নৈনিতাল প্রভৃতি রমণীয় স্বাস্থ্যকর স্থান সমূহ পরিশোভিত পার্ব্বত্য জনপদের আধিপত্য লাভের মূলে অনেকাংশে গার্ডনারের কৃতিত্ব ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সত্য বটে গুর্খাবীর অমর সিংহ ইংরাজ সেনানায়ক অক্টারলোনীর হস্তে পরাজিত হইয়া আত্মসমর্পণে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু যে সামরিক কৌশলের জন্য তাঁহাকে পরাজিত ও আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইতে হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে গার্ডনারের পরিকল্পনা এবং তাঁহার দ্বারাই কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল।

নেপালের সহিত যুদ্ধ বাধিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে গার্ডনার এবং তাঁহার পিতৃব্য-পুত্র দিল্লীর সরকারী রেসিডেণ্ট অনারেবল এডওয়ার্ড গার্ডনার হরিদ্বার-ডেরাডুন অঞ্চলে শিকার উদ্দেশ্যে পরিভ্রমণে যাইবার আয়োজন করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে কোন কারণ বশতঃ এডওয়ার্ডের পক্ষে যাওয়া সম্ভব হইল না। উইলিয়ম একাই বাহির হইলেন। পর্য্যটনকালে পথিমধ্য হইতে তিনি এডওয়ার্ডকে যে সকল চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে তাঁহার নিজের জীবন এবং তৎকালীন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজ সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়। ডেরাডুনে গিয়া গার্ডনার এক বিষম বিপদে পড়িয়াছিলেন। তথাকার গুর্খা শাসনকর্ত্তার তাঁহার সানুচর সশস্ত্র অবস্থায় আগমন রুচিকর হয় নাই। তখন নেপাল দরবারের সহিত ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের বিষম মনোমালিন্য চলিতেছিল। গুপ্তচর সন্দেহে তিনি গার্ডনারকে বন্দী করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু স্থানীয় শিখ মন্দিরের মোহান্তের মধ্যবর্ত্তিতায় গার্ডনার রক্ষা পাইলেন। গুর্খারা তাঁহার প্রাণবধ না করিয়া তাঁহাকে অবাধে নিজের এলাকায় ফিরিয়া যাইতে দিয়াছিল (এপ্রিল ১৮১৪)।

বর্ষ শেষ হইবার পূর্ব্বে নেপালের সহিত যুদ্ধ বাধিল। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে নেপাল বিজয়ের পর হইতে গুর্খারা মধ্যে মধ্যে নিজেদের রাজ্যসীমানা ছাড়াইয়া পার্শ্ববর্ত্তী জনপদ সমূহে প্রবেশ করিয়া অত্যাচার উপদ্রব করিত। ঐ সকল অঞ্চলে ইংরাজাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পরও তাহাদের স্বভাবে কোনও পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। এ সম্বন্ধে দরবারের নিকট বহু অনুযোগ অভিযোগ করিয়াও কোন ফল হয় নাই। ক্রমে তাহাদের অত্যাচার সহ্যসীমা অতিক্রম করিল। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে গুর্খারা বড় বেশী রকম উপদ্রব করিয়াছিল। সর্ব্ববিধ প্রতিকারের চেষ্টা ব্যর্থ হইল দেখিয়া গভর্ণর-জেনারেল লর্ড হেষ্টিংস অবশেষে যুদ্ধ করাই মনস্থ করিলেন। নেপাল সীমানার অদূরে সর্ব্বসমেত ত্রিশ হাজারেরও অধিকসংখ্যক সুশিক্ষিত সৈন্য সমবেত হইল। উহারা চারিটি বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া শত্রুর মধ্যে প্রবেশে আদিষ্ট হইয়াছিল। স্থির হইল প্রথমদল অক্টারলোনীর নেতৃত্বে নেপাল রাজ্যের পশ্চিম প্রান্ত আক্রমণ করিবে। জেনারেল জিলেস্পী ডেরাডুন অধিকার করিয়া জৈঠকের সুরক্ষিত দুর্গ আক্রমণে অগ্রসর হইবেন। তৃতীয় দলের অধিনায়ক জেনারেল উড গোরক্ষপুর হইতে ভাটোয়াল ও শিবরাজের পথে যাত্রা করিয়া পালপা অধিকারে গমন করিবেন এবং চতুর্থ দল লইয়া জেনারেল মারলে মক কানপুরের পথে কাঠমাণ্ডু অভিমুখে যাত্রা করিবেন। নভেম্বর মাসে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজদিগের সকল কল্পনা আকাশকুসুমে পরিণত হইল। দেখা গেল যে সকলে যাহা আশা করিয়াছিলেন এ যুদ্ধ তত সহজ হইবার নহে। প্রথমটায় উপর্য্যুপরি ব্যর্থতায় ইংরাজ সেনা কি প্রকার অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল তাহা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রে অবগত আছেন। দ্বিতীয় সেনাদলই প্রথম যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং প্রথম হইতেই পরাজয়ের কালিমা তাহাদের অঙ্গের ভূষণ হইয়াছিল। মুষ্টিমেয় শত্রু সৈন্য কর্ত্তৃক রক্ষিত কালুপার ক্ষুদ্র ফাঁড়ি আক্রমণ করিতে গিয়া ইংরাজবাহিনী তিনবার পরাজিত হইয়া ফিরিল। সমগ্র দুর্গরক্ষীগণ সংখ্যায় যত ছিল তাহা অপেক্ষা বহুগুণ অধিক ইংরাজ সৈন্য এই ব্যাপারে বিনষ্ট হইয়াছিল ; এবং সেনাধ্যক্ষ মেজর-জেনারেল স্যার রবার্ট রোলো জিলেস্পী প্রাণ হারাইলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী সেনাপতি মার্টিনডেল ডিসেম্বর মাসে জৈঠকের যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া অগ্রগমনে নিরস্ত হইলেন। উড এবং

মারলে কিছু করিতে পারিলেন না। শেষোক্ত সেনানায়ক রীতিমত ভীরুতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি ক্রমাগত তোপ ও সৈন্য চাহিয়া পাঠাইতে লাগিলেন এবং পরিশেষে তাঁহার সম্মুখীন শত্রুবাহিনী অপেক্ষা দশগুণ অধিক সৈন্য লইয়াও কিছুই করিলেন না। শুধু তাহাই নহে, একদিন রাত্রিকালে গুর্খাদিগের আক্রমণভয়ে ভীত হইয়া তিনি একাকী অশ্বারোহণে হেড-কোয়ার্টার্সে পলায়ন করিয়াছিলেন। শুধু পশ্চিমে অক্টারলোনী কোনমতে ইংরাজের মান রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সহযোগীবৃন্দের মত পরাজয়ের কলঙ্কভাগী না হইলেও শত্রুসেনাপতি অমর সিংহের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে তিনি যে প্রকার ধীর মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতেছিলেন তাহাতে তাঁহার প্রতিও ভরসা করিবার বিশেষ কিছু ছিল না। এইরূপে চারিজন সেনাপতির মধ্যে তিনজন পরাজিত ও অকৃতকার্য্য হওয়াতে শুধু যে গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছিল তাহা নহে; ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ইংরাজের অজেয়ত্বে বিশ্বাস কিয়ৎ-পরিমাণে শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল।

তীক্ষ্ণদৃষ্টি গার্ডনার এই সময় শত্রুর রাজ্যমধ্যে একটি বিষম দুর্ব্বল স্থানের আবিষ্কার করিলেন এবং কালবিলম্ব ব্যতিরেকে উক্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করার ফলে পরিণামে ইংরাজরাই বিজয়লাভ করিল। গুর্খারা অগ্রপশ্চাৎ সবিশেষ বিবেচনা না করিয়া ইতিপূর্ব্বে নিজেদের অধিকার বিস্তার করিয়াছিল; এক্ষণে উহাই তাহাদের পরাজয়ের কারণ হইল। মাত্র ১২০০০ সৈন্য লইয়া তাহাদের ৭০০ মাইল দীর্ঘ সীমানা রক্ষা করিতে হইতেছিল। রাজধানী কাঠামাণ্ডু এবং সর্ব্ব পশ্চিমপ্রান্তে মালাওন নামক স্থানে যুদ্ধনিরত অমর সিংহের মধ্যে কুমায়ুন প্রদেশ অবস্থিত ছিল। উহার ভিতর দিয়া অমরসিংহের নিকট সৈন্য সাহায্য ও রসদাদি যাইত। অপরাপর যুদ্ধক্ষেত্রে আবশ্যকতাবশতঃ কুমায়ুন প্রদেশ মধ্যে তেমন বেশী গুর্খা সৈন্য ছিল না। তথাকার প্রধান নগর আলমোরাও তাদৃশ সুরক্ষিত ছিল না। সুদক্ষ সৈনিকোচিত দূরদৃষ্টিতে গার্ডনার শত্রুর দুর্ব্বলতা এবং কুমায়ুন প্রদেশের ভবিষ্যৎ মূল্য বুঝিয়া পূর্ব্বোক্ত এডওয়ার্ড গার্ডনারকে তৎক্ষণাৎ ঐ জনপদ অধিকারের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। ২১শে নভেম্বর ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি এক পত্রে তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন,—"আমার মনে হয় যদি আমরা অন্য উপায়ে কৃতকার্য্য হই তাহা হইলে তোমার সৈন্যদের এ আক্রমণ বৃথাই হইবে। যে যাহা হউক, ইহাতে অপর কোন ফললাভ না হইলেও উহাদের সৈন্যদল দুইভাগে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে ও তাহাদের কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত রাখিবে এবং এইরূপে অমরসিংহের নিকট সাহায্য পৌছান বন্ধ হইবে।" কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত প্রস্তাব অনুমোদন করিলে দুই বিভিন্ন স্থান হইতে কুমায়ুন আক্রমণের ব্যবস্থা করা হইল। কর্ণেল গার্ডনার এবং তাঁহার শ্যালীপতি মেজর হায়দার ইয়ং হিয়াসের্ * প্রতি ঐ কার্য্যভার প্রদত্ত হইয়াছিল (৮।১২।১৮১৪)। এডওয়ার্ড গার্ডনারকে কুমায়ুনের কমিশনার নিযুক্ত করিয়া উহাঁদের দুইজনকে রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁহার অধীনে স্থাপন করা হইল। মোরাদাবাদ জেলার অন্তর্গত কাশীপুর হইতে গার্ডনার ৩০০০ এবং বেরিলি ও পিলিভিট হইতে হিয়ার্সে ১৫০০ রেহিলা সৈনিক সংগ্রহ করিলেন। গার্ডনার কোসী উপত্যকার পথে এবং হিয়ার্সে পিলিভিট হইতে কালীনদীর তট ধরিয়া অগ্রসর হইয়া টিমলাপাসের পথে কুমায়ুন প্রদেশে প্রবেশ করিবেন স্থির হইয়াছিল। এইরূপে গুর্খাদিগের সহিত যুদ্ধ দুইটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে পরিণত হইল; প্রথমটী পূর্ব্ববৎ শতদ্রু-তটে এবং অপরটী গণ্ডকী অঞ্চলে। শেষোক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরাজসৈনা কৃতকার্য্য হইতে পারিলে শতদ্রুতটে অমরসিংহের স্বদেশের সহিত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়া নিশ্চিত ছিল।

জানুয়ারী মাসের শেষে ইংরাজসেনা কুমায়ুনে প্রবেশ করিল। গুর্খাগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত ঐদেশের পূর্ব্বতন নৃপতির মন্ত্রী হরখ দেওজোষী গার্ডনারের সহিত এই অভিযানে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সবিশেষ চেষ্টার ফলে দেশের অধিবাসীগণ আক্রমণকারীদের পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক নানা বিষয়ে তাহাদের পরম সাহায্য করিয়াছিল।

* এই ব্যক্তি এককালে সিন্দিয়ার উপরে জর্জ্জ টমাসের সৈন্যদলে ছিলেন। স্বতন্ত্র এক প্রবন্ধে ইহার কথা বলা যাইবে।

শত্রুসেনার আগমনসংবাদে গুর্খারা আলমোরার পথে বহু স্থান যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত সুরক্ষিত করিতে সচেষ্ট হইল। কিন্তু গার্ডনার সোজা রাস্তায় না গিয়া বক্রপথে ঘুরিয়া রাণীক্ষেতের দুর্গম পার্ব্বত্যপথে অগ্রসর হইলেন। ২২শে মার্চ্চ রাণীক্ষেতে ৮১০ নূতন সৈনিক আসিয়া তাঁহার দলপুষ্টি করিল। অনন্তর তিনি আলমোরা অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং যথাকালে উক্ত সুদৃঢ় গুর্খাদুর্গের সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইলেন। হিয়ার্সে এখানে আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিলে উভয়ে একযোগে দুর্গ আক্রমণ করিবেন স্থির ছিল। কিন্তু হিয়ার্সেকে আর সসৈন্যে আসিতে হইল না। ৩১শে মার্চ্চ তারিখে এক যুদ্ধে তিনি গুর্খাহস্তে পরাজিত এবং আহত হইয়া স্বয়ং ধৃত হইয়াছিলেন। গুর্খারা তাঁহাকে বন্দী করিয়া আলমোরায় লইয়া আসিয়াছিল। ২৫শে এপ্রিল গার্ডনার নিজ সৈন্যদলসহ আলমোরা আক্রমণ করিলেন। গুর্খারা দুর্গ হইতে বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে বাধাদানে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে পুনরায় দুর্গমধ্যে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এমন সময় দুই হাজার নূতন সৈন্য লইয়া কর্ণেল (পরে সার জ্যাসপার) নিকোলস আসিয়া তাঁহার হস্ত হইতে নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। তখন সংখ্যায় বলীয়ান ইংরাজসেনা আবার মহোৎসাহে আলমোরা আক্রমণ করিল। এবার গার্ডনার সসৈন্যে নগর মধ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; রাত্রিযোগে শত্রুসেনা তাঁহাকে ভীষণভাবে পুনরাক্রমণ করিলেও তিনি তাহাদের বিতাড়িত করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে ইংরাজসেনা দুর্গ আক্রমণ করিল। তখন আর কোন আশা নাই দেখিয়া দুর্গরক্ষী বামসাহ বিপক্ষের সহিত সর্ত্তনিরূপণে দৌত্যকার্য্যে তাঁহাদের হস্তে বন্দী হিয়ার্সেকে প্রেরণ করিলেন। স্থির হইল গুর্খারা তাহাদের সুরক্ষিত স্থান সমূহ ইংরাজহস্তে সমর্পণ, সমগ্র কুমায়ুন প্রদেশ পরিত্যাগ এবং হিয়ার্সেকে মুক্তিদান করিবে; পরিবর্ত্তে ইংরাজ সেনাপতি তাহাদের নেপাল প্রত্যাবর্ত্তনে বাধা দিবেন না। অতঃপর গার্ডনার কিছুকাল নিজ সৈন্যদলসহ আলমোরা অঞ্চলে, পশ্চিম-সীমান্তে অক্টারলোনীর সহিত সমরনিরত অমরসিংহকে তাঁহার কেন্দ্রদেশ হইতে বিচ্যুত কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। এদিকে ছয়মাস অনবরত যুদ্ধের ফলে সেই সময় অক্টারলোনী এমন এক স্থানে আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন যেখান হইতে নিশ্চল দ্বিতীয় বাহিনীর সহযোগিতায় তিনি প্রতিপক্ষকে কতকটা কোণঠাসা করিয়া তুলিয়াছিলেন। অতঃপর গার্ডনার কর্তৃক স্বদেশের অভ্যন্তরভাগ হইতে সম্বন্ধচ্যুত সৈন্য ও রসদবিহীন গুর্খাবীর অমরসিংহ প্রত্যাবর্ত্তনের পথও রুদ্ধ দেখিয়া শত্রুকরে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন (১০।৫।১৮১৫)। যমুনার পশ্চিমপ্রান্তবর্ত্তী সমগ্র ভূভাগ এবং কুমায়ুন প্রদেশের অধিকার ইংরাজরা দাবী করিলেন। কিন্তু গুর্খাদরবার ঐসর্ত্তে সন্ধি স্থাপন করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তখন আবার উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধিল। অক্টারলোনী নূতন উদ্যমে শত্রু-রাজধানী অধিকারে অগ্রসর হইলেন। ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি কাঠমাণ্ডুর অদূরে আসিয়া দেখা দিলেন। তখন নেপালদরবার প্রমাদ গণিয়া ইংরাজদিগের সর্ত্তমত সন্ধি স্থাপনে ব্যগ্র হইলেন। ৩রা মার্চ্চ সিগৌলির সন্ধিতে উভয় পক্ষে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। সে শান্তি আজিও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

নেপালসমরে গার্ডনারের গুণের মর্য্যাদাস্বরূপে পর বৎসর গভর্ণমেণ্ট তাঁহার অনিয়মিত অশ্বারোহীদল তাঁহাদের সৈন্যবিভাগের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন। উহাদের ব্যয়ভার অতঃপর সরকারী তহবিল হইতে নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। তজ্জন্য গার্ডনারকে প্রদত্ত জায়গীরগুলি তাঁহাকে বংশগত জমিদারীভাবে দেওয়া হইল। তদ্ভিন্ন কোম্পানী তাঁহাকে আরও কয়েকটী নূতন সম্পত্তি দিয়াছিলেন। সমগ্র ইটা জেলাই এককালে গার্ডনারের জমিদারী ছিল। গার্ডনারের রেজিমেণ্ট বর্ত্তমানে ভারতীয় সেনাবিভাগে 2nd Bengal Cavalry নামে পরিচিত।

লর্ড হেষ্টিংস মার্কুইস ওয়েলেস্‌লির উপযুক্ত মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং গুরুর আরব্ধ কার্য্য অনেকাংশে সমাধা করিয়া গিয়াছিলেন। পেশবার রাজ্যবিলোপ তাঁহার শাসনকালের

অন্যতম প্রধান ঘটনা।* এই শেষ মারাঠাযুদ্ধ পেশবা, ভোঁসলা এবং হোলকরের সহিত সংঘটিত হইয়াছিল। উহাঁদের সৈন্যদল যথাক্রমে ঘিড়কি ও অস্তি, সীতাবলদি এবং মেহিদপুরের যুদ্ধে পরাজিত হইলে ও যতদিন পেশবার সেনাপতি বাপু গোখলে এবং Major Francesco Caetano Pinto † জীবিত ছিলেন ততদিন ইংরাজ বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই। যুদ্ধের ফলে পেশবার আধিপত্য সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইল। বাজীরাও বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা বৃত্তি লইয়া সুদূর বিঠুরে নির্ব্বাসনে গমন করিলেন। সাতারার রাজাকে তাঁহার নামসর্ব্বস্ব অধিকারে একাংশে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কোম্পানী পেশবার রাজ্য স্বাধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন। নাগপুররাজ্যেরও কতকাংশ তাঁহারা গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বযুদ্ধে যশোবন্তরাও হোলকরকে ইংরাজরা পরাজিত করিতে পারেন নাই। ওয়েলেসলির পদে গভর্ণর-জেনারেল হইয়া আসিয়া লর্ড কর্ণওয়ালিস তাঁহার সহিত কতকটা শীঘ্রভাবেই সন্ধিস্থাপন করিয়াছিলেন। এবার ইন্দোরদরবার "সাবসিডিয়ারী এলায়েন্সে"র নাগপাশে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হইলেন। গোয়ালিয়র দরবার সমরে কোন অংশ গ্রহণ না করিলেও যুদ্ধকালে তাহাদের আচরণ সম্পূর্ণ সন্তোষজনক বিবেচিত হয় নাই; এ কারণ তাঁহাদের ও কিঞ্চিৎ দণ্ডবিধান হইল। তাঁহারাও কোম্পানীকে রাজ্যাংশ প্রদান করিতে এবং সেনাবল একটা নির্দ্দিষ্ট সীমারেখা মধ্যে রাখিতে স্বীকৃত হইতে বাধ্য হইলেন। মারাঠা আধিপত্যের পরিবর্ত্তে রাজপুতানায় এই সময় হইতেই ইংরাজাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল। পূর্ব্বযুদ্ধে জয়পুরাধিপতিপ্রমুখ রাজপুত রাজন্যবৃন্দ ইংরাজের পক্ষাবলম্বন করিলেও সন্ধিস্থাপনকালে কর্ণওয়ালিশের গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের কথা স্মরণ রাখেন নাই। রাজস্থান পূর্ব্ববৎ সিন্ধিয়া, হোলকর এবং আমীর খাঁর দয়ার উপর পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধকালে জেনারেল অক্টারলোনী পরিচালিত একদল ইংরাজসেনা রাজপুতানায় প্রবেশ করিয়াছিল। গার্ডনারও এই দলে ছিলেন এবং নানারূপে নিজ সাহস, বীরত্ব ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। রাজপুতনায় এই ইংরাজাভিযানের বিবরণ জন্য কর্ণেল টডের "রাজস্থান" * দ্রষ্টব্য। টড নিজে এই যুদ্ধে রেসিডেণ্ট পদে নিযুক্ত হইয়া সৈন্যদলে উপস্থিত ছিলেন। এখানে সকল কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। শুধু প্রসঙ্গক্রমে গার্ডনারের কথা বলা হইবে। দীর্ঘকাল ভারতীয় সমাজে বাস করার ফলে এদেশীয়গণের চরিত্রসম্বন্ধে তাঁহার প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা হইয়াছিল এবং তাঁহার কৃত বন্দোবস্তের জন্য রাজপুতনায় ইংরাজ সেনাপতিকে লোকক্ষয়কর এবং আয়াসসাধ্য কয়েকটী গিরিদুর্গ অবরোধ বা আক্রমণে লিপ্ত হইতে হয় নাই। কমলমীর (প্রকৃত নাম কুম্ভের) অবরোধকালে ইংরাজসেনাপতি কর্ণেল কেসমেণ্ট দুর্গরক্ষীগণের সহিত রফা করিবার ভার গার্ডনারকে দিয়াছিলেন। এ কার্য্য তিনি যথেষ্ট তৎপরতার সহিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শত্রুসেনা তাহাদের রাজসরকারের নিকট হইতে যে বক্রী বেতন পাইত তাহা পাইয়াই ইংরাজহস্তে দুর্গ সমর্পণে সম্মত হইল। ঐ জন্য

* সাধারণতঃ ইতিহাসে পেশবা বাজীরাওয়ের ইংরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং বিশ্বাসঘাতকতা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মারাঠাযুদ্ধের কারণ বলিয়া প্রদত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু উহা প্রকৃত কারণ নহে। পেশবা ও ভোঁসলাকে কি ভাবে উত্যক্ত করিয়া যুদ্ধ বাধান হইয়াছিল এবং তজ্জন্য তৎকালীন পদস্থ রাজকর্ম্মচারীগণ কি প্রকার হীন ষড়যন্ত্রের আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা বিস্তারিতভাবে জানিতে ইচ্ছা হইলে পরলোকগত মেজর বামনদাস বসু মহাশয় প্রণীত "Rise of the Christian Power in the East" নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

† এই ব্যক্তি জাতিতে পর্ত্তুগীজ অথবা বর্ণসঙ্কর গোয়ানিজ ছিলেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তিনি পেশবার কর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছিলেন; কারণ উক্ত বর্ষে তাঁহাকে স্বধর্ম্মাবলম্বী সহকর্ম্মীগণের জন্য একটি ভজনালয় নির্ম্মাণোপযোগী জমি দিবার নিমিত্ত পেশবাকে অনুরোধ করিতে দেখা যায়। বর্ত্তমানে পুণাসহরে এখনও পেশবার খৃষ্টান সৈনিকগণের প্রতি সহানুভূতির নিদর্শনস্বরূপ প্রদত্ত জমির উপরে নির্ম্মিত গির্জ্জা, সমাধিক্ষেত্রাদি বিদ্যমান রহিয়াছে। ঘিড়কি ও সোলাপুরের যুদ্ধে পিণ্টো ইংরাজসেনার বিরুদ্ধে লড়িয়াছিলেন। পুণাসহরে "শঙ্কর শেঠ রোডে" যে চারিটী পুরাতন কবর আছে, প্রচলিত বিশ্বাসমতে উহাদের মধ্যে একটি পিণ্টোর; পুরাতন বৃটিশ রেসিডেন্সীর সন্নিকটে যে দুইটি সমাধি আছে তাহা ঘিড়কিযুদ্ধে নিহত পেশবার অপর দুইজন পর্ত্তুগীজ সৈনিকের বলিয়া কথিত আছে। এ বিষয়ে কিছু স্থিরনিশ্চয় সম্ভব নহে।

* ১ম খণ্ড, ৩৬শ অধ্যায়, পৃঃ ৫০০

তাহারা ৩০০০০৲ টাকা দাবী করিল। ঐ স্বল্পসংখ্যক সৈন্যের জন্য ঐ পরিমাণ টাকা প্রদান গার্ডনারের বৃথা ব্যয় বলিয়া মনে হইয়াছিল। এমন সময় রেসিডেণ্ট কর্ণেল টড তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন। রাজনৈতিক ব্যাপারে তিনি কেসমেণ্টের উপরিওয়ালা ছিলেন। কাজেই তাঁহার ইচ্ছামত ব্যবস্থা হইল, কেসমেণ্ট ও গার্ডনারের আপত্তি টিঁকিল না। ইংরাজশিবিরে তখন মাত্র ৪০০০৲ টাকা ছিল। কাজেই সেনাপতি মহাশয় বক্রী টাকার জন্য স্থানীয় স্রফ ও ব্যাঙ্কারদিগের নামে হাতচিঠা দিয়াছিলেন। শত্রু সেনা বিনা দ্বিধায় তাহা গ্রহণ করিয়া দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। তাহাদের টাকা পাইতে যে কোন বাধা হইবে না সে কথা তাহাদের জানা ছিল। টড তাঁহার "রাজস্থানে" এই ঘটনা ইংরাজের সুনামের অন্যতম নিদর্শন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

রামপুর দুর্গ অবরোধকালে কর্ণেল ভ্যজমান শত্রুসেনার সহিত রফার ভার সম্পূর্ণরূপে গার্ডনারকে দিয়াছিলেন এবং "মাত্র ৭০০০৲ টাকার পরিবর্ত্তে বৎসরের নিতান্ত অসময়ে একটি অবরোধ ব্যাপার আবশ্যক হইল না যাহার জন্য, অক্টারলোনী আমাকে লিখিয়াছিলেন, তিনি আগ্রা হইতে দুর্গ অবরোধোপযোগী তোপখানা আনাইতে বাধ্য হইতেন।"

এই সকল কৃতিত্বের পুরস্কার স্বরূপ ১৮২২ খৃষ্টাব্দে গার্ডনারকে স্থায়ীভাবে বৃটিশ সেনাবিভাগে মেজর-পদ প্রদত্ত হইয়াছিল এবং যে তারিখে (২৫ শে সেপ্টেম্বর ১৮০৩) তিনি হোলকরের নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন সেই তারিখ হইতে তিনি উক্ত পদ পাইলেন বলিয়া তাঁহাকে জানান হইয়াছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আর্ম্মি লিষ্টে গার্ডনারের নাম সর্ব্বপ্রথম ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কাসগঞ্জে অবস্থিত অধিনায়ক স্থানীয় লেফটেনাণ্ট-কর্ণেলরূপে পাওয়া যায়। উহাদের সহিত তিনি ১৮২১ খৃষ্টাব্দে সাগরে, ১৮২১-২৩ খৃষ্টাব্দে বেরিলিতে, ১৮২৪-২৫ সালে প্রথম ব্রহ্ম-যুদ্ধকালে আরাকানে, * ১৮২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে পুনরায় কাসগঞ্জে কর্ম্মনিরত ছিলেন। ১৮২৮ সালের জানুয়ারী মাসে রেজিমেণ্টের বেরিলিতে অবস্থিতিকালে তিনি ছুটিতে ছিলেন। বৃটিশ বা ইণ্ডিয়ান আর্ম্মি লিষ্টে অথবা ইণ্ডিয়া অফিসের কাগজপত্র মধ্যে গার্ডনারের আর কোন উল্লেখ দেখা যায় না।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

* ব্রহ্মযুদ্ধে গার্ডনারের কার্য্যের জন্য তাঁহার ঊর্দ্ধতন অফিসর জেনারেল মরিসন তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন।

একটী সন্ধ্যা

মোবারক আলি বি-এ

জীবনে কত সন্ধ্যা আসে যায়।

গোধূলির ধূসর ছায়া কখন জীবন-পটে গভীর ম্লান-রেখা এঁকে দেয়। কখনও বা অস্তগামী রবির লোহিত-আভা হৃদয় রাঙ্গিয়ে জীবন-শতদল ফুটিয়ে তোলে।

জীবন-প্রবাহ এম্নিভাবে চলে।

কাশী—গঙ্গার ঘাট

জীবন-প্রবাহের মৃদু-মধুর কলরোলে সাঁঝের স্নিগ্ধ রশ্মিপাত মানসলোকে এম্নি অমিয়ছটা ছড়ায় যা বিস্মৃতি-আবরণে লুকিয়ে থাকতে পারে না।

এম্নি একটী সন্ধ্যা।

আলো-ছায়ার মাধুরীতে ভরা।

উত্তুঙ্গ গিরিশিখরে শুভ্র বরফের স্তূপ বিদায়-বেলার কিরণসম্পাতে সচকিত হ'য়ে ওঠে কার আগমনের নূপুর সিঞ্চনে। মেঘের স্তর ভেসে বেড়ায় তর তর ক'রে। এ ওর কোলে হেসে খল খল করে ছুটে। সহসা থেমে যায় কার ছায়া স্পর্শে।

আমার সন্ধ্যা এরও ওপরে। তার মায়া থেকে এখনও মুক্ত হ'তে পারিনি।

সে কথাটাই বলি—

এলাহাবাদে বাধ্য হয়ে একটী প্যাসেঞ্জার ট্রেনে উঠতে হলো। তখন আকাশে মেঘ করে এসেছে। দু'এক ফোঁটা বৃষ্টি ঐ শুষ্ক দেশের মাটীর বুকে শীতল স্পর্শ দিচ্ছে। বৃক্ষ-বহুল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এলাহাবাদ সহর ছেড়ে আস্‌তে দুঃখ হলো না। এ সহরের ধূলি-শূন্য আবর্জ্জনাবিহীন ফিট্‌ফাট্ রাস্তাগুলি, ছোট ছোট সুন্দর ইমারত ও পুণ্যতোয়া ত্রিবেণী ছেড়ে আস্‌তেও দুঃখ হলো না,—দুঃখ হলো খসরুবাগ ছেড়ে আস্‌তে। ঐ বাগের গোলাপের রঙ্গিন পাপ্‌ড়ীতে, সমাধির প্রতি প্রস্তরে কিসের বেদনা-গীতি কবিত্বের মোহ-আবেষ্টনীকে দূরে রেখে এখনও ভেসে আস্‌ছে—সে মর্ম্মরধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে বাগানের প্রশস্ত আঙ্গিনার প্রতি কুঞ্জবীথিতে।

যাক্ যা বল্‌ছিলুম—

আমার সে সন্ধ্যা সকল সুষমা দিয়ে ঘেরা।

পথে অন্য সব ভুলে দৃষ্টি ছিল বিন্ধ্যাচলের দিকে। নজরুলের বাধার বিন্ধ্যাচল নয়, মুনি-ঋষি—দৈত-দানবের সাধনা কামনার বিন্ধ্যাচল নয়।

কখন মেঘের ছায়া ঢেকেছে এই পাহাড়কে—বৃষ্টিধারা নেমে এর প্রতি শিলাখণ্ড ধুয়ে দিচ্ছে—কখনও বা সূর্য্যকিরণ এর গায়ে প্রতিফলিত হ'য়ে হাস্‌ছে। সে কী অজস্র হাসি!

এই বিন্ধ্যাচলের কথাই ভাব্‌ছি। অতীত ইতিহাসের কত অলিখিত স্মৃতি এর খোলা বুকে মিল্‌বে—খুঁজলে এর পাষাণে কত উত্থান-পতন সুখদুঃখের কাহিনী খোদিত দেখা যাবে।

ট্রেন যখন চুণার ষ্টেশনে পৌছল তখন দিনমণি ক্লান্ত হ'য়ে পশ্চিম গগনে ঢলে প'ড়েছে।

ছোট্ট ষ্টেশন। এর পিছনে অনুচ্চপাহাড় মাথা তুলে যুগ যুগ হ'তে দাঁড়িয়ে আছে। আর সামনে চুনার দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। মহাকাল ধ্বংসের রথ চালিয়ে একদিন হয়ত একে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিবে। কিন্তু এই দুর্গকে কেন্দ্র ক'রে শের সাহের যে শৌর্য্য ও বিক্রম, রাজনীতিজ্ঞান ও প্রজাবাৎসল্য ফুটে উঠেছিল তা চিরকাল যশের সৌরভ বিলাবে।

ট্রেন ছাড়ল। বিন্ধ্যাচল আড়ি ক'রে ট্রেনের সাথে সাথে যেন চল্‌তে লাগ্‌ল। একবার নিকট আবার দূর—এঁয়ি এঁকে বেঁকে চলেছে পর্ব্বতশ্রেণী।

বাইরে তাকিয়ে অভিভূত হয়ে চলেছি। ছোকরা উকিল বন্ধু হতাশ্বাসে চীৎকার দিয়ে বলে উঠলো—বেনারসের গাড়ী আর আমরা ধরতে পাল্লুম না। ঐ যে গাড়ীখানা বেরিয়ে গেল।

আমরা তখন মোগলসরাই-এর কাছে এসে পড়েছি।

বিরাট জংসন, যাত্রী, কুলি, গাড়ীতে সরগরম। যাবার বেলা ছিল রাত্রিকাল। সহস্র বৈদ্যুতিক দীপাবলীতে উহা আলোকময়। ফেরবার পথে দেখি এঞ্জিনের ফোঁস-ফোঁসানি ও ধূম্র উৎগীরণ এবং সবার ব্যস্তচঞ্চল ভাব।

যাত্রীতে আমাদের গাড়ীখানি একেবারে ভর্ত্তি। মাত্র আমরা তিনজন বাঙ্গালী। বাকী সব যুক্ত-প্রদেশের। এদের হট্টগোলে গাড়ীতে ব'সে থাকা মোটেই আরামজনক নয়। মনে হয় এদের ভেতর কালচার নেই—ব্যবহারে অমায়িকতা লোপ পেয়েছে। অথচ ব্যবসা-সওদাগরীতে কেঁপে উঠে বাঙ্গালীকে ঘৃণার চোখে দেখ্‌তে সুরু করেছে।

যাত্রীদের ভেতর অনেকেই বেনারসে যাবে। তাদের ভেতর একজন বল্‌লে বেনারসে গাড়ী ঘণ্টায় ঘণ্টায় যায়।

এবার বন্ধু আমার হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। কিন্তু ভয়ের ভাব একেবারে তিরোহিত হলো না। কারণ আমরা যেখানেই গিয়েছি গন্তব্যস্থলে পৌঁছবার ব্যবস্থা করেছি দিবাভাগেই।

ট্রেন বদল ক'রে বেনারসের গাড়ীতে উঠেছি। মোগলসরাই হ'তে পথ আধ ঘণ্টারও কম। কিন্তু গাড়ীতে বসে রয়েছি একঘণ্টা ধ'রে। গাড়ী যেন আর ছাড়তে চায় না। মনে হয় এঞ্জিনটার ফোঁস ফোঁসানি লোপ পেয়ে ওটা জীবন-শূন্য হয়ে পড়েছে।

মেঘলা দিন। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। সময় আর কাটতে চায় না।

আমার অন্য সহযাত্রী ডাক্তার সাহেব পথপ্রবাসে আঙ্গুর খেতে ভালবাসেন। তিনি বড় এক থোকা আঙ্গুর কিনে আনলেন।

আঙ্গুর মুখ-বিবরে ফেল্‌ছি ও যাত্রীদের কথাবার্ত্তা শুন্‌ছি।

পল্টনের তিনজন সেপাই পনর দিন ছুটি ভোগ ক'রে আবার কার্য্যে যোগদান দিতে যাচ্ছে। দিল্লীতে এদের বাড়ী। যাবে বেনারস ক্যানটনমেণ্টে। জাতিতে এরা জাঠ। কত বছর পরে আবার ছুটী মিলবে তার ঠিক নেই—পল্টনের কঠিন দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য হতে কোনদিন স্বগৃহে ফিরতে পারবে কিনা তাও জানা নেই। কিন্তু কথাবার্ত্তায় একটুও বিমর্ষ ভাব নেই। বাড়ী হ'তে যেন এরা নূতন উৎসাহ ও প্রেরণা নিয়ে এসেছে। কার্য্যে যোগদানের পরেই এরা সুদূর পার্ব্বত্য অঞ্চলে প্রেরিত হ'বে—এইটুকু আমাদের কানে এল।

গাড়ীতে মেয়ে যাত্রীও আছে। মেয়েরা বেশ স্বাস্থ্যবতী। তবে আমাদের বাঙালী মেয়েদের মতো বিলাসপরায়ণা হয়ে উঠলে কি হ'বে বলা যায় না। পর্দ্দা এদের মোটেই নেই। পাশের বেঞ্চেই একটী ষোড়শী তরুণী উপবিষ্টা ছিলেন। শিক্ষিতা মোটেই নয়। তবে বোধ হলো ধনী ঘরের মেয়ে। পায়ে মখমলের স্যাণ্ডেল, হাতে রুমাল, গা ভরা

সোনার গহনা। পায়ে এবং পায়ের আঙুলেও গহনা। রূপ আছে, ঐশ্বর্য্যও আছে। কিন্তু ভেতরের সে সজ্জনশীলতা নেই।

আঙ্গুরগুলি শেষ হবার সাথে সাথেই গাড়ী ছেড়ে দিলো।

অল্পক্ষণেই বেনারস নয়নগোচর হল।

আকাশ তখন মেঘনির্ম্মুক্ত।

সন্ধ্যারাণী হেম-কঙ্কন প'রে সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে আকাশের বুকে স্বর্ণাভ আঁচলখানি দিয়েছে বিছিয়ে। তার রক্ত আভা পড়েছে সম্রাট্ ঔরংজীবের মস্‌জিদের গম্বুজে, আকাশস্পর্শী মিনারের চূড়ায়—উচ্চ মন্দির-শিখরে—আর কল কল ধ্বনি উচ্ছ্বসিত ছল ছল ঢেউয়ের মাথায়।

ঠিক এম্নি সময়ে ট্রেন এসে পড়লো ডাফ্‌রিণ ব্রীজের ওপর। আমাদের সবাই মুগ্ধনেত্রে ঐদিকে তাকালো।

পূজোর ভীড়ের জন্যে বাঙ্গালী হোটেলগুলিতে জায়গা মিললো না। এদিকে আমার তরুণ উকিল ভায়ার চোখে ভয়ের সঞ্চার হলো। টোঙ্গাওয়ালী বল্‌লে আমাদের মত তরুণ যুবক দেখলেই সঙ্গের স্যুটকেসগুলি তল্লাসী করা হয়। কাজেই রাত্রিতে ফিরতে হলো। মালব্যের বিরাট কীর্ত্তি হিন্দু ইউনিভারসিটী দেখা হলো না—দুঃখ ও অনুশোচনা হলো।

কিন্তু এই দুঃখ ও অনুশোচনা মনকে একটুও যাতনা দিতে পারেনি। ফেরবার পথে সর্ব্বক্ষণ মনে জেনেছে—গঙ্গার বুকে মন ভুলানো চোখ জুড়ানো মনোহর দৃশ্য—দিগ্‌বলয়ে সূর্য্য ডুবে যাচ্ছে আবীরের রং ছড়িয়ে—আর তা প্রতিফলিত হচ্ছে মস্‌জিদের মিনারে—মন্দিরের চূড়ায়—উচ্চ প্রাসাদাবলীর মস্তকে—আর নীচে গঙ্গার জল-কল্লোলে।

মোবারক আলি

কবি ও বৈজ্ঞানিক

শ্রীমৃণালকুমার ঘোষ এম্‌-এ

১

সাধারণতঃ আমরা ভাবি যে কবি আর বৈজ্ঞানিকের মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান আছে। তাঁরা যেন উভয়ে ভিন্ন প্রকৃতির, তাঁদের মত ও পথ বিভিন্ন এবং সেইজন্য তাঁদের গন্তব্যস্থান ও তাঁদের লক্ষ্য সম্পূর্ণ পরস্পর-বিরোধী। সুতরাং কবি বৈজ্ঞানিক হইতে পারেনা কিংবা বৈজ্ঞানিক কবি হইতে পারেনা। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে প্রকৃতপক্ষে উভয়ের মধ্যে এরূপ কোন দ্বন্দ্ব নাই। উভয়েরই লক্ষ্য এক, উপরন্তু অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে জগতের অনেক শ্রেষ্ঠ কবিরা বিজ্ঞানের সাধক ছিলেন। বিশ্বপ্রকৃতির বৈচিত্রের, রহস্যের অন্তরালে যে সার্থকতা, যে সত্য আছে কবি এবং বৈজ্ঞানিক উভয়েই তাহাতে মুগ্ধ। কবি অনেক সময় আপন অন্তর্দর্শন বলে এই পরম সত্যে উপনীত হয়েছেন এবং মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির ন্যায় ইহার বাণী মানবকে শুনাইয়াছেন। হৃদয়ের অনুভূতি, আনন্দ, প্রেম, আশা, বেদনা এবং দুঃখকে পাথেয় করে কবি এই সত্যের সন্ধানে পথ চলেছেন। আর বৈজ্ঞানিক গবেষণা, অনুশীলন, নিরীক্ষণ, পরীক্ষা, কত তন্দ্রাহীন তপস্যা এবং একাগ্র সাধনার বলে সেই সত্যের সাথে-পরিচিত হয়ে মানবের জ্ঞানভাণ্ডারকে পূর্ণতর করে তুলেছেন।

চলার পথে কবি পথের পাশের ফোটা ফুলটি দেখে বিভোর হন, পাখীর গান তাঁর হৃদয়কে আকুল করে, চাঁদের আলো তাঁর বুকের রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়ে তাঁকে মাতাল করে, সাগরের ঢেউ তাঁর কানে গানের সুরের মত বাজে, সূর্য্যোদয়ের আর সূর্য্যাস্তের বর্ণচ্ছটা তাঁকে মুগ্ধ করে আবার কখন বা নিপীড়িত, শৃঙ্খলিত মানবের মুক্তির জন্য তাঁর সকল হৃদয় হাহাকার করে ওঠে আর এই হিংসা-দ্বেষ-প্রপীড়িত মানবসমাজে কবে প্রেমশান্তির যুগ ফিরিয়া আসিবে তারি আশায় তিনি রাত্রি জাগেন।

আর বৈজ্ঞানিক তাঁর জ্ঞানতপস্যার বলে তাঁর চলার পথে আকাশের বিদ্যুৎকণা ধরে এনে আলো জ্বালান, যন্ত্রদৈত্যের সাহায্যে তড়িদ্‌বেগে জলে, স্থলে এবং শূন্যে ভ্রমণ করেন, পথের পাহাড় পর্ব্বত নিমেষে কোথায় উড়িয়ে দেন, তিনি ভাবেন কোন্ আকর্ষণী শক্তিতে গাছের ফল মাটিতে পড়ে, আকাশমণ্ডলে গ্রহনক্ষত্রেরা কোন্ অদৃশ্য শক্তিতে উল্কার বেগে ছোটে, দেহের রক্তধারায় রাত্রিদিবস কাহাদের নর্ত্তনলীলা চলেছে, আবার কখন বা শ্রম-ক্লিষ্ট মানবের বেদনায় তাঁর হৃদয় ব্যথিত হয়ে ওঠে, তাই তাহাদের শ্রম-লাঘব-মানসে তিনি কলদৈত্যের, যন্ত্ররাজের আহ্বান করেন।

২

এই রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-বর্ণ-ছন্দোময়ী প্রাণচঞ্চল পৃথিবীর প্রতি অণুপরমাণু, তার প্রতি ধূলিকণাটি যুগে যুগে কবি এবং বৈজ্ঞানিক উভয়কেই হাতছানি দিয়ে ডেকেছে এবং উভয়েই সেই আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন। পরম মিত্র তাঁরা, তাই দেখি যাত্রাপথে কখন কখন কবি এবং বৈজ্ঞানিক পরস্পর পাথেয়ের বিনিময় করিতেছেন। হাজার বৎসর পূর্ব্বে নৈশাপুরের ওমর খৈয়ামের "রুবেইয়াৎ" পড়িলে আজও মানুষের মনে "গোলাপী নেশা" ধরে। তাঁর কবি-প্রতিভার খ্যাতি আজ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গেছে। কিন্তু পণ্ডিতেরা বলেন যে তিনি প্রাচীনকালের একজন শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্ব্বিদ ছিলেন, অঙ্কশাস্ত্রে এবং বিজ্ঞানের অন্যান্যক্ষেত্রে ইরানদেশে তাঁহার অসামান্য পাণ্ডিত্য ছিল এবং বিজ্ঞান সাধনার অবসর সময়েই তাঁর এই রুবেইয়াৎগুলি রচিত হইয়াছিল। জগতের একজন অমর-কবি, ইতালীর দান্তে (Dante) চতুর্দ্দশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক

চিন্তাধারার সহিত কিরূপ নিবিড় ভাবে পরিচিত ছিলেন তাহা তাঁহার (Divine Comedy-তে) টলেমীয় জ্যোতির্ব্বিদ্যার প্রভাব Ptolemaic Astronomy হইতেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অনেকেই জানেন যে সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের শ্রেষ্ঠ কবি শেক্সপীয়ার (Shakespeare)এর সমগ্র কাব্যে বহু বৈজ্ঞানিক-উল্লেখ (Scientific allusions) আছে। কবি মিল্টন (Milton), যাঁকে তাঁর স্বদেশবাসীরা গর্ব্ব করে বলেন "God gifted Organ Voice of England," তাঁর ষষ্ঠ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের সহিত বিশেষ পরিচয় ছিল। যদি তিনি হাটন (Hutton), ল্যামার্ক্ (Lamarck) কিংবা ডারউইন (Darwin)এর পরে জন্মগ্রহণ করিতেন তাহা হইলে তাঁহার Paradise Lost এর কোন কোন অংশ যেখানে বিশ্বসৃষ্টির বর্ণনা আছে তাহার অনেক কিছু হয়ত পরিবর্ত্তন হইয়া যাইত। ক্লাসিকীয় বিজ্ঞান (Classical Science) তাঁহার মনোজগতে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। কপর্দ্দকহীন কবি গোল্ড্স্মিথ্ (Goldsmith), ইংলণ্ডের সাহিত্যে আজ পর্য্যন্ত যাঁর একটু স্থান আছে, তিনি বাঁশী হাতে করিয়া যখন য়ুরোপ ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন পাডুয়া (Padua)তে বুঝি চিকিৎসা বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়া এম্ ডি (M. D.) ডিগ্রী লাভ করিয়াছিলেন। গ্রেটব্রিটেনে (Great Britain) ফিরিয়া আসিয়া কোন কোন দরিদ্র পল্লীতে "প্র্যাক্‌টিশ" আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। কবি শিলার (Schiller) এবং কবি গোটের (Goethe) বিজ্ঞানের প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল এবং সাহিত্যের এক পৃষ্ঠাও যদি গোটে না লিখিতেন তথাপি তাঁর বিজ্ঞান অনুশীলনের কথা যাঁরা য়ুরোপের বিজ্ঞানচর্চ্চার ক্রমবিকাশের খোঁজ রাখেন তাঁরা অনেকেই ভুলিতেন না। লেক্ সম্প্রদায়ের (Lake School) শ্রেষ্ঠ কবি ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থ (Wordsworth) প্রতি পুষ্প, পল্লব এবং তৃণের ভিতর প্রাণের স্পন্দন অনুভব করিয়াছিলেন। বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র গাছের জীবনধারার, তার হাসি-কান্নার, সুখ-দুঃখের এমন কি তার স্নায়ুজালের (Nervous System) এবং মনোবিজ্ঞানের (Psychic life) কত নিগূঢ় তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের

"And 'tis my faith that every flower
Enjoys the air it breathes.
(Lines written in Early Spring)

ইহা কি দার্শনিক কবির একটি সুন্দর উক্তি, ইহা কি বৈজ্ঞানিক সত্য নহে? কবি কোলরিজ্ (Coleridge) যিনি ইংরেজী কাব্যের জগতে একটি বিশিষ্ট সুর আনিয়াছেন, তিনি স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন যে তাঁহার কাব্যে উপমার সংখ্যা (Stock of Metaphors) বাড়াইবার জন্য প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডেভী (Davy)র রসায়নবিজ্ঞানের (Chemistry) ক্লাশে তিনি রীতিমত যোগদান করিয়াছিলেন। কবি শেলী (Shelley) যাঁহাকে বাদ দিলে ইংরেজী সাহিত্য Chaucer, Shakspeare এবং Miltonকে বক্ষে ধারণ করেও বড় ম্লান হয়ে যায়, সেই শেলী যখন ইটন (Eton) স্কুলের ছাত্র তখন ডাঃ জেমস্ লিণ্ডের (Dr. James Lynd) কাছে রাসায়নিক পরীক্ষা (Chemical experiment) শিক্ষা করিতেন। এক সময়ে তিনি বৈজ্ঞানিক উপায়ে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া একটি বৃক্ষ দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার "The Sensitive Plant," "O de to the West Wind," "To Night," "A Summer Evening Churchyard, Lechlade, Gloucestershire," "Mutability," "On death" এবং বিশেষ করিয়া "The Cloud" ইত্যাদি কবিতার মধ্যে যে সব বর্ণনা এবং রহস্যের কথা আছে তাহা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত। কবি কীট্স (Keats) সাহিত্যের জগতে সুন্দরের সাথে সত্যের সমন্বয় ঘটাইয়াছিলেন। সৌন্দর্য্যের সাধক তিনি বলিতেন যে বিজ্ঞান রামধনুর বর্ণচ্ছটা হরণ করে, প্রজাপতির রঙীন পাখা ছাঁটিয়া ফেলে। কিন্তু তাঁহার জীবনালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রথম জীবনে কবি স্বয়ং বিজ্ঞানের সাধনা করিয়াছিলেন। এড্মণ্টন (Edmonton) নগরে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক হামণ্ড (Dr. Hammond)এর নিকট ভিষকশাস্ত্রে তিনি শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডের ইতিহাসে ভিক্টোরিয়া-যুগের অনেক কিছুর মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে ইহা একান্ত ভাবে বিজ্ঞানের যুগ। এ যুগের শ্রেষ্ঠ রাজকবি (Poet Laureate)

বিচিত্রা — প্রত্যাশা — শ্রীবৈদ্যনাথ দাস
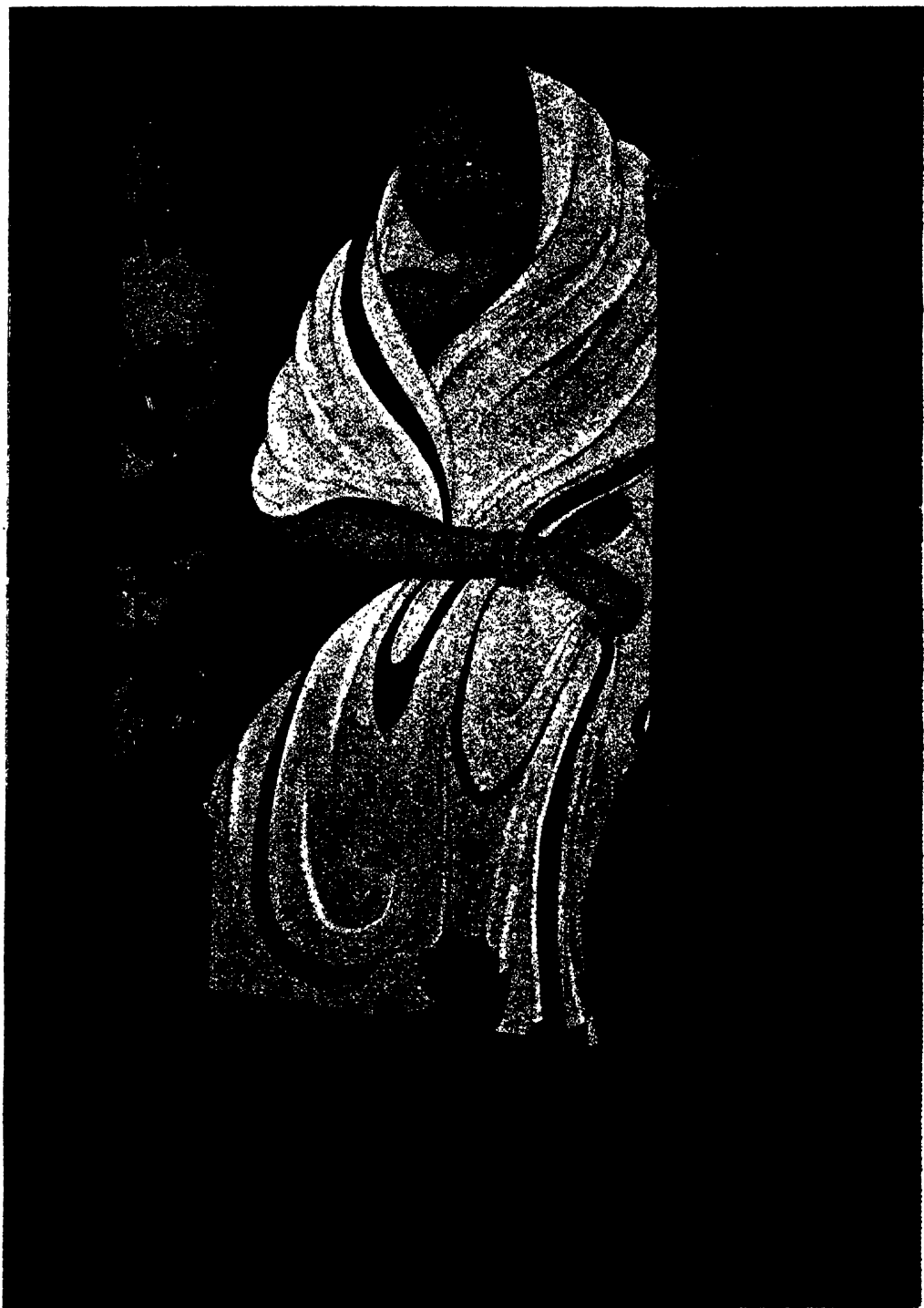
চৈত্র ১৩৪১

টেনিসনের (Lord Alfred Tennyson) শিক্ষা, দীক্ষা এবং চিন্তাধারার ভিতর বিজ্ঞানের বিপুল প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সর্ব্বকালে দেখিতে পাওয়া যায় সাধারণতঃ কবিরা প্রকৃতির ভিতর শান্তির, প্রেমের এবং করুণার ছবি দেখিতে পান কিন্তু টেনিসন প্রকৃতির ভিতর অহর্নিশি যে সংগ্রাম চলিতেছে,—যেখানে প্রতিটি প্রাণী অপরটিকে ধ্বংশ করিয়া বাঁচিতে চাহিতেছে·······প্রকৃতির সেই নিষ্ঠুর, রক্তাক্ত সংহারময়ী মূর্ত্তিকে বৈজ্ঞানিকের মতই দেখিতে পাইয়াছিলেন। আবার আমরা যখন তাঁহার "In Memoriam"এ পড়ি :—

"Our little systems have their day
They have their day and cease to be"

তখন বিস্মিত হইয়া যাই কবির আধুনিকতম সৃষ্টিবিজ্ঞানের (Newest Cosmologic Science) পরিচয় পাইয়া এবং তখনই বুঝিতে পারি যে কবি এবং বৈজ্ঞানিকের মধ্যে কোনই বিরোধ নাই।

২

বহুজীবধাত্রী সুন্দরী ধরিত্রী কবি এবং বৈজ্ঞানিককে বক্ষে ধারণ করিয়া আজ সার্থক হইয়াছে। বাউল যেমন তার মনের মানুষের সন্ধানে, অচেনা অদেখার পানে এগিয়ে চলে, কবি এবং বৈজ্ঞানিক ঠিক তাহারি মত সৃষ্টির প্রাণরহস্যের অন্তরালে যাহা অস্ফুট, যাহা অব্যক্ত, যাহা অজানা আছে তাহারি সন্ধানে সমুখপানে এগিয়ে চলেন। এই অজানার অভিযানে বৈজ্ঞানিক অলিভার লজ (Oliver Lodge) কত অদৃশ্য জগতের গোপন তত্ত্বের পরিচয় পেয়ে বিভোর হয়েছেন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র অজানার অন্তরালে যেখানে জীবন মূক, ভাষা যেখানে নীরব, চেতনা যেখানে অপ্রকাশ তথাকার একান্ত অন্তলীন গোপন রহস্য উদ্ঘাটন করিতেছেন। আর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ গাহিতেছেন :—

"আকাশভরা সূর্য্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান॥
অসীমকালের যে হিল্লোলে
জোয়ার ভাঁটায় ভুবন দোলে,
নাড়ীতে মোর রক্তধারায় লেগেছে তার টান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান॥
ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে,
ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে।
ছড়িয়ে আছে আনন্দেরি দান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান॥
কান পেতেছি চোখ মেলেছি,
ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি,
জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান॥"

মহাকালের সভায় একই আসনে বসিয়া কবি আর বৈজ্ঞানিক একতারায় ঝঙ্কার দিতেছেন। বিশ্বস্রষ্টার সত্তা নিমেষের তরে কেহই বিস্মৃত হন নাই; তাই দেখি বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ এডিসন (Edison) প্যারী নগরীতে (Paris) ইফেল টাওয়ারে (Eiffel Tower) আরোহণ করিয়া Visitors Bookএ যখন প্রসিদ্ধ ফরাসী স্তম্ভ-নির্ম্মাতাকে তাঁর সশ্রদ্ধ অর্ঘ নিবেদন করিতেছিলেন তখন বিশ্বসৃজনকারী সেই মহান শিল্পীকে স্মরণ করিয়া মাথা নত করিতেছেন, আর বাংলার গানের রাজা, যাঁহার সুরের জালে সারাবিশ্ব আজ জড়িয়ে গেছে তিনিও সেই স্রষ্টার চরণধূলার তলে মাথা নত করিয়া সকল সৃষ্টিকে দেবতার আশীর্ব্বাদ জেনে গেয়ে ওঠেন :—

"সারা জীবন দিলো আলো
সূর্য্য গ্রহ চাঁদ,
তোমার আশীর্ব্বাদ হে প্রভু,
তোমার আশীর্ব্বাদ।
মেঘের কলস ভ'রে ভ'রে
প্রসাদ-বারি পড়ে ঝ'রে,
সকল দেহে প্রভাত বায়ু
ঘুচায় অবসাদ,—
তোমার আশীর্ব্বাদ, হে প্রভু,
তোমার আশীর্ব্বাদ।
তৃণ যে এই ধূলার পরে
পাতে আঁচলখানি,
এই যে আকাশ চির-নীরব
অমৃতময় বাণী,—
ফুল যে আসে দিনে দিনে
বিনা রেখার পথটি চিনে,
এই যে ভুবন দিকে দিকে—
পুরায় কত সাধ,
তোমার আশীর্ব্বাদ, হে প্রভু
তোমার আশীর্ব্বাদ।"

শ্রীমৃণালকুমার ঘোষ

গান

মম জীবন-মধু কুড়ায়ে
　　　　দিকে দিকে দাও বিলায়ে।
পর-ব্যথাতুর হিয়াটিকে
　　　　ঐ মেঘে মেঘে দাও বিছায়ে॥
দাও দিকে দিকে ফুলগন্ধ
　　নিতি নব নব ছন্দ
　　ভেসে যাক মৃদু মন্দ
　　ঘন বেণু-বন দুলায়ে॥
সব চাওয়া আজি সব দেওয়া মাঝে
　　　　ক'রে দাও ওগো লয়,
হে মরণ আজি অভয়শরণ
　　　　এস এস রাঙ্গা পায়—
　　সকল হৃদয় ছানিয়া
　　লহ লহ তুমি অমিয়া
সব সুখ দুঃখ ভেঙ্গে দাও
　　　　ঐ দূর নীলিমায় রাঙায়ে।

কথা ঃ—শ্রীদেবীপ্রসাদ কর　　　　সুর ও স্বরলিপি ঃ—শ্রীঅশোকপ্রকাশ মিত্র

জ্ঞা জ্ঞা ॥ মজ্ঞা মপা মা মা । জ্ঞা জ্ঞা ঋা সন্‌া ৷ সা -া জ্ঞা জ্ঞা । সজ্ঞা মপা মপা দর্সা ৷
ম ম জী • • • ব ন ম ধু কু ড়া • য়ে • দি কে দি • • • কে • • •

৷ র্সনা -া দা দপা । মদা পমা জ্ঞরা জ্ঞা ৷ সজ্ঞা মপা মা মা । জ্ঞা জ্ঞা ঋা সন্‌া ৷
দা ও বি লা • য়ে • • • ম • ম জী • • • ব ন ম ধু কু ড়া •

৷ সা -া -া -া । -া -া -া -া ৷ সা জ্ঞা জ্ঞা রা । জ্ঞা -া -া -া ৷
য়ে • • • • • • • প র ব থা তু • • র

I জ্ঞা রা জ্ঞা পমা। পা -া পা -া I পা ণা ণা র্সণা। ণা দা পা ক্ষা I
হি য়া টী • কে • ও ই মে • ঘে • • মে • ঘে •

I পা ণা দা পমা। ক্ষা-পা -া -া I সা জ্ঞা জ্ঞা রা। জ্ঞা -া -া -া I
দা ও বি ছা• য়ে • • • প র ব্য থা তু • • র

I জ্ঞা রা জ্ঞা পমা। পা -া পা -া I পা ণা ণা র্সণা। ণা দা প ক্ষা I
হি য়া টী • কে • ও ই মে • ঘে • মে • ঘে •

I পা ণা দা পা। মদা পমা জ্ঞরা জ্ঞা II । I
দা ও বি ছা য়ে• •• ম• ম জীবন মধু কুড়ায়ে ইত্যাদি

পা -া II মদা পমা জ্ঞা -া। জ্ঞা মা সা জ্ঞা I মপা মজ্ঞা মা -া। -া -া মা মা I
দ ও দি• •• কে • দি কে ফু ল গন্ •• ধ • • • নি তি

I জ্ঞমা পা মপা দা। পদা ণা দণা র্সা I নর্সা ঋা র্সা -া। -া -া র্সা র্সজ্ঞা I
ন• • ব• • ন• • ব• • ছন্ • দ • • • স্তে সে

I জ্ঞা -া ঋা র্সা। ণা সঋা সা ণা I দা পা মা জ্ঞা। মপা দর্সা র্সণা -া I
যা ক মৃ দু মন্ •• দ • • • ঘ ন বে• •• ণু •

I দা দা পা পমা। মদা পমা জ্ঞরা জ্ঞা II
ব ন দু লা য়ে• •• ম• ম জীবন মধু কুড়ায়ে ইত্যাদি

II সা সা মা মা। -া -া মা মা I রা মা পদা পমা। জ্ঞরা জ্ঞা মা পা I
স ব চাও য়া • • আ জি স ব দেও য়া• মা• ঝে • •

I পণা দপা মজ্ঞা জ্ঞমা। ক্ষা -া সজ্ঞা জ্ঞঋা I ণ্‌া সা -া -া। -া -া -া -া I
ক রে• দা• •• • ও ও• গো• ল য় • • • • • •

I সা পা পা -া। -া পদা র্সণা র্সণা I দা পা -া দা। পমা -া মা মা I
হে ম ন্ত • • ণ আ জি অ ভ য় শ রণ • এ স

I জ্ঞমা পণা দপা মপা । রা জ্ঞা সা ঋা I মা মা -া -া । -া -া -া -া II
এ • • • স • • • রা • ঙা • পা য় • • • • • •

II -া পা পা পা । মদা পমা জ্ঞা মা I সজ্ঞা জ্ঞপা পমা -া । -া -া মা মা I
• স ক ল হৃ • • • দ য় ছা • নি য়া • • • ল হ

I জ্ঞমা পা মপা দা । পদা ণা দণা র্সা I ণা র্সঋা র্সা -া । -া -া র্সা সজ্ঞা I
ল • • হ • • তু • • মি • • অ মি • য়া • • • স ব

I জ্ঞা জ্ঞা ঋা র্সা । ণা র্সঋা র্সা ণা I দা পা মা জ্ঞা । মপা দর্সা ণা ণা I
সু খ দু খ ভে ঙে • দা • • ও ও ই দূ • • র নী লি

I দা -া পা পা । মদা পমা জ্ঞরা জ্ঞা II II
মা য় রা ঙা য়ে • • • ম • ম   জীবন মধু কুড়ায়ে ইত্যাদি।

বর্ষা-বিরহ

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য

আষাঢ়স্য প্রথম দিবস না হলেও দোসরা, তেসরা যা হোক্ একটা হবে। সারাটা আকাশ ভেঙে অবিরল ধারায় বৃষ্টি পড়ছে। সন্ধ্যাকাল। এমন দিনে প্রত্যেকের মনটাই একটু উদাসী না হয়ে পারে না। তাও আবার এই আকাশ-জোড়া বিরহের সুর ছাপিয়ে মনের কোণে অন্য কোনো সুর রণিয়ে তোলবার মত পাশে একান্ত আপনার জন যদি কেউ না থাকে তাহলে এই বাদল সন্ধ্যার নিঃসঙ্গতায় মনপ্রাণ আচ্ছন্ন হয়ে আসবেই। যদিও হাতে কাজের সরঞ্জাম নিয়েই বসেছিলাম, তবু সন্ধ্যার মেঘান্ধকারে মনটা ছিল কোন্ নিরুদ্দেশের পথে।

এমন সময় হুড়মুড় করে এসে ঘরে ঢুকলো সঞ্চিতা। সঞ্চিতা আমার বন্ধু। কলেজে পড়ে, রবি ঠাকুরের ভক্ত। লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতাও লেখে। রবীন্দ্রনাথের গান তার মত এ অঞ্চলে আর কেউ গাইতে পারে বলে কারো জানা নেই।

এমন বাদ্‌লার দিনেও যে বন্ধু সঞ্চিতা একবার আমাদের বাসায় না এসে পারে না, সে খেয়াল আমার ছিলই না। তার সাড়ীর প্রায় সবটাই ভিজে গেছে। অত যত্ন ক'রে চুল বেধে, টয়লেটিং করে এসে বেচারীর কিনা শেষটায় এই দশা! দেখে আমারই কান্না পেতে লাগলো। আল্‌না থেকে সাড়ী-জামা ওর হাতে তুলে দিয়ে বললাম, নে চট্ ক'রে বদ্‌লে নে। অপ্রস্তুত ভাবে একটু হেসে সে ড্রেস করে নিল। আমি লক্ষ্য করছিলাম, বললাম, এ কি রে, এরি মাঝে শেষ হয়ে গেলো? কই, স্নো মাখলি নে তো?

কিছু সময় পরে ও যখন উঠে এলো ততক্ষণে আমার টেবিল-ল্যাম্পের স্নিগ্ধ আলো জলে উঠেছে। তার মিষ্টি মুখখানি দেখে সত্যি একবার বুকের মাঝে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে হলো। তবু সাহস হলো না। ওর যা মনের অবস্থা এখন—সাড়ীর ভাঁজ নষ্ট হয়ে গেলে সে আমাকে কিছুতেই ক্ষমা করবে না। বললাম, বস্। সে কিন্তু বসলো না। ছোট্ট কোঠা আমার। ডানদিকে বিছনা, বা দিকে টেবিল-আয়না, জান্‌লার পাশে চেয়ারে আমি বসে। দেয়ালে খান কতো ছবি ও ফটো। ফটোগুলো বাবার, মা'র, বড়দি'র, দাদার ও দাদার ছোট জামাইবাবুর। বন্ধুটি ঘুরে ঘুরে সবই দেখছে। যেন এগুলো সে আর কোনোদিন দেখেনি, এই প্রথম দেখলো, এম্‌নি নিবিষ্ট হয়ে দেখছে। সব কিছুই দেখছে, অথচ ঠিক তার সায়ে বা' দিকে দাদার যে 'ফুলসাইজ' ফটোখানা ঝুলছে সে দিকে যেন তার নজরই নেই। হায় সঞ্চিতা, লুকোচুরি আর কতোকাল চল্‌বে।

দুষ্টুমি ক'রে বল্‌লাম, বল্‌তো কোন্ ফটোখানা সব চেয়ে সুন্দর?—বলা বাহুল্য দাদার ছবিখানি এখানে সবচেয়ে ভালো হয়েছে, তাছাড়া তুলনা করবার মতো ত আরেকখানা মাত্র ফটোই আছে।

সে কিন্তু আমার বিছ্‌নার শিয়রের দিকে ইঙ্গিত করে সেখানার দিকেই চেয়ে বল্‌লো, তোর মনীষ বাবুর।

—এ তোর প্রাণের কথা নয় সঞ্চিতা। হেসে জবাব দিলাম।

প্রাণের কথা নয়, সেও জানে আমিও জানি। Beauty is lover's gift. সে-চোখে দেখলে অসুন্দর ও সুন্দর হয়। তাছাড়া দাদা তো আবার সাক্ষাৎ রাজপুত্র।

এমনি দুষ্টুমি করে কিছু সময় কাটলো। সঞ্চিতা গুণ গুণ করে সুরের কলিকে ফুটিয়ে তুলছে। কিন্তু ওর প্রাণের কথা সে প্রকাশ করতে পারছে না সহজ লজ্জায়।

এতো সময় ওর মুখ দিয়েই যে কথা বের করবার ইচ্ছা ছিল, ভেবে দেখলাম হাজার হোক্, সে মুখ ফুটে কিছুতেই

সে কথা বলতে পারবে না। অথচ এই বাদ্‌লায় ভিজে এর জন্যেই তো সে এসেছে।

বল্‌লাম, চল্‌, দেখি গিয়ে দাদা একা একা বসে এই সন্ধ্যায় কি করছে!

ওর অন্তরের সবগুলো পর্দা এককালে গুঞ্জরণ করে উঠ্‌লো, তবু আপনাকে যথাসম্ভব গোপন করতে চেষ্টা করে বললে, চল্‌।

যেতে যেতে বল্‌লাম, আজ কোন্‌ গানটা গাইবি বল্‌ তো? সে মৃদু হেসে বল্‌লো, বল্‌তো কোন্‌টা?

আমিও দুষ্টুমি করে বললাম, দাদার যে গানটা সবচেয়ে ভালো লাগে।

প্রশান্ত খুসীতে তার মুখ আরো সুন্দর হয়ে উঠ্‌লো। পরক্ষণেই এলো লজ্জা, বললে যাঃ, চোখে মুখে কিন্তু তার প্রাণের পুলোকহিল্লোল উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

দাদার ঘরে গিয়ে দেখি, জানলার কাছে বসে সে আপন মনে নিজের কবিতা আবৃত্তি করে যাচ্ছে। বর্ষার দিনে সে এতো বার এই একই কবিতা আবৃত্তি করেছে যে আমারও শুনে শুনে কয় পংক্তি বেশ মুখস্থ হয়ে গেছে—

* * * হে নিষ্ঠুরা ক্ষণিকা পূর্ণিমা
স্তিমিত মিলন রাতে ভুলানো আশার বাণী,
সেই তব সীমা?
শুধু আশা, শুধু কুহেলিকা?
হে অবগুণ্ঠিতা মোর, কুণ্ঠিত দুবাহু তুলি,
যে নব মালিকা
দিয়েছিলে রিক্ত কণ্ঠে তুলি'
সে কি শুধু ক্ষণিকের ভুল?

* * * *

কৈশোরের শেষ প্রান্তে যৌবন স্বপ্নের তীরে
অতি ধীরে ধীরে
স্বপ্নমাখা কিশোরীর অনবদ্য তনু দেহখানি
সুমুখেতে আনি'
যে ইঙ্গিত করেছিলে আঁখির ভঙ্গীতে—
যে সুর ফুটায়েছিলে স্বপ্নাতুর জ্যোৎস্নার সঙ্গীতে
সে কি শুধু ক্ষণিকের খেয়াল?
শুধু ভুল?—নহে ভালবাসা?—* * *

ইত্যাদি। কবিতাটির নাম 'অসমাপ্ত'। তার নিজেরই লেখা। এই কবিতাই নাকি তার বর্ষার দিনে সবচেয়ে ভালো লাগে। কবিতাটি সে নিজে এতো সুন্দর আবৃত্তি করতে পারে যে তা না শুন্‌লে আর না দেখলে বিশ্বাস করা অসম্ভব হবে। দাদা গান গাইতে পারে না। কিন্তু ওর কবিতা আবৃত্তি করার শক্তি এতো চমৎকার যে ওর গান গাওয়ার আর প্রয়োজনই হয় না। এই বর্ষা-সন্ধ্যায় আজ তার সেই আত্মভোলা সুর উদ্বেল হয়ে উঠেছে। ওই দূর অন্ধকার আকাশের সীমাহীন কিনারায় চোখদুটো তুলে দিয়ে আপন মনে সে নিজের বিরহী অন্তরের প্রকাশমাধুর্য্যে নিমগ্ন হয়ে আছে।

আমরা চুপে চুপে ঘরে ঢুকে তার পেছনে যে গিয়ে দাঁড়িয়েছি তা সে বুঝতেই পারেনি। ক্রমে তার আবৃত্তি সমাপ্ত হলো। নীরব নির্জ্জনতার মাঝে সে এখন আপনার উপলব্ধিতে মগ্ন। আমার অসাবধানতায় টেবিলের সাদা কাঁচের গ্লাসটি মেজেতে পড়ে খান্‌ খান্‌ হয়ে ভেঙে গেলো। সেই আকস্মিক দুর্ঘটনায় দাদার স্বপ্ন গেলো ভেঙে। দাদা চোখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকিয়েই বললে, সঞ্চিতা যে। এই একটি মাত্র কথার ভুলে বুঝা গেলো এতো সময় সে কোন্‌ মানস-প্রতিমার ধ্যানে তন্ময় হয়েছিল।

আর যাই হোক্‌, দাদা অপ্রস্তুত হবার ছেলেই নয়। চট্‌ করে নিজেকে সামলে নিয়েই বললে, 'লুকিয়ে রাখলে আমার কাছে আরো শিগ্‌গীরই ধরা পড়ে ছোড়্‌দি'। এই তো দেখ্‌ না, তোকে না দেখে আগে তাকেই দেখেছি।'—সঞ্চিতা আমার পেছনেই একটু আড়ালে দাঁড়িয়েছিল। আনন্দে লজ্জায় বেচারী তখন প্রায় জড়সড় হয়ে পড়েছে। কিন্তু আমি তখন ভাব্‌ছিলাম দাদার কথাই। সে তো ওকে এই সন্ধ্যার অন্ধকারে ভালো করে দেখতেই পায়নি, অথচ সে তার উপস্থিতি অনুভব করতে পেরেছে। তার অন্তরের চোখ দুটো তাকে বলে দিয়েছে, সে এসেছে। ভালোবাসার কতো গভীর তন্ময়তা থাকলে মানুষের সেই অন্তরিন্দ্রিয় জাগে! শুনেছি কবিরা

প্রজাপতির মত লঘু পাখা মেলে কেবল উড়ে বেড়ায়। দাদাও কবি—কিন্তু ওর প্রাণে দার্শনিকের অতলস্পর্শী গভীরতা। তা-ই তার ভালোবাসাও এত গভীর।

আমাদের কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে দাদা কথাটার মোড় ফিরিয়ে দিলে।

ছোড়দি', চা খেতে এখন বড়ো ইচ্ছা হচ্ছে।

আমি দাদার বছর তিনেকের ছোট। তবু সে আমাকে ছোড়দি' বলেই ডাকে। আমিই ওর একমাত্র ছোট বোন্। কাজেই ওর বুকের অজস্র স্নেহধারা আমার শিরে বর্ষণ করতে দাদা কার্পণ্য করেনি। তাছাড়া আমিই ওর একমাত্র সঙ্গী। ওর প্রিয়-কবি Browningএর এমন কবিতা নেই যার ভাব নিয়ে সে আমার সাথে আলাপ ও আলোচনা করেনি। তাছাড়া আমিও দাদাকে পেয়ে বেঁচে গেছি। নইলে সাতসমুদ্র তেরো নদীর ওপারের দিকে তাকিয়ে এ দু'টি বৎসর যে কি ক'রে কাটতো ভেবেই পাই না। প্রাণের এই নিঃসঙ্গতার হাত থেকে বাঁচবার জন্যেই আমরা হয়ে পড়েছি পরস্পরের বন্ধু। সে জন্যেই ওর খেয়ালের মাত্রাও কবিদের মত যেমন একটু বেশী, ওর আব্দারের সুরও তেম্‌নি সপ্তকে বাঁধা।

চা তৈরী করতে হবে। সঞ্চিতাকে সেখানে সে-ভাবেই জোর করে বসিয়ে রেখে আমি ষ্টোভ্ ও চায়ের সরঞ্জাম যোগাড়ের জন্য চাকরকে ডাকতে অনির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্যে বাইরে বেড়িয়ে গেলাম। ইচ্ছে করেই একটু দেরী করলাম। নিঃসঙ্কোচ নির্জ্জনতার মাঝে পরস্পরকে ওরা একান্ত কাছে পাওয়ার সুযোগটুকু পাক্। কিন্তু ঘরে ঢুকে দেখে তো অবাক্। ওরা দুজনেই মৌন নীরব হয়ে ঠিক তেমনি এক ঠাঁয় বসে আছে। বুঝ্‌লাম, আজকের দিনে অন্ততঃ ওদের সহজতা আনতে আমার দৌত্যের প্রয়োজন আছে।

ষ্টোভ্ ধরিয়ে, কেট্‌লী চড়িয়ে দাদাকে আব্দারের সুরে বল্‌লাম, দাদা, একটা গল্প বল না ভাই!

না ছোড়দি, এখন গল্প টল্প বলতে ভালো লাগছে না।

চট্ করে সঞ্চিতার পাশে গিয়ে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে আস্তে আস্তে বললাম, ভালো না লাগার মানে কি বুঝতে পারছিস্ ত? অর্থাৎ তোকেও সাধতে হবে।

আমার এই সজীব কানমন্ত্রটুকু বন্ধুর নির্জ্জীব নিঃসাড়তার বুকে প্রাণের উচ্ছলতা জাগিয়ে তুল্‌ল। তবু সে বার দুই গাল লাল ক'রে কোনো রকমে বললে, বলুন না, না হয় আপনার জীবনের কোনো একটা দিনের সত্য ঘটনাই বলুন।

দাদার আমার মাত্রাজ্ঞান বেশ ঠিক আছে। সে বুঝতে পারলে, এবার তার ভালো-না-লাগা চলে যাওয়া দরকার। সে বললো, আচ্ছা বলছি। অবশ্যি তার মনের ঔৎসুক্য ওস্তাদ অভিনেতার মত ঔদাসীন্যের ভাব দিয়ে ঢেকে রেখে সে বলতে সুরু করলো :—

আমি তখন কলেজে পড়ি। একবার বোটানিক্যাল এক্‌স্‌কারশানে যাদবপুরের ওদিকে যেতে হলো। সঙ্গে অধ্যাপক আর জনকয় ছাত্রবন্ধু। ভোর সাতটায় বেরিয়ে এগারোটায় সবাই ফিরলো; আমার কিন্তু ওদের সাথে ফেরা আর হলো না।

যাদবপুরে আমার এক সহপাঠী বন্ধুর বাসা। বন্ধু ঠিক বলা চলে না, আমার মুগ্ধ ভক্ত। তখন কলকাতার ছোট ছোট মাসিক আর সাপ্তাহিকে আমার লেখা বেরুচ্ছে। কলেজ-ম্যাগাজিনেও গল্প কবিতা বেরিয়েছে। বন্ধুটি সাহিত্যিক ঠিক নয়, তবু জানিনা কেন হস্‌টেলে আমার কাছে প্রায়ই আসতো—আর সুযোগ পেলেই বলতেও ভুল করতো না যে আমার লেখা ওর খুব ভালো লাগে। এ ভালো লাগার কারণ বোধ করি ছিল আরো কিছু। অর্থাৎ কলেজে ভালো ছেলে বলে যেমন আমার একটু সুনাম ছিল তেমনি খেলতেও পারতাম নেহাত মন্দ নয়—তারপর সাহিত্যিক। ভক্ত না হয়ে যায় কোথা!

সে কথা যাক্, যাদবপুরে গিয়েই হলো ওর সাথে দেখা। বিস্মিত হয়ে বল্‌লাম, আরে সমর, তুমি এখানে যে? সে বললে, আমি যে এখানেই থাকি মামাদের বাসায়—ডেলী-প্যাসেঞ্জার, বুঝলে না? চল, আজ তোমাকে আর ছাড়ছি না। তোমার জন্যেই অপেক্ষা করে আছি। আগেই জানতাম কি না আজ তোমরা আসবে!

অগত্যা যেতেই হলো।

ড্রইং রুমে বসে আছি। বন্ধু ত আমাকে নিয়ে বিব্রত

এবং অতিমাত্রায় ব্যস্ত। কিছু সময় পরে অকস্মাৎ ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললে, আজ তোমাকে এমনি আশ্চর্য্য করে দোব যে……

বন্ধুরত্নের অসমাপ্ত কথা আর শেষ হলো না।

থাক্ মেজ্দা, আর আশ্চর্য্য করে কাজ নেই,—বলেই মুখে এক ঝলক প্রসন্ন হাসি আর হাতে খাবারের প্লেট আর জলের গ্লাস নিয়ে ঘরে ঢুকলেন মেজদার অনুজা ভগ্নীটি।

বিস্মিত বিমুগ্ধ হয়ে দু'তিন মুহূর্ত্ত চেয়ে থাকতে হলো,—বাঙালী মেয়ে এতো সুন্দরী হতে পারে! বয়স ষোলো-সতেরো; অপরূপ সুন্দরী, বেশভূষায় আধুনিকতার ছাপ সুস্পষ্ট।

হাতের প্লেট আর গ্লাস আমার সাম্নে সজ্জিত টিপয়ে রেখে হাত জোড় করে বললেন, নমস্কার পৃথ্বীশবাবু, আমিও দাদার মত আপনার কবিতার একজন মুগ্ধ ভক্ত। বলেই হাসিতে সুন্দর মুখখানি আরো সুন্দর হয়ে উঠ্লো।

একজন তরুণীর কাছ থেকে অমন Compliments পাওয়া যে কোনো তরুণেরই সাধনার ধন! লজ্জায় আনন্দে অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম।

সমর ভূমিকা ক'রে বললে, এ আমার মামাত বোন্ নন্দিনী। গেলোবার 'জুনিয়র কেম্ব্রিজ' পাশ করে এখন জার্ম্মান আর ফ্রেঞ্চ শিখছে। কিন্তু ওর সব চেয়ে বড় গুণ হলো, ও খুব ভালো এস্রাজ বাজিয়ে গাইতে পারে। সেদিন টেক্‌নিক্যাল স্কুলে ওর 'প্রলয় নাচন' নৃত্য দেখে সবাই মুগ্ধ হয়েছিল, তাছাড়া ……

নন্দিনী চট করে বললে, থাক্, থাক্, তোমায় আর পাঁচমুখে বোনের গুণকীর্ত্তন ক'রে বেড়াতে হবে না। পৃথ্বীশবাবুকে জলখাবারের সুযোগটুকু এবার দাও ত দেখি।

আচ্ছা আমি তা'লে একটু আসি—বলে সমর কতকটা অপ্রতিভ হয়েই বেরিয়ে গেলো। এত সময় পর আমার নজর পড়লো খাবারের প্রতি। নন্দিনী বললে, খান্।

প্লেটে একটি মাত্র চামচে। বললাম, আর আপনি?

না, না, আমি খেয়েছি, সে বললে।

অতিথির আগেই?

নন্দিনী লাল হয়ে উঠে বললো, যান্, আপনি ভারী অপ্রস্তুত করতে পারেন।

বল্লাম, তাহলে আরো বেশী অপ্রস্তুত যদি না হতে চান্ তবে আরো একখানা চামচে নিয়ে আসুন্, দুজনেই খাওয়া যাক্। বাধা নেই ত?

নন্দিনী উঠ্লো। কী স্বচ্ছন্দ সাবলীল ওর গতি! কি অবাধ ওর মেলামেশা!! দু'জনে খেতে খেতে অনেক কথাই হলো। ভক্ত সমর যে আমার সম্বন্ধে কত বড় বড় গল্প তৈরী করে ওকে বলেছে তার কথা থেকে তা স্পষ্টই বোঝা গেলো।

খাওয়া শেষ হলো। বল্লাম, এবার আপনার গান শুন্‌ব।

গান? এখানে তো হয় না, তাহলে চলুন আমার ঘরে।

ছোট্ট একটি কোঠা, পরিপাটী করে সাজানো। একদিকে দেয়াল আলমারীতে ইংরাজী—বাঙলা—ফ্রেঞ্চ—জার্ম্মান অনেক রকমের বই। সাম্নে পড়ার টেবিল। এক কোণে ড্রেসিং আয়না 'ফিট্' করা ছোট্ট আরেকটি টয়লেটিং টেবিল। অন্যদিকে অর্গ্যান্, ওপরে জ্যাকেটে ঢাকা এস্রাজ দেয়ালে ঝুলছে। ঝালর দেয়া সুজনী ঢাকা বিছনা।

ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বল্লাম, এর জন্যে আমাকে ক্ষমা করতে হবে, বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম;—কিন্তু আর দেরী নয়।

এসরাজের বুকে সুরের ঝঙ্কার বেজে উঠ্লো—সুরের স্বপ্ন। অনেকদিন অনেক ওস্তাদ বাজিয়ের বাজ্না শুনেছি, কিন্তু যন্ত্রের মাঝে অমন ক'রে প্রাণ জাগিয়ে তুলতে কাউকেই দেখিনি। মুগ্ধ বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। বাজনা শেষ হলো। বল্লাম, এবার গান। নন্দিনী চট্ করে বললে, স্নানের পর।

স্নান? এখন এই স্বপ্নের জগত থেকে একপাও সরতে মন মানছে না। বল্লাম, স্নান হসটেল থেকে বেরুবার সময়ই সেরে এসেছি। এখন আর প্রয়োজন হবে না। গাইতেই হবে।

কোন্ গানটা গাই বলুন্ তো?

আপনার যা ইচ্ছা।

সে সুরু করলে, 'হে ক্ষণিকের অতিথি।…' এ গান

অনেকবার শুনেছি, কিন্তু তেমনটি আর শুনিনি। গান গাইতে গাইতে আপনাকে ভুলে যাওয়া, সুরের লীলায়িত তরঙ্গের সাথে সাথে তন্বী তনুর অপূর্ব্ব দোলন-ভঙ্গিমা ;—মনে হলো সে যেন সুরের পাখা মেলে কোন্ স্বপ্নলোকে উধাও হয়ে যেতে চাইছে। বিমুগ্ধ, বিভোর হয়ে রইলাম। কটা মূর্চ্ছিত হিল্লোলের মাঝে ওর সুর মগ্ন হয়ে রইলো। গায়িকা এবং শ্রোতা দুজনেই আচ্ছন্ন। সত্যি ছোড়দি, সে মূর্চ্ছনা এখনো আমার দুটি কর্ণে রণিত হয়ে উঠ্ছে। এই একটি মাত্র গান, আর সে কিছুতেই গাইলে না। ধীরে ধীরে গানের জগত থেকে রবীন্দ্রনাথের কথা উঠ্লো, ক্লাসিকেল গানের সাথে ওঁর এবং বাঙলা গানের তফাৎ, তারপর উঠ্লো রবীন্দ্রনাথের কবিতার কথা। কাব্যজগতে ওর অনুভূতি এতো নিবিড়, ওর চিন্তাশক্তি এতো স্বচ্ছ যে ওর কথা শুনে সত্যই তৃপ্ত হলাম।

তারপরে উঠ্লো প্রাচ্যপাশ্চাত্যের কবিদের কথা, ওদের সমাজ আর আমাদের সমাজের কথা। আরো কতো কি!

অকস্মাৎ সে এক প্রশ্ন করে বসলো,

আচ্ছা, আজকের এই দিনটি আপনার অনেকদিন মনে থাকবে—নয়?

এমন প্রশ্ন যে সে অকস্মাৎ করতে পারে, ভাবতেই পারি নি। যাহোক্ কথাটা একটু ঘুরিয়ে দিয়ে বললাম, আচ্ছা আপনিই বলুন না, একটু আগে যে গানটি গাইলেন তা আপনার মনের সাথে মিলিয়ে নেওয়া যায় না কি?

প্রশ্ন করে ভাবলাম, ওকে বেশ পাল্টা জব্দ করতে পেরেছি। সে কিন্তু সহজ ভাবেই একটু চিন্তা করে বললো, নিশ্চয়ই। এও কি আবার বলে দিতে হবে না কি? বরং 'না' বল্লেই ত মিথ্যা বলা হবে। আপনার কি সন্দেহ আছে না কি?

কী আর বলব! চুপ করেই রইলাম।

কিছু সময় পরে নন্দিনী আমার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে ফেল্ল, আপনার চোখ দুটো ভারী সুন্দর—ঠিক কবির মতোই।

ভাবছিলাম বলি, আর আপনি মূর্ত্তিমতী কবিমানসী। কিন্তু কথাটা বলতে বাধলো।

টেবিলের ওপর একখানি ফটোর 'এলবাম্'। বল্লাম দেখি এলবাম্‌খানি দিন্ত।

সে এতো সহজে যে দিতে পারে ভাবি নি। সমস্ত 'এলবাম্' জুড়ে ওর নানা বয়সের অনেক রকমের ফটো। দু'তিন মাস বয়স থেকে আরম্ভ ক'রে ইদানীং তোলাও অনেকগুলো ফটো আছে। সে সব ফটো দেখে ওর কী হাসি! কোনোটা কাঁদ্তে কাঁদ্তে, কোনোটা কচি কচি দাঁত বের করে খেল্না হাতে নিয়ে খুসীমুখে হাস্‌তে হাস্‌তে তোলা। তারপরে ধাপে ধাপে বয়স বাড়বার ক্রমানুযায়ী ফটোগুলো সাজানো। 'জাঙ্গীয়া' থেকে 'ফ্রক্,' 'ফ্রক্' থেকে 'সাড়ী'। হরেক রকমের 'স্ন্যাপ্' আর 'বাষ্ট্'।

শেষটায় শেষের পাতায় একটি ফটো বেরুতেই সে চট করে হাত চাপা দিয়ে বল্ল, না, না, ওটি নয়। দয়া করে ওটি দেখবেন না। ছাড়ুন, ছেড়ে দিন্ দয়া করে।

আমারও জিদ বেড়ে গেলো। জিদ ঠিক নয়, কি এক রকম ছেলেমানুষী খেয়াল। আমিও ছাড়ব না, সেও কিছুতেই দেখতে দেবে না। বুঝ্লাম, বেশ বাড়াবাড়ি হচ্ছে। কেউ যদি আমাদের সে অবস্থায় দেখত! বল্লাম, থাক্ তবে। নিন্ আপনার ফটো......না দেখলেও চলবে। বলেই মুখখানি গম্ভীর করে বসে রইলাম। জানতাম সে যে দেখাতে চায় না ওটাই তার দেখানোর কারুকলা। কি আর করে, হয়ত চেয়েছিল আমি জোর করেই দেখ্‌ব; শেষটায় বল্ল, দেখুন।

পাঞ্জাবী কিশোরের মত মাথায় পাগড়ী, বুকে শাদা সার্টের উপর ওয়েষ্ট-কোট। পরণে ঢিলে ট্রাউজারস্ আর পায়ে নাগরাই পরে দিব্যি দাঁড়িয়ে আছে। ভারী চমৎকার ফটোটি। দেখলে কিছুতেই মনে হয় না, এ ফটো নন্দিনীরই।

একটু ভেবে বল্লাম, আমার একটা কথা রাখবেন?

আগে তো বলুন কি কথা?

না, আপনি বলুন রাখবেন কিনা?

না, না, সে হয় না। মানুষের ত আর চাওয়ার সীমা নেই। যদি শেষটায় আপনি আমাকেই চেয়ে বসেন।

বলেই খিল খিল করে হেসে উঠ্‌লো। বুঝলাম, তার মুখে কিছুই আটকায় না।

আমিও হেসে কথাটিকে আরেকটু হাল্‌কা করে বললাম, না, অতদূর চাইতে যাওয়ার সাহস আমার নেই। শুধু আপনার এই ফটোটি আমার চাই।

সে কিছুতেই দেবে না। আমারও লোভ হয়েছে খুব। অকস্মাৎ সে ফটোটা টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেললো।

এই আকস্মিক ছিঁড়ে ফেলাটা এতো বিশ্রী হলো যে এর পরে কারো মুখেই আর কোনো কথা জুটলো না। দু'জনেই দুজনের সামে নির্ব্বাক্ হয়ে বসে রইলাম। অত্যন্ত অস্বস্তিকর সে বসে থাকা। আমাদের সে কুশ্রীতা থেকে রক্ষা করল সমর। এসে বল্‌লো, কি রে তোদের গান বাজনা হলো ত? এবার চল! খেতে টেতে হবে ত?

এর পরে আরো ঘণ্টা তিন ছিলাম ওদের বাসায়। কিন্তু সেই যে নন্দিনী ছেলেমানুষী করে লজ্জায়, অভিমানে দূরে সরে গেলো এর পরে এগিয়ে আসা তার পক্ষে আর কিছুতেই সম্ভব হলো না। চলে আসবার সময় হাত তুলে নমস্কার করে মুখে হাসি আনবার চেষ্টা করে বল্‌লাম, আসি।

সেও হাত তুলে নমস্কার করে জানালো, কিন্তু মুখ ফুটে একটি কথাও আর বলতে পারল না। চোখ তুলেও আর চাইতে পারলে না।

সেদিন বুকভরা ব্যথা নিয়ে হস্‌টেলে ফিরে আসলাম। সারা রাত্ ছটফট করে কাটাতে হয়েছে। ভোরে ঘুম থেকে উঠে দেখি গাল বেয়ে ঝরে পড়া দুফোটা অশ্রুর চিহ্ন তখনো লেগে আছে।

* * * *

এই পর্য্যন্ত বলেই দাদা আকাশের অবিশ্রান্ত বর্ষণের দিকে নিস্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলো। জিজ্ঞেস করলাম, ওদের বাসায় আর কোনো দিন যাওনি দাদা?

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বেশ ধীরে ধীরেই দাদা বললো, না আর যাইনি। কিন্তু চিঠির আদান-প্রদান আমাদের মধ্যে এর পরেও অনেক দিন হয়েছে। সে-ই অবশ্য আগে ক্ষমা চেয়ে লিখেছিল। যাবার জন্যে প্রায়ই লিখত। কিন্তু যাওয়া আর হয়নি। ছোড়্‌দি, আমার জীবনে ওই প্রথম ভালবাসা। কৈশোর প্রেম অকারণেই এসেছিল, অকারণেই চলেও গেছে। কিন্তু স্মৃতিটুকু আজো মন থেকে যায়নি। বিচ্ছেদে মধুময় হয়ে আছে। আজো ভাবি, কেন যে সেদিন অমন আকস্মিক ভাবে পালিয়ে এসেছিলাম, কেন যে শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সেখানে যেতে পারিনি তা এখনো আমার কাছে অমীমাংসিত। সে দিনের চলে আসা কি রাগ, না অভিমান, না কিশোর প্রেমের আঘাত দেওয়ার নেশা—কিছুই বুঝি না।

বল্‌লাম, ও তোমার কবি-মনের খেয়াল, দাদা।

দাদা দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে আপন মনেই বললে, ওই যে সারা আকাশ জুড়ে মেঘেরা দলে দলে পাগল হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে কেন, জানিস? ওরা রামগিরির সেই বিরহী যক্ষের দূত। কিন্তু অলকার পথ ওদের কাছে চিরদিনের মত রুদ্ধ হয়ে গেছে। তাই ওদের এতো মাত্‌লামি আর অফুরন্ত অশ্রুবর্ষণ!—

* * *

গল্পের মাঝেই এত সময় ডুবেছিলাম। পাশে যে সঞ্চিতা বসে আছে তার খেয়ালই ছিল না। চেয়ে দেখি তার দু'চোখ অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে উঠেছে। সেও সম্বিত্ হারা হয়ে গল্পের মাঝেই নিমগ্ন হয়ে ছিল, চেতনা ফিরে আসতেই নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার ওরকম অকস্মাৎ চলে যাওয়াটা অশোভন ত বটেই, কিন্তু থাকাটা যে আরো অশোভন হত।

এদিকে ষ্টোভে চায়ের কেটলীতে জল ফুটছেই। দাদাকে জিজ্ঞেস করলাম, চা তৈরী ক'রে দোব?—সে মাথা নেড়ে শুধু বললে না।

আমার ঘরে গিয়ে দেখি সঞ্চিতা বিছনায় একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। কি অবিশ্রান্ত তার সে ক্রন্দন! কিছুতেই আর শান্ত হতে চায় না। সান্ত্বনা দিতে গিয়ে আরো

মুস্কিলে পড়লাম, তার কান্না আরো বেড়েই চললো। শেষটায় দাদার কাছেই যেতে হলো।

—কেন তুমি অমনভাবে ওকে আঘাত দিলে দাদা?

উত্তেজনায় সে দিকে লক্ষ্যই ছিল না। দেখি দাদা টেবিলে দুই হাতের মাঝে মুখ গুঁজে বসে আছে। বুঝতে বাকি রইলো না ওর চোখেও অশ্রুর প্লাবন নেমে এসেছে। তাই ধরা পড়বার লজ্জায় মুখ তুলতে সে পারছিল না। কথাও বললো না সেই একই ভয়ে।

সত্যি, কি দুর্জ্ঞেয় এই মানুষের মন। একটু আগেই ত দাদা সঞ্চিতাকে কাছে পাওয়ার জন্যে উন্মুখ হয়েছিল। অথচ যখন সে সত্যিই কাছে আসলো তখন সেই একান্ত বাঞ্ছিতাকেই অমন করে আঘাত দিয়ে দূরে না সরিয়ে দিলে কি চলত না?—আর এই আঘাতই কি চতুর্গুণ হয়ে দাদার নিজের প্রাণে ফিরে আসেনি? তবে?—

দাদা এতো সময়ে নিজেকে অনেকটা সংবৃত করে নিতে পেরেছে। ডাক্‌লাম, দাদা?

কি?

কেন তুমি এই মিথ্যে গল্প বানিয়ে বললে?

ও কি সব কিছুই সত্যি ভেবেছে নাকি?

আমিই তো ভেবেছিলাম। গল্প বানাতে ওস্তাদ ত তুমি কম নও!

ওকি চলে গেছে ছোড়দি? ভীরু কম্প্রকণ্ঠে দাদা বললে।

না, যায়নি। যতো আঘাতই তুমি ওকে দাও, ওযে যেতে পারে না দাদা। আজ যে বাদলায় ভিজে এই সন্ধ্যায় তোমার কাছেই সে এসেছে।

আঘাত কি ও খুব বেশী পেয়েছে ছোড়দি?

পায়নি আবার? দেখো গিয়ে আমার ঘরে কি ভীষণ কান্নাই না কাঁদ্‌ছে!

কাঁদ্‌ছে নাকি? দাদার স্বর আরো আর্ত্ত, আরো ক্লিষ্ট।

একটা অনুরোধ করব দাদা?

কি?

তুমি একবার ওর কাছে যাও লক্ষ্মীটি। ওকে গিয়ে সান্ত্বনা দাও। যাও, ওর কাছে যাও তুমি। আমার অনুরোধ রাখো।

অনেকক্ষণ পরে দাদা জবাব দিলে, যাচ্ছি।

দাদাকে আমার ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করে রইলাম।

একটু পরেই অস্থির হয়ে দাদা ফিরে এসে বললো, সঞ্চিতা কই ছোড়দি?

আমার ঘরে নেই?

না, না ছোড়দি', সে নেই।

দাদা এবার একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে।

ক্ষীপ্র পদে ঘরে গিয়ে দেখলাম, সত্যি সঞ্চিতা নেই। অভিমানিনী চলে গেছে।

সেই অবিশ্রান্ত বর্ষণের মাঝেই নীরবে যেমন সে এসেছিল তেম্‌নি নিঃশব্দে আবার চলেও গেছে। কেবল তার অন্তরের মর্ম্মন্তুদ বেদনার ইতিহাস লেখা হয়ে রইলো একটি বাদল সন্ধ্যার বুকে। আর বাইরের আকাশ-বাতাস তারি উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনাবেগ নিয়ে মুহুর্মুহু কেঁপে উঠ্‌ছে।

জগদীশ ভট্টাচার্য্য

বানপ্রস্থ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ এ (ক্যাল এবং ক্যাণ্টাব), এ আর সি এস্ (লণ্ডন), আই ই এস্

মহোবা

মহোবা বুন্দেলখণ্ডের একটি প্রাচীনতম সহর। অনুমান ৮০০ খৃষ্টাব্দের চাণ্ডিলরাজা চন্দ্রবর্ম্মা এক মহাযজ্ঞ (মহৎ সভা) করে মদন সাগরের (সরোবরের) তীরে এই সহরের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। 'মহৎ সভার' থেকে বর্ত্তমান মহোবা নামের উৎপত্তি। এখানে একটি ধ্বংসাবশেষ দুর্গ আছে। তার উপর থেকে চারিদিকের পার্ব্বত্য দৃশ্য এবং হ্রদের শোভা অতি রমণীয়।

গরুর গাড়ী—মহোবার পথে
শ্রীললিতমোহন সেনের সৌজন্যে

ছত্রপুর থেকে মহোবার ডাকবাংলা ৩৭ মাইল পথ, মোটরের মিটারের হিসাবে। পাহাড়ের কোলে নির্জ্জন স্থানে এই বাংলাটি। ১৮ই অক্টোবর বেলা প্রায় সাড়ে পাঁচটার সময় এখানে পৌছলাম। তাড়াতাড়ি চা খেয়েই মোটরে বাহির হওয়া গেল, সন্ধ্যার আগে যতটা পারা যায় সহরটার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নেবার জন্য, কতকটা যেন বই না পড়ে পাতা উল্টানর মত। একরাত্রি এখানে কাটিয়ে পরদিন দ্রষ্টব্য স্থানগুলি যথাসম্ভব দেখে আবার যাত্রাপথে অগ্রসর হতে হবে। মহোবায় অনেক প্রাচীন বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে, আর আছে আকাশের নীলাঞ্জন মাখা হ্রদের পর হ্রদ।

ঠিক্ সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে কিরাত সাগরের তীরে এসে মোটর থাম্‌ল। আমরা নেমে শেষ অস্তরাগের অস্তরাটি লেকের জলে স্পন্দিত দেখ্‌লাম। তীরে বটমূলে রাশীকৃত চিত্র ও লিপি খোদিত প্রস্তরখণ্ড, ঐতিহাসিকের আঁস্তাকুড়, হয়ত ইহার মধ্যে কত মূল্যবান্ তথ্যের টুক্‌রা পড়ে আছে। অদূরেই মদনসাগর। পাহাড়ে ও মন্দিরে মদনসাগরের ওপারের দৃশ্য একটা অপূর্ব্ব ইন্দ্রজাল রচনা করেছে। ধ্বংসের পশ্চাতে তার পূর্ব্বগৌরবের স্মৃতির একটা 'অরোরা' আছে, তাই তার শবাস্থিপঞ্জরেও একটা দীপ্তিচ্ছটা উদ্ভাসিত হয়। পরদিন আবার মদনসাগরে আসব ঠিক্ করে অন্ধকার হবার আগেই অলিগলির পথে হোঁচট্ খেতে খেতে মোটরে বাংলায় ফির্‌লাম। বুন্দেলখণ্ডের দেহাতে এসে এত বড় পল্লীসহর ইতিপূর্ব্বে চোখে পড়েনি। এখানে মস্ত বড়

লেক—মহোবা
শ্রীললিতমোহন সেনের সৌজন্যে

মুসলমান্ বস্তি দেখ্লাম যা অন্যত্র দেখিনি। কন্ভেণ্টের পাশ দিয়ে যেতে যেতে স্বদেশী বামাকণ্ঠে অর্গ্যান্ সহযোগে বিদেশী গান শ্রুতিগোচর হ'ল। এই সহজ সরল সুরের উত্থান পতনে বড় একটা গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্য আছে। অন্ত্যজ-জাতিদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্মের শিক্ষা-দীক্ষার মহা প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতে সর্ব্বত্রই দৃষ্টিগোচর হয়। আমাদের জাতীয় আধ্যাত্মিকতার দম্ভ আছে এবং তার চেয়ে এককাঠি বেশী আছে সেই মন্ত্রশক্তি, যার প্রভাবে আপনার জনকে পর করবার ক্ষমতা আমাদের অনন্যসাধারণ। আহারান্তে রাত্রে ডাক্বাংলার সম্মুখস্থ মাঠে ইজি চেয়ারে লম্বা হয়ে খুড়ো-ভাইপোয় উর্দ্ধমুখে জ্যোৎস্নাপান করা গেল। শুক্লপক্ষে বাহির হওয়া গেছে, এবারকার ভ্রমণকে চান্দ্রায়ন বলা যেতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে ব্রতটি সুখসেব্য, কৃচ্ছ্র নয়। ১৯শে অক্টোবর।

পাহাড়ের কোলে ডাক্-বাংলা—মহোবা

ভোরে উঠে বাংলার নিকটবর্ত্তী গুল্মজঙ্গলের মাঝখান দিয়ে একটি পথ ধরে অগ্রসর হ'তে হ'তে কল্যাণ সাগরের তীরে উত্তীর্ণ হলাম। পূর্ব্বাকাশে তখন সোণার দীপ্তি, তার আভা ফুটেছে সরোবরের নিথর দৃষ্টিতে। মানুষের অপলক চোখে ত এমন ছবি ফোটে না। অন্তরে ফোটে বই কি, কিন্তু তা' অন্তরাত্মা ছাড়া আর কেউ ত দেখ্তে পায় না। পায় না কেন বলি? পায়, তার রূপ সৃষ্টিতে, শিল্পে, সাহিত্যে সঙ্গীতে। সেই ভোরের মধুর আলো বাতাসে এসে মিশল নাম-না-জানা পাখীর কলতান। নামের প্রয়োজন কি? সেক্ষপীয়র বলেছেন—Call the rose by any name, it smells as sweet। তেমনি বলি, Call the bird by any name it sings as sweet.

মদনসাগরের তীরে—মহোবা

যে নামে খুসী ডাকনা গোলাপে রে,
গন্ধ তার তেমনি মধুময়।

মদনসাগরে স্নানের ঘাট—মহোবা

কি আসে যায় নামের হেরে ফেরে ?
মধুর স্বরে পাখীর পরিচয়।

বাংলায় ফিরে এসে চা খেয়ে মোটরে বাহির হওয়া গেল, মদনসাগরের উদ্দেশে। কাশ্মীরি শালে তৈরী অনেক রঙের Dressing gown বা আলখাল্লাটি মনে পড়ল। এক হিসাবে এই দরগা যুগপৎ হিন্দু মুসলমানের সমাধি মন্দির, ধূলিসাৎ পূজা-প্রতীকের সঙ্গে সাধু ফকিরের দেহধূলি এখানে মিশেছে।

হ্রদের দীপে ও ওপারে বড় চন্দ্রিকাদেবীর ও অন্যান্য মন্দির-গুলি দেখ্‌বার জন্য জেলেডিঙি সংগ্রহ কর্‌বার বহু চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। ঘাটে ডিঙির সারি, কিন্তু কাণ্ডারী নাই। আমাদের মহোবার পরমায়ু বেলা দ্বি-প্রহরাবধি। সুতরাং পরপারে যাবার আশা ত্যাগ করে এপারের দ্রষ্টব্যগুলির প্রতি মনোনিবেশ করা গেল। ভাইপোর ক্যামেরা নিযুক্ত হ'ল চিত্র-চয়নে, আমি দুচোখ দিয়ে যা' ছেঁকে তুল্‌লাম সছিদ্র-স্মৃতির ভাণ্ডে, তার চিহ্নলেশ বিশেষ কিছুই নাই। কেবল মনে পড়ে, লোকের সুগভীর সুনীল দৃষ্টি, আর ওপারের মন্দিরগুলির হাতছানি, আর সেই খেদোক্তি।

রয়েছে নাও, নাইক নেয়ে,
মিছে ওপারে রহিনু চেয়ে।

ভগ্ন-দুর্গ— মহোবা

মদনসাগরের নিকটেই মুনিয়া-দেবীর প্রাচীন মন্দির দর্শন করে, তীর বরাবর খানিকটা এগিয়ে গিয়ে পৌছলাম পীর্ মবারক শার দর্‌গায়। দর্‌গাটি প্রাচীন হিন্দু মন্দির ভেঙ্গে রচিত। আদ্যোপান্ত প্রায় সর্ব্বত্রই হিন্দু-মন্দিরের রূপ, কেবল দুচারটি কবরের লক্ষণায় দর্‌গা ব'লে অনুমিত হয়। তীর্থঙ্করদের মূর্ত্তি দেখাবে বলে একজন লোক আমাদের সঙ্গ নিল। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে মোটরের রাস্তা ফুরাল। আমরা গাড়ী রেখে

চন্দ্রিকাদেবীর মন্দিরের পূজারিণী
(ইনি আমাদের পথ দেখাইয়া তীর্থঙ্করদের মূর্ত্তি-খচিত গুহায় লইয়া গিয়াছিলেন।)

পদব্রজে গেলাম অনেকদূর। পথে মহাবীরের মন্দির ও পাহাড়ের গায়ে খোদা বিরাট হর-পার্ব্বতীর মূর্ত্তি (আধুনিক) দৃষ্টিগোচর হল বটে কিন্তু তীর্থঙ্করদের দর্শন লাভ হ'ল না। না হোক্, এই স্থানটি প্রাকৃতিক শোভায় রমণীয়। ফটো তুলে ও চারিদিকের শোভা উপভোগ করে আমরা মোটরে ফির্‌লাম। ভাইপো পুঁথিপত্র দেখে সহর থেকে ক্রোশদুই দূরে আর একদিকে যাত্রা কর্‌লেন তীর্থঙ্কর-দের সন্ধানে। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" দর্শন লাভ ঘট্‌ল।

আমরা রাজপথে মোটর রেখে ক্ষেতের পর ক্ষেত আর উলুখড়ের মাঠের পর মাঠ পার হয়ে একটা ছোট পাহাড়ের কাছে এসে পড়্‌লাম। পথে একটি সরোবরের পাশে ছোট মন্দির অতিক্রম করে কিছুদূর অগ্রসর হয়েছি, এমন সময় এক প্রাচীনা ঋজুকায়া স্ত্রীলোক আমাদের জিজ্ঞাসা কর্‌ল "কোথায় যাচ্চ তোমরা ?" আমাদের গন্তব্য জানালাম। সে আমাদের স্বেদসিক্ত কাতর মূর্ত্তি দেখে দয়াপরবশ হয়ে বল্‌ল "তোমরা ত পথ খুঁজে পাবে না। আমি এই মন্দিরের পূজারিণী (যে মন্দিরটি পার হয়ে এলাম)। চল, তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাই।" পূজারিণীর সঙ্গে চল্লাম। কিছুদূর গিয়ে একটা ছোট পাহাড়ে উঠতে হল। পাহাড়ের চূড়ায় একটি গুহা। পূজারিণী আমাদের পিছনে রেখে আগে গিয়ে গুহায় প্রবেশ কর্‌লেন এবং হাততালি দিয়ে দেখ্‌লেন কোন বন্য জানোয়ারের সাড়া পান কিনা। তারপর আমাদের ডাক্‌লেন। প্রকাণ্ড গুহা। অনেক দূর ভিতরে চলে গেছে। বাঘ-ভালুকের ভয় থাক্ না থাক্, সাপের ভয় ত আছে, বিশেষতঃ

গুহাগাত্রে তীর্থঙ্করমূর্ত্তি—মহোবা

বড়বাজারে—মৌরাণীপুর

প্রকৃতি তাঁর। জীবনের ক্ষুদ্র ইতিহাস আমাদের বল্লেন। তাঁর বাপ এই মন্দিরের পূজারি ব্রাহ্মণ ছিলেন। পোনেরো বৎসর হ'ল একদিন রাত্রে এই মন্দিরে ডাকাত পড়ে এবং তাঁর পিতা মাতা উভয়েই নিহত হন। তিনি পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেন। গ্রামের লোকেরা একমাত্র কন্যা তাঁকেই তদবধি এই মন্দিরের পূজারিণী করেছে। তিনি সমস্তদিন এই মন্দিরে কাটান, নিকটের গ্রামে রাত্রি বাস করেন। আমাদের সঙ্গে বড় রাস্তা পর্যন্ত আগ্‌বাড়িয়ে এলেন এবং করযোড়ে মার্জ্জনা ভিক্ষা কর্‌লেন, যদি তাঁর আতিথ্যের কোনো ত্রুটি হয়ে থাকে তবে আমরা যেন তাঁর কসুর মাপ করি। তাঁর অতিথি সৎকার ও সৌজন্যের মধুস্মৃতি নিয়ে ফির্‌লাম। ভাইপোর ক্যামেরা স্মৃতিটিকে চিত্রপটে মুদ্রিত করে আন্‌ল। পূজারিণীর মুখে স্তোত্রের আবৃত্তির ঝঙ্কারটিও কানে জেগে আছে। প্রকৃতি জড়, অবচনা, আমাদের মত স্থূলদর্শীর চোখে। কিন্তু তার উদার উন্মুক্তির মাঝখানে যখন সহজ সরল মানুষের সংস্পর্শে আসি, তখন সেই পুরুষ বা নারীর চোখে মুখে, কথায় আচরণে এমন একটি অনির্ব্বচনীয় স্বরূপ ফোটে, যার আমাদের মত সহুরে জীবের। বেশীদূর আর সে অন্ধকারে অগ্রসর হলাম না। গুহার মুখে ও বাহিরে প্রস্তর ভিত্তিতে খোদিত বহু মূর্ত্তি। সম্ভবতঃ তীর্থঙ্করদের হবে। ফটো তোলা হ'ল। তারপর আমরা পাহাড় থেকে নেমে ছোট চন্দ্রিকাদেবীর মন্দিরে পূজারিণীর সঙ্গে প্রবেশ কর্‌লাম। পিপাসায় শুষ্ক তালু। পূজারিণী ঘটি মেজে কূয়ার থেকে জল তুলে আমাদের সাদরে পান করালেন। বড় সরল মধুর

জৈন মন্দির—রাণাপুর

ভিতর চারিদিকের পরিস্থিতির সঙ্গে তার নিগূঢ় যোগটি আমরা প্রত্যক্ষ করি। জড়প্রকৃতি কথা কয় তার মুখে, মমতাময়ী হয় তার স্নেহ সেবায়। মন তখন আপনা থেকেই বলে,

"শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।"
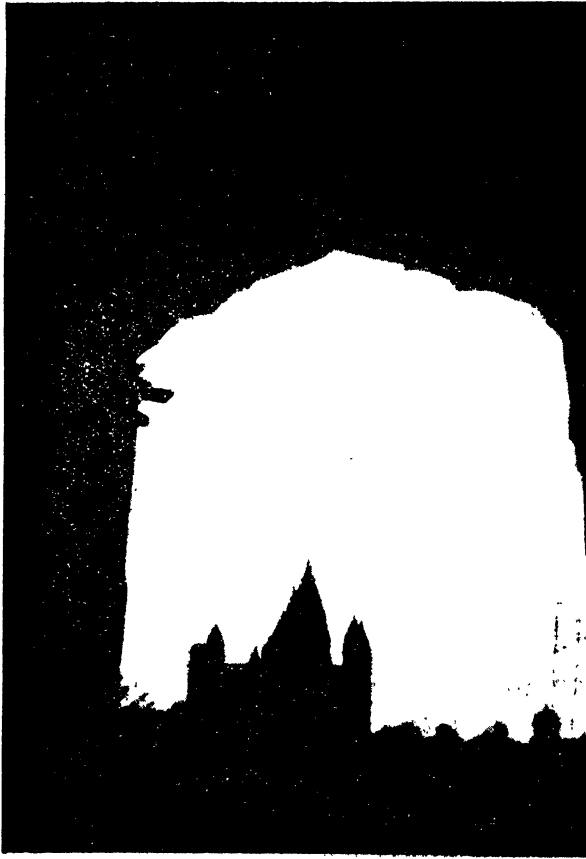
বাতায়ন—ওড়্চা

বাস্তবিক, মানুষের কাছে মানুষই চরমতম সত্য, শিব ও সুন্দর। আমাদের ভগবান ত আমাদেরই নিখুঁৎ মনের মানুষ, জ্ঞানে, প্রেমে, শুদ্ধতায় নরোত্তম। সেই রৌদ্র-দগ্ধ মধ্যাহ্নে তৃষ্ণার্ত্তকে জলদান করলেন যে মাতৃরূপিণী, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁকে স্মরণ করি। মন্দিরে একটি প্রাচীন প্রস্তর প্রতিমা দেখলাম, শিবের বক্ষে দণ্ডায়মানা কালী মূর্ত্তি। পূজারিণী বল্লেন, ইনি চন্দ্রিকা দেবী। চণ্ডিকা নয় ত? এ অঞ্চলে কোথাও এরূপ মূর্ত্তি চোখে পড়েনি।

মৌরাণীপুর

১৯শে অক্টোবর। বেলা আড়াইটার সময় মৌরাণীপুর অভিমুখে যাত্রারম্ভ। মোটরে ৭২ মাইল পথ। মাঝ রাস্তায় মোটর অচল হল, ঘণ্টা দুই গাছতলায় আসন পাতা গেল। সেই ডাক্‌বাংলায় যখন পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। বাংলার সম্মুখের মাঠে টেবিল পেতে দিব্যি আরামে চা পান করে দীর্ঘযাত্রার শ্রান্তি দূর হ'ল। চা খেয়েই মোটরে সহর দেখ্‌তে বাহির হলাম। এখানকার বড় বাজার প্রশস্ত চাতাল ঘেরা বিপণীশ্রেণী। চাতালে মোটর থামিয়ে হালুয়াই-এর দোকান থেকে পুরি ভাজিয়ে উদরপূর্ত্তির ব্যবস্থা করা গেল। যেমন ঘি, তেমনি আটা, পয়লা নম্বর। মোটরে বসে যখন নৈশ-ভোজের পুরির টগ্‌বগায়মান ঘৃত-সাগরে অবগাহন লোলুপ নয়নে দেখছি এমন সময়ে এক বৃদ্ধ ভিখারী গাড়ীর কাছে এসে মৃদুগুঞ্জনে বেহাগ রাগিণীতে আলাপ সুরু করে দিল। মিঠে গলা, মিড়ে মিড়ে সুর নিঙ্‌ড়ে, তানে তানে প্রাণ ঢেলে গাইল। উৎসুক শ্রোতা পেলে গায়কের কণ্ঠে সুরের ফোয়ারা স্বতঃই উৎসারিত হয়। অনেকক্ষণ ধরে তার গান শোনা গেল। আমাদের মোটর ঘিরে ভিড় জমে গেল। গানের ক্ষণিক আসরে মৌরাণীপুরের কিঞ্চিৎ মধু 'খোদা ছপ্পড় ফুঁড়ে' দিলেন। যথালাভ! জ্যোৎস্নায় সাঁতার দিয়ে মোটর যখন ডাক্‌বাংলার কূলে এল তখনও গানের রেশ কানে লেগে আছে। বেহাগ রাগে কেমন একটা আকুলতা আছে, যাকে

"Desire of the moth for the star
Of the night for the morrow"

বলা চলে। যা চিরদিনই নাগালের বাহিরে রয়ে গেল,

তার জন্য একটা মর্ম্মভেদী আকুল ক্রন্দন। যা পাবার নয়, তার জন্য হাহাকার। গভীর রাতে নিঃসঙ্গ একাকীত্বের মাঝে কোন্ নক্ষত্রলোকের পানে এ সুর ভেসে যায়, ভাসিয়ে নিয়ে যায়। একরাত্রির জন্য ডাকবাংলায় বিশ্রাম।

রাণীপুর

২০শে অক্টোবর। চা পানান্তে যাত্রারম্ভ। বেলা সাড়ে নটার সময় রাণীপুরে পৌছান গেল, মৌরাণীপুর থেকে চার মাইল মাত্র। এখানে একটি সুন্দর জৈনমন্দির আছে। ভাল করে দেখবার আর অবসর হল না। আমাদের বুন্দেলখণ্ডের গোণা দিন ফুরিয়ে এসে মাত্র কয়টি ঘণ্টায় "নাসিকান্তপ্রাপ্ত জীবিত" হয়েছে। এখনও শেষ ঘাটি ওড়্চা বাকি। সুতরাং বিলম্বেনালং, ছুটলাম ওড়্চার পথে।

ওড়্চা

ঝাঁসির থেকে ওড়্চা ৭ মাইল দূরে। বেটোয়া নদীর তটে বুন্দেলা রাজ্যের প্রাচীনতম শ্রেষ্ঠ রাজধানী এইখানে। নদী সৈকতে প্রকাণ্ড দুর্গ। পাথরের সেতুবন্ধ পার হয়ে সহরটী নদীর অপর পার পর্য্যন্ত প্রসারিত। সহরের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে রাজা বীরসিংহের প্রাচীর-ঘেরা বিরাট বিপুল প্রাসাদ। ওড়্চায় পৌছিতে বেলা একটা বেজে গেল।

দাতিয়া রাজগড় এবং ওড়্চার গিরিদুর্গগুলি স্থাপত্য-কৌশলে গাম্ভীর্য্যে ও পারিবারিক দৃশ্যাবলির সৌন্দর্য্যে অনুপম। সপ্তাহব্যাপী মোটর পরিক্রমা বেলা তিনটার সময় ঝাঁসিতে এসে পূর্ণচ্ছেদে পৌছিল।

বুন্দেলখণ্ডকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে ২০শে অক্টোবর বেলা সাড়ে চারটার ট্রেণে রওনা হলাম সাঁচির উদ্দেশে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্ত)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

ভ্রম সংশোধন

এই প্রবন্ধের গত ফাল্গুনের সংখ্যায় দুইটি ছাপার ভুল আছে। পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক সংশোধন করিয়া লইবেন।

পৃষ্ঠা ২১৭, ১ম কলম, লাইন ১২
—"আধঘণ্টা" স্থলে "আট ঘণ্টা" হইবে।

পৃষ্ঠা ২২২, ১ম কলম, লাইন ১৬
"বীরপদসঞ্চারে" স্থলে" ধীরপদসঞ্চারে" হইবে।
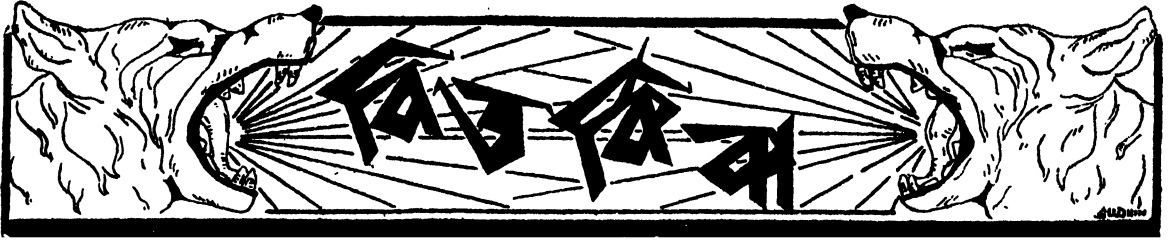
১। বানান-সমস্যা

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

গত অগ্রহায়ণের "বিচিত্রা"র "বিতর্কিকা"য় শ্রীযুত ব্রহ্মচারী-সরলানন্দ আমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছেন। আমি গত কার্তিকের "প্রবাসী"তে রাজা শ্রীরামচন্দ্র চরিত লিখিয়াছিলাম। ব্রহ্মচারী মহাশয় কয়েকটি শব্দের মৎকৃত বানানের হেতু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ইহাতে আমি প্রীত হইয়াছি। বুঝিতেছি, তিনি পাশ কাটাইয়া চলেন না।

কিন্তু দুঃখ হইতেছে, ব্রহ্মচারী মহাশয় "প্রবাসী"তে জিজ্ঞাসা করেন নাই। চরিতটি "বিচিত্রা"য় প্রকাশিত হয় নাই, "বিচিত্রা"র পাঠক তাঁহার প্রশ্নের গুরুত্ব বুঝিতে পারিবেন না। আমিও "বিচিত্রা" দেখিতে পাই না। এক বন্ধুর অনুগ্রহে দৈবাৎ পড়িতে পাইলাম। অন্যের কর্মের কিম্বা মতের প্রশংসা কিম্বা নিন্দা করিলে, অনুমোদন কিম্বা প্রতিবাদ করিলে, তাঁহাকে না জানাইলে মনের সুখও হয় না। চারি পাঁচ মাস পূর্বে দুই পত্রিকায় আমার কোন দুই মতের সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, আমি সেদিন দৈবাৎ আর এক বন্ধুর কৃপায় দেখিতে পাইলাম। সম্পাদকদ্বয় আমার ঠিকানা স্বচ্ছন্দে পাইতেন। আমি সমালোচনার উত্তর দিতে পারিলাম না, পত্রিকাদ্বয়ের পাঠক বুঝিলেন সমালোচনা ঠিক হইয়াছে।

ব্রহ্মচারী মহাশয়ের প্রশ্ন হইতে বুঝিতেছি, তিনি বাংলা বানান সম্বন্ধে আমার কোন প্রবন্ধ, কিম্বা মৌখিক ভাষায় লিখিত আমার কোন রচনা পড়েন নাই। এখানে তাঁহার প্রশ্নের সম্যক্ উত্তর দিবার স্থান নাই, সম্প্রতি আমার অবসরও নাই। এই কারণে সামান্যতঃ দুই চারি কথা লিখিতেছি।

বাংলা ভাষা আমার একার সম্পত্তি নয়। ইহা পাঁচ কোটি নর-নারীর পৈতৃক সম্পত্তি। বঙ্গের সর্বত্র, পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ প্রান্তেও লৈখিক বাংলা ভাষার ঐক্য আছে। ইহা নূতন নয়। বহুকালাবধি ঐক্য চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু মৌখিক ভাষা কখনও এক ছিল না, এক হইবে না। দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে মৌখিক ভাষার ভেদ আছে। এই কারণে মৌখিক ভাষায় লিখিতে হইলে আত্ম-প্রীতি খর্ব করিতে হইবে। আত্ম-প্রীতি স্বাভাবিক। কিন্তু সমাজে বাস করিতে হইলে পণ্ডিত ও অজ্ঞ, দুয়েরই মুখ চাহিতে হয়।

মৌখিক ভাষা ত্বরার ভাষা, আলস্যের ভাষা। সকল শব্দ ঠিক উচ্চারিত হইল কিনা, কর্তা-কর্ম-ক্রিয়াপদ যথাস্থানে বসিল কি-না, কে জানে। শ্রোতা বুঝিতে পারিলেই বক্তা নিশ্চিন্ত। ইঙ্গিতে জানাইতে পারিলে আরও খুশী। কিন্তু লিখিতে হইলে ধৈর্য চাই, অবসর চাই। তখন সর্ব-পরিচিত অক্ষর সাজাইয়া চিহ্ন দ্বারা অভিপ্রায় জানাইতে হয়। পাঠক লেখকের অপরিচিত, বিষয় অপরিচিত, ভাব অপরিচিত। ইঙ্গিত নাই, স্বরলোপ, স্বরবৃদ্ধি, বলন্যাস নাই; ধ্বনির চিত্র দ্বারা লেখক ও পাঠকের মনের যোগ ঘটাইতে হয়। অতএব মৌখিক ভাষার রূপে লৈখিক ভাষার রূপ যত রাখিতে পারা যায়, নানাস্থানের

পাঠকের তত সুবোধ্য ও সম্মত হয়। প্রামাণিক, সর্বজন-স্বীকৃত উচ্চারণের অনুগত বানান দ্বিতীয় কর্তব্য।

দুঃখের বিষয়, ইদানীর পাঠশালা ও ইস্কুলে ছেলেরা বর্ণ-পরিচয় শিখে না, কোন্ অক্ষরের কি ধ্বনি, ঘরের কথা শুনিয়া শিখে। এই অব্যবস্থায় শব্দের বানান ক্রমশঃ কৃত্রিম হইয়া পড়িতেছে। কলিকাতায় হিন্দী প্রভাব কলিকাতা নিবাসী বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা জানেন না, গাছের ডাল আর মুগের ডাল, মাছের চার আর টাকা চার, সোনার হার আর খেলার হার, গোরুর পাল আর নৌকার পাল, ইত্যাদি জোড়া জোড়া শব্দের ধ্বনিতে প্রভেদ আছে। দ্বিতীয়টিতে আকার পরে ঈষৎ ইকার আছে, প্রথমটিতে নাই। বঙ্গের পূর্ব ও পশ্চিম ভাগে এই ইকার বর্তমান। সেটা ভাখা নয়। ব্যুৎপত্তিতে আছে, লৈখিক রূপেও আছে। না থাকিলে বানান অশুদ্ধ। কলিকাতা-নিবাসী এক বন্ধু বলেন, "আজকাল সবাই আজকাল বলে, কেউ আজিকালি বলে না।" কথাটা ঠিক নয়। 'সবাই', তাঁহার মণ্ডলের সবাই। 'আজকাল' আর 'আজিকালি', এই দুয়ের মধ্যবর্ত্তী ধ্বনি লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীর মুখে বাহির হইতেছে। যখন বন্ধুবর বলেন, "কাল (তাঁর) কাল হয়েছে," তখন দুইটা 'কাল' উচ্চারণে নিশ্চয় প্রভেদ করেন। বাংলা ছাপাখানায় ঈষৎ ই-কারের দ্যোতক অক্ষর নাই। ি হইতে কাটিয়া ` লও, অক্ষরটি আমার কল্পিত। ইহার নাম ঈষৎ ই। অক্ষরটি ভাল কি মন্দ, সে বিচার করিতে পারেন। কিন্তু একটা অক্ষরের প্রয়োজন অস্বীকার করিতে পারেন না। হুকার 'কলিকা', 'কলিকাতা', 'বইন' প্রভৃতি শব্দের ইকার মৌখিক ভাষায় লুপ্ত হয় না, ঈষৎ ধ্বনিত হয়। সে ধ্বনি জানাইলে এবং আমার কল্পিত অক্ষর গ্রহণ করিলে ক'লকে, ক'লকাতা, ব'ন লিখিতে হইবে। া অক্ষরের যোগে ী দেখায়। ছাপাখানায় এই অক্ষরটি আছে। তখন চালে কাঁকর, ধাতে সয় না, জাতে নেয় না; ইত্যাদি রূপ দেখাইতে পারা যায়। পূর্বে পূর্বে মৌখিক ভাষায় আমার রচনা ছাপিবার সময় কম্পোজিটর ই-অক্ষরের টাইপ হইতে ঈষৎ ই কাটিয়া লইতেন। তাহার সময় যাইত, দুই অক্ষরের মাঝে ফাঁক পড়িত। আমিও বিরক্ত হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছি।

মৌখিক ভাষার ক্রিয়াপদে ঈষৎ ইকার বর্তমান। ব-স্ ধাতু লইয়া দেখাইতেছি। 'সে বসিত, বসিল, বসিবে।' মৌখিক ভাষায় 'সে ব'সত, ব'সল, ব'সবে।' বন্ধুবর নূতন অক্ষর-নির্মাণের বিরোধী। প্রেসের কর্তা কৃপাপূর্বক যে অক্ষর দিবেন, তিনি তদ্দ্বারা অভাব পূরণ করিবেন। দৈবক্রমে প্রেসে ' (ঊর্ধ্ব কমা) চিহ্ন আছে। তিনি ও অসংখ্য লেখক ঊর্ধ্ব কমা দ্বারা এই ঈষৎ ইকার জানাইতেছেন। ইংরেজী শব্দের অক্ষর কিম্বা বর্ণ লুপ্ত হইলে ঊর্ধ্ব কমা দ্বারা লোপ বুঝান হইয়া থাকে। কিন্তু বাংলায় ই ধ্বনি লুপ্ত বিগত নয়, বিদ্যমান জীবন্ত। ইংরেজী অনুকরণ চলিতে পারে না। বাংলা লেখকেরা ভাবিতেছেন না, ' চিহ্নটি অক্ষর অর্থাৎ বর্ণদ্যোতক নয়। এটি উদ্ধার-চিহ্ন, শব্দ ও বাক্যকে বিশেষ করিবার চিহ্ন। এটি ইঙ্গিত মাত্র। কর্তাভেদে ইঙ্গিতের ভেদ হয়। কেহ তর্জনী-হেলন দ্বারা তর্জন করেন, কেহ আহ্বান করেন, কেহ নমস্কার করেন, কেহ এক সংখ্যা জ্ঞাপন করেন, ইত্যাদি। কেহ লিখিতেছেন, করিত'। বুঝিতে হইবে ত অকারান্ত। কেহ হরী' লিখিয়া রী বানান দেখিতে বলেন। কেহ পদ্যে দেখি' লিখিয়া বলেন, এটি 'দেখিয়া'। কেহ, করি বলি ধরি' লিখিয়া বলেন, এই তিনটি পৃথক। কেহ বা 'মা'র' লিখিয়া 'মায়ের' পড়িতে বলেন, অথবা আর কিছু বলেন। এক চিহ্নের নানা অর্থ থাকিলে সেটা সঙ্কেত হইতে পারে না। বন্ধুবর বলেন, "বুঝিতে কষ্ট হইতেছে না"। এই যুক্তি বৈজ্ঞানিক নয়, ব্যবহারিক নয়, পাশ কাটাইয়া চলার যুক্তি। বোধ হয়, কোনও অক্ষর-পরিচয় বা ব্যাকরণ পুস্তকে ঊর্ধ্বকমার এত রকম সঙ্কেতের ব্যাখ্যা নাই। বন্ধুবরের কষ্ট হয় না, কারণ তাঁহার মণ্ডলের উদ্ভাবিত। আমার হয়; পড়িতে পড়িতে থামিতে হয়। সে মণ্ডলের বাহিরের বাঙ্গালী ও বাংলাভাষা-শিক্ষার্থী অবাঙ্গালী দিশাহারা হইয়া পড়েন। বোধ হয়, এই আশঙ্কায় কেহ কেহ ব-স্ ও বো-স্, দুইটা ধাতুর সৃষ্টি করিতেছেন। তাঁহারা বো-স-ত, বো-স-ল, বো-স-বে,

বো-সো লেখেন, সোজা ভাষাকে কঠিন করিতেছেন। কেহ ই-ত, ই-ল, ই-ব বিভক্তির ই-তো ই-লো, ই-বো রূপ কল্পনা করিয়া তুষ্ট হইতেছেন।

বাংলা ভাষায় ইয়া প্রত্যয়ান্ত অসংখ্য শব্দ আছে। ইয়া প্রত্যয় যোগে বিশেষণ নির্মিত হয়। পূর্ব বঙ্গে মৌখিক ভাষায় ইয়া স্বরূপে আছে, পশ্চিমবঙ্গে ইয়া স্থানে প্রায়ই ইয়ে হয়। ইয়া ধ্বনি আর য্যা ধ্বনি এক, ইয়ে আর যে এক। যেমন, পাহাড়িয়া—পাহাড়্যা—পাহাড়্যে; তিলিয়া—তিল্যা—তিল্যে; গুড়িয়া—গুড়্যা—গুড়্যে; ডানপিটিয়া—ডানপিট্যা—ডানপিট্যে; কুটকচালিয়া—কুটকচাল্যা—কুটকচাল্যে; চক্-চকিয়া—চক্-চক্যা—চক্-চক্যে; ইত্যাদি। ইয়া প্রত্যয়ান্ত শব্দের য ফলা না দিয়া কেবল 'এ' দিলে উচ্চারণ ও অর্থ থাকে না। শব্দটি বিশেষ্য থাকিয়া যায়, অধিকরণ কিম্বা কর্তা কারক বুঝায়। যথা, কার্তিকে ঝড়, পুবে বাতাস, চাকরে বাবুর কথা, দেমাকে চলিয়াছে, খেজুরে রস, ইত্যাদি। কলিকাতায় হিন্দুস্থানীরা বাণিজ্য ও চাকরি করিতে আসিয়া বাংলাভাষাও আক্রমণ করিয়াছে। কলিকাতাবাসী বাঙ্গালী বলেন, কাপড়ওয়ালা, কাগজওয়ালা; আমরা গ্রামের লোক বলি, কাপড়িয়া বা কাপড়্যে, কাগজিয়া বা কাগজ্যে। 'পঞ্চাশৎতম পৃষ্ঠে সপ্তদশ অধ্যায়'—'পঞ্চাশ্যা' পৃষ্ঠে 'সতর‍্যা' অধ্যায়। খাঁটি বাংলা। যেমন বলি, মাসের বিশ্যা। বিশ্যা—বিশ্যে বানানই ঠিক। '৫০ পৃষ্ঠে ১৭ অধ্যায়,' লিখিলে ভিন্ন অর্থ হয়। "আম-কাঁঠালিয়া পীড়িখানি ঘৃতে ম-ম করে।" 'আম-কাঁঠালের পীড়ি' বলিলে পীড়ি লক্ষ্য হয়, আম-কাঁঠাল গৌণ হইয়া পড়ে। এই শক্তিশালী ইয়া প্রত্যয় বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। য়-ফলার ভয়ে কদাচিৎ আসক্তি দ্বারা, কদাচিৎ শব্দের রূপান্তর দ্বারা, কদাচিৎ সম্বন্ধপদ দ্বারা পাশ কাটাইয়া ভাষাকে পঙ্গু করা হইতেছে।

যাবতীয় ধাতুর উত্তর ইয়া প্রত্যয় হয়। ব-স্ ধাতু ইয়া—'বসিয়া' (উপবিষ্ট) বিশেষণ। উপরের দৃষ্টান্তে ব-স্যা—বস্যে। 'সে বসিয়াছে', সে উপবিষ্ট আছে। ব-সি-য়া-ছে—ব-স্যে-ছে। ইহা কদাপি ব-সে-ছে নয়, বই-সে-ছে নয়। উচ্চারণে বানানে ও ব্যুৎপত্তিতে শুদ্ধ নয়। ই উ এ-আদিগণীয় ধাতুর উত্তরও ইয়া স্থানে যে লিখিলে অর্থ ও উচ্চারণ ঠিক হয়। য ফলা না দিলে কেবল উচ্চারণ নয় অর্থেও ভ্রম হয়। যেমন, 'সে কথা শুনিয়া হাসে,' 'কাণ্ড দেখিয়া কাঁদে'; যদি লিখি 'কথা শুনে হাসে', 'কাণ্ড দেখে কাঁদে,' বাক্যের অর্থান্তর হইয়া যায়। আমি মৌখিক ভাষায় লিখিবার সময় প্রথম প্রথম য়-ফলা দিতাম। এখন আর দিই না। যাঁহাদের ভাষা, যদি তাঁহারা অর্থের ভেদ গ্রাহ্য না করেন, কে রাখিতে পারিবে? আমি যুক্তি ও ব্যবহারসিদ্ধ নিয়মের বশে চলিতে চাই। ব্যাস ও বাল্মীকি আর্ষপ্রয়োগ করিয়াছেন। আমরা সামান্য নরগণের অন্তর্গত; আমরা আর্ষপ্রয়োগ করিলে উপহাস্যতাগত হইব। তাঁহারা ব্যকরণ লেখেন নাই, কাব্য লিখিয়াছেন।

ব্রহ্মচারী মহাশয়ের আর এক জিজ্ঞাসা কা-র্যে শব্দের য দ্বিত্ব হয় নাই কেন, প-র্ধ্যা-প্তে হইয়াছে কেন? প-র্যা-প্ত বানান ঠিক হইত। বোধ হয় প্রেসের কম্পোজিটর কিম্বা আমার লিখনিয়া অবহিত হয়েন নাই। (ব্রহ্মচারী মহাশয় আমার আ-থ বানান আ-ক করিয়াছেন। আ-ক বানান ঠিক নয়।) কখন কখনও আমি ইচ্ছা করিয়া দুই একটা শব্দের ব্যঞ্জন দ্বিত্ব রাখি। পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ উদ্দেশ্য। দেখিতেছি কা-র্যে ও প-র্ধ্যা-প্তে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, ব্রহ্মচারী মহাশয়ের কৌতূহল জন্মিয়াছে। রেফাক্রান্ত ব্যঞ্জনের একত্ব-স্থাপনে বিশ বৎসর লাগিয়াছে। এতদিনে অনেকে দ্বিত্ব-বর্জনে দোষ দেখিতেছেন না। 'প্রেসিয়া' 'লাইনোটাইপ' খুজিতেছেন, এবং 'টাইপার' অক্ষর কমাইতে চেষ্টা করিতেছেন। আমার বহুকালের বাঞ্ছাও এই। কিন্তু সে প্রয়োজনে ভাষার মূল উৎপাটন করিলে কেহ সুখী হইবে না।

ব্রহ্মচারী মহাশয় চী-নি বানান দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। হইবার কথা। কারণ অনেকে চি-নি লেখেন। 'আমি চিনি চিনি'; এই বাক্যের চি-নি শব্দের উচ্চারণ লক্ষ্য করিলে চী-নি বানান আপনই আসিবে। আমার "বাঙ্গালা শব্দকোশে" চী-নি চি-নি বানানের দোষগুণ বিচার করা গিয়াছে। অনেক লেখক ই ঈ বানানের অবহিত নহেন, কোনও সূত্র মানেন না।

দেশে নানাবিষয়ে বিসম্বাদ চলিতেছে, সাহিত্য ও ভাষাও রক্ষা পায় নাই। ভাবের উদ্দামতায় ধর্মাধর্মজ্ঞান থাকিতেছে না। ভাষায় স্বাধীনতায় কিন্তু আর এক দুশ্চিন্তার লক্ষণ দেখা দিয়াছে। প্রবন্ধে বন্ধ থাকে না, ভাষায় সংযম থাকে না। তা সংযত স্বাধীনতা বিপ্লবের মূল। কেহ কেহ বাক্যের পদবিন্যাসে পদাঘাত করিতেছেন, কর্তা-কর্ম-ক্রিয়াপদ স্থানভ্রষ্ট করিতেছেন। যেমন "রাম যুদ্ধ করিয়াছিলেন রাবণের সঙ্গে। তিনি রাবণের শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা। যিনি বুদ্ধি দিয়াছিলেন, তাহাঁর নাম হইতেছে বিভীষণ। লঙ্কারাজ্য লাভ হইল তাহাঁর।" এই রকম ভাষা ধামালীতে চলিতে পারে। কিন্তু শিষ্ট প্রবন্ধে ভদ্র ও শিক্ষিত লেখক এত ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতে পারেন, পাঠককে এত অবজ্ঞা করিতে পারেন, না দেখিলে বিশ্বাস হইত না। বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদর্শন" নাই, সুরেশ-সমাজপতির "সাহিত্য"ও নাই।

২। বাঙ্গালা রচনা ও বানান-সমস্যা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মণ্ডল

'বিচিত্রা' পত্রিকার 'বিতর্কিকা'র গর্ভে নিত্য নিত্য যেসব নূতন সমস্যার উদ্ভব হ'চ্ছে ও তাদের সমাধানের জন্যে যে-চেষ্টা হ'চ্ছে তা দেখে আশা ও আনন্দ হয়। 'বিচিত্রা'র সুধী সম্পাদক মহাশয় এই বিতর্কিকা পরিচ্ছেদটীর অবতারণা ক'রে সত্যিকারের সাহিত্য-সমৃদ্ধির পথ যে উন্মুক্ত করেছেন একথা এখানে বিশেষ করে না লিখলেও সাহিত্যামোদী মাত্রেই তা প্রাণে প্রাণে অনুভব করছেন নিশ্চয়ই। তার প্রমাণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিন্তাশীল লেখকগণ ও বাঙ্গলা ভাষার প্রতি ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ এদিকে মনোযোগ দিতে আরম্ভ করেছেন।

অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'বিচিত্রা'য় এই পরিচ্ছেদে শ্রীযুক্ত সরসীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এম-এস সি, এম-বি, মহাশয় 'বানান-সমস্যা' নিবন্ধে কিছু লিখেছেন। তিনি এই নিবন্ধে যে সব তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। সেগুলি প্রকৃতপক্ষে আলোচনার যোগ্য। তিনি লিখেছেন—"বাঙ্গালা ভাষার এই নিত্য নূতন বানান ও রচনা পদ্ধতি ইহাকে শুধু অবাঙ্গালী নহে, খাস বাঙ্গালীর নিকটও বিভীষিকা করিয়া রাখিয়াছে। অনেকটা এই কারণে শিক্ষিত সমাজ বাঙ্গালা ভাষার প্রতি আর পূর্ব্বের ন্যায় মনোযোগী হইতেছেন না। * * নিতান্ত ছাত্র ছাড়া উচ্চ শিক্ষিত কয়জন সৎসাহিত্যের চর্চ্চা করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মৃতকল্প অবস্থা ইহার অন্যতম প্রমাণ।" বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতই এমনি দুর্দ্দশার দিন সমাগত হ'য়েছে কিনা তা অনুধাবন করা যেমন উচিত, তেমনি তা সত্য হ'লে তার প্রতিকারের জন্যে অবিলম্বে অগ্রসর হওয়া সাহিত্য-শিল্পীগণের একান্ত কর্ত্তব্য।

সরসী বাবু 'বীরবলী' ভাষার সৃষ্টিকেও শুভপ্রদ মনে করেন নি, 'চলতি ভাষার ফতোয়াতে'ও শঙ্কিত হ'য়েছেন। প্রবেশিকা পরীক্ষার সময় বাঙ্গলা রচনা লিখতে গিয়ে তিনি যে সমস্যায় পড়েছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন তা যেমন কৌতুককর তেমন মর্ম্মান্তিকও বটে।

বাঙ্গালা ভাষা রচনা ও বাঙ্গালা বানান লিখিবার জন্য এই যে নিত্যনূতন সৃষ্টি চলছে এতে বর্ত্তমানে যে নানারূপ বাধা ও বিশৃঙ্খলার উৎপত্তি হচ্ছে তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, বাঙ্গালা সাহিত্য সৃষ্টির পত্তন হতে এ পর্য্যন্ত এই ভাষায় শক্তিশালী লেখকের সংখ্যা এত অল্প হ'য়েছে যে, তাঁরা আজও এই ভাষাটীকে একটী আদর্শ ভাষায় পরিণত করতে পারেন নি। বৌদ্ধযুগে যে বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধসাহিত্য লিখিত হয়েছিল তা তখনকার প্রাকৃত বাঙ্গালাতেই রচিত। সে ভাষা এখন একেবারে অচল। তারপর মুসলমান আমলে বৈষ্ণব-পদাবলী-সাহিত্যে বাঙ্গালা ভাষার অপেক্ষাকৃত অধিক উন্নতি হ'য়েছিল। কিন্তু এই দুই যুগের সাহিত্যে পদ্যেরই প্রচলন সমধিক ছিল। গদ্য-রচনা এ দুই যুগে তেমন শ্রী-সম্পন্ন হ'য়ে ওঠেনি। এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রসার লাভের প্রথম যুগে যে বাঙ্গালা গদ্য রচনার প্রয়াস হয়েছিল তা সংস্কৃত-শব্দবহুল ছিল। কাজেই কথ্য ভাষার সঙ্গে লেখ্য ভাষার অনেক পার্থক্য

দাঁড়িয়েছিল। সে বাঙ্গালা ভাষা 'সাধু ভাষা' আখ্যা লাভ করেছিল। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত লোক ভিন্ন সে ভাষা বোঝবার সাধ্য অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত জন সাধারণের ছিল না। ক্রমে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রবল জোয়ার এদেশে প্রবেশ করবার পর থেকে বাঙ্গালা ভাষার গঠন-বিন্যাসে যে ভাঙ্গনের সূত্রপাত হয়েছে তা যেমন বিস্ময়কর তেমনি বেগবান। তাই সংস্কৃতানুগ 'সাধু ভাষা'কে স্থানচ্যুত করবার জন্য 'আলালী' ও 'বীরবলী' প্রভৃতি ভাষা রচনার অভিযান চ'লছে। বাঙ্গালা ভাষা রচনার নব নব চেষ্টার ইতিহাসে এই কথাই প্রধান স্থান অধিকার ক'রেছে। বাস্তবিকই যে-ভাষা যত সরল ও সহজে ভাবপ্রকাশক্ষম সেই ভাষাই সমাজে স্থায়ী আসন লাভ করতে সক্ষম হবে। আমার মনে হয় এই ভাঙ্গন দেখে শঙ্কিত ও চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার চাইতে এর পরিণাম কি দাঁড়ায় সে জন্যে অপেক্ষা করার মত ধৈর্য্য আমাদের থাকা দরকার। কারণ যাঁরা একাজে হাত দিয়েছেন তাঁদের আমরা অবহেলা করতে পারি না।

কোনো ভাষাই কোনো একজন লেখকের হাতে গড়ে ওঠে নি এবং গ'ড়ে উঠতে সময়ও বড় কম যায় নি। আর বিশ্ব-বিদ্যালয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও মুসলিম সাহিত্য পরিষদ সকলে একত্রে হ'য়ে বাঙ্গালা ভাষা রচনার একটা নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি ঠিক করে দেওয়ার সময় এখনও আসেনি বলে মনে হয়। কারণ বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃত গঠন অতি অল্প দিনই আরম্ভ হয়েছে মাত্র। অভিধানই বলুন আর ব্যাকরণই বলুন প্রগতিশীল নবীন ভাষার অগ্রগামিত্বকে রোধ করবার সাধ্য কারো নেই। অধুনা-অপ্রচলিত ভাষার প্রাণধারা বরং অভিধান ও ব্যাকরণের মধ্যেই প্রবাহিত থাকতে পারে। যেমন সংস্কৃত লাটিন ও গ্রীক প্রভৃতি ভাষার। ঐ ঐ ভাষা শিক্ষার্থীগণ অভিধান ও ব্যাকরণের সাহায্যে ঐসব ভাষাকে আয়ত্ত করতে ও শুদ্ধভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হবে। এই ব্যবস্থা বর্ত্তমানে প্রচলিত কথ্য ভাষাকে লেখ্য ভাষায় পরিণত করবার জন্য প্রবর্ত্তন করতে গেলে ভাষা পঙ্গু হয়ে পড়বে ও তার উন্নতিতে বাধা উৎপাদন করা হবে বলে মনে হয়। এই ভাষাকে একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়মে এমনি বেঁধে ফেললে দৈনন্দিন কাজ-কর্ম্ম চলার বেশ সুবিধা হয়ত হবে কিন্তু ভাষাটী যে-অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকবে তা অনাগত কালের সুনিপুণ সাহিত্য-শিল্পীদের নিকট মনোরম দেখাবে কিনা সেটাও ভাববার বিষয়। কারিগরদের হাতুড়ির ঠোকাঠুকিতে কান অসহ্য ঝালাপালা ক'রছে ব'লে যদি তাদের অসমাপ্ত কাজে বাধা দিয়ে তাদিগকে নীরব ক'রে দেওয়া হয় তাহলে যে আকাঙ্ক্ষিত রূপটী ফুটিয়ে তোলবার জন্যে তারা অন্তর দিয়ে চেষ্টা ক'রছিল তা' কি ক্ষুণ্ণ হবে না? বাঙ্গালার পণ্ডিতসমাজ যে এখনও বিশ্বপণ্ডিত-সমাজের সমকক্ষ হ'তে পারেন নি তা' ভেবে দেখলে এত শীঘ্র বাঙ্গালা ভাষাকে তাঁদেরই কর্ত্তৃত্বে কঠিন নিগড়ে বাঁধবার প্রস্তাব জেনে ক্ষুব্ধ হ'তে হয়।

সরসীবাবু লিখেছেন—"প্রাণশক্তির নামে অনেক সময় স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় * * *।" রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে যে অফুরন্ত প্রাণশক্তি বিদ্যমান তা কি অস্বীকার করা যায়? কিন্তু বানান-সমস্যা সম্বন্ধে উভয়ে একমত নন। তাহলে তাঁদের মধ্যে কাকে আমরা স্বেচ্ছাচারী ব'লবো?

সরসীবাবু যেন মনে না করেন যে, আমি তাঁর লেখার প্রতিবাদ ক'রছি। তিনি বর্ত্তমানকালের বাঙ্গালা সাহিত্য-সৃষ্টির বিভিন্ন ধারার চেষ্টাকে যে ভাবে দেখেছেন আমি ঠিক সেভাবে দেখছি না এই কথা বলাই আমার উদ্দেশ্য।

কিন্তু তাঁর আর একটি কথার প্রতিবাদ না ক'রে পারছি না। তিনি তাঁর প্রবন্ধের শেষভাগে লিখেছেন—"বিদ্যাসাগর মহাশয় মেদিনীপুরী 'করিবেক, যাইবেক' লিখিয়াছেন বলিয়া তাহার প্রতিক্রিয়ায় যেমন চট্টগ্রামী প্রাদেশিকতা কেহ অনুমোদন করিবেন না সেইরূপ 'বুক্খে পোথ্থী ডানা নাড়লেও' আমরা সুখী হইব না।" আমার বক্তব্য এই যে 'করিবেক, যাইবেক' প্রভৃতি ক্রিয়াপদগুলি কেবল 'মেদিনীপুরী' কিনা এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় একাকী এইরূপ ক্রিয়াপদ সকল ব্যবহার ক'রে লিখেছেন কিনা? আমি ৪০০।৫০০ বছরের অতি প্রাচীন লেখা হ'তে প্রমাণ বের ক'রে দেখাব যে, বহু পূর্ব্বকাল থেকে 'করিবেক, যাইবেক' প্রভৃতি ক্রিয়াপদগুলি ব্যবহার অন্যান্য জেলার লেখক ও পণ্ডিতরা ক'রে এসেছিলেন। প্রথমেই কবি কৃত্তিবাসের

'রামায়ণ' থেকে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত ক'রছি। রায় সাহেব যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মশায়ের মতে কবি কৃত্তিবাসের জন্ম ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে এবং শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর মশায়ের মতে কৃত্তিবাস ১৪৬৭ হতে ১৪৭২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বাঙ্গালা রামায়ণ রচনা ক'রেছিলেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে সাড়ে চারশ' বছর আগে এই 'রামায়ণ' রচিত হ'য়েছিল। সেই সাড়ে চারশ' বছর আগের কবি কৃত্তিবাসের নিজ রচনা থেকে রামায়ণের আদিকাণ্ডের ১ম পয়ারে আমরা পাচ্ছি—"এতক্ষণ নাহি দেখি দেবের ভিতর। **হোইবেক** হেন আছে যাটী সহস্র বৎসর।" এই দুই ছত্র আমার জ্যেষ্ঠাগ্রজ পূজনীয় শ্রীযুক্ত কেদারবাবু কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও ১০৮ নং নারিকেল ডাঙ্গা মেনরোডস্থ 'স্বর্ণপ্রেস' হ'তে সম্প্রতি প্রকাশিত মূল কৃত্তিবাসী রামায়ণের ১ম খণ্ডের ২য় পৃষ্ঠার ৭ম ও ৮ম ছত্র হ'তে উদ্ধৃত হ'ল। কবি কৃত্তিবাস নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। এছাড়া শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত 'রামায়ণে'র আদিকাণ্ড হ'তেও এখানে কয়েকটা স্থান উদ্ধৃত ক'রছি।—"পিপীলিকা **মরিবেক** আমার চাপেতে।" (৫ম পৃষ্ঠার ২০শ ছত্র)' "ব্রহ্মার নিকটে তার **পড়িলেক** বীজ।" (১০ম পৃষ্ঠার ১১শ ছত্র), "অভিশাপ **করিলেক** জামাতার প্রতি॥" (১০ম পৃষ্ঠার ২য় কলমের ২য় ছত্র)। কবি কাশীদাসের 'মহাভারত' হ'তেও কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত ক'রছি। "ইহার জনক পূর্ব্বে **ধরিলেক** মোরে। বিবাহ না দিয়া মোরে **দিলেক** ভৃগুরে।" (৪র্থ পৃষ্ঠার ৩য় ছত্র) "যেকালে ইহার বাপ **কহিলেক** মোরে।" (৪র্থ পৃষ্ঠার ১৩শ ছত্র)। এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত 'রামায়ণ' ও 'মহাভারতের' সর্ব্বত্র দেখা যাবে। পূর্ণবাবু তাঁর সম্পাদিত 'রামায়ণের' ভূমিকায় লিখেছেন যে, ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে (অর্থাৎ আজ হ'তে ১৪০ বছর আগে) কলিকাতা বটতলার মোহনচাঁদ শীল নামে একজন পুস্তক বিক্রেতা কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' ও কাশীদাসের 'মহাভারতে'র পুনরুদ্ধার করার জন্য অভিপ্রায় ক'রেছিলেন এবং প্রাচীন পুঁথি দু'খানির ভাষা মনঃপূত না হওয়ায় ১৩জন সংস্কৃতজ্ঞ সুপণ্ডিত ও সুকবি নিযুক্ত ক'রে ভাষার সংশোধন ক'রেছিলেন। তাঁদের মধ্যে হুগলী জেলার শ্রীরামপুর নিবাসী কৈলাসনাথ তত্ত্বনিধি, বর্দ্ধমান জেলার কাল্না-নিবাসী যদুনাথ ভট্টাচার্য্য, হাঁসদহ পরগণার হরবল্লভ বিদ্যানিধি ও জাহানাবাদ পরগণার কেনারাম শিরোমণির নাম জানা গেছে। কবি কাশীদাসের জন্মস্থান বর্দ্ধমান জেলার সিঙ্গী গ্রামে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, নদীয়া জেলার স্বয়ং কৃত্তিবাস এবং বর্দ্ধমান ও হুগলী প্রভৃতি জেলার অন্যান্য পণ্ডিতগণ বিদ্যাসাগর মশায়ের অনেক আগে থেকেই উপরিউক্ত ক্রিয়াপদগুলির ব্যবহার ক'রে গিয়েছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মশায় জন্মেছিলেন ১৮২০ খৃষ্টাব্দে। এরূপ অবস্থায় ঐ সব ক্রিয়াপদগুলিকে কেবল 'মেদিনীপুরী' ব'লে উল্লেখ ক'রে এবং বিদ্যাসাগর মশায়ের প্রতি প্রাদেশিক ক্রিয়াপদ ব্যবহারের জন্য কটাক্ষপাত ক'রে সরসীবাবু সুবিচার করেন নি। এখন বেশ অনুমান করা যেতে পারে যে, ঐরূপ ক্রিয়াপদের ব্যবহার অন্যান্য কয়েকটা জেলারও নিজস্ব। আমি মেদিনীপুর জেলার লোক। মেদিনীপুরের কোনো কোনো স্থানে যে, ক্রিয়াপদের অন্তে 'ক' যোগ ক'রে কথ্য ভাষায় কথিত হ'য়ে থাকে তা জানি। অতএব "**করিলেক, যাইবেক**" প্রভৃতি ক্রিয়াপদগুলিকে প্রাদেশিক ব'লে অপবাদ দেবার অবসর থাকে কই? আর যদি ধ'রে নেওয়া যায় যে, এই ক্রিয়াপদগুলি কোনো বিশেষ জেলার নিজস্ব তাহলেও যখন বিভিন্ন জেলার সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতসমাজের অনুমোদিত হ'য়ে 'রামায়ণ' ও 'মহাভারতে'র ন্যায় সর্ব্বজন-প্রিয় এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচারিত পুঁথিগুলিতে ঐগুলি স্থানলাভ ক'রে এত সুদীর্ঘ কাল চ'লে আসছে তখন আর এ সম্বন্ধে অনুযোগ করা বৃথা।

আরও একটা কথার আলোচনা করতেও ইচ্ছা হচ্ছে। সরসীবাবু তাঁর প্রবন্ধের একস্থানে লিখেছেন—"যেদিন হইতে বঙ্গীয় লেখকগণ ধ্বনি-নিষ্ঠার প্রতি অত্যধিক নিষ্ঠা দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছেন সেদিন হইতেই এই সমস্যা (অর্থাৎ বান-সমস্যা—লেখক) বিকট রূপ ধারণ করিয়াছে।" কিন্তু শব্দ যেভাবে উচ্চারিত হয় সে ভাবে বানান লেখাই ত খুব সঙ্গত মনে হয়। অক্ষরের সৃষ্টিও এই ধ্বনির অনুকরণে নয় কি? ইংরেজী ভাষায় এর অত্যন্ত ব্যত্যয় দেখা যায়।

a, e, i, o, u এই পাঁচটী স্বরবর্ণের প্রকৃত ধ্বনি অনুযায়ী ইংরেজীর সব শব্দের উচ্চারণ হয় না। R-a-t রেট্, M-e-n মিন্, s-i-t সাইট্, D-o ডো এবং U-p ইউপ্ না হ'য়ে যথাক্রমে র‍্যাট, মেন্, সিট্ ডু এবং আপ্ ব'লে উচ্চারিত হয়। এতে ক'রে ইংরেজী শব্দের বানান শেখা, বানান লেখা ও উচ্চারণ করার জন্য কি কম হরকৎ পেতে হয় আর বানান ভুলও কি কম হয়? যদি ধ্বনির সঙ্গে মিল রেখে সব শব্দের বানান লেখা হ'ত তাহলে বানান লেখা ও শব্দ উচ্চারণ করা অত্যন্ত সহজই হ'ত। বাঙ্গালা ভাষায়ও এ বালাই নিতান্ত কম নয়। ই, ঈ, ি, ী, উ, ঊ, ু ও ূ নিয়ে মহা বিভ্রাট বাধে। তবে ধ্বনি-নিষ্ঠার মধ্যে এই কথাটুকুও বিবেচ্য যে, শব্দের উচ্চারণ যদি বিকৃত হ'য়ে যায় আর সেই বিকৃত উচ্চারণের ধ্বনি অনুযায়ী যদি বানান চালানোর চেষ্টা হয় তবে তা অমার্জ্জনীয়। যেমন 'শরীরে পদার্থ নেই' কথাটীকে যদি বিকৃত ক'রে উচ্চারণ করা হয় 'শলীলে পদথ নেই' আর এরই অনুযায়ী যদি বানান লেখার চেষ্টা হয় তবে তা' সমর্থন করা যায় না।

রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সাহিত্যরথিগণের চেষ্টায় বাঙ্গালা গদ্য রচনার এবং ঈশ্বর গুপ্ত, বিহারীলাল, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিবরগণের চেষ্টায় বাঙ্গালা পদ্য-রচনার যে ক্রমোন্নতি-ধারা প্রবাহিত হ'য়ে চ'লেছে তা সহজেই সকলের চোখে পড়ে। শিক্ষার অধিকতর প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-গগনে বর্ত্তমানে যে-সকল নূতন নূতন দিক্‌পালের উদয় হচ্ছে তাঁদের শিল্প-চাতুর্য্যে যদি সাহিত্যের অভিনব শ্রী সাধিত হয় তবে সে তো বাঙ্গালা ভাষার পক্ষে গৌরবের কথাই হবে। তবে একথাও সত্য যে মধ্যে মধ্যে সাহিত্য-শিল্পীদের কৃতকর্ম্মের আলোচনা চালিয়ে তাঁদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত যে, তাঁরা কী ক'রে যাচ্ছেন এবং তার শেষ ফল কি দাঁড়াতে পারে। তাঁদের সৃষ্টির সমঝ্‌দার যাঁরা তাঁরা একাজ অবশ্যই করবেন। যাঁরা নূতন নূতন সৃষ্টির কাজে মগ্ন তাঁরা তো আপনার ভাবে আপনি বিভোর হ'য়ে আছেন। মাঝে মাঝে মৃদু স্পর্শ দিয়ে তাঁদেরকে চম্‌কে দিতে হবে। সেই চম্‌কে-চাওয়া দৃষ্টি তাঁদিগকে তাঁদের কাজে অনেক পরিমাণে সাহায্য ক'রবে নিশ্চয়ই।

৩। বাঙ্গালীর সাধারণ উৎসব

মোহাম্মদ আজরফ্, এম-এ

জগতের প্রত্যেক জাতিরই নিজ নিজ উৎসব আছে। ইরাণীরা বসন্তের প্রথম দিনকে নওরোজ বলে—এইদিন তাহাদের নিকট বড় আনন্দের দিন। এই দিন তাহারা সকলে ফুল দিয়া বাড়ী-ঘর সাজায়—এ ওকে নিমন্ত্রণ করিয়া মিষ্টি খাওয়ায় বন্ধুরা একে অপরের বাড়ীতে ফুল ও মিষ্টির সওগাত পাঠাইয়া দেয়। এইদিন পুরনারীরা সুন্দর বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া চোখে সুরমা পরিয়া অতিথি অভ্যাগতকে আদর আপ্যায়ন করিয়া থাকেন। এইদিন সমস্ত পারস্যদেশ ব্যাপিয়া আনন্দের ঢেউ খেলিতে থাকে, কোথাও দুঃখ বিষাদের ছায়াও পাওয়া যায় না।

এইরূপ জগতের প্রত্যেক জাতিরই আপন আপন জাতীয় উৎসব আছে। তাহা ব্যতীত কোন কোন জাতি আবার নূতন উৎসবেরও সৃষ্টি করিয়াছে, যেমন আফ্‌গান জাতি প্রত্যেক বৎসর একবার তাহাদের স্বাধীনতার জয়ন্তী করিয়া থাকেন। তেমনই তুর্কিরা তাহাদের স্বাধীনতার উৎসবের আয়োজন করিয়া থাকেন।

জাতীয় জীবনে এই সব উৎসবের যথেষ্ট মূল্য আছে বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ উৎসব শব্দটীর মধ্যে আনন্দ ও রসের যে সন্ধান পাই তাহাই আমাদের জীবনে দুর্লভ। সারা বৎসর কর্ম্ম-কোলাহলের মধ্যে ব্যস্ত থাকার পর আমাদের মন স্বভাবতই ক্ষণিকের বিশ্রাম চায়—কর্ত্তব্যের কঠোর নিষ্পেষণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া কোন রসঘন ক্ষেত্রে আত্মবিলয় চায়, ইহাতে একদিকে যেমন মনের প্রাকৃতিক গতির অবাধ স্ফূর্ত্তি লাভ হয় তেমনই

পরবর্ত্তীকালে কাজ করিবার শক্তি ও স্পৃহা অনেক বাড়িয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ, উৎসবের মধ্যে একে অন্যের সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে মিলিবার, একে অপরকে ভাল ভাবে পরিচয় করিবার সুবিধা হয়। ইহাতে জাতীয় জীবনে একতার সৃষ্টি হয়—একের মন অপরের সঙ্গে নিবিড় ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হয়। আমাদের জাতীয় জীবন পরিচয়ের অভাবের দরুণ কতটুকু দুর্ব্বল ও কাজকর্ম্মে অপারগ হইয়া রহিয়াছে, তাহা যাহাদের অভিজ্ঞতা আছে তাহারা সহজেই অনুভব করিতে পারেন।

নিতান্ত দুঃখের বিষয়, আমাদের ভারতবাসীর জাতীয় উৎসব বলিয়া কোন উৎসব নাই। আমাদের দেশে যে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়—যেমন দুর্গোৎসব, ইদ ইত্যাদি—এইগুলিকে জাতীয় উৎসব বলা যায় না বরং ধর্ম্মোৎসব বলা যায়। দুর্গোৎসব নামটাতেই ধর্ম্মের ছাপ রহিয়াছে—এই উৎসবে অহিন্দুর—অহিন্দুর কেন শৈব অথবা বৈষ্ণব মতাবলম্বী হিন্দুরও অধিকার আছে বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য একথা স্বীকার্য্য যে কোন অহিন্দু, শৈব অথবা বৈষ্ণব এই উৎসবে যোগ দিলে শাক্ত হিন্দুরা তাহাদিগকে তাড়া করিয়া আসিবেন না। তবে তাড়া করুন অথবা নাই করুন এই উৎসব যখন ধর্ম্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—তখন ইহা যে-ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া আছে তাহাতে আস্থাহীন লোকের ইহাতে প্রাণের টান না হইবারই সম্ভাবনা। দুর্গোৎসব সম্বন্ধে যে কথা বলা হইল, ইদ্ সম্বন্ধেও সেই কথাই প্রযোজ্য।

ইদ নিছক মুসলমানী পর্ব্ব, তাহাতে অমুসলমান যোগ দিবেও না এবং দিতেও পারে না। তবে ইদ সম্বন্ধে একথা বলা যায় যে ইহা সকল মুসলমানেরই সাধারণ উৎসব—কোন মুসলমানেরই নিষিদ্ধ কোন কার্য্য ইহাতে হয় না। কিন্তু সে যাহাই হউক অমুসলমানের বেলা ইদ—ইদই, ইহাতে যোগ দিবার সুযোগ অথবা সুবিধা তাহার নাই।

আমাদের ভারতবর্ষের এক আশ্চর্য্য বিষয় এই যে এখানে শতাধিক বৎসর পাশাপাশি বাস করিয়াও হিন্দুর কোন ব্যাপারে মুসলমান অথবা মুসলমানের কোন ব্যাপারে হিন্দু যোগ দেয় না। তাহার কারণ বোধ হয় উভয় ধর্ম্মের আচারের দিকে পরস্পর বিরোধী (contradictory) ভাব। যেমন সহজ কথায় বলিতে গেলে হিন্দুর কোন প্রতিমাপূজায় অথবা প্রতিমাপূজার সঙ্গে জড়িত কোন কাজ-কর্ম্মে ধর্ম্মতঃ কোন মুসলমান যোগ দিতে পারে না। তেমনই মুসলমানের গো-কোরবাণী সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে হিন্দু যোগ দিতে পারে না। কাজেই আমাদের দেশের সাধারণের কোন উৎসব নাই, যাহা আছে তাহাকে সম্প্রদায় বিশেষের উৎসবই বলিতে হইবে।

আমরা ব্যক্তিগত ভাবে সাম্প্রদায়িক কোন উৎসবের বিরোধী নই। সকল দেশেই জাতীয় উৎসবের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক উৎসবও অনুষ্ঠিত হয়। যেমন বিলাতের জাতীয় উৎসবের সঙ্গে 'খৃষ্টমাস ডে' উৎসবও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের কথা হইতেছে কোন দেশেই কেবলমাত্র সাম্প্রদায়িক উৎসব নাই—ইহার সঙ্গে জাতীয় উৎসবও আছে—নাই কেবল এই আমাদের আনন্দহীন ভারতবর্ষে।

তাহা হইলে প্রশ্ন দাঁড়ায় কি করিয়া আমাদের ভারতবর্ষের মত বিশাল দেশে—যেখানে হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খৃষ্টান বৌদ্ধ প্রভৃতি বহু সম্প্রদায়ের লোকের বাস—এক সাধারণ উৎসবের আয়োজন করা যায়? আমাদের মনে হয় ভারতবর্ষের মত বিশাল দেশের চিন্তা না করিয়া বাংলা দেশের স্বল্প পরিসর গণ্ডির মধ্যেই আমাদের চিন্তাধারাকে আবদ্ধ রাখা উচিৎ। কারণ একেত ভারতবর্ষ এক হিসাবে মহাদেশ, তার উপর জলবায়ুর পার্থক্যে ভারতবর্ষের এক প্রদেশ অন্য প্রদেশ হইতে অনেকটা বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। দ্বিতীয়তঃ প্রকৃতির প্রভাবের দরুণই হউক, রক্তের পার্থক্যের জন্যই হউক অথবা আহার্য্যের বিভিন্নতার জন্যই হউক ভারতবর্ষের এক প্রদেশবাসীর মনোবৃত্তি অন্য প্রদেশবাসীর মনোবৃত্তি হইতে ভিন্ন প্রকৃতির হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কাজেই সকল ভারতবাসীর একত্রে উৎসবের আয়োজন করার সম্ভাবনা অল্প।

তাই আমাদের মনে হয় গোটা বাঙ্গালীজাতির উৎসবের আয়োজন করার কল্পনাই সুসঙ্গত। তাহা হইলে প্রশ্ন উঠিতে পারে বাঙ্গালীর জাতীয় উৎসবের স্বরূপ কি হইবে? প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল এই উৎসবে ধর্ম্মের কোন যোগ থাকিবে না। কারণ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সাম্প্রদায়িক উৎসবে সকলের প্রাণের যোগ থাকা সম্ভব নয়। আমাদের মনে হয় বৎসরের এক বিশেষ দিনে—যেদিন হিন্দু অথবা মুসলমান কোন সম্প্রদায়ের পক্ষে অশুভ নয়—এই উৎসবের আয়োজন করা যায়। যেমন ফাল্গুন মাসের কোন বিশেষ তারিখে আমরা এই উৎসবের আয়োজন করিতে পারি। এই দিন যদি আমরা প্রত্যেকের ঘর বাড়ী নানাবিধ ফুলে, নানা রঙ্গের লতা পাতায় সাজাই—ঘরের ভিতরে যদি ধূপ জ্বালাই—প্রত্যেক নরনারী যদি নিজের সাংসারিক অবস্থার অনুযায়ী নানাবিধ বেশভূষায় সজ্জিত হই—যদি একে অন্যের বাড়ীতে ফুলের অথবা ফলের সওগাত পাঠাই, যদি গ্রামের অথবা সহরের সকলে কোন বিশিষ্ট ময়দানে জড় হইয়া একে অন্যের গলায় মালা পরাইয়া দেই, যদি মেয়েরা একে অন্যের সঙ্গে অভিরুচি অনুযায়ী সই পাতে—যদি হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মেয়েরা একে অন্যের ললাটে চন্দনের অনুলেপ দেন তাহা হইলে বাঙ্গালীর সাধারণ উৎসবের মত একটা কিছু হইল বলা যাইতে পারে।

এ সম্বন্ধে চিন্তাশীল বাঙ্গালীরা আলোচনা করিলে কৃতার্থ হইব।

৪। সাহিত্যে প্রাদেশিকতা

শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

মাঘের বিচিত্রায় শ্রীযুক্ত স্বরূপ গুপ্তের 'সাহিত্যে প্রাদেশিকতা' পড়িলাম। শ্রীযুক্ত গুপ্ত বাংলাভাষায় দুইটি ভাগ দেখিতে পাইয়াছেন—পশ্চিমবঙ্গীয় ও পূর্ব্ববঙ্গীয়। পশ্চিমবঙ্গের ভাষা সাহিত্যে স্থান করিয়া লইয়াছে, এমন সময় পূর্ব্ববঙ্গের নব্য লেখকেরা তাঁহাদের দেশের ভাষার দাবী সাহিত্য-দরবারে পেশ করিলেন। স্বরূপবাবু ভয় পাইয়াছেন। পাছে বাংলাসাহিত্য প্রাদেশিকতা দোষে দুষ্ট হইয়া পড়ে, এই তাঁহার ভয়।

এই সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে চাই। প্রথম কথা, রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যে যে ভাষা চালাইয়াছেন, তাহা পশ্চিমবঙ্গের ভাষা নয়, তাহা বিশেষ করিয়া কলিকাতার ভাষা। এবং কলিকাতার ভাষা যে পশ্চিমবঙ্গের শুধু নয়, সমগ্র বাংলার, রবীন্দ্রনাথ ইহা একখানি পত্রে আমাকে জানাইয়াছিলেন।* মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলের ভাষা যদি সাহিত্যে প্রবেশ করে, তবে তাহা পূর্ব্ববঙ্গের ভাষা অপেক্ষা সহজবোধ্য হইবে না।

দ্বিতীয় কথা, পূর্ব্ববঙ্গের লেখকরা যে পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় লিখিতেছেন, এ সংবাদ তিনি কোথায় পাইলেন বুঝিতে পারিনা। আমাদের এমন একখানা বই-এরও নাম মনে পড়িতেছে না যাহা পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় লেখা। স্বরূপবাবু যদি জানেন, তবে দয়া করিয়া বিচিত্রার পাঠকদিগকে জানাইবেন।

বাঙাল দেশের লেখকদের লেখায় দুই একটা দেশীয় শব্দ থাকে, তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু লেখক যে আবেষ্টনীর মধ্যে শিশুকাল হইতে বাস করিতেছেন, যে শব্দগুলি প্রতিক্ষণে তাঁহাকে শুনিতে হয়, তাহা যদি তাঁহার লেখায় সামান্যরূপে প্রকাশ পায়, তাহা হইলে কোন দোষ হইতে পারে না, বরং ইহা একান্ত স্বাভাবিক। ইংল্যাণ্ড এবং স্কটল্যাণ্ডের ভাষাগত পার্থক্য ছিল এবং এখনও আছে। স্কটল্যাণ্ডের বিখ্যাত সাহিত্যিকগণ প্রচুর পরিমাণে স্কটিশ্ শব্দ ও উপমা ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা ইংরেজী সাহিত্যের বিপদ-স্বরূপ নন্; তাঁহারা তাঁহাদের লেখা দ্বারা ইংরেজী সাহিত্যকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিয়াছেন।

* ১৩৩৮ সালের চৈত্রমাসের বিচিত্রায় 'চলতি ভাষার রূপ' নামে কাশিত হইয়াছে।

একটি অংশকে কেন্দ্র করিয়া কোন দেশের জাতীয় সাহিত্য সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইতে পারে না। বাংলার প্রত্যেক অঞ্চলে বিভিন্ন শব্দ ও উপমার পুঁজি আছে। এবং প্রত্যেক শব্দ ও উপমার পশ্চাতে একটি কবিতা আছে আর আছে সেই অঞ্চলের লোকের মনের ইতিহাস। আমাদের উচিত এই প্রাদেশিক শব্দ ও উপমা সাহিত্যরসিকদের নিকট উপস্থিত করা। তাঁহাদের এবং কালের বিচারে যাহা সুন্দর ও সুষ্ঠু বলিয়া মনে হইবে, তাহা বাংলাভাষার সম্পদ স্বরূপ হইয়া থাকুক্।

আমাদের ভাষার নানাদিকে দৈন্য আছে। প্রাদেশিক শব্দ বিচারপূর্ব্বক গ্রহণ করিলে সেই দৈন্য কিছু ঘুচিতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি একটি প্রাদেশিক শব্দের কথা উল্লেখ করিব। শীত নিবারণের বস্ত্রকে আমরা আলোয়ান বলি। এই শব্দটির পশ্চাতে এমন একটি ছবি দেখিতে পাইনা যাহা অর্থগ্রহণে আমাদিগকে সাহায্য করিতে পারে। সম্ভবতঃ এইটি বাংলা শব্দও নয়। কিন্তু আমাদের গ্রামের মেয়েদের মুখে সুন্দর একটি শব্দ শুনিয়াছি, যাহার সংস্কৃতের রূপ থাকিলেও সহজগম্য এবং অর্থ-ব্যঞ্জনার গৌরবে শ্রেষ্ঠ। শব্দটি শীতরি,—শীতের যে অরি। আমি বলিতেছি না, আলোয়ান উঠাইয়া শীতরি প্রচলন করা হউক্। 'শীতরি'র পক্ষ হইয়া আমি এই দাবী জানাই যে বাংলাভাষা চিরকাল অবজ্ঞা করিয়া তাহাকে দূরে ঠেলিয়া যেন না রাখে; কাছে ডাকিয়া বিচার করিয়া যদি তাহাকে নির্ব্বাসনে দিতে হয় তো দিক্, কাহারো অভিযোগের কিছু থাকিবে না। বিনা বিচারে নির্ব্বাসন, রাজনীতিক্ষেত্রে তো বটেই, সাহিত্যের রাজ্যেও ক্ষোভের সৃষ্টি করে।

বাহুল্য ভয়ে আর কোনো দৃষ্টান্ত দেখাইলাম না। শেষ কথা এই যে স্বরূপবাবু আদর্শ ভাষা (standard) ঠিক করিবার জন্য লালায়িত। কিন্তু পরামর্শ করিয়া, সভা করিয়া কেহ কখনও ভাষাকে শায়েস্তা করিতে পারে না। সময়ের খেয়ালে, লেখকের খেয়ালে সে চলে। তাহাকে বাধা দিতে গেলে সে মরে। ভাষার বাধা সাহিত্য উপভোগের বড় বাধা নয়। তাহা হইলে ময়মনসিংহের পল্লী-কবির 'মহুয়া' পড়িয়া বাঙালী পাঠক আজও মুগ্ধ হইত না এবং কেহ পাদটিকা দেখিয়া চছার (chaucer) পড়িত না।

শ্রীসুশীলকুমার বসু

মুসলমান দুগ্ধ, মুসলমান জল; হিন্দু দুগ্ধ, হিন্দু জল

রেলওয়ে-স্টেশনে উক্ত প্রকারের চীৎকার শুনা যায় বলিয়া মহাত্মাজী দুঃখ করিয়া হরিজন পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে, মানুষ যাহা প্রস্তুত করে নাই, তাহার সম্বন্ধেও এই প্রকার পার্থক্য দুর্ব্বোধ্য এবং অসহনীয়; অবশ্য মানুষের প্রস্তুত খাদ্য সম্বন্ধেও এই প্রকার কোন পার্থক্যে যে তিনি বিশ্বাসী নহেন সে কথাও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনে যাঁহারা বিশ্বাস করেন মহাত্মাজী তাঁহাদিগকে এই প্রকার কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইতে বলিয়াছেন। সকল মানুষের নিকট হইতে (স্বাস্থ্যনীতির বহির্ভূত না হইলে) খাদ্য ও পানীয় গ্রহণের বাধা, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিশেষ করিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে মিলনের পক্ষে সব চেয়ে বড় বাধার সৃষ্টি করিয়াছে এবং শ্রেণী বিদ্বেষ জাগাইয়া রাখিয়াছে। এই অস্পৃশ্যতাকে সর্ব্বতোভাবে এবং সর্ব্বপ্রকারে দুর করিতে না পারিলে জাতীয় ঐক্য ও উন্নতি কখনই সম্ভব হইবে না।

কিন্তু, হিন্দুসমাজের অস্পৃশ্যতার রূপ বিশেষ ভয়াবহ বলিয়া ইহা এই সমাজের অন্তর্ভুক্ত বহুলোকের হীনতার কারণ ও উন্নতির অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে বলিয়া, ইহা দূরীকরণের উপর হিন্দু ও মুসলমানের পার্থক্যের দূরীকরণ অনেকটা নির্ভর করিতেছে বলিয়া সর্ব্বপ্রথম হিন্দুসমাজের আভ্যন্তরীণ অস্পৃশ্যতা ও বৈষম্য দুর করিবার জন্য আমাদিগকে উদ্যোগী হইতে হইবে।

এই সময়ে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বর্ত্তমান উৎকট বাড়াবাড়ি হ্রাস পাইয়া যাহাতে উভয়েই উভয়ের অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইতে পারে, তাহার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে এবং মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের এই সকল লজ্জাকর বাড়াবাড়ির চিত্র, আমাদিগকে হেয় ও বিদ্রূপ করিবার এবং আমাদের অযোগ্যতা প্রমাণের অস্ত্রস্বরূপে ব্যবহৃত হয়।

আমাদের অনেক লৌকিক ধর্ম্মবিশ্বাস এবং সামাজিক অনেক রীতিপদ্ধতি এতটা ত্রুটিযুক্ত ও বিসদৃশ যে, তাহার জন্য অপরের নিকট হইতে বিদ্রূপ ব্যতীত অন্য কিছু আমরা আশা করিতে পারি না। কিন্তু, ইহার সর্ব্বাপেক্ষা লজ্জাকর দিক হইতেছে যে, আজও আমাদের দেশে এই সকল বিষয় লইয়া গর্ব্ব করিবার লোকের অভাব নাই।

অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন ও পংক্তিভোজন

সকল শ্রেণীর হিন্দুর অন্নজল, সকল শ্রেণীর হিন্দুর গ্রহণীয় না হইলে, অস্পৃশ্যতা দূরীভূত হইবার সুফল যে বাংলাদেশে অন্ততঃ কিছু পাওয়া যাইবে না, সেকথা আমরা বহুবার বলিয়াছি। কিন্তু, বিরুদ্ধপক্ষীয়েরা সাধারণতঃ ইহার যৌক্তিকতা বা উপযুক্ততার বিচার না করিয়া এই কথা বলিয়া থাকেন যে মহাত্মা গান্ধী সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর একত্র পংক্তিভোজনের পক্ষপাতী নহেন। ইহা তাঁহার হরিজন আন্দোলনের কর্ম্মতালিকান্তর্ভুক্ত না হইলেও, তিনি যে ইহার এবং আরও একটু অগ্রসর হইয়া অসবর্ণ বিবাহেরও বিপক্ষে নহেন, তাহার প্রমাণ তাঁহার কার্য্য ও বাক্য হইতে পাওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধেও তিনি এবিষয়ে তাঁহার

মতামতের একটা আভাষ দিয়াছেন। তিনি জানিতে পারিয়াছেন, বেরারের কোন উচ্চ-বিদ্যালয়ের রৌপ্য-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে এক ভোজের আয়োজন হয় এবং ইহাতে হরিজন ছাত্রদেরও নিমন্ত্রণ হয়। কিন্তু, অন্য সকলকে এক পংক্তিতে বসিতে দিয়া ইঁহাদের জন্য পৃথক আসনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এসম্বন্ধে মহাত্মাজী বলিয়াছেন "চেহারা দেখিয়া যাহাদিগকে হরিজন বলিয়া চিনিতে পারা যাইত না, শিক্ষাপ্রাপ্ত এই প্রকারের হরিজন ছাত্রদিগকে নির্ম্মমভাবে অকারণে এখানে অপমান করা হইয়াছে। আজ কালকার দিনেও একটি **উচ্চ বিদ্যালয়ের** উৎসবে এই অপমানের দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে যদিও অনেকটা অগ্রসর হওয়া গিয়াছে তবুও, কুসংস্কার এখনও **নিতান্ত অপ্রত্যাশিত স্থানে এবং নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে** রহিয়া গিয়াছে।"

অর্থাৎ মহাত্মাজী আশা করিয়াছেন, অস্পৃশ্যতা দূর করিবার জন্য সাধারণের নিকট হইতে যতটুকুই প্রত্যাশা করুন না কেন, দেশের শিক্ষিত লোকদের তিনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত দেখিতে চাহেন।

মহাত্মাজী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এইরূপ ব্যাপার ঘটিতে দেখিয়া বিশেষ বিস্মিত এবং ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। কিন্তু, যে বাংলাদেশে অস্পৃশ্যতা প্রায় নাই বলিয়া আমরা গর্ব্ব করিয়া থাকি সেখানেও অনুন্নত শ্রেণীসমূহের ছাত্রেরা যে তথাকথিত উচ্চবর্ণের ছাত্রদের সহিত একত্রে হোষ্টেল বোর্ডিংএ থাকিয়া শিক্ষার সুবিধা পান না, সেকথা জানিতে পারিলে তাঁহার বিস্ময় ও ক্ষোভের মাত্রা সম্ভবতঃ অনেকগুণ বাড়িয়া যাইবে।

সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর একত্র ভোজন অনেকে বিশেষ দোষের মনে করিয়া থাকেন; এ সম্বন্ধেও মহাত্মাজী তাঁহার মত এই প্রসঙ্গে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "**রেল গাড়ীতে একই কামরার মধ্যে একই বেঞ্চে বসিয়া খাদ্যগ্রহণ** যদি বিভিন্ন জাতির একত্র ভোজন বলিয়া গণ্য না হয় তবে ইহাকেও (এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজনকে) সেরূপ গণ্য করিবার কারণ নিশ্চয়ই ছিল না। কিন্তু, অস্পৃশ্যতার অভিধানে একত্র ভোজনের একটি বিশেষ অর্থ আছে; ইহা সকলের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া খাওয়াকেও বাদ দেয় না।"

পাশ্চাত্য সভ্যতা কি জড়ধর্ম্মী

বহুদিনের সুপ্তির পর আমরা যখন প্রথম জাগিয়া জগতে স্থান গ্রহণ করিতে চাহিতেছি তখন, স্বভাবতঃই আদর্শের জন্য আমাদিগকে পাশ্চাত্য জগতের দিকে তাকাইতে হইতেছে। এখানে মানুষ সচেতন ও সচেষ্টভাবে সত্যের সাধনায় এবং দুঃখকে জয় করিয়া সুস্থ শরীরে, সুস্থ মনে এবং স্বাধীন চিত্তে বাঁচিয়া থাকিবার চেষ্টায় নিযুক্ত আছে। এখানে মানুষ যে সকল সত্যের সন্ধান পাইয়াছে তাহা সমগ্র বিশ্বমানবের সম্পত্তি; ইওরোপে আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া ইহাদের সত্যতা, মূল্য বা উপযোগিতা অন্য দেশের লোকের পক্ষে কিছুমাত্র কম হইবে না। ইওরোপের প্রতি বিরূপতা যদি আমাদিগকে ইওরোপের মানসিক সম্পদের প্রতি বিমুখ করিয়া তুলে তবে তাহা কখনই আমাদের পক্ষে লাভের হইবে না। তাহার চলিষ্ণুচিত্তের প্রেরণাকে আমরা কোনক্রমেই উপেক্ষা করিতে পারিব না।

ইওরোপের সভ্যতার পশ্চাতে বুদ্ধিকে জাগ্রত ও শানিত করিয়া তুলিবার এবং দেহমনে সচেষ্ট হইয়া উঠিবার প্রচণ্ড তাগিদ রহিয়াছে। ইহাকে পূর্ণভাবে স্বীকার করিয়া লইতে গেলে যে শক্তির প্রয়োজন তাহার অভাবে আমরা ইহাকে গালি দিয়া দূরে ফেলিতে চাই। আমরা আধ্যাত্মিক জাতি বলিয়া আমাদের মনে একটা অহঙ্কার আছে; কাজেই কোন কিছুকে আধ্যাত্মিকতার বিপরীত ধর্ম্মী বলিয়া আমাদের মনের নিকটে তাহাকে হেয় ও মূল্যহীন প্রতিপন্ন করা অনেকটা সহজ। এইজন্য ইওরোপকে জড়বাদী এবং ইওরোপীয় সভ্যতাকে জড়ধর্ম্মী বলিয়া আমরা কতকটা সান্ত্বনা লাভ করিয়া থাকি। যদিও সত্যকে বুঝিবার ও তাহাকে লাভ করিবার শক্তি ও ইচ্ছার অভাবই যে প্রকৃত জড়ত্ব, সে কথা আমরা ভুলিয়া থাকি। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ একস্থানে বলিয়াছেন, "আমরা পাশ্চাত্য আদর্শে নবদীক্ষিত; অন্য কথায় ইহা জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে বিজ্ঞান সম্মত মতের আদর্শ। এই মহান সত্যকে

অন্যায় ভাবে জড়বাদ বলিয়া বর্ণনা করিয়া ইহার গুরুত্ব লঘু করিবার চেষ্টা করা মূর্খতা। সত্য তাহার নিজের সীমার মধ্যেই আধ্যাত্মিক; জন্তুর মনই প্রকৃতপক্ষে জড়ধর্ম্মী, বিজ্ঞান বিরোধী বলিয়া রূপ ও ঘটনার কৃষ্ণাবরণ অতিক্রম করিয়া বিশ্ববিধানের গভীর প্রদেশে পৌছিতে ইহা অক্ষম।"

কিন্তু, মানুষের লোভই এই বিজ্ঞানের শক্তিকে ধ্বংসের কার্য্যে নিযুক্ত করিযা মনুষ্যত্বকে লজ্জা দিয়াছে। এদিকে সাবধান বাণী উচ্চারণ করিতে কবি ভুলেন নাই এবং ভারতবর্ষেরও যে এ সম্পর্কে কর্ত্তব্য আছে সে কথা দৃঢ়তা ও আশার সহিত বলিয়াছেন।

"পরস্পরকে ভীতি-প্রদর্শন করিবার সম্পর্কই আজ জাতিসমূহের মধ্যে সংযোগসূত্র স্থাপন করিয়াছে; আতঙ্কসৃষ্টির ক্ষমতার উপরই ইহার শক্তি নির্ভর করিতেছে এবং ভ্রূকুটী ও ভয় প্রদর্শনের প্রতিযোগিতায় সম্পদের অজস্র অপব্যয় হইতেছে। রাজনীতিক দুঃস্বপ্নের তমসাচ্ছন্ন প্রদেশে যাহা সত্যের পবিত্র আলোক লইয়া আসিতে পারিবে, সেই মহৎ বাণী শুনিবার জন্য সকলে প্রতীক্ষা করিয়া আছে। আমরা কিন্তু, ভারতবর্ষে আজও সুযোগ পাই নাই। তবুও আমাদের মানুষের কণ্ঠ আছে এবং সত্য তাহাকে দাবী করিতেছে। এমন কি যে ক্ষেত্রে কার্য্য করিবার জন্য আজও আমাদের নিমন্ত্রণ আসে নাই সেখানেও মানুষের মনের বিচার করিবার, তাহাকে সত্যে ও আদর্শে পৌছিয়া দিবার অধিকার আমাদের আছে।"

জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা

আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় দুর্দ্দশার কথা স্মরণ করিয়া রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজনীন আদর্শবাদের প্রতি কেহ কেহ অন্যায়ভাবে কটাক্ষ করিয়া থাকেন। কবি কিন্তু, আকার-হীন ধোঁয়াটে আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাস করেন না অথবা ভারতবর্ষের আত্মবিসর্জ্জনের মধ্য দিয়া তাহা লাভ করিতে হইবে বলিয়াও মনে করেন না। জাতিসমূহের মধ্যে যে পারস্পরিক অবিশ্বাস জগতের শান্তি হরণ করিয়াছে, যুদ্ধ-সজ্জায় মানুষের শক্তি অর্দ্ধেকে নিযুক্ত রাখিয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তে বিশ্বাস ও প্রীতির প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। "নিজের গৃহপ্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিবার মধ্যে নয়, অতিথি এবং প্রতিবেশীর প্রতি আতিথ্যের বিস্তারেই বিশ্বজনীনতার প্রকৃত প্রকাশ।" ভারতবর্ষের আন্তর্জাতিকতায় তাহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ছাপ থাকিবে। পাশ্চাত্য জাতীয়তার সর্ব্বপ্রধান দুর্ব্বলতা হইতেছে অপরের প্রতি বিমুখতা এবং সম্ভবতঃ এখানেই তাহার ধ্বংসের বীজ নিহিত। আমাদের জাতীয়তাই আজও গড়িয়া উঠে নাই কাজেই আমাদের প্রধান ক্ষেত্র এখানেই। তবে, একথা ভুলিলে চলিবে না যে, বিশ্বমানবের প্রতিও আমাদের বিশিষ্ট কর্ত্তব্য আছে; এবং এই বিশিষ্টতা লাভ করিবার জন্য, সত্যকে স্বীকার করিবার শক্তিহীনতাকে বিশিষ্টতা মনে করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধতা করিতে হইবে না, বরং তাহার সকল সত্য দিককে স্বীকার করিয়া লইয়া, তাহার বিপুল শক্তিকে অধিগত করিয়া তাহার পূর্ব্বকথিত দুর্ব্বলতা দূর করিবার দায়িত্ব ভারতের গ্রহণ করিতে হইবে।

কিন্তু, সর্ব্বপ্রথম আমাদের নিজেদের জানিতে হইবে। ইওরোপের শক্তির উৎস শুধু তাহার দৈহিক সমবায়ে নয় তাহার মানসিক শক্তিরও ঐক্যে ও সমবায়ে।

"আমরা যে কি সে সম্বন্ধে জাতি হিসাবে আমাদিগকে পূর্ণভাবে সচেতন হইতে হইবে। ইহা অতিশয় সত্য কথা যে, জাতীয় ঐক্য বোধের অর্থই হইতেছে জাতিকে সমগ্রভাবে এবং তাহার অংশগুলিকে জানা। কিন্তু, আমাদের অধিকাংশেরই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে শুধু যে এই জ্ঞান নাই তাহা নহে, ইহা চর্চ্চা করিবার অকপট আগ্রহও নাই। রাজনীতিক মত প্রচারের সময় উগ্রতার সহিত আমাদের জাতীয় ঐক্যের কথা বলিয়া আমরা নিজেরাই এই কথা বিশ্বাস করিয়া থাকি যে, আমাদের ইহা লাভ হইয়াছে এবং এইরূপে আমরা রাজনীতিক দিবাস্বপ্নের মায়াজগতে বাস করিতে থাকি। প্রকৃত কথা হইতেছে যে, আমাদের নিজেদের দেশে মানুষ সম্বন্ধে আমাদের ঔৎসুক্য বড়ই ক্ষীণ। আমরা রাজনীতি ও অর্থনীতির কথা বলিতে ভালবাসি···কিন্তু, আমাদের

প্রতিবেশী সম্প্রদায়গুলি কি ভাবিতেছে, কি অনুভব করিতেছে, কি বলিতেছে, কি ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, সমাজের বেড়া অতিক্রম করিয়া তাহা ব্যক্তিগত ভাবে কেহ অনুসন্ধান করিতে চাহি না।"

"মননশক্তির সমবায়ই ইওরোপকে এত বিপুল মানসিক শক্তির অধিকারী করিয়াছে। এখানে এমন উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহাতে এই মহাদেশের সকল দেশই এক সঙ্গে চিন্তা করিতে পারে। চিন্তার এই সুবিপুল সমবায় নিজের গতিবেগে সত্যভ্রষ্ট ব্যক্তিগত চিন্তাকে এবং অযুক্তির আতিশয্যকে নষ্ট করিয়া ফেলে। ...অন্যদিকে ভারতবর্ষের মন বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত; এমন কোন সাধারণ পথ নাই, যাহার অনুসরণ করিয়া আমরা (সাধারণ সংস্কৃতি মূলক ঐক্যে) পৌছিতে পারি।"

শুধু ধর্ম্ম এবং জাতি হিসাবেই আমরা বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত নহি। চিন্তা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও আমরা কেহ হিন্দু কেহ মুসলমান কেহ অন্য। যাহা আমাদিগকে এক করিতে পারিত, সেই শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই বিভাগকে বাঁচাইয়া রাখিয়া দুর্ব্বলতাকে আমরা সযত্নে পোষণ করিতেছি।

পাটনা সায়েন্স কলেজের অধ্যক্ষ পদে বাঙ্গালী নিযুক্ত

পাটনা সায়েন্স কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ কে-এস কোল্ডওয়েল ইণ্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিস হইতে অবসর গ্রহণ করায় তাঁহার স্থানে প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখার্জ্জী উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। অধ্যাপক মুখার্জ্জী বার্লিন, সুইডেন, ফিন্‌ল্যাণ্ড, নরওয়ে, ভিয়েনা, জেনেভা, মিলান্, প্যারিস, অক্স্‌ফোর্ড প্রভৃতি স্থানের বিজ্ঞানাগারে কার্য্য করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি পাটনা কলেজের গবেষণাগারে কার্য্য করিতেছিলেন।

সুভাষ বাবুর নূতন পুস্তক লিখিবার সংকল্প

অস্ত্রোপচারের পর সুভাষবাবু ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস সম্বলিত আর একখানি নূতন পুস্তক লিখিবার সংকল্প করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। হীনস্বাস্থ্য লইয়া প্রবাসে থাকিয়াও সুভাষ বাবু দেশের কাজ করিতে কোন সময় বিরত থাকেন নাই। এই সকল পুস্তকের দ্বারা বিদেশে ভারত সম্বন্ধে অনেক সঠিক তথ্য প্রচারিত হইবে।

সাংবাদিকের সম্মান

'এড্‌ভান্স' পত্রের শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সেনকে তাঁহার "সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় সমস্যা" বিষয়ে প্রবন্ধের জন্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'ডক্‌টর-অফ-ফিলসফি' উপাধি দান করা স্থির করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। তাঁহার প্রবন্ধ সার আর্থার ব্যারিডেল কীর্থ, অধ্যাপক এইচ জে-লাস্‌কী এবং শ্রীযুক্ত এম-আর-জয়াকর পরীক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন সাংবাদিক এই উপাধি পান নাই। আমরা তরুণ সাংবাদিকের এই সম্মানে বিশেষ আনন্দিত।

প্রিয়ম্বদা দেবীর পরলোক গমন

প্রতিষ্ঠা সম্পন্না মহিলা কবি প্রিয়ম্বদা দেবীর পরলোক গমনে বাংলা সাহিত্যের বিশেষ করিয়া মহিলা সাহিত্যিক সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। এক সময় তাঁহার কবিতার বিশেষ আদর ছিল এবং তাঁহার কয়েকখানি পুস্তক সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়

সংবাদ ও সাময়িক পত্রিকা যাঁহারা পাঠ করেন, বাংলার লাইব্রেরী আন্দোলনের ইতিহাসের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, বর্ত্তমান বর্ষের নিখিলভারত লাইব্রেরী সম্মেলনের সভাপতি কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের নাম ও যোগ্যতা তাঁহাদের সুপরিজ্ঞাত। বাংলায় লাইব্রেরী আন্দোলনের তিনিই অন্যতম প্রথম প্রবর্ত্তক ও প্রধান পরিচালক এবং তাঁহারই পরিচালনায় ও নেতৃত্বে সমগ্র ব্রিটীশ-ভারতে লাইব্রেরী আন্দোলন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে।

স্পেনের মাদ্রিদ্ ও বার্সিলোনায় উপস্থিত হইয়া আগামী আন্তর্জাতিক লাইব্রেরী কন্‌ফারেন্সে যোগ ও বক্তৃতা দিবার জন্য ইনি 'ইণ্টার-ন্যাশান্যাল্-ফেডারেশন্-অব্ লাইব্রেরীয়ানস্' এর পক্ষ হইতে 'লীগ-অব-নেসনস্' কর্ত্তৃক বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়াছেন। আগামী এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে কুমার ইওরোপ যাত্রা করিবেন বলিয়া প্রকাশ।

আমরা আশা করি, তিনি ভারতবর্ষ ও বাংলার সুনাম বাড়াইতে পারিবেন এবং ভারতবর্ষে লাইব্রেরী আন্দোলনের উপযোগিতা সম্বন্ধে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবেন।

অখিল ভারত গ্রাম উদ্যোগ সংঘ

পল্লী শিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য বম্বে কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবানুযায়ী গঠিত প্রতিষ্ঠানটির গ্রাম-উদ্যোগ সংঘ নাম ব্যাপকতর অর্থপূর্ণ এবং অধিকতর সময় ও বিষয়োপযোগী হইয়াছে। আমাদের শুধু যে শ্রমশিল্প নষ্ট হইয়াছে তাহা নয়, পল্লীগুলির স্বাস্থ্য গিয়াছে, সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার ক্ষমতা নষ্ট হইয়াছে, কর্ম্মের উদ্যম গিয়াছে, মানুষের বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে অত্যাবশ্যক বিধিব্যবস্থাগুলি লোপ পাইয়াছে এক কথায় গ্রামগুলি মৃতপ্রায় হইয়াছে। আমাদের জাতীয় জীবনধারার উৎস মুখ হইতেছে পল্লী; কাজেই পল্লীগুলিকে বাঁচাইতে না পারিলে, জাতীয় উন্নতির কোন প্রকার চেষ্টা স্থায়ী এবং শক্তিশালী হইবে না। পল্লীবাসীদের উদ্যমহীনতা এবং সংঘবদ্ধভাবে কার্য্য করিবার ক্ষমতার এবং পৌর কর্ত্তব্যজ্ঞানের অভাব পল্লীগুলির উন্নতির পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বড় বাধা হইয়াছে। এই উদ্যমহীনতা দূর করিয়া সংঘবদ্ধ কর্ম্মের প্রেরণা পল্লীবাসীদের মধ্যে সঞ্চারিত করিতে না পারিলে দুর্দ্দশার অবসান হওয়া বা কোন বিশেষ চেষ্টায় সাফল্য লাভ করা অনেকটা অসম্ভব। এইজন্য পল্লীগঠনের জন্য সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক হইবে পল্লীবাসীদের মধ্যে গণজীবন গঠনের ও তাঁহাদের সর্ব্ববিধ অভাব অভিযোগ দূর করিবার চেষ্টা করা। এ হিসাবে উদ্যোগ সংঘ নাম খুবই ভাল হইয়াছে।

অবশ্য পল্লীবাসীদের মধ্যে এই কর্ম্মপ্রেরণা আনয়ন করিতে হইলে কোন কর্ম্ম প্রচেষ্টার মধ্য দিয়াই তাহা আনিতে হইবে। আমাদের আর্থিক এবং বেকার সমস্যা এত প্রবল যে, (ইহা আমাদের দুর্গতির অন্যতম প্রধান কারণও বটে) লাভজনক কোন কাজ ব্যতীত লোককে আকৃষ্ট করা যাইবে না। এদিক দিয়া শ্রমশিল্পকে কেন্দ্র করিয়া পল্লীগঠনের চেষ্টা সফল হইতে পারে।

বাংলাদেশে অনেক যোগ্য এবং পরীক্ষিত কর্ম্মীকে বিশেষ আগ্রহ ও উদ্যমের সহিত দারিদ্র্য ও বহুবিধ বাধার সহিত লড়িয়া পল্লীসংগঠনের কার্য্যে নিযুক্ত ও বিফল হইতে দেখিয়াছি। কর্ম্মীদের কোন প্রকার দোষ বা চেষ্টার শিথিলতা চোখে পড়ে নাই। অত্যন্ত সাদাসিধা অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিয়াও তাঁহারা কোন প্রকারে টিকিয়া থাকিবার মত জীবিকার সংস্থান করিতে পারেন নাই। যাহাদিগকে সহযোগিতার জন্য আহ্বান করিয়াছেন অথবা যাহাদিগকে আদর্শ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদিগেরও টিকিয়া থাকিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। যে সকল শিল্পের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার প্রসারের জন্য দেশের সর্ব্বত্র কোন চেষ্টা না থাকায়, বাহিরে সুবিধা মত বাজার এবং সহানুভূতি না পাওয়ায় তাহা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই।

বর্ত্তমান চেষ্টা সংঘবদ্ধভাবে আরম্ভ হইবে বলিয়া, শ্রমশিল্পই এই চেষ্টার কেন্দ্রস্বরূপ হইবে বলিয়া, যাহাতে উন্নতধরণের প্রণালী অবলম্বিত হইতে পারে তাহার চেষ্টা হইবে বলিয়া, সর্ব্বোপরি মহাত্মা গান্ধীর প্রভাব পশ্চাতে আছে বলিয়া অন্যান্য চেষ্টা অপেক্ষা ইহার সফল হইবার সম্ভাবনা অধিক থাকিবে। অবশ্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব চেষ্টার ফলে বর্ত্তমানের পথ যে অনেকটা সুগম হইয়াছে সেকথাও নিঃসন্দেহ সত্য।

বম্বে কংগ্রেসে এই সংকল্প গ্রহণের সময় 'ম্রিয়মাণ শিল্প' কথাটার উল্লেখ ছিল; পরিবর্ত্তিত নিয়মতন্ত্রে 'ম্রিয়মাণ' কথাটাকে সম্ভবতঃ বিবেচনা করিয়া বাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহা ভালই হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, আমাদের শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠার সময় আমাদের একথা মনে রাখিতে হইবে

যে, শুধু পুরাতনের প্রতি শ্রদ্ধা আমাদিগকে বর্ত্তমান জগতে বাঁচিবার শক্তি দিবে না। সব সময়েই দেশের বর্ত্তমান রুচি ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কারণ, সঙ্গত হইবে কি না, সে প্রশ্ন বাদ দিয়াও বলা যায় যে, অধিকাংশ লোকের রুচির বা প্রয়োজনের পরিবর্ত্তন করা সম্ভব হইবে না। এই কাজ এই জন্য আরও কঠিন হইবে যে, বিদেশীরা সব সময়েই আমাদের রুচি ও মনের ঝোঁক অনুযায়ী জিনিসপত্র আমাদের সম্মুখে ধরিতে থাকিবেন। তাহা ছাড়িয়া দেশের অপছন্দ-সই জিনিস কর্ত্তব্যবোধে অধিক লোকে কিনিবে না এবং কোন লো.ই অধিক দিন কিনিবে না। ইহা না হইলেও, আ.াদের দেশে পূর্ব্বে ছিল না এমন অনেক নূতন লাভজনক শ্রমশিল্পের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে, শুধু নূতন বলিয়া এগুলির প্রতি বিমুখ হওয়া বা নূতন নূতন ক্ষেত্র অনুসন্ধান না করা বুদ্ধির কার্য্য হইবে না।

বর্ত্তমানে আমাদের বিলাস ও আড়ম্বরের জিনিসগুলি বিদেশ হইতে আসিতেছে বলিয়া বিলাস ও আড়ম্বরে দেশের ক্ষতি হইতেছে। কিন্তু এসকল জিনিস যদি আমরা দেশে প্রস্তুত করিতে পারি তবে, ইহার দ্বারা অনেক লোকে অন্নসংস্থান করিতে পারিবে এবং জীবন যাত্রার উচ্চাদর্শ বজায় রাখিবার জন্য লোককে বেশী পরিশ্রম করিতে হইবে বলিয়া জাতির কর্ম্মশক্তিও বর্দ্ধিত হইবে। কলের সাহায্যে অল্প সময়ে অধিক কাজ হওয়ায় যত লোকে বেকার হইয়া পড়িত, লোকের প্রয়োজন বাড়িলে তত লোকে বেকার হইবে না। আমাদের অর্থনীতিক উন্নতি লাভের প্রচেষ্টার সময় এসব কথা মনে রাখিতে হইবে এবং খেলনা ও নানাবিধ বিলাসের দ্রব্যও যাহাতে গৃহশিল্প হিসাবে প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার চেষ্টাও গ্রাম-উদ্যোগ সংঘের কর্ম্মতালিকার বহির্ভূত না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বাংলায় চিনির ব্যবসায়ের ক্ষেত্র

কৃষিজাত দ্রব্যের বিশেষ করিয়া পাটের মূল্য অসম্ভব রকম কমিয়া যাওয়ায় বাংলার কৃষকের দুরবস্থার একশেষ হইয়াছে। কৃষিই আমাদের একমাত্র ধনোৎপাদনের উপায়। আমরা অন্য যাহারা যাহা কিছু করি তাহার প্রধান অংশ হইতেছে এই ধনবণ্টনে সহায়তা করা। যথেষ্ট পরিমাণ লাভজনক শ্রমশিল্প দেশের লোকের হাতে থাকিলে অন্যেরাও দেশের ধনোৎপাদনে সহায়তা করিতে পারিতেন। আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মধ্যে প্রধানতঃ বস্ত্র এবং সামান্য ভাবে অন্য কোন কোন দ্রব্যের কিছু অংশ দেশে প্রস্তুত হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বের তুলনায় কিছু টাকা দেশের লোকের হাতে থাকিয়া যাইতেছে। কিন্তু, ইহার পরিমাণ খুব বেশী নহে বলিয়া এখনও কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যের উপরই দেশের আর্থিক অবস্থা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। বর্ত্তমানে এই মূল্য কমিয়া যাওয়ায় কৃষকদের মধ্যে দারিদ্র্য এবং বেকার সমস্যা বাড়িয়া গিয়াছে এবং অন্যদিগকে প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা কমিয়া গিয়াছে। কাজেই, অন্যদের মধ্যেও পূর্ব্বোক্ত সমস্যা তীব্রতর হইয়াছে।

কিন্তু, আমাদের দেশে ধনোৎপাদনের বা জীবিকার্জ্জনের সম্প্রসারণের ক্ষেত্র যে অনেক রহিয়াছে অর্থাৎ সাধারণ লোকের আয়ত্বের মধ্যে রহিয়াছে তাহার অনেক প্রমাণ আছে। যে সুযোগ অন্য প্রদেশের লোকেরা গ্রহণ করিতেছেন, এই প্রদেশেরও যে সকল ক্ষেত্র অপরে এখনও অধিকার করিতেছেন, সে সকল সুযোগ বাঙ্গালীরা গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না বা সে সকল ক্ষেত্রে স্থান করিয়া লইতে পারিতেছেন না। দৃষ্টান্ত স্বরূপে চিনির ব্যবসায়ের কথা বলা যাইতে পারে। ১৯৩১-৩২ সালে চিনির উপর আমদানি শুল্কের পর ভারতবর্ষে ইহার উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু, বাঙ্গালী তাহার ন্যায্য অংশ গ্রহণ করিতে পারে নাই।

শিকারপুর চিনির কলের উদ্বোধন বক্তৃতায় স্বায়ত্বশাসন বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় সার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় বাংলায় চিনির ব্যবসার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

১৯৩১-৩২ সালে ভারতবর্ষে মাত্র ৩২টি কারখানা ছিল এবং ইহাতে ৪,৮৭,১২০ টন চিনি উৎপাদিত হইয়াছিল; আর ১৯৩৩-৩৪ সালে কারখানার সংখ্যা ১৩০টি হইয়াছিল এবং ইহাতে ৭,৭৯,৬০০ টন চিনি প্রস্তুত

হইয়াছিল। ১৯৩৫-৩৬ সালে কারখানার সংখ্যা ১৫৬টি হইতে পারে এবং উৎপন্ন চিনির পরিমাণ ১১ লক্ষ টন হইবে বলিয়া অনুমান করা যায়। ১৯৩৫-৩৬ সালে ভারতবাসীরা অনুমান ৯ লক্ষ টন চিনি খাইবেন। অর্থাৎ চিনি সম্বন্ধে আমরা প্রায় স্বাবলম্বী হইয়া উঠিয়াছি এবং খুব শীঘ্রই ভারতবর্ষকে বাহিরের বাজারের সন্ধান করিতে হইবে।

কিন্তু, ইহাতে বাংলার উল্লসিত হইবার কারণ নাই। ১৯৩৪-৩৫ সালে এই প্রদেশের লোকে ১,৩০,০০০ টন চিনি খাইয়াছে আর এখানে উৎপাদিত হইয়াছে মাত্র ১৩ হাজার টন। অর্থাৎ ১ লক্ষ ১৭ হাজার টন পরিমাণ চিনি বিদেশ হইতে বা অন্য প্রদেশ হইতে এখানে আসিতেছে। বাংলার কারখানার সংখ্যা মাত্র ৪টি। বর্ত্তমানে বাংলায় চিনির ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে প্রতিযোগিতা বিদেশীর সহিত করিতে হইবে না,—অন্য প্রদেশের লোকের সহিত করিতে হইবে।

কলে ও হাতে প্রস্তুত চিনি

বাহিরের সহিত প্রতিযোগিতা করা যত সহজ ভারতের অন্য প্রদেশের সহিত প্রতিযোগিতা করা তত সহজ হইবে না। প্রথম কথা, ব্যবসা, শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাঙ্গালীরা নূতন প্রবেশ করিতেছেন কাজেই, অন্যান্য অনেকের অপেক্ষা তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা নিশ্চয়ই কম হইবে। অন্যান্য অবস্থা সমান হইলেও, প্রতিযোগিতায় তাঁহাদের পারিয়া উঠা শক্ত হইত, আর বর্ত্তমানে অপরের অধিকৃত ক্ষেত্রে তাঁহাদের পক্ষে প্রবেশ করা বিশেষ কষ্টসাধ্য হইবে। অন্য কোন প্রদেশকে বর্জ্জন করিবার আন্দোলন অথবা অসুবিধায় ফেলিবার জন্য আইনের আশ্রয় গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না।

মহাত্মাজী সকলকে চিনির পরিবর্ত্তে গুড় খাইতে বলিতেছেন; অন্য কোন কারণে না হইলেও অন্ততঃ আর্থিক সুবিধার জন্যও আমরা এই মতের সমর্থন করিয়া অপরের আর্থিক প্রভুত্ব হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে পারিতাম। কিন্তু, আমরা গুড় খাইলেও তাহা অন্য প্রদেশ হইতে আমদানি করিতে হইবে। সমগ্র ভারতবর্ষে যত জমিতে আকের চাষ হয়, বাংলার অংশ তাহার মধ্যে মাত্র ৭'২।

কাজেই সর্ব্বপ্রথম আমাদিগকে ইক্ষুর চাষ বাড়াইবার চেষ্টা করিতে হইবে এবং সম্ভবতঃ সরকারের সহযোগিতার ফলে কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে। ইক্ষুর চাষ বাড়িবার সঙ্গেই, যাহাতে তাহাকে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন না হইতে হয় তাহার জন্য প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে কয়েকটি পন্থা ফলদায়ক হইতে পারে।

আমরা অবশ্য একথা মনে করি না, কল কারখানার সাহায্য না লইয়া সর্ব্বপ্রকার শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠায় আমরা সক্ষম হইব। কিন্তু, দেশের সামাজিক আর্থিক ও নৈতিক জীবনের উপর যে কারখানার ক্ষতিকর প্রভাব আছে তাহা স্বীকার করি, এবং এইজন্যই লাভজনক গৃহশিল্পরূপে যে-সকল জিনিসের উৎপাদন অসম্ভব নহে সেগুলিকে সেই ভাবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা ভাল বলিয়া মনে করি।

ইক্ষুর চাষ বাড়িবার সঙ্গে যদি চিনির পরিবর্ত্তে লোকে গুড় বেশী খায় তবে, তাহার এই সুবিধা হইবে যে, যে সকল স্থানে ইক্ষু উৎপন্ন হইবে, সে সকল এবং তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানের বাজার ইহা সহজেই অধিকার করিতে পারিবে। কিন্তু, চিনি খাওয়া লোকে ছাড়িয়া দিতে পারিবে না বা দিবে না। অথচ, ইচ্ছা থাকিলেও, কিনিবার সময় কেহ বাংলার কলের চিনি বাছিয়া কিনিতে পারিবে না। কিন্তু, কারখানার পরিবর্ত্তে যদি হাতে বা ছোট কলে চিনি গৃহশিল্প হিসাবে প্রস্তুত হয় তাহা হইলে, ইহা স্থানীয় চাহিদা সহজেই মিটাইতে পারিবে।

চিনির জন্য বাংলায় ইক্ষুর সহিত খেজুরের চাষের সম্ভাবনা কতটা আছে তাহাও দেখা দরকার। বাংলার অনেক স্থানে ইক্ষু অপেক্ষা খেজুর গুড়ের প্রচলনই বেশী এবং যশোহরের সদর, কোটচাঁদপুর, কেশবপুর, মণিরামপুর প্রভৃতি স্থানে এখনও হাতে প্রচুর পরিমাণ ভাল চিনি উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বে আরও উৎকৃষ্টতর চিনি আরও অধিক পরিমাণে হইত। কলের সাহায্য ব্যতীত লোকে এই চিনিকে স্বচ্ছ শ্বেতবর্ণ করিতে ও দানা বাঁধাইতে পারিত।

এই লুপ্ত শিল্পটির পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সফল ও লাভজনক হইতে পারে।

মেডিক্যাল সার্ভিস ও ভারতীয়গণ

'আই-এম-এস' এ ভারতীয়দের গ্রহণ সম্বন্ধে এসেম্‌ব্লিতে বিতর্ক উপস্থিত হয়। অধিক বেতনের অন্য সকল পদ ও বিভাগের ন্যায় এখানেও ভারতীয়দের প্রবেশ বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ। ১৯৩২ সাল হতে এই বিভাগে ১৩ জন ভারতীয়কে এবং ৯৫ জন ইংরেজকে স্থায়ীভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে।

এই পার্থক্যের কারণস্বরূপে বলা হয় যে, সরকারের গৃহীত নীতি অনুসারে 'দুইজন ইংরেজ ও একজন ভারতীয়' এই অনুপাত বজায় রাখিবার জন্য এরূপ করিতে হইয়াছে। আর্ম্মি সেক্রেটারি মিঃ টটেনহাম বলেন যে ব্রিটীস কর্ম্মচারীদের জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ইংরেজ ডাক্তার রাখিতেই হইবে।

কাহারও স্বজাতি-প্রীতি ও জাতীয় অহঙ্কার পরিতৃপ্তির জন্য ভারতীয়েরা তাঁহাদের প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত থাকিবেন, ইহা সুযুক্তির কথা নহে। যোগ্যতা বিশিষ্ট ভারতীয় ডাক্তারেরা থাকিলে, উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখা হইল বলিয়া ভারত সরকার মনে করিতে পারেন। সকল বিভাগের সকল পদেই যোগ্য ভারতীয়দের মাত্র নিযুক্ত করিলে এই সমস্যার সর্ব্বাপেক্ষা স্বাভাবিক সমাধান হইবে।

রেলওয়ে সার্ভিসে ইওরোপীয় গ্রহণ নীতি নিন্দিত

রেলওয়ে সার্ভিসে অধিক সংখ্যায় ইওরোপীয় গ্রহণ-নীতি এসেম্ব্লীতে নিন্দিত হইয়াছে। বর্ত্তমান রেলওয়ে কর্ম্মচারীদের শতকরা ৩৮ জন মাত্র ভারতীয়।

এই প্রসঙ্গ আলোচনাকালে শ্রীযুক্ত রাম নারায়ণ সিং একটি চমৎকার কথা বলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন ভারতীয় নিয়োগের ফলে দেশের কি উপকার হইবে। এপর্য্যন্ত ইহাতে কতটুকু লাভ হইয়াছে। চাকরি প্রাপ্ত ভারতীয়েরা ইওরোপীয়দের অপেক্ষা স্বাধীনতার বড় শত্রু।

চাকুরে ভারতীয়েরা আত্মপরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে এসেম্ব্লীর বাহিরেও সম্ভবতঃ অনেকে এইরূপ ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষার নূতন বিধান

সরকার কর্ত্তৃক সংশোধিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার নূতন বিধানকে সিনেট পাকাপাকিভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। এই নূতন বিধান ১৯৩৯ সাল হইতে কার্য্যকরী হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। এই বিধান অনুসারে ইংরাজী ব্যতীত অন্য সকল বিষয়, বাংলা, উর্দ্দু, আসামী এবং হিন্দী এই প্রধান ভাষাগুলির যে কোন একটি বা অপরটির সাহায্যে পরিচালিত হইবে এবং মেয়েদের পাঠ্যতালিকা স্বতন্ত্র হইবে।

বর্ত্তমান বিধান অপেক্ষা এই প্রস্তাবিত বিধান যে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠতর হইয়াছে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। ইতিহাস, ভূগোল প্রাথমিক বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় অবশ্য পঠিতব্য হওয়ায় ছাত্রদের বর্ত্তমানের মানসিক অসম্পূর্ণতা অনেকাংশে দূর হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। পুরুষ ও মেয়েদের প্রকৃতিগত পার্থক্য ব্যতীত তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্রও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এজন্য তাঁহাদের পঠিতব্য বিষয়ও স্বতন্ত্র হওয়া প্রয়োজন; ইঁহাদের জন্য স্বতন্ত্র বিধান হওয়ায় এই প্রয়োজনকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই বিধান থাকিলে আরও ভাল হইত যে ইচ্ছা করিলে এবং নিজের ব্যবস্থা নিজে করিয়া লইতে পারিলে কোন ছাত্রী পুরুষদের জন্য নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য তালিকার অনুসরণ করিতে পারিবেন, তদনুযায়ী পরীক্ষা দিতে পারিবেন।

এই নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তনের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ে এপর্য্যন্ত অনুসৃত নীতি সম্পূর্ণভাবে পরিবর্ত্তিত হইল বলা হইয়াছে। একথা দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থাকে উদ্দেশ করিয়াই অবশ্য বলা হইতেছে। এ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ঠিক নহে। ইহাতে যেন কেহ মনে না করেন যে নূতন ব্যবস্থার ফলে ইংরাজীর বর্ত্তমান গুরুত্ব কমাইয়া বাংলার গুরুত্ব তাহার স্থানে অনেক বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিছু যে বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং ইংরাজী ব্যতীত অন্য সকল বিষয় মাতৃভাষার

সাহায্যে পড়িবার ব্যবস্থা হওয়ায়, ছাত্রদের শক্তির অপচয় যে অনেক কম হইবে তাহা নিশ্চিত। কিন্তু, তাহা এত অধিক নহে যাহাতে সমগ্র ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন হইল বলা যাইতে পারে। ছাত্রদের ইংরাজীর জ্ঞান যাহাতে হ্রাস না পায় তাহার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে; ব্যবস্থা বরং পূর্ব্বাপেক্ষা কঠোরতর হইয়াছে।

আমাদের যে ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজন আছে এবং ভারতবর্ষের প্রদেশ সমূহের মধ্যে ইংরেজীই যে সাধারণ ভাষার কার্য্য করিবে, ইংরাজী সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করিতে গেলে যে আমরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইব তাহার মধ্যে সন্দেহ মাত্র নাই। তাই বলিয়া আতঙ্কপ্রসূত কোন বাড়াবাড়ির ফল ভাল হইবে না। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় সেই বাড়াবাড়ি কিছু রহিয়াছে এবং প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় তাহা কিছুমাত্র হ্রাস করা হয় নাই। ইংরাজী ভাল ভাবে আয়ত্ত করিতে আমাদের ছেলেদের শক্তি ও উৎসাহের যে অপচয় হইতেছে, তাহা ভবিষ্যতেও হইতে থাকিবে।

প্রবেশিকা পরীক্ষাকে কাজে লাগিবার মত কতকটা প্রাথমিক শিক্ষা বলিলে বিশেষ অন্যায় করা হইবে না। দেশে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে উচ্চ শিক্ষার তুলনায়, শিক্ষার এই প্রাথমিক ধাপে ছাত্রের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতে থাকিবে। এই শিক্ষা শেষ হইবার পর ক্রমেই অধিকসংখ্যক লোক উচ্চ শিক্ষার দিকে না ঝুঁকিয়া বৃত্তিমূলক শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট হইবেন বা জীবিকার্জ্জনে নিযুক্ত হইবেন। ইঁহাদের অধিকাংশেরেই জীবনে কখনও ইংরাজী সাহিত্যের সম্পর্কে আসিতে হইবে না, বা ইংরাজী সাহিত্যের জ্ঞান কাজে লাগিবে না। ইংরাজীর যে কার্য্যকরী জ্ঞান কাজে আসিবে তাহা লাভ করিবার জন্য এই বিপুল উদ্যমের প্রয়োজন হইত না। বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যোগাযোগের জন্য ইংরাজীর নিম্নতম যে জ্ঞানের আবশ্যক হইবে তাহা অল্প ইংরাজী বলিতে পারা, চল্‌তি সাধারণ ইংরাজী পড়িয়া ও শুনিয়া মোটামুটি বুঝিতে পারা। ইহার জন্যও বর্ত্তমানের ন্যায় কঠোর ব্যবস্থার প্রয়োজন হইত না এবং এইটুকু অবশ্য শিক্ষনীয় হইলে, ইহার চেয়ে বেশী যাহাদের দরকার হইত তাহারা তাহা শিখিয়া লইতে পারিত। কথা হইতে পারে যাহারা উচ্চ শিক্ষা লাভ করিবে কথিত ব্যবস্থায় তাহারা অসুবিধায় পতিত হইবে। কিন্তু, সাধারণ ব্যবস্থা কথিত প্রকারের করিয়া উচ্চ শিক্ষার্থীর জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা রাখা যাইত; অথবা উপরের দিকে সাধারণ ছাত্রের পক্ষে ইংরাজীর বর্ত্তমান মান কমাইয়া দেওয়া যাইতে পারিত; ইহাতেও কোন দিক দিয়া কোন ক্ষতির আশঙ্কা ছিল না। ইংরাজীতে যাঁহারা বুৎপন্ন হইতে চাহিতেন, তাঁহাদের জন্য উপরের দিকে পৃথক ব্যবস্থা রাখা অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ হইত।

প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনে ইংরাজী যে পর্য্যন্ত পড়াইবার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে তাহারও পরীক্ষা এবং পঠন যদি বাংলার মধ্যবর্ত্তিতায় হইত, তাহা হইলেও ছাত্রদের পরিশ্রম কম হইত। কারণ পড়িয়া বুঝিতে পারা, নিজের মাতৃ-ভাষায় তাহার অর্থ, ব্যাখ্যাদি লিখিতে পারা, বিদেশীভাষা লিখিতে পারা বা তাহাতে ভাব প্রকাশ করিতে সক্ষম হওয়া অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ হইত।

মেয়েদের পাঠ্যতালিকা পৃথক করা হইয়াছে। তাঁহাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন ছিল, ইংরাজীর পরীক্ষা আরও সহজ করিয়া দেওয়া। যে সকল কারণে ছেলেদের পক্ষে ইংরাজীর কিছু পর্য্যন্ত জ্ঞান অত্যাবশ্যক মেয়েদের বেলায় তাহার অনেকগুলি কারণই নাই। কাজেই, মেয়েদের পক্ষে ইংরাজীকে নির্ব্বাচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারা যাইত অথবা খুব সামান্য দূর পর্য্যন্ত অবশ্য শিক্ষণীয় করিতে পারা যাইত। ইহাতে স্ত্রীশিক্ষার পশ্চাদ্বর্ত্তীতা শীঘ্র কমিবার সম্ভাবনা থাকিত এবং ইংরাজী কম জানিলেও তাঁহাদের মানসিক যোগ্যতা কম হইত না।

ইংরাজী সামান্য প্রকার বলিতে পারিলে এবং পড়িয়া ও শুনিয়া মোটামুটি বুঝিতে পারিলে যে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যেমন কারবার চলিবে, তেমনই সংযোগ রক্ষার জন্য অন্য উপায়ও অবলম্বিত হইতে পারে। প্রাচীন ভাষার পরিবর্ত্তে কোন আধুনিক ভারতীয় ভাষা শিখিবার যে সুবিধা বিশ্ববিদ্যালয় দিয়াছেন, অধিকাংশ স্কুল যদি সেই সুবিধা গ্রহণ করিয়া প্রাচীন্ ভাষার পরিবর্ত্তে কোন না কোন আধুনিক ভাষা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন এবং অন্যান্য প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও এই নীতির অনুসরণ

করেন তবে, প্রদেশগুলির মধ্যে সংযোগ ঘনিষ্ঠতর ও স্বাভাবিকতর হইবে।

ইংরাজী ব্যতীত অন্যান্য বিষয় মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের বিধান অবশ্য খুবই সঙ্গত হইয়াছে। তবে, ইহা অংশতঃ পূর্ব্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছিল এবং বিধান না থাকিলেও, অধিকাংশ স্কুলেই সকল বিষয়ই বাংলার সাহায্যে অন্ততঃ আংশিক সাহায্যে পড়ান হইয়া থাকে।

নারী প্রগতি তুরস্কে ও ভারতে

অন্তর্জাতিক নারী সংঘের সভানেত্রী মিসেস্ করবেট এস্‌বি প্রাচ্যদেশ ভ্রমণান্তে লণ্ডনে গিয়া তুরস্ক ও ভারতের নারীপ্রগতির স্বরূপের পার্থক্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

"ভারতবর্ষে নারীরা জাতীয়তাব ভিত্তির উপর নূতন সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছেন এবং নাগরিকের পূর্ণ অধিকার পাইবার পথের প্রতি ইঞ্চি ভূমির জন্য তাঁহাদিগকে সংগ্রাম করিতে হইতেছে। আর তুরস্কের নারীদের পূর্ণ রাজনীতিক অধিকার দিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং উচ্চ শিক্ষিত অল্পসংখ্যক নারী, তুরস্কের নারীসাধারণকে শিক্ষিত করিবার জন্য বিপুল প্রয়াস করিতেছেন ; এখানকার নারীসাধারণ এই সকল অধিকার চাহেনও নাই এবং ইহা ব্যবহার করিবারও অভিজ্ঞতা তাঁহাদের ছিল না।"

তুরস্কের সহিত তুলনায় ভারতের নারীদের গৌরব বোধ করিবার এবং পুরুষদের লজ্জিত হইবার কারণ রহিয়াছে। রাজনীতিক অধিকার পরের কথা, এখানে পুরুষেরা পারিবারিক ও সামাজিক জীবনেই তাঁহাদিগকে পূর্ণ অধিকার দিতে চাহিতেছেন না। ইঁহাদের এই সকল অধিকার পাওয়া উচিত বলিয়া যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহাদেরও অনেকে তাঁহাদিগকে এই অধিকার দিবার পূর্ব্বে শিক্ষিত ও যোগ্য দেখিতে চাহেন। অর্থাৎ সাঁতার শিখিবার পূর্ব্বে জলে নামিতে দিতে চাহেন না।

বাঙ্গালী অধ্যাপকের সম্মান

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত আই-ই-এস রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিবার জন্য উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সংস্কৃতিমূলক সম্বন্ধ স্থাপনকল্পে শ্রীযুক্ত দাশগুপ্তকে প্রেরণ করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষও অনুরুদ্ধ হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আরো কয়েকটি য়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়েও বক্তৃতা দিবার জন্য শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত নিমন্ত্রণ পাইয়াছেন।

মাদাম হালিদা এদিব হানুম

তুরস্কের এই মহিয়সী মহিলার কথা আমরা পূর্ব্ব সংখ্যায় লিখিয়াছিলাম। আশা করি, ইঁহার ভারতে ও বাংলায় আগমন, নারীদের, বিশেষ করিয়া মুসলিম নারীদের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার ও সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার বর্জ্জনের প্রেরণা আনয়ন করিবে। কোন কোন স্থানে মুসলিম নারীদের মধ্যে এই চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে জানিয়া আমরা সুখী হইলাম।

ইঁহার আগমনে ভারতবর্ষ ও তুরস্কের মধ্যে যে শুধু জ্ঞান ও মস্তিষ্কের সংযোগই প্রতিষ্ঠিত হইল তাহা নহে, তদপেক্ষাও মূল্যবান হৃদয়ের সম্পর্কের গোড়া পত্তন হইল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতার উপসংহারে ছাত্রদের উদ্দেশ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "আপনাদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। আমার নিজের দেশে থাকিয়া, যেন নিজের দেশের যুবকবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া কথা বলিতেছি, এই কথাটা যে আমি কতটা অনুভব করিয়াছিলাম তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিতেছি না। আমি চলিয়া যাইতেছি, কিন্তু ভারতবর্ষকে নমস্কার করিতেছি ; বাংলাকে নয়, উত্তর বা দক্ষিণ ভারতকে নয়, কোন বিশেষ ভারতবর্ষকে নয়, কিন্তু, যে ভারতবর্ষ, বিভিন্ন সভ্যতার সামঞ্জস্য বিধানে মহান হইবে, সেই বৈচিত্র সমন্বিত ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষকে।"

"শত শত হিন্দুভ্রাতার মধ্যে যদি একজনও মুসলমান থাকেন, তবে তাঁহার কর্ত্তব্য হইবে, ভারতবর্ষকেই তাঁহার নিজের ধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ মনে করা। তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথম নিজ সম্প্রদায়ের কথা নহে, পরন্তু, ভারতবর্ষের কথাই চিন্তা করিতে হইবে।"

মুসলিম তরুণদের নিকট তাঁহার এই আবেদন যেন ব্যর্থ না হয়।

আইন পরিষদ ও বাংলা

আইন পরিষদের প্রেসিডেণ্ট ও ডেপুটি প্রেসিডেণ্ট দুই জনই বাঙ্গালী। কিন্তু, সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের আলোচনার সময়, বাংলার প্রতিনিধিরা বাংলার পক্ষের কথা বলিবার অনুমতি পান নাই। ডেপুটি প্রেসিডেণ্ট অখিলবাবু পর্য্যন্ত সভাপতির নিকট লিখিত প্রার্থনা করিয়াও অনুমতি পান নাই (আনন্দ বাজার পত্রিকা)।

বক্তৃতা, বিতর্ক প্রভৃতিতে বাঙ্গালীরা পরিষদে প্রধান স্থান অধিকার করিতে না পারিলেও একেবারে কোণঠাসা হইয়া নাই। ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইন্দো-ব্রিটীস বাণিজ্যচুক্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা বিশেষভাবে সর্ব্বত্র প্রসংশিত হইয়াছে।

শ্রীসুশীলকুমার বসু

পট ও মঞ্চ

—আনন্দ—

শিল্পীর কথা

শিল্পীর কথা বলি। সভ্য মানুষের মনকে যে রসাবেশে বিভোর করতে পারে সেই শিল্পী। তার সাথে আমাদের সম্ভ্রম ও সঙ্কোচের দূরত্ব নেই, সে আমাদের রসপিপাসু আত্মার আত্মীয়। তার'পরে আমাদের দাবী অনেক—তার উৎকর্ষ আমরা কামনা করি তাই উন্নতি দেখলে তেমন প্রশংসা করি না কারণ সাধুবাদ আমরা তাকেই তত বেশী দিয়ে থাকি যাকে আমরা যত বেশী পর ও দূরসম্পর্কীয় মনে করি; কিন্তু তার অবনতিতে আমরা নিন্দায় মুখর হয়ে উঠি কারণ তার অপকর্ষের বিষয় আমাদের কাছে দুঃস্বপ্ন। মানুষের মনে যে রূপের তরঙ্গ তুলবে সুন্দরের আরাধনাই হবে তার জীবনের চরম লক্ষ্য, তার বিবর্দ্ধমান প্রতিভা মানুষকে ভুলিয়ে দেবে দৈনন্দিন দুঃখদীর্ণ জীবনের ব্যর্থতা আর ব্যথা— মানুষকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে তার পাশব থেকে দৈব জীবনের আনন্দোজ্জ্বল মণিপুরীতে, তাকে ঈশ্বরের মত মহীয়ান ও আনন্দময় করে তুলবে, দেখিয়ে দেবে তাকে চিরাভিপ্সীত সুন্দরকে পাবার পন্থা। আনন্দ-লোকের সোনার সিঁড়িপথে যে মানুষকে প্রতিভার আলোকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে তার জীবন হবে অখণ্ড কাব্য, সুরসুন্দর, সাধনায় একনিষ্ঠ।

ফ্রেড্ এষ্টেয়ার প্রথমে ছবি এঁকে তারপর নৃত্য-কুশল ও চপল পা চালায়। 'রবার্টা' তার নূতন ছবি। রূপ নাই বা তোমার থাকল ফ্রেড্, গুণে তুমি সকলের চিত্তজয় করেছ।

কিন্তু এই সব ভাবে আচ্ছন্ন কথা ছেড়ে দিলে কি দেখতে পাই তাই বলি। আমাদের দেশে শিল্পী আর মজুরে কোনো তফাৎ নেই। মজুর জলের দরে তার শক্তি বিকিয়ে দিয়ে নিঃস্ব হচ্ছে আর শিল্পী তার প্রতিভাকে পরিপুষ্ট করার পরিবর্ত্তে নামমাত্র মূল্যে অপস্রিয়মান প্রতিভাকে বিলিয়ে দিচ্ছে। যে প্রাচুর্য্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থাকলে তার প্রতিভায় জগৎ স্তম্ভিত হতে পারতো, বাজারে প্রতিভাকে সে দাম দিতে কেউ রাজী নয়। অর্থ দিতে পারুক আর নাই পারুক অনাহারশীর্ণ প্রতিভা থেকে ধনিকরা তার সবটুকু রস নিঙড়ে নেয়। শিল্পী যেদিন প্রতিভার বিনিময়ে অর্থের সন্ধানে প্রবৃত্ত হোল সেদিন থেকেই ধরে তার প্রতিভায় যক্ষ্মা। আমাদের দেশে শিল্পীর ব্যক্তিগত
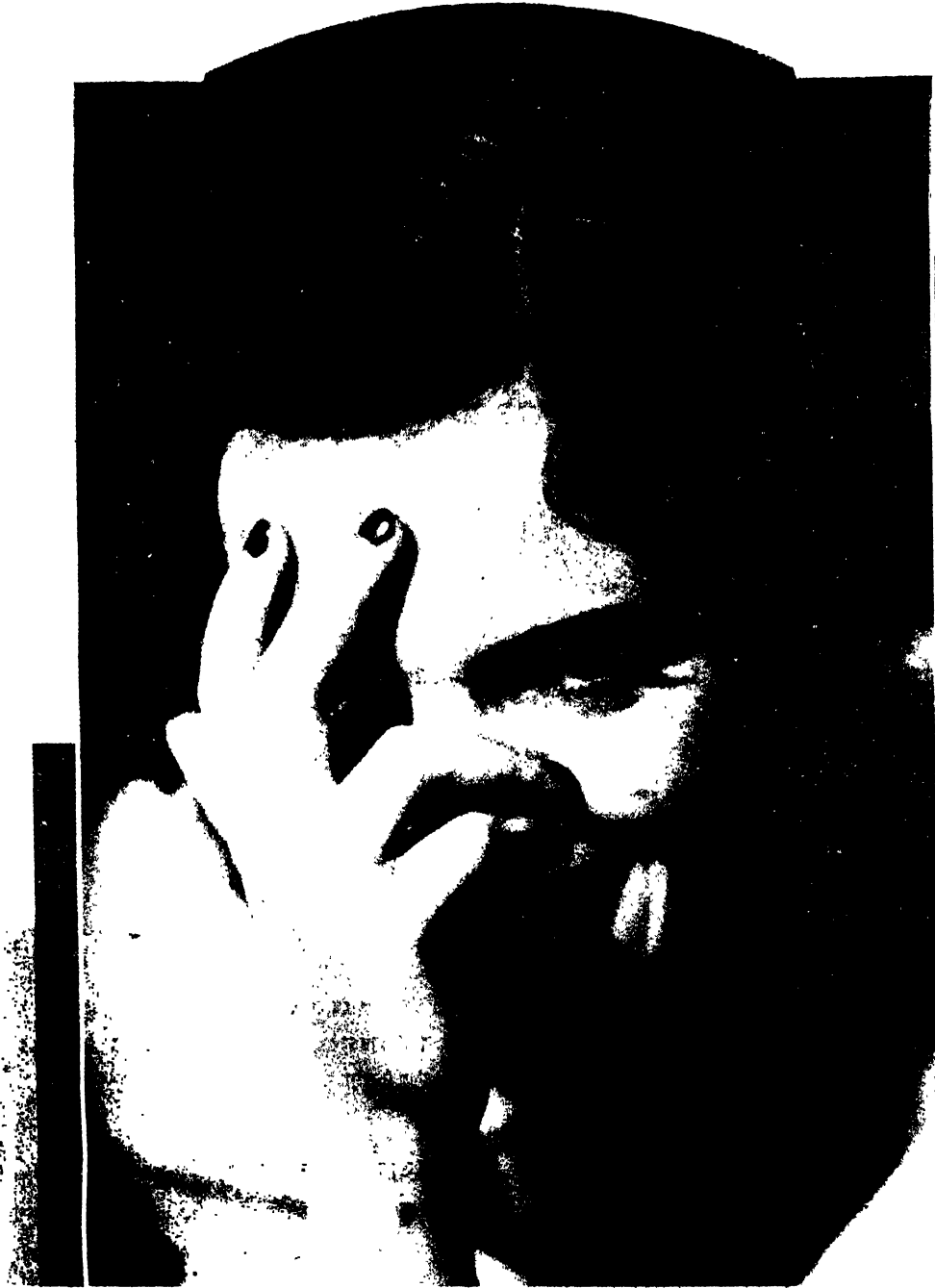
পাঠকরা তোমায় ভাল করে দেখতে চাইছেন, পাট কেল্‌টন্, আর তুমি মুখে হাত চাপা দিয়ে রয়েছ ! সত্যি, ভাল হচ্ছে না কিন্তু পাট
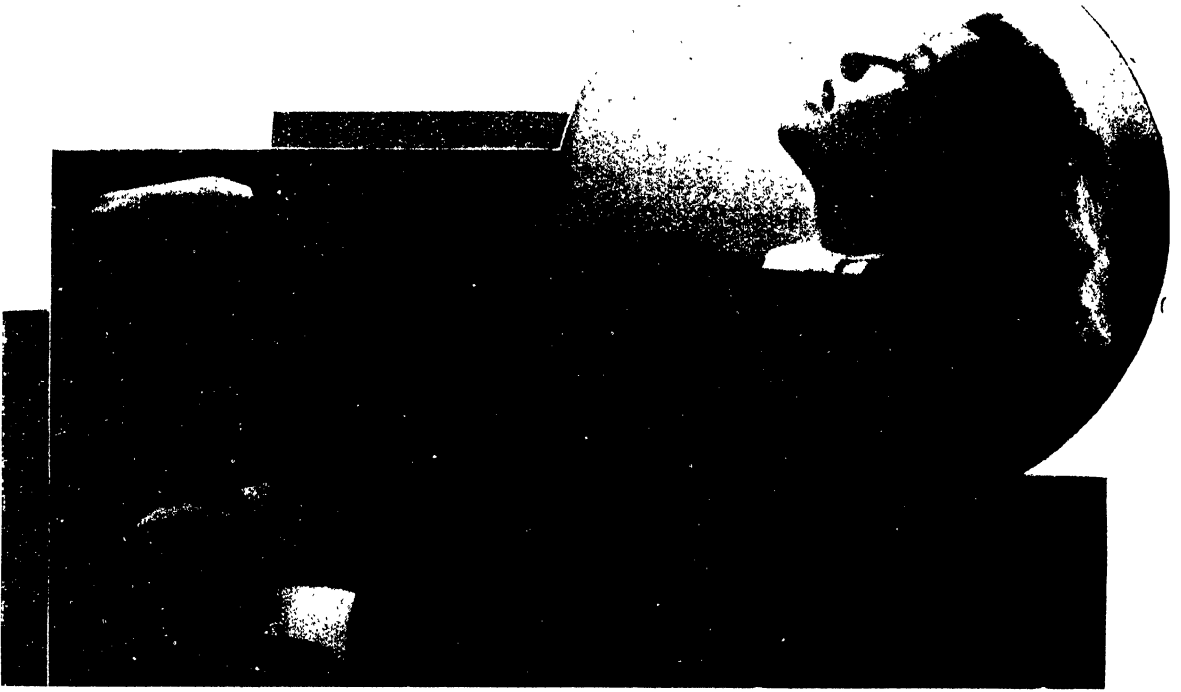
পর পর দুবার কেন বারো বার ক্যাথরিন্ হেপ্‌বার্ণের ছবি দিলে কিছুই বিসদৃশ হবে না, এত চমৎকার আর্টিষ্ট সে। 'লিট্‌ল মিনিষ্টার' আমরা অল্পদিনেই দেখবো। হেপ্‌বার্ণের নূতন ছবি হবে স্যার জেমস্ ব্যারীরই 'কোয়ালিটী ষ্ট্রীট' গল্পাবলম্বনে।

বিচ্যুতিও অসংখ্য। শিক্ষা ও সভ্যতার পালিশ তাদের মধ্যে ক'জনের আছে তাই ভাবি। প্রতিভা যাদের প্রতিদিন অপমৃত্যুর পথে এগিয়ে চলেছে তাদের আত্মম্ভরিতা দেখে বিস্মিত হতে হয়। আমাদের সমাজের তারা কেউ নয়—তাদের এককত্বের জগৎ আত্মম্ভরিতার দুর্লঙ্ঘ্য প্রাকার-পরিক্ষিপ্ত। তাদের জৈব জীবনেও সংক্রামিত হয়েছে অভিনয়—তাদের হালচাল যেন বলে বেড়ায়, ওগো, আমরা ষ্টেজে বা ছবিতে প্লে করি। আমরা সাধারণ মানুষেরা তাদের থেকে বহু ব্যবহিত। কিন্তু আরো দুঃখের কথা এই যে শিল্পীরা আমাদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলেও তাদের নিজেদের কোনো সমাজ নেই, সকলেই স্ব স্ব প্রধান ও একান্ত একক। পারিবারিক জীবন সকলের আছে এবং সকলের কাম্য। কিন্তু আমাদের শিল্পীদের মধ্যে অল্প কয়েকজনই পারিবারিক সুখ শান্তি ভোগ করে থাকে। সংসারের বাঁধন ও বোঝা তারা বহন করতে চায় না। যে ষ্টাইলে তারা জীবন যাপন করে তা বজায় রাখতে হলে অর্থ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজন এবং এই অর্থ সংগ্রহের আশায় পট ও মঞ্চ উভয় ক্ষেত্রেই যোগদান করতে হয় কিন্তু উদ্দেশ্য শেষ পর্য্যন্ত বিশেষ সিদ্ধ হয় না। ওদিকে অতিরিক্ত পরিশ্রম, রাত্রি জাগরণ ইত্যাদি নানা অমিতাচারের ফলে প্রতিভার পরিশিষ্ট কিছুই থাকতে পারে না। অত্যাচারে জর্জ্জর দেহ ও অমিতাচারে অবসন্ন মনে প্রফুল্লতা আনতে শিল্পীরা যে পন্থা অবলম্বন করেছে তার অনুসরণে তারা আজ ধ্বংসের পথে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে। আমাদের কি বলে দিতে হবে যে তাদের রসসৃষ্টির নামে যা হয়ে থাকে তা নিতান্ত ছেলেখেলা? সুন্দর ও সংযত, সুস্থ ও শান্তিময় জীবন তাদের মধ্যে

করুন যাপন করে? আমরা শিল্পীদের সঙ্ঘবদ্ধ ও আদর্শনিষ্ঠ হতে বলি, আমরা বলি প্রতিভার উপযুক্ত সম্মান ও মূল্য আদায় করতে। ঈশ্বর তাদের যে প্রতিভা দিয়েছেন তাকে বার বার অপমান করবার সুযোগ দান করতে নিষেধ করি। এই যে আমাদের পীঠ ও পটে দর্শককে কল্পনার সাহায্যে চরিত্রকে সর্ব্বাঙ্গীন উপলব্ধি করতে হয়, এই যে আমাদের জঘন্য অভিনয়ের standard এর মূলে আছে শিল্পীদের প্রতিভার দাস্য ও পরস্পর অসহযোগ এবং ধনিকদের to squeeze maximum out of minimum লক্ষ্য। আমরা বিশ্বাস করি না যে লোকে ভাল জিনিষ হলেও তাকে উপযুক্ত আর্থিক সম্মান দেয় না। বিদেশী চিত্রনির্ম্মাতা Metro Goldwin Mayer ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্ কাগজের পুরাণো বিজ্ঞাপনের অফিস ভেঙে এক ছবিঘর করতে এগার লক্ষ টাকা ব্যয় করেছে: তারা জানে অভূতপূর্ব্ব এবং অবিসম্বাদিত শ্রেষ্ঠ কিছু করতে পারলে investment এ আশাতীত return পাওয়া যায়। উদয়শঙ্করের কথা ধরুন, টিকিটের মূল্য কম নয় কিন্তু একটিও সীট্ পড়তে পায় কি? বাৎসরিক একবার বা দীর্ঘকাল অন্তর শঙ্করের নাচের আসর বসে বলে টিকিট পড়তে পায় না, কালান্তরের এই যুক্তি অনেকে দিতে পারেন। বেশ, তবে নিউ এম্পায়ারের কথা ধরা যাক্। তাদের আসনের মূল্য সবচেয়ে বেশী অথচ বিশ্বব্যাপী আর্থিক সঙ্কটের দিনেও তারা পয়সা পেয়ে আসছে সবচেয়ে বেশী। বলা যেতে পারে সাহেবরা পয়সা দেয়। কিন্তু ভাল জিনিষ দিলে সাহেব কেন, লাটসাহেবের কাছ থেকেও আমরা পয়সা আদায় করতে পারি। আমাদের দেশেই তারা খায় দায় থাকে রোজগার করে, ভাল হলে আমাদের জিনিষ নিতে কোনো কালেই তারা দ্বিধা করতে পারে না। থাক উপস্থিত আর্থিক প্রসঙ্গের জটিলতা।

এদেশে ধনিকের কাছে শিল্পী আর মজুরে বিশেষ কোনো তফাৎ নেই। বাঙালীরা যাও বা একটু মনস্বীকে মৌখিক খাতির করে অবাঙালী শিল্পীকে মজুর ছাড়া কিছুই মনে করে না। তারা মনে করে আমি তোমায় পয়সা দেব, তুমি দেবে কাজ—কেবল আর্থিক যোগসূত্র, প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক। কিন্তু হায়রে শিল্পীর মনই যে সর্ব্বস্ব তা কেউ বোঝে না! স্পর্শাতুর মন অল্পেই ভেঙে পড়ে অল্পেই গগনচারী হয়ে ওঠে। দুর্ব্যবহারে আর দাসত্বে, প্রভুত্বে আর পাষাণ কঠোরতায় রসের উৎস Sensitive মন callous হয়ে গেছে। শিল্পীরা—আদরে, আপ্যায়নে ও প্রাচুর্য্যে থেকে যাদের রসসৃষ্টি করবার কথা—নমস্কারেরও প্রতিদান পায় না অবাঙালী ধনিকের কাছ থেকে। কোনো শিল্পী যদি বলেন "Why shall I throw my good-morning in the air?" আমরা বলি "Why?" অথচ হাসির কথা এই যে ভিতরে এত দুর্ব্যবহার পেলেও শিল্পীদের পাঁচজন সাধারণ মানুষের সাথে আলাপ করাও পোষায় না, ভ্যানিটি সে পথ জুড়ে বসে আছে। আমরা ভাবি এই প্রবঞ্চনার বোঝা বয়ে গ্লানিপঙ্কিল চিত্তে কতদিন বাইরের ঠাট আর হাসি বজায় রাখা যেতে পারে!

নটী সম্প্রদায়কে আমরা বিশেষ দোষ দিই না। যেখান থেকে তাদের উৎপত্তি ও অভ্যুদয় এবং যে পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর মাঝে তাদের দিন কাটে তাতে তারা যে অভিনয় করতে পারে এজন্যই তাদের ধন্যবাদ দিই। শিক্ষা ও সংযম তাদের কাছ থেকে আমরা আশা করি না তাই তাদের অল্প কাজ দেখে ধন্যবাদ দিই। পাদপ্রদীপের পত্তনের যুগে না হয় পল্লীবিশেষ থেকে মেয়ে সংগ্রহ করে অভিনয় করানো হোত কিন্তু সে যুগ আজ ত' নেই; তবে কেন আর্টিষ্টের জন্য পল্লীবিশেষের শরণাপন্ন হতে হবে? অভিনয় আজ ঘৃণাস্পদ নয়, থিয়েটারকে আজ আর বখাটেদের আড্ডাখানা বলা চলে না আর মেয়েরাও আজ যথেষ্ট স্বাধীন। সুতরাং শিক্ষা দীক্ষা ও সংযম যাদের আছে এমন মেয়েদের অভিনয় ক্ষেত্রে আনতে কোনো যুক্তিসহ বাধাই দেখি না। ছেলেদের মধ্যে কয়েকজন 'সাধারণ মানুষ' আছে এবং এই সব শিক্ষিত ও নিয়মানুগত ছেলেদের সঙ্গে অভিনয়োৎকর্ষের জন্য আনতে হবে ভদ্র মেয়েদের। কিন্তু নারীত্বের অপমান আমাদের দেশ থেকে একেবারে চলে যায় নি। তাই আজো রয়েছে পতিতাপল্লী এবং তাই মেয়েদের পক্ষে অপমানের ভয় অন্তর্হিত না হলে অভিনয়বৃত্তিকে বরণ করে নেওয়া সম্ভব নয়। এজন্য পুরুষের সহযোগিতা ও আন্তরিকতা একান্ত প্রয়োজন।

আমরা বিশ্বাস করি জন্ ব্যারীমোর এলিজাবেথ বার্গনার প্রভৃতির মত আর্টিষ্ট আমাদের দেশেও অনেকের মাঝে ঘুমিয়ে আছে, সুযোগের সোনার কাঠির ছোঁয়া পেলেই জেগে উঠবে এবং আশা করি বার্গনার বা ব্যারীমোরের চেয়ে বড় আর্টিষ্ট বাঙালীর মাঝেই দেখা দেবে। শিল্পীর জীবন সম্পর্কে যে সব অপ্রিয় এবং সাধারণতঃ সত্য আমরা বলেছি এজন্য শিল্পের উন্নতিকামী আশা ও আস্থাবান্ মাত্রেই আমাদের ক্ষমা করবেন। আমরা চাই যে শিল্পী সুস্থ ও সুন্দর হয়ে অসামান্য যশোলাভ করে আমাদের আনন্দ বিবর্দ্ধন করুন।

নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর

'বিচিত্রা' যখন পাঠকদের হাতে পৌছাবে তখন উদয়-শঙ্করের নাচের আসর স্থানীয় এম্পায়ার থিয়েটারে বসে গেছে। ১৬ই থেকে ২২শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত শঙ্কর নাচ দেখাবেন। ইচ্ছা

ছিল এবারে শঙ্করের সাথে তাঁর আবিষ্কর্ত্তা হরেন ঘোষের সংযোগের কাহিনী বলবো কিন্তু নানা কারণে তা আর হয়ে উঠলো না। রসিক মাত্রেই শঙ্করের নাচ দেখতে ভুলবেন না এবং যাঁরা একবার দেখেছেন তারা ত এবারে যে-কোন প্রকারেই হোক স্থান সংগ্রহ করবেন। প্রতিভার আর্থিক মূল্য এদেশে যদি কেউ আদায় করতে জানে তবে সেই একমাত্র লোক শঙ্কর, ষোলো আনাই যে শিল্পী। রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে ও কবিত্বকে সারা জগতের মানুষ বন্দনা করেছে, বাঙালীর ছেলে শঙ্করকেও বারবার বিশ্ব করেছে অভিনন্দিত তার রসসৃষ্টির গুণে মুগ্ধ হয়ে। আমরা হৃদয়ানন্দকর শঙ্করের অধিকতর সাফল্য ও অখণ্ড আয়ু কামনা করি।

বেটি গ্রেব্‌ল্ অবশ্য তারকা বা নামজাদা কেউ নয় তবে ওর 'গে ডিভর্সি'র নাচ আমাদের ভাল লেগেছিল। আর তাছাড়া 'বিচিত্রা'র পাঠকদের সামনে দাঁড়াবার মত বেটি সেজেছেও ভাল, হাসছেও মিষ্ট যদিও তা থেকে প্রথম পরিচয়ের জড়তা সম্পূর্ণ চলে যায় নি।

'বিজলী'র উদ্বোধন ও প্রসঙ্গতঃ

গত ৮ই মার্চ্চ শুক্রবার, 'ছবি-ঘরের' মালিক হরিপ্রিয় পালের ভবানীপুরস্থ চিত্রগৃহ, 'বিজলীর' উদ্বোধন হয়ে গেল। শ্রীযুত জে, সি, মুখার্জ্জী সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন এবং মিসেস মুখার্জ্জী পটের আবরণ উন্মোচন করেন। চিত্র-নির্ম্মাতা প্রেক্ষাগৃহের মালিক, চিত্রপরিবেশক সকলে ত ছিলেনই কিন্তু সাংবাদিক, সাহিত্যিক, খেলোয়াড়, করপোরেশনের লোক, পুলিশের লোক কে আসতে বাকী ছিলেন তাই ভাবি। প্রচুর জলযোগের ব্যবস্থা হয়েছিল এবং বাজী পুড়েছিল বহুক্ষণ। সাহিত্যিকদের কিন্তু ভীষণ একতা দেখলাম। শরৎচন্দ্র, 'বিচিত্রা'-সম্পাদক, নরেন দেব, বসন্ত চট্টোপাধ্যায়, গিরিজা বসু ও প্রভাবতী দেবী সকলে ছোট্ট একটি দল পাকিয়ে একত্র বসেছিলেন।

'বিজলী'র উদ্বোধন শেষে ফেরবার পথে মাঠের মাঝে নেমে একাই আস্তে আস্তে আসছিলাম। পার্কষ্ট্রীটের ঘড়িতে দেখি ন'টা বেজে গেছে। পাশে হল্ এণ্ড এণ্ডারসনের বিশাল বিপনি নিস্তব্ধ। কি জানি কেন আমাদের পাড়ার ছোট্ট মুদিখানার কথা মনে পড়লো। কত প্রভেদ এদের দুজনের মাঝে। ঠিক এমনি প্রভেদ আমাদের ষ্টুডিও আর ওদেশের ষ্টুডিওর মাঝে। আমরা সবাই খেলাঘরের মাঝে 'বৎসরের শ্রেষ্ঠতম ছবি' তুলতে ব্যস্ত থাকি। পাঁচ কসবার আর ভেল্কি দেখাবার ভাবনায় আমাদের ঘুম হয় না। ওদিকে ওরা India Speaks তুলে সারা জগতে আমাদের কলঙ্কিত করে দেখায়। 'আত্মবৎ মন্যতে জগৎ' খুব সত্য কথা, কিন্তু এতে দোষস্খালন হয় না। আমরা যীশুর মত গাল বাড়িয়ে

দুঃখ হয় য়্যান্ হার্ডিং আমাদের দেশে তুমি সুবিধা করতে পারছো না। বলতে পারি না Fountain Biography of a Bachelor Girl ও Enchanted Aprilএ আমাদের দেশে তোমার প্রতিষ্ঠা হবে কিনা ; হবে হলেই আমরা সুখী হবো কারণ তোমার গুণপনার পরিচয় আমরা পেয়েছি।

ষ্টুডিও খেলাঘরের সামিল। চূড়ান্ত বিচার হয়ে গেলে পাকুড় বা ভাওয়াল মামলার অভূতপূর্ব্ব Mysterious Crime thrillerগুলি কোনো ষ্টুডিও ইংরাজীতে তুলে সারা জগতের চিত্রব্যবসায়ে ভারতকে প্রতিষ্ঠিত করবেন বলে আশা হয় না। আমেরিকা হলে চিত্রনির্ম্মাতাদের কাছে এসব ব্যাপার কত লোভনীয় না হোত—সামান্য ব্যাপার নিয়ে ওরা An American Tragedyর মত ছবি তুলে থাকে।

চিত্র পরিচয়—ছোট্ট মাস ফেব্রুয়ারী কিন্তু চিত্রসম্পদে সে কার চেয়ে হীন নয়। গত মাসে গড়ে দিনে একটী ছবি মুক্তি লাভ করেছে, এ ছাড়া র্যাশিয়ান্ ব্যালের পক্ষকাল এবং লণ্ডন মিউজিকাল্ কোম্পানীর সপ্তাহব্যাপি আসর বসেছিল। ২৮ খানি ছবির মধ্যে একখানি বাংলা, নাম 'সত্যপথে'। আমাদের মতে (ক) শ্রেণীর ছবি হবে অসাধারণ, (খ) সুন্দর, (গ) উপভোগ্য এবং (ঘ) সাধারণ। (ছ) শ্রেণীর ছবি ছেলেরাও দেখতে পারে।

গ্রেট্ এক্‌স্‌পেক্‌টেশন্‌স্—(ক) ও (ছ) ডিকেন্সের গল্পের মায়াজাল পটেও সকলের মনকে বাঁধে। মূল গ্রন্থের প্রায় সকল ব্যাপারই পূর্ব্ববৎ রেখে কত চমৎকার ছবি হতে পারে তা আর একবার দেখা গেল। বিস্ময়ের বিষয় এই যে যে যুগে Mae Westএর Raw Sexstuff সব চেয়ে বেশি আদর পায় সে যুগেও আমরা সেকেলে 'নীরস' প্রেম ও সন্তান বাৎসল্যের কাহিনী দেখে প্রশংসায় মূক হয়ে গেছি। হেন্‌রি হালের ত্রিবিধ রূপসজ্জা ও অভিনয় যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচায়ক। ফ্লোরেন্স রীড্, জর্জ্জ ব্রেকষ্টোন্ (শিশু পিপ্) ও জেন্ ওয়াটের অভিনয় সুন্দর হয়েছে।

রয়েছি। Second Paradise প্রভৃতি বহু ভ্রমণ বিষয়ক ছবিতে আমাদের চপেটাঘাত করা হয়েছে কিন্তু তবু আমরা ছোট ছবি তুলে ওদের দেখাই না যে তোমাদের সভ্যতার চড়া পালিশ না থাকলেও অন্তর সম্পদে আমরা কারো চেয়ে হীন নেই। আমাদের জাতীয়তা, আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের দেব দ্বিজে অনুরাগ যখন জগতের সামনে বীভৎসরূপে ফুটে উঠছে তখন আমরা তুলি 'বৎসরের শ্রেষ্ঠতম বাণীচিত্র'; করি প্যানপেনে প্রেমের ছায়ারূপ। শুধু নিজেদের সম্পদ দেখিয়ে ক্ষান্ত হলে চলবে না, দেখাতে হবে ওদের পাশ্চাত্য সভ্যতার উজ্জ্বল ও সাড়ম্বর পরিচ্ছদের মাঝে লুকিয়ে আছে হিংস্র লালসালোলুপ পশু মন। পাল্টা জবাব দেওয়া দূরে থাকুক ছোট ছবি তুলে দোষমুক্ত হবার চেষ্টাও আমাদের কেউ করবে না। যথার্থই আমাদের

ফিলিপ্‌ হোম্‌স্‌কে (যুবক পিপ্‌) তেমন মনে ধরে না। অন্যান্য সব ভূমিকাই সু-অভিনীত। প্রযোজক ষ্টুয়ার্ট ওয়াকারকে আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি।

বুলডগ্‌ ড্রামণ্ড ষ্ট্রাইক্‌স্‌ ব্যাক্‌ (খ) ও (ছ)—এই ছবিটীর সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য জিনিষ হচ্ছে রোণাল্‌ড্‌ কোল্‌ম্যানের অনবদ্য অভিনয়—দর্শকের সর্ব্বক্ষণ মনে হয় কোল্‌ম্যান্‌ যেন চোখের সামনে সশরীরে দাঁড়িয়ে। ছবিটীর উপভোগ্যতা বিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছে চার্লস্‌ বাটারওয়ার্থের হাসাবার গুণে। সি অব্রে স্মিথ্‌, উনা মার্কেল্‌ প্রভৃতির কাছ থেকেও হাসির খোরাক মিলেছে প্রচুর। লরেটা ইয়ং ও ওয়ার্ণার ওল্যাণ্ডের অভিনয় বেশ স্বাভাবিক হয়েছে। রোমাঞ্চের সাথে প্রাণভরা হাসিকে সুসঙ্গত করার ব্যাপারে (blending এ) পরিচয় পাওয়া যায় treatment এর পরমোৎকর্ষের। প্রয়োগশিল্পী রয় ডেল্‌ রুথ্‌ সুন্দর কাজ করেছেন।

ফার্ষ্ট ওয়ার্ল্ড্‌ ওয়ার (ক) ও (চ)—এটি ষ্টুডিয়োর তোলা ছবি নয় সুতরাং সত্য বলতে শ্রেণীবিভাগের বহির্ভূত। বিগত মহাযুদ্ধের ছবি, ফটোগ্রাফ ও ফিল্ম প্রভৃতি নানাস্থান থেকে সংগ্রহ করে একত্রে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এতে পারম্পর্য্য রক্ষা হতে পারে না কিন্তু সংগ্রাহক লরেন্স ষ্টালিংসের ব্যাখ্যা সে অভাব পূরণ করেছে। মানুষ কত নিষ্করুণ ও বর্ব্বর হতে পারে, মিথ্যা দেশাত্মবোধের বিষ নিরীহ প্রজায় অনুপ্রবিষ্ট করে স্বার্থাহত জননায়করা মানুষের কত বড় শত্রুতা সাধন করতে পারে—তারই পরিচয় মিলবে এই বীভৎস ও আনন্দকর ছবিতে। 'দি ওয়ার্ল্ড্‌ মুভস্‌ অন্‌' 'মেরি গ্যালাণ্ট'ও আলোচ্য ছবিতে প্রমাণ হয়ে গেল ভাবী যুদ্ধ ও শান্তি নিয়ে ফক্‌স্‌ ফিল্ম সব চেয়ে বেশি মাথা ঘামায়। এই শিক্ষাপ্রদ ছবি মানুষ মাত্রেরই দেখা কর্ত্তব্য।

দি লষ্ট পেট্রল্‌ (খ) ও (ছ)—সাহারা মরুভূমিতে অদৃশ্য শত্রুর আক্রমণে এক সৈন্যদলের একে একে নায়ক ভিন্ন সকলেই মারা পড়লো—ছবির আখ্যানভাগ বলতে ত' এই কিন্তু জন্‌ ফোর্ডের প্রয়োগ কৃতিত্বে এবং নটদের অভিনয় গুণে অসীম মরুতে মৃত্যুযাত্রী পেট্রলের কাহিনীতে প্রাণ কেঁদে উঠে। শত্রু অদৃশ্য থেকে দিনের পর দিন পেট্রলের লোকদের মারছে, এ অবস্থায় কেউ যদি অদৃশ্যশত্রুকে হত্যা করবার এবং দেখবার জন্য পাগল হয় তাতে বৈচিত্র্য কিছুই নেই। ধর্ম্মোন্মত্ত সৈনিকের ভূমিকায় বরিস্‌ কার্লফের অভিনয় অত্যুত্তম হয়েছে। দলের অধিনায়করূপে ভিক্টর ম্যাক্‌লাগ্‌লেন্‌কে আমরা ভুলতে পারবো না। সব কটী চরিত্রই জীবন্ত।

১৬। **নাইট্‌স্‌ ইন্‌ হলিউড্‌** (খ)—ভুয়ো সিনেমার স্কুল খুলে পয়সা লোটা নিয়ে গল্প। আগাগোড়া ব্যাপারটী অসম্ভব হাস্যোদ্দীপক। জেমস্‌ ডানের অভিনয় হয়েছে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। যাঁরা যে-কোনো প্রকার ভূমিকায় আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে পারেন—জেম্‌স্‌ ডান্‌ তাঁদের অন্যতম। এলিস্‌ ফের গান ও অভিনয় বিশেষ মনোজ্ঞ। মিচেল্‌ ও ডুরাণ্ট ছায়াজগতের মাণিকজোড় হাস্যরসাভিনেতা বলে উত্তরোত্তর নাম করবে। কাজ আদায় করবার বেলা বেশ মধুরভাষী অথচ আসলে একটী পাকা জুয়াচোরকে চমৎকার ফুটিয়েছেন ডান্‌ ব্র্যাড্‌ফোর্ড। জর্জ্জ মার্শাল্‌ প্রযোজনায় যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

মিসেস্ উইগস্ অব্ দি ক্যাবেজ্ প্যাচ (ক) ও (চ)—দরিদ্রের নিত্য সংগ্রাম ও ছোটখাটো সুখ দুঃখের মাঝে যে কত বড় প্রাণের আবেদন লুকানো থাকতে পারে তা এই ছবিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নাম ভূমিকায় পলিন্ লর্ড এবং অন্যান্য ভূমিকায় জ্যাসু পিট্‌স্, ডব্লু সি ফিল্ডস্, কেণ্ট টেলর, ইভ্‌লিন্ ভেনাবল্ প্রভৃতির অভিনয় চরিত্রানুগ হয়েছে। ইউরোপিনার অংশে ছোট্ট মেয়ে ভার্জিনিয়া ওয়েল্ডার ভারি মিষ্ট অভিনয় করেছে। টীম্ ওয়ার্ক চমৎকার। নরম্যান্ টাউরগ্ এই sweet ও tender theme এর সুষ্ঠু পরিচালনায় পূর্বখ্যাতি বৰ্দ্ধিত করলেন।

হোয়াট্ এভ্রি ওম্যান্ নোজ্ (খ) ও (চ)—স্যার জেম্‌স্ ব্যারির লেখা গল্পটী আরম্ভ হয়েছে একটু অস্বাভাবিক ভাবে। তবু হাসির মধ্য দিয়ে যে গল্পটী তিনি বলেছেন তাতে প্রাণের কথাই ফুটে উঠেছে সুন্দর ভাবে। প্রধানাংশে হেলেন্ হেইজের অভিনয় হয়েছে অত্যন্ত সুন্দর ম্যাগির ভূমিকাকে এমন সুন্দর রূপ অপর কেউ দিতে পারতো না। অন্যান্য অংশে ব্রায়ান্ আহেরেন্, ডাডলে ডিগ্‌স্, ডেভিড্ টরেন্স, ম্যাজ্ ইভান্স প্রভৃতির অভিনয় বেশ স্বাভাবিক হয়েছে।

আই গিভ্ মাই লাভ্ (খ)—উইনি গিব্‌সন্ এ যাবৎকাল তাঁর অভিনীত চরিত্রগুলির দরুণ আমাদের মনে রেখাপাত করতে পারেন নি। কিন্তু এবার তাঁকে আমরা হৃদয়ে বরণ করে নিয়েছি—রূপসজ্জায় ও অভিনয়ে তিনি উচ্চাঙ্গের শিল্পকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। পল্ লুকাসের অভিনয় চিরদিনই খুব স্বাভাবিক ও মনোজ্ঞ। এরিক্ লিণ্ডেন্ ও ট্যাড্ আলেকজাণ্ডারের অভিনয় ভাল হলেও এনিটা লুইসির অভিনয় তেমন মনে ধরে না।

ইভলিন্ প্রেণ্টিস্ (খ)—উইলিয়াম্ পাওয়েল্ এবং মার্ণায়ের অভিনয়গুণে ছবিটী পরম রমণীয় হয়ে উঠেছে—এই দুজনের একত্র ছায়াবতরণ আমাদের একান্ত কাম্য। ছোট মেয়ে কোরা সিউ কলিন্স উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছে। অপরাপর আর্টিষ্টদের মধ্যে ইসাবেল্ জুয়েল্ ও উনা মার্কেলের আমরা প্রশংসা করি। আদালত দৃশ্যটী খুব জমে উঠেছে। উইলিয়াম্‌কে হাওয়ার্ড তাঁর খ্যাতিমত প্রযোজনা করেছেন।

লাভ্ টাইম্ (খ) ও (চ)—সঙ্গীত রচয়িতা ফ্রান্‌জ্ স্যুবার্টের সঙ্গীতমধুর যৌবনকাহিনী। প্রধানাংশে নিল্‌স্ এস্‌থারের অভিনয় অতি সুন্দর হয়েছে কিন্তু সব চেয়ে চমৎকার অভিনয় হয়েছে নায়িকার অংশে প্যাট প্যাটারসনের। এই নির্দ্দোষ প্রেমের কাহিনীতে হাস্যরস আছে প্রচুর। হ্যারি গ্রীন্, হার্বার্ট মুণ্ডিন্ এবং স্যুবার্টের অভিনয়ে প্রচুর হাসা গেছে।

দি গে ব্রাইড (খ)—আখ্যায়িকাকার ফ্রান্সিস্ এলান্ কো দস্যুদলের কার্য্যাবলী নিঙড়ে অজস্র হাস্যরস বার করেছেন। এই সব ভীষণ লোকদের নিয়ে প্রযোজক জ্যাক্ কন্‌ওয়ে এমন হাল্কাভাবে হাসি-খুসিভরা deal করেছেন যে ভদ্রলোকের প্রশংসা না করে পারা যায় না। কিন্তু সব চেয়ে চমৎকার জিনিষ হচ্ছে মেরির ভূমিকায় ক্যারল্ লোম্বার্ডের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা—এত হাসাতেও ক্যারল্ পারে!

ইমিটেশন্ অব্ লাইফ্ (খ)—প্রধানাংশে ক্লডেট্ কলবার্ট 'ইট্ হ্যাপ্‌ন্‌ড্ ওয়ান্ নাইটে'র চেয়ে ভাল অভিনয় করেনি। ওয়ারেন্ উইলিয়াম্ ও রচেল্ হাড্‌সনের ভূমিকা ত্রুটিতেও অভিনয়ের ক্ষমতানুপাতে সুযোগের অভাব। ফ্রেডি ওয়াশিংটনের তরুণী পিওলা আমাদের সবচেয়ে ভাল লেগেছে। লুই বিভার্সের অভিনয়ে ক্ষমতাময়ী মা জীবন্ত হয়ে উঠেছেন। নেড্ স্পার্কস্ বিশেষ উপভোগ্য অভিনয় করেছেন।

কক্ আইড্ ক্যাভেলিয়ার্স (খ)—মধ্য যুগের দুই বড় বিদ্যায় সিদ্ধহস্ত বুদ্ধিজীবীর কাহিনী। পুরুষবেশে ডরোথি লী এই দলে যোগ দিয়ে বাধালে গোলমাল কিন্তু তাকে তরুণী যখন জানা গেল তখন বার্ট তার প্রেমে পড়লো। ওদিকে থেল্‌মা টড্ ভূতপূর্ব্ব স্বামী ব্যারণকে ছেড়ে ভিড়লে রবার্টের সঙ্গে। শূয়ার শিকার দেখে আমাদের হাসির চোটে প্রাণান্ত হবার উপক্রম। প্রচুর হাসি ও হাল্কা নাচগানের উপভোগ্য ছবি।

ষ্টিঙ্গারি (গ) ও (ছ)—ছবিটী আসলে ছেলেদের উপযুক্ত করেই তোলা হয়েছে এবং এই কারণে বড়দের সর্ব্বত্র সমান ভাল লাগে না। আমরা যারা প্রযোজকপ্রবর উইলিয়াম্ ওয়েল্‌ম্যানের অধীনে 'সিমারণে'র অনুপম তারকাদ্বয় নূতন ছবিতে নামছে শুনে পুলকিত হয়েছিলাম, ছবি দেখে মোটেই তেমন আনন্দিত বোধ করছি না। যাই হোক, আইরিন্ ডানের অভিনয় বেশ ভালই—গানগুলি আরো চমৎকার।

লাইম্ হাউস্ ব্লুজ (গ)—'স্কারফেস্' দেখবার পর এসব দস্যু-কাহিনীর ছবিকে নিতান্ত tame affair মনে হয়। গল্পে হাস্যরসের নাম গন্ধ নেই কিন্তু তবু ছবি রোমাঞ্চকর হতে পারেনি। ও দেশের সমালোচকদের মতে জর্জ্জ রাফ্‌টের অভিনয় নাকি পড়ে যাচ্ছে কিন্তু আমরা ত' দেখলাম জর্জ্জ রাফ্‌টের অভিনয় বেশ ভালই। জীন্ পার্কার করেছে সবচেয়ে স্মরণীয় অভিনয়—আমরা এই নূতন তারকার'পরে অনেক আশা রাখি। এ্যানা মে ওয়াং এবং কেণ্ট টেলরের অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য। আলেকজেণ্ডার হলের প্রযোজনা যথাযোগ্য হয়েছে।

এছাড়া নিম্নলিখিত ছবিগুলিও আমাদের মতে (গ) শ্রেণীর:—দি আয়রণ ডিউক; মেরি ষ্টিভেন্স্ এম্. ডি এবং এ লেডি ইন্ ডেন্জার।

(ঘ) শ্রেণীর মধ্যে কয়েকটী নামজাদা নটনটীর ছবি আছে:—হোয়ার সিনার্স মিট্ (ক্লাইভ্ ব্রুক্ ও ডায়ানা উইনার্ড); লিট্ল্ মিস্টার (এড্ওয়ার্ড জি রবিন্সন্ ও ছোট ডগ্লাস্ ফেরায়ব্যাঙ্কস্), ষ্টুডেন্ট টুর (জিমি ডুরাণ্ট ও চার্লস্ বাটারওয়ার্থ); সিল্ক এক্স্প্রেস্ (নিল হ্যামিল্টন্) ইত্যাদি।

সত্যপথে—ম্যাডান্ থিয়েটার্সের বাংলা ছবি। গল্প ও প্রযোজনা—অমর চৌধুরী। গল্পের গলদ ও ভাষার ভুল যথেষ্ট; তবে কমিক সিচুয়েশন্গুলি বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। কালীভক্তি, পতিতাপালিতার একনিষ্ঠ প্রেম, নীতি ও ধর্ম্মের মহিমা প্রচার প্রভৃতি mass appeal-এর সব কটী উপাদান প্রচুর ও অসমঞ্জসভাবে চালানো হয়েছে। প্রারম্ভে যারা নায়ক-নায়িকা পরিশেষে তারা পার্শ্বচরিত্রে পরিণত হয়েছে। অমর চৌধুরী ধনপতিরূপে প্রচুর হাসিয়েছেন তবে স্থানে স্থানে তিনি ভাঁড়ামি সম্পূর্ণ পরিহার করতে পারেন নি। ডলি দত্তের অভিনয় স্বাভাবিক হয়েছে, শিক্ষিতা তরুণীরূপে শ্রীমতীকে মানায় ভাল। ধীরাজ ভট্টাচার্য্য আমাদের মনে রেখাপাত করতে সমর্থ হন নি। কার্ত্তিক রায় বিরক্তিকর অতি-অভিনয় করেছেন। গানগুলি এবং গায়ক তারা ভট্টাচার্য্য অনুল্লেখযোগ্য। নানা দোষ সত্ত্বেও প্রযোজনার মাঝে শিল্পি-মন উঁকিঝুঁকি মারে।

আনন্দ

প্রভাত হইতে খুঁজি সাঁজে

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

দিগন্ত প্রভাত হতে তোমারে খুঁজিয়া ফিরি আমি,
সূর্য্য ক্রমে ঢলে অস্তাচলে,
সন্ধ্যার গোধূলিরাগ ধীরে ধরাবক্ষে আসে নামি,
ছায়া তার ভাসে কালো জলে।
অনন্ত সঙ্গীত জাগে আমার এ কণ্ঠের মাঝারে
ভাষা তবু ফুটে উঠে নাই,
সকলই হারায়ে যায় কালো বিস্মৃতির পরপারে,
খুঁজিয়া কিছুই নাহি পাই।

অলক্ষ্যে অন্তরে মম কামনা কুসুম যবে ফুটে,
বাতাসেতে সুগন্ধ ছড়ায়,
দূর দিগন্তের বুকে সে সুবাস যায় চলে ছুটে;
হৃদ মোর স্বপনেতে মিলায়।
পর্ব্বতের ঘেরা সেই স্থান, কোথায় মানস সরোবর
তার কোন তীরে আছ তুমি,
লঙ্ঘিতে পারি না গিরি, কেমনেতে যাব গিরি'পর,—
চূড়া আছে মেঘলোক চুমি।

বাসনা অসীম নয়, সীমার মাঝারে মরে ঘুরে,
আকুলি তোমারে পেতে চায়;
কোথায় পাইব বন্ধু,—তুমি যাও দূরে—আরও দূরে,
দেখা তব মিলিবে কোথায়?
কল্পনাও ব্যর্থ হয়,—ফিরে আসে আহত হইয়া,
প্রভাত হইতে খুঁজি সাঁজে,
আমার চিত্তের মাঝে স্মৃতি শুধু আনিল বহিয়া;
তোমারে পাওয়ার সুর বাজে।

শ্রীবিনয় রায়চৌধুরী এম্ এ

স্পোর্টস্ ঃ

ইণ্টারভার্সিটি স্পোর্টস্—

ইডেন উদ্যানে পাঞ্জাব বনাম ক্যাল্‌কাটা ভার্সিটির পঞ্চম বার্ষিক স্পোর্টস্ উৎসবে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় আবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

ভার্সিটি স্পোর্টস্—এ লাহিড়ী (ক্যালকাটা) পোল ভল্টে ১০ ফিট্ ৪ ইঞ্চি লাফিয়ে প্রথম হয়েছেন।

কয়েক বছর ধরে নানা প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়ে এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ যুবকরা মিলনের ভিত্তি গড়ে তুলছে।

এবার নিয়ে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় পাঁচবার জয়ী হল। ক্যালকাটার বার বার পরাজয়ের গ্লানি, আমাদের, বিলেতে বাইনাচে কেম্ব্রিজের কাছে অক্সফোর্ডের দুর্দ্দশার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রতিযোগিতায় পাঞ্জাব নয়টিতে ও কলকাতা পাঁচটিতে জয়ী হয়েছে।

পাঞ্জাবের মেহেরচাঁদ আর ক্যালকাটার জেড এইচ খান সত্যিকার প্রশংসা পাবার যোগ্য।

বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে এইচ্ খান ১০০ গজ ও ২২০ গজ দৌড়ে জয়লাভ আর ১৯৩৪ সনে নিরঞ্জন সিংহের রেকর্ড ব্যর্থ করে হপ-ষ্টেপ এণ্ড জাম্প-এ মেহের চাঁদের নতুন ভারতীয় রেকর্ড স্থাপন করে সকলকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করেছিল।

প্রতিযোগিতার কয়েকটি ফল ঃ—

পোলভল্ট ঃ—১ম—এ লাহিড়ী (ক্যালকাটা), ২য়—পেয়ারী সিং (পাঞ্জাব)। উচ্চ—১০ ফুট ৪ ইঞ্চি।

অর্দ্ধ মাইল দৌড় ঃ—১ম—এইচ মেটা (পাঞ্জাব), ২য়—এল ব্রেকন্নার (ক্যালকাটা)। সময়—২ মিনিট ৭$\frac{1}{5}$ সেকেণ্ড।

২২০ গজ দৌড় ঃ—১ম—জেড্ এইচ খান (ক্যালকাটা), ২য়—মেহের চাঁদ (পাঞ্জাব)। সময়—২২$\frac{4}{5}$ সেকেণ্ড (ভারসিটি রেকর্ড)।

হপ-ষ্টেপ এণ্ড জাম্প :—১ম—মেহের চাঁদ (পাঞ্জাব), ২য়—জে ষ্টিল (ক্যালকাটা)

দৈর্ঘ্য—৪৬ ফুট ১০½ ইঞ্চি (ভারতীয় রেকর্ড)

বর্শা ছোঁড়া :—১ম—রেজাউল রহমন (পাঞ্জাব), ২য়—মেহের চাঁদ (পাঞ্জাব)

দুর—১৭৮ ফুট ৭ ইঞ্চি (ভারসিটি রেকর্ড)।

ইণ্টার স্কুল স্পোর্টস্ :—

মার্কাস স্কোয়ারে ইণ্ডিয়ান স্কুল স্পোর্টস্ এসোসিয়েশনের পরিচালনায় ইণ্টার স্কুল এথ্লেটিক্ চ্যাম্পিয়ন্সিপ প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে। বাংলার বিভিন্ন অংশ হতে ৪১ স্কুলের প্রায় ২৫০ শত প্রতিযোগি যোগদান করেছিল। স্পোর্টসের শেষে অলিম্পিক প্রথানুযায়ী 'মার্চ্চ পাষ্ট' হয়।

প্রতিযোগিতার কয়েকটি ফল :—

৭৫ গজ দৌড় (জুনিয়ার)—১ম, অনিল দত্ত (ক্যাথিড্রাল), ২য় ডি মুখার্জ্জি (খড়্গপুর)। সময়—৯⅘ সেকেণ্ড।

২২০ গজ দৌড় (সিনিয়র)—১ম, আক্রাম হোসেন (ক্যালঃ মাদ্রাসা), ২য়, কে খাঁ (খড়্গপুর)। সময়—২৪ সেকেণ্ড।

নিজস্ব চ্যাম্পিয়নসিপ (সিনিয়র)—আক্রাম হোসেন ৩১ পয়েণ্ট।

বেষ্টম্যান (জুনিয়র)—অনিল দত্ত ৩১ পয়েণ্ট।

টিম চ্যাম্পিয়নসিপ্—খড়্গপুর স্কুল (বি এন আর) ৬৩ পয়েণ্ট।

টিম চ্যাম্পিয়নসিপ্ (জুনিয়র)—ক্যাথিড্রাল স্কুল।

কালিঘাট স্পোর্টস :

নামজাদা স্পোর্টসের মধ্যে কালিঘাট স্পোর্টসের স্থান অতি উচ্চ। প্রতি বছরেই বিখ্যাত এথ্লেটিকরা এতে যোগদান করেন।

এ বছর ইডেন উদ্যানে এই স্পোর্টস-এ নিজস্ব (individual) চ্যাম্পিয়ন্সিপ হয়েছে, ই, বি, আর-এর এল, বেনহাম।

কালীঘাট স্পোর্টসে উঁচু বেড়া ১২০ গজ দৌড়ে এম. সার্টন্ প্রথম হয়েছেন।
ফটো—কাঞ্চন মুখার্জ্জী

বেনহাম long distance runner। কালিঘাট স্পোর্টস-এ এত বড় সম্মান ইনি প্রথম লাভ করলেন। অদ্বিতীয় অলিম্পিক এথ্লেটিক, এম সার্টন অতি সহজেই ১২০ গজ উঁচু বেড়া দৌড়ে প্রথম হন।

মেয়েদের মধ্যে ওয়াণ্ডারার্স ক্লাব-এর মিস্ মারজোরী স্মিথ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এ বছর প্রায় প্রতি স্পোর্টস-এ মেয়ে এথ্লেটিকরা বেশ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে। এ এক শুভ লক্ষণ।

কয়েকটি ফল :—

৮৬ গজ দৌড় (মেয়েদের)—

১ম—মিস্ এডওয়ার্ড (ওয়াণ্ডারার্স), ২য়—মিস লেডি (ওয়াণ্ডারার্স)। সময়—১৩½ সেকেণ্ড।
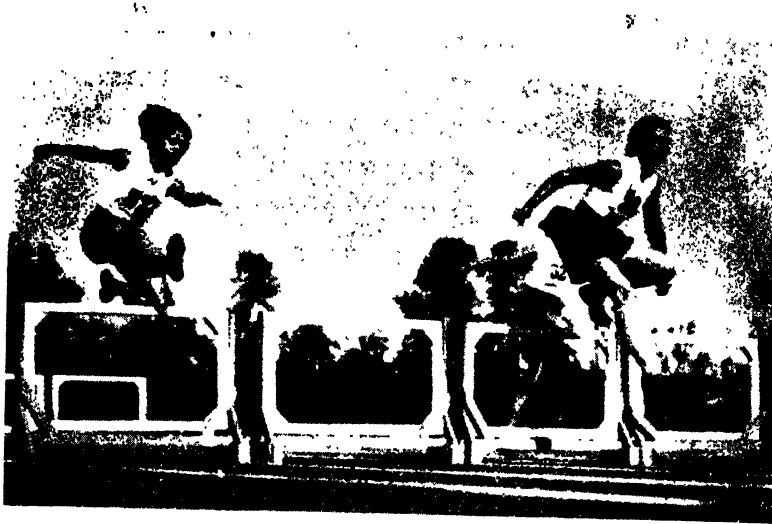
কালীঘাট স্পোর্টসের মেয়েদের নীচু বেড়া ৮৬ গজ দৌড়ে মিস্ বেটি এড্ওয়ার্ড্স্ (নং ৫৮) জি লেভিকে (নং ৫৭) হারিয়ে প্রথম হয়েছেন। ফটো—কাঞ্চন মুখাৰ্জ্জী

১৫০ গজ হ্যাণ্ডিক্যাপ দৌড় (মেয়েদের)—১ম, মিস প্রিচার্ড, ২ গজ (ব্লু ট্রায়ঙ্গল্), ২য়—মিস হার্ট ৮ গজ। (লামাটিনিয়ার), সময়—১৮½ সেকেণ্ড।

ইণ্টার স্কুল স্পোর্টস মেয়েদের :—

মার্কাস স্কোয়ারে আনন্দ মেলার তত্ত্বাবধানে মেয়েদের ইণ্টার স্কুল স্পোর্টস হয়ে গেছে। পূর্ব্বে কেবল ভারতীয় বালিকারাই এতে যোগদান করতে পারিত। এবার সকল সমাজের মেয়েদের যোগদানে অধিকার দেওয়াতে বহু ভারতীয় ও ইউরোপীয় প্রতিযোগি দেখা গিয়েছিল।

স্পোর্টসের শেষে আর কে মিশনের (ডায়মণ্ডহারবার) বালিকারা কুচকাওয়াজ করেছিল।

প্রতিযোগিতার কয়েটি ফল :—

৫০ গজ এগ্ এণ্ড স্পুন রেস—১ম, মিস্ মলিনা দত্ত (রামকৃষ্ণ মিশন গার্ল স্কুল), ২য় মিস্ আশা চাটার্জ্জি (বেথুন)।

১০০ গজ দৌড় (সাধারণ)—১ম, এইচ খাঁন (মেডিকাল), ২য়, ডি সিমসন। (আই এ ক্যাম্প)। সময়—১০ সেকেণ্ড।

১০০ গজ দৌড় (মেয়েদের)—১ম, মিস্ মারজোরী স্মিথ (ওয়াণ্ডারার্স) ২য়, মিস লেডি (ওয়াণ্ডারার্স)। সময়—১২ সেকেণ্ড (রেকর্ড)।

১ মাইল ভ্রমণ—১ম, বিমল দে (ন্যাশানল এস্ এ), ২য়—পি গাঙ্গুলী। (প্যারাগণ)। 2সময়—৭ মিনিট ১৭⅘ সেকেণ্ড।

অৰ্দ্ধ মাইল দৌড় (সাধারণ)—১ম, এল বেনহাম (ই বি আর), ২য়—এল্ সুকিয়াস। (আই এ ক্যাম্প)। সময়—২ মিনিট ৩½ সেকেণ্ড।

১২০ গজ হার্ডল দৌড় (সাধারণ) —১ম, এম সাটন (খড়গপুর)। সময়—১৫⅘ সেকেণ্ড।

৪৪০ গজ রিলে রেস্ (মেয়েদের) —বিজয়িনী দল ওয়াণ্ডারার্স। সময়—৫৫⅕ সেকেণ্ড।

আনন্দ মেলা স্পোর্টসে ৫০ গজ এগ্ এণ্ড স্পুণ রেস-এ মিস্ মলিনা দত্ত প্রথম হয়েছেন। ফটো—কাঞ্চন মুখাৰ্জ্জী

১০০ গজ দৌড় (এ গ্রুপ্)—১ম, মিস্ এস এজরা (জুয়িস গার্লস স্কুল) ২য়, মিস্ রমা চক্রবর্ত্তী। (বেথুন)। সময় ১৩½ সেকেণ্ড।

৫০ গজ নিড্ল রেস (বি গ্রুপ্)—১ম, মিস্ প্রীতিকণা চৌধুরী (বেথুন) ২য়, তপতী ভট্টাচার্য্যি (ব্রাহ্ম গার্ল স্কুল)।

৭৫ গজ ম্যাক্ রেস (সি গ্রুপ্)—১ম, মিস্ ইলা মুখার্জ্জি (ভিক্টোরিয়া স্কুল) ২য়, বেলা ঘোষ (মেট্রোপলিটন)।

'এ গ্রুপ্' চ্যাম্পিয়নসিপ্—জুয়িস্ গার্লস স্কুল, ৩১ পয়েন্ট।

'বি গ্রুপ্' চ্যাম্পিয়নসিপ্—বেথুন স্কুল ২৬ পয়েন্ট।

'সি গ্রুপ্' চ্যাম্পিয়নসিপ্—বেথুন স্কুল ২৭ পয়েন্ট।

বিলিয়ার্ড ঃ—

গ্র্যাণ্ড্ হোটেলের ব্লু রুমে অল ইণ্ডিয়া বিলিয়ার্ড টুর্নামেন্টের ফাইনালে ভূতপূর্ব্ব চ্যাম্পিয়ন এম বেগ্‌কে ১০৯৫—৭৮১ পয়েন্টে হারিয়ে প্রত্যুষ দেব এ বছরে

বিজয়া কুমার প্রত্যুষ দেব

চ্যাম্পিয়ন হলেন। এই নিয়ে তাঁর দুবার হল। ১৯৩২ সালেও ছিলেন। প্রতি বছরের ন্যায় এবারেও বিখ্যাত খেলোয়াড় সব যোগদান করেছিল। গত বছরের চ্যাম্পিয়ন রেঙ্গুনের বা সিঙ্ এবার সেমি-ফাইনাল গেমে প্রত্যুষের কাছে মাত্র ২ পয়েন্টের জন্য হেরে যায়।

ফাইনাল গেমে প্রত্যুষের খেলা হয়েছিল চমৎকার। জীবনে অতি অল্পদিনেই এমন সুন্দর নিখুঁত খেলা দেখিয়ে তোখড় বেগ্‌কে হারিয়ে দিয়ে বহু গণ্যমান্য দর্শকের কাছ থেকে এত উচ্চ প্রশংসা ও উৎসাহ পেয়েছেন। প্রত্যুষের কাছে বেগ্‌এর এই প্রথম পরাজয়। আগে বরাবর বেগ্‌ই জিতে আসত।

খেলার প্রথম সেসনে ২ ঘণ্টা গেমে প্রত্যুষের ৬১৫, বেগের ২৯৬ পয়েন্ট। দ্বিতীয় সেসনে ২ ঘণ্টা গেমের পর প্রত্যুষের সর্ব্বশুদ্ধ ১০৯৫ আর বেগের ৭৮১ পয়েন্ট।

এই টুর্ণামেন্টে বুকাননের highest break ১০৪কে ডিঙ্গিয়ে দেবের highest break উঠেছিল ১১২; প্রত্যুষ দেবের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি বাঙ্‌লার যুবসমাজের সম্মান। গুজব যে তিনি বিলেত যাচ্ছেন, ব্রিটিশ এম্পায়ার চ্যাম্পিয়নসিপ্ খেল্‌তে।

বিলিয়ার্ড জগতে লিন্‌ডরাম স্মিথ ডেভিসের পাশে প্রত্যুষের নাম দেখবো আশা করি।

প্রোফেসনল্ বিলিয়ার্ড টুর্ণামেন্ট ঃ—গত বছরের বিজয়ী মাইকেলাস্ গ্র্যাণ্ড হোটেলে ফাইনাল গেমে ই মঙ্ক-কে ১০৩৭—১০২৫ পয়েন্টে হারিয়ে এ বছরে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। খেলার প্রথম সেসনে মাইকেলাস্ তত সুবিধা করতে পারে নি; ৯০,৫৭ বড় দুটো ব্রেক দিয়ে মঙ্ককে টপ্‌কিয়ে সেদিনের মত বাজি মারে। কলিকাতার অনেক নামজাদা প্রোফেসনল্ রাজা, জ্ঞানচাঁদ, কচি খান প্রভৃতি এই টুর্ণামেন্টে খেলেছিল।

টেনিস্ ঃ—

পাঞ্জাব টেনিস্ টুর্ণামেন্টে পুরুষদের সিঙ্গল ফাইনালে পুনেসেক্‌এর কাছে পালাডার আবার পরাজয় হয়েছে।

পুনসেক্ যুগোশ্লাভিয়ার ১ নম্বর খেলোয়াড় আর পালাডা ২ নম্বর।

নির্ম্মল সেন

পালাডার টেনিস জীবনে সত্যিকার কৃতিত্ব ভারতের সবচেয়ে বড় দুটো টুর্ণামেণ্ট ক্যাল্‌কাটা চ্যাম্পিয়নসিপ্ ও অল ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়নসিপ্‌এ পুনসেক্‌কে হারিয়ে জয়ী হওয়া; সুতরাং পাঞ্জাব পরাজয় গ্লানি তাকে বোধ হয় ততখানি আঘাত করবে না। পুনসেক্ ৬—২, ৬—৪, ৬—৩ গেমে পালাডাকে এত সহজে হারাবে কেউ আশা করে নাই।

মেয়েদের সিঙ্গল ফাইনালে, মিস্ সিমোর ৬—১, ৬—১ গেমে মিস্ ষ্টেবিঙ্গকে পরাজিত করেছেন।

এই টুর্ণামেণ্টের পর যুগোশ্লাভিয়া বনাম পাঞ্জাব একটা এক্জিবিসন্ ম্যাচ হয়েছিল। পুনসেক্ ৬—২, ৬—২ গেমে রণবীর সিংকে হারায় আর পালাডা ৬—২, ৮—৬ গেমে এস্ সাহানিকে পরাজিত করেছে।

বম্বে টেনিস্ টুর্ণামেণ্ট :—

বম্বে হার্ডকোর্ট চ্যাম্পিয়নসিপ্ সিঙ্গল ফাইনালে ভারতের ২ নম্বর খেলোয়াড় ই ভি বব্ ৬—৩, ৬—৩ গেমে এম্ আজিমকে হারিয়েছেন।

লেডী সিঙ্গল ফাইনালে অতি সহজেই মিস্ লীলা রাও ৬—০, ৬—০ গেমে মিসেস্ এস্ ক্যাপটেন্‌কে দুটো লাভ সেট্ দিয়ে জয়ী হয়েছেন।

বম্বে টুর্ণামেণ্টের সবগুলি প্রতিযোগিতাতেই বব্ আর মিস্ লীলারাও চ্যাম্পিয়ন হয়ে এক নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছেন।

টেনিস এক্জিবিসন্ :—

বম্বে কুইনস্ রোড কোর্টে একটা এক্জিবিসন ম্যাচ্ হয়, তাতে বিলেতের কয়েকজন বিখ্যাত খেলোয়াড় মিষ্টার হিউজেস্ মিস্ লাইল প্রভৃতি যোগদান করেছিলেন।

লেডিস্ সিঙ্গল ম্যাচে মিস্ লীলারাওর কাছে মিস্ লাইল ৬—৩, ৬—০ গেমে অভাবনীয় পরাজয়ে সকলেই বিস্মিত হয়েছে। সেদিনকার খেলায় মিস্ রাওর প্রতি ষ্ট্রোক্‌টাই দেখবার মত হয়েছিল। মিষ্টার জি হিউজেস ও মিস্ লাইল ৬—২, ৬—৩ গেমে এ পিট্ ও মিস্ ডিগ্নার-ম্যানকে পরাজিত করেন।

বিহার চ্যাম্পিয়নসিপ্ :—

বিহার উড়িষ্যা পুরুষদের সিঙ্গল ফাইনালে সি এল্ মেটা ৬—১, ৬—৪, ৬—১ গেমে এইচ্ বর্ম্মাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।

অল্ বেঙ্গল জুনিয়র চ্যাম্পিয়নসিপ্ :—

জুনিয়র টেনিস্ খেলোয়াড়দের উৎসাহ দেবার জন্যে ক্যাল্‌কাটার বিখ্যাত সাউথ্ ক্লাব্-এর পরিচালনায় উড্‌বার্‌ন্ কোর্টে গত কয়েক বছর ধরে এই টুর্ণামেণ্ট হয়ে আসছে। এই জুনিয়র টুর্ণামেণ্টে নাম করে সি এল্ মেটা, অদীপ মুখার্জ্জি, এ এরাকি প্রভৃতি খেলোয়াড় টেনিস মহলে বিশেষ সুপরিচিত।

খেলায় পারদর্শিতার পরিচয় দিয়ে এ-ছরও যে চ্যাম্পিয়ন হলো সে—শ্রীমান নির্ম্মল সেন। সিঙ্গল ফাইনালে নির্ম্মল

সেন ৬—০, ৬—০ গেমে পি ক্লুয়ারকে দুটো লাভ সেট্ দিয়ে জয়ী হয়েছে। ডবল্ ফাইনালে নির্ম্মল সেন ও এ চোপ্রা এ ডেমেট্রিয়াস্ ও আর সেলিমকে ৮—৬, ৬—৪ গেমে পরাজিত করেছে।

অতি অল্পদিনের মধ্যেই বিশিষ্ট খেলোয়াড় হিসেবে শ্রীমান নির্ম্মল সেনের নাম শুনবো।

হকি :—

হকি খেলার সঙ্গে সঙ্গে গড়ের মাঠে ছেলে বুড়োর ভীড় জমতে সুরু করে। প্রায় পনেরটি টিম্ নিয়ে এ বছরে প্রথম ডিভিসন্ লীগ আরম্ভ হয়েছে। ইউরোপীয়ন টিম্ হিসেবে অন্যান্য বছরের তুলনায় অদ্বিতীয় কাষ্টমস্ দল সুবিধাজনক নয়। সেণ্টার ফরওয়ার্ড ওয়েষ্টনকে অসুখের জন্য খেলার গোড়ার দিকে হারাতে হয়েছে; যদিও পুরোণো সউকাত আলি দলে ফিরে এসেছে কিন্তু আগেকার সেই খেলার মাধুর্য্য ও চাতুর্য্য আর নেই। গত বছরের চ্যাম্পিয়ন রেঞ্জার্স ক্লাব পুরোণো টিমের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। টিম হিসেবে বেশ ব্যালান্সড্; চ্যাম্পিয়ন হতেও আশা রাখে কিন্তু পূর্ব্বেকার চেয়ে প্রতিপক্ষ দল উন্নত হওয়াতে লীগ্ জয়ী হতে বেশ রীতিমত বেগ পেতে হবে। সেণ্ট জোসেফ্ আর সেণ্ট জেভিয়ার লীগের 'Shock' টিম; এদের খেলা কবে কোনদিন খুলবে বলা শক্ত। এবার সেণ্ট জেভিয়ার-

এন্ মুখার্জ্জী (মোহনবাগান)

সে কয়েকটি তরুণ খেলোয়াড় যোগ দেওয়াতে লীগে দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় স্থান অধিকার করবে। সেদিন সেণ্ট জোসেফ কাষ্টমস্‌কে ২—১ গোলে হারিয়ে সহরে এক চাঞ্চল্য উপস্থিত করেছে। এ পরাজয়ে রেঞ্জার্স-এর উল্লাস হবার কথা এজন্য কাষ্টমস্‌কে পরে অনুতাপ করতে হবে। অন্যান্য ইউরোপীয়ন টিম্‌গুলি চলন সই।

পি, দাস (মোহনবাগান)

সকলের প্রিয় মোহন বাগান দল লীগে পুলিসকে ৪গোলে হারিয়ে সকলকে আনন্দ দিয়েছে। ক্যাপ্টেন পি দাস ও গোলকিপার এন্ মুখার্জ্জি নিউজিল্যাণ্ডে খেলবার জন্যে নিমন্ত্রিত হয়। লীগের শেষদিকে মোহন বাগানের বেশ ক্ষতি হবে সন্দেহ নাই। আপ্ কাণ্ট্রি থেকে কয়েকজন ভাল খেলোয়াড় আনিয়ে ভবানীপুর টিমটিকে নতুন করে দাঁড় করিয়েছে। সেদিন নিজেদের শুধু খেলার দোষেই রেঞ্জার্সের কাছে ১ গোলে হেরে দুটো মূল্যবান পয়েণ্ট নষ্ট করলো। পুরোণো গ্রীয়ার এখনও বেশ জোরের সঙ্গেই নিজেদের সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছে; কাষ্টমস্ অতি কষ্টে ১ গোল জিতে নিজেদের মান বাঁচিয়েছিল।

মহমেডান স্পোর্টিং এখনও একটা গেমও জিততে পারে নি, তবে প্রতি বছরের মত এবারও নিশ্চয় বাইরের থেকে ভাল প্লেয়ার আনিয়ে দলটিকে পুষ্ট করবে। লীগ্ চ্যাম্পিয়ন এবার কে হবে এখন থেকে বলা শক্ত।

তবে রেঞ্জার্স আর কাষ্টমস্-এর মধ্যে এবার রেঞ্জার্সই বাজী মারবে।

নিউজিল্যাণ্ড টুর :—

নিউ জিলাণ্ড হতে হকি খেলার নিমন্ত্রণ পেয়ে ইণ্ডিয়ান হকি ফেডারেশন একটি টিম গঠন করে, ২০শে এপ্রিল পাঠাতে মনস্থ করেছেন। ইণ্ডিয়ান টিমের নির্ব্বাচিত খেলোয়াড়দের মধ্যে বাঙ্গালারই পাঁচ জন আর বাকি সব ম্যানাভেডার ষ্টেট্ ও পাঞ্জাব। অলিম্পিক্ টিমের ন্যায় তত নামজাদা খেলোয়াড় এ দলে না থাকলেও একে আমরা সেকেণ্ড বেষ্ট টিম বলে গণ্য করতে পারি।

অদ্বিতীয় ধেয়ান চাঁদ ক্যাপ্টেন নির্ব্বাচিত হয়েছে। মোহন বাগানের পি দাস ও এন্ মুখার্জ্জি নির্ব্বাচিত হওয়াতে এতদিন পর বাঙ্গালা বিশেষতঃ বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের হকি ফেডারেশন যথার্থ সম্মান দিতে পেরেছে দেখে সকলেই খুসী হয়েছে। ভারতের বাইরে বাঙ্গালী হকি খেলোয়াড় এই বোধ হয় প্রথম আন্তর্জাতিক খেলায় যোগ দিতে চলেছে।

নির্ব্বাচিত টিম: গোলকিপার—টি ব্লেক্ (সিন্ধু) ও এন্ মুখার্জ্জি (বেঙ্গল)

ব্যাক্—মহম্মদ হোসেন, (মানাভাডার), পি দাস (বেঙ্গল) ও রসিদ আমেদ্ (পাঞ্জাব)

হাফ্ ব্যাক্—ডি নেষ্টর (বেঙ্গল), মাসুদ (মানাভাডার), এম্ গোপালম (মাদ্রাজ) ও মহম্মদ নায়াম (পাঞ্জাব)

ফর্‌ওয়ার্ড—সাহাবুদ্দিন (মানাভাডার), এল ডেভিডসন্ (বেঙ্গল), ধেয়ান চাঁদ (আর্ম্মি) রূপ সিং (গোয়ালিয়র), নবাব মানাভ ডার (মানাভাডার), বি অগ্নিহোত্রি (ইউ পি) এবং আর কার (বেঙ্গল)

রিঙ্ক হকি :—

গত কয়েক বছর ধরে ওয়াই এম্ সি এ ওয়েলিংটন্ ব্র্যাঞ্চ-এর পরিচালনায় কর্পোরেশন ষ্ট্রীটে রিঙ্ক হকি লীগ খেলা হয়ে আসছে। এ বছর সকলকে হারিয়ে সেণ্ট জেভিয়ার টিম্ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে; সিটি অপ্‌টিমিষ্ট ক্লাব হয়েছে সেকেণ্ড।

সিনিয়র নক্‌আউট টুর্ণামেণ্টে সেণ্ট্ জেভিয়ার্স ফাইনালে উঠেছে। আশা করি এরাই এবার জিতবে।

মেয়েদের হকি :—

—এ বছরে সিনিয়র হকি লীগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে খড়্গাপুর দল। আজকাল এরাই সব চেয়ে ভাল টিম বলে গণ্য হয়।

বিখ্যাত টেনিস প্লেয়ার মিস্ হ্যাণ্ডিসন্ এই দলেই খেলেন। টিম হিসেবে তারপরেই ওয়াই ডব্লিউ সিএর ব্লুট্রায়েঙ্গল ও গ্রাস্‌হপার ক্লাবই স্থান পায়।

মেয়েদের লীগ বিজয়িনী—খড়্গাপুর দল

লেডি টেগার্ট কাপে গ্রাস্‌হপারের কাছে খড়্গাপুর হেরে গেছে। তবে সিনিয়র টুর্ণামেণ্টে খড়্গাপুর ফাইনালে গেছে।

হকি খেলার আমোদ আহ্লাদ ছাড়াও স্বাস্থ্যের দিক থেকে দেখ্‌তে গেলে বাঙ্গালার মেয়েরা এখনও অনেক পেছিয়ে। মেয়েদের ইস্কুল কলেজে হকি খেলার প্রচলন হলে খেলার প্রতি ঝোঁক, নষ্টস্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার ও দেশের মঙ্গল হয়।

ইন্টার ভার্সিটি ম্যাচ ঃ—

এবার ভার্সিটি ম্যাচে ক্যালকাটা বিশ্ববিদ্যালয় ৪-০ গোলে পরাজিত হয়েছে। গত বছরেও লাহোরে যে খেলা হয়েছিল তাতেও ক্যালকাটা ৪-১ গোলে হেরে যায়। সুতরাং এ বছরে হকি ও এথ্‌লেটিক্‌ স্পোর্টসে পাঞ্জাব চ্যাম্পিয়ন হল। যারা সেদিন মোহনবাগান গ্রাউণ্ডে এই খেলা দেখেনি তারা যেন খেলার গোল দেখে দুইটিম্‌কে ভুল করে বিচার করে না বসে।

ক্যালকাটা দল খেলার বেশীর ভাগেই বিপক্ষ দলকে চেপে রেখেছিল; গোল দেবার সুযোগও কম পায় নি। ৩।৪ টে গোল দিলে কেউ আশ্চর্য্য হত না। পাঞ্জাব দল খুব opportunist আর ভাগ্যও সেদিন খুব সাহায্য করেছিল। পাঞ্জাবের গুরুচরণের খেলা এত সুন্দর হয়েছিল যে প্রকাশ করা যায় না; ধরতে গেলে তারই জন্য পাঞ্জাব সেদিন জেতে। খেলার প্রথম ভাগে কোন গোল হয়নি। বিশ্রামের পর শ্রী (২), হরনাম ও প্রাণ পর্য্যায়ক্রমে গোল দেন।

পাঞ্জাব দল—ওমপ্রকাশ; নাসীর ও গুরুচরণ; শ্যাম, চিরঞ্জী ও গিরিধারী; প্রাণ, শ্রী, ফৈজি, হরনাম ও জাফর (ক্যাপ্টেন)

ক্যালকাটা দল—ষ্টিল; পি দাস ও মার্চেন্ট; আরিফ, পি সেন (ক্যাপ্টেন) ও ডিকেন্স; এ মিত্র, উইলসন্‌, রেন্টন, পেরিয়ার ও এম্‌ খাঁ।

আমপায়ার—পি গুপ্ত ও এ এন্‌ড্রি।

অল্‌ ইণ্ডিয়া ওয়েট লিফ্‌টিঙ কম্পিটিসন্‌ ঃ—

—বাগবাজার জিমনাসিয়াম এসোসিয়েসনের তত্ত্বাবধানে অল্‌ ইণ্ডিয়া কম্পিটিসনে ব্রহ্মদেশের বীর জ উয়িক (Zaw Weik) ১২ ষ্টোন অর্থাৎ ৬৮০ পাউণ্ড ওজন তুলে ভারতের এক নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছেন। এর আগে কেউ এত ওজনের ভারী জিনিস তুলতে সক্ষম হয়নি। মাদ্রাজের এম্‌ ভারতম্‌ ৫৫৫ পাউণ্ড ওজন তুলে জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।

এণ্ডিয়োরেন্স্‌ সুইমিং ঃ—

রয়টারের খবরের প্রকাশ যে বুনা আয়ারে পেড্রো ক্যানডিয়োটি জলে সমানে ৮৭ ঘণ্টা ১৯ মিনিট সাঁতার দিয়ে বিশ্ববিখ্যাত পি কে ঘোষের রেকর্ডকে ম্লান করে দিয়েছে। পি কে ঘোষ রেঙ্গুনের লেকের জলে ৭৯ ঘণ্টা ২৪ মিনিট সাঁতার দিয়েছিলেন।

শ্রী বিনয় রায়চৌধুরী

সবিনয় নিবেদন

—দ্বিতীয় খণ্ড—

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

কাঁদছিল।—

কত সামান্য কারণে যে মানুষ কাঁদতে পারে তাই যেন সপ্রমাণ করতেই কাহিনী কাঁদছিল। নইলে কাননের সামান্য কথায় তার কান্না পাওয়া মোটেই উচিত হয়নি। কাননের আঘাত ক'রে কথা বলার অভ্যাস তার কাছে অপরিজ্ঞাত নয়, আর এতকাল কাহিনীতো তা অনায়াসেই গায়ে মেখে চ'লে এসেছে। আঘাত পেয়েও আহতের আচরণ সে কোনদিনই করেনি, বরং উল্টো অভিনয় ক'রেই কাননকে অপ্রতিভ ক'রে তুলতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু আজ আর চেষ্টা ক'রেও সে অভিনয় করতে পারলো না, চোখের জল তাকে ফেলতেই হ'লো।

কানন বলেছিল, প্রদীপ আচ্ছা বোকা ছেলেতো! মুকুট আর লিপির জন্যে টী-পার্টি দিচ্ছে। কেন, ঘরে কি ওর পয়সা রাখবার জায়গা নেই? আচ্ছা, সে বোকা ছেলে না হয় টী-পার্টি দিচ্ছে। তার বাপের পয়সা আছে, সে তো দেবেই, না দেওয়াই বরং তার পক্ষে অপরাধ। কিন্তু তোমাদের বলি কাহিনী, তোমরা কি সেখানে শো দিতে যাচ্ছ নাকি? বাপ্ রে, কি বিশ্রীরকম চক্‌মকে সাজগোজ ক'রে টয়লেটের আদ্যশ্রাদ্ধ ক'রে, গন্ধ ছড়িয়ে সেখানে চলেচ' বলতো? তোমাকে এত করতে তো কোনদিন দেখিনি এর আগে। ভেনিস্-প্রিয়া লিপি রক্ষিতের কাছে নতুন ট্রেনিং নিচ্ছ বুঝি? আজ ফেরবার পথে নিউ-মার্কেট থেকে একটা ভ্যানিটি ব্যাগ কিনে এনো। ওটা আর বাকী থাকে কেন?

কাহিনী এসেছিল কাননকে সঙ্গে ক'রে প্রদীপের টী-পার্টিতে নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু কাননের কথা খচ্ ক'রে তার অন্তরের কোন্ কোমল স্থানটিতে যে বিঁধে গিয়ে তার চোখে জল এনে দিল তা সে নিজেও বুঝতে পারছিল না।

সিল্কের শাড়ীর আঁচল দিয়ে চোখের জল সে মুছতে যাচ্ছিল, কানন তার হাতটা ধ'রে ফেলে বাধা দিয়ে বললো, আঃ, কি করছ' কাহিনী, মুখের পাউডার উঠে যাবে যে।

কাহিনী আর সহ্য করতে পারলো না, কণ্ঠ যথাসম্ভব অবিকৃত রাখবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে বললো, স্পষ্টবাদিত্বের দাম্ভিকতায় তুমি গেলে কাননদা'। তোমার বিদ্যা-বুদ্ধিতে আমার প্রগাঢ়--

চোখের জল আর বাধা মানতে চাইলো না, কাজেই বাক্য অসমাপ্ত রেখেই সে কাননের ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কাহিনীর প্রস্থান-ভঙ্গীতে কাননের হাসি পেল, কিন্তু না হেসে সে ডাকলো, কাহিনী, যেওনা। তোমার সঙ্গে আমার আরও কথা আছে, দাঁড়াও।

কাহিনী ফিরে এলো। চোখের জল তখন সে সাম্‌লে নিয়েছে বটে, কিন্তু মুখ থেকে ব্যথার ছাপ তখনও তার মিলিয়ে যায়নি। কানন ত্রস্তে তার সর্ব্বাঙ্গে একটা দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললো, প্রদীপ অনেক ক'রে ব'লে গেছে বটে, কিন্তু যেতে একটুও ইচ্ছে নেই। সত্যি কাহিনী, আজকাল কোন পার্টিতে আমি যোগ দিতে পারি না, আমার চোখে এসব কেন জানি জ্বালা ধরায়, ফিরে এসে অনুতাপ আমাকে করতে হয়ই। কি জান', সোনার ঝল্‌মলানি আমি সইতে পারি, কিন্তু জরির ঝল্‌মলানি আমাকে অতিষ্ঠ ক'রে তোলে, চোখ আমার জ্বালা করে। তোমাকে আঘাত করতে আমি তোমার টয়লেট্ করার কথা স্মরণ করিয়ে

দিইনি। আধুনিক ছেলেমেয়েদের সকলকে লক্ষ্য ক'রেই ওকথা আমার বলা, তুমি তার মধ্যে বিশিষ্ট কিছু নও।

কাহিনী নীরবে দাঁড়িয়েই আছে দেখে কানন আবার বললো, আমি না গেলে তুমি দুঃখিত হবে নিশ্চয়ই?

কাহিনী বললো, হ'তে পারি।

কানন হেসে ফেলে বললো, হ'তে পারি না—হবেই। ভাল কথা, প্রদীপ তোমাদের নিতে গাড়ী পাঠায় নি?

পাঠিয়েছিল, আমি গাড়ীতে যাইনি, ঝর্ণা গেছে।

একটা ট্যাক্সি ডাকি তা'হ'লে?

কি দরকার? এটুকু হেঁটেই যেতে পারবো।

কানন আবার মনে মনে একটু হেসে নিয়ে বললো, কাহিনী, আমার কথাই যে নির্ভুল—তাওতো নয়। হ'তে পারে আজকাল শো'র সত্যিকারের প্রয়োজন আছে। দুনিয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হবে তো? কিন্তু আমি কিছুতেই ভেবে পাই না যে, এত ক'রেও আজকালকার ছেলে-মেয়েরা দুনিয়ার কিছুরই সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছে না কেন। চল, হেঁটেই যাওয়া যাক্। কাল সীমা আর পুতুলের চিঠি একসঙ্গেই প্রায় এসেছে। দু'টো চিঠিতে কি অদ্ভুত অমিল। চল, পথেই সব বলবো'খন।

হলঘর জম্‌জম্ করছিল। আলোর জ্বালাময় ঝলমলানি, আসবাবপত্রের ঝন্‌ঝনি, আর সমাগত স্ত্রী-পুরুষের অঙ্গের সাজ-সজ্জার চক্‌মকানি হলঘরটিতে কেমন এক রূঢ় রূপসজ্জায় সজীব ক'রে তুলেছিল। কিন্তু সব কিছুর মধ্যে এই যে প্রয়োজনের অধিক আয়োজন—আসলে যা রূঢ়তা দিয়েছে, তা কানন ও কাহিনীর আগমনের পূর্ব্বে কেউ লক্ষ্য করেনি। এবং তাদের আগমনের পরেও প্রদীপ ভিন্ন অন্য কেউ তা লক্ষ্য করেনি। প্রদীপও হয়তো তা লক্ষ্য করতো না যদি কাননের হলে প্রবেশের সঙ্গে মুখের বিকৃতি সে না দেখে ফেলতো। কাননের মুখ-বিকৃতি প্রদীপকে চোখে আঙুল দিয়ে সে-কথা যেন বুঝিয়ে দিল। প্রদীপের মনে হ'লো, কাননকে এ-আসরে নিমন্ত্রণ ক'রে এনে নিজেকে লজ্জিত ক'রে না তুললেও সে পারতো। কানন প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপকে লজ্জিত ক'রে তুলেছে এবং প্রদীপের নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদের দু'একজনকে অপ্রতিভ না ক'রে কানন যে এ-আসর থেকে উঠে যাবে না সে-বিষয়েও সে নিঃসন্দেহ। কাজেই কাননের আগমনে সে কেমন একটু সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়লো।

কানন চতুর্দ্দিকে ত্রস্তে একটা দৃষ্টি ফেলে অভ্যাগতদের দেখে নিয়ে সামনের একটা চেয়ার হাত দিয়ে একটু সরিয়ে নিয়ে তা'তে বসবার আয়োজন ক'রে ইঙ্গিতে প্রদীপকে ডাকলো। প্রদীপ সামনে এগিয়ে এসে দাঁড়াতেই কানন একটু মোলায়েম হেসে বললো, প্রদীপ, একটু আতর-গুলাব্ ছড়াবি না? আমি যে কিছুই মেখে আসিনি সেই আশায়। ······বাঃ কাহিনী, দাঁড়িয়ে রইলে যে? একটা চেয়ার দেখে ব'সে যাও, নেমন্তন্ন-বাড়ীতে আপনি জায়গা ক'রে বসতে হয়।

প্রদীপ তাড়াতাড়ি একটা চেয়ার—কাননের পাশে একটু টেনে দিয়ে বললো, কাননদা', তোমার কি ভদ্রতাজ্ঞান ব'লেও কিছু নেই? তোমার সঙ্গে যে এলো সে বসলো কিনা তা না দেখেই তুমি দিব্যি ব'সে পড়লে তো। আবার তা'কে উপদেশ দিচ্ছ কোন্ মুখে শুনি?

কাহিনী প্রদীপের এগিয়ে দেওয়া চেয়ারে বসতে যাচ্ছিল, এমন সময় সহসা লিপি রক্ষিত কোথা থেকে উঠে এসে সেই চেয়ারে ব'সে প'ড়ে বললো, কাহিনী, ভাই, তুই আর একটা চেয়ার নিয়ে বোস্। আমার কাননবাবুর সঙ্গে মস্ত তর্ক আছে। সেদিন যে বড় আমাকে—

কানন বাধা দিয়ে বললো, আমাকে মাপ করতে হ'লো তোমার লিপি, তর্ক আমি মোটেই করতে পারি না, তবে লোক চটাতে আমি অদ্বিতীয়। তারপরে কাহিনীর দিকে ফিরে বললো, দেখলে কাহিনী, তোমাকে আগেই বলেছি যে নেমন্তন্ন বাড়ীতে জায়গা নিজেকে ক'রে নিতে হয়, আর তা না করলে ঠকতে হবেই।

লিপি রক্ষিত তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললো, সে কি কাহিনী, তুই দাঁড়িয়ে থাকবি কেন? তুই বোস্, আমি আর একটা চেয়ার আনি বরং।

প্রদীপ বললো, দাঁড়ান একটু, আমিই এনে দিচ্ছি।

প্রদীপ চেয়ার এনে দিল, কিন্তু লিপি কি ভেবে সেখান থেকে অন্যত্র চ'লে গেল এবং সঙ্গে কাহিনীকে নিয়ে যেতেও সে ভুললো না।

কানন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে প্রদীপের একটা হাত ধ'রে চেয়ারে বসিয়ে বললো, ওরা হয়তো আমার ওপর চ'টে গেল, কিন্তু কি করবো—যাক্, কি আয়োজন করেছিস্ শুনি ?

প্রদীপ সসঙ্কোচে বললো, বেশী কিছুই করিনি। চা আর তার সঙ্গে—

কানন হেসে বললো, যাক্, তার সঙ্গে আরও কিছু আছে তা'হ'লে ? কিন্তু ঝর্ণাকে দেখছি না যে বড় ? সে কি আসেনি ?

প্রদীপ বললো, হুঁ, এসেছে তো! তারপরে হলের এককোণে যেখানে লিপি কাহিনীকে ভিড়ের মধ্যে টেনে নিয়ে গেল সেদিকে চেয়ে বললো, ঐ ওখানে আছে বোধ হয়। ওখানে আমার এক বন্ধু—কেরিকেচারিষ্ট, রজত রায়ের নাম শুনেছ নিশ্চয়ই—সে খুব আসর জমিয়ে বসেছে।

কানন হেসে ফেলে বললো, তবেতো ঝর্ণা ওখানেই থাকবে। তার আর অপরাধ কি !

ময়ূর এসে খবর দিল, বড়দা'কে পুলিশে ধ'রে নিয়ে গেছে।

সহসা হলের চতুর্দ্দিকে একটা অনীপ্সিত চাঞ্চল্য জেগে উঠলো। একে একে সকলেই এসে ময়ূরকে ঘিরে দাঁড়ালো এবং নানা প্রশ্নে তা'কে মুহূর্ত্তে ব্যাকুল ক'রে তুললো।

প্রদীপ সমস্ত শুনে দুঃখিত হ'য়ে বললো, পরাগদা'কে আমি একশোবার তখন বল্লাম যে, আজকের ময়দানের সভায় ধর-পাকড় হবে, তুমি সেখানে গেলে কখনই এখানে আসতে পারবে না। আর হ'লোও তাই।

লিপি বললো, আমিও কি কম বারণ করেছিলাম, কিছুতেই শুনলো না।

কানন বললো, সত্যি, না শোনা তার মস্ত অপরাধ হ'য়েছে।

কানন এমন ভাবে কথাটা বললো যে, প্রদীপ ও লিপি ভিন্ন সকলেই হেসে উঠতে বাধ্য হ'লো।

মুকুট সমস্ত শুনে ময়ূরকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, প্রদীপ তাকে থামিয়ে বললো, ময়ূর থাক্ বরং,—ওকে আমি পরে বাড়ী পাঠিয়ে দেব'খন। ও বেচারী এসে কিছু না খেয়ে চ'লে যাবে সে হয় না।

মুকুট ময়ূরকে রেখেই চ'লে গেল।

মুকুট চ'লে গেলে লিপি বললো, আমিও গেলে পারতাম, কিন্তু রজতবাবুর কেরিকেচার ফেলে উঠে যেতে ইচ্ছে করছে না; রজতবাবুর কি ওয়াণ্ডারফুল্ ভয়েস্!

ঝর্ণা বললো, প্রদীপদা' ভারী সেল্‌ফিস্! এতদিন রজতবাবুর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়নি।

কানন নিজের মনে মনে না হেসে পারলো না। তার ইচ্ছে ছিল না এ সম্বন্ধে কোন কথা বলে, কিন্তু না ব'লেও সে পারলো না। বললো, প্রদীপ সেল্‌ফিস্ মোটেই না—ভীতু। রজতবাবুর যে রকম গ্রীক্ গডের মত চেহারা তা'তে ওকে একটু দূরে দূরে রাখা মন্দ কথা না। তার ওপরে—আবার ওয়াণ্ডারফুল্ ভয়েস্! সোনায় সোহাগা!

কাননের কথায় সকলেই ক্ষুণ্ণ হলো, কিন্তু প্রতিবাদ ক'রে কাননকে কথা বাড়াবার এবং নিজেকে অধিকতর—অপ্রতিভ ক'রে তোলার সুযোগ দিতে কেউ রাজী হ'লো না। রজত দূরে থাকায় কাননের অনুচ্চ কণ্ঠের কথা শুনতে পায়নি, পেলে তার কিছু এ সম্বন্ধে বলার থাকতো কিনা তা সেই জানে। আর বলার থাকতোই বা কি—বড়জোর সে বলতে পারতো, মিথ্যে লজ্জা দেন কেন।

রেডিওর গান সুরু হ'লো। হলঘরে সে যেন নটরাজের তাণ্ডব-নৃত্য সুরু হ'য়ে গেল। চতুর্দ্দিকে তখন কাঁটা-চাম্‌চে-পেয়ালার ঝন্-ঝনানি বেজে চলেছে। প্রদীপ হলঘরের চতুর্দ্দিকে টেবিলের কাছে ঘুরে ঘুরে অভ্যাগতদের তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত।

রেডিওর গান সুরু হ'তেই কানন উঠে দাঁড়িয়ে প্রদীপকে বললো, আমি চল্লাম প্রদীপ। কিছু মনে করিস্‌নে যেন, আমাকে একবার লালবাজার লক্-আপ-এ যেতেই হবে পরাগের খবর নিতে। এতক্ষণ যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু পাছে কিছু না খেয়ে গেলে ক্ষুণ্ণ হ'স্ তাই যেতে পারিনি।

লিপি কাননকে উঠে দাঁড়াতে দেখে ব'লে উঠলো, ওকি কাননবাবু, এর মধ্যে চল্লেন যে ?

কানন উত্তরে বললো, আমার বিশেষ কাজ আছে। এখন না উঠলেই নয়। আশা করি, তোমরা কেউ তা'তে ক্ষুণ্ণ হবে না।

ঝর্ণা লিপির পাশ থেকেই ব'লে উঠলো, বেশ, যেতে হয় যাও। এ গেদারিং-এ তুমি এমন কিছু ইম্পর্ট্যান্ট পারসন্ নও যে তোমার যাওয়া না-যাওয়ায় কারও কিছু তেমন এসে যায়।

কানন শত চেষ্টায়ও হাসি চাপতে পারলো না। বললো, কারও কিছু আসে যায় না ব'লেইতো সাহস ক'রে উঠে যাচ্ছি। নব-পরিচিত রজতবাবুর কি সে সাহস আছে ? থাকতে পারে না।

ব'লে কানন বেরিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ লিপি রক্ষিত উঠে দাঁড়িয়ে কাননের একটা হাত ধ'রে ফেলে বললো, দাঁড়ান কাননবাবু, আমিও আপনার সঙ্গে যাব। আমারও কাজ আছে।

ত্রস্তে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে রজতের সঙ্গে কি যেন কথা ব'লে লিপি কাননকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেল। পথে বেরিয়েই তার মনে পড়লো যে, ভ্যানিটি ব্যাগটা সে হলঘরে ফেলে এসেছে। কিন্তু কাননকে দাঁড় করিয়ে ভ্যানিটি-ব্যাগটা আনতে যাবার সাহস তার হচ্ছিল না। সে যখন কি করবে ঠিক করতে পারছে না তখনই কানন বললো, আজ যে তোমার হাতে ব্যাগ দেখছি না মিস্ রক্ষিত ?

ওঃ, হলঘরে ফেলে এসেছি বোধ হয়। ব'লেই লিপি তাড়াতাড়ি প্রদীপের হলঘরে গিয়ে প্রবেশ করলো।

কানন পথে দাঁড়িয়েই ছিল। আর ভাবছিল, লিপি সহসা প্রদীপের হলঘরে যে আসর জমেছে তা ভেঙে তার সঙ্গ নিল কিসের আশ্বাসে ?

মুকুটের সঙ্গে লালবাজারে তাদের দেখা হ'লো। মুকুটের কাছে পরাগের সমস্ত সংবাদ পেয়ে কানন বাড়ী ফিরছিল, লিপিও তার সঙ্গে ছিল।

কানন ভেবেছিল, লিপি মুকুটের সঙ্গেই বাড়ী ফিরবে, কিন্তু তা যখন ফিরলো না তখন সে লিপিকে ট্যাক্সি নেবে কিনা জিজ্ঞাসা করলো। লিপিও জানালো, হুঁ, সেই ভাল। বাসে বড্ড লোকের ভিড়, ও আমার একেবারেই পছন্দ হয় না।

একটা ট্যাক্সি ডেকে লিপিকে তা'তে তুলে নিজেও উঠে ব'সে বললো, তোমাকে কোথায় নামিয়ে দিতে হবে ?

লিপি বললো, আপনার যদি বিশেষ কোন কাজ না থাকে তো একবার চলুন না লেক থেকে বেড়িয়ে আসি। রাতওতো বেশী হয়নি। তারপরেই না হয় বাড়ী ফিরবো'খন। অবশ্য আপনার কাজ থাকলে আমাকে পরাগবাবুর ওখানে নামিয়ে দিয়ে আপনি বাড়ী যান। আমি এখনও পরাগবাবুদের ওখানেই আছি, পরাগবাবুর মা আমাকে কিছুতেই হোটেল-টোটেলে থাকতে দিতে রাজী হন না। বলেন, আমার বাড়ী থাকতে—

কানন ট্যাক্সি ড্রাইভারকে লেকে যেতে ব'লে বললো, সত্যিইতো হোটেলে থাকতে যাবে কেন ? কোন হিন্দু মহিলাই এ প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারে না। আর পরাগের মা'তো দেবেই না।

লিপি বললো, কিন্তু এভাবে সেখানেও তো আর আমার থাকা চলে না। সেই কথা বলতেই আপনার সঙ্গে আমার আসা। আমি ভারী বিপদে পড়েছি কাননবাবু। আমাদের বিয়ে যখন হবার নয় তখন মিথ্যে সে-বাড়ীতে থাকা কি আমার উচিত ? ভবিষ্যতে ওরা যদি ভাবে যে, আমি ওদের জেনে শুনে চীট্ করেছি তো ওদেরতো দোষ দেওয়া যায় না।

কানন বিস্মিত হ'য়ে বললো, সেকি, মুকুট কি তোমাকে বিয়ে করতে রাজী নয় ?

লিপি কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললো, না, তার দিক থেকে কোন বাধা নেই, বাধা আমার নিজের দিক থেকেই। আমি এখন বেশ বুঝতে পারছি যে, কোন বন্ধনই আমার প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খায় না।

কানন বললো, নিজের প্রকৃতিকে ভুল বোঝাওতো কিছু বিচিত্র নয়। কাজেই ভাল করে বিচার না ক'রে কিছু করতে যাওয়া কি ঠিক ?

লিপি কাননের আরও পাশে এগিয়ে ব'সে বললো, আজ দু'বছর ধরে আমি নিজেকে বিচার ক'রে আসছি, নইলে মুকুটবাবুর কথায় কাজ করলে কবেইতো আমাদের বিয়ে হ'য়ে যেত।

কানন সহসা লিপির পিঠে হাত রেখে যেমন ক'রে মানুষ সন্তপ্তকে সহানুভূতি জানায় তেমন ভাবেই বললো, সেই ভাল হ'তো লিপি।

লিপি অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো, না, সে কিছুতেই ভাল হ'তো না। আজ তা'হ'লে অনুতাপের আমার আর সীমা থাকতো না।

কেন? কিসের অনুতাপ লিপি?—ব'লে কানন তার পিঠে পূর্ব্ববৎ হাত রেখেই ব'সে রইলো।

লিপি কাননের বুকের কাছে আরও এগিয়ে প'ড়ে বললো, কেন? সে আমি তোমাকে বোঝাতে পারবো না।

কানন সহসা চম্‌কে লিপির পিঠ থেকে হাত তুলে নিয়ে বললো, লিপি, আমার অন্যায় হ'য়ে গেছে। তোমার দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের সুযোগ নিয়ে—

না, এ আমার দুর্ব্বল মুহূর্ত্ত মোটেই নয়।

কানন বললো, অস্বীকার ক'রে লাভ নেই লিপি। মেয়েরা যে মুহূর্ত্তে পুরুষকে আপনি থেকে তুমিতে নামিয়ে আনে সেটা তাদের দুর্ব্বল মুহূর্ত্তই বলতে হয়। আর তা'ছাড়াও আবার—দু'দিন পরেই হয়তো তোমার ঠিক এই মুহূর্ত্তই আসবে যখন নিতান্ত অসঙ্কোচে তুমি ঐ গ্রীক্ গড্ রজতের পাশে ব'সে ঠিক এই কথাই বলবে।

লিপির সারা দেহে বিরাট চাঞ্চল্য দেখা দিল। কানন যেন ঐ একটি সামান্য কথার আঘাতেই লিপিকে দিক্ ভুল করিয়ে ছেড়ে দিতে সক্ষম হ'লো। লিপি সভয়ে কাননের কাছ থেকে একটু স'রে বসলো। ট্যাক্সি তখন চার্চ্চ পার হ'য়ে এলগিন্ রোডের কাছাকাছি এসে পড়েছে। উভয়ের মধ্যে কিছুক্ষণ কোন কথাবার্ত্তা হ'লো না। ট্যাক্সি যখন চড়কডাঙ্গার মোড়ে এসে পড়লো তখন কানন তাড়াতাড়ি লিপির কাছে এগিয়ে ব'সে তার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে বললো, আমার কথার কোন দাম নেই লিপি। যারা আমার কথায় ক্ষুণ্ণ হয়, তারা হয় বোকা, নয় তাদের নিজেদের ওপর কোন আস্থাই নেই। আর কাহিনী তা বোঝে ব'লেই সে আমার কথার কোন মূল্য দেয় না, ঝর্ণাতো কান পেতে শোনেও না।

লিপি কি মনে ক'রে বললো, আচ্ছা, থাক ওসব কথা। লেকে যেতে আজ আর ভাল লাগছে না। চল বরং তোমার বাড়ীতেই যাওয়া যাক্।

কানন হেসে ফেলে বললো আমার Bachelor's den-এর চেয়ে লেক যে ঢের ভাল জায়গা লিপি। অন্ততঃ denএর গুমোট সেখানে নেই।

তা' হোক। চল তোমার বাড়ীতেই যাওয়া যাক্।

কানন ড্রাইভারকে সেরূপ উপদেশ দিয়ে বললো, লিপি, এ বেশ ভালই হ'লো। তোমার মুখে ভেনিসের গল্প শোনবার বড় ইচ্ছে ছিল, আজ শুনবো'খন।

লিপি বিরক্ত হ'য়ে বললো, ভেনিসের গল্প শোনাবার জন্যে আমার তো চোখে ঘুম নেই।

কানন হেসে ফেলে বললো, তবে কি তোমার কথাই শোনাবে? বেশ, তা শুনতেও আমি কাতর নই।

লিপি অতি ক্রোধে হেসে ফেললো। এবং একথাও তার মনে হ'লো, সত্যি, এ লোকটার কথার কি তবে কোন মূল্যই নেই?

* *
*

কাননের ঘরে ব'সে লিপি নিজের কথা নয়, ভেনিসের কথা নয়, সীমার কথাই তুললো। বললো, সীমাকে আমি কোনদিন দেখিওনি তবু সীমার জন্যে কেন জানিনা আমার অত্যন্ত কৌতূহল। যেদিন থেকে সীমার কথা আমার কানে এসেছে সেদিন থেকেই কেন জানি না আমি তাকে দেখবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছি। সীমার সঙ্গে তোমার কিন্তু একটুও মিল আমি দেখি না।

কানন নিজের চেয়ারখানি লিপির আরও কাছে এগিয়ে নিয়ে সীমার কথা এড়িয়ে চলতেই লিপির বাঁ হাতটা নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে তার হাতের সরু চুড়িগুলির প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে বললো, লিপি, কিছু যদি মনে না

কর' তো তোমাকে একটা কথা বলি।······তোমার সব কিছু দেখতে আমার বেশ লাগে, কিন্তু তোমার কথা শুনতে আমার মোটেই ভাল লাগে না। ঝর্ণার কথা শুনতে আমার বেশ লাগে কিন্তু তার কিছুই আমি দেখতে পারি না। অবশ্য, ভেনিসের কথা তোমার মুখে হয়তো ভালই লাগবে আমার।

না, আমার মুখের কোন কথাই তোমার ভাল লাগবে না, সে আমি জানি। ব'লে লিপি নিজের হাতখানা কাননের হাত থেকে ছিনিয়ে নিল।

কানন লিপির দিকে চেয়ে মনে মনে হাসলো। লিপিকে বিরক্ত করতে তার কেমন যেন ভাল লাগছিল। কানন লিপিকে বেশ ভাল ক'রেই চিনেছিল যে, লিপি আর যাই হোক্—মুহূর্ত্তের মানুষ। আজ এ মুহূর্ত্তে সে যেমন ক'রে আপনাকে তার হাতে বিলিয়ে দিয়ে ব'সে আছে, অন্যদিন শত চেষ্টায়ও আর সে তা পারবে না। লিপির প্রতি তার কেমন একটু করুণাও জেগেছিল,—সে ঠিক দুর্ব্বলের প্রতি সবলের যে করুণা।

কানন আবার তার হাতখানা টেনে নিয়ে বললো, লিপি, তোমার হাতের চুড়িগুলো এত সুন্দর যে আমি সারারাত এমনি এগুলোর পানে চেয়ে ব'সে থাকতে পারি।

লিপি হাত না টেনে নিয়েই বললো, আচ্ছা, তুমি কি কোন মানুষকে কোনদিন ভালবাসতে পারনি? কারও মুখের কথা, কারও হাতের চুড়ি, কারও অন্যকিছু······এমন টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে নয়, গোটা মানুষটাকে?

কানন হেসে ফেলে বললো, কেন ভালবাসবো না? রাঙাদি'কে সত্যিই ভালবেসেছি। আর পুতুলকে—তাও কতকটা।

সে ভালবাসার কথা আমি বলিনি, শ্রদ্ধা সম্ভ্রমের কথা নয়। যে ভালবাসা শুধু একজনকেই বাসা চলে—রাজ্যশুদ্ধ লোককে নয়।

সে ভালবাসায় আমার আস্থা নেই লিপি। খণ্ড ভালবাসাতেই আমার অখণ্ড আস্থা। কাজেই কা'কে যে কখন আমি ভালবেসে ফেলি তা আমি নিজেই বুঝে উঠতে পারি না। তোমার সঙ্গে এইতো আমার সেদিন প্রথম আলাপ, তবু এরই মধ্যে আমি তোমার দুর্ব্বলতাকে ভালবাসতে সুরু করেছি। হ'তে পারে এ আমার দুর্ব্বলতা।—ব'লে কানন লিপির হাতের আঙুল থেকে তার নামে initial দেওয়া মিনে করা আংটিটি খুলতে চেষ্টা করছিল।

লিপি ত্রস্তে সেটা খুলে কাননের হাতে দিয়ে বললো, এটা এমন কিছু অমূল্য পদার্থতো নয়, তবু এটার দিকেই তোমার সমস্ত মন প'ড়ে আছে, কথার মধ্যে মন তোমার একটুও নেই।

কানন আংটিটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নিজের আঙুলে পরাতে পরাতে বললো, সে কথা ঠিক লিপি; বড় কিছুর ভিত্‌রে আমি কোনদিনই মন দিতে পারিনি, ছোট জিনিষেই আমার মন বাঁধা প'ড়ে যায়।

লিপি সহসা কি ভেবে কাননের আঙুল থেকে আংটিটা ছিনিয়ে নিয়ে বললো, কেন জোর ক'রে আমার সব কথাই ভুল বুঝতে সুরু করলে বল'তো? আমার ওপর তোমার এত আক্রোশ কিসের শুনি?

কানন হো হো ক'রে হেসে উঠে বললো, কারও ওপরেই আমার কোন আক্রোশ নেই লিপি। তুমিওতো দেখ্‌ছি আমাকে ভুল বুঝতে সুরু করলে।

লিপি সহসা চেয়ার ছেড়ে কাননের পাতা শয্যার ওপর গিয়ে লুটিয়ে প'ড়ে বালিশে মুখ গুঁজে বললো, এ আমি ভাল ক'রেই জানি। এ দুনিয়ায় আমার জন্যে কারও বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই। তোমার কাছেও যে তা আমি পাব না সে আমি ভাল ক'রেই জানতাম। আর কিছু না পার'—অন্ততঃ আমার আজকের বোকামিকে তুমি ক্ষমা ক'রো।

কানন বিব্রত হ'য়ে উঠে লিপির পাশে এসে দাঁড়ালো। লিপি তখনও বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে ছিল। কানন তার পাশে ব'সে সস্নেহে তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললো, মানুষের দুর্ব্বলতা আমার মত কেউ ভালবাসে না লিপি। তোমার দুর্ব্বলতাকে আমি সত্যি ভালবাসি। সীমার দুর্ব্বলতাকে আমার মত এত সহজে কেউ ক্ষমা করতে পারেনি।

লিপি 'অরে আপনাকে কিছুতেই সংযত রাখতে পারলো না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে সুরু ক'রে দিল।

কানন নিজেও এমন কোন কথা খুঁজে পাচ্ছিল না যা দিয়ে লিপিকে সে সান্ত্বনা দিতে পারে। কাজেই নীরবে লিপির মাথায় হাত বুলিয়ে চললো।

লিপি কোনক্রমে চোখের জল মুছে নিয়ে বললো, আমি যে কত দুর্ব্বল তা তোমাকে না দেখলে আমি কোনদিনই বুঝতে পারতাম না।

কানন চুপ ক'রে রইলো। তার বলার যে কিছু ছিল না তা নয়। বলতে হ'লে সে বলতো, আর মানুষ যে কত দুর্ব্বল হ'তে পারে তা তোমাকে না দেখলে আমি কোনদিনই বুঝতাম না হয়তো।

কিছুক্ষণ পরে লিপি ভাল ক'রে চোখের জল শাড়ীর আঁচলে মুছে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আর আমার কল্‌কাতা ভাল লাগছে না। শীগ্‌গিরই বম্বে চ'লে যাব। যদি কখনও তোমাকে আমার সেখানে যেতে চিঠি লিখি যাবে তো?

যদি না গেলে অসন্তুষ্ট হও তো যাব বই কি!

না, অসন্তুষ্ট হব কেন?

বেশ, তাহ'লেও যাব। ব'লে কানন টেবিলের ওপর থেকে লিপির ভ্যানিটি ব্যাগটা লিপির হাতে তুলে দিয়ে বললো, প্রথম যেদিন তোমার হাতে এই ব্যাগটা দেখলাম সেদিন কেন জানি আমার চোখে তোমাকে ভারী বিসদৃশ ঠেকেছিল, আজ কিন্তু তোমার হাতে ও জিনিষটা আমার বেশ লাগ্‌ছে। হয়তো বিশ্বাস করবে না; ভাববে, এখনও ঠাট্টা করছি বুঝি।

শঙ্করকে দিয়ে একখানা ট্যাক্সি ডাকিয়ে লিপিকে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে কানন বললো, বম্বে যাওয়ার আগে জানিয়ে যেও কিন্তু লিপি।

লিপি বললো, আচ্ছা!

কানন গেটে দাঁড়িয়ে ট্যাক্সি চলতে দেখে বললো, গুড্‌নাইট্‌!

লিপি ট্যাক্সি থেকে মুখ বাড়িয়ে অনেকটা চমক-খাওয়ার মত ক'রে বললো, গুড্‌নাইট্‌!

* * *

জেঠাইমার দেওঘরের বাড়ীর বারান্দায় বসে বাগানের ইকুইলিপ্‌টস্‌ গাছের সারির ভেতর দিয়ে ত্রিকূট পাহাড়ের তাপসমূর্ত্তি দেখতে সীমার বড় ভাল লাগে। সীমা অষ্টপ্রহর তাই ঐ বারান্দার একটা আরাম কেদারায় কাত হ'য়েই থাকে। মধ্যাহ্নে যখন চতুর্দ্দিকে একটা অস্বস্তি কেমন ঝিমিয়ে আসছে ব'লে মনে হয় তখন সীমা একখানা উপন্যাস কিংবা রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী' নিয়ে আরাম কেদারায় শুয়ে পড়ে। এখানে এসে সীমার কাজ প্রথম প্রথম একপ্রকার ছিল না বললেই চলে, ক্রমে পাড়ার লোকদের সঙ্গে তার পরিচয় হ'লো, অমনি একপাল মেয়ে এসে জুটলো, তাদের মধ্যে যে পাণ্ডা সে কেমন ক'রে না জানি একদিন আবিষ্কার করে ফেললো যে, সীমাদি' এম্‌ব্রয়ডারির কাজে একজন পাকা ওস্তাদ। ব্যস, তখন থেকে সীমার আর কাজের অন্ত নেই। সেই থেকে সীমার আর মধ্যাহ্নে উপন্যাস বা রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী' পাঠ করা হ'য়ে ওঠে না।

মেয়েদের পাণ্ডাটির নাম রাণু। পাণ্ডা হবার যোগ্যতা তার সব দিক দিয়েই আছে। দেখতে যেমন মোটা, তেমনি তার বুদ্ধি, আর তেমনি তার কথার শ্রী। মেয়েরা সবাই তাকে রাণুদা' ব'লে ডাকে। তার নামের পেছনে কবে যে প্রথম কার মুখ থেকে দা' কথাটা বেরিয়ে এলো তা আজও কেউ আবিষ্কার করতে পারেনি, কিন্তু দা' বাদ দিয়ে মেয়েদের কাউকেই বড় একটা তা'কে ডাকতে শোনা যায় না। রাণু প্রথম প্রথম এজন্য যথেষ্ট প্রতিবাদ করে ব্যর্থ হ'য়ে এখন থেমেছে। বলে, মরুকগে,' ওদের যা খুসি তাই ব'লে ওরা ডাকুকগে।'

রাণু তার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে রোজ মধ্যাহ্নে সীমার কাছে আসে। তারপরে সাবানের বাক্সটা খুলে একরাশ সুতো আর কাপড় বের ক'রে বলে, সীমাদি', কাল যে কাশ্মীরি ফোঁড়্‌টা শেখালে না, সেটা ঠিক হ'য়েছে কিনা দেখ'তো?

সীমা বইয়ের পাতা উল্টে রেখে বলে এই হয়েচে, আর একটু টেনে টুনে করলেই দেখতে ভাল হবে।

তারপরে একে একে সকলেই তাদের কাপড়ের নীচ থেকে নিজের নিজের হাতের কাজ বের করে দেখাতে থাকে।

সীমা ভাল করে দেখে উপদেশ দেয় আবার কখনও নিজেই কারও কাজ একটু এগিয়ে দেয়। পড়া আর সেদিন হয় না। দেখতে দেখতে মধ্যাহ্ন গড়িয়ে যায়। ত্রিকূট পাহাড়ের ধূসর মূর্ত্তি আরও ধূসর হয়ে উঠে। বেলা শেষ হয়ে এলে সীমা নিজেই তাদের তাড়া দিয়ে উঠিয়ে দেয়। তারপরে একটু চা তৈরী করে খেয়ে জেঠাইমাকে সঙ্গে নিয়ে বৈদ্যনাথের মন্দিরের উদ্দেশ্য বেরিয়ে পড়ে। প্রায়ই রাণু তাদের সঙ্গে থাকে। দেওঘরে রাণুর আলাপী মেয়ের অভাব নেই। পথে তাদের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হতে সীমার সঙ্গেও তাদের আলাপ পরিচয় হয়ে গেছে। রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলতে হয়ই। জ্যেঠাইমা বিরক্ত হয়ে বলেন, বাবা তোদের আলাপী মেয়েতে যেন রাজ্য ছাওয়া, একপা এগিয়েছি কি অমনি পিছু থেকে ডাক্। আমার যেন মরণ। আর যদি কখনও তোদের সঙ্গে মন্দিরে যাইতো কি বলেচি!

কিন্তু রোজ তাঁকে যেতে হয়ই।

সেদিন রাণু বেলা দশটার সময় হাঁপাতে হাঁপাতে একখানি দৈনিক সংবাদপত্র হাতে এসে সীমাকে খবর দিল, জান সীমাদি, কল্‌কাতায় সেদিন ময়দানের সভায় খুব ধর পাকড় হয়ে গেচে। আমার এক পিসতুতো ভাইকেও ধ'রে নিয়ে গেচে।

বলিস কি!—বলে সীমা এক অজ্ঞাত শঙ্কায় কেমন যেন একটু বিচলিত হয়ে উঠলো। বললো, কাগজে বেরিয়েচে বুঝি? দেখি।

রাণু সীমার হাতে বাংলা সংবাদপত্রখানা তুলে দিয়ে বললো, ঐ অমিয় সান্ন্যাল যার নাম না—সেই হ'চ্ছে গিয়ে আমার বড় পিসীর ছোট ছেলে। পিসিমা কত দুঃখু করেন, তবু যদি ছেলের হুঁস্ হয়। কেবল স্বদেশী নিয়েই আছে। এবার বি,এ পরীক্ষা দেবার কথা ছিল, আর দিয়েচে!

ব'লে রাণু অদ্ভুত একপ্রকার ভঙ্গী ক'রে নিজের পুরু ঠোঁট বেঁকালো। সীমা তা লক্ষ্য করেনি, লক্ষ্য করলে নিশ্চয় না হেসে পারতো না।

সীমার শঙ্কা সত্যে পরিণত হ'তে দেখে সে কেমন নিঃশঙ্ক হ'য়ে উঠলো। আর পরাগের সম্বন্ধে এ ব্যাপারটা এমন কিছু অভাবিতও নয়। কাজেই সীমা পূর্ব্বে যেটুকু বিচলিত হয়েছিল, তা'ও সহজেই দূর হ'লো। সীমা সংবাদপত্রের উপর একটা দ্রুত দৃষ্টি চালিয়ে নিয়ে বললো, কল্‌কাতার সব নেতারাই যে ধরা পড়েচেন দেখ্‌চি, কাউকে আর বাদ রাখেনি।

রাণু তাড়াতাড়ি বললো, পরাগবাবু থেকে সকলকেই ধ'রেচে দেখ্‌চি। আর অমিয়দা' ঐ পরাগবাবুরই ছাত্র কিনা। এইবার ছাত্র মাষ্টার একসঙ্গেই জেল খেটে আসুক। যেমন পিসিমার কথা ওর কাণে যায় না, বেশ হ'য়েচে!

সীমা রাণুর কথা শুনে মনে মনে হাসলো এবং প্রকাশ্যে হাসি গোপন ক'রে বললো, ওদের জেল খাটায় দুঃখ নেইরে রাণু। তা থাকলে কি আর কেউ যায়!

রাণু অতি বিচক্ষণের মত বললো, সেই তো হ'য়েচে জ্বালা সীমাদি'! পিসিমার সেই তো হ'য়েচে বিপদ!

সীমা না হেসে পারলে না। বললো, তা'হোক, সেজন্যে তোরই বা অত দুর্ভাবনাটা কেন?

না আমার আমার আর দুর্ভাবনা কিসের! কাগজখানা রইলো সীমাদি, ওবেলা এসে নিয়ে যাব।—বলে রাণু আবার হাঁপাতে হাঁপাতেই চ'লে গেল। বোধ হয়, অমিয় সান্ন্যাল যে তার পিস্‌তুতো ভাই এবং পিসিমার একান্ত অবাধ্য এই খবরটাই দশজনকে জানাতে গেল।

যেদিন সংবাদপত্রের মারফৎ সংবাদ এলো যে পরাগের ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হ'য়েচে, সেদিনই এক অচেনা হস্তাক্ষরে সীমার কাছে এক চিঠি এলো। সে চিঠি মিনতির লেখা এবং পরাগের বাড়ী থেকেই তা লেখা।

মিনতি লিখেছে, সীমাদি, ভাগ্যচক্রে যে মানুষকে কোথা হতে কোথায় নিয়ে যায় তা মানুষ কোনদিনই ভেবে পায় না। কে জানতো যে, তোমার কাছেও আবার আমাকে একদিন চিঠি লিখতে হবে এবং তা আবার নিজেরই গরজে। পরাগদা'র মুখে তোমার কথা আমি সবই শুনেচি এবং তুমি আমাকে না চিনলেও আমি তোমাকে বেশ চিনি। তোমার সঙ্গে আমার একবার দেখা হওয়া একান্ত দরকার। তোমার সঙ্গে আমার এত কথা আছে

যা চিঠি লিখে শেষ করা যায় না, আর চিঠিতে তা লেখাও চলে না। কাজেই ভাবচি, এবার পূজার সময় দেওঘর বেড়াতে যাব, অবশ্য যদি তুমি তারই মধ্যে এখানে না চ'লে আস'। পরাগদা' কালই হয়তো জেলে চললো। নইলে পরাগদা'কে সঙ্গে নিয়েই দেওঘর বেড়াতে যেতাম। অবশ্য, পরাগদা' তা'তে রাজী হ'তো কিনা তা সেই জানে। ভাগ্যচক্রে তোমার জীবনসূত্রের সঙ্গে আমার জীবনসূত্র যে এমন ক'রে কোনদিন জোট পাকিয়ে যেতে পারে তা কেউ ভাবেনি নিশ্চয়। আর সে জোট খোলবার ভার প'ড়েছে আমারই অক্ষম হাতে। তোমার সাহায্য ছাড়া আমি যে কিছুই করতে পারবো না সে তুমিও হয়তো বোঝ। তোমার সাহায্য ভিক্ষা করতে তাই আজ আমি বাধ্য। এবার পূজায় যদি দেওঘর যাওয়া হয় তবেই সব তোমার কাছে খুলে বলতে পারবো। এ দুনিয়ায় কোন কাজই যে তেমন দুরূহ নয় তা তোমার কাছে আজ চিঠি লিখতে ব'সেই আরও বিশেষ ক'রে উপলব্ধি করলাম। আমার পরিচয়ের মধ্যে বড় জোর বলতে পারি যে, পরাগদা'র মা'র সইয়ের মেয়ে আমি। আমার নাম কখনও তুমি শুনে থাকলেও থাকতে পার।—মিনতি।

চিঠিটা আদ্যোপান্ত প'ড়ে সীমার হাসি পেল। সীমা মিনতিকে চেনে এবং ভাল ক'রেই চেনে, পরিচয়ও তার ভাল ক'রেই জানে, যদিও মিনতির সঙ্গে তার চাক্ষুষ পরিচয় আদৌ নেই। সীমা তাড়াতাড়ি চিঠির কাগজ বের ক'রে কলম হাতে ক'রে উত্তর দিতে ব'সে গেল। কিন্তু যা অতি সহজ তা লিখতে গিয়েও তার হাত কেমন সুস্পষ্ট দুর্ব্বলতায় কেঁপে উঠলো। হঠাৎ মনে হ'লো, এত তাড়াতাড়ি করবারই বা কি আছে। পরাগদা' ছ'মাস জেলে থাকবে যখন তখন একটু ভেবে-চিন্তে একদিন এ-চিঠির উত্তর দিলেই তো চলবে। পরমুহূর্ত্তেই তার আবার মনে হ'লো, ভাববার কিছু নেই এ'তে। পরাগদা'র জীবনকে ব্যর্থ ক'রে দেওয়া ছাড়া তার দ্বারা কোন সাহায্যই আর হ'তে পারে না। বরং পরাগদা'র জীবন সার্থক ক'রে তুলতে নিজের জীবনকে ব্যর্থ করার মধ্যে তবু একটা সার্থকতা আছে, তৃপ্তি আছে। আজীবন দুঃখকে বরণ করা হয়তো তারই গৌরবে সহজ হ'য়ে উঠবে। সীমা দেওঘরের মুক্ত আকাশের পানে চেয়ে চেয়ে এতদিনে ঠিক করেছে যে, কোন দুঃখই মানুষের পক্ষে এত বড় না যা মানুষ সহ্য করতে পারে না। মানুষ দুর্ব্বল হ'তে পারে, কিন্তু মানুষের বল যে কত অপরিমেয় তা মানুষ নিজেই সন্ধান রাখে না। সীমাও এতদিন তা জানতে পারেনি, কোনদিন হয়তো জানতেও পারতো না যদি না সে এমন-ভাবে পশুরাজের গৃহ থেকে বিদ্রোহ জানিয়ে বেরিয়ে আসতে পারতো। দেওঘরে এসে তার নূতন দৃষ্টি লাভ হ'য়েচে। আজ সে অনায়াসেই আবার পশুরাজের গৃহে সমস্ত লাঞ্ছনা অকাতরে বরণ ক'রে নিতে পারে।

সীমা ত্রস্তে লিখে গেল, মিনতি, আমার জীবনসূত্রের সঙ্গে তোমার জীবনসূত্র যদি জোট পাকিয়ে গিয়েই থাকে তো সে দোষ আমার, আর সে জোট খুলতে হবে তবে আমাকেই। দেওঘরে বেড়াতে তুমি আসতে পার; পরাগদা'র জন্যেই তোমাকে একবার আমার দেখা দরকার; কিন্তু ও জোট খুলতে কষ্ট ক'রে তোমাকে এখানে আর আসতে হবে না। আমিই একদিন পাকিয়েছি, আমিই আবার তা খুলে দিলাম। পূজায় তুমি দেওঘরে না এলে বুঝবো যে তুমি অত্যন্ত স্বার্থপর। আমার মত দুঃখভাগিনীর জন্যে তোমার কিছুমাত্র দরদ নেই।—সীমা।

সীমা একটা খামে চিঠিখানা মুড়ে ঠিকানা লিখে চাকরের হাতে তুলে দিয়ে পরম স্বস্তি অনুভব করলো। সীমার সহসা মনে হ'লো, মানুষের মহানুভবতারও সীমা নেই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

মহিলা কবি ৺প্রিয়ম্বদা দেবী

শ্রীমমতা মিত্র

সুপ্রসিদ্ধ মহিলা কবি প্রিয়ম্বদা দেবীর মৃত্যু হয়েছে। এ খবর আকস্মিক নয়, গত কয়েক বৎসর ধরে তাঁর শরীর খারাপ চলছিল, মৃত্যুর চরম আহ্বান-লিপি তাঁর কাছে পৌঁছেছে এটা সকলেই বুঝেছিলেন। প্রথম বসন্তের আবির্ভাবে যখন পত্রে পুষ্পে তরুরাজি বিকশিত হয়ে উঠেছে, দেহ মন স্নিগ্ধ করে দক্ষিণে বাতাস বইছে, প্রকৃতি-লক্ষ্মী তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য্য নিয়ে বিশ্বের দ্বারে সমাগত, এমনই এক ফাল্গুনী সন্ধ্যায় সুকুমার অনুভূতি সম্পন্না একটি সুন্দর কবি-জীবনের অবসান হলো।

প্রিয়ম্বদা দেবী

বংশ পরিচয় ও শিক্ষা

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্রিয়ম্বদা দেবী জন্মগ্রহণ করেন পাবনা জেলার গুনাইগাছা গ্রামে। তিনি স্বর্গীয় কৃষ্ণকমল বাগচী ও সুকবি শ্রীযুক্তা প্রসন্নময়ী দেবীর কন্যা। কলিকাতা হাই-কোর্টের জজ সাহিত্য-রসিক ৺আশুতোষ চৌধুরী এবং বাঙলা গদ্য-সাহিত্যে নব যুগ প্রবর্ত্তক স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর (বীরবল) তিনি ছিলেন ভাগিনেয়ী। প্রথম বিদ্যা শিক্ষা হয় তাঁর কৃষ্ণনগর বালিকা বিদ্যালয়ে। পড়াশুনায় প্রিয়ম্বদা দেবী বরাবরই ভাল ছিলেন। কৃষ্ণনগর বিদ্যালয় থেকে বৃত্তি লাভ করে কলিকাতার প্রসিদ্ধ বেথুন বিদ্যা-মন্দিরে প্রবেশ করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষাতেও তিনি বৃত্তি পান। ১৮৯২ সালে তিনি বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে রৌপ্য-পদক পেয়েছিলেন সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ দক্ষতার জন্য। তিনি যখন গ্র্যাজুয়েট হন সে সময় মহিলা গ্র্যাজুয়েট খুব কম দেখা যেত।

বিবাহিত জীবন

যে বছর তিনি বি-এ পাশ করেন সেই বছরেই তাঁর বিবাহ হয় রায়পুরের খ্যাত-নামা উকিল ৺তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তাঁর বিবাহিত জীবন ছিল মধুময়। কিন্তু এই সুখ স্থায়ী হয় নি। কারণ ১৮৯৫ সালে তাঁর স্বামী-বিয়োগ ঘটে। এ ঘটনায় তিনি অত্যন্ত আঘাত পেয়েছিলেন। এখানেই যে তাঁর দুঃখের শেষ হলো তা নয়। নয়নের মণি একমাত্র পুত্র তারাকুমারকেও বিধাতা মায়ের বুক থেকে অকালে ছিন্ন করে নিলেন। জীবন-মুকুল প্রস্ফুটিত হবার আগে কালের কঠোর স্পর্শে ঝ'রে গেল। এই বেদনা-কণ্টক আমরণ বিঁধে ছিল তাঁর বুকে। সংসার তাঁকে অনাবিল সুখ শান্তি ভোগ করবার অবসর বেশি দেয় নি। উষার আবির্ভাবে ভোরের আকাশে শুকতারা যেমন ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায় স্বামী পুত্রকে ঘিরে রঙিন আশা আকাঙ্ক্ষা-মণ্ডিত

তাঁর জীবন-স্বপ্ন বিলীন হয়ে গিয়েছিল আপন চিত্তাকাশে। সংসার তাঁকে দিয়েছে দুঃখ, তাই কাব্য-লক্ষ্মী তাঁকে পরম স্নেহের সঙ্গে কাছে টেনে নিয়েছিলেন।

প্রকৃতি

প্রিয়ম্বদা দেবী সত্যই ছিলেন প্রিয়ভাষিণী। তাঁর সঙ্গে কথা বলা যথার্থ আনন্দের বিষয় ছিল। যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরাই জানেন একথা। পরের দুঃখে সহানুভূতি, দরিদ্রে দয়া প্রভৃতি বহু সদগুণের তিনি অধিকারিণী ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনকে আমি তাঁর সংস্পর্শে আনবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেম। চার বছর আগে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। প্রথম পরিচয়ের দিন থেকে আমায় তিনি স্নেহের চোখে দেখেছিলেন। একদিনের আলাপেই মনে হয়েছিল যেন তিনি আমার কত আপন। এমনই ছিল তাঁর ব্যবহার।

কবি-প্রতিভা

তিনি গদ্য ও পদ্য রচনায় সিদ্ধ-হস্ত ছিলেন। রেণু, পত্রলেখা ও অংশু এই তিনখানি তাঁর কাব্য-গ্রন্থ। কথা উপকথা, অনাথ ও পঞ্চুলাল বই তিনটি লিখে তিনি বাঙলার ছেলেমেয়েদের মন ভুলিয়েছেন। 'ভক্তবাণী' নামে একখানি ধর্ম্মগ্রন্থও তিনি রচনা করেছিলেন। ভাষা-জননীর চরণ কমলে তাঁর অঞ্জলি দান নিষ্ফল হয় নি। তিনি যে সময় কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন তখন মহিলা কবির সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়। ৺স্বর্ণকুমারী দেবী, ৺কামিনী রায়, শ্রীযুক্তা প্রসন্নময়ী দেবী, মানকুমারী বসু, ৺গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী এঁরা তখন বাঙলার কাব্যাকাশে উজ্জ্বল জোতিষ্ক। এঁদের মাঝে প্রিয়ম্বদা দেবী নিজের স্থান করে নিয়েছিলেন আপনার গুণে। এঁর বিশিষ্টতা ছিল। ইনি লিখতেন ছোট ছোট কবিতা। তাঁর অন্তরের উদারতা, মাধুর্য্য, দুঃখ, সুখ, প্রেম, বাৎসল্য প্রভৃতি রসে কবিতাগুলি ফোটা ফুলের মতই মনোহর। দু-একটি কবিতা উদ্ধৃত করার প্রলোভন সংবরণ করতে পারলেম না। 'অংশু' কাব্য-গ্রন্থের 'স্মৃতি' কবিতাটি এখানে সম্পূর্ণ তুলে দিলেম :—

"আজ মনে পড়ে বাছা হাসিখানি তোর,
দুধের মতন সাদা কচি দাঁত গুলি—
অকারণ আনন্দের আলোকে বিভোর,
গোলাপ কোমল ঠোঁট যবে যেত খুলি!
দীর্ঘ কালো পক্ষ্মে ঘেরা খোলা দুটি চোখ,
আকাশের সব আলো ছিল তারি মাঝে,
সরল চাহনি ভোলা, ভুলাইত শোক—
বুঝিতাম স্বর্গ কোথা ধরায় বিরাজে।
আজিকে আকাশ খোলা অপার আলোকে,
কুন্দ শুভ্র গন্ধরাজ ফুটিছে ধরায়,
তোর হাসিখানি তাই ভাসিছে এ চোখে,
আঁখির কিরণ তোর পরাণ ভুলায়।"

যে সন্তানকে তিনি হারিয়ে ফেলেছেন সেই পলাতক শিশু তাঁর মনোরাজ্য অধিকার করে রয়েছে। আকাশের অপার আলোয়, কুন্দ শুভ্র গন্ধরাজের অতুল রূপ ও গন্ধের মধ্যে তাঁরই বুকের নিধির হাসিখানি, আঁখির কিরণ দেখছেন। পুত্র-শোকাতুরা জননী আপন হৃদয়ের বেদনা দিয়ে এই যে আলেখ্য চিত্রিত করেছেন তা যেমন করুণ তেমনই সুন্দর। একটী ছোট ভাব কি চমৎকার ফুটে উঠেছে।

"চির যৌবন" কবিতায় দেহ ও মনের বর্ণনা করছেন তিনি।

"শ্লথ হবে তনু মোর দৃষ্টি হবে ক্ষীণ,
দেহের লাবণ্য-ধারা হ'য়ে যাবে লীন;
নিবিড় নিকষ কৃষ্ণ কুন্তল আমার
হবে জানি কোনদিন চূর্ণিত তুষার,
পরাণের তরুণিমা ঘুচিবে না কভু,
হে অমর প্রিয়তম তুমি যেথা প্রভু।

দীপ্ত নয়নের আলো লুপ্ত হ'য়ে যাবে,
সঙ্গীতের অধিকার শ্রবণ হারাবে।
কণ্ঠে আসিবে না গান, যাবে স্পর্শসুখ,
দিবে মনোরথ ভাঙি' চরণ বিমুখ!
পরাণের তরুণিমা ঘুচিবে না কভু
হে অমর প্রিয়তম তুমি যেথা প্রভু।"

যৌবনের শেষে জরার আক্রমণে দেহের লাবণ্য ঝরে যাবে, দৃষ্টি হ'বে ক্ষীণ, কণ্ঠ, শ্রবণ, চরণ, হস্ত প্রত্যেকে নিজ

প্রিয়ম্বদা দেবী

নিজ অধিকার হারাবে। অনিবার্য্য এ যে। কিন্তু পরাণের তরুণিমা ঘোচাবার শক্তি কারও নেই, কারণ অন্তর-লোকে আছেন অমর প্রিয়তম, তাই চিত্ত থাক্‌বে চির-তরুণ।

"স্বপ্ন-শিশু"তে কবি বল্‌ছেন—

"তোমারে করিয়া কোলে ঘুম ভাঙে মোর,
তোমারে জাগাই আমি আঁখির সোহাগে,
লইয়া বুকের পাশে স্নেহ সুখে ভোর
কাটে একা রাত্রি মোর তব অনুরাগে।
এ নিদাঘে সারাদিন তুলি বারে বারে,
জীবন-অমিয়া মোর তোমারে পিয়াই,
তৃপ্ত করি, শান্ত করি, ওগো একেবারে
তোমারে অমর আমি করিবারে চাই।"

কী ললিত-মধুর কল্পনা! কবি আপন স্বপ্নজড়িত মোহাবস্থায় বিভোর হ'য়ে হৃদয়গ্রাহী ভাষায় এই কবিতাটি লিখেছেন। কত আর বল্‌ব। এমন অসংখ্য পেলব সুন্দর ফুলে তিনি বঙ্গবাণীর অর্ঘ্য সাজিয়ে গেছেন। এই ফুলগুলির মধুর সৌরভে বাঙ্‌লার কাব্য-কানন আমোদিত হ'য়ে থাক্‌বে।

সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা

আগেই বলেছি তাঁর দেহে মনে সৌন্দর্য্য ছিল অপর্য্যাপ্ত। সব কিছুই তিনি সুন্দর ক'রতে চাইতেন। তিনি যেখানে বাস ক'রতেন সে বাড়ীটি সর্ব্বদাই থাকৃত সুসজ্জিত ও নয়নাভিরাম। বাড়ীখানিকে মনে হ'ত একটি শান্তির নীড়, এমন স্তব্ধ, শান্ত ভাব বিরাজ ক'রত সেখানে; তিনি নিজে কখনও অপরিচ্ছন্ন ভাবে থাকতেন না, সব সময়েই শোভন ও মনোজ্ঞরূপে থাক্‌বার স্পৃহা তাঁর চিরদিন ছিল। তিনি যে কবি-প্রকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেন তার পরিচয় এই সমস্ত ছোট বড় নানারকম বিষয় থেকে পাওয়া যায়।

পরিণত বয়সে আজ তিনি বিধাতার কোলে ফিরে গেছেন। তাঁর পতি-বিয়োগ-বিধুর ও পুত্র-শোকাতুর হৃদয় চির-শান্তি লাভ করুক এই আমাদের ঐকান্তিক কামনা। আমাদের তিনি যা দিয়ে গেলেন তা'র মর্য্যাদা আমরা যেন বুঝি। চোখে আর তাঁকে দেখতে পাব না আমরা, আমাদের দৃষ্টি তাঁকে হারাল, কিন্তু তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে বেঁচে রইলেন, আমরা সত্যই তাঁকে হারাই নি।

শ্রীমমতা মিত্র

৪

সুন্দরবন বেশী দূর নয়; এখান হইতে তিনটা ভাঁটি ও পো দেড়েক জোয়ার মাত্র লাগে। তাই শীতের ক মাসে গোল আর মোম-মধুর নৌকার বড় ভিড়। ষ্টীমারও চলে দু একখানা, তবে সে নিতান্তই সখ করিয়া। ধান কাটার মরশুমে দুই পারের আবাদে বিস্তর বালিহাঁস আসিয়া পড়ে, হাঁস শিকারের লোভে বনকরের অফিসারেরা সেই সময়ে কখন কখন ষ্টীমার ঘুরাইয়া এই পথে আসেন। মরা গোনের সময় জল মরিয়া গিয়া দু চার জায়গায় বালির চড়া জাগিয়া ওঠে, ষ্টীমারের সাধারণ পথ তাই এ নদী দিয়া নয়,—সেই মাথাভাঙার দিক দিয়া ঘুরিয়া চলিয়া যায়। এ অঞ্চলের লোক আঁধার রাতে সার্চ্চলাইটের আলো দেখিতে পায় মাত্র।

অমনি একখানা সখের ষ্টীমার সম্প্রতি গাঙে আসিয়াছে, হুস-হুস শব্দে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উড়াইয়া ভাঁটায় আগাইয়া জোয়ারে পিছাইয়া সমস্তদিনে গড়ে হাত কুড়িক করিয়া চলে। ডেকের উপর চেয়ার পাতিয়া বসিয়া একটা লোক মাঝে মাঝে চা বিস্কুট ও কমলানেবু খান; লোকটি সাহেব—টুপি-পরা সাহেব, ঠিক যেমনটি হইতে হয়। উড়ন্ত বকের ঝাঁক দেখিলে খাওয়া ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ বন্দুকে তাক করেন; গুড়ুম গুড়ুম করিয়া গুলি-বৃষ্টি হয়। বকের অবশ্য কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না তাহাতে। নির্ব্বিঘ্নে তারা দৃষ্টিসীমা পার হইয়া গেলে সাহেব নিশ্চিন্ত চিত্তে পুনরায় প্লেট টানিয়া লইয়া বসেন।

তীরের লোকগুলা কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া হতবাক্ হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে কে একজন রটাইল, সুন্দরবনে যাইবার লোক ইহারা নয়—এ সব জল-পুলিস। এতদিনে কোম্পানী বাহাদুরের টনক নড়িয়াছে, ঢালিপাড়ায় নজর দিতে চর আসিয়াছে, শিকার-টিকার সব মিছা কথা। গতিক দেখিয়া সন্দেহ হইবার কথাই বটে। ষ্টীমারের লোকেরা ষ্টীমারের সঙ্গে যদি পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে ব্যবস্থা করিয়া আসিয়া থাকে ত আলাদা কথা— নহিলে বর্ত্তমান পুরুষে ত সুন্দরবনের ত্রিসীমানায় কারো পৌছিবার কথা নয়। এবং দলের বড়কর্ত্তা সেই সাহেবটি হইতে সুরু করিয়া তাঁহার সঙ্গোপাঙ্গ চেলাচামুণ্ডা – বন্দুকে সকলেরই হাত এমন সাফাই যে এই বিদ্যার বালাই লইয়া ষ্টীমারে উহারা সব শিকারে আসিয়াছে, একথা বিশ্বাস করা অতি শক্ত। ব্যাপার যা-ই হোক, ঢালিপাড়া কিন্তু অকস্মাৎ একেবারে শিষ্টশান্ত হইয়া গেল।

এ কদিন ষ্টীমার একটু আধটু তবু যা হোক নড়াচড়া করিতেছিল, সে দিন দুপুর হইতে একদম নিশ্চল হইয়া বসিল। ভোঁ ভোঁ করিয়া অনবরত বাঁশী বাজিতেছে। কাণ্ডটা কি? ঢালিপাড়ার যে সেখানে ছিল গাঙের ধারে আসিয়া জুটিল। অল্প অল্প ভাঁটার টান ধরিয়াছে, লোক দেখিয়া খালাসীরা চেঁচাইতে লাগিল। দু গাছা কাছি তীরের দিকে ছুঁড়িয়া চেঁচাইয়া বলিল—ধরো সবাই মিলে; টেনে দাও—কসে টানো তোমরা একটু। কাছির আগা

তীর অবধি পৌঁছিল না, জলে পড়িল। রঘুনাথ ইহার মধ্যে নাই, জরুরী ডাক পাইয়া সকালবেলা চৌধুরী-বাড়ি চলিয়া গিয়াছে, এখনো ফিরে নাই। কাজেই সকলে ভানুচাঁদের দিকে তাকাইল।

ভানুচাঁদ মুখ ঝাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল—কাছি টানতে বল্‌ছে কি—কি বল্‌ছে বেটারা, শুনতে পাচ্ছি নাকি আমরা কিছু? চুপ করে থাক্—যে যেমন আছিস।

একজনে ওরই মধ্যে বেশী বিচক্ষণ, সে প্রতিবাদ করিয়া উঠিল। ভানুচাঁদের বয়স কম, একটা কোন মজার নামে লাফাইয়া ওঠে। রঘুনাথ না থাকায় আজ একেবারে নিরঙ্কুশ হইয়া পড়িয়াছে। লোকটি তীরের জনতা দেখাইয়া কহিল—তাহলে বাপু, তাড়িয়ে দিই···ওদের, একেবারে পাড়া ভেঙে এসেছে শেষকালে রেগে টেগে যাবে ওরা? বলিয়া চোখ ঘুরাইয়া ষ্টীমার এবং বিশেষ করিয়া সাহেবকে দেখাইল।

ভানুচাঁদ হাসিয়া খুন। বলিল—রাগে রাগুক। ডাঙায় আসতে হবে না আর। চড়ায় আটকে গেছে—হি—হি—হি। গাঙ সাঁতরে আসবে নাকি? আসে যদি তখন—

—যদি বন্দুক মারে?

—যেমন বক মেরে থাকে? আর একদফা হাসাহাসি চলিল।

বিকাল হইয়া আসিল। ভাটায় জল সরিয়া গিয়া নদীগর্ভ নিকানো আঙিনার মতো তকতক করিতেছে। হঠাৎ দেখা গেল, সাহেব বুট পরিয়া বন্দুক হাতে বীর-বিক্রমে কাদায় নামিতেছেন। সঙ্গে পাঁচ সাত জন লোক কেউ গুলির বাক্স লইয়াছে, কেউ তারের খাঁচা, ছুরি কাঁটা এবং আনুষঙ্গিক আয়োজনগুলাও সঙ্গে চলিয়াছে। অর্থাৎ ব্যাপার আর সোজা নয়। এইবার সাহেব শিকার করিতে ভূতলে নামিলেন। সঙ্গের লোকেরা কখনো আড়কোলা করিয়া—কখনো বা হাত পা গলা মাথা যে যেখানে পারিল ধরিয়া টানাটানি করিয়া কায়ক্লেশে সাহেবকে কূলে আনিয়া হাজির করিল। ততক্ষণে সেখানে আর কেহ নাই, একা ভানুচাঁদ কেবল অবাক হইয়া দেখিতেছিল, এত কষ্টের মধ্যেও সাহেব হাতের বন্দুক, মুখের গালি—কোনটাই ছাড়েন নাই। ভানুচাঁদের সঙ্গেও একবার চোখোচোখি হইয়া গেল। কিন্তু সাহেব শুধু কটমট করিয়া তাকাইলেন, কিছু বলিলেন না। তারপর ঐ বাঁধের উপর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অবলীলাক্রমে ডজনখানেক কমলালেবু উড়াইয়া সাহেব কিছু ঠাণ্ডা হইলেন। সঙ্গের লোকেরা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। খোসা স্তূপাকার হইয়া পড়িয়া রহিল। তারপর শিকারীর দল বাদায় নামিল।

এ হেন ব্যাপারের শেষ না দেখিয়া কোনমতেই ফেরা যায় না। ভানুচাঁদ পিছনে পিছনে চলিয়াছে। হঠাৎ কিন্তু রসভঙ্গ ঘটিয়া গেল। সাহেব থমকিয়া দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভানুচাঁদের দিকে তাকাইয়া আরদালীকে কি কহিয়া দিলেন। আরদালী আসিয়া কহিল—কি সাঙাৎ, যাওয়া হচ্ছে কোথা?

সেই সুরেই ভানুচাঁদ জবাব দিল—বুকের উপর দিয়ে হাঁটছি না ত। অত ব্যথা লাগে কেন? জমিদারের জায়গা—আমারও না, কারো বাবারও না।

ইহার ঠিক মত জবাব দিতে গেলে পাখীর সন্ধান স্থগিত রাখিয়া ঐ খানেই দলশুদ্ধ ফিরিয়া দাঁড়াইতে হয়। সাহেব বোধকরি কথাবার্ত্তা কিছু শুনিতে পান নাই, গজেন্দ্রগতিতে তিনি আগাইয়াই চলিলেন। ভানুচাঁদের পেশীবহুল লম্বা চওড়া দেহ খানির দিকে তাকাইয়া আরদালীও আপাততঃ ক্ষমা করিয়া যাওয়া সমীচীন মনে করিল। সুর সপ্তম হইতে একেবারে খাদে নামিয়া আসিল। বলিল—তুমি চলে যাও দাদা, বাজে লোক সঙ্গে নিইনে আমরা। গোলমাল করে পাখী তাড়িয়ে দেয়।

ভানুচাঁদ বলিল—সে ত তোমারই খুব পারবে। আমি তাড়াব না—দুটো একটা মারব।···আচ্ছা, পুব মুখোই চল্লাম তবে—তোমরা ও-দিকে যাও—ঠিকঠাক বন্দুক মেরো ভাই, আমার ওদিকে যায় যাতে—

হাসিয়া একাকী সে মোড় ঘুরিল। যাইবার মুখে বাড়ী হইয়া গুয়োল-বাঁশটা লইয়া গেল।

দল বল ফিরিয়া আসিয়া আবার যখন বাঁধের উপর উঠিল, তখন বেশ ঘোর হইয়া আসিয়াছে। আয়োজন একেবারে নিরর্থক হয় নাই, তারের খাঁচায় একটা মরা কাক। বাঁধের ধারে একটা টিপয় পড়িয়াছে, ষ্টীমারে উঠিতে আবার এখনি কাদায় পড়িতে হইবে, গোধূলির আলোটুকু থাকিতে

থাকিতে সাহেব তাড়াতাড়ি তাই দু' হাতে মুখের মধ্যে রসদ বোঝাই করিতেছেন। হঠাৎ ওদিকে ভানুচাঁদ আসিয়া উঠিল; গান করিয়া হাসিয়া গুরোল-বাঁশ নাচাইয়া আস্ফালন করিতে লাগিল—এ হল দেশী বন্দুক—দেখ, ভাই সব। পোড়া মাটির গুলি—কার নাক ভাঙব বলো? মন্তোর পড়ে ছাড়ব —চলে যাবে বোঁ-ও-ও-ও—

গর্ব্ব করিবার কথাই বটে। দড়ি দিয়া বিশ কুড়িটা বুনো হাঁসের পা বাঁধিয়া ঝুলাইয়া আনিয়াছে—কতকগুলি মরে নাই তখনও। তারই দু-তিনটা একসঙ্গে ডাকিয়া উঠিতে সাহেব চমকাইয়া তাকাইয়া দেখিলেন। খাওয়া তখন প্রায় সমাধা হইয়াছে। আগাইয়া আসিয়া সাহেব বলিলেন—হাসিস্ কেন?

ভানুচাঁদ ভালমানুষের মত কহিল—ঐ কাকটা কি মরে পড়েছিল, না,—হুজুর মেরেছেন?

সে কথার উচ্চবাচ্য না করিয়া সাহেব বলিলেন—তোর ঐ পাখীগুলো দিয়ে দে।

—কেন?

একজনে ইঙ্গিতে ভানুচাঁদকে কাছে ডাকিয়া কহিল—বড্ড ভাল সাহেব রে—টাকা পাবি। দিয়ে দে—

ভানুচাঁদ কহিল—টাকা কি হবে? চৌধুরীর খাই, কাঁসী বাজাই—টাকা আমরা চাই না—

আরদালীর সঙ্গে পরিচয় সকলের আগে; বোধ করি সেই সুবাদেই সে আরও তিন চার জনকে লইয়া ভানুচাঁদকে একেবারে ঘিরিয়া ফেলিল। বলিতে লাগিল—পাখী ক'টা দাও ভাই। ষ্টীমারের সারেঙ-খালাসী সব বেটা হা-পিত্যেস বসে বসে পথ তাকাচ্ছে। হুজুর বলে এসেছিলেন সবাইকে, রাত্রে গোস্ত হবে।

সাহেবও বেশী দূরে ছিলেন না, সমস্তই কানে যাইতেছিল। কালো রঙের সাহেব, অতএব বুঝিতেও কিছু কষ্ট হয় না। অনেকটা আপনার ভাবেই বলিলেন—কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! একটা পাখী আজ আমাদের ওদিকে ছিল না। ঐ কাকটা কেবল। নইলে কি আর—

অনেক বলাবলিতে ভানুচাঁদের বোধকরি অবশেষে করুণা হইল। আচ্ছা—বলিয়া সে পাখীর দড়ি খুলিতে বসিল। একজনে ছুটিয়া গিয়া তারের খাঁচাটা টানিয়া আনিল, সাহেব শিষ দিতে দিতে গুলির বাক্সে চাবি আঁটিতে লাগিলেন, আর একজনে উপদেশ দিল—একটা একটা করে খোল ভাই। এমনি সময়ে হঠাৎ ভানুচাঁদ তড়াক করিয়া লাফাইয়া যেন নৃত্য সুরু করিল।—উড়ে গেল, ঈশ—সমস্ত উড়ে গেল যে—। তারপর মিনিট খানেক শূন্যপানে সে এমনি ভাবে তাকাইয়া রহিল, মাথায় যেন তার বাজ পড়িয়াছে বা অমনি একটা কিছু। হাতে তখন সত্যই একটা পাখীও নাই। উড়িয়াছেই বটে। নিতান্ত যেগুলা মরিয়া গিয়াছিল, উড়িতে উড়িতে সেগুলা টুপ করিয়া নদীর জলে পড়িয়া গেল। জ্যান্তগুলা সাদা পাখা নাড়িতে নাড়িতে নদীপারে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। দাঁত বাহির করিয়া সকলের মুখের দিকে তাকাইয়া ভানুচাঁদ হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ইহার পর সাহেবের আর ধৈর্য্য রহিল না, বজ্রগর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, রাগের বশে ইংরাজী বাংলার বাছ বিচার রহিল না।—চালাকী পেয়েছিস্, ইউ গাধা রাস্কেল। ধরে আন্ ওটাকে—ঘুঘু দেখেছে, ফাঁদ দেখেনি—

চীৎকার গোলমালের মাঝখানে একে দুয়ে দেখিতে দেখিতে কোথা হইতে দশ বারো জন ঢালি ভানুচাঁদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। বাঁধের এদিকে ওদিকে কাছাকাছি কোথাও উহারা ছিল নিশ্চয়। সাহেব চীৎকার করিতে লাগিলেন—কে আছিস্, নিয়ে আয় আমার চাবুকটা ষ্টীমার থেকে। আর বেঁধে নিয়ে আয় ঐ বেটাকে এক্ষুণি—

চাবুক আনিতে সকলেরই উৎসাহ। চক্ষের পলকে পাঁচ-সাত জনে কাদা ভাঙিয়া ষ্টীমারে উঠিয়া পড়িল। কিন্তু বাঁধিয়া আনারই একান্ত লোকাভাব। যে রকম মালকোঁচা আঁটিয়া গুরোল-বাঁশ হাতে সারবন্দী সব দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে সকলেই সকলকে বিপুল উৎসাহে আগে ঠেলিয়া দেয়, নিজে কেহ আগাইতে চায় না। সাহেবের গর্জ্জন সমভাবে চলিতে লাগিল, বন্দুক ঠুকিতে ঠুকিতে বাঁধের মাটি এক বিঘৎ বসিয়া গেল, অথচ আসামী নিতান্ত যদি নিজে হাত-পা বাঁধিয়া হাজির না হয়, তাহাকে আনিবার কোন ব্যবস্থাই শেষ পর্য্যন্ত হইয়া উঠিল না।

অনেক ঠেলাঠেলি তর্কাতর্কি পরামর্শের পর সকলে পিছাইয়া একেবারে গাঙের ধারে চলিয়া আসিল।

সাহেব গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—কি ?

একজনে কহিল—বড্ড শাসাচ্ছে হুজুর,—গাঙের জলে চুবিয়ে দেবে। সন্ধ্যেবেলা—শীতের দিন—

আর একজনে বলিল—চাবুক-টাবুক নয় হুজুর। যে ক'টা বন্দুক আছে সব নিয়ে আসতে হুকুম দিন। ডাকাত-দুষমন এরা—পঙ্গপালের দল। এই ফাঁকার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও সব চালাকী কথা নয়—

হুজুর হুকুম দিলেন—আনো বন্দুক।

যে আজ্ঞে,—বলিয়া তৎক্ষণাৎ আর একদল বন্দুক আনিতে ষ্টীমারে উঠিল। তাদের দেরী হইতেছে বলিয়া আর একদফায় আজও কজন। হঠাৎ ভানুচাঁদ ও ঢালিরা হো-হো করিয়া হাসিয়া প্রান্তর নদীকূল হাসিতে তরঙ্গিত করিয়া বাঁধ বহিয়া ধীরে ধীরে পাড়ার দিকে ফিরিয়া চলিল। সাহেবের হাতের বন্দুক যেমন ছিল, তেমনি রহিল;—পিছনে তাকাইয়া দেখেন, বন্দুক আনিতে একে একে সকলেই ষ্টীমারে গিয়া উঠিয়াছে: তিনিই কেবল একা। অন্ধকার বেশ গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে; একদম সাড়া শব্দ নাই। বিরক্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—মরলি নাকি সব ?

ষ্টীমার হইতে জবাব আসিল—না।

সাহেব কৃতার্থ হইয়া কহিলেন—তা হলে বিছানা পেতে ঘুম হচ্ছে নাকি ?

ইহারও বিনীত জবাব আসিল—আজ্ঞে না। একটু আহারাদি হচ্ছে।

রাত্রি প্রহরখানেক হইয়া গেল, কিন্তু ঐ একটু আহারাদি চলিতেই লাগিল, শেষ হইবার নাম নাই। নদীকূলে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সাহেবের শীত ধরিয়া গিয়াছে। অধীর কণ্ঠে অবশেষে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—তোরা ফাঁসীর খাওয়া খেয়ে নিচ্ছিস, বেটারা ?

—আজ্ঞে না। যৎসামান্ত।

—জোয়ার এসে গেল যে।

কথাটা সত্য কিনা পরখ করিতে একজনে রেলিঙ দিয়া লণ্ঠন উঁচু করিয়া ধরিল। উচ্ছল তরঙ্গ প্রায় বাঁধের ধার অবধি ভরিয়া তুলিয়াছে, ষ্টীমার তরঙ্গের আঘাতে মন্দ মন্দ দুলিতেছে। খুসী হইয়া লোকটি বলিতে লাগিল—তবে ত সুবিধে হল হুজুর, জাহাজ ভেসে উঠেছে, একদম ডাঙার ধারে লাগাবো। উঠা-নামার আর অসুবিধা হবে না। এই এলাম আমরা।

টুলে বসিয়া ঝিমাইতে ঝিমাইতে কোন সময়ে সারেঙের একটু ঘুম আসিয়া গিয়াছে। সাহেবের চেঁচামেচিতে চমকিয়া জাগিয়া উঠিয়া ভোঁ ভোঁ করিয়া বাঁশী বাজাইল। সার্চ্চ-লাইটের আলো পড়িল জলের উপর। একবার ডাহিনে একবার বা বামে ঘুরাইয়া আগাইয়া পিছাইয়া অনেক কষ্টে অনেক যত্নে অবশেষে ষ্টীমার যখন কূলের কাছাকাছি আসিল, তক্তা ফেলিয়া দিতে সাহেব আর দৃকপাত না করিয়া উপরে উঠিয়া আসিয়া একেবারে চিমনীর ধারে চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িলেন। শীতের হাওয়া দিতেছিল। সাহেব ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিলেন, পর্দ্দা ফেলিতে। যাহাকে বলা হইল, সে করিৎকর্ম্মা লোক; কেবলমাত্র পর্দ্দা ফেলাইল না, কেবিনে পুরু করিয়া বিছানাটাও পাতিয়া দিল।

কত রাত্রি তার হিসাব নাই, নদীর উপর ষ্টীমার পর্দ্দা মুড়ি দিয়া পড়িয়া আছে। চারিদিক নিষুপ্ত, ইঞ্জিনের ষ্টীমেও যেন একটা অতিকায় ঘুমন্ত জন্তুর নিঃশ্বাসের শব্দ হইতেছে। একটা খালাসী নীচের ডেকে শুইয়া শুইয়া নাক ডাকাইতেছিল। হঠাৎ সে চমকিয়া উঠিল; কোথায় যেন ইঁদুর নড়িতেছে। খড় খড় করিয়া পাতা-লতার বোঝা ঠেলিয়া ইঁদুরের মতো কি-একটা বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। তারপর খেয়াল হইল, বাড়িঘর ত নয়, ষ্টীমারে ইঁদুর আসিবে কোথা হইতে! সজাগ হইয়া চোখ বুঁজিয়া সে পড়িয়া রহিল। শব্দ শুনিল—স্পষ্ট খস্ খস্ শব্দ—শিয়রের দিকে, খানিকটা ওধারে। ষ্টীমারে লণ্ঠন আছে পাঁচ-সাতটা, এ দিকটাতেও পোষ্টের সঙ্গে একটা বাঁধা আছে বটে, কিন্তু ঝুল-কালিতে তার এমন অবস্থা যে আলোর চেয়ে সেটা আঁধার বাড়াইয়াছে বেশী। হঠাৎ জলের মধ্যে একটা ভারী বোঝা পড়িয়া যাওয়ার মতো শব্দ হইল, লাফাইয়া উঠিয়া

পর্দ্দার ফাঁকে মুখ বাড়াইয়া দেখে, কুয়াসামগ্ন জ্যোৎস্নায় ভরা জোয়ারে একখানা নৌকা ষ্টীমারের গা ঘেঁসিয়া দ্রুত পলাইয়া যাইতেছে। চকিতে অমনি একটা সন্দেহ মাথা চাড়া দিয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি আগাইতে গিয়া কমলানেবু পায়ে ঠেকিতে লাগিল, পায়ের আঘাতে কতকগুলা জলে ছিটকাইয়া পড়িল, কতকগুলো পায়ে পায়ে চেপ্টা হইয়া গেল। আলো খুলিয়া আনিয়া বিস্তর কষ্টে ঠাহর করিয়া দেখে, যা ভাবা গিয়াছিল তাই; নৌকা যে চুপি চুপি আসিয়া কেবল ষ্টীমার দেখিয়া ফিরিয়া গিয়াছে তাহা নয়, সাহেবের বাছাই-করা গণিয়া-রাখা নেবুর দুটো ঝুড়িই অন্তর্দ্ধান করিয়াছে—আর কি কি গিয়াছে ভাবিয়া চিন্তিয়া হিসাব করিয়া দেখিতে হয়। মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল, টর্চ্চ জ্বলিল, বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ হইতে লাগিল, সাহেব ট্রাউজারের ফিতা কসিতে কসিতে ঘুমচোখে ছুটিয়া আসিলেন। বৃত্তান্ত শুনিয়া ঘুম ত উড়িয়া গেল চক্ষের পলকে, সাহেব গুম হইয়া রহিলেন, পাঁচ সাত মিনিট কথা বলিতে পারিলেন না। তারপর হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন—ওঠো, চলো সব।

উঠিতে ত কারো বাকী নাই, কিন্তু চলিতে বলিলেই চলা—এই শীতের রাত্রে সেটা বড় সহজ কথা নয়। পর্দ্দার একটু কোণ তুলিয়া দেখিতে গিয়া হাড়ের মধ্য অবধি কনকন করিয়া উঠে, এ অবস্থায় চোর ধরার চেয়ে কম্বল জড়াইয়া আবার শুইয়া পড়িতে সকলের উৎসাহ বেশী। নৌকা দৃষ্টিসীমার একবারে অতীত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সাহেবের বোধকরি মনে মনে তখনও আশা, চোরেরা যখন দুহাতে নৌকা বাহিবার কাজে ব্যস্ত তখন ঝুড়ি সামনে লইয়া বসিবার ফাঁক এখনো পায় নাই। অতএব সেই ফাঁক পাইবার আগেই গিয়া পড়িতে পারিলে কাল সকাল বেলা এই লোনাজলের দেশে আর যাই হোক একেবারে নির্জ্জলা উপবাস করিয়া মরিতে হইবে না। তাড়াতাড়ি কোন গতিকে সজ্জা সমাপন করিয়া সকলের আগে তিনি কূলে নামিয়া দাঁড়াইলেন।

কাজেই ওদিকেও সমারোহে তোড়জোড় আরম্ভ হইল। নৈশ শীত-বায়ুতে সাহেব একাকী ঠকঠক করিয়া কাঁপিতে সুরু করিয়াছেন, চেঁচাইয়া জোর দেখাইবার মতো অবস্থাও তাঁর নাই। শেষ পর্য্যন্ত আবার সিঁড়ি বহিয়া উঠিয়া একটা করিয়া হাত ধরিয়া সকলকে নামাইতে হইবে কিনা ভাবিতেছেন, এমনি সময়ে হাতিয়ার-পত্র লইয়া সাঙ্গোপাঙ্গেরা হুড়মুড় করিয়া বীরবিক্রমে নামিয়া আসিল।

কোন দিকে তিলমাত্র সাড়াশব্দ নাই, নির্জ্জন অস্পষ্ট জ্যোৎস্না থমথম করিতেছে। ক্রমে ঢাসিপাড়ার কাছাকাছি আসিয়া তারা আলের ধারে সারবন্দী দাঁড়াইল। বাবলা বনে অজস্র জোনাকী ঝিকমিক করিতেছে। পিছনের একজন আগে আসিয়া সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় যাওয়া হচ্ছে, হুজুর?

চলিতে চলিতে দেহ ইতিমধ্যেই একটু নরম হইয়া উঠিয়াছিল। সাহেব ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন—নেমন্তন্ন খেতে।

লোকটি বলিল—আজ্ঞে না, খাওয়াতে—সে বুঝেছি। কিন্তু কথাটা বুঝে দেখুন, হুজুর। রাত্তিরবেলা—কে কি রকম মানুষ—একেবারে পাড়াশুদ্ধ ঘাঁটা দিয়ে···বুঝে দেখুন কথাটা—তার চেয়ে কাল সকালে বরং ··

সাহেব বলিলেন—বলেছ ভাল, তবে এক কাজ করো। চর হয়ে তুমি বরঞ্চ দেখে এসো। আমরা দাঁড়াই এখানে।

লোকটার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, এমন জানিলে হিতোপদেশ দিতে কদাপি আসিত না। দশজনের পরামর্শ মতোই সে মুখপাত্র হইয়া আগাইয়াছিল; উদ্দেশ্য, চোর ধরাটা এইভাবে আবার স্থগিদ হইয়া যাইবে। উল্টা উৎপত্তি হইয়া বসিতে সে হতভম্বের ভাবে পিছনের সঙ্গীদের দিকে তাকাইয়া রহিল। রাত্রে ভাল মুখ দেখা যায় না কিন্তু সাহেবের কথা-বার্ত্তা একটুকুও যে আর কারো কানে গিয়াছে ভাবভঙ্গীতে এমন মনে হইল না,—সহযাত্রী হইতে কেহই আগাইল না, একটা মুখের কথাও কেহ বলিল না। সাহেব পুনশ্চ বলিলেন—সেই ভাল হে। তুমি চলে যাও, চুপিচুপি সন্ধান নিয়ে এস। বুঝে দেখলাম বটে, সমস্ত পাড়া ঘাটানো ঠিক নয়।

বোধকরি আকাশের ক্ষীণ চন্দ্রকেই সাক্ষী করিয়া লোকটা তখন করুণ মুখে অগ্রসর হইল। সাহেব পিছন হইতে বলিলেন—ফিরো কিন্তু—ডুব দিয়ে বোসো না। দাঁড়িয়ে রইলাম—

—দুর্গা! দুর্গা!—ও কি কথা। সে মনে মনে যা করিতে গেল তা প্রকাশ করিয়া বলার কথা নয়। কিন্তু ফিরিয়া

আসিল অনতি পরেই। উৎফুল্ল স্বর। ফিস-ফিস করিয়া কহিল—আসুন। গুঁড়ি মারিয়া সে আগে আগে চলিল।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—গিয়েছিলে ত সত্যি সত্যি?

এই দেখুনসে এসে—বলিয়া রাগের বশে ধাঁ করিয়া লোকটি পাশের উঠানে ঢুকিয়া পড়িয়া কি কতকগুলা তুলিয়া আনিল। টর্চ টিপিয়া দেখা গেল, লেবুর খোসা। চোরেরা বুদ্ধিমান সন্দেহ নাই; বামাল বোধ করি শেষ করিয়াই রাখিয়াছে, হাতে-নাতে ধরিয়া ফেলার উপায় রাখে নাই। দারুণ আক্রোশে সদলবলে সাহেব সেই উঠানে গিয়া উঠিলেন। অনেকক্ষণ হইতেই একটা একটানা আওয়াজ আসিতেছিল, যেন বিশ-পঁচিশটা কামারশালে হাপর টানিতেছে। উঠানে যাইতেই সেটা আরো প্রবল হইয়া কানে যাইতে লাগিল। নজর করিয়া দেখা গেল, হাপর নয়—নাক। খোলা দাওয়ায় মাদুরের উপর মরদগুলো পাহাড়ের মতো পড়িয়া পড়িয়া ঘুমাইতেছে। সেই পাহাড়ের নাসারন্ধ্র দিয়া যেন ঝড় বহিয়া যাইতেছে। সাহেব বন্দুকের ঘোড়া টিপিলেন, নিশীথ রাত্রে নদীকূলে সেই আওয়াজ ধ্বনিত হইয়া ফিরিতে লাগিল, লোকগুলা কিন্তু পাশ ফিরিয়াও শুইল না।

বন্দুকে হইল না, ইহার পর একটিমাত্র উপায় বন্দুকের কুঁদা দিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখা। বোধ করি তারও অন্যথা হইত না, সাহেব একেবারে মরীয়া—কিন্তু তার আগেই হঠাৎ একটি দীর্ঘ ছায়ামূর্ত্তি রাস্তা হইতে ছুটাছুটি করিয়া একেবারে উহাদের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

সাহেব হাঁকিলেন—খাঁড়া রও—

লোকটি হুকুম মান্য করিল; ঘাড় নীচু করিয়া সেলাম করিল।

—তুমি কে?

লোকটি বলিল—সর্দ্দার। আমি বাড়ি ছিলাম না; ছোঁড়াগুলো গোলমাল করেছে নাকি, কর্ত্তা?

দলের সর্দ্দার সামনে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে, সাহেব মনে মনে ভারী স্ফূর্ত্তি করিয়া রঘুনাথকে তাক করিয়া বন্দুক উঠাইলেন।

রঘুনাথ একেবারে হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।—মারবেন না কর্ত্তা; একদম মরে যাব। রক্ষে করুন—

সাহেব অটল। বন্দুক তেমনি ধরাই আছে। দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়িলেন।—না, চোর তোরা সব—

—আজ্ঞে না, কক্ষনো না, আমরা বুঝিনে কিছু, দোষ-দিষ্টি মাপ করুন—আমরা নাবালক—

চাঁদের মৃদু আলো, তার উপর গোটা দুই তিন টর্চ্চের আলো, রঘুনাথের কাঁচাপাকা দাড়ির উপর আসিয়া পড়িল। নাবালকের কথায় সাহেবের লোকজন সব হাসিয়াই খুন। ইহার পর বন্দুক দেখাইয়া আর কি হইবে, হাত নামাইয়া হাসিমুখে সাহেব বলিলেন—তা সত্যি, দাড়ি দেখে নাবালক বলেই ঠেকছে বটে। মারব না তোকে, আচ্ছা ঐগুলোকে ওঠা, দেখি ওরাই বা কি?

রঘুনাথ শেষের কথায় মনোযোগ না দিয়া দাড়িতে হাত বুলাইয়া বলিল—আজ্ঞে, এ দাড়ি কিন্তু আমার নয়—

—কার?

চণ্ডীমা'র—

এবারে হাসির তুমুল রোল উঠিল। সাহেব অনেক কষ্টে হাসি সামলাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—চণ্ডীমা'র আবার দাড়ি উঠল কবে?

রঘুনাথ কিন্তু হাসিঠাট্টার ধার দিয়াও গেল না; মহা গম্ভীর হইয়া বলিতে লাগিল—ও বছর বাবুদের সঙ্গে বরণডাঙার একটু ঠোকাঠুকি হয়। ওদের চিন্তামণি রুখে দাঁড়াল—এগুনো গেল না। ফিরতে হল। দু'চারটে আঁচড় লাগল পিঠে। চৌধুরী মশায় ঠাট্টা করলেন। মা চণ্ডীর কাছে মানত করে তাই চুল দাড়ি রাখলাম। মা দিন দেন ত তাঁর পায়ে নামিয়ে রেখে আসব একদিন—

একজনে টিপ্পনী কাটিল—আজকে যা নমুনা দেখলাম, সর্দ্দার—ও দাড়ির আশা চণ্ডীমার কোন কালে নেই—

নিতান্ত কৃতার্থ হইয়া একগাল হাসিয়া রঘুনাথ বলিল—আজ্ঞে, আমারও এর পরে বড্ড মায়া,—হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া ঘর হইতে এক মাদুর আনিয়া বলিল—বসুন, কর্ত্তা। তামাক সাজব?

এত আপ্যায়নেও সাহেব বসিলেন না। বলিলেন—না। ডাক ওদের?

—ষ্টীমারে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে নাকি?

—লেবুর ঝুড়ি দুটো। সেই সঙ্গে আর যা যা নিয়েছে। সাহেব বলিতে লাগিলেন—এই যদি করে ত ভালো, নইলে তোমার কোন চালাকিতে ভুলছি নে।

রঘুনাথ জিভ কাটিয়া পড়িল।—বলেন কি কর্ত্তা? চালাকি করলাম কখন?...কিন্তু ওরা ত সে রকম ছেলে নয়। কর্ত্তার জিনিষ পত্তোর আর কারা নিয়ে গিয়েছে। আপনারা ভুল করে এসেছেন—

—আর এগুলোও ভুল করেও এসেছে নাকি? যে লোকটাকে কপালক্রমে চর হইতে হইয়াছিল, জ্যোৎস্নার আলোয় আঙুল দিয়া সে উঠানের পাশে দেখাইল।

তবু রঘুনাথ তর্ক ছাড়ে না।—ও ত খোসামাত্তোর—লেবু নয়। আপনি একবার বুঝে দেখুন, কর্ত্তা।

এমনি সময় ভানুচাঁদ হঠাৎ দাওয়ার উপর পাশমোড়া দিয়া উঠিয়া বসিল।

—গোলমাল কিসের?

রঘুনাথ একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিল।—হারামজাদারা খোসা কুড়িয়ে এনে উঠোনে রেখে এখন নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিস। এদিকে দিল যে সাবাড় করে।

ভানুচাঁদ দাওয়া হইতে লাফাইয়া উঠানে পড়িল। রঘুনাথ বলিতে লাগিল—লেবু আনিসনি তা জানি, কিন্তু খোসা ত এনেছিস। ও-ও ত কর্ত্তার। ধর্ পায়ে ধর্, দয়াময়ের রাগ পড়ে যাবে—

ভানুচাঁদ বিদ্রূপের কণ্ঠে কহিল—তাই ধরতে দেবে সাহেব? দেবে নাকি? তা একা ত নই। দলবল ডাকি। আয় রে জিতু, ভোলা, মহেশ—চলে আয় পা ধরতে।

হি-হি করিয়া হাসিতে হাসিতে ভূতের মতো একের পর এক ছায়ামূর্ত্তি হঠাৎ দাওয়া হইতে নামিয়া আসিল। তারপর আনাচ কানাচ হইতে আরও অনেকে ছুটিয়া আসিয়া পাশাপাশি দাঁড়াইতে লাগিল। ভানুচাঁদ হাসিতে হাসিতে বলিল—এস সর্দ্দার তুমি ধরবে সাহেবের ডান ঠ্যাং আর আমি বাঁয়েরটা। দেখা যাক টেনে, গায়ের বল কার বেশী; তোমার না আমার—...আর তোরা যা ঐ নন্দীভৃঙ্গীগুলোর দিকে। দু-দুজনে এক একটাকে নিয়ে পড়।

যে কথা সেই কাজ। তেরে-রে করিয়া ভক্তিমান জোয়ানগুলা লাফাইতে লাফাইতে পা ধরিতে আসিল। সাহেব আর দিশা না পাইয়া বন্দুক ছুঁড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে আরও দু-তিন জনে ছুঁড়িল। বাবলাবনে কয়েকটা পাখী জাগিয়া উঠিয়া কিচমিচ করিয়া উঠিল। ও বাবা গো—বলিয়া রঘুনাথও অমনি সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে গড়াইয়া পড়িল।

বিস্মিত, নিশ্চেতন পাথরের মতো ঢালিরা। ছুটিয়া আসিয়া সকলে রঘুনাথকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তারপর ক্রন্দনাকুল শত কণ্ঠ নৈশ বাতাসে ধ্বনিত হইতে লাগিল—সর্দ্দার! সর্দ্দার!

সাহেবও হতভম্ব হইয়া গেছেন। পিছনের লোকেরা অবাক। ভীত বিপন্ন দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—কে ছর্‌রা দিয়েছিলি? ফাঁকা দেওড় করার কথা ছিল না?

—তাই ত হয়েছে।

—ছাই হয়েছে। সহসা গভীর গর্জ্জনে সাহেব চমকিয়া স্তব্ধ হইয়া গেলেন। সর্দ্দারের চারিপাশে ভিড় করিয়া যাহারা দাঁড়াইয়া বসিয়া ছিল, সকলের মধ্যে মাথা উঁচু করিয়া ভানুচাঁদ বলিয়া উঠিল—তোমরা থাকো এখানে—সর্দ্দার মরছে। কিন্তু যারা মারল ওকে, আমি তাদের সঙ্গে মোলাকাৎটা সেরে আসি।

লাফাইয়া উঠিয়া ছুটিয়া সে সাহেবের দলের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতে যায়। রঘুনাথের জ্ঞান ছিল, তার হাত ধরিয়া ফেলিল—ক্ষীণ কণ্ঠে মানা করিতে লাগিল—যাসনে রে ভানুচাঁদ, আমার কথা শোন—যাসনে।

ভানুচাঁদ মাথার ঝাঁকড়া চুল ঝাঁকাইয়া বলিয়া উঠিল—ভয় নেই, তোমার জ্ঞান থাকতে থাকতেই ফিরে আসব। মরবার সময় একটু হেসে মরতে পারবে, সর্দ্দার। আমি আসি—হাত ছাড়ো—

রঘুনাথ হাত ছাড়িল না, বলিতে লাগিল—তোরা বাবারা নিমিত্তের ভাগী হতে যাস নে, আমার শেষ কথাটা শোন। নির্দ্দোষীকে খুন করে গেল, ওদের ত ফাঁসী হবে। কোম্পানীর রাজত্বে নিস্তার নেই কিছুতে—

ভানুচাঁদ হাত ছাড়াইবার জন্য ছটফট করিতে লাগিল। কিন্তু মরিতে বসিয়াও রঘুনাথের গায়ের বল অল্প

নয়; আবার মুমূর্ষুর গায়ে কোথাও ব্যথা না লাগে। অধীর কণ্ঠে সে কহিতে লাগিল—ঐ ওরা পালিয়ে গেল, ছাড়ো—ছাড়ো—

রঘুনাথ কাতরাইতে কাতরাইতে কহিল—কোথায় যাবে? কোম্পানীর জাল পাতা রয়েছে। তুই ভানুচাঁদ বড্ড ক্ষেপা। আমার সামনে তোরা সার বেঁধে দাঁড়া—আর যারা যাবা আছে সবাইকে খবর দে—কেউ যেন বাদ থাকে না। আমার এই শেষ হুকুম—

ভানুচাঁদ বলিয়াছিল ঠিকই। এদিকে যখন একের পর এক সমস্ত ঢালিপাড়ার মেয়ে-পুরুষ মুমূর্ষুকে ঘিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সাহেবের দল ততক্ষণে ত্বরিত পায়ে ষ্টীমারে চড়িয়া সিঁড়ি তুলিয়া লইল। সাহেব বারম্বার দাঁতমুখ খিঁচাইয়া বলেন—ষ্টীমে জোর দে—শূয়ার ব্যাটারা, আরও জোর—

জল কাটিয়া পূর্ণবেগে ষ্টীমার ছুটিতেছে, কেবিনে গিয়া সাহেব তিষ্ঠাইতে পারিলেন না; বারম্বার মনে হয় পিছনে পিছনে ফাঁসের দড়িও বুঝি সমান বেগে ছুটিয়া আসিতেছে। সারেঙ্গ ও খালাসীগুলা উদ্বাস্ত হইয়া উঠিতেছে, সাহেব হাঁকিতেছেন—জোরে চালা—আরও—

৫

বোধকরি অত কথা কহিবার শ্রমেই রঘুনাথ অবসন্ন ভাবে চোখ বুঁজিয়া এলাইয়া পড়িল। বুকে কোথায় আঘাত লাগিয়াছে, উপুড় হইয়া দুইহাতে সেই আহত স্থান চাপিয়া ধরিয়াছিল। সন্তর্পণে একটু সরাইয়া দিয়া জায়গাটা দেখিবার চেষ্টা হইতেই হি-হি করিয়া হাসিতে হাসিতে মরণোন্মুখ রঘুনাথ তড়াক করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বলিল—তাড়িয়ে দিলাম চালাকী করে। দেখ্ ত—

আর দেখিবার কিছু নাই। ষ্টীমার ততক্ষণে বাঁক পার হইয়া পূর্ণবেগে চলিয়াছে। দলশুদ্ধ হাসিয়া ধুলায় উপর লুটোপুটি খাইতে লাগিল।

রঘুনাথ বলিল—সাহেব লোক। গোলমাল করতে আছে? কে জানে···হয়ত বা জল-দারোগা টারোগা হবে। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। দেখ্ তো কতদূর গেল।

দেখিবে আর কি, কান পাতিয়া কয়েক মুহূর্ত একটু স্থির হইয়া শুনিল—একটা গুমগুম আওয়াজ ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইয়া দূরে মিলাইতেছে। রঘুনাথ হাসিতে হাসিতে বলিল—সাহেব কিন্তু বড্ড দাগা পেয়ে গেল। ও হারাম-জাদারা, বলি লেবুগুলো সব সাবাড় করেছিস নাকি?··· কিন্তু কি রকম হল বল দিকি একবার! চৌধুরী মশায় আসছেন, কাজ-কর্ম্ম রয়েছে···আমি ত ফিরে এসে দেখে শুনে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, এসব কি গেরো—

চৌধুরীর আসার কথায় সকল কথা তলাইয়া গেল। এক সঙ্গে বিশ পঁচিশটা ব্যগ্র কণ্ঠ—কখন আসবেন তিনি? কখন? কখন?

—এই রাত্রে।

আনন্দে মরদগুলার যেন লাফাইয়া নাচিতে ইচ্ছা করে। বলিল—ওঃ অনেক দিনের পরে। মশালের জোগাড় রাখব নাকি, সর্দ্দার?

রঘুনাথ বলিল—সে কথা হয়নি ত—সে সমস্ত বোধ হয় নয়। চৌধুরী মশায় বল্লেন শুধু, আমি যাবো—তুমি এগুতে লাগো, সর্দ্দার।

ঢালিপাড়ায় কেহ ঘুমায় নাই। বাইন কাঠের বড় বড় কুঁদা জ্বলিতেছে, তাহাই ঘিরিয়া সকলে জাগিতেছে। নানারকম গল্প চলিতেছে, দা-কাটা তামাক পুড়িতেছে খুব। তারপর জ্যোৎস্না ডুবিয়া গেল। চারিদিকে আবছা আবছা অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ শোনা গেল, ঘোড়ার খুরের শব্দ খটাখট-খটাখট—। লোকগুলা উঠিয়া দাঁড়াইল।

নরহরি চৌধুরী একলাফে নামিয়া সকলের সামনে দাঁড়াইলেন। গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন—কাল সকালে পঁচিশখানা লাঙল নামবে সখীসোনার চকে···

আনন্দোচ্ছল সুরে ভানুচাঁদ জিজ্ঞাসা করিল—তা হলে কি দিয়ে দিয়েছে ওরা? ভাল হল চৌধুরী মশায়···বেশ হল—খাসা হল—

চৌধুরী হাসিলেন, এ হাসি আগে যারা দেখিয়াছে তারা শিহরিয়া কাঁপিয়া উঠে। রঘুনাথের দিকে তাকাইয়া নরহরি প্রশ্ন করিলেন—কেউ জানে না এখনো? সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়িয়া গেল, কত বড় নিরর্থক এই প্রশ্ন। নরহরি নিজে আসিয়া না বলা পর্য্যন্ত তাঁর কথা অতি বড় সুহৃৎকে ভুল করিয়া কেহ বলিবে না;—ইহা ঢালিপাড়ার চিরদিনের বিধি।

নরহরি হাসিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিলেন—ওরা চক দেয় নি—আমাদের নিতে হবে। খান পঁচিশেক লাঙ্গল এখানে এসে পৌঁছুবে রাতারাতি। কাল তোমরা পঁচিশ জনে তাই নিয়ে চকের খোলে নামবে—

ভানুচাঁদের মুখ এক মুহূর্ত্তে ছাইয়ের মতো হইল, তার সকল উৎসাহ নিভিয়া গেল। হাতের লাঠিখানার উপর সে মাথাটা কাৎ করিয়া দিল।

রঘুনাথ পাশে দাঁড়াইয়া ছিল। কহিল—কিহল রে ভানু?

ভানু নিরুত্তর।

একটুখানি ঠেলা দিয়া রঘুনাথ আবার ডাকিল—কথা বলছিস না কেন? কি হল তোর?

ভানুচাঁদ বলিল—ওসব আমি পারব না, সর্দ্দার। মাথা নাড়া দিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিল—না—কিছুতেই পেরে উঠব না, বুঝলে? সে দিন এল কোদাল, আজ আসছে লাঙ্গল। তবু ত কোদালের কাজ ছিল রাত্তির বেলা। দিন দুপুরে চাষাদের সঙ্গে লাঙল ঠেলতে পারব না আমি—। বলিতে বলিতে ভানুচাঁদের গলা ধরিয়া আসিল।

প্রায় সমস্ত কথাই নরহরির কানে যাইতেছিল। বলিলেন—ও রঘুনাথ, বলে কি ছোকরা?

রঘুনাথ বলিবার আগেই ভানুচাঁদ আগাইয়া গিয়া দাঁড়াইল। বলিল—চৌধুরী মশায়, তোমার কামারে কেবল কোদাল আর লাঙ্গল গড়ছে—সড়কী-বল্লম গড়ে না আজকাল? ছিলাম ঢালি, এখন কি চাষা বানিয়ে তুলবে আমাদের?

চৌধুরী হাসিতে লাগিলেন। তারপর বলিলেন—হুকুম দিয়ে দিয়েছি বাপু, হাকিম নড়বে ত হুকুম নড়বে না। কাল সকালে পঁচিশখানা লাঙল নামবেই সখীসোনার চকে—আর বাঁধের উপর বসে তামাক-টামাক খাবে জন পঞ্চাশ। তা ছাড়া গাঙের খোলে নৌকোর মধ্যে—ঘুমোতে পারে, দাবা-পাশা খেলতে পারে—তাও ধর আরও শ খানেক আন্দাজ। তুমি কোন দলে থাকবে, ভানুচাঁদ?

ভানুচাঁদ আগ্রহের সুরে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—আমার ঐ তামাক খাওয়ার কাজ। লাঠি আর হুঁকো নিয়ে বাঁধে আমি টহল দিয়ে দিয়ে বেড়াব—ঐটে বেশ হবে।

প্রসন্নমুখে সকলের দিকে তাকাইয়া নরহরি ঘোড়ায় চড়িয়া সপ্ করিয়া চাবুকের ঘা দিলেন। মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—কিন্তু লাঙলের কাজটাও মন্দ ছিল না হে। মাটি চষতে হবে না বেশী—বরণডাঙার কেউ যদি আসে বুকের উপর দিয়ে ফলা টান্‌তে হবে। পারবে তোমরা?

হাঁ হাঁ—করিয়া অনেকগুলা কণ্ঠস্বর একসঙ্গে বাঘের মতো গর্জ্জন করিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে নরহরি অদৃশ্য হইয়া গেলেন। ঢালিরা যে যার ঘরে ফিরিতে লাগিল। ভানুচাঁদকে উদ্দেশ করিয়া রঘুনাথ বলিল—লাঙল একটু ধরে-টরে রাখলে বুদ্ধির কাজ হত কিন্তু, এই দেখনা আজকের কাণ্ড…কোম্পানীর নজর পড়ে যাচ্ছে, সে দিনকাল আর থাকছে না বাপু। বন্দুক গুলি-গোলার পাল্লায় লাঠি আর কদ্দিন?

ভানুচাঁদ হাসিয়া বলিল—যদ্দিন এই হাত দুখানা কাটা না যাচ্ছে, সর্দ্দার। মরদমানুষের হাত থাকবে, লাঠি থাকবে না—এ কি রকম কথা?

পায়ের নীচে জোয়ারের জল ছলছল করিয়া লাগিতেছে। রঘুনাথ বড় স্নেহে ভানুচাঁদের কাঁধে হাত রাখিল। ভানুচাঁদ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, মুখের সামনে মুখ আনিয়া বলিতে লাগিল—ভাবছ কেন সর্দ্দার? যদ্দিন চলে চলুক, যখন চলবে না, গাঙের জল ত আর শুকিয়ে যাবে না?

(ক্রমশঃ)

শ্রীমনোজ বসু

স্বর্গীয়া প্রিয়ম্বদা দেবী

বিগত ৪ঠা ফাল্গুন ১৩৪১ বাঙালাদেশের অন্যতমা মহিলা কবি শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী পরলোক গমন করেছেন। ১৮৭১ সালে প্রিয়ম্বদা দেবী জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৬৪ বৎসর হয়েছিল। তাঁর অশীতিপরা বৃদ্ধা জননী "বনলতা" রচয়িত্রী শ্রীযুক্তা প্রসন্নময়ী দেবী এখনো জীবিত আছেন। এই বৃদ্ধ বয়সে সন্তান-শোকে তিনি অভিভূত হয়েছেন সন্দেহ নেই। আমরা তাঁকে আমাদের ঐকান্তিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

১৮৯০ সালে প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ পরীক্ষা পাশ করেন এবং সংস্কৃতে বিশেষ পারদর্শিতার জন্য রৌপ্য-পদক লাভ করেন। দুই বৎসর পরে শ্রীযুক্ত তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁর বিবাহ হয়। কিন্তু ১৮৯৫ সালেই তারাদাসের মৃত্যু ঘটে। নিয়তির নিষ্ঠুর পীড়ন এই অকাল-বৈধব্যেই শেষ হয় নি, ১৯০৬ সালে প্রিয়ম্বদা দেবী তাঁর একমাত্র পুত্র তারাকুমারকে হারাইলেন! স্বামী পুত্র হারানোর নিদারুণ শোক তাঁর চিত্তে বেদনার যে চিরস্থায়ী রেখা অঙ্কিত ক'রে দিয়েছিল তাঁর কাব্যরচনার মধ্যে চিরদিনই সেই বেদনার একটি সুস্পষ্ট সুর শুনতে পাওয়া যেত। পুত্রের মৃত্যুর পর প্রিয়ম্বদা দেবী বহু জনহিতকর কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করেন।

'রেণু', 'অংশু', পত্রলেখা', 'অনাথ', 'ভক্তবাণী' প্রভৃতি পুস্তক প্রিয়ম্বদা দেবীর রচিত। তাঁর মৃত্যুতে বাঙলা ভাষা ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কুমার শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়

আগামী মে মাসে স্পেনে ইণ্টারন্যাশনাল লাইব্রেরী কংগ্রেসের অধিবেশন বসবে। ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরূপে তা'তে নিমন্ত্রিত হয়েছেন নিখিল-ভারত-পাঠাগার সংসদের সভাপতি কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়। তদুদ্দেশ্যে শীঘ্রই তিনি স্পেন দেশে যাত্রা করবেন এবং কংগ্রেস অধিবেশনের পর ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের লাইব্রেরী পরিচালনা পর্য্যবেক্ষণ ক'রে তিনি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করবেন।

আমাদের দেশে পাঠাগার আন্দোলন সম্বন্ধে রায় মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম, মনোযোগ এবং কর্ম্ম-তৎপরতার কথা বিচিত্রার পাঠকগণের অবিদিত নেই। তাঁর লিখিত এবং তাঁর বিষয়ে লিখিত বহু প্রবন্ধ বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়েছে। পাঠাগারের মধ্য দিয়ে লোকশিক্ষার যে বিশিষ্ট উপায় আছে তদ্বিষয়ে প্রভূত সহায়তার দ্বারা রায় মহাশয় দেশের মঙ্গল বিধান করেছেন। এ-জন্য বাঙলাদেশ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। তাঁর যোগ্যতার প্রতি ইণ্টারন্যাশনাল লাইব্রেরী কংগ্রেসের সম্মান প্রদর্শনে আমরা অতিশয় আনন্দিত হয়েছি। বিদেশে গৌরবের সহিত কর্ত্তব্য সম্পাদন ক'রে সুস্থ শরীরে রায় মহাশয় দেশে ফিরে আসুন সর্ব্বান্তঃকরণে আমরা এই কামনা করি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষা

আগামী ১৩৩৯ সাল হ'তে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা একমাত্র ইংরাজি সাহিত্য ভিন্ন অপরাপর বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীগণের নিজ নিজ মাতৃভাষায় (যথা-প্রয়োজনে বাঙলা, হিন্দু, উর্দ্দু বা আসামীতে) দিতে হবে, এমন ব্যবস্থা করা হচ্ছে। শিক্ষা প্রদানের দিক দিয়ে এ-ব্যবস্থা যে মঙ্গলপ্রদ হবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই। রাজ্য পরিচালনার, আইন-আদালতের এবং দেশ-বিদেশের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান ভাষা ব'লে ইংরাজি ভাষা ভারতবর্ষের অপরিহার্য্য ভাষা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং ইংরাজি ভাষা শিক্ষার প্রতি অবহেলা করলে চলবে না। সে বিষয়ে পাকা ব্যবস্থা রাখতে হবে। কিন্তু একটি দুরূহ বিদেশী ভাষার পাঠ্য-পুস্তকাদি পাঠ ক'রে এবং সেই ভাষায় পরীক্ষাদি দিয়ে অকারণ যে অধ্যবসায় ক্ষয়িত হয় তার হাত থেকে মুক্তিলাভও আবশ্যক। কিন্তু ইংরাজি ভাষা যখন আজকাল ভারতবর্ষের মধ্যে এবং বাহিরে বিভিন্ন জাতিগণের পরস্পরের মধ্যে সাধারণ চিন্তা-চর্চ্চা কার-কারবারের বাহন, তখন বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি বিষয়গুলির ইংরাজি বিশেষ শব্দসমূহ (technical terms) জানা না থাকলে অন্যান্য জাতির সহিত লিখিত এবং মৌখিক আলোচনায় অসুবিধা ঘটবে কি-না সে কথাও ভেবে দেখা উচিত।

Edited by Upendranath Ganguly, Printed by Saratchandra Mukherjee at The Sreekrishna Printing Works
259 Upper Chitpore Road, and published from 27/1 ... Calcutta
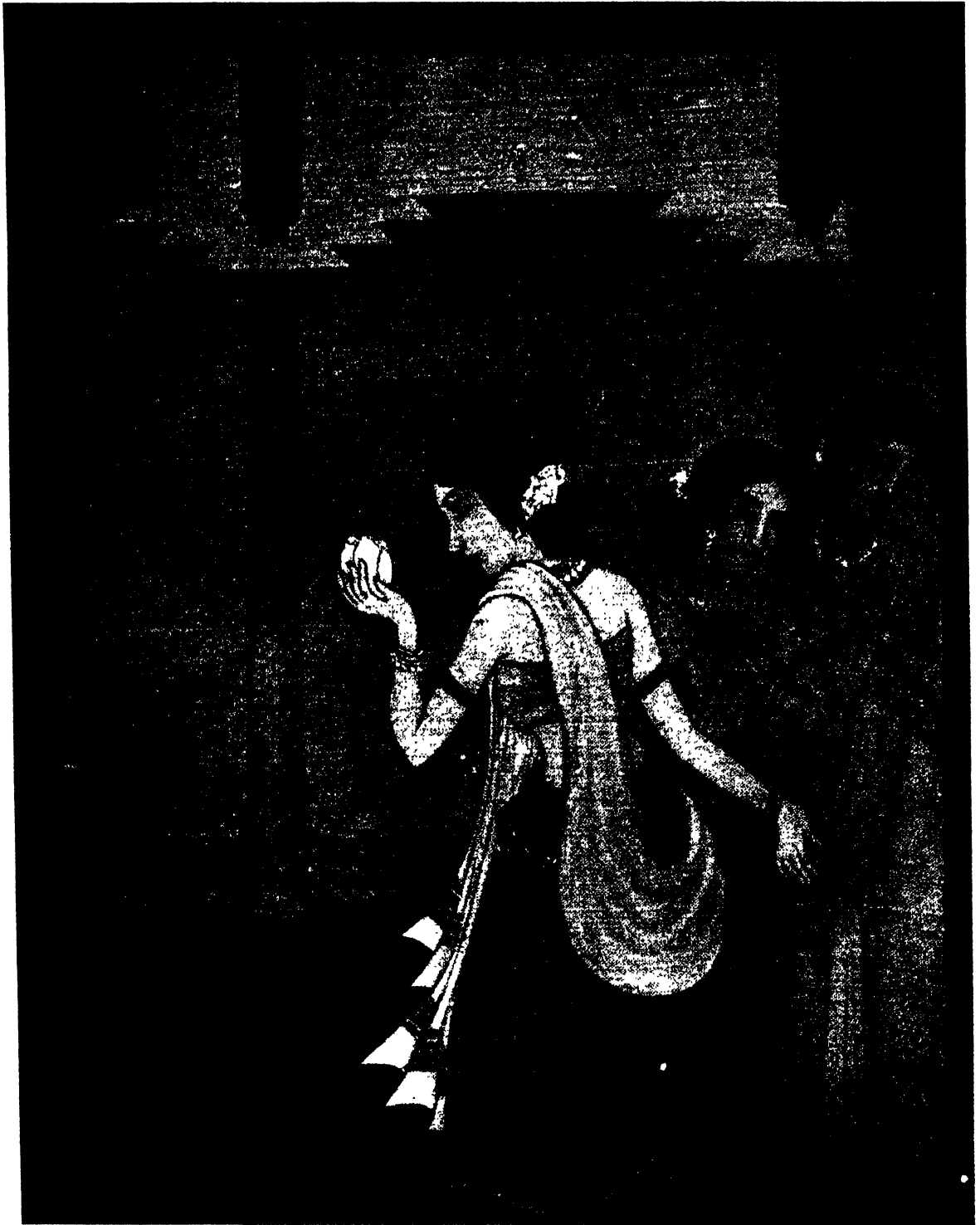
বিচিত্রা
বৈশাখ ১৩৪২

গায়িকা

শ্রীযুক্ত ভি-আর চিত্রা

অষ্টম বর্ষ, ২য় খণ্ড	বৈশাখ, ১৩৪২	৪র্থ সংখ্যা

অতীত বাণী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মনে হয়েছিল আজ সব ক'টা দুর্গ্রহ
চক্র ক'রে বসেছে দুর্মন্ত্রণায়।
অদৃষ্ট জাল ফেলে' অন্তরের শেষতলা থেকে
টেনে টেনে তুল্‌ছে নাড়ি-ছেঁড়া যন্ত্রণাকে।
মনে হয়েছিল অন্তহীন এই দুঃখ ;
মনে হয়েছিল, পন্থহীন নৈরাশ্যের ধাঁধায়
শেষ পর্য্যন্ত এমনি ক'রে
অন্ধকার হাৎড়িয়ে বেড়ানো ;
মনে হয়েছিল, বাসা গেছে ডুবে
ভাগ্যের ভাঙনের অপঘাতে

এমন সময়ে সদ্য বর্ত্তমানের
প্রাকার ডিঙিয়ে দৃষ্টি গেল
দূর অতীতের দিগন্তলীন
বাগ্‌বাদিনীর বাণীসভায়।
যুগান্তরের ভগ্নশেষের ভিত্তিচ্ছায়ায়
ছায়ামূর্ত্তি বাজিয়ে তুলেছে রুদ্রবীণায়
পুরাণখ্যাত কালের কোন্ নিষ্ঠুর আখ্যায়িকা।

দুঃসহ দুঃখের স্মরণতন্তু দিয়ে গাঁথা
সেই দারুণ কাহিনী।
কোন্ দুর্দ্দাম সর্ব্বনাশের
বজ্র-ঝঞ্ঝনিত মৃত্যুমাতাল দিনের
হুহুঙ্কার ;
যার আতঙ্কের কম্পনে
ঝঙ্কৃত করেছে বীণাপাণি
তার বীণার তীব্রতম তার।

দেখতে পেলেম
কত কালের দুঃখ লজ্জা গ্লানি,
কত যুগের প্রজ্জ্বলন্ত মর্ম্মস্রাব
সংহত হয়েছে,
ধরেছে দহনহীন বাণীমূর্ত্তি
অতীতের সৃষ্টিশালায়।
আর তার বাইরে প'ড়ে আছে
নির্ব্বাপিত বেদনার পর্ব্বতপ্রমাণ ভস্মরাশি,
জ্যোতির্হীন, বাক্যহীন অর্থশূন্য।

শান্তিনিকেতন
৪।৪।৩৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ফাল্গুন-পূর্ণিমা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার বনে বনে ধরলো মুকুল
বহে মনে মনে দক্ষিণ হাওয়া।
মৌমাছিদের ডানায় ডানায়
যেন উড়ে মোর উৎসুক চাওয়া॥
গোপন স্বপন কুসুমে কে
এমন সুগভীর রং দিল এঁকে,
নব কিশলয় শিহরণে
ভাবনা আমার হলো ছাওয়া॥
ফাল্গুন পূর্ণিমাতে
এই দিশাহারা রাতে
নিদ্রাবিহীন গানে
কোন নিরুদ্দেশের পানে
উদ্বেল গন্ধের জোয়ার তরঙ্গে
হবে মোর তরণী বাওয়া॥

দোল পূর্ণিমা

১৩৪১

[র্সা -া -া -া]

ধ না II না র্সা র্সর্রা -র্সনা । র্সা -া -া -র্রা I না না র্সা র্রা । না র্সা ধা না I

আ মার ব নে ব • • • নে • • • ধ র ল মু কু ল্ আ মার

• I না র্সা র্সর্রা -র্সনা । র্সা -া র্সা র্সা I ণা র্রা র্রা র্সা । ণা -ধা পা মা I

ব নে ব • • • নে • ব হে ম নে ম নে দ • ক্ষি ণ

I পা র্সা র্ণা -া । -ধা -া ধা না I না র্সা র্সর্রা -র্সনা । র্সা -া -া -া I

হা ও য়া • • • আ মার ব নে ব • • • নে • • •

I ণা র্রা র্রা র্রা । র্সা র্সা র্সা -র্রা I ন র্সা র্সা ণা -ধা । ধা ণা পা মা I
মো উ মা ছি দে র ডা • না য় ডা • না য় যে ন

I মা পা পা ধা । ণা ণা র্সা র্সা I ণা র্সা র্সণা -া । -ধা -া ধা না I
উ ড়ে মো র উ ৎ সু ক চা ও য়া • • • আ মার

I না র্সা র্সর্রা -র্সনা । র্সা -া -া -া I -া -া ধা না । না র্সা র্রা র্সা I
ব নে ব • • • নে • • • • • আ মার ব নে ব নে

I না না র্সা র্রা । না র্সা ণা ধা I পা পর্সা ণা ধা । পা -া গা মা I
ধ র ল মু কু ল্ ব হে ম নে ম নে দ • ক্ষি ণ

I পা র্সা ণা -া ।- ধা ।- -ধা না II
হা ও য়া • • • আ মার

II { র্সা র্সর্মা র্মা র্মা । র্মা র্মা র্মা র্মা I র্গর্মা র্পা র্মর্পা -র্মা । -র্গা -র্গা র্গা র্গা I
গো প • ন স্ব প ন কু সু মে • • কে • • • • এ মন

I র্গা র্গর্মা র্মা র্মা । র্গর্মা -া র্গা র্গা I র্রর্গা -র্মর্গা র্রর্সা -া । (-া -া -া -া) I
সু গ • ভী র র ং • দি ল এ • • • কে • • • • •

। -া -া ধা না I না র্সা র্সা র্সা । র্সর্রা র্না র্সা -র্রা I র্জ্ঞা -া র্জ্ঞা র্জ্ঞা ।
• • ন ব কি শ ল য় শি • হ র • ণে • ন ব

। র্রর্জ্ঞা র্জ্ঞা র্রা র্সা I র্সর্রা ণা র্সা র্রা । র্জ্ঞা -া -া -া I মা মা পা -া ।
কি শ ল য় শি • হ র • ণে • • • ভা ব না •

-া -া -া -া I মা পা ধা পা । ধা ধা না র্সা I ণা র্সা র্সণা -া । -ধা -া ধা না II
• • • • ভা ব না আ মা র হ লো ছা ও য়া • • • আ মার

II { সা সা রা রা । রা -গা রা গা I গা -মা মা -া । -া -া মা মা I
ফা ল্ গু ণ পূ • র্ নি মা • তে • • • এ ই

I মা পা পা -ধা । পা -ধা -পা -র্সা I ণা -া ধা -া । (-পা -মা -গা -রা) } I
দি শা হা • রা • • • রা • তে ০ • • • •

-া -া -া -ণা I { না -া র্সা র্সা । র্সা র্সা র্সর্রা -না I র্সা -া -া -া । -া -া র্সা র্সা I
• • • • নি • দ্রা বি হী ন গা• ০ নে • • • • • কো ন্

I না র্সা -র্রা র্রা । র্রা -র্সা নর্সা -র্রা I র্সা -া -ণা -া । -ধা -া -া -ণা } I
নি রু • দ্দে শে র পা• • নে • • • • • • •

I র্সা র্সা র্সর্মা র্মা । র্মা র্মা র্মা র্মা I র্মা গর্পা র্পা র্মা । র্মর্পা র্পা র্মা র্গা I
উ দ্ বে ল গ ন্ ধে র জো য়া• র ত র • ঙ্ গে •

I র্গা র্গর্মা র্মা র্মা । র্গর্মা র্রর্গা র্সা -র্রা I ণা র্বা র্সা -র্রা । -ণা -র্সা ধা না II
হ বে • মো র ত• র• ণী • বা ও য়া • • ০ আ মার

স্বরলিপি—শান্তিদেব ঘোষ

[গত দোল পূর্ণিমার দিনে এই গানটি রচিত ক'রে সুর দিয়ে উৎসব সভায় কবি নিজে গেয়েছিলেন। বিঃ সঃ]
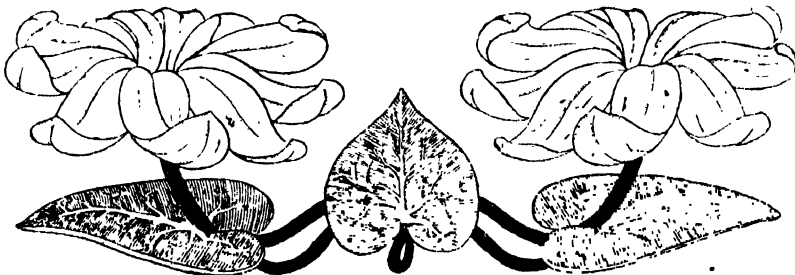
আধুনিক বাঙ্গলা কথা-সাহিত্যে কল্পনার দৈন্য

অধ্যাপক নন্দলাল চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, পি-এইচ্-ডি

বাঙ্গলার কথাসাহিত্য আজ বিশ্বের সাহিত্য দরবারে উচ্চস্থান পাবার উপযুক্ত হয়েছে সে সম্বন্ধে অন্ততঃ বাঙ্গালী সাহিত্যানুরাগীর কোন সন্দেহ নেই, যদিও আমাদের সে ধারণা যে কতটা যুক্তিসঙ্গত সেটা যাচাই করবার সময় এখনো আসেনি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যেদিন নোবেল প্রাইজ পেয়ে বাঙ্গলার মুখ উজ্জ্বল করলেন, সে দিন হতে সাধারণ বাঙ্গালী এই কথাই ভেবে এসেছে যে তার ভাষা ও সাহিত্য নগণ্য বা হীন নয়, বিশ্বসাহিত্যে নিশ্চয় তার একটা বিশিষ্ট স্থান আছে, তা নইলে বাঙ্গলা গীতিকাব্য য়ুরোপে অতটা শ্রদ্ধা ও বিস্ময় জাগিয়ে তুলতে পারত না। এরূপ চিন্তায় যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ মেলে, কিন্তু এটা ভেবে দেখবার দিন এসেছে যে আমাদের কথাসাহিত্য যে পথে ও যে রূপে আজকাল বিকশিত হয়ে উঠেছে সেটা সত্যই বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্য ও মর্য্যাদার পরিচায়ক কি না।

এ সম্বন্ধে অবশ্য কোন মতভেদ নেই যে, বাঙ্গলার কথাসাহিত্য পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও ভাবধারার সংস্পর্শে ও প্রভাবে গড়ে উঠেছে, এবং তাতে লজ্জিত হবারও কিছু নেই। সাহিত্য জগতে এরূপ দেনাপাওনা প্রথম নয়, অগৌরবের কথাও নয়। বরং বাঙ্গালীর গৌরব করবার কথা এই যে তার গল্প উপন্যাস মূলতঃ ধার করা জিনিস হলেও তাতে তার নিজস্ব একটা ছাপ দেখা গিয়েছে, যেটাকে তার মৌলিক সৃষ্টির পূর্ব্বাভাষ বলে স্বীকার না করলে সত্যের অপলাপ করা হবে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্র বাঙ্গলা কথাসাহিত্যে যেরূপ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তাতে একথা অবশ্যই বলা চলে যে বাঙ্গলা উপন্যাস বা ছোট গল্প সবটাই বিদেশী রীতি ও ভাবের অনুকরণ নয়। কিন্তু একথা কি আমরা সত্যই জোর গলায় বলতে পারি যে আমাদের গল্প উপন্যাস পাশ্চাত্য প্রভাব হতে সম্পূর্ণ মুক্তি পেয়ে নিজের একটা সমগ্র রূপ পরিগ্রহ করেছে? দুঃখের বিষয়, সে কথা বলা যায় না। একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে বাঙ্গলা কথাসাহিত্য এখনো অনুকরণযুগ হতে সম্পূর্ণ পাশ কাটাতে পারে নি, এখনো তার নিজস্ব সত্ত্বা, বা স্বতন্ত্র রূপ দেখা যায় নি। বাঙ্গালী কবি আজ পাশ্চাত্য সাহিত্য হতে প্রেরণা পাবার জন্য উৎসুক নন, কিন্তু বাঙ্গলার ঔপন্যাসিক এখনো বিদেশী কথাসাহিত্য হতে শুধু প্রেরণাই নয়, ভাব বস্তু, এমন কি গল্পাংশও ধার করে নিতে লজ্জিত হচ্ছেন না। বাঙ্গলার উপন্যাস বা গল্প বাহ্যরূপে বাঙ্গালী হলেও জাতি বা গোত্র হিসাবে এখনো কতকটা বিদেশী।

এখন প্রশ্ন ওঠে, "আমাদের কথাসাহিত্যের এরূপ দৈন্য কেন?" এর উত্তর অবশ্য এক কথায় দেওয়া যায় না। প্রথমে মনে রাখতে হবে যে কথাসাহিত্যের সৃষ্টি তখনই সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, যখন সামাজিক পরিস্থিতির সহিত জাতির মনোজগতের সত্যিকার একটা যোগ থাকে। এই যোগের অভাবে যে উপন্যাস গড়ে ওঠে তা অস্বাভাবিক ও কষ্টকল্পিত হতে বাধ্য, তার সহিত দেশের সংস্কৃতির কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। এই প্রকারের কথাসাহিত্য বিদেশী সাহিত্যসৃষ্টির অক্ষম অনুকরণ না হয়েই থাকতে পারে না। আধুনিক বাঙ্গালা গল্প উপন্যাসে এখনো আমাদের সমাজ ও ভাবধারার একটা আন্তরিক যোগ বা ঐক্য সম্পূর্ণরূপে পরিলক্ষিত হয়নি। যতদিন তা না হচ্ছে, ততদিন বাঙ্গালা কথাসাহিত্য সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না।

আজকালকার অধিকাংশ বাঙ্গলা গল্প, বা উপন্যাস পড়লে এই কথাই মনে হয় যে গল্পের যে পারিপার্শ্বিক তা যেন পাশ্চাত্য সমাজেরই ছায়া মাত্র। বাঙ্গলার মাটির,

বা নাড়ীর সহিত তার কোন জ্ঞাতিত্ব নেই। বাঙ্গালী লেখক কি নিজের দেশের ও সমাজের পরিস্থিতি হতে রসবস্তু আবিষ্কার করতে পারেন না? শরৎচন্দ্র কি সে পথ দেখান নি? তবু আধুনিক ঔপন্যাসিকের কল্পনার দৈন্য কেন এখনো দূর হয়নি?

প্রথম কারণ এই যে, আমাদের সামাজিক জীবনের পরিধি এত বেশী সঙ্কীর্ণ যে তা থেকে উচ্চশ্রেণীর গল্পের উপাদান সংগ্রহ করা প্রকৃত প্রতিভা না থাকলে সহজ নয়। কাজেই সাধারণ গল্প লেখক বিদেশী গল্পের ভাবাংশ আত্মসাৎ করতে বাধ্য হন।

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, বিদেশী গল্পের বাঙ্গলা রূপান্তর জনপ্রিয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। নীতিবাগীশ সমালোচক যাই বলুন না কেন বাঙ্গলার সাধারণ পাঠক পাঠিকা ঐ ধরণের প্রেমের গল্পই আজকাল পড়তে চায়, তাই বাজারের চাহিদা যখন ঐরূপ, লেখক তখন তাই যোগাতে তৎপর; আর প্রকাশকগণের দৃষ্টি যে আর্থিক লাভের দিকেই থাকে তা বলাই বাহুল্য।

তৃতীয় কারণ এই যে চিত্তাকর্ষক বিদেশী ফিল্মের অত্যধিক প্রচলন হওয়ায় লোকের ও সেই সঙ্গে লেখকের রুচির পরিবর্ত্তন হয়েছে। সেটা সুলক্ষণ, না কুলক্ষণ, সে সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন, মোট কথা এই যে বিলাতী ফ্যাসানের গল্প যে পাঠক সমাজের প্রীতিকর, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বাঙ্গালী লেখকও যে সিনেমার সংক্রামক প্রভাব হতে মুক্ত নন তার প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া গিয়েছে। ছবির পরদায় বিদেশী সমাজের যে প্রতিচ্ছবি দেখা যায় তার আবেদন যে কত গভীর, ও তার প্রতিক্রিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যে কত দূর ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে তার হিসাব ক'জন করেছেন? একথা বল্লে অত্যুক্তি হবে না যে বিদেশী ফিল্ম আমাদের আধুনিক কথাসাহিত্যকে এক উৎকট বিজাতীয় আকৃতি প্রদান করছে।

চতুর্থ কারণ হচ্ছে "একটা নতুন কিছু"র হুজুগ। গতানুগতিক, একঘেয়ে গল্প না লিখে নবীন লেখকেরা তাঁদের সাহিত্য সৃষ্টির ভিতর নূতনত্ব আমদানী করতে চান, বলা বাহুল্য এই নূতনত্ব বেশীর ভাগই শুধু বিদেশের সমস্যা, ভঙ্গী বা চিন্তার অপরূপ খিচুড়ী। বাঙ্গালী লেখক যদি প্রতিজ্ঞা করেন যে তিনি সেই চিরন্তন কন্যাদায়, শাশুড়ী-বউর ঝগড়া, পল্লীসমাজের দলাদলি, জমিদার পিতা-পুত্রের মনোমালিন্য, হোষ্টেল-মেসের রোমান্স, গণিকার আত্মত্যাগ, পুণ্যের জয়, পাপের পরাজয়, প্রভৃতি নিয়ে আর গল্প লিখবেন না, তাহলে তাঁকে অগত্যা পাশ্চাত্য কথাসাহিত্যের কাছে দ্বারস্থ হতে হয়। এ ছাড়া আর গত্যন্তর কি? যাঁরা পুরাতন 'থোড়-বড়ি-খাড়া' অবলম্বন করে এখনো গল্প লিখতে প্রয়াসী, তাঁদের সংখ্যা যে অল্প, ও জনপ্রিয়তা যে ক্রমেই তাঁদের কমে আসছে তা না বল্লেও চলে।

পঞ্চম কারণ এই যে আজকাল সাময়িক পত্র ও পাঠাগারের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়ায় গল্প উপন্যাসের চাহিদা আগের চেয়ে এত বেশী বেড়েছে মনে হয়, যে সেই অনুপাতে সত্যিকার মৌলিক রচনা প্রকাশিত হওয়া অসম্ভব। এমন কি অনেক লেখক অর্থলোভেই হোক্, বা যে কোন কারণেই হোক্ এত বেশী লিখতে আরম্ভ করেছেন যে আশঙ্কা হয় ঐরূপ ভাবে দ্রুত গল্প সৃষ্টি করলে তাঁদের প্রতিভার অযথা অপব্যয় হবে, যদিও তাঁদের ব্যাঙ্কের হিসাব ভারি হয়ে উঠতে পারে।

ষষ্ঠ ও শেষ কারণ হচ্ছে বাঙ্গলা সাহিত্যে প্রকৃত সমালোচনা বিরল। সমালোচনা-সাহিত্য যত দিন না পরিপুষ্ট হবে, ততদিন সাহিত্যিক মানদণ্ডের অভাব থাকবে, ও সেই সঙ্গে মৌলিক সৃষ্টির প্রতিষ্ঠা ও প্রসার সম্ভব হবে না।

সাহিত্য ক্ষেত্রে চুরি বা অনুকরণ মাত্রই যে নিন্দনীয় তা নয়, অনুকরণেরও একটা আর্ট আছে। অনুকরণ তখনই সার্থক হবে, যদি লেখকের নিজেরও কল্পনার শক্তি থাকে। দুঃখ এই যে সেই কল্পনার শক্তির পরিচয়ও বেশী পাওয়া যাচ্ছে না। বাঙ্গলা গল্প উপন্যাসে বিদেশী গল্পের অনুকরণ, বা রূপান্তর এত কাঁচা যে রসপিপাসু মন পীড়িত না হয়েই পারে না। পাশ্চাত্যের সমাজে যা সহজ ও স্বাভাবিক, তারই বাঙ্গলা সংস্করণ যে তা নাও হতে পারে তা অনেক লেখকই ভুলে যান, ফলে হয় এই যে তাঁদের গল্পে যা থাকে তাকে ন্যাকামী ছাড়া আর কি বলা যেতে

পারে? এই ন্যাকামী একরূপ সংক্রামক ব্যাধির মত আমাদের কথাসাহিত্যে প্রবেশ লাভ করেছে, এর অত্যাচারের জ্বালায় রসবোধবিশিষ্ট যাঁরা তাঁরা উৎপীড়িত হয়ে উঠেছেন, ও অনেকেই বাঙ্গলা গল্প উপন্যাসের ত্রিসীমানা মাড়ায় না। এই ন্যাকামী শুধু লেখকের অক্ষমতা ও অসাফল্যেরই পরিচায়ক।

গল্প তখনই সার্থক হতে পারে, যখন তার ঘটনা সংস্থাপনের কোনরূপ অসৌষ্ঠব, অসত্যতা, বা অসম্ভবত্ব মনকে আঘাত করে না; অর্থাৎ কল্পরাজ্যের মাঝেও সত্যের ছায়া থাকা দরকার। সেই মায়াসৃষ্টির উপরই গল্পের সাফল্য নির্ভর করে। আধুনিক গল্প-উপন্যাস পড়তে বসলেই পদে পদে এই কথাই মনে হয় যে ঘটনার এরূপ বিকাশ সম্ভব নয়, এরূপ হয় না, কাজেই লেখকের কল্পনায় দৈন্য সহজেই ধরা পড়ে। তথাকথিত বাস্তবপন্থী গল্প-লেখকেরা দাবী করতে পারেন যে তাঁরা সত্যদ্রষ্টা ও সত্যবক্তা, কিন্তু দুঃখের বিষয় সে দাবী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মিথ্যা। তাঁদের গল্পে বাস্তবতা বলে যা জাহির করা হয় তা তাঁদের রুগ্ন বিকৃত মনের উচ্ছ্বাস। তাঁদের অচেতন মনের চিকিৎসা একমাত্র মনোবিজ্ঞানবেত্তাই পারেন। এই সব অতি-আধুনিক লেখকের বাস্তবের সহিত পরিচয় যে অতি অল্প, তা তাঁদের অপরূপ সৃষ্টিই প্রতিপদে প্রমাণিত করে। যে পরিমাণ ভূয়োদর্শন, জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, ও সামঞ্জস্যজ্ঞান না থাকলে বাস্তবতা সৃষ্টি সম্ভব হয় না, তার কতটুকু সাধারণ গল্প-লেখকের আছে? অনেকের পুঁজি মনে হয়—খানকতক বিদেশী সমাজের, বা বস্তির গল্প—তাই নিয়ে নিজেদের সঙ্কীর্ণ কল্পনার দ্বারা যে গল্প রচনা করেন তাতে আর যাই হোক্, বাঙ্গলা সাহিত্যের গৌরব বাড়ছে না। তাঁদের গল্পের নায়ক নায়িকা বালীগঞ্জের ড্রয়িংরুমে বা টেনিশকোর্টেই বিচরণ করুন, অথবা চটকলের, ও কয়লার খনির আশে-পাশে বস্তির ভিতর ঘুরে বেড়ান, বস্তুতঃ তাঁরা যে য়ুরোপীয় ও য়ুরোপের আমদানী তা বুঝতে কষ্ট হয় না। দুঃখ ও লজ্জার কথা, এই যে লেখক শিক্ষিত পাঠককে এত সহজে প্রতারিত করতে উৎসুক। এঁরা যখন নারীর মনস্তত্ত্ব নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, তখনই এঁদের অক্ষমতা ও অনভিজ্ঞতা সব চেয়ে বেশী হাস্যাস্পদ মনে হয়। বাঙ্গালী মেয়ে তা পড়ে হাসবে না কাঁদবে তাই স্থির করা কঠিন হয়ে পড়ে। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই সব অলীক মনস্তত্ত্ব আলোচনা ও ভিত্তিহীন বাস্তবতা আমরা শুধু যে নীরবে সহ্য করি তাই নয়, সেটাকে অনেকেই বাঙ্গলার কথা-সাহিত্যের উন্নতির লক্ষণ বলে মনে করতে কুণ্ঠিত হই না।

বাঙ্গালী গল্পলেখকের কল্পনা ও অভিজ্ঞতার দৈন্য শুধু যে বিষয়বস্তু উদ্ভাবন, বা চরিত্রসৃষ্টি-ব্যাপারেই দেখা যাচ্ছে তাই নয়। আধুনিক গল্প উপন্যাসের ভৌগোলিক দিক এত বেশী একঘেয়ে হয়ে পড়ছে যে লেখকদের বর্ণনাশক্তির দারিদ্র্য লজ্জার কারণ হয়েছে। প্রায় সমস্ত গল্প উপন্যাসেই সেই চিরপুরাতন কলকাতা, বড় জোর দার্জ্জিলিং, কাশী, বা পুরীর দর্শন মেলে। কলকাতায় বালীগঞ্জ, দার্জ্জিলিংয়ের ম্যাল, কাশীর বিশ্বনাথের গলি, ও পুরীর সমুদ্র—এই হোলো বেশীর ভাগ গল্পের ভৌগোলিক সীমানা।

বিলাত ফেরৎ লেখকদের মধ্যে জনকয়েক সব-জান্তা সাহিত্যযশপ্রার্থী অবশ্য আড়ম্বর সহকারে তাঁদের ইঙ্গ-বঙ্গ নায়ক নায়িকাকে জাহাজের বুকে, বা কন্টিনেন্টের রেস্তরাঁতে, বা মাঠেঘাটে টেনে নিয়ে গেছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁদের কল্পনার দৌড়ও সীমাবদ্ধ ও গতানুগতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক গৃহকোণে আবদ্ধ, তাই বিদেশ সম্বন্ধে কৌতূহল বশতঃ এই সব লেখকের বর্ণনা বৈচিত্র্যহীন ও অবাস্তব হলেও সাগ্রহে পড়েন। সেটা কতকটা দুধের আস্বাদন ঘোলে মেটানোর মত। বিলাত যাঁরা যাননি, তাঁদের তাই প্রবাসজীবনের গল্প ভাল লাগে—সে গল্প আর্টের দিক দিয়ে যতই কাঁচা হোক্ না কেন। তা নইলে বিলাত ফেরৎ লেখকের গল্প উপন্যাসে বিদেশী-সাহিত্যের উগ্র ঝাঁঝ বা আমেজ এত সুপ্রকট হওয়া সত্ত্বেও তা নির্ব্বিবাদে সাময়িক পত্রের বুকে, বা বইয়ের দোকানে শোভা পেত না। তবে এ কথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে গণ্ডীবদ্ধ ভৌগোলিক নাগপাশ হতে এঁরা বাঙ্গালী পাঠককে মুক্তি দিতে তৎপর হয়েছেন, সেটুকুও কম লাভ নয়। যাই হোক্, অধিকাংশ গল্প-

উপন্যাসের লেখকের দেশভ্রমণ উত্তরে দার্জ্জিলিং, পশ্চিমে কাশী এলাহাবাদ, দক্ষিণে পুরীক্ষেত্রেই শেষ হয় বোধ হয়, অন্ততঃ তাঁদের লেখা পড়ে এইরূপ ধারণা হওয়া অসঙ্গত নয়। গল্প লিখতে হলে যে সব সময়েই নায়ক-নায়িকাকে পৃথিবীর চার কোণে দৌড় করাতে হবে তা নয়, তার সহিত গল্পের আর্টেরও কোন সম্পর্ক নেই; তবে আধুনিক বাঙ্গলা গল্প-উপন্যাসে স্থান-নির্ব্বাচনে, বা বর্ণনায় যে গতানুগতিকতা দেখা যাচ্ছে সেটা কল্পনা ও অভিজ্ঞতার দৈন্যেরই একটা ক্ষুদ্রতর লক্ষণ।

পাশ্চাত্য সাহিত্যে একশ্রেণীর উপন্যাস আছে যার ভিত্তি শুধু বিজ্ঞানমূলক কল্পনা, সেরূপ ধরণের লেখা এখনো বাঙ্গলায় দেখা দেয়নি বল্লেও হয়। এখানে বলা প্রয়োজন যে ঐরূপ গল্প সত্যই উচ্চশ্রেণীর লেখা কিনা তা নিয়ে মতবিভেদ থাকতে পারে। এখনো বাঙ্গালী H. G. Wells, Jules Verne, বা Conan Doyle-এর আবির্ভাব হয়নি, শুধু এই কথাই মনে রাখা দরকার।

ঐতিহাসিক উপন্যাস বাঙ্গলায় অনেক হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের আমল থেকে। এই ধরণের উপন্যাসে কল্পনার অবকাশ যথেষ্ট মেলে, কিন্তু অধিকাংশ ঐতিহাসিক উপন্যাসে যেরূপ ধরণের কল্পনার আতিশয্য দেখা যায় তার প্রশংসা করা চলে না। অতীত যুগের নর-নারী ও তাদের সময়কার সমাজ নিয়ে লেখা তখনই হৃদয়গ্রাহী ও সার্থক হতে পারে, যদি লেখকের সমসাময়িক ইতিবৃত্ত সম্যক্ পড়া থাকে। লেখকের ইতিহাস-জ্ঞান যদি গভীর না হয়, তাহলে তাঁর গল্পের নর-নারী আধুনিক বাঙ্গালীরই রূপান্তর হবে। সত্যের যে ছায়া আমরা কথাসাহিত্যে খুঁজি, তা মিলবে না। বাঙ্গলায় প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংখ্যা তাই খুবই অল্প। ঐতিহাসিক গল্প লিখতে হলে কতটা সংগঠনক্ষম কল্পনাশক্তির দরকার—তার আন্দাজ পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক উপন্যাস হতে পাওয়া যায়। নবীন কথাসাহিত্যিকেরা যে কেন সে দিকটাই পরিহার করে চলছেন তা বোঝা শক্ত। এতে কি তাঁদের কল্পনাশক্তির হীনতা প্রতিফলিত হচ্ছে না?

বাঙ্গালী গল্পলেখকের দায়িত্ব যে কম নয়, তা এই বল্লেই বোঝা যাবে যে বাঙ্গলার কথাসাহিত্য এখনো সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি লাভ করেনি। নবীন বাঙ্গালী লেখককে তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা দিয়ে সাহিত্য পরিপুষ্ট করতে হবে, যার বলে বাঙ্গলা বিশ্বের কথাসাহিত্যে বরেণ্য হতে পারে। মামুলী একঘেয়ে বিদেশী প্রেমের গল্পকে বাঙ্গলা ছাঁচে ঢেলে সাজানো শুধু নিজেকে ও পাঠককে ঠকানো হবে। ধার করা জিনিষ নিয়ে বড়লোক হওয়া যায় না, এ কথা সামান্য হলেও আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। প্রকৃত মৌলিকতা সাধনার বস্তু, একদিনে তা মেলে না। কাজেই রাতারাতি ঔপন্যাসিক বা গল্পলেখক হবার লোভ যতই তীব্র হোক্ না কেন তা জয় করতে হবে। বিজ্ঞানে, দর্শনে, কাব্যে, সঙ্গীতে, চিত্র-শিল্পে নবীন বাঙ্গলার উচ্চস্থান আমাদের গৌরবের ও গর্ব্বের বিষয়। আমরা চাই আমাদের দেশ কথাসাহিত্যেও তেমনি কৃতিত্ব ও উৎকর্ষের পরিচয় দিক্। তা যে অসম্ভব নয় তা বাঙ্গালী বিবিধ ক্ষেত্রে প্রমাণ করেছে, কাজেই এ আশা মোটেই অমূলক নয় যে অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গলা কথাসাহিত্যও নিজের গৌরবে ও সাফল্যে গরীয়ান্ হয়ে উঠবে।

শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায়

অভিজ্ঞান

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১৬

সদর মহলে প্রবেশ ক'রে সন্ধ্যা অন্তঃপুরে যাবার পথটা ঠিক নির্ণয় করতে পারছিল না, দূর থেকে দেখ্‌তে পেয়ে একজন ভৃত্য ছুটে এল; বল্‌লে, "আসুন আমার সঙ্গে, আমি গিন্নী-মার কাছে নিয়ে যাচ্ছি।" অভ্যাগতা যে সেই বাড়িরই বধূ. তা অবশ্য সে বুঝ্‌তে পারেনি।

অন্তঃপুরে প্রবেশ ক'রে দীর্ঘ বারান্দার প্রান্তে উপরে উঠবার প্রশস্ত সোপান। ভৃত্যের পিছনে পিছনে সোপান অতিক্রম ক'রে সন্ধ্যা দ্বিতলের বারান্দায় উপনীত হ'য়ে দেখলে ঠিক যেন তারই অপেক্ষায় প্রিয়লাল স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গেল, চক্ষে যেন একটা অন্ধকার ঘনিয়ে এল; সীড়ির রেলিং-প্রান্তের মোটা থামের মাথাটা তাড়াতাড়ি ধ'রে ফেলে সে ভাবটা সে সাম্‌লে নিলে।

কথাটা মিথ্যা নয়, প্রিয়লাল মোটরের শব্দ শুনতে পেয়ে বারান্দায় বেরিয়ে গিয়ে সন্ধ্যাকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করতে দেখতে পেয়েছিল। কি যে করা উচিত তা সে প্রথমটা ভেবেই ঠিক্ করতে পারে নি, তারপর শেষ পর্য্যন্ত সন্ধ্যা উপরেই আসবে অনুমান ক'রে সীঁড়ির নিকটে গিয়ে তার অপেক্ষাতে দাঁড়িয়ে ছিল। সন্ধ্যাকে সম্বোধন ক'রে প্রিয়লাল বল্‌লে, 'মা এখন পূজো করছেন, হয় ত একটু দেরী হবে,—ততক্ষণ অন্য ঘরে একটু অপেক্ষা করলে ভাল হয়।" তারপর ভৃত্যের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, "হরি, তুই তোর কাজে যা, আর দরকার নেই।"

হরি চলে গেলে প্রিয়লাল বল্‌লে, "এস আমার সঙ্গে।"

প্রিয়লালের পিছনে পিছনে গিয়ে সন্ধ্যা যে ঘরে প্রবেশ করল সেটা প্রিয়লালের পাঠাগার। চার পাঁচটা বই-ভরা আলমারি, একটা বড় সেক্রেটেরিয়েট্ টেব্‌ল, গোটা দুই তিন হোয়াট্ নট্, সাধারণ ও কুশনমোড়া পাঁচ সাতটা চেয়ার,—অবস্থাপন্ন ব্যক্তির পাঠাগারে যেমন থাকা উচিৎ সবই তেমনি, অধিকন্তু ঘরের একপাশে একটা গদী-মোড়া অপ্রশস্ত খাট, সম্ভবতঃ পরিশ্রমের পর ক্লান্তি অপনোদনের জন্য।

ঘরে প্রবেশ ক'রে ভাল ক'রে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে প্রিয়লাল বল্‌লে, "ওই চেয়ারটায় বোসো।"

সন্ধ্যা একবার নিমেষের জন্য প্রিয়লালের মুখের উপর দৃষ্টিপাত ক'রে আঁচলটা গলায় দিয়ে নত হ'য়ে প্রিয়লালের পদধূলি গ্রহণ করলে, তারপর ধীরে ধীরে চেয়ারে গিয়ে ব'সে চেয়ারের বাহুর উপর মাথা রেখে নিঃশব্দে রোদন করতে লাগল।

প্রিয়লালের চক্ষুও বাষ্পাচ্ছন্ন হ'য়ে এল, মুখ দিয়ে কথা বার হ'ল না। মিনিট খানেক নীরবে অবস্থান করার পর ভগ্নকণ্ঠে সে ডাক্‌লে, "সন্ধ্যা?"

বস্ত্রাঞ্চলে চোখ মুছে মুখ তুলে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসু নেত্রে প্রিয়লালের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে।

প্রিয়লাল বল্‌লে, "সন্ধ্যা, আমাদের প্রাণের যা কথা, তা বলবার সময় এখন হয় ত' হবে না, মা অনেকক্ষণ পূজোয় বসেছেন, এখনি উঠবেন, তার আগেই দু-চারটে কাজের কথা সেরে নিতে হবে।"

প্রিয়লালের ভূমিকা শুনে সন্ধ্যার মুখ আশঙ্কায় বিবর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল। স্খলিতকণ্ঠে বল্‌লে, "কাজের কথা? আমার সঙ্গে কি কাজের কথা?"

প্রিয়নাথ বল্‌লে, "কাজের কথা আর কিছু নয়, যে বিপদে আমরা পড়েছি, তার কথা।"

"আচ্ছা, তার কি কথা বল?"

"তুমি যে আজ এখানে এসেছ, সে কি বাবাকে জানিয়ে এসেছ ?"

"না।"

"প্রকাশ দাদা তোমাদের আসবার কথা চিঠি লিখে কিছু জানান নি ?"

"যতদূর জানি, জানান নি।"

সন্ধ্যার উত্তর শুনে প্রিয়লালের মুখে চিন্তা দেখা দিলে; বললে, "বোধহয় ভাল করনি, হঠাৎ এসে পড়া হয়ত ঠিক হয় নি।"

সন্ধ্যার চক্ষের মধ্যে সহসা বিদ্যুৎ-কণিকা জ্বলে উঠল, আরক্ত মুখে ঋজু হয়ে ব'সে সে এক মুহূর্ত্ত নিজেকে বোধ হয় প্রস্তুত ক'রে নিলে, তারপর সোজাসুজি প্রিয়লালের দিকে চেয়ে দৃঢ়স্বরে বললে, "ডাকাতদের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার পর পনেরো ষোলো দিন আমি জামসেদপুরে প'চে মরছি,—একে তুমি হঠাৎ এসে পড়া বল ? তুমি পারতে এতদিন অপেক্ষা করতে ?" এক মুহূর্ত্ত চুপ ক'রে থেকে পুনরায় বললে, "তুমি ত তোমার কাজের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছ, এবার আমি একটা কাজের কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি। আচ্ছা, আমাকে তাহ'লে পরিত্যাগ করবে ব'লেই কি তোমরা স্থির করেছ ? বল ? সত্যি ক'রে বল ?"

এই আকস্মিক কঠিন প্রশ্নের উত্তরে কি বলবে সহসা তা স্থির করতে না পেরে প্রিয়লাল ক্ষণকাল বিমূঢ়ভাবে নিরুত্তরে রইল, তারপর বললে, "এক কথায় ত' এ কথার উত্তর দেওয়া যায় না সন্ধ্যা! এর উত্তর হ্যাঁ-ও নয়, না-ও নয়।

"তবে কী এর উত্তর ? বল ?"

"এর উত্তর—বাবা যতদিন পর্য্যন্ত মন স্থির করতে না পারছেন ততদিন আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে। বাবার সঙ্গে এ নিয়ে বাদ-বিসম্বাদ করলে তাঁর জেদটা মিছিমিছি বাড়িয়ে দেওয়া হবে—হয়ত' তাতে তাঁর মতকে আমাদের বিরুদ্ধে পাকা ক'রেই তোলা হবে। তার চেয়ে কিছুদিন তাঁকে ভাবতে সময় দিয়ে অপেক্ষা করাই উচিৎ নয় কি সন্ধ্যা ? বুঝে দেখ !"

সন্ধ্যা বললে, "আচ্ছা, এ কথা তা হ'লে না-হয় তাঁর সঙ্গেই হবে, কিন্তু একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি,—বাবা যদি শেষ পর্য্যন্ত আমাকে না নেওয়াই স্থির করেন, তখন তুমি কি করবে ? তখন তুমি আমাকে গ্রহণ করবে ত ?"

সন্ধ্যার এই সুকঠিন প্রশ্নে প্রিয়লালের মুখ শুকিয়ে উঠল; বললে, "এ কথা এখন কেন সন্ধ্যা ? পরের কথা আগে কেন ?"

সন্ধ্যার মুখে গভীর দুঃখের মৃদু হাসি স্ফুরিত হ'ল। বললে, "কেন, তা তুমি বুঝবে না। যে আশ্রয়হীন অবলম্বনহীন তার যে কত দুঃখ কত ভয় তা তুমি কি ক'রে বুঝবে বল ?—তোমার ত' আশ্রয় ভাঙ্গেনি।" এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম নিয়ে বললে, "তুমি বলতে পারলে না, কিন্তু আমি হ'লে কি করতাম জান ? দরকার হ'লে তোমার জন্যে সমাজ সংসার অবুঝ বাপ-মা সমস্ত ত্যাগ করতাম, কিন্তু বিনা অপরাধে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও তোমাকে ছেড়ে থাকতাম না। এ তোমাকে আমি স্পষ্ট ক'রে ব'লে রাখলাম, একমাত্র বাঙ্গলাদেশের হিন্দু ঘরের মেয়ে হ'য়ে জন্মানো ছাড়া আর আমি কোনো অপরাধ করি নি,—পাল্কী থেকে লাফিয়ে প'ড়ে ডাকাতদের সঙ্গে পালিয়ে যাই নি, আমি তাদের লুঠ করতে আসবার জন্যে ব'লে পাঠাই নি! তাদের হাতে প'ড়ে আমার যে নিগ্রহ হয়েচে তার জন্যে একমাত্র তোমরা দায়ী। কেন তোমরা আমাকে অমন বিপদ-ভরা পথ দিয়ে রাত্রে নিয়ে এসেছিলে ? কেন তোমরা আমার রক্ষার জন্যে যথেষ্ট লোক-জন সঙ্গে আনো নি ? কেন তোমরা ডাকাতদের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করবার চেষ্টায় সেখানে প্রাণ দিলে না ? অপরাধ করবে তোমরা, আর তার শাস্তি পাব আমি ?" দীর্ঘ উত্তেজিত অভিভাষণের পর সন্ধ্যা ঘন ঘন হাঁপাতে লাগল।

প্রিয়লালের পায়ে তখনো লাঠির আঘাতের বেদনা ছিল, তখনো আহত পায়ের চিকিৎসা শেষ হয়নি। একবার মনে করলে বলে যে, পা যদি সেদিন না ভাঙ্গত তা হ'লে প্রাণ হয় ত' দিতেই হোত। কিন্তু কৈফিয়ৎ দিতে প্রবৃত্তি

হোল না; বললে, "অপরাধ স্বীকার করছি সন্ধ্যা, কিন্তু তুমি বড় বেশি উত্তেজিত হয়েছ,—একটু শান্ত হও।"

সন্ধ্যা বললে, "উত্তেজিত হয় ত' কিছু হয়েছি, কিন্তু যতটা তুমি মনে ভাবছ, ততটা ঠিক নয়। মনে কোরো না এ-সব কথা এখনি আমি বানিয়ে বানিয়ে তোমাকে বল্‌ছি। এ সব আমার মুখস্থ হয়ে গেছে! দিনের মধ্যে কতবার যে এই সব কথা নিয়ে মনে মনে তোমাদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করি তা তুমি কি ক'রে জানবে! তুমি ভাবছ, এ মেয়ে যে এমন মুখরা তা আগে কখনো জান্‌তাম না!"

দুঃখার্ত্তকণ্ঠে প্রিয়লাল বললে, "আমি ভাবছি সন্ধ্যা, কত দুঃখই না-জানি তুমি পেয়েছ যা তোমার মতো লাজুক মেয়েকে এতটা মুখরা ক'রে তুলেছে!"

শুনে সন্ধ্যার দুই চক্ষু সজল হ'য়ে এল; সে বললে, "সত্যিই তাই। ভেবে ছাখ, পঁয়ত্রিশ দিন আমি ডাকাতদের বাড়ী ছিলাম। সেখানে কী ঝড় আমার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। তারা যে দুর্গতি আমার করেছিল তার চেয়ে যদি আমাকে প্রাণে মারত ত' আমি তাদের সদয় বলতাম। জানো?—আমার মনে হয় আমার বয়েস যেন দশ বৎসর বেড়ে গেছে। সময়ে সময়ে মনে হয়, সে সন্ধ্যাকে বোধহয় ডাকাতেরা মেরেই ফেলেছে, আমি তার প্রেত-দেহ!"

এ কথার উত্তরে প্রিয়লালের মুখ দিয়ে কোনো কথা নির্গত হ'ল না,—একটা মর্ম্মান্তিক মনস্তাপে তার দেহ স্তব্ধ হয়ে গেল। সমস্ত ঘরটা বেদনার সকরুণ ব্যঞ্জনায় থম্‌থম্ করতে লাগল। একটা ক্লক্ ঘড়ি ঠক্ ঠক্ ক'রে একটানা শব্দ ক'রে চলেছিল, ঢং ক'রে তাতে সাড়ে নটার প্রহর-শব্দ বাজল। সেই শব্দে যেন উভয়ের অনুভূতি ফিরে এল।

কাতরস্বরে প্রিয়লাল বললে, "সময় আমাদের বেশি নেই সন্ধ্যা। বাবা ছেলে-মেয়েদের নিয়ে দমদমার বাগানে বেড়াতে গেছেন, সাড়ে নটা দশটার সময়ে তাঁর আসবার কথা; মার পূজো এতক্ষণে বোধহয় শেষ হ'য়ে এসেছে। তোমার অক্ষম স্বামীকে যদি ক্ষমা করতে পার ত' কোরো, কিন্তু সব দিক বিবেচনা ক'রে, সব কথা সব রকমে ভেবে দেখে আমি যা উচিৎ ব'লে স্থির করেছি আর একবার তোমাকে তা বলতে বাধ্য হলাম,—বাবার মত হওয়া পর্য্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে।"

সন্ধ্যা দৃপ্তস্বরে বললে, "কিন্তু তোমার এ কথার উত্তরে তোমাকে যেকথা আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আর একবার তা জিজ্ঞাসা করি,—বাবা যদি শেষ পর্য্যন্ত আমাকে না নেন, তুমি নেবে ত?"

প্রিয়লালের মুখ সহসা কালো হ'য়ে উঠল, গম্ভীরস্বরে সে বললে, "এ কথারও উত্তরের জন্যে তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে সন্ধ্যা!"

ঘৃণা ও ব্যঙ্গ-মিশ্রিত তীক্ষ্ণকণ্ঠে সন্ধ্যা বললে, "অপেক্ষা করতে হবে?—কতদিন অপেক্ষা করতে হবে শুনি? জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত কি?"

"তা বলতে পারিনে,—কিন্তু অপেক্ষা করতে হবে!"

রুষ্ট মুখে এক মুহূর্ত্ত প্রিয়লালের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সন্ধ্যা বললে, "তা যেন বলতে পার না,—কিন্তু কোথায় অপেক্ষা করতে হবে তাও বলতে পার না কি? কোন্ দেশে, কোন্ সহরে, কাদের বাড়ী?"

"ধর, তোমার বাপের বাড়ী।"

"আমার বাপের বাড়ী? কেন, তোমাদেরই সমাজ আছে জাত আছে ধর্ম্ম আছে,—আর আমার বাপের বাড়ীর লোকদের সে সব কিছু নেই? তারা ত' টাকা-কড়ি আসবাব-পত্র দিয়ে আমাকে দান করে দিয়েছে—তুমি ত' ধর্ম্ম-সাক্ষী ক'রে আমাকে গ্রহণ করেছ,—এখন তুমি আমাকে একটা অনিশ্চিত সময়ের জন্যে বাপের বাড়ীতে অপেক্ষা করতে বলছ। দৈবক্রমে তুমি পুরুষ হয়ে জন্মেছ আর আমি জন্মেছি মেয়েমানুষ হ'য়ে,—এরই বলে তুমি আমার ওপর এতবড় অত্যাচার করতে পারছ। এই কি তোমার ধর্ম্ম? এই তোমার কর্ত্তব্য?"

"আমার কর্ত্তব্য তা হ'লে কি বল তুমি?"

সন্ধ্যা স্থির দৃষ্টিতে ক্ষণকাল প্রিয়লালের দিকে চেয়ে রইল, তারপর বললে, "আমি যা বলি তা পারবে তুমি করতে? আমি বলি তোমার কর্ত্তব্য, তোমার বাপ-মা আমাকে নিতে রাজি না হ'লে আজই তোমার আমার সঙ্গে এ বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসা। তারপরে কোনো দিন

যদি তাঁদের মত আমাদের সপক্ষে বদলায় সেদিন আমরা দু'জনে আবার এ বাড়ীতে ফিরে আসব। দুটো পেটের জন্যে ভেবো না। তুমি বড়লোকের ছেলে, তুমি যদি চালাতে না পার, মেয়েস্কুলে মাষ্টারী করে, বড়লোকের মেয়েদের গান শিখিয়ে আমি চালিয়ে নোবো। এ তুমি পারবে করতে? আমি হ'লে কিন্তু নিশ্চয় পারতুম!"

আর্ত্তস্বরে প্রিয়লাল বললে, "আমি দুর্ব্বল, আমাকে তুমি ক্ষমা কোরো সন্ধ্যা!

সজোরে মাথা নেড়ে প্রবলভাবে সন্ধ্যা বললে, "না, না, দুর্ব্বলকে আমি ক্ষমা করিনে; দুর্ব্বলকে আমি ঘৃণা করি!"

"তবে তাই কোরো।"

সন্ধ্যা তেম্‌নিভাবে বলতে লাগল, 'শোন! খবরের কাগজে আমার মত হতভাগিনীদের কাহিনী পড়তে পড়তে যখন দেখতাম যে, বিনা অপরাধে তাদের বাপ-মা শ্বশুর শাশুড়ী স্বামী তাদের অনায়াসে ত্যাগ করলে, তখন কী ঘৃণা যে তাদের ওপর হতো তা তোমাকে কি বলব! গুণ্ডাদের চেয়েও তাদের ওপর আমার বেশী ঘৃণা হোত। তখন কি জানতাম, আমি নিজেই একদিন তাদেরই একটা দলের হাতে পড়ব"

একটু চুপ ক'রে থেকে প্রিয়লাল ধীরস্বরে বললে, "সেই ঘৃণিত দলের কাছে আজ তুমি বিনা আহ্বানে কি প্রত্যাশা নিয়ে এসেছ বলবে?"

"কোনো প্রত্যাশা নিয়ে আসি নি, একটা বোঝাপড়া করতে এসেছি।"

"কি বোঝাপড়া?"

"বোঝাপড়া এই যে, আমার আর একটুও ধৈর্য্য নেই, আর আমি একদিনও অপেক্ষা করতে পারবো না! আজ তোমরা আমাকে গ্রহণ করলে ত' ভাল, নইলে আমিও তোমাদের আজ ত্যাগ ক'রে যাব। তারপর আর ফিরে আসবার পথ থাকবে না, তোমরা নিজে নিয়ে আসতে গেলেও নয়!"

"এতবড় অপরাধ আমরা করেছি ব'লে মনে করো তুমি যে এই শাস্তি আমাদের দিতে পার?"

প্রিয়লালের কথা শুনে সন্ধ্যার দুই চক্ষু প্রজ্বলিত হ'য়ে উঠল; বললে, "এ কি তুমি পরিহাস ক'রে বলছ?"

ব্যস্ত হ'য়ে প্রিয়লাল বললে, "না, না, সন্ধ্যা, আমি এমন ইতর নই যে তোমার সঙ্গে এ অবস্থায় পরিহাস করব,—আমার মনের অবস্থা পরিহাসের মতো নয়। আমি সত্যিই জান্‌তে চাই যে আমরা কী এমন অপরাধ করেছি যে, আর কিছুদিন অপেক্ষা করতে বললে তুমি আমাদের চিরদিনের মতো পরিত্যাগ ক'রে যাবে? আমরাও ত' ডাকাতদের লেলিয়ে দিই নি?"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "না, তা দাও নি; সে অপরাধ তোমাদের নয়। কিন্তু এক কথা কতবার বল্‌ব বল? তুমি ত' বুঝ্‌বে না! তুমি এত বড় প্রাসাদে বাস কর, খাওয়া-পরবার ব্যবস্থা তোমার ঠিক মতো আছে, নিরাশ্রয়ের দুঃখ তুমি কেমন ক'রে বুঝ্‌বে? একদিনও ভাল ক'রে ভেবে দেখেছ কি আমার কথাটা? কত অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য ক'রে হাতে পায়ে ধ'রে মুক্তি পেলাম, অধীর আগ্রহে তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম! ভাব্‌লাম সংবাদ পেয়েই তোমরা জামসেদপুরে গিয়ে বুকে ক'রে আমাকে নিয়ে আস্‌বে। এই প্রত্যাশার বদলে কী পেলাম জান? দু চারটে শুকনো ছোটো ছোটো টেলিগ্রাম আর দু চারটে ছোটো ছোটো চিঠি। তাও আমাকে নয়! তারপর পনের ষোল দিন অপেক্ষা ক'রে এখানে ছুটে এলাম। বাপের বাড়ি গেলাম, তারা বললে এখানে নয়, শ্বশুরবাড়ি যাও। শ্বশুরবাড়ি এলাম, তুমি বলছ এখানে নয় বাপের বাড়ি যাও। আচ্ছা, কোথায় যাই বল দেখি? আছি ত' প'ড়ে দূর সম্পর্কের এক ভগ্নিপতির বাড়ি। সবিতা দিদি তা'তে ঠিক সন্তুষ্ট নয় তাও বুঝতে পারি। এ'তে কি অপেক্ষা করবার ধৈর্য্য থাকে?"

ম্লান মুখে প্রিয়লাল বল্‌লে, "সত্যি!"

সন্ধ্যা বল্‌তে লাগল, "তোমার সঙ্গে আমার কথা শেষ হয়েছে, এখন চল মার সঙ্গে একবার দেখা করি, তাঁর হয়ত এতক্ষণে পুজো শেষ হয়েছে। তোমাকে অনেক দুর্ব্বাক্য অনেক কটু কথা বলেছি,—তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো। তুমি আমার স্বামী, তোমাকে না ব'লে, তোমার কাছে

নালিশ না ক'রে আমার উপায় নেই। তা ছাড়া, একটা কথা কি জানো? বেশ বুঝতে পারছি এ আমার স্বাভাবিক অবস্থা নয়, এত কথা কওয়া আমার অভ্যাস নয়, হয়ত উচিতও নয়,—কিন্তু কিছুতেই সামলাতে পারছিনে। ঠিক মনে হচ্চে আর কোনো লোকের আত্মা যেন আমার উপর ভর ক'রে এসব বলাচ্ছে করাচ্ছে!" তারপর আসন ত্যাগ ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "হয়ত' এ জীবনে আর তোমার সঙ্গে দেখা হবেনা, আর একবার তোমার পায়ের ধূলো দাও।" ব'লে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রিয়লালের পদধূলি গ্রহণ করলে।

উচ্ছল অশ্রু রোধ করতে করতে উঠে দাঁড়াইতেই প্রিয়লাল বাহুবন্ধনে সন্ধ্যাকে আবদ্ধ করতে উদ্যত হ'ল। সন্ধ্যা প্রিয়লালের বাহুপাশ কাটিয়ে ত্বরিত পদে দূরে স'রে গিয়ে বল্‌লে, "না, না, ও-সব এখন নয়! আমি এসেছি তোমার কাছে আশ্রয় চাইতে। আশ্রয় পেলে তারপর তোমার কাছ থেকে আদর যত্ন সবই নোবো,—তারে আগে কিছু নয়। এখন মার কাছে চল।"

বিষণ্ণ মুখে প্রিয়লাল বললে, "চল।"

মমতাময়ী তখন পূজার্চ্চনাদি সমাপন ক'রে একটা ঘরে ব'সে ধর্ম্মগ্রন্থে মনোনিবেশ করেছিলেন। সেই ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে প্রবেশ না ক'রেই প্রিয়লাল বললে, "মা, সন্ধ্যা এসেছে।"

মমতাময়ী কথাটা ঠিক শুনতে পেলেন না কিম্বা বুঝতে পারলেন না, বই থেকে চক্ষু উত্থিত ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে এসেছে?"

অন্তরাল থেকে সম্মুখে এসে সন্ধ্যা নিমেষের জন্য স্থির হ'য়ে দাঁড়াল, তারপর দ্রুতপদে ঘরের ভিতর প্রবেশ ক'রে নত হয়ে দুই হস্তে মমতাময়ীর পদধূলি গ্রহণ করতে গিয়ে দুই পা জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে লাগল। বললে, "মা, তোমরা না-কি আমাকে ঘরে স্থান দেবে না স্থির করেছ? —তোমরা না-কি আমাকে ত্যাগ করবে?"

মমতাময়ী সযত্নে সন্ধ্যাকে তুলে নিজের পাশে বসিয়ে বললেন, "স্থির হও বউ-মা, শান্ত হও! বিপদে উতলা হ'য়ো না।"

"কিন্তু এমন বিপদে কি ক'রে স্থির হয়ে থাকি মা? তোমার পদসেবার দাসী হ'য়েও কি এ বাড়ীতে থাকতে পাব না?"

মমতাময়ী বধূর চিবুক স্পর্শ ক'রে চুম্বন ক'রে বললেন, "দাসী হয়ে থাকবে কেন বউ-মা, তুমি ত এ বাড়ীতে রাজরাণী হয়ে থাকবে তাই জানি। কিন্তু অদৃষ্ট আমার এমনই মন্দ যে, এমন যে সোনার চাঁদের মত বউ পেলাম তা ভোগে এল না! সংসারটা একেবারে ভেঙ্গে চুরে গেল!" ব'লে কাঁদতে লাগলেন। তারপর অঞ্চলে চক্ষু মুছে বলতে লাগলেন, "আমার কি অসাধ যে তোমাকে নিয়ে ঘর করি? কিন্তু কি করব বলো, কর্ত্তাকে ত' কিছুতেই রাজি করতে পারছিনে, কেবল বংশ-মর্য্যাদা আর বংশ-মর্য্যাদা! বেশী চাপাচাপি ক'রে ধরলে বলেন, কাশীবাসী হব।"

মমতাময়ীর কথা শুনে সন্ধ্যার মুখে সন্ত্রাসের লক্ষণ দেখা দিলে; আর্ত্তস্বরে সে বললে, "তুমি ত' মেয়েমানুষ হ'য়ে মেয়েমানুষের দুঃখ বুঝবে মা! তুমি বল, তা হ'লে আমার কি গতি হবে!"

তখন শাশুড়ী বধূতে অনেকক্ষণ ধ'রে অনেক কথাবার্ত্তা অনেক পরামর্শ হ'ল। মমতাময়ী বল্‌লেন, "আমি যেভাবে বললাম ঠিক সেইভাবে তুমি কথা কইবে বউ-মা। তারপর তোমার অদৃষ্ট!"

কিন্তু ক্ষণকাল পরেই জহরলাল গৃহে প্রত্যাগমন করলে মমতাময়ী যখন নানাপ্রকার ভূমিকাদির পর বধূর আগমন সংবাদ তাঁর নিকট জ্ঞাপন করলেন তখন হ'তেই অদৃষ্ট বিরূপ মূর্ত্তিতে দেখা দিলে। ক্রুদ্ধস্বরে তর্জ্জন ক'রে জহরলাল বললেন, "না, সে কিছুতেই হ'তে পারে না, তুমি এখনি ওকে ওর বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও।"

মমতাময়ীর চিত্তের অন্তরতম প্রদেশে অভাগিনী বধূর জন্য অকৃত্রিম সমবেদনা ছিল, সে জন্য ইতিপূর্ব্বে কয়েকবারই তিনি বধূর সপক্ষে স্বামীর নিকট দরবার করেছেন, কিন্তু কখনো তর্ক অথবা বচসা করেন নি। আজ সূচনাতেই স্বামীর কাছ থেকে রূঢ় প্রতিবাদ পেয়ে তাঁর মনটা বিগড়ে গেল। তিক্তকণ্ঠে বললেন, "দেখ, অত কঠিন হয়ো না।

সে তোমার ছেলের বউ, এত বড় বিপদে প'ড়ে তোমার কাছে এসেছে আশ্রয় ভিক্ষে করতে, আর তুমি তার সঙ্গে একটা কথা না ক'য়ে আমাকে বলছ পাঠিয়ে দাও তাকে বাপের বাড়ী? একটা মিষ্টি কথাও তোমার কাছ থেকে সে পেতে পারে না? আচ্ছা, বুকে হাত দিয়ে বল দেখি তার অপরাধটা কি?"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে জহরলাল বললেন, "কিন্তু আমার অপরাধটাই বা কি শুনি যে, আমি সমাজের কাছে অত বড় একটা অপরাধ করব?"

মমতাময়ী বললেন, "বউমার সঙ্গে দুটো কথা কইলেই সমাজের কাছে অপরাধ করা হবে? সমাজ তা হ'লে একটা দত্যি-দানবের মতো কিছু বল?"

জহরলাল মনে করলেন, উকিলের সঙ্গে তর্ক করার চেয়ে আসামীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা করলে মামলা সহজে নিষ্পত্তি হতে পারে। বললেন, "আচ্ছা, নিয়ে এস তা হ'লে। আমি কিন্তু দশ মিনিটের বেশী কথা কইব না।"

কথা কইতে গিয়ে কিন্তু বহু বহু দশ মিনিট হ'য়ে গেল তবু কথা শেষ হয় না। প্রথমে জহরলাল বিনা অনুমতিতে এবং না জানিয়ে হঠাৎ আসার অবিমৃষ্যকারিতার জন্য সন্ধ্যাকে মৃদু তিরস্কার ক'রে আর বাজে দুই-একটা উপদেশ দিয়ে ব্যাপারটা শেষ করবার চেষ্টায় ছিলেন; কিন্তু ভর্ৎসনা-উপদেশের লাঠি-সোঁটা শেষ হওয়ার পর সন্ধ্যার দিক থেকে যখন বিচার-বিতর্কের গুলি-গোলা বর্ষণ আরম্ভ হ'ল তখন আত্মরক্ষা করতে করতে তিনি বিব্রত হ'য়ে উঠলেন; বুঝলেন বিবাহ-কালের বউমা আর নেই, তখনকার কেঁচো এখন হয়েছে কেউটে।

জহরলালের কাছে আসবার পূর্ব্বে সন্ধ্যা নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আত্ম-প্রতিষ্ঠিত ক'রে নিয়েছিল,—মনে মনে সে স্থির করেছিল যে, জহরলালের নিকট কোনো অবস্থাতেই নিজের সংযম হারাবে না। তাই যুদ্ধের বিশৃঙ্খল গোলযোগের মধ্যে একজন পাকা গোলন্দাজ যেমন মাথা ঠাণ্ডা রেখে চতুর্দ্দিক দেখে দেখে গোলা-গুলি ছোঁড়ে সেও তেমনিভাবে জহরলালের প্রতি প্রশ্ন বর্ষণ করছিল। উত্তর দিতে দিতে জহরলাল অস্থির হয়ে উঠছিলেন;—বারে বারে তাঁর সাক্ষী মানতে হচ্ছিল হিন্দুজাতির সনাতন সমাজ-বৃদ্ধকে, কিন্তু জেরার বাণে বাণে বৃদ্ধের দেহ ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে যাচ্ছিল।

অবশেষে জহরলাল বললেন, "তোমার তর্কের কাছে আমি হার মানলাম। এবার তুমি থাম!"

সন্ধ্যা বললে, "কিন্তু আমি ত শুধু তর্কই করিনি বাবা, আমি ত আমার মহাদুঃখের কথা নিরাশ্রয়তার কথাও আপনার কাছে নিবেদন করেছিলাম। আমার ত' মনে হয় তার কাছেই আপনার হারা উচিৎ ছিল।"

তীব্রকণ্ঠে জহরলাল বললেন, "না, তার কাছে আমার হারবার কোনো কারণ নেই। তোমার দুরদৃষ্টের ফল তুমি যদি ভোগ কর তার জন্যে আমি দায়ী নই। সুতরাং এ-কথা তুমি জেনে রাখ যে, যতদিন পর্য্যন্ত না আমি তোমাকে স্পষ্ট কথায় গ্রহণ করছি ততদিন পর্য্যন্ত এ বাড়ীতে আর এমন ক'রে হঠাৎ এসে উত্যক্ত করবার কোনো অধিকার তোমার রইল না। এ কথা এমন রূঢ়ভাবে বলবার আমার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু তুমি আজ অতিশয় নির্লজ্জভাবে আমার সঙ্গে ব্যবহার করেছ, তাই বলতে বাধ্য হ'লাম। আর একটা কথা তোমাকে জানিয়ে রাখি, তোমার ভরণপোষণের জন্যে একটা অর্থের ব্যবস্থা আমি করব, সে বিবেচনা আমার আছে। সে কথাটা তোমার বাবাকে জানিয়ে দিয়ো, ফল হবে।"

এর পর কিছুক্ষণ ধ'রে এমন একটা ব্যাপার চলল যুদ্ধের ভাষায় যাকে বলে বেয়নেট্ চার্জ্জ। মনের রক্ত থাকলে নিশ্চয় দেখা যেত উভয় পক্ষেই রক্তপাত ঘটেছে।

বেলা তিনটার সময়ে প্রকাশ যখন এসে উপস্থিত হ'ল জহরলাল তখন বৈঠকখানায় ব'সে তারই অপেক্ষা করছিলেন। প্রকাশকে দেখে তিনি ক্রোধে আগুন হ'য়ে উঠলেন, কিন্তু যতটা সম্ভব তার বাহ্য অভিব্যক্তি প্রচ্ছন্ন রেখে বললেন, "প্রকাশ, তুমি আজ বিনা সংবাদে একটা hysteric মেয়েকে বাড়ীতে ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়ে ভারী অন্যায় করেছিলে। এমন সব ভীষণ scene যে ঐ একটা অল্প বয়সের মেয়ে করতে পারে তা আমার এর আগে ধারণাই ছিল না!"

মৃদু হেসে প্রকাশ বললে, "তার কারণ এর আগে আর কখনো আপনার ও-রকম ভীষণ-অবস্থায়-পড়া মেয়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তা করবার কারণ ঘটেনি। ভেবে দেখুন-দিকি কি নিদারুণ অবস্থায় ও দিনযাপন করছে, মাথা ঠিক রাখা সম্ভব কি ?—কিন্তু সে কথা যাক্, ওর সম্বন্ধে আপনি কি সাব্যস্ত করলেন ? ও আপনার এখানেই রইল ত ?"

জহরলাল প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বললেন, "না, না, নিশ্চয়ই সে আমার এখানে থাকবে না। কিন্তু সে বিষয়ে শুধু আমিই সাব্যস্ত করিনি, সে নিজেও সাব্যস্ত করেছে আজ থেকে আমাদের ত্যাগ করবে!" ব'লে কথাটার একান্ত হাস্যকরতার প্রমাণ স্বরূপ উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন।

প্রকাশ বললে, "এ কথা সে নিশ্চয় তখন বলেছে যখন দেখেছে আপনার কাছে তার বিশেষ কিছু আশা নেই, আপনি তাকে পরিত্যাগই করবেন।"

জহরলাল বললেন, "কিন্তু পরিত্যাগ না ক'রে কি করি বল ? তাকে পরিত্যাগ না করলে সমাজকে আমার পরিত্যাগ করতে হয়। কিন্তু আমি কী এমন অপরাধ করেছি যে সমাজকে পরিত্যাগ করতে যাব তা বল ?"

"সেই বা কী অপরাধ করেছে বলুন ?"

"অদৃষ্ট তার মন্দ, এই তার অপরাধ। এ নিশ্চয় জেনো প্রকাশ, দুরদৃষ্টের মতো দ্বিতীয় অপরাধ আর নেই। তা নইলে এত সাধুলোকে যে এত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে তার কোনো অর্থ ই করা যায় না।"

অতঃপর উভয়পক্ষে বহুক্ষণ ধ'রে প্রবল তর্ক-বিতর্ক চলল, কিন্তু কোনো ফল হ'ল না। হতাশ হ'য়ে প্রকাশ বললে, "যখন তাকে গ্রহণ করতে কিছুতেই আপনি রাজি নন তখন তর্ক ক'রে কোনো ফল নেই। সন্ধ্যাকে তা হ'লে ডেকে পাঠান, বাইরে আমার গাড়ী অপেক্ষা করছে।"

জহরলাল বললেন, "তুমি মনে করো না প্রকাশ, আমি এমনই একটা ভীষণ-রকম নিষ্ঠুর লোক যে, আমার মনে কোনো কষ্টই হচ্ছে না। এ ব্যাপারটা আমার জীবনেও একটা বড় রকম দুর্ঘটনা হ'য়ে রইল। আমি বেঁচে থাকতে সন্ধ্যাকে গ্রহণ করবে না এই কথা দেওয়াতে আমিও প্রিয়কে কথা দিতে বাধ্য হয়েছি যে, পুনর্ব্বার বিয়ে করবার জন্যে আমি কোনদিন তাকে অনুরোধ করব না। সংসার আমার ভেঙ্গে গেছে! তোমার মামীমা হাসেন না, আমার সঙ্গে ভাল ক'রে কথা কন না, দিবারাত্র ধর্ম্মগ্রন্থ নিয়েই সময় কাটান। আমি যদি সেই রাত্রেই সন্ধ্যাকে ডাকাতদের হাত থেকে উদ্ধার ক'রে আনতে পারতাম তাহ'লে ত তাকে একেবারে বাড়ীতেই নিয়ে আসতাম। কিন্তু একমাসের ওপর সে ডাকাতদের বাড়ী বাস ক'রে এসেছে, এখন, ধর, কিছুদিন পরে যদি প্রকাশ পায়—" অদূরে একব্যক্তি ব'সে খবরের কাগজ পড়ছিল, হয়ত আত্মীয়ই কেউ হবে, তার দিকে তাকিয়ে প্রকাশের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কথাটা মৃদু চাপা কণ্ঠে শেষ করলেন।

শুনে প্রকাশের মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। একটু চুপ ক'রে থেকে সে বলল, "কিন্তু তাতেও কিছু আসে যায় না। ডাকাতদের সন্ধ্যাকে হরণ করে নিয়ে যাওয়াতে সন্ধ্যার নিজের কোনো অপরাধ হয় না স্বীকার করতে হ'লে ও-কথাতেও হয় না স্বীকার করতে হয়।"

"তুমি স্বীকার করতে পারতে ?"

"আমরা দুর্ব্বৃত্ত লোক, আমাদের কথা ছেড়ে দিন মামাবাবু, আমরা কিছু কিছু দুষ্কর্ম্ম ক'রে থাকি,—হয়ত পারতাম।"

"বলা সহজ, করা শক্ত!"

মৃদু হেসে প্রকাশ বল্‌লে, "এখন এ কথা থাক্, কিন্তু পরীক্ষা যদি আসে তা'হলে পাশ হব, এ কথাও ব'লে গেলাম।"

জহরলাল বললেন, "ভাল কথাই! আমরা সামান্য লোক বড় কথার মাহাত্ম্য বুঝ্‌তে পারিনে। কিন্তু আর দেরী ক'রে কাজ নেই, ওকে নিয়ে গিয়ে কিছু খাওয়াও।"

"ও কি এখানে এখন পর্য্যন্ত কিছু খায় নি ?"

উচ্ছ্বসিত স্বরে জহরলাল বল্‌লেন, "কত বড় ওর দর্প! কেউ ওকে জলস্পর্শ পর্য্যন্ত করাতে পারেনি।"

দুঃখিত স্বরে প্রকাশ বল্‌লে, "আহা, সেই কাল রাত্রে খেয়েছিল!" তারপর তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল; বল্‌লে,

"তা ভালই করেছে,—এখানে খেলে হজম হোত না, বমি হয়ে যেত !"

রুষ্ট কণ্ঠে জহরলাল বল্‌লেন, "কেন শুনি ?"

প্রকাশ বল্‌লে, "তা নয় মামাবাবু ? এরকম অবস্থায় আপনি হ'লে এক পেট খেয়ে ঢেঁকুর তুল্‌তে তুল্‌তে ফিরে যেতে পারতেন ? পারতেন না, আপনারও বমি হ'য়ে যেত।"

কি উত্তর দেবেন ভেবে না পেয়ে জহরলাল আরক্ত মুখে ব'সে রইলেন। কিছুতেই বল্‌তে পারলেন না, তাঁর বমি হোত না, হজম করতেন।

গাড়িতে উঠে সন্ধ্যা বল্‌লে, "মুখুজ্জে মশায়, আমিনার দেওর নাসীরউদ্দীন এখানে বোধ হয় ইস্‌লামিয়া কলেজে পড়ে। তার সন্ধান পাওয়া শক্ত হবে না, তার সঙ্গে আমাকে আমিনার কাছে পাঠিয়ে দিন !"

প্রকাশ বল্‌লে, "কিন্তু আমি কি অপরাধ করলাম সন্ধ্যা ? আমার সঙ্গে যাবে না কেন ?"

সন্ধ্যার দুই চোখের মধ্যে আলো জ্বলে উঠ্‌ল ; বল্‌লে, "আপনিও ত' হিন্দু সমাজের লোক, আপনাকেই বা বিশ্বাস কি ? আমি কিছুতেই জামসেদপুরে ফিরে যাব না।"

স্নিগ্ধ কণ্ঠে প্রকাশ বল্‌লে, "হোটেলে গিয়ে আগে কিছু খাবে চল সন্ধ্যা, তারপর এসব কথা হবে।"

শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু প্রকাশের কাছে সন্ধ্যার হার মান্‌তেই হ'ল, সেই দিন রাত্রের ট্রেণেই উভয়ে জামসেদপুর ফিরে চল্‌ল।

(ক্রমশঃ)

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিশেষ কার্য্যে ব্যস্ত থাকার জন্য এ-মাসে তাঁহার নূতন উপন্যাস বাহির করা সম্ভবপর হইল না।

মোরত' সন্ধ্যা ঘনায়ে এসেছে

শ্রীকর্ম্মযোগী রায়

ওষ্ঠে তোমার অমৃত রয়েছে মৃত্যু পথিক আমি,
দাওনা আমারে আমি যে নিত্য তাহারি পরশকামী !
যে মালা আমার গিয়াছে শুকায়ে তারে দাও পুন গেঁথে,
নব যৌবনে মৃত এ জীবন আবার উঠুক মেতে !
যে আকাশ আজ মেঘে ঢাকিয়াছে তার মাঝে আনো আলো,
আধ নিভে যাওয়া জীবন-প্রদীপ নূতন করিয়া জ্বালো।

আঁখি যে আমার উতল হয়েছে তোমারি দৃষ্টি তরে
তোমারি মিলন অশ্রু লাগিয়া আমারো অশ্রু ঝরে !
কতদিন আর ঘুরায়িবে বল, প্রাণহারা উদাসীন,
দুয়ারে দুয়ারে হৃদয় মাগিয়া ফিরিবে এ দীন হীন।
সুন্দরী ধরা কতবার এলো আমার প্রাণের দ্বারে
কতবার হায় ভগ্ন হিয়ায় ফিরায়ে দিয়েছি তারে।
এত রূপ আছে এত গান আছে আমি এর কেউ নই !
সকলে নেহারে স্বপ্ন, আমি না স্বপন-পসারী হই।

হয়ত এখন মনে পড়িবে না সেই নব কৈশোরে
আমার হৃদয় বেঁধেছিলে সখী উতল বাহুর ডোরে।
হৃদ্‌স্পন্দন হয়েছে সাক্ষী সেই মিলনের নব,
চারি চক্ষুর জল-তরঙ্গে পরিণয় উৎসব।
বলিতে পারোকি সত্য করিয়া তুমি হইয়াছ সুখী
বিচ্ছেদ ব্যথা শুধু কি আমারি, শুধু আমি চিরদুখী।
মনের নয়নে দেখিতে পাওনা কোনদিন কারো ছবি
কোনদিন জল ভরে নাকি চোখে কারো স্মৃতি অনুভবি !
ক্ষণিক শিহর লাগেনা কি বুকে সকল সুখের মাঝে
কোনো সকরুণ রাগিণী তোমার মন-বীণে নাহি বাজে।
মোরত' সন্ধ্যা ঘনায়ে এসেছে, তোমার প্রাণে কি প্রিয়া,
আজিও রয়েছে উষার আলোক স্বপ্ন-সুরভি নিয়া !

সন্ধি-বিচ্ছেদ

শ্রীসত্যরঞ্জন সেন এম্ এ, বি এল্

আর্য্য সন্তানের পক্ষে শাস্ত্রের বচন মনে রেখে চলা যে কত দরকার, তা আমরা আজকাল ভুলে যেতে বসেছি। ছেলেবেলায়—মনে পড়ে—ছিদাম কামারের দোকানে সন্ধ্যার পর যখন ধূমপান সভার অধিবেশন হ'ত তখন যতবড় তর্কই উঠুক না কেন, একজন একটা শাস্ত্রের বচন আওড়া'তে পারলেই সঙ্গে সঙ্গে তা'র চূড়ান্ত নিষ্পত্তি। গল্পটা ঠিক জানা না থাক্‌লেও কেউ যদি বল্‌লে, "তুমি কি বল্‌ছো বাপের পো, সেটি হ'বার জো নেই, ওকথা শাস্তরে খুলে লিকে রেখে গেছে; পেত্যয় না হয় ত্রৈলোক্য ঠাকুরকে জিজ্ঞেস্ করগে,"—অমনি সব সংশয় দূর হয়ে যেত। আর আজকাল? দুপাতা ইংরাজী পড়ে আমরা—"

না, আর নয়। এ যেন ক্রমে সনাতন-ধর্ম্ম-সংরক্ষিণী সমিতির বক্তৃতা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, কারুর ভাল লাগ্‌ছে না। থাক, সে তখন পরে এক সময়ে বল্‌বো। কারণ এ কালে বাজেই আসল বলে গণ্য, মেকী খাঁটিকে হটিয়ে দিচ্ছে।

একবার একটা দম্পতি-কলহ মেটাতে গিয়ে শেষে যা' দাঁড়ালো, তা' দেখে মনে পড়্‌লো শাস্ত্রের বচন—'দম্পতি-কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।' কথাটা যদি ছাই আগে মনে পড়্‌তো তা' হ'লে কি ও কাজে হাত দি'।

ব্যাপারটা হয়েছিল আমাদের গাঁয়ের গোপাল চাটুয্যেকে নিয়ে। সে আমার ছেলেবেলার খেলার সাথী, পাঠশালা থেকে আরম্ভ করে মাইনর স্কুলের কিছুদুর পর্য্যন্ত সহপাঠীও ছিল। আমার চেয়ে এক আধ বছরের ছোট হ'লেও, তা'র বর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব (গাত্রবর্ণের নয়), বেশীদিন পর্য্যন্ত উপেক্ষা করা চলে নি। তাই এখন তা'কে গোপাল-দা' বলে ডাকি। তবু দা-ঠাকুর বল্‌তে কেমন একটু বাধে,—ঐ যে দু-পাতা ইংরাজী পড়েছি কিনা।

বুড়ো মা ছাড়া গোপালের আপনার বল্‌বার কেউ ছিল না। এক ছিল তা'র দিদি অন্নদা,—কিন্তু তিনি অনেকদিন হ'ল গোত্রান্তর গ্রহণ করে শুধু যে মারা কাটিয়ে গিয়েছেন তাই নয়, এক বিশাল সংসারে অন্নদা-মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন, কালে ভদ্রে কখন বাপের বাড়ী এলে দু-চার দিনের বেশী থাক্‌তে পারেন না।

এ অবস্থায় ছেলের বিবাহ দেবার জন্যে মায়ের আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। ছেলের পক্ষেও সেটা আর কিছু না হ'ক অন্ততঃ কর্ত্তব্য ত বটেই। কিন্তু গোপাল কিছুতেই ঘাড় পাতে না। অভাব তা'র কিছুই ছিল না; জমি-জমা, বাগান পুকুরের ফসলে সংসার বেশ চলে যায়,—খেটে খাবার দরকার হয় না। খুচরা তেজারতি করে কিছু নগদ আমদানিও হয়। কিন্তু বেশী পীড়াপীড়ি করলে সে মাকে বল্‌তো, "কেন, আমরা মায়ে-ব্যাটায় ত বেশ আছি মা। কি দরকার একটা ভেজাল ঢুকিয়ে।"

মা বলেন, "সে কি কথা! ঘরের লক্ষ্মী আসবে—"

"হ্যাঁ, অমন লক্ষ্মী ত গাঁয়ের ঘরে ঘরে দেখছি! রক্ষে কর, দরকার নেই, এ বেশ আছি।"

মা হয়ত অভিমান করে বলেন, "তা বেশ থাক্‌বে বই কি! বুড়ো মা মর্‌তে মর্‌তে দাসীবৃত্তি করুক, ভাত রাঁধুক, আর—"

গোপাল অমনি বাধা দিয়ে বলে, "কেন, ঘরের পাট ত ফ্যালার মা সবই কর্‌চে। আর ভাত রাঁধা? ভারি ত! সে আমিও কি পারি না—বামুনের ছেলে।"

ব্রাহ্মণত্ব প্রমাণ করবার জন্যে গোপাল দুদিন জোর করে রান্না কর্‌লো। কিন্তু মা হয়ে কেউ কি আর সত্যি বসে বসে তাই দেখতে পারে? দুদিন পরে আবার যেমন ছিল তেমনি চলতে লাগলো। গোপালের দাবা-পাশা আর গান বাজনা নিয়ে বেশ দিন কেটে চল্‌লো। এই রকম করে

বছরের পর বছর গেল, গোপালের খেয়াল ছিল না যে 'বলবুদ্ধি ভরসা' যখন 'ফরসা' হয়ে যায় সে বয়সটা ক্রমেই এগিয়ে আসছে।

এমন সময়ে গোপালের মা গেলেন মারা। অন্ন-দিদি তা'র দু-চার দিন আগেই খবর পেয়ে এসে পড়েছিলেন। কিন্তু এবারও বেশীদিন থাকতে পারলেন না। চতুর্থীটা নিজের বাড়ীতে গিয়েই বেশ ঘটা করে করলেন।

এদিকে গোপালের স্বপাক চলতে লাগলো। কালা-শৌচের একটা বছর এই রকম করেই কাটলো। ইতিমধ্যে দাদার মতিগতি বোধ হয় যেন একটু বদলাতে আরম্ভ করেছিল। কেন না, এখন তাকে কেউ বিয়ের কথা বললে, সলজ্জ হাসির সঙ্গে একটু ক্ষীণ প্রতিবাদ করেই চুপ করে যায়। বলে, এ বয়সে কে আর আমাকে মেয়ে দেবে বল। সম্মতি লক্ষণটা বেশ স্পষ্ট নয় বলেই হ'ক, বা যে কারণেই হ'ক, কথাটা রহস্যচ্ছলে উঠে ঐ হাসিটুকুতেই তার পরিসমাপ্তি হয়। বিশেষ কোনও চেষ্টা আর হয় না, কারণ তেমন আগ্রহ কারুরই দেখা গেল না। হ'ত, যদি গ্রামে কারুর বয়স্থা কন্যা থাকতো। কিন্তু এখানে ব্রাহ্মণের বাস বড় কম—মাত্র পাঁচ সাত ঘর।

হঠাৎ একদিন গোপাল চলে গেল দিদির বাড়ী। তাঁর দেওরের এক ছেলের নাকি বিয়ে, তাই গোপালকে ডেকেছেন বিয়ে বাড়ীতে একটু খাটবার জন্যে। কিন্তু গোপাল যে কেমন কাজের লোক তা' কি তা'র দিদির জানা নেই? ভাবলাম মা-মরা-ভাইটির উপর বোধ হয় তাঁর স্নেহের মাত্রাটা একটু বেড়ে গিয়েছে, এই সূত্রে তা'কে দিনকতক নিজের কাছে রাখবার ইচ্ছা।

মাস দুই পরে গোপাল ফিরে এল—সস্ত্রীক।

দিদি নাকি দেবের পুত্রের সঙ্গে নিজের ভাইটিকেও বিবাহ-বিপণিতে যাচাই করতে দিয়েছিলেন। খরিদ্দার সহজেই জুটে গেল। তাই 'রাজেন্দ্র-সঙ্গমে দীন' গোপালদারও 'তীর্থ দরশন' ঘটে গেল—বিনা খরচায়।

এই ঘটনায় গ্রামের একঘেয়ে জীবনে বেশ একটু মৃদু চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। অপ্রত্যাশিত অথচ নিতান্ত অবাঞ্ছনীয় নয় এমন কিছু ঘটলেই এ রকম হয়ে থাকে।

এদিকে পত্নীলাভের সঙ্গে সঙ্গে গোপালের মিত্রলাভের যোগটাও দেখা গেল। যাদের সঙ্গে কোন কালে ঘনিষ্ঠতা ছিল না, তারা বেশ মাখামাখি আরম্ভ করলো। এমন কি, বয়সে দুচার বছরের বড় এমনও কেউ কেউ 'গোপাল-দা' বলে তার সদর ঘরে শিকড় গেড়ে বসেন, সহজে নড়তে চান না।

গোপাল বুঝতে পারে না, হঠাৎ তা'র এতটা আদর-সম্ভ্রম বেড়ে গেল কেন। আমি বুঝিয়ে বললাম, "এ আর কিছু নয় দাদা, সেই যে 'কথামালায়' পড়েছিলে 'একদা এক দোকানে মধুর কলসী উল্টাইয়া পড়িল', আর অমনি ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি এসে জুটলো—এও তাই। তবে এ সব মাছি একটু বেশী সেয়ানা কি না, তাই মধুর কলসী উল্টাবার অপেক্ষা রাখেনি, কলসী আমদানি হ'তেই আগে-ভাগে এসে জুটেছে,—ক্রমে সব সরে' পড়বে।"

হ'লও তাই। কেবল আমার সঙ্গে গোপালের সম্বন্ধ সেই রকমই রইল, বরং আরও একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো। কারণ ক্রমে বৌদি'—অর্থাৎ গোপালের স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হ'ল। ব্রাহ্মণ কন্যা তাঁর সরল নিঃসঙ্কোচ ব্যবহারের দ্বারা সহজেই আমার স্নেহ ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করলেন।

কিন্তু মেয়েমানুষ জাতটা কি চালাক! তরুণী ভার্য্যার যে মূল্য কত, আর স্বামীর বয়সের অনুপাতে সেই মূল্যের যে কতটা তারতম্য হয়, তা' এই সরলা পল্লী-বালাও বেশ বুঝে নিয়েছেন। তাই দেখলাম ইনিও স্বামীর উপর তাঁর প্রতিপত্তি অল্পদিনের মধ্যে বেশ জমিয়ে বসেছেন। দেখলাম তাঁর একটা না একটা আবদার লেগেই আছে, আজ এটা চাই কাল ওটা চাই। অবশ্য জড়োয়া গহনা কিংবা মোতির মালার ফরমাস নয়,—ছোটখাটো মামুলী, ন্যায়সঙ্গত ফরমাস। গোপাল তাঁ'র সকল আবদারই অকুণ্ঠিত চিত্তে রক্ষা করবার চেষ্টা করে, কিন্তু করেও সব সময়ে মন পায় না। জিনিস প্রায়ই অপছন্দ হয়।

সেটা অবশ্য গোপালের দোষ নয়। স্ত্রীলোকের ব্যবহার্য্য জিনিসের সঙ্গে এতদিন তা'র কোন পরিচয়ই ছিল না। কাজেই নিতান্ত আনাড়ির মতন এটা ওটা যা' কিনে আনে তা' কোনটাই প্রায় ঠিক হয় না। গোপাল শেষে ও

ভারটা আমার উপর চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হ'ল। এ কাজে আমার অভিজ্ঞতা গোপালের চেয়ে বেশী ত বটেই। তাছাড়া, মামলা-মকর্দ্দমার জন্য প্রায়ই সহরে যেতে হয় বলে গ্রামশুদ্ধ লোকের ফরমাস প্রায় আমাকেই যোগাতে হয়।

এই সূত্রে বৌদিদির সঙ্গে আমার বেশ একটা স্নেহের সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেল। তারপর তাঁর আব্দার অনুরোধের অন্ত নেই, আমারও তাঁর মন যোগা'তে ক্লান্তি নেই, গোপালেরও পয়সা যোগাতে আপত্তি নেই। শেষে আমারই এক এক সময়ে বিরক্তি ধরে যায়। গোপালকে সতর্ক করে দি', "অমন করে একেবারে রাশ ছেড়ে দিয়ে ভাল করছো না দাদা। বেশী নাই দিলে শেষে সাম্‌লাতে পার্‌বে না। মাঝে মাঝে একটু রাশ টেনে ধর—না হলে স্ত্রৈণ হয়ে পড়্‌লে বলে। দেরী করে বিয়ে করলে ওরকম প্রায়ই হয় বটে, কিন্তু তুমি ত সত্যি বুড়োও নয়, দোজ্‌বরেও নও, অত নীচু হ'য়ে থাক্‌বে কেন? নিজের জোরের উপর থাক্‌বে,—'এই গোঁপজোড়াতে দিলে চাড়া'—এই রকম ভাব।"

মনে হয় উপদেশ রক্ষিত হয়েছে। কারণ বাইরে থেকে যতটা বুঝি, মাঝে মাঝে মান অভিমান তর্কাতর্কির প্রমাণ পাওয়া যায়। এক একদিন গিয়ে দেখি, দাদা ঘোরতর গম্ভীর এবং যৎপরোনাস্তি চুপচাপ, আর বাড়ীর ভিতর গৃহিণীর মুখ ভার, যেন এইমাত্র একটা ঝড় হয়ে গিয়েছে আর সেই সঙ্গে এক পশলা বৃষ্টি।

জেলা-আদালতে আমার একটা বন্ধকী খতের মামলা দায়ের ছিল। এক সময়ে একদিন পেয়াদা এসে হাজির হ'ল—আমার তরফের সাক্ষীদের সমন জারি কর্‌তে। গোপালও খতের একজন সাক্ষী ছিল। প্রথমেই তা'র সমনটি ধরিয়ে, পেয়াদাকে নিয়ে অন্য সাক্ষীদের তল্লাসে গেলাম। কাজ সারা হ'লে পেয়াদাকে খুসী ক'রে বিদায় দিয়ে ফির্‌ছি, গোপালদের বাড়ীর সামনে এসে পৌঁছতেই বাড়ীর ভিতরে উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনে থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম।

গোপাল-গৃহিণী তখন বেশ উঁচু গলায় মুক্ত কণ্ঠে প্রচার কর্‌ছেন, "তা বলে' আমার দাদাদের নিয়ে অমন ঠাট্টা-তামাসা করো' না, আমার ভাল লাগে না।"

দাদা জবাব দিচ্ছেন, "কেন কর্‌বো না, খুব কর্‌বো। আমার বলবার অধিকার আছে বলেই বলি।"

একটা খণ্ড-যুদ্ধ চল্‌ছে দেখে বাড়ীর ভিতর ঢুক্‌তে হ'ল।

"কি হচ্ছে বৌদি', এমন প্রাণখোলা আলাপ হয়ে গেছে যে। ও-পাড়া থেকে শুন্‌তে পেয়ে এই আস্‌ছি। কিন্তু ব্যাপারটা কি?"

কণ্ঠস্বর একটু সংযত করে তিনি বল্‌লেন, "দেখ না ঠাকুর-পো, শুধু শুধু যখন তখন আমার দাদাদের ঠেস্ দিয়ে দিয়ে কত কথা বলা হয়। কেন? কিসের জন্যে?"

আমি বল্‌লাম, "সে কথা ত বাড়ী ঢোক্‌বার আগেই শুনেছি। কিন্তু গোড়ার কথাটা কি? খামকাই কি আর তোমার দাদাদের—"

গোপাল বল্‌লে, "সে এক সামান্য তুচ্ছ কথা। তাই থেকে—"

"হ্যাঁ, তুচ্ছ কথা বই কি! আমি যা' বলি সবই তুচ্ছ কথা!"

বল্‌লাম, "বেশ ত, তুমিই বল না বৌদি' কি হয়েছিল!"

তিনি বেশ ধীর ভাবে গুছিয়ে বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন, "হয়েছিল কি, আমি শুধু বলেছি, সাক্ষী দিতে সহরে যাবে, সেই সময়ে আমার জন্যে একটা ব্লাউজ্ কিনে নিয়ে এস। এই শুনে উনি একেবারে আকাশ থেকে পড়্‌লেন,—ব্লাউজ্ আবার কি? আমি বল্‌লাম, তা'ও জান না?—মেয়েদের গায়ে দেবার জামা। উনি বল্‌লেন, তাই বল—জ্যাকেট্। তা জ্যাকেট ত তোমার ক'টা রয়েছে। আমি বল্‌লাম, জ্যাকেট্ আজকাল ছোটলোকেরা পরে, ভদ্র সমাজে চলে না,—ব্লাউজই ফ্যাসন। এই না শুনে উনি ত মহা গরম। বল্‌লেন, ওসব ফ্যাসন ট্যাসন আমাদের বাড়ী চল্‌বে না। তোমার দাদারা সাহেবী মেজাজের লোক, বৌদিদিরা সব স্কুলে পড়ে মেমসাহেব বনে' গেছেন, তাঁরা ব্লাউজ-ঘাঘরা পরতে পারেন—"

গোপাল বাধা দিয়ে বল্‌লো, "কথাটা আমি ঠিক ও ভাবে বলিনি। আমি বলেছিলাম, তোমার দাদারা থাকেন সহরে, কত বড় বড় ঘরে যাওয়া আসা করতে হয় বৌদিদিদের, তাঁদের পক্ষে ফ্যাসান মত নতুন নতুন ধরণের

জামা-কাপড় দরকার হ'তে পারে ; এখানে এই পাড়াগাঁয়ে,— বামুনের ঘরের বৌ তুমি, তুমি ওসব কখনই বা পরবে, কোথায়ই বা যা'বে ? সেইর কথাটাকে ঘুরিয়ে—"

আমি বল্লাম, "থাক গে, আর কথা বাড়িয়ে কাজ নেই। ব্যাপার কি তা' বুঝ্তে পেরেছি। এতে কিন্তু তোমাদের দুজনকারই দোষ আছে। তুমি ত দাদা, পৃথিবীর কোন খবরই রাখ না। বাস্তবিকই আজকাল জ্যাকেট আর চলে না, ব্লাউজ পরাই চাল। সুতরাং বৌদি' কিছু অন্যায় বলেন নি। আর ওটা ত কিছু অষ্টপ্রহর ব্যবহারের জন্যে নয়, তবে দুটো-একটা ভাল জামা-কাপড় ঘর করে রাখা দরকার, কালেভদ্রে কোথাও যেতে আস্তে হ'লে—"

নিজের অনুকূলে ডিক্রী পাচ্চেন দেখে বৌদি'র যেন একটু উৎসাহ বেড়ে গেল। তিনি আমার কথা শেষ করতে না দিয়ে তাঁর প্রধান অভিযোগের পুনরাবৃত্তি আরম্ভ করলেন—"আর অমন যখন-তখন আমার দাদাদের বেখ্যানা করা,—তাঁরা হ্যান্ করেছেন, তাঁরা ত্যান্ করেছেন,—তাঁদের কাছে থেকে, তাঁদের খেয়ে মানুষ হয়েছি,—আমার ওসব মোটেই সহ্য হয় না—" বল্তে বল্তে তাঁর স্বর বন্ধ হয়ে এল, নারী ও শিশুর যা ব্রহ্মাস্ত্র, এই তালে তার প্রয়োগ আরম্ভ হ'ল।

পরনারীর চোখের জলে বিচলিত হ'বার মতন দুর্ব্বলতা আমার নাই। বল্লাম, "ওটা কিন্তু তোমার ভুল বৌদি'। তোমার দাদারা কি কেবল তোমারই দাদা, গোপালদা'র কি কেউ হন না ? কি, বল না দাদা, তাঁরা তোমার কে হন ?"

দাদা আমার চোখের ইঙ্গিতে বুঝ্তে পারলেন। বল্লেন, "তাঁরা আমার শালা। শালাদের নিয়ে একটু ঠাট্টা-তামাসা কর্‌বো না ? আলবৎ কর্‌বো।"

দাদার কথায় সায় দিয়ে বল্লাম, "তা তুমি খুব পার। কিন্তু তা বলে যা'তে বৌদি'র মনে কষ্ট হয় এমন কোন কথা বলা উচিত নয়।"

ব্যাপারটাকে একটু হাল্কা করে আনবার চেষ্টায় ছিলাম, কিন্তু তা' হ'ল না। বৌদি'র মুখের উপর থেকে মেঘখানা সর্‌লো না। তিনি আবার আরম্ভ করলেন,—"না, উনি আঁতে ঘা দিয়ে এমন এক-একটা কথা বলেন, যা'তে গা জ্বলে যায়। এক এক সময়ে মনে হয় আমার যদি নিজের বাপের বাড়ী থাক্‌তো, এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে জ্বালা জুড়াতাম। কিন্তু মামার বাড়ীর উপর ত কোন দাবী নেই। যাই হ'ক, তুমি এর একটা বিহিত কর ঠাকুর-পো, আমি আর পারি না।"

আমি বল্লাম, "বাপের বাড়ী নেই বলে আপশোষ কর্‌ছো বৌদি'। আচ্ছা বেশ, আমি এমন ব্যবস্থা করে দিচ্ছি যা'তে সেই একই ফল হ'বে। তোমরা নিত্যি এমন ছেলেমানুষের মতন ঝগড়া-ঝাটি আরম্ভ করেছ যে তা'র একটা মীমাংসা না করে দিলে আর চল্‌ছে না। তাই আমি মধ্যস্থ হয়ে তোমাদের এই সর্ত্তে সন্ধি করে দিচ্ছি যে, আজ থেকে কেউ কারুর সঙ্গে কথা কইবে না ; আর জেঠাই-মার (গোপালের মার) ঘরখানা ত এখন খালি পড়ে রয়েছে, বৌদি' সেই ঘরে শোবে,—কারুর সঙ্গে কারুর সংস্রব থাক্‌বে না। তা বলে বৌদি'কে বেঁধে ভাত দিতেও হ'বে, তেল-গামছাও জোগাতে হ'বে, পানও সেজে দিতে হ'বে ; আর দাদাকে দোকান-বাজার সবই করে দিতে হ'বে,—কেবল কথা কইতে পাবে না। আজ থেকে সাত দিন এই রকম চলুক। এই সাতদিন দুজনেই সন্ধির সর্ত্ত মেনে চল্‌তে হ'বে। যদি কেউ সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ করে, তা'র দণ্ড হ'বে। সাতদিন পরে আবার নতুন ব্যবস্থা হ'বে। কেমন, রাজী ত ?"

বৌদিদি মাথা হেঁট করে বল্লেন, "বেশ, তাই হ'ক।" দাদার দিকে চাইতে তিনি একটু মুচ্‌কে হেসে চুপ করে রইলেন। সুতরাং—'মৌনং সম্মতি লক্ষণম্'।

তারপর মকদ্দমা সম্বন্ধে পরামর্শ কর্‌বার জন্যে দাদাকে সঙ্গে করে নিয়ে সদর ঘরে গিয়ে বসা গেল। সেখান থেকে বোঝা গেল যে বৌদিদি তাঁর শাশুড়ীর ঘরখানিকে ঝেড়ে-মুছে বাসোপযোগী কর্‌বার জন্যে উঠে পড়ে লেগে গিয়েছেন।

দিন দুই পরে একবার খবর নিতে গেলাম। দেখা গেল আমার ব্যবস্থা মতই সব চল্‌ছে। কিন্তু দুজনকারই কেমন একটু ভাবান্তর লক্ষ্য কর্‌লাম। গোপালকে দেখে মনে হ'ল যেন একটু বিষন্ন, অন্যমনস্ক। ওদিকে বৌদিদির

অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য,—আমাকে দেখে একটু কাষ্ঠহাসি হেসে দু-চারটে মামুলি কথা কইলেন মাত্র, তারপর একেবারে চুপচাপ। বোধ হ'ল যেন আমার উপর একটু অসন্তুষ্ট।

মনে মনে একটু রাগ হ'ল। দুজনে খেচাখেচি করে অশান্তি ভোগ করছিল, আমি দিলাম মিটিয়ে,—এখন দুজনে আমার উপরই বিরূপ! হা অদৃষ্ট!

ঘটনার পর চারদিনের দিন আমার সেই মকদ্দমার তারিখ। একটু সকাল করে বেরিয়ে পড়্তে হ'বে, না হলে ঠিক সময়ে পৌছতে পারা যাবে না। এই ভেবে ভোরে উঠেই সাক্ষীদের ডাক্তে ছুটলাম। ফেরবার পথে ভাব্লাম গোপালকেও একবার তাগাদা দিয়ে যাই।

সদর দরজা খোলাই ছিল, গলা খাঁকারি দিয়ে ভিতরে ঢুক্লাম। দেখ্লাম রান্নাঘরের চাল ফুঁড়ে ধোঁয়া উঠ্ছে,—মনে হ'ল এইমাত্র উনানে আগুন দেওয়া হয়েছে। ফ্যালার মা খিড়কীর ঘাটে বাসন মাজ্তে বসে কোন অনুপস্থিত প্রাতিবেশিনীর উদ্দেশে অবাধে গাল দিয়ে চলেছে। বৌদিদি নিজের ঘরে শিকল তুলে দিয়ে বোধ করি পুকুরে গিয়েছেন।

দাদার ঘরের দরজা অল্প একটু ফাঁক করা রয়েছে দেখে, আমি রোয়াকের নীচে চটি খুলে রেখে আস্তে আস্তে ঘরে ঢুক্তেই—একেবারে চক্ষু স্থির! দেখি দাদা সোজা হয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন, আর বৌদিদি তক্তপোষের ধারে পা ঝুলিয়ে বসে। বোধ করি হেঁট হয়ে দাদার কানে কানে কিছু বল্‌ছিলেন, দরজা খোলার শব্দে চম্‌কে গিয়ে একেবারে উঠে দাঁড়ালেন। মুহূর্ত্তের জন্যে আমারও উমার মতন 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থা। পালাবার পথ খুঁজ্‌ছি, এমন সময়ে দাদাও উঠে বস্‌লেন।

নিজেকে একটু সাম্‌লে নিয়ে বল্‌লাম, "দাদার কি শরীর খারাপ নাকি?"

দাদা উঠে দাঁড়িয়ে কোঁচার খুঁট গায়ে জড়াতে জড়াতে বল্‌লেন, "না, শরীর ভালই আছে।"

"তবে বৌদি' এ ঘরে কেন?"—এই বলে বৌদিদির মুখের পানে চাইতেই, তিনি মাথার কাপড় আর একটু টেনে দিয়ে শুধু একটু ক্ষীণ হাসি হাস্‌লেন। মনে হয় শাড়ীর লাল পাড়টার ছায়া পড়ে তাঁ'র মুখখানাকে অতখানি লাল করে তুলেছিল।

আমি একটু রাগের ভাব দেখিয়ে বল্‌লাম, "এই তোমাদের এত ঝগড়া-ঝাটি লাঠালাঠি, আমি থেকে দুজনের একটা সন্ধি করে দিলাম, দুদিন যেতে না যেতেই সেই সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ! নিতান্ত ছেলেমানুষ সব।"

গোপাল-দা' আর একটু এগিয়ে এসে হেসে বল্‌লেন, "এটা নেহাৎ একটা সন্ধির সর্ত্তভঙ্গ নয় হে ভায়া,—এ একেবারে সন্ধি-বিচ্ছেদ!" কাগজ ছেঁড়্‌বার ভঙ্গীতে দু-হাত নেড়ে কথাটা তিনি বিশদ করে দিলেন।

একটু অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বল্‌লাম, "তা হবে বই কি। আমারই ভুল হয়েছিল। দাম্পত্য-কলহে যে তৃতীয় ব্যক্তির স্থান নেই, এ কথাটা মনেই ছিল না। তা হ'লে আর এ বিড়ম্বনা হয়।"

শ্রীসত্যরঞ্জন সেন

নর্ত্তকী

শ্রীমহিতোষ বিশ্বাস

বানপ্রস্থ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ এ (ক্যাল এবং ক্যান্টাব), এ আর্ সি এস (লণ্ডন), আই-ই-এস্

সাঁচির পথে

ইংরাজীতে একটা চল্‌তি কথা আছে, 'গড়ানি পাথরে শ্যাওলা ধরে না'। বুন্দেলখণ্ডে ভ্রমণ শেষ করে সাঁচির পথে

ডাক্-বাংলা—সাঁচি

ট্রেনে যেতে যেতে এই কথাটা বারবার মনে হচ্ছিল। এ রকম গো-গ্রাসে ঘুরপাক্ খেলে পরিপাকটা বাধা পায়। যতগুলি জায়গা দেখে এলাম প্রত্যেক স্থানটিতে অন্ততঃ দুচার দিন থাক্‌তে পার্‌লে একটু জাবর্ কেটে নিতে পারা যেত। কিন্তু চর্ব্বিত-চর্ব্বণের অবকাশ কোথা? ঘরে ফিরে গিয়ে মনে হবে একটা সিনেমা দেখে ফির্‌লাম, কতকগুলি চলচ্চিত্রের একটা অস্পষ্ট আব্‌ছায়া মনের এক কোণে পড়ে থাক্‌বে। তিন রকম রেখাঙ্কণ মনের উপর পড়ে—"শিলাসু সিকতাসু জলেষু রেখা"। পাথর, বালি আর জলের উপর রেখাপাত, স্থায়ী, অস্থায়ী আর ক্ষণিক। ফটোগ্রাফের ফিল্মের মত আমাদের মন ছায়াচিত্রগুলিকে ধরে রাখ্‌বার জন্য একটু বিরামের অপেক্ষা রাখে। বিষয়ের বৈশিষ্ট্যের উপর এবং চিত্তের দীপ্তি-অনাতপের অনুপাতে এই অবকাশ-টুকুর অবশ্য হ্রাসবৃদ্ধি আছে।

যে রকম মার্কিনি চালে আমরা ভূ-প্রদক্ষিণ কর্‌ছি তা'তে চোখের দেখাটা ঘনিষ্ঠতর পরিচয়ের নিবিড়তা লাভ কর্‌বার সুযোগ পেল না। পাখী গলস্থলীতে যা গেলে, সেটা পাকস্থলীতে ধীরে ধীরে দ্বিতীয় সংস্করণে জীর্ণ করে তোলে। আমাদের দেহে দুটি জঠর না থাক্‌লেও বোধ করি অন্তরে আছে। চোখ কান দিয়ে যেটা গলাধঃকরণ করি সেটাকে আবার ধীরে সুস্থে চিত্তের অন্তস্তলে মানসিক রসায়নে চিত্তের রসরক্তে পরিণত করি। যেখানে এই বিশ্রামটুকুর অভাব হয় সেখানে পাওয়াটা অন্তরঙ্গ উপলব্ধিতে পৌঁছায় না। অতৃপ্তির সঙ্গে তাই মন কেবল বল্‌চে, হ'ল না, হ'ল না, 'ভাল করি পেখন না ভেল', আবার আস্‌তে হবে এখানে। তবু অভাব পক্ষে এই ক্ষণিকের দর্শনই বা মন্দ কি? ইউলোসিসের কানে সাইরেনদের যে গানটি জেগেছিল তার সুর আর কথা হয়ত তিনি ভুলেছিলেন, কিন্তু তাঁর স্মৃতির অস্ফুট গুঞ্জনটি যে গানের আসরে আর সব গানকে ধিক্কৃত কর্‌ত তার সন্দেহই নাই। বুন্দেলখণ্ডের স্মৃতি মগ্নচৈতন্যে থাক্‌বে। ঘরের কোণে

মনকে সুস্থির হয়ে টিকতে দেবে না, বাহির-কটকা করে ছাড়বে।

আর একটি অভাব ট্রেনে ব'সে অনুভব করছিলাম। এ যাত্রায় কোনো মানুষের সঙ্গে পরিচয় ঘটল না (আর্টিষ্ট্ মিঃ ললিত সেন ছাড়া)।

একবার যূথভ্রষ্ট হ'লেই বুঝতে পারা যায় মানুষের কাছে মানুষের মূল্য কত। এক ইংরাজ দম্পতীর গল্প শুনেছিলাম। তাঁরা বিদেশ ভ্রমণে বাহির হয়েছিলেন। বহুদিন কোনো ইংরাজের সঙ্গে কথাবার্ত্তার সুযোগ ঘটেনি। জার্ম্মানীতে এক হোটেলে রাত্রিযাপন করছেন, এমন সময়ে নিশুতি রাতে পাশের ঘরে এক বেবী কান্না জুড়ে দিল। স্বামীকে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে গৃহিণী বল্লেন, উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, "Hark the baby is crying in English", ওগো শোন, বেবী কেমন ইংরাজিতে কান্না ধরছে!

ভাইপো গেলেন Dining Car এ কিঞ্চিৎ ইন্ধন সংগ্রহে। আমার অগ্নিমান্দ্য, সুতরাং জানালার ধারে আমার কোণটিতে আরামে বসে কাম্‌রায় একটি সহযাত্রীর প্রতি কুতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম। তিনিও মুচকে হাস্‌লেন, পরিচয়ের সূত্রপাত হ'ল। ভদ্রলোকটি চলেছেন কাশ্মীর থেকে মধ্য-ভারতের কোন্ এক জায়গায় সেখানকার কলেজের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হয়ে। সম্প্রতি মাস ছয়েকের জন্য ইয়োরোপ ঘুরে এসেছেন। ফ্রান্স্, ইতালী ও জার্ম্মানী। দুচার কথার পরেই এই তিনটি দেশের, তুলনামূলক সমালোচনা সুরু করে দিলেন। দেশের অর্থাৎ তৎতৎ দেশীয় বর্ত্তমান্ নারী-প্রগতির সম্বন্ধে। শাস্ত্রে বলে, "গৃহিণী গৃহমুচ্যতে"। সেই হিসাবে রমণী রাষ্ট্রমুচ্যতে বলা চলে। গার্হস্থ্য জীবনকে যদি সমাজের কেন্দ্র ধরা যায়, তবে আমার সহযাত্রীর মতে জার্ম্মানীতে বর্ত্তমান নারী-শক্তির ঘূর্ণ্যাবেগ কেন্দ্রানুগ, আর ফ্রান্স্ ও ইতালীতে কেন্দ্রাতীগ। ভদ্রলোকটি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্, এ, দর্শনশাস্ত্রে। পিতা ছিলেন কাশ্মীরী মুসলমান্, ইংরাজ কন্যা বিবাহ করে পরে হয়েছিলেন খ্রীষ্টান। কন্যাদের বিলাতে শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। পুত্রের মতিগতি প্রাচ্যমুখী। পাঞ্জাবে বর্ত্তমান্ নারী-প্রগতি ইতালি ও ফ্রান্সের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে এই আশঙ্কায় তিনি সন্ত্রস্ত। আমাকে বাংলা দেশের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। বল্লাম, ভারতের সর্ব্বত্রই পুরাণ আটচালায় ভাঙনের মড়্‌মড়ানি জেগেছে। কোথাও পাশ্চাত্য অনুকরণের চাপে, কোথাও বা অন্তররুদ্ধ আবেগের তাড়নায়। ভিতরের চাপে যেখানে ফাটল ধরে, সেখানে নবজীবনের সূত্রপাত হয়েছে বলে আশান্বিত হওয়া যেতে পারে। আর বাহিরের ভারে যদি ভাঙে তবে জ্যান্তে গোর। বাংলার প্রাণশক্তি আছে। অনুকরণের কৃত্রিমতার চেয়ে বোধ হয় প্রাণের তাগিদ আছে বেশী। আমার ধারণা সত্য কি মিথ্যা ভাগ্য-বিধাতা জানেন। তবে আশা করি সত্য।

বৌদ্ধ স্তূপ—সাঁচি

বল্লাম, দেখুন, মিশরের সূর্য্যমন্দিরে খগরাজ ফেনিক্সের হাজার বৎসর পরমায়ু যখন ফুরিয়ে আস্‌ত, তখন সে চারিদিক

থেকে সংগৃহীত সুগন্ধী পর্ণসম্ভারে চিতাশয্যাটি প্রস্তুত করে সেই বহ্নিশয্যায় শয়ান হয়ে নিজেই আপনার মুখাগ্নি করত। চিতাভস্ম হ'তে উদ্ভূত হ'ত দীপ্তপর্ণী সংপ্রাপ্ত নবীন পক্ষীরাজ। আমাদের ভারতবর্ষ একটি অতি বৃদ্ধ জটায়ু পক্ষী, কম্-সে-কম্ দুহাজার বৎসর তার উমের্। এখন যদি সে দুনিয়ার দশদিক থেকে সমিধ সংগ্রহ করে চিতাশয্যাটি সাজিয়ে আপনার অন্ত্যেষ্টি সৎকার করে তা'হ'লে আবার হয়ত দুহাজার বৎসর পরমায়ু নিয়ে নবজীবনে ভূমিষ্ঠ হবে। তার চিতাভস্মে পূর্ব্ব পশ্চিম যে রসায়নে মিলিত হবে তা'তে স্বদেশের সার-সত্ত্বের সঙ্গে বিদেশের দর্ভ-নিষ্কর্ষ মিশে তার নবপত্র ও পরমায়ু সৃজন করবে। বাংলায় যে অধুনা কিছু আধ্যাত্মিক বা সামাজিক বিপ্লব ঘটেছে তার ভিতর পূর্ব্ব-পশ্চিমের মিশ্ররাগ ঝঙ্কৃত হয়েছে। আমাদের রামমোহন বর্ত্তমান যুগে প্রাচীন ভারতকে নবজীবনে উদ্বুদ্ধ করবার প্রথম উদ্‌যাগ করেছিলেন প্রতীচ্য জ্ঞানবিজ্ঞানের উদ্দীপনায়, সুদৃঢ় বৈদান্তিক ভিত্তির উপর। তাঁর কাজ এখনো শেষ হয়নি। সংস্কারপন্থী ও রক্ষণশীলদের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে সমন্বয়ের মূল সুরটি অক্ষুণ্ণ আছে। তবে একথা সত্য আমাদের লব্ধি এতাবৎ সামান্য, অনলব্ধি অপ্রমেয়। যা-ই করি না কেন আমাদের প্রাণের মূল শিকড়টি যদি দেশের মর্ম্মস্থল থেকে প্রাণরস সংগ্রহ করতে না পারে তা'হ'লে আমাদের মহতী বিনষ্টি। পাশ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষা আমাদের রক্ষা করতে পারবে না। একটা মূলোর উত্তমার্দ্ধটির ভিতরটা কুরে কুরে ফোঁপরা ক'রে তার ভিতরে জল ঢেলে সেটাকে ঝুলিয়ে রাখলে দুচারটে পাতা গজাতে পারে বটে, কিন্তু তা'তে প্রাণ প্রতিষ্ঠা চলবে না। মাটির জিনিষকে তার আপনার মাটিতে পুঁততে হবে, বিদেশী সার মিশাতে হবে স্বদেশী মাটিতে।

বৌদ্ধ-স্তূপ—সাঁচি

মেয়েরা স্বতঃই রক্ষণশীল। পাশ্চাত্য অনুকরণ উপর উপর কতকটা ছায়াপাত করলেও বাংলার নারী প্রগতির আবেগ পশ্চিমমুখী নয়। বায়ু বিজ্ঞানে বলে নিম্নস্তরের মেঘগুলি যে দিকে ভেসে চলে উর্দ্ধলোকের মেঘাবলির গতি তার বিপরীত দিকে। বাংলার যথার্থ শিক্ষিতা ও ব্যক্তিত্বশালিনী নারীরা পশ্চিমের ঝোড়ো হাওয়ায় গা ভাসিয়ে দেননি। তাঁদের স্বৈরগতি বিপরীত দিকে। তাঁদের অবরোধের দ্বার ধীরে ধীরে গৃহে গৃহে উদ্‌ঘাটিত হচ্চে। অসাধু দৃষ্টান্তে কুফলের চেয়ে সুফলের সম্ভাবনা বেশী যদি সুশিক্ষালব্ধ স্বাধীন বিচার ফলাফল সম্বন্ধে সতর্কতা আনে। বাংলার মেয়েরা এ বিষয়ে যথেষ্ট হুঁসিয়ার বলে আমার মনে হয়।

ভাইপো রেস্তরাঁ কামরার থেকে ফিরলেন। আমাদের বিশ্রম্ভালাপে ধামাচাপা পড়ল। তারপর কিরূপে কাশ্মীরে সস্তায় ঘুরে আসতে পারা যায় সে সম্বন্ধে সহযাত্রীর কাছ থেকে কিঞ্চিৎ তথ্য সংগ্রহ করা গেল। বল্লেন, আমাদের কাশ্মীর যাত্রার বন্দোবস্ত পাকা ক'রে তাঁকে চিঠি লিখলে তিনি সুব্যবস্থা করে দিতে পারবেন। আমিও তাঁকে বাংলায় নিমন্ত্রণ করলাম। পথিকে পথিকে ভবিষ্যপর্ব্বের একটা

বায়না হয়ে রইল। যা হোক্, তবু একটা পথের পরিচয় ঘটল ঠিক্ সেই সময়ে যখন মনটা একটু চঞ্চল হয়েছিল অচেনাকে পরিচয় সূত্রে বাঁধতে।

ট্রেণ ছুটে চলেছে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত পাহাড় জঙ্গল মাঠ পার হয়ে। নিসর্গের নিয়মচক্রে আলো অন্ধকারের নিশ্চয়ই কোনো সার্থকতা আছে। বিজ্ঞান উঁকি ঝুঁকি মেরে একটু আধটু তথ্য সংগ্রহ করে আনে, অসীম রহস্যসিন্ধুর থেকে এক আধ কলসি জল। কিন্তু যাকে আমরা সুন্দর বলি তার সার্থকতা কোথায়? এই যে দিক্‌দিগন্ত ভেসে যাচ্ছে

স্তূপের পাশে চৈত্যগৃহে স্তম্ভপঞ্জর—সাঁচি

সৌন্দর্য্যের প্লাবনে, মানুষের চোখ, যাতে সৌন্দর্য্যের অনুভূতি ফোটে, এর কতটুক্ দেখ্‌ছে, আর সবই কি রূপের হিসাবে বাজে খরচ? রাতের পর রাত চলেছে এই আলো অন্ধকারের খেলা, চাঁদের জ্যোৎস্না, নক্ষত্রপুঞ্জের জটলা। আমরা ত দিব্যি ঘরে খিল দিয়ে ঘুমাই। কচিৎ দুচারটি খেয়ালী নিদ্রাহীন চোখে আকাশ পানে চেয়ে এ রূপের মেলা দেখে। শুধু কি সেই দুচারজন আধপাগ্‌লার জন্য এই রূপের বন্যা? প্রকৃতির কুবেরভাণ্ডারে খরচের ত হিসাব নাই। তাই ভাব্‌লাম, আজকার এই জ্যোৎস্না রাত্রিটি বুঝি বিশেষ ভাবে আমার জন্য। এতে আর আমার অহমিকা কি? যাঁর এই অকৃপণ দান তাঁরই বদান্যতার বাহুল্যমাত্র। হঠাৎ মনে হ'ল চলেছি বৌদ্ধতীর্থে, কিন্তু তীর্থযাত্রীর সে ব্যাকুলতা ত আমার নাই। যদি থাক্‌ত তা হলে এ যাত্রা কী আনন্দময়, ঔৎসুক্যময় হ'ত! আমাদের সব পাওয়াই ত চাওয়ার তীব্রতায় মূল্যলাভ করে। তাই কবি যখন বলেন Now. এই মুহূর্ত্তেই,—

"The moment eternal, just that and no more
When ecstasy's utmost we clutch at the core"

—একটিমাত্র ক্ষণ বা চিরন্তন, আনন্দের সীমা শেষ যে নিমেষ, তাকে যখন পাই প্রাণের মণিকোঠায়, তখন মহাকাল এসে একটি পলকে আশ্রয় করে। কবি খেলোয়াড়, তাই ফুটা কড়ি দিয়েও যদি খেলেন, সে খেলায় বাজিমাৎ! আমরা মুমূর্ষু, ভীরু, তাই মরণকে আগ্‌বাড়িয়ে ডেকে আনি! বলি উদাসকণ্ঠে—

"আয়ুর্নশ্যতি পশ্যতাং
প্রতিদিনং যাতি ক্ষয়ং যৌবনং
প্রত্যায়ান্তিগতাঃ পুনর্ন দিবসাঃ
কালো জগদ্ভক্ষকঃ।"

দিন দিন আয়ুক্ষীণ
যৌবন বিশীর্ণ পলে পলে,
ফিরিবে না গত দিবা,
বিশ্বলুপ্ত কালের কবলে।"

আসলকথা অনুভূতি। এই অন্তর্গূঢ় অনুভবটি আমাদের পরমায়ুর মাপকাঠি। যাঁর যত আছে তিনি সেই অনুপাতে সহস্রায়ু, কল্পান্তজীবী। এ পৃথিবীতে এসে ক'মণ অন্ন ধ্বংস করলাম সে ওজনে ত জীবনের নিরিখ মেলে না।

সাঁচি

রাত্রি ৮টার পর সাঁচি পৌঁছিলাম। প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য কেবল এই ট্রেনটা ষ্টেশনে থামে।

তাড়াতাড়ি নেমে পড়্‌লাম। অদূরেই ডাক্‌বাংলা। মুটের কৃপায় মালপত্রসহ আস্তানায় পৌছান গেল। বিনা সংবাদে এসেছি। খান্‌সামার কৃপায় সুরাহা হ'ল। দিব্যি পরিপাটি বাংলা, ঠিক্‌ সেই পাহাড়ের কোলে যার চূড়ায় বৌদ্ধস্তূপগুলি রয়েছে। আজ ২০শে অক্টোবর, প্রতিপদ, কাল পূর্ণিমা।

ছাদশূন্য চৈত্যগৃহ – সাঁচি

ঠিক্‌ হ'ল এ কদিন এখানেই বিশ্রাম করা যাবে, ভূপাল যাবার সঙ্কল্প ত্যাগ কর্‌লাম। আহারান্তে বাহিরে চেয়ার পেতে বসা গেল। নিস্বচ্ছ অনাবিল জ্যোৎস্নায় চারিদিক উদ্‌ভাসিত, কি স্তব্ধতা এই জনহীন প্রান্তরে। মর্ম্মরে খোদিত বুদ্ধদেবের শুচিশুভ্র মূর্ত্তির মত আজিকার এই শুক্লা নিশীথিনীর মুখে নিষ্পন্দ প্রশান্তি। স্থানটি যথার্থ শান্তিরসাস্পদ।

২১শে অক্টোবর। সকালে জলযোগের পর স্তূপ দর্শনে বাহির হ'লাম। নিকটে পল্লী নাই। বাংলার সম্মুখের রাস্তা অনতিদূরেই গিয়ে মিশেছে পাহাড়ে চড়বার পাথরের সিঁড়ির নীচে। এঁকে বেঁকে চড়াই পথটি উঠে গেছে অধিত্যকা পর্য্যন্ত। বাঁকে বাঁকে ভূপালরাজ্যের মনোরম পার্ব্বত্য-শোভার আকর্ষণে আমাদের ঊর্দ্ধগতি মাঝে মাঝে কমা সেমিকোলানের বিরাম অবসরগুলিতে অচল হ'ল। অনভ্যস্ত পর্ব্বতারোহণের দ্রুতশ্বাস ও মুহুর্মুহু বিশ্রামে সমাহিত হ'ল। পাহাড়টি মোটামুটি ৩০০ ফিট্‌ উঁচু।

প্রাচীন বিদিশাপুরীর (বর্ত্তমান ভিল্‌সা) সন্নিকটে সাঁচি। ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধকীর্ত্তির নিদর্শন এইখানে। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই সারনাথ বা বুদ্ধগয়ার মত সাঁচির সঙ্গে বুদ্ধদেবের কোনো সাক্ষাৎ সম্পর্ক নাই। তিনি এখানে কখনো আসেন নি। সম্রাট অশোকের মহিষী দেবীর পিতৃগৃহ ছিল বিদিশায়। প্রবাদ এই যে তাঁর পুত্র মহেন্দ্রের জন্য সাঁচিতে এক বৌদ্ধ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যাহাই হোক্‌, সাঁচির প্রাচীনতম মন্দির ও বিহারগুলি অশোকের সময় নির্ম্মিত এবং ভারতবর্ষের অন্য কোথাও সম্রাট্‌ অশোকের এরূপ বিপুল ও সুন্দর স্মৃতি-চিহ্নাবলি নাই। প্রত্নবিভাগের ডিরেক্টার্‌ স্যার্‌ জন্‌ মার্‌শেল সাহেব ভূপাল রাজ্যের অকুণ্ঠ্যে এই পাহাড়ের উপরকার স্তূপগুলির উদ্ধার ও জীর্ণসংস্কার করেন। গিরিশিখরস্থ মিউজিয়ামটিও তাঁহার প্রতিষ্ঠান। খৃষ্টপূর্ব্ব তিনশত বৎসর হইতে পরবর্ত্তী দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত রচিত বহুস্তূপ এই পাহাড়ের উপর আছে। মন্দিরগুলির গোলাকার গম্বুজ, চূড়ায় বৌদ্ধছত্র। আড়ম্বরলেশহীন সহজ সরল গঠনসৌষ্ঠব এই সকল মন্দিরের। কিন্তু মন্দির বেষ্টিত প্রাচীরের সিংহদ্বারে তোরণে তোরণে স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব্ব কারুকার্য্য। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে দুহাজার বৎসরের ধ্বংস চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে কীর্ত্তিস্তম্ভগুলি আজও প্রায় অক্ষুণ্ণ রয়েছে। উত্তরদিকের মন্দিরটি সব চেয়ে সুরক্ষিত।

ফুটবলের গোল-পোষ্টের মত কাঠামো এই তোরণগুলির। খাড়াই থাম্‌গুলি চারকোণা, উপরে সমান্তরাল ভাবে পৃথক পৃথক বিলম্বিত তিনটি সরল রেখার খিলান। এই তোরণগুলির স্তম্ভে ও খিলানে বৌদ্ধ জাতকের বিবিধ আখ্যায়িকার চিত্রাবলি এবং সম্রাট অশোকের বিচিত্র কীর্ত্তি-কাহিনীর চিত্রলিপি। কারুশিল্পেরও ভূরি ভূরি নিদর্শন আছে নানারকম সম্ভব অসম্ভব ফুল ফল লতা পাতায়। স্থানে স্থানে কলানৈপুণ্য অনিন্দ্যসুন্দর ও বাস্তবের নিখুঁৎ অনুকৃতি। জীবজন্তুর বৈচিত্র্যেরও অভাব নাই।

ঘাসের ঘোম্‌টা—সাঁচি

জোড়ে জোড়ে ঘোড়া বলদ উট হাতি ছাগল বাঘ সিংহ বাঁদর ময়ূর হাঁস নৃসিংহমূর্ত্তি ইত্যাদি। জন্তুর মধ্যে হাতি, পাখীর মধ্যে ময়ূর, আর ফুলের মধ্যে পদ্মের বাহুল্য লক্ষ্য করলাম। কলুষের লেশ কোথাও নাই।

স্তূপগুলি প্রদক্ষিণ করবার জন্য প্রাচীর বেষ্টিত কক্ষপথ।

মিউজিয়মটি পাহাড়ের উপর। প্রবেশপত্র এক টাকা। কাচের গবাক্ষে প্রকাণ্ড প্রকোষ্ঠটি আলোকোজ্জ্বল। বহু বুদ্ধমূর্ত্তি ও শিলালিপি এই কক্ষে সযত্নে রক্ষিত।

অতি সুন্দর সচিত্র পোষ্টকার্ড ও পুঁথি এখানে বিক্রীত হয়। ইংরাজীভাষী গাইড্ বা পাণ্ডা নাম্‌তা পাঠের মত অনর্গল প্রস্তরতোরণখচিত বুদ্ধ ও অশোকের ইতিকথা সম্বলিত চিত্রকাহিনীর বিচিত্র ব্যাখ্যা ক'রে তীর্থযাত্রীদের কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার তৃপ্তিবিধান করে।

দুটি মন্দিরে গ্রীক্ স্থাপত্যের প্রভাব খুব সুস্পষ্ট দেখ্‌লাম। তক্ষশীলায় এরূপ মন্দির অনেক দেখেছি। ভারতীয় ভাস্কর্য্যে ও স্থাপত্যে গ্রীক্ সাঙ্কর্য্যের লক্ষণ অনেক স্থলে যে পরিস্ফুট তা' আমার মত অর্ব্বাচীন পর্য্যটকের দৃষ্টিও এড়ায় না।

দুপুরবেলা আহারান্তে ডাকবাংলার বারান্দায় বিশ্রাম। বিকাল হ'লেই আবার যাব পাহাড়ের চূড়ায়, সূর্য্যাস্ত ও শারদীয় পূর্ণিমার অভিসারে। বসে বসে মিউজিয়ামে রক্ষিত বুদ্ধমূর্ত্তিগুলির কথা ভাব্‌ছিলাম। কয়েকটি সহজ সরল ঋজুবঙ্কিম রেখার টানে কঠিন পাথরে কি স্বচ্ছতা ফুটেছে। মূর্ত্তির অন্তরাল ভেদ করে বাহির হয়েছে ধ্যানীর স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তিচ্ছটা! ভারতের অন্তর্গূঢ় স্বরূপটি যেন প্রকাশ পেয়েছে শিল্পীর নৈপুণ্যে। বুদ্ধদেব ছিলেন গভীর জলের মীন। সেই নিস্তরঙ্গ গহনের সান্দ্রঘন শান্তি ও আনন্দ পরিস্ফুট

হয়েছে মূক প্রস্তরের ব্যঞ্জনায়, ভাস্করের কলাকৌশলে। বুদ্ধদেবকে সম্মুখে রেখে তিনি ত এ মূর্ত্তি রচনা করেন নি। শিল্পীর কল্পনা ও আদর্শ মূর্ত্ত হয়েছে এই প্রতীকে। তাঁর দৃষ্টি ও বাণী স্ফুরিত হয়েছে অঙ্গুলি প্রান্তে, মুদ্রিত হয়েছে শিলা ফলকে। এ প্রকাশ বিশ্বভারতীয়। সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের মানব অন্তরে এই মৌনমূর্ত্তির বাণী ধ্বনিত হবে।

বাংলার পাশ দিয়ে মেয়ের দল চলেছে ঘাসের বোঝা মাথায় নিয়ে। সহুরের চোখে এ পল্লীদৃশ্যটি বড় মধুর। যেতে যেতে অপাঙ্গদৃষ্টিতে ডাক্‌বাংলার এই বড় বিদেশী

আগন্তুকদের একটু দেখে নিচ্চে। তারা কি জানে সে দৃষ্টি ক্যামেরার ফাঁদে কয়েদী হবে আর বাংলার মাসিক পত্রের পাতায় প্রতিধ্বনি তুলবে? এমন ছোট মেয়ের সরল কুতূহলী দৃষ্টি দেখে Wordsworth এর সেই লাইনগুলি মনে পড়ল।

"I bless thee vision as thou art,
I bless thee with a human heart,
God shield thee to thy latest years!
Thee neither know I, nor thy peers
And yet my eyes are filled with tears."

দিনান্ত—সাঁচি

স্বপনপুত্তলি ওরে, আশীর্ব্বাদ করি,
আশীর্ব্বাক্যে ক্ষুদ্র বুক ওঠে মোর ভরি'।
হও চির আয়ুষ্মতী বিধাতার বরে!
কে তুমি, জানি না আলো জ্বালো কার ঘরে,
জানি না কেন যে মোর আঁখি জলে ভরে।

Thou dost not need
The embarrassed look of shy distress
And maidenly shamefacedness.
Thou wearest upon thy forehead clear
The freedom of a mountaineer.

লাজের বালাই নাই অকুণ্ঠিত চোখে
গুণ্ঠন লুণ্ঠিত নয় সরমের ঝোঁকে,
ভালে তব আছে লিখা বাধাবন্ধহীন
পাহাড়ী মেয়ের স্ফূর্ত্তি স্বচ্ছন্দ স্বাধীন।

বিকালে আবার পাহাড়ের উপরে গেলাম। সূর্য্যাস্তের গৈরিকে যে বৈরাগীর মূর্ত্তি আকাশে দেখেছিলাম, কিছুক্ষণ পরে দেখি তার মুখে জ্যোৎস্নার শুভ্র হাসি ফুটেছে। বুদ্ধদেবের অধ্যাত্ম জীবনের আদি ও উত্তর পর্ব্বের ছবি যেন ওই আকাশে আঁকা। বৈরাগ্যে প্রারম্ভ, শান্তিতে পর্য্যবসান; বৈরাগ্য অস্থায়ী, শান্তি চিরন্তন। বহুযুগের সেই ঋষিমন্ত্রটি যেন এই জ্যোৎস্না রজনীর আকাশবাণী,—

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি
ভূতানি জায়ন্তে।
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি।
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।
"অয়ং চন্দ্রঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং
মধ্বস্য চন্দ্রস্য সর্ব্বানি
ভূতানি মধু, যশ্চায়মস্মিংশ্চন্দ্রে
তেজময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো
যশ্চায়মধ্যাত্মং মানস
স্তেজময়োঽমৃতময়ঃ
পুরুষেঽয়মেব স
যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং
ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্।"

"এই চন্দ্রমা সর্ব্বভূতের মধু; সর্ব্বভূতও তেমনি এই চন্দ্রমার মধু। এই যে চন্দ্রে অধিষ্ঠিত তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, ইঁহারা পরস্পর পরস্পরের মধু। ইনিই সেই আত্মা, ইনিই ব্রহ্ম, ইনিই সব।"

বিজ্ঞান বলেন, একটি জড়কণার মধ্যে সংহত হয়ে আছে অমেয় শক্তির বিপুল সঞ্চয়। এই রুদ্ধশক্তি যদি বন্ধনমুক্ত হয় তবে বারুদের বোমার মত একটা মহাদেশকে নিমেষে চূর্ণবিচূর্ণ করতে পারে। বুদ্ধদেব ছিলেন ঘনীভূত প্রাণকণা, কারুণ্যকণা. ক্ষুদ্র দেহে আমাদেরি মত। "বন্ধো হি বাসনা বন্ধো মুক্তিঃস্যাদ্ বাসনাক্ষয়ঃ"। বাসনাই বন্ধন, বাসনাক্ষয়ই মুক্তি।

পূর্ণ বিমুক্তি তাঁর জীবনে হয়েছিল, তাই আমাদের অধ্যাত্ম-লোকে তিনি বাষ্পীভূত হয়ে গেলেন। জগতের সব মহাপুরুষ এই রকম সহস্রধা হয়েই বিশ্বমানবের প্রাণে ওতপ্রোত হয়ে যান। যাঁর জীবনে এই মুক্তি যে পরিমাণে অব্যাহত, তিনি তদনুরূপ পরিব্যাপ্তি পেয়েছেন নর-নারীর অন্তরে অন্তরে। আমরা জমাট নিরেট হয়ে আছি, আমাদের প্রাণের অণুতে অণুতে গেরোগুলো বজ্রকঠিন, তাই কণাই থেকে গেলাম।

দেহটা ত জড় নয়, ঘনীভূত প্রাণ। বুদ্ধদেবের অস্থি-মজ্জায় এই প্রাণ কল্যাণ মন্ত্রে স্পন্দিত হয়েছিল। দেশকালের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে যে জ্যোতিষ্কটি একদা উদিত হয়েছিল, তার কেন্দ্রবিন্দুটি নির্ব্বাসিত হয়েছে দুহাজার বৎসরেরও আগে। তার জ্যোতির্হিল্লোল এখনও প্রতি জীবনে কিরণ-সম্পাত করছে। কত নক্ষত্র কোটি কোটি বৎসর আগে এমনি করেই নিভে গেছে, কিন্তু এখনো তাদের ঈথর-তরঙ্গের দীপ্তি আকাশে দীপ্যমান্।

২২শে অক্টোবর। আমাদের পর্য্যটন এবারকার মত এখানে ফুরাল। সকালে ৮টার ট্রেণে উল্টা রথযাত্রা। ফিরবার পথে আগ্রায় নেমে জ্যোৎস্নায় তাজ্ দর্শন করে ঘরে ফিরব।

ভাইপো আমার সঙ্গে আগ্রায় একরাত্রি কাটিয়ে Left Luggage এর গুদামে আমাকে ফেলে পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। আমি আগ্রায় আরও সপ্তাহখানেক কাটালাম, ফাঁক তালে মথুরা বৃন্দাবন ঘুরে এলাম। বানপ্রস্থের প্রথম কিস্তির এইখানেই শেষ।

এই নিবন্ধে সন্নিবিষ্ট চিত্রগুলি অধ্যাপক হিরণকুমার সান্ন্যালের গৃহীত বহুসংখ্যক ফটো হইতে নির্ব্বাচিত। উপসংহারে তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। চিত্রশিল্পী ললিতমোহন সেন তাঁর ফটো ও Lino cut গুলি ব্যবহার করবার অনুমতি দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে বেঁধেছেন।

(সমাপ্ত)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

চাওয়া

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

আজ রাতে কথা নয়, চেয়ে দেখো আকাশ উতলা,
সাজানো লিপিকা তার কথাভারে হইল ভূতলা।
সোনার জলের ধারা ঝ'রে পড়ে আখর গলিয়া,
শশি তারা দিশাহারা, কী বুঝাবে কী ভাষা বলিয়া!
ফুলে ফুলে আঁখি মেলে ধরণীও চেয়ে আছে স্থির,
ঊর্দ্ধেতে অন্তর তার গন্ধস্রোতে হইল বাহির।
দূর আর দূর নয়, ঐ দেখো সবই কাছে-কাছে,
আলো হয়ে মহাকাশ কোল দিল ঘরের কানাচে।
কত সে অতীতকাল, কত দূর অনাগত দিন,
চোখে দুটি চোখ বেখে সম্মুখে রয়েছে সমাসীন;
এ জ্যোৎস্না-বন্যায় তা'রা মিশায়ে দিয়েছে বাণীধারা,
কথা যদি থাকে কিছু, সুযোগ হয় না যেন হারা।—
মুখে পাছে বেধে যায়, বিচারিলে যদি হয় ভুল,
সব প্রাণ মেলে ধরো, বন্যায় ছাপায়ে যাক কূল।
ভাসায়ে যা নিয়ে যাবে, ভ'রে দিয়ে যাবে তারো বেশি,
মনে রবে চিরকাল, চাও দেখি একটি নিমেষ-ই!
আঁখি কী বলিতে পারে, খুঁজে দেখো, থাকলে
সন্দেহ,—
তুমি না চাহিতে পারো, তোমারে কি চায় নাই
কেহ?

চৈত্র ও বৈশাখ

শ্রীহেমন্তকুমার বসু বি-এ

চৈত্র বৈশাখেরে ডাকি দিয়া হাতছানি
বলি ওঠে মিনতির বাণী—
ওগো নিত্য জীবনের কাণ্ডারী তরুণ,
হে নবীন, হে সুন্দর, নহ তুমি নহ অকরুণ
—ভালে তব জ্বলে বালারুণ—
বারেক প্রসারি ঐ জ্যোতির্ম্ময় শুভ্র করাঙ্গুলি,
লহ মোরে তুলি
শুভ্রপক্ষ তব তরণীতে,
নব জীবনের বার্ত্তা বহি নব নব ধরণীতে
গতি যার হোলো সুরু নীলাম্বর ছায়ে
তুলি' মন্দ বায়ে।

জীর্ণ নায়ে
কোটী কোটী জীবনেরে লয়ে
প্রাণপণ বলে বাহি চলিতেছিলাম ভয়ে ভয়ে
একাকী অশক্ত বৃদ্ধ নেয়ে।—
চকিতে হেরিনু চেয়ে
অকূল তরঙ্গতলে ডোবে তরী—ডোবে
মৃত্যুক্ষোভে
যাত্রীদলে ওঠে হা হা বাণী !
তুলি জীর্ণ কম্পমান পাণি
ঊর্দ্ধে রাখি আঁখি
দেবতার আশীর্ব্বাণী মাগি
হেরিনু ফিরিতে
নিঃসঙ্গ বসিয়া আছি ; নাহি জানি কেমনে চকিতে
নিমেষে সোনার নায়ে নিখিলেরে দিয়েছ আশ্রয় !
কোটী কণ্ঠে ওঠে গাথা—জয় তব জয়।

হেথা মোরে ঘেরি'
চির-রাত্রি সুগভীর ; চির-উষা হেরি
তব আস্য উচ্ছসিয়া বর্ণে গন্ধে মাতে
ঝঞ্ঝাবাতে
কম্পমান তরী হেথা মজ্জমান ঘাতে,—
মেদুর সমীরে
নব-জীবনের ধ্বজা তরী-শীর্ষে কাঁপে তব ধীরে।
একটী রেখার পারে পারে
নবীন উষার দেশ পুরাতন রাত্রি—রাজ্য রহে চাহি
আলোক আঁধারে।

এলায়ে পড়েছে দেহ বক্ষে তবু আয়ুর পিপাসা
তব নব জীবনের আশা
আমারে লাগায় ভ্রম, চক্ষে আঁকে সোনার স্বপন,
তুলে' নাও হে নবীন, দাও তব রস-হর্ষ-মদির জীবন।
সৌম্য ভালে হাস্যভাতি ঝলে
বৈশাখ প্রসন্ন-ভাষে বলে :—
তোমার জীবনে বন্ধু, অসাধ কারো কি আছে কিছু ?
তব পিছু
এলো যে আহ্বান
কেমনে ফেরাব তার টান ?
দুর্জ্জয় দুর্দ্দম সে যে কতো
জান না ত জীবন লাগায় ভ্রান্তি অতো।

যখনি তোমারে লব তুলি
বন্ধু, সে তো ফিরিবে না ভুলি
নিমেষে নিঃসীম সিন্ধু আলোড়ি' আকুলি
ধ্বংস-দূত
কুলিশ কঠোর করে প্রাণে প্রাণে হানি
দেবে মরণ বিদ্যুৎ।
তব লাগি, তব সনে
নিখিল পড়িবে বাঁধা এক তব নিয়তি বন্ধনে!
হবে খুসী দেখি চেয়ে চেয়ে
পুরাতন বৎসরের শ্রান্ত ক্লান্ত ওগো শেষ নেয়ে?

তার চেয়ে
উষার এ স্বপ্ন হ'তে লুব্ধ আঁখি হে মুগ্ধ, ফিরাও
আপনি যামিনী পানে চাও;
আপনার অন্ধকার আঁকড়িয়া ধরি'
বক্ষপাশে, সুনির্ম্মম হাসিমুখে লহ লহ বরি
অন্তিম আহ্বান।

তব অবসান
ধীরে এঁকে দিক ঐ তরী মজ্জমান
নিখিলের হা হা বাণী মাঝে;
নিয়তি দাঁড়াক হেরি লাজে।
শোকাতুর বুকে
এনে দাও ভুলে যাওয়া দুখে।
কি হারালে স্মরি—
তরুণীর যৌবনেরে ক্ষণতরে জাগাও শিহরি।

তব সিন্ধু সমাধির পরে
উষা দেবে পুষ্প ও পল্লব থরে থরে,
গোধূলি ছড়ায়ে দেবে সোনা
কালের আঁধার ঘরে নীরবে চলিবে তব
নবজন্ম-স্বপ্নজাল বোনা।

শ্রীহেমন্তকুমার বসু

দ্বিতীয় পক্ষ

শ্রীশান্তিময়ী দত্ত

রমা যখন রাঙা বেনারসীখানা পরিয়া অনাদির বাম পাশে দাঁড়াইল, তখন তাহাকে যে মানায় নাই, এমন কথা কেউই বলে নাই। দোষের মধ্যে অনাদির মাথায় একটু টাক্ ছিল আর মুখখানা একটু অস্বাভাবিক গম্ভীর গোছের দেখাইতেছিল। রমার সমবয়সী তরুণীরা তাহাকে নানাপ্রকার রসিকতা করিয়াও নাকি হাসাইতে পারে নাই। উমা রমার গালে একটু ঠোকা মারিয়া বলিল "বাব্বা, এমন ফিলজফার বরও তোর কপালে ছিল! একটু হাসলেও কি তত্ত্ব-চিন্তায় বাধা পড়্‌ত?"

তরণীদলের হাসির তরঙ্গে আঘাত করিয়া জলদ-গম্ভীর স্বরে কে পশ্চাৎ হইতে বলিয়া উঠিলেন, "ওর কি আর চ্যাপ্‌লামো কর্‌বার বয়েস আছে, না সখ আছে? বিয়ে একটা না করলে সংসারটা বজায় থাকে না, তাই দু'হাত এক করা। কিসে আর কিসে? সে বউয়ের সঙ্গে কি এর তুলনা হয়? সে বউ কলেজে না পড়লেও বিদুষী কম ছিল না। এক আলমারী বই এখনও ঘরে সাজানো রয়েছে—অনাদি রোজ নিজে হাতে ঝাড়ে, মোছে, আর দুই চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ে। আয়, অনু, উঠে আয়, নতুন বউয়ের সখীরা তাকে নিয়ে হাসি, মস্করা করুক, তুই লাইব্রেরীতে নিরিবিলি একটু ব'স্ গিয়ে।"

নতুন বউয়ের সমাদর এবং অভ্যর্থনার নমুনা পাইয়া রমার বন্ধুবান্ধব ধীরে আস্তে সকলে সরিয়া পড়িল।

রমা বাপের বাড়ীর ঝিয়ের সাহায্যে শ্বশুরবাড়ীর ঘর দুয়ার দেখিয়া লইল। দিনের অধিকাংশ সময় আপন শয়ন-গৃহে একাকী কাটাইত। সেই ঘরে অনাদিনাথের প্রথমা পত্নী ৺রেণুকার একখানা বৃহৎ ছায়া-চিত্র দেয়ালে ঝোলানো আছে, একখানি ওয়ার্ডরোবের উপরে "রেণু-স্মৃতি" লেখা রহিয়াছে, তাহার চাবি অনাদিনাথের দিদি সাবিত্রীর কাছে থাকে। তিনিই এ বাড়ীর কর্ত্রী। কথায় বার্ত্তায় রমা বুঝিয়া লইয়াছিল রেণুকার মৃত্যুর পর 'বড়দিদি' ছোট ভাইটীর সংসারের ভার গ্রহণ করিবার জন্য নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও শ্বশুরের ভিটার মায়া ছাড়িয়া আসিয়াছেন।

মা, বাপ অনেক আশা করিয়া কন্যার নাম 'সাবিত্রী' রাখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কলিযুগের 'সাবিত্রী'র তপস্যায় যমরাজ বোধহয় সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, কাজেই 'সত্যবান'কে ফিরাইয়া দেন নাই, অগত্যা সাবিত্রী ভাইটীর কল্যাণ কামনায়ই জীবনপাত করিতেছেন।

রেণুকার অকাল-মৃত্যুতে অনাদিনাথ নিতান্তই অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন, বিরহের কবিতা লিখিয়া খাতা ভরাইতেন, কলেজে লেক্‌চার দিতে দিতে প্রায়ই অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়া নোট্‌স্ লিখিতে ভুল করিতেন। ছাত্ররা মুখ টিপিয়া হাসিত। সেকেণ্ড্-ইয়ারের ছাত্রী রমা প্রোফেসরের এইরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া প্রাণে ব্যথা পাইত, সহপাঠীদের মুখে প্রোফেসর সম্প্রতি পত্নী-শোক পাইয়াছেন শুনিয়া সমবেদনায় তাহার কোমল প্রাণখানি ভাঙিয়া পড়িত।

ক্লাসের লেক্‌চার শেষ হইলে একদিন রমা বাড়ী ফিরিবে বলিয়া ট্রামের অপেক্ষা করিতেছে, অনাদি তখন আপনার মোটরে উঠিয়া সবে মাত্র ষ্টার্ট দিয়াছেন, রমা বলিল "মিঃ সেন, আমাকে দয়া ক'রে একটু লিফ্‌ট্ দেবেন? আমার এক বন্ধুর বাড়ী যাব, আপনার পথেই পড়বে।"

এতখানি দুঃসাহসের কাজ করিয়া ফেলিয়া রমা নিজেই কেমন একটু বিস্মিত ও অভিভূত হইয়া পড়িল। অনাদি বাঁ-হাতে দরজা খুলিয়া দিয়া বলিল "বেশ তো উঠে পড়ুন না, আনন্দের সহিত পৌঁছে দেবো।" রমা পিছনের দরজা খুলিয়া উঠিতে গিয়াছিল, অনাদি বলিল "সামনে বসুন না, বেশ হাওয়া পাবেন আর তা' ছাড়া কথা বলতেও সুবিধে হবে।"

এই ঘটনার পর হইতেই অনাদি প্রতিদিনই প্রায় অন্যমনস্ক ভাবেই কলেজের ছুটীর পর রমার জন্য অপেক্ষা করিতেন এবং গল্প করিতে করিতে নানা রাস্তা ঘুরিয়া তাহাকে বাড়ী পৌছাইয়া দিতেন।

কলেজের ছাত্রদের কল্যাণে এই শুভ সুযোগের খবর বন্ধুবান্ধব এবং অভিভাবক মহলে রটিতে বেশী দেরী হইল না এবং ফলে রেণুকার এন্‌লার্জমেণ্টখানি বিলাত হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই রমার সঙ্গে অনাদির মালা বদল হইয়া গেল। * * * *

অনাদি যে রমাকে ভালবাসে না, এমন কথাও রমা বলিতে পারে না। বিয়ের আগে দুই তিন মাস কী আনন্দে তাহাদের কাটিয়াছে! প্রতিদিন কলেজ ফেরত রমাদের বাড়ী একত্রে চা-পান, ভাই-বোন্‌দের সহিত গল্প, আমোদ, সন্ধ্যায় গঙ্গার ধারে ড্রাইভ্, ছবি দেখা,—বাকী সময়টুকু পরস্পরের চিন্তা—কি মধুর!

বিবাহের পর প্রথম এ বাড়ীতে পা দিয়াই যেন সে স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল! সমস্ত বাড়ীটা যেন কার বিরহে ছম্ ছম্ করিতেছে! বাড়ীর পুরাণো দরওয়ান সেলাম দিয়া অভ্যর্থনা করিল কিন্তু বেকুবের মতন বলিয়া ফেলিল, আগের মাইজী তাহাকে বড় মেহেরবাণী করিতেন, সাদি উপলক্ষে তাহার বহুকে রেশমী শাড়ী আর পাঁচটী টাকা দিয়াছিলেন। ঠাকুর পরিবেশন করিতে করিতে বলিল "আগের মা-ঠাকরুণের আমল থেকে সে রান্নার প্রশংসা পাইতেছে, নতুন মা কি আর তাহার নিন্দা করিতে পারেন? বড় ননদ সাবিত্রী তো এক হাট লোকের সাম্‌নে কি না বলিলেন প্রথম দিনই। স্বামীরও হঠাৎ এমন গম্ভীর হইবার কারণ কি, তা' কি আর রমা বোঝে নাই? এই সংসারের প্রত্যেকটী জিনিষ রেণুকার বিবাহের যৌতুক, রেণুর নিজের হাতে সাজানো। রমা যে তাহারই পরিত্যক্ত আসনে বসিয়াছে! এই স্মৃতি-ভরা সংসারে সে নতুন আগন্তুক। স্বামী এতদিন তাহাকে পাইয়া যাহাকে ভুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এখন আবার তারই উপস্থিতি প্রতি পদক্ষেপে এ সংসারে আর একজনকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। অভিমানে সে কাঁদিল অনেক কিন্তু অনাদি যখন তাহার সম্মুখে কাতর-দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকেন, তখন আবার রমার কোমল প্রাণখানি বেদনায় ভরিয়া উঠে, প্রাণ তার বলিয়া উঠে "ওগো যা' তুমি হারিয়েছ, আমি তা' ভরে দেবো, তোমার রিক্ত প্রাণখানি আমার সর্ব্বস্ব দিয়ে ভরাব।"

অনাদি মাঝে মাঝে রেণুকার ছবিখানি দেখে, রমাকে বলে, "যে ম'রে গেছে তার সঙ্গে শত্রুতা কি? সেও বড় ভাল মেয়ে ছিল, বড্ডই ভালবাসতাম তাকেও। তবে তোমাকে পেয়ে আমি সব কষ্ট ভুলেছি, তুমি আমায় নতুন জীবন দিয়েছ।"

রমার চোখ জলে ভরে ওঠে, সে বলে, "তুমি তাকে ভুল্‌তে পারনি মোটেই, তাকে পাচ্ছ না বলেই আমাকে এনেছ তো?"

অনাদি বলে "রেণুকে তুমি যদি দেখতে, নিশ্চয়ই ভাল না বেসে থাকৃতে পারতে না। সে তো আমাদের স্পর্শেরও অতীত এখন, তার পবিত্র স্মৃতি আমরা দুজনেই রক্ষা করব, কেমন? তোমাকে না পেলে হয়ত আমি পাগল হোয়েই যেতাম, তোমাকে যে কতখানি ভালবাসি, তা' কি তুমি বোঝ না, রমা? ছবিকে, স্মৃতিকে হিংসে ক'রে নিজের মনকে কলুষিত কোরো না।"

রমা স্বামীর বেদনা-ভরা চোখ দুটী কোমল, নম্র, দৃষ্টি দিয়া ঢাকিয়া দেয়, গলা জড়াইয়া বলে "তোমার দুঃখ দেখেই তো আমি তোমায় চেয়ে নিয়েছি, তোমার পবিত্র-স্মৃতিতে আমি বাধা দেব না।"

এম্‌নি করিয়া রমা ও অনাদির জীবনযাত্রা আরম্ভ হইল। রমার ইচ্ছা হয় তার পছন্দমত ঘরখানি সাজায়, তার নিজের বিয়ের উপহারের জিনিসগুলি দিয়া ড্রয়িং-রুমখানির সম্পদ বৃদ্ধি করে, কিন্তু সাবিত্রী বলিয়া উঠেন, "আহা-হা, মরা মানুষের উপরও এত অত্যাচার কেন? কত যত্নে, কত খেটে ঐ ঘরখানি সে সাজিয়েছিল, দিলে সব ওলট্-পালট্ ক'রে।"

রমা গ্রাহ্য করে না, মন তার গুমরিয়া উঠে কিন্তু কথা বলে না একটীও।

একদিন সে চাকরদের সাহায্যে 'রেণু-স্মৃতি' লেখা

কাপড়ের আলমারীটা সরাইয়া ননদের ঘরে পাঠাইয়া দিল এবং নিজের আয়না-লাগানো নতুন আলমারীটা সেখানে রাখিল। ননদ রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে আসিয়া রেণুর ছবিখানি খুলিয়া লইয়া অনাদির লাইব্রেরীতে রেণুর বইয়ের আলমারীর উপরে টাঙাইয়া রাখিলেন।

অনাদি গৃহে ফিরিতেই সাবিত্রী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ করিতে লাগিলেন—নতুন বউ এমন পাষাণী, এমন হিংসুটে যে মরা মানুষটীর কোন চিহ্ন এ বাড়ীতে থাক্‌তে দেবে না, তাঁহার আর কি, তিনি তো শ্বশুর-ভিটায় ফিরিয়া যাবেনই, অনাদিরই প্রাণ ফাটিয়া যাইবে, তাঁর এত আদরের রেণুর এত অনাদর দেখে।

অনাদি দিদির এত কান্নাকাটি ও অভিমান দেখিয়া একটু বিচলিত হইল এবং রমাকে কিছু বলিবার অবসর না দিয়াই বিরক্তভাবে বলিয়া উঠিল "এত নাড়াচাড়ার কি প্রয়োজন ছিল? আলমারীটা বা ছবিটা তোমার কি ক্ষতি করিতেছিল? বাড়ীতে জায়গার তো অভাব নাই, ইচ্ছা হয় তো একখানা ঘর খালি ক'রে নিজের ইচ্ছামত সাজিয়ে থাক্‌লেই পার। দিদির মনে ব্যথা দেওয়া কি উচিত হোয়েছে?"

রমা কোন কথার জবাব দিল না। অনাদি দিদির দেওয়া জলখাবার খাইয়া বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময়ও রমাকে কিছু বলিয়া গেল না।

রমার সেদিন আর সহ্য হইল না। দিদির দুর্ব্যবহার সে অম্লান-বদনে দিনের পর দিন সহিয়াছে কিন্তু স্বামীর উদাসীনতা সে সহিতে পারে না। সে স্থির করিল, নীরবে কাহাকেও কিছু না জানাইয়া আজ কোথাও চলিয়া যাইবে, শীঘ্র ফিরিবে না, স্বামীকে কোন প্রকার সন্ধানও দিবে না। দেখিবে, স্বামী তাহাকে চান কি শুধু মৃতের স্মৃতিকেই বহন ক'রে সন্তুষ্ট থাকেন।

রমা একবার খোঁজ করিল সাবিত্রী কোথায় আছেন। ঝি, চাকররা বলিল বড়দিদিমণি পাড়ায় কার বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছেন। রমা সুযোগ বুঝিয়া একটা আলোয়ান জড়াইয়া, চটীজোড়া পায়ে দিয়া হাত-ব্যাগে দুই চারিটী টাকা লইয়া খিড়কীর দরজা দিয়া বাহির হইল। খিড়কীর বাগানের ফটক দিয়া বাহির হইবে এমন সময় একজন ঝি দৌড়াইয়া আসিয়া তাহাকে বলিল "একজন বাবু বিশেষ দরকারে আপনাকে ডাক্‌ছেন।" রমা অপ্রত্যাশিত বাধা পাইয়া বিরক্ত বোধ করিল এবং এমন সুযোগটা নষ্ট হওয়ায় দুঃখিতও হইল। ড্রয়িংরুমে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, একজন অপরিচিত ভদ্রলোক, মুখের চেহারায় অসংযত জীবনের ফল স্বরূপ অকাল বার্দ্ধক্যের রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে, হাতে একগাছি লাঠি, তাহার উপর সমস্ত শরীরটার ভার চাপাইয়া দিয়া কোন প্রকারে যেন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। রমা ঘরে প্রবেশ করিতেই বলিল "ক্ষমা করবেন, আমি মিসেস্ সেনের নিকট একটু দরকারে এসেছি।"

রমা দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর করিল "আমিই মিসেস্ সেন, কি প্রয়োজন বল্‌তে পারেন।"

লোকটী বলিল "আমার নাম বিজয় বোস, আমি মিসেস্ সেনের বিশেষ বন্ধু, আপনি তিনি ন'ন, ইহা নিশ্চিত।"

রমা বলিল "ওঃ, আপনি মিঃ সেনের প্রথমা স্ত্রীর কথা বলছেন বুঝি? তিনি প্রায় এক বছর হোল মারা গেছেন, আপনি খবর জানতেন না, আপনার বিশেষ বন্ধুর মৃত্যুর খবর, আশ্চর্য্য বটে!"

লোকটী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল "আমি মিসেস্ সেনের একজন প্রণয়ী ছিলাম, এই দেখুন তাঁর হাতের লেখা প্রণয়-লিপি, চিনবেন কি হস্তাক্ষর"? পকেট হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া রমার হাতে দিল। রমা কম্পিত স্বরে বলিল "যদিও আমি স্বর্গীয়া ভগ্নীর সপত্নী, তবু তাঁর নামে এরূপ কলঙ্কের কথা আমার নিকট বলে আপনি ক্ষমা পাবেন, আশা করবেন না। তিনি আমার স্বামীর প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী ছিলেন, তাঁর পবিত্র স্মৃতি আমরা দুজনেই শ্রদ্ধার সহিত অন্তরে বহন করি।"

লোকটী হাসিয়া বলিল "তাহলে তো আরও সুবিধা হলো, আপনারা কেউই চাননা বোধহয়, যে রেণুকার নামে একটা কলঙ্ক এখন রটে যায়। এই চিঠির তাড়া পরীক্ষা করে দেখুন রেণুকার হস্তাক্ষর কিনা—। আমি যখন রেণুকার প্রণয়ী ছিলাম, তখন সে আমাকে এই চিঠিগুলি লিখেছিল। এই চিঠিগুলি দেখিয়ে আমি ইচ্ছা করলে মিঃ সেনের স্ত্রীর

নামে কলঙ্ক প্রকাশ করতে পারি, তাহাতে আপনার স্বামীর পরিবারের সুনামেও দাগ পড়বে।"

রমা অনিচ্ছায় একখানি পত্র খুলিয়া দেখিল, এ সত্যিই রেণুকার হাতের লেখা, এ লেখা সে তাহার স্বামীর বাক্সে অনেকবার দেখিয়াছে। চিঠি খানিক পড়িয়াও দেখিল, ঠিকই বিজয়কে লেখা। চিঠির নীচে লেখা আছে "তোমারই রেণু"।

রমার মাথা গরম হইয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল, এসবের অর্থ কি? চিঠিগুলি লইয়া রমার নিকট আসার উদ্দেশ্য কি?

বিজয় বলিল, রমাকে সে চেনেও না, তাহার নিকট সে আসেও নাই। রেণুকা জীবিত আছে মনে করিয়াই সে এখানে আসিয়াছিল। চিঠিগুলি তাহার স্বামীকে দেখাইবে এই ভয় দেখাইয়া তাহার নিকট কিছু টাকা আদায় করিবার মতলবে আসিয়াছিল। রেণুকার বিবাহের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিজয়ের সহিত রেণুকার প্রণয় হইয়াছিল,দুই তিন বৎসর পরস্পরকে চিঠিপত্র লিখিয়াছিল। বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়াও বিজয় তাহাকে বিবাহ করে নাই। মদ্যপান করিয়া, চরিত্রহীন হইয়া নিজের বিষয়-সম্পত্তি সব নষ্ট করে, সেজন্য রেণুকার অভিভাবক এ বিবাহে অনুমতিও দেন নাই। একটা জুয়াচুরীর মোকদ্দমায় জড়িত হইয়া জেল খাটিবার ভয়ে ছদ্মবেশে ৪।৫ বৎসর বিদেশে ঘুরিয়া বেড়ায়। দেশে ফিরিয়া আসিয়া শুনিয়াছিল রেণুকার বিবাহ হইয়াছে মিঃ সেনের সঙ্গে। এখন তাহার কিছু টাকার বিশেষ প্রয়োজন। এই চিঠিগুলির পরিবর্ত্তে ৫০০৲টী টাকা পাইলেই সে চলিয়া যায় এবং আর কোন গোলমাল করে না।

রমার মনে হইল, যে রেণুর স্মৃতিতে স্বামীর মন আজও ভরপুর, যার চিন্তা তাঁহার সারাজীবন জুড়িয়া রহিয়াছে, সেই রেণু আর একজনকে একদিন ভালবাসিত, একথা জানিলে নিশ্চয়ই তার প্রতি অশ্রদ্ধা হইবে এবং তাহা হইলেই রমাই তাঁহার সর্ব্বস্ব হইতে পারিবে। এই তো সুন্দর সুযোগ, লোকটাকে বসিয়ে রাখি, নিজে চোখে স্বামী রেণুর হাতে লেখা প্রণয়-লিপিগুলি দেখুন।

কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাহার মনের ভাব বদ্লাইয়া গেল। যে স্বামী তাহার এত আদরের, যাঁহাকে সে এতো ভালবাসে, যাঁহার সর্ব্বস্ব হইবার জন্য তাহার প্রাণগত আকাঙ্ক্ষা, তাঁহার মনে সে এত বড় আঘাত দিবে? এমন সুন্দর মধুর একটা স্মৃতি সে ছারখার করিয়া দিবে? কতখানি ব্যথা, কী ভীষণ ঈর্ষা জাগিবে তাঁহার মনে।

না, না, এত কষ্ট সে সইতে দেবেনা তার প্রিয়তমকে। মৃতের স্মৃতি পবিত্রই থাক্! সে অবিচলিত কণ্ঠে বলিল "আপনি এই চিঠির তাড়ার পরিবর্ত্তে যা' চান, তা' আমি দিতে পারব না, তবে আমার একগাছি মুক্তোর হার আমার কাছে আছে, তার মূল্য পাঁচশ' টাকার অনেক বেশী, সেই গাছি আমি দিতে পারি যদি শপথ করেন এই চিঠির তাড়া ছাড়া রেণুকার আর কোন চিহ্ন আপনার কাছে নেই এবং আর কখনও একথা কারও কাছে উল্লেখ করবেন না"। বিজয় শপথ করিয়া চিঠির তাড়াটী রমার হাতে দিল। রমা উপরে গিয়া আলমারী খুলিয়া তাহার স্বর্গীয়া দিদিমার দেওয়া মুক্তোর হারগাছা আনিয়া বিজয়ের হাতে দিল। বিজয় বিস্ময়ে রমার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, তারপর সজল-চক্ষে বলিল, "নারীর হৃদয় সত্যিই অবোধ্য! বিশেষ বিপদে পড়েই আজ এটা আমায় নিতে হোল। নরাধমকে ক্ষমা করবেন।"

বিজয় প্রস্থান করিলে পরই রমা আবার খিড়কীর বাগানে গেল এবং একটী নিভৃত স্থানে চিঠিগুলি রাখিয়া আগুন জ্বালাইয়া দিল।

অনাদি স্ত্রীর প্রতি কর্কশ ব্যবহার করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছিল। সে রমাকে না বলিয়াই বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। একাকী ময়দানে বসিয়া অনেক ভাবিল, রমার প্রতি কত অন্যায় ব্যবহার তাহারা করিয়াছে। সে কত আশা, আকাঙ্ক্ষা লইয়া প্রথম সংসারে প্রবেশ করিয়াছিল, পদে পদে কেমন করিয়া তাহার উৎসাহে বাধা দেওয়া হইয়াছে। মৃতের সম্মান রক্ষা করিতে গিয়া জীবিতকে কত আঘাত দেওয়া হইয়াছে, এই রকম প্রত্যেকটী ক্ষুদ্র ঘটনা তাহার মনে পড়িতে লাগিল। দিদিই যে তাহাদের সংসারের অশান্তির প্রধান কারণ তাহাও সে বুঝিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে, উন্মুক্ত আকাশতলে দাঁড়াইয়া সে প্রতিজ্ঞা করিল আজ ঘরে গিয়া রমার নিকট

ক্ষমা চাহিবে এবং রেণুকার স্মৃতি-চিহ্নগুলি একটী আলাদা ঘরে সরাইয়া বন্ধ করিয়া রাখিবে।

বাড়ী ফিরিয়া প্রতিদিনকার অভ্যাস মত ড্রয়িংরুমে রমাকে খুঁজিল, না পাইয়া অন্দরের দিকে ছুটিল। সাবিত্রী নিজ ঘর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, "অনু, কা'কে খুঁজ্‌ছ, রমাকে? আগে চল লাইব্রেরীতে, বিশেষ কথা আছে।"

অনাদি ভীত হইয়া বলিল "সে কি, রমার কিছু হ'য়েছে নাকি? রাগ ক'রে চলে যায়নি ত কোথাও?"

সাবিত্রী অনাদির হাত ধরিয়া লাইব্রেরিতে বসাইয়া বলিলেন, "শোন্ অনু, রমা যে সে মেয়ে নয়। তুই-ই তার ভালবাসার একমাত্র অধিকারী ন'স্, আরও অংশীদার আছে। বিয়ের আগে সে কত লোকের সঙ্গে মিশেছে, তার খবর ত নিস্ নি? এ কি রেণুর মত সতী-লক্ষ্মী মেয়ে? আজ আমি একটু পাড়ায় বেড়াতে গিয়েছি, সেই সুযোগে এক ছোক্‌রা এসেছিল। দুজনে ড্রয়িংরুমে কতক্ষণ কথা কইছিল কে জানে? দু-চারটে কথা আমার কানে এল, আমি তাই সিঁড়ির দোরের আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনলুম। সে একটা বদ্‌মায়েস্, চেহারা দেখ্‌লেই বোঝা যায়। কতগুলো চিঠির তাড়া দেখিয়ে রমাকে ভয় দেখাচ্ছিল, যদি ৫০০৲ টাকা না দেয় তো তোকে সব দেখিয়ে জব্দ করবে। রমা তাড়াতাড়ি উপরে গিয়ে তার বাপের বাড়ীর কার দেওয়া একছড়া মুক্তোর মালা এনে তাকে দিয়ে কত ক'রে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলে যেন এ কথা প্রকাশ না করে। সে ছোক্‌রা ত অমন দামী জিনিষ কখনো চোখেও দেখেনি বোধ হয়, তাই হাতে জিনিষটা পেয়েই চিঠিগুলো দিয়ে তিন সত্যি করে দৌড়ে পালাল। এই তো সেও গেল আর রমাও খিড়কীর বাগানে চিঠি পোড়াতে গেল। আমি কিছু বল্‌লুম না, চুপি চুপি শুধু সব দেখে আর শুনে নিলুম, এখন তোর কর্ত্তব্য তুই কর্ বাপু। আমাকে ত তোর বউ দুটী চোখে দেখতে পারে না, ঐ রেণুর নাম করি কিনা? বাবা! কি সতীন্-হিংসে! আগেকার কালে কতগুলো সতীন্ নিয়ে যে বাঙালীর মেয়েকে ঘর করতে হোত, তাতেও তো এত অসহ্য হোত না। মরা মানুষটাকে পেলেও ও যেন খুন করে, এম্‌নি ওর হিংসে! এদিকে তো স্বামীকে কত পিয়ার করেন! আড়ালে, আব্‌ডালে কত চল্‌ছে, কে জানে?"

অনাদির কানে সব কথা প্রবেশও করে নাই। সে কেবল ভাবছিল, দিদিকে না সরালে রমার আর শান্তি নেই। সে সব কথা না শুনিয়াই বলিল "আমাকে বিয়ে করার আগে রমা যদি কাউকে ভালবেসেই থাকে, তাতে দোষ কি? আমিও তো রমাকে বিয়ে করবার আগে রেণুকে ভালবেসেছিলাম। আমি অমন নীচ নই যে সে সব কথা জিজ্ঞেস করে তাকে লজ্জা দেব। রমা কোথায়, তাই বলনা?"

সাবিত্রী ভাইয়ের এরূপ ভাব দেখিয়া একটু বিস্মিত ও আহত হইলেন। দিদির মুখের উপর ভাই কখনও একটী কথাও বলে নাই। নতুন বউ নিশ্চয় তুক্ জানে, নইলে এমন পরিবর্ত্তন হয় ভাইয়ের?

আঙুল দিয়া বাগানের দিকে দেখাইয়া দিয়া সাবিত্রী দেবী অভিমানে নীরবে ঘরে চলিয়া গেলেন।

অনাদি "রমা, রমা" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে যখন সেখানে আসিয়া পৌছিল তখন রমা একটী কাঠী দিয়া কাগজগুলি আগুনের মধ্যে ঠেলিয়া দিতেছে। হঠাৎ অনাদির উপস্থিতিতে হতভম্ব হইয়া গেল, মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, গলার স্বর কম্পিত হইল। সে বলিল "তুমি! তুমি কখন এলে?" অনাদি দেখিল সম্মুখে রাশিকৃত চিঠি পুড়িতেছে, একটী লাল ফিতা পাশে পড়িয়া রহিয়াছে। অনাদি বিকৃত স্বরে বলিল "তবে, এ কথা সত্যি? তোমার প্রণয়ীর চিঠি পোড়াচ্ছ? মুক্তোর মালার বদলে এগুলি পেয়েছ? পাছে আমি জান্‌তে পারি এই ভয়ে তোমার দিদিমার দেওয়া হাজার টাকা মূল্যের জিনিষ একটা দুর্ব্বৃত্তের হাতে দিয়েছ? কি দরকার ছিল, রমা? আমার সঙ্গে এ লুকোচুরী কেন? সত্যিই কি তুমি আর কাউকে এখনও ভালবাস? তোমার এত ভালবাসা শুধু অভিনয় মাত্র। বল, বল রমা সে কে? সত্যি বল, তোমার এত আদরের হার তাকে এইজন্যে দিয়েছ, এ কথা ঠিক্?

রমা নিস্পন্দ। ভাবিতে লাগিল অনাদিকে ইতিমধ্যে এত খবর কে বলিল? এখন গোপন করার উপায়ও নেই। নিশ্চয়ই সেই লোকটা রাস্তায় অনাদিকে পাইয়া মিথ্যা কথা

বলিয়া গিয়াছে, রেণুর বদলে তাহার নাম করিয়াছে। এখন অস্বীকার করিলেই কি স্বামী বিশ্বাস করিবেন? সে দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর করিল "হ্যাঁ, এই চিঠিগুলি পাবার জন্যেই টাকার অভাবে আমায় মুক্তোর মালা বিসর্জ্জন দিয়েছি।" অনাদি পোড়া চিঠিগুলির দিকে দেখিতে দেখিতে হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"এ কি! এ যে রেণুর লেখা! এ কোথায় পেলে?"

এক টুকরা অর্দ্ধ দগ্ধ কাগজ তুলিয়া দেখিল চিঠির শেষে লেখা "তোমারই রেণু"। আর এক টুক্‌রায় লেখা "আমার বিজয়"।...মুহূর্ত্তের মধ্যে অনাদির মনে পড়িয়া গেল রেণুর মৃত্যুর আগে একদিন সে অনাদির কাছে তাহার অতীত জীবনের একটী ইতিহাস বলিয়া ক্ষমা চাহিয়াছিল। বিজয় বোস্‌কে সে একদিন ভাল বাসিয়াছিল। বিজয় কিরূপ নির্ম্মমভাবে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যায় এবং শেষে জেলের ভয়ে দেশ ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ হয়, সে ঘটনাও সে শুনিয়াছিল রেণুর কাছে। অনাদি রমাকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিল "রমা, রমা, আমায় ক্ষমা কর। কত অবিচার তোমার উপর করেছি। কি কোরে, কোথায় এ চিঠি তুমি পেলে আর কেনই বা গোপনে পোড়াচ্ছ, আমায় খুলে বল। আমি কিছু বুঝতে পারছি না। সেই বিজয় বোস কি এসেছিল এখানে? দিদি কি সব বল্লেন, আমি ভাল ক'রে শুনিনি। তুমি কেন আগে বল্‌লে না আমায়, এ কার চিঠি, কেন পোড়াচ্ছ?"

রমা অনাদির বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "তুমি তো আমাকে কিছু বলবার অবসর দাও নি।"

অনাদির অনুপস্থিতিতে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সব কথাই তখন রমা বলিয়া ফেলিল কেবল নিজে যে পালাইবার সংকল্প করিয়াছিল সে কথাটী গোপনে রাখিল। সর্ব্বশেষে বলিল "তোমার মনের সুখ শান্তির জন্য, তোমার প্রাণের তৃপ্তির জন্যে আমার অতি আদরের জিনিষটিকে বিসর্জ্জন দিয়ে আজ আমি যে কি তৃপ্তি পেয়েছি, তা' ভাষায় বল্‌বার সাধ্য নেই। আজ হারানোর দুঃখ আমি অনুভব করছি না— তোমার স্বর্গগতা পত্নীর পবিত্র স্মৃতিতে যে কেউ কালি মাখিয়ে তোমার চোখে তাকে হীন করবে, এ আমি সইতে পারি নি।"

শ্রীশান্তিময়ী দত্ত

শিক্ষা, সেবা ও শক্তি-কেন্দ্র

শ্রীসুবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ,

বাংলার পল্লীসংস্কার ও পল্লীসংগঠন মূলক কর্ম্মকেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করিবার খেয়াল বহুদিন হইতেই আছে। কারণ, বাংলার বিভিন্ন স্থানে এই সকল শুভ প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মধারার তত্ত্বানুসন্ধান লইতে গিয়া অনেকটা আত্মতৃপ্তি লাভ করি। মনে হয়, নগর-সর্ব্বস্ব যে মহাসভ্যতা সম্পন্ন পল্লীশ্রীকে আজ এরূপ শোচনীয় ভাবে দুর্দ্দিনের বিপথ দেখাইয়াছে, তাহার কবল হইতে মুক্ত হইয়া বঙ্গপল্লী আবার বুঝি পূর্ব্ব গৌরব ফিরিয়া পাইতে চলিল। কারণ বঙ্গের প্রতিভা ও যুবশক্তি যুগব্যাপী মোহ কাটাইয়া উঠিয়া আবার পল্লীগুলির দুঃখ-দুর্দ্দশা দূরীকরণে এবং সর্ব্ববিধ উন্নতি কল্পে আপনাদিগকে নিয়োজিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সম্প্রতি এইরূপ একটি কর্ম্মকেন্দ্র দেখিয়া আসিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছে। গত কয়েকমাস হইল সরিষা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের কার্য্যধারা সম্বন্ধে আলোচনা দুই একটি সাময়িক পত্রে দেখিয়াছিলাম। পল্লীসংগঠনের দিক হইতে এই প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ কিছু কাজ করিতেছে, এমন একটি ধারণা তখন হইতেই জন্মিয়াছিল। সম্প্রতি স্বচক্ষে তাহা পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছি এবং কার্য্যাবলী বিশেষভাবে অনুধ্যান করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

"ছাত্রী সঙ্ঘ" পাঠাগার

কলিকাতা হইতে ২৬ মাইল দক্ষিণে ডায়মণ্ডহারবার রোডের উপর এই আশ্রমটি অবস্থিত। ১৩ বৎসর পূর্ব্বে ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর ইহা স্থাপিত হয়। অতি সামান্য ভাবে আরম্ভ হইলেও ইহার উদ্দেশ্য ও আদর্শ কোন কালেই চলনসই বা সঙ্কীর্ণ ছিল না। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নামাঙ্কিত এই পুণ্য প্রতিষ্ঠান তখন হইতেই এক বিরাট আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল। ভারতের বৈদিক আধ্যাত্মিক ভিত্তি ভূমির উপর জনসাধারণের যুগোপযোগী শিক্ষা বিস্তারই ছিল এই প্রতিষ্ঠানটির মূলগত উদ্দেশ্য।
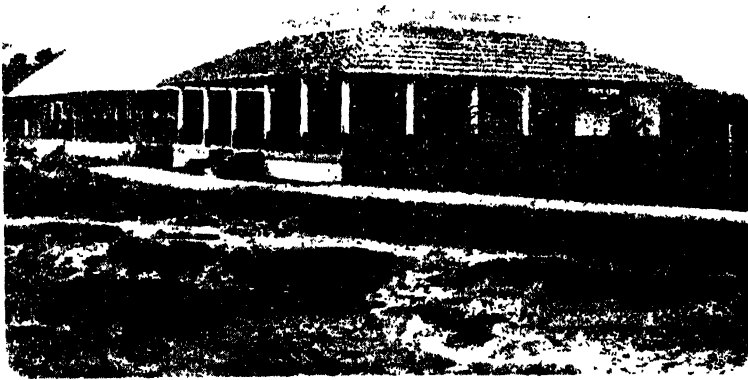
আশ্রমে প্রবেশ করিতেই প্রথম চোখে পড়িল একটি সহজ পরিচ্ছন্নতা। কয়েকটি ঝক্‌ঝকে মাটির বাড়ি, সম্মুখে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণের সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র অথচ সুদৃশ্য পুষ্করিণী—
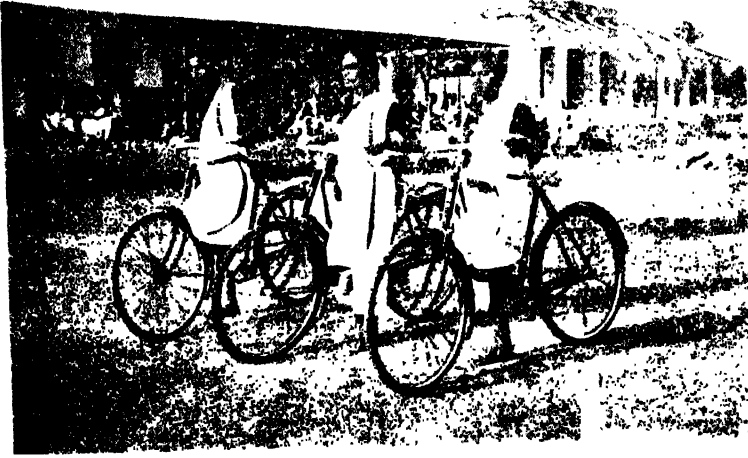
ছাত্রীগণের সাইকেল অভ্যাস

এবং সর্ব্বশেষে চতুর্দ্দিকের অবাধ বিস্তীর্ণতা। আশ্রমের এই পরিস্থিতিটি বেশ ভাল লাগিল।

আশ্রমের সম্পাদক স্বামী গণেশানন্দজী স্বভাব-সুন্দর সৌজন্যে আপ্যায়িত করিলেন। তাঁহার সহিত আশ্রম দেখিতে লাগিলাম।

অদূরেই একটি পরিচ্ছন্ন পাকাবাড়ি। ইহাই সরিষা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষামন্দির, অবৈতনিক মধ্য-ইংরাজি বালক-বিদ্যালয়। সামান্যাবস্থায় আরম্ভ হইয়া বর্ত্তমানে ইহার ছাত্রসংখ্যা তিনশতেরও অধিক। এই বিদ্যালয়টির বিশেষত্ব এই যে, ইহার ছাত্রগণ অধিকাংশই দরিদ্র কৃষক সন্তান। ইহাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এই বিদ্যালয়টিকে অবৈতনিক করা হইয়াছে। তেরজন অভিজ্ঞ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ছাত্রগণ শিক্ষালাভ করিতেছে।

এই বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালীর উৎকর্ষ বাস্তবিকই প্রশংসাযোগ্য। শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া ছাত্রগণ স্বভাবতঃই বিনয়ী, কর্ম্মকুশল ও বুদ্ধিমান হইয়া উঠিতেছে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মধ্য হইতে কতকগুলি সক্ষম ও সুযোগ্য বালককে লইয়া "ভ্রাতৃসঙ্ঘ" গঠিত হইয়াছে। তাহারা প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আহারাদির সময় ব্যতীত সমস্তসময়ই বিদ্যালয়ে কাটায় এবং বিচক্ষণ শিক্ষকদিগের সহিত মিলিয়া মিশিয়া সর্ব্ববিধ শিক্ষালাভে সমর্থ হয়। এক মহান আদর্শবোধ ও দেশহিতৈষণার পুণ্য-প্রেরণা এই তরুণ শিশুমনগুলিকে অধিকার করিয়া থাকে। তাছাড়া খেলাধূলায় ও শরীর চর্চ্চায়, ড্রিলে ও ব্যায়াম-কৌশলে ইহাদের কৃতিত্ব চমকপ্রদ। আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষ এই বৎসর হইতেই বিদ্যালয়টিতে কৃষিবিভাগ

"ছাত্রী সঙ্ঘে"র প্রধানা নেত্রীগণ

ছাত্রীগণের ভলি বল্ খেলা

পাঠাগার"। বলাবাহুল্য, ভ্রাতৃসঙ্ঘ যে নীতির উপর গঠিত, ছাত্রীসঙ্ঘও ঠিক সেই একই নীতিকে অবলম্বন করিয়া গঠিত হইয়াছে। ছাত্রীসঙ্ঘের মেয়েরাও প্রাতঃকালে বিদ্যালয়ে আসিয়া ব্যায়ামাদি করিয়া পড়িতে বসে। তারপর নটার সময় তাহারা বাড়ি ফিরিয়া যায়। আবার এগারটার সময় তাহারা বিদ্যালয়ে আসে, এবং খেলাধুলার পর সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাড়ি চলিয়া যায়। এই সুদীর্ঘ দিন তাহারা নিবিষ্টচিত্তে পড়াশোনায়, এবং খেলাধুলার নিবিড় উজ্জ্বল আনন্দে কাটাইয়া দেয়। তাহারা যখন বাড়ী ফিরিয়া যায়, সঙ্গে লইয়া যায় অপরিমেয় জীবন আর উৎসাহ, অধ্যয়ন-লব্ধ জ্ঞান আর ক্রীড়াজাত আনন্দ! নারী-প্রগতির যে মহা আন্দোলন আজ বাংলা তথা ভারতকে উজ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহার একটি বিশিষ্ট রূপ আজ এখানে

খুলিয়াছেন। যে বিদ্যালয়ের শতকরা ৯০ জন ছাত্রই কৃষকের সন্তান, তাহাকে কৃষি-বিদ্যালয়ে পরিণত করিলে যে তাহাদের বিশেষ সুবিধা হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

শিক্ষামন্দির হইতে আমরা সারদা মন্দিরে গেলাম। ইহা মধ্য-ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়। যদিও মধ্য-ইংরাজি পর্য্যন্ত ইহা স্বীকৃত (recognised), তবুও দশম শ্রেণী পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর ছাত্রীরা ইহাতে অধ্যয়ন করে। বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা এক শতের মধ্যে। শিক্ষামন্দিরে যেমন কৃষক শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যাই অধিক, সারদামন্দিরে কিন্তু তেমনই ভদ্র-গৃহস্থের কন্যা সংখ্যাই অধিক।

সারদা মন্দিরের পরিচ্ছন্নতা আরও বেশী প্রত্যক্ষ। সুদৃশ্য একটি ফুলবাগানের পাশ দিয়া সুদৃশ্যতর একটি নব-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র পাকাবাড়ি দেখিলাম। ইহা "ছাত্রীসঙ্ঘ

ছাত্রীদিগের থ্রো বল্ খেলা

ছাত্রীগণের ডাম্বেল্ ড্রিল্

চোখে পড়িল। এই সকল সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর আশ্রয়ে আসিয়া তাহারা স্বাধীনতার যথেচ্ছ উচ্ছৃঙ্খলতার সন্ধান পায় নাই, কিন্তু মুক্তির নির্দ্দোষ আনন্দ ও নির্ম্মল শিক্ষাটুকু লাভ করিয়াছে। তাহারা যুগোপযোগী বিশাল জ্ঞানকে দূরে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া যুগান্তের অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারকে মহা আড়ম্বরে সহাস্যে গ্রহণ করে নাই। এই জন্যই একটি সুদূর গণ্ডগ্রামের পথে পথে তাহাদিগকে সাইক্লে করিয়া বিদ্যালয়ে আসিতে দেখিলাম, এবং স্কোয়াড্ ড্রিলে নির্ভুল কমাণ্ড দিয়া এই বালিকা বাহিনীকে বহুক্ষণ ধরিয়া কুচ্‌কাওয়াজ করিতেও দেখিলাম।

ছাত্রীদিগের শরীর চর্চ্চার নৈপুণ্য দেখিয়া ইহাদের পড়াশোনার কৃতিত্বের বিষয়ে প্রশ্ন উঠা সম্ভব। কিন্তু মাত্র এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, গত ১৯২৮ হইতে ১৯৩৪ সালের মধ্যে ২০টি বালিকা বিভিন্ন পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করিয়াছে।

উপরোক্ত এই দুইটি বিদ্যালয় ছাড়াও সরিষা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের তত্ত্বাবধানে দূরে দুইটি গ্রামে আরও দুইটি বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। নিকটবর্ত্তী মানখণ্ড নামক গ্রামে একটি উচ্চ প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়, এবং ভঙ্গলপাড়া নামক গ্রামে একটি উচ্চ প্রাথমিক মিশ্র বিদ্যালয় জনসাধারণের শিক্ষাবিস্তার কল্পে দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

শিক্ষামন্দির এবং সারদা-মন্দিরের ছাত্র-ছাত্রী ছাড়াও স্থানীয় উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের একদল ছাত্রকে আশ্রমে দেখিলাম। ইহারা নিয়মিত আশ্রমে আসিয়া থাকে এবং আশ্রমকে একান্তভাবে আপন জ্ঞান করে। ইহাদের ব্যবহার এবং গতিভঙ্গির ভিতর এমন একটি বিশিষ্টতা আছে,—

ছাত্রীগণের খেলা-ধুলা

মনে করেন না, এবং সেইজন্যই সর্ব্ববিধ শিক্ষার ব্যবস্থা ইঁহারা করিয়াছেন। এইজন্য বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদিগের সকল প্রকার সুবিধা অসুবিধার কথা ইঁহাদিগকে সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হয়। এই সকল কারণে আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষ উভয় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর জন্য জলযোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রতিদিন টিফিনের সময় প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীই মুড়ি পাইয়া থাকে। তাছাড়া ভ্রাতৃসঙ্ঘের ছাত্রদের, ছাত্রী-সঙ্ঘের ছাত্রীদের, আশ্রম-সংশ্লিষ্ট স্থানীয় উচ্চইংরাজি বিদ্যালয়ের

বার্ষিক শিক্ষা-শিবিরে শ্রেণীবদ্ধ যুবক ও বালকগণ

যাহাতে মনে হয় এই সকল মুদ্রাই একই মুদ্রালয় হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে।

এইবার তৃতীয় শ্রেণীকে দেখিলাম। ইহারা বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করিয়াছে, এবং কলিকাতার বিভিন্ন কলেজে উচ্চশিক্ষালাভ করিতেছে। ইহাদের সরল আচরণ প্রচুর প্রাণময়তা এবং সহাস সৌজন্য দর্শক-অতিথিকে আকৃষ্ট করে। ইহাদের সকলকে এক সঙ্গে দেখিলে তবেই আশ্রমের ছেলেদের দেখা সম্পূর্ণ হয়। শিক্ষামন্দিরের নিম্নতম শ্রেণীর ছাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পর্য্যন্ত এক অমোঘ যোগসূত্র ইহাদের মধ্যে অবিচল স্নেহপ্রীতি ও অনুরাগ আনিয়া দিয়াছে। একের অভাব অভিযোগকে ইহারা একান্ত আপনার বোধ করিতে শিখিয়াছে। অপরাহ্ণ বেলায় উপরোক্ত সকল শ্রেণীর ছাত্রই যখন একত্র ভলি, বাস্কেট, ফুটবল প্রভৃতি খেলায় আনন্দে মাতিয়া উঠে, এবং ক্রীড়াচ্ছলে কৌতুক কলহাস্যে আশ্রম প্রাঙ্গণ উচ্চকিত ও মুখরিত করিয়া তুলে, তখন মনে হয় ইহারা হয়ত প্রাণের সন্ধান পাইয়াছে—অপরিসীম জীবনকে উপলব্ধি করিবার একটা সৌভাগ্য ও অন্ততঃ ইহাদের হইয়াছে।

সরিষা আশ্রমের শিক্ষার একটি বিশেষত্ব এই যে, সকল প্রকার পুঁথিগত জ্ঞানের পরিচয়কেই ইঁহারা যথেষ্ট বলিয়া

বার্ষিক শিক্ষা শিবিরে যুবক ও বালকগণ কর্ত্তৃক গ্রামের প্রধান পয়ঃপ্রণালী খনন

ছাত্রগণের দৌড়াড় ড্রিল

উভয়বিধ শিক্ষালাভই করিয়া থাকে। অধীত বিদ্যাকে কার্য্যদ্বারা অভ্যাস করিতে এবং সংযত তৎপরতার সহিত ব্যবহারিক জীবনের ছোট বড় কাজগুলি সুসম্পন্ন করিতে শিক্ষাশিবিরের মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা অনেকখানি। গত বৎসর সপ্তাহব্যাপী শিক্ষাশিবির হইয়াছিল। এই সময়ে সরিষা গ্রামের বদ্ধপ্রায় প্রায় এক মাইল ব্যাপী এক জল-নিকাশের পথের ৮০০০ ফুট মাটি কাটিয়া ইহাকে কার্য্যক্ষম করিয়া তোলা হইয়াছে। এক একটি শিক্ষাশিবিরে ছেলে-মেয়ের সংখ্যা প্রায় একশত হইয়া থাকে।

ছাত্রদের এবং যুবকদের জন্য নিয়মিত রুটির ব্যবস্থা আছে।

দুইজন অভিজ্ঞ ব্রতচারী ও লোকনৃত্য শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষামন্দিরের ছাত্রদের নিয়মিত ব্রতচারী ও লোকনৃত্য শিক্ষা দেওয়া হইতেছে দেখিলাম। তাহাদের লোকনৃত্য প্রদর্শনের উৎকৃষ্ট ভঙ্গিগুলি বিশেষ মনোজ্ঞ হইয়াছিল।

সকল শ্রেণীর ছাত্র এবং ছাত্রীকে লইয়া প্রতি বৎসর একটি করিয়া শিক্ষাশিবির (Training Camp) অনুষ্ঠিত হয়, শুনিলাম। অবশ্য ছাত্র এবং ছাত্রীদের শিক্ষাশিবির পৃথক-ভাবেই হইয়া থাকে। নির্দ্দিষ্ট কয়েকদিন ছাত্র-ছাত্রীগণ সুনিয়মিত কার্য্য-তালিকানুযায়ী থিওরেটিক্যাল এবং প্র্যাক্‌টিক্যাল

ডায়মণ্ডহারবার সাবডিভিসানের ছেলেদের মধ্যে একটা খেলাধূলার বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষ গত ১৯৩২ সালে আশ্রমের শুভানুধ্যায়ী এবং বড় ছেলেদের সাহায্যে একটি "ডায়মণ্ডহারবার সাব্‌ডিভিসনাল ইন্টারস্কুল
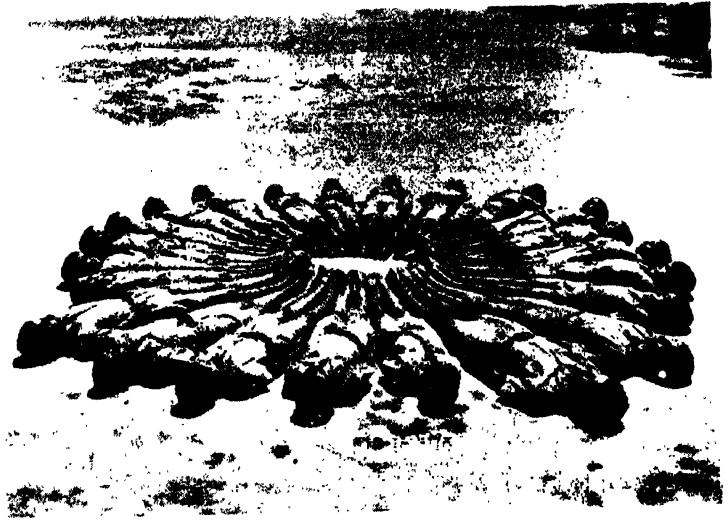
পদ্মাকারে শিক্ষা মন্দিরের কয়েকটি ছাত্র

এথলেটিক স্পোর্টস এসোসিয়েশান" খুলিয়াছেন। এই স্পোর্টস এসোসিয়েশানের উদ্যোগে প্রতিবৎসর ফেব্রুয়ারী হইতে মার্চ্চ মাসের মধ্যে বাৎসরিক খেলাধূলার প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে। মহকুমার অনেকগুলি বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা প্রতি বৎসর ইহাতে যোগদান করিয়া থাকে। এইভাবে এই স্পোর্টস্ এসোসিয়েশানের ঐকান্তিক চেষ্টায় স্থানীয় বালকদিগের মধ্যে বেশ কতকটা খেলা-ধূলার জন্য উৎসাহ আসিয়াছে।

সরিষা আশ্রমে একটা জিনিষ লক্ষ্য করিলাম। আশ্রমের কর্তৃপক্ষ কাল্‌চারের কোন একটা বিশেষ অঙ্গকে

আশ্রম ব্রহ্মচারীগণ কর্ত্তৃক কাঠি-নৃত্য

অসম্ভবরূপ প্রতিপত্তি দিতে চাহেন না। ম্যাথু আর্ণাল্ডের কালচারবাদকে ইঁহারা যেন বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন করিয়া চলিতেছেন। তাই দেখি, যেই আশ্রমের বালকগণ ও মনোযোগ ও যত্নসহকারে কেবলমাত্র কতকগুলি সুদক্ষ খেলোয়াড় মাত্র হইয়া উঠিতে লাগিল, ঠিক সেই সময়েই "বিবেক-ভারতী সাহিত্য চক্রের" জন্ম। আশ্রমের কাল্‌চারের এই বিশিষ্ট অঙ্গটিই আমাকে যথেষ্ট অভিভূত করিয়াছে। আশ্রম-সংশ্লিষ্ট সাহিত্য-রসিক কয়েকজন শুভানুধ্যায়ী এবং বিশেষ করিয়া উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত বড় ছেলেদের আন্তরিক প্রয়াসে ও অকাতর সাধনায় এই কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানটি তিলে তিলে গড়িয়া উঠিতেছে। সাহিত্য ও সাহিত্যিকের, কবি ও কাব্যের মৌলিক গবেষণামূলক ও চিন্তাশীল সমালোচনাই এই সাহিত্য-চক্রের অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রতি পূর্ণিমায় সন্ধ্যার পর এই সাহিত্য চক্রের সাধারণ অধিবেশন হয়। এই সভায় সাহিত্য-চক্রের সভ্যেরা গবেষণামূলক সমালোচনা অথবা মৌলিক রচনা পাঠ করিয়া থাকেন। এই গবেষণা কার্য্য পরিচালনের উপযোগী একটি ভবিষ্যৎ পুস্তকাগার গড়িয়া উঠিতেছে, দেখিলাম। অবশ্য ইহা ছাড়া আশ্রমের নিজস্ব একটী পুস্তকাগারও আছে।

আশ্রমের ব্যায়ামাগারে প্রতিদিন ছাত্রেরা ব্যায়াম করিয়া থাকে। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শক্তির চর্চ্চা না থাকিলে শিক্ষাও যেমন অসম্পূর্ণ, শক্তিও তেমনি ভিত্তিহীন। এই নিয়মিত ব্যায়ামের ফলে কয়েকটি বেশ স্বাস্থ্যবান, সুগঠিত-দেহ যুবক ছাত্র সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। বলা বাহুল্য দুইজন সুশিক্ষিত ব্যায়ামশিক্ষকের শিক্ষাধীনে ছাত্রেরা স্বাস্থ্য লাভ করিতেছে।

এই ত গেল আশ্রমের শিক্ষার দিক। কিন্তু ইহা ছাড়া আরও একটি দিক আছে তাহা সেবার দিক। যুগাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত এই প্রতিষ্ঠানটি বেশ ভাল করিয়াই জানে যে, শিক্ষা বা শক্তি যদি জনসেবার জন্য নিয়োজিত না হইল, তাহা হইলে উভয়ই ত ব্যর্থ। লোক-কল্যাণের নিমিত্ত নিঃস্বার্থ আত্মদানের মধ্যেই ত সমস্ত শিক্ষার সার্থকতা। এই বিরাট সেবাকার্য্যের জন্য গুণীকে তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ উৎসর্গ করিতে হয়—শিক্ষিত শিক্ষা বিলায়, শক্তিমান শক্তি দান করে। অতএব প্রগতিশীল এই প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষাহীন, স্বাস্থ্যহীন এবং উৎসাহহীন পল্লী-বাসীর মধ্যে সুনীতির ও সুশিক্ষা বিস্তারের বিপুল আয়োজন করিয়া যে লোক-সেবার অনুষ্ঠান

করিতেছে, তাহা আজ বাংলার সর্ব্বত্রই অবশ্য-প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শুনিলে আশ্চর্য্য লাগে যে, এত বড় একটা প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য কোন চিরস্থায়ী তহবিলের বন্দোবস্ত নাই। আশ্রমের মাসিক ব্যয় প্রায় ১২০০৲ টাকা। এই পরিমাণ অর্থ কেবলমাত্র এককালীন এবং মাসিক চাঁদারূপেই সংগৃহীত হয়, এবং এই বিশাল ব্যয়ভারের অধিকাংশই কতকগুলি মহাপ্রাণ গুজরাটি, ভাটিয়া এবং মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী বহন করিয়া থাকেন। অবশ্য ইহা অতি আনন্দেরই কথা। কারণ, ইহাত তাঁহাদের সহৃদয়তারই লক্ষণ। কিন্তু বাঙালীর নিজস্ব কি এক্ষেত্রে করিবার কিছুই নাই? বাংলার এক সুদূর পল্লীর সেবাকার্য্যের জন্য দিনের পর দিন গুজরাটি, ভাটিয়া এবং মাড়োয়ারীর মহাপ্রাণতার উপর নিশ্চিন্তে নির্ভর করিতে হইবে? আর এদিকে, প্রাপ্তির প্রাচুর্য্য উৎসবে নিত্য নব অভাবের সুদীর্ঘ ফিরিস্তি প্রদানেই কি বাঙালীর সমস্ত আগ্রহ সমস্ত শক্তিই নিঃশেষ হইয়া যাইবে? এই শুভ প্রতিষ্ঠানের প্রগতির বিচিত্র ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় তাহার নামোল্লেখের কোন প্রকার বালাই কি থাকিবে না? এ প্রশ্নের বিচার বাঙালীই করিবে।

সরিষা রামকৃষ্ণ মিশনের কার্য্যাবলী পল্লীর উন্নতি-অনুসন্ধিৎসুমাত্রেরই বিস্ময় আনিয়া দেয়। তবুও, যখন স্বামী গণেশানন্দজীর সহিত বিদায়কালীন কথাবার্ত্তা কহিতেছিলাম, তিনি আমাকে কেবলমাত্র ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, তাঁহার মানস-অন্তঃশায়ী গভীর আদর্শ-বোধের ইহা কতটুকু মাত্রই বা প্রকাশ! আদর্শ পল্লী-সংগঠনের দিক দিয়া এই সুদীর্ঘ তের বৎসরে তিনি কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছেন মাত্র, বহুদূর অগ্রসর হইবার এখনও বহুবিলম্ব আছে। শিক্ষায় দীক্ষায়, কর্ম্মে সাধনায়, উৎসবে আনন্দে পল্লী-জীবনের সমুজ্জ্বল চিত্র এখনও কল্পনার বস্তু।

তবে সরিষা রামকৃষ্ণমিশনের কর্ম্মকেন্দ্র পরিদর্শন করিয়া এইটুকু আশা জাগে যে, যদি আবার বাংলার পল্লীগুলির প্রতি শত শত সহস্র সহস্র সুকৃতি মনীষীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, যদি ভারতের সনাতন বৈশিষ্ট্যের উপর বাংলার পল্লীগুলিকে যুগোপযোগী জ্ঞান-সম্পদে আবার আমূল সংশোধিত ও সমৃদ্ধ করিয়া তোলা যায়, তাহা হইলে আধুনিক জীবনযাত্রার দুঃসহ বেদনার হাত হইতে অনেকখানিই নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে। কিন্তু তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে সরিষা রামকৃষ্ণ মিশনেরই মত গ্রামগুলিকে করিয়া তুলিতে হইবে শিক্ষা, সেবা ও শক্তিকেন্দ্র।

শ্রীসুবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্ণেল গার্ডনার

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ, বি-এল্‌, পি-আর্‌-এস্‌

(পূর্ব্বানুবর্ত্তন)

শতবর্ষ পূর্ব্বে লেডী ফ্যানী পার্কস নাম্নী জনৈক ইংরাজ মহিলা কিছুকাল এদেশে বাস করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে যাহা কিছু দ্রষ্টব্য ও জ্ঞাতব্য, দেখিতে ও বুঝিতে,—বিশেষতঃ হিন্দু ও মুসলমান মহিলাগণের জেনানা জীবন দেখিতে—তাঁহার পরম আগ্রহ ছিল। তাঁহার লিখিত "Wanderings of a Pilgrim in Search of the Picturesque" নামক কৌতূহলোদ্দীপক ও পরম সুখপাঠ্য গ্রন্থে সমসাময়িক ভারতীয় এবং অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের সুন্দর চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। গার্ডনারের সহিত ফ্যানীর সবিশেষ সম্প্রীতি ঘটিয়াছিল। তিনি ফ্যানীর সহিত কন্যা সম্বন্ধ পাতাইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে "মেরা বেটী" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। লেডী পার্কসও তাঁহাকে অনুরূপ শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে লখনৌনগরে তাঁহাদের সর্ব্বপ্রথম পরিচয় সংঘটিত হইয়াছিল। তখন গার্ডনার সেনাবিভাগ হইতে অবসর লইয়া অযোধ্যা নৃপতির কোন কার্য্যব্যপদেশে তথায় বাস করিতেছিলেন। ফ্যানীর লেখা হইতে গার্ডনার এবং তাঁহার পরিবারবর্গ সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়। ইতিপূর্ব্বে গার্ডনারের বিবাহ এবং হোলকরের নিকট হইতে পলায়নের যে কাহিনী দেওয়া হইয়াছে তাহা উক্ত গ্রন্থ হইতে পরিগৃহীত; গার্ডনার নিজেই তাঁহাকে ঐ সকল কথা বলিয়াছিলেন।

"২৮।৮।১৮৩১—কর্ণেলগার্ডনার কি প্রীতিপ্রদ সঙ্গী! তাঁহার সহিত আমার কত চিত্তাকর্ষক কথাবার্ত্তা হইয়াছে, যাহা মধ্যে মধ্যে তাঁহার 'বেচারী রুগ্না পত্নীর' (তিনি বেগমকে এই বলিয়া উল্লেখ করিতেছিলেন) সেবাকার্য্যে তিনি ব্যাপৃত থাকার জন্য ব্যাহত হইতেছিল। তিনি নিতান্ত অসুস্থ শরীরে এবং মনে তুল্যভাবে অবসাদগ্রস্ত। তাঁহার স্বামী কিছুতেই তাঁহাকে ঔষধ সেবনে রাজী করাইতে পারিতেছেন না। কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি তাঁহার ২৯ বৎসর বয়স্ক অ্যালেন গার্ডনারকে হারাইয়াছেন। তাহার পর একে একে একটী কন্যা, একটী পৌত্র, পুনরায় আর একটি কন্যাকে তিনি বিসর্জ্জন দিয়াছেন। এক্ষণে আবার আর একটী শিশুপৌত্র সাংঘাতিক পীড়িত। এই সকল দুর্ঘটনায় তাঁহার মন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এবং তিনি কোন প্রকারের চিকিৎসা কার্য্য নিজের জন্য আর করাইতে অনিচ্ছুক। কর্ণেলের মুখে তাঁহার শোক দুঃখের কাহিনী আমি আর সহ্য করিতে পারি না—কত সময় শুনিতে শুনিতে আমি শিশুর মতন উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়াছি। তিনি বলিয়াছিলেন 'তুমি আমাকে রেসিডেণ্টের টেবিলে প্রায়ই কথা কহিতে এবং বাহ্যতঃ প্রফুল্লভাবে থাকিতে দেখিয়া থাক বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমার মন তখন বিদীর্ণ হইতে থাকে।' তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী সম্বন্ধে আমাদের অনেক কথা হইয়াছে। আমি তাহাকে আত্মচরিত লিখিতে রাজী করাইবার চেষ্টা করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন 'আমি যদি তাহা লিখি তাহা হইলে তোমাদের সহজে উহা বিশ্বাস হইবে না; রচা গল্প বলিয়া তোমাদের মনে হইবে।' রুগ্না বেগমের নিকট তিনি এখন গিয়াছেন। তাঁহার জীবনের আশ্চর্য্যজনক ঘটনাসমূহ শুনিবার লোভে আর একবার তাঁহার সহিত নিভৃতে বসিয়া কথোপকথনের জন্য মন বড় উচাটন করিতেছে!

'কর্ণেল গার্ডনার খুব সুপুরুষ; কম বয়সে আরও কত ছিলেন! কিরূপে তিনি বেগমকে বিবাহ করিয়াছিলেন সে গল্প আমি শুনিয়াছি। তাহার প্রেম কত রোমাণ্টিক ধরণের হইয়াছিল! তাঁহার প্রতিকৃতি পাইতে আমার ইচ্ছা হয়,—ঠিক্ যেমনটি তিনি এখন আছেন,—তেমনই প্রভুত্বব্যঞ্জক

চিত্তাকর্ষক আকৃতির! আমার প্রতি তাঁহার পক্ষপাতিত্বে আমি যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়া থাকি।" (পৃঃ ১৮৩-৫)

১৮৩২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে আবার এলাহাবাদে গার্ডনারের সহিত পার্কস-দম্পতীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি তখন অযোধ্যাধিপতির জন্য একটি পুল নির্ম্মাণ করাইতেছিলেন; "ঐ কার্য্যের জন্য আবশ্যক প্রস্তর সমূহের উৎপত্তিস্থান চুণার পাহাড়ে যাইবার জন্য তিনি নৌকাযোগে লখনৌ হইতে আসিয়াছিলেন এবং আমাদের সহিত নয়দিন কাল অতিবাহিত করিয়া বারানসী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তিনি এখন অযোধ্যার রাজা এবং উজীর নবাব হাকিম মেহেন্দী উভয়েরই নিকট সমধিক প্রিয় এবং বর্ত্তমানে তিনি যে জায়গীরটী পাইয়াছেন, যদি আরও বৎসর কয়েকের জন্য ঐ একই সর্ত্তে তাহা উপভোগ করিতে পারেন তবে ধনী ব্যক্তি মধ্যে পরিগণিত হইবেন। তিনি এ সকলেরই যোগ্য ব্যক্তি। জেনানী-জীবন সম্বন্ধে তথ্য জন্য আমি তাঁহাকে প্রশ্ন করিলে তিনি অনেক কথা বলিলেন।" আমাকে তিনি বলেন "আমি ত্রিশ চল্লিশ বৎসর কাল হইল বিবাহ করিয়াছি এবং ইহার মধ্যে পত্ন্যন্তর গ্রহণ করি নাই। ইহাতে মুসলমানরা নিতান্ত বিস্মিত হইয়া থাকে এবং স্ত্রীলোকরা সকলে আমাকে আদর্শস্থানীয় বলিয়া মনে করে।" (পৃঃ ২২৯-৩১)

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে পার্কস-দম্পতী আগ্রায় তাজমহল দেখিতে আসিয়াছিলেন। এ সংবাদে কর্ণেল গার্ডনার তাঁহাদের তথা হইতে মাত্র ৬০ মাইল দূরবর্ত্তী কাসগঞ্জে তাঁহার আতিথ্য গ্রহণে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সে সময় তাঁহার পরিবারে একটি বিবাহ আসন্ন ছিল, মুসলমান পদ্ধতির বিবাহ দেখিতে ফ্যানীর আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক একথাও তিনি তাঁহাকে জানাইতে ভুলেন নাই। আগ্রা হইতে কাসগঞ্জ যাইবার পথে কটচৌরা নামক স্থানে গার্ডনারের দ্বিতীয় পুত্র জেমস পিতার বিশাল জমিদারী-সমূহের তত্ত্বাবধান কার্য্যে অবস্থান করিতেছিলেন। আসিবার পথে তাঁহার সহিত দেখা করিতে তিনি লেডী পার্কসকে লিখিয়াছিলেন।

"২১শে ফেব্রুয়ারী ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ডাকযোগে কটচৌরা যাত্রা করিয়া আমরা পরদিবস মধ্যাহ্নে তথায় পৌছিলাম। জেমস গার্ডনার পরম সমাদরের সহিত আমাদিগকে সম্বর্দ্ধিত করিলেন। তাঁহাকে আমি ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। তাঁহার মুখাকৃতি দেখিয়া আমার তাঁহার পিতাকে মনে পড়িল। উভয়ের ধরণধারণেও যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে। তাঁহার পরিধানে সুদৃশ্য দেশীয় পরিচ্ছদ ছিল। সাধারণতঃ তিনি তাহাই পরিয়া থাকেন।

"জেনানামহলের প্রবেশপথে আমি নীত হইলাম। সহসা তিনটী খুব সুন্দরকায় শিশু নূতন আগন্তুককে দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিল। ইহারা, দুইটি বালক এবং একটি বালিকা, জেমসের সন্তান। তাহাদের পরণে সোনালী ও রূপালী জরির কারুকার্য্য খচিত রেশম ও সাটিনের দেশীয় পরিচ্ছদ ছিল। ছেলেমেয়েগুলি সত্যই পরম নয়নানন্দকর; উত্তরকালে তাহারা যে অসাধারণ দৈহিক সৌন্দর্য্যের অধিকারী হইবে তাহা বেশ বুঝা যাইতেছিল। পাল্কী হইতে নামিয়া আমরা প্রাঙ্গণের উপর দিয়া হাঁটিয়া জেনানার প্রবেশ পথের দিকে চলিলাম। সেখানে আমরা সকলে পাদুকা পরিত্যাগ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। গুরুজন বা সম্মানার্হ ব্যক্তির নিকট জুতা পরিয়া যাওয়া প্রথা নহে; এমন কি স্বয়ং মিঃ জেমস গার্ডনারও কখন তাঁহার পত্নীর নিকট বিনামা বা পাদুকা পরিয়া যাওয়ার মত অসৌজন্য প্রকাশ করেন নাই।

"আমরা যখন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলাম বেগম তখন একটি চারপাইয়ে বসিয়াছিলেন। মিসেস বি আমাকে কর্ণেল গার্ডনারের বন্ধু বলিয়া পরিচয় করিয়া দিলেন। বেগম আমার সহিত করমর্দ্দন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "How do you do?" এই পর্যন্ত তাঁহার ইংরাজী ভাষাজ্ঞান। তাঁহাকে পীড়িত ও অবসন্ন দেখাইতেছিল; হয়ত ঐ অবসাদ অহিফেনের ফল। মলকা বেগমের অসামান্য রূপের এত প্রশংসা আমি ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম যে সত্য কথা বলিতে কি তাঁহাকে দেখিয়া আমি কতকটা নিরাশ হইয়াছিলাম। তাঁহার সুদীর্ঘ, ঘনকৃষ্ণ অলকদাম মস্তকের সম্মুখে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া মুখমণ্ডলের উভয় পার্শ্ব দিয়া বক্ষোদেশ পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছিল; অবশিষ্ট

কেশপাশ দীর্ঘবেণীবদ্ধ হইয়া পৃষ্ঠের উপরে প্রলম্বিত ছিল। তাঁহার পরিধানে রেশমী পায়জামা এবং গায়ের উপরে একজোড়া শাল ছিল, হস্ত ও বাহুদ্বয় অলঙ্কারশোভিত ছিল। যে কক্ষটীতে বেগম আমাদের সহিত দেখা করিলেন সাধারণতঃ সেইটিই তিনি শয়নকক্ষরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। গৃহতলে শুভ্র আস্তরণ বিস্তৃত ছিল। তিনি একটি চারপাইয়ের উপর বসিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের অধিবাসীরা আসবাবপত্র ব্যবহার করে না, সেজন্য ঘরে অপর আর কিছু ছিল না। দুই তিনটী বাঁদী পাখীর পালকের সুবৃহৎ পাখা দ্বারা তাঁহাকে ব্যজন করিতেছিল; অপর কয়েকজন রাজকীয় সম্মানসূচক ময়ূরপুচ্ছের চামর দিয়া মশা মাছি তাড়াইতেছিল।

"মলকার অহিফেন আনীত হইল, তিনি নিজে এক ডেলা খাইলেন এবং অর্দ্ধেক মটর পরিমাণ পুত্রকন্যাগণের প্রত্যেককে খাওয়াইয়া দিলেন। বেগম প্রত্যহ যথেষ্ট পরিমাণ অহিফেন সেবন করেন এবং ছয় বৎসর বয়স না হওয়া পর্য্যন্ত সন্তানদিগকে দিয়া থাকেন। এ বিষয়ে বহু এতদ্দেশীয়া মহিলাকে প্রশ্ন করিয়া আমি উত্তর পাইয়াছি যে 'ইহাতে তাহাদের ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি কাশী হয় না, ইহাই আমাদের রেওয়াজ; ব্যস, তাহা হইলেই হইল;—ইহাই রেওয়াজ।'

"বেগম আমাদিগকে বিদায় দিবার সময় পুনরায় সন্ধ্যাবেলা আসিতে বলিলেন। মিসেস বি-র সহিত তাঁহার যথেষ্ট সম্প্রীতি ছিল, তিনি উহাঁকে কতকটা ভালও বাসিতেন। তিনি মলকাকে বলিলেন, 'আমি আশা করি, বেগম সাহেবা, যেহেতু আমাদিগকে আপনার আদেশ পালন করিতেই হইবে এবং সন্ধ্যাবেলা আসিতেই হইবে আপনি সে সময় আপনার সমস্ত রত্নালঙ্কার পরিয়া থাকিবেন এবং আপনার পূর্ণ সৌন্দর্য্য আমাদিগকে দেখিতে দিবেন।' বেগম হাসিয়া স্বীকৃত হইলেন। আমরা যখন কক্ষ হইতে বাহির হইতেছিলাম তখন তিনি বলিলেন, 'আহা, তোমরা ইংরাজী বিবিরা কেমন তোমাদের গোরা মুখ খোলা রাখিয়া পুতুলটীর মত যথা ইচ্ছা তথা যাওয়া আসা কর! তোমরা কত সুখী!' ইহা হইতে আমার মনে হইল বাদশাজাদীর জেনানার প্রাচীর চতুষ্টয়ের মধ্যে অবরোধ পছন্দকর নয়।

"জেনানামধ্যে আমি যে ইতিহাস শুনিলাম তাহা এইরূপ:—মলকা বেগম মোগল বাদসাহ দ্বিতীয় আকবর সাহের ভ্রাতুষ্পুত্রী। আকবরের অন্যতম পুত্র সেলিমের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার অন্যতমা ভগিনী অযোধ্যার রাজা নাসিরুদ্দিন হাইদারের মহিষী ছিলেন। একবার মলকা লখনৌনগরে ভগিনী সন্নিধানে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। নবাব তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক প্রাসাদ মধ্যে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আটক রাখিয়াছিলেন। কর্ণেল গার্ডনার তখন লখনৌয়ে ছিলেন। তিনি নৃপতির এবম্বিধ আচরণে বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া মলকাকে উদ্ধার করিয়া নিজ জেনানা মধ্যে তাঁহার বেগমের হেফাজতে রাখিয়া দিয়াছিলেন। সাধারণতঃ বিবাহাদি ব্যাপার ভৌগলিক অবস্থানের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। জেনানা মধ্যে মলকাকে দেখিবার যে সুযোগ জেমস পাইয়াছিলেন এবং তদীয় অসাধারণ সৌন্দর্য্য উভয়ে মিলিয়া তাঁহার মাথা ঘুরাইয়া দিল এবং তিনি একদিন মলকাকে লইয়া জেনানা হইতে প্রস্থান করিলেন। কর্ণেলের ক্রোধ-বিরক্তির অবধি রহিল না, তিনি পুত্রের সহিত সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিলেন, জীবনে আর কখনও তাহার মুখ দেখিবেন না বলিলেন। পলাতকযুগল প্রায় দুই বৎসর কাল অরণ্য মধ্যে বাস করিয়াছিলেন। একদিন কর্ণেল গার্ডনার নৌকা যোগে কোথায় যাইতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া জেমস সন্তরণ করিয়া নৌকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন এবং শপথ করিয়া জানাইলেন যে পিতা তাহাকে নৌকায় স্থান না দিলে তিনি ঐভাবেই দেহ বিসর্জ্জন করিবেন। গার্ডনার প্রথমটায় বিচলিত হন নাই। কিন্তু পরিশেষে পরিশ্রান্ত জেমসকে নিমজ্জদোদ্যত দেখিয়া স্নেহেরই জয় হইল। তিনি হাত বাড়াইয়া পুত্রকে নৌকায় উঠাইয়া লইলেন। মীর্জ্জা সেলিমের সহিত মলকার বিবাহ ভঙ্গ হইল। অতঃপর জেমসের সহিত তিনি যথারীতি পরিণীতা হইলেন।

"সন্ধ্যাবেলা আবার আমরা জেনানা মহলে গেলাম দীর্ঘায়ত একটী কক্ষ মধ্যে আমাদিগকে লইয়া যাওয়া হইল। শুভ্র আস্তরণাবৃত কক্ষতলে কয়েকটী "চিরাগদান" রক্ষিত ছিল। প্রত্যেকটীতে অন্ততঃ একশত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদীপ

জ্বলিতেছিল। মধ্যভাগে পুরু একটী গালিচার উপর বেগমের জরীর নক্সাদার গদী ও তাকিয়া রক্ষিত ছিল। অভ্যাগতদিগের গদী ও তাকিয়াগুলি কতকটা সাধাসিধা ধরণের; তাহাতে কারুকার্য্য অতটা ছিল না। আমাদের আসিবার অল্প পরেই মলকাবেগম কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে তখন নেত্রপ্রদাহকারী জ্যোতির্ম্ময় কোন এক অপার্থিব জীব বলিয়া বোধ হইতেছিল। তাঁহার মুখের উপর দিয়া দোপাট্টা টানা ছিল; সে জন্য মুখ ভাল করিয়া দেখা যাইতেছিল না। তাঁহার চলনভঙ্গী এবং অঙ্গ সঞ্চালন সবই পরম সুষমাপূর্ণ। তাঁহার পরিচ্ছদের শোভা এবং শালীনতা অনভ্যস্ত ইউরোপীয় চক্ষে সত্যই বিস্ময়প্রদ। বেগম আসনে সমাসীন হইয়া মুখের উপর হইতে দোপাট্টা অপসারিত করিয়া আমাদের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাকে তখন কত সুন্দর দেখাইতেছিল! কত বেশী সুন্দর! তাঁহার উৎসাহপ্রদীপ্ত বদনমণ্ডলের ভাব ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। মনে যখন কোন প্রফুল্লভাবের উদয় হইতেছিল তখন যেন তাঁহার কৃষ্ণতার চক্ষুদ্বয় হইতেও হাসি ঝরিতেছিল। প্রাতঃকালের সে অবসাদ অন্তর্হিত হইয়াছিল; সন্ধ্যায় তাঁহাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রাণী বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। প্রাচ্যদেশীয়া রমণীগণের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে আমি যে সকল কাহিনী শুনিয়াছিলাম তন্মধ্যে যে কিছুমাত্র অত্যুক্তি নাই তাহা আমার বিশ্বাস হইল।

"মলকাকে দেখিবার বহুকাল পূর্ব্ব হইতে আমি তাঁহার রূপের খ্যাতি শুনিয়া আসিতেছিলাম। তাঁহার নেত্র দুইটি সুদীর্ঘ, আয়ত, ঘনকৃষ্ণ ও সুন্দর; সুর্ম্মা দেওয়াতে তাহা আরও বড় দেখাইতেছিল। তাঁহার কপালের গঠন বড় সুন্দর; নাসিকা সূক্ষ্ম—অসামান্যরূপ সুন্দর ও সুগঠিত, যেন বিধাতাপুরুষ সযত্নে কুঁদিয়া কাটিয়াছেন। তাঁহার মুখমণ্ডল কিন্তু আমার তেমন সুন্দর বলিয়া বোধ হইল না; ওষ্ঠাধর একটু বেশী রকমই সূক্ষ্ম। প্রাচ্যদেশীয়া বিবাহিতা মহিলাগণের প্রথামত তাঁহার দন্তপংক্তি এবং ওষ্ঠাধরদ্বয়ের ভিতরপিঠও মিসিরাগরঞ্জিত। আমার চক্ষে ইহা বড় অশোভন ঠেকিল এবং বোধ হয় সেই কারণে তাঁহার মুখমণ্ডলের উপরদেশ অপেক্ষা নিম্নাংশ আমার অপেক্ষাকৃত কম সুন্দর বলিয়া বোধ হইল। দেশীয়গণের চক্ষে অবশ্য মিসিতে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। মলকার সমক্ষে আস্তরণের উপর বহুসংখ্যক কাচপাত্রে নানাপ্রকার মিষ্টান্ন রক্ষিত ছিল। বাঁদীরা চা ও কফির সহিত তাহা অভ্যাগতগণকে প্রদান করিতে লাগিল। মলকা কফি পান করিলেন। তাঁহার গড়গড়া পার্শ্বে রাখা ছিল, মধ্যে মধ্যে তাহা তিনি সেবন করিতেছিলেন। বিশেষ প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ তিনি আমাকে উহা হইতে ধূমপান করিতে দিলেন। কর্ণেলের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ভ্যালেন্টাইন গার্ডনারের পত্নীও এইদলে উপস্থিত ছিলেন, তিনি বেগমের নিকটেই থাকেন।

"মিঃ গার্ডনার আমাকে জেনানা মধ্যে একটি ঘর দিয়াছিলেন। ইহাতে আমার পক্ষে ভারতীয় জীবনযাত্রা প্রণালী পর্য্যবেক্ষণের সুবিধা হইল। প্রথমটায় আতর গুলাবের তীব্র গন্ধ আমার বরদাস্ত হইত না; রীতিমত কষ্ট হইত। পরে অবশ্য তাহা সহিয়া গিয়াছিল। বাঁদীদিগের নিকট আমি এক বিশেষ কৌতূহলের বস্তু হইয়াছিলাম। জেনানা মধ্যে এক ইংরাজী বিবির আগমন তাহাদের পক্ষে এক অচিন্ত্যনীয় কাণ্ড। আমি যখনই বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতাম, দেখিতাম পর্দ্দার ফাঁকে ফাঁকে অর্দ্ধ-ডজন কৌতূহলে ভরা মুখ উঁকি মারিতেছে। আমার পরিচ্ছদ সমূহের সংখ্যা ও আকৃতি দেখিয়া তাহাদের বিস্ময়ের অন্ত থাকিত না। বড় ঘরওয়ালা মহিলারা এদেশে রূপকথা শুনিতে শুনিতে ঘুমাইতে অভ্যস্ত। উহারা বেগমকে যে একঘেয়ে সুরে গল্প বলিয়া ঘুম পাড়াইত তাহা আমি প্রায়ই শুনিতে পাইতাম। রূপকথার রচনা করা এবং রাত্রে তাহা বলা ইহা ভিন্ন ঐ লোকগুলির অপর কোন কাজ নাই। আমার চারপাইয়ে শুইয়া তৈমুরীয়দিগের গৌরবোজ্জ্বল দিনের আগ্রা প্রাসাদের এবং যে রূপবতী বেগমের সহিত সন্ধ্যাকালটা কাটাইয়াছিলাম তাঁহাকে স্বপ্ন দেখিয়া আমার রাত কাটিয়া গেল। যাত্রাকালে বেগম আমাকে সুগন্ধি মশলাপরিপূর্ণ জরী ও পুঁতির কাজ করা সুন্দর একটি বটুয়া উপহার দিলেন। তাঁহার ইচ্ছায় আমি গালার চুড়ি পরিলাম এবং যতদিন না সেগুলি আপনা হইতে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল ততদিন আমার

প্রথম জেনানাদর্শনের স্মৃতিচিহ্নরূপে তাহা প্রকোষ্ঠে ধারণ করিয়াছিলাম। (পৃঃ ৩৭৯-৮৯)"

"২৪।২।১৮৩৫ :—আমরা এখান হইতে তের মাইল দূরবর্ত্তী কাসগঞ্জ অভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমরা যখন আসিয়া পঁহুছিলাম, তখন আমাদের প্রিয় বন্ধু দেশীয় ও ইংরাজ আরও কয়েকজন ভদ্রলোকের সহিত বাটীর সম্মুখের সোপান শ্রেণীর উপর বসিয়াছিলেন। আমার মনে হইল ওরূপ বীরোচিত প্রভুত্বব্যঞ্জক মূর্ত্তি আমি ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই। রক্তবর্ণের নক্সাদার শালের একটি লবেদা ভিন্ন তাঁহার অবশিষ্ট পরিচ্ছদ ইংরাজী ছিল। লবেদার ষ্টাইলটি বড় চমৎকার এবং তাঁহার বয়সের পক্ষে বেশ মানাইয়াছিল। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ভ্যালেন্টাইন এবং কাম্বেপ্রদেশের জনৈক বৃদ্ধ নবাব তাঁহার নিকট থাকেন। কাসগঞ্জে তাঁহার সুন্দর একটি জমিদারী আছে। বহির্বাটীতে তাঁহার বন্ধুগণ এবং পরিচিত ইংরাজগণ থাকেন। আমার স্বামীকে এবং আমাকে এইখানে স্থান দেওয়া হইয়াছিল। উদ্যানের মধ্যভাগে চতুর্দ্দিকে উচ্চপ্রাচীরবেষ্টিত "বড়া-ডেরা"তে বেগম বাস করেন। প্রথম প্রথম ভোজনপর্ব্বে ইউরোপীয় এবং দেশীয় উভয়বিধ আহার্য্য বস্তুর সমাবেশ থাকিত; কিন্তু শেষোক্তগুলি এত মুখরোচক হইত যে আমি আর ইংরাজীখানা মুখে তুলিতে পারিতাম না। অপরাপর অতিথিগণও এ বিষয়ে আমার সহিত একমত হওয়াতে কর্ণেল গার্ডনার অনুগ্রহ করিয়া ডিনার টেবল হইতে ইউরোপীয় ডিসগুলির নির্ব্বাসনের আদেশ দিয়াছিলেন।

"২৭।২।১৮৩৫ :—আজ সকালে বেগম সংবাদ পাঠাইলেন যে তিনি সায়াহ্নকালে অভ্যাগতগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। কর্ণেল আমাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া তাঁহার ধর্ম্মকন্যা বলিয়া পরিচয় করিয়া দিলেন। বেগম উঠিয়া দাঁড়াইয়া সস্নেহে আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া ফরাসীদের ধরণে আমার উভয়গণ্ডে তাঁহার গণ্ডদেশ স্পর্শ করাইলেন। অতিথিগণের সম্বর্দ্ধনা করিয়া তিনি তাঁহার জরির কারুকার্য্যমণ্ডিত বেগুনে রংয়ের মখমলের গদিতে পুনরায় উপবেশন করিলে আমরা সকলে তাঁহার উভয়পার্শ্বে আসন পরিগ্রহণ করিলাম। বেগম এখন বৃদ্ধা হইয়াছেন; খর্ব্বাকৃতি,—কিন্তু খুব প্রাণবতী। রত্নাভরণের প্রাচুর্য্যে তাঁহার সর্ব্বশরীর ঝলমল করিতেছিল। হীরক, মুক্তা, চুণি ও পান্না যেখানে যতটি ধরে তিনি তাঁহার ক্ষুদ্রদেহে ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরণে ছিল সিল্কের পাজামা, লাল বেনারসীর পেশোয়াজ ও দোপাট্টা। তিনি উপবিষ্ট ছিলেন এবং দোপাট্টায় তাঁহার সর্ব্বশরীর এরূপ আবৃত হইয়াছিল যে তাঁহাকে দেখিয়া কোন সজীব ব্যক্তি বলিয়া মনে না হইয়া স্বর্ণ, মুক্তা ও লোহিতবর্ণের একটা উজ্জ্বল স্তূপ বলিয়া ভ্রম হইতেছিল। বেগমের স্বর্ণ-নির্ম্মিত আলবোলা সম্মুখে রক্ষিত ছিল। ঘরের অপর প্রান্তে ১৪ জন ক্রীতদাসী বসিয়াছিল, উহারা বেগমের খাস সম্পত্তি। তাহারা নানাপ্রকারের বাদ্যযন্ত্র বাজাইল, কেহ কেহ নৃত্য করিল।

"বেগমের আত্মীয়গণ তাঁহার বামপার্শ্বে বসিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অ্যালেনের বিধবা হিন্দা বিবিসাহেবাও তাহাদের মধ্যে ছিলেন। কর্ণেল গার্ডনারের আত্মীয় ২৮শ সংখ্যক দেশীয় পদাতিকদলের অফিসার ষ্টুয়ার্ট উইলিয়ম গার্ডনারের সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা হরমুজী বেগমের বিবাহ হইয়াছে। তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা সুসান বা সুব্বিয়া বেগম সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মোগল বংশীয় একটী সাহজাদার সহিত তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া যাওয়ার জন্য তিনি তখন প্রথামত পর্দ্দা মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। বেগমের চরণপ্রান্তে জেমসের প্রথম বিবাহজাতা দুটি কন্যা বসিয়াছিল। জ্যেষ্ঠা অ্যালেডা ("শুকতারা"), বয়স প্রায় পনের বৎসর; গাত্রবর্ণ খুব পরিষ্কার, মুখাকৃতি গোল এবং খুব সুন্দর। কিন্তু সুমিষ্ট ও চিত্তাকর্ষক একটী ধরণ ইহাই ছিল মেয়েটীর মধ্যে প্রধান বিশেষত্ব। সকলকার মধ্যে তাহাকে কর্ণেল গার্ডনার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন। সত্যই মেয়েটীকে দেখিলে ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়। তাহার কনিষ্ঠা ভগিনী "সন্ধ্যাতারা" অ্যালেডার মত অত গৌরী না হইলেও সুন্দরী এবং চঞ্চল প্রকৃতি। বেগমের মত মেয়ে দুইটিরও মুখাকৃতি তাতারী ধাঁচের অর্থাৎ চক্ষুদ্বয়ের মধ্যের ব্যবধান কিছু অধিক। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বালিকাদ্বয় খুব সুন্দরী ও মনোরমা।

"দেশীয় ধরণে জীবনযাত্রায় অনুরাগী দুইজন ইংরাজ ভদ্রলোক কাসগঞ্জ ভাল লাগায় আমাকে অনুরোধ করিলেন যেন আমি গার্ডনারকে তাঁহাদের তাঁহার পরিবারভুক্ত হইবার ইচ্ছার কথাটা জানাই। আমার কথার প্রত্যুত্তরে তিনি বলিলেন

"সুব্বিয়ার" ত সাহজাদার সহিত বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে।" আমি বলিলাম "কিন্তু সে নিজে তাহাকে পছন্দ করে কিনা তাহা কি আপনি জানেন?" তিনি হাসিয়া বলিলেন এদেশ সম্বন্ধে তুমি কিছুই জান না। একজনের বদলে আর একজনকে পছন্দ করা অথবা ভাবী স্বামীকে পূর্ব্বে দেখা এদেশে মেয়েদের পক্ষে বড় বেহায়াপনা। মিঃ—কে বলিও তাঁহার আমার সহিত আত্মীয়তার ইচ্ছাতেই আমি ধন্য। সন্তুষ্টচিত্তেই আমি আমার পৌত্রীকে তাঁহার করে সমর্পণ করিতাম, যদি না বেগম এই বড়ঘরে কুটুম্বিতায় (অবশ্য তাঁহার মতে) সব মনপ্রাণ না ঢালিয়া দিতেন। আমি অনেক বৎসর ধরিয়া এ বিবাহ সম্বন্ধে মত দিই নাই। কিন্তু "বুঁদকা ঘরেঁা ধল গয়া"; * শেষ পর্য্যন্ত তাঁহারই জিত হইল। আমি নিজে বিবাহিত জীবনে সুখী হইলেও কোন ইউরোপীয় ভদ্রলোককে দেশীয়া পত্নী গ্রহণে উপদেশ দিই না। অপর লোকটী সাংসারিক হিসাবে মন্দ পাত্র না হইলেও তাহাকে আমি পছন্দ করি না। "শুকতারা"কে আমি তাহার হস্তে দিতে পারিব না।"

"জেমস গার্ডনারের প্রথমা পত্নী বাণু বিবি সাহেবাও সেখানে ছিলেন। প্রথম যৌবনে তিনি খুব সুন্দরী ছিলেন তাহা তাঁহাকে দেখিলে সহজে বুঝা যায়। অভ্যাগতগণ তাম্রকূট ও তাম্বুল সেবন করিলেন। আমার জন্য ভাল করিয়া পান সাজা হইল। জীবনে সেই সর্ব্বপ্রথম আমি পান খাইলাম। বেশ ভালই লাগিল।

"বেগমের পিতৃব্য কাম্বের বৃদ্ধ নবাবের কথা ভুলিলে চলিবে না। লোকটী অদ্ভুত। তিনি বিলাত বেড়াইয়া আসিয়াছেন। আমাদের সহিত টেবিলে খাইতেন এবং অতিথিগণের সহিত শেরী পানও করিতেন। মহিলারা উপস্থিত থাকিলে শেরী এবং সুধু পুরুষদের টেবিলে ব্রাণ্ডী লইতেন। দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে তিনি "ব্ল্যাক গেমন" খেলিতেও জানেন। তাঁহার পূর্ণনামটী এইরূপ:—"ফখ্‌র উদ দৌলা মুমতাজ উলমুলক নবাবমীর মামুন খাঁ বাহাদুর দেলমে দিলওয়ার জঙ্গ।"

কর্ণেল গার্ডনারের নাম উইলিয়ম লিনিয়স। তাঁহার ধর্ম্মপিতা বিখ্যাত উদ্ভিদতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতের নাম হইতে তাঁহার নামকরণ হইয়াছে। তিনি নিজেও একজন সুদক্ষ উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদ এবং পরম উৎসাহের সহিত ঐ শাস্ত্রের চর্চ্চা করিয়া থাকেন। তাঁহার বাগানটী সুন্দর ও সুবৃহৎ—নানাপ্রকার সুন্দর গাছ, দুষ্প্রাপ্য চারা ও লতা, মনোরম পুষ্প ও গুল্মসমূহে সদাই পরিপূর্ণ। মনোরম বহুবিধ ফলমূলাদি বারমাসই উৎপন্ন হয়। উদ্যানটীর সৌকর্য্যার্থে গার্ডনার অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করেন না। উহার ঠিক মধ্যস্থলে বড় বড় বৃক্ষের ছায়াসুশীতল ক্রোড়ের আশ্রয়ে একটি কুঞ্জবন নির্ম্মিত। বেগম এবং তাঁহার সহচরীগণ প্রায়ই সারাদিনটা এইখানে যাপন করেন। সে সময় চতুষ্পার্শ্বে প্রহরীর বন্দোবস্ত করা হইয়া থাকে। বেগমও খুব ফুল ভালবাসেন। ইউরোপীয় আদর্শে যদিও তাঁহাকে উদ্ভিদবিদ্যাবিশারদ বলা চলে না, তাহা হইলেও তিনি সর্ব্ববিধ দেশীয় গাছ গাছড়ার ভেষজগুণ এবং কোনটী হইতে কি প্রকার রং পাওয়া যায় তাহা অবগত আছেন। জেনানা মধ্যে এ জ্ঞান তাঁহার নিত্য প্রয়োজনে লাগে। (পৃঃ ৩৯২—৯৭)

"আগ্রায় আমি লোকমুখে পাত্রী সুসানের রূপের খ্যাতি শুনিয়াছিলাম। ইংরাজ ও দেশীয় বহু ব্যক্তির নিকট হইতে গার্ডনার তাহার পাণিপ্রার্থনা পাইয়াছিলেন। জেনানাবাসিনীদের পক্ষে সুব্বিয়াকে বেশ শিক্ষিতা বলা চলে। লিখিতে পড়িতে জানা ছাড়া সে ছোলা দিয়া হিসাব করিতেও পারে। তাহার বয়স প্রায় বিশ বৎসর; এদেশের বিবাহের পাত্রীর পক্ষে বয়স কিছু অধিক হইয়াছে। তাহাকে দেখিয়া কিন্তু আমার বিস্ময়ের অন্ত রহিল না। তাহার গাত্রবর্ণ পাণ্ডুর, মুখের গঠন কতকটা চ্যাপ্টা, চেহারা নিতান্ত রোগা ও ক্ষীণ;—সুন্দর মোটেই নয়। ইহাকেই লোকে খোসামোদ করিয়া "কত সুন্দর" বলে। ইউরোপীয়ের সৌন্দর্য্য অথবা অনেক এশিয়াবাসী মহিলার মত উজ্জ্বল পরিষ্কার গাত্রবর্ণ তাহার নাই। তাহার ধরণ ধারণেরও লোকে প্রশংসা করিত; কিন্তু আমার তাহাও ভাল লাগিল না।

"পাত্র আঞ্জাম সেকো † বিংশতিবর্ষীয় যুবক,—খুব সুপুরুষ। কুঞ্চিত ঘনকৃষ্ণ কেশদাম গুচ্ছে গুচ্ছে তাঁহার

* অর্থাৎ বিন্দু বিন্দু জলে পাথরও ক্ষয় হয়।

† ইনি মলকাবেগমের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।

মস্তকের উভয় পার্শ্বে ঝুলিয়া পড়িয়াছে; নেত্রদ্বয় দীর্ঘ ও উজ্জ্বল; মুখাকৃতি সুন্দর; গাত্রবর্ণ ঈষৎ হরিতাভ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ; দেহাকার মধ্যম। সকল ভারতবর্ষীয়ের মত সাহজাদাও শ্মশ্রুগুম্ফশালী। তাঁহার পিতা মীর্জ্জা সুলেমান নববিবাহিত দম্পতীকে একটি পয়সাও দিবেন না বলিয়াছেন। কাজেই বিবাহের যাবতীয় ব্যয়ভার পাত্রীর পিতামহ বহন করিতেছেন, বরপক্ষের খরচও তিনি দিতেছেন। সাহজাদার মাসিক বৃত্তি মাত্র একশত টাকা। কর্ণেল গার্ডনার আমাকে বলিলেন "এই বিবাহে যে টাকাটা বৃথা অপব্যয় হইবে তাহা যদি আমি সুবিয়াকে দিতাম তাহা হইলে আমি তাহার অবশিষ্ট জীবন বিষময় করিয়া তুলিতাম। সে নিজেকে হতমান বলিয়া বিবেচনা করিত। যদিও প্রথামত সে ঘরের বাহিরে যাইতে অথবা জাঁকজমকের কিছুই দেখিতে পাইবে না, তবুও অন্য লোকের মুখে তাহার বিবাহের সময় রাস্তার দুই পার্শ্বে কয় মাইল লম্বা রোসনাই হইয়াছিল, কি রকম বাজী, বাজনা হইয়াছিল, এবং কি রকম শোভাযাত্রা করিয়া বর আসিয়াছিল,—এ সকল গল্প শুনিয়া সে গর্ব্বানুভব করিবে। অবশিষ্ট জীবন সে একবেলা খাইয়া কাটাইবে তাহাও স্বীকার, তথাপি নগদ টাকার পরিবর্ত্তে সে এই সকল গল্প গাছা অধিকতর পছন্দ করিবে। এ বিষয়ে সে একেবারে পাকা হিন্দুস্থানী।" সকাল হইতে রাত্রি অবধি বেগমের উৎকণ্ঠার অবধি নাই; পাছে কোন কিছু ভুল হইয়া যায়, দানসামগ্রীতে সামান্য কোন জিনিস বাদ পড়ে। তাহা হইলে এত অর্থব্যয় বিফলে যাইবে, তাঁহার সকল সুনাম বিনষ্ট হইবে; সবাই বলিবে "ওমা, কি ঘেন্নার বিয়ে!" (পৃঃ ৪২২—২৩)

"লেডী পার্কসের গ্রন্থের ৩৬শ ও ৩৭শ অধ্যায় সুধু বিবাহোৎসবের সুদীর্ঘ বিবরণে পরিপূর্ণ। তাঁহার নিকট ঐ সকল ব্যাপার পরম কৌতুহলের বিষয় হইলেও এদেশের সকলেই ও ধরণের উৎসব এবং মুসলমান বিবাহ-পদ্ধতির সহিত অল্পবিস্তর পরিচিত। এখানে সুধু গার্ডনার পরিবারের কথা বলা যাইবে। "বরের বধূসহ প্রস্থান কালে অন্তঃপুরিকারা সকলে সুবিয়ার নিকটে আসিয়া তারস্বরে রোদন আরম্ভ করিল। তাহার গমনে যাহাদের কোন কষ্ট হইবার কথা নহে তাহারাও ভীষণভাবে চীৎকার ও ক্রন্দন করিতে লাগিল। গার্ডনার সেখানে বসিয়াছিলেন। তাঁহাকে বড় বিষণ্ণ ও পাণ্ডুর দেখাইতেছিল। প্রাণপ্রিয়া পৌত্রীকে বিদায় দিবার কালে সস্নেহে অঙ্কে লইতে গিয়া বৃদ্ধের সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল, অশ্রুপ্রবাহ বাধা মানিল না, গণ্ড বাহিয়া বড় বড় ফোঁটা ধরিয়া পড়িল। তিনি আর যেন দাঁড়াইতে পারিতেছিলেন না। সাহজাদাকে কাছে ডাকিয়া তিনি বলিলেন যে তাঁহার পৌত্রীর প্রতি তাহার আচরণ যেরূপ হইবে তিনিও তাহার সহিত সেইমত ব্যবহার করিবেন। স্ত্রীকে সুখী করিলে সাহজাদার কোন অভাব থাকিবে না; কিন্তু তাহাকে কষ্ট দিলে তিনিও তাহাকে দুঃখ দিবেন। অতঃপর তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন "যুবক গার্ডনারের হস্তে উহার ভগিনীকে সমর্পণ করিবার কালে আমি জানিতাম সে সুখী হইবে। কিন্তু এই বেচারী, —কে জানে উহার অদৃষ্টে কি আছে? সে কথা যাউক, এ বিবাহে তাহার নিজের ইচ্ছা ছিল; তাহার মা ও ঠাকুমা এজন্য প্রাণপাত করিয়াছিলেন। আর, আমার বেটি, তুমি ত জান শেষ পর্য্যন্ত মেয়েদেরই জয় হয়।" (পৃঃ ৪৪৩)

"কর্ণেল গার্ডনারের কথাবার্ত্তা বড় হৃদয়গ্রাহী। তিনি বেশ পণ্ডিত লোক, অথচ তাঁহার ভাবটা শিশুর মত সরল ও প্রফুল্ল। আমি তাঁহাকে কতবার নিজ জীবনী লিখিতে অথবা তাঁহার বলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে লিখিয়া লইতে দিতে অনুরোধ করিয়াছি। কত বিচিত্র ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইয়াছে,—সে সকলের বিবরণ কত আনন্দদায়ক হইত; তাঁহার লিখনভঙ্গী ও এত মনোরম যে লিখিত হইলে ঐ গ্রন্থ বাস্তবিক এক মূল্যবান বস্তু হইত। আমার কাছে তিনি তাঁহার জীবনের কত অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলিয়াছেন। কিন্তু আমি তাহা লিখিবার চেষ্টা করি নাই, কারণ আমার মনে হইত তাঁহার মুখের ভাষা যথাযথ স্মরণ রাখিতে না পারিলে ঐ লেখার অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য নষ্ট হইবে। * জেমস গার্ডনারও বেশ চালাক

* লেডী পার্কস এ সঙ্কোচ অনুভব না করিলে ভালই করিতেন তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য। কর্ণেল টড প্রমুখ সে যুগের অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি গার্ডনারকে আত্মচরিত লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

চতুর চটপটে লোক। তিনি কখনও ইংলণ্ডে যান নাই। কলিকাতার কোন স্কুলে তাঁহার শিক্ষারম্ভ হইয়াছিল; অবশিষ্টাংশ গৃহে তাঁহার পিতার এবং মিঃ বি—র নিকট হইয়াছে। ফারসী ভাষা তিনি দেশীয়গণের মতই দ্রুত লিখিতে পড়িতে সক্ষম; সাধারণতঃ ঐ ভাষাতেই তিনি নিজের যাহা কিছু কাজকর্ম্ম নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন। তিনি বেশ বিচক্ষণও বটে; ধূর্ত্ততায় তিনি দেশীয়গণকেও হারাইতে সমর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তিনি খুব অতিথিবৎসল। অশ্বারোহণ, অসিচালন, বর্শানিক্ষেপ এবং লক্ষ্যভেদ ইত্যাদি পুরুষোচিত সর্ব্ববিধ ব্যায়ামাদিতে তিনি সমান পারদর্শী; সর্ব্বপ্রকার ভারতীয় ক্রীড়াকৌতুকেও তিনি সুদক্ষ। যে ধরণের জীবনযাপনে তিনি অভ্যস্ত তজ্জন্য তিনি সত্যই উপযুক্ত। সূর্য্যের খরতাপে ক্লেশানুভব না করিয়া তিনি সারাদিন অশ্বপৃষ্ঠে জমিজমাদি পর্য্যবেক্ষণ করেন। তাঁহার নিজেরও অনেকগুলি গ্রাম আছে; সেখানকার তিনিই প্রভু। চাষ আবাদ এবং নীলের ব্যবসা হইতে তাঁহার যথেষ্ট অর্থাগম হয়। মলকা বেগম স্বামীকে সকল বিষয়ে পরম সাহায্য করিয়া থাকেন। প্রজারা সকলে বেগমকে খুব শ্রদ্ধাভক্তি করে এবং তাঁহার মুখের কথাই তাহাদের কাছে আইন আদালত।" (পৃঃ ৪৩৫—৩৬)

"একদিন বড়বাগানে থাকা কালে কর্ণেল গার্ডনার অসুস্থ বোধ করিয়াছিলেন। বেগম আমাকে তাহার নিকট যাইতে অনুরোধ করিলেন। পীড়িত স্বামীর সন্নিধানে যাইবার জন্যও জেনানার বাহিরে যাইতে তাঁহার সাহস হয় নাই। আমি তাঁহার নিকট গেলাম কতকটা সুস্থ হইবার পর তিনি বাড়ীর মধ্যে ফিরিতে চাহিলেন। আমার স্কন্ধে ভর দিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন এবং উদ্যানের ঠিক বহির্ভাগে অবস্থিত তাঁহার পুত্র অ্যালেনের সমাধিস্থানে গেলেন। তিনি একটি কবরের উপর বসিলেন, আমাদের অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন "বার্দ্ধক্য এবং তাহার আনীত রোগ না থাকিলে আমরা কখনই এ ধরাধাম পরিত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতাম না। আমি আর বেশী দিন বাঁচিব না। আমার বেটী, তোমার সহিত আর হয়ত দেখা হইবে না। আমার পুত্রের পার্শ্বে শয়ন করা, ইহাই আমার অন্তিম বাসনা। জেমস্‌কে এ সম্বন্ধে আমি বলিয়া রাখিয়াছি। বেচারী বেগম, আমাকে ছাড়ার পর তাঁহাকেও আর বেশীদিন থাকিতে হইবে না। তুমি দেখো, তিনি মুখে বেশী কিছু বলিবেন না; কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাঁহার বুক ভাঙ্গিয়া যাইবে; তিনিও আর বেশী দিন টিঁকিবেন না! তাঁহার পুত্র অ্যালেনের মৃত্যুর পর বেগম তাঁহার সমস্ত জহরত হামানদিস্তায় কুটিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিছু পরে আমরা ঘরে ফিরিলাম।" (পৃঃ ৪৫৫)

"৫।৪।১৮৩৫ ঃ- কর্ণেল গার্ডনারের নিকট বিদায় লইয়া আমরা বিষণ্নমনে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলাম। তাঁহার স্বাস্থ্য কিরূপ নষ্ট হইয়াছে তাহা আমি দেখিয়াছি; বিশ্রাম এবং সেবা তাঁহার পক্ষে একান্ত আবশ্যক তাহাও জানি, কিন্তু দেশীয়গণের হস্তে পরিত্যক্ত হইয়া তাঁহার স্বাচ্ছন্দ্যের কথা যে কেহই স্মরণ রাখিবে না তাহাও বুঝি। পরে আমি শুনিয়াছিলাম যে আমাদের প্রত্যাবর্ত্তনের পর সাংসারিক বিষয় লইয়া তাঁহাকে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তাঁহার ভগ্ন শরীরে সে পরিশ্রম ও উদ্বেগ সহ্য হইল না। হাঁপানি এবং উৎকট রকমের মস্তকের যন্ত্রণায় তিনি বড় কষ্ট পাইয়াছিলেন এবং মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বে পক্ষাঘাতের একটা আক্রমণ হইতে সামলাইয়াছিলেন। তাঁহার পীড়ার সংবাদে আমার কতবার কাসগঞ্জে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইয়াছে; কিন্তু চক্ষুলজ্জাবশতঃ পারি নাই। পোষ্যকন্যা ধর্ম্মপিতার বিষয়ের অংশভাগিনী হয়। পাছে অন্তঃপুরিকারা আমার যাওয়ার মধ্যে কোন গূঢ় অভিসন্ধি লুক্কায়িত আছে মনে করেন সেই ভয়ে আমি যাইতে পারি নাই। সে সময় তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলেন এমন একটি ভদ্রলোক আমাকে পরে বলিয়াছিলেন "তাঁহার শেষ পীড়ার সময় কর্ণেল গার্ডনার প্রায়ই সুগভীর স্নেহের সঙ্গে তোমার নাম করিতেন; কতবার তোমার উপস্থিতি কামনা করিয়াছিলেন। আমি সে কথা তোমাকে লিখি নাই, কারণ তখন 'লু' চলিতেছিল এবং দূরত্বও প্রায় পাঁচ ছয় শত মাইল ছিল।"

"একবার যদি তিনি শুধু আমাকে লিখিতেন; আমি তৎক্ষণাৎ ডাক গাড়ীতে কাসগঞ্জ যাইতাম। মুমূর্ষু সুহৃদের

অন্তিম ইচ্ছা পূরণের সুখের কাছে "লু" বা পথের কষ্ট কত তুচ্ছ! কত সপ্তাহ আমি তাঁহার গৃহে তাঁহার সঙ্গসুখ উপভোগ করিয়া, তাঁহার সম্ভ্রান্ত সুভদ্র ধরণের প্রশংসা মনে প্রাণে করিয়া, তাঁহার বিপদসমূহ হইতে আশ্চর্য্যকর রক্ষা পাওয়ার ও অন্য দুর্লভ জীবনের ঘটনাবলীর গল্প শুনিতে শুনিতে কাটাইয়াছি। তাঁহার বীরত্ব ও নির্ভীকতাব্যঞ্জক কীর্ত্তিকলাপসমূহ বর্ণন আমাপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি দ্বারা হওয়াই উচিত এবং একমাত্র তিনিই তাঁহার চরিতাখ্যায়ক হইবার উপযুক্ত ছিলেন।

"২৯শে জুলাই ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে কাসগঞ্জে আমাদের প্রিয়বন্ধু কর্ণেল গার্ডনার ৬৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁহার কথামত অ্যালেনের কবরের পার্শ্বে তাঁহাকে সমাহিত করা হইয়াছিল।* তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই হইল। তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে বেগম যেন দিন দিন শুখাইয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি মুখে বিশেষ কিছু বলেন নাই; কিন্তু ভিতরে ভিতরে শোকানলে নিরন্তর দগ্ধ হইতে লাগিলেন এবং স্বামীর মৃত্যুর এক মাস দুই দিন পরে তিনিও পরলোকে তাঁহার সাথী হইয়াছিলেন।" (৪৫৭-৫৮)

গার্ডনারের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অনেক কথা লেডী পার্কসের লেখা হইতে ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়া গিয়াছে। তাঁহার বহুবিধ গুণগ্রামের উল্লেখ তখনকার দিনের অনেকেই করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ তাঁহাকে উচ্চাদর্শের বৃটিশজাতীয় ভদ্রলোকের নিখুঁত নিদর্শন বলিয়া থাকেন। তিনি কবির ভাষায় বলিতে "ব্যূঢ়োরস্ক, বৃষস্কন্ধ, শালপ্রাংশু মহাভুজ" ছিলেন। তাঁহার প্রভুত্বব্যঞ্জক সৈনিকোচিত সুন্দর কান্তির সকলেই একবাক্যে প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। সর্ব্ববিধ পুরুষোচিত ক্রীড়ায় ও ব্যায়ামে তিনি পারদর্শী ছিলেন। বাল্যকালে ফরাসীদেশে শিক্ষালাভের ফলে ইউরোপীয় কৃষ্টির অনেকটা তিনি পাইয়াছিলেন এবং সুদীর্ঘকাল এতদ্দেশে ভারতীয় সাহচর্য্যে থাকিয়াও তাহা হারান নাই। দীর্ঘকাল ভারতীয় সমাজে থাকার ফলে অধিবাসীদের চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান জন্মিয়াছিল এবং তাহাদের বহুবিধ আচার পদ্ধতি ও মতবাদবিশ্বাসও তিনি পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎসত্ত্বেও স্বজাতীয়ের সহিত ব্যবহারকালে তিনি পুরামাত্রায় ইউরোপীয়ই ছিলেন; তাঁহার সাহচর্য্যে কেহই আপত্তিকর কিছুই পায় নাই। ইতিহাস, বিজ্ঞান, উদ্ভিদতত্ত্ব, উচ্চগণিৎ, সরকারী ব্লুবুক—এ সকলেই তাঁহার পরম অনুরাগ ছিল। তিনি সার্ভে এবং মানচিত্র অঙ্কনও জানিতেন।

ঔপন্যাসিক থ্যাকারে-বর্ণিত মেজর গ্যাহাগন বোধ হয় এ দেশে অনেকের নিকট সুপরিচিত। গার্ডনারের চরিত্র হইতে থ্যাকারে তাঁহার নায়কের চিত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। গার্ডনারের মত গ্যাহাগানও এক ভারতবর্ষীয় নৃপতিকে তাঁহার গৃহমধ্যে আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং এক নৃপ-বালার চিত্তহরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন উভয় চরিত্রে আর কোন মিল দেখা যায় না। মদগর্ব্বী গ্যাহাগানের চিত্র গার্ডনারের প্রকৃত আলেখ্য মনে করা উচিত। গার্ডনার লোক সমক্ষে আত্মপ্রকাশ করিতে একেবারেই ভালবাসিতেন না। লর্ড রডন এ দেশে গভর্ণর জেনারেল হইয়া আসিলে অনেকেই তাঁহাকে গার্ডনারকে তাঁহার সহিত দেখা করিবার কালে পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই। এ সম্বন্ধে তিনি নিজে এডওয়ার্ড গার্ডনারকে এক চিঠিতে লিখিয়াছিলেন:—"কুইবেরণ অভিযানে আমি সর্ব্বদাই লর্ড রডনের নিকট থাকিতাম। আমার নিকট তিনি সুস্পষ্টভাবে নিজ অভিমত প্রকাশ করিতেন এবং তাঁহার সহিত লা ভেন্‌দি প্রদেশে যাইবার জন্যও আমাকে বলিয়াছিলেন। এ সকল কথা তিনি নিশ্চয়ই ভুলিয়া যান নাই। যদি উহা তাঁহার মনে থাকে তবে হয়ত আমার পুরাতন প্রসঙ্গের উত্থাপন তাঁহার নিকট আমাকে প্রাসাদাকাঙ্ক্ষীরূপে প্রকাশ করিতে পারে; এ জন্য ওবিষয়ে কিছু না বলা উচিত হইয়াছে। আমি জীবনে

---

* কাসগঞ্জের অদূরে ছাওনী নামক স্থানে গার্ডনার বংশের পারিবারিক সমাধিক্ষেত্র অবস্থিত। এখানকার বহুসংখ্যক কবরের মধ্যে শুধু অ্যালেনের মর্ম্মরনির্ম্মিত সুন্দর সমাধিটীর গাত্রে একটী লিপি আছে:—"Alan Gardner died XXX January 1828।" কর্ণেল গার্ডনারের সমাধিসৌধ মধ্যে বেগম এবং জেমসও (মৃত্যু ১৪।৬।১৮৪৫) সমাহিত হইয়াছিলেন।

কখনও কাহারও নিকট কোনরূপ অনুগ্রহ ভিক্ষা করি নাই।"* সিন্ধিয়ার ভূতপূর্ব্ব সৈনিক ভাগ্যান্বেষীদিগের প্রথম ইতিবৃত্তলেখক মেজর লুই ফার্ডিনাণ্ড স্মিথ গার্ডনারকে "A gentleman and a soldier of pleasing address and uncommon abilities" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এ বিষয়ে আমরাও তাঁহার সহিত একমত হইতে বাধ্য।

গার্ডনারের বিবাহিত জীবন খুব সুখের হইয়াছিল। তাঁহার স্বেচ্ছানির্ব্বাচিতা বিদেশিনী পত্নীকে লইয়া তিনি একদিনের জন্যও অসুখী হন নাই। বিবাহকালে বেগমের অভিভাবকগণের সহিত তাঁহার সর্ত্ত হইয়াছিল যে তাঁহাদের সন্ততিবর্গের মধ্যে পুরুষরা পিতৃপিতামহের, এবং কন্যার মাতৃধর্ম্মে দীক্ষিত হইবে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বেগম স্বেচ্ছায় সুগভীর স্বামীপ্রেমের বশে কন্যা পৌত্রী সকলকেই খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে দিয়াছিলেন। গার্ডনারের দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মিয়াছিল। কন্যা অ্যালেডার শৈশবে পাঁচ বৎসর মাত্র বয়সে দেহান্ত হইয়াছিল (১০।১।১৮০৩)। জ্যেষ্ঠপুত্র অ্যালেনের (মৃত্যু ৩০শে জানুয়ারী ১৮২৮) হরমুজী ও সুবিয়া নাম্নী কন্যা দুইটী ভিন্ন মঙ্গু নামে এক পুত্র ছিল, শৈশবে তাহার মৃত্যু হয়। গার্ডনারের খুল্লতাত এডমিরাল অ্যালেন হাইড, ব্যারণ গার্ডনারের প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্র অ্যালেন (১৭৭০-১৮১৫) এবং ফ্রান্সিস (১৭১২-১৮২১) উভয়েই ব্রিটিশ নৌবিভাগের এডমিরাল পদলাভ করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্র অ্যালেন তদীয় লর্ড-উপাধির অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার পরলোক গমনের পর তাহার পুত্র অ্যালেন লেগী (১৮১০-৮৩) পৈতৃক পদবীর অধিকারী হইয়াছিলেন। ফ্রান্সিসের পুত্র ষ্টুয়ার্ট উইলিয়াম কোম্পানীর সেনাবিভাগে কর্ম্ম লইয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। হরমুজীকে বিবাহ করিয়া (২৮।৮।১৮৩৪) তিনি আর স্বদেশে ফিরিয়া যান নাই। নিজ ভারতীয়া পত্নীসহ এদেশেই বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের চারি পুত্র ও দুই কন্যা জন্মিয়াছিল। ২০শে জুলাই ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ষ্টুয়ার্টের মৃত্যু হয়। পর বৎসর তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাত-পুত্র তৃতীয় ব্যারণ পরলোক গমন করেন। তাঁহার কোন সন্তানাদি ছিল না। অতঃপর নিকটতম আত্মীয় হিসাবে ষ্টুয়ার্ট উইলিয়মের জ্যেষ্ঠপুত্র অ্যালেন হাইড (জন্ম ১।৭।১৮৩৬) তদীয় লর্ড-পদবীর অধিকারী হন। কিন্তু মুসলমানী বিবাহ হইতে তাহার মাতামহের, মাতার ও নিজের জন্ম হওয়ার ফলে বিবাহ বা জন্ম সার্টিফিকেট প্রদানে অক্ষমতাপ্রযুক্ত তাঁহার পক্ষে হাউস অব লর্ডসের সমক্ষে স্বীয় দাবীর বৈধতা প্রমাণ করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি সাধারণে চতুর্থ ব্যারণ গার্ডনার নামে পরিচিত ছিলেন। অ্যালেন কিছুকাল উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের পুলিশ বিভাগে কার্য্য করিয়াছিলেন। ১২ই মার্চ্চ ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মাসতুতো-ভগিনী অর্থাৎ সুবিয়ার কন্যা জেন মেকোর সহিত তাঁহার নিজের এবং মেরী-নাম্নী জনৈকা দেশীয়া খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী মহিলার সহিত তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা মেজর এডওয়ার্ডের বিবাহ হইয়াছিল। ৯ই জুলাই ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে অ্যালেন হাইডের মৃত্যুর পর তাঁহার একমাত্র পুত্র অ্যালেন লেগি (জন্ম ২৫।১০।১৮৮১) লর্ড পদবীর অধিকারী হন; তিনিই নামতঃ পঞ্চম ব্যারণ গার্ডনার। তিনি কিছুকালের জন্য যুক্তপ্রদেশের সেক্রেটারিয়েটে কার্য্য করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি ইটা জেলার মনোথাগ্রামে নিজ জমিদারীতে বাস করেন।

গার্ডনারের দ্বিতীয় পুত্র জেমসের প্রথমা পত্নী বাণু বিবিসাহেবার গর্ভে 'শুকতারা' এবং 'সন্ধ্যাতারা' নাম্নী কন্যাদ্বয় ভিন্ন জেমস বাহিঙ্গাসাহেব নামে এক পুত্র এবং দ্বিতীয়া পত্নী মলকা বেগমের গর্ভে সুলেমান সিকো বা মুন্না সাহেব, সিকান্দার সিকো বা উইলিয়ম লিনিয়স ও জাহাঙ্গীর স্যামুয়েল নামক তিন পুত্র এবং নবাব-বেগম নামে এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। গার্ডনারের বিশাল ধনসম্পত্তির ইহারাই উত্তরাধিকারী হইয়াছিল।* কিন্তু অমিতব্যয়িতা, আত্মকলহ এবং তজ্জনিত মামলা মোকদ্দমার ফলে বর্ত্তমানে তাহা গার্ডনার বংশের হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছে। ইহাদের

* "The Real Major Gahagan," Cal. Review, July 1891, P. 31.

* এককালে সমগ্র ইটা জেলা গার্ডনারদের জমিদারী ছিল।

মধ্যে হিম্মৎসাহেব কাপ্তেন বার্ণার্ড ফ্যাস্থম * নামক একজন ফরাসী ভাগ্যান্বেষী সৈনিকের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল। কর্ণেলের পৌত্র-বংশীয়গণ খাসগঞ্জের, অ্যালেন হাইডের বংশ মনোথার, এবং মেজর এডওয়ার্ডের বংশধরগণ নীরাটের গার্ডনার নামে পরিচিত। ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে গার্ডনার-বংশের আরও অনেক শাখাপ্রশাখা আছে। তাহাদের বংশ-তালিকার জন্য বিলাতী Peerage সম্বন্ধীয় গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। এদেশীয় গার্ডনারগণ আহার বিহারে, পোষাক পরিচ্ছদে, ভাষায়, ধরণধারণে সম্পূর্ণ ভারতীয় হইয়া গিয়াছেন। শতবর্ষ পূর্ব্বে লেডী পার্কসের গ্রন্থ হইতে প্রকাশ, তাঁহারা নামেই শুধু খৃষ্টান ছিলেন, নতুবা আর কোনও বিষয়ে প্রতিবেশী মুসলমানদের সহিত তাঁহাদের পার্থক্য ছিল না। এত দীর্ঘকাল পরে তাঁহাদের অবশিষ্ট ইউরোপীয় ভাবটুকুও বিনষ্ট হইয়াছে; এক্ষণে তাঁহাদের আর অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বলিয়াও চেনা শক্ত। গার্ডনাররা এক্ষণে দিল্লীর মোগল, কাম্বের নবাব এবং এক বৃটিশ লর্ড বংশের অদ্ভুত ভারতীয় সংমিশ্রণ। এইজন্যই পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ভাগ্যান্বেষীদিগের মধ্যে কর্ণেল গার্ডনারের জীবনই সর্ব্বাপেক্ষা রোমাণ্টিক। †

* ইঁহার প্রথম জীবন সম্বন্ধে কোন কথা জানা যায় না। ফরাসী-বিপ্লবের প্রায় সমসময়ে তিনি স্বদেশ হইতে ভারতবর্ষে পলাইয়া আসিয়াছিলেন। নিজামরাজ্যে জেনারেল রেমণ্ডের দলে কিছুদিন কার্য্য করিবার পর তিনি ভূপালে আসেন; তাঁহার ভ্রাতা জঁা বাপতিস্ত সেখানে একজন সেনানায়ক ছিলেন। ইহার পর তিনি জয়পুর দরবারে কর্ম্মগ্রহণ করেন। মাধোগড়ের যুদ্ধের পর তিনি সিন্ধিয়ার সেনাবিভাগে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ বাধিলে আরও অনেকের মত তিনিও সেনাদল হইতে পলায়ন করিয়া লর্ড লেকের আশ্রয় লইয়াছিলেন। লেক তাঁহাকে গার্ডনারের অনিয়মিত অশ্বারোহীদলে কাপ্তেন পদ দিয়াছিলেন। ৭ই এপ্রিল ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত আদালতনগরের যুদ্ধে ফ্যান্থম কর্ণেল অ্যাটনি পলম্যানের অধীনে এক পল্টন অশ্বারোহী সৈনিক পরিচালিত করিয়াছিলেন। সমরাবসানের পর তিনি প্রথমে পাটনায় ও পরে বেরিলিতে বাস করিতে থাকেন। প্রথম জীবনে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এতকাল পরে আবার তিনি ঐ ব্যবসায় আরম্ভ করেন। বৃদ্ধ সাহ আলমের শেষ পীড়ার সময় তাঁহার দরবারস্থ বৃটিশ রেসিডেণ্ট মিঃ মেটকাফ তাঁহার চিকিৎসা করিবার জন্য ফ্যান্থমকে আহ্বান করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই সম্রাটের মৃত্যু হইয়াছিল। তিনি রামপুরের নবাবের পারিবারিক চিকিৎসক এবং মধ্যে কিছুকালের জন্য তাহার প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। কিন্তু নবাবের সহিত মনোমালিন্যের সূত্রপাত হইলে পুনরায় কর্ম্মত্যাগ করিয়া বেরিলিতে নিজ স্বাধীন পেশায় ফিরিয়া গিয়াছিলেন। রামপুরাধিপতির কর্ম্মনিরত J. F. Fauvel নামক একজন ফরাসী ভদ্রলোকের কন্যাকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র ও দুই কন্যা জন্মিয়াছিল। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। বেরিলিসহরের পল্টনগঞ্জ মহল্লার তাঁহার নামের দেশীয় মুখে বিকৃতরূপ হইতে নামকরণ হইয়াছে বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

† বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিতে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির সাহায্য লওয়া হইয়াছে:—

Lady Parkes—"Wanderings of a pilgrim in search of the Picturesque."

Compton—"European Military Adventurers of Hindustan."

Keene—"Hindustan under Free Lances."

"Sketches of Remarkable Living Characters in India"—Asiatic Journal, October 1834.

"The Real Major Gahagan"—Calcutta Review, July 1891.

"Dictionary of National Biography", Vol. VII

Burke's Peerage.

(সমাপ্ত)

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সবিনয় নিবেদন

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জাহ্নবী দেবীর অসুখ সেরে গেছে সত্য, কিন্তু পরাগের কারাবরণে তিনি বিশেষ কাতর হ'য়ে প'ড়েছেন ভেবেই কানন তা'কে দেখতে গেল। আশা ছিল, লিপি ও মুকুটের সঙ্গেও হয়তো সেখানে দেখা হবে। সে-রাত্রের পরে লিপির সঙ্গে আর তার দেখা হয়নি এবং লিপি যে তখনও বম্বে চ'লে যায়নি, আর গেলে যে তাকে না জানিয়ে সে কখনই যাবে না তাও সে ভাল ক'রেই জানতো।

কানন পরাগের বৈঠকখানায় পা দিয়েই থমকে দাঁড়ালো। ঘরের এক পাশের একটা ইজিচেয়ারে মুকুট বিবর্ণ মুখে ব'সে আছে, আর লিপি তার একপাশের একটা চেয়ারের হাতলে ন্যস্ত হাতের ওপর চোখ ঢেকে ব'সে আছে। লিপি যে রোরুদ্যমানা তা তার দিকে চাইলেই সহজে বোঝা যায়।

লিপি হঠাৎ মুখ তুলে কি যেন বলতে গিয়ে কাননকে দরজার সামনে দেখেই নিজেকে যথাসাধ্য সামলে নিয়ে বললো, বেশ, আমি আজ এ-বাড়ী ছেড়ে চ'লে যাচ্ছি। আজই আমার বম্বে যাওয়া হ'তে পারে না। দু'একদিন এখানে হোটেলে আমাকে থাকতেই হবে। তোমার মা'কে সে-কথা জানাবার সাহস আমার নেই, আর তিনি তা'তে রাজীও হবেন না। আমি আজই ক্যাল্‌কাটা হোটেলে চ'লে যাচ্ছি, আমার জিনিষপত্তর পরে সেখানে পাঠিয়ে দিলেই চলবে।

মুকুট তখনও কাননের উপস্থিতি টের পায়নি, সে বললো, সেই কথাই ভাল। তুমি চ'লে যাও, তোমার জিনিষপত্তর আমি লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেব'খন।

কানন তাড়াতাড়ি ঘরের মাঝে প্রবেশ ক'রে বললো, মুকুট, এসব হ'চ্ছে কি? লিপিকে ঘরে ডেকে আনবার অধিকার তোমার আছে ব'লেই যে তা'কে যখন খুসি তাড়াবার অধিকারও তোমার আছে তা'তো নয়। ডাকা যত সহজ তাড়ানো তত সহজ হ'লে দুনিয়ায় ভাবনা ছিল কি! পরাগ আজ জেলে না থাকলে সেও আমারই মত তোমার এ কাজে বাধা দিত। বিশেষ ক'রে কাকীমার মত যখন তুমি পাওনি। লিপিকে যদি হোটেলে যেতেই হয় তবে কাকীমাকে জানিয়েই যেন সে এ-বাড়ী থেকে যায়। তোমার অনুমতিই এ-ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়।

মুকুট অস্বস্তি প্রকাশ ক'রে বললো, সবই মানি কাননদা', কিন্তু এ আমার পক্ষে এখন অসহ্য হ'য়ে উঠেচে।

কানন বললো, অসহ্য হ'য়ে ওঠাই শেষ কথা নয় মুকুট। অসহ্যের চরমে এসেও হয়তো কর্ত্তব্য মানুষের শেষ হয় না।

লিপি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে কাননের একটা হাত ধ'রে ফেলে তা'কে একটা চেয়ারে বসাতে চেষ্টা ক'রে বললো, থাক্ কাননবাবু, তর্ক ক'রে এ আর জোড়া লাগবে না। যেখানে মন নেই সেখানে মন আছে ভাবতে যাওয়ার মত বোকামি আর কিছুই হ'তে পারে না।

মুকুট কণ্ঠস্বরে অত্যন্ত বিরক্তি মিশিয়ে বললো, এই, ঘা না খেলে মানুষের বুদ্ধি খোলে না। এখনতো সবই বেশ পরিষ্কার বুঝেচ' দেখছি।

কানন লিপির হাত ধ'রে তা'কে পাশের একটা চেয়ারে বসিয়ে নিজেও ব'সে বললো, থাক্ লিপি, উত্তর দিতে পারাই বড় কথা নয়, উত্তর দিতে না পারাও অনেক সময়ে বড় কথা হ'তে পারে।

মুকুট নিতান্ত নিস্পৃহের মত জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে বললো, তুমি ওকে মোটেই চেনোনা কাননদা'।

কাননের ভারী হাসি পেল। সে হেসে ফেলে বললো, না, আমি চিনি না, তুমি চেনো।

মুকুট আবার ফিরে বললো, আমার চেয়ে ওকে কেউ ভাল ক'রে চেনে না নিশ্চয়ই। আজ পাঁচ বছর ধ'রে ক্রমাগত ওকে আমি দেখে আসছি।

কানন তথাপি হেসে বললো, পাঁচ বছর দেখাই মানুষ চেনার পক্ষে বড় নজির নয়। মানুষ চিনতে হ'লে নিজেকে আগে মানুষ হ'তে হয় মুকুট।

এমন সময় মিনতি দু' পেয়ালা চা নিয়ে এসে সেখানে প্রবেশ করলো। হঠাৎ কাননকে সেখানে দেখে সে একটু প্রথমটা থম্‌কে দাঁড়িয়েছিল, তার পরমুহূর্ত্তেই আবার নিজেকে সামলে নিয়ে কাননের হাতে এক পেয়ালা, আর মুকুটের ইজি-চেয়ারের হাতলের ওপর এক পেয়ালা চা রেখে লিপির দিকে ফিরে বললো, আমি এখুনি আর এক পেয়ালা নিয়ে আসছি ভাই।

মিনতি চ'লে গেলে মুকুটকে লক্ষ্য ক'রে কানন বললো, মিনতি আজকাল কি এখানেই আছে নাকি?

মুকুট উত্তরে বললো, বড়দা'কে যেদিন ধ'রে নিয়ে গেল তার পরের দিনই খবর পেয়ে এসেছে, তারপরে মা ওকে কিছুতেই যেতে দিচ্ছেন না। ওদিকে ওর স্কুল খোলা, ও ভারী বিপদে পড়েছে।

মিনতি আবার লিপির চা নিয়ে ঘরে এসে প্রবেশ করলে কানন বললো, আমাকে তোমার মনে আছে মিনতি? তোমাদের ব্যারাকপুরের বাড়ীর দোতলার বারান্দাটা কিন্তু আমি আজও ভুলতে পারিনি। সে প্রায় বছর তিন চার আগেকার কথা।

মিনতি সলজ্জ একটু হেসে বললো, কেন থাকবে না? গঙ্গায় বোটে ক'রে আমরা কত বেড়িয়েছি। আমার সব কথাই বেশ মনে আছে। আপনি বোটে ব'সে Browning-এর যে-সব কবিতা আওড়াতেন সেগুলো আবার আপনার মুখে শুনতে ইচ্ছে করে। একদিন শোনাবেন কাননদা'?

কানন হেসে ফেলে বললো, কবিতা? আমি দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক, আমার মুখে গুরু-গম্ভীর কথাই লোকে শুনতে চায়, কবিতা আজও কেউ শুনতে চায়নি। তুমি আমাকে অবাক করলে মিনতি। এই দেখ না, এতক্ষণ মুকুট ও লিপিকে বাছা বাছা দর্শনের বুলি শোনাচ্ছিলাম।

মিনতি বললো, তা' হোক্, আমাকে কিন্তু কবিতাই শোনাতে হবে।

কানন পূর্ব্ববৎ হেসেই বললো, বেশ, শুনতে চাও, শোনাব'। তা দাঁড়িয়ে রহিলে কেন, ব'সো।

মিনতি একটা চেয়ারে বসলে কানন আবার বললো, মাসিকপত্রে তোমার যে-সব কবিতা এ পর্য্যন্ত বেরিয়েছে তা আমি পড়েছি মিনতি। তোমার কবিতা আমার ভারী ভাল লাগে।

মিনতি লজ্জিত হ'য়ে উঠে বললো, আমাকে আপনারা ভালবাসেন ব'লেই হয়তো ওকথা বলচেন।

কানন মিনতির সঙ্কোচ দেখে না হেসে থাকতে পারলো না। তারপরে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে লিপির দিকে ফিরে বললো, লিপি, চা'টা খেয়ে নাও, ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে যে।

লিপি চায়ের পেয়ালা হাতে তুলে নিল। মুকুট তখনও অন্যদিকে চেয়ে ইজি-চেয়ারে নিস্পৃহভাবে শুয়েছিল। চায়ের পেয়ালার প্রতি তার কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না।

মুকুটের চাকরি ঠিক হ'য়েই ছিল। লণ্ডন থেকেই সে চাকরি নিয়ে ভারতবর্ষে ফিরেছিল। সে ইচ্ছে ক'রেই এতদিন চাকরিতে যোগ দেওয়ার দিন শরীরের অজুহাতে পিছিয়ে রেখেছিল, কিন্তু আর তার ভাল লাগছিল না। আরও বিশেষ ক'রে লিপিকে এড়াবার জন্যই সে চাকরিস্থল করাচীর উদ্দেশ্যে রওনা হ'য়ে গেল।

মুকুট চ'লে গেলে লিপি বুঝলো, এখন কল্‌কাতায় থেকে আর কোন লাভ নেই। কল্‌কাতা তার কাছে তখন অসহ্য হ'য়ে উঠেছিল। জাহ্নবী দেবী তা'কে কিছুতেই বম্বে যেতে দিতে রাজী হচ্ছিলেন না। এখানেই একটা চাকরি খুঁজে নিতে উপদেশ দিচ্ছিলেন। ওদিকে মিনতিও গেল ব্যারাকপুর চ'লে। তখন লিপির বম্বে চ'লে যাওয়া ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। এবং সেজন্যই কাননকে তার ধরতে হ'লো যা'তে কানন জাহ্নবী দেবীকে তার সকল কথা বুঝিয়ে ব'লে তার

যাওয়ার ব্যবস্থা সহজেই ক'রে দিতে পারে। কানন অগত্যা জাহ্নবী দেবীকে ব'লে লিপির যাওয়ার অনুমতি সংগ্রহ ক'রে দিল।

লিপি চ'লে যাওয়ার দিন কাননের সঙ্গে এসে দেখা ক'রে গেল ; আর ব'লে গেল, তোমার সময় হ'লে আমার ওখানে যেতে ভুলো না যেন। আমার জন্য আর কারও কোন দরদ না থাকুক তোমার একটু থাকবে ব'লেই আমার বিশ্বাস কাননদা', কারণ, তোমার মত ভাল ক'রে আমার দুর্ব্বলতার পরিচয় আর কেউ এ দুনিয়ায় আজও পায়নি। পরাগদা'র মার স্নেহ আমি কোনদিনই ভুলতে পারবো না জীবনে। প্রথম তিনি আমাকে খ্রীশ্চান ভেবে শঙ্কাকুল হ'য়ে উঠেছিলেন। তারপরে আমাকে আপনার ক'রে নেবার জন্যে ছেলের কাছে পর্য্যন্ত হেঁট হ'তে কার্পণ্য করেন নি। তাঁকে মা'র মত ক'রেই পেয়েছিলাম, কিন্তু আমার ভাগ্য-লিপি হয়তো অন্যরূপ কাননদা'। সেজন্যে আমার একটুও দুঃখ নেই। তোমার মুখেই সেদিন শুনছিলাম, জীবনকে চিনতে হ'লে জীবন দিয়েই চিনতে হয়। আমার অভিজ্ঞতা নিয়ে আমি বাঁচতে পারবো—এ বিশ্বাস আমার আছে।

চ'লে যাওয়ার সময় লিপি সহসা নত হ'য়ে কাননকে প্রণাম করতে গেল, কানন তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললো, না, না, থাক্ লিপি। ওর আর কোন প্রয়োজন নেই।

লিপি নিরুত্তরে চ'লে গেল। কানন তার সঙ্গে গেট পর্য্যন্ত এগিয়ে এলো, কিন্তু একটা কথাও আর তার মুখ দিয়ে বেরুলো না।

কানন ঘরে ফিরে দেখলো, লিপি তার ভ্যানিটি ব্যাগটা ভুলক্রমে টেবিলের ওপরে রেখে গেছে। অন্যদিন হ'লে সে হয়তো নিজেই ষ্টেশনে গিয়ে লিপির হাতে ব্যাগ পৌছে দিয়ে আসতো কিন্তু আজ কেন জানি সে প্রবৃত্তি আর হলো না। লোককে আঘাত করতে সে কোনদিনই দৃক্‌পাত করেনি, আজ এই প্রথম বিচলিত হলো। ব্যাগটা হাতে তুলে নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করলো—লিপির সমস্ত স্মৃতি যেন এ ব্যাগের সঙ্গেই জড়ানো আছে। লিপি হয়তো ব্যাগটা নিতে আবার ফিরে আসতে পারে কিন্তু কাননের মনে হলো হাজার প্রয়োজন থাকলেও লিপি নিজে আর তা ফিরিয়ে নিতে আসবে না।

কানন লিপির ব্যাগটা আবার টেবিলের ওপর সযত্নে রেখে দিয়ে শয্যায় গিয়ে শুয়ে পড়লো। শয্যায় গা এলিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে পড়লো দুতিন সপ্তাহের চিঠি এসে জমা হয়ে আছে তার একখানারও উত্তর এ পর্য্যন্ত দেওয়া হয়নি। কানন তাড়াতাড়ি উঠে আবার টেবিলের কাছে এসে চিঠির ফাইল বের করে কলম নিয়ে বসলো। রাঙ্গাদি'র চিঠি এসেছে, পুতুলের পর পর দুতিনখানা চিঠি এসেছে, সীমারও চিঠি এসেছে। কোন চিঠিরই এ পর্য্যন্ত উত্তর দেওয়া হয়নি। রাঙ্গাদি' লিখেছে পূজোর ছুটিতে এবার আমার এখনো আসা চাইই কিন্তু। পুতুল প্রতি চিঠিতেই লিখছে তার কে এক অপরূপ ঠাকুরঝি আছে তাকে দেখলে কোন মানুষই নাকি বিয়ে না করে থাকতে পারে না। তাকে একবার দেখবার জন্যে সে অত্যন্ত উতলা হয়ে উঠেছে। পুতুলের চিঠি পড়লে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, কানন চিরকুমার থাকবার বাসনা মনে মনে পোষণ করে আর পুতুল তা ভাঙ্গবার জন্য ব্যাকুল! পুতুলের এ ধারণা জন্মাবার কারণ কিন্তু কানন আজও আবিষ্কার করে উঠতে পারেনি। আর পুতুলের বিশ্বাস যে তার ঠাকুরঝিকে দেখলে কানন কিছুতেই আর এমন বেয়াড়া খেয়াল মনে মনে পোষণ করতে পারবে না। সেই ঠাকুরঝিকে চাক্ষুষ করাবার জন্য কাননকে সে বার বার ঐ একই মর্ম্মে চিঠি লিখছে। আর পূজার ছুটিতে কানন যদি তার ওখানে না যায় তো কাননের সঙ্গে তার আর কোন সম্পর্কই কোনদিন থাকবে না। সীমার চিঠি কিন্তু অন্যরকম, সে লিখেছে, পূজার ছুটিতে যদি আর কোথাও না যাও তো এখানে একবার এসো।

একে একে সব চিঠিরই জবাব কানন লিখলো। আর সব চিঠিতেই লিখে দিল যে, হুঁ, আমি তোমার ওখানে যাব। ঠিকই যাব।

কানন চিঠি লেখার কঠিন কর্ত্তব্য শেষ ক'রে শঙ্করকে ডেকে এক কাপ চা তৈরী করবার আদেশ দিয়েই দেখলো, শঙ্করের ঠিক পশ্চাতে দরজার সামনে কাহিনী এসে দাঁড়িয়েছে। কাহিনীকে দেখেই শঙ্করকে আর এক কাপ

বেশী করতে আদেশ দিয়ে বললো, এসো কাহিনী, ভেতরে এসো। লিপি যে আজ চ'লে গেল বম্বে, তা জান' বোধ হয়?

কাহিনী ঘরের ভিতরের একটা চেয়ারে এসে ব'সে বললো, আমি তা'কে See off করতে গেছলাম। ষ্টেশন থেকে সোজা তোমার এখানে আসছি। আর লিপির জন্যেই আজ আমাকে তোমার এখানে আসতে হ'লো।

কানন সাধারণ বিস্ময়ের সঙ্গে বললো, কেন? সে যাবার সময় নিজেই তো আমার সঙ্গে দেখা ক'রে গেছে। আর তার প্রমাণ এখনও আমার টেবিলের ওপর তার ব্যাগটা প'ড়ে আছে। ব'লে আঙুল দিয়ে ব্যাগটা দেখালো।

কাহিনী বললো, সে যে যাবার সময় তোমার সঙ্গে দেখা ক'রে গেছে, আর ব্যাগটা যে ভুলে তোমার এখানে ফেলে গেছে তাও সে আমাকে ব'লেছে। আর তোমার এখান থেকে রাস্তায় বেরিয়েই তার ব্যাগের কথা মনে হয়েছিল, কিন্তু আবার এসে নিয়ে যাবার সাহস তার হয়নি।

কানন বললো, আমার তা' হ'লে ব্যাগটা ষ্টেশনে পাঠিয়ে দেওয়াই উচিত ছিল বল'?

কাহিনী বললো, না পাঠিয়ে ভালই করেছ' কানন দা'। লিপি বলছিল, সে আঘাত সে তা'হ'লে কিছুতেই আর সহ্য করতে পারতো না। সে একটা কথা তোমাকে জানাতে ব'লে গেছে কাননদা',—তোমাকে দেখার আগে মানুষকে শ্রদ্ধা করতে সে কোনদিনই শেখেনি, মানুষকে কি ক'রে অপমান করতে হয় তাই শুধু সে জানতো।

কানন একটু হেসে কথাটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা ক'রে বললো, যাক্, আমার কথা বাদ দাও কাহিনী, লিপি নিজের কথা কিছু ব'লে গেল?

কাহিনী বললো, না, এক ঘণ্টা শুধু তোমার কথাই সে আমাকে শুনিয়েছে। তার নিজের হয়তো তোমাকে বাদ দিয়ে কিছু বলারও ছিল না।

কানন মুখ টিপে হেসে বললো, লিপি হয়তো তবে আমাকে সত্যিই ভালবেসেছে।

কাহিনী একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বললো, তুমি যে কি কাননদা' এখনও লিপিকে নিয়ে ঠাট্টা করতে তোমার একটু বাধে না। অথচ, পাছে তুমি তা'কে কোনদিন স্বপ্নে ছোট ভাব' সেই ভয়ে সে কি তার চোখের জ ফেলা। ষ্টেশনে যদি তাকে তুমি দেখতে তবে কখন একথা তুমি বলতে পারতে না। এত দেশ-বিদেশ ঘু যার শিক্ষা সে যে অমন ক'রে ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে চোখে জল ফেলতে পারে তা আমি স্বচক্ষে না দেখলে কোনদি বিশ্বাস করতে পারতাম না।

কানন আবার একটু হেসে বললো, চোখের জল ফেলা হয়তো চরম কথা নয় কাহিনী।

কাহিনী বিরক্ত হ'য়ে বললো, তোমার কাছে এ দুনিয় কিছুই চরম কথা নয় কাননদা'।

কানন তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে থাক্ কাহিনী, তর্ক করতে আজ আর ভাল লাগছে না লিপির জন্যে সতি [illegible]টা কেমন আজ বিষণ্ণ। দুর্ব্বলতা কোনদিনই আমি নিজের মধ্যে দেখিনি। সীম জন্যেও সেদিন এতটা কাতর হইনি। আজ লিপি আমাকে প্রথম জানিয়ে দিয়ে গেল, হাজার বিদেশী শিক্ষ দিয়ে আপনাকে ঘিরে রাখলেও বাঙালী মেয়ের অন্তর শাশ্বত হ'য়ে ধ্বনিত হ'চ্ছে সেই একই রাগিনী, সব তারা সমান। শুধু চিনে নেবার চোখ থাকা চাই তুমি, লিপি, রাঙাদি, পুতুল, ঝর্ণা, সীমা, মিনতি- সবাই তোমরা একই ছাঁচে ঢালা, শুধু কাঁচা অবস্থ হাতের চাপ লেগে যেটুকু পার্থক্য তোমাদের মধ্যে দে দিয়েছে; আর তারই জন্যে তুমি—কাহিনী, অমুক- রাঙাদি', অমুক—পুতুল। আসলে, তোমরা সবাই এক।

কানন ত্রস্তে ঘরের বাইরে এসে বললো, ছাদে চ কাহিনী, ঘরের মাঝে আজ কেমন আমার অতি বোধ হ'চ্ছে।

কাহিনীও উঠে দাঁড়িয়ে বললো, তুমি যাও ততক্ষ আমি দেখে আসি শঙ্কর চায়ের কতদূর কি করলো আর তোমার রাতের খাওয়ার ব্যবস্থাটাও আজ ক'রে দিয়ে যাই।

কানন বললো, তা যাও, কিন্তু শঙ্করকে চটিও না। তা' হ'লে ভবিষ্যতে আমাকে উপোষী থাকতে হবে।

ব'লে কানন ছাদের সিঁড়ির দিকে চ'লে গেল। আর কাহিনী সিঁড়ি দিয়ে নেমে রান্নাঘরের দিকে গেল।

* *

ছুটিতে বেড়াতে বেরুবার আয়োজন করতেই কানন নিউ-মার্কেটে ঢুকলো। একটা বুক-ষ্টল থেকে হাতের সামনে যা পেল এক রাশ ম্যাগাজিন, আর Wodehouse এর খান দুই বই কিনে নিউ-মার্কেটের চতুর্দ্দিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। তখনও আসল জিনিষ তার কেনাই হয়নি। বহুদিন পরে আবার তার পুতুলের সঙ্গে দেখা হবে, পুতুলকে এমন কি জিনিষ কিনে দেওয়া যায় যা পেয়ে পুতুল আপনাকে একেবারে ধন্য জ্ঞান করবে। পুতুলের চাহিদা যদি লিপি, কাহিনী, ঝর্ণা—ওদের মত হ'তো, অর্থাৎ আধুনিক মেয়েদের মত হ'তো তা' হ'লে কানন নিউ-মার্কেট থেকে সে জিনিষটা আবিষ্কার করতে পারতো বহু পূর্ব্বেই। কিন্তু পুতুল যে পাড়াগাঁয়ের গৃহস্থ ঘরের বধূ—না জানি এখন গৃহিণীপনায় একেবারে সুনিপুণা হ'য়ে উঠেছে। কাজেই কানন অনেক ঘুরে, অনেক ভেবেও পুতুলের মনের মত জিনিষ কিছুতে খুঁজে পাচ্ছিল না।

কানন ঘুরতে ঘুরতে মার্কেটের মাঝে যেখানে মানুষের ওজন নেবার মেশিনগুলো রয়েছে সেখানে এসে হাজির হ'লো। হঠাৎ একটা মেশিনের দিকে চোখ পড়তেই সে অবাক হ'য়ে গেল সেখানে ঝর্ণা ও রঞ্জতকে দেখে। ঝর্ণা নিজের ওজন নিচ্ছিল, আর রঞ্জত তারই পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। কানন মুহূর্ত্তে কি যেন ভেবে ঠিক করলো, তার পরেই ফিরে সে সেখান থেকে সরে যাচ্ছিল যাতে ঝর্ণা তা'কে না দেখে ফেলে। ঝর্ণা তা'কে দেখতে পায়নি ঠিকই। কিন্তু আর একটা মেশিনের পাশে দাঁড়িয়েছিল প্রদীপ, আর সে মেশিনে রঞ্জতের পিস্‌তুতো বোন উমা নিজের ওজন নিচ্ছিল। প্রদীপ ও উমাকে কানন দেখেনি বটে, কিন্তু প্রদীপ কাননকে দেখতে পেয়েছিল এবং কাননের পলায়ন-তৎপরতাও তার চক্ষু এড়ায় নি। প্রদীপ ত্রস্তে কাননের কাছে এগিয়ে এসে বললো, ওকি কাননদা', আমাদের দেখে পালাচ্ছ' বুঝি? বেশ!

কানন প্রদীপের কণ্ঠ শুনে চমকে পিছু ফিরে বললো, ও, সদলবলেই তবে আসা হ'য়েছে? আমি ঝর্ণাকে দেখতে পেয়েছিলাম, কিন্তু তোকে তো দেখতে পাইনি।

প্রদীপ বললো, আমি ও-পাশের মেশিনটার কাছে দাঁড়িয়েছিলাম। রঞ্জতের পিস্‌তুতো বোন উমা তার ওয়েট্ নিচ্ছিল।

তা বেশ!—ব'লে কানন এগুতে যাচ্ছিল, প্রদীপ তাড়াতাড়ি তার হাত ধ'রে ফেলে বললো, পালালে চলবে না কাননদা', আমাদের সঙ্গেই তোমাকে বাড়ী ফিরতে হবে। আমাদের সঙ্গে গাড়ী আছে, তোমাকে বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দেব'খন।

কানন কিছুতেই রাজী হচ্ছিল না, বললো, আমার জিনিষ সব এখনও কেনা হয়নি যে।

তা' হোক্। আমরা সঙ্গে থাকলেও তো তা কিনতে পারবে।—ব'লে প্রদীপ তার হাত ধ'রে আলোয় ঝল্‌মল্ বৃত্তাকার স্থানটুকুতে নিয়ে এলো।

ঝর্ণা এতক্ষণ কাননকে দেখে বাঁ-হাতের কার্ডখানা যাতে তার ওজন লেখা ছিল সেখানা মুখের সামনে তুলে ধ'রে সলজ্জ হাসতে সুরু করলো। সে হাসি কৌতুক, আনন্দ, লজ্জা ও অপ্রতিভতার সংমিশ্রণেই একমাত্র সম্ভব।

কানন ঝর্ণার কাছে এগিয়ে এসে বললো, কই দেখি, কত ওজন হ'লো তোর?

ঝর্ণা কার্ডখানা একটু আড়াল ক'রে বললো, কত মনে হয় শুনি?

কানন বললো, ওজন যখন নেওয়াই হ'য়েছে তখন আন্দাজে ব'লে লাভ কি?

ঝর্ণা বললো, তবু বলো না, দেখি, তোমার আন্দাজ কেমন।

কানন বললো, এই সাত ষ্টোন্ ৮।৯ পাউণ্ড্?

ঝর্ণা কার্ডখানা দেখালো, তা'তে আছে, সাত ষ্টোন্ দশ পাউণ্ড্,আর তারই নীচে লেখা, 'You have a warm heart, but do not let it override your common-sense.'

কানন লেখাটা প'ড়ে হাসতে লাগলো। তার পরে বললো, নীচে কি লেখা আছে পড়েছিস্?

হুঁ, পড়েছি বই কি!—ব'লে ঝর্ণা তাড়াতাড়ি উমার হাতটা ধ'রে ফেলে বললো, দেখি, তোমার কত ওজন হ'লো উমাদি'?

উমা ঝর্ণার হাতে কার্ডখানা দিতে ঝর্ণা তা দেখে নিয়ে কাননকে দেখিয়ে বললো, এই দেখ', উমাদি'র আমার চেয়ে দু'পাউণ্ড্ ওজন কম।

কানন ত্রস্তে একবার উমার সর্ব্বাঙ্গে দৃষ্টি বুলিয়ে নিতে গিয়ে দেখলো যে, উমার কপালে খুব ছোট ক'রে একটি সিঁদুরের টিপ আছে। কানন বললো, ওতে কি লেখা আছে দেখি?

ঝর্ণা তাড়াতাড়ি বললো, সেদিকে কিন্তু উমাদি' জিতে গেছে। লেখা আছে, 'Your life will lie along the more pleasant and happy paths.' ভাল কথা কাননদা', উমাদি'র সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেওয়া দরকার। উমাদি' হচ্ছে রজতদা'র পিস্তুতো বোন, খুব ভাল ভাওলিন বাজাতে পারে। আর উমাদি', কাননদা'র পরিচয় কাননদা' আমার চেয়ে নিজেই ভাল দিতে পারবেন।

তা পারবো। ব'লে কানন উমার দিকে ফিরে বললো, আমার নাম শ্রী কাননবিহারী বসু। এর বেশী আপনার প্রয়োজন নেই নিশ্চয়ই, অবশ্য ঝর্ণার এর পরেও জিজ্ঞাস্য অনেক থাকতে পারে।

উমা হেসে ফেলে বললো, আপনি যে ইউনিভরসিটির দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক তা আমি ইতিপূর্ব্বেই জেনেচি, কাজেই আপনার পরিচয় না পেলেও চলতো।

কানন মৃদু একটু হেসে বললো, তা ঝর্ণার সঙ্গে যখন আপনার পরিচয় হ'য়েছে তখন যে আপনি তা জানেন সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম।

সান্ধ্যসজ্জায় সজ্জিত দু'জন সৈনিকপুরুষ এসে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। তাদের স্বজাতীয় ভাষায় দুর্ব্বোধ্য উচ্চারণ সংযোগে তারা হাস্যালাপে মেতে উঠেছিল। কানন ক্রু দৃষ্টি সঞ্চালনে তাদের ভাবগতিক দেখে নিয়ে বললো, চল এগোন' যাক্। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আলাপ জমিয়ে লাভ নেই।

পুতুলের পরিচয় সকলকে ভাল ক'রে দিয়ে পুতুলকে এমন কি জিনিষ দেওয়া যেতে পারে যাতে পুতুলের আনন্দের সীমা থাকবে না, জানতে চেয়ে কানন বিশেষ লাভবান হ'লো না। কারণ, তাদের মধ্যে কেউ এমন কিছুই বলেনি যা সত্যই পুতুলকে চমৎকৃত করতে পারবে। অন্ততঃ, পারবে ব'লে কাননের নিজের মনে হয় না।

ফলে, কিছুই সেদিন আর পুতুলের জন্য কেনা হ'লো না।

মার্কেটের বাইরে এসে উমা বললো, কাননবাবু, আপনি পুতুলের যে পরিচয় দিলেন তা'তে তাকে একমাত্র কি দিলে সে সন্তুষ্ট হবে তা কিন্তু আমি ব'লে দিতে পারি।

কানন বললো, বলুনতো দেখি।

উমা মুখ টিপে হেসে বললো, পেতলের হাতা, আর লোহার খুন্তি। নিশ্চয় ও দু'টো জিনিষের তার বড় অভাব।

উমার কথায় সকলেই একযোগে হেসে উঠলো। কাননও না হেসে পারলো না। কিন্তু পুতুলকে কি যে সত্যি দেওয়া চলতে পারে তা সে কিছুতেই ভেবে পেল না।

ঝর্ণার অনুরোধে প্রদীপের কার এসে লাগলো ঝর্ণাদের বাড়ীর দোর গোড়ায়। এবং তার একান্ত অনুরোধে সকলকে সেখানে নামতেই হ'লো।

কাহিনী বৈঠকখানা ঘরের একখানা চেয়ারে ব'সে নিবিড় মনোযোগের সঙ্গে কি যেন একখানা বই পড়ছিল। তাদের সদলবলে প্রবেশ করতে দেখে সে তাড়াতাড়ি বইখানা বন্ধ ক'রে পাশে একটু সরিয়ে রেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

কানন হাতের ম্যাগাজিন ও বই টেবিলের ওপর রেখে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ব'সে বললো, কাহিনী, ঝর্ণার অনুরোধে তোমার পড়ায় ব্যাগ্‌ড়া দিতে এলাম আমরা।

কাহিনী লজ্জিত হ'য়ে বললো, হুঁ, যে পড়া আজকাল পড়ি। তারপরে কাননের কাছে এগিয়ে গিয়ে টেবিলের ওপরে রাখা কাননের ম্যাগাজিন ও বইগুলো দেখতে দেখতে বললো, 'এসব বুঝি পূজোর ছুটির খোরাক তোমার কাননদা' ? তা এবার কোথায় যাওয়া ঠিক করলে শুনি ?

উমা কাননের পাশের চেয়ারটা টেনে বসেছিল, সে বললো, আমরা ভাই সবাই মিলেও কাননবাবুকে দার্জ্জিলিং নিয়ে যেতে পারছি না। কি সব অচেনা অখ্যাত পল্লীগ্রামে নাকি বেড়াতে যাবেন। বেশ, একবার ম্যালেরিয়া দেবী স্কন্ধে ভর করলেই হয় আর কি! তখন বুঝবেন, যেমন আমাদের কথা শোনা হ'লো না।

কাহিনী বললো, কাননদা', তুমি বুঝি এবার পুতুলের শ্বশুরবাড়ী বেড়াতে যাবে ? কিনা নাম সে গাঁয়ের ? কদমকেশরপুর বুঝি ?

কানন বললো, শুধু কি কদমকেশরপুর, আরও অনেক জায়গায় যেতে হবে। ধর, রাঙাদি'কে অনেকদিন দেখিনি, তাঁর ওখানেতো একবার যেতেই হবে। তারপরে দেওঘরে সীমার সঙ্গেও একবার দেখা করা দরকার। অবশ্য, সময়ে কুলোবে না, নইলে বম্বেও একবার ঘুরে আসতাম, লিপি অনেক ক'রে ব'লে গেছে।

উমা তাড়াতাড়ি বললো, আর আমরা যে এতলোকে মিলে বলছি তা বুঝি আপনার কানেই গেল না ?

কানন হেসে ফেলে বললো, কানে খুব গেছে, নইলে আর যেতে অস্বীকার হ'লাম কেমন ক'রে, তবে আপনাদের সঙ্গে প্লেজার ট্রিপে বেরুবার ভাগ্য আমার নেই।

ঝর্ণা অমনি রুখে দাঁড়িয়ে বললো, কেবল প্লেজার ট্রিপ, প্লেজার ট্রিপ ক'রোনা কাননদা'। তোমার নিজের বেলা বুঝি ওগুলো প্লেজার ট্রিপ নয় ? সাধে কি তোমার সঙ্গে ঝগড়া বাধে।

সত্যি, ঝগড়া বাধে নাকি ?—ব'লে কানন হাসতে লাগলো।

রজত এতক্ষণ চুপ ক'রেই বসেছিল। সে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, কাননবাবু, আমাদের দশজনের অনুরোধেই না হয় এবার প্লেজার ট্রিপে গেলেন, তা'তে মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে যাবার ভয় আছে ব'লেতো আমার মনে হয় না। আর উমাকে আমি দু'বার এক বিষয়ে অনুরোধ করতে কাউকে কোনদিনই শুনিনি।

উমা তাড়াতাড়ি বললো, উঠে দাঁড়ালে কেন রজতদা', ব'সো। কাননবাবু যখন যেতে পারছেন না তখন আর তাঁকে বলা কেন ? যাক্‌. ঝর্ণা আর প্রদীপদা'র যাওয়াতো এক-রকম ঠিক, না সেদিকেও কোন বাধা আছে ?

রজত আবার বলতে ঝর্ণা বললো, প্রদীপদা' মা'কে ব'লে দেখুক, মা যদি রাজী হন তবেই আমার যাওয়া ঠিক হ'তে পারে। অবশ্য, কাননদা' গেলে মা'র অনুমতি নেওয়ারও বিশেষ প্রয়োজন হ'তো না।

কাহিনী ম্যাগাজিন থেকে মুখ তুলে বললো, না প্রদীপদা', মা'কে বলতে যেওনা। মা আগে থাকতে জেঠাইমার কাছে চিঠি লিখে আমাদের দেওঘর যাবার ব্যবস্থা ঠিক ক'রে ব'সে আছেন। কাননদা' যদি এখান থেকে সোজা দেওঘর যান তবে তাঁর সঙ্গেই আমাদের যাওয়া হবে, নয়তো আমরা দু'জনে দেওঘর চ'লে যাব। এখন মা'কে বলতে যাওয়া বৃথা।

কানন জিজ্ঞাসা করলো, কাকীমা কি তাই ঠিক করেছেন নাকি কাহিনী ? কিন্তু আমিতো বরাবর দেওঘর যেতে পারবো না। কদমকেশরপুর হ'য়ে, রাঙাদি'র ওখানে ঘুরে, যদি সময় হয় তবেই দেওঘর যাব।

ঝর্ণা ক্ষুণ্ণ হয়ে বললো, না, আমি কল্‌কাতায় ব'সে থাকবো তবু দেওঘর যেতে পারবো না। দেওঘর দেখে দেখে প'চে গেছে। আর ওখানে দেখারই বা আছে কি ?

উমা দুঃখিত হ'য়ে বললো, তা'হ'লেতো বাকী রইলো এক প্রদীপদা'। প্রদীপদা', তুমিও ওদের সঙ্গে ঝুলে পড়', তা'হ'লে আমার আর কিছু বলবার থাকবে না। এখন দেখছি যত অনর্থের মূল আপনিই কাননবাবু।

কানন বললো, অথচ আমি এর বিন্দুবিসর্গও এর আগে জানতে পাইনি। ওদের যে দেওঘর যাওয়া ঠিক হ'য়ে আছে তা আমি এই প্রথম শুনলাম। তা বেশতো, আপনারা

দার্জ্জিলিং যাওয়া বন্ধ ক'রে সদলবলে দেওঘরেই চলুন না এ যাত্রা।

উমা বললো, এখন আর তা কি ক'রে হয় কাননবাবু? আমার শ্বশুরবাড়ীর ওরাও সব দার্জ্জিলিং চললো যে, ওদের সঙ্গেই তো আমাদের যাওয়ার কথা। আগে জানলে না হয় দেওঘর যাওয়াই ঠিক করতাম। এখন দেরী হ'য়ে গেছে।

কানন উমার মুখের দিকে চেয়ে দেখলো, উমার মুখে কেমন একটু বিমর্ষভাব। উমার কথা শেষ ক'রেই সহসা নজর পড়লো তার হাতের ঠোঙায় যাতে তখনও নিউমার্কেট থেকে আনা প্রচুর চকোলেট্ ও ক্রীম্ ছিল। পথে সকলে মিলে খেয়েও তা শেষ করতে পারেনি। উমা তাড়াতাড়ি ঠোঙাটা টেবিলের ওপর রেখে কাহিনীকে বললো, চকোলেটের কথা আমি এতক্ষণ ভুলেই গেছলাম। প্রদীপদা'র যেমন কাণ্ড, কিনতে বলা হ'লোতো একেবারে দু'পাঁচ মণ কিনে আনা হ'লো। কাহিনী ভাই, বাদবাকী সব কিন্তু তোমাকেই শেষ করতে হবে।

কাহিনী উমার কাছে এগিয়ে গিয়ে ঠোঙাটা হাতে তুলে নিয়ে বললো, বাবা, এ শেষ করতে হ'লে একটা রাক্ষসের দরকার।

সহসা ঝর্ণারও মনে প'ড়ে গেল যে, পথে উমা তা'কে এক কাপ চা খাওয়াবার কথা বলেছিল। অমনি সে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, ভাল কথা উমাদি,' তুমি যে চা খাবে বললে, আমার আর মনেই ছিল না এতক্ষণ। যাই, চা নিয়ে আসি আমি, উঠে যেও না কিন্তু।

কাহিনী ঝর্ণার গতিতে বাধা দিয়ে বললো, তুই বোস্ ঝর্ণা, আমিই চা নিয়ে আসছি। ব'লে কাহিনী টেবিলের ওপর চকোলেটের ঠোঙাটা নামিয়ে রেখে চ'লে যেতে যেতে ব'লে গেল, তোমরা খেতে থাক ততক্ষণ, আমি এসে ভাগ নেব'খন।

চকোলেটের প্রতি কারো তখন কোন স্পৃহা আর ছিল না; এক কাননই কথার ফাঁকে ফাঁকে তা থেকে দু' একটা তুলে মুখে দিচ্ছিল।

* * *

কাননের ঘরের মেঝেতে ব'সে সামনে কাননের সুটকেসের ডালাটা খুলে কাহিনী তা'তে জিনিষপত্র সাজিয়ে রাখছিল। আর কানন অদূরে একটা চেয়ারে ব'সে কাহিনীর কাজ একটি অব্যক্ত আনন্দের সঙ্গে নিরীক্ষণ করছিল। এ-দৃশ্যের মাধুর্য্য কাননকে কেমন দুর্ব্বল ক'রে তুলেছিল। তার মনে হচ্ছিল, বাঙালীর ঘরে এ-দৃশ্য কত পুরাতন এবং কতবার দেখা, তবু এ-দৃশ্যের মনোহারিত্বটুকু আজও কি অম্লান। সুটকেস্ সাজাতে এমন কিছু শিল্পীর প্রয়োজন হয় না, নিতান্ত আনাড়িও তা সাজাতে পারে, কিন্তু প্রয়োজন হয় একটি প্রাণের—সে প্রাণ হয়তো শিল্পীতেও না থাকতে পারে। ও প্রাণ শুধু যেন বাঙালীর মেয়েতেই আছে, আর ও-দৃশ্যের সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে শুধু বাঙালীর ছেলেই।

কাহিনী!

কানন মুহূর্ত্তপূর্ব্বেও ভাবতে পারেনি যে সে এমন খাপছাড়ার মত হঠাৎ কাহিনীর নাম ধ'রে ডেকে উঠতে পারে। নিজের কানেই তাই তার অসাবধান মুহূর্ত্তের ডাক কেমন বিশ্রী শোনালো।

কাহিনী কিন্তু কাননের ডাকের বিসদৃশতা লক্ষ্য করেনি, বললো, কি, কিছু উল্টোপাল্টা সাজানো হ'লো নাকি?

কানন তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, না। ও কাপড় দু'খানা ওপরেই রেখো। আর ঠিক কথা, সিঁদুরের কৌট'টা মনে ক'রে দিয়েছো তো?

কাহিনী বললো, হুঁ, সবই ঠিক আছে। কিন্তু কাননদা', দু'খানা একই রকম কাপড় পুতুলকে না দিয়ে দু'রকমের দু'খানা দিলে কি ভাল হ'তো না?

কাননের হাসি পেল। সে বললো, ভাল যে হ'তো সে আমি জানি। যাক্, কাপড় দু'খানা পছন্দ হবে তো?

কাহিনী বললো, এমন দামী কাপড়ও যদি পছন্দ না হয়তো কি আবার পছন্দ হবে শুনি?

কানন বললো, সেইতো হ'য়েছে আমার মুস্কিল! পুতুল যে এক ধরণের মেয়ে। দাম শুনে জিনিষ পছন্দ করতে এখনও শেখেনি কিনা, বরং কম দামী শুনলেই পছন্দ করে বেশী।

কাহিনী বললো, হ'লোই বা পুতুল পাড়াগেঁয়ে গেরস্ত ঘরের বউ, তা' ব'লে এ-জিনিষ পছন্দ করবে না—এ হ'তেই পারে না। তবে দু'খানা হুবহু একই রকম ব'লে যদি একটু ক্ষুণ্ণ হয়। আর দু'খানা কি কেউ কোনদিন এক রকমের দেয় কাউকে কাননদা'? আমি আগে দেখলে নিশ্চয় বদলে আনাতাম।

কানন হাসতে চেষ্টা ক'রে বললো, বদলাতে হ'লে এখনও সময় আছে, কিন্তু বদলাবার জন্যে আমি কিনিনি। ওর ভেতরে আমার উদ্দেশ্য কিছু নিশ্চয়ই আছে। আর তোমাকে তা বলতে আমার বাধা কিছু নেই। পুতুলের কে এক অপরূপ গুণবতী ঠাকুরঝি আছে। পুতুল ভেবেছে, আমি চিরকুমার থাকার পণ নিয়েছি। কাজেই সে লিখেছে, তার ঐ ঠাকুরঝিকে দেখলে আমি কখনই নাকি আমার পণ না ভেঙ্গে থাকতে পারবো না। পুতুলের সেই ঠাকুরঝির উদ্দেশ্যেই কাপড়খানা কেনা, অবশ্য পুতুল যদি বুদ্ধি ক'রে তা'কে কাপড়খানা দেয় তবেই আমার কেনা সার্থক। নইলে আমি আর তাকে কেমন ক'রে দি'; জানা নাই, শোনা নেই, লোঁকেই বা ভাববে কি?

কাহিনী শুনে চুপ ক'রে রইলো। কিছুক্ষণ পরে কানন আবার বললো, কি, কোন উত্তর দিলে না যে?

কাহিনী হেসে বললো, উত্তর আর দেব কি! ভাবছি, পুতুলের যদি আমারই মত বুদ্ধি হয় তবে তোমার আপশোষের আর সীমা থাকবে না।

কানন বললো, কেন, তুমি যদি পুতুল হ'তে কাহিনী, তা'হ'লে তোমার ঠাকুরঝিকে কাপড়খানা দিতে না?

কাহিনী বললো, আমি যখন পুতুল নই তখন কি ক'রে বলি সে কথা?

কানন বললো, কেন, বিচার ক'রেই বল'।

কাহিনী মুখ টিপে হেসে বললো, বিচার যে নির্ভুল হবে তার কি কোন মানে আছে কাননদা'? তবু শুনতে চাইচো যখন তখন বলি। আমি যদি পুতুল হ'তাম তা'হ'লে দিতাম নিশ্চয়ই, কিন্তু কাহিনী হ'লে কিছুতেই দিতাম না।

কানন জোর দিয়ে বললো, তাও দিতে কাহিনী।

সহসা পশুপতির আগমনে কানন ও কাহিনী উভয়েই চম্‌কে উঠলো। পশুপতির পশ্চাতে শঙ্কর এসে দাঁড়িয়েছিল। কানন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, এই যে, পশুপতি যে, হঠাৎ কি মনে ক'রে? দু'দিন তোমার বাড়ী গিয়ে তোমার দেখা মিললো না, তারপরে একদিন গিয়ে শুনি, কোথায় নাকি উঠে গেছ। সে-বাসায় আর নেই বুঝি তোমরা?

না, সে বাসাটা ভাল না ব'লেই ছেড়ে দিতে হ'লো।—ব'লে পশুপতি কাহিনীকে একবার ভাল ক'রে দেখে নিয়ে কাননকে বললো, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে, একবার যদি বাইরে আসতে পার'তো বড় ভাল হয়। কারও সামনে সে কথা আমি তোমাকে বলতে পারবো না।

কানন বললো, কেন, তুমিই বরং ভিতরে এসো পশুপতি, কাহিনী ততক্ষণ ও-ঘরে যাক্।

পশুপতি ভেতরে আসতে কাহিনী আস্তে আস্তে সেখান থেকে বেরিয়ে গেল। পশুপতি কানন-কর্ত্তৃক-প্রদর্শিত চেয়ারে ব'সে বললো, আমি এসেছি সীমার সম্বন্ধে কথা কইতে তোমার সঙ্গে। আমি এখন যদি সীমাকে আনতে যাই তো সে আমার সঙ্গে আসতে রাজী হবে কিনা সেই কথাই জানতে। আর সীমা যদি রাজী নাও হয় তবু তাকে আমি নিয়ে আসবো।

কানন পশুপতির স্বল্পোত্তেজিত মুখের দিকে চেয়ে বললো, রাজী না হলেও যখন তুমি নিয়ে আসবে ঠিক করেছ' তখন আর আমার মতের কি প্রয়োজন পশুপতি?

পশুপতি বললো, আছে। এপক্ষে সীমার অভিভাবক বলতে যদি কেউ থাকে তো সে তুমিই। কাজেই তোমার মতের একটা প্রয়োজন আছে বই কি!

কানন বললো, সীমাতো এখন আমার কাছে নেই, সে আছে জ্যেঠাইমার কাছে, এক্ষেত্রে জ্যেঠাইমাই এখন তার অভিভাবক। তিনি যদি অমত না করেন তবে তো কোন কথাই আর থাকে না। আর জ্যেঠাইমা যে অমত করবেন এমনতো মনে হয় না। তবে সীমার মত না পেলে যে কিছুই হবে না।

পশুপতি বললো, সে আমি না ভেবে আসিনি। সীমাকে আমি লিখেছি সে বিষয়ে, আর সীমা অমত করবে না ব'লেই আমার বিশ্বাস। আর মা'র কথা সীমা ফেলতে পারবে না কখনই। মা'ও সীমাকে এক চিঠি লিখেছেন।

কানন বললো, এতো সুখের কথা পশুপতি। আমরা কেউ অমত করবো না, যদি সীমাকে তোমরা মত করাতে পার।

পশুপতি উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আচ্ছা, আজ তবে উঠি। এই কথা জানতেই আমার আসা। সীমা কখনই অমত করবে না, তার মত এত ভাল ক'রে কে আর জানে যে, তার স্বামী কত দুর্ব্বল।

কানন পশুপতির এ অদ্ভুত পরিবর্ত্তনে বিশেষ বিচলিত হয়েছিল, কাজেই পশুপতির কথার উত্তরে আর কিছুই তার বলা হ'লো না, কিন্তু বলার তার অনেক কিছুই ছিল। পশুপতি দরজার কাছ পর্য্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে দাঁড়িয়ে বললো, এসব কি পুজোর ছুটিতে কোথাও বেরুবার আয়োজন হ'চ্ছে নাকি? কোথায় যাওয়া হবে? দেওঘর যাবে নাকি?

কানন বললো, হুঁ, দেওঘরেও একবার যেতে হবে বই কি! তবে কবে যে গিয়ে সেখানে পৌছুতে পারবো তা বলতে পারি না। আপাততঃ কদমকেশরপুর যাওয়া ঠিক করেছি।

পশুপতি বললো, অপিসের খাটুনি আছে, পুজোর ক'দিনও আমাদের ছুটি নেই। পুজোর পরেই ছুটি ক'রে দিন দু'য়েকের জন্যেও অন্ততঃ দেওঘর যাব সীমাকে আনতে। তার মধ্যে তুমি গিয়ে পৌছুলে তো ভালই হয়। আচ্ছা, আসি এখন।

সহসা কাহিনী তার গতিতে বাধা দিয়ে বললো, ওকি, কতকাল পরে এ বাড়ীতে এসেছেন, কিছু মুখে না দিয়ে গেলে শুনবো কেন? কাননদা'তো এ সবের বাইরে কিনা। ওঁর বাড়ীতে যে এখনও কেন ভদ্রলোকে পা দেয়—তা'তো আমি ভেবেই পাই না।

পশুপতি ফিরে দেখলো, কাহিনীর এক হাতে এক পেয়ালা চা ও অপর হাতে এক প্লেট খাবার, আর তার পশ্চাতে শঙ্করের হাতে এক গ্লাস জল। অগত্যা পশুপতিকে আবার বসতেই হ'লো।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

১। গুড্ মর্ণিং এবং গুড্ ইভ্নিং

ব্রহ্মচারী সরলানন্দ

বিদেশী শিক্ষা ও সভ্যতা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী সমাজের সামাজিকতা এবং আচার ব্যবহারও অনেকটা পরাজিত জাতির জীবনে সহজে এবং অজ্ঞাতসারে প্রবেশ করে। ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগে এমন বিদেশী অনেক কিছুই আমরা গ্রহণ করিয়াছিলাম। জাতীয়তার প্লাবন যখন বর্ষার বন্যার মত দেশের প্রান্তে প্রান্তে নর-নারীর প্রাণে প্রাণে নব চেতনা আনিয়া দিল, তখন আমরা আবার আমাদের 'স্বদেশী' বা 'জাতীয়' বস্তু-নিচয়ের প্রতি মমতা ফিরিয়া আনিতে শিখিলাম।

কিন্তু, আজও সেই প্রথম ইংরেজী-শিক্ষা-যুগের বিদেশী সামাজিকতার অনুকরণাভ্যাস সম্পূর্ণরূপে আমরা বর্জ্জন করিতে পারি নাই। এখনও সামাজিক চিঠিপত্র লিখিতে, বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়বর্গকে কুশল সংবাদ জানাইতে পত্রের প্রথমে আমাদের অনেকে "My Dear Amares" বা "My Dear Brother" এমন কি "My Dear Father" ও লিখিয়া থাকেন। ইঁহারা অনেকেই যে ইংরেজীর আদব কায়দার প্রতি অতিরিক্ত অনুরক্তি বশতঃ বা জাতীয়তার প্রতি মমতাবর্জ্জিত হইয়া এইরূপ করেন, তাহা নহে। অধিকাংশ স্থলেই "জাতীয় ভাষা" বা "স্বাদেশিকতা" সম্পর্কে ইঁহাদের ঘোর ঔদাসীন্যই ইহার জন্য দায়ী।

অনেক সময় লক্ষ্য করিয়াছি, যিনি বাংলা ভাষার সঙ্গে সর্ব্বদা সম্বন্ধ রাখেন, মাতৃভাষার চর্চ্চা করেন, বাঙ্গালীর সঙ্গেই দিবসের চব্বিশ ঘণ্টা উদযাপন করেন এবং সাহিত্য চর্চ্চার একটু হয়ত গর্ব্বানুভবও করেন, তিনিও "হাসপাতাল" না লিখিয়া "হস্পিটাল" লিখিয়া থাকেন। এবং প্রয়োজন বুঝিয়া, যেখানে "হাসপাতাল"কে "দাতব্য ঔষধালয়" বা "আরোগ্যশালা" বলিয়া বুঝান যায়, সেইখানে তাহা প্রচলিত করিতে ঔদাস্য প্রকাশ করেন। "নার্শ" না লিখিয়া ধাত্রী লিখিতে পারেন না। গল্প লিখিতে লিখিতে "গেট" লিখিয়া বসেন। খোলা "ফটকে" বন্ধুর গোলাপ বাগানে ঢুকিতে পারেন না।

তেমনি মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া উদ্যান বাটিকায় (Park) বেড়াইতে বেড়াইতে বন্ধুর সাক্ষাৎ ঘটিয়া গেলে "গুড্ মর্ণিং" বা "গুড্ ইভনিং" বলিয়া বন্ধুবরকে সম্ভাষিত করা হয়। আমার নিজের পক্ষে, [illegible] আমি অত্যন্ত অপমাননা মনে করি। "গুড্ মর্ণিং……" বলিয়া যদি বন্ধু আমাকে একগাছি গোলাপ মালাও উপহার দেন, তাহা গ্রহণে আমার লজ্জা ও ঘৃণা হয়।

আমার বিশ্বাস, "গুড্ মর্ণিং" বা "গুড্ ইভনিং"এর বাংলা অনুবাদ "সুপ্রভাত" এবং "সুসন্ধ্যা"ও সুন্দর হয় না। এইরূপ হুবহু অনুবাদে কোথায় যেন কষ্ট-কল্পনার সৌন্দর্য্য-হীনতা থাকিয়া যায়। বাঙ্গালীর সমাজে যাহা চিরন্তন চলিয়া আসিয়াছে "সুপ্রভাত" বা "সুসন্ধ্যা" না বলিয়া সোজাসুজি "নমস্কার" বলিয়া অঞ্জলিবদ্ধ সম্ভাষণ কেমন হয়? বাঙ্গালী মনের সহজ অভিব্যক্তি "নমস্কার" সব সময়েই চলিতে পারে। সকাল, দুপুর এবং সন্ধ্যা, রাত্র সব অবস্থায়ই "নমস্কারে"র ব্যবহারে কাহারও অরুচির হেতু থাকিতে পারে কি?

কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও, বাঙ্গালী সমাজের শিক্ষিতদের মধ্যে চিঠির বাহিরে ঠিকানা লিখিতে নামের পূর্ব্বে "মিষ্টার" (Mr.) এর খুব প্রচলন দেখা গিয়াছিল। অনেকে "বাবু" (Babu)ও ব্যবহার করিতেন। এখন সেই স্থানে "শ্রীযুত" (Sj) আসিয়া ঠাঁই পাইয়াছে।

স্বদেশী ভাষার চর্চ্চা ও আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃই ইহার প্রতি আমাদের মমতা ও অনুরক্তি বাড়িবে। বঙ্কিম-যুগের তুলনায় রবীন্দ্র যুগই ইহার সাক্ষ্য। যে দেশে যে যুগে রবীন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের মত প্রতিভা বাংলা ভাষাকে তার লালিত্য, মাধুর্য্য ও ভাব-বিকাশের অপূর্ব্ব ভঙ্গিমা-সৌন্দর্য্যে বিশ্বে গৌরব ও সম্মানের আসন দিতে পারিয়াছে, সামাজিক জীবনের ছোটখাট সম্বোধন বা শিষ্টভাষণগুলিতে সেই যুগে যদি আমরা বিদেশী ভাষা পরিহার করিতে না পারি, তবে, তার চেয়ে গ্লানি ও অপমানের আর কিছু থাকিতে পারে কি?

প্রাণের ভাবকে সহজ অভিব্যক্তি দিতে মাতৃভাষার আশ্রয় গ্রহণ যত স্বাভাবিক, বিদেশী ভাষার মধ্যবর্ত্তিতায় তাহা করা ততখানি অস্বাভাবিক। অনেকের আপত্তি উঠিবে, এমন অনেক শব্দ আছে, যাহা বাংলা ভাষায় নাই এবং ইংরাজীতে আছে। শব্দ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য হইলেও অনেক সময় বিদেশী ভাষার আশ্রয় গ্রহণে আপত্তি থাকা নেহাৎ গোঁড়ামি।

এইখানে আমাদের বক্তব্য, সমাজে যে সব সম্বোধন বা শিষ্টভাষণের সচরাচর প্রচলন একান্ত আবশ্যক, তেমন জিনিষের জন্য বিদেশীর ভাষাকে সমাদর দিতে আমাদের উৎসাহ থাকা নিতান্ত লজ্জাকর। আমরা আমাদের গৃহে বা সমাজে, আমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে মনের ভাব প্রকাশ করিতে যাইয়া যদি বিদেশী ভাষার আশ্রয় গ্রহণে অনন্যোপায় হই, তদ্দারা শুধু আত্মাবমাননা নয়, মাতৃভাষার দারিদ্র্যের গ্লানিই চিত্তকে বিদ্ধ করে। বরং, আমরা সকলে মিলিয়া মাতৃভাষার দুয়ারে যাইয়া মা'র কাছে হাত পাতিয়া নূতন শব্দ ভিক্ষা চাহিব, বাণীর বর-পুত্রদিগকে মায়ের শব্দ দারিদ্র্যের দুঃখ ঘুচাইতে অনুরোধ জানাইব—তথাপি বিদেশী ভাষাকে নিজ সমাজের হৃদয়ে আনিয়া শ্রদ্ধার আসন দিয়া মাতৃভাষার বন্ধ্যাত্বের প্রমাণ জগৎকে জানাইব না।

২। বানান সমস্যা

শ্রীকামাখ্যাচরণ বসু

গত ফাল্গুনের বিচিত্রায় আমি লিখেছিলাম যে চলতি ভাষার লেখকেরা সমস্ত বানান উচ্চারণ অনুযায়ী লেখেন না, অথচ কতকগুলি বানান তাঁরা উচ্চারণ অনুযায়ী লেখেন। যে বানানগুলি তাঁরা উচ্চারণ অনুযায়ী লেখেন সেগুলি তাঁদের মতে ভাষাতত্ত্বের নিয়ম অনুযায়ী বানান। আমাদের মতেও তাই। কিন্তু যে বানানগুলি তাঁরা উচ্চারণ অনুযায়ী লেখেন না সে গুলিরও তো ভাষাতত্ত্বের নিয়ম অনুযায়ী উচ্চারণ বদলেছে। কেননা ভাষাতত্ত্ব মানে ভাষা বদলে যাবার সাধারণ নিয়ম। তবে তাঁরা কেন সমস্ত বানান উচ্চারণ অনুযায়ী লেখেন না? কেন লেখেন না তার উত্তর আমি যা ভাবতে পেরেছি বলছি। কিন্তু তার আগে, সমস্ত বানান উচ্চারণ অনুযায়ী হলে কি রকম হয় তার একটা উদাহরণ দেখুন:—ভাইতে বাংলার ধাতু **গভো** পয়ারেই তাঁদের **গ্রোন্থো রচোনা** কোরে গ্যাছেন। **সংস্কিতো অনোভিজ্ঞো লেখোকেরাও** গ্রোন্থাদি রচোনায় পয়ারেরই আশ্রয় নিতেন। এই **রকোম** ছন্দে লেখবার **কারোন** পয়ার পোড়তে **মিশ্‌টি** (মিষ্টি), **শহোজে মুকোস্তো** হয়। সহজ আর মিষ্টি এই কথা দুট ছাড়া আর সমস্ত কথাগুলি, যে গুলির বড় অক্ষরে ছাপা তৎসম শব্দ এবং তাদের শুদ্ধ সংস্কৃত রূপই চল্‌তি ভাষায় প্রচলিত আছে। উক্ত বানানগুলি এবং এই রকম বেশির ভাগ তৎসম শব্দের বানান বিকৃত করা হয় না। এই রকম উচ্চারণ অনুযায়ী বানান না লেখার মানেই হচ্ছে তাঁরা ব্যাকরণের ভয় করেন।

আচ্ছা, আমরা ব্যাকরণকে ভয় করি কেন? ব্যাকরণকে আমি মানি বলেই ব্যাকরণের সম্মান। কিন্তু আমরা কেন ব্যাকরণকে মানি? নিশ্চয়ই ভাষার মঙ্গলের জন্যে। ব্যাকরণ আমাদের ভাষার কি মঙ্গল বিধান করে, না ভাষাকে একই অবস্থায় অনেক দিন ধরে বাঁচিয়ে রাখে। সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ সংস্কৃত ভাষাকে বহুদিন বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিল বলেইতো সে ভাষার এত ঐশ্বর্য্য। এই সে দিনও জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' লিখেছেন; কিন্তু পৈশাচী ভাষা 'বৃহৎকথামঞ্জরী'তেই শেষ হল কেন? ভাষা নিত্য বদলে যেতে চায়, পঞ্চাশ বছর সময়ের মধ্যে কটা প্রতিভাবান লেখকের জন্ম হয়—যাঁদের দানে ভাষা ঐশ্বর্য্যশালী হয়ে উঠ্‌তে পারে? সেই জন্যে ব্যাকরণের সাহায্যে ভাষাতত্ত্বের অর্থাৎ প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে লড়াই করে ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। সুতরাং আমরা দেখছি যে ভাষার মঙ্গলের জন্যেই আমরা ব্যাকরণ মানি। চলতি ভাষার লেখকেরা সমস্ত বানান উচ্চারণ অনুযায়ী করেন না এই জন্যে যে উচ্চারণ অনুযায়ী বানান করলে ভাষার রূপ এত বদলে যায় যে সে ভাষার সঙ্গে আগের ভাষার সামঞ্জস্য ঘুচে যায়; অন্য কথায় বলতে গেলে ব্যাকরণের নিয়ম অমান্য করা হয়। কেননা ব্যাকরণ প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে লড়াই করে ভাষাকে নিত্য বদলে যেতে দেয় না।

লড়াই হলেই হার জিত আছে—অন্তত একটা সন্ধিও হয়। তেমনি বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্বের যুদ্ধে উভয় পক্ষেই অনেকবার হার জিত হয়ে গেছে। এখন এসেছে সন্ধির সময়। বাংলা ভাষার ইতিহাস আলোচনা করলেই আমরা ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্বের দ্বন্দ্বের অনেক কথা জানতে পারি। কত পুঁথিতে বিবাহকে—বিভা, মূর্খকে—মুরুখ্‌ লিখিত হয়েছে। তার পরে আবার এই সমস্ত কথার সংস্কৃত রূপ জোর করে প্রচলন করা হয়েছে। তারপর আলালী ভাষা হয়েছে, বিদ্যাসাগরী হয়েছে, রামকৃষ্ণমিশনের ভাষা হয়েছে, সর্ব্বশেষে প্রমথবাবু চলতি ভাষার বিশিষ্ট রূপ দিয়েছেন। এখন আমরা প্রমথবাবুর ভাষা সাহিত্যে চালাতে চাচ্ছি। প্রমথবাবুর ভাষার চেয়েও সরল ভাষা সৃষ্টি করতে যেয়েই হয়েছে গণ্ডগোল। কিন্তু আমরা যদি প্রমথবাবুর ভাষাকে বদলাতে না দিয়ে এই ভাষাকে ব্যাকরণ-শাসিত ভাষা করে ফেলতে পারি তা হলে এই ভাষাই অনেক দিন বেঁচে থাকতে পারবে।

উচ্চারণ অনুযায়ী বানান করতে আরম্ভ করলে অন্তত পঞ্চাশ, ষাট, বছর পরে প্রমথবাবুর ভাষা যে কত বদলে যাবে এখন থেকেই অনুমান করা যায়। এখনই চলতি ভাষায় যে সব কথা চল্‌ছে তার চেয়েও কথ্য ভাষায় কথা বদলে গেছে। যেমন—দূর—ধুর, তাহলে—তাইলে, গিছ্‌লে—গিছ্‌লিশ্‌ ইত্যাদি। সুতরাং আমার মনে হয় আর ভাষা বদলান বন্ধ করা ভালো।

এইবারে আর একটা কথা মনে পড়ছে যে, সমস্ত বানান উচ্চারণ অনুযায়ী না করলে, উচ্চারণ হবে এক আর বানান হবে আর। এ কি ভালো? সত্যিই এ ব্যাপারটা ভালো নয়। আবার উচ্চারণ অনুযায়ী বানান করলেও ভালো হবে না (কেন তা আগে বলতে চেষ্টা করেছি)। তা ছাড়া আরো একটা কারণ আছে। বাংলা দেশে প্রাদেশিক ভাষাগুলির কোনোটার সঙ্গে কোনোটার মিল নেই—বিশেষ পশ্চিম বঙ্গের সঙ্গে পূর্ব্ব বঙ্গের। সেই জন্যে একটি সাধারণ সাহিত্যের ভাষা দরকার। কিন্তু বাংলা ভাষাকে যদি নিত্য বদলে যাবার স্বাধীনতা দেওয়া হয় তাহলে সুদূর ভবিষ্যতে হয়ত প্রত্যেক প্রদেশে একটি করে নোতুন ভাষা সৃষ্টি হবে। যদি দুটি অপ্রিয় বস্তু আমাদের সামনে আসে এবং তাদের মধ্যে যে কোনোটিকে গ্রহণ করতে আমরা বাধ্য হই তাহলে যেটি অন্যটির অপেক্ষা প্রিয় সেইটি নেওয়াই কি ভালো নয়? এ রকম গণ্ডগোল ইংরিজি ফরাশি ভাষাতেও আছে।

তবে কতকগুলি কথা আছে যাদের বানান উচ্চারণ অনুযায়ী হওয়াই ভালো। যেমন (১) বিদেশী শব্দের বানান। (২) যে বানানগুলি উচ্চারণ অনুযায়ী না করলে মানে বুঝতে অসুবিধে হয় (৩) যেগুলির উচ্চারণ অনুযায়ী বানান না করলে চলে না। (৪) আর যে শব্দগুলি ভাষাতত্ত্বের নিয়ম অনুসারে বিকৃত হয়ে অধুনিক বাংলায় চলছে। এইবারে কতকগুলি উদাহরণ নেওয়া যাক্। (১) :—'গেলাশ' গেলাস কথাটাকে অনেকে 'স' দিয়ে বানান করেন অথচ 'গেলাশ' কথাটার 'শ'এর মতো উচ্চারণ হয়। বিদেশী শব্দের বানান

বিচিত্রা
বৈশাখ ১৩৪০

গঙ্গাপ্রণাম

শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়
কুমার শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ রায়ের সৌজন্যে

উচ্চারণ অনুযায়ী হওয়াই ভালো মনে হয়। যথা সময়ে বিদেশী কথার বানান পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করব। (২) মত (opinion) মত' (like)। 'মত' যখন opinion মানে হবে তখন 'মত' বানান হয় কিন্তু যখন like হবে তখন 'মত' লিখলে মাঝে মাঝে মানে বুঝতে অসুবিধে হয়।

এই জন্যে যখন like মানে হবে তখন 'মতো' লিখলেই ভালো হয়। এই রকম আরো অনেক কথা আছে যেমন 'ভাল' (কপাল), ভালো (good), কোনো, কোন্, কখনো, কখন্ ইত্যাদি। (৩) যেমন পুরোণ। এই কথাটিকে দিয় আমরা 'পুর'ণ' লিখতাম তাহলে 'পুরোণ' উচ্চারণ করতাম না। সুতরাং 'পুরোণ' লেখাই ভালো। (৭) গোরু শব্দটির বানান আমরা অনেকে 'গরু' এই রকম করি। গরু শব্দটি কিন্তু এসেছে 'গো-রূপ' শব্দ থেকে, 'গৌ' বা 'গাভী' থেকে নয়। তাই যদি হয়, তাহলে 'গরু' বানান করবার কোন মানেই থাকে না—বানান করা উচিৎ গোরু। এই রকম শব্দ যেমন নোতুন, (শম্ভুবাবু এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন) বুড়ো, ভালো, বড়ো।

৩। ছালাম
কাজি সেরাজুল হক্

"ছালাম কী ভাবে কাহাকে দিতে হবে।"

মাঘের বিচিত্রায় মওলবী এ, কে, এস, সতীবদ্দীন সৈয়দী ছাহেব ছালাম ব্যবহার বিধি আলোচনা করে নতুন আলোক সম্পাত করেছেন। মওলবী ছাহেব যে পথ বাৎলিয়েছেন আমি তা গ্রহণ করতে অক্ষমতা জানাচ্ছি। কোন প্রকৃত মুছলমানই লেখককে সমর্থন করবেন না বলেই আমার বিশ্বাস। তবে দিন-কালের যা অবস্থা এক শ্রেণীর সমর্থকের অভাব হয়ত নাও হতে পারে। নতুন একটা কিছু করা চাই—সঙ্গে একটু নামও—তাই লেখকের এই প্রয়াস। মওলবী ছাহেব ছালামের নতুন রূপ দিতে চান, কিন্তু ইছলামের এমন মহান চির-মুক্ত সার্বজনীন সংযোগ সেতুকে সংস্কার করতে হাত দেওয়ার আগে তাঁর মতটা কতটুকু যুক্তিযুক্ত পরখ করা উচিত ছিল নাকি? তিনি যে মত প্রকাশ করেছেন ইছলাম তা সমর্থন করে কিনা—বোধ হয় মওলবী ছাহেব বিবেচনা করা দরকার মনে করেন নি। ইছলামের বরখেলাপ (বিরুদ্ধী) যা, মুছলমান কোন মতেই তা গ্রহণ করতে পারে না। মুছলমানকে সরিয়ত মাফিক চলতে হবে, তাতে যদি যুগ-প্রগতির সঙ্গে খাপ না খায়, তা হলে নাচার। যুগধর্ম্মের দোহাই দিয়ে—যেহেতু পুরাতন, সেহেতু বর্জ্জন কর, এ ধারণা মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। "এক ঘেয়েমী" লেখককে পীড়া দেয় তাই তিনি নতুনের মোহে সম্মোহিত হয়েছেন। পুরাতন হলে ও একঘেয়ে হলে সব কিছুকে সংস্কার অথবা বর্জ্জন করা যায় না। অনেক জিনিষ আছে, ভাল লাগায়, না লাগায় কিছু এসে যায় না।

লেখক রায় দিয়েছেন "ছালাম সমবয়স্ক ও অপরিচিত মুছলমানকেই দিতে হইবে।" মওলবী ছাহেব দু'টো সর্ত্ত আরোপ করেছেন একটাকে বাদ দিলে অন্যটা অকেজো। লেখকের মতে সমবয়স্ক হলেই তিনি ছালাম পাবেন না যদি না তিনি অপরিচিত হন। একমাত্র অপরিচিত হলেই চলবে না, সমবয়স্ক হওয়া চাই তবেই তিনি ছালাম পাবেন। বলুন দেখি কী বিষম সমস্যা। অথচ ইছলামের আদেশ—দুইজন মুছলমান পরিচিত হন অথবা অপরিচিত হন, সমবয়স্ক হন কিম্বা বয়সে অসমানই হন দেখা হলেই অন্য কথা বলার আগে প্রথমেই—আচ্ছালামো আলায় কুম্ বলে ছালাম জানাবেন। সে জন্য কেউ কোন অপরিণত বয়স্ক বালককে উক্ত প্রকার ছালাম দিতে বলে না। এ ব্যবস্থা শুধু পুরুষের জন্য—মেয়েদের জন্য নয়। কোন অপরিচিত লোককে বয়স জিজ্ঞেস করা অভদ্রতা নয় কি? বয়সের পরীক্ষা নিয়ে যদি ছালাম করতে হয় তা হলে কত বেশী সময়ের দরকার। অথচ আজিকার যুগ চলার যুগ, সবাই সংক্ষেপে কাজ সেরে নিতে চান। এমন কি সময় সংক্ষেপের জন্য, অল্প সময়ে বেশী শিখবার জন্য, ছাপাখানার খরচ কমাতে সুনীতিবাবু বাংলা ভাষা Roman letterএ লিখতে চান। মওলবী ছাহেবের রায় মত কাজ করতে গেলে চির-মুক্ত ছালামকে সংকীর্ণ গণ্ডির

বাঁধনে এঁটে দিলে ছালাম রুদ্ধশ্বাসে মারা যাবে, ইছলামের এমন সুন্দর universal brother-hoodএর নিদর্শনকে কোন মতেই সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ করা যায় না। ছালাম গোড়মুখী হ'ক এমন ইচ্ছা কেউ মনে পোষণ করতে পারে না। পরিচিত মুছলমানকে ছালাম করা যাবে না—এ লেখকের উদ্ভট কল্পনা। আধুনিক আলোকপ্রাপ্ত মুছলমানেরা নামাজ রোজাই করেন ভারি, তা আবার ছালাম। মুছলমানে মুছলমানে দেখা হলে প্রথমেই ছালাম করতে হয় ও বিদায়ের বেলা সর্ব্বশেষে ছালাম করতে হয়। "বিদায় লইতে হইলে প্রথমেই" কথার অর্থ বুঝা গেলনা। আমরা বাঙ্গালী মুছলমানেরা পূজনীয় নিকটআত্মীয়-আত্মীয়াদের পায়ের কাছে বসে মাথা সোজা রেখে পায় হাত দিয়ে সেই হাতে চুমু খাই ও বুকে, কপালে ঠেকাই। ইহাকেই কদম-বুছি (কদম বুচি নয়) বলা হয়। শুধু বাঙ্গালী মুছলমানের মধ্যে এই রেওয়াজ প্রচলিত। বাংলা ছেড়ে মুছলিম অধ্যুসিত যে যায়গায়ই আমরা যাই না কেন সর্ব্বত্রই কনিষ্ঠগণ বয়োঃজ্যেষ্ঠ নিকট আত্মীয়-আত্মীয়াদের হস্তচুম্বন করে থাকে। এমন কি বাপকেও তারা কদমবুছি করে না। নিকট আত্মীয় দুর আত্মীয় অথবা অনাত্মীয় প্রত্যেককেই তারা ছালাম করে থাকে। বাপকেও তারা ছালাম করে থাকে। সেজন্ম ছালামের মর্য্যাদা নষ্ট হয় না। লেখকের এ ভুল ধারণা।

লেখক বলেছেন "ছেলে বাপকে, কোনো প্রকারেই ছালাম দিতে পারিবে না। এই প্রকারে মাতা এবং অপর পূজনীয় ব্যক্তিকে কখনই ছালাম দেওয়া আমি অনুমোদন করিতে পারি না"। কোন বাঙ্গালী মুছলমানই বাপকে ছালাম করে না সে কথা স্বতঃসিদ্ধ,—তারা বাপকে কদমবুছি করে, মাকেও তাই করে। মেয়েদেরকে ছালাম করা আশ্চর্য্য বটে! মওলবী ছাহেব তাঁর কোন নিকট আত্মীয়াকে কখনও ছালাম করেন কি? তাঁর এ বিষয় কোন অভিজ্ঞতা আছে কিনা জানিনা—আমাদের তেমন কোন অভিজ্ঞতা নাই সরল ভাবে স্বীকার করছি। কোন দেশেই পুরুষ মেয়েদেরকে ছালাম করে না এমনকি মেয়েদের নিজেদের মধ্যেও ছালাম প্রচলিত নয়।

আদাব পূর্ব্ব বাংলার কতকাংশে মাত্র প্রচলিত। অন্য কোথাও আদাব প্রচলিত নাই। আমরা কতক বাঙ্গালী মুছলমান ছালাম ও আদাবের মধ্যে সীমারেখা টেনেছি। আদাবকে আমরা যতটা পছন্দ করি ছালামকে আমরা তত মর্য্যাদা দেই না। যদি কেউ আমাদের আদাব না দিয়ে ছালাম দেয় তা হলে আমরা চটে যাই। এতদ্বারা আমরা সরিয়ত বিরুদ্ধ কাজ করে থাকি। লেখকও এই কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হয়ে ভুল পথে চলেছেন, আদাবের কোন অর্থ নাই—দিলে পুণ্যও নাই না দিলে পাপও নাই। আদাব একবারে মাত্র একজনকেই দেওয়া হয়। কিন্তু ছালাম একবারে একজন, একাধিকজনকে দেওয়া যায়। যদি কোনস্থানে একজন হ'ক, শতজন হ'ক, অথবা যতজনই হ'ক, একবার মাত্র আছালামো আলায়কুম্ বললে, সকলকেই ছালাম দেওয়া হল। একজন ছালাম করলে উপস্থিত প্রত্যেকেই ছালাম গ্রহণ করে প্রতি-ছালাম করে থাকেন। ছালাম দেওয়া ও গ্রহণ করা উভয়ই পুণ্যের কাজ। ছালামের পুণ্য ফলে আমরা একবার পুণ্যের পরিবর্ত্তে বহুগুণ পুণ্য পেয়ে থাকি। দেখুন কী সুন্দর ব্যবস্থা। অথচ লেখক ইহাকেই বিধি-নিষেধে বেঁধে দিতে চান। লেখকের এ প্রয়াস ব্যর্থ হতে বাধ্য। এই ছালাম মুছলমান ব্যতীত অন্য কারুর উপর প্রযোজ্য হতে পারে না। ছালামের মধ্যবর্ত্তীতায় আমরা এক মুছলমানের অন্য এক মুছলমানের সঙ্গে সংযোগ রেখে থাকি। ইছলামের সৌন্দর্য্যের অন্যান্য দিক বাদ দিলেও একমাত্র ছালামই নিখিল মুছলিমকে একই সূত্রে গ্রথিত রেখেছে।

৪। সাহিত্যে প্রাদেশিকতা

শ্রীরাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ত্তমান বাঙলা সাহিত্যে যে প্রাদেশিকতার ধুয়া উঠেছে তা যদি দিন দিন বেড়ে চল্‌তে থাকে তাহলে বাস্তবিকই সাহিত্য ক্রমে সঙ্কীর্ণ হয়ে আসবে। সাহিত্যকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে দরকার তার সার্ব্বজনীনত্ব। সাহিত্যের এই

সার্ব্বজনীনত্ব প্রাদেশিকতার মধ্যে দিয়ে সম্ভব নয়। যে সাহিত্য বা ভাষা একদেশের বা প্রদেশের প্রচলিত ভাষায় রচিত তা অপর দেশে বা প্রদেশে প্রসার লাভ কর্‌তে পারে না, আর তা না পার্‌লে সে ভাষা কখনও জনপ্রিয় হ'তে ত পারেই না, উপরন্তু এই ভাষাতে বৈশিষ্ট্য থাকার দরুণ বিভিন্ন প্রদেশের লোকদের মধ্যে যে পার্থক্য থেকে যায় তা'তে দেশের জাতীয়তা গড়ে উঠতে পারে না এবং এই জাতীয়তা না থাক্‌লে দেশের উন্নতিও সম্ভবপর নয়।

বাঙলাভাষা বাঙলাদেশে ত চলেই তা ছাড়া বিহারের সাঁওতাল পরগণায়, মানভূম ও পূর্ণিয়ায় এবং আসামের গোয়ালপাড়া ও কাছাড়েও প্রচলিত। তাই দেখতে পাওয়া যায় যে বাঙলা ভাষার মধ্যে বাঙলাদেশের বিভিন্ন অংশের যথা পূর্ব্ববঙ্গ, পশ্চিম বঙ্গ ইত্যাদি, আসামের গোয়ালপাড়া এবং সাঁওতাল পরগণা ইত্যাদি স্থানের বৈশিষ্ট্য প্রবেশ করেছে। উদাহরণ স্বরূপ বাঙলার সাধুভাষা বিভিন্ন প্রদেশের হাতে প'ড়ে কি রকম রূপান্তরিত হ'য়েছে তা'র একটা নিদর্শন দেওয়া হইল।

সাধু ভাষা :—তৎকালে তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র ক্ষেত্রে ছিল। সে যেমন বাটীর নিকটবর্ত্তী হইল অমনি নৃত্যগীত বাদ্যাদির ধ্বনি শুনিতে পাইল; এবং একজন ভৃত্যকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—এই সকল ব্যাপারের অর্থ কি? ভৃত্য উত্তর করিল,—আপনার ভ্রাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন ও আপনার পিতা তাঁহাকে নিরাপদে সুস্থ শরীরে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া আনন্দোৎসব করিতেছেন।

চলিত ভাষা :—(কলিকাতা, ভাগীরথী তীর)—তখন তার বড় ছেলে ক্ষেতে ছিল, সে এসে যেই বাড়ীর কাছাকাছি হ'লো ওম্‌নি নাচ গান বাজনার শব্দ শুন্‌তে পেলে। তখন সে চাকরকে ডেকে জিজ্ঞেস ক'র্‌লে—এ সব হ'চ্ছে কেন? চাকর ব'ল্‌লে—আপনার ভাই ফিরে এসেছেন, আর আপনার বাবা তাঁকে ভালোয় ভালোয় ফিরে পেয়েছেন ব'লে নাচগান খাওয়ান দাওয়ান কর্‌ছেন।

ঢাকা মাণিকগঞ্জের মৌখিক ভাষা :—তার বর ছাওয়াল তখন মাঠে আছিলো। সে বারীর দিগে যতই আইগাইবার লাইগ্‌লো ততই বাজনা আর নাচ্ শুইন্‌বার লাইগ্‌লো। তারপর একজন চাকরেরে ডাইকা জিগ্‌গাসা কৈল্লো—ইয়ার মানে কি? সে কৈল, তোমার বাই আইচে, তারে বা'লে বা'লে পাইয়া তোমার বাপে এক খাওয়া দিচেন।

শ্রীহট্ট :—তখন তার বর পুয়া ক্ষেতে ছিল। সে বাড়ীর নিকট আইলে নাচ গাওনার শব্দ হুন্‌ল। সে একজন চাকরেরে ডাকিয়া জিঘাইল এ হকল কিয়র? সে তাগরে কহিল্ তুমার বাই বাড়ীৎ আইছে, তাতে তুমার বাপ বড় খানি দিছল, কেননা তারে সুস্থ অবস্থায় পাইছন।

এখন বাঙলা সাহিত্যের বা ভাষার সার্ব্বজনীনত্ব লাভ্ করতে হলে উপরিউক্ত কোন্ প্রদেশের ভাষার প্রাধান্য দেওয়া যাবে বা কোনটীকে Standard বলে ধরা যাবে সেইটাই হচ্ছে প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর দেবার আগেই ব'লে রাখা দরকার যে, প্রত্যেক দেশেই মানুষের চাল-চলন, আদব কায়দা, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক শিক্ষা ও কর্ম্মের কেন্দ্র হ'চ্ছে সে দেশের রাজধানী। আর এই রাজধানীতে বিভিন্ন প্রদেশের লোক সমবেত হয়ে ভাবের আদান প্রদান করতে গিয়ে তাদের মধ্যে একটা ভাষার সৃষ্টি হয় যেটা কিনা সর্ব্বদেশের মধ্যেই বোধগম্য। সুতরাং রাজধানীর ভাষাই তখন Standard হ'য়ে দাঁড়ায়। এই রাজধানীর ভাষার মূলগত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে "সংক্ষেপ"। এখানকার লোকদের সময়ের মূল্য খুব বেশী তাই তারা যথাসম্ভব সংক্ষেপে তা'দের ভাব ব্যক্ত করতে চায়।

যা'হোক বাঙলা ভাষার বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় বাঙলাদেশের রাজধানী হচ্ছে কোল্‌কাতা, আর কোল্‌কাতা অঞ্চলের কথ্যভাষাই গত দেড়শ' বছর ধ'রে বাঙলা সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার ক'রে সমগ্র বাঙলার শিক্ষিত জনগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয়ে আস্‌ছে। কোল্‌কাতা নিবাসী ও কোলকাতা প্রবাসী বহু বাঙালী লেখক কোলকাতার সর্ব্বজন আদৃত এই চলিত ভাষায় সাহিত্য রচনা করছেন। এই কোলকাতা ভাষার নিদর্শন হ'চ্ছে

সাধুভাষার কলিকাতা—কোলকাতা
" উত্তরপাড়া—ওতোরপাড়া
" গোত্র —গোত্তোর

এই সব বিবেচনা ক'রে কোলকাতার ভাষাকেই বাঙলা ভাষায় চল্‌তি Standard ভাষা বলে ধ'রে নিতে পারা যায়। তাতে প্রাদেশিকতা রেশারেশীর হাত থেকেও রেহাই পাওয়া যেতে পারে।

স্বখাদ সলিলে

শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ

১

লেজার বুক্ দেরাজে বন্ধ করিয়া রাখিয়া হিরণ্ময় জানালার কাছে ডেক্ চেয়ারটা টানিয়া বসিল।

চৈত্র মাস। দিবসের উত্তাপ তাপমান যন্ত্রের দুরূহ স্থানে উঠিয়াছে। বাতাস বহিতেছে আগুনের হল্কার মত। বাহিরে অস্পষ্ট জ্যোৎস্না দেখা দিয়াছে। পল্লবে প্রচ্ছন্ন তরু শাখায় অদৃশ্য থাকিয়া একটা পাপিয়া পিউ পিউ করিয়া ডাকিয়া উঠিতেছে।

হিরণ্ময় পকেট হইতে সিগার-কেস্ বাহির করিয়া একটা সিগার ধরাইয়া ফুঁকিতে আরম্ভ করিল।

বছর দুই হইল সে ব্যাঙ্কে চাকরী করিতেছে। মাইনে মন্দ নয়। শরতের নির্ম্মল নীলাকাশের মত মন তাহার নিরুদ্বেগ, প্রসন্নতাময়। জীবনে না আছে কোনো উপদ্রব না আছে কোনো দুঃশঙ্কা।

পল্লী প্রত্যন্তবর্ত্তী নদীর মত ওর জীবনের স্রোত চলিয়াছে বন্ধুরতা বর্জ্জিত সমতলের ঋজু পথ দিয়া স্বচ্ছন্দ-গতিতে ও অবলীলাক্রমে।

কাঁধের উপর বোঝাও কিছু ছিল না। দায় বহিতে হইত শুধু এক বিধবা মায়ের।

সুস্থ সবল দেহ—স্ফূর্ত্তি ভরা মন, কাজে প্রবল উৎসাহ—দিন কাটে সুখে ও সন্তোষে, পৃথিবীর দিকে চাহিয়া দেখে হর্ষভরা চোখে।

সকাল হইতে চলে কাজের হিড়িক। সন্ধ্যার পর অখণ্ড অবকাশ। লেজার বুকের সূক্ষ্ম অঙ্কজাল হইতে আজ সে খুব সহজে মাথা গলাইয়া বাহির হইয়াছে। প্রভাতের কনকাঞ্চিত রৌদ্রের মত তাহার মনে খুসীর আমেজ লাগিয়াছে।

…হিরণ্ময় পা দোলাইতে দোলাইতে বাড়ীর কথা ভাবে। মা লিখিয়াছেন বিবাহের কথা। পাত্রী দেখিয়া তাঁহার পছন্দ হইয়াছে, হিরণ্ময় যদি কোনোক্রমে দিন পনেরর ছুটী লইয়া বাড়ী আসে তবে শুভকার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন হইতে পারে। মেয়ে সুন্দরী, বাপের পয়সা আছে, দিবে থোবে ভাল।

মেয়ে সুন্দরী—এই একটুখানি আভাসে ওর মনের চিত্রপটে সুচারুশ্রী কমনীয় মুখ এক কমল-নয়নার ছবি ফুটিয়া ওঠে। তিলোত্তমার মত জগতের সকল সৌন্দর্য্য চয়ন করিয়া সে রূপময়ী হইয়া ওঠে।

ঠোঁটের কোণে একটুখানি হাসি ফোটে শেষে। মায়ের চোখে সে সুন্দরী। কিন্তু মায়ের সৌন্দর্য্যের মান যদি তাহার মনের মানের সঙ্গে না মেলে। রং ফর্সা হইলেই ত আর সৌন্দর্য্যের একশেষ হইল না। যদি বিনোদদা'র বউর মত তার চোখ গোল গোল ভাঁটার মত হয়, কিম্বা ঘোষালদের সরির মত আঁকসীর মত নাক হয়, নয়ত ও পাড়ার বিনোদিনীর মত হাড়গিলে হয়? একে একে ওর চেনা অনেক মেয়ের কথা মনে হয়, কিন্তু কাহারও চেহারা তাহার পছন্দ হয় না। কাঁচা পটুয়ার মত মনে মনে পট আঁকে আর মোছে।

মা হয়ত কনে দেখিতে বলিবেন। ওটা প্রস্তাবে যত সহজ কার্য্যতঃ তত সহজ কি! বর সাজিয়া কন্যা মনোনয়ন করিতে যাওয়াটা স্রেফ্ আহাম্মকী। ঘর ভর্ত্তি লোকের কৌতূহলী দৃষ্টির মাঝখানে চোখ তুলিয়া তাকানো দুষ্কর, তায় আবার পরখ করিয়া দেখা!

হিরণ্ময়ের চিন্তায় বাধা পড়িল। বাহির হইতে রুক্ষ গলায় কে ডাকিল, বাড়ী আছেন কি?

গলাটা হরেকৃষ্ণ পোদ্দারের।

হরেকৃষ্ণ ডাকিবার সঙ্গে সঙ্গে দরজায় ঘা দিল।

হিরণ্ময় উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল। ঘরের ভিতর

আসিয়া হরেকৃষ্ণ বলিল, গিয়েছিনু বারুণী স্নানে। ফিরতি পথে ভাবলুম একবার তাগাদা দিয়ে যাই। আমার টাকাটা কবে দেবেন? এবারে কিন্তু শুধু সুদের টাকায় হচ্ছে না, আসলের অর্দ্ধেক দিতে হবে। আমার মেয়ের বিয়ে ঠিক্ করেছি। আটশ টাকার খতখানা এবারে শোধ করে দিতে হচ্ছে।

হরেকৃষ্ণ লোকটা কিছু রুক্ষ মেজাজের। কথাবার্ত্তা কাঠ:খোট্টা ধরণের, হাসে সে ক্বচিৎ; কথায় না কথায় মুখ খিঁচায়। ললাটে তাহার ভ্রুকুটির রেখা পড়িয়াছে লাঙ্গলের ফালের মত গভীর হইয়া। মানুষটি রোগা, লম্বা, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, টাকপড়া মাথা, মিট্‌মিটে চোখ। গ্রামে ওর মত ধনী নাই। মস্ত গহনার কারবার। কিন্তু কাপড় পরে হাঁটুর ওপর, গায় তালি দেওয়া জামা। ছাতিটায় ফুটার অন্ত নাই।

নাম-করা কৃপণ। গুঁতি ভর্ত্তি টাকা লোহার সিন্ধুকে ওঠে, বাজারের কড়ি হাত দিয়া গলে না ছেলে মেয়ের পরণে ছেঁড়া কাপড়। বউএর মোটা শাখায় অলঙ্কৃত হাতখানি হলুদে কালীতে মাটীতে মাখা। সে হাতের বিরাম নাই কখনো। হরেকৃষ্ণ কিছুর দিকেই চাহিয়া দেখে না তাহার চোখ শুধু লোহার সিন্ধুকটার ওপরে। তাহার ভিতরকার খালি জায়গাটা যখন ভরিয়া ওঠে তখন তাহার বুকও ভরিয়া ওঠে।

টাকা লাগায় চড়া সুদে। কিন্তু হিরণ্ময়ের মাকে সে টাকা ধার দিয়েছিল একটু কম হারে। একবার তাহার একটি ছেলেকে হিরণ্ময়ের মা টোট্‌কা ঔষধ দিয়া রক্তামাশয় হইতে বাঁচাইয়াছিলেন—স্ত্রীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে সুদের বাড়তি টাকাটা তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল সেই কারণে।

কিন্তু কাজটা হরেকৃষ্ণর মনঃপূত হয় নাই, অপ্রসন্ন মুখে পত্নীকে বলিয়াছিল, বনে জঙ্গলের একটা শেকড়—ও কি কব্‌রেজদের হীরে মুক্তো সোনা ভস্ম—যে ওর অত দাম? কিন্তু পত্নী তা শোনে নাই। হিরণ্ময়ের মায়ের কাছ হইতে চড়তি হারে সুদ আদায় করিলে সে গলায় ফাঁসী দিয়া মরিবে এই বলিয়া শাসাইয়াছিল।

কিন্তু হরেকৃষ্ণ এই ক্ষতিটা ভুলিতে পারিত না, খাইতে শুইতে তাহা কাঁটার মত খচ্‌খচ্‌ করিয়া তাহার হৃৎপঞ্জরে বিদ্ধ হইত। টাকাটা হিরণ্ময়দের হাত হইতে উঠাইয়া লওয়ার জন্য সে বিধিমত চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু হিরণ্ময় টাকা দিয়া উঠিতে পারে নাই।

...আটশ টাকা হঠাৎ চাওয়ায় হিরণ্ময় রাগিয়া বলিল, তোমার সঙ্গে কথা রয়েছে—অল্প অল্প শোধ কর্ব্ব—এখন ফস্ করে বল্লেই হোল, আটশ ন'শ টাকা একবারে দিয়ে ফেল্‌তে! টাকা গাছে ফলে! টাকা দেব যখন আমার সুবিধে হবে।

...চোখ লাল করিয়া হরেকৃষ্ণ বলে, সুবিধে হলে দেবে? টাকা দেবার বেলা কার কবে সুবিধে হয়! ছ'মাসের মধ্যে টাকা দিয়ে দিবে বলেছিলে, দু' বছর ত ঘুরে গেল। একি জুচ্চুরি নয়? নিজের বেলা টাকা গাছে ফলে না আর আমার বেলা টাকাটা বাণের জলে ভেসে এয়েছিল? সওয়া শ' টাকা মাইনে পাও—এখন টাকা শুধ্‌তে তোমার ল্যাঠাটা কি? ধার করে যে টাকা দিতে পারে না তার অত নবাবীই বা কি জন্যে! তোমার মা—

হিরণ্ময় হুঙ্কার দিয়া ওঠে, খবরদার্ আমার মায়ের নাম মুখে এনো না। মুচ্‌ড়ে ঘাড় ভেঙ্গে দেব।

ভেংচাইয়া হরেকৃষ্ণ বলে, না মুখে আন্‌বে না! ঘুঘু দেখেছো ফাঁদ ত দেখোনি—আদালতে তোমার মাকে আমি দাঁড় করাচ্ছি তবে ছাড়ছি। দিচ্ছি গিয়ে এবার নালিশ করে—দেখি এবারে টাকা শোধ দাও কি না দাও। ভালমানুষি ক'রে সুদ অর্দ্ধেক ছেড়ে দিতেছি—কতগুলো করে টাকা আমার লোক্‌সানি যাচ্ছে সেদিকে কারুর হুঁস নেই। আজ টাকা তুলে কালই আমি শতকরা চার টাকা হিসাবে লাগাতে পারি। পড়েছি যত জোচ্চোরের পাল্লায়, যেমন মা ধড়িবাজ তেমনি ছেলে—আবার বলেন মুচ্‌ড়ে ঘাড় ভেঙ্গে দেব। সস্তায় ভাঙ্গে আর কি! দেখ না একবার হাত তুলে।

কিন্তু হরেকৃষ্ণের কথাটা শেষ হইল না। হিরণ্ময় তাহার উপর লাফাইয়া পড়িয়া টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া কষিয়া কানকপাটির উপর এক থাপ্পড় বসাইয়া দিল।

হরেকৃষ্ণ খিট্‌খিটে ও বদ্‌রাগী যতই হোক্, সাহস

তাহার একবিন্দুও ছিল না। সে ছিল নিভান্ত ভীতু ধরণের লোক। হিরণ্ময় টুঁটি চাপিয়া ধরিবামাত্র সে যে চোখ বুজিল আর চোখ খুলিল না।

গোটা কয়েক থাপ্পড় বসাইয়া দিয়া হিরণ্ময় হরেকৃষ্ণকে ছাড়িয়া দিল।

হরেকৃষ্ণ মাটিতে পড়িয়া রহিল, নড়িল না।

হিরণ্ময় চেয়ারে বসিয়া দন্তে দন্ত নিষ্পেষণ করিয়া বলিল, র‍্যাস্কেল, চেন না, কার সঙ্গে কথা কও। তোমার মত দশটা বুড়োকে আমি নিকেশ করে দিতে পারি—ঢং করে আর পড়ে থাক্‌তে হবে না,—বেরোও আমার বাড়ী থেকে উল্লুক।

কিন্তু হরেকৃষ্ণ নড়ে না।

হিরণ্ময় উঠিয়া আসিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিতেই বাতির আলোটা হরেকৃষ্ণের মুখের উপর পড়িল।

হিরণ্ময় সভয়ে তাহাকে ছাড়িয়া দিল। শিথিল একটা স্তূপের মত হরেকৃষ্ণ হিরণ্ময়ের পায়ের কাছে পড়িয়া রহিল।

ভয়ে হিরণ্ময় দুই হাত পিছাইয়া গেল, আবার আগাইয়া আসিয়া হেঁট হইয়া তাহার পায়ের কাছে পতিত পদার্থটার দিকে চাহিয়া রহিল।

পাঁচ মিনিট আগে এ যে ছিল, এখন যে এ সে নয়—সে সম্বন্ধে আর সংশয় মাত্র নাই।

হিরণ্ময় ঘামিতে লাগিল, জিহ্বা শুখাইয়া তালুতে লাগিয়া গেল। হাত পা অসাড় হইয়া আসিতে লাগিল।

বাহিরের দরজাটা বাতাসে একবারে ঝটকা মারিয়া বন্ধ হইয়া গেল। হিরণ্ময় শব্দে চমকিয়া উঠিয়া ক্ষিপ্রপদে আসিয়া কপাটে খিল আঁটিয়া দিল।

নীরব নিশীথ। বাতাসে তরুর মর্ম্মর নাই। দীর্ঘ-দেহ নারিকেলের ঝোপ্‌রা মাথা নিঃশব্দে দুলিতেছে। ঋজু-ছন্দ দেবদারু থাকিয়া থাকিয়া শিহরিয়া উঠিতেছে। আকাশে নক্ষত্র নীরবে চাহিয়া আছে। পথে লোক চলাচল নাই।

কিন্তু হিরণ্ময়ের মনে হইতে লাগিল, আকাশ বাতাস অন্তরীক্ষ পূর্ণ করিয়া লক্ষকণ্ঠের অট্টরোল যেন ক্রমশঃ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। কানে না শোনা সেই শব্দ যেন উচ্চ হইতে উচ্চ গ্রামে, উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধে, দিক্ হইতে দিগন্তরে প্রসৃত পরিব্যাপ্ত হইতেছে। অন্ধকারে অলক্ষ্যে অশ্রুত সেই শব্দ যেন সমুদ্র তরঙ্গের মত স্ফীত হইয়া উঠিতেছে; হিরণ্ময় উৎকর্ণ হইয়া শোনে।

ফিরিয়া আসিয়া আবার ঘরের মাঝখানকার স্তূপটার দিকে চাহিয়া নিষ্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

বাহির দরজায় কে একজন ঘা দেয়; নাম ধরিয়া ডাকে—হীরু বাড়ী আছিস্?

হিরণ্ময়ের অসাড়তা এক নিমেষে ছুটিয়া যায়। বিছানা হইতে চাদর সুজনী টান্ মারিয়া তুলিয়া স্তূপটাকে একদিকে টানিয়া নিয়া চাপা দেয়। ব্র্যাকেট হইতে পাড়িয়া গোটা দুই কোট ও ধুতি তাহার উপর ফেলে।

...বাহিরে যে ডাকিতেছিল, সে কণ্ঠের স্বর ও দরজায় আঘাতের মাত্রা চড়াইয়া হাঁকে, ওরে হীরু, বাড়ী আছিস্ না কি?

হিরণ্ময় গিয়া কপাট খুলিয়া দেয়।

যে আসিয়াছিল সে ওদের গ্রামের ছেলে, নাম ধীরাজ। গ্রাম সুবাদে কি একটা সম্পর্কও আছে। বয়সে হিরণ্ময়েরই সমবয়সী। ঘরে ঢুকিয়া ধীরাজ বলে, ঘুমিয়েছিলি এই সন্ধ্যাবেলা? চেঁচিয়ে গলা চিরে যাওয়ার যোগাড়! কুম্ভকর্ণ না কি!

হিরণ্ময় আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলে, একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বটে, তা বটে।

...ডেকচেয়ারটাতে বসিয়া পড়িয়া ধীরাজ বলে, অসুখ কোরেছে তোর? চেহারাটা কেমন শুখ্‌নো দেখাচ্ছে যেন!

উৎকণ্ঠিত হিরণ্ময় বলে, হ্যাঁ, তা অসুখ কোরেছে বৈকি! অসুখ ছাড়া কি মানুষ আছে!

ধীরাজ বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া বলে, বাইজোভ্, কীরে তোর হয়েছে কি? রাতারাতি চুপ্‌সে গেলি কি করে? কি রকম এলো পাতাড়ি কথা কইছিস্! কি হয়েছে?

হিরণ্ময়ের মুখে কথা আটকাইয়া যায়, তবু তাহাকে কথা বলিতে হয়। কি হইয়াছে তাড়াতাড়ি একথার উত্তরে আর কিছু ভাবিয়া না পাইয়া বলে, কলিক পেইন্।

কলিক পেইন তোর কবে থেকে? কস্মিন্‌কালেও ত তোর কোনো ব্যামো হয়েছে বলে শুনিনি। ডাক্তার দেখিয়েছিস্?

হ্যাঁ, তা দেখাব বই কি।

দেখাবি বই কি! গর্দ্দভ! বেদনায় মুখ নীল হয়ে গেছে তবু ঘাড় গুঁজে ঘরে পড়ে আছিস্? চল্ আমার সঙ্গে ভুবন লাহিড়ীর কাছে।

আজ থাক্, কাল যাব।

আজ তোর কাজটা কি? চল্ আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব। খুড়ীমা যদি শোনেন তোর অসুখ—আর আমি তোকে অমনি ফেলে চলে গেছি—তাহ'লে আমাকে কখনো মাপ কর্ব্বেন না। ওঠ্।

এই রাত্তিরে—

ভারী ত রাত্; নটাও তো বাজেনি!

নারায়ণগঞ্জ ঢাকাও নয় কল্‌কাতাও নয়, এখানে এই অনেক রাত্।

উঠিয়া দাঁড়াইয়া ধীরাজ বলে, রাখ্ তোর ওসব বাজে কথা। চল্ আমার সঙ্গে।

কিন্তু,—সত্যি কথা বল্‌তে কি, যাওয়া এখন অসম্ভব। বেদনাটা বড় একিউট্ লাগ্‌ছে। শুয়ে পড়্ তবে, আমি ভুবন লাহিড়ীকে নিয়ে আসছি।

ভুবন লাহিড়ীকে আন্‌বি! জানিস্ ওঁর ফী কত! আমার হাতে অত টাকা নেই। বেদনার একটা পাউডার আমার কাছে আছে ওতেই কাজ দেবে।

খেয়েছিস্?

হিরণ্ময়ের একটু বেশী রাতে খাওয়া অভ্যাস। রাত্রিতে ভাত খায় না, রুটি খায়। ওর চাকর ওর খাবার ঢাকা দিয়া রাখিয়া চলিয়া যায়। রোজগার মত আজও পাশের ঘরে খাবার ঢাকা আছে। হিরণ্ময় ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, হুঁ।

ডাক্তার তুই যদি না দেখাস্, আমি আর কি কর্ত্তে পারি, কিন্তু ডাক্তার দেখানো তোর খুবই উচিত। তোর চেহারা ভয়ানক খারাপ দেখাচ্ছে, বলিতে বলিতে ধীরাজের চক্ষু পড়ে কোণার প্রকাণ্ড কাপড়ের স্তূপটার ওপর। সবিস্ময়ে বলে, হীরু—তোর একলার অত কাপড়?

আম্‌তা আম্‌তা করিয়া হিরণ্ময় বলে, এবার হয়ে গেছে কি রকম করে।

হয়ে গেছে কি রকম করে! অবাক্ করে দিলি যে, এত কাপড় মানুষ পর্‌তে পারে? লাট বেলাট হয়ে উঠ্‌ছিস্ দেখি! কিঞ্চিৎ হিতোপদেশ দিচ্ছি শোন্—সওয়াশ টাকা সওয়া লাখ টাকা নয়—হিসেব করে চলিস্। যাক্ ওকথা, এদিকে ত্থাখ্, আমাদের বাড়ী এত সব স্নানযাত্রী এসেছে যে বাড়ীতে পা রাখ্‌বার জায়গাটুক নেই। তোর এখানে ঘুমুব বলে কিন্তু আমি এসেছি।

হিরণ্ময়ের মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত নিরতিশয় শঙ্কার একটা বিদ্যুৎ খেলিয়া যায়। ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলে, আমার এখানে ত শোওয়া চল্‌বে না তোর। আমারও ত অতিথদের জায়গা দিতে হবে।

অতিথ্ এসেছে নাকি?

আসেনি এখনো, আস্‌বার কথা আছে।

তা এলই বা, আমি তোর খাবার ঘরেই না হয় শুয়ে থাক্‌ব।

কিন্তু মেয়েরা তাতে অসুবিধা মনে কর্ব্বে।

মেয়েরা আসবে না কি?

হুঁ।

কারা?

সে তুই চিন্‌বি নে।

আচ্ছা, আমি বাইরে বারান্দায় শুচ্ছি।

না, সে হয় না।

এবারে ধীরাজ উষ্ণ হইয়া ওঠে, বলে স্নানে যায় যে মেয়েরা তারা আর এত অস্পৃশ্যাস্পর্শাগিরি ফলায় না! সোজা কথা বল্ যে তোর মত নেই।

হিরণ্ময় মিনতির মত করিয়া বলে, আজ জায়গা নেই তাই বল্‌ছি, তা না হ'লে তুই বরাবরই এখানে শো না, তাতে আর আমার আপত্তি কি, আমি ত একলাই থাকি।

কিঞ্চিৎ উষ্মার সহিত ধীরাজ উঠিয়া দাড়াইয়া বলে, আজ ঠেকেছিলাম, তাই এসেছিলাম; নইলে কে আর এমন পরের দুয়ারে ধন্না দিতে যায়! যাক্, চল্লাম।

ধীরাজ বাহির হইয়া পড়িল। পথে চলিতে চলিতে

হিরণ্ময়ের অদ্ভুত আচরণের কথা যতই তাহার মনে পড়িতে লাগিল, ততই তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। হিরণ্ময়ের সঙ্গে চেনা ত তাহার নূতন নয়, ছোট হইতে তাহাকে সে দেখিয়া আসিতেছে—এ রকম বুওরিশ তাহাকে সে কখনও দেখে নাই। ওর বাড়ী সে থাকিতে ত আসে নাই—একটা রাত কাটাইতে আসিয়াছিল,—ও কিছুতেই কি তাহাতে রাজি হইল!

কলিক্ ফলিক্ সব ফাঁকি! আদতে হয়ত ওর কাছে কাহারও আসিবার কথা নয়ত কাহারও কাছে ওর যাওয়ার কথা—আমি থাক্‌লে সে গোপন অভিসারে সমূহ ব্যাঘাত উপস্থিত হয়—কাজেই নানা বাহানায় তাহা কাটাইয়া দিল। ডুবিয়া ডুবিয়া জল খাইলে একাদশীর বাপেও জানে না কি না! মুখে মর‍্যালিটির বক্তৃতা আর ভিতরে ভিতরে এই! কি হিপোক্রিট্! সোজা ব্যাপারে সোজা কথা কয় মানুষ। যেখানে ঢাকাঢুকি চাপাচুপি সেখানেই পাপ। মা এ দিকে বিবাহের সম্বন্ধ করিতেছেন, আর উনি তলে তলে এই সব চালাইতেছেন। লক্ষ্মীছাড়া হতভাগা কোথাকার!

ধীরাজ হিরণ্ময়কে শুধু গালাগালি দিয়াই ক্ষান্ত হইল না, ভবিষ্যতে হিরণ্ময়ের সঙ্গে আর বাক্যালাপ করিবে না, মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করিল।

বাহিরের কপাট বন্ধ করিয়া হিরণ্ময় আসিয়া মৃতের কাছে দাঁড়ায়। কাপড় জামা উঠাইয়া র‍্যাকেট্-এ টাঙ্গাইয়া রাখে, চাদর সুজনী বিছানার উপর ফেলে।

ঘড়ির দিকে একবার চাহিয়া দেখে কতটা রাত্রি হইয়াছে।

গোষ্ঠবিহারী স্নানে গিয়াছে ভাবিয়া একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, আবার পরক্ষণেই যাহা তাহার করিতে হইবে তাহা ভাবিয়া শিহরিয়া ওঠে।

ঢং করিয়া দশটা বাজে। হিরণ্ময় চম্‌কাইয়া ওঠে, সময় যায় হু হু করিয়া—এক মুহূর্ত্তও আর দেরী করা চলে না। বারোটা—একটা—দুটো—তিনটে—চারটে। পাঁচটা বাজিলেই হয় ত গোষ্ঠবিহারী দেখা দিবে।

ধীরাজকে ঠেকাইয়াছে বলিয়া ত গোষ্ঠবিহারীকে ঠেকানো যাইবে না। দরজা খুলিয়াই সে ঝাঁটা হাতে লইবে, বাড়ীর একপ্রান্ত হইতে আরেক প্রান্ত এক তিল বাকি রাখিবে না। পর্য্যন্ত তক্তাপোষের তলাও না।

হিরণ্ময় ঘরের জানালাগুলি সন্তর্পণে বন্ধ করিয়া দরজার শিকল তুলিয়া দিয়া রান্নাঘরে গেল।

বাড়ীটা ছোট হইলেও বাড়ীর সম্মুখে ও পিছনে জমিন্ ছিল অনেকটা। গোষ্ঠবিহারী পিছনের জমিনটা কোপাইয়া শাক-সব্জী লাগাইয়াছিল। এ জন্য সে একটা কোদালও কিনিয়া ফেলিয়াছিল। কোদালটা কিনিতে হিরণ্ময় বড় মত দেয় নাই, জোর করিয়াই গোষ্ঠবিহারী কিনিয়াছিল। আজ এই নিদারুণ প্রয়োজনের সময় বহু বিতর্কে ক্রীত সেই কোদালটার কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল।

বাড়ীটার চারিদিকে নীচু দেয়াল। সম্মুখে দরজার দুপাশে গোটা ছয়েক কামিনী ফুলের গাছের সারি। ডাইনে গোটা দুই আম ও বাঁয়ে একটা কাঁঠাল গাছ। বাহিরে সরু কাঁচা রাস্তা, তার নীচে খানিকটা জলা। স্থানটি নিভৃত ও লোকবিরল।

লণ্ঠন কমাইয়া ঘরের ভিতর রাখিয়া দিয়া হিরণ্ময় অর্দ্ধস্ফুট জ্যোৎস্নালোকে ডানদিকের জমিটার মাঝামাঝি জায়গাটা কোপাইতে লাগিল।

মাথার উপর সপ্তর্ষিমণ্ডল দূরে অশ্বত্থ কৃষ্ণচূড়ার পিছনে হেলিয়া পড়িল, কৃষ্ণপক্ষের আধখানা চাঁদ দিক্‌প্রান্তে অবতরণ করিল। দিবসের উত্তাপে তপ্তবাতাস শীতল হইয়া উঠিল।

হিরণ্ময় তবু মাটি কাটে। ঘামে জামা কাপড় ভিজিয়া যায়, গায় মাথায় মাটি লাগে, কোমর পিঠ কন্ কন্ করে, হিরণ্ময় তবু চাঙ্গারি ভরিয়া মাটি উঠাইয়া ফেলিতে থাকে।

আমের ঘন পল্লব-নীড় হইতে উন্নিদ্র একটা কোকিল কুহু কুহু করিয়া ডাকিয়া ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে আরও কতগুলি পাখী সাড়া দেয়। হিরণ্ময় কোদাল রাখিয়া ঘরের ভিতর যায়।

আলো বাড়াইয়া দিয়া হরেকৃষ্ণের কোটের পকেট হাতড়াইয়া যাহা কিছু আছে বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখে। অঙ্গ স্পর্শ করিতেই ওর সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া ওঠে, একবার ছাড়িয়া দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, তাহার পর চোখ বুজিয়া পা দুইটা ধরিয়া উঠায়।

বারান্দা পার হইয়া, সিঁড়ি দিয়া ছেঁচড়াইয়া টানিয়া নিয়া গর্ত্তের ভিতর ফেলে।

উবুড় হইয়া একবার চাহিয়া দেখে, মাটির কত নীচে হরেকৃষ্ণ শয়ন করিল।

মনে মনে হিসাব করিয়া বলে,—পুরো তিন হাত, ব্যস্। তাহার পর মাটি চাপা দেয়।

মাটি মুছিয়া কোদাল যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া হিরণ্ময় শোবার ঘরে ফিরিয়া গেল।

বাতিটা একবার চড়াইয়া দিয়া আবার তৎক্ষণাৎ কমাইয়া দিল। কাছাকাছি যদিও কেহ থাকে না, দৈবাৎ কেহ পথেও ত চলিতে পারে। এত রাত্রিতে আলো জ্বলিতে দেখিলে মনে সন্দেহের সঞ্চার ত বিচিত্র নয়! রোঁদে ফিরিতে মহল্লার চৌকিদারটাই যদি আসে।

বাতি কমাইয়া দিয়া হিরণ্ময় সভয়ে ঘরের যে কোণটায় শবটা ছিল সেই দিকে তাকায়। একবার মনে হয় যে স্তূপটা ওখানে ছিল, তাহার চারিগুণ বড় একটা স্তূপে জায়গাটা ভরিয়া রহিয়াছে। একবার সেটা যেন নড়িয়া উঠিল, শাদা চাদরটার উপরে তামাটে রংএর টাক-পড়া একটা মাথা—উঁচু কপাল—ঝুলিয়া পড়া শাদা ভ্রুর নীচে কোটরগত দুইটা মেটে রংএর চোখ যেন—

হিরণ্ময় চক্ষু বুজিয়া দুর্গানাম জপে, জপিতে জপিতে রাত্রি ভোর হইয়া যায়, জবাকুসুমসঙ্কাশ ধান্তারি মহাদ্যুতি দিবাকর দেখা দেয়।

২

রাত্রির মায়া সূর্য্যালোকে মিলাইয়া গেল। অন্ধকারের সঙ্গে অন্ধকারের পার্শ্বচর বিভীষিকা আত্মগোপন করিল। হিরণ্ময় উঠিয়া কলের নীচে ঘণ্টাখানেক ধরিয়া স্নান করিল। তাহার পর এক গ্লাস সরবৎ ও গোটা কয়েক রসগোল্লা দিয়া জলযোগ করিয়া বাহির হইল।

গোষ্ঠবিহারী তখনও বাড়ী ফেরে নাই। যাত্রীদের সঙ্গে সেও স্নানে গিয়াছিল। আসিল যখন, তখন বেলা নয়টা বাজে। কোনোদিকে না চাহিয়া সাত তাড়াতাড়ি রান্না চড়াইয়া দিল। যাহোক্ ভাতেভাতও ত একটা নামাইয়া দেওয়া চাই। রান্না না হইলে বাবু যদিও কিছু বলিবেন না, তবু তাহার ত একটা বিবেচনা আছে। না বলিয়া স্নানে গিয়াছে—একটা অপরাধ ত সে করিয়া বসিয়াছেই,—তাহার উপর আরো একটা বাড়ানো কেন! এমন ভাল মানুষ—উঁচু কথা একটি মুখে নেই—হাজার ত্রুটিতে রাগ নেই—দয়ার শরীর—পিঁপ্ড়েটির ওপরও কত মায়া! এমন মানুষকে উপোসী রাখা অধর্ম্মের কাজ।

গোষ্ঠবিহারী ভাবে আর তাড়াতাড়ি উনানে ফুঁ পাড়ে। হাড়ির কালো গায়ের উপর দিয়া আগুনের দীপ্ত রক্তশিখা লক্ লক্ করিয়া ওঠে। টগ্‌বগ্ করিয়া ভাত ফুটিতে থাকে।

ইতিমধ্যে হিরণ্ময় এক গাড়ী মাটি ও জন দুই মজুর লইয়া আসে এবং রাত্রির বুজাইয়া দেওয়া গর্ত্তটার উপরে মাটি স্তূপ করিয়া রাখে।

গোষ্ঠবিহারী বাহিরে আসিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করে, কি কর্‌চেন এখানটায় এত মাটি দিয়ে?

হাসিবার চেষ্টা করিয়া হিরণ্ময় বলে, বাগান বাগান করে তুই মরিস্, এবারে দেখিস্ এমন ফুলের বাগান কর্ব্ব যে তোর একেবারে তাক্ লেগে যাবে। এখানটায় একটা পুষ্পবেদী বানাব—মানে, বুঝ্‌লি? গোল করে উঁচু করে একটা জায়গা কর্ব্বে, তার এক ধাপ নীচু করে আরেকটা চক্কর বাঁধবে, আরেক ধাপ নীচু করে আরেকটা চক্কর বাঁধবে। এর ওপর বসাব ফুলের টবের সারি। দোপাটি বেলা, জুঁই-চাপা কৃষ্ণকলি, মালতী, গোলাপ—সব।

গোষ্ঠবিহারী বর্ণনা শুনিয়াই অবাক্ হইয়া যায়। বাবুর এত বুদ্ধি! তাহার মাথায় কি কখনো এমন কথা গজাইত! সে পারে শুধু কুমড়া-লাউ-ঝিঙ্গা-ডাঁটার জঙ্গল বানাইতে। অমন বাহারদারী করিয়া বাহারী গাছ লাগানো কি তাহাদের চাষাভুষা লোকের কাজ!

তবু গোষ্ঠবিহারী বলে, বেদীই যদি গড়েন বাবু তবে কাঁচা মাটি দিয়ে করা কেন, মিস্ত্রী ডেকে শান বাঁধিয়ে কল্লে'ইত হোত! বলেন ত আজ বিকেলেই—

আরে না না এ শাণ ফাণের কর্ম্ম নয়। তাছাড়া পরের চাকৃরি—আজ এখানে আছি—কাল হয়ত চলে যাব বর্ম্মা মুলুকে, নয় কাছাড়, কিম্বা ছোটনাগপুর—কি দরকার আমার এত খরচে।

গোষ্ঠবিহারী খুসী হইয়া বলে, তা বটে, তা বটে। টি'কে থাক্‌তেই যদি না পারেন তবে মিছেমিছি কি জন্যে টাকা ঢাল্‌তে যাবেন।

দেখিতে দেখিতে বেদী গড়া হইয়া যায়। কয়েক রকমের ফুলের টব তাহার ধাপের উপর সারি দিয়া বসানো হয়। কলিকাতায় মর্শু'মি ফুলের জন্যে হিরণ্ময় চিঠিও লিখিয়া দেয়। সারাদিন সহর ঘুরিয়া টব ও চারা কেনে।

তারপর আসে রাত্রি। নীরব, নিঃসঙ্গ, নিশ্চেতন অন্ধকার। হিরণ্ময়ের মনের ভিতরে ধীরে ধীরে তাহা প্রসারিত হইতে থাকে।

কাজ সারিয়া গোষ্ঠবিহারী আসিয়া বলে, বাবু আমি চল্লুম তবে এখন।

হিরণ্ময় বলে, যা।

বলিয়াই অনুশোচনা করে, যাইতে না বলিয়া গোষ্ঠবিহারীকে থাকিতে বলিলে কি ক্ষতি হইত! কিন্তু কথাটা মুখ ফুটিয়া কিছুতেই বলিতে পারে না।

হিরণ্ময় বাহিরের কপাট বন্ধ করিয়া দিয়া আসে, বাতিটা চড়াইয়া ঘরের কোণটাতে রাখে, তাহার পর শুইয়া পড়ে।

হঠাৎ তাহার মনে পড়ে এই চাদরটাই সে গত রাত্রিতে—

হিরণ্ময় লাফাইয়া বিছানা ছাড়িয়া মাটিতে নামিয়া পড়ে। কম্পিত হস্তে মশারী উঠাইয়া সুজনি ও চাদর টান মারিয়া উঠাইয়া পাশের ঘরে নিয়া ফেলিয়া দেয়।

চক্ষু হইতে তন্দ্রা যায় ছুটিয়া। অকারণেই একবার ঘরের কোণটার দিকে তাকায়। টেবিলের কোণায় হাত রাখিয়া কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকে। একবার বাক্স খুলিয়া বিছানার চাদর খোঁজে, না পাইয়া ব্র্যাকেট হইতে ধুতি পাড়িয়া দোভাঁজ করিয়া বিছানায় পাতে। বাতিটায় গোটা দুই বই ঠেস্ দিয়া আলো আড়াল করে, তাহার পর শুইতে যায় কিন্তু শোওয়া হয় না দেশী কাপড়ের ভারী মশারীটা উঠাইতেই মনে হয় বিছানার মাঝখানে কুণ্ডলী পাকাইয়া কে যেন শুইয়া। জামার ভিতর দিয়া হাড়গুলি তাহার উঁচাইয়া রহিয়াছে, পা দুইটা পোড়া কাঠের মত, ঘাড় ভাঙ্গিয়া মাথাটা বুকের ভিতর ঢুকিয়া গিয়াছে, ধ্বসিয়া-পড়া মুখের ভিতর হইতে শাদা উঁচু দাঁত বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

মশারী ছাড়িয়া দিয়া হিরণ্ময় দশ হাত পিছাইয়া যায়। কপাল বাহিয়া ঘাম ঝরিতে থাকে। হাত পা যায় অবশ আড়ষ্ট হইয়া।

বাতির গায়ে ঠেস্ দেওয়া বই দুইটা উঠাইয়া নিয়া সভয়ে আবার বিছানার দিকে তাকায়।

নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। তাহার চারিদিকে ব্যাপ্ত গভীর গহন নীরবতার নিগূঢ় স্পন্দন আপনার হৃৎ-স্পন্দনে অনুভব করে।

এতটুকু শব্দ কোথাও নাই! গাছের ডালে একটা পাখী কিম্বা রাস্তায় একটা কুকুরও ডাকে না। রাত্রিবেলা যে হুলো বিড়ালটা প্রত্যহ রান্নাঘরের দাওয়ায় বিকট শব্দ করিয়া ডাকিতে থাকে,—আজ তাহারও কোনো সাড়া শব্দ নাই। দূরে অতি দূরে কচি ছেলের কান্না, মেঠো সুরে পথচারী কৃষকের মানভঞ্জনের গানের একটা কলি—একটা কাশি, একটু হাসি—চেতন প্রাণীর একটুকু কণ্ঠস্বর কোথাও নাই। হিরণ্ময় উৎকর্ণ হইয়া থাকে যদিই বা দৈবাৎ কিছু শোনা যায়, প্রতিদিনের তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর নিরতিশয় অবহেলার এই শব্দগুলি তাহার ঐকান্তিক প্রার্থনার ধন হইয়া উঠে।

ঘরের বাতাস গুরু হইয়া ওঠে। হিরণ্ময়ের মনে হয় যেন শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে, কপাট খুলিয়া বারান্দায় গিয়া দাঁড়ায়।

অমনি চোখে পড়ে তাহার স্বহস্ত-রচিত পুষ্পবেদীটা। কৃষ্ণপক্ষের বাঁকা-চাঁদ সবে মাত্র তখন জলার পারে মাঠের ও পারে তরুবীথির অন্তরালে দেখা দিয়াছে, আকাশের গায় জ্যোৎস্না লাগিয়াছে, মাটিতে অন্ধকার। সেই অন্ধকারে

উঁচু ঢিপির মত বেদীটা একটা প্রকাণ্ড পিণ্ডাকার দেখায়। তাহার চক্ষু ঢিপি ভেদ করিয়া ঢিপির তলাকার জিনিষটা সুস্পষ্ট দেখিতে পায়।

তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর আসিয়া হিরণ্ময় কপাট বন্ধ করিয়া দেয়। বিছানায় শোওয়া আর হয় না। টেবিলের উপর বাতি রাখিয়া ডেক্ চেয়ারটায় চক্ষু বুজিয়া বসে।

কিন্তু মানুষের ইন্দ্রিয় ত একটা নয়। দশেন্দ্রিয় দিয়া দশমুখে অনুভূতির ধারা চেতনার মূলে সমবেত হয়। একটা ইন্দ্রিয় বিফল হইলে অপর নয়টা হইয়া ওঠে অতি সচেতন।

হিরণ্ময়ের মনে হয় বাহিরে কে যেন হাঁটিতেছে, কাঁচা মাটির উপর তাহার পায়ের শব্দ ভাল করিয়া শোনা না গেলেও একটু যেন আভাস পাওয়া যাইতেছে। তাহার সম্মুখে খোলা ঐ জানালাটার কাছে কষ্টে চাপা টানিয়া ফেলা একটা নিঃশ্বাস কি ঐ শোনা গেল না?

—সঙ্গে সঙ্গে কাপড়ের একটু খস্‌খসিও?

হিরণ্ময় চোখ মেলিয়া চারিদিকে তাকায়। জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া পাইচারী করিতে থাকে। এক একবার নিজের পায়ের শব্দে নিজেই চমকিয়া ওঠে। ছায়াটার দিকে সন্দিগ্ধ সভয় দৃষ্টিপাত করে।

ছেলেবেলাকার মায়ের মুখে শোনা গল্প মনে পড়ে—রাম নামে ভূত পলায়। ওষ্ঠাগ্রে অবিশ্বাসের একটা হাসি দেখা দেয়। সেই পত্নীবর্জ্জনকারী রাম—কলেজে পড়িবার সময় হাজারোবার যাহার চরিত্র-বিশ্লেষণ করিয়াছে, নিষ্ঠুর অবিবেচক বলিয়া গালি পাড়িয়াছে—সেই রামচন্দ্র—তাহার নামে ভূত পলায়?

আবার মনে হয় না-ই যদি কিছু হইবে তবে সেকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত গোটা ভারতবর্ষের লোক ঐ নাম কীর্ত্তন করিতেছে কেন?

লাখো লোকে যদি ঐ নামে জন্মে জন্মে ত্রাণ পাইয়া থাকে তবে ক্ষীণ বিশ্বাস সে না হয় নাম লইয়া আজিকার রাত্রিটার জন্য ত্রাণ পাইবে!

আজিকার রাত্রি! তাহার পর? আজ হইতে যে ভবিষ্যৎ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল—অন্ধকার, অনুত্তরণীয়, অনন্তকালে বিস্তীর্ণমান—অপরিজ্ঞাত বিভীষিকাময় যে ভবিষ্যৎ, কোন্ নক্ষত্রের জ্যোতিতে তাহা স্বচ্ছ সুগম হইয়া উঠিবে।

৩

হিরণ্ময় ভাবিয়া দেখিল শান্তি বা স্বাচ্ছন্দ্য লাভের একটি মাত্র উপায় তাহার আছে। সে উপায় হইতেছে বাড়ীটা বিক্রী করিয়া দেওয়া নয় ভাড়া দেওয়া।

কিন্তু প্রস্তাবটা যত সহজ, কাজটা তত সহজ নয়। বাড়ী তাহার নয়, বাড়ী তাহার মায়ের। বধূ যখন সংসারের কর্ত্রী হইবেন, তখন যদি মা-ছেলেতে বনি-বনাত না হইয়া ওঠে, সেই ভয়ে পিতা জীবদ্দশায় বাড়ীটা মায়ের নামে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। মৃতের দেওয়া সম্পদ্ মা মুখের কথায় ছাড়িয়া দিবেন কি?

দ্বিতীয়তঃ ছাড়িয়া যদি দেন ও—অন্যে কিনিলে বা ভাড়া লইলে বেদীর তলাকার জিনিস একদিন অতর্কিতে উপরেও উঠিয়া আসিতে পারে।

যে বাড়ী লইবে পুষ্পবেদী সাজাইয়া রাখিবার মত সুরুচি ও সৌন্দর্য্যবোধ তাহার নাও থাকিতে পারে। হয়ত তাহারা ওখানটায় কুড়িখানেক মানকচু লাগাইবে, নয়ত—ধর—একটা কুয়োই খুঁদিয়া বসিবে।

নাঃ—এ হয় না। যে ভাবেই তাহার দিন কাটুক্ এ বাড়ী ছাড়িতে সে কিছুতেই পারিবে না। তাহার জীবন কাঠি মরণ কাঠি রহিয়াছে বেদীর তলাকার অচেতন স্তূপটার কঙ্কাল-মুষ্টিতে! উহাকে অতিক্রম করিয়া যাওয়ার তাহার সাধ্য নাই।

ঐ অচল বস্তুটা তাহার সচল জীবনের পশ্চাতে অহোরাত্র সন্তরণ করিয়া বেড়াইবে,—তাহার সকল কাজে সকল ভাবনায়—তাহার আমোদে উল্লাসে, সুখ সম্ভোগে—তাহার সকল প্রচেষ্টায় প্রশস্তিতে, অস্থিময় বিকটআস্য মেলিয়া পিছু পিছু ধাওয়া করিতে থাকিবে।

লোকে বলে বিন্দু সিন্ধুতে মিলায়। তাহার ভাগ্য গুণে এক বিন্দু দুর্দ্দৈব তাহার জীবন পারাবার শোষণ করিয়া নিল। অসীম সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ ভবিষ্যৎ কাল,

তাহার নিষ্কলঙ্ক বর্ত্তমান ও অতীত সহ—কুৎসিৎ দর্শন একটি নিমেষের ভিতর তলাইয়া গেল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা গোষ্ঠবিহারীকে ডাকিয়া হিরণ্ময় কহিল, গোষ্ঠ, তুমি না হয় বাইরে না-ই শুতে গেলে। বড় বৃষ্টির সময় রাত বিরাতে কখন দুর্য্যোগ করে বসে— এখন থেকে বাড়ীতেই শোও।

গোষ্ঠবিহারী বিদেশী লোক হইলে কি হয়, হিরণ্ময়ের উপর ওর অনুরাগ ছিল অসাধারণ। তাহার জন্য খাটিত সে মনের আনন্দে, ব্যাগার শোধ দিতে নয়। যত্ন করিয়া রাঁধিয়া বাড়িয়া খাওয়াইয়া সে কেবল তাহার পাতে প্রসাদ পাইয়াই পরিতৃপ্ত হইত না, সঙ্গে সঙ্গে চিত্ত-প্রসাদ ও লাভ করিত অনেকখানি।

হিরণ্ময়ের অনুরোধে গোষ্ঠ রজনীর স্বাধীনতার মায়া ত্যাগ করিয়া বাসায় রহিয়া গেল।

প্রভাতের আলোকের সঙ্গে রজনীর বিভীষিকা দূর হইয়া যায়। জন কোলাহল-মুখরিত পথে হাঁটিতে হাঁটিতে হিরণ্ময়ের ভাবনা ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। হরেকৃষ্ণ ব্যাটা মরিয়াছে, বালাই গিয়াছে। থাকিলে পনেরো শ' টাকায় পঁচিশ শ' আদায় করিয়া ছাড়িত। উচিত ছিল ওর ব্রহ্মপুত্রে ডুবিয়া মরা—কলেরায় কতলোক মরিল,—এ ব্যাটা মরিতে জায়গা না পাইয়া তাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়িল।

তাহার অপরাধটা কী! সে ত তাহাকে মারিবার জন্য ওৎ পাতিয়া বসিয়া ছিল না! হরেকৃষ্ণ যখন টাকা চাহিয়াছিল তখনও ত সে জানিত না যে তাহার কাল শেষ হইয়াছে। নেহাৎ দৈব বশতঃই ঘটনাটা ঘটিল তবু লোকে তাহাকে নরহন্তা বলিতে ক্ষান্ত হইবে না, এবং আইনও তাহাকে দণ্ড হইতে অব্যাহতি দিবে না। খুনীর মত ফাঁসীকাঠে তাহাকে লটকাইয়া ছাড়িবে। কিন্তু মরা মানুষ কথা কয় না। হরেকৃষ্ণকে যেখানে সে রাখিয়াছে, সেখান হইতে সে আর বাহিরে নিশ্চয় মাথা বাড়াইতে পারিবে না। দুচার মাস খোঁজাখুঁজি চলিবে,—তাহার পরে সংসারের হালখাতার নূতন পাতা হইতে তাহার স্মৃতিরেখা বিবর্ণ হইয়া বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

বাড়ীতে ওর খোঁজাখুঁজি আরম্ভও হইয়াছে হয়ত। বৌটা ওর বিধবা হইল—এই যা দুঃখ। কিন্তু ও বাঁচিয়া থাকিতে ওর বৌর কি সুখটাই বা ছিল। যক্ষি ব্যাটা ভাল করিয়া খাইতে পরিতে ও দেয় নাই—খাটাইয়া হাড় কালি করিয়াছে শুধু। বড় বড় ছেলে মেয়েগুলিকে হাঁটুর উপর কাপড় পরাইয়া রাখিত—দু পয়সার পচা পুঁটি ভিন্ন জন্মে ও হতভাগা ঘরে কিছু নেয় নাই! এমন লোকের মরাই উচিত।

কিন্তু বাঙ্গালী মেয়েলোকের স্বভাব বড় খারাপ। স্বামী যত বড় অপদার্থ হৌক্ না কেন, তাহার জন্যই কাঁদিয়া জীবনপাত করিবে। হরেকৃষ্ণর বৌও বোধ হয় তাহার অপদার্থ স্বামীটার জন্য আকাশ ফাটাইয়া কাঁদিতেছে। সংসারে এক শ্রেণীর লোক আছে, হাজার ভাল করিলেও তাহাদের ভাল কিছুতেই হবে না, যে মন্দটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া তাহাদের জীবন কাটে, অন্ধকারে তাহার জন্যই তাহারা হাত্ড়াইয়া মরিতে থাকে। বেহারি মেয়ে হইলে বছর না ঘুরিতে ওর বৌ পত্যন্তর গ্রহণ করিয়া সকল যন্ত্রণা ঘুচাইতে পারিত। কিন্তু তাহা হইবার নয়, বাড়ী গেলেই ওর বৌ সিন্দুর চিহ্ন বর্জ্জিত সীমন্ত, ও থানকাপড়ে অনপনেয় তিরস্কারের মত তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইবে। যাক্, কিছুদিন এখন আর বাড়ী যাওয়া হইবে না। বিবাহের সম্বন্ধটা এখন কিছুদিনের জন্য না হয় মুলতুবীই থাক্। মনটা একটু সুস্থির হোক্। বিবাহ না হয় পরেই করা যাইবে।

রাত্রিতে বিছানায় যাহা দেখিয়াছিল দপ্ করিয়া একবার তাহা মনে পড়ে। কিন্তু তাহা এখন আর ভয় সঞ্চার করে না। নিজের দেখার উপর নিজেরই অবিশ্বাস আসে। ভাবে, ওটা হয়ত কোন কিছুর ছায়া—রাত্রি গভীর, বাড়ীটা নির্জ্জন, মন ছিল তাহার চিন্তাচ্ছন্ন— চোখের উপর মনের ওটা কারসাজি।

ভয়ের কারণ যখন তাহার কিছুই নাই তখন খামখাই সে যত রাজ্যে কথা ভাবিয়া মরে কেন? ঐটিই যত কুএর গোঁড়া। আজই হুইলার ষ্টল হইতে এড্গার ওয়ালেস, উড্হাউস্, প্রভৃতির খান্ কয়েক বই লইয়া

আসিবে। কল্পলোকের বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় কুশ্রী কুৎসিত বিকটাকার হরেকৃষ্ণ ছায়ার মতই মিলাইয়া যাইবে।

শীষ্ দিয়া গান গাহিতে গাহিতে হিরণ্ময় ষ্টেশনের দিকে চলিল।

৪

শুইতে শুইতে হিরণ্ময় বলে গোষ্ঠ, তুমি কোথায় শুতে যাও?

আজ্ঞে, মাসীর বাড়ী আছে কাছে, সেখেনে যাই। মেসোত ভাইয়া আছে—গল্প সল্প করি—নইলে আর কি!

আজ তোমার খারাপ লাগ্‌ছে বোধ হয়।

কি বলেন বাবু, খারাপ লাগ্‌ছে! রেতে না যাই দিনের বেলা যাব এখন। ঘুমুলে কে বা কার! রাজতক্ত আর ধূলিশয্যে এক তখন!

তোমার বাড়ী না কোথা?

আজ্ঞে, বীরতারা।

মা বাপ নেই?

বাপ নেই ছোট থেকেই, মাও গেছেন বছর চারি হয়েছে।

বউ, ছেলে পুলে?

আজ্ঞে, আছে দেশে।

মাসীর ছেলেরা কি করে?

আজ্ঞে, আমারই মত খাটে, খায়।

কটি ছেলে মেয়ে তোমার?

আজ্ঞে, এই তিনটি ছেলে দুটি মেয়ে।

পাঁচটি? তবে ত বেশ বড় সংসার তোমার!

আজ্ঞে।

জমি জমা আছে?

সামান্য। বড় ছেলেটি কাজে লেগেছে গত বার, ছোটটিকে এবার দেব ভাব্‌ছি।

কত বড় ছেলে?

আজ্ঞে, এই একটি দশ, একটি বারো। আমাদের শূদ্রের ঘরের ছেলে বাবু একবার টেনে মেনে এইটুকু কর্ত্তে পার্ল্লে'ই ভাতের ভাবনা থাকে না।

তোমার আর কেউ নেই?

আজ্ঞে না।

আচ্ছা গোষ্ঠ, তুমি ভূত দেখেছো?

হিরণ্ময়ের আলাপে গোষ্ঠ পুলকিত হইয়া উঠিতেছিল, এই প্রশ্নে তাল কাটিল, অপ্রসন্ন মনে কহিল, রাত্তির বেলা তেনাদের আলাপ না করাই ভাল।

হিরণ্ময় জিজ্ঞাসা করে, ডরাও নাকি?

আজ্ঞে, তেনাদের কে না ডরায়?

হিরণ্ময়ের আর কিছু জিজ্ঞাসা করা হয় না। শুইয়া পড়িয়া বাতাস করিতে করিতে বলে, উঃ! কি গরম!

গোষ্ঠ বলে, দিন্ পাখাটা আমার কাছে, আমি একটু বাতাস দি।

হিরণ্ময় পাখাটা গোষ্ঠের হাতে দেয়, একবার বলিতে গিয়া ফিরাইয়া লইয়া আবার বলে, বাতাস কর্চ্ছ যখন, তখন আমি যাবৎ না ঘুমোই, তাবৎ কর, ঘুমিয়ে গেলে তুমি চলে যেয়ো।

বিগত রাত্রির ক্লান্তি হিরণ্ময়ের চক্ষু ভরিয়া নামে, চোখের পাতা বুজিয়াই সে গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া যায়।

গোষ্ঠর বয়স ভারী, তায় ও বায়ুচড়া মানুষ,—নিতান্তই লঘুনিদ্র। ঘরে কিছু নড়িলে বা শব্দ করিলেই জাগিয়া বসে।

গভীর রাত্রিতে হঠাৎ বাহিরে ধুপ্ ধাপ্ শব্দে গোষ্ঠ ধড়্‌মড়িয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল। কিসের এ শব্দ! শব্দটা আসিতেছে কোন্ দিক্ হইতে? চোর সিঁদ কাটে না ত?

মশারি ঠেলিয়া বাহিরে আসিয়া গোষ্ঠ ঘরের চারিদিকে তাকায়। খোলা জানালা দিয়া বাগানটার দিকে স্বতঃই দৃষ্টি পড়ে।

ওকি ও? মানুষ, না আর কিছু?

গোষ্ঠ কলেজে পড়ে নাই, সুতরাং যথার্থ আর্ত্ত ভক্তের মত রামনাম জপিতে লাগিল।

অস্ফুট চন্দ্রালোকে দীর্ঘাকার মনুষ্যাকৃতি নত হইয়া কি একটা জিনিষ হাতে লইয়া তাহা দ্বারা সবেগে বেদীমূলে আঘাত করিল।

চাঁদের আলো যতই অস্ফুট থাক্, গোষ্ঠ দৃশ্যটা দেখিল অতি পরিস্ফুট রূপে।

গোষ্ঠ ভাবিয়া দেখিল যত কিছু ভূতের গল্প সে শুনিয়াছে,—তাহাতে এরকম সে কখনও শোনে নাই যে ভূত মাটি খোঁড়ে।

অথচ মানুষ হোক বা ভূত হোক্ মাটি যে সে খুঁড়িতেছে ইহা নিশ্চিত। কারণ মাটিতে কোপ মারার শব্দটা অভ্রান্ত।

ভূত এরকম এতক্ষণ ধরিয়া লাগিয়া পড়িয়া মানুষের চোখের সাম্‌নে কাজ করে না, দেখা দিয়া ছায়ার মত শূন্যে মিলাইয়া যায় এই সে চিরকাল শুনিয়া আসিতেছে। তাছাড়া ভূতের শরীর নাকি স্বচ্ছ—তাহার ভিতর দিয়া ও পিঠের জিনিস কাঁচের মত দেখিতে পাওয়া যায়।

এ ভূত হইতে পারে না, ভূত যদি নয় তবে এ কি?

নিঃসন্দেহ চোর।

চোর ফুলের টব ফেলিয়া দিয়া বেদী খুঁড়িতেছে, এও কি হয়?

কিন্তু যদি কোনো রকমে কোথাও শুনিয়া থাকে, এই জায়গায় মাটির তলে টাকার ঘড়া পোঁতা আছে—

মরুক্ গে, অতশত ভাবিয়া তাহার কি দরকার বাবুকে জাগাইলেই সব গোল এখনই মিটিয়া যাইবে ভাবিয়া গোষ্ঠ তাড়াতাড়ি লণ্ঠন জ্বালিয়া হিরণ্ময়কে উঠাইতে গেল।

কিন্তু হিরণ্ময় শয্যায় ত নাই-ই, ঘরে কোথাও নাই। গোষ্ঠের তখন নজর পড়িল খোলা দরজার দিকে। লণ্ঠন হাতে করিয়া গোষ্ঠ বাহিরে গেল।

বিস্ময়াভিভূত গোষ্ঠ হিরণ্ময়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিল, বাবু, বাবু, এ কচ্চেন কি!

হিরণ্ময় তবু শোনে না, কোদাল বাগাইয়া ধরিয়া আবার কোপ্ বসায়।

গোষ্ঠ কোদাল কাড়িয়া নিয়া ঝাঁকি দিয়া বলিল, বাবু, শোনেন, একবার চান্ ত দেখি।

স্বপ্নে সঞ্চরণের কথা গোষ্ঠ গল্প শুনিয়াছিল, কিন্তু কোনোদিন চক্ষে দেখে নাই। সে মনে করিত 'তেনারা' কেহ ভর করিলেই মানুষ এ রকম অচৈতন্যে চলিয়া বেড়ায়, কথা বলে। ঘুমের ঘোরে কোদাল ধরিয়া মাটি কোপানোর মত পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ না করিলে সে হয়ত বিশ্বাসই করিতে পারিত না।

দ্বিতীয়বারের ঝাঁকিতে হিরণ্ময়ের স্বপ্ন টুটিয়া গেল, জাগিয়া বিহ্বল দৃষ্টিতে গোষ্ঠের দিকে চাহিয়া হিরণ্ময় বলিল য়্যাঁ, য়্যাঁ, কি, কি?

আলোটা তুলিয়া ধরিয়া গোষ্ঠ বলে, এ করেছেন কি বাবু, টবগুলো সব ফেলে ভেঙ্গে চুরমার করেছেন,—অত খেটেখুটে বেদীটে তৈরী করালেন—তাও কুপিয়ে ছারখার কোরেছেন,—রাত দুপুরে উঠে এ কি কাণ্ড!

গোষ্ঠের কথা হিরণ্ময়ের হৃদয়ঙ্গম হয় না, নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে চাহিয়া থাকে।

অসীম খেদে মাথা নাড়িয়া গোষ্ঠ বলে, দেখুন দেখি কারখানাটা! অত যত্নের ফুলের গাছগুলো ছিন্নি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে একেবারে! কত দাম দিয়ে ঢাকা থেকে আন্‌লেন গিয়ে—আহা হা কী দশাটা হোল সব! ফুলন্ত গাছ সব! আর অমন চমৎকার বেদীটে—নিজেই কত সাধ করে গড়্‌লেন—আহা হা!

হিরণ্ময় তাহার চারিদিকে পতিত ভাঙ্গা টব ও ফুলের গাছগুলির দিকে তাকায়, ভাঙ্গা বেদীটার দিকেও একবার চাহিয়া দেখে। ওর মনের বিহ্বলতার ঘোর কাটে না, বলে, আমি,—আমি কি করেছি এই সব—কি যে বল গোষ্ঠ!

গোষ্ঠ বলে, বাবুর স্বপ্নে চলে বেড়ানো রোগ আছে বুঝি?

হিরণ্ময় চিন্তা করিয়া বলে, ছিল—ছোটবেলায়—ইদানীং এরকম আর হয়নি কখনো।

বড় খারাপ রোগ বাবু। বেহুঁশে এমন কাজ করা বড় ফ্যাসাদের কথা। চলুন এখন ঘরে যাই।

গোষ্ঠ হিরণ্ময়কে রান্নাঘরের উঠানে লইয়া গিয়া হাত পা ধোয়াইয়া দেয়।

বিছানায় বসিয়া হিরণ্ময় বলে,—রেস্তোরাঁয় চা খেতে গিয়ে গোটা চারি ডিমের ডেভিল্ খেয়েছিলুম,—পেট গরম হয়ে মাথাটা গরম হয়ে গেছে।

আজ্ঞে, এই গরমের মধ্যে ও সব গরম জিনিস আর খাবেন না। দেখুন ত দেখি কি কাণ্ডটা হোল, এমন

বেদীটে—এত মেহন্নৎ করে গড়্‌লেন, অমন সব ফুলের টবগুলো—আহা হা, সব গেল।

আক্ষেপ করিতে করিতে গোষ্ঠ পাশের ঘরে শুইতে যায়। হিরণ্ময় স্তব্ধ নিশ্চল হইয়া বিছানায় শুইয়া থাকে।

ভয় কিছু নাই—এ ভরসা তবে তাহার মিথ্যা? মাকড়সা ঘরের কোণে জাল বোনে, নির্ভয়ে নিরুদ্বিগ্ন মনে। হঠাৎ একদিন ঘরের মালিকের দৃষ্টি তাহার উপরে পড়ে—জালের সঙ্গে মাকড়সা এক নিমেষে লোপ পায়।

তাহার জীবনের এই বিষম মুহূর্ত্তটিকে সে তবে ফাঁকি দিতে পারে নাই, নিঃশব্দ চরণ পাতে সে তাহার দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে—একদিন হঠাৎ—

হিরণ্ময়ের বুকের রক্ত হিম হইয়া আসে, মাথা ঝিম্‌ ঝিম্‌ করিতে থাকে, জীবনের উপকূলে সুসজ্জিত তাহার আশার দীপালি এক মুহূর্ত্তে নিভিয়া যায়।

৫

পরের দিন হিরণ্ময় গোষ্ঠকে ছুটি দিল, এবং ঘরে তালা লাগাইয়া জ্যাঠতুত ভাই দিবাকরের বাড়ী গেল।

দিবাকর বয়সে হিরণ্ময়ের কিছু বড়। সেও কাজ করে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে। জন কয়েক সমবয়সী ছেলের সঙ্গে একটা বাসা ভাড়া করিয়া থাকে।

হিরণ্ময় যখন উপস্থিত হইল তখন তাসের আড্ডা বসিয়াছে, মহোৎসাহে ব্রিজ খেলা চলিতেছে। হিরণ্ময় বসিয়া খেলা দেখিতে লাগিল। দিবাকর বলিল হীরু, তুই খেল্‌, আমি উঠি।

দিবাকর খেলায় তত পটু নয়, তাহার 'ডামির' তাহার অর্ব্বাচীনতায় তখন ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবার বিশেষ দুর্লক্ষণ দেখা দিতেছিল, দিবাকরের উঠিবার প্রস্তাবে সে ভরসান্বিত হইয়া হিরণ্ময়ের দিকে চাহিল।

হিরণ্ময় ভাবিয়া দেখিল, কয়দিন সে রাত্রিতে ঘুমায় নাই, শ্রান্তিতে দেহ তাহার অবসন্ন। একবার ইহাদের দলে ভিড়িলে আজও তাহার নিদ্রার কোনো সম্ভাবনা থাকিবে না। তাড়াতাড়ি সে ব্যগ্রতা সহকারে বলিল, দিবুদা, আমায় আজ রেহাই দেও, শরীরটে আমার ভাল নেই, আমায় একটু শোবার জায়গা বরঞ্চ দাও, আমি একটু ঘুমিয়ে বাঁচি।

দিবু হাতের তাস গোছাইয়া ডাক দিতে দিতে বলিল, এখানে শুতে এলি—তোর বাড়ীতে কি অতিথ্‌ এসেছে?

মানুষের ত কালাকাল জ্ঞান নেই,—এত রাত্তিরে এল তারা—আমি যাই কোথা, এলুম তোমাদের এখানেই।

দিবু একবার প্রতিপক্ষ নবেন্দুর হাতের তাস দেখিবার চেষ্টা করিয়া বলে, সেদিন ধীরাজ এসেছিল, বল্লে, তুই অম্বলের ব্যামোতে বড্ড ভুগ্‌ছিস্‌? তোর আবার অম্বলের ব্যামো কবে হোল? এই না সেদিন এখানে পোলাও মাংস খেয়ে গেলি?

ব্যামোর চিন্তা সর্ব্বক্ষণ কর্লে কি আর মানুষ বাঁচে! ভাল যতক্ষণ আছি—ততক্ষণ ভাল থাকার প্লেজার নষ্ট করা কেন। এই ত তাস খেল্‌ছো—সকালে আফিস—কত কাজের কত তাড়া—তা কি আর ভাব্‌ছে এখন? যাক্‌, তোমরা খেল, আমি শুয়ে পড়ি।

হিরণ্ময় উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া পাশের ঘরে গিয়া দিবাকরের বিছানায় শুইয়া পড়ে।

রাত্রি শেষের দিক্‌ দিয়া হিরণ্ময় দিবাকরের ডাকে ও ধাক্কায় জাগিয়া যায়। দিবাকর বলে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কি চ্যাঁচাচ্ছিলি? আমি বলি ডাকাতেই বা ধর্‌লে বুঝি! স্বপ্নে এরকম চ্যাঁচানো তোর অভ্যাস আছে না কি?

হিরণ্ময় সবিস্ময়ে বলে, স্বপ্নে চেঁচিয়েছি? আমি? কখন?

দিবাকর ও নবেন্দু হাসে।

নবেন্দু বলে, চেঁচিয়েছো কি যেমন তেমন? রীতিমত ষাঁড়ের মতন চেঁচিয়েছো। কি স্বপ্ন দেখ্‌ছিলে বল ত! ডাকাতে খুন করছে এরকম স্বপ্ন দেখ্‌ছিলে নিশ্চয়। আমাদের শুদ্ধ ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে।

বিস্মৃত স্বপ্নটা হিরণ্ময়ের মনে পড়িয়া যায়, শঙ্কা গোপন করিয়া বলে, অত চ্যাঁচালুম—তবু জাগ্‌লুম না? কি বলে চ্যাঁচালুম?

দিবাকর বলে, পাশের ঘর থেকে সব কথা ত আর বোঝা যায় নি। যা-তা কি সব বল্‌ছিলি—আর হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কর্‌ছিলি!

নবেন্দু হাস্য সহকারে বলে হীরুদা এত ভক্তিমান হলে কবে থেকে? ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কৃষ্ণনাম করা যে সে ভক্তির ব্যাপার নয়—একেবারে অব্‌সেস্‌ড্‌ হয়ে যাওয়ার লক্ষণ যে!

হিরণ্ময় কাষ্ঠহাসি হাসে, বলিবার মত কথা তাহার মুখে জোয়ায় না। জিহ্বা শুকাইয়া কণ্ঠতালুতে লাগিয়া যায়।

দিবাকর মুরুব্বিয়ানা করিয়া বলে, একা বাড়ীতে থাকিস্—এরকম বোবায় ধরা অভ্যাস ত ভাল কথা নয়। খুড়ীমা বাড়ীতে একা থেকে কি করেন—আনিয়ে নে এখানে।

হিরণ্ময় আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলে, হ্যাঁ তা আনাব বই কি—আনাব বই কি, তা মা এলেই হয়।

দিবাকর জোর দিয়া বলে, এলেই হয় কি, তুই লেখ্‌ আস্‌তে—আপনি আস্‌বেন এখন।

এর আগেও ত মাকে আন্‌তে চেয়েছিলুম, বাড়ীতে বিগ্রহ আছেন—মা তাঁর সেবা ফেলে আস্‌তে চান্‌ না।

তবে বিগ্রহ শুদ্ধুই মাকে আন্‌। আবার বল্‌ছিস অম্বলের ব্যামোও হয়েছে—মা আসুন সব ব্যামোই সেরে যাবে।

হিরণ্ময় শুইয়া পড়ে, নবেন্দু চলিয়া যাইতে যাইতে ফিরিয়া বলে, হীরুদা, বল ত—বাকি রাতটা তোমার সঙ্গে শুয়ে কাটিয়ে দিতে পারি। ডাকাতে ত ধরেছিল—এর পর যদি ভূতে ধরে?

হিরণ্ময় উত্তর দেয় না। দিবাকরের চলার সঙ্গে সঙ্গে দিবাকরের হাতের লণ্ঠনের আলো দূরবর্ত্তী হইয়া পাশের ঘরের দেয়ালের আড়ালে লুকাইয়া যায়।

অন্ধকারে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া হিরণ্ময় চাহিয়া থাকে।

'Dead man tells no tale'—কথাটা ফাঁকি তবে। মরা মানুষ কথা না কহিলেও কথা কহাইতে পারে, মাটির সঙ্গে মাটি হইয়া মিশিয়া গিয়াও দুর্লঙ্ঘ্য দুরতিক্রম্য হইয়া অধিষ্ঠান করিতে পারে।

হিরণ্ময় শিহরিয়া ওঠে। মাঠের ধারে ডলার পাশে অনতি প্রশস্ত লোকচক্ষু বহির্ভূত গর্ত্তটার মধ্যে বিরাট পৃথিবীটা গ্রহনক্ষত্র শশী সূর্য্য ব্যোম সমেত তলাইয়া যায়। তালপাতার সিপাই'র মত লড়্‌বড়ে ধড়্‌ধড়ে অস্থিচর্ম্মসার কদাকার ঐ হরেকৃষ্ণ বিরাট বামনদেবের রূপ পরিগ্রহ করিয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল আজ ঢাকিয়াছে, তাহার নিদারুণ পদচাপ হইতে তাহার মুক্তি নাই, পরিত্রাণ নাই।

ক্যামেরার কাঁচের ভিতর দিয়া দেখা মহাসমুদ্রের মত অপরিসীম জীবন দুর্ব্বহ বিভীষিকার ভিতর দিয়া তাহার চক্ষে অত্যন্ত সল্পায়তন ও ক্ষুদ্র হইয়া ওঠে।

উৎসবময়ী ধরণীর প্রাঙ্গণ হইতে বেণুবীণা যায় থামিয়া, ফুলমালা খসিয়া পড়ে, চন্দ্র সূর্য্য চির তিমিরে অন্তর্হিত হয়। সেই নিঃসীম অন্ধকারে একক সর্ব্বসাঙ্গচ্যুত হিরণ্ময় অবসাদে অবসন্ন হইয়া চির ভয়ঙ্করের দিকে চাহিয়া থাকে।

গোষ্ঠ জিজ্ঞাসা করে, বাবু কি আজ বাইরে যাবেন?

হিরণ্ময় বলে, না গোষ্ঠ, আজ আর কোথাও যাব না, বাসায়ই থাকব।

লণ্ঠন মুছিতে মুছিতে গোষ্ঠ বলে, আজকে শরীরটে জানি কেমন আছে। গরম জিনিস টিনিস এ সময়টা বড় খাবেন না বাবু, ঠাণ্ডা সরবৎ, ফুটি, তরমুজ, ক্ষীরাই এ সবটা খাবেন; একটুখানি মকরধ্বজ চাল ধোয়া জল মিশ্রী দিয়ে খেলেও কিন্তু পার্ত্তেন!

হিরণ্ময় হাসিয়া বলে, আরে না, না, ও সবের কিছু দরকার নেই। ভালই আছি আমি।

ও পাড়ায় আজ গান হবে,—বাবু যদি ভাল থাকেন, তবে আমি একবার শুনতে যেতুম। বয়সে ভাঁটি পড়েছে—এখন সারা রাত জেগে গান শুনবার ক্ষমতা ত নেই ঘণ্টা দু তিন শুনে আসব।

গোষ্ঠের দিকে চাহিয়া হিরণ্ময় বলে, আচ্ছা, তা যেয়ো।

খাওয়া দাওয়ার পরে গোষ্ঠ চলিয়া যায়, ডলার ধারে সরু কাঁচা রাস্তাটার পার হইতে তাহার গান শোনা যায়,—

"যাই যাই যাই, বিনোদিনী রাই,
মথুরা নগরে আন্‌তে নব নীরদ নাগরে"

হিরণ্ময় কান পাতিয়া শুনিতে থাকে। গানের শব্দ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া দূরে মিলাইয়া যায়।

হিরণ্ময় একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে। জীবনের বিপুল ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার তাহার চক্ষে দারুণ দারিদ্র্যদুষ্ট ও রিক্ত হইয়া ওঠে। যাহা কিছু সে সম্ভোগ করিয়াছে, যাহা কিছু হইতে সে আনন্দ লাভ করিয়াছে,—যাহা কিছুর জন্য সে লালায়িত হইয়াছে, আকিঞ্চন করিয়াছে,—সকলই তাহার কাছে বিরস বিস্বাদ বিবর্ণ হইয়া যায়। এক বিপুল শ্রান্তিভারে তাহার দেহ মন আচ্ছন্ন হইয়া আসে; বিছানায় শুইয়া পড়িয়া সে ভাবে, কাল যদি আর সে না জাগে, এই নিদ্রাই যদি তাহার শেষ নিদ্রা হয়, জীবন-সমুদ্রে অনন্ত বুদ্বুদ-মালার সঙ্গে মুহূর্ত্তে যেমন তাহার উদয় হইয়াছিল, তেমনিতর এক মুহূর্ত্তে যদি সে জলে জল হইয়া মিলাইয়া যায়—তবে সে আজ একান্ত বাঁচিয়া যায়! "ঘরেও নহে, পারেও নহে,

যে জন আছে মাঝখানে—"

সে শান্তিহীনের মত অন্ধকার অপরিজ্ঞাত অনিশ্চিতের স্রোতে আর ভাসিয়া ফিরিতে পারে না। মরণকে মানুষ কায়মনোবাক্যে শুধু ভয়-ই করে না,—এড়াইয়াও চলে। অথচ মরিলে মানুষ ভব-যন্ত্রণা এড়ায়—এও প্রসিদ্ধ উক্তি। মরিয়া গিয়া হরেকৃষ্ণর তেমন কিছু লোকসান—অন্ততঃ তাহার লজিক্ অনুসারে—হয় নাই, জরাজীর্ণ হইয়া বছরের পর বছর ধরিয়া শয্যায় পড়িয়া রোগে ভুগিয়া মরিত --এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে দৈব-চক্রান্তে তাহার সব জ্বালা চুকিয়া গিয়াছে—দিনের ভিতর হাজার বার করিয়া মরার যন্ত্রণা ভোগ করার চেয়ে আচম্‌কা এক মুহূর্ত্তে সব কিছু এড়াইয়া যদি সে যাইতে পারিত তবে···

ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া হিরণ্ময় স্বপ্ন দেখে, হরেকৃষ্ণ মাটির নীচ হইতে তাহাকে ডাকিতেছে, হীরুবাবু, হীরুবাবু, মাটি সরান, আমি উঠি।

চাঁদের আলোয় রঞ্জন-রশ্মির মত হিরণ্ময় বেদী, গাছপালা, মাটি ভেদ করিয়া হরেকৃষ্ণকে দেখিতে পায়,—দেশে ওর বাড়ীর দাওয়ায় ও যেমন করিয়া বসিয়া থাকিত, তেমনি করিয়া পোড়া কাঠের মত পা দুইটা মেলিয়া বসিয়া সে উঠিবার চেষ্টায় দুহাতে উপরকার মাটি ঠেলিতেছে ও তাহাকে ডাকিতেছে। মাটিতে তাহার নাক মুখ বুজিয়া গিয়াছে, চক্ষু ঢাকিয়া গিয়াছে, ঘোঙ্‌রাইয়া সে ডাকিতেছে হীরুবাবু, হীরুবাবু, মাটি সরান, মাটি সরান, আমায় উঠ্‌তে দিন্।

হিরণ্ময় স্থির হইয়া থাকিতে পারে না, উঠিয়া কপাট খুলিয়া বাহির হয়। রান্নাঘর হইতে কোদালটা লইয়া আসে, টান মারিয়া টবগুলি ফেলিয়া দিয়া মাটি কাটিতে আরম্ভ করে।

হঠাৎ হরেকৃষ্ণ যেন তাহার পিছন দিক্ হইতে উঠিয়া আসিয়া তাহার টুঁটি চাপিয়া ধরে, বলে, তবে রে শয়তান, তবে? এবার কোথায় যাবি? এবার দেখ্ কে কার ঘাড় মট্‌কায়।

কণ্ঠনালীতে কঠিন চাপে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া হিরণ্ময় জাগিয়া গিয়া চক্ষের উপর তীব্র আলোকপাতে বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে।

দারোগা টুঁটি ধরিয়া ঝাঁকাইয়া বলে, উঠে দাঁড়াও ওপরে, রাত দুপুরে এ কি হচ্ছে?

হিরণ্ময়ের হাতের কোদাল খসিয়া পায়ের উপর পড়ে, একটা আঙুলও কাটিয়া যায়।

দ্বিরুক্তিমাত্র না করিয়া গর্ত্ত ছাড়িয়া সে উঠিয়া দাঁড়ায়।

দারোগা টর্চ্চ ঘুরাইয়া গর্ত্তের ভিতরে আলো ফেলে, হরেকৃষ্ণের টাকপড়া মাথাটার কিয়দংশ মাটির ভিতর হইতে দেখা যায়।

দারোগা পকেট হইতে হাতকড়া বহির করিয়া হিরণ্ময়ের হাতে লাগাইতে যান।

হিরণ্ময় হাত সরাইয়া লইয়া বলে, দরকার নেই, চলুন, আপনার সঙ্গে যাচ্চি।

দারোগা হিরণ্ময়ের দিকে সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলেন, পথে পালাও যদি?

নাম লিখে নিন। হিরণ্ময়কুমার সোম। বাড়ী কুমারখালি। এখানে ব্যাঙ্কে আমি কাজ করি।

দারোগা হিরণ্ময়ের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলেন, কার ছেলে?

চন্দ্রকুমার সোমের।

গর্ত্তের ভিতর কার মড়া?

হরেকৃষ্ণ সাহার।

কে তাকে খুন করেছে?

খুন করেছি বল্‌তে পারি না, ওর সঙ্গে বচসা হয়েছিল—রাগের চোটে ওর গলা টিপে ধরি তাতে ও মরে যায়।

এ ঘটনা কবে ঘটেছিল?

শনিবার সন্ধ্যার পরে।

মড়া কে পুঁতেছে এখানে?

আমি।

একা?

একা।

এখন গর্ত্ত খুঁড়ে কি কর্চ্ছিলেন?

জানি না। সজ্ঞানে গর্ত্ত খুঁড়ি নাই। ঘুমের ঘোরে কর্চ্ছিলুম।

সজ্ঞানে করেন নি, ঘুমের ঘোরে করেছেন? আশ্চর্য্য ব্যাপার! আচ্ছা চলুন থানায়, ওখানে এজাহার দেবেন। এ বাড়ী আপনার? আর কে আছে এখানে?

কেউ না। আমি একা থাকি। ওঃ, না, আমার চাকর আজ দুদিন থেকে শোয় এখানে। বাড়ী আমারই।

চাকর এখানে আগে শুত না?

না।

এখন কেন শোয়?

আমি শুতে বলেছিলাম।

কেন?

ভয়ে।

কি ভয়?

হিরণ্ময় হরেকৃষ্ণের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে। দারোগা ঈষৎ হাস্যে জিজ্ঞাসা করেন, ঘরে আপনার চাকর আছে এখন?

আছে।

তাকে ডেকে তা হ'লে কপাট বন্ধ কর্ত্তে বলি।

হিরণ্ময় ব্যগ্রকণ্ঠে বলে, না, ওকে ডাক্‌বেন না। পুরোণো চাকর—বড় মমতা করে। এইটি মাপ দিন্।

আচ্ছা চলুন তবে, বলিয়া দারোগা পথে বাহির হইয়া পড়েন, হিরণ্ময় নিঃশব্দে তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকে। দুঃশঙ্কা লজ্জা উৎকট ভাবনার করাল দংষ্ট্রা বেধ হইতে সহসা বিচ্যুত হইয়া সে আশ্রয় লাভ করে, গভীর রাত্রির অতল শান্তির ক্রোড়ে।

শ্রীআমোদিনী ঘোষ
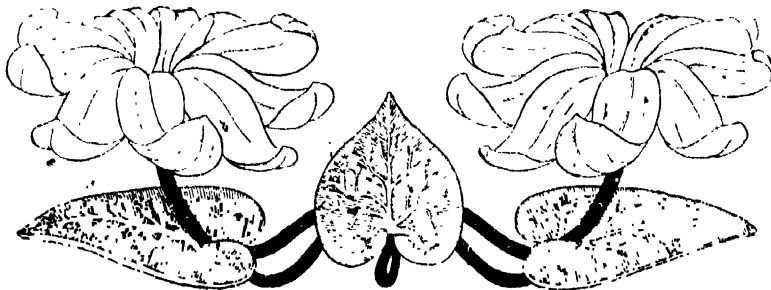
"আমি ডাকি পঁচিশে বৈশাখ"

শ্রীসুজাতা রায়

আজি সেই পঁচিশে বৈশাখ !
—দিকে দিকে পাঠাইছে আমন্ত্রিত লিপি
প্রতি জনে দিয়ে গেছে ডাক।
"এস আজি—
মিলন প্রাঙ্গণে শুভ জয়ন্তী দিবসে,
চিত্ত সব লও ভরি নব রূপ রসে,
এস সবে, গৃহ দূরে থাক,
আজি শুভ পঁচিশে বৈশাখ।
আর কিছু নহে—
হৃদয়ের প্রীতি-রসে পূর্ণ শতদল,
প্রভাতের সপ্রেম আলোকে
সে রবির পূজাভিনন্দন !
এরি লাগি মুখরিত মিলন প্রাঙ্গণ
এরি লাগি অর্ঘ্যে অর্ঘ্যে উঠিছে ভরিয়া
বনানীর সুশ্যাম অঞ্চল।
যে সুধা করিছে পান বিশ্ববাসীজন
লেখনী ধারায়,
না বলা প্রাণের কথা কে করিছে পাঠ—?
শক্তিমান সে কবি সম্রাট।

তাঁরে নমো নমঃ !
হৃদয় উঠিছে ভরি গভীর পুলকে
স্তব্ধ রহে বাক,
আমি ডাকি পঁচিশে বৈশাখ।
আমারো প্রাণের কথা ছন্দে আজি
উঠিছে রণিয়া,
হে সম্রাট কবি,
আমার প্রাণের গান শুনিও ক্ষণিক।
প্রতি শুভ বৈশাখ কর' আলোকিত
আলোকিত কর' সর্ব্বদিক,
হে রক্তিম রবি !
গানে গানে বিশ্বপ্রাণ উঠুক ভরিয়া,
জনে জনে আনন্দ বিলাক
আজি শুভ পঁচিশে বৈশাখ।"
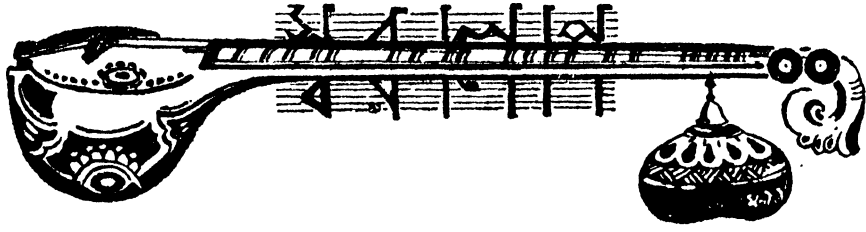
ভাটিয়ালী—কাহার্‌বা

আমার ভাঙ্গা তরী বেয়ে
কোথায় যাব নাই ঠিকানা, ভবসায়রের নেয়ে।
ঈশান কোণে মেঘ জমেছে ঝড় এলরে ঘিরে
কার বা আশে পাল তুলেছি আসব না আর ফিরে,
(এবার) ডুবি যদি ডুব্‌ব নিঠুর তোমার পানে চেয়ে।
প্রভাতে এসেছি ঘাটে
আর যে বেলা নাই
সবাই মোরে গেছে ফেলে
তাই তোমারে চাই।
চৌদিকে ঘোর আঁধার নিশি ধর এসে পাড়ি
কেমন করে হাল রাখিবে ঢেউ দিয়েছে ভারী,
(এবার, ধরলাম কসি' নামের রশি
বিপদ আসুক ধেয়ে॥

কথা—শ্রীনরেশ্বর ভট্টাচার্য্য | সুর ও স্বরলিপি—শৈলেশকুমার দত্তগুপ্ত

II -া গা গমা -পা। -গা -মা -গা -া I -া গা -া মা। গা -া রা -া I
• আ মা • • • • র্ • ভা • ঙ্গা ত • রী •

সা ন্‌া সা -া। -া -া -া -া I -া সা রা -রমা। মা -মপা পা -া I
বে • য়ে • • • • • • কো থা • য়্ যা • ব •

-া পা া ধা। ধা -া র্সা -া I -ণা ণা ণা ণা। ধা -া পা -া I
• না ই ঠি কা • না • • ভ ব সা য় • রে র্

পা -ধা মা -পা। গা মা পা -া I -গা গা -া মা। গা -া রা -া I
নে • য়ে • • • • • • ভা • ঙা ত • রী •

সা ন্‌া সা -া। -া -া -া -া II
বে • য়ে • • • • •

II -া পধা ধা -র্সা । র্সা -া র্সা -া I -া র্সা -া র্সা । র্সা -না র্সা -া I
• ঈ শা ন্ কো • ণে • • মে ঘ্ জ মে • ছে •

-া র্সা -া র্সা । র্সর্রা -া র্গা -া I -া র্সা -র্রা র্র-র্গা । র্রর্সা -া -া -া I
• ঝ ড়্ এ ল • রে • • ঘি • • রে • • •

-া র্সা -া র্সা । র্সা -া র্সা -া I -া না -া না । ধা -া ধণা -ধপা I
• কা র্ বা আ • শে • • পা ল্ তু লে • ছি • •

-া গা -া পা । পা -া পা ধা I -া পধা -া -া । পা -ধা পা ধা I
• আ স্ ব না • আ র • ফি • • রে • এ বার্

-া ধর্সা -া র্সা । র্সা -া র্সা -া I -া নাঃ র্সঃ না । ধা -ণা ধা -া I
• ডু • বি য • দি • • ডু ব্ ব নি • ঠু র্

-া ধপা পা -না । ধা -া পা -া I পা -ধা মা -পা । -গা -মা -পা -া I
• তো মা র্ পা • নে • চে • য়ে • • • • •

-গা গা -া মা । গা -া রা -া I সা ন্া সা -া । -া -া -া -া I
• ভা • ঙা ত • রী • বে • য়ে • • • • •

II -া ধা -া সা । সা -রা রা -গা I -া গা -া গা । গা -া গা -া I
• প্র • ভা তে • এ • • সে • ছি ঘা • টে •

-া গা -া মা । গা -া রা -া I -া রা -া -া । -গা -া -া -া I
• আ র্ যে বে • লা • • না • • ই • • •

-া গধা ধা -া । ধা -া ধা -া I -া ধা পধা -র্সা । -পা -ধা -া পা I
• স বা ই মো • রে • • গে ছে • • • • ফে

গা -া -া -া । -া -া -া -া I -া গা -া পা । গা -া রা -া I
লে • • • • • • • • তা ই তো মা • রে •

-া সা -া -ধ্া। ধসা -া -া -া I -া পা -া গা। পা -া ধা -া I
০ চা ০ ০ ই ০ ০ ০ ০ চৌ ০ দি কে ০ ঘো র্

-া ধা র্সা -া। -া র্সা র্সা -া I -া র্সা -া র্সা। র্সর্রা -া র্গা -া I
০ অ ধা র ০ নি শি ০ ০ ধ ০ র এ ০ সে ০

-া র্সা র্রা র্রর্গা। র্রর্সা -া -া -া I -া র্সা -া র্সা। র্সা -া র্সা -া I
০ পা ০ ০ ড়ি ০ ০ ০ ০ কে ০ মন্ ক ০ রে ০

-া না -া না। ধা -া ধণা -ধপা I -া গা -া পা। পা -া পা -ধা I
০ হা ল্ রা খি ০ ব ০ ০ ঢে উ দি য়ে ০ ছে ০

-া পধা -া -া। পা -ধা পা ধা I -া ধর্সা -া র্সা। র্সা -া র্সা -া I
০ ভা ০ ০ রী ০ এ বার্ ০ ধ র্ লেম্ ক ০ সি ০

-া না র্সাঃ নঃ। ধা -ধণা ধা -া I -া ধপা পা -না। ধা -া পা -া।
০ না মে র্ র ০ শি ০ ০ বি প দ্ আ ০ স্থ ক্

পা ধা মা -পা। -গা -মা -পা -া I -গা গা -া মা। গা -া রা া I
ধে ০ য়ে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ভা ০ ঙা ত ০ রী ০

সা -ন্া সা -া। -া -া -া -া II
বে ০ য়ে ০ ০ ০ ০ ০

"রঙের পরশ"—শ্রীদিলীপকুমার রায় মূল্য ২॥৹ টাকা।

যা আনন্দ দিতে পারে তা'র অস্তিত্বের প্রয়োজন সেইখানেই প্রমাণ হ'য়ে যায়। শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের নতুন গ্রন্থ "রঙের পরশ" এই ধরণের বই। এ সাধারণ উপন্যাসও নয়, সাধারণের নিমিত্তও নয়। কেন, তা লেখক তাঁর পূর্ব্বতন উপন্যাস "দু'ধারা"র ভূমিকাতেই সুস্পষ্ট ক'রে ব'লে দিয়েছেন। "...উপন্যাসের মধ্যে যেটার দিকে আমি পাঠক পাঠিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছি...... সেটা হচ্ছে য়ুরোপের নানান্ অভিঘাত ও অভিজ্ঞতা ভারতীয়ের মনের মধ্যে দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঠিক কি রকম রসধারা ও ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি করে সেই চিত্রটি। সেই জন্যেই অনেক স্থলে দীর্ঘ আলোচনাদির অবতারণা আমি অনুচিত বোধ করিনি—যেহেতু এ বইগুলি ঠিক উপন্যাসের মাপকাটিতে গৃহীত হোক্—এ আমি চাই না।"

এক ধরণের আভিজাত্য আছে যেটা বংশগৌরবের বাইরে, বা একান্ত মনোরাজ্যের জিনিষ, কিন্তু যা' মানুষকে অপর সকল মানুষ থেকে স্বতন্ত্র ক'রে দেয়, সাধারণ নিয়ম কানুন তার কাছে খাটে না। দিলীপবাবুর চরিত্রগুলির মধ্যে এই ভাবের উপস্থিতি তা'দের সাধারণের গ্রহণশক্তির বহির্জগতে এনে ফেলেছে। লেখক বলেছেন তারা সাধারণ মানুষই কেবল একটু "ভালো টাইপের", কিন্তু ঐ ভালো-মিটাই তা'দের সাধারণত্ব ঘুচিয়ে দিয়েছে। একে snobbery না ব'লে H. G. Wells এর সুবিধাজনক "intellectual aristocracy" আখ্যা দিলে মন্দ হয় না।

'রঙের পরশে' বিশাল কথাশিল্পের দুইটি অবশ্য উপকরণের একান্ত অভাব অনুভূত হয়। যথা universality এবং inevitability। উপন্যাসখানি প্রকাশ্যভাবে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে লিখিত অতএব প্রথম অভাবটা মার্জ্জনীয়। কিন্তু দ্বিতীয়টা রচনাপদ্ধতির একটা বৃহৎ দুর্ব্বলতা। ঘটনাস্থল ও ঘটনার, এবং পরিবেষ্টন ও চরিত্রের মধ্যে, এবং ঘটনা পারম্পর্য্যে এমন কোন সহজ সংযোগ নেই যে, মন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে, সহসা সচকিত হ'য়ে আবিষ্কার করে এ অনিবার্য্য; ঠিক এমন স্থলে এমন মানুষের এমন কথা এমন ভাব অবশ্যম্ভাবী; এ না হ'য়ে উপায় ছিলো না। সমগ্র ব্যাপারটা মঁত্রোতে সংঘটিত না হ'য়ে কামস্‌চট্‌কায় হ'লেও ক্ষতি ছিলো না, শ্রোত্রী দীপা না হ'য়ে আমরা হ'লেও সম্ভবতঃ অতনু অসুবিধা বোধ করতো না।

বইখানা আধুনিক জীবনের একটি সমস্যাকে কেন্দ্র ক'রে লেখা হ'য়েছে। এই সমস্যার মধ্যে নূতনত্ব এইটুকু যে চির পরিচিত Eternal Triangle টাই কেমন একটু গোলমেলে হ'য়ে গেছে। দু'জন একজনকে ভালো না বেসে একজন একসঙ্গে দু'জনকে ভালোবাসতে বিষম চেষ্টা করছে। এ সম্ভব কি অসম্ভব তা'র তর্কে প্রবিষ্ট হবার সময় এখন নয়; সুযোগ হয়েছিলো যখন 'দুধারা' প্রথম প্রকাশিত হ'য়েছিলো। গল্পের মূলেই তো এই বিষম সমস্যার ছায়াপাত দেখ্‌তে পাই, যদিচ পরিশেষে সমস্যার জটিলতা সন্ধ্যাকাশে ঘনায়মান ধূমকুণ্ডলীর ন্যায় মিলিয়ে যায়, "শেষ প্রশ্নের" মতন কোনো উত্তরবিহীন অস্পষ্ট প্রশ্নে এসে শেষ হ'য়ে যায় না।

বইখানা শেষ করে মনে হয় একজন দুইজনকে ভালোবাসতে পারে, দুই রকম ক'রে, প্রয়োজন বশতঃ, মানুষের অন্তর্ঘন ক্ষুধাকে তা'রা দুই দিক দিয়ে তৃপ্ত করতে পারে ব'লে। অতৃপ্তির মধ্যে যে প্রেম বাস করে, মানুষকে যা' লক্ষ্মীছাড়া ক'রে দেয় এ সে সম্পদশালী প্রেম নয়। সেখানে দ্বিধা করবার অবসর হয় না; একে বিশ্লেষণ করা সহজসাধ্য।

মোটামুটি গল্পখানা এই। অতনু এবং দীপা পরস্পরকে ভালোবেসেছিলো, কিন্তু একটু ভুল বোঝার ফলে অতনু চলে গেলো য়ুরোপ ঘুরতে, দীপা অতনুর এবং নিজের অধ্যাপক রাজীবকে বিয়ে ক'রে নিশ্চিন্ত ভাবে সংসার করতে লাগ্‌লো। বহুদিন পরে য়ুরোপে পুনরায় সাক্ষাৎ; রাজীব কাজে মগ্ন, দীপার স্বাস্থ্য মন্দ; অতনুর উপর পড়লো দীপাকে মঁত্রো নিয়ে যাওয়া; সত্যি কথা বলতে কি তরুণীকে হাওয়া বদল করানো ছিলো অতনুর অভ্যস্ত। যাই হোক্‌, মঁত্রোর হ্রদে গভীর নিশীথে অতনু-দীপার কথোপকথন হোলো। প্রথমে দীপা তার নিজের কথা একটু বল্লে, ও অতনু বিস্তারিতভাবে বল্লে তার দুই প্রণয়িনীর কথা, সুন্দরী সুখী রুভার, ও সুবুদ্ধিমতী বিধবা লরার কথা। ভোরে রাজীবের আগমন। ইতি।

সমস্যা হোলো ঐ দুই প্রণয়িনীকে নিয়ে। অতনুকে সুন্দরী রুভার রূপচাঞ্চল্য চমকিত ক'রে দেয়, ধীরা লরার স্বভাব-সৌন্দর্য্য মুগ্ধ ক'রে দেয়। সে পড়লো দো' টানায়; অবশেষে রুভাকে, ত্যাগ করতে হোলো; এবং সেই প্রত্যাখ্যানের বিষাদের মধ্যে দিয়ে রুভার চপল স্বভাবের গোপন মাধুর্য্য সহসা প্রকাশ পেলো। এদিকে লরাও তার স্থিরবুদ্ধি অনুসারে অতনুকে এক বৎসরের ছুটি দিলো আত্মজিজ্ঞাসা ক'রে নিতে। হয় তো এই অবসরের মধ্যেই দীপার সঙ্গে পুনর্ব্বার দেখা হোলো।

অতনু দীপাকে ভালোবেসেছিলো তার তরুণ হৃদয়ের সমস্ত আবেগ দিয়ে, সেখানে কোনো সমস্যার কথা ওঠেনি। সমস্যা এলো পরে যখন রুভাকেও লরাকে একসঙ্গে ভালো-বাসলো। লরা তার মনকে আর রুভা তার প্রাণকে টান্‌লো ব'লে। লরার জয় হোলো কারণ রুভাকে অতনু সর্ব্বান্তঃকরণে ভালোবাসেনি, গভীর ভাবে আকৃষ্ট হ'য়েছিলো মাত্র। যা সর্ব্বান্তঃকরণে সর্ব্বদেহ মনে অনুভূত হয় তেমন প্রেম দিয়ে নয়। সত্যিকারের এখানে কোনো সমস্যাই নেই, এমন করে ভেবে দেখ্‌লে সমস্ত প্রাঞ্জল হ'য়ে যায়। দীপার জীবনেও এমন একটি সমস্যার ইঙ্গিত আছে। কিন্তু সেখানে ধরা ছোঁয়ার মধ্যে কিছু এলো না। আসল কথা উপাখ্যান আরম্ভ হ'বার পূর্ব্বেও দীপা অতনুকে ভালোবেসেছিলো এবং রাজীবকে বিবাহ করেছিলো এবং উপাখ্যানের মধ্যেও অতনুকে ভালোবাসছে এবং রাজীবের সঙ্গে নিগূঢ় ভাবে বিবাহিত রয়েছে। যেমন 'শেষের কবিতা'য় অমিতের অবস্থা হ'য়েছিলো, লাবণ্য হোলো যা'র সাগর আর কিটি গৃহদ্বারের দীর্ঘিকা নিয়ত যার জলগণ্ডুষ ভরে পান করা যায়। কিটি যেমন ঠকেছিলো, রাজীবও তেমনই ঠকেছে, কায়াকে পেয়েছে কিন্তু চঞ্চলা ছায়াকে পায়নি। স্ত্রীকে পেয়েছে, দীপাকে পায়নি। সে হ'য়ে রয়েছে দীপার রক্ষাকবচ; যে দীপা স্বামীত্বের বাইরে বাস করে, তা'কে পায়নি। তাই রাজীব স্নিগ্ধ হেসে বলেছিলো—"বিশেষ ক'রে যেখানে আলাপ একেবারে নিরামিষ না—না রে অতু?" এবং দীপা অতনুর দৃষ্টি-বিনিময় হয়েছিলো। হায় রে স্বামী!

গল্পের পরিশেষে লেখক 'গল্পাৎ পরতরং নহি' ব'লে এক বিষম তর্কের সূচনা করেছেন, যা'তে গল্পের মধুর আস্বাদ রসনা থেকে বেমালুম লুপ্ত হ'বার আশঙ্কা আছে। বাস্তবিক এমন তর্ক বেশী দূর গড়ায় না; যেহেতু রবীন্দ্রনাথ বলছেন দৃঢ়ভাবে, বর্ত্তমান য়ুরোপের লেখকদের উপর বেজায় রাগ ক'রে, যে পশ্চিমের কায়াবহুল অসঙ্গত জীবনযাত্রার ধাক্কা তা'দের শিল্পে ও সাহিত্যে লেগেছে; তারই হঠাৎ নবাবী আপন ইণ্টেলেক্‌চুয়েল আড়ম্বরে এবং সেটা আভিজাত্য নয়, সেটা স্বল্পায়ু, মরণ-ধর্ম্মী। আবার একটু পরেই বল্‌ছেন যে প্রব্লেমে ও প্রাণে, প্রবন্ধে ও গল্পে জোড়াতাড়া জিনিষ সাহিত্যে বেশীদিন টিকবে না।

কিন্তু প্রব্লেমে ও প্রাণে, প্রবন্ধে ও গল্পে যে একটা জন্মগত অসামঞ্জস্য আছে একথা সকলে নাও মান্‌তে পারে। বিশেষ ক'রে যে জগতে মানুষে Hardy, Meredith, Galsworthy প'ড়ে থাকে, এবং পড়ে গোরা, ঘরে বাইরে, শেষের কবিতা।

দিলীপকুমারের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ কোথাও এতটুকু মার্জ্জনা লাভ করেন নি। তবে এইটুকু আমাদের পাঠক সমাজ থেকে বক্তব্য যে দিলীপকুমারের যুক্তি কেবল এক শ্রেণীর উপন্যাস সম্বন্ধে খাটে; উপন্যাস মাত্রকেই এই গণ্ডিতে ফেল্লে তার প্রবৃত্তিকে অতি-সংযত করতে হয়। প্রব্লেমকেই যে উপন্যাসের মূলমন্ত্র করতে হ'বে এমন কথা বল্লে চলবে না।

প্রমাণ বহুজন সমাদৃত Jean Cristophe, The Good Earth, Growth of the Soil, The Beloved Vagabond এবং এই ধরণের পাঁচসহস্র বই। তবে এইটুকু শিরোধার্য্য যে আধুনিক উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা আর আর্কেডিয়ার বৃক্ষতলে কেলি ক'রে দিন কাটাতে পারবেন না, তাঁদের দস্তুরমত বুদ্ধিবৃত্তির কৃষ্টি সমাধান করতে হবে।

মোট কথা রবীন্দ্রনাথ ও দিলীপকুমার উভয়ের তর্কই কিঞ্চিৎ একচোখা হ'য়ে গেছে। তর্ক করতে গেলে—বিশেষ ক'রে বৃহৎ লোকের সঙ্গে, বৃহৎ বিষয়ে, বৃহৎ প্রকাশ্য পত্রে, সে খোলা চিঠিই হোক্ কি বন্ধ চিঠিই হোক্—যেমন চিরকাল হ'য়ে থাকে।

রবিবাবুর ঐ প্রব্লেম ও প্রাণের কথাটা 'রঙের পরশে'র সম্বন্ধে এইটুকু খাটে যে দীপা-অতনু-কথোপকথনে এমন অনেক কথা প্রসঙ্গক্রমে বলা হ'য়ে গেছে যা সাধারণ মানুষের হঠাৎ প্রসঙ্গক্রমে বলে ফেলা দুঃসাধ্য, কেন না তা' বহু গভীর চিন্তা প্রসূত ও এমন সুনির্ব্বাচিত সুমার্জ্জিত সালঙ্কার ভাষায় উচ্চারিত, সাধারণে যা' সাধারণতঃ করে না। কিন্তু দিলীপকুমার আগে হ'তেই আমাদের মুখ বন্ধ ক'রে দিয়েছেন এই বলে যে এ গল্প যদি শুধু গল্পই হ'য়ে থাকে তবু এ সাধারণ গল্প নয়, realism-এর উদ্দেশ্য নয়। বিষয়ও সাধারণ নয়, অবস্থাও সাধরণ নয়। বাস্তবিক সমস্ত জেনে শুনে অতনুর সঙ্গে অমন করে দীপাকে ছেড়ে দেওয়া সাধারণের পক্ষে অস্বাভাবিক। এবং যেহেতু দু'জন ভূতপূর্ব্ব প্রণয়ীর গভীর নিশীথে গভীর সৌন্দর্য্যের মধ্যে গভীরভাবে আত্মপ্রকাশ করাটাও সাধারণ ব্যাপার নয়, অতএব তা'দের আলাপনটাও যে অসাধারণ হ'বে তা'তে আশ্চর্য্যের কিছু নেই। এইখানে লেখকের একটা ত্রুটি হ'য়ে গেছে। কথোপকথনটা স্থানে স্থানে আন্তরিকতা ছেড়ে সাহিত্য সভার যোগ্য হ'য়েছে। দিলীপকুমার নিজেও তা স্বীকার করেছেন, স্থানান্তরে, অন্য প্রসঙ্গে, কিন্তু তাই ব'লে তাঁ'কে মার্জ্জনা করা যায় না। এর একটা উদাহরণ দীপা যেখানে যেখানে নৈর্ব্যক্তিক ভাবে রুভার মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করছে, কিম্বা বেচারাকে একা পেয়ে অতনু নানান্ দার্শনিক তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করছে, অবশ্য এই সকল অবান্তর কথার মধ্যে আমরা অশেষ আনন্দ পেয়েছি। তার প্রধান কারণ দিলীপকুমার সুকবি। অমন মধুর ক'রে ভাবার অতীততীরগামী সঙ্গীতের কথা অতনু দীপাকে বলতে পারতো কি না জানি না, কিন্তু দিলীপ তাঁর সুদীর্ঘ সুরসাধনার মধ্যে উপলব্ধি ক'রে অনায়াসে অপরূপ ক'রে বলতে পেরেছেন।

এখানে একটা ক্ষুদ্র পদ্ধতি-দোষের কথা বলা প্রয়োজন। বইখানিতে বহুস্থানে বিদেশী কবিতা এবং গদ্য, বাংলা পদ্যে তর্জ্জমা করা হ'য়েছে স্থানে স্থানে তা'দের গাম্ভীর্য্য খর্ব্ব ক'রে। এতে বারংবার রচনার সহজ ছন্দ ভেঙ্গে যাচ্ছে। তার উপর অতনুও যেখানে সেখানে লরার বিশাল কবিতা নির্ম্মমভাবে আদ্যোপান্ত আবৃত্তি ক'রে যাচ্ছে, তা'তে লরাকে যত না উপলব্ধি করা যায়, তার চেয়ে অতনুর অদ্ভুত স্মরণশক্তি চমক্ লাগিয়ে দেয়।

এ সমস্তের মধ্যে দিলীপকুমারের কবি-প্রতিভা তেমন প্রকাশ পায় না, যেমন পেয়েছে লরার শেষ চিঠির অপরূপ রিক্ততার রাজেন্দ্রশোভন ঐশ্বর্য্যে।

বাস্তবিক বইখানা সাধারণের নিমিত্ত নয়। এর মধ্যে একখানা রাজকোষের আভরণ রয়েছে, যা'রা বস্তুর ওজন দিয়ে কীর্ত্তি যাচাই ক'রে নেয় তা'রা একে গ্রহণ করবে না। 'গোরা'র প্রচণ্ড চলায়মান শক্তি এতে নেই, 'শ্রীকান্তে'র তীব্র জীবনীশক্তি এতে নেই, 'শেষ প্রশ্নে'র আবর্ত্তন এর মধ্যে নেই। গল্প এ দেশের নয়, নায়িকাদ্বয় বিদেশিনী, নায়ক ইতালিয়ান-পড়া কবি। পূর্ব্বে এমন উপন্যাস কেহ লেখেনি, আজকালও কেহই এর অনুকরণ করেনি। দিলীপকুমার তাঁর কাব্যসম্ভার বিতরণ ক'রে দিয়েছেন অপর্য্যাপ্ত ভাবে, কিন্তু সাধারণের মনস্তুষ্টি তা'তে কিছুতে হ'বে না। ভালো লাগবার ক্ষমতা আমাদের অসীম। একদা Florence Barclay-র Following of the Star এর হতভাগ্য চরিত্রদের ধ'রে নিয়ে শুদ্ধি ক'রে হিঁদু বানিয়ে সুপ্রসিদ্ধা লেখিকা তা'দের কাহিনীর সঙ্গে স্বরচিত একখানা সমগ্র উপন্যাস জুড়ে দিয়ে "মন্ত্রশক্তি" প্রকাশিত করলেন, এবং আমরা কত না আনন্দ করলাম। বাস্তবিক

আমাদের ভালো লাগবার ক্ষমতা প্রশংসনীয়। তবু দিলীপ কুমারের কোন রচনা কোন কালে জনপ্রিয় হবে না; কিন্তু যা'র ভাল লাগবে সে একটা যথার্থ আনন্দের সামগ্রী পেয়ে যাবে।

শ্রীলীলা মজুমদার

বর্ণধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা বিষয়ে প্রস্তাব:—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন শর্ম্মা প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য বারো আনা।

হিন্দুর অস্পৃশ্যতা সমস্যা:—শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা।

উভয় গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় একই এবং উভয় গ্রন্থকারই পুরাতনের নজীর টেনে স্পৃশ্যতা এবং অস্পৃশ্যতার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য সাধনের ইঙ্গিত ক'রেছেন। উদ্দেশ্য মহৎ, সন্দেহ নাই। কিন্তু সামঞ্জস্য বিধান ক'রবে কে? বিদেশী রাজশক্তি ভারতের ধর্ম্ম অথবা সমাজ সম্পর্কে কোনরূপ আইন-কানুন ক'রতে নারাজ। রঘুনন্দনের শাসন একালে অচল। কোন হিটলার এখনো এদেশে জন্মগ্রহণ করেনি। আসলে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ব'লে কোন জিনিস ভারতবর্ষে নেই। বঙ্গদেশে কোন কালে ছিল কিনা সন্দেহ। যা' আছে তা' হ'চ্ছে একটা কৃত্রিম জাতিভেদ প্রথা—সে কালের স্বার্থান্বেষী সমাজদ্রোহী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের সৃষ্ট। কর্ণেল উপেন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর "হিন্দুজাতির ইতিহাসে" তা' প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন। ডক্টর রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের মতে আর পঞ্চাশ বছর পরে বাংলাদেশে উচ্চ বর্ণের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। তখনকার বাঙ্গালীরা এই স্পৃশ্যাস্পৃশ্য সমস্যা অতি সহজেই সমাধান ক'রে নেবে। ততদিন আমাদের একটু পাণ্ডিত্য-বিলাস ক'রে নিতে ক্ষতি কি? অন্ততঃ আমাদের পরবর্ত্তীদের একটু আমোদের উপাদান রেখে যেতে পারব তো!

—নচিকেতা

খাদ্য ও স্বাস্থ্য:—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বর্দ্ধন প্রণীত এবং গ্রন্থকার কর্ত্তৃক ১৭, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য দশ আনা।

বাঙ্গালীর খাদ্য সমস্যা নিয়ে অনেকেই আলোচনা ক'রেছেন। তবুও মনে হয়, এ বিষয়ে আরো বেশী আলোচনা প্রয়োজন যতদিন না একটা আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। খাদ্য কি ক'রে মুখরোচক গুরুপাক এবং অপুষ্টিকর হতে পারে তা' নিয়ে বাঙ্গালী গত কয়েক শতাব্দী ধ'রে পরীক্ষা ক'রে আসছে। বাঙ্গালীর এখন প্রয়োজন লঘুপাক এবং শক্তিবর্দ্ধক আহারের। তা' যে কত সস্তায় হ'তে পারে বর্ত্তমান গ্রন্থকার তাঁর পুস্তকে দেখিয়েছেন। ইহাই এই পুস্তকের বিশেষত্ব। আলোচনা ও বাহুল্য-বর্জ্জিত। পুস্তকখানির দামও কম হওয়ায় সর্ব্বসাধারণের মধ্যে যে ইহার বহুল প্রচার হবে, সে আশা করা অন্যায় নয়।

—পুণ্ডরীক

শরীর গঠন:—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত। সিটি পাব্‌লিশিং হাউস, শিলচর হইতে শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

গ্রন্থকারের ভারতের অন্যতম ব্যায়ামবীর বলিয়া খ্যাতি আছে। আলোচ্য পুস্তকখানির বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে চিত্রসাহায্যে ব্যায়ামের প্রক্রিয়া দেখান হ'য়েছে। ইহাতে খাদ্য, স্বাস্থ্যপালন ইত্যাদি আনুষঙ্গিক বিষয়েরও আলোচনা আছে। গ্রন্থকার আমিষের পক্ষপাতী নন্। এই পুস্তকখানি আমাদের যুবকসম্প্রদায়ের মধ্যে আদরণীয় হ'তে দেখলে সকলেই সুখী হবেন। পুস্তকখানির ছাপা, বাঁধাই, ছবি চিত্তাকর্ষক।

—পুণ্ডরীক

দেশের কথা

শ্রীসুশীল কুমার বসু

দেশের বর্ত্তমান অবস্থা তেমন নৈরাশ্য-জনক নহে

দেশের উপর দিয়া যখন কোন উত্তেজনার ঢেউ বহিয়া যাইতে থাকে, বিক্ষুব্ধ জনতা যখন জয়ধ্বনি ও করতালির শক্তিতেই জাতীয় প্রগতিকে লক্ষ্যস্থানে পৌঁছিয়া দিতে চাহে, তখনকার সেই বাষ্পাচ্ছন্ন আকাশের নীচে দাঁড়াইয়া আগ্রহের অধীরতায় আমরা লক্ষ্যকে অতিশয় নিকটবর্ত্তী মনে করি, নিজেদের উন্মাদনার মোহকে জাতীয়চিত্তের আকস্মিক জাগরণ বলিয়া ভুল করি, সমস্ত অবস্থার সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া সকল বাধাবিঘ্ন খতাইয়া দেখিয়া প্রকৃত পরিস্থিতির স্বরূপ নির্দ্ধারণ আমাদের পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠে না; সেইজন্য যখন স্বাভাবিক কারণে এবং পারিপার্শ্বিক ঘটনার সমবায়ে উত্তেজনা শান্ত হইয়া দেশের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিতে থাকে তখন বিষাদে এবং নৈরাশ্যে আমরা মনে করিতে থাকি যে দেশ ঘুমাইয়া পড়িল, এ দেশের মুক্তির সম্ভাবনা নাই, আন্দোলনের উত্তেজনা কিছুমাত্র ফলপ্রসূ হইল না, ইহা শুধু বহুলোকের ক্ষতি ও কষ্টের কারণ হইল মাত্র এবং সর্ব্বপ্রকার প্রগতিমূলক প্রচেষ্টার পরে লোকের আস্থা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া গেল। সে সময় যাঁহারা আন্দোলনের ঘূর্ণাবর্ত্তে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন, দেশের মুক্তির জন্য সর্ব্বস্বপণ দৃঢ়তা এবং অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের তদানীন্তন কার্য্য ও বাক্যের সহিত তাঁহাদের বর্ত্তমান কার্য্য ও বাক্যের অসঙ্গতি দেখিয়া আমাদের জাতীয় চরিত্রের শক্তি সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়ি এবং অন্যায়ভাবে নিজেদের চরিত্র ও ভাগ্যকে ধীক্কার দিতে থাকি এবং সব সময়েই মনে এই অস্বাভাবিক আশা পোষণ করিতে থাকি যে যতলোকে যেরূপে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহারা যদি সকলে সেইরূপে কাজ করিয়া যাইতে পারিতেন তবে আমাদের দুর্দ্দশার অবসান হইতে পারিত। দেশের বর্ত্তমান অবস্থা আমাদের অনেকের মনে এই প্রকার নৈরাশ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। গত আন্দোলনগুলির সময় দেশের উন্নতি সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস ও আশা এবং বর্ত্তমানের বিষাদ ও নৈরাশ্য এ উভয়েরই ভিত্তি অপ্রকৃত।

আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, কোন একটি বিশেষ ঘটনাকে অবলম্বন করিয়াই যদিও অধিকাংশ আন্দোলন উত্তেজনা ও বিক্ষোভের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে তবুও, ইহার জন্মসম্ভাবনা বহু পূর্ব্ব হইতেই ঘটিতে থাকে। সাধারণ দৃষ্টিতে যেমন দেখা গিয়া থাকে, তেমন কোন বিশেষ ব্যাপারকে উপলক্ষ্য করিয়া অথবা বিশেষ কোন বা কোন কোন নেতার প্রভাব বা শক্তির ফলে কোন আন্দোলন দেশের মধ্যে বিস্তার লাভ করিতে পারে না। বহুলোকের বহুদিনের চিন্তা ও কার্য্য, নানাবিধ বিচ্ছিন্ন ও সমবেত প্রয়াস, প্রচলিত অবস্থা ও ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পুঞ্জিত অসন্তোষ আকস্মিক আঘাতের মূর্ত্তি লইয়া দেখা দেয়। যে ক্ষেত্রে আন্দোলন দেখা দেয়, সে ক্ষেত্রের বাহিরে অন্য ক্ষেত্রের কাজের ফলেও তাহার উদ্ভব অসম্ভব নহে বরং অনেকক্ষেত্রে তাহাই বিশেষভাবে ঘটিয়া থাকে।

কাজেই, কোন আন্দোলনের সময় আমরা বহুদিনের পুঞ্জীভূত শক্তির আকস্মিক প্রকাশ দেখিতে পাই।

আমাদের গত রাজনীতিক অন্দোলনগুলিকে যে শুধুমাত্র আমাদের বহুদিনের রাজনীতিক চিন্তা ও কার্য্য সম্ভাবিত করিয়াছে তাহা নহে। শিক্ষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য যে বিপুল প্রয়াস চলিয়াছে এবং যাহার ফলে বহুবিধ নূতন চিন্তা ও ভাবের সহিত আমাদের যে পরিচয় ঘটিয়াছে পৃথিবীর গতিশীল মানবচিত্তের সহিত আমাদের যে সংযোগ ঘটিয়াছে নানাদেশের উত্থান পতন, উন্নতি অবনতির যে ইতিহাস আমরা অধ্যয়ন করিয়াছি জ্ঞান বিজ্ঞানের যে মহিমা দেখিয়াছি, আমাদের মনে রাজনীতিক আশা আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিতে, রাষ্ট্রিক প্রচেষ্টায় আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সহায়তা করিয়াছে। যদিও ব্যর্থতার ক্ষোভে শিক্ষার এই পরোক্ষ প্রভাবকে আমরা স্বীকার করিতে চাহি না এবং এই ব্যর্থতার জন্য শিক্ষার কল্পিত ও সত্য ত্রুটিসঞ্জাত দুর্ব্বলতাকে অর্থাৎ পরোক্ষে শিক্ষাকেই দায়ী করিয়া থাকি। আনুসঙ্গিকভাবে সমাজ ধর্ম্ম প্রভৃতি ক্ষেত্রে বহুদিন ধরিয়া যে সংস্কারপ্রচেষ্টা অবিশ্রান্ত গতিতে চলিয়াছে, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতির ক্ষেত্রেও যে উদ্যম দেখা গিয়াছে, তাহাও রাজনীতির দিক দিয়া আমাদের সজাগ করিয়া তুলিয়াছে। অবশ্য আবার রাজনীতিক আন্দোলনের আঘাতে এই সকল প্রচেষ্টাও বহুগুণে শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহার দ্বারাও এই একই কথারই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

এই সকল কারণের ফলে, দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এমন অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন, যাহাতে রাজনীতিক প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ না করিয়া তাঁহাদের উপায়ান্তর ছিল না। তাঁহাদের মধ্যে যে কর্ম্মশক্তি জাগ্রত ও সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহার প্রয়োগের উপযুক্ত ক্ষেত্র ছিল না, তাঁহাদের মধ্যে যে আত্মাভিমান ও স্বাজাত্যাভিমান জাগিয়াছিল, রাষ্ট্রিক পরাধীনতার গ্লানি, ব্যক্তিগত জীবনে এবং যোগ্যতার পুরস্কার লাভে শাসকদের নিকট হইতে নিকৃষ্ট-জনোচিত ও অসম ব্যবহারের পীড়া, স্বদেশে ও বিদেশে যোগ্যতা সত্ত্বেও সমানাধিকার লাভের অক্ষমতা, এবং রাজনীতিক পরাধীনতাই এই সকল দুর্দ্দশার মূল কারণ এই বোধ ইঁহাদিগকে রাজনীতিক প্রচেষ্টার পথে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। কাজেই, এই সময় আমরা যে শক্তির প্রকাশ দেখিলাম, এই সময়েই তাহার সৃষ্টি হয় নাই।

একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে এই জাগরণ আসিলেও, ইঁহাদের সকল লোকের মধ্যে আসে নাই—কোন সমাজের মধ্যেই তাহা আসিতে পারে না। ইঁহাদের মধ্যে চিন্তাশীল দেশপ্রেমিক লোকেরা এই সকল কথা ভাবিয়াছেন বা ইহার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। ইঁহাদের চিন্তা, কর্ম্ম এবং চেষ্টার ফলে দেশের স্থায়ী উন্নতিমূলক কাজসকল ও গত আন্দোলনগুলি সম্ভব হইয়াছে এবং ইঁহাদের কর্ম্মশক্তি, কর্ম্মকৌশল এবং আন্তরিকতার উপর দেশের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে। ইঁহারা যখন চেষ্টার দ্বারা ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন অর্থাৎ সমাজের অধিকাংশ লোককে অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত করিয়া কোন একটা বিশেষ পথে পরিচালিত করিবার শক্তি অর্জ্জন করিয়াছেন তখনই কোন বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে। অর্থাৎ যাঁহারা সাধারণভাবে নিষ্ক্রিয় থাকিয়া পূর্ব্বোক্তদের দ্বারা প্রভাবিত হইতেছিলেন এবং তাঁহাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন, যখন তাঁহারা বিশেষ একটা কোন আঘাতের ফলে অথবা পূর্ব্বোক্তদের কোন চেষ্টা এবং কৌশলের ফলে আঘাতমূলক কোন কর্ম্মপদ্ধতিকে অবলম্বন করিয়া অনেক লোক সাময়িক ভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া পড়িয়াছেন, তখনই আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের রাজনীতিক আন্দোলনগুলিও এইভাবে সম্ভব হইয়াছে। এই সময় যাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে স্থায়ী কর্ম্মী হইবেন অথবা স্থায়ী কর্ম্মীরা এই প্রকার সংগ্রামের সময় যে উৎসাহ ও নিষ্ঠা লইয়া কাজ করিয়াছিলেন, শান্তির সময়ও তাঁহারা সেই উৎসাহ ও নিষ্ঠা লইয়া কাজ করিবেন, এরূপ আশা কেহ করিয়া থাকিলে সেই গণনাতেই ভুল হইয়াছে।

পরিবর্ত্তন আনয়নের জন্য কর্ম্মীদের (ইঁহাদের অধিকাংশই অবশ্য কর্ম্মী নামধেয় নহেন) দ্বারা যে ধীরগতি কর্ম্মপ্রচেষ্টা চলিতে থাকে, তাহা যখন এমন অবস্থায় আসিয়া উপনীত

হয়, যখন ধীরপ্রগতি আর সম্ভব হয় না, কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসার ব্যতীত আর কোন চেষ্টা ফলবতী হয় না অথবা কর্ম্মীরা যখন মনে করেন যে, একটা লাফ দিতে পারিলে সম্মুখে একটা প্রসারিত কর্ম্মক্ষেত্র উন্মুক্ত হইবে তখন, প্রগতি-পন্থীরা তাঁহাদের সমস্ত কর্ম্মশক্তি একত্রিত করিয়া আঘাতের সাহায্যে বাধা অতিক্রম করিতে চাহেন। সংঘাতের ফলে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, তাহাই আরও বহুলোককে কর্ম্মক্ষেত্রে টানিয়া আনে। স্থায়ী কর্ম্মীরা এই সকল লোকের কর্ম্ম-শক্তিকে এই সুযোগে কতকটা কাজে লাগাইয়া লইতে পারেন।

ভারতবর্ষের গত তিনটি রাষ্ট্রিক আন্দোলন অর্থাৎ অসহযোগ আন্দোলন এবং আইন অমান্য আন্দোলনের দুই পর্য্যায়ের ইতিহাস লক্ষ্য করিলে এই কথার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। কোন কোন স্থানে দেশের সাধারণ লোক এই আন্দোলনে যোগ দিলেও, এবং অনেক ক্ষেত্রে এই আন্দোলনের পশ্চাতে তাঁহাদের সহানুভূতি থাকিলেও, প্রধানতঃ ইহাকে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আন্দোলন বলিতে হইবে। ধীরগতি কর্ম্মপন্থায় যেটুকু প্রগতির সম্ভব, এই সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহা শেষ হইয়াছে। শিক্ষার দিক দিয়া হউক, চিন্তা ও ভাবপ্রচারের দিক দিয়া হউক, নূতন নূতন প্রচেষ্টা ও উদ্যমের দিক দিয়া হউক ইঁহারা একটি শক্তিশালী সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের শক্তির উপযুক্ত প্রয়োগের জন্য যে ক্ষেত্রের প্রয়োজন ছিল, তাহা আয়ত্বের মধ্যে ছিল না এবং তাহা লাভ করিবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বড় বাধা ছিল রাষ্ট্রিক পরাধীনতা। ইঁহাদের অনেক সাধারণ লোক ও নেতার বিশ্বাসও জন্মিয়াছিল যে, ইঁহাদের হাতে যে শক্তি সঞ্চিত হইয়াছিল তাহার দ্বারা দেশের রাষ্ট্রিক শক্তি লাভ হইতে পারিত এবং দেশের জনসাধারণকে প্রভাবিত করিবারও শক্তি তাঁহাদের ছিল। রাষ্ট্রিক অধিকার লাভ হইলে, দেশের সম্মুখে বহু সম্ভাবনাযুক্ত যে ভবিষ্যৎ আছে তাহার আশা, রাষ্ট্রিক শক্তির সহয়তায় চক্ষের সম্মুখে যে সকল জাতি সর্ব্বদিকে কল্পনাতীত উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহাদের প্রগতির ইতিহাসও ইঁহাদিগকে এই রাষ্ট্রিক শক্তি লাভে অনেকটা প্রলুব্ধ করিয়াছিল এবং তাহার ফলে, বাধাবিঘ্নের হিসাব করিবার সময়, তাহাকে কতকটা লঘু বলিয়া ধরিয়া লওয়াও কতকটা স্বাভাবিক হইয়াছে। এইজন্য সর্ব্বক্ষেত্রে লব্ধ ইঁহাদের সকল শক্তি এই আন্দোলনে প্রযুক্ত হইয়াছিল এবং এইজন্যই তাহাকে আমরা এতটা শক্তিশালী দেখিয়াছিলাম।

তিন তিনবার যে চেষ্টা হইল, তাহার পরিণতি অনেকটা একই প্রকার এইজন্য হইল যে, সকল বারই একই শক্তি সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিল। প্রথমবার অপেক্ষা দ্বিতীয়বার বা দ্বিতীয়বার বা প্রথমবার অপেক্ষা তৃতীয় বারে কোন নবতর শক্তি প্রগতিকামীদের দলপুষ্ট করে নাই। ইঁহাদের জনসংখ্যা এবং অন্যান্য অবস্থার কথা বিবেচনা করিলে, ইঁহারা যে ত্যাগ ও বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন তাহা তুচ্ছ করিবার মত নহে। এই আন্দোলন হইতে আমরা এই কথাটা বুঝিতে পারিয়াছি যে, দেশে যে শক্তির উদ্ভব হইয়াছে তাহার দ্বারা কঠোরতর আঘাত আর সম্ভব নহে। বহুদিনের বহুমুখী চেষ্টার ফলে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে যে শক্তির উদ্বোধন সম্ভব হইয়াছে, সেই শক্তিকে প্রধানতঃ রাজনীতিক সংগ্রাম হইতে বিরত হইয়া, ব্যাপকতর ক্ষেত্রে শক্তির উদ্বোধনের কঠোরতর সাধনায় নিযুক্ত হইতে হইবে।

যে উদ্দেশ্যে গত আন্দোলনগুলি আরম্ভ হইয়াছিল, সেই উদ্দেশ্যের দিক্ দিয়া ইহা বিফল হইলেও, দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে গণচেতনা জাগাইয়া ইহা আমাদের সীমাবদ্ধ কর্ম্মক্ষেত্রকে অনেক প্রসারিত করিয়া দিয়াছে, বহুলোককে দেশ সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিয়াছে, সাময়িক কর্ম্মের মধ্য দিয়া দেশ অনেক স্থায়ী কর্ম্মী লাভ করিয়াছে।

উত্তেজনার সময় যাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, শান্তির সময়েও তাঁহারা সকলে কর্ম্মলিপ্ত থাকিবেন, এরূপ আশা করা অসঙ্গত এবং রাজনীতিক কাজকর্ম্ম এবং উত্তেজনার হিসাব হইতেই, দেশের অবস্থার স্বরূপ নির্ণয়ও প্রমাদযুক্ত।

রাজনীতিক এবং অরাজনীতিক নানাবিধ দীর্ঘকালব্যাপী চেষ্টার ফলে যেমন, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে গণজীবন গড়িয়া উঠিয়াছে এবং রাষ্ট্রিক ও অন্য নানাপ্রকার

প্রগতিমূলক চেষ্টা ও উদ্যমের মধ্যে যাহা আত্মপ্রকাশ করিতেছে দেশের অন্যান্য সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে যাহাতে সেই গণজীবন গড়িয়া উঠিতে পারে, দেশাত্মবোধ জাগিতে পারে, অন্য সর্ব্বপ্রকার বৈষম্য দূরীভূত হইয়া জাতীয়তার প্রসার ঘটিতে পারে, বিগত আন্দোলনগুলিতে যে সকল কর্ম্মক্ষেত্র উন্মুক্ত হইয়াছে, তাহার সুযোগ গ্রহণ করা যাইতে পারে, যে সকল ত্রুটি বিচ্যুতি এই সুযোগে আমাদের লক্ষ্য পথে আসিয়াছে, তাহা যাহাতে সংশোধিত হইতে পারে, এজন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া কর্ম্মীদের ব্যাপৃত থাকিতে হইবে।

যে সকল কর্ম্মীর সচেতন চেষ্টার ফলে, দেশ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকৃত হইবে এবং যাহাদের কর্ম্মের উপরই দেশের ভবিষ্যৎ বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতেছে তাঁহাদিগকে রাজনীতি অপেক্ষা অন্যান্য ক্ষেত্রে—অর্থনীতিক ক্ষেত্রে সমাজ সংস্কারের শিক্ষাপ্রসারের ক্ষেত্রে কাজ করিয়া জনসাধারণের সহিত সমাজের বর্ত্তমান উচ্চস্তরের যোগস্থাপন করিতে হইবে। রাজনীতির বাহিরে ইঁহাদের সংগঠন-প্রতিভা যে কাজ করিতে পারিবে,একদিন তাহাই রাষ্ট্রিক শক্তির আকারে আত্মপ্রকাশ করিবে।

জাতির উন্নতি করিবার স্পষ্ট ইচ্ছা লইয়া কাজ করিবেন না, অথচ জীবিকার জন্য বা অন্যান্য উদ্দেশ্য লইয়া এই সকল ক্ষেত্রে যাঁহারা কাজ করিবেন, তাঁহাদের কাজের দ্বারাও আমাদের লক্ষ্য অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইবে। এই সকল পরোক্ষ কাজ অবিশ্রান্ত গতিতে চলিয়াছে, গত আন্দোলনগুলির ফলে দেশে যে গণচেতনা জাগ্রত হইয়াছে, জনসংঘকে তাহা স্বতঃই উন্নতির অভিমুখে পরিচালিত করিতেছে। এই কর্ম্মে বিক্ষোভ নাই বলিয়াই ইহা এমন কোন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে না যাহা অতি সহজে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে।

কাজেই রাজনৈতিক চাঞ্চল্য লক্ষিত না হইলেও নিরাশ হইবার কারণ উপস্থিত হয় নাই। অবশ্য এই সকল কথার দ্বারা ইহা বলিতে চাহিতেছি না যে, এই স্বতঃ ক্রিয়াশীল শক্তির উপরই আমরা নিশ্চিন্তমনে নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিতে পারি বা কর্ম্মীদের সংঘবদ্ধ হইয়া একটা বিশেষ কর্ম্মপদ্ধতির অনুসরণ করিবার আবশ্যকতা নাই। বরং পরিবর্ত্তিত নূতন অবস্থায়, কর্ম্মক্ষেত্রের অভূতপূর্ব্ব প্রসার ঘটায় তাঁহাদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

দেশের বর্ত্তমান স্থির অবস্থাতে অনেকে পশ্চাদ্বর্ত্তিতা মনে করিয়া ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকটা নিরাশ হইয়া পড়িতেছেন বলিয়া একথা বলিবার প্রয়োজন হইল।

যোগ্যতর ও শ্রেষ্ঠতর মানুষ চাই

গ্রামগুলির সংস্কার ও পুনর্গঠনের জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, শ্রেষ্ঠতর ও যোগ্যতর মানুষ গড়িয়া তুলাই সকল কাজের লক্ষ্য হওয়া চাই। বেঙ্গল-ন্যাশান্যাল-চেম্বার-অব-কমার্সের সাধারণ সভায় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার গ্রাম সংগঠনের এই দিকটার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষন করিয়াছেন। তাঁহার মতে, পল্লীবাসীরা যাহাতে নিজেদের বিশেষ সমস্যাগুলি নিজেরা বুঝিতে পারেন এবং প্রয়োজন মত বাহিরের সাহায্য লইয়া যাহাতে তাহার প্রতিবিধানের উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন, সুবিস্তৃত প্রচারের দ্বারা তাঁহাদের এরূপ শিক্ষাবিধান করিতে পারিলে তদপেক্ষা অধিকতর বাঞ্ছনীয় আর কিছু হইবে না। প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যনীতি প্রভৃতি বিষয়েও বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন কারণ বুদ্ধিমান অধিবাসীরাই মাত্র সমস্যার বিশ্লেষণ ও প্রতিবিধানের উপায় অবলম্বন করিতে পারেন। এইজন্য পল্লীবাসীদের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের জোর চেষ্টার চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় কাজ আর কিছু নাই। জ্ঞান ও বুদ্ধি যে শক্তি লইয়া আসে এবং যে শক্তি আশা ও বিশ্বাস উৎপাদন করে সেই শক্তির দ্বারা পল্লীবাসীদিগকে সজ্জিত করিতে হইবে। বর্ত্তমানের বিষণ্ণ ও নৈরাশ্যপূর্ণ মনোভাবের পরিবর্ত্তে ভবিষ্যতের প্রতি আশা ও বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

পল্লীর নানাবিধ দুঃখ, দুর্দ্দশা ও দৈন্যের মূলে নিঃসন্দেহ আমাদের অজ্ঞতা রহিয়াছে। কিন্তু সম্ভবতঃ তদপেক্ষাও অধিকতর দায়ী আমাদের সংঘবদ্ধভাবে কাজ করিবার ক্ষমতার ও উদ্যমের অভাব এবং ভবিষ্যতের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থাহীনতা। শুধুমাত্র শিক্ষার প্রসারের দ্বারা যদি অভীষ্ট সিদ্ধ হইত, তাহা হইলে শিক্ষিত পল্লীগুলি বর্ত্তমানের দুর্দ্দশা হইতে মুক্ত হইত। পল্লীগুলির আর্থিক উন্নতির উপর

ইহার অন্যবিধ উন্নতি বিশেষভাবে নির্ভরশীল হইলেও ধনের উপরই উন্নতি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে না। বাংলাদেশের অধিকাংশ পল্লী দরিদ্র হইলেও, দুই একটি ধনী পল্লী নাই, এমন নহে। কিন্তু সেগুলিরও অবস্থা বিশেষ আশাপ্রদ নহে। আরও অন্যান্য অনেকের ন্যায় যে শ্রীযুক্ত সরকারও পল্লী-সংগঠনের জন্য সর্ব্বাগ্রে শিক্ষার এবং তৎপরেই কৃষি, শিল্প প্রভৃতির উন্নতির আবশ্যকতার কথা বলিয়াছেন, তাহা এই দিক দিয়া সত্য যে শিক্ষা এবং অর্থ ব্যতীত কোনপ্রকার হিত ও উন্নতিকর কার্য্য সম্ভব নহে। কিন্তু, আমাদের মনে হয় আমাদের দুর্দ্দশার ইহার চেয়েও বড় কারণ উদ্যমের এবং সংঘবদ্ধভাবে কাজ করিবার ক্ষমতার অভাব।

আমরা যে অস্বাস্থ্যে ও অজ্ঞতায় ডুবিয়া আছি, রোগ ও দারিদ্র্য আমাদের নিত্য সঙ্গী হইয়াছে, শিল্প ও ব্যবসাগুলি আমাদের হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছে তাহার প্রধান কারণ, সকলে মিশিয়া পরস্পরের সহযোগিতায় কাজ করিবার মত চরিত্রের বলিষ্ঠতা আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। আপাত প্রয়োজনের বাহিরেও বাঁচিবার জন্য যে সকল কাজ নিতান্ত অপরিহার্য্য তাহা করিবার মত উদ্যম এবং বহুদিন নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ ভোগ করিয়া, কোনপ্রকারে যে ইহার অবসান হইতে পারে ভবিষ্যতের প্রতি এই বিশ্বাসও আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। যে শিক্ষার এবং অর্থের এত প্রয়োজন তাহার জন্যও সর্ব্বপ্রথম বিশ্বাস, উদ্যম এবং মিলনের শক্তি জাগ্রত করিতে হইবে।

বাঙ্গালীর রক্ষা আবশ্যক

ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সাধারণ বার্ষিক সভায় শ্রীযুক্ত পি-এন-ঠাকুর তাঁহার অভিভাষণে বাঙ্গালী যুবক ও শ্রমিকের ভয়াবহ বেকার অবস্থার উল্লেখ করিয়া বাংলাদেশে বাঙ্গালীদের রক্ষার জন্য আইন প্রণয়ণের দাবী করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে এমন দিন যায় না যে দিন কোন না কোন প্রদেশে বাঙালীদের নিষিদ্ধ হইবার বার্ত্তা সংবাদপত্র বহন করিয়া আনে না। আজ বিহারে, কাল যুক্তপ্রদেশে, তার পরদিন পাঞ্জাবে, রূপে অন্যান্য প্রত্যেক প্রদেশেই। অবাঙ্গালীদের যে দলে দলে বাংলায় আগমনের ফলে,বাঙ্গালীদের স্বার্থহানি, ধ্বংস এবং অনাহার অনিবার্য্য হইয়াছে, হিন্দু মুসলমান প্রত্যেক বাঙ্গালীরই তাহার বিরুদ্ধে একযোগে উঠিয়া দাঁড়াইবার সময় আসিয়াছে। অন্যান্য প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের ন্যায় আমাদের গভর্ণমেণ্টও যাহাতে আমাদিগকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করেন, ও আমাদিগকে সাহায্য করেন তাহার জন্যও চেষ্টা করিবার সময় আসিয়াছে।

তিনি এজন্য সরকারকে প্রয়োজন হইলে আইন প্রণয়ণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, এবং এ আশ্বাসও দিয়াছেন যে এই প্রকার ব্যবস্থা দেশের লোকের সমর্থন পাইবে। আইনের উপযোগিতা সম্বন্ধে সকলে একমত না হইলেও, বর্ণিত অবস্থা যে বর্ণে বর্ণে সত্য তাহা প্রত্যেক বাঙ্গালীই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন। বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে বিদ্বেষের সৃষ্টি হয় তাহা অবশ্য আমরা চাহি না, তবে ইহাও চাহি না যে বাঙ্গালীদের দুর্ব্বলতার (ক্ষমতাহীনের ঔদার্য্য দুর্ব্বলতারই নামান্তর) সুযোগ লইয়া সকলেই নির্ব্বিচারে তাহাদিগকে তাহাদের ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিতে থাকুক।

অর্থোপার্জ্জনের জন্যই বাঙ্গালীরা অন্যান্য প্রদেশে গেলেও তাঁহারা ঐ সকল প্রদেশে গণজীবন গঠনে, শিক্ষা বিস্তারে, ও উন্নতির আশঙ্কা জাগাইবার কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। অন্যান্য প্রদেশবাসীরা বাংলা হইতে যদিও তদপেক্ষা অনেক অধিক অর্থ শোষণ করিয়াছেন তবুও, এখানকার সামাজিক জীবনগঠনে তাঁহাদের দান উল্লেখযোগ্য নহে। কিন্তু বাঙ্গালীরা সমান ব্যবহার পাইবার আশা অপেক্ষা অন্য অন্যায় সুবিধা কিছু চাহেন নাই।

অন্যদের এই কথাটা বুঝাইয়া দিবার দিন আসিয়াছে যে পরস্পরকে সহ্য করিতে না চাহিলে শুধু বাঙ্গালীরাই অসুবিধায় পড়িবেন না।

অবশ্য আমাদের একথাও ভুলিলে চলিবে না যে আমাদের উদ্যম, কর্ম্মশক্তি, কষ্টসহিষ্ণুতা, কার্য্যে সততা এবং সংঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতার অভাবও আমাদিগকে প্রতিযোগিতায় জয়ী হইতে দিতেছে না।

ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক হিসাব

১৯৩৪ সালে ভারতবর্ষ হইতে ১৫১ কোটি টাকার মাল বিদেশে রপ্তানি (পুনঃ রপ্তানি ধরিয়া) হয়; ১৯৩৩ সালে হইয়াছিল ১৪৭ কোটি টাকার। আর ১৯৩৪ সালে বিদেশ

হইতে আমদানি হইয়াছিল ১২৬ কোটি টাকার জিনিস ১৯৩৩ সালে হইয়াছিল ১১৬ কোটি টাকার। অর্থাৎ পার্থক্য ৩৩ সালে ৩১ কোটি টাকা ছিল এবং ৩৪ সালে তাহা নামিয়া আসিয়া ২৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। বাণিজ্যে ভারতবর্ষের নগদ লাভ অবশ্য ৩৩ সালের ৮১·৪ কোটি টাকার স্থানে ৩৪ সালে ৮৫·৯ কোটি টাকা দেখান হইয়াছে। কিন্তু, মনে রাখিতে হইবে যে ইহার মধ্যে ৩৩ সালে সোনা রপ্তানি হইয়াছিল ৫১ কোটি টাকার এবং ৩৪ সালে সোনা রপ্তানি হয় ৬০½ কোটি টাকার। এ খবরও অবশ্য আমাদের পক্ষে নিশ্চিন্ত হইবার মত নহে।

১৯৩৪ সালে ভারতবর্ষ ৩৩ সাল অপেক্ষা ১৫৮ লক্ষ টাকার কার্পাসজাত বস্ত্রাদি, ৭৩ লক্ষ টাকার রেশম ও রেশম সূত্র ১৫২ লক্ষ টাকার চাউল এবং ৬৩ লক্ষ টাকার রং অধিক আমদানি করিয়াছে। চাউল এবং পাট ও পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের গতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, কয়েকটি দেশ ভারত হইতে রপ্তানি দ্রব্যের প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত করায় সে সকল দেশে রপ্তানি ক্রমাগত কমিতেছে।

জার্ম্মানি, ফ্রান্স ও বেলজিয়মে রপ্তানি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হ্রাস পাইয়াছে।

ত্যাগ সম্বন্ধে আমাদের বিকৃত ধারণা ও ক্রমশিল্পের ভবিষ্যৎ

ত্যাগ আমাদের দেশে চিরদিন মহত্তম আদর্শ বলিয়া পূজা পাইয়া আসিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভোগের আদর্শ নিন্দিত হইয়াছে। ত্যাগের মধ্যে একটা শক্তির পরিচয় আছে বলিয়া এবং সাধারণতঃ কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভোগসুখ হইতে বিরত হইতে হয় বলিয়া ইহা সহজেই লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে এবং শ্রদ্ধা পাইবার দাবী রাখে। অন্যদিকে বিলাস ও ভোগ আত্মপরায়ণতার নিদর্শন বলিয়া এবং অনেক সময়েই তাহার পশ্চাতে বঞ্চনার ইতিহাস থাকে বলিয়া অর্থাৎ একদিকে ইহা মানুষের নৈতিক অপকর্ষের সূচনা করে বলিয়া স্বভাবতঃই ইহা লোকের নিকট প্রশংসার অধিকারী হয় না। কিন্তু, ব্যক্তিগত জীবনে এই কথা অনেক সময় সত্য হইলেও, সামাজিক জীবনে অনেক ক্ষেত্রেই ইহা মিথ্যা হইয়া পড়ে। তদ্ব্যতীত ব্যক্তিগত জীবনেও ত্যাগ সম্বন্ধে আমাদের মনে অনেক ভুল ধারণার উদ্ভব হইয়াছে।

যাঁহারা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ত্যাগের ব্রত গ্রহণ করেন, তাঁহাদের ত্যাগের দ্বারা সমাজ লাভবান হয়। সমাজকে তাঁহারা যতটা দান করেন, বাধ্য হইয়া নিজেদের ভোগ-সুখের অংশ হইতে তাঁহাদের ততটা বিসর্জ্জন করিতে হয়। এই শ্রেণীর লোকের ত্যাগ ও সেবার ফলে, মানব সমাজের রক্ষা ও অগ্রগতি সম্ভব হইয়াছে; ভবিষ্যতেও সমাজকে ইঁহাদের উপরই নির্ভর করিতে হইবে। কিন্তু, সাধারণের পক্ষে এই আদর্শ গ্রহণ করা এবং তদনুসারে জীবন নিয়ন্ত্রিত করা সহজ নহে, ফলে বিকৃতি স্বাভাবিক। ত্যাগের প্রকৃত অর্থ আমাদের কাছে সব সময় ধরা পড়ে না বলিয়া, প্রায়ই এমন দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধনী টাকা জমাইতেছেন এবং সাদাসিধা জীবনযাপন করিয়া লোকের প্রশংসা পাইতেছেন। অর্থাৎ সরল জীবনযাপন করিয়া তাঁহার যে অর্থ বাঁচিতেছে, তাহা সঞ্চিত হইতেছে। ত্যাগ তাঁহার পক্ষে প্রকৃত হইত যদি সদাসিধা জীবন যাপন করিয়া সমস্ত উদ্বৃত্ত অর্থ তাঁহারা কোন জনহিতকর কার্য্যে প্রদান করিতেন। নহিলে, সঞ্চয় সমাজের বিরুদ্ধে একটা বড় অপরাধের মধ্যে পরিগণিত হওয়া উচিত। কোন বিশেষ অবস্থার মধ্য দিয়া দশজনের অর্থ একজনের নিকট যায়; কিন্তু, কোথাও গিয়া ইহা আটক পড়িয়া গেলে, সমাজ ইহার সুবিধা হইতে বঞ্চিত হয়। যাহার হাতে অর্থ সঞ্চিত হয়, তাহার যদি জীবনযাত্রার মান বাড়িয়া যায়, নানাপ্রকার বিলাসের দ্রব্যাদি তাঁহাকে ক্রয় করিতে হয়, নিজেদের নানাপ্রকার কার্য্যের জন্য নানা লোককে নিযুক্ত করিতে হয় তবে, সাধারণের মধ্যে তাঁহার অর্থ বণ্টিত হইতে পারে। যদি কোন ধনী ব্যক্তি অপরের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া নিজের কোন কার্য্য নিজেই সম্পন্ন করেন তবে, লোকে তাঁহার সরল ব্যবহারের প্রশংসা করিবে বটে; কিন্তু, তাঁহার চারিপাশে কর্ম্মাভাবে যে সকল লোক অর্থাভাব ভোগ করিতেছে তাহাদের কেহ যে এই সুযোগে তাঁহার নিকট নিজের পরিশ্রম বিক্রয় করিয়া, অক্ষুণ্ণ আত্মমর্য্যাদার সহিত তাঁহার অর্থের

কিছু অংশ গ্রহণ করিতে পারিত, এইরূপে তিনি তাহাকে সে সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিয়া অন্যায় ভাবে সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করিলেন। যদি কেহ সামর্থ্য থাকিতে কুলিকে পয়সা না দিয়া নিজের মোট নিজেই বহন করেন তবে, তাঁহা মহত্ত্বের আবরণে স্বার্থপরতা হইয়া দাঁড়াইবে।

আমরা যদি ত্যাগের আদর্শকে বড় করিয়া দেখিয়া জীবনযাত্রার মান ছোট করিয়া ফেলি তবে, আমাদের কর্ম্মশক্তি অনেকটা পঙ্গু ও শিথিল হইয়া পড়িবে এবং সমাজের সর্ব্বস্তরে ধন বণ্টনের অসুবিধা ঘটিবে। বর্ত্তমানে আমাদের অধিকাংশ বিলাসদ্রব্য এবং বহু প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিদেশ হইতে ক্রয় করিতেছি বলিয়া, বিলাসচর্চ্চায় আমাদের দেশের আর্থিক ক্ষতি হইতেছে। ইহার প্রতিকারের জন্য যাহাতে এই সকল দ্রব্য আমাদের দেশে প্রস্তুত হইতে পারে তাহার জন্য চেষ্টা করা দরকার। আমাদের দেশের ছোট বড় অনেক শিল্পের ভবিষ্যৎ দেশের চাহিদার উপর নির্ভর করিতেছে বলিয়া, প্রয়োজনাতিরিক্ত জিনিস ব্যবহারের অভ্যাস নষ্ট হইতে দেওয়া ভাল হইবে না। বরং দেশে যে সকল কাজের এবং সখের দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতেছে, তাহার যেগুলিকে আমরা কাজে লাগাইতে পারি, তাহা আমাদের কিনিবার অভ্যাস গড়িয়া উঠা দরকার।

কেহ হয়ত মনে করিতে পারেন, লোকের সম্মুখে যদি ত্যাগের আদর্শ না থাকে তবে, লোকে বিশেষভাবে আত্মপরায়ণ হইয়া উঠিবে এবং যাহাতে নিজের ব্যক্তিগত লাভ নাই এমন কোন কাজ কেহ করিতে চাহিবে না। এই কথার প্রতিবাদের জন্য আমরা পাশ্চাত্য জগতের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিতে চাহি। আমাদের দেশে ত্যাগ ও সরলতার আদর্শ চিরদিন সম্মানিত হইয়া আসিতেছে; তবুও নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থের বাহিরে দশজনের জন্য দশজনে মিশিয়া আমরা কোন কাজ করিতে পারি না বলিয়াই আমাদের এত দুর্গতি; অর্থের অভাবে অর্থাৎ আমাদের ত্যাগের শক্তির অভাবে আমাদের জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলি শুকাইয়া মরে। আর ইউরোপের সর্ব্বপ্রকার জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের বহুলাংশ সেখানকার ধনীদের ও সাধারণ লোকের দানের ফলে গড়িয়া উঠিয়াছে। জাতীয় স্বার্থ এবং মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য বা রক্ষার জন্য সেখানকার লোকে যে ভাবে ধনপ্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারে, তাহা আমাদের কল্পনাতীত। গবর্ণমেণ্টের চেষ্টার ফলেও, পাশ্চাত্যের বিভিন্নদেশে যে সকল উন্নতিমূলক কাজ হইতেছে, তাহারও পশ্চাতে ঐ সকল দেশের লোকের নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থের বাহিরে—অনেক সময় বিরুদ্ধে—সাধারণের হিতের জন্য দলবদ্ধভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে।

কেহ ত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইলেই তিনি দেশ বা সমাজের সেবা করিতে পারেন না; দেশ বা সমাজসেবায় অনুপ্রাণিত হইলেই তবে অনেক সময় ত্যাগের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এই প্রকার সেবায় যিনি যতটা আত্ম-নিয়োগ করিতে পারেন, নিজের স্বার্থ তাঁহাকে ততটা ত্যাগ করিতে হয়; ইহাই প্রকৃত ত্যাগ এবং এই ত্যাগই শ্রদ্ধা ও সম্মানের যোগ্য। আমরা যাঁহাদিগকে ত্যাগী পুরুষ বলিয়া সম্মান করিয়া থাকি তাঁহারা এইভাবেই ত্যাগ করিয়াছেন। ত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইলে কেহ দেশ বা সমাজ সেবায় ব্রতী হইবেন এরূপ মনে করিলে ফলকে কারণ বলিয়া ভুল করা হইবে।

অবশ্য একথা কেহ মনে করিলে আপাতদৃষ্টিতে অন্যায় করা হইবে না যে, ভোগের আদর্শ আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের নৈতিক আদর্শকে কিছু ছোট করিয়া ফেলিতে পারে। কিন্তু, একথা কখন সত্য হইবে? ইচ্ছা করিয়া জ্ঞাতসারে আত্মতৃপ্তির জন্য যখন আমরা ভোগের দিকে ঢলিয়া পড়িতে থাকি তখনই ইহার প্রভাব আমাদের উপর ভাল না হইতে পারে। কিন্তু জীবনযাত্রার সাধারণ মান যখন বাড়িয়া যায়, তখন সেই বর্দ্ধিত মানের অনুযায়ী ব্যবস্থায় আমাদের মনে ভোগের ইচ্ছা জাগাইয়া না তুলে অথবা সে সময় আমরা ভোগ সম্বন্ধে সচেতনও থাকি না।

যে সমাজে শুধুমাত্র একখানা কটিবাস পরিধানই সাধারণ নিয়ম সে সমাজের কেহ ভাল একখান বড় কাপড় ও একটা জামা পরিধান করিলে, তিনি বিলাসী বলিয়া পরিগণিত হইবেন; এবং সম্ভবতঃ এক্ষেত্রে পরিধানকারীর মনও বিলাসিতা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু যে সমাজে ঐ প্রকারের কাপড়,

একাধিক জুতা, প্রভৃতি পরিধান করাই সাধারণ নিয়ম, সেখানে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি বিলাসী বলিয়া গণ্য হইবেন না; বরং নিজের পরিচ্ছদের অসম্পূর্ণতার জন্য তাঁহার মনে লজ্জার ভাবই থাকিবে।

কাজেই, সাধারণভাবে সকল লোকের জীবনযাত্রার মান বাড়িয়া গেলে কোন দিক দিয়া আমাদের কাহারও কোন ক্ষতির কারণ নাই; সকল দিক দিয়াই লাভের আশা আছে। ত্যাগ সম্বন্ধে অনেকের মনেই যেরূপ ভুল ধারণা আছে এবং একশ্রেণীর লোকের মধ্যে সেই ভুল ধারণা যে ভাবে ছড়াইতেছে তাহা শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি ও ধন বণ্টনের পক্ষে অন্তরায় হইতে পারে।

কংগ্রেস সোসালিষ্ট দল ও সুভাষবাবু

কংগ্রেসের তথা দেশের রাজনীতিক ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণভাবে সোসালিষ্ট দলের কর্ম্ম ও নীতির উপর নির্ভর করিতেছে,—এই মত শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ইউনাইটেড্ প্রেসের নিকট এক পত্রে ব্যক্ত করিয়াছেন। কংগ্রেসের জাতিগঠনমূলক অরাজনৈতিক কাজগুলির ভার তিনটি অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উপর অর্পিত হইয়াছে এবং আইন সভাসম্বন্ধীয় কাজগুলি ব্যতীত অন্য কোন রাজনীতিক কর্ম্মতালিকা কংগ্রেসের সম্মুখে নাই। অন্যদিকে কংগ্রেসের বর্ত্তমান কর্ণধারগণ যে পদ্ধতিতে কংগ্রেসের কার্য্য পরিচালিত করিতে চাহিতেছেন তাহাতে, কেহ কেহ মনে করিতেছেন যে কংগ্রেস রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান না থাকিয়া কতকটা ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। এরূপ অবস্থার মধ্যে স্বভাবতঃই লোকে কংগ্রেসের মধ্যে এমন শক্তির উদ্ভব দেখিতে চাহিতেছে যাহা দেশকে নূতন পথে ও নূতন আদর্শে পরিচালিত করিতে পারে। কংগ্রেস সোসালিষ্ট দল কংগ্রেসপন্থী তরুণদের লইয়া গঠিত এবং রাষ্ট্রিক চিন্তার দিক দিয়াও এই দল সর্ব্বকনিষ্ঠ। কাজেই ইঁহাদের উপর দেশের ভবিষ্যতের জন্য অনেকেই আশা পোষণ করিতেছেন। সুভাষচন্দ্র ইঁহাদের চিন্তার অস্পষ্টতা ও আদর্শের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যে অভিযোগ করিয়াছেন, কংগ্রেস সোসালিষ্ট দলের পক্ষ হইতে তাহার প্রতিবাদ করা হইয়াছে।

রাজনীতির প্রধান ভিত্তি হইতেছে অর্থনীতি। আমাদের দেশে আর্থিক ব্যবস্থার গঠন অন্যান্য দেশ হইতে অনেক পৃথক। এই দেশের উপযোগী কি প্রকারের শাসনতন্ত্র এবং রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক আদর্শ ইঁহাদের কাম্য, তাহা আজও সাধারণ লোকে জানে না। যাহাতে কাহারও স্বার্থ অন্যায়ভাবে ক্ষুণ্ণ না হয়, কোন বিশেষ শ্রেণীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব বা কোন শ্রেণীর উপর অবিচার না হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইঁহারা রাষ্ট্রতন্ত্রের একটা আভাসমূলক খসড়া প্রস্তুত করিয়া প্রচার করিলে, সাধারণ লোকে ইঁহাদের আদর্শ আরও স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিত এবং বাদানুবাদের ফলে ইঁহারাও নিজেদের দোষ, ত্রুটি ও দুর্ব্বলতা (কিছু থাকিলে) ধরিতে ও সংশোধন করিতে পারিতেন।

মধ্য-ভিক্টোরিয়া যুগের গণতান্ত্রিকতা

গণপরিষদের অনুপযুক্ততা ও অযৌক্তিকতার কথা বলিতে গিয়া সুভাষচন্দ্র মধ্য-ভিক্টোরিয়া যুগের গণতান্ত্রিকতাকে বিশেষভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। তিনি রাশিয়ার দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছেন যে, রাশিয়া সমস্ত বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির ভোটের দ্বারা নির্ব্বাচিত কোন পার্লামেন্টের দ্বারা শাসিত হইতেছে না; ইহা একটি দলের দ্বারা শাসিত হইতেছে এবং এই দল দেশের লোকের প্রতিনিধিরূপে কাজ করিতেছে বলিয়া দাবী করে। ইটালি এবং জার্ম্মানিতেও এইরূপে একটি দল অন্যান্য সমস্ত রাজনীতিক দলকে চাপা দিয়া নিজেরা সকল রাজনীতিক ক্ষমতা আত্মসাত করিয়াছে এবং ইহারাই দেশের লোকের প্রতিনিধিরূপে কাজ করিতেছে বলিয়া দাবী করে। অন্যদিকে স্পেনের সোসালিষ্ট দল ক্ষমতা হাতে পাইয়া, সদিচ্ছার উদার পরিচয় হিসাবে ফলাফলের কথা না ভাবিয়া প্রাপ্তবয়স্কা সকল স্ত্রীলোককেই ভোটাধিকার প্রদান করেন এবং এই অধিকারপ্রাপ্ত স্ত্রীলোকদের ভোটের ফলে ইঁহারা বিতাড়িত হন। কাজেই, যে দল স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবার আশা পোষণ করে, সেই দলকেই শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রস্তুত করিতে হইবে এবং স্বরাজ লাভ হইলে তাঁহাদের আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে।

স্বরাজ লাভের পূর্ব্বেই হউক আর পরেই হউক দলের সার্ব্বভৌমত্বই আমাদের ভবিষ্যতের জয়ধ্বনি হইবে।

এই দল যদি প্রকৃত পক্ষে ভবিষ্যতে দাঁড়াইতে চায় তাহা হইলে, ইহাকে যুদ্ধের পরবর্ত্তী ইউরোপ ও আমেরিকার রাজনীতিক ও অর্থনীতিক ঘটনাবলী লক্ষ্য করিতে হইবে এবং সেই অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যৎ ভারতের পথ নির্দ্দেশ করিতে হইবে। অভ্যাসজাত সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা পরিহার করিয়া ভবিষ্যৎ ভারতের সম্পূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য ইহাকে প্রস্তুত হইতে হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে দান

অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক প্রদত্ত ৩০,০০০৲ টাকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ধন্যবাদের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। সংস্কৃত, পালি এবং প্রাচ্যদেশীয় অন্যান্য প্রাচীন ভাষার শ্রেষ্ঠ পুস্তকসমূহ যোগ্য পণ্ডিত ব্যক্তিদের দ্বারা বাংলায় অনুবাদ করিবার জন্য এই অর্থের দ্বারা একটা বিশেষ তহবিল গঠন করা হইবে।

ষোল বৎসরের কঠিন পরিশ্রমের ফলে দাতার পিতা শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ একাকী সমগ্র জাতকের পালি হইতে বাংলায় অনুবাদ করিয়া যে বিরাট কার্য্য সমাধা করিয়াছেন, তাহার স্মৃতি স্বরূপে বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক এই অর্থে প্রকাশিত পুস্তকগুলি ঈশান অনুবাদ-মালা নামে খ্যাত হইবে।

বিদ্যার জন্য অধ্যাপক ঘোষের দান অন্যান্য অনুরূপ দানের ন্যায়ই বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। এই দানের পশ্চাতে মাতৃভাষার উন্নতির ইচ্ছা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া ইহাকে আমরা আরও অধিকতর মূল্যবান্ বলিয়া মনে করি। আমরা এই মনে করিয়াই সবিশেষ আশান্বিত হইতেছি যে, বাংলাভাষার ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য দেশ ও সাহিত্যপ্রেমিক বাঙ্গালীদের শ্রম, অর্থ ও উদ্যম সমভাবেই নিযুক্ত হইতে পারিবে।

বাংলায় তৃতীয় মেডিক্যাল কলেজ

প্রতি বৎসর এদেশের বহু সংখ্যক লোক যে সকল রোগে মারা যায়, এবং তদপেক্ষাও অধিক সংখ্যক লোক যে সকল রোগে ভুগিয়া হীনস্বাস্থ্য ও ভগ্নোদ্যম হইয়া বাঁচিয়া থাকে তাহার অধিকাংশ নিবারণযোগ্য এবং চিকিৎসাযোগ্য। অন্যান্য দেশে যে সকল ব্যবস্থার দ্বারা এই সকল রোগ নিবারিত হইয়াছে, চেষ্টা করিলেও আমাদের দেশে সে সকল ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিতে, এখনও বহুদিনের প্রয়োজন হইবে। দেশে যথেষ্ট সংখ্যক উপযুক্ত চিকিৎসক থাকিলে, নিজেদের ব্যবসায় খাতিরে তাঁহাদিকে যতটুকু চেষ্টা করিতে হইবে, তাহার ফলেও অনেক লোক চিকিৎসিত হইবার সুযোগ পাইবে। সাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় অনেক প্রয়োজনীয় জ্ঞানও ইঁহাদের সাহায্যে ছড়াইয়া পড়িবে। সহরগুলিতে আর নূতন ক্ষেত্র না থাকায়, নূতন ডাক্তারদের এখন পাড়াগাঁয়ের দিকে আসিতে হইবে। কাজেই, শুধু ডাক্তারি পড়িতে ইচ্ছুক ছাত্রদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য নহে, সাধারণ ভাবেও দেশের উপকারের জন্য ডাক্তারি পড়িবার সুযোগ বর্দ্ধিত করিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট, জাতীয় আয়ুর্ব্বিজ্ঞান বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে ১৯৩৫-৩৬ সাল হইতে Preliminary Scientific M. B. পর্য্যন্ত পড়াইবার অনুমতি দিয়া সুবিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন। আশা করা যায়, কলেজটি শীঘ্রই একটি পূর্ণাবয়ব মেডিক্যাল কলেজে পরিণত হইতে পারিবে।

শ্রীসুশীলকুমার বসু
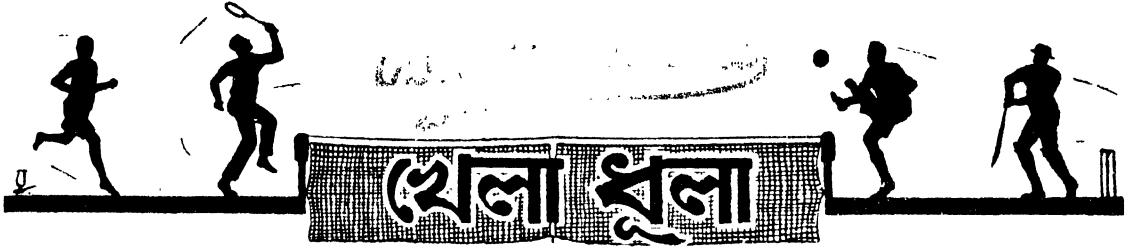
শ্রীবিনয় রায়চৌধুরী এম্-এ

স্পোর্টস্

এ বছরের মত স্পোর্ট্সের পালা শেষ হ'ল। ইহার ফলাফল আলোচনা করলে দেখা যায় (১) এবার স্পোর্টসের ষ্ট্যাণ্ডার্ড বেশ উঁচু (২) কয়েকটি তরুণ খেলোয়াড়দের সাফল্য এবং (৩) মহিলা প্রতিযোগিনীদের আশ্চর্য্য উন্নতি।

বালিকা ব্যায়াম সমিতির স্পোর্টসে টাগ্-অফ্-ওয়ারে বিজেতা স্যার আশুতোষ গার্লস্ স্কুল

[শ্রীযুক্ত সুধীর দত্তের সৌজন্যে]

এবার আবু ইউসুফ্, জেড্ খাঁ, বেন্‌হাম, সাটন্, প্রভৃতির প্রতিযোগিরা দক্ষতার পরিচয় এবং নতুন নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছেন।

ইন্টারভার্সিটি স্পোর্টস, বেঙ্গল অলিম্পিক্ স্পোর্টসএ ১০০ গজ এবং ২০০ গজ দৌড়ে জেড্ খাঁ নতুন রেকর্ড স্থাপন করে সকলকে মুগ্ধ করেছিলেন। দৌড়ে জেড্ খাঁর সমকক্ষ এবার কেউ ছিল না বল্লেই হয়। বিখ্যাত ভারতীয় এ্যাথ্লিট্দের মধ্যে আবু ইউসুফ্ অন্যতম। এবার বেঙ্গল এ্যাথলিটিক্ স্পোর্টস-এ হাইজাম্প প্রতিযোগিতায় ৬ ফুট ৩/৪ ইঞ্চি লাফিয়ে এক নতুন ভারতীয় রেকর্ড স্থাপন করেছেন। হাইজাম্পই ইহার বিশেষত্ব।
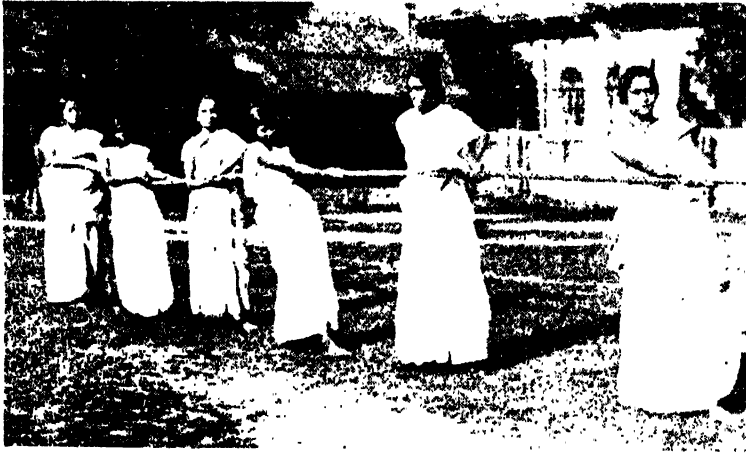
১৯৩০ সালে ভারতীয়দের পক্ষ হতে ইনি জাপানে সুদূর প্রতীচ্য অলিম্পিক্ স্পোর্টস-এ যোগ দিয়েছিলেন। কালীঘাট এবং ইন্টার রেলওয়ে স্পোর্টস এ অর্দ্ধ মাইল দৌড়ে বেন্‌হাম এক নতুন রেকর্ড করেছেন। হার্ডল্‌স-এ সাটন্ অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

বিলেতে অলিম্পিক্ স্পোর্টসে ইনি ভারতীয় পক্ষ হতে যোগ দিয়েছিলেন। মিস্ মার্জরী স্মিথ্ এবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহিলা প্রতিযোগিনী বলে বিবেচিত হয়েছেন। ১০০ গজ বা কোন দৌড়ে আজ পর্য্যন্ত মিস্ স্মিথ্ অপরাজেয় হয়ে আছেন।

তার পরেই মিস্ পূর্ণ ঘোষের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। "বেষ্ট ইণ্ডিয়ান গার্ল এ্যাথলিটিক্" এই বলে মিস্ ঘোষকে সম্মানিত করা হয়। মিস্ ঘোষের ন্যায় স্পোর্টস মহলে বাংলার আরও অনেক মেয়েদের এমন উচ্চ সম্মান পেতে দেখবো আশা করি।

আমহার্ষ্ট ক্লাবের স্পোর্টস্

ই, বি, আর ন্যানশান মাঠে উক্ত ক্লাবের ২৫শ বার্ষিক স্পোর্টস সুসম্পন্ন হয়েছে। কলিকাতার বহুপ্রতিযোগি এই স্পোর্টসএ যোগ দিয়েছিল।

আমহার্ষ্ট স্পোর্টিং ১০০ গজ মহিলা দৌড় হচ্ছে—প্রথম রাণী চাটার্জি
ফটো—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়

কয়েকটি ফল :—

৫০ গজ শ্লো সাইকেল রেস (বালিকাদের)

১ম—কুমারী রমা সেনগুপ্ত (বাগবাজার ইউনাইটেড্) সময় ৩৪ সেঃ

সুঁচ সুতা দৌড়

১ম—কুমারী সুপ্রভা মিত্র, ২য়—কুমারী মেনকা মুখার্জি।

বালিকা ব্যায়াম সমিতির স্পোর্টস্

ডেফ্ এণ্ড ডাম্ব স্কুল মাঠে উক্ত সমিতির প্রথম বার্ষিক স্পোর্টস সাফল্য-মণ্ডিত হয়েছে। খুব কম করে প্রায় ২৫০ শত বালিকা এই স্পোর্টসে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিল।

মেয়েদের এই উৎসাহ ও সাফল্যের পরিচয়ে আনন্দ হবার জন্য কয়েকটি ফল :—

টাগ্ অফ্ ওয়ার (এ গ্রুপ)

বিজেতা স্যার আশুতোষ গার্লস্ স্কুল, বিজিত ডেফ্ এণ্ড ডাম্ব স্কুল।

নিড্ল রেস্ : (বি গ্রুপ্)

১ম—কুমারী আশালতা মুখার্জি (স্যার আশুতোষ স্কুল)

২য়—কুমারী যোগমায়া চৌধুরী (মেট্রোপলিটন স্কুল)

থ্রি লেগেড্ রেস্

১ম—কুমারী লক্ষ্মী ঘোষ ও ভগবতী গাঙ্গুলী (খেলাঘর)

টেনিস্

পশ্চিম ভারত টেনিস্ চ্যাম্পিয়নসীপ্

ভারতের অনেক নামজাদা খেলোয়াড় এই প্রতিযোগিতায়
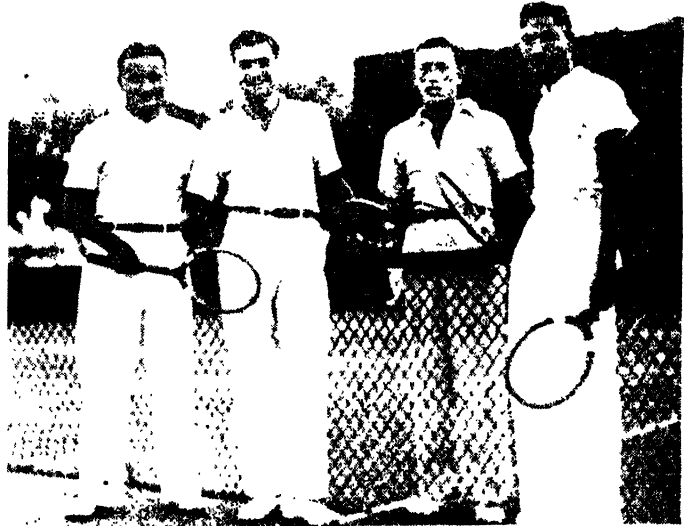
পশ্চিম ভারত টেনিস্ ডবলস ফাইন্যাল চ্যাম্পিয়নসিপ্ (বামদিক হতে) পুনসেক্, কুকুজেভ্, প্যালাডা এবং কৃষ্ণস্বামী। প্যালাডা এবং পুনসেক জয়ী হয়েছেন।
[শ্রীযুক্ত সুধীর দত্তের সৌজন্যে]

যোগ দিয়েছিলেন। সিঙ্গলস এবং ডবলস প্রতিযোগিতায় যুগোশ্লেভিয়া খেলোয়াড়রা অতি সহজেই জয়লাভ করেন।

পশ্চিম ভারত মহিলা সিংগল্‌স্ ফাইন্যালে মিস্ স্যাণ্ডিসন্ জয়ী হয়েছেন।
(বামদিক হতে) মিস্ জেনি স্যাণ্ডিসন্ ও মিস্ লীলা রাও
[শ্রীযুক্ত সুধীর দত্তের সৌজন্যে]

সিঙ্গলস্ ফাইন্যালে প্যালাডার কাছে ৬-৪, ৬-১ গেমে পুনসেকের আবার পরাজয় ঘটেছে। ডবলস্ ফাইন্যালে পুনসেক্ এবং প্যালাডা ৭-৫, ১১-৯ গেমে কুকুজিভ্ এবং কৃষ্ণস্বামীকে পরাজিত করেছে।

মেয়েদের সিঙ্গলস খেলায় ভারতে অপরাজিতা মিস্ জেনি স্যাণ্ডিসন এ দেশের দুই নম্বর খেলোয়াড় মিস্ লীলা রাওকে ৩-৬, ৬-২, ৬-৪ গেমে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।

খেলার প্রথম সেটে লীলা রাও বিশেষ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। কিন্তু ২য় ও ৩য় সেটে স্যাণ্ডিসনের মারাত্মক সার্ভিং ও ষ্ট্রোকের কাছে নিজের গৌরব প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেন না।

এদেশে মহিলা টেনিস প্রতিযোগিতায় মিস্ স্যাণ্ডিসন্‌কে আজ পর্য্যন্ত কেউ হারাতে পারেন নি। ইহা কম কৃতিত্বের পরিচয় নয়।

তবে দুঃখের বিষয় বিলেতে ডেভিস্ কাপ্ খেল্‌তে গিয়ে স্যাণ্ডিসন্ ও লীলা রাও ভারতের নাম রাখতে পারেন নি। আশা করি ভারতের মহিলা খেলোয়াড়রা বিদেশের বিখ্যাত খেলোয়াড়দের পাশে শীঘ্রই নিজেদের আসন প্রতিষ্ঠিত করবেন।

টেনিস্ ইণ্টার-ন্যাশনাল্ ম্যাচ

সেদিন বম্বেতে ভারতীয় বনাম যুগোশ্লেভিয়া দলের একটি এক্‌জিবিসন ম্যাচ্ হয়েছিল। এবারও কলকাতার ন্যায় বিদেশী খেলোয়াড়রা জয়লাভ করে। ভারতের বর্ত্তমান ১নং খেলোয়াড় মোহনলাল, প্যালাডা এবং পুন্‌সেকের কাছে বার বার পরাজয় স্বীকার করায় এদেশে টেনিস ষ্ট্যান্‌ডার্ড কত নীচু তাই আমাদের ভাবিয়ে তোলে। অথচ টেনিস্ জগতে আমেরিকা, ব্রিটিশ ও ফ্রান্সের পাশে যুগোশ্লেভিয়ার স্থান এমন কিছুই নয়। আজ পর্য্যন্ত ডেভিস্ কাপে যুগোশ্লেভিয়ার দলের কোন খেলোয়াড়ই সেমি-ফাইনাল বা ফাইনালে পৌছিতে পারেনি।

বিখ্যাত ফ্রেঞ্চ্ প্রোফেশনল র‍্যামিলন্ কলকাতায় এবার খেলতে এসে বলেছিলেন, বিদেশ হতে নামজাদা ট্রেনারদের আনিয়ে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে দেশের তরুণ উন্নত খেলোয়াড়দের শিক্ষা দেওয়া উচিত। টেনিস্ কর্ত্তৃপক্ষের শীঘ্রই এ সম্বন্ধে মনোযোগী হওয়া উচিত।

খেলার ফলাফল :—

পুনেক্ ৬-০, ৫-৭, ৬-৪ গেমে মোহনলালকে হারায়।

প্যালাডা ৬-৩, ৭-৫ গেমে বব্‌কে হারায়।

রঞ্জী ক্রিকেট টুর্ণামেণ্ট-এর ফাইন্যালে দুইদলের ক্যাপ্টেন—
(বামদিক হতে) মিষ্টার এবল (উত্তর ভারত) এবং মিষ্টার জয় (বম্বে)
[শ্রীযুক্ত সুধীর দত্তের সৌজন্যে]

বালীগঞ্জ টেনিস টুর্ণামেণ্ট্

কলকাতার টেনিস্ season এর সর্ব্বশেষ টুর্ণামেণ্ট হল বালীগঞ্জ টেনিস চ্যাম্পিয়নসীপ্। প্রতি-বছরই কলকাতায় বহু বিখ্যাত ও অখ্যাত খেলোয়াড়রা যোগ দেন। এবার সিঙ্গলস ফাইনালে বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন ডি হজেস্‌কে হারিয়ে মাইকেলমোর জয়ী হয়েছেন। মহিলা সিঙ্গলস্ ফাইনালে মিস্ হার্ভে জনসন, মিস্ হোমানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন্।

ক্রিকেট

এম্-সি-সির পরাজয়

প্রথম টেষ্ট্—ইংলণ্ড ৪ উইকেটে জেতে। মোট স্কোর্—ইংলণ্ড ২৫৮, ওয়েষ্ট ইন্‌ডিজ ১০২ এবং ৫১ (৬ উইকেট)।

দ্বিতীয় টেষ্ট্—ওয়েষ্ট ইন্‌ডিজ ২১৭ রানে জেতে। মোট স্কোর্—ওয়েষ্ট ইন্‌ডিজ্ ৩০২ ও ২৮০ (৬ উইকেট), ইংলণ্ড ২৫৮ ও ১০৭।

তৃতীয় টেষ্ট—ড্র হয়। মোট স্কোর্—ওয়েষ্ট ইন্‌ডিজ্ ১৮৪ এবং ১০২ (৫ উইকেট) ইংলণ্ড ২২৬ এবং ১৬০।

চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল এক ইনিংস ও ১৬১ রানে এম্-সি-সি দলকে পরাজিত করেছে। এই জয় লাভের ফলে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল "রাবার" পেল। প্রথম ইনিংস খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ৭ উইকেটে ৫৩৫ রান করার পর তাদের ক্যাপ্টেন জর্জ্জ গ্রাণ্ট্ সেই ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করেন।

এই টিমে সুদক্ষ খেলোয়াড় হেড্‌লির আশ্চর্য্যকর ব্যাটিং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

রঞ্জী ক্রিকেট টুর্ণামেণ্ট ফাইন্যাল—উত্তর ভারত টিম খেলতে নাব্‌ছেন।
[শ্রীযুক্ত সুধীর দত্তের সৌজন্যে]

ক্রমাগত ৮ ঘণ্টার উপর নিখুঁত ব্যাটিং ও বহু সুন্দর ষ্ট্রোক্ দেখিয়ে ২৫০ রান করে নট্ আউট্ হয়ে থাকেন। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ পক্ষ হয়ে টেষ্ট্ ম্যাচে আজ পর্যন্ত এত অধিক রান্ কেউ করেন নি।

মাত্র ১০৩ রানএ ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস খেলা শেষ হয়।

এই আশ্চর্য্য পরাজয়ে সকলেই বিস্মিত হয়েছেন। এম্ সি দলে কম পক্ষে সাত আটটি ইংলণ্ডের বিখ্যাত টেষ্ট খেলোয়াড় এমস্, হ্যামণ্ড, হেণ্ডেন, ওয়াট্ (ক্যাপ্টেন) প্রভৃতি যোগ দিয়েছিলেন।

একমাত্র অষ্ট্রেলিয়ার পরেই ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন-সের ক্রিকেটে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে।

ইহার তুলনায় ভারতীয় ক্রিকেটের ষ্ট্যানডার্ড অনেক পিছনে।

১৯৩৩ সালে এম্-সি-সির কাছে ভারতীয়দের পরাজয়ের কথা সকলেরই স্মরণ আছে।

ইণ্টার কলেজিয়েট বাইচ খেলায় সেণ্ট জেভিয়ার সি পোলিটেক্না টিমকে হারিয়ে দেওয়া হচ্ছে।
ফটো—দেবব্রত চাটার্জী

তারপর অতি দৃঢ়তার সহিত ব্যাটিং করে ৯১ রানে সিলি সকলকে মোহিত করেছিল। ইহার প্রত্যুত্তরে ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস এর মোট রান্ ২৭১। এই দলে একমাত্র এমস্ই ভাল খেলা দেখিয়েছিলেন। তিনি ক্রমাগত ৪ ঘণ্টা ব্যাটিং করে ১২৫ রান করেন। ইডেন ও হেণ্ড্রেনের যথাক্রমে ৫৪ এবং ৪০ রান্ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ২৮০ রানের ব্যবধান থাকায় ইংলণ্ড "ফলো" হতে বাধ্য হল। দ্বিতীয় ইনিংস এ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ-এর বোলারদের মারাত্মক বোলিং-এর কাছে ইংলণ্ড দাঁড়াতে পারলে না।

লীগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান আর রেঞ্জার্সের খেলা। খেলার ফল ১—১ হয়
ফটো—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়

রঞ্জী গোল্ড কাপ, টুর্ণামেন্ট

এই টুর্ণামেণ্টে বম্বাই এবং উত্তর ভারত ফাইনালে উঠেছিল। বম্বাই ২০৮ রাণে জয়লাভ করে রঞ্জীর ট্রফি পেল। প্রথম ইনিংসে বম্বাই ২৬৬ রান করে। ভারতের টেষ্ট খেলোয়াড় মার্চেণ্ট একশতের অধিক রান করে সকলকে মোহিত করেছিল। বাকা খাঁর মত সুদক্ষ বোলারের অনুপস্থিতিতে উত্তর ভারত টিম খুব দুর্ব্বল হওয়া সত্ত্বেও প্রথম ইনিংসে ২১৯ রান করেছিল। দ্বিতীয় ইনিংসে বম্বে ৩০০ রানের মধ্যে মার্চেণ্ট-এর ১২০ এবং ভাজিপদার ৭১ রান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সুদক্ষ বিজয় মার্চেণ্টএর মনোহর ব্যাটিং এবং পার্শি খেলোয়াড় ভাজিপদার-এর মারাত্মক বোলিংএর জোরেই বম্বের এই আশ্চর্য্য জয়লাভ।

ইহার প্রত্যুত্তরে দ্বিতীয় ইনিংসে উত্তর ভারত মাত্র ১৩৯ রান করেছিল।

লীগ, চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান দল

(বামদিক হতে) দাঁড়িয়ে—বি-সেন, এ-দেব, জে-খান, পি ঘোষ, এবং ডি-দাস। বেঞ্চে বসে—আরিফ্, পি-সেন, পি-দাস (ক্যাপ্টেন), এইচ-মিটার, জে-ব্যানার্জ্জী ও এস্-চ্যাটার্জ্জী। মাটিতে বসে—এন্-মুখার্জ্জী

ফটো—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়

ভাইস্‌রয় কাপ,

রঞ্জী কাপ বিজয়ী বম্বের দল ক্রিকেট ক্লাব অফ্ ইণ্ডিয়া দলের কাছে অভাবনীয় পরাজয়ের কথা সকলেই শুনেছে।

ফিরোজ শা কোট্‌লা গ্রাউণ্ডে ইণ্ডিয়া ক্রিকেট ক্লাব প্রথম ইনিংসে মোট ৪৪৯ রান করে ঐ গ্রাউণ্ডে একটা নতুন রেকর্ড করে। দুবছর আগে ভাইস্‌রয় টিমের বিরুদ্ধে এম্-সি-সি দল ৮ উইকেটে ৪৩১ রান করেছিল।

ক্রিকেট ক্লাবের এই আশ্চর্য্য জয়ের প্রধান কারণ ক্যাপ্টেন নাইডুর সুন্দর ব্যাটিং ও বোলিং, বম্বের ভাল ভাল বোলারের বিরুদ্ধে অমরনাথের যাদুকরের ন্যায় সেঞ্চুরি রান, লাল সিং এর চমৎকার ফিল্ডিং এবং নিশারের মারাত্মক বোলিং।

এরা সকলেই ভারতের বিখ্যাত টেষ্ট খেলোয়াড়। ক্রিকেট ক্লাবের এত উচ্চ রানের বিরুদ্ধে বম্বের প্রথম ইনিংসে মাত্র ১০৫ রান সমুদ্রের এক ফোঁটা লোনা জল হয়ে দাঁড়াল। দ্বিতীয় ইনিংসে বম্বের রান হল মাত্র ২০০। বম্বের বিরুদ্ধে দুই ইনিংসে নিশারের বোলিং এভারেজ দেখবার মত। প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেটে ১৫ রান এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৩ উইকেটে ৫৭ রান।

ইণ্টার কলেজ বাইচ প্রতিযোগিতা

কলকাতা ঢাকুরিয়া লেকে বাইচ প্রতিযোগিতার ফাইনালে সেণ্ট জেভিয়ার কলেজ মাত্র এক লেংথ-এ প্রতিদ্বন্দী প্রেসিডেন্সী কলেজকে হারিয়ে জয়ী হয়েছে। ৩ মিনিট ৪৪॥ সেকেণ্ডে প্রতিযোগিতার ১০০০ গজ দূরত্বকে সেণ্ট জেভিয়ার অতিক্রম করে। এই খেলা দেখবার জন্যে বহু সহস্র নরনারীর সমাবেশ হয়েছিল।

ইণ্টার কলেজ বাইচ খেলা বেশী দিনের নয়। সুতরাং তরুণ সেণ্ট জেভিয়ার দাঁড় বাহকদের কৃতিত্ব সেই তুলনায় মন্দ হয়নি। তাছাড়া এ বছরই সর্ব্বপ্রথম বাইচ খেলা শিক্ষা করে এঁরা চ্যাম্পিয়ন হল। এ কম গৌরবের কথা নয়। কলকাতায় বাইচ খেলার ব্যবস্থা তেমন বিশেষ নেই। এক ইউরোপীয়ন ক্লাব ছাড়া বিলাসী ধনী ও বিশিষ্ট ভারতীয়দের আর একটি ক্লাব আছে। ছাত্র এবং সর্ব্বসাধারণের উপযোগী আরও অনেক প্রতিষ্ঠান হওয়া আবশ্যক।

এতদিন পর কলিকাতা ইউনিভার্সিটির কর্ণধারেরা ব্যায়াম চর্চ্চায় এবং বাইচ খেলার প্রতি মনোযোগী হয়েছেন, এ এক শুভ লক্ষণ। বিলেতে অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ এর ইণ্টারভার্সিটি বাইচ খেলা সেখানে জাতীয় উৎসবে পরিগণিত হয়েছে। এ দেশে রেঙ্গুনে ইউনিভারসিটি বাইচ খেলায় বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তারা এ বিষয়ে উদ্যোগী হলে আর ছাত্রদের উৎসাহ থাকলে ভবিষ্যতে অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের অনুকরণে এখানেও ইণ্টারভার্সিটি বাইচ খেলা প্রবর্ত্তিত হবে, আশা করি।

বিজয়ী সেণ্ট জেভিয়ার দল

এন্, ঘোষ; রবি দত্ত (ক্যাপ্টেন); এম্ চৌধুরী; এ চোপরা এবং এ বসু।

বিজিত প্রেসিডেন্সী দল :

কে, ঠাকুর; আর, ঘোষ (ক্যাপটেন); জে, সুর; বি, সেন এবং বি ভট্যাচার্জ্জি।

হকি

এবার হকি লীগে প্রসিদ্ধ মোহনবাগান দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় সারা দেশময় এক অদম্য উৎসাহ ও উত্তেজনার সাড়া পড়ে গেছে।

লীগ খেলা আরম্ভ হবার পূর্ব্বে এ বছর মোহনবাগান চ্যাম্পিয়ন হবে, এ কেউ ভাবে নি। ১৯১১ সালে ফুটবলে দুর্দ্দান্ত গোরা টিমদের বিপক্ষে শিল্ড বিজয়ী মোহনবাগানের অপূর্ব্ব কীর্ত্তির চেয়ে লীগে আজিকার এঁদের সাফল্য কোন অংশে কম নয়। প্রতি বছরই হকি লীগ চ্যাম্পিয়ন হওয়া এংলো ইণ্ডিয়ান টিমদের প্রায় একচেটিয়া ছিল।

প্রথম বার ১৯১১ সাল এবং ১৯২৩ সালে রাঁচি থেকে সুদক্ষ খেলোয়াড় আনিয়ে টিমকে পুষ্ট করে সর্ব্ব প্রথম ভারতীয় টিম গ্রীয়ারই চ্যাম্পিয়ন হয়। সেদিনকার সে উত্তেজনা আজও অনেকে ভুলে যায় নি।

এখন সে গ্রীয়ারের শোচনীয় অবস্থা দাঁড়িয়েছে। হয়ত এবার তাদের দ্বিতীয় ডিভিসনে নেবে যেতে হবে।

এ বছর লীগে একটি বিশেষত্ব শুধু তরুণ বাংলার খেলোয়াড় নিয়ে মোহনবাগান অপরাজেয় হয়ে রইল।

মোহনবাগান মোট ১৫টি ম্যাচের মধ্যে ৯টি খেলায় জয়ী হয়েছে এবং ৫টি খেলায় ড্র করেছে; সর্ব্বশুদ্ধ পয়েণ্ট হয়েছে ২৩ আর রেঞ্জার্সের ২২। ফলে রেঞ্জার্স রানার্স কাপ পেল। টিম হিসাবে মোহনবাগানের এন, মুখার্জ্জি, পি, দাস, দেব আর খাঁ, রেঞ্জার্সের হুজেস, ওস্‌বর্ণ কাষ্টমসের ডিপ্-হোলট্‌স লীগে খেলেছিল চমৎকার। অলিম্পিক খেলোয়াড় এ্যালেন-এর পর এন, মুখার্জ্জির মত গোল-কিপার বাংলায় আর হয় নি।

লীগে অদ্বিতীয় কাষ্টমস্ তেমন সুবিধে করতে পারে নি। আশা করা যায় এবার বাইটন কাপে বাংলারই কোন টিম জয়ী হবে।

বেঙ্গল এ্যামেচার বক্সিং টুর্ণামেণ্ট

এবারকার বক্সিং টুর্ণামেণ্টে ডি, ব্যানার্জ্জি বনাম মিলারের প্রতিদ্বন্দীতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মিষ্টার ব্যানার্জ্জি মুষ্টি যোদ্ধা জে, কে, শীল এর সুযোগ্য ছাত্র। এই তরুণ বাঙ্গালী মুষ্টি যোদ্ধার সঙ্গে অল্ ইণ্ডিয়া রেলওয়ে ব্যাণ্টাম ওয়েট মিলারের সঙ্গে লড়াই হয়। যুদ্ধে ব্যানার্জ্জির দারুণ ঘুঁসি খেয়ে মিলার নক্-আউট হয় এবং ব্যানার্জ্জি বিজয়ী হন।

ফুটবল

বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রিয় খেলা হচ্ছে ফুটবল। হকি seasonএর মাঝামাঝি কলিকাতার ফুটবল মহলে নানা গুজব শুনতে পাওয়া যায়। গত বছর প্রথম ডিভিসন লীগের শেষ স্থান অধিকার করেছিল 'এরিয়ান্স' তবে আই, এফ, এ

কাউন্সিল এবার এরিয়ান্সকে প্রথম ডিভিসন লীগে খেলবার অধিকার দিয়াছে। তার কারণ গত বছর সাউথ আফ্রিকা টুরে এরিয়ান্স টিম তাদের নামজাদা খেলোয়াড়দের ধার দিয়েছিল। এ বছর ই, বি, আর, প্রথম ডিভিসনে অরোরা দ্বিতীয় ডিভিসনে, বি, এন, আর, উত্তরপাড়া, সুবারবন এবং টেলিগ্রাফ তৃতীয় ডিভিসনে এবং মিলন সমিতি রোণাল্ডসে হাট ও শিবশঙ্কর চতুর্থ ডিভিসনে খেলবার অধিকার পেয়েছে। আই, এফ এর নিয়ম অনুসারে এখন হতেই নানা ক্লাবের বহু খেলোয়াড় ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেটের

বম্বে মহিলা জিমখানার দল খেলতে নাবছে।
[শ্রীযুক্ত সুধীর দত্তের সৌজন্যে]

জন্য দরখাস্ত করেছে। গুজব, কালীঘাটের নন্দ চৌধুরী, ভবানীপুরের এস গুইন, মোহনবাগানে যোগ দিয়েছেন।

ই, বি, আর-এ পুরোনো সামাদ, টি সোম, মনা দত্ত, আনোয়ার প্রভৃতির যোগদানে ই, বি, আর টিম খুব পুষ্ট হয়ে গড়ে উঠলো সন্দেহ নাই। গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ন মোহমেডন স্পোর্টিং অনেক বিখ্যাত খেলোয়াড়দের এবছর হারিয়েছে। মাত্র ইষ্ট বেঙ্গল সেলিম এবার এই টিমে যোগ দিয়েছেন। তবে বাইরে থেকে ধার করা ভাল প্লেয়ার আনতে এঁরা মজবুত। ইষ্ট বেঙ্গল টিমে মাদ্রাজের বিখ্যাত রমনা ও লক্ষীনারায়ণ যোগ দিচ্ছেন।

ক্রীড়া জগতের খবর

বিশ্ববিখ্যাত ইংলণ্ডের টেষ্ট ক্রিকেটার জে, হবস্ ৫১ বৎসর বয়সে ক্রিকেট জগত হতে অবসর গ্রহণ করলেন। নানা আশ্চর্য্য ঘটনায় হবসের জীবন পূর্ণ। ছেলে বেলায় ইনি কেম্ব্রিজ ইউনিভারসিটির জাসি কলেজে গ্রাউণ্ডম্যান ছিলেন। পরে সারের বিখ্যাত টম্, হাওয়ার্ড এর হাতেই ইনি শিক্ষার পূর্ণতালাভ করেন। তাঁর ক্রিকেট জীবনের কয়েকটি রেকর্ড—১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত তিনি ৬১,২২০ রান করেছেন।

বিখ্যাত ইংরাজ ক্রিকেটার ডব্লিউ, গ্রেস এর রেকর্ড ছিল ৫৪,৮৯৬। অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৪১টি টেষ্ট ম্যাচে ইনি ৩,৬৩৬ রান করেন। মেলবোর্ণের মাঠে ১৯১১-১২ সালের টেষ্ট ম্যাচে প্রথম ইনিংসে হবসের রেকর্ড পার্টনারসিপ রান হয়েছিল ৩২৩।

বিলেতে মিডলসেক্স ক্রিকেট ক্লাবের বিরুদ্ধে ৩১৬ রান এ নট আউট হয়ে থাকেন।

অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজ ইন্টারভাসিটি বক্সিং যুদ্ধে অক্সফোর্ড ৪ ৩ বাউটে জয়লাভ করেছে। বিজেতা দলে লাহোরের এস্. নন্দ নামে একজন ভারতীয় বক্সিং ব্লু ছিল। পূর্ব্বে কেম্ব্রিজের প্রথম বাঙ্গালী বক্সিং ব্লু পি, এল রায়এর অতীত কীর্ত্তিকলাপ আজও অনেকে ভুলে যায় নি।

স্পোর্টস জগত হতে অদ্বিতীয় জার্ম্মান স্পোর্টসম্যান ডক্টর ওটো পেলজার অবসর গ্রহণ করলেন। ১৯২৬ সালে বিখ্যাত বিলেতের ষ্ট্যামফোর্ড ব্রিজে ১ মিনিট ৫১৪/৫ সেকেণ্ডে অর্দ্ধমাইল দৌড়ে জগতে এক নূতন রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন।

প্রায় ১৫ বছর ধরে দেশবিদেশের নানা প্রতিযোগিতায় ইনি নিজের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে এসেছেন। সেদিনও ৩৫ বছর বয়সে জার্ম্মান অলিম্পিক্ স্পোর্টসে নবাগত তরুণদের হারিয়ে জগতকে বিস্মিত করে দিয়েছিলেন।

বক্সিংএ আজকাল World Champion হলেন Max Baer। ভূতপূর্ব্ব চ্যাম্পিয়ন Max Senmeling তাঁকে যুদ্ধে আহ্বান করেছেন। এই দুই জার্ম্মান যোদ্ধাবৃন্দের লড়াই হবে খুব সম্ভব লণ্ডনে।

ভারত বিলিয়ার্ড বিজয়ী কুমার প্রদ্যুম দেব বিলেতে ব্রিটিশ এম্পায়ার বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়নসিপ্ খেলবার জন্যে যাত্রা করেছেন। নিজের পারদর্শিতার পরিচয় দিয়ে দেশের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবেন আশা করি।

২০শে এপ্রিল ভারতীয় হকিদল নিউজিল্যাণ্ডে যাত্রা করছে। বাংলার আর কার্-এর অনুপস্থিতে অদ্বিতীয় ওয়েলস্ নির্ব্বাচিত হয়েছে। ধ্যান চাঁদের পর ওয়েলসের মত সুদক্ষ সেণ্টার ফরওয়ার্ড এদেশে খুব অল্পই আছে। টিমের ম্যানেজার হয়ে চলেছে পি, গুপ্ত এবং হকি ফেডারেশনের সম্পাদক ডক্টর বেরাম।

ব্যাঙ্গালোরেও নতুন ষ্টেডিয়ম হতে চললো। বাংলার এ বিষয়ে এখনও জল্পনা কল্পনা শেষ হয় নি। কাগজ মারফতে মধ্যে মধ্যে সুসংবাদ পেলেও ভরসা করতে সাহস হয় না।

সিল্ভার জুবিলির ফাণ্ডের জন্য বম্বেতে মেয়েদের একটি হকি খেলার প্রদর্শন হয়েছিল। বম্বের টিম বনাম রেষ্টের খেলা দেখতে বহু গণ্যমান্য লোক এসেছিলেন। খেলায় বম্বে টিম ৪-১এ জেতে। কল্কাতার ন্যায় হকিতে এখনও বম্বের মেয়েরা তত পারদর্শী ও উৎসাহী হয়ে উঠেনি। আশা করা যায় এ বছর থেকে বম্বেতে মেয়েদের হকি খেলা প্রচলন হবে।

কানাডা ও আমেরিকার ফুটবল এ্যাসোশিয়েসন-এর নিমন্ত্রণ পেয়ে স্কট্লণ্ড টিম খেলতে চলেছে। অন্যান্য দেশের ন্যায় ফুটবলে আমেরিকার তত নাম নেই। সুতরাং কানাডাই এ ব্রিটিশদলকে খেলায় ভাল করে জুঝতে পারবে।

এবার ঢাকা হকিলীগের চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ওয়ারী ক্লাব। গত বছরও ঐ টিমই জিতেছিল। মোহনবাগানের ন্যায় উহারা ফুটবল, ক্রিকেট এবং হকিতে ঢাকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টিম।

কুইনস্ ক্লাবে লণ্ডন টেনিস্ চ্যাম্পিয়নসিপে জার্ম্মান খেলোয়াড় ডক্টর প্রেন্, ব্রিটিশ খেলোয়াড় স্পেন্স্কে ৬-১, ৬-৩ গেমে জিতেছিলেন।

গত বছরের ন্যায় এবছরও বিলেতে ফুটবল লীগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আর্শেনল ক্লাব। দেশ বিদেশে এদের আশ্চর্য্য কীর্ত্তিকলাপ ছড়িয়ে পড়েছে। জেমস্, গ্যালাচর প্রভৃতি খেলোয়াড়রা এই টিমেই খেলে। লীগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে—সাণ্ডারল্যাণ্ড্। দুঃখের বিষয় এবার এফ্ এ কাপে আর্শেনল তত সুবিধা করতে পারে নি।

ইণ্টারভার্সিটি স্পোর্টস প্রতিযোগিতায় এবার কেম্ব্রিজ জয়লাভ করেছে। কেম্ব্রিজ ৭টি এবং অক্সফোর্ড ৪টি প্রতিযোগিতায় জিতেছে। ব্রাউন (কেম্ব্রিজ) ৪৪০ গজ দৌড়ে মাত্র ৪৯ সেকেণ্ডে এক নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছেন।

পোলভল্ট বিজয়ী ওয়েবষ্টার (কেম্ব্রিজ) ১২ ফিট ৬½ ইঞ্চ লাফিয়ে খুব অল্পের জন্য বৃটিশকে অলিম্পিক্ রেকর্ডকে ম্লান করে দিতে পারেন নি। ১৯৩০ সালে বণ্ড্ ১২ ফিট ৬¾ ইঞ্চ লাফিয়ে বৃটিশ রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন।

বিখ্যাত সন্তরণ বীর প্রফুল্ল ঘোষ হস্তবদ্ধ অবস্থায় কর্ণওয়ালিস্ স্কোয়ারে ৬২॥০ ঘণ্টা সন্তরণ করেছেন।

প্রফুল্ল ঘোষের নূতন কীর্ত্তি

হস্তবদ্ধ অবস্থায় ৬২॥০ ঘণ্টা নিরবসর সন্তরণ

পৃথিবীর সন্তরণ ইতিহাসে এই প্রথম

চারপদীর ডুন পাড়ির দ্বিতীয় ভঙ্গী

আগামী জুন মাসে একশত ঘণ্টা নিরবসর সাঁতারের উপক্রমণিকা স্বরূপ—এই হস্তবদ্ধ অবস্থায় সাঁতারের আয়োজন করা হয়। প্রফুল্লকুমার গত ৬ই এপ্রিল শনিবার প্রাতে ৭—১৩ মিঃ সময় কলিকাতার হেদুয়া পুষ্করিণীতে সহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিদিগের সমক্ষে জলে অবতরণ করেন এবং সোমবার রাত্রি ১০—৩ মিঃ এর সময় বিরত হন। শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা হাতকড়ি উন্মোচন করিলেই প্রফুল্লকুমার সজোরে ৫০ গজ সাঁতরাইয়া গিয়া পুনরায়

চারপদীর ডুন পাড়ির তৃতীয় ভঙ্গী

কয়েকজন বিখ্যাত সাঁতারুদিগকে ঐ পথ-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাস্ত করিয়া স্বয়ং জল হইতে মঞ্চের উপর লাফাইয়া উঠেন। শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা তাঁহাকে মাল্যের দ্বারায় ভূষিত করিয়া করমর্দ্দন করেন। প্রফুল্লকুমারকে সেই রাত্রের জন্য আমাদের নবনির্ম্মিত সমিতি ভবনে রাখা হয়। প্রায় অর্দ্ধ-

চারপদীর ডুন পাড়ের চতুর্থ ভঙ্গী

ঘণ্টাকাল বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত বসালাপে সময় অতিবাহিত করিয়া প্রফুল্লকুমার নিদ্রা যান। পরদিবস প্রাতে ছয় ঘটিকার শয্যাত্যাগ করিয়া স্বাভাবিক সুস্থ ব্যক্তির ন্যায় সমিতির প্রাঙ্গণে বিশ্রামের জন্য ভ্রমণ করিয়া নয় ঘটিকার সময় পুনরায় পুষ্করিণীতে সাঁতার দিয়া রাজপথে নির্গত হন।

গত ফাল্গুন সংখ্যা বিচিত্রায় আমার লিখিত যে চার-পদী-ডুন্ পাড়ি সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশ হইয়াছে তৎসম্পর্কে তিনখানি চিত্র বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশ করিলাম। শিক্ষার্থী-দিগের মধ্যে এই ধরণের সন্তরণ কৌশলের ব্যাপ্তি লাভ ঘটিলে আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

আগামী সংখ্যায় ট্রাজান বা "কাঁচি-পাড়ি" সম্বন্ধে বিস্তারিতরূপে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীশান্তি পাল

পেয়ালা-রহস্য

"এক পেয়ালা চা"। কি রহস্যই না আছে চায়ের এই পেয়ালাটিতে, কি না যাদু এই নামে! "আনন্দ দেয় অথচ অবসাদ আনে না" যে পেয়ালা বহু শতাব্দী ধরে তার সৌহার্দ্য মানুষের সঙ্গে। সত্যই তাকে মানবতার পাত্র বলা যায়। এই জীবনদায়িনী পানীয়ের পাত্রে চুমুক দিয়ে বহু যুগ ধরে মানুষ পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেছে। কবি তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন: "চা পিহ চঞ্চল, চাতক দল চল চল হে।"

প্রাচীন কিম্বদন্তী অনুসারে চীন দেশই প্রথম পৃথিবীর চা উপহার দেয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতেও দেখা যায়, চা জাপানীদের ধর্ম্মানুষ্ঠানে স্থান পেয়েছে। তারপর ভারতবর্ষ এ পানীয়কে বিশ্বের দরবারে প্রচারিত করেছে। ভারতের এ দান গ্রহণ করে ইংলণ্ড তাকে চিরকালের সামাজিক অনুষ্ঠানে পরিণত করেছে। পাশ্চাত্য জগতে চা-ই ভারতের রাজপ্রতিনিধি। কিন্তু কেমন করে সম্ভব হল এ ব্যাপার? কৌতূহলী পাঠক ইতিহাসের পাতা উল্টোলেই তার উত্তর পাবেন। এই সম্প্রতি ভারতীয় চা-এর প্রগতির শতবর্ষ সম্পূর্ণ হয়েছে।

বর্ত্তমান সভ্যতার প্রতীক হিসাবে, ফুটবল ও টেনিস বলের মত ব্যায়াম-ক্রীড়ার পরিচারিকার সঙ্গেই চায়ের পেয়ালার স্থান। জীবনের আনন্দ ও জীবন-বিলাসের কান্ত-কলার ও প্রকাশ দেখা যায় চা-য়ে। পৃথিবীর সভ্য জাতিগুলির কাছে চা এক নূতন জীবন সঞ্জীবনী; যা শুধু জীবনকে দীর্ঘই করে না, সম্পূর্ণ ভাবে তাকে উপভোগ করবার শক্তিও বাড়িয়ে দেয়। স্বল্প আমাদের জীবনে আনন্দের বরাদ্দ মানুষের আর কতটুকু? সুতরাং যে চায়ের পেয়ালা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের দুঃখ, দুর্ভাবনা, অশান্তি বিতাড়িত করে দিয়ে জীবনের বেসুরো কর্কশ দিকের কথা ভুলিয়ে দেয় তার সম্বন্ধে একটু উচ্ছ্বাসিত হয়ে পড়লে আমাদের দোষ কি দেওয়া চলে?

"চায়ের জন্য বিধাতাকে ধন্যবাদ: চা না থাকলে পৃথিবীর অবস্থা কি হোতো? কি করে তার উদ্ভব হল! চায়ের আগে আমি যে জন্মাইনি এ আমার পরম সৌভাগ্য"—বলেছেন সিড্‌নি স্মিথ্‌। তিনি সকলকালের শ্রেষ্ঠ চা-রসিকদের একজন। তাঁর এ উক্তিতে বিনা দ্বিধায় সায় দেয় না এমন লোক কি কেউ আছে!

পৃথিবীর যত লোক চা পান করে তার অধিকাংশই যোগান দেয় ভারতবর্ষ; চা ভারতের একটি প্রধান জাতীয় ব্যবসায়। জল ছাড়া চায়ের চেয়ে সস্তা কোন কিছু নেই বলেই নয়, ভারতের একান্ত উপযুক্ত পানীয় বলেই চা ভারতের জাতীয় পানীয় হওয়া উচিৎ। ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ক্লান্তিকর গ্রীষ্মকালে, অবসন্ন শরীরের জন্য নিয়ত এমন একটি পানীয় দরকার হয় যা সহজে চাঙ্গা করে তুলতে পারে। এক পেয়ালা চায়ের সঙ্গে এ বিষয়ে কোন কিছুরই তুলনা হয় না। অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা দেশেও চায়ের আদর হওয়া স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত। চায়ের পেয়ালা বিশ্বব্যাপী এই মর্য্যাদা দেখে বিস্মিত হবার কিছুই নেই। সত্যিই চায়ের পাত্রকে মানবতার পাত্র বলা যায়।

প্রাচীন ইতিহাস ও নূতন নীতি

প্রাচীন একটি কাহিনী বলছি। বহু শতাব্দী আগে এদেশে এক হিন্দু তাপস দীর্ঘ নয় বৎসর বিনিদ্রভাবে মোক্ষলাভের সাধনা করেছিলেন। তাঁর নাম বোধিধর্ম্ম।

অষ্টম বৎসরে তিনি দেখলেন ঘন ঘন তাঁর হাই উঠছে। কি করেন কিছুই তিনি বুঝতে পারলেন না। সাত বৎসরের কঠোর সাধনা তাঁর ব্যর্থ হয়ে যায় যায়। মুদিত-প্রায় চোখের পাতা কোন রকমে খোলা রাখবার চেষ্টা করে তিনি চারিধারে খুঁজতে লাগলেন। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি নিকটের ঝোপের ওপর গিয়ে পড়ল। আপনা থেকেই হঠাৎ সে ঝোপের পাতা ছিঁড়ে তিনি চর্ব্বণ করতে

লাগলেন। পরের মুহূর্ত্তে তাঁর নিদ্রা একেবারে গেল ছুটে। দুই জগতে মাঝে আর তাঁকে দোদুল্যমান থাকতে হ'লনা—আলো অন্ধকার জগৎ। সেই অত্যাশ্চর্য্য পাতা চর্ব্বণ করে তিনি তাঁর সাধনা পূর্ণ করলেন।

ভারতের প্রাচীন পুরাণ কথা অনুসারে বোধিধর্ম্মই চায়ের পাতা আবিষ্কার করেন। সাধনায় সিদ্ধ হয়ে বোধিধর্ম্ম চীনে তীর্থযাত্রায় গিয়েছিলেন, সঙ্গে নাকি তাঁর ছিল এই অতি অপরূপ গাছের পাতা। সমস্ত বৌদ্ধজগতে বোধিধর্ম্মই চায়ের প্রচলন করেছিলেন বলে শোনা যায়। চীনের দক্ষিণ জেন সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এখনো প্রতিদিন বোধিধর্ম্মের বিগ্রহের সম্মুখে সমবেত হয়ে চা-পানের অনুষ্ঠান পালন করেন। এ অনুষ্ঠানের সমারোহ অনেক। তার একটি নিয়ম এই যে সমস্ত ভিক্ষুকেই একটি পাত্র থেকেই চা পান করতে হয়। এই প্রাচীন অনুষ্ঠানের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায় জাপানের চা খাওয়ার রীতিতে।

কবে সেই ৫৪০ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করবার জন্যে বোধিধর্ম্ম চীনে গিয়েছিলেন, আর এখন ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ। এই দীর্ঘকালের ব্যবধান—প্রায় চতুর্দ্দশ শত বৎসরেও মানুষের জীবনের চা-পানের অনুষ্ঠানের মূল্য কিছু কমেনি। মানুষের অভ্যাস বদলায়; পুরাতনের জায়গায় নূতন নীতি প্রচলিত হয়; কিন্তু বহুযুগ আগেও চা যা ছিল এখনও তাই আছে। পানীয় হিসাবে তার তুলনা নেই। সেদিন মানুষ চা থেকে যে সান্ত্বনা ও আনন্দ পেয়েছে আজও তাই পাচ্ছে। বর্ত্তমান যুগে শুধু চা প্রচুর পরিমাণে ও আরও বিশুদ্ধ ও মার্জ্জিত ভাবে উৎপন্ন করবার ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছে। সব চেয়ে উৎকৃষ্ট চা, সর্ব্বাপেক্ষা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় ভারতবর্ষে। চা যে ভারতবর্ষের একটি প্রধান জাতীয় সম্পদ এ বিষয়ে কী কোন সন্দেহ আছে?

সার্ব্বজনীন বাণী

আমাদের এই বর্ত্তমান যুগের বিশেষত্ব যদি কিছু থাকে তা এই সামাজিক ও নৈতিক আদর্শ উন্নত করবার পথে এ যুগ অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র এ প্রগতি অবশ্য সমান তালে চলেনি। বিজ্ঞান মানুষকে অনেক দিক দিয়ে প্রকৃতিকে জয় করতে সাহায্য করেছে কিন্তু নিজেকে করতে শেখায়নি।

তার কারণ বোঝা কঠিন নয়। মানুষের উদ্যম আবিষ্কৃত হয়েছে অনেক কিছু কিন্তু তার সবগুলির বিশ্ব-কল্যাণে নিয়োজিত হবার যোগ্যতা নেই। সার্ব্বজনীন ভাবে যে কয়টি জিনিষ সব চেয়ে বেশী সংখ্যক লোকের সব চেয়ে বেশী উপকার করেছে তার মধ্যে চা একটি। মানব-সমাজের নৈতিক ও সামাজিক প্রগতিতে চা-পানের বিশ্বব্যাপী অভ্যাস বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছে। ধনী দরিদ্র সকলের উপযোগী, পরম তৃপ্তিকর সর্ব্বসাধারণের রুচিকর এমন উৎকৃষ্ট পানীয় আর নেই।

সাধারণ ও মাদক অনেক প্রকার পানীয় আছে; কৃত্রিম অস্বাভাবিক পানীয়েরও অভাব নেই; কিন্তু চায়ের স্থান অধিকার করতে পারে এমন পানীয় হাজার চেষ্টা করলেও বোধ হয় খুঁজে পাওয়া যাবে না। তার কারণ আর কিছু নয়। চায়ের মত এমন বিশুদ্ধ, সুলভ, সুস্বাদু, অপকারহীন পানীয় পৃথিবীতে এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। ভারতবর্ষে অন্ততঃ বন্ধু ও প্রিয়জনকে দেবার পক্ষে চায়ের চেয়ে উপযুক্ত কোন পানীয় আমাদের জানা নেই। সাধারণের কাছে চায়ের একটি বিশেষ আকর্ষণ আছে। চায়ে আমরা সকলেই অভ্যস্ত, বন্ধুত্ব ও অন্তরঙ্গতার সমস্ত মাধুর্য্য তাতে আছে।

পৃথিবীর লোকে বৎসরে বিশ হাজার কোটী পেয়ালা চা পান করে থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পৃথিবীর অর্দ্ধেক চা ভারতেই উৎপন্ন হলেও ভারতীয় চায়ের এখনো যথোপযুক্ত কদর দেখতে পাই না। পানীয় হিসাবে চায়ের গুণে জনগণের মধ্যে চা এমন অপ্রধান হয়ে থাকবে কেন? সকলের পক্ষে সুলভ, শরীরের পক্ষে এমন তেজস্কর প্রকৃতিদত্ত পানীয় থাকতে কৃত্রিম পানীয় গ্রহণ করবার কোন প্রয়োজনই আমাদের নেই।

তিনটি বিশিষ্ট উপাদান থাকবার দরুণ চা তেজস্কর সত্ত্বেও কোন অপকার করে না।

১। থেইন্ঃ—ক্যাফিন জাতীয় এক প্রকার পদার্থ। স্নায়ুগুলিকে সবল ও সতেজ করার সঙ্গে পেশীর শক্তিও বাড়ায়। চা-পানের পর মনের ও দেহের উৎসাহ এই জন্যই বৃদ্ধি পায়।

২। বাষ্প-ধর্ম্মী তৈল জাতীয় পদার্থঃ—চায়ের সুগন্ধ ও সুতার এই জিনিষটি থেকেই পাওয়া যায়।

৩। ট্যানিন্ঃ—লবণ যেমন খাদ্যকে মনোমত করে ট্যানিন্ চায়ে দেয় ধারাল স্বাদের বৈশিষ্ট্য।

চা সম্বন্ধে ভুল ধারণা দূর হওয়া প্রয়োজন। চা সত্যই শরীরের চমৎকার তেজস্কর পানীয়। শ্রান্তি হরণ করবার ক্ষমতা তার বিস্ময়কর। শরীর ও মন দুয়েরই অবসাদ চায়ে দূর হয়। নিত্যকার পানীয় হিসাবে চায়ের সত্যকার মূল্য স্বীকৃত হওয়া প্রয়োজন। সকালে শয্যাত্যাগের সময় থেকে রাত্রে আবার নিদ্রা যাবার পূর্ব্বে পর্য্যন্ত যতবার খুশী যেমন ভাবে ইচ্ছা চা পান করা যেতে পারে। চা'য়ে যে না সন্তুষ্ট হয় তার অরুচি সারবে না কিছুতেই।

নেশা-তত্ত্ব

(গল্প-প্রবন্ধ)

শ্রীগিরিজা ভট্টাচার্য্য

ভগবান মানুষ গড়ে তাকে দুটি অপরূপ জিনিষ দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। একটি হচ্ছে তার চলবার দম, অর্থাৎ পরমায়ু। আর একটি হচ্ছে তাকে চালাবার নেশা। দম জিনিষটা অবশ্য সকল জীবকেই দেওয়া আছে, আর মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব বলে যে তার দম সকলের চেয়ে বেশী তাও নয়; কিন্তু এই নেশা জিনিষটাতেই মানুষের বিশেষত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব। অন্যান্য জীবের মধ্যেও কিছু কিছু নেশার আভাস পাওয়া যায়,—যেমন কুকুরের প্রভুভক্তি, জীবমাতার বাৎসল্য, কিন্তু মানুষের নেশা আরো সূক্ষ্ম ধরণের জিনিষ। বলতে গেলে এই নেশা বস্তুটি ছাড়া মানুষের মধ্যে আর বিশেষ কিছু নেই। আপনারা বলবেন মানুষের বুদ্ধি, চৈতন্য—এই গুলোই তো হচ্ছে বিশেষত্ব। কিন্তু আমার মনে হয় এগুলি পরবর্ত্তী বৃত্তি, তার সবার আগে থাকে নেশা। বুদ্ধি আর নেশার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকতে পারে, কিন্তু দুই একসঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িয়ে থাকে। যার নেশা নেই, কোনো প্রয়াস নেই, তার বুদ্ধি ক্রিয়া করবে কোন দিকে? তার বুদ্ধিতে বা কি প্রয়োজন, পরমায়ুতে বা কি প্রয়োজন? নেশাই জীবনকে প্রয়োজন দান করে। জীবন থেকে নেশা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে মানুষ ক্ষেপে যায়, আর তখনও যদি বুদ্ধি কিছু বজায় থাকে তো মানুষ আত্মহত্যা করে। কাকে নেশা বলা হচ্ছে বোধ হয় বুঝলেন; মানুষের নানারকম আকাঙ্ক্ষা আর ভাল লাগা আর মনের টানকে একটি মাত্র নাম দেওয়া যেতে পারে—নেশা। এ আছে বলেই জীবনটা কোন দিক দিয়ে কেটে যায় কেউ জানতে পারে না; মাঝে মাঝে যদি ফাঁক পড়ে তো দৈনন্দিন জীবন দুর্ব্বহ হয়ে ওঠে। আসল কথা, জীবনের উদ্দেশ্য যে কি তা কেউই জানে না; যখন যাতে নেশা লাগে তাকেই বলে উদ্দেশ্য।

নেশা জন্মালেই বুদ্ধি খোলে, সেই ভিত্তির উপর চৈতন্যের বিকাশ হয়। সব সময় কি মানুষের বুদ্ধি থাকে, না সব সময় মানুষ চেতন অবস্থায় থাকে? মানুষ মাত্রেরই মন আছে এবং মন মাত্রেই বুদ্ধি আছে, কিন্তু উত্তেজিত না হলে বুদ্ধি সুপ্ত অবস্থায় থাকে। লোকে বলে শিক্ষার দ্বারা বুদ্ধির উৎকর্ষ হয়। কিন্তু শিক্ষার একটি মাত্র রাস্তা নয়, যে কোনো পথে শিক্ষা দিলেই বুদ্ধি খুলে যায়; অর্থাৎ যে কোনো একটা নেশা ধরিয়ে দিলেই বুদ্ধির ক্রিয়া চলতে থাকে, তার সূক্ষ্মতর পরিণতি ঘটতে থাকে। কিন্তু পরিণতিটা হয় কেবল সেই দিক দিয়েই, অন্যদিকে আর কিছুমাত্র উৎকর্ষ হয় না। যার যেটা নেশা তাকে সেই সেই আবেষ্টনের মধ্যে দেখলে মনে হয় কত বড়, আর কত বুদ্ধিমান, কিন্তু সেই আবেষ্টন থেকে সরিয়ে আনলেই দেখা যায় অন্য বিষয়ে সে একেবারে নির্ব্বোধ, জানোয়ারের সঙ্গে তার আর কোন তফাৎ নেই। তখন সে জীবধর্ম্ম রক্ষা করবার যতটুকু কাজ কেবল ততটুকুই করবে, অর্থাৎ শুধু খাবে দাবে আর হাই তুলবে, মানুষের মত কোনো কাজ তার কাছে পাওয়া যাবে না। মাতালের মদ বন্ধ করে দিলে যে অবস্থা হয়, জল থেকে মাছ ডাঙ্গায় তুললে যে অবস্থা হয়, ডেপুটিবাবুর পেন্সন পাবার পর যে অবস্থা হয়, যুদ্ধের নেশা বন্ধ করে দেবার পর কাইজারের যে অবস্থা হয়েছে, নেশার পথ বন্ধ করে দিলে মানুষ মাত্রেরই ঐ অবস্থা হয়। নেশা-বিহীন মানুষ আর অন্যান্য জানোয়ারের মধ্যে কোনো তফাৎ দেখবেন না। নেশার জোরেই মানুষ এত বড় হয়েছে, একথাটা নেহাৎ ঠাট্টার নয়; অবসর পেলে এটা পরম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে একবার ভাল করে ভেবে দেখবেন।

নেশায় নেশায় আজ মানুষ কোথায় এসে পৌঁছুলো! পৃথিবী ঘুরে চলেছে আপন চালে আর সেখানে মানুষ চলেছে আপন নেশার খেয়ালে। আদি মানুষের তো প্রথম প্রথম জীবনযাত্রার কোন সরঞ্জামই ছিল না, কিন্তু মনের মধ্যে নেশার উপাদান ছিল যথেষ্ট। যা আছে তা তো আছেই, কিন্তু আরো চাই, এই হোলো তার নেশা। নেশা চরিতার্থ করবার পথ খুঁজে নিয়ে ক্রমে একটা করে প্রয়োজন গড়ে তুলতে লাগলো, চাহিদার সঙ্গে জোগান বাড়তে লাগলো, জীবনযাত্রার সরঞ্জামে পৃথিবী ভরে গেল। এখন এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যেন জৈব ধর্ম্মটা নিতান্ত অবান্তর, তার সরঞ্জামগুলোই জরুরী। এ যেন ঠিক রেলগাড়ীর যাত্রী, এক এক জন যাত্রীর সঙ্গে সঙ্গে দশটা করে পুঁটুলির বোঝা! এটা যে দোষের কথা তা বলছি না, হয় তো এইটাই মানুষের গুণ, এই নেশা না থাকলে মানুষ কিছু সৃষ্টি করতেই পারতো না। এই দিয়ে মানুষ অপ্রয়োজনীয়কে প্রয়োজনীয় করে তুলেছে অনর্থককে সার্থক করে তুলেছে। মানুষের শরীরের খোরাক তো সামান্যই, কিন্তু মনের খোরাক নইলে মানুষ বাঁচে না, নেশাই মানুষকে চালায়, নেশার জন্যই মানুষের এত কাজ বেড়ে গেছে। এক মানুষের নেশার খোরাক জোগানো অন্য মানুষের পেশা দাঁড়িয়ে গেছে,—যত রকমের নেশা আছে তত রকমের পেশাও আছে। আর মজা এই যার যেটা পেশা প্রায়ই তার সেটা নেশা নয়,—তার নেশা অন্যত্র, এবং সেটার মাশুল সংগ্রহ করবার জন্য এই পেশা নিতে হয়েছে। যার যেটা নেশা দৈবাৎ তার যদি সেটা পেশা হয় তা হলে তো কথাই নেই। কিন্তু সকলের পক্ষে তা নয়। যে সকল সূক্ষ্ম নেশা আছে তা কেবল মনেরই খোরাক জোগাবে, শরীরের খোরাক তার দ্বারা জোগাড় করতে গেলেই মন বিমুখ হয়ে বসে, মন তাকে একেবারে নিজস্ব দখলে রাখতে চায়। সেইজন্য অনেক সময় মানুষ নিজের প্রিয় নেশাটিকে অতি সন্তর্পণে গোপন করে রেখে দেয়। সকলেরই কিছু না কিছু প্রিয় নেশা আছে, কিন্তু সকলেই সেটা অন্যের কাছে গোপন করতে ইচ্ছা করে, সেটাকে খেলো করতে চায় না। মাতাল যেমন গোপনে মদ খায়, মা তেমনি গোপনে ছেলেকে আদর করে, প্রেমিক গোপনে প্রিয়াকে সম্ভাষণ করে, চিত্রকর গোপনে ছবি আঁকে, লেখক গোপনে বসে বই লেখে, ভক্ত গোপনে ঠাকুরের পূজা করে। এ কথা পরে আবার হবে। কিন্তু নেশার বস্তুটি যাতে সহজলভ্য হয়, অর্থাৎ কেবল খাদ্যপানীয় নয়—যেটি কাম্যবস্তু সেটি যাতে মূল্য দিলেই কিনে নিতে পারা যায়,—এই উদ্দেশ্যেই মনুষ্যসমাজে প্রথমে অর্থমুদ্রার সৃষ্টি হলো। কিন্তু সে উদ্দেশ্য এখন ব্যর্থ হয়ে গেছে,—উল্টে অর্থই এখন এক বিশেষ নেশার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং অধিকাংশের মাথায় এই নেশাই এখন ঢুকেছে। সকলেই জানেন লোকের নিছক অর্থসঞ্চয়ের কথা, যার নেশা ছাড়া আর কোনোই অর্থ নেই।

কিন্তু সাধারণতঃ নেশার প্রবৃত্তিটা একমুখী থাকে না,—সেটা শতমুখী হয়ে আপনাকে চরিতার্থ করে। মানুষের পঞ্চ-ইন্দ্রিয় নেশা উপভোগ করবার জন্য সর্ব্বদা উন্মুখ হয়ে আছে—যখন যে দ্বার দিয়ে পারে রসবস্তুকে গ্রহণ করে। এ-ছাড়া ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বা মন আছে, এবং সাধনা করলে আরো উঁচুদরের নেশার উপযুক্ত সপ্তম ইন্দ্রিয়ও নাকি লাভ করা যায়। সে কথা ছেড়ে দিলেও সাধারণ নেশার বস্তুই তো অসংখ্য রয়েছে! মদ অহিফেন ছাড়া কাব্য, সাহিত্য, নাচ-গান, থিয়েটার-বায়স্কোপ, খেলাধূলা, আড্ডা দেওয়া, বাগান করা, বাড়ী করা, জানোয়ার পোষা, মাছ ধরা, শীকার করা, দেশভ্রমণ, মোটর গাড়ী, এরোপ্লেন,—নানারকম ভোগের নেশা, ত্যাগের নেশা,—আর কতই বা নাম করা যায়! মানুষের নেশা বহুধা বিভক্ত হয়ে খণ্ডে খণ্ডে আপনাকে পরিতৃপ্ত করে।

মানুষ যখন যেটা নিয়ে থাকে, দেখা যায় তখন তাতেই তার নেশা ধরে। কাজের মধ্যেও নেশা আছে, সেটা কেবল কাজেরই নেশা, তার অন্য অর্থ নেই। কাজের মধ্যে নেশা না লাগলে মানুষ কাজ করতে পারে না, তার বুদ্ধি খোলে না, প্রেরণা জাগে না। ঐ যে কেরাণীবাবুটি আফিস ছুটেছে, এবং আফিস থেকে এসেই আবার টুইশন করতে ছুটবে, ওর কিসের নেশা? বলতে পারেন যে ওর মনে মনে একটা আকাঙ্ক্ষা আছে অর্থাৎ নেশা আছে, হয় তো খুব বড় ঘরে মেয়ের বিয়ে দেবে নয় তো ছেলেকে খুব

বড় হাকিম করবে, সেই আশাতেই এত খাটছে। হতে পারে সে কথা, কিন্তু উপস্থিত সে কথাটা ওর মনের মধ্যেই নেই, এখন কেবল কাজে যাবার নেশা। যে যার উপস্থিত নেশা নিয়ে কাজ করে এবং তখন তার মুখটা বেজায় গম্ভীর হয়ে যায়; এটা কাজের নেশার একটি লক্ষণ। ছেলেবেলায় পড়েছিলাম কবি এক জায়গায় লিখেছেন—"মানুষ কেন যে মানুষের প্রতি, ধরে আছে হেন যমের মূরতি?"—কথাটা ভারী মনে লেগে গিয়েছিল। তখন মনে হয়েছিল সত্য কথাই তো, মানুষ এমন হাঁড়ি-মুখ করে থাকে কেন? কিন্তু এখন ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারছি এর অর্থটা কি। মানুষ জানাতে চায় যে কাজের নেশাটাই তার একমাত্র নেশা, আর কিছু সে গ্রাহ্য করে না—যেটা একদম মিথ্যা কথা। সকালের দিকে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালেই দেখতে পাওয়া যাবে হন্ হন্ করে লোক চলেছে,—তাদের সে কি প্রচণ্ড মুখ! আর কিছুই না, মনের নেশাটিকে তারা ঘুম পাড়িয়ে রেখে বেরিয়েছে, এখন কাজের নেশায় তাদের পেয়েছে। কাজ ফুরিয়ে গেলে এ-ভাব আর থাকবে না, তখন আবার রকমারি নেশার আবির্ভাব হবে। আবার অকাজেরও একরকম নেশা আছে যাকে আমরা কুঁড়েমি বলে খুব ঠাট্টা করি। তাও কিন্তু বদলে যায়, চিরদিন একভাবে থাকে না।

নেশা বহুধা বিভক্ত না হয়ে কখনো কখনো একান্তও হয়ে ওঠে। যখন তা হয় তখন মানুষ সাধারণের স্তর থেকে অনেকটা উঁচুতে উঠে যায়। তখন অন্যান্য চিন্তা হয়ে মানুষ একটা নেশাতেই উৎকর্ষ লাভ করতে থাকে, তখন দিন রাত্রি ভেদ থাকে না, আহার নিদ্রা জ্ঞান থাকে না, কারণ তখন বহিরিন্দ্রিয়ের নিরোধ হয়ে গেছে,—আভ্যন্তরিক ইন্দ্রিয়ের কাজ চলছে। কবি, শিল্পী, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, এদের মধ্যেই এই রকম নেশা দেখতে পাওয়া যায়। এক নেশার মধ্য দিয়েই এদের জীবন কেটে যায়, অন্য সব নেশাকে এরা নেশাই মনে করে না। নেশার অবশ্য সমাপ্তি কিছুই নেই, অসমাপ্ত অবস্থাতেই পরমায়ুর দম ফুরিয়ে যায়, তখন তারা সেটা আর একজনের হাতে তুলে দিয়ে যায়। কিছুকাল পর্য্যন্ত হয়তো তার জের চলে, কিন্তু পরের নেশাতে কেউ খুসী হতে পারে না, সকলে নিজের নেশাটাকেই তৃপ্ত করতে চায়, কাজেই সেটা কালক্রমে ডুবে যায় আবার নতুন লোকের নতুন নেশা আবির্ভূত হয়। এরা প্রত্যেকেই নিজের নেশার একাগ্র সাধনা করে। শোনা যায় আগে লোকে অভিষ্ট লাভের জন্য তপস্যা করতো, এবং তার দ্বারা বর লাভ করতো। এও তপস্যা, আর বর লাভ হচ্ছে তার পরিণতি। এই আরাধ্য নেশাকে শ্রীরাধার রূপ দিয়ে তাঁকে পাওয়া আর না পাওয়া নিয়ে সেকালের কবিরা কত কাব্যলীলার সৃষ্টি করে গেছেন।

আবার এর চেয়ে উঁচু নেশা হচ্ছে দেশভক্তির নেশা, দেবতাভক্তির নেশা, ধর্ম্মের নেশা। সে নেশা যদি কারো সফল হয় তবে স্থানীয় জগতে নেশার বান ডেকে যায়, কারণ এ নেশা নিজে ভোগ করলে তৃপ্ত হয় না, সকলকেই ডেকে ডেকে পান করাতে হয়। তাতে কোন বাধা পড়লে রক্তপাত পর্য্যন্ত হয়ে যায়। ইতিহাসের পাতায় পাতায় তার প্রমাণ আছে। কিন্তু যে সব সার্থক-নেশা মহাপুরুষ পৃথিবীর যুগ পরিবর্ত্তন করেন তাঁরা অন্যান্য বিষয়ে একেবারে অমানুষের মত হয়ে যান। লোকে যখন তাঁদের নেশার ভাবটা মর্ম্মে অনুভব না করে তখন বিচার-বুদ্ধি দিয়ে তাঁদের চরিত্রে শত ছিদ্র আর সহস্র অসঙ্গতি দেখতে পায় এবং নিন্দায় মুখর হয়ে উঠে। নিন্দার নেশাও আর এক রকমের নেশা। এই নিন্দার নেশা যাদের পেয়ে বসেছে তারা আর একথা ভাবতে পারে না যে বড় নেশার কাছে ছোট নেশা টেঁকে না। যাঁরা বড় নেশার সন্ধান পেয়েছেন তাঁদের ইন্দ্রিয় বোধও থাকে না, হিতাহিত বিচারও থাকে না, দিগ্বিদিক জ্ঞানও থাকে না। মানুষের সব ছোট নেশাগুলি যাঁদের লোপ পেয়ে গেছে তাঁদের আমরা বলি মহামানব। এই হচ্ছে নেশার চরম উৎকর্ষ।

কিন্তু ছোট থেকে বড় যে নেশাই ধরুক, নেশার সময় মানুষের কিছু না কিছু জ্ঞান লোপ হয়, অর্থাৎ আত্মচৈতন্য নেশার মধ্যে গিয়ে কতক মিশে যায়। তখন মানুষ যে সব কথা বলে সেই কথার স্রোতেই সে ভেসে চলে যায়, তার অর্থটা আর বিচার করতে পারে না। যেমন মনে করুন শাসনের নেশায় কে এক রাজা সমুদ্রতরঙ্গকে সম্বোধন করে বলেছিলেন—"Thus far shalt thou proceed and no

further"—কাকে হুকুম করেছেন তা আর ভেবে দেখেন নি। কিম্বা যেমন আমাদের এক কবি কাব্যের নেশায় গাইলেন—"জননী বঙ্গভাষা, এ জীবনে চাহি না অর্থ, চাহি না মান, শুধু যদি—ইত্যাদি," কথাটার অর্থ ঝোঁকের মাথায় তলিয়ে দেখলে না। আরো অনেক উদাহরণ দিয়ে কার কি নেশা ধরিয়ে দিতে পারা যায় কিন্তু তা অপ্রিয় হয়ে উঠবে, কথাটা এই পর্য্যন্তই থাক।

অতএব যত দিক দিয়েই দেখুন নেশাই হচ্ছে মানুষের একমাত্র খাঁটি কথা। এইটিকেই স্বতঃসিদ্ধ করে মানুষের যে কোনো ক্রিয়াকলাপ বিশ্লেষণ করে দেখুন, তার আসল অর্থ জলের মত সহজ হয়ে যাবে। মানুষ যে কাজই করুক, তাতে যতই প্রহেলিকা কিম্বা ঘনঘটা থাকুক, তার একটি মাত্র কারণ আছে এই নেশা, এ ছাড়া আর কোন জটিলতাই তার মধ্যে নেই। দশ বছর আগে আমি এই সত্যের প্রথম সন্ধান পেয়েছি। তার পর যতই দিন যাচ্ছে ততই এ-ধারণা বদ্ধমূল হয়ে উঠছে। অন্ততঃ দশ বছরের মধ্যে এমন কোনো চরিত্র বা এমন কোনো ঘটনা দেখিনি এই একটি মাত্র কারণ দিয়ে যার অর্থ করা যায় না। কথাটা সত্য কিনা আপনারাও পরীক্ষা করে দেখবেন।

আর এক রকম একাগ্র নেশার কথা বলতে ভুলে গেছি, যেটা বলা বিশেষ দরকার। এ নেশাটা একাগ্র বটে কিন্তু চিরস্থায়ী নয়; এটা পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু গৌণে; যতদিন যার উপর পড়ে ততদিনের মত সেটা একাগ্র হয়েই থাকে। সেটি হচ্ছে স্নেহ, প্রেম, ভালবাসার নেশা। এ নেশাটা বিধাতা নিজে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। শাস্ত্রে বলে মায়া নিম্নগামী। সেটা প্রয়োজনায়। অর্থাৎ যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁর যখন যেখানটায় দরকার পড়ে সেইখানটায় এটা প্রয়োগ করিয়ে দেন এবং দরকার ফুরিয়ে গেলে সরিয়ে দেন, মানুষের এতে বিশেষ কিছু হাত থাকে না। একজন মানুষের দ্বারা আর একজন মানুষকে রক্ষা করাতে গেলে এটা দরকারই হয়। সেইজন্য এর নীচের দিকে অর্থাৎ ছোট এবং অসহায়ের দিকেই গতি। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা করে দেখলেই এটা বুঝতে পারা যায়। জন্মের পর শিশুর উপর মা বাপের যে কি টান তা আর বোঝাতে হবে না।

মায়ের সন্তানের প্রতি যে টান তা যে তাকে গর্ভে ধরেছেন বলেই হ'য়ে থাকে একথা ঠিক নয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পরই যদি তাকে সরিয়ে ফেলা যায় তাহলে এ-টান জন্মায় না, আবার অন্যের সন্তান দুগ্ধপোষ্য অবস্থা থেকে কোনো স্ত্রীলোককে মানুষ করতে দিলে তার প্রতি ঠিক আপন সন্তানের মতই স্নেহ জন্মায়। অতএব স্নেহটা আসলে প্রতিপালনের স্নেহ। এ কথাও পরে হবে। তবে মায়ের স্নেহটাই কেবল দেখা যায় বরাবর চিরস্থায়ী থাকে, তার কারণ ছেলের প্রতি মায়ের প্রতিপাল্য বোধটা কখনই দূর হয় না। কিন্তু ছেলের পক্ষে তো সে কথা নয়! ছেলের যতক্ষণ প্রতিপাল্য না জোটে ততক্ষণ তার মায়ের নামে চোখে জল আসে, ভালবাসার প্রথম শিক্ষাটা মায়ের উপর দিয়েই হয়ে যায়। তারপর যেমনি জোটেন প্রিয়া অমনি তিনিই হন প্রেমের একমাত্র আধার। মা তখন কেবল শ্রদ্ধার পাত্র। তখন মনে হয় ঐ প্রিয়াটিকেই বিধাতা আমার জন্য বিশেষ নির্দ্দিষ্ট করে রেখেছিলেন, এইটি না হলে আমার জীবন কি করে বা থাকে,—ইত্যাদি ইত্যাদি। কালক্রমে সন্তানসন্ততি আসে, আবার আধারের পরিবর্ত্তন ঘটে, কারণ তখন তারই প্রতিপাল্য এবং উপস্থিত স্নেহের প্রয়োজন সেখানে। ক্রমে নাতি-পুতির উপর দিয়ে স্নেহের হাত বদল হতে হতে বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয়। তখন নিজেই অথর্ব্ব, প্রতিপালন করবে কে? বিধাতার স্নেহের প্রয়োজন তখন শেষ হয়ে গেছে, কাজেই তখন অনিত্য সংসার, সবই মিথ্যা মায়া, স্নেহের নেশা ত্যাগ করে তখন অন্য জাতীয় নেশার চর্চ্চা করতে হয়। যাঁরা প্রেমকে শাশ্বত বলে বোধ করেন, অর্থাৎ যাঁরা বর্ত্তমানে ঐ জাতীয় নেশার মধ্যে ডুবে আছেন তাঁরা হয়তো অসন্তুষ্ট হবেন। প্রেম যে শাশ্বত তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার আধারপরিবর্ত্তন ঘটবেই, কারণ বিধাতার সৃষ্টিরক্ষার জন্য তার প্রয়োজন আছে। সান্নিধ্য থেকে ও প্রতিপাল্যবোধ থেকে প্রেম জন্মায়। উপযুক্ত যে কোনো পুরুষকে আর মেয়েকে একসঙ্গে মিলিত করলে প্রেম জন্মাবে,—যদি অবশ্য কোনো বাধা না পড়ে,—এটা নিত্যই দেখছি। কারণ স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে প্রতিপালন-সম্পর্ক আছে। অন্যান্য নেশার মত এ নেশাতেও কোনোরূপ বাধা পড়লে

তার থেকে নানা রকম বৈচিত্র্যের স্থষ্টি হয় বটে কিন্তু নির্ব্বিরোধ হলে কালক্রমে তার স্বাভাবিক পরিণতি ঘটে। সুতরাং স্নেহ ভালবাসার নেশাটা প্রয়োজনের নেশা, দরকার মত সেটা ক্ষণস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী। এমন কথনো দেখেছেন কি যে যৌবনের নেশাটা পরেও ঠিক একই ভাবে থাকে? এসব নেশা কথনো এক জায়গায় স্থায়ী হয় না, মানুষকে ক্রমাগতই টেনে টেনে নিয়ে যায় দূরের দিকে। কবি এই নেশাকেই উদ্দেশ্য করে বলেছেন—"আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী?" কবিতাটা এই অর্থ নিয়ে আর একবার পড়ে দেখবেন।······

ক্ষমা করবেন, আলোচনাটা কিছু দীর্ঘ হয়ে গেল। যাক্, গল্পটা এইবার বলি।

দশ বছর আগেকার কথা। আমরা তথন কলেজে পড়ি, হোষ্টেলে থাকি। পূজার ছুটীতে মৈমনসিংএ কাকার কাছে বেড়াতে গিয়েছিলাম আমি, মেজদা আর জগদীশ। ছুটীর পর তিন জনে একসঙ্গেই ফিরছিলাম। সিরাজগঞ্জের পথে আসাই সহজ, সন্ধ্যার পর ষ্টীমার থেকে নেমে সিরাজগঞ্জ ঘাট ষ্টেশনে রাত্রের প্যাসেঞ্জারটা ধরলাম। এই ট্রেণটা একেবারে সকালে গিয়ে শিয়ালদা পৌছুবে,—সমস্ত রাত্রি আরামে ঘুমানো যাবে মনে করে সেকেণ্ড ক্লাসের তিনটে বার্থ রিজার্ভ করে নিয়েছি। যে গাড়ীতে উঠলাম, দেখলাম সেটাতে আর কোনো প্যাসেঞ্জার নেই, কেবল আমরাই তিনজন। গাড়ীটা আমাদের অধিকারে রইল, এত রাত্রে কে আর এ গাড়ীতে উঠবে,—এই ভেবে তিনটে বেঞ্চিতে তিনজনে লম্বা হয়ে শুয়ে আমরা মনের সুখে গল্প করতে লাগলাম। সিরাজগঞ্জ ঘাটের পরের ষ্টেশনটা সিরাজগঞ্জ বাজার, সহরের যাত্রীরা অনেকে এই ষ্টেশন থেকেও ওঠে। এই ষ্টেশনে পৌছুতেই এক ভদ্রলোক অতি ব্যস্তসমস্ত হয়ে স্ত্রী-পরিবার লটবহর সমেত হৈ চৈ করে আমাদের গাড়ীতে উঠে পড়লেন। সঙ্গে দেখলাম একটি ভদ্রমহিলা,—তাঁর স্ত্রীই হবেন,—একটি ১৪।১৫ বছরের হাফ্ প্যাণ্ট-কোর্ট পরা ছেলে, আর একটি ৪।৫ বছরের মেয়ে; লটবহরের মধ্যে দেখলাম অনেক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সরঞ্জাম, থিওডোলাইট্, লোহার চেন, তিনপায়া লম্বা ষ্ট্যাণ্ড প্রভৃতি, আর ভদ্রলোকের হাতে একটা চামড়ার কেসে গোটানো মাপবার ফিতা। আমরা তাড়াতাড়ি উঠে তাঁদের জায়গা ছেড়ে দিতে গেলাম, ভদ্রলোক অমনি বাধা দিয়ে বলে উঠলেন—"থাক্, থাক্, থাক্, থাক্"—বলেই কুলীদের পয়সা চুকিয়ে দিয়ে আবার তেমনি ব্যস্তসমস্ত হয়ে ফিতেটা হাতে নিয়ে নেমে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়েই রইলেন, ছেলে মেয়ে দুটিও দাঁড়িয়ে রইল। চলে যাবার আগে এদের বসবার জায়গাও করে দিলেন না বা বলেও গেলেন না কোথায় যাচ্ছেন। আমরা একটু আশ্চর্য্যই হলাম, ভাবলাম বোধ হয় কোনো জিনিষ ফেলে এসেছেন তাই তাড়াতাড়ি ছুটে আনতে গেছেন। যাই হোক আমরা একধারের বেঞ্চি ছেড়ে দিয়ে তাঁদের বসতে দিলাম এবং মাঝের বেঞ্চিটাও বাদ দিয়ে অন্য পাশের বেঞ্চিতে গিয়ে বসলাম। ভদ্রমহিলা বেঞ্চির কোণে নিশ্চিন্ত হয়ে বসলেন দেখলুম,—কোনো উদ্বেগ বা ঔৎসুক্যের চিহ্ন দেখলাম না। আমরাও তিনজনে বাইরের দিকে মুখ করে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

কলেজে পড়া ছেলেদের মন অপরিচিত স্ত্রীলোক সম্বন্ধে যেন কেমন কেমন হয়। কথাও বলতে পারে না, মুখ তুলে চাইতেও পারে না, কেমন বাধ বাধ ঠেকে। আর তথন আমরা সবে মাত্র বাইবেলে পড়েছি—"Whosoever looks upon a woman......"

কথাটা মনের মধ্যে টাট্কা হয়ে সর্ব্বদা জেগে আছে। স্ত্রীলোক দেখলেই মনে হয় তার দিকে চাওয়া উচিত নয়, মুখ ঘুরিয়ে রেখে মর‍্যাল্ কারেজ্ দেখানো উচিত। তথন এত জানি না যে মেয়েদের দিকে চেয়ে থাকার নির্লজ্জতা করলে একরকমের দোষ হয়, আবার না চেয়ে দেখার একগুঁয়েমি করলে অন্য রকমের দোষ হয়। কোনো রকম নেশার চোখে দেখলেই দোষ কিন্তু সরল ভাবে দেখলে দোষ নেই, বাইবেলে এই কথাই বলেছে, এতটা বোঝবার তথন আমাদের সময় হয়নি।

কিন্তু গাড়ী প্রায় ছাড়বার সময় হোলো,—ভদ্রলোক তনথও ফিরলেন না। আমরা অসহিষ্ণু হয়ে উঠলাম, ভারী অস্বস্তি বোধ হতে লাগলো। তিনটি অপরিচিত পুরুষের

মধ্যে যুবতী স্ত্রীকে দাঁড় করিয়ে রেখে তিনি গেলেন কোথায়? তিনি কি আর আসবেন না নাকি, ভদ্রমহিলা কি এই রাত্রিকালে একাই আমাদের গাড়ীর মধ্যে থাকবেন? ভদ্রলোক কি ভেবেছেন যে আমরা নিতান্তই নাবালক? আমাদের বয়স-মর্য্যাদায় বড় আঘাত লাগলো। কিন্তু কি আর করা যাবে, এ অপমানের কোনো জবাব নেই, বিপদটা এখন আমাদেরই। তিনজনে চুপি চুপি এইসব কথা বলাবলি করছি এমন সময় গাড়ী ছাড়ার ঘণ্টা পড়লো, বাঁশী বাজলো, —তখন দেখি ফিতা হাতে ভদ্রলোক কোথা থেকে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এসে গাড়ীতে উঠলেন এবং হাসতে হাসতে হাঁফাতে হাঁফাতে আমাদের দিকে চেয়ে বেঞ্চির উপর বসে পড়লেন। আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

গাড়ী ছেড়ে দিলে। আমরা দেখি ভদ্রমহিলাও কোনো কথা বলেন না, ভদ্রলোকও কথা বলে না। মহিলাটি যেমন নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিলেন তেমনই বসে আছেন। ভদ্রলোকও একদম চুপ করে আছেন। আমরা ভেবেছিলাম অন্ততঃ কিছু কৈফিয়ৎ জিজ্ঞাসা করা হবে,—কোথায় তিনি চলে গিয়েছিলেন, এত দেরী হোলো কেন। তা কিছুই না! যেন উনিও জানেন ইনি কোথায় গিয়েছিলেন আর ইনিও জানেন ওঁর সেটা জানা আছে। যেন এই রকম অব্যবস্থার ব্যাপার আর খামখেয়ালির আচরণ মেয়েটির অভ্যাস হয়ে গেছে, এতে নূতন কিছু নেই।

আমাদের মধ্যে মেজদাই একটু বয়সে বড়, একটু সপ্রতিভ এবং কথাবার্ত্তায় কিছু রসিক। ভদ্রলোক একবার আমাদের দিকে ফিরে চাইতেই মেজদা হাতজোড় করে নমস্কার করে বল্লেন,—"অভদ্রতা মাপ করবেন, মশাই বুঝি ইঞ্জিনীয়ারিং করেন?"

ভদ্রলোক একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে বল্লেন,—"হাঁ, ঠিক কথা বলেছেন, আমি জিওলজিক্যাল সার্ভেয়ার। তাইতো মশাই, কেমন করে একথা জানতে পারলেন? আমাকে চেনেন না কি?"

মেজদা তখন তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে তাঁর সঙ্গে যে সব ইঞ্জিনীয়ারির সরঞ্জাম রয়েছে, তাতে এ কথা জানতে বিশেষ বুদ্ধির দরকার হয় না।

মেজদা আবার জিজ্ঞাসা করলেন—"উনি তো আপনার স্ত্রী, আর ঐ দুটি বুঝি আপনার ছেলেমেয়ে?"

ভদ্রলোক একেবারে হো হো করে হেসে উঠলেন। "এইবার ঠকে গেছেন মশাই ঠকে গেছেন। আমার স্ত্রীর তো ঐ বয়স দেখছেন, অত বড় ছেলে কি করে আমার হতে পারে? আরে ওটা একটা চাকর, চাকর! দেখতে পাচ্ছেন না ওটার নেপালীর মত চেহারা? বাঙালীর ছেলে কি ঐ রকম হয়? ওটা একটা চাকর, চাকর! এই,—তুই নীচে নেমে বোস্,—এঃ, বেঞ্চিতে উঠে বসা হয়েছে! দাও তো গো ওকে একটা কম্বল টম্বল। —ও ছেলে নয় মশাই চাকর কিন্তু বেটা একেবারে ছেলের বাড়া। আমরা যখন দার্জ্জিলিং গিয়েছিলাম তখন আমার স্ত্রী ওটাকে কুড়িয়ে এনেছে। ওর বাপ মা কেউ নেই, আমাদের ঘরে চাকরী খুঁজতে এসেছিল। ওঁর তখন ছেলেপুলে হয়নি, নেহাৎ বাচ্ছা দেখে ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। সেই অবধি আদর দিয়ে দিয়ে ওকে একেবারে মাথায় তুলে রেখেছেন। ওকে স্কুলে ভর্ত্তি করে দিয়েছেন,— বেটা এখন থার্ড ক্লাসে পড়ে আর ওঁরই যা ফাই ফরমাস খাটে। বিদ্বান চাকর রাখতে ওঁর ভারি সাধ।"

আমরা একটু অবাকই হলাম। এই চাকর! ওর চাকর কোনখানটায়? এমন ভদ্রলোকের মত পোষাক পরিচ্ছদ, এমন সযত্নে টেরি কাটা, চেহারাটাও সযত্নপালিত, মুখখানাও বেশ নরম! দেখলাম ছেলেটী ভারী চালাক, সর্ব্বদাই মুখ টিপে টিপে হাসছে। দুই বেঞ্চির মাঝে কম্বল পেতে নিয়ে বসে আবার তেমনিই হাসতে লাগলো। সে বেশ বুঝে নিয়েছে তাকে কি রকমের চাকর রাখা হয়েছে,— বুঝে সুঝে আপনার স্থায়ী বন্দোবস্ত করে নিয়েছে। একটু পরেই সে হাসতে হাসতে পরিষ্কার বাংলায় বল্লে—"মা, খাবার টাবার খাবে না?"

ভদ্রলোক অমনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—"হাঁ হাঁ, খাবার বের কর, ভারী ক্ষিদে পেয়ে গেছে।"

টিফিন কেরিয়ার খোলা হোলো, খাবার বের করা হোলো, টিফিন কেরিয়ারের তিনটে বাটিতে তিনভাগ করে খাবার সাজানো হোলো। দেখলাম ভদ্রমহিলা

একটি বাটি দিলেন ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোককে, একটি বাটি দিলেন ছেলেটিকে, আর একটি বাটি নিজের জন্যই ঢাকা দিয়ে একপাশে রাখলেন। ছোট মেয়েটি ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে।

এঁদের খাওয়া হয়ে গেলে ভদ্রলোকটিকে গ্লাসে করে জল দিলেন,—তাঁর জল খাওয়া হয়ে গেলে সেই গ্লাসেই ছেলেটিকে জল দিলেন। বুঝলাম একটি মাত্র গ্লাস, এ ছাড়া উপায় নেই। তার পর ভদ্রমহিলা উঠে হাতমুখ ধোবার জন্য বাথরুমে গেলেন।

বাথরুম থেকে ফিরে এসে তিনি বল্লেন—"খুকিকে দুধ খাওয়াতে হবে।" তার মুখে এই প্রথম কথা শুনলাম।

লটবহরের ভিতর থেকে ভদ্রলোক একটি কাঠের বাক্স বের করে আনলেন। বাক্সটির ডালা খুলতেই দেখা গেল তার মধ্যে বড় নতুন রকমের কারিগরি আছে। প্রয়োজন অনুসারে তার মধ্যে উঁচু নীচু থাক্ করা, এবং একপাশে একটা দুধের বোতল, একপাশে ঝিনুক, এক পাশে বাটি, স্পিরিট ল্যাম্প, ছাঁকুনি, দেশালাই সব এমন ভাবে সাজানো যে স্থানচ্যুত হবার সম্ভাবনা নেই।

আমরা উৎসুক হয়ে জিনিষটা দেখছিলাম। মেজদা বল্লে—"বাক্সটা একবার দেখতে পারি কি" ?

ভদ্রলোক একেবারে মহা উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। "নিশ্চয়, নিশ্চয়,—এটা একটা দেখবার জিনিষ"—বলতে বলতে বাক্সটা হাতে নিয়ে একেবারে আমাদের বেঞ্চিতে উঠে এলেন। বাক্স থেকে জিনিষগুলো এক একটা তুলে দেখাতে লাগলেন ; বাটিটাকে আটকে ধরবার জন্য কেমন গর্ত্ত করতে হয়েছে, ঝিনুকটার জন্য কেমন ক্লিপ্ দিতে হয়েছে, স্পিরিট পড়ে দুধের সঙ্গে না মিশে যায় সে জন্য স্পিরিট ল্যাম্পের একটা আলাদা রকম ঘর করতে হয়েছে, আবার সেটা বাক্সের মধ্যে রেখেই জ্বালা যায়,— তার উপরই দুধের বাটি বসিয়ে দেওয়া যায়।

"এটা আমি নিজে হাতে তৈরী করেছি, বুঝলেন মশাই ! মিস্ত্রিকে দিয়ে কি এ সব কাজ হয় ? দেখুন ওঁর কত সুবিধা করে দিয়েছি। ট্রেনে তো প্রায়ই ঘুরতে হয় কিন্তু ভাবনা করবার কিছু নেই, বাক্স খুল্লেই মেয়ের দুধ গরম হয়ে যাবে। আরে মশাই এর জন্য দস্তুর মত মাথা ঘামাতে হয়েছে, বুঝেছেন ? তবুও উনি বলেন কি না আমাকে দিয়ে ওঁর কোনো উপকার হয় না।"

আরো বোধ হয় কিছু বলতেন, ভদ্রমহিলা বাধা দিলেন। বল্লেন—"বাক্সটা এদিকে দাও।"

"এই নাও, এই নাও,—বাক্সটা পরে দেখাব মশাই, ওঁর আবার একটু ত্রুটি সহ্য হয় না। আগে দুধটা খাওয়ানো হয়ে যাক্।"

দুধ গরম করে মেয়েকে খাইয়ে ভদ্রমহিলা খাবার খেতে লাগলেন। ইতিমধ্যে মেজদা ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোকটির সঙ্গে বেশ জমিয়ে নিয়েছেন। শোনা গেল তিনি জিওলজিষ্ট, ইম্পিরিয়াল সার্ভিস। জিওলজির সার্ভে কি রকম করে করতে হয়, থিয়োডোলাইট কি দরকারে লাগে, পৃথিবীর ভিতর থেকে স্তরে স্তরে কি রকম করে মাটি খুঁড়ে বের করতে হয়, কি রকম করে সে মাটি পরীক্ষা করে দেখতে হয়, কি করে জানতে পারা যায় কোথায় কয়লা আছে আর কোথায় সোনা আছে, এই সব কথায় দুজনে খুব মশ্‌গুল হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে ভদ্রমহিলা বল্লেন—"অনেক রাত হয়েছে, এইবার আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়।"

"ঠিক ঠিক, ঠিক কথা বলেছ। আপনারাও শুয়ে পড়ুন। তাই-তো কোথায় শোবেন ?"

আমরা দুজনে দুটো বাঙ্কের উপর গিয়ে উঠলাম, জগদীশ থাকলো নীচের বেঞ্চিতে।

"রাজুটা ঐখানেই শুয়ে থাক" বলে ভদ্রলোক মাঝের বেঞ্চে নিজের বিছানা পেতে নিলেম, মহিলাটিও ওদিকের বেঞ্চে বিছানা পেতে আবার আলো নেভাবার কথা বলে মেয়েটিকে নিয়ে শুলেন। ভদ্রলোক তখন উঠে গিয়ে গাড়ীর সব আলো নিভিয়ে দিলেন।

আমরা দেখলাম ভয়ানক অন্ধকার হয়ে গেল। গাড়ীতে একটি স্ত্রীলোক রয়েছে, এখানে অন্ধকারে কি করে থাকা যায় ? আর রাত্রে যদি বাঙ্ক্ থেকে নামবার

দরকার হয় তা হলেই তো বিপদ! আমি তখন ভদ্রলোককে বল্লাম—"আচ্ছা বাথরুমের আলোটা যদি জ্বেলে রাখা যায় তা হলে কি আপনাদের অসুবিধা হবে? উনি নীচে রয়েছেন, অন্ধকারে তো ওঠানামা করা যাবে না।"

"না না, ঠিক কথাই তো, ঠিক কথাই তো" বলে ভদ্রলোক বাথরুমের আলোটা জ্বেলে দিয়ে এলেন। বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দিলে উপরকার ঘষা কাঁচের ভিতর দিয়ে যেটুকু আলো আসে তাতে গাড়ীর মধ্যে অতি সামান্যই আলো হয়,—মানুষ, বেঞ্চি, মালপত্র কেবল আব্ছায়া মত দেখা যায়। আমাদের পক্ষে এই যথেষ্ট মনে করে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়লাম।

কিছুক্ষণ সময় কেটে গেল, ঘুম আর কিছুতে আসে না। কেমন যেন একটা অসুবিধা লাগে। কিন্তু তবু চোখ বুজেই পড়ে আছি। বোধ হয় আধ ঘণ্টার উপর কেটে গেল, ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোকের বেশ নাক ডাকছে শোনা যাচ্ছে। আমি কত কি ভাবছি আর মনে করছি সকলেই ঘুমোচ্ছে কেবল আমিই জেগে আছি। খুব জাগা নয়, গাড়ীর অবিশ্রাম ঝাঁকানিতে একটা তন্দ্রার মত ভাব,—খানিকটা চেতন, খানিকটা অচেতন।

হঠাৎ ভদ্রমহিলার বেঞ্চির কাছে ধপ্ করে একটা শব্দ হোলো,—কিছু যেন গুরু পদার্থ নীচে পড়ে গেল। মাথা তুলে দেখি ভদ্রমহিলা নিজের মাথার বালিসটা নীচে ফেলে দিয়েছেন, ছেলেটি সেটা টেনে নিয়ে নিজের মাথায় দিলে। এর পর মহিলাটি নিজের হাতে মাথা রেখে শুলেন। ওদিকে চেয়ে দেখি মেজদাও মাথা তুলে উঁকি মেরে দেখছে। আমায় দেখে মেজদাও শুয়ে পড়লেন, আমিও শুয়ে পড়লাম। আবার সব চুপচাপ হয়ে গেল।

ধপ্ করে ঐ বালিস ফেলার শব্দটা আমার মনের এমন একটা বিস্ময়জনক রহস্যস্থানে ধাক্কা দিলে যার অস্তিত্বের কথা ইতিপূর্ব্বে কখনই টের পাইনি। তন্দ্রা তো ছুটেই গেল, মনের মধ্যে নানা কৌতুহল জেগে উঠলো। কে জানে ঐ ব্যাপারটার ভিতরকার কি অর্থ! মেয়েদের ব্যবহারে বিস্তর রকমের প্রহেলিকা! মহিলাটি অবশ্য মনে করেছেন যে আমরা ঘুমিয়ে পড়েছি, তাঁর স্বামীরও নাক ডাকছে, তাই বালিসটা দেবার সময় কিছু সাবধান হন নি। হয় তো বালিসটা দেবার ইচ্ছা তাঁর প্রথম থেকেই ছিল, সকলের সুমুখে সেটা সম্ভব হয় না বলে তিনি সুযোগের অপেক্ষা করছিলেন। ছেলেটাও নিশ্চয় জেগেছিল এবং এইটাই প্রত্যাশা করেছিল, নইলে বালিসটা পড়া মাত্র সেটা টেনে নেয় কি করে? বোধ হয় এই আদান প্রদানের ব্যাপারটা নূতন নয়, প্রায়ই এমন হয়ে থাকে। ট্রেনে যেতে ছেলেটির জন্যও যে একটা অতিরিক্ত বালিস নিতে হয়ে এ কথা হয় তো স্বামীকে জানানো যায় না, বা প্রকাশ্যভাবে নিজেকেও তা বলা যায় না, সুতরাং এ ছাড়া আর উপায় নেই। একজনের মাথায় বালিস না হলে ঘুম হয় না, আর একজনের নিজের বালিসটা না দিতে পারলে ঘুম হয় না,—দুজনেই সুযোগের অপেক্ষা করে। উৎকণ্ঠা মিটে গেছে, এইবার দুজনেই নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। একজন চায় নিতে আর একজন চায় দিতে,—দুহাজার বার শোনা এই কথা কি বিচিত্রভাবে সেদিন প্রত্যক্ষ করলাম।

কাপড় জামার অন্তরালে থাকে শরীর, শরীরের অন্তরালে মন, মনের অন্তরালে বাসনা! যখন কেউ দেখতে পাবে না, কেউ প্রশ্ন করবে না, কেউ যাচাই বা বিদ্রূপ করবে না, কেবল তখনই মনের বাসনা আবরণ ভেদ করে বাইরে আসে। বাইরের মানুষ কেবল পাহারা দেয়, সে যখন নিরাপদ দেখে তখন ভিতরের মানুষটি প্রকাশ হয়। বাইরের মানুষ আর ভিতরের মানুষ কখনই এক নয়। অতএব মানুষকে কেমন করে চেনা যাবে, গোপনে সে কি কাজ করে তার ঠিকানা কি? এই গভীর রাত্রে আবছায়া অন্ধকারে সুষুপ্ত গাড়ীর মধ্যে দৈবাৎ জেগে উঠে আমরা অতর্কিতে যে জিনিষটি দেখলাম এটা কারো দেখবার সম্ভাবনাই ছিল না। কালের যাত্রাপথে অন্ধকারে অগোচরে মানুষের মধ্যে এমনি কত বিচিত্র ঘটনা ঘটে যাচ্ছে কে তার সন্ধান জানে?

কিন্তু গোপন করে কি লাভ? স্নেহের যে দান আছে এটা তো সকলেই জানে এবং সকলেই মানে, তা কেন আবার গোপন করা? স্নেহকে মানুষ গণ্ডী দিয়েছে, সেই গণ্ডীর বাইরে যখন কেউ যেতে চায় তখনই তাকে ছদ্ম আচরণ করতে হবে। কেবল পরের কাছে নয়, নিজের মনের কাছেও ধরা দেওয়া চলবে না। ভালমন্দের বিচার যখন হতে পারবে না তখনই যাকে আমরা দুর্ব্বলতা বলি সেই জিনিষটুকু বেরিয়ে আসবে। অথচ এইটাই লোকের ব্যক্তিগত সত্তা, এইখানেই তার পরিচয়, আর এইটাকেই সভ্যতা লুকিয়ে রাখতে শিখিয়েছে। তবু এইখানেই তার নেশা লাগে। নেশা তাকেই বলে যা খুব ভাল লাগে আর যাকে খুব গোপন করে রাখতে হয়।

নানা কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম, কিন্তু একটা ঝাঁকানিতে খুব ভোর বেলাই ঘুম ভেঙ্গে গেল। চেয়ে দেখি গাড়ী পোড়াদা ষ্টেশন থেকে ছাড়লো। আরো দেখি মহিলাটি আবার বালিস মাথায় দিয়েছেন আর ছেলেটি বেঞ্চিতে উঠে তাঁর পায়ের তলায় বসে আছে। এ তো বড় মজা!

এর পর দেখলাম ভদ্রমহিলা উঠে কাপড়, সেমিজ, তোয়ালে মাজন সাবান প্রভৃতি হাতে নিয়ে বাথরুমে চলে গেলেন। এই সুযোগে আমি একটু সিগারেট খেয়ে নিলাম। রাত্রে সিগারেট খাওয়া হয় নি, কারণ লক্ষ্য করে দেখেছি ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক এ নেশা করেন না, তা হলে ট্রেনে বসে নিশ্চয়ই তিনি খেতেন। এ অবস্থায় এই বয়োজ্যেষ্ঠের কাছে, বিশেষ ঐ ভদ্রমহিলার সুমুখে সিগারেট খাওয়াটা উচিত মনে হয় নি।

বাথরুম থেকে ফিরে এসে তিনি রাজুকে হাতমুখ ধুতে পাঠিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পরেই সে বাথরুম থেকে ফিট্‌ফাট্ হয়ে এল। ইতিমধ্যে ইঞ্জিনিয়ার বাবু উঠে পড়েছেন এবং আমি আর মেজদা নেমে গিয়ে জগদীশের বেঞ্চিতে বসেছি। ইঞ্জিনিয়ার বাবু আবার মেজদার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলেন এবং ভদ্রমহিলা মেয়েটিকে তুলে মুখ হাত ধুইয়ে দুধ খাওয়াবার ব্যবস্থা করলেন।

গাড়ী নৈহাটি ষ্টেশনে পৌছুলো। ভদ্রমহিলা তখন তাঁর স্বামীকে বল্লেন—"এঁদের চা খেতে বলবে না?"

"হাঁ হাঁ, সে সব আমি ঠিক করে ফেলছি দেখ না" বলতে বলতে তিনি ষ্টেশনে নেমে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটলেন এবং একটু পরেই সোরাবজির হোটেলের দু তিন জন খানসামা সমেত এসে হাজির হলেন। তারা রুটি, মাখন, চা এবং সরঞ্জাম প্রভৃতি রেখে চলে গেল।

মহিলাটি চা প্রস্তুত করতে লাগলেন। ভদ্রলোক তো মহা ব্যস্ত, কেবলই তাঁকে সাহায্য করতে যাচ্ছেন কিন্তু বিশেষ কিছুই করতে পারছেন না। মহিলাটি এইবার তাঁকে বল্লেন,—"তুমি মুখ ধোবে না?"

"ঠিক ঠিক, আসল কাজটাই ভুলে গেছি। আচ্ছা তুমিই সব তৈরী কর, আমি আসছি।" ভদ্রমহিলা তাঁকে বুরুষ মাজন প্রভৃতি বের করে দিলেন, তিনি বাথরুমে প্রস্থান করলেন।

ইতিমধ্যে চা-টা সব তৈরী হয়ে গেছে। একহাতে রুটির প্লেট আর এক হাতে চা নিয়ে তিনি অসঙ্কোচে আমার সুমুখে এসে দাঁড়ালেন, কিন্তু কোনো কথা বল্লেন না। চুড়ি পরা ফর্সা গোল হাতখানি চায়ের পেয়ালা এনে সকাল বেলা মুখের সুমুখে ধরেছে দেখে অভ্যাস মত মায়ের কথা মনে হয়ে থাকবে, বাইবেল ভুলে গিয়ে আমিও অসঙ্কোচে মুখ তুলে চাইলাম। কি চমৎকার সে মুখখানির ভাব! মা নয়, কিন্তু আমাদের তখনকার বয়সে দেখলেই যেন দিদি কিংবা বৌদিদি বলতে ইচ্ছা করে। আপনারা যেন একে সুন্দরী মনে করবেন না, সুন্দরী হতে পারতেন যদি নাকটি একটু লম্বা হোতো আর দুই গালে চোখের কোলে মেছেতার দুটি বড় বড় দাগ না থাকতো। দেখেই প্রথমে মনে হোলো এই দুই দাগেই মুখের শোভা নষ্ট করে দিয়েছে।

কিন্তু তার পরেই দেখতে পেলাম মুখের মধ্যে সেই অপার্থিব ভাবটি, দাগের মলিনতা না থাকলে যার দিকে হয় তো আমার দৃষ্টিই যেতো না। দাগটি ছিল বলেই যেন সে ভাবটি এমন দেখতে পেলাম। পটুয়া যেন মুখের উপর দুটি তুলির ছোপ লাগিয়ে দিয়ে বল্লে এদিকে চেয়ো না, দেখবার জিনিষ অন্যদিকে আছে। চোখ দুটি আর ঠোঁট দুটি সত্যই দেখবার মত, ভিতরে যে কত জিনিষ আছে আর তার যে কি সংযম তা ঐখান থেকেই বোঝা যায়।

চোখের উপর ভাসছে গভীর কৌতূহলময়ী স্নিগ্ধ কত ভাষা, আর ঠোঁটের অন্তরালে কত কোমলতম কথা—যে কথা কখনো উচ্চারিত হবে না, ঠোঁটদুটি কেবল উন্মুখ হয়েই নীরব থেকে যাবে। এ মুখ আমার অনেকদিন পর্য্যন্ত হঠাৎ এক-একবার আপনা আপনি মনে পড়ে গেছে; প্রথমে দেখেছি মেছেতার দাগ, তার পর দেখেছি একসঙ্গে চোখ আর ঠোঁট।

চা ত আমরাই আগে খেলাম। তারপর ওঁরা সকলে খেলেন, রাজু ছেলেটিও ওঁদের সঙ্গে খেলে। তারপর দেখলাম ছেলেটি চায়ের সরঞ্জামগুলো একপাশে সরিয়ে রাখলে। বোধ হয় এই প্রথম ওকে নিজের হাতে কিছু কাজ করতে দেখলাম।

মেজদা হঠাৎ বলে বসলেন—"ছেলেটি তো বেশ চালাক, অথচ কেমন সভ্য-ভব্য! আচ্ছা মশাই ওর মাইনে কত দেন জিজ্ঞাসা করতে পারি?"

ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক একটু হেসে বল্লেন—"ওর আবার মাইনে কি? ওর লেখাপড়া ইত্যাদির জন্যে যা খরচ হয় তা মাইনের চেয়ে ঢের বেশী। কেন, একথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন?"

মেজদা বল্লেন—"আমি তাই ভাবছিলাম। আমরা যে হোষ্টেলে থাকি সেখানে ষ্টুয়ার্ড গোছের একটা চালাক ছোকরার বিশেষ দরকার,—তার হাতে বাজার খরচের টাকাকড়ি সব থাকবে। এতে বেশ দুপয়সা লাভ আছে, এই রকম চালাক হলে সকলেই খুসী হয়ে কিছু কিছু মাসোহারা দেবে। তাতে অনেক পয়সা রোজগার হয়। আপনি তো এখানে ওখানে ঘোরেন, কত চাকর জোগাড় করে নিতে পারবেন, এটিকে আমাদের দিন না? আমরা খুবই যত্নে রাখবো আর লেখাপড়াও শেখবার উপায় করে দেব।"

ভদ্রলোক একেবারে ভয়ানক চম্‌কে উঠলেন। "তা কি হয় ভাই, তা কি হয় ভাই, ও যে আমাদের—আর উনি তো ওকে ছাড়তে পারবেন না! আপনারা ঠিকানাটা দিয়ে দিন না, ভাল চাকর দেখলেই আপনাদের পাঠিয়ে দিতে পারবো।"

ওদিকে চেয়ে দেখি ভদ্রমহিলা মুখ ফিরিয়ে হাসছেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন যে মেজদা ঠাট্টা করেছে, আর ইঞ্জিনিয়ার তা বুঝতে না পেরে অসামাল হয়ে গেছে, নিজের মনের ভাব গোপন রাখতে পারে নি। বেশ বোঝা গেল দুজনেই ছেলেটিকে ভালবাসেন এবং নিজের ছেলের মত দেখেন। কিন্তু পরস্পর পরস্পরের কাছে সেটি গোপন রাখতে চেষ্টা করেন। ভদ্রমহিলা অবশ্য তা পারেন, ভদ্রলোক অতটা পরেন না। জেনেশুনে এঁরা পরস্পরের কাছে এই নিয়ে লুকোচুরী করেন। আর বুদ্ধিমান অনাথ ছেলেটি মাঝ থেকে পরম সুখ উপভোগ করে। এঁরা দুজনেই মনে করেন অনাত্মীয়কে ভালবাসা বুঝি কিছু অপরাধ, যাঁর সে অপরাধ যতটা বেশী তিনি ততই সেটাকে লুকোতে চান। মানুষের মনের ভিতর এ কি চিরন্তন ছেলেমানুষী, যা ভাল লাগে তাই লুকিয়ে রাখতে চায়, জানে না যে বাষ্পের মত সম্প্রসারণশীল সামগ্রী কখনো চাপা দেওয়া যায় না, ঢাকতে গেলেই ঠেলে বেরিয়ে আসে এবং সকলেই দেখতে পায়।

যাক্, শিয়ালদা ষ্টেশনে পৌছে আমরা দুই দলই খুব ব্যস্ত হয়ে উঠলাম,—তাঁদেরও লটবহর যথেষ্ট, আমাদেরও নিতান্ত কম ছিল না। প্ল্যাটফর্ম্মে নামার পর, ভদ্রলোক যখন মহা ব্যস্ত হয়ে কুলীদের মাথায় মোটগুলি গণনা করে রওনা হয়ে যাচ্ছেন, ভদ্রমহিলা তখন পিছন থেকে তাঁর জামা টেনে ধরলেন। একটু নিম্নস্বরে বল্লেন, "এঁদের কিছু বলে যাচ্ছ না?"

"ও,—হাঁা,—তাইতো, ওঁদেরই তো খুঁজছি। এই যে এঁরা পিছনে রয়ে গেছেন। নমস্কার মশাই নমস্কার, আপনাদের সঙ্গে বেশ চেনা-শোনা হয়ে গেল। গাড়ীতে অনেক কষ্ট দিয়েছি, কিছু মনে করবেন না। চাকর আমি নিশ্চয় পাঠিয়ে দেব, সে কথা আমার মনে থাকবে। আচ্ছা, তা হলে আসি,—নমস্কার, নমস্কার।"

তারপর ভিড়ের মধ্যে আমরা তাঁদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলাম। মেজদা তখন বল্লে—"তিনটি সন্তানকে নিয়ে মেয়েটির কি বিড়ম্বনা।"

জগদীশ বুঝতে পারলে না। বল্লে—"তিনটি কি রকম?"

"এতক্ষণ তবে দেখলে কি? ঐ স্বামী বেচারাকে আর

নিজের মেয়েটিকে প্রতিপালন করে ওঁর সুখ হচ্ছে না, স্নেহ করবার জন্ম আবার এক নেপালী ছোঁড়া জুটিয়েছেন! মেয়েদের 'আহিক্কে'টাও কম নয়, কেবলই সংখ্যা বাড়াতে চায়। বাৎসল্য রসে একেবারে ভরপুর! এরাই তো সংসারটাকে খেলে!"

ঠিকা গাড়ীতে উঠে ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে যেমনি আমরা রাস্তার মোড় ঘুরেছি, অমনি জগদীশ একখানা গাড়ীর দিকে আঙুল বাড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলো—"ঐ যে ওঁরা যাচ্ছেন!" বলেই সে তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে নমস্কার করলে। ভদ্রলোক অন্যমনস্ক হয়ে অন্য দিকে চেয়ে ছিলেন, ভদ্রমহিলা একটু হেসে তাকে প্রতিনমস্কার করলেন। গাড়ী অদৃশ্য হয়ে গেল।

এঁদের সঙ্গে এই একটিবার মাত্রই দেখা। গত দশ বছরের মধ্যে আর কখনো এঁদের দেখা পাবার সৌভাগ্য আমার হয় নি। সুতরাং এ গল্পের এইখানেই শেষ।

আপনারা বলবেন, এই তো সামান্য গল্প, এর এত ভনিতার কি দরকার ছিল? আপনাদের হয় তো ঠিক বোঝাতে পারছি না, আমার কাছে ঐ রাত্রের ঘটনার মূল্য কতখানি। ঐ ঘটনা আমার জীবনে একটা মস্ত বড় প্রশ্নের জবাব এনে দিয়েছে। ঘটনার নায়ক নায়িকাদের সকলকেই ভুলে গেছি, কারো মুখও আর মনে পড়ে না, কিন্তু এখনও ঐ ধপ্ করে বালিস পড়ার শব্দটা সেই রকম ভাবেই আমার কানে এসে বাজে। থেকে থেকে অনেক বারই ঐ শব্দটা যেন নূতন করে শুনতে পাই। ওটা ভুলে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। যখনই দেখি কোনো বিষয়ে কারো একান্ত আগ্রহ জন্মেছে, যখনই দেখি তার জন্য সে আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ছে, অর্থাৎ যখনই দেখি কারুকে কোনো নেশায় ধরেছে,—তখনই আমার কানে ধপ্ করে বালিস পড়ার সেই শব্দটা এসে লাগে। যতই তারা অন্যায় করুক, যতই অবিচার করুক, আর যদি তাতে আমার কিছু অনিষ্টও করে, তবুও এইটা দেখলেই আমি তখনই তাদের ক্ষমা করি। আমি বুঝতে পারি যে বেচারাদের কোনোই দোষ নেই, বুদ্ধি তাদের সুস্থ অবস্থায় নেই, একটা নেশায় তারা মত্ত। এইবার থেকে হিসাবজ্ঞান কিছু থাকবে না, মাথার বালিসটি ফেলে দিতে হবে, সাংসারিক স্বার্থের জ্ঞান লোপ পেয়ে যাবে, নিজের ক্ষতি বা পরের ক্ষতি কোনো দিকেই হুঁস্ থাকবে না, আর বাধা দিয়েও একে থামানো যাবে না।...

নেশা অবশ্য এত জোরে লাগতে আজকাল সচরাচর দেখা যায় না, আর যাও দেখা যায় তাও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই পয়সার নেশা। কিন্তু সেটাও তো একটা নেশা, তার ধর্ম্ম যাবে কোথায়?

যাই হোক এই একটি মাত্র ঘটনা থেকে নেশা-তত্ত্বটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে, সেই কথাটাই আপনাদের বল্লাম। ক্রমে ক্রমে এটা বুঝে নিয়েছি যে লোকে যখন বলে যে সাম্‌লে নেশা কর, তখন সে কথার কোনই মানে হয় না।

আরো একটা মজার কথা আছে। গল্পটা কয়েক বছর আগে লিখে ফেলে রেখেছিলাম, মনে করেছিলাম সুযোগ হলেই কোনো মাসিক পত্রিকায় এটা ছাপিয়ে দেব। ভাগ্যিস ছাপতে দিই নি!

আজই বৈকালে সেই ভদ্রমহিলাকে দেখেছি। আমাদের বাসা থেকে বালিগঞ্জ পার্ক অনেকটা দূর বলে কখনো সে দিকে যাওয়া হয় নি। আপিসের ছুটীর পর আজ ইচ্ছা করেই ঐ পার্কে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ দেখি এক ভদ্রমহিলা একটি বেঞ্চিতে একা চুপ করে বসে আছেন, তাঁর মুখে মেছেতার দাগ। দেখেই মুখখানা মনে পড়ে গেল,—নিশ্চয়ই সেই ট্রেনের দেখা ইঞ্জিনিয়ারের স্ত্রী। তবু প্রথমটায় সাহস হোলো না, ওরকম দাগ তো অনেক মেয়ের থাকে। এদিক ওদিক একটু ঘোরাঘুরি করে শেষে তাঁর সুমুখে গিয়ে বল্লাম,—"যদি কিছু মনে না করেন তো একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আপনি কি কোনো ইম্পিরিয়াল জিওলজিক্যাল সার্ভেয়ারের কেউ হন?"

তিনি অবাক হয়ে বল্লেন—"হাঁ, আমি তাঁর স্ত্রী। আপনি তাঁকে চেনেন?"

আমি তাঁকে সেই ট্রেনের পরিচয়ের কথা সব বল্লাম। প্রথমটায় কিছুতেই চিনতে পারেন না,—অনেক কথা বলার পর চিনতে পারলেন।

তার পর তাঁদের অনেক খবর শুনলাম। তাঁর স্বামী এখন ধানবাদে থাকেন এবং মাটির তুলায় কোথায় কিসের খনি আছে তারই সার্ভে করবার জন্য তাঁকে কেবলই ঘুরে বেড়াতে হয়। বালিগঞ্জে একখানা বাড়ী করেছেন, এঁরা সেইখানেই থাকেন, স্বামী কচিৎ এক-আধবার আসতে পারেন। মেয়েটি এখন অনেক বড় হয়েছে,—সে লোরেটোতে পড়ে। তার এখন শীঘ্র বিয়ে দেবেন না, বিয়ে দিলেই তো ছেড়ে যাবে! তাঁর আর কোনো সন্তানাদি হয় নি, মেয়েকে আর রাজুকে নিয়েই আছেন। রাজুও এখন বড় হয়েছে, তার বিয়ে দেওয়া হয়েছে, পাশ করার পর এখানকার সার্ভে আফিসে তার একটা চাকরীও হয়েছে, বৌ নিয়ে সে এঁর কাছেই থাকে। সেও এখানে বেড়াতে এসেছে একটু পরেই দেখা হবে।

কথা হতে হতেই দেখি রাজু বৌয়ের হাত ধরে এসে উপস্থিত হোলো। এই সেই রাজু? একেবারে মস্ত সাহেব, কোট-প্যান্ট পরা, নেক্‌টাই আঁটা, মাথায় ফেল্ট্ হ্যাট, দস্তুর মত ষ্টাইল! কে বলবে এ নেপালী! আর বৌটিও বেশ বড় সড়, ফুটফুটে চেহারা,—কোন দেশের মেয়ে কে জানে!

বৌটির দিকে চেয়েছি দেখেই বোধ হয় সে বেজায় চটে গেল। ভদ্রমহিলাকে রুক্ষস্বরে বল্লে—“বাড়ী চল, কার সঙ্গে বসে এত কথা কইছ?”

ভদ্রমহিলা আমার পরিচয় দিলেন,—কিন্তু অনেক বলাতেও তার যেন কিছুই স্মরণ হোলো না। আমাকে কোন কথা না বলে তাঁকে সম্বোধন করে বল্লে—“আমি গাড়ীতে গিয়ে বসছি, তুমি শীঘ্র এসো,”—এই বলেই সে বৌয়ের হাত ধরে চলে গেল।

ভদ্রমহিলাও তখনই উঠলেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে তাঁদের মোটর পর্য্যন্ত গেলাম। বয়সের সঙ্গে তাঁর কি পরিবর্ত্তন হয়েছে এইটে আমি লক্ষ্য করছিলাম। চেহারার পরিবর্ত্তন তো যা হবার তা হয়েছে,—আরো দেখলাম সেই ঠোঁটে এখন অনেক কথা ফুটেছে কিন্তু সেই চোখে আর সে ভাষা নেই, অর্গল খুলে গেছে বলে বোধ হয় চোখের উপর আর তা ভেসে ওঠে না।

রাজু ইতিমধ্যে সুমুখের আসনে চালক হয়ে বসেছে, স্ত্রীকে নিজের পাশে বসিয়েছে। ভদ্রমহিলা পিছনের আসনে উঠে বসলেন। এঞ্জিনে ষ্টার্ট দেওয়া হোলো। একটি পশমওয়ালা নাক খেঁদা কুকুর এতক্ষণ গাড়ীতে বসে ছিল, এইবার সে লাফিয়ে উঠে আমার মুখের সুমুখে এসে ঘেউ ঘেউ করতে লাগলো।

গাড়ী ছাড়ে দেখে ভদ্রমহিলাকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—“আপনাদের বাড়ীর ঠিকানাটা কি?

“রিচি রোড চেনেন?”

রাজু হঠাৎ পিছন ফিরে তাঁকে ধমক দিয়ে বল্লে—“এখন থাক্, আর কথা বলতে হবে না,”—বলেই সে গিয়ারের আওয়াজ করলে।

ভদ্রমহিলা একটু হেসে বল্লেন—“আচ্ছা বাপু তাই ভাল, এইখানেই যদি বিকেলের দিকে বেড়াতে আসেন তো আমার সঙ্গে দেখা হবে।”

নমস্কারটা আমার আর করা হোলো না, গাড়ী ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

ব্যাপারটা বুঝলাম। আরো ভবিষ্যতে কতদূর পর্য্যন্ত গিয়ে দাঁড়াবে তা বলতে পারি না, কিন্তু উপস্থিত তো দেখলাম ভদ্রমহিলার সেই স্নেহ এখনও পর্য্যন্ত স্থায়ী আছে এবং নেশা রীতিমত পেকে উঠেছে। তিনি তো এই স্নেহের বস্তু নিয়ে বেশ সংসার পাতিয়ে বসেছেন, কিন্তু তাঁর স্বামী ভদ্রলোক এই স্নেহের নেশাতেই আট্‌কে থাকেন নি। তাঁর ইঞ্জিনিয়ারী নেশা অন্য প্রকারের, মাটির তলায় তিনি গোপন খনির সন্ধানে মেতে আছেন, এই নীড়ের মধ্যে এসে বসবার তাঁর ফুরসৎ কোথায়? আর রাজুকেও এখন এক নতুন নেশায় পেয়েছে,—এটা একরকম অধিকার-বোধের নেশা, বড় সহজ নেশা নয়, সুতরাং পাহারা দেওয়ার ভাবটা সদাই জাগ্রত। গাড়ীটা তার নিজস্ব অধিকার মনে করে আমি কাছে যেতেই কুকুরটা যেমন ভাবে তেড়ে এসেছিল, ওর স্ত্রীর দিকে চাইতেই—তা ও বেচারার কিছু দোষ নেই, এইটেই স্বাভাবিক। যাই হোক, দেখলাম তিনজনে তিনরকমের নেশা নিয়ে বেশ আছে। এই বেশ রাখাটাই নেশার কাজ।

গল্পটার এইরকম পরিণতি দেখে অনেকেই হয়তো চটে যাবেন। বলবেন এটা অস্বাভাবিক, লোকের সমাজ আছে, ধর্ম্ম আছে, সামঞ্জস্য বোধ আছে,—আরো অনেক কথাই বলবেন। অবশ্য এর অনেক রকমের পরিণতি হতে পারতো বা ভবিষ্যতে হয় তো হবেও, কিন্তু সংসারে এমনও হয়ে থাকে। যখন যে অবস্থা পড়ে, ঘটনাও তেমনি ঘটতে থাকে। মনে করুন যদি এঁদের অবস্থার স্বাচ্ছল্য না থাকতো, তা হলে কি ঐ ছেলেটাকে কুড়িয়ে আনতেন? আর যদি বা আনতেন, এতটা কি প্রশ্রয় দিতে পারতেন? বড় জোর তাকে চাকরের মত রাখতেন। কিংবা মনে করুন ভদ্রমহিলার যদি কোনো ছেলে থাকতো, বা পরে কোনো ছেলে জন্মাতো, তা হলেও কি এতটা হোতো? কিংবা যদি ভদ্রলোক মারা যেতেন, কিংবা যদি আরো কিছু হোতো, তা হলে ঘটনাও তেমনি উল্টে-পাল্টে যেতো, স্নেহের স্পৃহাটা হয় তো ভিন্ন দিকে চালিত হোতো। নেশা জিনিষটা সেই একই, কেবল ক্ষেত্র ও পাত্রের অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন আকার গ্রহণ করে। জীবনের তুলাদণ্ডে পাষাণ-ভাঙা না পড়লে নেশাটা অবাধে একদিক পানে অগ্রসর হয়ে যায়, আবার পাষাণ চাপালেই অন্যদিকে উঠে পড়ে। অবস্থার ফাঁক দিয়ে গিরিনদীর মত নেশা আপনার পথ করে নিয়ে চলে, আর মানুষকে তার পিছু পিছু টেনে নিয়ে চলে। জীবনযাত্রায় দেখা যায় মানুষের নিজের হাতটা খুব কম; গীতার সেই কথাটাই সকলের চেয়ে খাঁটি,—"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন";— আপনারা হয় তো জানেন হৃষীকেশ মানে ভগবান, কিন্তু টীকাকার বলে 'হৃষীক' মানে 'ইন্দ্রিয়'; সুতরাং টীকাকারের মতে ভগবান ছাড়াও ও-কথার অনেক অর্থ করা যেতে পারে। তেল থাকলেই প্রদীপ জ্বলে না, তার ইন্ধন চাই। চিত্ত-প্রদীপে নেশাই আমাদের ইন্ধনরূপে সর্ব্বদা বিরাজ করে এবং ইন্দ্রিয়ের মূল—মনকে পথ দেখিয়ে চালায়, —শ্লোকটার এই রকম অর্থ করলে বিশেষ অন্যায় হয় কি?

শ্রীগিরিজা ভট্টাচার্য্য

"মাদামকুরী" ও এক্স্-রে

শ্রীপুলিনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় বি-এস্-সি

[প্রতিবাদ]

চৈত্র মাসের বিচিত্রায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিত "মাদামকুরী" শীর্ষক প্রবন্ধে একটি বিশেষ ভুলের প্রতি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া অংশটি (২৮২ পৃঃ) উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

এই প্রবন্ধটিতে অমরেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন যে "তাঁদের সেই অনন্যসাধারণ সাধনার পরিণতি হচ্ছে আধুনিক কালের চিকিৎসা জগতের যুগান্তরকারী রঞ্জনরশ্মি (X-ray বা Radium Ray)" এবং তাহার পরে তিনি আবার লিখিয়াছেন যে "এই রেডিয়ম্ থেকে যে কিরণ নির্গত হয় তারই নাম X-ray"।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে অমরেন্দ্রবাবুর মতে X ray ও Radium Ray একই এবং এক্সরে আবিষ্কার করেন মাদাম্ কুরী; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মাদাম্কুরীর এই রেডিয়ম্ আবিষ্কারের বহুপূর্ব্বে অধ্যাপক রোণ্ট্গেন্ এক্স রে আবিষ্কার করেন এবং ঐ কারণেই ঐ গুলির আর একটি নাম রোণ্ট্গেন রশ্মি (Rontgen Ray), আর যদি অমরেন্দ্রবাবু একটু চেষ্টা করেন তবে জানিতে পারিবেন যে এই বিশেষ রশ্মিগুলির গঠন ও উৎপত্তির সঠিক কারণ নির্ণয় করিতে না পারার জন্য স্বয়ং রোণ্ট্গেন্ ইহাকে এক্স্-রে বলিয়া অভিহিত করেন—ঠিক যেমন সাধারণ অঙ্কে অজানা কিছুকে X বলিয়া ধরা হয়।

তাহার পর রেডিয়ম্ রশ্মির গঠন সম্বন্ধে, ইহা উল্লেখযোগ্য যে, রেডিয়ম আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই সার্ আর্ণেষ্ট রাদারফোর্ড, সার্ উইলিয়ম র‍্যাম্জে, অধ্যাপক সডি প্রমুখ তখনকার বৈজ্ঞানিকগণ ঐ রশ্মির গঠন সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিতে থাকেন, এবং রাদারফোর্ড, রেডিয়ম্ ইউরেনিয়ম্ প্রভৃতি রেডিয়মধর্ম্মী দ্রব্য হইতে বিকীর্ণ রশ্মির বিশ্লেষণ করিয়া দেখান যে ঐ জটিল রশ্মিগুলি আল্ফা (Alpha-Ray) বিটা (Beta-Ray) ও গামা (Gamma-Ray) এই তিনটি বিভিন্ন প্রকারের রশ্মি লইয়া গঠিত।

উক্ত আল্ফা-রশ্মি আবার পজিটিভ্-চার্জ্জ যুক্ত কণা লইয়া গঠিত; এই কণাগুলি প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় বিশ হাজার মাইল বেগে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, ইহাদের দ্রব্যাদি ভেদ করিবার শক্তি (Penetrating Power) খুবই কম, তবে গ্যাসের মধ্য দিয়া চালিত হইলে তাহাকে পরিচালক করিবার ক্ষমতা ইহাদের যথেষ্টই আছে; আরও জানা গিয়াছে যে এইগুলি পজিটিভ-চার্জ্জ যুক্ত হিলিয়মের পরমাণু।

বিটা-রশ্মির মূলে আছে ইলেক্ট্রনের প্রবাহ, এবং ইহাদের গতি প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ষাট হাজার হইতে একশত আশী হাজার মাইলের মধ্যে; এবং ইহারা তড়িৎচুম্বকের পজিটিভ্ Pole দ্বারা অতি সহজেই আকৃষ্ট হইয়া থাকে ও ভেদ করিবার যথেষ্ট শক্তি ইহারা রাখে।

গামা-রশ্মির প্রকৃত স্বরূপ, এক্স-রের মতই ইহার তরঙ্গ তবে এই তরঙ্গের দৈর্ঘ্য এক্স-রের তরঙ্গ অপেক্ষা অনেক ছোট। ইহাদের ভেদ করিবার শক্তি বিটা-রশ্মি অপেক্ষা শতগুণ অধিক, আর ইহাদের উপর চুম্বক তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।

উপরোক্ত তিন প্রকার রশ্মি লইয়াই, রেডিয়ম রশ্মির গঠন সুতরাং ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে এক্স-রের সহিত রেডিয়ম্ রশ্মির কত প্রভেদ; এবং রেডিয়ম্ রশ্মিকে এক্স্-রে বলা নিতান্তই ভ্রমাত্মক; কিন্তু এই সামান্য ও অতি সাধারণ বৈজ্ঞানিক-বিষয়ে লেখক তাঁহার নিজের ভ্রান্ত ধারণা প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে মর্ম্মাহত করিয়াছেন।

স্ত্রী-শিক্ষা

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বসু

আমার মনে হয় মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা চিন্তাই করি খুব কম; এবং যতটুকু চিন্তা করি, তার ভিতর গলদ থাকে অনেক। মেয়েকে দুই একখানা বই না পড়ালে, অন্ততঃ চিঠি লেখা এবং পড়ার মত উপযুক্ত না করলে, বিয়ের বাজারে আজকাল তার কোন দামই হবার সম্ভাবনা নেই, শুধু এই বড় পরাতন আশঙ্কাতেই তাকে স্কুলে পাঠাতে আমরা বাধ্য হই। যাঁরা সুন্দরী মেয়ের পিতা তাঁরা এইটুকুই যথেষ্ট মনে করেন; এবং যাঁরা সে সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত তাঁরা আর একটু পড়িয়েই মেয়ের বয়সের দিকে তাকিয়ে শিউরে ওঠেন এবং ঐটুকু বিদ্যাকে মূলধন ক'রে পাত্রের মন আকর্ষণ ক'রতে যত্নবান হন। ফলে তাঁরা বিবাহকে চরম লক্ষ্য স্থির ক'রে যে শিক্ষার ব্যবস্থা করেন তাতে না থাকে প্রকৃত শিক্ষার স্বার্থহীন উদ্দেশ্যের সংযোগ, না থাকে মেয়েকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ক'রে গ'ড়ে তোলার মহান আদর্শ।

যন্ত্রে আজকাল অনেক রকম জিনিষই তৈরী হ'চ্ছে—আমাদের দেশের মেয়েরা তার মধ্যে একটী। সাধারণতঃ শৈশব থেকে তাদের মনের গড়ন যে ছাঁচে ফেলে ঢালাই করা হয় তাকে দাম্পত্যের ছাঁচ ছাড়া আর কিছু বলা চলে কিনা জানি না। আমার কথা সত্য কিনা প্রমাণ ক'রতে গিয়ে আমি নিজেদের মনের গতির সত্যকার পরিচয় দিতে চাই না।

তবে যদি প্রমাণ দিতে চান তা'হ'লে একটী অল্পবয়স্কা, ধরুন ৮।৯ বছরের, মেয়ের কথাবার্ত্তা, তার চালচলতির ধরণ, তার অকারণ সঙ্কোচের অনাবশ্যক আড়ষ্টভাব আপনাদের বেশ ক'রে বুঝিয়ে দেবে যে, এই অল্প সময়ের মধ্যেই এই ঢালাইএর ভিতর প'ড়ে সে কেমন সুন্দর আকার প্রাপ্ত হ'য়েছে। কিন্তু সে ছাঁচের অবয়বও কি সম্পূর্ণতার দাবী ক'রতে পারে? তা যদি পারত তাহ'লে প্রায় প্রতি পরিবার দাম্পত্য জীবনের ও মাতৃত্বের আজ যা পরিচয় দিচ্ছে তার চাইতে আরও অনেক ভাল পরিচয় দিত। অবশ্য আমার বক্তব্য এ নয় যে এই শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা একেবারেই উদাসীন থাকব। আমার বক্তব্য এই যে শুধু একদিকের শিক্ষা সম্বন্ধে সীমাতিরিক্ত মনোযোগ দিতে গিয়ে অন্যদিকের শিক্ষাগুলিকে অবহেলা ক'রলে আমাদের মেয়েদের কাছ থেকে আমরা যা চিরকাল আশা ক'রে আসছি তাই পেতে পারি বটে, কিন্তু তাতে সমাজকে পঙ্গু ক'রে রাখার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার কোন কৈফিয়ৎই আমাদের রইল না।

শিক্ষা যদি মনের জড়তা দূর ক'রে সত্য সন্ধানের পিপাসা বাড়িয়ে জ্ঞানলাভকে একান্ত ক'রে না নিতে পারে তবে তাকে প্রকৃত শিক্ষা বলা চলে না। এখন কথা হ'চ্ছে আমাদের মেয়েদের ভিতর সেই শিক্ষালাভের ইচ্ছাকে জাগিয়ে তোলবার প্রয়োজন আছে বলে মনে ক'রবো কি-না; এবং যদি প্রয়োজন থাকে, তবে কখন এবং কি ভাবে তাকে জাগ্রত করা যায়। আমার মনে হয় মেয়েদের একটী পৃথক এবং স্বাধীন স্বত্ত্বা আছে যদি আমরা স্বীকার ক'রে নিই, তাহ'লে সেই ইচ্ছাকে তাদের ভিতর জাগিয়ে তোলা যে একান্ত বাঞ্ছনীয় সে সম্বন্ধে সন্দেহ করার আর কিছুই থাকে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই বিশাল সমাজের অল্প কয়েকজন ছাড়া আর কেউ সে কথা স্বীকার করতে চা'ন না। তাদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আমাদেরই বদ্ধাবস্থার অনুরূপ; নিতান্ত স্বার্থপরের মত আমাদের পাওয়াকেই সর্ব্বস্ব ক'রে নিয়ে তাদের চাওয়ার রূপটীকে পর্য্যন্ত আমরা চিনতে চাই না! এই উপেক্ষার ফলে যে সংস্কারের সৃষ্টি হয়েছে তাকে শুভ বলে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। এবং তাকে পরিবর্ত্তন করতে গেলে প্রথমেই আমাদের মেয়েদের মনে সেই স্পৃহা জাগিয়ে তুলতে হবে যাতে তারা

নিজেদের স্বরূপ নিজেরা চিন্‌তে পারে, নিজেদের বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন ক'রে তুলতে পারে, তাদের সমাজকে, জগতের সমাজকে জেনে সেখানে নিজেদের স্থান বেছে নিতে পারে।

তারপর, কখন এবং কি ভাবে সেই স্পৃহাকে জাগাবার প্রকৃষ্ট সময়? আমার মনে হয়, শৈশব এবং বাল্যকাল। শিশুর কৌতুহলী মনে যদি সেই স্পৃহার বীজ বপন করা যায়, তার মস্তিষ্ক সংস্কারের জড়তায় আচ্ছন্ন হ'য়ে উঠবার আগে যদি সেখানে সন্দেহ করবার, প্রশ্ন ক'রবার, অধিকার সঞ্চার করা হয়, প্রশ্ন করলে নিজেদের অজ্ঞতা গোপন ক'রতে গিয়ে একটা চড় মেরে মূঢ়তার পরিচয় না দিয়ে সদুত্তরে তাকে আশান্বিত করতে পারা যায়, তাহ'লে সহজেই তার শিক্ষালাভের আগ্রহ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। আমার বিশ্বাস এটা খুব সনাতন উপদেশ। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ কোথায়ও মেনে চল্‌তে দেখি না। কেন? প্রথম এবং প্রধান কারণ,—বুঝিয়ে দেবার পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার ক'রতে আমরা একেবারেই নারাজ। দ্বিতীয় কারণ আমাদের ধৈর্য্যের অভাব; তৃতীয় কারণ, আমাদের নিজেদের অপরিমিত মনের অজ্ঞতা কিম্বা অজ্ঞানতা প্রকাশের ভীতি, এবং চতুর্থ কারণ, আমাদের চিন্তার ধারায় যে স্থবিরত্ব এসে গিয়েছে তাতে তাকে অভ্যস্ত পথ ছাড়া অন্য পথে চল্‌তে দিতে আমরা মনে মনে ভয় পাই।

তাইত আজ মেয়েকে স্কুলে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্‌তে পেরেছি। সেখানে যা শেখে তাই তাদের পক্ষে যথেষ্ট,—এই বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে আমরা আমাদের দায়িত্বের কাছ থেকে, আমাদের কর্ত্তব্যের কাছ থেকে ছুটী নিয়ে ভুলেও খোঁজ খবর নেবার দরকার মনে করি না যে সে সেখানে কিরূপে শিক্ষালাভ কর্‌ছে। কারণ তাতে আমাদের যতটুকু সময়ের দরকার আমরা তা কিছুতেই দিতে চাই না। ক্লান্তির দোহাই দিয়ে আমাদের মনকে ইচ্ছা ক'রেই অবসাদগ্রস্ত ক'রে ফেলি। স্কুলের শিক্ষার উপর যতটুকু নির্ভর করা উচিত তার চাইতে আমরা অনেক বেশী নির্ভর ক'রে—সেই প্রকৃত শিক্ষার সম্বন্ধে আমাদের ঔদাসিন্যকে দৃঢ় ক'রে তুলেছি। স্কুলের শিক্ষা যে সম্পূর্ণ নয় সে বিষয়ে কারও সন্দেহ থাক্‌বার কোনও কারণ দেখি না। স্কুলে পড়াশুনা হয়; অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগে মনটা অনেকটা প্রসারতা লাভ করে, প্রতিযোগিতার ফলে ধারণাশক্তি তীক্ষ্ণ হয় সত্য; কিন্তু স্কুলে ন্যায় অন্যায় বিচার করবার ক্ষমতা উন্মেষিত হ'লেও প্রস্ফুটিত হয় না, স্কুল তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য দেবার অবসর পায় না, তাদের সংসারের প্রতি, সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য শেখাবার দায়িত্ব নিয়ে মাথা ঘামায় না; তাদের অনুসন্ধিৎসার উপকরণ যোগাতে তাদের কুসংস্কার, দ্বিধা, মোচন কর্ত্তে অসমর্থ। স্কুল তাদের শুধু সাধারণ ভাবে বিষয় বিশেষে প্রবেশ লাভের পন্থা ব'লে দিয়েই ক্ষান্ত। পারদর্শী করবার দাবী তার উপর কর্‌তে যাওয়া শুধু অন্যায় নয়, অসম্ভব। সে ভার আমাদেরই অর্থাৎ পিতামাতারই নিতে হবে। এড়িয়ে চলার শাস্তি আমি আগেই বলেছি, পুনরাবৃত্তি করতে চাই না।

আমাদের চিন্তাশক্তি এমনি অবসন্নতা প্রাপ্ত হয়েছে, ভূতে পাওয়া রোগীর মত এমনি প্রথাগ্রস্ত হ'য়ে গিয়েছে, নিশ্চলতাকে আজীবন সেবা ক'রে তাকে এমনি বিফল ক'রে ফেলেছি যে কোন পরিবর্ত্তনের কল্পনা—তার মধ্যে যতই মঙ্গলের বীজ নিহিত থাকুক না কেন, সে যতই কল্যাণের অগ্রদূত হোক না কেন—আমাদের শুধু বিচলিত ক'রে তোলে না, তাকে আঘাত ক'রবার জন্যে, তাকে বিনষ্ট করবার জন্যে আমাদের দেহ মনকে অদ্ভুত রকমে সজাগ ক'রে তোলে। অথচ আমরা বাস করছি যে জগতে তার প্রত্যেক চেতন পদার্থটী এই পরিবর্ত্তনেরই দাস—প্রতি মুহূর্ত্তে সে আপনাকে পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ক'রে চলেছে তার সীমা পর্য্যন্ত যতক্ষণ না পৌঁছুতে পারে। চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি দু'শ বছর আগেকার দিন আজ বেঁচে নেই অথচ সেদিনকার সমাজ নিজেকে গর্ব্বভরে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ক'রছে। এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে সবই বদলায়, বদলাতে পায় না কেবল আমাদের নীতি, আমাদের আচার, আমাদের সংস্কার; তাদের প্রত্যেক লিখিত অলিখিত বিধানগুলি আমাদের কাছে যেন অখণ্ড এবং অপরিবর্ত্তনীয়!! তাইত আজ মেয়েদের প্রগতির বিরুদ্ধে আমাদের বিরাট ষড়যন্ত্র! অথচ ভেবে দেখা দরকার মনে করি না যে, তাদের

এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা তাদের শিক্ষারই অনুসারক; এই চাঞ্চল্য তাদের বদ্ধ অবস্থারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহের লক্ষণ; এই উদ্দীপনা সেই সনাতন সামাজিক বিধানের উপর তাদের অনাস্থার নামান্তর মাত্র। তারা দুই একখানা বই প'ড়ে যতটুকু শিক্ষাই অর্জ্জন করুক না কেন নিজের অবস্থা উপলব্ধি ক'রতে তাই যথেষ্ট। কারণ বাইরের জগত আজ তারা চোখে দেখতে না পেলেও সেই দুই একখানা বইএর ভিতর দিয়ে এবং অন্যান্য উপায়ে তার সঙ্গে তারা সম্বন্ধ স্থাপিত ক'রে নেয়। অপর দেশের নারীজাতির আত্মপ্রকাশের খবর এই উপায়ে যতটুকু তারা পায় তাইতে তাদের মনে, নিজেদের অবস্থার তুলনায়, অসন্তোষের কালো মেঘ ঘন হ'য়ে উঠে। এখন কথা হচ্ছে তাই বলে কি তাদের এই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ক'রে রাখবে? আমার বিশ্বাস সে চেষ্টা যেমন অসম্ভব, তেমনি হাস্যকর। শুধু তাই নয়, এই কালের গতিকে রোধ ক'রে তাকে সেই দু'শ বছর আগেকার অবস্থার দিকে ফিরিয়ে দেবার কল্পনা অসম্ভব নয় বটে কিন্তু তা বাস্তবে পরিণত করা একেবারেই অসম্ভব। তাই ব'লতে চাই শিক্ষার সঙ্গে বদ্ধতার বিরোধকে আমরা যতই দমন ক'রে রাখতে চাইব, ততই সে মাথা তুলবে এবং সেই শিক্ষার সার্থকতাকে ক্রমে ক্ষুণ্ণ ক'রে ফেলবে। সংঘাত যতই তীব্র হবে অন্তরের ক্ষুব্ধতা ততই বেড়ে যাবে,—ফলে মন নিস্তেজ হ'য়ে গোপনের আশ্রয়প্রার্থী হ'য়ে উঠবে। আবরণের আবশ্যক শুধু সেইখানেই যেখানে প্রকাশের ভয়—সে ভয় অপসারিত করার চেষ্টায় আজ তারা সেই আবরণ ভেদ ক'রে নিজেদের শক্তির সন্ধানে বেরিয়েছে।

আজ সারা জগতের জাগরণের সাড়ায় আমাদের মেয়েরা উদ্বুদ্ধ,—আমাদের মনের ভীতিপুষ্ট দুর্ব্বলতা দিয়ে তাদের ভীত ও দুর্ব্বল ক'রে তুলবো না। আজ তারা সত্যিই যদি মুক্তিপথের যাত্রী হ'তে চায় তবে আমাদের সহানুভূতি, আমাদের অভিজ্ঞতা, আমাদের উৎসাহ দিয়ে এই মুক্তির সাধনায় তাদের সত্যিকার সাধক ক'রে তুলব, স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ, তার দায়িত্ব বুঝিয়ে দেব যাতে তারা উচ্ছৃঙ্খলতার বিপদকে চিন্‌তে পেরে নিজেদের কল্যাণ সম্বন্ধে সব সময় সজাগ থাকতে পারে, আমাদের মনের স্নেহ উদারতা দিয়ে তাদের আরও উদার ক'রে তুলব।

দেশে একদিন ছিল যেদিন স্ত্রী-শিক্ষার কথা বললে মানুষে তাকে বাতুল ব'লে উপহাস ক'রতো—সুখের বিষয় আজ দেশ থেকে সে আত্মঘাতী মনোবৃত্তির দ্রুত পরিবর্ত্তন হ'চ্ছে। স্ত্রী-শিক্ষা আমাদের দেশে সম্প্রতি সুরু হ'য়েছে।

বাংলাদেশের স্ত্রী-শিক্ষার অবস্থা অন্যান্য অনেক প্রদেশের চেয়ে শোচনীয় হ'লেও দিকে দিকে আজ আশার দীপ্তি দেখা দিয়েছে। এমন দিন হয় তো সত্বরই আস্‌বে যেদিন সমাজ হিতৈষী প্রত্যেকেই সমাজের এই অতি প্রয়োজনীয় সমস্যাটীর দিকে বিশেষ যত্নবান হবেন।

আপনাদের আর অধিক সময় বিরক্তি উৎপাদন ক'রতে চাই না,—শেষ ক'রবার পূর্ব্বে কর্ত্তৃপক্ষগণের কার্য্যের প্রশংসা না করলে তাঁদের উপর অবিচার করা হবে। এই বিদ্যালয়টীর প্রতি তাঁদের যে অকৃত্রিম দরদ ও সহানুভূতি দেখছি তাতে আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি এর উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। যে মহৎকার্য্যে এঁরা ব্রতী হ'য়েছেন তা প্রত্যেকেরই অনুকরণীয়।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বসু
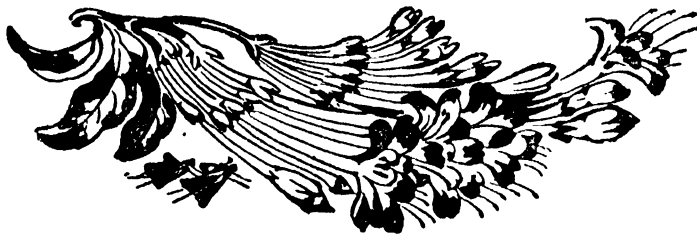
পাঁজিয়া বালিকা-বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণী সভার সভাপতির অভিভাষণ।

নববর্ষের অভিবাদন
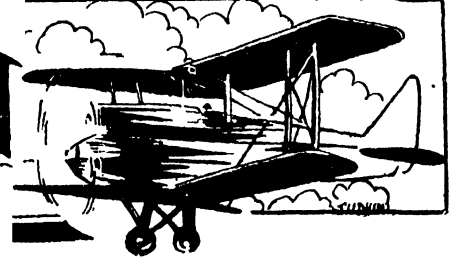
আমরা আমাদের পাঠক, লেখক, শিল্পী, গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা, হিতৈষী, বন্ধুবর্গ, সকলকে নববর্ষের সাদর অভিবাদন জ্ঞাপন করছি। কামনা করছি ১৩৪২ সাল যেন সর্ব্বতোভাবে তাঁদের পক্ষে শুভ হয়, কল্যাণপ্রদ হয়; যেন তাঁদের কর্ম্মে প্রেরণা আনে, দেহে স্বাস্থ্য এবং মনে আনন্দ প্রদান করে।

এই অবকাশে প্রার্থনা করি, ১৩৪২ সালের বাঙলার ভাগ্য-গগন যেন আলোকে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। ১৩৪১ সালের শেষ ভাগ যে-সকল সমস্যা এবং মলিনতার মেঘ সঞ্চয় করেছে, ১৩৪২ সালের সূচনা যেন সে-সকলকে অবিলম্বে অপসৃত করে। দেশ যেন সর্ব্বপ্রকার বিরোধ, বিক্ষোভ, গ্লানি থেকে মুক্ত হ'য়ে যুক্ত হয়।

বিজয়রত্নের মর্ম্মর মূর্ত্তি

বিগত ১৫ই মার্চ্চ ১৯৩৫ "যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে" স্বনামধন্য কবিরাজ ৺মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জনের মর্ম্মর-মূর্ত্তি উন্মোচন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। সুবিখ্যাত ভাস্কর শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় রায় চৌধুরী কৃত মৃত্তিকা আদর্শ অবলম্বনে এই মর্ম্মর মূর্ত্তি ইটালী হ'তে প্রস্তুত হ'য়ে এসেছে। মহামান্য বর্দ্ধমানাধিপতি শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুর স্যর বিজয়চন্দ্‌ মহ্‌তাব্‌ মর্ম্মর মূর্ত্তি উন্মোচন করেন।

বাঙলা দেশে বৃহৎ ভাবে আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় স্থাপনের কল্পনা প্রথমে বিজয়রত্নই করেন, কিন্তু নানাপ্রকার বাধা-বিঘ্ন হেতু তিনি তাঁর কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করতে সক্ষম হন নি। পরে তাঁর শিষ্য পরলোকগত প্রসিদ্ধ কবিরাজ যামিনীভূষণ রায় অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। সুতরাং উক্ত বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এবং অপরাপর দেশবাসী যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে বিজয়রত্নের মর্ম্মর মূর্ত্তি স্থাপন করে কর্ত্তব্যপালন করেছেন। যে সকল ব্যক্তি নিজ নিজ ক্ষেত্রে উন্নতির শীর্ষদেশে আরোহণ করেছেন তাঁদের স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপন করা দেশবাসীর একান্ত কর্ত্তব্য সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন

এই প্রসঙ্গে বিজয়রত্নের জীবনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলে সাধারণের পক্ষে কৌতূহলোদ্দীপক হবে ব'লে উক্ত উৎসব দিনে বিতরিত পুস্তিকা হ'তে কিছু কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করলাম। পুস্তিকার লেখকের নাম শ্রীজিতেন দাশগুপ্ত।

"বিজয়রত্ন ১২৬৫ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ রবিবার "কাঁচাদিয়া" নামক বাংলার এক ক্ষুদ্র পল্লীতে উচ্চবংশীয়

বৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় জগচ্চন্দ্র সেন সর্ব্বগুণসমন্বিত প্রসিদ্ধ ভিষক্ ছিলেন—চিকিৎসা শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার মাতা হরসুন্দরী ছিলেন স্বনামধন্য কবিরাজ স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেনের ভগিনী।

বিজয়রত্ন দেড়বৎসর বয়সে পিতৃহীন হন। জগচ্চন্দ্রের যথেষ্ট উপার্জ্জন থাকিলেও তিনি বিশেষ কিছু সঞ্চয় করিয়া যাইতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পর বিজয়রত্নের জননী দুইটি শিশু লইয়া অকূল পাথারে পড়িলেন।

বিজয়রত্ন অতি শৈশবেই তাঁহার গ্রামের বাংলা বিদ্যালয়ে পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় তাঁহার প্রতিভা দেখিয়া সকলেই বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যান। দশ বৎসর বয়সের সময় অতি সম্মানের সহিত তিনি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময় তাঁহার জন্মভূমি কীর্ত্তি-নাশার গর্ভে অন্তর্হিত হওয়ায় তিনি তাঁহার মাতার সহিত কলিকাতায় মাতুলালয়ে চলিয়া আসেন।

দুঃখই জীবনের কষ্টিপাথর। দুঃখকে বরণ করিতে পারিলেই জীবনের অন্তর্নিহিত সার জিনিষটুকু ফুটিয়া উঠে—সেইটি নিছক খাঁটি সোনা। বিজয়রত্নের বাল্যজীবন কাটিয়াছিল দুঃখের মাঝে। কিন্তু তিনি কোন দিনই সে দুঃখকে গ্রাহ্য করেন নাই। তিনি বাল্যের সেই পুঞ্জীভূত দুঃখকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন হাসিমুখেই। তাই তাঁহার ভিতরের প্রতিভা উজ্জ্বল হইতে আরও উজ্জ্বলতর হইয়া উত্তরকালে দেখা দিয়াছিল।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি কলিকাতা আসিয়া প্রথমে ব্যাকরণ পরে সাহিত্য ও অলঙ্কারশাস্ত্র পাঠ করিয়া ক্রমে বাদার্থ, বেদান্ত, সাংখ্য ও পাতঞ্জল অধ্যয়ন করেন এবং শাস্ত্রের প্রতি বিভাগেই অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। শাস্ত্রাদি পাঠের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাঁহার মাতুল স্বনামধন্য কবিরাজ স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেন এবং সুপণ্ডিত কবিরাজ স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সেন মহাশয়ের নিকট আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র পাঠ করেন। তিনি আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র এমন সুন্দরভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন যাহা একমাত্র তাঁহার মত লোকের পক্ষে সম্ভব। আয়ুর্ব্বেদে তাঁহার দান অসাধারণ। তিনি নবযুগের ধন্বন্তরিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বিজয়রত্নের প্রতিভা ছিল সর্ব্বতোমুখী। বিজয়রত্ন চিকিৎসক—বিজয়রত্ন দার্শনিক, বিজয়রত্ন সাহিত্যিক, বিজয়রত্ন কবি, বিজয়রত্ন সাধক, বিজয়রত্ন ধার্ম্মিক—সর্ব্বোপরি বিজয়রত্নের চরিত্র ছিল স্ফটিকের মত স্বচ্ছ—তুষারের মত শুভ্র এবং আকাশের মত উদার।

বিজয়রত্ন সে যুগের ধন্বন্তরিকল্প ছিলেন। তিনি রোগীর পার্শ্বে বসিলে রোগীর অর্দ্ধেক রোগ আরাম হইয়া যাইত। রোগীর মনের উপর চিকিৎসকের প্রভাব থাকিলে রোগ আরাম করা যে কতদূর সহজসাধ্য হয় তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। বিজয়রত্ন প্রত্যেক রোগীকেই অতি যত্নসহকারে দেখিতেন। কুটির হইতে আরম্ভ করিয়া রাজার প্রাসাদ পর্য্যন্ত তাঁহার সমান ব্যবহার ছিল। তাঁহার ন্যায় লোভমুক্ত লোক সে যুগে খুব কম দেখিতে পাওয়া যাইত।

দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ছাড়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের রাজন্যবর্গ ও বড় বড় ইংরাজ কর্ম্মচারীর নিকটেও তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। কন্যাকুমারিকা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত বিজয়রত্নের প্রতিপত্তি যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছিল। ইংরাজ রাজত্বে আয়ুর্ব্বেদের প্রসার প্রায় লুপ্ত হইয়া আসিয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের এই চিকিৎসা প্রণালীর উপর বিশেষ কোন আস্থা ছিল না, সুতরাং দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও ক্রমশঃ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার কথা ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছিলেন। বিজয়রত্নের আবির্ভাব ঠিক সেই সময় হইল। তিনি আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা প্রণালীকে এক অভিনব সজ্জায় সজ্জিত করিয়া সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন, সকলেই বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া গেল। লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদের উপর দেশের যাবতীয় প্রধান ব্যক্তি ও সরকার বাহাদুরের দৃষ্টি পড়িল।

ভারতে এমন কোন দেশীয় রাজ্য ছিল না—যেখান হইতে বিজয়রত্নের আহ্বান না আসিয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে বহু ইংরাজ ভদ্রলোক বিজয়রত্নের চিকিৎসায় আশাতীত সুফল পাইয়া আয়ুর্ব্বেদের গুণগান করিতে করিতে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ভারতের অধিকাংশ প্রধান প্রধান

ব্যক্তিবর্গ এবং জননায়কগণ বিজয়রত্নের গুণমুগ্ধ বন্ধু ছিলেন। দেশমান্য স্বর্গীয় পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু প্রমুখ প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ বিজয়রত্নের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। কাশ্মীর, বরোদা প্রভৃতি ভূপতিবর্গ বিজয়রত্নকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। বিজয়রত্নকে আহ্বান করিয়া কাশ্মীর নৃপতি তাঁহাকে যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা বাঙ্গলা দেশে খুব কম লোকের ভাগ্যে ঘটিয়াছে।

বাল্যের সেই কপর্দ্দকহীন বিজয়রত্ন প্রৌঢ় অবস্থায় লক্ষ্মীর বরপুত্র হইয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মৃত্যুর পূর্ব্বে স্থান বিশেষে তাঁহার দৈনিক পরিশ্রমের হার সহস্র মুদ্রা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। দৈনিক সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়াও তাঁহাকে লইবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত। ভারত সরকার তাঁহাকে "মহামহোপাধ্যায়" উপাধিতে ভূষিত করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

বাণীর একনিষ্ঠ সেবক প্রসিদ্ধ কবি নবীনচন্দ্র সেন বিজয়রত্নের আন্তরিক বন্ধু ছিলেন। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে কবিতায় পত্র বিনিময় হইত। সে সমস্ত লিপি এখনও বিজয়রত্নের গৃহে সযত্নে রক্ষিত আছে। বিজয়রত্ন কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। "অষ্টাঙ্গ হৃদয়ের টীকা" তাহাদের মধ্যে অন্যতম। বিজয়রত্নের অষ্টাঙ্গ হৃদয়ের টীকা যিনি পড়িয়াছেন তিনি জানেন যে তাঁহার পরিকল্পনা ও জ্ঞান কি অসাধারণ ছিল।

বিজয়রত্নের পরিকল্পনা ছিল—একটি আয়ুর্ব্বেদ সভা, একটি আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও একটি আয়ুর্ব্বেদীয় হাঁসপাতাল স্থাপন করা। তিনি 'আয়ুর্ব্বেদ সভা' মৃত্যুর পূর্ব্বেই প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু অপর দুইটি তিনি আর সমাধা করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহারই প্রিয়তম শিষ্য প্রসিদ্ধ কবিরাজ স্বর্গীয় যামিনীভূষণ রায় এম-এ, এম-বি, কবিরত্ন মহাশয় তাঁহার গুরুদেবের পরিকল্পনার রূপ দিয়া গিয়াছেন, তিনি আজীবন চেষ্টার ফলে এবং অসাধারণ স্বার্থ ত্যাগ করিয়া "অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও হাঁসপাতাল" প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

বিজয়রত্নের কর্ম্মজীবন অপেক্ষা নৈতিক জীবন ছিল আরও মহান্। পৃথিবীতে তাঁহার কেহই শত্রু ছিল না। দরিদ্রের পর্ণ কুটির হইতে আরম্ভ করিয়া ধনীর প্রাসাদ পর্য্যন্ত সকল স্থানেই তিনি সমানভাবে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

৮ঠা আশ্বিন ১৩১৮ মাত্র ৫২ বৎসর বয়সে চারি পুত্র ও চারি কন্যা রাখিয়া তিনি সাধনোচিত ধামে চলিয়া গেলেন।

পরলোকগত বিশ্বনাথ বসু

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের একমাত্র পুত্র বিশ্বনাথ বসু মাত্র ২৩ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। বিগত ৯ই এপ্রিল এই নিদারুণ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়।

এই অল্প বয়সেই বিশ্বনাথ সংস্কৃত পালি হিন্দী ইংরাজি ও বাঙলা ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। বঙ্গীয় বিশ্বকোষের দ্বিতীয় সংস্করণের সম্পাদনে বিশ্বনাথ তাঁর পিতার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। শুধু সাধারণ সম্পাদন এবং প্রুফ দেখাতেই তাঁর কর্ত্তব্য নিবদ্ধ ছিল না, বিশ্বকোষের অন্তর্গত কয়েকটি প্রবন্ধও তিনি লিখেছিলেন। বিশ্বনাথ Royal Asiatic Society-র সদস্য এবং বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সহকারী সম্পাদক ছিলেন।

এমন গুণবান এবং কর্ম্মী পুত্রের প্রচণ্ড শোক নগেন্দ্রবাবু কি প্রকারে সহ্য করবেন তা আমাদের বুদ্ধির অনধিগম্য ব্যাপার! তাঁকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমরা খুঁজে পাচ্ছিনে। প্রার্থনা করি পরম করুণাময় ভগবান বিশ্বনাথের পিতামাতা এবং বিধাতা পত্নীর চিত্তে শান্তি স্থাপন করুন আর প্রার্থনা করি বিশ্বনাথ যে পুত্রটিকে রেখে গেছেন সেটি দীর্ঘজীবি হয়ে পিতামহের বংশ রক্ষা করুক।

ভ্যাক্স ইন্‌ষ্টিটিউট্ ল্যাবরেটরি লিঃ

আমাদের দরিদ্র দেশ হ'তে অর্থ নিষ্কাসনের যে কয়েকটি প্রধান প্রণালী আছে তার মধ্যে কোনোটিতে একটু বাধা পড়তে দেখলে মনে আনন্দের সঞ্চার হয়। বিদেশ হইতে আমদানি করা মূল এবং পেটেন্ট অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ দেশের অর্থ নিষ্কাসনের একটি প্রধান প্রণালী। যে বিপুল অর্থ এই প্রণালী দিয়ে প্রতি বৎসর বিদেশে প্রবাহিত হয় তার পরিমাণ শুনলে সত্যসত্যই প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার হয়।

সমগ্র তালিকার কথা উপস্থিত ছেড়েই দেওয়া যাক্, কেবলমাত্র হাইড্রোজেন্ পেরক্সাইড্ বাঙ্গলা দেশে প্রতি বৎসর চার পাঁচ লক্ষ টাকার বিক্রয় হয়। অসুস্থ দেহের যে-কোনো গলিত দূষিত স্থল পরিষ্কৃত করবার জন্য হাইড্রোজেন পেরক্সাইড্ মূল্যবান ঔষধ; মুখ প্রক্ষালনের জন্যও এ ঔষধের ব্যবহার অল্প মূল্যবান নয়। আমাদের দেশে কোনো ঔষধের কারখানা এ ঔষধটি ব্যবসা-চল ভাবে এপর্য্যন্ত প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়নি। কারণ, প্রথমতঃ সংশ্লেষণ প্রণালীর দ্বারা বিভিন্ন উপকরণাদি হ'তে হাইড্রোজেন পেরক্সাইড্ প্রস্তুত করাই সহজ কার্য্য নয়, এবং দ্বিতীয়ত হাইড্রোজেন পেরক্সাইড্ (H_2O_2) হ'তে এক ভাগ অক্সিজেন এত সহজে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে সাধারণ জলে (H_2O) পরিণত হয় যে ল্যাবরেটরীজাত হাইড্রোজেন পেরক্সাইড্‌কে পূর্ণশক্তি সম্পন্ন রূপে বোতলে ভরা অতি সুকঠিন ব্যাপার। ১৩৬।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ কলিকাতার নব-প্রতিষ্ঠিত ভ্যাক্স্ ইনষ্টিটিউট্ ল্যাবরেটরী লিমিটেড্ (Vax-Institute Laboratory, Ltd.) আমাদের দেশের এই অভাব এবং অক্ষমতা মোচন করেছেন। ভ্যাক্স-ওজোন (Vax-Ozone) নাম দিয়ে তাঁরা হাইড্রোজেন্ পেরক্সাইড্ প্রস্তুত করেছেন, এবং তাঁদের প্রস্তুত ভ্যাক্সোজোন্ দ্বাদশ আয়তন অক্সিজেন সম্পন্ন ব'লে তাঁরা দাবী করেন। নমুনা স্বরূপ প্রাপ্ত এক বোতল ভ্যাক্সোজোন অভিজ্ঞ চিকিৎসককে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে এর কার্য্য-শক্তি এবং উপকারিতা বিষয়ে আমরা বিশেষভাবে সন্তোষ লাভ করেছি। আমরা আশা করি ভ্যাক্সোজোন্ দেশের একটি সম্পদরূপে গণ্য হ'য়ে কিয়ৎ পরিমাণে দেশের অর্থক্ষয় নিবারণ করবে।

শুধু ভ্যাক্সোজোনই নয়, ইন্‌জেক্‌শন প্রণালীতে ব্যবহৃত বহুসংখ্যক ঔষধের অ্যাম্‌পিউল্ (Vaxin Medicinal Ampoules) ভ্যাক্স্ ইনষ্টিটিউট কর্ত্তৃক প্রস্তুত হয়েছে।

আমরা এই নব-জাত ঔষধ প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও প্রসার কামনা করি।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া লিঃ

এই প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্কটির ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫ তারিখের বোর্ড অফ্ ডিরেক্টর্‌স্-এর বিবরণী এবং সাল-তামামি ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৩৪ সালের ব্যালেন্সশীটের নকল পেয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখে আমরা বিশেষ সন্তোষলাভ করেছি। গত ১৯৩৪ সালে ব্যাঙ্কের খাঁটি লাভ, সায় পূর্ব্ব বৎসরের বকেয়া, ২৯৫০৫১৬৮/১৫ টাকা হয়েছিল। শেয়ার হোল্ডারগণকে প্রথম ছয় মাসের ডিভিডেণ্ট দেওয়া হয় শতকরা ৬্ টাকা হিসাবে; শেষ ছয় মাসের ডিভিডেণ্টও ঐ হিসাবে দেওয়া হবে স্থির হয়েছে। ব্যাঙ্কের ডিপজিটের তায়দাদ চব্বিশ কোটি টাকার অধিক।

দেশী ব্যাঙ্কের এরূপ সন্তোষপ্রদ উন্নতি দেখ্‌লে মনে সত্যই আনন্দের সঞ্চার হয়। আমরা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি।

ঝরণা

জার্ণালিজ্‌ম্ শিক্ষার একটা প্রাথমিক উপায় হচ্ছে হস্তলিখিত মাসিক পত্র সম্পাদন। বহুকাল হ'তে এ রীতি প্রচলিত আছে, এবং বর্ত্তমান কালেও মাঝে মাঝে এমন এক-আধটি মাসিক পত্রের দর্শন লাভ ঘটে। এমন দুই একজন পাকা মাসিকের সম্পাদকের কথা আমাদের জানা আছে যাঁরা তাঁদের ছাত্রাবস্থায় হস্তলিখিত মাসিক পত্রিকায় হাত পাকিয়েছিলেন। সময়ে সময়ে এই সব অমুদ্রিত মাসিকের অপরিচিত অঙ্কে শক্তিমান অজ্ঞাত লেখকের রচনা দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই;—পরে হঠাৎ একদিন দেখি সেই লেখক হস্তলিখিত মাসিকের খেলাঘরের সীমা অতিক্রম করে মুদ্রিত মাসিকের পাকা ঘরে প্রবেশ করেছেন। সুতরাং এই সকল হস্তলিখিত মাসিক পত্রের উপকারিতা অস্বীকার করা যায় না।

'ঝরণা' এই শ্রেণীর একটি মাসিক পত্র। সম্পাদক শ্রীসুপ্রভাত চৌধুরী যখন গত পূজা সংখ্যার ঝরণাটি এনে হাতে দিলেন, এর সৌষ্ঠব দেখে অবাক হ'য়ে গেলাম। ৩ তিনখানা প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্র একত্র করলে যেমন আকার হয় তেমনি মোটা, পুরু অ্যাণ্টিক কাগজ, পাতায় পাতায় নক্সা, কথায় কথায় ছবি, রঙিন ছবি পাঁচ সাত খানা—ছবির সামনে সামনে টিসু পেপার, শক্ত বোর্ড দিয়ে বইখানি বাঁধানো।

সৌষ্ঠব দেখে যেমন আনন্দিত হলাম প্রবন্ধের সম্পদ

দেখে কিন্তু তেমন হ'তে পারলাম না। বাঙলা দেশের প্রচলিত মাসিকপত্রগুলিতে যাঁদের সাক্ষাৎ সর্ব্বদা পাই ঝরণার অধিকাংশ লেখা দেখলাম তাঁদেরই মধ্যে অনেকের। লেখকের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণব রায়, প্রভাবতী দেবী, হেমেন্দ্রলাল রায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, গিরিজাকুমার বসু, জসীম উদ্দীন;—শিল্পীর মধ্যে চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়, ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিন্তামণি কর। বুঝলাম অনেক হাঁটাহাঁটি অনেক সাধ্য-সাধনা ক'রে লেখাগুলি সংগ্রহ করতে হয়েছে, কিন্তু তথাপি সেগুলির মধ্যে উপরোধ পালনের ছাপ সুস্পষ্ট। এর সার্থকতা কোথায়? তার চাইতে নূতন লেখকের অপরিণত রচনার আস্বাদ পেলে বেশি খুসী হ'তাম। সম্পাদক বল্লেন, এটি বিশেষ সংখ্যা, তাই এমন,—সাধারণ সংখ্যাগুলি নূতন লেখকের লেখাতেই পূর্ণ থাকে। এ যুক্তিও সারগর্ভ মনে হ'ল না। বৎসরের মধ্যে এগার মাস যারা পরিশ্রম ক'রে চালায়, উৎসবের দ্বাদশ মাসটিতে তাদের অক্ষম ব'লে বিবেচনা করলে চল্‌বে কেন? নিজের প্রদীপ থেকে যেটুকু আলো পাওয়া যায় সেইটুকুই যথার্থ আলো, পাশের অট্টালিকা থেকে যে আলো জানলা দিয়ে প্রবেশ ক'রে তার উপর নির্ভর করা উচিৎ নয়, সুইচ বন্ধ করলেই সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার!

'ঝরণা'কে অবলম্বন ক'রে এত কথা বলবার এই কারণ যে, বাঙলা দেশে হস্তলিখিত মাসিক পত্রের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়, এবং সেই সকল পত্রের সম্পাদকেরা যদি নিজেদের কর্ত্তব্যবোধ সজাগ রেখে চল্‌তে পারেন তা হ'লে এই সাধনার ফলে উত্তর কালে তাঁরা বাঙলা ভাষার মঙ্গল সাধন করতে সক্ষম হবেন তা নিঃসন্দেহ।

ঝরণা দেখে আমরা সুখী হয়েছি। এর মধ্যে যে যত্ন, উদ্যম, পরিশ্রম এবং শিল্পরুচির পরিচয় আছে তা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। আশা করি এর সুযোগ্য সম্পাদক একে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে নিয়ে যাবেন।

অমৃতবাজার পত্রিকার মামলা

কলিকাতা হাইকোর্টকে অবমাননার অপরাধে অমৃত-বাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ ও প্রিণ্টার শ্রীযুক্ত তড়িৎকান্তি বিশ্বাসের যথাক্রমে তিন মাস ও এক মাস বিনা-শ্রম কারাবাসের দণ্ডবিধান হয়েছে। আমরা উভয়কে আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

শ্রমিক সম্মিলনে শ্রীযুক্ত কানাইলাল দত্ত

আগামী জুন মাসে জেনেভায় আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সম্মিলনে প্রসিদ্ধ কয়লা ব্যবসায়ী এবং ন্যাশনাল সোপ ও কেমিক্যাল ওয়ার্কসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত কানাইলাল দত্ত ভারত গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক পরামর্শদাতা মনোনীত হয়েছেন। ব্যবসাবুদ্ধি-সম্পন্ন বিচক্ষণ কানাইলাল তথায় সগৌরবে তাঁর কর্ত্তব্য পালন করবেন এ বিশ্বাস আমরা সম্পূর্ণ করি।

কাশীপুর বরাহনগর সাধারণ পাঠাগার

শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ গোস্বামী, ডাঃ তারকনাথ মজুমদার, ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস, শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার ঘোষ প্রভৃতির সহযোগিতায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের চতুর্দ্দশ বাৎসরিক উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। এই উপলক্ষে লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষ সাধারণের মধ্যে জ্ঞান চিন্তা ও আনন্দ বর্দ্ধনের বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন। শিক্ষা ও শিল্প প্রদর্শনী ভিন্ন একটি স্বাস্থ্য প্রদর্শনীও খোলা হয়েছিল। শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার ঘোষ ভিন্ন ভিন্ন স্থান পর্য্যটন ক'রে পাঠাগারের উন্নতিকল্পে যে সকল অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছেন তা সুদৃশ্য এবং শিক্ষাপ্রদ স্লাইডের সাহায্যে মনোজ্ঞ বক্তৃতার দ্বারা সকলের নিকট ব্যক্ত করেন।

শ্রীরামপুর সঙ্গীত সম্মেলন

বিগত ২৩শে চৈত্র ১৩৪১ শ্রীরামপুরে সঙ্গীত সম্মেলন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উদ্বোধন উৎসবে পৌরহিত্য করেছিলেন তথাকার চেয়ারম্যান জমীদার শ্রীযুক্ত কানাইলাল গোস্বামী। বঙ্গের প্রসিদ্ধ গায়ক সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী ও ভারতবিখ্যাত তবলাবাদক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

শ্রীহরিহর রায়, শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায়, শ্রীপ্রসাদ বসু, শ্রীঅরবিন্দ মিত্র, শ্রীবিষ্ণুচরণ সান্যাল প্রভৃতির সবিশেষ চেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়েছে। আমরা এই সম্মেলনের ক্রমোন্নতি কামনা করি।

Edited by Upendranath Ganguly, Printed by Saratchandra Mukherjee at The Sreekrishna Printing Works

বিচিত্রা

তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী

রঞ্জন মজুমদার

অষ্টম বর্ষ, ২য় খণ্ড | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২ | ৫ম সংখ্যা

পরিণয়-মঙ্গল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমাদের বিয়ে হোলো ফাগুনের চৌঠা,
অক্ষয় হয়ে থাক্ সিঁদুরের কৌটা।
সাত চড়ে তবু যেন কথা মুখে না ফোটে;
নাসিকার ডগা ছেড়ে ঘোমটাও না ওঠে,
শাশুড়ি না বলে যেন কী বেহায়া বৌটা॥

পাক-প্রণালীর মতে কোরো তুমি রন্ধন,
জেনো ইহা প্রণয়ের সব সেরা বন্ধন।
চামড়ার মতো যেন না দেখায় লুচিটা,
স্বরচিত ব'লে দাবী নাহি করে মুচিটা,
পাতে ব'সে পতি যেন নাহি করে ক্রন্দন॥

যা-ই কেন বলুক্ না প্রতিবেশী নিন্দুক,
খুব ক'সে আঁটা যেন থাকে তব সিন্দুক।
বন্ধুরা ধার চায়, দাম চায় দোকানী,
চাকর বাকর চায় মাসহারা-চোকানি,
ত্রিভুবনে এই আছে অতি বড়ো তিন দুখ॥

বই-কেনা সখটারে দিয়ো নাকো প্রশ্রয়,
ধার নিয়ে ফিরিয়ো না, তাতে নাহি দোষ রয়।
বোঝো আর না-ই বোঝো কাছে রেখো গীতা-টি,
মাঝে মাঝে উল্‌টিয়ো মনুসংহিতাটি,
"স্ত্রী স্বামীর ছায়া সম", মনে যেন হোঁস্ রয়॥

যদি কোনো শুভদিনে ভর্ত্তা না ভর্ৎসে,
বেশি ব্যয় হয়ে পড়ে পাকা রুই মৎস্যে,
কালিয়ার সৌরভে প্রাণ যবে উতলায়,
ভোজনে দুজনে শুধু বসিবে কি দু-তলায়?
লোভী এ কবির নাম মনে রেখো, বৎসে॥

দ্রুত উন্নতি-বেগে স্বামীর অদৃষ্ট
দারোগা-গিরিতে এসে পাক্ শেষে ইষ্ট।
বহু পুণ্যের ফল যদি তার থাকে-রে,
রায়-বাহাদুর খ্যাতি পাবে তবে আখেরে,
তার পরে আরো কী বা র'বে অবশিষ্ট!

১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫ সন
প্রয়াগ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
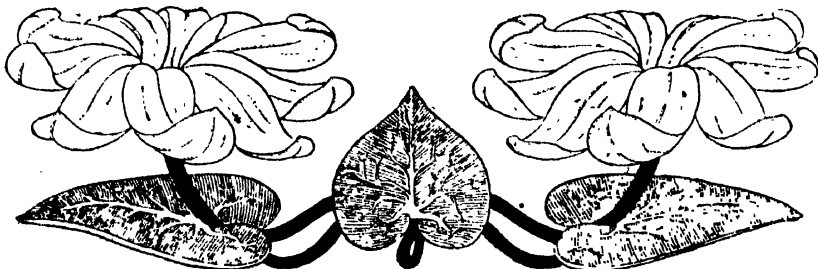
জন্মদিনে

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

গণি যেন অক্ষমালা। বার বার ঘুরে ঘুরে আসে
সম্বৎসর ; শুভ জন্মতিথি তব আসিল আবার
উচ্চকিত অঙ্গুলির পরশনে, বৈশাখী উষার
কনকাক্ষ বিঘোষিল বর্ষশেষ, প্রত্যহের পাশে
টানি দিয়া স্বর্ণ রেখা। হে সবিতা, নবদিবা আশে
চাহিনু পূর্ব্বাশা পানে, মহানন্দে হেরিনু তোমার
জীবনপ্রবাহ 'পরে প্রাণোচ্ছল তরঙ্গ বিস্তার
প্রসারিত দিগ্‌দিগন্তে জ্যোতির্ম্ময় উদার আকাশে।

এল উৎসবের দিন, কাঙালের আয়োজন হীন
রিক্ততা উঠিল ভরি' অন্তরের উদ্বেল হরষে।
অমৃতের বরপুত্র, এখনো রয়েছ আলো করি'
বাংলার কুঁড়েঘর, দীপ্তি তব নির্ম্মল নবীন
চিরদিন র'বে হেথা। ওঠে ভরি' সান্দ্র সুধারসে
কমলের মর্ম্মকোষ দলগুলি যত তার খসে!
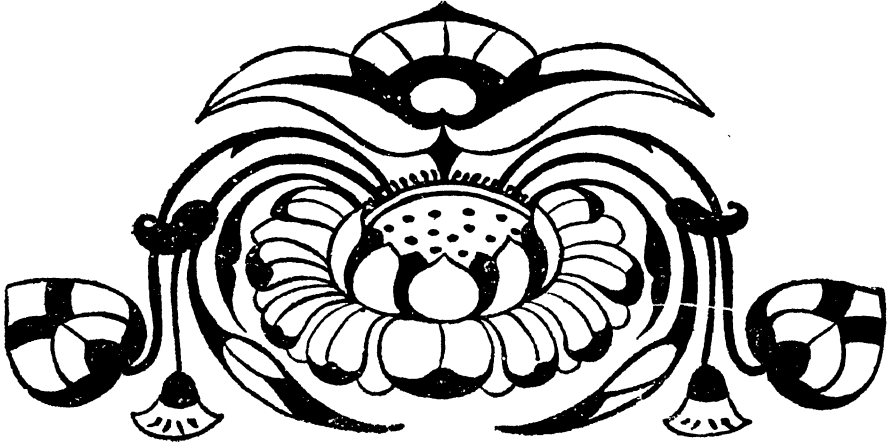
বাঙ্গালীর পুষ্টি *

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্-এ, বি-এস্-সি

Science of Nutrition এর বাঙ্গালা পুষ্টি-বিজ্ঞান এবং Dietetics এর বাঙ্গালা অন্নবিদ্যা দিতেছি।

ইংরাজী ১৯২৭ সালে Vitamin factors in Bengali Diet নামক প্রবন্ধে এবং গত বর্ষে 'বাঙ্গালীর খাদ্যসংস্কার' নামক প্রবন্ধে আমি পুষ্টি-বিজ্ঞানের অভিনব তথ্য সমূহ এবং ঐ সকল হইতে বর্ত্তমান বাঙ্গালীদিগের খাদ্যের কিরূপ পরিবর্ত্তন হওয়া প্রয়োজন তাহার আলোচনা করিয়াছি। পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে যে সকল অসম্পূর্ণতা আছে এবং নূতন যে সকল তথ্য বাহির হইয়াছে এবং আমার নিজের পরবর্ত্তী অভিজ্ঞতা এই প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছি।

বর্ত্তমান প্রবন্ধটীর এইরূপ নামকরণের ইচ্ছা ছিল:—A Basic Diet for Bengalis—ইহার ঠিক শুদ্ধ বাঙ্গালা পাইতেছি না;—বাঙ্গালী জাতির সর্ব্বনিম্ন আবশ্যক খাদ্য—অর্থাৎ যে নিম্নতম মাত্রা ও দামের খাদ্য খাইয়া বাঙ্গালী জাতি সুস্থ ও সবল থাকিতে পারে। অপর দুইটী নাম, A Plea for Bengal's Native Dietary; Back to Bengali Native Diet; বাঙ্গালী জাতির পুরাণ খাদ্যই ভাল বা বাঙ্গালী জাতিকে আবার পুরাণ খাদ্যে ফিরিতে হইবে।

গত প্রবন্ধে আমাকে ভীত ভীত ভাবে (apologetically) বাঙ্গালীর জাতীয় খাদ্যকে সমর্থন করিতে দেখিয়া জনৈক বন্ধু, সুপণ্ডিত ও সুবিজ্ঞ চিকিৎসক বলিলেন, "আমি আপনার প্রবন্ধটি সর্ব্বাংশে সমর্থন করি, কিন্তু এরূপ ভয়ে ভয়ে প্রচার করিলে চলিবে না। আপনাকে জোরের সহিত বলিতে হইবে শরীর বিধান বিদ্যা (Physiology) এবং তদন্তর্গত Science of Nutrition আবিষ্কৃত হইবার বহু পূর্ব্বে বাঙ্গালী জাতি নিজেদের জাতীয় খাদ্য আবিষ্কার করিয়াছিল। নতুবা তাহাদিগের সম্বন্ধে কোনও আলোচনার প্রয়োজন হইত না।" প্রসিদ্ধ অধ্যাপক Starling যখন কলিকাতা ভ্রমণকালে প্রেসিডেন্সি কলেজে আসিয়াছিলেন তখন তিনি কথোপকথন কালে বলিয়াছিলেন, যে-কোন জাতীয় খাদ্য বা অন্য আচার ব্যবহার অনেক সময় বহু অভিজ্ঞতার ফল, উহাকে তাড়াতাড়ি সরাইয়া দেওয়া সঙ্গত নয়; অনেক সময় পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে তাহাদের অন্তর্নিহিত সত্য প্রমাণ হয়।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমার প্রধান বক্তব্য (এবং উহা অতি সহজ ও প্রাচীন সত্য) যে বাঙ্গালী জাতি পুষ্টি-বিজ্ঞানের জন্মের বহু পূর্ব্বে তাহাদের জাতীয় খাদ্য আবিষ্কার করিয়াছিল। এবং বর্ত্তমানের সংঘর্ষে আসিয়া তাহারা ঐ জাতীয় খাদ্য হইতে যতই দূরে আসিয়া পড়িয়াছে ততই তাহাদের ক্ষতির কারণ হইয়াছে।

বাঙ্গালী জাতির পক্ষে, তাহাদের একটা পরাভূতি-অনুভূতি রূপ প্রবৃত্তি (Defeatist tendency) তাহাদের বহু অনর্থের মূল কারণ হইয়াছে। উহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইবার সময় আসিয়াছে। ছেলেবেলা থেকে শুনিয়া আসিতেছি বাঙ্গালীরা পতনোন্মুখ জাতি, বাঙ্গালীর ধর্ম্ম মন্দ, তাহাদের আচার-ব্যবহার মন্দ, তাহাদের পরিচ্ছদ মন্দ, তাহাদের বাসগৃহ মন্দ, তাহাদের খাদ্য মন্দ এমন কি বাঙ্গালা দেশটাই মন্দ। যে জাতি বহু শত বর্ষ পরাধীন হইয়া রহিয়াছে তাহাকে নিঃশঙ্ক ভাবে গালাগালি দেওয়া যাইতে পারে এবং ঐ কার্য্যের জন্য বিশেষ বিদ্যাবত্তা বা গবেষণার প্রয়োজন হয় না। যে ছেলেকে ভাল করিতে হইবে

* কলিকাতা সাহিত্য সম্মিলনের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনের বিজ্ঞান শাখার সভাপতির অভিভাষণ।

ক্রমাগত তাহার দোষ দেখাইয়া তাহার প্রতি কার্য্যে টিক্ টিক্ করিয়া তাহাকে ভাল করা যায় না; সহানুভূতির সঙ্গে তাহার গুণ দেখাইয়া এবং কি উপায়ে তাহার ঐ গুণাবলীর সম্যক বিকাশ হইতে পারে তাহা দেখাইলে তবে তাহার উন্নতি সম্ভবপর। যাহা ব্যক্তির সম্বন্ধে খাটে তাহা জাতির সম্বন্ধেও খাটে।

আমাদের জাতীয় ধর্ম্মের সরল সাধনপ্রণালীর সুখ্যাতি করিতে আমরা ভীত হইয়াছি, যতদিন না সপেনহোর এমার্সনের চিন্তা দ্বারা কিম্বা কুইয়ে-ফ্রয়েডের গবেষণা দ্বারা সেগুলি পবিত্রীকৃত ও সমর্থিত হইয়াছে। আমাদের জীবজন্তুর প্রতি সদয় ব্যবহারের মাহাত্ম্য অনুভব করিতে ভয় হইয়াছে যতদিন না ডারউইন দেখাইয়াছেন যে ঐ নিম্ন জীবেরাও মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত। আমাদের নগ্নপদ ও গাত্র বা সূর্য্যকিরণে ভাসিত তৈলসিক্ত দেহ দেখাইতে ভয় হইয়াছে যতক্ষণ না ভিটামিন ডি আবিষ্কৃত হইয়াছে ও পাশ্চাত্যদেশে স্বাস্থ্যবিদ্‌গণ Nudist cult প্রচার করিয়াছেন।

বাঙ্গালা দেশ খারাপ এই ভাবটা দেশ মধ্যে প্রচার হওয়ার ফলে বাঙ্গালীরা বাঙ্গালার বাহিরে কোটী কোটী টাকা ব্যয় করিয়া স্বাস্থ্যনিবাস সকল নির্ম্মাণ করিয়াছে। যাহাকে বৎসরের মধ্যে দশ এগার মাস অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিতে হয় শুধু দুই এক মাস বাহিরে থাকিয়া তাহার কি হইবে? ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের চেষ্টায় দক্ষিণ কলিকাতায় অস্বাস্থ্যকর জলা ও জঙ্গলের মধ্যে যে সকল স্বাস্থ্যকর নব সহর গঠিত হইয়াছে তাহা দেখিয়া মনে হয় বাঙ্গালীরা যে টাকা বিদেশে বাড়ী নির্ম্মাণ ও রেল যাতায়াত খরচায় ব্যয় করিয়াছে, যদি তাহারা ঐ টাকার চতুর্থাংশ বাঙ্গালা দেশেই নব সহর নির্ম্মাণে ব্যয় করিত তাহা হইলে বাঙ্গালী জাতির অনেক দুঃখ কমিয়া যাইত।

আমার এই পুষ্টি সম্বন্ধীয় প্রচার কার্য্যের কালে অনেকবিধ তর্ক শুনিতে হইয়াছে। একজন বলেন, "আপনি শুধু সস্তা জিনিষের দ্বারা কি প্রকারে পুষ্টি হইতে পারে তাহাই অন্বেষণ করিতেছেন, কোন্ জিনিষের দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল পুষ্টি হইতে পারে তাহার দাম যাহাই হউক না কেন, তাহা অন্বেষণ ও প্রচার করাই প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের কর্ত্তব্য।" আমি বলিলাম, "যে প্রকারে খুব সস্তা জিনিস ও উপায়ের দ্বারা পুষ্টি সাধিত হইতে পারে তাহা নিরূপণ করাই বৈজ্ঞানিকদিগের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। জাপান ও অন্যান্য দেশে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া ঐ উদ্দেশ্যে পুষ্টি-চতুষ্পাঠী (Nutrition Institution) সমূহ গঠিত হইয়াছে। এদেশেও তাহা হওয়া উচিত।" বাঙ্গালী জাতি অতি দরিদ্র; মহার্ঘ্য উপায় বাতলাইলে অতি অল্প লোকেরই উপকার হইবে। আর বর্ত্তমান সময়ে আমাদের অন্ততঃ এইটুকুও শিক্ষা হইয়াছে যে প্রতিবেশীর দুঃখ দারিদ্র্য অনুভব করিয়া এবং নিজের সাচ্ছল্য অনুভব করিয়া তুলনায় কল্পনায় আনন্দ করা সঙ্গত নহে—পারলৌকিক কারণে নহে,—দয়ার প্রাবল্যে নহে—শুধু নিজের হিতের জন্য আনন্দ করা সঙ্গত নহে। কারণ দরিদ্র প্রতিবেশীর ছেলে যক্ষ্মায় বা কলেরায় বা ম্যালেরিয়ায় বা বসন্তে আক্রান্ত হইলে ঐ সকল রোগের বীজাণু নিজের বাটীতে আসিয়াও পড়িতে পারে, এবং সেখানের দুই এক জন লোক রোগাক্রান্ত হইয়া মরিতে পারে। আর দেহের সর্ব্বাপেক্ষা (optimum nutrition) সকল সময়ে ব্যক্তিগত বা জাতীয় সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টির কারণ নহে। নরমাংসভোজী ও আমমাংসভোজী ভীমবল ও দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস জাতি ভারতবর্ষে ও আফ্রিকায় অপেক্ষাকৃত অপুষ্ট ও শান্ত প্রকৃতির জাতিদ্বারা পরাভূত হইয়াছিল।

বাঙ্গালা দেশের আবহাওয়াকেও নিন্দা করা ফ্যাসান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে স্বাস্থ্য ভাল থাকে না; স্বাস্থ্য লাভ করিতে গেলে হয় দার্জ্জিলিং নয় পুরী বা সাঁওতাল পরগণায় যাইতে হইবে। এই ফ্যাসান চলিত হওয়াতে দেশের স্বাস্থ্যের অবনতি আরও দ্রুত হইয়াছে। কলিকাতার গঙ্গায় পূর্ব্বে অনেক গৃহ-বোট থাকিত তাহাতে বাস করিয়া কিছু দিনের মধ্যেই অনেক নরনারী ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিত; তাহা এক্ষণে লোপ পাইয়াছে। ঢাকারও House boat সকল ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে এবং House boat fashion পুনরুদ্ধার না করিতে পারিলে শীঘ্রই লোপ পাইবে। স্বাস্থ্য উদ্ধারের স্থান যতই নিকটে, হয় ততই সুবিধা। খুব শীঘ্র উহা ব্যবহার করা যায়—

মিতব্যয়িতার জন্যও বটে নৈকট্যের জন্যও বটে। বাঙ্গালা দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যকে নিন্দা করাও একটা ফ্যাসান হইয়াছে। দার্জ্জিলিংএ বেড়াইতে গিয়া হিমালয়ের সুদূরস্থ মেঘবৎ ঝাপসা শৃঙ্গ দেখিয়া যাহারা বিভোর ভাব দেখাইবার চেষ্টা করেন, তাঁদের মধ্যে বার আনা লোকও নিজের দেশের নদীতটে বসিয়া সূর্য্যের উদয় বা অস্ত দেখিয়াছেন কিনা সন্দেহ;—যে সৌন্দর্য্যে বিভোর হইয়া বৈদিক ঋষি উষার জয়গান করিয়াছিলেন; এবং এখনও লোকে উপাসনার কালের উদয়কালীন সূর্য্য, মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্য এবং অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের বিচিত্র সৌন্দর্য্য ধ্যান করিয়া নিজের আত্মাকে প্রসারিত করিবার চেষ্টা করেন। যাঁহারা পশ্চিমের রৌদ্রতপ্ত ও ধূলিধূসরিত বায়ুমণ্ডল, গৃহ ও পথ এবং তৃণহীন কঙ্করময় ফাটা মাঠ দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইবার প্রয়াস পান তাঁহারা বাঙ্গালার স্বচ্ছ বায়ুমণ্ডল, বিহগকূজিত আম্রবন এবং শ্যামল দিগন্তরেখা দেখিয়া উৎফুল্ল হইবার শিক্ষা পান না। সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাহার অনুভূতি করিতে হইলেও শিক্ষার প্রয়োজন। আমাদের দেশের দৃশ্যের সৌন্দর্য্য এবং সাধারণ কার্য্যাবলীর সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার জন্য আমাদের মনকে প্রস্তুত করিতে হইবে, শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। তখন আমরা কবির মত বলিতে পারিব :—

> Will you seek afar off? You
> surely come back at last,
> In things best known to you the best,
> or as good as the best,
> In folks nearest to you finding
> the sweetest, lovingest,
> Happiness, knowledge, not in another
> place, not for another hour but
> this hour.*

বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য চাউল বা ভাতের বিরুদ্ধে একটী প্রচণ্ড প্রচারকার্য্য (propaganda) চলিতেছে। আমাদিগকে স্বদেশজাত সহজলভ্য ও সুলভ ভাত ছাড়িয়া বিদেশ হইতে আগত ও মহার্ঘ ময়দা খাইতে হইবে। যে তর্কপ্রণালীর দ্বারা সিদ্ধান্ত করা হয় যে যেহেতু বাঙ্গালীরা ভাত খায় এবং বাঙ্গালীদের বেরিবেরি ব্যারাম হয় অতএব ভাতই বেরিবেরির কারণ, ঠিক সেই বিধ তর্কের দ্বারাই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, যেহেতু মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীদের মধ্যে অধিক বেরিবেরি হয় এবং মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীরাই গরীব বাঙ্গালীদিগের অপেক্ষা অধিক ময়দা আহার করে অতএব ময়দা আহারই বাঙ্গালীর বেরিবেরির কারণ। যেহেতু বাঙ্গালীরা ময়দা বা আটা খাইতে অভ্যস্ত নয় সেজন্য ধূলা, সোপষ্টোনের গুঁড়া কিংবা কীটদষ্ট জীর্ণ গমের গুঁড়া প্রভৃতি ভেজাল ময়দাসহ মিশাইলে বাঙ্গালীরা তাহা সহজে ধরিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ পাঞ্জাবী প্রভৃতি জাতিরা যাহারা ময়দা খাইতে অভ্যস্ত তাহারা যে ভাবে রুটী করে বাঙ্গালীরা সে ভাবে রুটী করে না।† পাঞ্জাবীরা আটাটাকে বহুক্ষণ আগে প্রচুর জল দিয়া ভিজাইয়া রাখিয়া দেয়; ময়দার মধ্যস্থ বিবিধ enzyme ঐ সময় কতকটা কার্য্য করে; পরে উহারা ঐ মাখা আটা উত্তমরূপে মর্দ্দন করে; উহাতে এত জল দেয় যে উহাকে বেলুনে সম্পূর্ণরূপ বেলা যায় না খানিকটা হাতে করিয়া চওড়া করিতে হয়; পরে সেই মোটা রুটী তাওয়ায় ও আগুনে সেঁকে; ময়দাটী পাতলা করিয়া মাখা হয় বলিয়া তাওয়ায় সেঁকিলে উহা অনেকাংশে Soluble starchএ পরিণত হয় পরে আগুনে সেঁকিবার কালে উহা কতকাংশে Dextrinএ পরিণত হয়। পাঞ্জাবীরা ঐ রুটী গরম গরম খাইয়া থাকে, গরম অবস্থায় রুটিগুলি নরম থাকে উহা সুচর্ব্বিত হইতে সুযোগ পায় এবং পাচকরস সমূহ উহার উপর সহজেই কার্য্য করিতে পারে। তুলনা করা যাউক ইহার সহিত বাঙ্গালার রুটী প্রস্তুতপ্রণালী; তাড়াতাড়ি ময়দা শক্ত করিয়া মাখিয়া বেলিয়া পাতলা পাতলা রুটী গড়া হইল, পরে উহা তাওয়ায় দুই এক মিনিট সেঁকিয়া পনর কুড়ি সেকেণ্ড আগুনে সেঁকিয়া রুটী হইল; ঐ রুটীতে বেশীর ভাগ কাঁচা starch থাকিয়া যায়, Dextrinও কম তৈয়ারী হয়। আর অধিকাংশ

* Whitman.

† পেশওয়ারীরা আবার ময়দার সঙ্গে খানিকটা খামির (yeast) মিশায়, উহাতে পাঁউরুটীর মত রুটী তৈরী হয়।

বাটীতেই ঐ রুটী অনেকক্ষণ রাখিয়া দেয়। জুড়ান রুটী দাঁত দিয়া ভাল চর্ব্বণ করা যায় না এবং তাপের অভাবে মুখলাল (Saliva) প্রভৃতি পাচকরসও সম্যক উৎপন্ন হয় না; উহা হজম করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তা ছাড়া দেখা যায় যে-বাঙ্গালী ভাত খাইতে গেলে দু ছটাক বা আড়াই ছটাক চাল খায় সে রুটী খাইতে গেলে তিন বা চার ছটাক আটা বা ময়দা খায়। ভাতটী ফুলা থাকে বলিয়া বেশী খাওয়া যায় না। ইহার ফলে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর খাদ্যে অধিক শ্বেতসার প্রবেশ করে। এবং ইহা তাহার পক্ষে একবারেই ভাল নহে কারণ তাহার পরিশ্রম কম বলিয়া তাহার দেহে অতিরিক্ত শ্বেতসারময় খাদ্যের কোনও প্রয়োজন নাই। ঐ অপাচ্য অতিরিক্ত শ্বেতসার, হয় অন্ত্রে জড় হইয়া পচিয়া Dyspepsia উৎপাদন করে, নয় হজম হইয়া (কাহারও হজম-শক্তি অধিক) শরীরে প্রবেশ করিয়া Diabetes রোগের সৃষ্টি করে।

উচ্চৈঃস্বরে ভাতের মহিমা বর্ণনা করিবার সময় আসিয়াছে। ভাতের মত সুপাচ্য ও সুলভ খাদ্য আর নাই। বিহারের অর্দ্ধেক অংশ, বাঙ্গালা, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, আসাম, বর্ম্মা, শ্যাম, জাভা, চীন দেশ এমন কি দুর্দ্ধর্ষ জাপানী জাতির দেশেও ভাতই প্রধান খাদ্য। পৃথিবীর অর্দ্ধেক অংশেরও বেশী লোকের ভাতই প্রধান খাদ্য। রুষ-জাপান যুদ্ধের সময়ে জাপানী সৈন্যগণের বড় বড় রণভ্রমণ (march) ভাতের উপরে নির্ভর করিয়াই হইয়াছিল। জাপানী সৈন্যগণের সঙ্গে থাকিত শুক্‌না ভাত; গরম জলে তাহা কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিয়া উহা তাহারা ভক্ষণ করিত। ভাত সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ খাদ্য বলিয়া ভাতখেগো জাতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অন্য জাতিরা পারিয়া উঠিতেছে না। ভাতখেগো জাতিরা যখন বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞানসম্মত উপায়গুলি জীবনসংগ্রাম কার্য্যে ব্যবহার করিবে তখন তাহারা দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিবে।

ভাতখেগো জাতিরা বহু যুগের অভিজ্ঞতায় ভাতেরও গুণের সীমা (Limitations) পাইয়াছিল। তাহারা বুঝিয়াছিল ভাত অতি সুপাচ্য ও সুলভ খাদ্য হইলেও উহা সম্পূর্ণ খাদ্য নহে। আমরা এখন বুঝি ভাত সর্ব্বাপেক্ষা সুপাচ্য ও সুলভ তাপাঙ্ক (calorie) দানকারী (heat producing) খাদ্য। আমরা যদি এই সত্যটী উত্তমরূপে বুঝিতে পারি তাহা হইলে ভাত হইতে আমাদের কোনও বিপদ্ নাই। ভাতে প্রটিন অংশ অতি কম, স্নেহময় অংশ নাই বলিলেই হয়, এবং উহার লবণ পদার্থ সমূহ ও ভিটামিন সমূহ কম। বাঙ্গালীর ভাত রাঁধিবার প্রথায় * লবণ ও ভিটামিন সমূহ প্রায় বিদূরিত করা হয়। চাল কিনিবার সময় উহার দুর্গন্ধ আছে কিনা এবং উহাতে ভেজাল আছে কিনা তাহা নির্ণয় করা সহজ। একসের ময়দার মধ্যে আধ ছটাক রাস্তার ধুলা মিশাইয়া দিলে উহা সহজে ধরা যায় না; এবং এক মণে ভেজালের জন্যই দুই আনা দশ পয়সা লাভ হইতে পারে। চাল সংগ্রহ করিয়া রাঁধিবার পূর্ব্বে উত্তমরূপে ধুইয়া লওয়া হয় ইহাতে কতকটা লবণ পদার্থ এবং অল্প ময়লা বাহির হইয়া যায়। তার পরে প্রচুর জলে চালগুলিকে সিদ্ধ করিয়া ফেন গালা হয়; উহাতেও ভিটামিন ও লবণ বাহির হইয়া যায়। এই প্রণালীতে যে ভাত রাঁধা হয় তাহা অতি সুপাচ্য দু-তিন ঘণ্টার মধ্যেই হজম হইয়া যায়।

ভাতের আর একটী দোষ হইতেছে যে উহা অম্লপ্রজনক (acid producing) খাদ্য। আজকাল কয়েক বর্ষ হইতে শরীর ব্যাপার সমূহের উপর H-ion concentration এর প্রভাব সম্বন্ধে অনেক গবেষণা হইয়াছে। সাধারণের বোধগম্য ভাবে ঐ প্রসঙ্গের বিস্তৃত আলোচনা করিবার সময় আমার এই প্রবন্ধে নাই। কিন্তু ঐ ব্যাপারের সম্বন্ধে যাহাতে সাধারণের মধ্যে একটী স্মৃতি বা জিজ্ঞাসার ভাব থাকিয়া যায় তন্নিমিত্ত সামান্য আলোচনা করিতেছি। খাদ্য নির্ব্বাচন কালে প্রধানতঃ এই সকল বিষয়গুলির প্রতি জোর দেওয়া হয়:—(১) মূল্য (২) সুপাচ্যগুণ (৩) তাপ প্রদানগুণ (Heat value) (৪) খাদ্যের প্রটিন মূল্য বা উপযুক্ত প্রটিন (৫) খাদ্যের স্নেহ মূল্য অর্থাৎ খাদ্যে অবস্থিত উপযুক্ত স্নেহময় পদার্থ মাত্রা (৬) খাদ্যের ভিটামিন মাত্রা (৭) খাদ্যের অপাচ্য বস্তু মাত্রা (Roughage)। ঐ সাতটীর

* ভাবপ্রকাশ ও অন্যান্য বৈদ্য গ্রন্থেও এই প্রথারই সমর্থন করা হইয়াছে।

সহিত আমি আর দুইটী যোগ দিতে চাহিতেছি। (৮) খাদ্যের বিবিধ খনিজ পদার্থ মাত্রা। খাদ্যে যথোপযুক্ত মাত্রায় তাপমূল্য, প্রটিন, স্নেহ এবং ভিটামিন থাকা সত্বেও খনিজ পদার্থের অভাবে শরীর টিকে না—অসুস্থ হয় ও মৃত্যু ঘটে। সোডিয়াম, পোটাসিয়াম ও ক্যালসিয়াম ঘটিত লবণের অভাব ঘটিলে অবিলম্বে মৃত্যু হয়। তদ্ব্যতীত লৌহও খাদ্যে অত্যাবশ্যক বস্তু। খাদ্যে আয়োডিনের উপযোগিতা বহুকাল প্রমাণ হইয়াছে। যে সকল স্থানে খাদ্যে আয়োডিন কম সেখানে থাইরইড গ্রন্থির পীড়া গলগণ্ড রোগ জন্মে। এরূপ স্থলে জলের সহিত আয়োডিন লবণ মিশাইয়া চিকিৎসা করিয়া উপকার পাওয়া যায়। সৌভাগ্যক্রমে বাংলা দেশ সমুদ্রের নিকটস্থ বলিয়া উহার জমিতে আয়োডিনের অভাব নাই এবং বাঙ্গালা দেশের উদ্ভিদে যথেষ্ট আয়োডিন থাকে। সম্প্রতি দেখা গিয়াছে যে খুব সামান্য মাত্রায় তাম্রঘটিত লবণও শরীরের পক্ষে অত্যাবশ্যক। কয়েকবিধ রক্তাল্পতা রোগে সামান্য তাম্র ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাওয়া গিয়াছে। লবণ পদার্থসমূহ প্রায় সকল স্বাভাবিক খাদ্যে থাকে। যে সকল খাদ্য কৃত্রিম উপায়ে পরিস্কৃত করা হয় তাহাতে লবণের অংশ কমিয়া যায়। গুড়ে লবণ ভাগ আছে কিন্তু বিশুদ্ধ চিনিতে লবণাংশ কিছু নাই। গম বা চালের উপরিভাগে লবণণ ও ভিটামিন থাকে। উহা কাঁড়িয়া শুভ্র চাল বা শুভ্র ময়দা প্রস্তুত হইলে উহার লবণ ও ভিটামিন অনেক বাদ যায়। আলু প্রভৃতি তরকারীতে লবণ মাত্রা ভাল কিন্তু কোটার দোষে অনেক লবণ বাহির হইয়া যায়। আলুর খোসার নীচেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লবণ ; বাঁধাইয়া আলু কুটিয়া এবং উহাকে জলে ধৌত করিলে উহার মূল্যবান লবণপদার্থ সমূহ অনেক বাহির হইয়া যায়। খোসাশুদ্ধ আলু, পটল ব্যবহার করিলে বা ঐ সকল আনাজ বড় বড় করিয়া কাটিলে উহার লবণ ও ভিটামিনের সম্যক সংরক্ষণ হয়। ছোট ছোট করিয়া আলু কুটিয়া জলে ধৌত করিলে উহার লবণাংশ অনেক বাহির হইয়া যায়। লাবরা তরকারী সমূহ এবং খোসাশুদ্ধ সিদ্ধ করা তরকারী এ জন্য অধিক উপকারী। ঝোলের ও শুক্তের তরকারী এ কারণ যথা সম্ভব বড় করিয়া কোটা আবশ্যক। অথবা আগে তরকারী গুলি জলে ধুইয়া লইয়া পরে ছোট ছোট করিয়া কুটিয়া আর না ধুইলেও লবণাদির সম্যক সংরক্ষণ হয়।

(৯) খাদ্যের **ক্ষার ও অম্লের সামঞ্জস্যের** কথা ধরিতে হইবে। আমাদের রক্ত এবং শরীরস্থ টিসু সমূহ খুব সামান্য মাত্রায় ক্ষার গুণযুক্ত। শরীর মধ্যে বিবিধ রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে শরীরে নানাবিধ অম্লপদার্থের উৎপত্তি হয়। কচিৎ ক্ষারের আধিক্য-সম্ভাবনা হয়। শরীরযন্ত্র এমনই অদ্ভুত ভাবে নির্ম্মিত যে উহাতে সামান্য মাত্রায় ক্ষার বা অম্ল আধিক্য হইলে উহা বিকল হইয়া পড়ে ও পরে মৃত্যু ঘটে। খাদ্য হইতেই বা খাদ্য পরিণামের (metabolism)-এর ফলে শরীরে ক্ষার বা অম্ল জন্মে। শরীর মধ্যে হঠাৎ ক্ষার বা হঠাৎ অম্লাধিক্য হইলে উহা হইতে আত্মরক্ষা করিবার শরীরের অদ্ভুত উপায় সকল আছে। শরীরে হঠাৎ অম্লাধিক্য হইলে প্রথমতঃ ঐ অম্ল শরীরস্থ দুইটি লবণের সহিত মিলিয়া অম্লগুণহীন বা সমভাপন্ন হয়। এই দুইটী লবণ সোডিয়াম বা পোটাসিয়াম বাইকার্ব্বনেট ও ফসফেট। শরীরে ঐ দুই লবণ পদার্থের অভাব হইলেও স্বাস্থ্যের ব্যতিক্রম ঘটে। শারীরিক পরিশ্রমের ফলে এবং বিবিধ প্রটিন খাদ্য জীর্ণ হইয়া ঐ সকল অম্ল পদার্থ সৃষ্ট হয়। স্নেহময় পদার্থও সম্যক জীর্ণ না হইলে অম্ল পদার্থের সৃষ্টি করে। ডায়াবেটিস রোগের শেষ ভাগে এই স্নেহময় পদার্থের অপজীর্ণন হেতু প্রচুর অম্ল পদার্থের সৃষ্টি হয়—স্বাস্থ্যহানি হইয়া ক্রমশঃ মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়। শরীরে সম্যক মাত্রায় উক্ত লবণগুলি উপস্থিত না থাকিলে প্রটিন খাদ্য কতক অংশে য়্যামোনিয়ায় পরিবর্তিত হইয়া অম্লের সমতা বিধান করে। কিন্তু ঐ কার্য্য প্রটিনের মুখ্য কার্য্য নহে। নিতান্ত বাধ্য হইয়াই শরীর রক্ষার্থ ঐ কার্য্য করিতে হয়। উহা কতকটা যেন বহুমূল্য শাল দিয়া গামছার কার্য্য সম্পাদন করা। Berg দেখাইয়াছেন যে যদি খাদ্যে সম্যক মাত্রায় ক্ষারলবণ থাকে তাহা হইলে প্রটিনের ঐরূপ অপব্যবহার হয় না। কাজেই কম প্রটিনেও স্বাস্থ্য সম্যক রক্ষিত হইতে পারে। মিতব্যয়িতার দিক হইতেও উহা খুব প্রয়োজনীয়। আর এমন অনেক দেহ আছে যাহার পাকযন্ত্র, যকৃৎ বা বৃক্ক (Kidneys) অত্যধিক প্রটিন খাদ্য হজম বা তাহার

পরিণামজাত পদার্থের সুচারুরূপ বহিষ্করণ কার্য্যে সমর্থ নহে। এরূপ লোকেও স্বল্প প্রটিন অথচ ক্ষারবহুল খাদ্য খাইয়া সুস্থ থাকিতে পারে। কতকগুলি খাদ্য যেমন ভাত রুটী মাছ, মাংস, ডিম অম্লবহুল খাদ্য। ঐ সকল খাদ্য পোড়াইলে উহাদের ছাইয়ে অম্লাধিক্য থাকে। ডাল, আলু, কচু প্রভৃতি বিবিধ আনাজ ও তেঁতুল, আম প্রভৃতি ফল এবং দুগ্ধ ক্ষারবহুল খাদ্য, অর্থাৎ ঐ সকল খাদ্যের ছাইয়ে ক্ষার অধিক থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য ভাত অম্লজনক হওয়াতে উহার অম্লজনকতা গুণের সমতা বিধানার্থ উহার সহিত ক্ষার গুণ যুক্ত ডাল ও বিবিধ আনাজ মিশাইতে হইবে। তবে উহা উপযুক্ত খাদ্য হইবে নচেৎ নহে। আলুতে যথেষ্ট মাত্রায় ক্ষার পদার্থ থাকে। আলুর প্রটিন অত্যন্ত ফলোপযোগী এ কথা বহু দিন হইতে জানা ছিল। আলুতে সম্যক মাত্রায় ক্ষার থাকাতে কম প্রটিনেও শরীর রক্ষা হয়। যাহারা খুব তাড়তাড়ি বেরিবেরি রোগের কারণ বাহির করিতে ভালবাসেন (যেমন বেরিবেরির সর্ষপ তেল মত, চাউল মত) তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত সমরেখা বাদ (Parallelism) সম্বন্ধে অনুধ্যান করিতে বলি। আলুর মূল্য ও বেরিবেরি রোগ। আলুর দাম যখন সব চেয়ে বেশী বেরিবেরিও তখন সব চেয়ে বেশী। আলুর দাম কমের সঙ্গে বেরিবেরিও কমিতে থাকে। আলুর দাম যখন বেশী হয় সাধারণ আনাজ ও ফলের দামও সেই সময়ে বেশী। সেইরূপ কোন বর্ষে আম কম হইলেও লোকের খাদ্যে লবণ ও ভিটামিন কম হইতে পারে। যে বৎসর আম বেশী হয় সে বৎসর লোকে আশ্বিন মাস পর্য্যন্তও আম খাইয়া থাকে। শুধু জিনিসের দামের কথা ভাবিলে চলিবে না। লোকের ক্রয় সামর্থ্যও বিচার কালে আলোচ্য।

গত বর্ষে Berg Theoryর উপর ভর করিয়া বাঙ্গালীর খাদ্য সংস্কার শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম তাহা পাঠ করিয়া জনৈক ডাক্তার বন্ধু তর্ক তুলেন যে ডাল জাতীয় খাদ্য সত্য-সত্যই ক্ষার (alkali) বহুল কিনা? Sherman এর বইতে যে দত্ত (data) দেওয়া হইয়াছে তাহা পাঠে সন্দেহ ঘনীভূত হইল। এই সমস্যা মীমাংসা করিবার জন্য আমি এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের শরীর বিধান বিদ্যার সহযোগী শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রনারায়ণ বেরা এম্-এস্-সি উভয়ে এক গবেষণায় নিযুক্ত হই। ঐ কার্য্য এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই; সম্পূর্ণ হইলে উহা স্বতন্ত্র পত্রে প্রকাশিত হইবে। উহার ফল যাহা পাইয়াছি তাহাতে আমরা বিস্মিত হইয়াছি। আমি এখানে ভট্টাচার্য্য ও বেরার অপ্রকাশিত বিবৃতি (paper) হইতে কিছু সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ দিতেছি। কয়েকবিধ চাল, ডাল ও আটা সম্বন্ধে আমাদের কার্য্য শেষ হইয়াছে। প্রণালী এই:—৫ গ্রাম পরিমিত দ্রব্য (চাল, ডাল, আটা, ময়দা প্রভৃতি) ভস্মীভূত করা হয়। পরে ঐ ভস্মের সহিত ২৫ সি, সি ডেসিনর্ম্মাল য়্যাসিড মিশান হয়, পরে ঐ মিশ্রকে ডেসিনর্ম্মাল য়্যালক্যালি দিয়া সমবিন্দু (Neutral point) না আসা পর্য্যন্ত টাইট্রেট করা হয়। কেমিষ্ট দিগের উহা বুঝিতে অসুবিধা হইবে না। সাধারণ পাঠকের উহা বুঝিবার চেষ্টার প্রয়োজন নাই। প্রয়োজনীয় কথা যাহা পাইলাম তাহা এই:—চাউলের ভস্ম অম্লগুণযুক্ত। বিবিধ আটা ও ময়দার ভস্ম ঈষৎ ক্ষারগুণযুক্ত; এই ব্যাপারে আমাদের পরীক্ষার সহিত বৈদেশিক পরীক্ষার অসামঞ্জস্য হইতেছে; তাহাদের মতে ময়দাও ঈষৎ অম্লগুণযুক্ত। ডালগুলির ভস্ম সকলেই ক্ষারগুণযুক্ত। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ডালের ক্ষারের মাত্রার পার্থক্য খুব বেশী। মুগডালের ক্ষার মাত্রা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, তার পর কড়াই, তার পর অরহর, তার পর ছোলা, তার পর মটর, তার পর মসুর এবং সর্ব্বশেষ খেসারি।

নিম্নলিখিত তালিকা হইতে উহাদের আপেক্ষিক ক্ষারত্ব বা অম্লত্ব সহজে বোধগম্য হইবে।

৫ গ্রাম দ্রব্যের ভস্ম		উহাতে অবস্থিত $\frac{N}{10}$ অম্ল বা ক্ষারের তুলনায় দত্ত অম্ল বা ক্ষার	
মুগ	ডাল	১০·৭৫	ক্ষার
কড়াই	„	৯·৩৫	
অরহর	„	৮·৩৫	
ছোলা		৪·৬৫	
মটর	„	২·৪৫	„
মসুর	„	২·১	„
খেসারী	„	১·৯৫	„
আটা (লাল)		১·৭৩	„
ময়দা (সাদা)		·১৫	„
চাল (ঢেঁকি ছাটা)		·৭২	অম্ল
চাল (কল ছাঁটা)		·৫	অম্ল

কুলথ কলায়ের ডাল খাইয়া বা উহা ভিজইয়া তাহার জল খাইয়া অনেকের অশ্মরী আরোগ্য হইয়াছে। কবিরাজেরা উহা ঐ রোগে ব্যবহার করিয়া থাকেন। সম্ভবতঃ উহার ক্ষার মাত্রা অধিক। আমাদের উহা এখনও বিশ্লেষণ করা হয় নাই।

এক্ষণে আমার প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্যে আসিয়া পৌঁছিলাম। বাঙ্গালীদের একটি Basic Diet বা Standard Diet স্থাপন করা দরকার। ঐ খাদ্য তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বহুকাল ধরিয়া পরীক্ষার দ্বারা নির্ণয় করিয়াছিল। ইউরোপীয় খাদ্য এদেশের ঠিক উপযোগী বলা যায় না। কারণ সাহেবদের বৎসরের মধ্যে দুই তিন মাস দার্জ্জিলিং বা সিমলার মত শীতল স্থানে না কাটাইলে চলে না। এবং তিন চার বৎসর অন্তর তাহাদের স্বদেশ গমন না করিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে না। তদ্ব্যতীত তাহাদের আর্থিক সাচ্ছল্যের জন্য এ দেশেও যে সকল ব্যয়সাধ্য শৈত্যজনক উপায় অবলম্বন করা হয়, সাধারণ বাঙ্গালীর পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে। যাহা অসম্ভব তাহার জন্য হা হুতাশ করা অপেক্ষা যাহা সম্ভব তাহারই যথাসম্ভব সুব্যবহার করা সঙ্গত। Coue এবং Canon এর গবেষণা দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে যে আমাদের মানসিক অবস্থার উপরে রক্তসঞ্চালন-যন্ত্রাবলী, শ্বাস-যন্ত্রাবলী এবং পাক-যন্ত্রাবলীর সুচারু কার্য্য নির্ভর করে। আনন্দ ও সন্তোষ অভ্যাস দ্বারা পরিপাক রস সমূহ সুষ্ঠুরূপে প্রস্তুত হয় এবং শারীরিক সম্যক পুষ্টি-বিধান হইয়া থাকে।

বাঙ্গালীর Basic Diet (তলদেশীয় খাদ্য) প্রাচীন বাঙ্গালীর খাদ্য; উহাই আমরা সমর্থন করিতেছি। এবং উহার সপক্ষে প্রচার করিতেছি, ভাত, ডাল, তরকারী এবং অম্বল, এই চারি পদার্থযুক্ত খাদ্যই বাঙ্গালীর Basic Diet। উহার একটিকেও বাদ দেওয়া বা কম করা চলে না; বাদ দিলেই খাদ্য অসম্পূর্ণ হইবে। শরীরের সম্যক পুষ্টি হইবে না; রোগাক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা বাড়িবে। (১ম) **ভাত**। উহা সহজপাচ্য ও সুলভ তাপাঙ্কদানকারী খাদ্য। যাহারা যত শারীরিক পরিশ্রম করে তাহাদের তত অধিক ভাতের প্রয়োজন। যাহারা পরিশ্রম করে না তাহাদের পক্ষে অতিরিক্ত ভাত বিষবৎ কার্য্য করে। মধ্যবয়সে অর্থ সাচ্ছল্যের ফলে যাঁহারা রন্ধনকার্য্যের পারিপাট্য বিধান করিতে সমর্থ তাঁহারা প্রয়োজনাতীত ভাত খাইয়া নানা রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে যে হবিষ্য বা তদনুরূপ সিদ্ধ খাইয়া সুফল পান তাহার কারণ হবিষ্যের গুণে নহে, মিতাহারের গুণে; মশলাদিহীন অপ্রীতিকর আহার লোকে নিতান্ত প্রয়োজন না থাকিলে গলাধঃকরণ করিতে পারে না। (২য়) **দাইল**। এই খাদ্যের প্রয়োজন, প্রটীন বাড়াইবার জন্য, বিবিধ লবণ পদার্থ ও ভিটামিন বি বাড়াইবার জন্য। ডালের ক্ষার লবণগুলি ভাতের অম্লাধিক্যদোষ নাশ করে। ডালের বি অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ। ঐ পদার্থের অভাবে শরীরের উপচয় সম্যক হয় না; অতএব বৃদ্ধিশীল ছেলেমেয়েদের খাদ্যে উহা থাকা অত্যাবশ্যক। ভিটামিন বি-র অভাবে নার্ভগুলির মাংসপেশীগুলির বিশেষতঃ পরিপাক যন্ত্রের গাত্রস্থ মাংসপেশীগুলির অধোগতি হয়, পরে অপরিপাক ও উদরাময় হয়। কেহ কেহ বলেন ডাল সহ্য হয় না এবং তাহারা একেবারে ডাল খাওয়া বন্ধ করেন। উহাতে এক কু-চক্র (vicious circle) গঠিত হয়। পাকযন্ত্রের স্বাস্থ্যপ্রাপ্তির যাহা প্রধান ঔষধ সেই ভিটামিন বি তাহারা খাদ্য হইতে বর্জ্জন করেন। যাহাদের ডাল সহ্য হয় না তাহাদের অন্ততঃ ডালের পাতলা ঝোল খাওয়া প্রয়োজন। উহাতে লবণ ও ভিটামিন অনেক অংশে থাকে। (৩য়) **তরকারী** উহার অন্তর্গত পটোল, বেগুন প্রভৃতি ফল, আলু, মূলা, প্রভৃতি মূল এবং শাক অর্থাৎ গাছের কচি পাতা ও ডগা তরকারী হইতে আমরা বিবিধ খনিজ লবণ—বিশেষতঃ ক্ষার লবণ, ভিটামিন এ এবং স্বল্প পরিমাণে অন্য ভিটামিনও পাই। তদ্ব্যতীত উহারা খাদ্যে কর্কশাংশের (roughage) এর কার্য্য করে। ভিটামিন এ শরীরের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন। এবং উহা সংক্রামক রোগেরও প্রতিষেধক ঔষধ। এইরূপ পরীক্ষা করা হইয়াছিল:—দুই দলই সমপুষ্ট ইঁদুরকে দুই খাঁচায় রাখা হইয়াছিল। এক দলের খাদ্যে ভিটামিন এ ছিল এবং অন্য দলের খাদ্যে ছিল না। তারপর দুই দলকেই টাইফইড রোগের বীজাণুদ্বারা আক্রান্ত করা হয়। যাহাদের খাদ্যে ভিটামিন এ ছিল না তাহাদের অধিকাংশই

মারা যায়; অন্য দলের বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নাই। ভিটামিন এ যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগেরও প্রতিষেধক মহৌষধ। (৪র্থ) অম্ল তেঁতুল আম, কুল, আমড়া, চালতা প্রভৃতি। এই সকল সহজলভ্য ও সুলভ খাদ্য হইতে আমরা বিবধ লবণ ও ভিটামিন সি পাই। ভিটামিন সি আমাদের রক্তকৈশিকা (capillaries) গুলির সংরক্ষক মহৌষধ। ঐ ভিটামিনের অভাবে কৈশিকাগুলি বিকৃত হয় ও সহজে ফাটিয়া যায়। দাঁতের মাড়ি হইতে সহজে রক্তপাত হয়; নানাবিধ চর্ম্মরোগ হইতে থাকে। উপরোক্ত Basic Diet যাহারা নিয়মিত ভাবে গ্রহণ করে তাহাদের খাদ্য সামঞ্জস্যীকৃত; উহার একটীরও অভাব হইলে খাদ্য অসামঞ্জস্যীকৃত; ঐরূপ খাদ্যে শরীর রক্ষা হয় না। সামঞ্জস্যীকৃত খাদ্য গ্রহণকারী দরিদ্রগৃহেও অনেক সুপুষ্ট সুস্থ লোক দেখা যায়। অসামঞ্জস্য খাদ্য খাইয়া অনেক বড় লোকের ঘরের ছেলেও রুগ্ন ও অপুষ্ট থাকে। ভিটামিন ডি র কথা উপরে আলোচনা করি নাই। ঐ ভিটামিন আমাদের শরীরের অস্থি সকলের সংগঠনকারী মহৌষধ। নগ্নগাত্র (বিশেষতঃ তৈলসিক্ত করিয়া) প্রাতঃকালীন রৌদ্রে উদ্ভাসিত করিলে রক্ত মধ্যে ভিটামিন ডি সংগঠিত হয় এবং অস্থিগঠন কার্য্যে সহায়তা করে। ছেলে-মেয়ের গাত্রে অধিক মাত্রায় কাপড় চোপড় জড়াইয়া রাখিলে তাহাদের শরীরে ঐ ভিটামিনের অভাব হয়, পরে ডাক্তার খরচ করিয়া কডলিভার অইল খাওয়াইয়া ঐ ভিটামিন প্রদান করিতে হয়। আনাজের মধ্যে ঐ ভিটামিন কতকাংশে থাকে আর বাটনার মধ্যেও কতক; সর্ষপ, পোস্ত, তিল প্রভৃতি তৈলময় বীজের বাটনায় ঐ ভিটামিন থাকে।

উপরে যে বাঙ্গালীর Basic Diet দেওয়া হইল (ভাত, ডাল, চচ্চড়ি ও অম্বল) তাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ, অতি দরিদ্রেরও উপযোগী। অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থার লোকে ঐ খাদ্যে বিদ্রোহ করিবে কিন্তু উহার অন্তর্ভুক্ত তথ্য (Principle) সকলেরই হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। কারণ অবস্থান্তর ঘটিলে (যেমন চাকরী যাইলে, কন্যার বিবাহের পর, বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া) মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী বাহিরের ভড়ং যথাসম্ভব বজায় রাখিতে চেষ্টা করে; ব্যয় সংক্ষেপের চেষ্টা হয় শুধু খাবারের উপর দিয়া। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় উপরোক্ত Basic Diet যেরূপ পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয় এক্ষণে তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাউক:—

(১) নিরামিষ আহার। উপরোক্ত আহারও নিরামিষ; উহার উপর দুগ্ধ যোগ করিলে উহা আরও উৎকৃষ্ট খাদ্য হইবে। দুগ্ধের জৈব প্রটিন সহজপাচ্য এবং উহা উত্তম ভিটামিন এ যুক্ত খাদ্য। প্রচুর শাক খাইয়া তবে দুগ্ধের অনুরূপ ভিটামিন এ পাওয়া যাইবে। অত শাক হজম করা বা খাওয়া অনেকের পক্ষে অসাধ্য। প্রাত্যহিক খাদ্যে এক ছটাক হইতে আধ সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ থাকিতে পারে। ইহার অতিরিক্ত দুগ্ধ যাহারা কোনও রূপ পরিশ্রম করেন না তাহাদের পক্ষে অনাবশ্যক ও ক্ষতিকর। যেখানে দুগ্ধের মাত্রা কম সেখানে উহা দহিতে পরিবর্ত্তিত করিয়া ব্যবহার করা উচিত।

(২) আমিষ আহার:—ডিম্ব, মৎস্য ও মাংস। আমিষ প্রটিন শরীরের শীঘ্র উপচয়কারক। তা ছাড়া চিংড়ি, মৌরলা প্রভৃতি ছোট মাছে অধিক মাত্রায় ক্যালসিয়ম আছে। অতএব ছোট মাছ একেবারে নগণ্য নহে। প্রত্যহ কিছুমাত্রায় ছোট মাছ খাওয়া উচিত। ক্যালসিয়ম, লৌহ প্রভৃতি আবশ্যক খনিজ পদার্থ একদিনে বেশী মাত্রায় দিলে শরীর উহা শোষণ করিতে পারে না; উহা বিষ্ঠার সহিত বাহির হইয়া যায়। কিন্তু প্রত্যহ অল্প অল্প মাত্রায় দিলে উহা সহজে শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া কাজে লাগে। অতএব চিংড়ি ও চুণা মাছের অম্বল প্রত্যহ অল্প মাত্রায় খাইলেই বেশী উপকার হয়।

(৩) স্কুল কলেজের ছেলেদের খাবার:—স্কুলের ছেলেদের খাবারই সর্ব্বাপেক্ষা অসামঞ্জস্য (unbalanced)। যাহাদের অবস্থা হীন তাদের ছেলেদের প্রায় দিনের পর দিন আলু ভাতে ভাত খাইয়া যাইতে হয়। ডাল, একটু বেশী করিয়া আলু ও অন্য আনাজ ভাতে এবং একটু আচার বা তেঁতুল দিলে ঐ খাদ্য অনেকটা উন্নত হইবে। এক মুঠা চিংড়ি মাছ ভাজা বা অন্য মাছ ভাজা দেওয়া উচিত। মাছ বেশী করিয়া ভাজিলে উহার

প্রটিন দুষ্পাচ্য হয়, কিন্তু উহার হাড় মচমচে হওয়ায় সহজে গুঁড়া হইয়া ভোজ্যে পরিণত হয়। অবস্থাপন্ন ঘরের স্কুলের ছেলেদের খাদ্যও অসামঞ্জস্যীকৃত। তাহারা প্রচুর মাছ, মাংস, ডিম্ব বা দুধ পাইয়া ডাল, অম্বল ও আনাজ খাইতে চাহে না। তাহাদের খাদ্যে প্রায় ভিটামিন বি ও সি র অভাব ঘটে। একটু অবস্থাপন্ন ঘরেই টাইফায়েড রোগ বেশী। ছেলেদের প্রথম হইতেই শিখাইতেই হইবে যে প্রত্যহ কিছু ডাল, আনাজ ও অম্বল গ্রহণ করা উচিত। মাছের ঝোল বা ভাল সুক্ত হইলে ছেলেরা আর ডাল খাইতে চাহে না। এরূপ স্থলে তাহারা আহারের প্রথমেই ডালটাকে সুপের মত করিয়া চুমুক দিয়া খাইতে অভ্যস্ত হউক।

বাঙ্গালীর খাদ্যে ডাল ও ঝোল যথাসম্ভব পাতলা হওয়া বাঞ্ছনীয়। এরূপ করিলে বাঙ্গালীর পানীয়ের মধ্যে রক্ষিত জলের মাত্রা বাড়িয়া যাইবে এবং অরক্ষিত জলের মাত্রা কমিয়া যাইবে। যে ব্যক্তি দিনে চার গেলাস জল খাইত যদি ডাল ও ঝোলের ভিতর দিয়া তাহার দুই গেলাস জল প্রাপ্তি হয় তবে তাহার শুধু জল মাত্র দুই গেলাস খাইলেই চলিবে। বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ স্থানের জল উপরিস্থ জল (surface water); বিবিধ রোগের বীজাণুপূর্ণ; শরীরযন্ত্র একটি নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় বীজাণু ধ্বংস করিতে সমর্থ; ঐ মাত্রার অতিরিক্ত বীজাণু শরীরে প্রবেশ করিলে তাহাদের সকলগুলি বিনষ্ট হয় না; রোগ সৃষ্টি করে। অতএব দেখা যাইতেছে শুধু জল খাওয়া অপেক্ষা ছেলেদের ডাল ও ঝোলের মধ্য দিয়া সুসিদ্ধ জল কতকাংশ খাওয়াইতে পারিলে তাহাদের কলেরা, টাইফইড প্রভৃতি রোগাক্রান্ত হইবার সম্ভবনা কমিয়া যাইবে। এই আলোচনায় দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্বে যে ছেলেদের কানা উঁচু কাঁসিতে করিয়া ভাত খাইতে দেওয়া হইত, যাহাতে প্রচুর তরল পদার্থ খাওয়া যাইত, তাহা প্রকৃতই স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল ছিল। অনেকে জল ফুটাইয়া ব্যবহার করিয়া ভাবেন রোগ হইতে অব্যাহতি পাইব; কিন্তু তাহা ঘটে না; কারণ জল ফুটাইবার ভার থাকে চাকর বামুনের উপর; তাহারা ভাল করিয়া না ফুটাইয়া বা ফুটান জলের সহিত অন্য জল মিশাইয়া তাড়াতাড়ি কাজ করিয়া থাকে; আর বীজাণুর বীজগুলি (Spores) সব সময়ে অল্প সিদ্ধ হইয়া নষ্ট হয় না; ডাল ও ঝোল অনেকক্ষণ ধরিয়া ফুটিতে পায়; লবণ থাকায় উহার ফুটানর তাপ মাত্রা শুদ্ধ জলের অপেক্ষা অধিক এবং লঙ্কা, হলুদ প্রভৃতি মশলারও বীজাণু নষ্ট করিবার শক্তি আছে। অতএব বাঙ্গালীর খাদ্য মাদ্রাজীদের অনুকরণে প্রচুর জলযুক্ত হউক। পশ্চিমের ডাল-তরকারী ঘন বা শুকনা হয় তাহাতে ক্ষতি নাই; কারণ সেখানকার কূয়ার জল ভাল।

পরিশেষে আমি কয়েকটী খাদ্যতালিকা যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, দিতেছি। উহা হইতে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাইবে।

পরিশিষ্ট

১০টি বাঙ্গালী পরিবারের ডাইলের হিসাব :—

মুগ ডাল ও মসুর ডাল বেশী চলিত; বোধ হয় সহজে সিদ্ধ হয় বলিয়া; পশ্চিম বঙ্গের লোকে কড়াইয়ের ডাল বেশী খায় কিন্তু পূর্ব্ব বঙ্গের লোক খুব কমই খায়। অরহর অনেকটা চলিত; মটর ও খেসারী ডাল খুব কম চলিত। ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের জন প্রতি এই মাত্রা পাওয়া গেল।

মাত্রা—ছটাক—(১) ৪/৫; (২) ১ ১/৮; (৩) ২ ১/৬; (৪) ১ ২/৭; (৫) ১ ৩/৫; (৬) ১ ১/৪; (৭) ৪/৯; (৮) ৪/৯; (৯) ১/২; (১০) ২/৬।

যে বাড়ীতে হিন্দুস্থানী চাকর বেশী সেই বাড়ীতে ডালের খরচও বেশী; যে বাড়ীতে বাঙ্গালী চাকর বেশী বা চাকর নাই সেই বাড়ীতে ডালের খরচ কম। অনেক বাড়ীতে দুই বেলা ডালই হয় না। ইহা বিশেষ অনুধ্যানযোগ্য; ডালে ভিটামিন বি থাকে। উহা বেরিবেরির মহৌষধ। বেরিবেরি মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর বেশী হয়; বাঙ্গালীরা একবারে অধিক ডাল হজম করিতে পারে না। অতএব তাহাদের কোন আহারই একেবারে ডাল-শূন্য হওয়া উচিত নয়।

বাঙ্গালীর খাদ্য—মোদক পরিবার :—কলিকাতা

সকালে :—জলখাবার—মুড়ি, সন্দেশ বা রসগোল্লা।

মধ্যাহ্নে ঃ—ভাত, ডাল, ভাজা (আলু, পটল), চড়চড়ি, মাছের ঝোল।

অম্বল কখনও কখনও। ভাত—প্রতি বারে চাল তিন ছটাক বা এক পোয়া; ডাল এক পোয়াতে ৫ জন—৳ ছটাক। মাছ—এক ছটাক। সকাল বেলার বাজার খরচ ছয় আনা—আট আনা; লোক সংখ্যা ৫ জন।

বিকালে ঃ—প্রায় কিছু খায় না।

রাত্রে ঃ—৯টা—১০টা। রুটী—আটা ৫ জনে ১ সের, জন ৩ ছটাক। তরকারী—১টা প্রধানতঃ আলু; মিষ্ট দোকানের।

সুস্থ। অসুখ নাই।

বাঙ্গালী পল্লীগ্রামের শ্রমিক পরিবার ঃ—

সকালে মুড়ি ও গুড়। মধ্যাহ্নে ভাত, মাছ, ডাল, অম্বল। রাত্রে ঐ। চাল জন প্রতি—৷৷০ সের, ডাল দিন দেড় ছটাক। মাছ চুনা আদি দেড় ছটাক। তেঁতুল রোজ। লঙ্কা। আনাজ—আলু, বেগুন, কখনও কম কখনও বেশী। লোকেদের শরীর সুস্থ ও কর্ম্মপটু।

হিন্দুস্থানী খাদ্য

ডালওয়ালা ঃ—সকালে কিছু না। ১২ টার সময় ছাতু এক পোয়া, লঙ্কা ১টা, লবণ। রাত্রে—আটা আধ সের, অরহর ডাল আধ পোয়া। আলু, বেগুন আদি আনাজ এক পোয়া। ঘি—আধ ছটাক। সবল ও সুস্থ।

গোয়ালা (দোহাল), বলিষ্ঠ ঃ—বেহারী, আরা জিলা। দুবেলা ভাত। ৯ টার সময় বাতাসা—১ ছটাকের কম। জন প্রতি দু বেলায় চাল দিন—এক সের। ডাল দেড় পোয়া জন প্রতি, আলু এক পোয়া জন প্রতি। বেগুন ⁄০ ছটাক। ঘি জন প্রতি আধ ছটাক। তেল এক ছটাকের কিছু কম, মশলা পাঁচ জনে দুই পয়সা। Menu—ভাত, ডাল, আলু, বেগুনভাতে এক বেলা, কোনও দিন টক ও অম্বল দিয়া খায়, কোনও দিন শুধু ডাল দিয়া। মাছ খায় না। বর্ষাকালে এক বেলা ছাতু—জন প্রতি দেড় পোয়া —রাত্রে আটা আধ সের। শীতকালেও দুপুরে ছাতু, রাত্রে আটা (জাঁতাভাঙ্গা)। দুধ কখনও কখনও।

উড়িয়া মজুরের খাদ্য

উড়িয়া মজুরদের খাদ্য ঃ—জন প্রতি চাল—তের ছটাক, —দাম পাঁচ পয়সা; ডাল—২½ ছটাক। মাছ প্রায় চুণা—১¼ ছটাক—দাম প্রায় দু পয়সা। সর্ষপ তেল—⅛ ছটাক, দাম ½ পয়সা। মশলা ও লবণ এক পয়সা। তেঁতুল রোজ না। আনাজ—বেগুন, আলু—।০ পোয়া দাম দেড় পয়সা। পেঁয়াজ—৴৫ পয়সা। দুবার ভাত। চা খায় না। খৈনী, দোক্তা ও চূণ খায়। জল খাবার খায় মুড়ি—৴১০ ও পেঁয়াজ। চা ও মুড়ি কখন। তেলে ভাজা কখনও কখনও। ভাতের পূর্ব্বে দুধ দেড় ছটাক। আফিং না। কচু বেশী খায়। শাক, ভাত, ডাল, তরকারী, মাছ খায়।

জাপানী খাদ্য

(জনৈক জাপান প্রত্যাগত উচ্চপদস্থ ডাক্তারের নিকট হইতে প্রাপ্ত।)

উহারা চা অত্যন্ত খায়। Salts ও ভিটামিন কিছু কিছু পাওয়া যায়; ফলে খাদ্যে অরন্ধিত জল অপেক্ষা রন্ধিত জল বেশী থাকে। প্রধান খাদ্য ভাত, সয়াবিনের সুপ। সয়াবিন এক প্রকার মটর, চীনা বাদামের ন্যায় প্রচুর তৈলযুক্ত, এবং উহাতে প্রটিন ও ডালের মত থাকে। মাছ টাট্‌কা বা শুঁটকী। আনাজ প্রধানতঃ মূলা। জাপানী মূলা প্রকাণ্ড; উহা কাঁচা বা সিদ্ধ বা আচার করিয়া প্রচুর মাত্রায় ব্যবহার করে। দুগ্ধের ব্যবহার নাই বলিলেই হয়। লবণের ব্যবহার অত্যন্ত কম।

মাদ্রাজীদিগের খাদ্য

(শ্রীযুক্ত প্রভাতনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত)

জনৈক বন্ধু মাদ্রাজ তিন মাস ভ্রমণ করিয়া মাদ্রাজী খাদ্য সম্বন্ধে এই সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সকালে প্রায় চা ও ইডলি। ইডলি ঃ—চাল ও কড়াই ডাল বেশ করিয়া বাটিয়া ও ফেটাইয়া (ফেটানর সময় উহাতে বায়ু প্রবেশ করে) ছোট ছোট বাটীতে রাখিয়া ভাপে (Steam bath) সিদ্ধ

করা হয়। বায়ু তাপে বিস্তৃত হওয়ায় ইডলির (বড়া) ভিতরটা ফোঁফরা হইয়া যায়। ইডলি প্রায় লঙ্কা ও নারিকেল বাঁটার চাটনি দিয়া খায়। মধ্যাহ্নে—ভাত বাঙ্গালা দেশেরই মত ফেন গালা; সামান্য একটু ঘৃত; ভাতের অনুপান এই কয়টি অল্পবিস্তর সব জায়গাতেই পাওয়া যায়ঃ—প্রথম—সম্বর:—সজনে খাঁড়া, ঢেঁারস, ঝিঙ্গে প্রভৃতি টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া ডালের সহিত সিদ্ধ; ডাল ও তরকারীর মাত্রা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জলের ভাগ সুপ্রচুর। দ্বিতীয়—রসম:—গোলমরিচ, লঙ্কা, দারুচিনি, লবঙ্গ, আদা প্রভৃতি মশলা এবং পেঁয়াজকুচি সম্বলিত ফোঁড়ন দেওয়া তেঁতুলের জল। তৃতীয়—পাকড়ি দই ও সিদ্ধকরা বিবিধ তরকারী মিশান— পরিমাণ সামান্য। চতুর্থ—ভাজা, প্রায়ই লঙ্কা ভাজা বা লঙ্কা পোড়ান এবং মচমচে করিয়া সিম বিশেষ ভাজা। পঞ্চম—খুব পাতলা ঘোল। ষষ্ঠ কখনও কখনও পায়সম্—ক্ষীণদুগ্ধ পায়স বিশেষ। কখনও কখনও মাদ্রাজীরা দোসে নামক এক প্রকার খাদ্য খায়—উহা চাল, ডাল ও পেঁয়াজ দিয়া তৈরী—সরু চাকলির মত। আর বিবিধ জাতীয় ডালের বড়াও জল-খাবারের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। ব্রাহ্মণ হোটেলে প্রায় সর্ব্বত্র ঐ খাদ্য। তবে অন্য জাতিরা মাছ ও মাংস খায়। উপরোক্ত খাদ্যে প্রটিন ও ভিটামিন এ (যাহা দুগ্ধজ খাদ্যে থাকে) কম। ভিটামিন B ও C উপযুক্ত মাত্রায় আছে। ঐ খাদ্যে প্রাণিজ প্রটিন (মাংস, মাছ ও দুগ্ধ) যোগ হইলে ভাল হয়। মাদ্রাজীরা ক্ষীণদেহ জাতি হইলেও কর্ম্মঠ জাতি; ম্যালেরিয়া ও বেরিবেরিতে অধিক ভোগে না। মাদ্রাজে খাবার জন্য তিল তৈল ব্যবহার হয়, গায়েও তাই মাখে। আরও দক্ষিণে নারিকেল তৈল খায়।

শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

অভিজ্ঞান

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১৭

প্রত্যূষে যখন প্রকাশের মোটর গেট্ পার হ'য়ে গৃহাঙ্গণে প্রবেশ করল তখন সবিতা বারান্দায় স্বামীর প্রতীক্ষায় ব'সে ছিল। দূর থেকে প্রকাশের পার্শ্বে সন্ধ্যাকে উপবিষ্ট দেখে মনটা একেবারে তিক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। একবার ভাবলে তাড়াতাড়ি উঠে বাড়ির ভিতর চ'লে যায়,—কিন্তু ভাবতে ভাবতেই গাড়িটা এত কাছে এসে পড়ল যে তার আর উপায় রইল না।

অতি কষ্টে কোনো প্রকারে সন্ধ্যাকে কলিকাতায় চালান করে মনে মনে সে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছিল। তার উপর কাল সন্ধ্যার পর ষ্টেশনে গাড়ি পাঠাবার জন্য যখন প্রকাশের টেলিগ্রাম এল তখন সবিতা মনে মনে এই কথাই স্থির ক'রে নিয়েছিল যে, সন্ধ্যাকে তার শ্বশুরেরা সহজে গ্রহণ ক'রেছে ব'লেই এত শীঘ্র প্রকাশের ফিরে আসা সম্ভবপর হয়েছে। আজ সন্ধ্যাকে প্রকাশের সঙ্গে ফিরে আস্‌তে দেখে মনের সমস্ত স্থৈর্য্য অন্তর্হিত হ'ল। মনে হোল, এ আপদ সংসারের শান্তি একেবারে নষ্ট না ক'রে দিয়ে ছাড়বেনা।

গাড়ি থেকে অবতরণ ক'রে বারান্দার উপর উঠে প্রকাশ সবিতার মুখমণ্ডলে যে বস্তু সুপরিস্ফুট দেখ্‌লে তার সহিত ধূম মেঘ মসী প্রভৃতি দ্রব্যের উপমা দেওয়া চলে। সন্ধ্যাকে নিয়ে প্রত্যাবর্ত্তনের ফলে এই ধরণের ঘটনাদির সম্ভাবনা আছে মনে মনে সে আশঙ্কা বরাবরই ছিল। আসন্ন অপ্রীতিকর অবস্থার দুশ্চিন্তায় মনটা বিষণ্ণ হয়ে উঠ্‌ল, কিন্তু তথাপি মুখে একটু ক্ষীণ হাস্য স্ফুরিত ক'রে বল্‌লে, "কি সব্? খবর সব ভাল ত?"

সবিতা বল্‌লে, "সবের মধ্যে ত আমি। বেঁচে যখন আছি তখন ভালই।"

অদূরে একটা চেয়ারের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে প্রকাশ বল্‌লে, "কিন্তু ঐ চেয়ারের পিঠে ঝোলানো ও সৌখীন জামাটি নিশ্চয়ই আমার নয়,—সুতরাং আরও কিছু খবর থাক্‌তে পারে ব'লে মনে হচ্চে।"

সবিতা বল্‌লে, "ও! ওটা প্রমথ ঠাকুরপোর। প্রমথ ঠাকুরপো কাল কলকাতা থেকে এসেছেন।"

"হঠাৎ?"

"হঠাৎ ভিন্ন কবে তিনি নোটিস দিয়ে আসেন?"

স্মিত মুখে প্রকাশ বল্‌লে, "এ কথা অকাট্য। কিন্তু কোট ঝুলচে, দেহ কোথায়?"

সন্ধ্যা সংক্ষেপে বল্‌লে, "বাথরুমে।"

"বোঝা গেল।" ব'লে প্রকাশ ভিতরের দিকে প্রস্থান কর্‌লে।

প্রমথ পিতৃমাতৃহীন ধনী যুবক। নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত কোনও গ্রামে, কিন্তু গ্রামের সহিত সম্পর্ক একরকম বিচ্ছিন্নই। কচিৎ কদাচিৎ সেখানে পদার্পণ করে, বাস করে কলিকাতার গৃহে। বহু দূর সম্পর্কে সে প্রকাশের পিসতুত ভাই। সাধারণত এরূপ অবস্থায় আত্মীয়তার স্বীকার-স্বীকৃতি আদান-প্রদান থাকে না, এ ক্ষেত্রেও ছিল না; কিন্তু প্রকাশ এবং সবিতা একবার লক্ষ্মৌ বেড়াতে গিয়ে ঘটনাক্রমে দুই এক দিনের জন্য প্রমথর অতিথি হ'তে বাধ্য হয়। প্রমথ তখন দীর্ঘকাল যাবৎ তার লক্ষ্মৌয়ের বাড়িতে বাস করছিল। সেই সময়ে কথায় কথায় তাদের মধ্যে আত্মীয়তার ক্ষীণ ধারাটুকু অকস্মাৎ আবিষ্কৃত হ'য়ে পড়ে। তারপর থেকে প্রমথ পশ্চিমযাত্রার পথে মাঝে মাঝে দু-চার দিনের জন্য জামসেদপুরে প্রকাশের গৃহে অবস্থান ক'রে যায়। প্রমথর প্রকৃতি উচ্ছৃঙ্খল, চরিত্র তার নিষ্কলুষ নয়, এ সব কতকটা জানা এবং বোঝা থাক্‌লেও তার সহৃদয়তা এবং আন্তরিকতার গুণে প্রকাশ এবং সবিতা তাকে ভালবাস্‌ত এবং সে এলে খুসী হোত।

সন্ধ্যা প্রকাশের পশ্চাতে এসে দাঁড়িয়ে ছিল, এগিয়ে এসে নত হ'য়ে সবিতাকে প্রণাম করে ভগ্নকণ্ঠে বল্‌লে, "আবার ফিরে এলাম সবি দিদি।"

গম্ভীর মুখে সবিতা বল্‌লে, "ফিরে যে আস্‌বে তা কতকটা জানাই ছিল।"

কথাটা নিতান্ত সহজ নয়। এই ফিরে আসার অপরাধের জন্য সবিতা কোন্ পক্ষকে দায়ী করতে চায়—সন্ধ্যাকে, না সন্ধ্যার পিতা মাতা শ্বশুর শ্বাশুড়ী স্বামীকে—তা ঠিক বোঝা যায় না,—কিন্তু তার মুখের ভাব এবং কথার সুর থেকে মনে হয় সন্ধ্যার প্রতি তার সন্দেহ কম নয়। বিশেষতঃ নিত্যকার 'তুই' সম্বোধনের পরিবর্ত্তে আকস্মিক 'তুমি' শব্দের প্রয়োগ সাধারণতঃ বিদ্রূপ বিরক্তি প্রভৃতি মনোভাবেরই পরিচায়ক। আত্মাবমাননার গ্লানিতে সন্ধ্যার মুখ কঠিন হয়ে উঠ্‌ল; বললে, "তোমার কতকটা জানা ছিল, আমার কিন্তু পুরোপুরিই জানা ছিল।"

সবিতা রুক্ষস্বরে বল্‌লে, "তাই যদি ছিল তা হ'লে যাবার দরকারই বা কি ছিল শুনি?"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "অদৃষ্টের ভোগ ছিল, ভুগে এলাম।"

দৃঢ়স্বরে সবিতা বল্‌লে, "এ কথা আমি মানিনে;—অদৃষ্ট গাছে ফলে না, আমরা নিজ হাতেই গ'ড়ে তুলি। কিন্তু সে কথা যাক্, তোমার মুখুজ্জেমশাই সেখানে তোমার বিষয়ে চেষ্টা-চরিত্র কিছু করেছিলেন, না শুধু তোমাকে একদিনের জন্যে বেড়িয়েই নিয়ে এলেন?"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "এ কথা তুমি মুখুজ্জে মশাইকে জিজ্ঞাসা কোরো সবি দি, তিনি ঠিক বল্‌তে পারবেন; তবে আমার বিশ্বাস সাধ্যমত চেষ্টার ক্রটি তিনি করেন নি।"

"কিন্তু তাঁর সাধ্য কি একদিনেই শেষ হোল? আর দিন দুই সেখানে থেকে চেষ্টা করলে বিশেষ কিছু ক্ষতি হোত কি?"

এ কথার যথাযথ উত্তর দিতে হ'লে এমন সব কথা বলবার প্রয়োজন হয় যাতে কথোপকথনটা ক্রমশ বচসার রূপ ধারণ করতে পারে। তা'ছাড়া, প্রকাশের নাম ক'রে সবিতা যে দোষারোপ করছিল প্রকৃতপক্ষে যখন তা সন্ধ্যার উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হচ্ছিল তখন শুধু প্রকাশের পক্ষের কৈফিয়ৎ দিয়েই কথাটাকে সম্পূর্ণভাবে শেষ করা যায় না। আপাততঃ কি উপায়ে আলোচনাটা বন্ধ করবে মনে মনে সেই কথা সন্ধ্যা চিন্তা করছিল এমন সময়ে অদূরে প্রমথ আবির্ভূত হোল। সন্ধ্যাকে দেখে থম্‌কে দাঁড়িয়ে সবিতার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে সে জিজ্ঞাসা করলে, "আসতে পারি?"

সবিতা বল্‌লে, "নিশ্চয় পারো, এসো প্রমথ ঠাকুরপো।"

নিকটে এসে চেয়ার থেকে জামাটা নিয়ে গায়ে দিতে দিতে প্রমথ বললে, "প্রকাশ দাদা এসেছেন তা গাড়ির আওয়াজে আর তাঁর গলার শব্দে টের পেয়েছি, কিন্তু এত দেরী হোল কেন? গাড়ি লেট্ ছিল না কি?"

সবিতা বল্‌লে, "বোধ হয় ছিল।"

সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে মৃদুস্বরে প্রমথ জিজ্ঞাসা করিল, "ইনি?"

সবিতা বলিল, "সন্ধ্যা!"

সন্ধ্যার কথা সবিতার মুখে প্রমথ প্রায় সবটাই শুনেছিল, এত শীঘ্র প্রকাশের সহিত তার প্রত্যাবর্ত্তনে মনে কৌতুহলের উদয় হোল, কিন্তু সন্ধ্যা-প্রসঙ্গের অনালোচ্যতা স্মরণ ক'রে তদ্বিষয়ে কোন প্রশ্ন করা সে অসমীচীন বিবেচনা করলে; সন্ধ্যাকে সম্বোধন ক'রে বললে, "এত সংক্ষেপে বউদিদি আপনার পরিচয় দিলেন তা থেকে বুঝতে পেরেছেন আপনার পরিচয় আমার অজানা নয়; যদিও আপনাকে দেখচি আজ প্রথম কিন্তু নাম করলেই বুঝতে পারি। আপনার দিদি আমার বউদিদি, সুতরাং এ বাড়িতে আমার কি সম্পর্ক তাও বুঝতেই পারছেন।"

সবিতা বললে, "কিন্তু সে সম্পর্কের হিসেবে তোমার ওকে আপনি বলে সম্বোধন না করলেও চলে।"

সবিতার কথা শুনে প্রমথর মুখে হাসি দেখা দিলে; বল্‌লে, "শুধু সম্পর্কের হিসেবেই নয় বউদিদি, বয়সের হিসেবেও আপনি বলে সম্বোধন না কর্‌লে চলে, কিন্তু আজকালকার কালের যুগরীতির হিসেবে বিনা অনুমতিতে হঠাৎ তুমি ব'লে সম্বোধন করলে বর্ব্বরতার পরিচয় দেওয়া হবে।"

প্রমথর কথা শুনে একটু ব্যস্ততা সহকারে সন্ধ্যা তার প্রতি দৃষ্টিপাত করে ঈষৎ আরক্তমুখে বললে, "অনুমতির

কোনো দরকার নেই, আপনি আমাকে তুমি বলেই ডাকবেন।"

স্মিত মুখে প্রমথ বললে, "আচ্ছা, তাই বলেই তাহলে ডাকব।"

সন্ধ্যা গৃহমধ্যে প্রস্থান করলে প্রকাশ বললে, "ভারী সুন্দর দেখতে ত! তোমার বোনের মত সুন্দরী মেয়ে বাঙালীর ঘরে খুব বেশি নেই বউদিদি!"

প্রকৃতপক্ষে সে বিষয়ে সবিতারও বিশেষ কিছু মতভেদ ছিল না, কিন্তু যে বস্তু তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের মতো তার বিরুদ্ধে উদ্যত হয়েছে ব'লে মনে মনে সে আশঙ্কা করে, সুস্পষ্ট বচনে তার প্রশংসায় যোগ দিতে প্রবৃত্তি হোল না; নিস্পৃহ উদাস কণ্ঠে বললে, "তা হবে।"

প্রমথ বললে, "'তা হবে' না বৌদিদি, সত্যি-সত্যিই তাই। কিন্তু সে কথা যাক্, এঁরা ত কলকাতা গেছলেন মাত্র পরশুদিন রাত্রে, কিন্তু এর মধ্যেই ফিরে এলেন কেন? সেখানে কি তারা সন্ধ্যাকে ঘরে নিতে রাজি হলেন না?"

সবিতার মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠল; ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বললে, "এখনো শুনিনি ত কিছু, কি ক'রে বলব বল তাঁরাই রাজি হলেন না, না "এঁরাই রাজি হ'লেন না।"

বিস্ময়মিশ্রিত স্বরে প্রমথ বললে, "এঁরাই রাজি হলেন না?—এঁদের রাজি না হবার কারণ কি হ'তে পারে বৌদিদি?"

অন্তরের যত্ননিরুদ্ধ ক্রোধ এবং দুঃখ যে-কোনো একটা পথ দিয়ে নির্গত হবার চেষ্টা করছে বুঝতে পেরে সবিতা কথাটা এড়িয়ে যাবার অভিপ্রায়ে বললে, "তা ধর, তাঁরা যদি ঠিক এঁদের পছন্দ মত কথাবার্ত্তা না ক'য়ে থাকেন তা হ'লে এঁরাই বা হঠাৎ রাজি হন কি ক'রে?"

• সবিতার পূর্ব্ব কথা এবং এ কথা বলবার ভঙ্গীতে সুরের আকস্মিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য ক'রে প্রমথ মনে মনে মাথা নাড়লে। কথার টোপ ফেলে কথা তোলবার উদ্দেশ্যে শান্ত স্বরে বললে, "সে কথা ঠিকই বউদিদি, এখন ত তোমাদের আর সে 'পতি পরম গুরু'র দিন নেই, এখন মেয়েদের মধ্যে 'মানুষ' জেগে উঠচে, সুতরাং এখন আর এমন সর্ত্তে স্বামীর ঘরে বাস করা চলে না যাতে আত্মসম্মানে আঘাত লেগে মাথা হেঁট হয়।"

বিরক্তিকুঞ্চিত মুখে সবিতা বললে, "স্বামীর ঘরে বাস করতেই আত্মসম্মানে আঘাত লাগে, কিন্তু—" কথাটা শেষ না করেই সে চেপে গেল। অন্তরের গ্লানিটা পুনরায় প্রকাশ পাবার চেষ্টায় ছিল।

প্রমথ বললে, "কিন্তু কি বউদিদি?"

মৃদু হেসে সবিতা বললে, "কিন্তু এ-সব কথা এখন থাক্, মুখটুক্ ধুয়ে চা খাবার জন্যে তয়ের হও।"

এ 'কিন্তু' দিয়ে পূর্ব্বের 'কিন্তু'কে ঠিক চাপা দেওয়া গেল না। সামান্য একটি ছিদ্রের উপর চক্ষু স্থাপিত ক'রে যেমন পৃথিবীর অর্দ্ধেকখানা দেখে নেওয়া যায়, ঠিক তেমনি ভাবে একটি মাত্র 'কিন্তু' শব্দের দ্বারা চতুর প্রমথ সবিতার অন্তরের অনেকখানি অংশের সন্ধান লাভ করলে। মুখে বললে, "প্রকাশ দাদার সঙ্গে এখনো দেখা হয় নি; আগে চল তাঁর সঙ্গে দেখা করি।"

প্রকাশের সঙ্গে নিভৃতে সাক্ষাত হ'তে সবিতা বললে, "তুমি আবার ওকে ঘাড়ে ক'রে এখানে নিয়ে এলে কেন?"

প্রকাশ বললে, "খুব সরল কারণে। আর কেউ নিলেনা, তাই নিয়ে আসতে বাধ্য হলাম।"

সবিতার মুখে বিদ্রূপের হাসি স্ফুরিত হল; বললে, "খুব সরল কারণ ত! আর কেউ না নিলে তুমি নিয়ে আসতে বাধ্য হও?"

প্রকাশ বললে, "হই, তা'ত দেখতেই পাচ্ছ। কিন্তু তুমি কি মনে কর যে, এর মধ্যে একটা জটিল কারণও কিছু আছে?"

প্রকাশের অধর প্রান্তে কৌতুকের মৃদু হাসির রেখা দেখে সবিতার পিত্ত জ্বলে উঠল; তীব্রকণ্ঠে বললে, "দেখ, শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চেষ্টা কোরো না!"

ব্যগ্রকণ্ঠে প্রকাশ বললে, "বিশ্বাস কর সবু, এ পর্য্যন্ত ও চেষ্টা করিনি! কারণ এ ক্ষেত্রে শাকই বা কি আর মাছই বা কে তা যখন জানা নেই, তখন অজানা জিনিস দিয়ে অজানা জিনিষ ঢাকবার চেষ্টা ভারি কঠিন কর্ম্ম!"

এ কথা সবিতার বিশেষরূপে জানা ছিল যে তার কৌতুক-প্রিয় স্বামী যখন কোনো আলোচনা বা কথোপকথনের মধ্যে রসিকতার ধারা অবলম্বন করে তখন আসল কথা তার মধ্যে এমন গভীরভাবে নিমজ্জিত হয় যে তাকে সে সময়ের মত পরিত্যাগ করাই সুবুদ্ধির কাজ। কিন্তু এখন তার মনটা এমন তিক্ত হ'য়ে ছিল যে কথাটাকে একটা কোনো তীব্র খোঁচা দিয়ে তোলবার জন্যে সে উদ্যত হ'ল; বল্লে, "তুমি যে ও-কে আবার এখানে ফিরিয়ে নিয়ে এলে তা'তে কার উপকার হোল শুনি?"

মনে মনে একটু চিন্তা করে প্রকাশ বল্লে, "তোমার যে হয় নি তা'ত বুঝতেই পাচ্ছি, কিন্তু সন্ধ্যা ছাড়া আর কোনো লোকের হয়েছে ব'লে কি তোমার সন্দেহ হয়?"

আরক্ত মুখে সবিতা বল্লে, "ঠাট্টা এখন তুলে রাখ! ফিরিয়ে নিয়ে এসে মনে করোনা সন্ধ্যার তুমি বিশেষ কিছু উপকার করেছ।"

"কিন্তু ফিরিয়ে না এনে আর কি করতে পারতাম তা বল?"

"কেন, ফেলে এলে না কেন?"

সবিস্ময়ে প্রকাশ বল্লে, "ফেলে এলাম না কেন? কোথায় ফেলে আসতাম তাকে?"

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সবিতা বল্লে, "তার বাপের বাড়িতে,—শ্বশুর বাড়িতে। তা না পারতে, কলকাতায় ত ফুটপাথের অভাব ছিলনা, ফুটপাথে।"

এবার কিন্তু প্রকাশের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠ্‌ল; বল্লে "ওটা মনে পড়ে নি, ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু একটা কথা বলি তোমাকে, এখানেও ত ফুটপাথের অভাব নেই, দেও না ওকে ফুটপাথে বার ক'রে। আমার কুটুম্ব, কিন্তু তোমার ত আত্মীয়—তুমি ঢের সহজে ও কাণ্ডটা পারবে।"

অকস্মাৎ কথাটার মোড় ফিরে গেল। ছিল রঙিন, হয়ে উঠ্‌ল সঙ্গীন। ঈর্ষ্যার মত্ততায় বচসা করা চলে, কিন্তু যুক্তি-হেতু দিয়ে তর্ক করা চলে না, সুতরাং এর পর থেকে তর্কটা যে-ভাবে অগ্রসর হ'ল তাতে শেষ পর্য্যন্ত সবিতাকেই পরাস্ত হ'তে হ'ল। সে যখন বুঝ্‌তে পারলে যে বাক্য তার প্রকৃত অস্ত্র নয়, তখন বাক্য পরিত্যাগ ক'রে সহসা এমন একটা নিশ্ছিদ্র নীরবতা অবলম্বন করলে যে তার চাপে সংসারের দম আটকাবার উপক্রম হ'ল। যে দু-চারটে কথা না কইলে আতিথ্য-ধর্ম্ম নিতান্তই ক্ষুণ্ণ হয় শুধু প্রমথর সহিত কথোপকথন সেই শীর্ণ ধারায় চল্‌ল, বাকি লোকের সহিত একরকম পরিপূর্ণভাবেই বন্ধ হয়ে গেল। মাঝে মাঝে অতি সংক্ষিপ্ত যে এক-আধটা কথাবার্ত্তা হয় তাকে কোনো মতেই সদালাপ বলা চলে না। দেখ্‌তে দেখ্‌তে দু-তিন দিনের মধ্যে সংসারের আবহাওয়া বিষিয়ে উঠ্‌ল।

ঐক্যতানের মধ্যে একটা যন্ত্র যখন বেসুরা বাজতে থাকে তখন বাকি যন্ত্রগুলার মধ্যে যথার্থ মিলও ব্যর্থ হয়ে যায়। প্রকাশ প্রমথ আর সন্ধ্যার হোল সেই দশা। একটা অস্বাস্থ্যকর নীরবতার মধ্যে কিছুতেই তারা সহজ ভাবে আলাপ জমাতে পারলে না। ফলে, অফিসের কাজের অত্যধিক চাপাচাপির অছিলায় প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় নানাবিধ ফাইলের অন্তরালে প্রকাশ আত্মগোপন করলে, প্রমথ একটা অত্যন্ত মোটা ইংরাজি নভেল সংগ্রহ করে তার মধ্যে ডুব মারলে, আর সন্ধ্যা নিরবশেষে দুশ্চিন্তা এবং দুর্ভাবনার পথ দিয়ে ধীরে ধীরে সেই অবস্থায় উপনীত হোল যে অবস্থার অব্যবহিত পরবর্ত্তী অবস্থায় মানুষে জীবনের কোনো আকর্ষণ অথবা সমাজের কোনো প্রয়োজন অনুভব করে না, যে অবস্থায় সে সুযোগ পেলে প্রাণত্যাগ করতে পারে, প্ররোচনা পেলে কুলত্যাগ করতে পারে।

প্রত্যুষের ক্ষীণ আভা সবেমাত্র পূর্ব্বদিকে ফুটে উঠেছে, গৃহ মধ্যে সকলেই তখনো নিদ্রাগত, সন্ধ্যা শয্যাত্যাগ ক'রে বারান্দায় এসে একটা চেয়ারে উপবেশন করল। সমস্ত রাত্রিটাই নিদ্রিত অবস্থায় দুঃস্বপ্নে, এবং জাগ্রত অবস্থায় দুশ্চিন্তায় কেটেছে;—মনটা হয়ে রয়েছে একটা অতি বেগবান সূক্ষ্ম যন্ত্রের মতো স্পন্দিত। সংসারের এই গ্লানিকর অবস্থার জন্য মুখ্যতঃ যে সে-ই দায়ী এবং গৌণত প্রকাশ, এ কথা তার বুঝ্‌তে বাকী নেই, এবং যৌবন-প্রবৃত্তির সহজ অনুভূতির বশে এমন সংশয়ও তার মনে দেখা দিতে আরম্ভ করেছে যে, সে নারী এবং প্রকাশ পুরুষ এই যোগাযোগই অবস্থাটাকে বিশেষভাবে জটিল ক'রে তুলেছে। কথাটা ভেবে এক এক সময়ে তার হাসি পায়; মনে মনে বলে, হায় রে,

মানুষের ক্ষুদ্র মন! এত অকারণ পাপও তোমার মধ্যে বাস করতে পারে!

কলিকাতা যাওয়ার পূর্ব্বে সন্ধ্যা প্রকাশকে মাঝে মাঝে অনুরোধ করত গার্লস স্কুলের একটা মাষ্টারী অথবা কোনও ধনী ব্যক্তির কন্যাকে গান শেখানোর কাজ জুটিয়ে দেবার জন্যে। এবার কলিকাতা থেকে ফিরে এসে পর্য্যন্ত একবারও সে-রকম অনুরোধ সে করেনি। সে স্থির করেছে এবার তার নিজের ব্যবস্থা নিজেই করবে, তার সঙ্গে অপর কাউকে জড়িত রাখ্‌বেনা,—এমন কি প্রকাশকেও নয়। কিন্তু কি যে সে ব্যবস্থা গত রাত্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভেবে ভেবেও তা স্থির করতে পারে নি। মাঝে মাঝে আমিনার কথা মনে হয়েচে,—বাপ মা শ্বশুর শাশুড়ী স্বামী তাকে যে জিনিষ দেয় নি, সেই নিরতিপ্রয়োজনীয় আশ্রয় আমিনা তাকে দিয়েছিল এবং প্রয়োজন হ'লেই দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেচে।

আশ্রয় যে কত বড় বস্তু তা যার নেই সেই জানে! অনাহারে দেহত্যাগ করা সহজ, কিন্তু সেই দেহটার অবস্থিতির জন্য এই বিশাল পৃথিবীর মধ্যে এক হাত ভূমি অধিকারে না থাকার মতো বিড়ম্বনা আর নেই! আমিনা তাকে শুধু সেই আশ্রয়ই দেয় নি, মর্য্যাদাও দিয়েছিল; এবং সেই মর্য্যাদা যাতে চিরস্থায়ী হয় তদুপযুক্ত ব্যবস্থা করবার প্রস্তাবও করেছিল। হায় রে! যে গৃহবধূকে এক সমাজ বিনা অপরাধে গৃহ হ'তে বহিষ্কৃত ক'রে দেয়, আর-এক সমাজ সেই হত-ভাগিনীকেই গৃহের বধূ করবার জন্য প্রস্তাব করে! তবে?—একটা নিষ্ফল আক্রোশে সন্ধ্যার চিত্ত আহত বিষধর সর্পের মত পাক খেতে লাগ্‌ল।

চটি জুতার শব্দ পেয়ে সন্ধ্যা ফিরে দেখলে প্রমথ আসছে। এ কয়েকদিনের মধ্যে প্রমথর সঙ্গে তার দু-চার বার মামুলি কথা হয়েছে মাত্র, আলাপ পরিচয় বিশেষ কিছুই হয় নি।

প্রমথ একেবারে সোজা সন্ধ্যার নিকট উপস্থিত হ'য়ে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বস্‌ল, তারপর শান্তকণ্ঠে বল্‌লে, "তুমি যদি কিছু মনে না করো সন্ধ্যা, তা হ'লে আমি তোমার কাছে খুব সহজভাবে একটা প্রস্তাব করি।"

প্রমথ সহসা এত নিকটে এসে বসাতেই সন্ধ্যা একটু বিস্মিত হয়েছিল, তারপর কোনো প্রকার ভূমিকা ব্যতিরেকে অকস্মাৎ এমন একটা অদ্ভুত ধরণের কথা বলায় সে আরও বিস্মিত হোল। প্রমথর প্রতি সকৌতূহল দৃষ্টি স্থাপিত ক'রে বল্‌লে, "কি প্রস্তাব বলুন।"

প্রমথ বল্‌লে, "বলছি। কিন্তু কথাটা যখন একান্ত তোমার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে, তখন বল্‌তে গিয়ে কোনো দিক দিয়ে যদি রূঢ়তা প্রকাশ পায় ত' আমাকে ক্ষমা কোরো,—কারণ বাস্তবিকই একটা sporting spirit নিয়ে এ কথা বল্‌তে আমি উদ্যত হয়েছি।"

প্রমথর প্রতি তেমনি উৎসুক দৃষ্টি স্থাপিত ক'রে সন্ধ্যা বল্‌লে, "বলুন?"

মনে মনে একটুখানি কি চিন্তা ক'রে নিয়ে প্রমথ বললে, "ঘুম ভেঙ্গে কেউ উঠে এলে অসুবিধে হবে, তাই কথাটা সংক্ষিপ্ত করবার জন্যে প্রথমেই ব'লে রাখা ভাল যে, যে কঠিন সমস্যা আর দুঃখের ভিতর দিয়ে তোমার জীবন এখন চল্‌ছে তার প্রায় সব কথাই আমি জানি;—সে বিষয়ে যেটুকু শোনবার তা শুনেছি,—তারপরে যেটুকু বোঝবার তাও বুঝেছি। আমি যতটুকু জানি তাতে এই বুঝেছি যে, একমাত্র প্রকাশ দাদা ছাড়া তোমাকে আশ্রয় দেবার উপস্থিত আর কোনো লোক নেই, কিন্তু তোমাকে আশ্রয় দিতে গিয়ে তাঁর অবস্থা যে কী শোচনীয় হয়েচে তা হয় ত' তুমি নিজেও কিছু কিছু বুঝতে পার। তোমাকে যতটা আদর-যত্ন করবার জন্যে তাঁর মন ব্যস্ত হ'য়ে রয়েছে তার কিছুই তিনি করতে পারছেন না, অথচ অপর দিকে বউদিদি তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করেছেন। বউদিদির এ মনোভাবের কারণ কি, তুমি ঠিক তা অনুমান করতে পেরেছ কি না জানি নে, সুতরাং সে বিষয়ে একটু খুলে বলি। মেয়েমানুষ সব জিনিসই ভাগ ক'রে ভোগ করতে পারে, শুধু পারে না স্বামী। অবস্থা বিশেষে হয় ত' একবারে স্বামীর সমস্তটাই ছাড়তে পাবে, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই খানিকটা ছাড়তে পারে না। তোমার প্রতি প্রকাশ দাদার স্নেহ দেখে সম্ভবতঃ বউদিদি মনে মনে ভয় পেয়েছেন; ভাবচেন ও শুধু স্নেহই নয়, তার চেয়েও এমন কিছু

ধারালো জোরালো বস্তু যার দ্বারা তাঁর ষোল আনা পত্নীত্বের খানিকটা কেটে বেরিয়ে তোমার এলাকায় গিয়ে মিলতে পারে। সত্যি কথা বল্‌তে গেলে, এ বিষয়ে বউদিদিকে বিশেষ দোষ দেওয়াও যায় না। তোমার মতো এমন একটি অপরূপ পদার্থকে পাশে রেখে স্বামীর বিষয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বাস করতে পারে এমন মনের জোর অল্প মেয়েমানুষেরই আছে। বউদিদির তুমি মাসতুত বোন সে জন্যে মনে কোরোনা এ বিষয়ে ব্যতিক্রম হবার কথা। একটা কথা আছে জান ত?—আন্ সতীনে নাড়ে চাড়ে বোন-সতীনে পুড়িয়ে মারে। ভালবাসার ক্ষেত্রে বোন ব'লে কোনো দয়া-দাক্ষিণ্য নেই। সেই জন্যে ভয় পেয়ে বউদিদি এমন একটা রুক্ষ মূর্ত্তি ধারণ করেছেন যে সংসার থেকে আমোদ-আহ্লাদ হাসিখুসি এমন কি কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত উবে গেছে। প্রকাশ দাদার মতো সদানন্দ প্রকৃতি লোকের পক্ষে এ অবস্থা হয়েছে জল থেকে ডাঙ্গায় তোলা মাছের মতো। কিন্তু ওঁর মতো অতবড় মহাপ্রাণ ব্যক্তি আমি ত' আর একটিও দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না, ভদ্রলোক বল্‌তে প্রকৃত অর্থে যা বোঝায় সত্যিই তিনি তাই। তাই এ কথা আমি নিশ্চয় ক'রে তোমাকে বল্‌তে পারি যে, বউদিদি যদি কোনো দিন রাগ বা অভিমান ক'রে এ বাড়ি ছেড়ে চ'লেও যান তা হ'লেও প্রকাশদাদা মুখ ফুটে কোনো কথা তোমাকে বল্‌তে পারবেন না, একবার তোমাকে আশ্রয় দিয়ে কখনই পরিত্যাগ করবেন না। কিন্তু যার মনে কিছুমাত্র আত্মসম্মানের জ্ঞান আছে তার পক্ষে এরকম আশ্রয়ে জীবন যাপন যে কত বড় শাস্তি তা বলবার আবশ্যক করে না;—তুমি যে সেই শাস্তি প্রতিনিয়ত প্রতি মুহূর্ত্তে ভোগ করছ এ আমি হলফ ক'রে বল্‌তে পারি। কেমন?—যতটা বল্‌লাম মোটামুটি ঠিক কি-না?"

অবনত মস্তকে সন্ধ্যা বল্‌লে, "হ্যাঁ, ঠিক।"

"আচ্ছা, এবার তা হ'লে আমার দিকের কথা একটু বলি। আমার বাপ নেই মা নেই, ভাই নেই বোন নেই, এ পর্য্যন্ত বিয়ে করিনি কাজেই স্ত্রী পুত্র কন্যা নেই। থাকবার মধ্যে আমার কি আছে জান?—প্রভূত অর্থ আছে। গর্ব্ব করছি নে, সত্যিই যে অর্থ আমার আছে তাকে লোকে প্রভূত অর্থ-ই বলে। এই অর্থ হচ্ছে একটা মস্ত বড় শক্তি। তা ছাড়া, সমাজের কাছে কোনো দিক দিয়েই আমার কান বাঁধা নেই ব'লে সমাজকে আমি অনায়াসে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাতে পারি। যাবে তুমি আমার সঙ্গে? থাকবে তুমি আমার কাছে? তোমারও আশ্রয়ের একান্ত প্রয়োজন, আমারও সে আশ্রয় দেবার মতো অর্থ আর সামর্থ্য আছে। চিরদিনের জন্যেই আমি তোমাকে আশ্রয় দিতে প্রস্তুত আছি, কোনো দিনই তা এক মুহূর্ত্তের জন্যেও অনিশ্চিত হবে না।" একটু চুপ ক'রে থেকে পুনরায় বল্‌তে লাগল, "মনে কোরোনা আমি তোমার কাছে এ প্রস্তাব করছি তোমার প্রতি কোনো মোহ অথবা আকর্ষণের বশীভূত হয়ে,—অন্তত এ পর্য্যন্ত ত' ও-সব জিনিসের কোনো লক্ষণ টের পাই নি। এ আমি করছি নিতান্ত তোমার যে জিনিসটার প্রয়োজন হয়েচে সেই জিনিসটার যোগান দেবার লোভে,—সমাজের কষাইখানা থেকে উদ্ধার ক'রে একজন অসমাজিকের ঘরে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবার আকাঙ্ক্ষায়। এ আমার ভারি ভাল লাগ্‌ছে!—মনে হচ্চে তা যদি করতে পারি তা হ'লে আমার টাকার সবটাই অপথে-কুপথে নষ্ট না হয়ে পুণ্য-কাজেও খানিকটা লাগে! কিছু দিন আগে অমলা নামে একজন মেয়েকে কতকটা এই রকম অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে ভারি ধাক্কা খেয়েছিলাম, প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আর কখনো কোনো মেয়ের উপকার করতে যাব না, কিন্তু তোমার দুর্গতি দেখে সে প্রতিজ্ঞা রাখ্‌তে পারলাম্ না। আমার প্রস্তাবে তুমি রাজি আছ সন্ধ্যা? যাবে আমার সঙ্গে?"

প্রমথর সুদীর্ঘ বাক্যের সমস্তটাই সন্ধ্যার কর্ণে প্রবেশ করেছিল কি-না বলা কঠিন, শেষ কালের পর পর দুইটা প্রশ্নে সহসা যেন তন্দ্রামুক্ত হ'য়ে সে প্রমথর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে, তারপর শান্তকণ্ঠে বল্‌লে, "যাব।"

নিরতিবিস্ময়ে প্রমথ বল্‌লে, "যাবে?—বেশ ক'রে ভেবে-চিন্তে বল্‌ছ ত?"

সন্ধ্যা এ কথার কোন উত্তর দিলে না, চুপ ক'রে রইল।

প্রমথ বল্‌লে, "তাড়াতাড়ি নেই, দুই-এক দিন ভাল ক'রে ভেবে তারপর না হয় আমাকে বোলো।"

চকিত হয়ে ব্যগ্রকণ্ঠে সন্ধ্যা বল্‌লে, "না, না, ভাববার দরকার হবে না, আজই চলুন!"

উৎফুল্লমুখে প্রমথ বল্‌লে, "তা বেশ ত, আমার কোনো আপত্তিই নেই। কিন্তু দেখ সন্ধ্যা, জানিয়ে যাওয়া কিছুতেই চল্‌বে না,—তা'তে শেষ পর্য্যন্ত যাওয়াও হবেনা, অথচ মিছে একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হবে। তাছাড়া প্রকাশদাদা ভারি একটা অসুবিধার অবস্থায় পড়বেন। রাত্রের গাড়িতে যাওয়াও সুবিধে হবে না, চাকরদের নজরে প'ড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, তা ছাড়া গেটে তালা দেওয়া থাকে, সে এক বিপদ। যেতে হবে দুপুরের গাড়িতে, সে সময়ে প্রকাশদাদা থাক্‌বেন অফিসে আর বউদিদি থাক্‌বেন ঘুমিয়ে। বাগানের একেবারে শেষের দিকে কোণে মালীদের যে ছোট গেট আছে, তুমি বেড়াতে বেড়াতে সেখানে ঠিক বেলা দুটোর সময়ে গিয়ে দাঁড়াবে, আমি তখনি এসে তোমাকে তুলে নিয়ে ষ্টেশনে চ'লে যাব। কেমন, এই ব্যবস্থাই ঠিক ত?"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "হ্যাঁ।"

"আর দেখ জিনিসপত্র বিশেষ কিছুই নেওয়া চল্‌বেনা। পথে একটা বড় সহরে দুই এক দিনের জন্যে নেবে একেবারে গুছিয়ে দুজনের মতো সমস্ত জিনিস কিনে নোবো,—তারপর পৌঁছে লিখে দিলেই হবে আমাদের জিনিসগুলো এখানকার চাকর-বাকরদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে।"

কোন কথা না ব'লে সন্ধ্যা চুপ ক'রে ব'সে রইল।

প্রমথ বল্‌লে, "আর একটা কথা। দু-চার কথায় প্রকাশদাদাকে একখানা চিঠি লিখে রেখো যেয়ো,—এ ব্যবস্থা যে প্রধানতঃ তাঁদের কথা ভেবেই আমরা করলাম এ কথাটা বুঝিয়ে দিয়ো। এ বাড়িতে তুমি থাক্‌লে যদি কোন রকম অশান্তির উৎপত্তি না হোত, তা হ'লে আমার সঙ্গে তোমার এমন ক'রে চ'লে যাবার ত' কোনো প্রয়োজনই হোত না। এই কথাটা বুঝিয়ে দিয়ো। বুঝ্‌লে?"

এবারও সন্ধ্যা কোনো কথা কইলে না। প্রমথ লক্ষ্য ক'রে দেখ্‌লে সন্ধ্যার চক্ষুর মধ্যে অশ্রুর আড়ম্বর হয়েছে; তাড়াতাড়ি উঠে প'ড়ে বল্‌লে, "আমি চল্‌লাম। দোর খোলার শব্দ পেলাম, কেউ হয়ত' উঠেছে,—এ দিকে আস্‌তে পারে।" যেতে যেতে পিছন ফিরে তাকিয়ে বল্‌লে, "সময়টা ভুলো না যেন, ঠিক দুটো।"

প্রমথ চ'লে যেতেই সন্ধ্যার চোখ থেকে অবরুদ্ধ অশ্রুর রাশি ঝর ঝর ক'রে ঝ'রে পড়ল। তপ্ত অশ্রু—এর মধ্যে যে কত দুঃখ কত বেদনা কত গ্লানি সঞ্চিত, তা একমাত্র তার অন্তর্যামী ভিন্ন আর কেহই জানে না! কিন্তু আজ যে নূতন ক'রে তার প্রাণে মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা উদ্বেলিত হয়ে উঠল, তার হেতু কি?—উৎপত্তি কোথায়?—যে সমাজের শেষ সীমা আজ সে অতিক্রম ক'রে যাচ্ছে ব'লে মনে করছে, সে সমাজের কাছ থেকে ত নির্ব্বাসন-পত্র কয়েকদিন পূর্ব্বেই পেয়েছে,—সে সমাজের মধ্যে এ কয়েকদিনের বাস ত' অধিকারের বাস নয়, অনুগ্রহের বাস। তবে নূতন ক'রে কী এমন বস্তু সে আজ হারাতে চলেছে যে, সব-হারানোর এই করুণ রাগিণীতে তার প্রাণ সহসা আকুল হ'য়ে উঠ্‌ল! হায় সংস্কার! হায় মোহ! এমন নিদ্দয়ভাবে পদাহত হয়েও পদলগ্ন হয়ে থাক্‌তে চাও কিসের লোভে!

পদশব্দে সন্ধ্যা চেয়ে দেখ্‌লে প্রকাশ আস্‌ছে। চোখের জল তখনো একেবারে শুকিয়ে যায় নি, তাড়াতাড়ি বস্ত্রাঞ্চলে দুই চক্ষু ভাল ক'রে মুছে ফেলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

নিকটে এসে প্রকাশ বল্‌লে, "উঠ্‌লে কেন সন্ধ্যা? বোসো না।"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "অনেকক্ষণ ব'সে ছিলাম, এবার বাড়ির ভিতর যাই।"

"প্রমথর সঙ্গে গল্প করছিলে?"

মৃদুস্বরে সন্ধ্যা বল্‌লে, "হ্যাঁ।"

"খুব ভাল কথা। প্রমথ একজন চমৎকার গল্প-বলিয়ে। তা ছাড়া, বিশ্বের এত খবরও ওর সংগ্রহে আছে। আমি ত' অফিসের কাজের জন্যে একটুও সময় পাইনে, তুমি প্রমথর সঙ্গে মাঝে মাঝে গল্প-টল্প কোরো, তবু একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে থাক্‌তে পারবে। কিন্তু ওই বা আর কদিন এখানে আছে,—যে খেয়ালী মানুষ, কখন যে তল্পিতল্পা নিয়ে স'রে পড়ে তার ঠিক নেই।"

"মুখুজ্জে-মশাই?"

প্রকাশ বললে, "কি?"

"আপনি আমাকে কখনো ভুল বুঝবেন না মুখুজ্জে-মশায়!"

স্মিতমুখে প্রকাশ বল্‌লে, "তা হ'লে তুমিও কখনো আমাকে ভুল বোঝাতে চেষ্টা কোরো না।"

"আর, যত অপরাধই আমি করিনে কেন, আপনি আমাকে ক্ষমা করতেও কখনো ভুলবেন না।"

প্রকাশ বল্‌লে, "সর্ব্বনাশ! সে তিতিক্ষা আমার আছে না-কি সন্ধ্যা?"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "আছে। একমাত্র আপনারই আছে। আচ্ছা, মুখুজ্জে-মশায় দেবতারা খুব বড় শুনেছি, কিন্তু তারা কি আপনার চেয়েও বড়?"

সন্ধ্যার কথা শুনে প্রকাশ মুখে বিস্ময়ের ভাব প্রকট ক'রে বললে, "মাথায় না বহরে ?"

সন্ধ্যা বললে, "সে আপনি যাই বলুন, আমার বিশ্বাস তারা আপনার চেয়ে সব দিকেই ছোট।"

দুই চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে প্রকাশ বললে, "ব্যাপারটা কি, বল দেখি সন্ধ্যা ? দেবতা আর মানুষ নিয়ে হঠাৎ এ রকম মাপজোক আরম্ভ করলে কেন ?"

সন্ধ্যা বললে, "তা জানিনে কিন্তু আপনি একটু দাঁড়ান মুখুজ্জে মশায়, আপনার পায়ের ধূলো নিই।"

দুই পা পিছিয়ে গিয়ে প্রকাশ বললে, "হঠাৎ ?"

এগিয়ে গিয়ে নত হ'য়ে প্রকাশের পদধূলি নিয়ে সন্ধ্যা বললে, "হঠাৎ নয়। ভারি ইচ্ছে হোল নিতে, তাই নিলাম।"

"সন্ধ্যা !"

চক্ষে অশ্রু মুখে হাসি নিয়ে সন্ধ্যা মুখ তুলে বললে, "কি ?"

"লুকিয়ো না, আসল ব্যাপারটা কি খুলে বল।"

সন্ধ্যা নীরবে একটু হাসলে ; তারপর বললে, "আচ্ছা, আপনি অফিস থেকে এলে ও-বেলা বলব এখন।" বলে আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না ক'রে উদ্‌গত অশ্রু রোধ করতে করতে বাড়ির ভিতর চ'লে গেল। যেতে যেতে মনে মনে বলতে লাগল, হে ভগবান, তুমি আমার একটুকু মিথ্যা বলার অপরাধ ক্ষমা কোরো—এ যদি না বলতাম তা হ'লে সমস্ত জিনিসটাই হয়ত' পণ্ড হ'য়ে যেত।"

একটা অনির্দিষ্ট দুশ্চিন্তায় সমস্ত দিন প্রকাশের মনটা অসুস্থ হ'য়ে রইল। কাজের তাড়ায় অফিস থেকে বাড়ি ফিরতেও সেদিন একটু বিলম্ব হ'য়ে গেল। এসে শুনলে দুপুরবেলা থেকে সন্ধ্যার কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না, সঙ্গে সঙ্গে প্রমথরও উদ্দেশ নেই। ব্যাপারটা বুঝে নিতে এক মুহূর্তও বিলম্ব হোল না, এবং সন্ধ্যার সহিত সকালবেলাকার ব্যাপারটা যে প্রচ্ছন্ন বিদায়-অভিনয়, তাও সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলে। সবিতার মুখে শুনলে টেবিলের উপর একটা খামে মোড়া চিঠি চাপা আছে,—সম্ভবতঃ সন্ধ্যারই চিঠি। খুলে দেখলে তাই-ই। চিঠিটা সংক্ষিপ্ত,—এই রকম।

শ্রীচরণকমলেষু, মুখুজ্জেমশায়, সকালবেলাকার কথা-বার্ত্তার পর আজই আপনার কাছে একেবারে দু-দুটো অপরাধ করলাম। সকালবেলা যখন ব'লেছিলাম সন্ধ্যাবেলা আপনাকে আসল কথা বলব, তখন এ চিঠিটার কথা ভেবেই 'ইতি গজ'র মিথ্যা কথা বলেছিলাম। সেই প্রথম অপরাধ, আর এই না জানিয়ে প্রমথবাবুর আশ্রয়ে পালিয়ে যাওয়া দ্বিতীয়। আমি জানি আপনি আমার এ দুটো অপরাধই ক্ষমা করবেন।

কেন আপনার আশ্রয় ত্যাগ করলাম, তা আপনার মতো বুদ্ধিমান আর হৃদয়বান লোককে বেশি বুঝিয়ে বলতে হবে না। আত্মহত্যাও ত' করতে পারতাম, তা না ক'রে আত্মার হত্যা করলাম। এ একটা দুর্ঘটনা, যা যে-কোনো মেয়েমানুষের জীবনে ঘটতে পারে। বাঙলা দেশের শত সহস্র দুর্ভাগিনী মেয়ে সমাজ থেকে বিতাড়িত হ'য়ে যে পথে গেছে, আমিও সেই পথে গেলাম। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন এই পথের চরম দুর্গতি থেকে আমি যেন রক্ষা পাই।

আপনি আমার জীবনে যে কত বড় হ'য়ে রইলেন, তা বড় ক'রে বলতে গিয়ে ছোট করতে চাইনে। আপনার কথা মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত মনে থাকবে। আর মনে থাকবে আমিনার কথা, সেও আমার পূর্ব্বজন্মে আপনার জন ছিল।

চললাম মুখুজ্জেমশায়, অভাগিনী সন্ধ্যাকে ক্ষমা করবেন। সমস্ত মনটা একটা গভীর বিস্ময়ে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। কেবলই মনে হচ্ছে, এ-ও আবার হয়! আমারই জীবনে এ-ও আবার হ'ল! উৎকট বিস্ময়ের মধ্যে আর সব অনুভূতি ডুবে গেছে। রাগ নেই, দুঃখ নেই, ভয় নেই! কিন্তু এ আপনাকে ব'লে গেলাম মুখুজ্জেমশায়, সত্যই আমি এমন কোনো অপরাধ করিনি, যাতে আমার এত বড় দণ্ডটা পাওয়া উচিৎ হোল।

মনের অবস্থা অত্যন্ত চঞ্চল, সব কথা ভাল ক'রে গুছিয়ে লিখতে পারছিনে, তাই এইখানেই শেষ করলাম।

সবিদিদিকে বলবেন আমার অপরাধ যেন তিনি ক্ষমা করেন। তাঁকে আমার প্রণাম জানাবেন, আপনিও জানবেন।

ইতি

আপনার অভাগিনী ছোট বোন

সন্ধ্যা

চিঠি শেষ ক'রে প্রকাশ চক্ষু মার্জ্জনা করলে, তারপর সন্ধ্যার মঙ্গলের জন্যে মনে মনে এমন আকুলভাবে প্রার্থনা করলে যেমন সচরাচর কেউ কারুর জন্যে করে না।

(ক্রমশঃ)

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

জনপ্রিয় সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ

সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের রাজত্বের রজত-জুবিলী উপলক্ষে সারা ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য-ব্যাপী যে উৎসব অনুষ্ঠিত হ'য়েছে, তা' থেকে সম্রাটের বিপুল জনপ্রিয়তা সপ্রমাণ হয়েছে। বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, যেখানে সূর্য্য কখনো অস্ত যায় না,—তারই একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যে প্রীতি, শ্রদ্ধা ও ভক্তির বন্যা বয়ে গিয়েছে,—তা' আমাদের সম্রাটকে পৃথিবীর ইতিহাসে অমর করে রাখবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

*　　*　　*　　*

সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ

আমাদের ভারতবাসীর চিত্তে সম্রাট যে অক্ষয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তা' তাঁর অনন্যসাধারণ গুণাবলীর জন্যেই সম্ভবপর হ'য়েছে। সিংহাসনে আরোহণ করবার অনতিকাল পরেই তিনি ভারতবর্ষ পরিদর্শন করা প্রয়োজন মনে করেছিলেন, যদি-চ তার মাত্র ছয় বৎসর পূর্ব্বেই যুবরাজ হিসাবে তিনি একবার ভারতবর্ষে এসেছিলেন। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর থেকে ভারতবাসী কখনো ভারত-সম্রাটকে ভারত-ভূমিতে দেখবার সৌভাগ্য লাভ করেনি, সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জই সর্ব্বপ্রথম তাঁর ভারতীয় প্রজাবর্গকে সে-সৌভাগ্যের অধিকারী করেছিলেন এবং সেই সময়েই ভারতবর্ষের চিত্তে তিনি যে অধিকার বিস্তার করেছিলেন, তা গত পঁচিশ বছরের আন্দোলন, আলোড়ন ও চঞ্চলতা অতিক্রম করে আজও অক্ষত রয়েছে।

*　　*　　*　　*

গত পঁচিশ বৎসরের ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করে দেখলে তা যে বিশেষ সন্তোষজনক হবে তা' নয়।

সম্রাজ্ঞী মেরী

অনেক দিকে অনেক কিছু উন্নতি হয়েছে অবশ্যই এবং তার সুবিধা ধনী লোকেরা ভোগ করছেন, কিন্তু উন্নততর শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনার জন্য যে একটা ভীষণ সংগ্রাম ভারতবর্ষের চিত্তকে ক্ষতবিক্ষত করেছে এবং করছে, এ কথা অস্বীকার করলে সত্যের অপলাপ করা হ'বে। অনিবার্য্য কার্য্য-কারণ পরম্পরায় ঘটনা-স্রোত যে দিকে প্রধাবিত হচ্ছে,—তা' হবেই, তা' প্রতিরোধ করা কারো সাধ্য নেই; কিন্তু ভারতবর্ষের আকাঙ্ক্ষার প্রতি সম্রাটের যে মনোভাব, যে সংবেদনা,

তা যে কল্যাণকর সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ মনোভাব তিনি ব্যক্ত করেছিলেন সেই ১৯০৫ সালে, যুবরাজ হিসাবে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে ফিরে যাবার পরেই :—

"যা কিছু সেখানে দেখলাম, শুনলাম, তা' থেকে আমি এ কথা মনে না করেই পারি না যে আমাদের ভারত-শাসনের কাজ অনেক সহজ হ'য়ে যায়, যদি তার মধ্যে আমরা আরও সমবেদনা অনুপ্রবিষ্ট করে দিতে পারি। এই ভবিষ্যদ্বাণী করবার সাহস আমার আছে যে আমাদের দিক থেকে এই গভীরতর ও ব্যাপকতর সমবেদনায় ভারতবাসীর চিত্ত থেকে প্রকৃত এবং চির-প্রচুর সাড়া পাওয়া যাবেই।"

* * * *

সম্রাটের সিংহাসনারোহণ থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত জগতের মধ্যে যত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, পৃথিবীর ইতিহাসের অন্য কোনো যুগে পঁচিশ বছরের মধ্যে এত পরিবর্তন বোধ হয় আর কখনো ঘটেনি। সম্ভবতঃ আগামী পঁচিশ বছরের মধ্যে এর চেয়েও দ্রুততর বেগে কালচক্র ঘূর্ণায়মান হ'তে থাকবে। গত য়ুরোপীয় মহাসমরে শুধু যে য়ুরোপের ভৌগোলিক ব্যবস্থার বহুল পরিবর্ত্তন হ'য়েছে তা' নয়, মানুষের শাসন-প্রণালীতে, সমাজ-দেহে ও চিন্তারাজ্যে মহাকালের রথচক্র খর-নির্ঘোষে অগ্রসর হ'য়ে চলেছে। এত ক্ষিপ্রগতির বেগ যেন সাম্‌লানো যাচ্চে না, দু' দিকের ভার-সামঞ্জস্য রেখে চলা নিত্যই দুরূহতর হ'য়ে উঠ্‌ছে। সময় সময় মনে হয় নটরাজের প্রলয়-দুন্দুভি বাজ্‌লো বুঝি বা!

* * * *

পৃথিবীর ইতিহাসে কত যুগের অবসান হ'য়েছে, কত নূতন যুগের সূচনা হ'য়েছে,—কিন্তু যে নবযুগের সূচনায় বিধাতা সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের উপর এই সুবিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-শাসনের ভার ন্যস্ত করেছেন, তার কোনো তুলনা নেই। কাল-চক্রের এই প্রবল বেগ মানবসভ্যতা ধারণ করতে পারবে কি-না, তা নির্ভর করবে এই দ্রুত ও অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তনরাজির প্রতি মানুষের আধ্যাত্মিক প্রতিক্রিয়ার উপর। কিন্তু সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ যে মানসিক শক্তি তাঁর এই অচিন্ত্যনীয় দুরূহ কর্ম্মে নিয়োগ করেছেন, তা' যে সর্ব্বদিকেই কল্যাণকর, এবং সৃষ্টি ও স্থিতির সহায়ক সে-বিষয়ে তাঁর অসংখ্য প্রজাবর্গের মধ্যে বোধ হয় দ্বিমত নেই। ভগবান্ সম্রাটকে দীর্ঘজীবি করুন।

সুশীলচন্দ্র মিত্র

বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্য

শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

মহাকাব্য রচনা বাংলা সাহিত্যের বহুকালের প্রথা নহে। বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলি মহাকাব্য নহে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্য রচনা আরম্ভ হয়। বাংলা সাহিত্যে কবিপ্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছে গীতিকাব্যে। কিন্তু পাশ্চাত্য প্রভাব সূচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে-সব যুগপ্রবর্ত্তক কবি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূচনা করিয়াছিলেন তাঁহারা প্রায় সকলেই মহাকাব্য রচয়িতা। এই মহাকাব্য রচনার অর্থ কি, ইঁহারা প্রথমে কি কারণে মহাকাব্য রচনার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং অল্পকালের মধ্যেই আবার কেন এই ধরণের কাব্য রচনা বন্ধ হইয়া গীতিকবিতার ধারা বঙ্গসাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিল—উনবিংশ শতাব্দীর কাব্যসাহিত্য আলোচনা করিলে এই সকল প্রশ্ন স্বভাবতই আমাদের মনে উদিত হইয়া থাকে।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের বাংলা সাহিত্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য সাহিত্যের খুব প্রবল প্রভাব ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদর্শ ছিল ক্লাসিক আদর্শ। শেলী কীট্‌স্ প্রভৃতি রোমান্টিক কবিদিগের সহিত বাঙালী তখনও সম্যকভাবে পরিচয় লাভ করে নাই। সেইজন্য উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী কবিগণ মহাকাব্য রচনাকেই শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভার উপযুক্ত মনে করিয়াছিলেন। ইংরেজি মহাকাব্যের সমাদর বাঙালী কবিদিগকে মহাকাব্য রচনায় প্রেরণা দিয়াছিল। সেকালের সাহিত্যিকগণের ধারণাই ছিল যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য হইতেছে মহাকাব্য এবং একমাত্র মহাকাব্য রচনাতেই কবিপ্রতিভা সম্যক প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহার উপর, আখ্যানমূলক রচনার জন্য বাংলা গদ্য তখনও পরিপুষ্ট হইয়া উঠে নাই। অথচ সাহিত্যিকমাত্রেরই প্রাণ মন তখন নূতন নূতন আদর্শে ভাবে ও বড় বড় কাহিনীতে পূর্ণ। এইরূপ ক্ষেত্রে সেকালের সাহিত্যিকগণ দেখিলেন যে একমাত্র মহাকাব্যের সাহায্যে যে-কোনও একটি বড় কাহিনী প্রকাশ করা সম্ভব। এই সব কারণে সে যুগের কবিগণ মহাকাব্য রচনার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

এখন দেখা যাক মহাকাব্য কি, এবং কি ধরণের মহাকাব্য আমাদের বাংলা সাহিত্যে রচিত হইয়াছিল। প্রাচ্য আলঙ্কারিকগণ কাব্যকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করেন—খণ্ডকাব্য ও মহাকাব্য, এবং আমাদের দেশের আলঙ্কারিকগণ মহাকাব্যের যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন তাহা মোটামুটিভাবে এই—কোনও পুরাণের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ আখ্যান, ইন্দ্র প্রভৃতি প্রধান দেবতা, কোনও সৎকুলজাত যশস্বী নৃপতি অথবা চন্দ্রবংশ সূর্য্যবংশের ন্যায় কোনও প্রখ্যাত রাজবংশের চরিতাখ্যান অবলম্বন করিয়া ছন্দে রচিত কাব্য মহাকাব্য বলিয়া গণ্য হইবে। ইহাতে প্রকৃতির বর্ণনা ও ঋতুবর্ণনা থাকিবে, সৈন্যচালনা ও যুদ্ধ, রাজা বা সেনাপতিবর্গের মন্ত্রনা, জন্ম-মৃত্যু বিবাহ, বিরহ মিলন, উৎসব পার্ব্বন প্রভৃতির সমুদয় অথবা কোনও কোনও বিষয় মূল আখ্যানের সহিত গ্রথিত হয়। মহাকাব্যের সর্গগুলি খুব বড়ও হইবে না অথচ খুব ছোটও হইবে না এবং সংখ্যায় আটটির অধিক হইবে। কবি তাঁহার নিজের ইষ্টদেবতার স্তুতি বন্দনা করিয়া অথবা সাধারণের মঙ্গলকামনা করিয়া গ্রন্থ আরম্ভ করেন। প্রত্যেক সর্গের শেষে বর্ণিত বিষয়ের আভাষ প্রদত্ত হয় এবং সর্গগুলি একরূপ বা বিবিধ ছন্দে রচিত হয়। সাধারণতঃ যে-কোনও একটি বিশেষ ছন্দে মহাকাব্যের সর্গ রচিত হয়, তবে সর্গশেষে কবি বিভিন্ন ছন্দের অবতারণা করিয়া বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। কোনও সর্গের বর্ণিত বিষয়ের অনুসারে, অথবা সেই সর্গের ছন্দ বা নায়কের নামানুসারে সর্গের নামকরণ হয়।

মহাকাব্যে বীর, করুণ, আস্থ ও শান্ত এই চারিটি রসের যে কোনও একটির অথবা উক্ত সব কয়টি রসেরই প্রাধান্য থাকে এবং মহাকাব্যের মধ্যে নাটকীয় ভাব বর্ত্তমান থাকিবে।

প্রাচ্যের আলঙ্কারিকগণের মতো পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণও মনে করেন যে আখ্যায়িকা বা উপাখ্যানের বর্ণনাই মহাকাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রতীচ্য আলঙ্কারিকগণ যাহাকে এপিক বলিয়াছেন তাহার সহিত প্রাচ্য মহাকাব্যের আদর্শগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে এপিকের বিষয়টি বেশ গুরুগম্ভীর ও অসাধারণ হওয়া চাই। একটি মহান ও চির-বিস্ময়কর, হৃদয়োন্মাদক ও অভূতপূর্ব্ব উপাখ্যানের বর্ণনা এপিকের প্রধান উদ্দেশ্য। এপিকের নায়কের বীরোচিত কার্য্যকলাপে সকলে উৎসাহিত হইবে এবং নায়ক শেষ পর্য্যন্ত জয়যুক্ত হইয়া মহাশক্তিমানের মতো মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে। পাশ্চাত্য আদর্শে এপিক পদবাচ্য হইতে হইলে তাহার মধ্যে কথাবস্তুর অভিন্নতা (Unity of action) ও বিষয়-গৌরব থাকা নিতান্ত প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে উহা যেন হৃদয়গ্রাহী হয়। এপিকের লেখক যে গল্পাংশের জন্য প্রতিপদে ইতিহাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিবেন তাহা নহে। এ সম্বন্ধে তিনি বিলক্ষণ স্বাধীন। তবে পৌরাণিক আখ্যান, জনশ্রুতি এবং লৌকিক সংস্কারকে কবি একেবারে উপেক্ষা করিতে পারেন না, কারণ এপিকের গল্প ও চরিত্র স্বজাতীয় হওয়া চাই। এপিকের নায়ক ও অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে এমন মহৎ গুণাবলী থাকা চাই যাহার সহিত লৌকিক সংস্কার জড়িত থাকে। এপিককে চিত্তাকর্ষক করা কবির একান্ত প্রয়োজন এবং সেজন্য কবি খানিকটা কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন কিন্তু নায়কের চরিত্র জাতির প্রাণধর্ম্ম অনুযায়ী হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। এপিকের নায়ক জাতির উদ্ধারকর্ত্তা হইবেন।

চরিত্রচিত্রণ এপিক রচনায় বিশেষ প্রয়োজন। কল্পনা ও বাস্তবের সমন্বয়ে চরিত্রগুলিকে ফুটাইয়া তুলিবার শক্তির উপরে এপিকের উৎকর্ট ও স্থায়ীত্ব নির্ভর করে। এরিষ্টটল্ তো গল্পাংশকে বাদ দিয়া চরিত্রসৃষ্টিকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। তিনি বলেন, চরিত্রগুলির যদি নাটকীয় অভিনয় না থাকে তাহা হইলে এপিক কেবল ইতিহাস অথবা অদ্ভুত উপন্যাসে পরিণত হয়। তাঁহার মতে একমাত্র হোমারই প্রকৃত মহাকবি জন্মিয়াছিলেন যিনি জানিতেন যে এপিকের মধ্যে কতখানি নায়ক-নায়িকার মুখ দিয়া প্রকাশ করানো উচিত।

পাশ্চাত্য আদর্শে মহাকাব্য রচনায় শাখাকাহিনীর (Episodes) বিশেষ প্রয়োজন আছে। শাখা-কাহিনী কাব্য-অঙ্গে বিচিত্রতা আনিয়া থাকে। তবে দেখিতে হইবে যে ঐ শাখা-কাহিনী যেন কাব্য-অঙ্গে খুব সহজে গ্রথিত হয়। শাখা-কাহিনী মূল বিষয় হইতে সংক্ষিপ্ত হইবে এবং উহা প্রাঞ্জল এবং সুচারুসম্পন্ন হইবে। এপিকের ভাব ও ভাষায়, উপমায়, অলঙ্কারে ও উচ্ছ্বাসের মধ্যে বেশ একটি মহনীয়তা থাকা প্রয়োজন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে কয়টি বাংলা মহাকাব্য রচিত হয় সেগুলি পাশ্চাত্য মহাকাব্যের আদর্শে রচিত কারণ তখন শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেই ইংরেজি সাহিত্যের কাব্য-রসের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ইংরেজি সাহিত্যের ভিতরে যে-ধরণের কবি-দৃষ্টি ও কলানৈপুণ্য আছে তাহা বঙ্গসাহিত্যে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য বাংলা সাহিত্যে অবতীর্ণ হইলেন রঙ্গলাল ও মাইকেল। মাইকেলের পূর্ব্বে রঙ্গলাল 'পদ্মিনী' উপন্যাস রচনা করেন। কিন্তু তাঁহার কাব্যে মঙ্গলকাব্যের প্রভাব এবং ভারতচন্দ্রের প্রভাব সুস্পষ্ট। বিষয়বস্তুতে উহা অবশ্য স্কট্ এবং বায়রণের Metrical Romance এর শ্রেণীর। রঙ্গলালের উদ্দেশ্য ছিল বায়রণ, স্কট্ এবং মুরের Verse Tale বা কাহিনী কাব্যের অনুকরণ। কিন্তু ইংরেজি Verse Tale এর ভিতরে যে ধরণের কবি-দৃষ্টি ও কল্পনা বর্ত্তমান তাহা তিনি তাঁহার উপাখ্যান কাব্যে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। তবে পাশ্চাত্য প্রভাবে দেশাত্মবোধ তাঁহার জাগিয়াছিল এবং 'পদ্মিনী' উপাখ্যানের প্রধান বিশেষত্ব উহার বিষয়গৌরব। তবে আমূল কবি-কল্পনার পরিবর্ত্তন রঙ্গলালে নাই।

রঙ্গলালের অনুকরণে মাইকেলেরও উপাখ্যানকাব্য

লেখাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া মহাকাব্য রচনা করিলেন। মাইকেলের মহাকাব্য রচনার আকাঙ্ক্ষার মূলে কয়েকটি কারণ আছে। মাইকেলের অন্তর্জীবনে ও কাব্য-আদর্শে রোমান্টিক কাব্যের লক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিতে পারে নাই। ইংরেজ কবি মিল্টন ও গ্রীক কবি হোমারের মহাকাব্যের ছন্দের ধ্বনি ও কল্পনার বিশালতা তাঁহার কবি-চিত্তকে কাব্য-সৃষ্টিতে যেরূপ উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছিল ভাবপ্রধান গীতিকবিতা তাঁহাকে সেরূপ মুগ্ধ করিতে পারে নাই। তাহার উপর পদ্মাবতী নাটকে তিনি যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ-পরীক্ষা করিয়াছিলেন উহা তাঁহার মহাকাব্য রচনার পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল। গতিশীল ভাষা ও ছন্দ মহাকাব্য রচনার খুব উপযোগী। মাইকেল নাটক রচনা করিতে গিয়া এইরূপ ছন্দের প্রবর্ত্তন করিলেন। তিনি গ্রীসের মহাকবি হোমার, ইটালীর আর্জ্জিল দান্তে তাসো এবং ইংলণ্ডের কবি মিল্টনের ছন্দে মুগ্ধ হইয়া বাংলা সাহিত্যে এই নূতন ছন্দের প্রবর্ত্তন করেন। কিন্তু নাটক রচনায় মাইকেলের কবিত্বশক্তি প্রকাশ পায় নাই। সেই জন্য এই নব আস্বাদিত ছন্দে তিনি মহাকাব্য রচনা করিলেন।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য আগাগোড়া অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত। কিন্তু উহা মহাকাব্য নহে। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত তাঁহার শ্রেষ্ঠ কবিকৃতি হইতেছে মেঘনাদবধ মহাকাব্য। মেঘনাদবধ বঙ্গসাহিত্যে প্রথম মহাকাব্য। হেমচন্দ্রও নবীনচন্দ্র এবং মাইকেলেরই অনুকরণে মহকোব্য রচনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু মোটামুটিভাবে ধরিতে গেলে একমাত্র মাইকেলের মেঘনাদবধে পাশ্চাত্য মহাকাব্যের প্রেরণা খুব বেশী পরিমাণে বর্ত্তমান এবং কাব্য হিসাবে মেঘনাদবধ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

ইউরোপীয় এপিক কাব্যের সংজ্ঞা মাইকেলের মনে পরিষ্কারভাবে বর্ত্তমান ছিল। মহাকাব্যের গঠনরীতির ক্ষেত্রে মধুসূদন প্রতীচ্য গ্রীক আদর্শের অনুসরণ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য গ্রীক রীতিই অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশেরও কাব্যরচনার প্রচলিত রীতি। রামায়ণ মহাভারত আমাদের দেশের বিখ্যাত মহাকাব্য। কিন্তু রামায়ণ মহাভারত এক একটা সম্পূর্ণ ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া, উহার প্রারম্ভ হইতে চরম পরিণতি পর্য্যন্ত, ধারাবাহিকভাবে রচিত হইয়াছে। মহাকবি ব্যাস বা বাল্মিকী জীবনের কোনও একটি অংশ অবলম্বন করিয়া মানবজীবন সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্ত (Criticism of life) উপস্থিত করেন নাই। কিন্তু হোমার তাঁহার ইলিয়াড্ কাব্যে ট্রয় যুদ্ধের শেষ কয়েক মাসের ঘটনা অবলম্বন করিয়া তাঁহার মহাকাব্য রচনা করেন। এই জন্য ইলিয়াড্‌কে রামায়ণ বা মহাভারতের মতো "ঐতিহাসিককাব্য" বলা যায় না। মাইকেল হোমারের আদর্শে প্রভাবিত হইয়া তাঁহার মেঘনাদবধে লঙ্কাসমরের খণ্ডাংশকেই তাঁহার বক্তব্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এই হোমারিক আদর্শ তাঁহারই সমসূত্রে হেমচন্দ্রের বৃত্তসংহারেও আসিয়া গিয়াছে। নবীনচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধেও উক্ত Form বা কাব্যের গঠনরীতি প্রতিফলিত হইয়াছে।

ভাবগভীরতা ও শব্দসম্পদ ইউরোপীয় এপিকের মূল উপাদান। মাইকেলের মেঘনাদবধে এ দুই-ই বর্ত্তমান। মেঘনাদবধের প্রারম্ভেই মাইকেল ইউরোপীয় কাব্যের Muse এর বন্দনা করিয়াছেন। সেখানে সরস্বতীর ছদ্মবেশ খসিয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য এপিকের আদর্শ অনুযায়ী মাইকেল তাঁহার কাব্যে দেবতাগণকে আনয়ন করিয়াছেন এবং পাশ্চাত্য মহাকবিদের মতো দেবতা ও মানুষকে একই কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন। মাইকেলের কাব্যে "সীতা ও সরমার কথোপকথন" পাশ্চাত্য এপিকের Episode এর আদর্শে রচিত। এ্যারিষ্টটলের মতে এপিক শ্রেণীর কাব্যের আদি, মধ্য ও অন্ত সরলভাবে কাব্যের উদ্দেশ্য ও ঘটনাবলী বর্ণনা করিবে। মাইকেল বর্ণে বর্ণে এই নিয়ম রক্ষা করিয়াছেন। সমগ্র মেঘনাদবধখানি যেন এই নিয়মে সুরে বাঁধা হইয়াছে। এইভাবে পাশ্চাত্য মহাকাব্যের রচনা-রীতি এবং বহু আখ্যায়িকা, ভাব ও চরিত্র অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তিত আকারে মেঘনাদবধে দেখা যায়। মহাকাব্যের রসকে মধুসূদন পাশ্চাত্য আদর্শে বাংলা সাহিত্যে দিয়াছেন।

একমাত্র মধুসূদনই তথাকথিত মহাকাব্য রচনায় কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার পরে আর কেহ এ চেষ্টায় সফল হন নাই। হেমচন্দ্র মাইকেলেরই অনুকরণে তাঁহার

বৃত্রসংহার কাব্য রচনা করেন। কিন্তু হেমচন্দ্রের রচনা-রীতি অপরিপক্ক। তিনি রঙ্গলালের মতো Metrical Romance পদ্ধতিই বৃত্রসংহারের ব্যবহার করিয়াছেন। হেমচন্দ্র তাঁহার বৃত্রসংহার কাব্যে নানাবিধ ছন্দের ব্যবহার করিয়াছেন। এই বিভিন্ন ছন্দের ব্যবহার যেমন তাঁহার কাব্যের সুরটি খাটো করিয়া রাখিয়াছে তেমনি উহা এপিক রচনার অন্তরায় হইয়াছে। কারণ, বিভিন্ন ছন্দ ব্যবহার করিয়া এপিক রচনা করা যায় না। হেমচন্দ্রের অমিত্রাক্ষর ছন্দ মিলহীন পয়ার, কারণ উহাতে অমিত্রাক্ষর ছন্দের যে অনুপ্রাস ও ছন্দস্পন্দ তাহা নাই। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রকৃতি ও মাধুর্য্য তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। এক অমিত্রাক্ষর ছন্দ যে বাঁশীর মৃদুমধুর গুঞ্জরণ হইতে ভেরীর আওয়াজও প্রকাশক্ষম তাহা তিনি ধরিতে পারেন নাই। অথচ মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ হইতে মনে হয় যেন খুব উঁচু সুরে বাঁধা বীণা ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে নানাবিধ কাব্যরস পরিবেশন করিতেছেন। মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিরিক ঝঙ্কার এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দের গম্ভীর ভাব দুই-ই সুন্দর ভাবে ফুটিয়াছে। কিন্তু হেমচন্দ্রের ভাষা কেবল উন্মাদনাপূর্ণ—সরল গদ্যেরই রূপান্তর মাত্র। তাঁহার ভাষাতে সকল স্থানে কাব্যোচিতরূপ ফুটিয়া উঠে নাই।

বৃত্রসংহারে একমাত্র গুণ ইহার বিষয়বস্তু নিরূপণ। সমগ্র বৃত্রসংহারের মধ্যে দু-একটি বর্ণনা ছাড়া আর কিছুই আমাদের মন হরণ করিতে পারে না। দধিচীর তনুত্যাগ ও বজ্রগঠনে বাস্তবিক পক্ষে মহাকাব্যের উদ্দেশ্য প্রকাশ পাইয়াছে। বিষয়বস্তু নিরূপণে মাইকেল অপেক্ষা হেমচন্দ্রের কৃতিত্ব অধিকতর। কারণ মধুসূদন চিরাগত আদর্শ ও বিশ্বাসকে ভঙ্গ করিয়া মেঘনাদবধের চরিত্রগুলি সৃষ্টি করিয়াছেন। তবে তাহাতে কাব্যের ক্ষতি হয় নাই। নানা স্থানে তাঁহার বর্ণনা মহাকাব্যের অনুরূপ অভিনব ও বিস্ময়কর হইয়াছে। কিন্তু হেমচন্দ্রের কাব্য অনুশীলন করিলে দেখা যায় যে তাঁহার কাব্যে মহাকাব্যের সৌষ্ঠব এবং সৌন্দর্য্য নাই এবং তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য যুদ্ধবর্ণনা। চরিত্রের ভিতর দিয়া বীররস প্রকাশ না করাইয়া ক্রমাগত যুদ্ধবর্ণনার ভিতর দিয়া বৃত্রসংহারকে বীররসপ্রধান করিতে যাওয়া তাঁহার ভুল হইয়াছে। এই সব কারণে তিনি এপিক লেখক হিসাবে সফলকাম হন নাই।

নবীনচন্দ্রের মহাকাব্য আদর্শে বা আকারে মহাকাব্যের কোন নিয়ম রক্ষা করিয়া চলে নাই। কাব্যের ভঙ্গি ও ভাবে সেগুলি ঠিক মহাকাব্য হইতে পারে নাই। তাঁহার কল্পনা ঠিক কাব্য-প্রধান নহে আর তাঁহার কাব্যে ভাবের ঐক্য নাই। তাঁহার রচনাগুলি অতিদীর্ঘ পদ্যসঙ্কুল, নানাবিষয়ক কাব্য নিবন্ধ বা Poetical Essays মাত্র হইয়াছে। কাব্যের কোনও একটি অঙ্গের সঙ্গে অপর অঙ্গের সুসামঞ্জস্য সুময় সম্বন্ধ নাই। এপিকের ঘটনাধারা একক। কিন্তু শিল্পীর সংযম ও নিপুণতার অভাববশতঃ নবীনচন্দ্রের মহাকাব্য গুলিতে ঘটনাধারা একভাবে বহিয়া যায় নাই।

নবীনচন্দ্রের রৈবতক কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস এই কাব্যত্রয়, এবং পলাশীর যুদ্ধকে মহাকাব্য বলা হয়। নবীনচন্দ্রের প্রথমোক্ত কাব্যত্রয়ের বিষয়বস্তুর গৌরব বেশ মহান। সেখানে তিনি মহাভারতকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন একটা বিশাল ভারতসাম্রাজ্য ও একটা বিরাট ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিতে চাহিয়াছে। আধুনিক যুগের ভাবধারার সহিত মহাভারতের আখ্যায়িকার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কাব্য রচনা তাঁহার কবিত্বের পরিচায়ক। কাব্যের মধ্যে দেশানুরাগ ও ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশ করা নবীনচন্দ্রের বিশেষত্ব। কিন্তু দেশানুরাগ বা ধর্ম্মতত্ত্ব নিছক কল্পনা ও কবিত্বের উপর ভিত্তিলাভ করিতে পারে না, সেইজন্য তাঁহার রচনা কাব্য হিসাবে উৎকর্ষ লাভ করে নাই। মহাকাব্য এবং Fiction এ দুইয়ের মিশ্রণে তাঁহার কোনও কাব্যই মহাকাব্য হিসাবে সার্থক হয় নাই। পলাশীর যুদ্ধে তাঁহার যে ঐতিহাসিক কল্পনার উন্মেষ দেখা দিয়াছিল তাহা ভাববহুল উচ্ছ্বাসে ডুবিয়া গিয়াছে। পলাশীর যুদ্ধের formও ঠিক নাই। স্থানে স্থানে উপাখ্যান কাব্যের সমাবেশে উহা মিশ্র আকারও ধারণ করিয়াছে। তাহার উপর, অতি আধুনিক ঘটনা এপিক রচনার বিরোধী। পলাশীর যুদ্ধের স্মৃতি তখনও লোকের মনে পুরাতন হইয়া উঠে নাই। আধুনিক কোনও বিষয় অবলম্বন করিলে কল্পনার হয় না। সেইজন্য পলাশীর যুদ্ধ মহাকাব্য হয় নাই।

চিন্তা বা ভাবমূলকভাবে দেখিতে গেলে রৈবতক কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস রচনায় নবীনচন্দ্র সাফল্যলাভ করিয়াছেন। কিন্তু কাব্য চিরস্থায়ী হয় কবির রচনারীতি ও প্রকাশক্ষমতার দ্বারা। কবির প্রথম প্রয়োজন হইতেছে কাব্যরস পরিবেশন। তত্ত্বকথা ধর্ম্মনীতি রাজনীতি প্রভৃতি কাব্যের প্রেরণার সহিত মাঝে মাঝে আসিতে পারে। কিন্তু নবীনচন্দ্রে উহাই মুখ্য হইয়াছে বলিয়া তিনি মহাকাব্য রচনায় সফল হন নাই।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে একমাত্র মধুসূদনই বঙ্গসাহিত্যে মহাকাব্য রচনায় সফলতা লাভ করেন। তাঁহার মেঘনাদবধ সত্যই একটা সৃষ্টি হইয়াছে। সুগ্রথিত কল্পনা ও কবিত্বের স্রোত প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রবাহিত। তবে মনে রাখিতে হইবে যে মাইকেলের মহাকাব্য এবং হোমার অথবা ব্যাস এবং বাল্মিকীর মহাকাব্য এক শ্রেণীর নহে। কারণ ইংরেজিতে যাহাকে এপিক বলা হয় এবং হোমারের রচনা যাহার আদর্শস্বরূপ, তাহা একমাত্র Heroic যুগেই সম্ভব। পাশ্চাত্য সমালোচকদের মতে ইউরোপীয় কাব্যজগতে দুই শ্রেণীর এপিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে—Epic of Growth এবং Epic of Art। এই শ্রেণী-বিভাগ দ্বারা বাল্মিকী ব্যাস ও হোমারকে প্রথম শ্রেণীর এপিক-লেখক বলা যায়। আর এই হিসাবে মিল্‌টন ভার্জ্জিল অথবা মধুসূদন দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখক। রঘুবংশ প্রভৃতি সংস্কৃত মহাকাব্যও এই দ্বিতীয় শ্রেণীর।

বাল্মিকী ও হোমারের যুগে প্রাচীনতম কাহিনীগুলি, যাহা মুখে মুখে বা গায়কদিগের দ্বারা বহুকাল ধরিয়া প্রচারিত হইয়া আসিতেছিল, সেগুলি অমিত প্রতিভাশালী কবিবিশেষ একত্র করিয়া একটি অখণ্ড সুবৃহৎ কাব্যের আকারে রচনা করিয়া দিলেন। সেইজন্য রামায়ণ ও ইলিয়াড্ Epic of Growth। ভার্জ্জিল ও মধুসূদন যথাক্রমে হোমার ও বাল্মিকীর এপিক হইতে ঘটনাবিশেষ একত্র করিয়া শিল্পনৈপুণ্যের সাহায্যে নূতন এপিক সৃষ্টি করিলেন। সেইজন্য তাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর এপিক-লেখক। শিল্প হিসাবে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাকাব্যগুলি উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে বটে কিন্তু কাব্যপ্রেরণায় উহাদিগকে ঠিক এপিক বলা যায় না।

মাইকেলের পরে আর কেহই বঙ্গসাহিত্যে মহাকাব্য রচনায় সফল হন নাই। ইহা হইতে একটা বিষয় স্পষ্ট বোঝা যাইবে যে বাঙালী-প্রতিভা ঠিক মহাকাব্যের অনুকূল নহে—বাঙালীর জীবনে মহাকাব্যের প্রেরণাও নাই উপকরণও নাই। মাইকেলের পরে অন্ততপক্ষে Narrative Epic উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করিতে পারিত। কারণ মাইকেল বাংলা ভাষাকে ও ছন্দকে এপিক রচনার উপযোগী সামর্থ্য দান করিয়া গিয়াছিলেন।

বাংলা মহাকাব্যগুলিতে মহাকাব্যের বিরোধী লক্ষণ অধিকতর প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া একখানিও মহাকাব্য হইয়া উঠে নাই। অমিত প্রতিভাশালী মধুসূদনও মহাকাব্যের রূপ ও আদর্শকে পূর্ণ সার্থকতা দিতে পারেন; নাই তাহার কারণ এপিকের অনুরাগী হইলেও মধুসূদনের কবিমানস ছিল রোমান্টিক। মাইকেলের তিলোত্তমাসম্ভবে যে রোমান্টিক বা অসম্ভব মনোহর ভাবাবেগ দেখা গিয়াছিল ঠিক সেই রোমান্টিসিজ্‌ম্ পরিপুষ্ট ও পরিপক্ক আকারে মেঘনাদবধে বর্ত্তমান। মেঘনাদবধে প্রবল গীতিকাব্যের প্রেরণা কাজ করিয়াছে। মেঘনাদবধের অনেক স্থানে ব্যক্তিগত হৃদয়োচ্ছ্বাস ফুটিয়াছে এবং সেই সব স্থানগুলিতে স্বভাবতঃ এপিক-কাব্যরস অপেক্ষা লিরিক-কাব্যরস প্রবল হইয়াছে। হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্রের কাব্যেও স্থানে স্থানে এইরূপ লিরিক-মাধুর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে। এই সব কবিদের কবিপ্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছে প্রকৃতি বর্ণনায় বা বিষাদে। এইজন্য চরিত্রচিত্রণ অথবা ঘটনাবর্ণনাতে বাঙালী মহাকবিদিগের কবিত্ব ও কৃতিত্ব তত বেশী প্রকাশ পায় নাই। অথচ Objective কবিতার প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে চরিত্রচিত্রণ এবং ঘটনাবর্ণনা।

এ যুগের তথাকথিত মহাকাব্যগুলিতে কাব্যমাধুর্য্য আমরা যেখানে সব চেয়ে বেশী আস্বাদন করি সেই স্থানগুলি গীতিপ্রবণ। মেঘনাদবধেরও গীতিপ্রবণতা ও ভাবপ্রণতা লক্ষ্য করিবার বিষয়। কবিমানস ও কবি-প্রকৃতির প্রতি মাইকেলের বিশেষ ঝোঁক ছিল। সেইজন্য মেঘনাদবধে পরাজয়ের কারুণ্য ও কবিত্বই অধিকতর ফুটিয়াছে। এইরূপ গীতিপ্রবণতা আধুনিক কাব্যের উপযোগী, মহাকাব্যের উপযোগী নহে। কবির প্রাণ অনুসারে—কবি-

প্রেরণার তাড়নায় মেঘনাদবধের বহুস্থানে লিরিক কাব্যরস প্রধান হইয়াছে। মেঘনাদবধের লিরিক ভাবটি রাবণের বিলাপে, রামচন্দ্রের মমতায়, প্রমীলার ক্রন্দনে, সীতা ও সরমার কথোপকথনে সর্ব্বত্রই এপিকের আবরণ ভেদ করিয়া লিরিক আবেগের উচ্ছ্বাসে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মেঘনাদবধের সকল উৎকৃষ্ট অংশগুলিই লিরিক। সীতা ও সরমার কথোপকথন, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, প্রমীলার স্বর্গারোহণ প্রভৃতি সকল উৎকৃষ্ট স্থানই লিরিক উচ্ছ্বাসে পূর্ণ।

আপাতঃদৃষ্টিতে দেখিলে মনে হইবে যে কাব্যসৃষ্টির জন্য এ যুগের মহাকাব্য রচয়িতাগণের কবিদৃষ্টি বহির্গত আদর্শের আরাধনায় নিয়োজিত অর্থাৎ তাঁহারা তাঁহাদের কাব্যসৃষ্টির জন্য লিরিক কবিদের মতো তাঁহাদের অন্তরের ভাবরসের দিকে না চাহিয়া ইতিহাস পুরাণ হইতে কাব্যের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের কাব্যের সমস্তটাই আত্মনিমগ্ন ভাবকল্পনাপ্রসূত—উহা লিরিক আবেগ ছাড়া আর কিছুই নহে।

বাঙালীর কল্পনাপ্রবৃত্তি গীতিপ্রবণ। যে যুগে মহাকাব্য রচনার সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল সে যুগেও প্রচ্ছন্নভাবে গীতি-কবিতার আবেগ মহাকাব্য রচনাকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। এইজন্যই এ যুগের মহাকাব্যসমূহে ক্লাসিক সংযম অপেক্ষা রোমান্টিক আবেগ সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। তবে একই যুগে এপিক এবং লিরিক—দুইটি বিপরীত ধারার সংঘর্ষে কিছুদিনের জন্য বাঙালীর গীতিপ্রবণ মানসপ্রকৃতি মহাকাব্যের তাড়নায় স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছিল।

মহাকাব্য রচনার স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেরণা ছিল না বলিয়াই মহাকাব্য রচনার প্রয়াস বঙ্গসাহিত্যে সফল হইল না। তারপর উপন্যাস সাহিত্যের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কাহিনী-কাব্যের আর কোনও প্রয়োজন রহিল না। গদ্যে রোমান্স প্রভৃতি সুন্দররূপে প্রকাশ পাওয়াতে মহাকাব্যপ্রীতি কাটিয়া গেল। প্রচ্ছন্ন গীতিকবিতার ধারা বঙ্গসাহিত্যে নূতনভাবে আত্মস্থ হইয়া স্ফূর্ত্ত হইল।

মহাকাব্যের From এর প্রতি বাঙালী যদিও আকৃষ্ট হইয়াছিল কিন্তু গীতিকাব্য-প্রীতিবশতঃ বাংলা কাব্যধারা মহাকাব্য রচনার পথ ছাড়িয়া দিয়া গীতিকাব্যের দিকেই ধাবমান হইল। কবিবর বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের নিকটে গীতিকাব্য নূতন প্রাণ পাইয়া পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়

অতৃপ্তির অন্ধকারে কাঁদে

শ্রীধীরেন্দ্রকুমার চৌধুরী

অধরে অধর নাহি নয়নে নয়ন রাখ নাই,
বক্ষোপরি বক্ষ নাহি, চুম্বনের নাহিক আবেশ ,
সন্ধ্যার মধুর ক্ষণ অন্ধকারে হতেছে কাবাই,
প্রণয়ের ভাষা মূক, মুখরের মৌন নিরুদ্দেশ।
সন্ধ্যারাত্রে বসে আছি নীলিমায় ফোটে নাই তারা,
বাতাস ব্যাকুল নহে, শিহরণ জাগে নাই মনে ;
অনন্ত আকাশ উর্দ্ধে, নিম্নে কাঁদে ধরনীর কারা,
পাশাপাশি বসে মোরা, আঁধারের কুহেলি নয়নে।

আমার করের মধ্যে বন্দী তব কোমল আঙুল,
কী কথা বলিতে গিয়া বারে বারে হতেছে স্পন্দিত ;
আমারে করেছে বন্দী প্রিয়া তব ঘন কালো চুল,
তোমার করের স্পর্শ যেন মোর চিরপরিচিত।
তোমারে দেখেছি আমি অন্তরের উজল প্রাসাদে ;
প্রসারী পরাণ তাই অতৃপ্তির অন্ধকারে কাঁদে।

সবিনয় নিবেদন

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কদমকেশরপুর। নামটি বেশ। কে জানে কেমন সে গ্রাম। হয়তো নিতান্তই পাড়াগাঁ, হয়তো সমৃদ্ধিশালী, হয়তো আবার—কি জানি, কত কিছুই হ'তে পারে,—আবার কত কিছু নাও হ'তে পারে। কানন চলেছে কাদকেশরপুর —সম্পূর্ণ অপরিচিত অখ্যাত স্থান; কি যে হ'তে পারে, আর কি যে না হ'তে পারে কিছুই তার ধারণায় আসে না। অথচ অনেক কিছুই সে ট্রেণে ব'সে ব'সে ভেবে ঠিক করে। সে জানে, তার ভাবনার কিছুই হয়তো মিলবে না, তবু ভাবতে কেমন ভাল লাগে তার। কদমকেশরপুর গ্রাম যে কোথায় তাও সে ভাল ক'রে জানে না। শুধু তার জানা আছে যে, বোলপুর ষ্টেশনে নেমে গরুর গাড়ী ক'রে ৭.৮ ক্রোশের পথ যেতে হয়, কিন্তু কোন্ দিকে যেতে হয় তাও তার জানা নেই। এম্‌নি অপরিচিত স্থানে যাওয়ার মধ্যে একটা দোদুল্যমান শঙ্কা, একটা সকৌতুক আনন্দ, একটা অনিশ্চিতের দুশ্চিন্তা মিলে থাকে এমনভাবে যে, নিজেকে বেশ উপভোগ করা চলে। কানন ট্রেণে ব'সে এ অনিশ্চিত যাত্রাকে যেমন উপভোগ করছিল, তেম্‌নি উপভোগ করছিল সে তার নিজের ভাবনাগুলোকে। হয়তো সমস্ত ভাবনাই তার অকারণ, হয়তো আসল দুর্ভোগের কথাই সে একবারও ভাবেনি। যদি দুর্ভোগও লেখা থাকে কপালে, তবু তা উপভোগ করা চলতে পারে; অবশ্য তেমন দৃষ্টি থাকা চাই। কাননের সে দৃষ্টি আছে জেনেই কাননের শঙ্কা তত গভীরতা পায়নি।

বোলপুর পৌঁছুতেই ভোর হ'য়ে গেল। কানন তাড়াতাড়ি স্যুটকেস আর সঙ্গের ছোট বিছানাটি নিয়ে প্ল্যাট্‌ফর্মে নেমে দাঁড়ালো। হঠাৎ প্ল্যাট্‌ফর্মে নেমে দাঁড়াতেই তার কেমন মনে হ'লো, সে যেন এক নূতন জগতে এসে পড়েছে। আর একথাও তার মনে হ'লো, এম্‌নি এই একই কথা তারই মত কত লোকেরই তো প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়িয়ে মনে পড়েছে। এখানে সমস্তই তার অজানা, অচেনা, —এম্‌নি তার মত কত অজানা অচেনা লোক না জানি যুগ যুগ ধ'রে এখানে এসেছে, গেছে, কেই বা তাদের হিসাব রাখে, অথচ তাদের অপরিচয় তো কোনদিনই এত বড় বাধা হ'য়ে ওঠেনি যা ঠেলে তারা নিজেদের কাজ শেষ ক'রে বিদায় নিতে পারেনি।

কাননের মনে হ'লো, এমন ক'রে কেউ কোনদিন একথা ভেবে দেখেছে কিনা তা কে জানে, কিন্তু এত বড় বিস্ময় তো আর হয় না। অপরিচয়ের বাধা কি তবে বাধাই না? কানন কিন্তু ভেবে পাচ্ছিল না, আজ এমন ক'রে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাববার তার কিসের প্রয়োজন হয়েচে। অথচ এই অর্থহীন ভাবনার মধ্যে যে কত আমেজ, কত আনন্দ, কত ঐশ্চর্য্য আছে তা কাননের মত যে এমন অপরিচিত স্থানে দাঁড়িয়ে কৌতুকদৃষ্টি নিয়ে না ভেবেছে সে জানে না।

রাঙাদি'র ওখানে যেতে কাননের চোখে বোলপুর ষ্টেশন বহুবারই পড়েছে। দু'একবার এখানে ট্রেণ থামতে সে নেমে প্ল্যাটফর্ম্মে পায়চারিও করেছে; কিন্তু আজকের নামার সঙ্গে সে সব দিনের নামার কি বিরাট পার্থক্য! তার কেমন যেন মনে হচ্ছিল, এ প্ল্যাটফর্ম্মের সঙ্গে আজ থেকে যেন তার জন্ম-জন্মান্তরের সখ্যতা সুরু হ'লো। কাননের কেমন যেন ভাবতে ভাল লাগছিল; সত্যি, এমন ক'রে জগতে কোন মানুষই কি কোন অপরিচিত প্ল্যাটফর্ম্মে নেমে এমন ক'রে তার মত ভাবেনি? হয়তো ভেবেছে; অবশ্য নাও ভাবতে

পারে। যদি নাই ভেবে থাকে তো কেন ভেবে দেখেনি, এমন ক'রে ভেবে দেখার মধ্যে যে কত আনন্দ—এমন আনন্দ-ঘন মুহূর্ত্ত যাদের জীবনে আসেনি তাদের মত বঞ্চিতদের জন্য সহসা কাননের মনে করুণা ঘনালো। কাননের সহসা আবার মনে হ'লো, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একি পাগলামি তার সুরু হ'লো? কোথায় কদমকেশপুর—কোন্ পথে—সে সবের খোঁজ নিতে হবে যে তার।

তাড়াতাড়ি প্লাটফর্ম্মের বাইরে বেরিয়ে আসতে যাচ্ছিল, একটা কুলী এসে তাকে বিরক্ত সুরু করলো। কানন অগত্যা তার হাতে স্যুটকেস্ আর বিছানাটা দিয়ে বললো, হ্যারে বাইরে বাস দেখচি, বাস কি কদমকেশরপুর পর্য্যন্ত যায়?

কুলীর কাছ থেকে কানন যে সংবাদ সংগ্রহ করলো তা'তে তার নূতনত্বের সহসা-সঞ্জাত আনন্দ সহজেই ম্লান হ'য়ে এলো। কদমকেশরপুর বাস তো চলেই না, চলে একমাত্র গরুর গাড়ী—তাও ক্রমান্বয়ে তিনদিন বৃষ্টি হ'য়ে গেছে এখানে, গরুর গাড়ী চলবে কিনা তারও কিছু ঠিক নেই।

প্রচুর অর্থলাভের লোভ দেখিয়েও কানন কোন গাড়োয়ানকেই রাজী করাতে পারলো না। সকলেই বলে, 'বাবু, কদমকেশরপুর তো আর এক আধ ক্রোশের পথ নয় যে সাহস করবো, সে প্রায় আট-ন ক্রোশের পথ—কাঁচা মাটির পথ, চাকা যাবে ব'সে, মিথ্যে বন-বাঁদাড়ে আটকে প'ড়ে থাকবো।'

কানন মহা বিপদে পড়লো। আরও ভাল ক'রে খবর নিয়ে জানলো, দু'তিন দিন পর পর টানা রোদ হ'লে যদি দু'একজন গাড়োয়ান সাহস করে, তার আগে কেউ রাজী হবে না।

কানন ভেবেই পাচ্ছিল না যে, এই দু'তিন দিন সে বোলপুরের মত অচেনা অজানা জায়গায় কেমন ক'রে কাটাবে। আর আকাশের চেহারা আজ একটু ভাল বটে, কিন্তু আবার খারাপ হ'তে কতক্ষণ? এমনি অনিশ্চিতের হাতে আপনাকে স'পে দিয়ে কি মানুষ ব'সে থাকতে পারে কখনও? সহসা তার মনে পড়ে গেল রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের কথা। যাক্, তবু শান্তিনিকেতনটা এই ফাঁকে একবার দেখা হ'য়ে যাবে। এতক্ষণে কানন একটু তৃপ্তি অনুভব করলো।

বোলপুর ষ্টেশন থেকে শান্তিনিকেতন প্রায় মাইল দেড়েকের পথ। কানন তা তার কুলীর কাছ থেকেই জানতে পেরেছিল, কিন্তু সে ঠিক তাদের দূরত্ব জ্ঞানের ওপর আস্থাবান হতে পারছিল না। কাজেই পোষ্টাপিসের খোঁজ নিয়ে সেদিকে এগিয়ে চললো। বোলপুরের পোষ্টাপিস ষ্টেশনের খুব কাছেই। শান্তিনিকেতনের তথ্য সংগ্রহের জন্যই যে সে পোষ্টাপিসে এসে উঠলো তা নয়, তার স্যুটকেস্ ও বিছানাটাও রাখার একটা স্থানের দরকার। পোষ্টাপিসে যদি সুবিধা হয় এই ভেবেই সে পোষ্টমাষ্টার বাঙালী বাবুটির সঙ্গে আলাপ করলো। পোষ্টমাষ্টার কান্তিবাবু খুব আনন্দের সঙ্গেই কাননের মালপত্র নিজের বাসায় রাখতে রাজী হ'লেন এবং কানন তার এখানে যদি মাস খানেকও থাকতে চায় তো তিনি খুব খুসি হয়েই তার থাকার সমস্ত রকম ব্যবস্থা ক'রে দিতে রাজী আছেন, তবে অধুনা স্ত্রী-পুত্রকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার ফলে নিজেকেই হোটেলে দু'বেলা খেতে হচ্ছে, এটুকু কষ্ট কাননকেও স্বীকার করতে হবে। কানন একটা ডেরা পেয়ে অনেক দুর্ভাবনার হাতই সহজে এড়াতে পারলো।

কাননের চা ও প্রাতঃকালীন আহারের সমস্ত রকম ব্যবস্থাই কান্তিবাবু তার পোষ্টাপিসের লোক দিয়ে করিয়ে দিলেন। তারপরে কাননকে তিনি বল্লেন, দেখুন কাননবাবু, আপনি এখানে এসেছেন বড় বে-টক্কর সময়ে। শান্তিনিকেতনে কি আর এখন কেউ আছে, পুজোর ছুটিতে সবাই তো বাড়ী চ'লে গেছে। তবু যান একবার, দেখে আসুন।

কাননের একথা অবশ্য এতক্ষণ একবারও মনে হয়নি। সে একটু চিন্তিত হ'লো। তাইতো, পূজার ছুটিতে বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীরা যে যার বাড়ী চলে গেছে হয়তো। আর রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তখন বিদেশে আছেন। কাননের শান্তিনিকেতন দেখার আগ্রহ অনেকটা কমে গেল সত্য, তবু সে কান্তিবাবুর সঙ্গে-দেওয়া পিয়নটিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

কানন কান্তিবাবুর উপদেশ অনুযায়ী হেঁটেই চললো। এমন পথ ধ'রে হাঁটতে সত্যই তার ভাল লাগছিল। ভোর-বেলাকার তরুণ আলোয় নূতন জায়গার পথ ধ'রে চলার মধ্যে এক অপূর্ব্ব আনন্দ আছে। কানন সঙ্গের পিয়নটির কাছ থেকে পথেই শান্তিনিকেতনের অনেক খবর নিয়ে নিয়েছিল। কত দূর-বিদেশের লোক এখানে প্রায়ই আসে ইত্যাদি কত কিছু। কবির সম্বন্ধে পিয়নটির ধারণা কি জানবার জন্য কাননের কেমন যেন বাসনা হ'লো। জিজ্ঞাসা করায় পিয়নটি বললো, জানেন বাবু, উনি যে কি তা আজও আমরা ভেবে ঠিক করতে পারিনি। আর উনি তো বছরে কত সময় বিদেশেই থাকেন—আমাদের ওনাকে দেখবার সৌভাগ্য আর কত হয় বলুন। কিন্তু কি রাজপুত্তুরের মত চেহারা ওনার দেখেচেন বাবু? অমন যে মানুষ দেখতে হয় তা ওনাকে না দেখলে কি কোনদিন আমাদের বিশ্বেস হোত!

কানন অবাক হ'য়ে কবির সম্বন্ধে এই অশিক্ষিত পিয়নটির মতামত শুনছিল।

শান্তিনিকেতনের কিছু আগে রাস্তার বাঁদিকে তাদের একটা মস্ত পুষ্করিণী পড়লো। কানন অবাক হ'য়ে গেল সে পুষ্করিণীর দিকে চেয়ে। পুষ্করিণীতে জল প্রায় দেখাই যায় না, আগাগোড়াই তার লাল আর শ্বেত পদ্মে ছাওয়া। এত পদ্ম এক সঙ্গে ফুটে থাকতে সে ইতিপূর্ব্বে কোথাও কোনদিনই দেখেনি। কাননকে সহসা পথের মাঝেই দাঁড়িয়ে যেতে দেখে পিয়নটিও দাঁড়িয়ে গেল। পিয়নটি বললো, বাবু, এত পদ্ম ফুটতে কোথাও বড় একটা সত্যি দেখা যায় না। আপনারা বাবু সহুরে মানুষ; আপনাদের তো অবাক ক'রে দেবেই—আমরাই অবাক হ'য়ে যাই। শান্তিনিকেতন দেখতে এসে অনেকেই এখানে একবার না দাঁড়িয়ে পারেন না।

কথাটা ঠিক। এখানে মানুষ এসে না দাঁড়িয়ে সত্যি পারে না। মানুষের সৌন্দর্য্যবোধ আজও এত ছোট হ'য়ে যায়নি যে মানুষ এ দৃশ্য উপেক্ষা করতে পারে। কাননেরও তাই মনে হচ্ছিল।

এত আশা নিয়ে আসা, কিন্তু শান্তিনিকেতন দেখে কানন সত্যি খুসি হ'তে পারেনি। দূর থেকে একদিন যা'কে সে একটা স্বপ্নরাজ্য ব'লে ভেবেছিল তা'কে আজ অমন ক'রে আত্মপ্রকাশ ক'রে বসতে দেখে কানন নিতান্তই হতাশ হ'লো। তার কেবলই মনে হ'তে লাগলো, মানুষ যেন তার প্রিয় বস্তুকে দেখার লোভ চিরদিন সংবরণ করতে শেখে। না-দেখার কৌতূহল যে দেখার আনন্দের চেয়ে কত বড় তা আজ কানন মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করলো। তার একমাত্র সান্ত্বনা যে, শান্তিনিকেতনের অধিবাসীরা এখন এখানে বড় একটা কেউ নেই ব'লেই হয়তো স্থানটাকে এত প্রাণহীন ব'লে বোধ হ'চ্ছে। কানন ঘুরে ঘুরে শান্তিনিকেতনের সমস্ত স্থান দেখলো, কোথায় ছেলেমেয়েদের গাছতলায় বসিয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়,—কোথায় তারা কেমনভাবে বাস করে, কোথায় তাদের উপাসনা মন্দির, কতটুকু আশ্রমের সীমানা—সবই সে তন্ন তন্ন ক'রে দেখে নিলে। শান্তিনিকেতনের একজন শিক্ষকের সঙ্গে তাঁর আলাপ হ'লো। তিনি অতি দুঃখের সঙ্গে কাননকে জানালেন যে, এখন এখানে দেখার মত কিছুই নেই। ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা সবাই ছুটিতে যে যার বাড়ী চ'লে গেচে, শুধু তিনি আর দু'একজন এখনও আছেন এবং দু'একদিনের মধ্যেই চ'লে যাবেন। আর এখানকার কলাভবন এবং লাইব্রেরীই দেখবার মত জিনিষ—তাও এখন বন্ধ, দেখার কোন উপায় নেই। কাননকে যে তিনি তা দেখাতে পারলেন না সে জন্যে তাঁর আর আফশোষের সীমা নেই। কাননকে তিনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কবি এখানে অবস্থান-কালে কখন কোথায় কি করেন এসব ভাল ক'রে দেখালেন, কবি কবে কোথায় দাঁড়িয়ে তাঁর কোন্ কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলেন তাও বিশদ ব্যাখ্যার সঙ্গে জানিয়ে দিলেন। কাননের দারুণ হতাশার মধ্যে তবু এই শিক্ষকটির আবির্ভাব তাকে কতকটা আশ্বস্ত করতে পেরেছিল।

কানন যখন বোলপুর পোষ্টাপিসে ফিরে এলো তখন বেলা প্রায় এগারোটা বেজে গেছে। কান্তিবাবু ইতিমধ্যেই কাননের খাওয়া-দাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা হোটেলের সঙ্গে ঠিক

ক'রে ফেলেছিলেন এবং অনুমতি পেলেই হোটেলে পিয়ন পাঠিয়ে তার আহার্য্য এখানেই আনাবার ব্যবস্থা করবেন। কান্তিবাবুর আতিথেয়তায় কানন খুসিই হ'লো। এখানে দু'চারদিন কাটানো তার পক্ষে খুব শক্ত হবে না যা'হোক্।

সুরুলের শ্রীনিকেতন দেখবার বাসনাও কাননের ছিল, কিন্তু শান্তিনিকেতন দেখার পরে এ যাত্রা আর তা দেখার কোন আকর্ষণই তার রইলো না।

বেলা সাতটা-আটটার সময় বোলপুর থেকেই খেয়ে নিয়ে কান্তিবাবুর পরামর্শ অনুযায়ী সঙ্গে কিছু পথের জন্য খাদ্য-সামগ্রী যেমন পাওয়া গেল কিনে নিয়ে কানন গরুর গাড়ীতে চেপে বসলো। যাত্রা তার সুনির্দ্দিষ্ট কিন্তু পথের চেহারা যে কেমন তা তার জানা-নেই। গাড়োয়ানও তেমন ভরসা কিছুই দিতে পারছিল না। দু'তিনদিন ক্রমান্বয়ে রোদ উঠেছে সত্য কিন্তু বনের ভেতর দিয়ে কদমকেশর-পুরের দিকে যে ছায়াপরিবৃত পথ গেছে তা তখনও শুকিয়েছে কিনা কে জানে। গাড়োয়ানও অদৃষ্টের ওপর নির্ভর ক'রে গাড়ী ছেড়ে দিল। মাইল তিনেক পথ বেশ ভালই ছিল, তারপরেই বনের ভেতর দিয়ে গ্রাম্য কাঁচা রাঙামাটির পথ। পথের দু'ধারে ফণি-মনসার আল, মাঝ দিয়ে গেছে তার রাঙামাটির পথ, ওপরে বড় গাছের ঘন ছায়া। সে পথ দিয়ে গরুর গাড়ী যেন কত যুগ-যুগান্ত ধ'রে চলেছে—এম্‌নি মনে হয়; পথের দু'পাশে চাকার চাপে চাপে দাগ কেটে এখন তা নালায় পরিণত হ'য়েছে। পথের মাঝখানটা দু'পাশের চেয়ে অনেক উঁচু। ক্রমেই গাড়ীর চাকা কাদায় ব'সে যেতে লাগলো। এক এক জায়গায় আবার যেখানে বনের ছায়া তেমন ঘন নয় সেখানকার মাটি কিছু শক্ত থাকায় গাড়ী বেশ চলছিল। ক্রমেই কানন বনের আড়ম্বর ও পথের দৈন্য দেখে শঙ্কাকুল হ'য়ে উঠছিল। দু'পাশে কতদূরে যে গ্রাম তার কোন স্থিরতা নেই! যদি এই জনশূন্য বনাভ্যন্তরেই গাড়ীর চাকা মাটিতে ব'সে যায়, আর যদি বলদ দু'টির অক্লান্ত চেষ্টাতেও গাড়ীকে সে কাদার আবেষ্টন থেকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব না হ'য়ে ওঠে তবে কানন যে তখন কি করবে তা ভেবেই পাচ্ছিল না। তার মনে হচ্ছিল, আর দিন কত বোলপুরে অপেক্ষা ক'রে আসাই তার উচিত ছিল। প্রথম বনের ভেতর গাড়ী এসে পড়তে তার খুবই ভাল লেগেছিল। নাম-না-জানা অচেনা অদেখা কত পাখীর কূজন, বনের নিস্পৃহ ঐকান্তিক ধ্যানগম্ভীর তাপসমূর্ত্তি, দু'পাশের ফণি-মনসার বসন্তরোগীর মত দৈহিক বিক্ষোভ, একটা নিস্তরঙ্গ স্নিগ্ধতা, বন ও বনফুলের সৌরভ জড়ানো কেমন ব্যথাতুর নিশ্বাস, কত উপভোগ্য সৌন্দর্য্যের মাঝে নিজের উপস্থিতির সজ্ঞানতা,—কাননের এত ভাল লেগেছিল যে কানন নিজেও তা কারও কাছে ব্যক্ত ক'রে বোঝাতে পারে না। কিন্তু অনিশ্চিত শঙ্কা সহসা জেগে তার সহজ সৌন্দর্য্যোপলব্ধির পথে ব্যাঘাত জন্মাতে লাগলো।

পথে ক্বচিৎ দু'একটি নীচজাতীয়া স্ত্রীলোকের সঙ্গে তাদের দেখা হচ্ছিল, কিন্তু কদমকেশরপুর পর্য্যন্ত গরুর গাড়ী পৌঁছুবে কিনা সে সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ তারা কেউ দিতে পারছিল না। এই সব নীচ জাতীয়া স্ত্রীলোকদের কারও মাথায় কাঠ বোঝাই ঝুড়ি, কারও আবার দুধের কেঁড়ে। সকলেরই কেমন একটু কাননের সঙ্গে রঙ্গ করার বিনীত অভিলাষ। কথা বলার অপূর্ব্ব তাদের ভঙ্গী—সলাজ, কিন্তু অবিব্রত। তাদেরই মধ্যে একজন কাননকে বলেছিল, বাবু, একটা বিড়ি দিবে? কানন সলজ্জ হ'য়ে বলেছিল, বিড়ি তো নেই, পয়সা নিবি? মেয়েটি মুখ ঘুরিয়ে বনের ভেতর দিয়ে অদৃশ্য হ'য়ে গেচ্‌লো। যাবার সময় সে অদ্ভুত এক ভঙ্গীতে একটু হেসে চ'লে গেলো। কানন সহজে তার সে অপূর্ব্ব ভঙ্গী ভুলতে পারছিল না। হঠাৎ আবার সেই মেয়েটির সঙ্গেই কিছুদূর এগিয়ে দেখা। কানন তাকে আবার দেখে একটু বিস্মিত হ'লো। পরক্ষণেই তার বিস্ময় কেটে গেল। কেননা বনের ভেতর দিয়ে মেয়েটি সোজা পথে এসেছে, আর গাড়ী বনের বাইরে দিয়ে অনেকটা পথ ঘুরে এসেছে। মেয়েটি বনের আড়াল থেকে সহসা বেড়িয়ে এসে সলজ্জ একটু হেসে বললে, দে'-বাবু, একটা পয়সাই দে' তবে। কাননের বিস্ময়ের আর অবধি ছিল না, কিন্তু এ চাওয়াকে সে ঠিক ভিখারীর চাওয়া ব'লে ভাবতে পারলো না, এর ভেতর

কিছু দাবও যেন ঐ মেয়েটির আছে। মেয়েটি পয়সা পেয়েই আবার বনের আড়ালে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। কাননের কেবলই মনে হচ্ছিল, ও যেন আবার অতর্কিতে কোন্ বনান্তরাল থেকে সহসা বেরিয়ে এসে সামনে দাঁড়াবে। হয়তো পয়সাটা ফিরিয়েই দিবে। ও যেন প্রয়োজনের গরজে ও পয়সা নেয়নি। কিন্তু তার আর শেষ পর্য্যন্ত দেখা মেলেনি।

পথ ক্রমেই খারাপ হ'তে লাগলো। গাড়ী আর চলতে চায় না। কানন শঙ্কাকুল হ'য়ে উঠলো। তবে কদমকেশর-পুরের হদিস্ তখন পাওয়া গেছে। কেউ বলে, দু'কোশ তিনকোশ পথ। কেউ বলে, না, অত আর হবে কোত্থেকে। গাড়োয়ান বলদ দু'টোকে আপ্রাণ ঠেঙিয়েও আর গাড়ী কাদা থেকে টেনে তুলতে পারছিল না। গাড়োয়ান গাড়ী থেকে নেমে চাকা ঠেলতে বাধ্য হ'লো। একটু এগিয়েই কাননকেও গাড়ী থেকে নামতে হ'লো। গাড়ী আর কিছুতেই অগ্রসর হয় না। গাড়োয়ান হতাশ হ'য়ে হাল ছেড়ে দিল। কি যে এখন করা উচিত কানন তা আর ভেবে পাচ্ছিল না। দু'পাশে গাঁয়ের কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না। লোকজনের আগমনের আশাও দুরাশা। সমস্ত পথের মধ্যে এখানের বনই সব চেয়ে নিবিড়। গাড়োয়ান অগত্যা কাননকে গাড়ীতে উঠে বসতে ব'লে লোকজনের সন্ধানে চ'লে গেল। এ ভিন্ন অন্য কোন উপায়ও ছিল না। গাড়োয়ান কিছুক্ষণ পরেই দু'জন লোক সংগ্রহ ক'রে আনলো, তারা কোথায় গর্জ্জুনপুরের হাটে চলেছিল বনের ভেতর দিয়ে। কিন্তু তাদের শরীরের দিকে চেয়ে কাননের কিছুমাত্র ভরসা হচ্ছিল না। কানন আবার গাড়ী থেকে নেমে দাঁড়ালো।

কদমকেশরপুর পৌছুতে বেলা প্রায় চারটে বেজে গেল। কানন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো।

* *

*

গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করতেই কানন গাড়ী থেকে নেমে গাড়ীর পাশে পাশে হাঁটতে সুরু করলে। কাননের সারা দেহে তখন কেমন একটা অবসাদ ও বেদনা ঘনিয়ে এসেছিল। গরুর গাড়ীতে এতটা পথ চলতে অনভ্যস্ত ব'লেই হয়তো তা'কে এতটা কাতর ক'রে তুলেছিল। গাড়ী থেকে নামতে পেয়ে সে যেন বেঁচে গেল।

অদূরের তাল গাছে ঘেরা পুকুরের ঘাট থেকে কে একটি ঘোমটা দেওয়া গ্রাম্য বধূ জল নিয়ে গৃহে ফিরছিল, আর তার অল্প পশ্চাতেই একটি স্বাস্থ্যবান গোলগাল গ্রাম্য মেয়ে কি যেন সামনের বধূটিতে বলতে বলতে আসছিল। পশ্চাতের মেয়েটির কাঁখেও জলের কলসী। কাননের মনে হ'লো সামনে যে রাঙামাটির দেয়াল তোলা বাড়ী দেখা যাচ্ছে পথের ওপারে ওখানেই হয়তো তারা থাকে। ওদের কাছে পুতুলের শ্বশুরবাড়ীর সন্ধান নিলে কেমন হয়? কিন্তু গ্রামের মেয়ে ও গ্রামের বধূকে তার মত বিদেশী লোকের পক্ষে কোন প্রশ্ন করা সমাচীন হবে কিনা তা কানন কিছুতেই ভেবে ঠিক করতে পারছিল না। ভাবছিল গাড়োয়ান যদি বুদ্ধি ক'রে প্রশ্নটা করে তো সে বেঁচে যায়। তারা কাছে এগিয়ে এলো। কানন তখনও কি করবে ভেবে ঠিক করতে পারছিল না।

কানন স্পষ্ট শুনতে পেল পশ্চাতের মেয়েটি তার সামনের বধূটির কাছে এগিয়ে এসে বলে, দ্যাখ্ ভাই কে আবার বিদিশী মানুষ গাঁয়ে এলো।

বধূটি ঘোমটার আড়াল থেকেই উত্তর করলো, মরণ তোমার। যা না জিগ্‌গেস্ ক'রে আয় না। দ্যাখ্ না, যদি বরাৎ খোলে। ব'লে বধূটি একটু ঘোম্‌টা তুলেই আবার বললো, ঠাকুরঝি, এ যেন ভাই ঠিক আমার কাননদা'র মত দেখতে। নামটা জিগ্‌গেস্ ক'রে আসতে পারিস্? কাননদা'রও যে আসার কথা আছে ভাই। কিন্তু সত্যিই কি আর সে গরীব বোনকে মনে করবে! আসার হ'লে এ্যাতদিনে কবেই এসে যেত।

কানন বধূটিকে পুতুল ব'লে নিশ্চয় ক'রে চিনেছিল, তবু 'পুতুল' ব'লে ঘোম্‌টা দেওয়া বধূটিকে ডাকতে তার সাহস হ'লো না।

এমন সময় গড়োয়ান তাদের লক্ষ্য ক'রে হেঁকে বললো, মা'ঠান্, যদু মল্লিকের বাড়ী কোন্‌টা হবে বটেক ?

বধূটি সহসা ঘোমটা তুলে ভাল ক'রে কাননের দিকে চাইলো। তার পরেই—ও ভাই, এতো কাননদাই যে।—ব'লে আর ঘোম্‌টা টেনে দিল না।

কানন বললো বাবা, এই তোর শ্বশুর বাড়ীর দেশ পুতুল ?

পুতুল আনন্দাধিক্যে প্রথমে ভেবেই পাচ্ছিল না যে সে কেমন ক'রে কাননকে অভ্যর্থনা জানাবে, তারপরে, তার সামনে এগিয়ে এসে বললো, হ্যাঁগো, এই গাঁয়েরই নাম কদমকেশরপুর। ঐ সামনের বাড়ী। পেন্নামতো আর পথে দাঁড়িয়ে করা যায় না, বাড়ী চল'।

পুতুলের ঠাকুরঝি সহসা একটু পিছিয়ে পড়েছিল, হয়তো একটু আনমনাও হ'য়ে পড়েছিল। কানন তা লক্ষ্য ক রতেভুল করেনি।

কাননের সবই কেমন নূতন লাগছিল। ইতিপূর্ব্বে এমন কোন গ্রাম্য পরিবারের সঙ্গে এতটা ঘনিষ্টভাবে মেশবার সুযোগ তার হয় নি। পুতুল থেকে পুতুলের স্বামী, শ্বশুর, শ্বাশুড়ী সবাই যেন একযোগে তার কাছে তাদের দীনতা জানাতে সুরু করলো। অথচ কানন যতদূর সংবাদ সংগ্রহ করতে পারলো তা'তে সে বুঝলো যে, কদমকেশরপুরের জমীদারদের কথা বাদ দিলে যদু মল্লিকের অবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা স্বচ্ছল। তবে এত দীনতা জানাবার ব্যগ্রতা তাদের সবার মধ্যেই প্রকট কেন ? পুতুল কি তার সম্বন্ধে এমন কিছু এখানে প্রকাশ ক'রে ব'সে আছে যা'তে সবাই তা'কে এত বড়লোক ভেবেছে যে, এ দীনতা প্রকাশ না ক'রে তারা পারচে না ? কিন্তু গ্রামের আরও দু'চারজনের সঙ্গে আলাপ হ'তে সে বেশ বুঝতে পারলো যে, এ-টা একটা গ্রাম্য রীতি মাত্র।

কাননকে পরিতুষ্ট করবার জন্য সবারই কি আপ্রাণ চেষ্টা। পুতুলের শ্বশুর কাননের সঙ্গে দু'একটা কথা কয়েই তাড়াতাড়ি পুতুলের স্বামী হরেনকে ডেকে গর্জন-পুরের হাটে পাঠিয়ে দিলেন। তখন বেলা আর নেই দেখেও। তারপরে নিজেই জেলেদের ডাকতে গেলেন এই অবেলায় পুকুর থেকে মাছ ধরাবার জন্যে। কানন শত চেষ্টায়ও তাদের কাজে বাধা জন্মাতে পারলো না। তারা তার আগমনে এতটা ব্যাকুল হয়েছে দেখে কানন মনে মনে একটা অস্বস্তি অনুভব করলেও তাদের আন্তরিকতা দেখে মুগ্ধ না হ'য়ে পারেনি। পুতুল তাড়াতাড়ি এক বাটি চা ক'রে নিয়ে এলো, তা'তে চায়ের স্বাদ একেবারে নেই বললেই চলে, কিন্তু এত আন্তরিকতা দিয়ে তা প্রস্তুত যে কানন তারই আনন্দে শুধু তা পান ক'রে গেল। পুতুল তাকে তা পান ক'রে উঠতে দেখে বললো, আমাদের এখানে চা'তো কেউ খায়না কিনা, ক্বচিৎ কেউ এলে তবে তার জন্যে ক'রে দিতে হয়, কাজেই ও খেয়ে তোমার যে তৃপ্তি হবে না কাননদা' সে আমি জানি। তাও যদি ঠাকুরঝি ক'রে দিত তো কিছু স্বাদ হ'তো, আমি যে আবার চা তৈরী করতে হয় কেমন ক'রে তাই জানি না। এসব কাজে ঠাকুরঝি একেবারে পাকা ওস্তাদ। তা ওর আবার নাকি তোমাকে দেখে ভারি লজ্জা। কিছুতেই ক'রে দিলে না। এমন কি, পানটা এগিয়ে দেওয়ার কাজও আর ওকে দিয়ে হবে না।

পুতুলের শ্বাশুড়ী অম্‌নি ডাকতে সুরু ক'রে দিলেন, মাধুরী, ও মাধুরী। পোড়ামুখী গেল কোন্ চুলোয় ?

কিন্তু মাধুরীর আর কোন সাড়া মিললো না।

মাধুরীর দেখা মেলে বড় হঠাৎ। আবার হঠাৎই সে কোথায় যে চ'লে যায় কানন তা ভেবেই পায় না। লজ্জায় মুখ তার অষ্টপ্রহর রাঙা হ'য়েই আছে। কানন সুবিধা পেলেই তার লজ্জা ভেঙে দেবার চেষ্টা ক'রে কি যেন বলতে যায়,—অম্‌নি মাধুরী কোথায় যে অদৃশ্য হ'য়ে যায় তা একমাত্র সেই জানে।

পুতুল বলে, ওর মত ভাল মেয়ে আর কোথাও পাবে না কাননদা' এ আমি জোর ক'রেই ব'লে দিতে পারি। ওর যা গুণপনা তা বলে শেষ করা যায় না।

দেখতেই যা একটুকু মোটা, তা' ব'লে অপছন্দ করবার মত এমন কিছু না। ও যার ঘরে বউ হবে সে খুব ভাগ্যবান কাননদা'।

কানন পুতুলের কথা শুনে মনে মনে হাসে। প্রকাশ্যে বলে, বেশ মেয়ে ও। আমারতো বেশ লাগে ওকে।

পুতুল অমনি কাননকে চেপে ধরে, বলে, কথা দাও কাননদা' যে ওকে তুমি বিয়ে করবে। আমি সত্যি ওকে বড্‌ড ভালবাসি, ওর একটা খুব ভাল বিয়ে হয় এই আমি চাই।

কানন বলে, দুর পাগ্‌লি, এসব কথা কি চট্‌ ক'রে দিয়ে দিলেই হয়রে।

পুতুল বলে, খুব হয়। খুব হয়। তুমি তবে আমাকে সত্যিই ভালবাস না।

কানন ভেবে পায় না পুতুলকে সে কি ব'লে বোঝাবে।

সেদিন পুতুল এক কাণ্ড ক'রে বসলো। কাননের দেওয়া কাপড়ের একখানা মাধুরীকে পরিয়ে নিজে অপরখানা প'রে মাধুরীকে একরকম জোর ক'রে কাননের সামনে টেনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললো, দেখতো কাননদা', কেমন দেখতে হ'য়েচে এবার।

কানন ভাল ক'রে মাধুরীর দিকে চাইতেই পারলো না। মাধুরী সেখান থেকে পালাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছিল। পুতুল জোর ক'রে তা'কে ধ'রে রেখে তার চুলের রাশ তুলে ধ'রে বললো, কাননদা', আর কোন মেয়ের এত চুল আছে দেখেচো কখনও?

মাধুরী একটা ঝটকা টানে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আর যাবার সময় ঈষৎ ক্রোধযুক্ত-কণ্ঠে ব'লে গেল, এর শোধ যদি না নি তো আমার নাম মাধুরীই না।

কানন পুতুলের কাণ্ড দেখে ভারী বিব্রত হ'য়ে পড়েছিল। মাধুরীকে পালাতে দেখে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। বললো, কি যে ছেলেমানুষি করিস্‌ পুতুল! কেন, মিথ্যে বেচারীকে লজ্জা দেওয়া!

পুতুল বললো, মিথ্যে কি রকম? যার সঙ্গে ওর বিয়ে দেব' সে কি ওকে ভাল ক'রে দেখবে না? সত্যি, মাধুরী দেখতে চমৎকার, নয় কি? ওঃ, ওর আর একটা নাম তো তোমাকে বলাই হয়নি কাননদা'। ওর আর এক নাম হ'লো গিয়ে টোপাকুল। ও একটু গোলগাল দেখতে কিনা, তাই আমার এক পিস্‌তুতো দেওর আছে—ভারী সে ফাজিল, গর্জ্জনপুরের সখের যাত্রার দলে সে অভিমন্যু সাজে, সে ওকে ডাকে টোপাকুল ব'লে। সে ভারী মজা করে কিন্তু ওকে নিয়ে। দেখলেই বলে,—

ও ভাই টোপাকুল,
আমি যে কেঁদেই আকুল।

তখন ঠাকুরঝিকে দেখে কে! আর এমন ক'রে সে বলে যে, মানুষ না হেসেই পারে না। ঠাকুরঝিকে ক্ষ্যাপাতে তার আর জুড়ি কেউ নেই। একবার ঠাকুরঝিকে টোপাকুল ব'লে ডেকেই দেখ' না।

কানন হেসে ফেলে বললো, এমনি তুই যা আমার ওপর চটিয়ে দিয়েচিস্‌ ওকে তা'তেই রক্ষে নেই, তায় আবার টোপাকুল ব'লে ডাকলে আর এখানে তিষ্টোতে পারবো না।

পুতুল বললো, তুমি ওকে তবে মোটেই চেনোনি কাননদা'। ওর মত ভাল মানুষ আর হয় না। রাগ ব'লে কোন পদার্থ ওর শরীরে নেই। তবে বড্ড ছেলেমানুষ, এই যা!

বিদায়ের দিন পুতুল আবার সেই একই কথা তুলে বসলো। বললো, কই কাননদা', কথাতো তুমি কিছুই দিলে না। ওঃ, তোমার বুঝি তবে ঠাকুরঝিকে পছন্দ হয় নি? তা তোমরা হ'লে সহুরে মানুষ, তা না হওয়াই তো স্বাভাবিক।

পুতুলের অভিমান দেখে কাননের ভারী হাসি পেল। হাসি চেপে নিয়ে সে বললো, পছন্দ হবে না কেন পুতুল, কিন্তু আমি যে আর এক জায়গায় এর আগে কথা দিয়ে ফেলেচি।

কথা দিয়ে ফেলচো'? কোথায়? তা এতদিন আমাকে বল'নি কেন কাননদা'? না, তুমি আমাকে মোট্টে ভালবাস

না।—ব'লে পুতুল কাননের একটা হাত আনন্দাতিশয্যে চেপে ধরলো।

কানন তাড়াতাড়ি বললে, নারে পুতুল, কথা তাদের ঠিক দি' নি এখনও, তবে দোব, ঠিক করেচি।

পুতুল বললো, কাদের বল' না।

কানন বললো তুইতো চিনবি না তাদের, নইলে বলতাম।

পুতুল আবার বললো, কি সে মেয়ের নাম, তাই বল' না শুনি?

কানন নীরবে কি যেন একটু ভাবলো, তারপরে বললো, ধর, যদি কাহিনীই তার নাম হয়।

পুতুল ক্ষণিক নীরব থেকে বললো, বেশ, সে যাই হোক্‌গো' ছাই! তাহ'লে আর আমার কিছু বলার নেই। বিয়েতে আমাকে নিয়ে যাবেতো কাননদা'? না নিয়ে গেলে দেখবে'খন।

কানন গাড়ীতে গিয়ে উঠে বসলো। বাড়ীর সকলেই তা'কে বিদায় দিতে গাড়ীর সামনে পথে এসে দাঁড়িয়েছিল, শুধু সেখানে ছিল না মাধুরী। কানন তাকে আর একবার দেখবার আশায় চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালিত ক'রেও দেখতে পেল না। সে যে কোথায় গেছে কেউ তা জানেও না।

গাড়ী ছেড়ে দিল।

গাড়ী কিছুদূর অগ্রসর হ'তেই কানন সহসা দেখতে পেল, প্রথম দিন এখানে এসে যে পুকুর থেকে পুতুল ও পুতুলের ঠাকুরঝি মাধুরীকে জল নিয়ে গৃহে ফিরতে দেখেছিল, সেই পুকুরেরই পাড়ে একটা তালগাছে গা ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাধুরী। অপূর্ব্ব তার ভঙ্গী। যেন সে নিষ্প্রয়োজনে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। কাননের সেদিকে চোখ পড়তেই মাধুরী একটু চোখ ফিরিয়ে নিল। যেন সে একটু বিরক্ত হ'য়েছে—এই ভাব।

সহসা কাননের মনে প'ড়ে গেল,—

ও ভাই টোপাকুল,
আমি যে কেঁদেই আকুল।

সত্যই আজ টোপাকুলের জন্য কাননের কেন জানি অন্তরে অত্যন্ত ব্যথা ঘনালো।

* * *

পথে পথেই এবার কাননের পূজা কেটে গেল। কদমকেশরপুর থেকে গেল রাঙাদি'র ওখানে। রাঙাদি'র ওখান থেকে দেওঘর। দেওঘর এসে যে পৌছুলো ঠিক লক্ষ্মীপূজার পরের দিন। তার সমস্ত মন ও দেহকে এই পথ চলার শ্রম এমন ক্লান্ত ও অবসন্ন ক'রে তুলেছিল যে, দেওঘরে এসে কিছুই আর তার ভাল লাগছিলো না। মানুষের জীবনকে যেমন সে ঘা মেরে মেরে পাঁপ্‌ড়ির পর পাঁপ্‌ড়ি খুলে ঝরিয়ে দিয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে দেখেছে এমন ক'রে হয়তো আর কেউ দেখেছে কিনা তার সন্দেহ আছে, আর সেই যে মানুষের দুর্ব্বলতা, রিক্ততা ও দৈন্যের সুন্দর ব্যাথা-কাতর অভিজ্ঞতা তাই আজ তারই অজ্ঞাতে ব্যাকুল ক'রে তুলেছে। মানুষের জন্য আজ তার কত দরদ, কত ব্যথা, কত সহানুভূতি! তার নিজের জন্যেও কিছু কম নয়।

রাঙাদি' চিরদিন জগতের বাইরে একান্তে প'ড়ে থাকাকেই সমস্ত জীবন দিয়ে বরণ ক'রে নিল, তবু সেই রাঙাদি'ই এবার জগৎ সম্বন্ধে কাননকে নূতন দৃষ্টি দান করলো। রাঙাদি' এবার একদিন বলেছিল, মানুষ শুধু দুর্ব্বলই নয় কানন। সে যে কত কঠিন তা তুই ধারণাও করতে পারিস্ না। লিপির ঐ যে বিদায় নেওয়া ওকি শুধু তার দুর্ব্বলতা, ও যে কত কঠিন তা শুধু আমিই ভাবতে পারি কানন। তোকে সে সত্যি ভালবাসতে পেরেছিল, নইলে অমন ক'রে তোকে সে ছেড়ে যেতেও কোনদিন পারতো না। আর ঐ যে পুতুলের কথা বললি,—সে যেই শুনলো তুই কাহিনীকে বিয়ে করবি ঠিক করেচিস্ অম্‌নি সে আর ওদিক দিয়ে একটা কথাও তো কইল না। মানুষ কত কঠিন তা একবার ভেবে দেখেচিস্ কি? আর, আমার কথা যদি বলিস্, এই যে আমি ওঁকে পাবার জন্যে সব ত্যাগ্ ক'রে এলাম—হ'তে পারে সে আমার দুর্ব্বলতা, কিন্তু এই যে ওঁকে পেলাম জীবনে একান্ত ক'রে, আর সে পাওয়ার আনন্দ যে আজও সহ্য ক'রে বেঁচে আছি, একি আমার কম কঠিন হৃদয়ের পরিচয় কানন?

কানন রাঙাদি'র কথায় শুধু বিস্মিত হয়নি, বিচলিতও হ'য়েছিল। রাঙাদি' আরও বলেছিল, আর এই যে মা আমাকে কোনদিনই ফিরিয়ে নিতে পারলেন না—এ মা'র কত বড় দুর্ব্বলতা, কিন্তু এই যে ফিরিয়ে নিলেন না কোনদিন, এখানে মা'র দৃঢ়তার পরিচয়। কাজেই মানুষ শুধু দুর্ব্বলই না কানন, সে সবলও, আর এত সবল যে আমরা তা ধারণাই করতে পারি না।

কানন ইতিপূর্ব্বে জীবনকে অমন ক'রে কোনদিনই বিচার করেনি। মানুষের বিরাট সত্তার আভাষ সে এতদিন পায়নি। আর তারই আভাষ পেয়ে সে চঞ্চল ও বিভ্রান্ত হ'য়ে উঠলো। মানুষের জীবনের গতি যে কত বিচিত্র, কত অপরূপ, কত ভাবে মানুষের জীবনের প্রকাশ, কত ভাবে সে আপনাকে স্বপ্রতিষ্ঠ ক'রে রেখেছে—দুর্ব্বলতায়, দৃঢ়তায়, প্রাণের পূর্ণতায় ও রিক্ততায়, আবাল দৈন্য ও আবাল বিশালতায়, কাতরতায় ও অকাতরতায়! মানুষের বৈরাট্য অনুমেয়! মানুষ অসাধারণ! মানুষ সুন্দর!

এ ক'দিনের চিন্তার উগ্রতা ও পথের ক্লান্তি কাননকে দেওঘরে পৌছেই শয্যা নিতে বাধ্য করলো। তার জ্বর এলো, কিন্তু জীবনে এত ক্লান্তি আবার এত আনন্দ একসঙ্গে কখনই সে অনুভব করেনি। জীবনে এ যেন তার অপরূপ ও অভিনব অভিজ্ঞতা।

পশুপতি এসে ইতিমধ্যে সীমাকে নিয়ে গেছে। কানন জ্যেঠাইমার মুখে তার সব কথাই শুনেছে। পশুপতির সে কি লজ্জা! কাননের আসা পর্য্যন্ত সে ইচ্ছে ক'রেই যে থাকতে চায়নি তা শুনে কাননের যেমন হাসি পেল, তেমন ব্যাথাও ঘনালো। কিন্তু আজ সে কিছুতেই ভেবে পেল না যে, পশুপতির লজ্জিত হওয়ার এতে আছে কি! কাননের সঙ্গে তাঁর দেখা হ'লে কানন বলতো, সাবাশ পশুপতি! তুমিও মানুষ, মানুষের পরিচয় দেবে তা'তে আর লজ্জা কি!

যাক্‌, দেখা না হ'য়ে ভালই হয়েছে। হয়তো পশুপতি তা'তে আরও লজ্জা পেত।

কাননের বহুপূর্ব্বেই কাহিনী ও ঝর্ণা দেওঘরে এসেছিল, আর বারাকপুর থেকে মিনতিও এসেছিল। মিনতি একলাই এসেছিল। কারণ, কাহিনী ও ঝর্ণা যে আসবে তা তার জানা ছিল না। মিনতির কাজ শেষ হ'য়ে গেছলো, সীমার সঙ্গে দেখা করাই ছিল তার উদ্দেশ্য, তা হ'য়ে গেছে। সীমার সঙ্গেই সে আবার কল্‌কতা ফিরে যেত, কিন্তু কাহিনী ও ঝর্ণার একান্ত অনুরোধে তাকে থাকতেই হ'লো এবং কথা ছিল যে কাননদা' এখানে এসে পৌছুলেই তারা অবিলম্বে এক সঙ্গে সব কল্‌কতায় ফিরবে। মিনতির কল্‌তাকা ফেরার বিশেষ তাড়াও একটু ছিল। কারণ, পরাগদা'র মা জাহ্নবীদেবী তখন কল্‌কতায় একলাই ছিলেন, আর তার স্বাস্থ্যও তেমন ভাল না; এবং ময়ূর বার বার তাকে তাড়াতাড়ি দেওঘর থেকে ফিরে আসতে ব'লে দিয়েছিল তার নিজের গরজেই। বাড়ীতে একলা তার মন টেকে না। ময়ূর তার সঙ্গে দেওঘর আসতে চেয়েছিল, কিন্তু সে তাকে জাহ্নবীদেবীর কথা ভেবেই তাড়াতাড়ি ফেরবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছিল।

কাননের জ্বর হ'য়ে পড়ায় মিনতি প্রমাদ গণলো।

রাত তখন অনেক।

কাননের শয্যাশিয়রে ব'সে কাহিনী কাননের মাথার চুলে হাত বুলোচ্ছিল। কানন অফুরন্ত গল্প ব'লে চলেছে। কত কথা, রাঙাদির কথা, পুতুলের কথা, পুতুলের ঠাকুরঝি টোপাকুলের কথা। কথার তার শেষ নেই। কানন ব'লেই চলেছে, আর কাহিনীর ঝুকে পড়া চুলের রাশ বুকের কাছে টেনে নিয়ে একটি পরম আবেশের সঙ্গে তা আমুলে জড়িয়ে জড়িয়ে কি যেন কৌতুকানন্দে আপনাকে মাতাল ক'রে তোলার প্রয়াস পাচ্ছে।

জ্যেঠাইমা এসে ঘরে ঢুকলেন। বললেন, কাহিনী, রাত অনেক হয়েচে। মিনু ও ঝর্ণা বোধ হয় এতক্ষণে ঘুমিয়েও পড়েচে। তুইও যা মা, রাত জেগে কি শেষে শরীর খারাপ করবি, আমিই কাননের ঘুম না আসা পর্য্যন্ত ওর শিয়রে বসব'খন।

কাহিনী বললো, না জ্যেঠাইমা এমন গল্প ফেলে কেউ উঠতে পারে না। কাননদা' বল'তো আবার সেই রাঙাদির Nonsesne এর গল্পটা, সেই পুতুলের ঠাকুরঝি টোপাকুলের

তালগাছে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়ানোর গল্পটা, কদমকিশরপুরের পথের সেই মেয়েটির বিড়ি চাওয়ার গল্পটা; দাওনা জ্যেঠাইমাকে শুনিয়ে কাননদা। সেই যে যাত্রার দলের অভিমণ্যু—সে যেন কি বলে ?—

ও ভাই টোপাকুল
আমি যে কেঁদেই আকুল।

তারপরে কাহিনী কিছুতেই হাসি সামলাতে পারলো না। কাননের হাতের আঙুলে তখনও কিন্তু কাহিনীর চুল জড়ানো ছিল। কাননও হাসতে লাগলো।

জ্যেঠাইমা তাদের মজা দেখে বললেন, তবে আমিই ঘুমুইগে তোরাই জেগে গল্প কর। কিন্তু কাহিনী, কাননের এ জ্বর আর কিছু না, ক্লান্তি থেকেই হয়েচে ওকে যত বিশ্রাম দেওয়া যায় ততই ভাল। ওকে ঘুম না পাড়িয়ে কিন্তু ঘর থেকে যাস্‌নে।

ব'লে জ্যেঠাইমা চলে যাচ্ছিলেন, কানন তাকে ডেকে ফিরিয়ে বললো যেওনা জ্যেঠাইমা। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। এই—আমার কাছে এসে ব'সো।

জ্যেঠাইমা কাননের শয্যার পাশে এসে বসতে কানন বললো, আমি তোমাকে রাঙাদির কথাই বলবো জ্যেঠাইমা, তুমি কেন তার কথা শুনবে না, আমি আজ তোমাকে না শুনিয়ে ছাড়বো না।

জ্যেঠাইমার মুখে সহসা একটু পরিবর্ত্তন দেখা দিল। তিনি সংযত হয়ে বসে বললেন, তার কথা আর কি তুই আমাকে শোনাবি কানন? তাকে আমার চেয়ে তুনিয়ায় আর কেউ ভাল করে চেনে না নিশ্চয়ই।

কানন তাড়াতাড়ি বললো, না জ্যেঠাইমা, তুমি তাকে মোটেই চেনোনা, চিনলে তুমি তাকে ক্ষমা করতে পারতে নিশ্চয়ই।

ক্ষমা?—জ্যেঠাইমা কেমন একটু হাসতে চেষ্টা ক'রে বল্লেন, কানন, তোর রাঙাদি' যে আমার ক্ষমার অনেক ওপরে। তাকে ক্ষমা করে তাই কোনদিন অপমান করতে সাহস পাইনি। জগতে কোন মা-ই বোধ হয়—মেয়েকে আমার মত সম্মান শ্রদ্ধা দিতে শেখেনি কানন। তোরাতো জানিস্ না আমি তোদের রাঙাদিকে কত ভালবাসি অন্তরে অন্তরে—মেয়ের প্রতি মায়ের ভালবাসা সে নয় কানন, সে হচ্ছে সুন্দরকে ভালবাসা। তোর রাঙাদি' যে আমার চোখে কত সুন্দর তা শুধু আমিই জানি কানন। কাউকে ব'লে বোঝাবার জিনিষ সে নয়। আমার মা হওয়া সার্থক হ'য়েচে কানন।

কানন ও কাহিনীর চোখে জ্যেঠাইমার কণ্ঠের ঐকান্তিকতায় জল এসে পড়েছিল। কানন তাড়াতাড়ি চোখের জল সামলে নিয়ে বললো সে আমি বিশ্বাস করি জ্যেঠাইমা। রাঙাদিকে যে দেখেচে সেই তোমার একথা বিশ্বাস করবে।

কাহিনী বললো, এতো তোমার দিকের কথা হ'লো জ্যেঠাইমা, রাঙাদির দিক থেকেওতো কিছু বলার থাকতে পারে? আর রাঙাদির কষ্টের জীবন দেখে আমাদের দশ জনেরওতো কিছু বলার থাকতে পারে ?

জ্যেঠাইমা কাহিনীর মুখের দিকে সস্নেহ দৃষ্টি তুলে বল্লেন, তোদের রাঙাদির দিক থেকেও একথা বলচি। শুধু আমার একলার কথা এ নয় কাহিনী। ধর্, তোদের রাঙাদিকে যদি আমি ফিরিয়েই আনি, তা'তে তোদের রাঙাদি তার মায়ের ওপর শ্রদ্ধাতো হারাবেই, অধিকন্তু হারাবে তার মনের এ বিপুল ঐশ্বর্য্য। তার মনের বৈভব লুঠ ক'রে তাকে দীনতা দিয়ে আমি চোথ চেয়ে তাকে কথনই দেখতে পারবো না। মা হয়ে আমি তা পারবো না!

কাননের কিছুই আর এর পরে বলার ছিল না। সে কাহিনীর চুলগুলো নিজের হাতের আঙুলে জড়িয়ে জড়িয়ে কি যেন অনাবিষ্কৃতি বিরাট রহস্য তুনিয়ার আবিষ্কার করার ব্যর্থ প্রয়াসে কাতর হয়ে উঠছিল। তাদের সবারই মুখে তখন ব্যথাকাতর নীরবতা। কাহিনীর মুখ শুধু লজ্জায় সামান্য একটু রাঙা।

(সমাপ্ত)

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

ইব্‌সেন্ ও বর্ত্তমান বাঙ্গালার কথা-সাহিত্য

শ্রীপ্রসন্নকুমার সমাদ্দার

আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের বিষয় আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই তার যে দিকটায় আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, সেটা হচ্ছে 'গল্প-সাহিত্য'। উপন্যাস ও "পরম্পরাশ্রয়া আখ্যায়িকা"কেও ইহারই অন্তর্ভুক্ত বলা যায়। মূলকথা, এই সকল গুলিই ব্যাপকভাবে 'কথা-সাহিত্য' নামে অভিহিত হ'য়ে থাকে। বাঙ্গালার এই কথা-সাহিত্য যে অতি অল্পকালের মধ্যে অভাবনীয় ভাবে উন্নতি ও প্রসার লাভ করে' বঙ্গসাহিত্যকে বিশেষভাবে সম্পন্ন করেছে এ বিষয়ে বোধ করি, মতদ্বৈধ নাই।

বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কোন কথা বলবার আগে বিষয়টী পরিস্ফুট করবার জন্য এই কথা-সাহিত্যের উৎপত্তি, গতি ও ক্রম-পরিণতির মূলে কি কি শক্তি ক্রিয়াশীল এবং কি কি পারিপার্শ্বিক ঘটনা ও কারণ-পরম্পরা দ্বারা ইহারা নিয়ন্ত্রিত ও নির্দ্ধারিত হয়েছে সে বিষয়ে দু'চার কথা বলা সমীচীন মনে করি।

সকল দেশের সাহিত্যের ক্রম-বিকাশের ইতিহাসেই দেখা যায়, প্রথম অভ্যুদয় কাব্য-সাহিত্যের, তারপর গদ্য-সাহিত্য। এই গদ্য-সাহিত্যের প্রথম অভ্যুদয়-কালেও আবার উপন্যাসের আবির্ভাব প্রায়শঃ দৃষ্ট হয় না। সাধারণতঃ গদ্য-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ও ক্রম-পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে এই কথা-সাহিত্যের উদ্ভব দৃষ্ট হয়। আমাদের বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্রে উপন্যাস-সৃষ্টি ব্যাপারও ঠিক তেমনি ভাবেই সংঘটিত হয়েছে। যদিচ বহু শতক পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্যে এই পরম্পরাশ্রয়া আখ্যায়িকা বা উপন্যাসের প্রথম সৃষ্টি ৺টেকচাঁদ ঠাকুরের (প্যারীচাঁদ) হাতে তাঁর 'আলালের ঘরের দুলালে'; তথাপি তাকে পূর্ণাঙ্গ কথা-সাহিত্যের নিদর্শন বলা যায় না। বর্ত্তমানে কথাসাহিত্য বলতে আমরা সত্যি সত্যি যা' বুঝি, তার সৃষ্টি হয়েছে, সাহিত্য সম্রাট ৺বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বঙ্গদর্শনের যুগে। অবশ্য বাঙ্গালার অতি-আধুনিক কথা-সাহিত্য ও বঙ্কিম যুগের কথা-সাহিত্যের মধ্যে এমন একটা প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে যা' পাঠকমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বঙ্কিম-সাহিত্যে আমরা দেখতে পাই, মানবচরিত্রের সুসংবদ্ধ গঠনোপযোগী একটা সুনীতি ও মহাপ্রাণাত্মক ধর্ম্মের একটা বলিষ্ঠভাব; তাঁর শিল্পসাধনের বৈচিত্র্যের মধ্যে দৃষ্ট হয়, একটা অনন্য-সাধারণ সংযম ও শৃঙ্খলা। তাঁর সাহিত্যের মেরুদণ্ড আমাদের এই অতি-আধুনিক সাহিত্যের মত এত পেলব সহজ-শিহরণশীল ছিল না; তাহা ছিল সুদৃঢ় ও সুবলয়িত। তাঁর কথা-সাহিত্যে এখনকার মত কথায় কথায় অহৈতুক শিল্প-সাধনের (Art for art's sake) ধূয়া ছিল না; কথায় কথায় মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের এমন একটা উৎকট প্রচেষ্টা ও মানবচরিত্রকে অধিকাংশস্থলে এমন নিঃসঙ্কোচ রিরংসাপ্রবণ করে অহৈতুকভাবে পরিকল্পিত করবার উদ্দাম প্রবৃত্তিও ছিল না; ছিল একটা শান্ত সংহত লিপি-নৈপুণ্য, একটা জাতীয় কল্যাণমূলক আত্ম-প্রতিষ্ঠার ভাব এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যের সহিত তাঁর নিবিড় পরিচয় সত্ত্বেও তাঁর সাহিত্যে ছিল প্রাচ্য আদর্শের প্রতি একটা প্রগাঢ় অনুরাগ। বঙ্কিমচন্দ্রের পর যখন সাহিত্য পরিচালনের গুরুভার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়ে, তখন বাঙ্গালার কথা-সাহিত্যে সংযোজিত হ'তে আরম্ভ হয় নব নব উপাদান ও বৈশিষ্ট্য এবং সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য ভাবসংঘাত ও বৈদেশিক সাহিত্যাদর্শের প্রভাবে তার বাহিরের রূপও পরিবর্ত্তিত হয়ে উঠে অনেকখানি। তারপর বাঙ্গালার কথা-সাহিত্যের অভাবনীয় পরিণতরূপ আমরা দেখতে পাই, শক্তিবান্ কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের হাতে—, তাঁর সেই অপূর্ব্ব রচনাভঙ্গিতে ও বিচিত্র শিল্প-কৌশলে।

তারপরেই আমাদের এই বর্ত্তমান বা অতি আধুনিক

পাওয়া যায়। এই সকলেরই মূল, পাশ্চাত্য জীবনধারার বিকৃত মর্ম্মার্থ গ্রহণ ছাড়া আর কিছুই নয়। উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে যে একটা উচ্চ ও মহনীয় আদর্শ ও একটা সংস্কারমুক্ত, উদার মহাপ্রাণাত্মক ভাবোদ্বুদ্ধ সুস্থ বলিষ্ঠ সাহিত্যিক মন থাকা একান্ত আবশ্যক একথা আমরা প্রায়শঃ ভুলে যাই; কাজেই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা যে সকল সাহিত্য-সৃষ্টির নিদর্শন পাই তা' প্রায়ই দুর্ব্বল ও ক্ষীণজীবি; পরন্তু অধিকাংশই কষ্ট-কল্পনা ও কৃত্রিমতার ভারে আড়ষ্ট। শুদ্ধ একটা অভিনব আদর্শ-সৃষ্টির অজুহাতে কতকগুলি কাল্পনিক, চমকপ্রদ চরিত্র সৃষ্টি ক'রে তাদের মুখ দিয়ে দীর্ঘকালের শ্রদ্ধাপুষ্ট সংস্কার ও সামাজিক রীতিনীতি বিষয়ে বিরুদ্ধ-প্রশ্ন উত্থাপিত ক'রে তরুণ ও তরল চিত্তে অযথা বিক্ষোভ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করাই কথা-সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয় ঔপন্যাসিক মাত্রেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, কি সামাজিক, কি লৌকিক, কি রাজনীতিক, কি ধর্ম্ম যে বিষয়েরই কোন প্রশ্ন তিনি তাঁর সৃষ্ট চরিত্র-সাহায্যে উত্থাপিত করুন না কেন, কল্যাণকর যুক্তিতর্ক দ্বারা তাঁর গঠনমূলক সমাধান কর্ব্বার ঐকান্তিক চেষ্টা করা তাঁর কর্ত্তব্য। কারণ যাতে সমাজ-সংস্থিতির ভিত্তি শিথিল হয় ও মানবের নৈতিক জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিপ্লবের সৃষ্টি হ'তে পারে এমন সকল প্রশ্ন উত্থাপিত করে' দেশের তরুণ পাঠক-পাঠিকাদের চিত্তকে অকারণ অশান্ত ও উচ্ছৃঙ্খলতাপ্রবণ কর্ব্বার অধিকার কারুর নাই তা' তিনি যত বড় কবিই হোন আর যত বড় ঔপন্যাসিকই হোন। যত অহৈতুক ভাবেই তাঁরা কথা-সাহিত্য সৃজন করুন না কেন তাঁদের সৃষ্ট চরিত্রের একটা বিশিষ্ট ফলশ্রুতি আছেই, পরোক্ষ ভাবেই হোক আর অপরোক্ষ ভাবেই হোক তাহা পাঠকচিত্তকে অল্পাধিক প্রভাবান্বিত কর্‌বেই। এ বিষয়ে পাশ্চাত্য প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক H. G. Wells একস্থানে বলেছেন "Even if the novelist attempts or affects to be impartial he still cannot prevent his characters setting examples; he cannot avoid putting ideas into readers' heads".

তারপর একটা কথা কোনরূপেই ভুল্‌লে চল্‌বে না যে, সকল দেশকে এক আদর্শ ও এক কাল্‌চারের ধারা অনুযায়ী গঠিত করা যায় না; দেশ কাল ও পাত্রভেদে মানুষের আকারগত ও ভাষাগত পার্থক্য থাকা যেমন স্বাভাবিক, তা'দের জীবন-যাত্রা-প্রণালী, চিন্তাধারা, সামাজিক আদর্শ ও কালচারের পার্থক্য থাকাও তেমনি স্বাভাবিক।

কাজেই কি কাব্য, কি কথা-সাহিত্য, কি নাট্য-সাহিত্য, কি চিত্রকলা—যে কোন চারুশিল্প-সৃষ্টি-ব্যাপারই হোক না কেন যেখানে মানবচরিত্র সৃজন অনিবার্য্য সেখানে দেশকাল-ভেদ ও জাতিগত বৈশিষ্ট্যের কথা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ পারিপার্শ্বিক হ'তে রসগ্রহণ করে' পরিপুষ্ট হওয়া জীবমাত্রেরই ধর্ম্ম। যে পারিপার্শ্বিক হ'তে স্বাভাবিকভাবে রস আকর্ষণ কর্‌তে পারে না বা পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না, তার পক্ষে পুষ্টিলাভ ত দূরের কথা—প্রাণশক্তি বজায় রেখে টিকে থাকাই দায় হ'য়ে পড়ে। কাজেই পাশ্চাত্যই হোক আর উদীচ্যই হোক কোন দেশ হতে কোন সাহিত্যাদর্শ বা রূপ ও রস-সৃষ্টির ধারা গ্রহণ কর্ত্তে হ'লে, প্রথমতঃ চিন্তা করা আবশ্যক হবে, তা' আমাদের জীবনধারা, পারিপার্শ্বিক ও জাতিগত ঐতিহ্যের কতখানি অনুকূল হবে এবং তাদের সঙ্গে কতখানি খাপ খাবে। সাহিত্যের চিরন্তনতা যে একটা প্রধান গুণ সে কথা অবশ্য অস্বীকার কর্‌বার উপায় নাই, কিন্তু তাই বলে' চিরন্তনতার দোহাই দিয়ে নিছক দেহধর্ম্মের বিচিত্র সংক্রামণ-প্রয়াসকেই সাহিত্যের সর্ব্বস্ব করে' তোলা অর্থাৎ যে সনাতন বেদনার সংক্রামণ-প্রয়াসে মরালীর সম্মুখে মরাল শতভঙ্গীতে আপনাকে মনোহারী কর্ত্তে চেষ্টা করে, সেইটীকে নানাভাবে, নানা ভঙ্গীতে, নানা অলঙ্কারে সাজিয়ে পাঠক সম্মুখে উপস্থাপিত করাকেই সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য বলা যেতে পারে না। উচ্চসাহিত্য হবে সেই জিনিষ যাকে বলা যায়—মানব-মনের মনীষা তার ঐন্দ্রজালিক সৃজনীশক্তি-প্রভাবে যে বিশাল পরিকল্পনার বাঙ্‌ময় রূপ সৃষ্টি করে তারই সুচারু রূপায়ন,—যার মধ্যে মানবহৃদয়ের নানা বিচিত্র অনুভূতি নানাবিধ রসাশ্রয় করে' মূর্ত্ত হ'য়ে উঠবে,—যা মানবমনে চৈতন্য-প্রাপ্তির একটা অপূর্ব্ব বেদনা জাগাবে—যা, এই নিরন্তর প্রবহমান মানবজীবনের যে অনির্ব্বচনীয় সঙ্গীতের মিড় আকাশে বাতাসে নিরন্তর প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সেইদিকে জড়িমালিপ্ত মানবচিত্তকে সজাগ ও উন্মুখ করে' দিবে। *

শ্রীপ্রসন্নকুমার সমাদ্দার

* বাগবাজার গ্রন্থাগার-মঙ্গল-সমিতির সাহিত্য-আলোচনী সভায় পঠিত।

প্রত্যাহার

শ্রীকুড়নচন্দ্র সাহা

প্রকাণ্ড আকারের পাঁচ পাঁচটা ধানের গোলা সিদ্ধেশ্বরের পাকা দালানটা আড়াল করিয়া রাখিয়াছে, পথ হইতে ইমারতটা হঠাৎ তার চ'খে পড়ে না। এজন্য সিদ্ধেশ্বরের কোন ক্ষোভ নাই, কারণ দিন দিন তা'র শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। আগে গোলা ছিল দুটি, তাও আবার ছোট। বৈশাখের রোদে পুড়িয়া চালের খড়গুলি তখন ঝুরঝুরে হইয়া থাকিত,—তা'রপর বর্ষা নামিলে খড়গুলির আর চিহ্ন পাওয়া যাইত না। এখন সিদ্ধেশ্বরের আর সেদিন নাই,—পাঁচটা গোলাই বেশ করিয়া টিন দিয়া ছাওয়া; রোদবৃষ্টি কিছুতেই আর তা'রা কাহিল হবার নয়।

দূরের লোক যা'রা পথ দিয়ে চলে, তা'রা ভাবে এটা গোলাবাড়ী, জমিদারের লোকে দিনরাত প্রজাদের রক্ত শুঁষিতেছে। আর গাঁয়ের লোকে জানে, গোলার আড়ালে পাকা ইমারতের মালিক তা'দের বুড়া আঙ্গুল দেখাইয়া এক পুরুষেই ফাঁপিয়া উঠিয়াছে,—চোখ কচ্‌লাইয়া লাভ নাই!

তা' যে যাই মনে করুক, সিদ্ধেশ্বরের বিষয়বুদ্ধি বেশ টন্‌টনে। সকাল হইতে রাত দশটা নাগাদ একতিল তা'র বিশ্রাম নাই। মাঠের জমিগুলির ভার কৃষাণের উপর। কিন্তু, সিদ্ধেশ্বর নিশ্চিন্ত নয়, যখন তখন আসিয়া তদারক করে। বাড়িতে মুদিখানার কেনাবেচায় একজন ছোকরা আছে। ছোক্‌রাটি সিদ্ধেশ্বরের স্বজাতি; এইখানেই থাকে, খায়-পরে। মাসান্তে মাহিনার দুটি টাকা সিদ্ধেশ্বর তা'র মায়ের হাতে পাঠাইয়া দেয়। দুপুরবেলা আছে ভিখিরি বিদায়। কাজটা বরাবর এক সের চালেই সম্পন্ন হইত; কিন্তু এখন অকুলান দেখিয়া সিদ্ধেশ্বর আর এক সের বাড়াইয়া দিয়াছে।

প্রথম দিন মানদা বলিয়াছিল,—কি করছ দাদা, সংসার তোমার ফতুর হবে যে!

সিদ্ধেশ্বর উত্তর দিল,—হ'লেই হ'ল, আমি কেন আছি? লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ফুরোয় না জেনে রাখিস্!

মানদার যুক্তি টেকে নাই! লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধেশ্বরের উদরের স্ফীতি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

পাকা ঘর হইয়াছে আজ বছর দুই। মাত্র দিন কয়েক আগে বাহিরের পলস্তারা শেষ হইল। মানদা বাহিরের দিকটা এতদিন শুধু শুধুই ফেলিয়া রাখে নাই,—নির্ব্বিবাদে ঘুঁটে দিয়া আসিয়াছে। এখন ঘুঁটের স্থলে চূণ বালির ধব্‌ধবে কান্তি ফুটিয়া উঠিল! মুদিখানার পাশের ঘরটা বৈঠকখানা। সেখানে ফরাস করা হইয়াছে। একপাশে একটি আলমারি, তাহার ভিতর দুই চারিখানা বই, আর কাগজপত্র। মনের আনন্দে সিদ্ধেশ্বর প্রথম দিন ঘরের মধ্যে পায়চারি সুরু করিয়া দিল।

মানদা হাসিতে হাসিতে কাছে আসিয়া বলিল,—সবই ত হ'ল, এখন এলে পরে ভরসা পাই দাদা।

চিঠি লিখেচে, আস্‌বে না বল্‌চিস্ কি। ভদ্রলোকের কথা ত! আমাদের তৈরী থাক্‌তে দোষ নেই।

মানদা আবার হাসিয়া উঠিল,—তা' বটে! একাই ত আস্‌বেন?

—চিঠির কথা তাই আছে।

—ভাল হয় একা এলেই।

সিদ্ধেশ্বর এ কথার কোন উত্তর দিল না। কেবল একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বাহিরের দিকে তাকাইল।

রাত্রে বৈঠকখানায় দুইজনের কথা চলিতেছিল, একজন সিদ্ধেশ্বর, আর একজন অপরিচিত ভদ্রলোক! ভদ্রলোকের নাম নিশিকান্ত,—প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করায় মুখের উপর গাম্ভীর্য্য দেখা দিয়াছে।

নিশিকান্ত মশ্‌লা চিবাইতে চিবাইতে বলিলেন,—ছোট বেলায় একবার এসেছিলাম তোমাদের গাঁয়ে। একদিনের আসা, কারও সঙ্গে আলাপ হয় নি।

সিদ্ধেশ্বর মৃদু হাসিয়া বলিল,—দুই চারদিন থাকুন, অনেকের সঙ্গে আলাপ হ'য়ে যাবে,—সঙ্গে সঙ্গে দরজার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই মানদার চ'খ দুটি শুধু একবার দেখিতে পাইল।

নিশিকান্ত বলিলেন,—সময় থাক্‌লে সবই সম্ভব হ'ত, কিন্তু তা যখন নেই—

—তা' বটে, পরের কাজ।

হ্যারিকেনের উজ্জ্বল রশ্মিতে ঘরের চারিদিক আলোকিত। সিদ্ধেশ্বরের দৃষ্টি কেমন একটু ত্রস্ত আবার উদাস! কিসের একটু ছুতা করিয়া ঈষন্মুক্ত দরজাটা দিয়া সে বাহিরের পথটা একবার দেখিয়া আসিল।

নিশিকান্ত বলিলেন,—রাত হচ্ছে শুধু শুধু, কাজের কথা আর বাকী থাকে কেন?

সিদ্ধেশ্বর স্নিগ্ধহাস্যে উত্তর দিল,—একটা কথা, আমাদের কোন অমত নেই।

—অমত আমারও নেই বাবাজি, তোমাকে দেখে প্রথমেই আমি খুসি হ'য়েছি! বয়স একটু হ'য়েছে, তা'তে কোন দুঃখ নেই। আয়বুড়ো ছেলে যে পাচ্ছি, এই আমার ভাগ্য। তা'ছাড়া আমার খুকিও সেয়ানা ত!

সিদ্ধেশ্বরের মাথা নত হইয়া আসিল।

নিশিকান্ত ফের বলিলেন,—একদিন সময় মত গিয়ে দেখে আসতে পার।

—দেখেছি।

—দেখেছ;—মৃদু হাসিয়া নিশিকান্ত সিদ্ধেশ্বরের মুখের দিকে তাকাইয়া বেশ একটু নিশ্চিন্ত হইলেন বোধ হইল। তারপর বলিলেন,—টুক্‌টুকে রঙ্‌, মাস দুই আগে ম্যালেরিয়ায় ভুগে একটু রোগা হ'য়েছে এই যা!

দরজার আড়াল হইতে এবার মানদার কণ্ঠ শোনা গেল,—কি দেবেন থোবেন, তা' একটু ব'লে যান। শুধু মুখেই সার্‌বেন নাকি?

নিশিকান্ত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সিদ্ধেশ্বরও হাসিল।

—বুড়োকে পীড়াপীড়ি কর্‌লে কি পারে বেটি?

মানদা বলিল,—পীড়াপীড়ির কথা নয়। কর্‌লে এতদিন অনেক জায়গায় কর্‌তাম। আমাদের সে ইচ্ছে নয়।

নিশিকান্তের হাসিমুখে অল্প গাম্ভীর্য্য ফুটিল। তিনি ছাড়িবার নন। বলিলেন,—বুড়োকে তবে এ যাত্রা মাফই না হয় কর্‌লি বেটি, বুড়ো তোদের শরণ নিয়েচে,—তুমি কি বল বাবাজি!

সিদ্ধেশ্বর আর বলিবে কি? সে উঠিয়া দাঁড়াইল!

নিশিকান্তের নাসিকা-গর্জ্জন আরম্ভ হইয়াছিল। সিদ্ধেশ্বর মানদাকে বলিল,—কেমন ব'লেছিলাম না তোকে, বড় ভাল লোক!

—ভাল লোক কিসে দেখ্‌লে তুমি। একখানা দান সামিগ্রীর কথা মুখ দিয়ে বেরুলো না—ভাল লোক!

ও কথা বলিস্‌ নে। ভালয় ভালয় হ'য়ে গেলে এখন বাঁচি।

সে ভরসাও খুব বেশি নেই, জেনো দাদা।

সিদ্ধেশ্বরের চ'খে মুখে একটু সংশয়ের ছায়া ফুটিল। বলিল,—নেই? নেই কেনরে? কেউ ফাঁশ করেছে নাকি?

মানদা হাসিয়া বলিল,—করেনি, তবে করতেও বোধ হয় দেরি নেই।

সিদ্ধেশ্বর আবার হতাশ হইল। কয়েক মুহূর্ত্ত সে চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—দেরি নেই? তোর জন্যেই আমাকে চোর হ'তে হবে। সব কথা খুলে বলিগে তাহ'লে। তা'র পর ক্ষীণকণ্ঠে বলিতে লাগিল,—লিখে পড়ে দিতে কি আমার আপত্তি? কেবল তোর কথাতেই এতদিন,··· আর ও-সবে ইচ্ছেও তেমন নেই জানিস্‌।

ঘরের ভিতর যে আলো জ্বলিতেছিল,—তাহারই একটু রেখা আসিয়া সিদ্ধেশ্বরের মুখের উপর পড়িয়াছিল। মানদা দেখিল, সিদ্ধেশ্বরের সে মুখ বিষণ্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

সে হাসিয়া বলিল,—বড্ড তোমার ভয় দাদা, একটুতেই সাহস হারাও। আমি কি বল্‌ছিলাম জান? বিকেলে উনি ঐ দিকটাতে একবার গিয়েছিলেন।

—পাড়ার ভেতর ?

—আঃ না গো, পাড়ার ভেতর যাবেন কেন ? বলিয়া বাহিরের একটা কাছাকাছি জায়গার দিকে তাকাইয়া মানদা একটু হাসিল।

—তা'তে কি ? উনি দেখেন নি জেনে রাখিস্। দেখলে কিছু শুধুতেন।

—ধর, কোন কথা না শুধিয়ে মনে মনে আমাদের সঙ্গে একটু রহস্য ক'রে চলে গেলেন।

তাতেই বা হবে কি ?

হবে না কিছু, কিন্তু ঠক্‌লে ত !

সিদ্ধেশ্বর ফের শুধাইল,—কেন দেখেছে নাকি সত্যি ?

মানদা এবার সহজকণ্ঠে উত্তর দিল,—না, তবে যাচ্ছিলেন ঐদিকে একটু বেড়াতে। আমি কৌশলে ফিরিয়ে আনি। নইলে দেখে ফেলতেন বৈকি ! কতদিনই যে আর জ্বালাবে গো। হ্যাঁ, মিন্‌সে কাল এগারটার গাড়ীতে যাবে বুঝি ?

—বল্‌লেন ত তাই !

নিশুতি রাত্রি। সিদ্ধেশ্বর বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িল। বাড়ির পশ্চিমদিকে একটি অনতিবৃহৎ পুষ্করিণী। চারিদিক আম-কাঁঠালের গাছের ছায়ায় অন্ধকার। ভিতরে কোন মনুষ্য-প্রবেশের পথ নাই। বাপের আমলের প্রকাণ্ড গর্ত্তটাকে সিদ্ধেশ্বর বুদ্ধি করিয়া পুকুর করিয়াছে। পুকুরের জল অবধি পাকা-সিঁড়ি। উপরে ঝাড় কয়েক বেল ফুলের গাছ। বর্ষারাত্রে যখন ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া বৃষ্টি হয়, তখন এই ফুলের গন্ধ পুকুরঘাট ছাড়িয়া সিদ্ধেশ্বরের অন্তঃপুরে আসিয়া প্রবেশ করে।

সিঁড়ির উপর আসিয়া সিদ্ধেশ্বর চুপ করিয়া দাঁড়াইল। এদিকটা বড় নির্জ্জন,—কেউ আসে না এখানে। অন্যের প্রবেশও এখানে নিষিদ্ধ। কেবল দিনে রাতে বার দুই তিন আসিয়া সিদ্ধেশ্বর নিজের কাজ সারিয়া চলিয়া যায়।

আমগাছের মাথায় চাঁদ দেখা দিয়াছিল। ঝোপে ঝাড়ে অল্প অল্প অন্ধকার। চারিদিকে গভীর নির্জ্জনতা একটা বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়াছে। চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় সিদ্ধেশ্বরের দৃষ্টি পুকুরের অপর পাড়ে গিয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল। বিবাহ আসন্ন। মনটা সিদ্ধেশ্বরের চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। এত রাত্রে এখানে আসিয়া তা'র মন খারাপ করিতে ইচ্ছা ছিল না,—কিন্তু আসিয়াছে সে বড় প্রয়োজনে। আশে পাশে কিসের একটা শব্দ হইতেই সিদ্ধেশ্বর চমকিয়া উঠিল। সিঁড়ির উপর তাহারই একটা ছায়া। সিদ্ধেশ্বর আর দেরি করিল না। পুকুরের শেষ ধাপটায় নামিয়া আস্তে করিয়া ডাকিল,—পাগ্‌লি ! কোন সাড়া নাই। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ফের ডাকিল, —পাগ্‌লি,···ঘুমিয়েচিস্। পুকুরের ঘন সবুজ ঘাসের উপর আমগাছের শীর্ণ ছায়ায় সর্‌সর্ করিয়া একটা শব্দ হইল। পুকুরের কোল ঘেঁসিয়া কে ছুটিয়া আসিতেছে তাহারই দিকে। সিদ্ধেশ্বরের চ'খ দুটি তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল। শীর্ণ কান্তিহীন এক মূর্ত্তি,—সারা গা দিয়া খড়ি উঠিতেছে—হাঁটু পর্য্যন্ত ঢাকা ময়লা একখানা কাপড়ে নিজের আর সিদ্ধেশ্বরের লজ্জাটাকে সে কোন রকমে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। সিদ্ধেশ্বরের কাছে আসিয়া অতি নিরীহভাবে তা'র পায়ের কাছেই সে বসিয়া পড়িল। সিদ্ধেশ্বর সিঁড়ির উপর বসিয়া বলিল,—আঁচল পাত্ দেখি তাড়াতাড়ি।

—ইঃ, এঁটো যে, পাতা কই ? তাড়াতাড়ি সে উঠিয়া পড়িতেছিল। সিদ্ধেশ্বর একটা ঝাঁকানি দিয়া বলিল,—এঁটো নয়, পাত্ আগে।

কোঁচড় খুলিয়া সিদ্ধেশ্বর বাহির করিল,—মুড়ি আর খানকয়েক শাঁক-আলু। এই আহাৰ্য্যগুলির দিকে তাকাইয়া পাগ্‌লির কণ্ঠ দিয়া একটা অস্ফুট আনন্দধ্বনি বাহির হইয়া গেল।

সিদ্ধেশ্বর চ'খ দুটি কঠিন করিয়া শাসাইল,—চেঁচাবি ত মার খাবি, চুপ ক'রে খেয়ে নে।

পাগ্‌লি খাইতেছে আর এক একবার চ'খ তুলিয়া সিদ্ধেশ্বরের মুখের দিকে তাকাইতেছে।

কাজ চুকিয়াছে। সিদ্ধেশ্বরের আর এখানে থাকার প্রয়োজন কি ? এখনই সে উঠিবে। এই কাণ্ডজ্ঞানহীন স্ত্রীলোকটার ভার সে নিজের স্কন্ধেই লইয়াছে। মানদাকেও তা'র বিশ্বাস নাই। কতদিন সে মানদার উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে নাই, চুপি চুপি আসিয়া পাগ্‌লির

সহিত দেখা করিয়াছে,—পাছে তা'র অনাদর হয়, পাছে সে না খাইয়া থাকে।

সিদ্ধেশ্বর উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, হঠাৎ কি ভাবিয়া বসিল। পাগলির অতি কাছে আসিয়া ক্ষণকাল সে তা'র চ'খের দিকে তাকাইয়া রহিল। স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার আলোয় মনে হইল,—সে ছুটি চ'খ যেন একেবারেই নিরর্থক নয়, তাদের ভাষা আছে, পলকহীন ছুইটি কালো তারায় অন্তরের মমতা সজল হইয়া উঠিয়াছে।

সিদ্ধেশ্বর ধীরে ধীরে পাগ্‌লির মাথাটা নিজের কোলের উপর তুলিয়া লইল।

—উঃ, কর কি গো?

সিদ্ধেশ্বরের চ'খে আবেশ নামিয়া আসিয়াছে। এ কণ্ঠ যে বহুদিন আগের ভুলিয়া যাওয়া কণ্ঠ! কোথাও এতটুকু জড়তা নাই,—স্বর তেমনই ক্ষিপ্র অথচ মধুর!

সিদ্ধেশ্বর সস্নেহকণ্ঠে শুধাইল,—যাবি নিরু, আমাদের বাড়ি?

—যাব কেন, তোমরা যে মার।

—মারি আর কবে রে। মেয়েমানুষ, আমার মান-সম্মানটাও দেখ্‌লিনে তুই, লোকে কত নিন্দে করে বল্‌ ত?

—করুক, আমি আর যাব না বাপু। আমিও একদিন দেখ্‌ব। ঘরে একদিন আগুন ধরিয়ে দেব চুপি চুপি। পুকুরের জল নিতে এলে দেব ভাব্‌চ, কথ্‌খনো না।

সিদ্ধেশ্বর কোন কথা কহিল না, চুপ করিয়া রহিল। কথায় কথায় পাগ্‌লি আবার কি করিয়া বসে কে জানে। এতক্ষণ সে যে ভাল মানুষ হইয়া আছে এইটুকুই আশ্চর্য্য।

সিদ্ধেশ্বর বসিয়া আছে। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ কখন মাথার উপর উঠিয়া আসিয়াছে। সিদ্ধেশ্বরের তা' খেয়ালই নাই।

নিরু যেদিন প্রথম আসিয়াছিল, সেদিনের কথা তা'র মনে পড়ে। সম্পত্তির মধ্যে ছিল সেদিন বিঘে পাঁচেক জমি, আর খড়ের ছুখানা ঘর। বাপের দেনা দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া চলিয়াছে। পেটে ভাত নাই দেনা শুধিবে কি করিয়া? গ্রামের অক্ষয় ঘোষ আসিয়া যুক্তি দিল কল্‌কাতায় গিয়ে এই বেলা পথ দেখ্‌ সিদ্ধেশ্বর, দেশে থেকে মর্‌বি শেষে। এই যুক্তি সিদ্ধেশ্বর শিরোধার্য্য করিয়াছিল। যাওয়া স্থির। কাপড় চোপড় লইয়া সিদ্ধেশ্বর বাহির হইতেছে এমন সময় নিরু আসিয়া গোল বাধাইল,—কত টাকা চাও তুমি?

কেন, টাকা কেউ আমাকে দেবে নাকি?

আমিই দেব। কিন্তু, বল আগে দেশ ছেড়ে তুমি যাবে না।

দেশে থেকে যদি চলে, তবে কিসের দুঃখে যাব নিরু?

দেশে থেকেই চল্‌বে। আমি বল্‌চি চলে যাবে।

একটি বছরও কাটে নাই। সিদ্ধেশ্বর যা'তে হাত দিয়াছে, তাই সোনা হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষেতে ফসল, মুদিখানায় খদ্দের—সিদ্ধেশ্বরের গৃহে লক্ষ্মী আসিয়া দেখা দিল।

পাগ্‌লি হঠাৎ সিদ্ধেশ্বরের চমক্‌ ভাঙ্গিয়া দিল,—জান গো তোমার পরেশের জ্বালায় আর পারিনে। আমার কাপড়খানা ছিঁড়ে দিয়েচে। ওকে একটু শাসন করে দিও বাপু, দিচ্ছ ত?

—দেব।

আর দেখ, পুকুরে ওকে নামতে দিও না। যে দুষ্টু, কোন দিন আবার—

ছোট্ট ছেলেটি সিদ্ধেশ্বরের চখের উপর খেলা করিতেছে। ছেলের মত ছেলে বটে। এই বয়সেই গাছে চড়িয়া পাখীর বাচ্চা পাড়িয়া আনে। কেলো কুকুরটার পিঠে বসিয়া সওয়ার হয়। ঢিল ছোড়ে, বাঁশী বাজায়। শুধু কি তাই? তীর ধনুক হাতে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ায়। ঠিক যেন, রূপ কথার রাজপুত্তুর—পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া তেপান্তরের মাঠ দিয়া একদিন দিগ্বিজয়ে চলিয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যা বেলায় সিদ্ধেশ্বর আসিয়াছিল পুকুরে হাত মুখ ধুইতে। হাত মুখ ধুইয়া উঠিয়া আসিবে এমন সময় দৃষ্টি পড়িল পুকুরের জলে। অস্পষ্ট আলোয় দেখা যায় না, কি ওটা? শ্যাওলা? গাছের শুক্‌ন পাতা? না পরেশ? পরেশই ত! মাথার কোঁকড়ানো চুলগুলি উপরে রাখিয়া জলের ভিতর পা ছুইখানি ডুবাইয়া দিয়া পরেশ নিশ্চল হইয়া সাঁতার কাটিতেছে। সিদ্ধেশ্বর তখন কি করিয়াছিল, ভাল মনে নাই। নিরুর কথাটাই কেবল মনে আছে। অন্তঃপুর হইতে ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া পুকুরের কালো জলের দিকে তাকাইয়া হাসির অট্টরোলে সন্ধ্যার আকাশ বাতাস সে সচকিত

করিয়া দিয়াছিল। সেদিন হইতে পুকুরের ঘাট নিরুর বড় প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে,—ছোট ছেলেটার সাঁতার দেখিয়া দেখিয়া আজও তা'র আশ মেটেনা।

সিদ্ধেশ্বর দেখিল, পাগলি উঠিয়া ধীরে ধীরে পুকুরের পাড় দিয়া চলিতেছে। তা'র পায়ের আঘাতে গাছের শুকনো পাতাগুলি মর্ মর্ শব্দে ভাঙিয়া যাইতেছে। কিছুক্ষণ পরে সে শব্দ মিলাইয়া গেল। আমগাছগুলির ঘন ছায়ার তলে পাগলি একবার খল্ খল্ শব্দে হাসিয়া উঠিল। তা'র পরেই দিগন্তব্যাপি নির্জ্জনতা। গাছের পাতাগুলি কেবল জ্যোৎস্নার আলোয় নড়িতেছে, আর কিছু নয়।

বৈঠকখানার দিকে আসিতেই সিদ্ধেশ্বর দেখিল নিশিকান্ত তা'র আগে আগে ফিরিতেছেন। এত ভোরে ভদ্রলোক কোথায় গিয়াছিলেন? তাড়াতাড়ি সিদ্ধেশ্বর পুকুরের দিকে মুখ ফিরাইতেছিল এমন সময় নিশিকান্ত ডাকিলেন—বাবাজি,—

সিদ্ধেশ্বর ঈষৎ ভয়চকিত দৃষ্টিতে নিশিকান্তের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

ট্রেনের এখনও দেরি আছে বাবাজি, এগারটার গাড়ীর জন্যে বসে থেকে লাভ নেই। ততক্ষণে পৌছে যাবে।

—কিন্তু না খেয়ে—

নিশিকান্ত বাধা দিলেন,—বারটার এদিকে জলটুকু আমি মুখে দিইনে, তুমি কিছু মনে ক'রনা।

সুটকেস হাতে সিদ্ধেশ্বর ষ্টেশান পর্য্যন্ত নিশিকান্তের সঙ্গে গেল। পথে কাহারও সহিত দেখা হইল না ভাবিয়া মনে মনে সে খুসি হইল।

গাড়ীতে উঠার আগে নিশিকান্ত ভাবি জামাইকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন,—সামনের ফাল্গুনে শেষ করব বাবাজি, দিন আমি গিয়েই দেখব।

সিদ্ধেশ্বর ঘাড় নাড়িয়া জানাইল তাহার কোন আপত্তি নাই।

* * *

ফাল্গুনের দ্বিতীয় সপ্তাহ কাটিয়া গেল, কি সিদ্ধেশ্বরের নামে কোন চিঠি আসিল না। তৃতীয় সপ্তাহে নিশিকান্ত একখানি পত্র পাইলেন:—

বিবাহে আমার আপত্তি আছে, কেন তা' আপনাকে বলিতে পারিব না। আপনি আপনার কন্যার বিবাহ অন্যত্র দিতে পারেন। আমার সকল ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

নিশিকান্ত চিঠির অক্ষরগুলির দিকে চাহিয়া চাহিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া হাসিলেন।

শ্রীকুড়নচন্দ্র সাহা

চিরজীবি

শ্রীসুপ্রভা দেবী বিএ

আমি শুধু চলে যাবো দিনান্তের সম,
নীলাভ্র হইতে মোর আলোক অঞ্চল
সম্বরি' মৃত্যুর পানে। বিস্মৃতির তমো
আমার স্মরণখানি করিবে চঞ্চল!
তবু না নিঃশেষ হবে যেই প্রেমগীতি
তরঙ্গিয়া কণ্ঠে মোর নিত্য পড়ে ঝরি';
উঠিবে বিহগ তানে পুষ্পবন-বীথি
প্রতি প্রাতে সেই সুরে শিহরি' শিহরি'।

আমি শুধু চলে যাবো; আমার হৃদয়
ফুলে শস্যে তৃণতলে মানব অন্তরে,
উপহার রেখে যাবো চির মৃত্যুঞ্জয়,
জাগিবে সে ধ্রুবতারা অনন্ত অম্বরে।

কত নব আঁখিতটে মুগ্ধ পরিচয়!
চিরন্তন প্রেম মোর লভিবে বিজয়।

যৌগিক ছন্দে যুগ্মধ্বনি

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন এম্-এ

রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল পূর্ব্বে এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন, "যতক্ষণ বাংলা ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতি……সম্পূর্ণ বদল হ'য়ে না যাবে ততক্ষণ যে অক্ষর যেমন ভাবেই সাজাই না কেন বাংলা ছন্দের ধারা আজও যেমন ভাবে চল্‌চে কালও তেমনি ভাবে চল্‌বে।……ছন্দের ধাত বদল হবে না" (বাংলা ছন্দ—বিচিত্রা, ১৩৩৮, পৌষ, পৃঃ ৭১৬)। তাঁর এই উক্তি সম্পূর্ণ সত্য এবং এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহেরও অবকাশ নেই। কিন্তু বাংলা হরফ ও লেখার পদ্ধতি (বিশেষতঃ যুক্তাক্ষরের রীতি) যদি সম্পূর্ণ বদলে যায় এবং অন্য কোনো নূতন পদ্ধতিতে যদি অক্ষর সাজানো যায় তাহ'লে বাংলা ছন্দ ঠিকই থাক্‌বে বটে, কিন্তু কোনো কোনো বাংলা ছন্দের হিসাব রাখার প্রচলিত পদ্ধতিতে যে বিষম উলোট-পালোট ঘটে যাবে সে-বিষয়েও সন্দেহ করা চলে না। ধরা যাক্ ভারতবর্ষে একজন দ্বিতীয় কামাল পাশা আবির্ভূত হ'য়ে আইন ক'রে ভারতীয় লিপিপদ্ধতি সম্পূর্ণ বাতিল ক'রে দিলেন এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র রোমান হরফ ও লিপিপদ্ধতি প্রবর্ত্তন করলেন। আরও ধ'রে নেওয়া যাক্ যে তার ফলে সমগ্র বাংলা কাব্যসাহিত্যকেও রোমান হরফে ঢেলে সাজানো হয়েছে। এখন দেখা যাক্ বাংলা ছন্দের উপর নয়, ছন্দ বিশ্লেষণ-রীতির উপর তার কি প্রভাব হবে। রবীন্দ্রনাথের "বঙ্গমাতা" (চৈতালি) কবিতাটির প্রথম দুই পংক্তি হচ্ছে এরকম—

> পুণ্য পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
> মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে।

প্রচলিত কায়দায় আমরা ব'লে থাকি যে, এ ছন্দের প্রতি পংক্তিতে আছে চৌদ্দ "অক্ষর"। কিন্তু এই 'অক্ষর' শব্দের অর্থ যে কতখানি অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক তা আমরা আমাদের লিপিপদ্ধতি ও অভ্যাসের ফলে সহজে বুঝতে পারিনে। কিন্তু লিপিপদ্ধতির রূপান্তর ঘটলেই এ বিষয়ে আমাদের অভ্যাসের ত্রুটি ধরা পড়ে। উপরের পংক্তি-দুটিকে রোমান হরফে রূপান্তরিত করা যাক্।

> Punye pape duhkhe sukhe patone utthane
> Manush haite dao tomar santane.

হরফ বা লিপি-পদ্ধতি বদলে যাওয়া সত্ত্বেও "ছন্দের ধাত বদল" হয়নি অর্থাৎ ছন্দ একই আছে। কিন্তু হরফ বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে ছন্দের হিসাব রক্ষার প্রচলিত প্রণালীতে যে পরিবর্ত্তন ঘটে গেল, সেইটেই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার বিষয়। এখন আর বলা যায় না যে, এখানে প্রতি পংক্তিতে চৌদ্দ 'অক্ষর' আছে। 'অক্ষর' মানে যদি হয় letter বা হরফ, তাহ'লে অক্ষর সমাবেশ-রীতির মধ্যে মোটেই সমতা পাওয়া যাবে না। আর 'অক্ষর' মানে যদি হয় সিলেব্‌ল্ তাহ'লেও উপরের পংক্তি-দুটিতে চৌদ্দটি ক'রে সিলেব্‌ল্ পাওয়া যাবে না। প্রথম পংক্তিতে চৌদ্দ সিলেব্‌ল্‌ই আছে বটে, কিন্তু দ্বিতীয় পংক্তিতে সিলেব্‌ল্ আছে মাত্র দশটি। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে 'অক্ষর' শব্দের প্রচলিত অর্থে শুধু letter বা হরফ ও বোঝায় না, শুধু সিলেব্‌ল্‌ও বোঝায় না। আসল কথা এই যে, 'অক্ষর' বলতে প্রধানত, সিলেব্‌ল্‌ই বোঝায়, কিন্তু অবস্থাবিশেষে 'অক্ষর' বলতে হসন্ত বর্ণকেও বোঝায়। কিন্তু কোন্ কোন্ অবস্থায় হসন্ত বর্ণ পূর্ণ অক্ষর বা সিলেব্‌ল্-এর মর্য্যাদা পায় তা নির্ণয় করা সহজ-সাধ্য নয়। হসন্ত বর্ণ বা ভাঙা সিলেব্‌ল্ কোন্ কোন্ স্থলে পুরো সিলেব্‌ল্ বা অক্ষর বলে গণ্য হয়, সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আমরা দেখ্‌লাম যে বাংলা ছন্দে কখনও কখনও হসন্ত বর্ণকে পূর্ণ অক্ষর অর্থাৎ পূর্ণ সিলেব্‌ল্ এর মর্য্যাদা দেওয়া

হ'য়ে থাকে। যেমন—"কাশীরাম দাস ভণে শুনে পুণ্যবান", এখানে হসন্তোচ্চারিত 'ম' এবং 'স' তাদের বিলুপ্ত অকারের গৌরবে এখনও পুরো অক্ষরের মর্য্যাদা পাচ্ছে। শুধু তাই নয়, চিরকালের হসন্ত ন্-টিকেও এখন পুরো অক্ষর বলে গণ্য করা হচ্ছে। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, হসন্ত এবং স্বরান্ত বর্ণকে এভাবে সমান মর্য্যাদা দেওয়া অযৌক্তিক সুতরাং অবৈজ্ঞানিক। অথচ বাংলা ভাষায় 'অক্ষর' শব্দটি দ্ব্যর্থবোধক হ'য়ে পড়েছে। আর দ্ব্যর্থবোধক পরিভাষা নিয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হলে যে পদে পদে বিড়ম্বনা ঘটতে পারে, একথা না বললেও বোঝা যায়। তাই আমি বাংলা ছন্দের আলোচনায় 'অক্ষর' শব্দটি ব্যবহার না করারই পক্ষপাতী।

'অক্ষর' শব্দকে যদি বর্জ্জন করা যায় তবে তার স্থলে কোন্ পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করা যায় দেখা যাক্। জড় জগতের ভৌতিক বিশ্লেষণের ভিত্তি যেমন অণু, তেমনি ছন্দোজগতের ধ্বনি বিশ্লেষণের ভিত্তি হচ্ছে সিলেবল্ বা ধ্বনিব্যষ্টি। জড় জগৎ তৈরি হয়েছে অসংখ্য অণুর বিচিত্র সমবায়ে, তেমনি ছন্দোজগৎও গ'ড়ে উঠেছে সিলেবল্-এর বিচিত্র সমাবেশের ফলে। অর্থাৎ ছন্দো বিশ্লেষণের unit বা একক হচ্ছে সিলেবল্। আবার অণুর সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় পরমাণু; তেমনি সিলেবল্-এরও সূক্ষ্মতর বিভাগের ফলে পাওয়া যায় মাত্রা বা mora। অর্থাৎ অণু যেমন পরমাণুর সমষ্টি, তেমনি সিলেবল্ও মাত্রার সমষ্টি।

যাহোক, একথা বোঝা গেল যে ছন্দের প্রাথমিক বিশ্লেষণ নির্ভর ক'রে সিলেবল্-বিভাগের উপর এবং তার সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণ প্রতিষ্ঠিত মাত্রা-বিভাগের উপর। কিন্তু মাত্রা-বিভাগ নির্ভর করে সিলেবল্ এর প্রকার ভেদের উপর। অতএব আগেই দেখা দরকার সিলেবল্ কয় প্রকার। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে সমস্ত সিলেবল্কেই দুইটী সুস্পষ্ট শ্রেণীতে ফেলা যায়। কতকগুলি সিলেবল্ নিঃসঙ্গ, এদের ধ্বনিটা থাকে মুক্ত; এরা অন্য কোনো স্বর বা ব্যঞ্জন বর্ণকে আশ্রয় বা সঙ্গ দান করেনি ব'লে এদের ওজনটাও অপেক্ষাকৃত হাল্কা। এরকম নিঃসঙ্গ সিলেবল্কেই বলি অযুগ্মধ্বনি অর্থাৎ open syllable। কিন্তু এই নিঃসঙ্গ সিলেবল্গুলি যখন অপর একটি (বা একাধিক) নিরাশ্রয় স্বর বা ব্যঞ্জন বর্ণকে আশ্রয় দান করে তখন এদের যুক্ত ধ্বনিটা যায় বুজে এবং ওজনেও তখন এরা অপেক্ষাকৃত ভারি হয়ে পড়ে। এই রকম সংসক্ত সিলেবল্কেই বলি যুগ্মধ্বনি বা রুদ্ধধ্বনি অর্থাৎ closed syllable। অতএব সমস্ত সিলেবলকেই যুগ্মধ্বনি ও অযুগ্মধ্বনি এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি। এবার দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যথা—বন্দনা। এই শব্দটী 'বন্' ধ্বনিটা হচ্ছে যুগ্ম, আর দ এবং না এই দুটি ধ্বনি হচ্ছে অযুগ্ম।

এবার অযুগ্ম ও যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ-বৈচিত্র্য পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য করা যাক্। আমাদের নিত্য কথোপকথনের উচ্চারণ-ভঙ্গীর প্রতি যদি লক্ষ্য রাখি তাহ'লে দেখা যাবে আমরা প্রত্যেক বাংলা স্বরধ্বনিকেই প্রয়োজন মতো কখনও হ্রস্ব অর্থাৎ ছোটো ক'রে উচ্চারণ করি, আবার কখনও দীর্ঘ অর্থাৎ বড়ো ক'রে উচ্চারণ ক'রে থাকি। যুগ্মধ্বনিকে যখন আমরা টেনে দীর্ঘ ক'রে উচ্চারণ করি তখন ওই যুগ্মধ্বনির অন্তর্গত আশ্রয় ও আশ্রিত অংশ দুটি যেন পরস্পর থেকে খানিকটা বিচ্ছিন্ন বা বিশ্লিষ্ট হ'য়ে পড়ে। তাই ওরকম দীর্ঘোচ্চারিত যুগ্মধ্বনিকে বলতে পারি বিশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনি। তেমনি ঠেসে ছোটো-করা অর্থাৎ হ্রস্বোচ্চারিত যুগ্মধ্বনিকে বলতে পারি হ্রস্ব বা সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনি তাই দেখতে পাচ্ছি অযুগ্ম ও যুগ্মধ্বনির হ্রস্ব ও দীর্ঘ রূপভেদে মোট চার প্রকার ধ্বনি নিয়ে আমাদের নিত্য কারবার। আর, আমাদের সমস্ত বাংলা ছন্দও ওই চার প্রকার ধ্বনির বিচিত্র সমাবেশের দ্বারাই গঠিত।

কালব্যাপ্তির দিক্ থেকে এই চার প্রকার ধ্বনির পরিমাণ বা ওজনের হিসাব রাখার প্রণালীটি কি তাও দেখা দরকার। মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে, একটি অযুগ্ম ধ্বনির হ্রস্ব উচ্চারণের কালকে বলা হয় এক মাত্রা। আর, অযুগ্ম ধ্বনির দীর্ঘ উচ্চারণকে দ্বৈমাত্রিক ব'লে সাধারণতঃ গণ্য করা হ'য়ে থাকে। তেমনি যুগ্মধ্বনির হ্রস্ব বা সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের কালকে এক মাত্রা এবং তার দীর্ঘ বা বিশ্লিষ্ট উচ্চারণের কালকে দুইমাত্রা ধরা হ'য়ে থাকে। এইটে

হচ্ছে ধ্বনির মাত্রা নিরূপণের সাধারণ মোটা হিসাব। সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণে এই হিসাবে কিছু ত্রুটি রয়েছে ব'লে আমার বিশ্বাস। কিন্তু এস্থলে ওই সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হবার প্রয়োজন নেই আমাদের। যৌগিক অর্থাৎ সাধু ভাষার সাধারণ পয়ার ছন্দে এই চার প্রকার ধ্বনি সংস্থাপনের রীতি কি সেইটেই হচ্ছে বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

প্রথমেই ব'লে রাখা দরকার যে, বাংলা কবিতার যৌগিক বা পয়ার ছন্দে অযুগ্ম ধ্বনির দীর্ঘ উচ্চারণের অর্থাৎ দ্বৈমাত্রিক অযুগ্ম ধ্বনির ব্যবহার প্রায় নেই বললেই হয়। কিন্তু এ ছন্দে অযুগ্ম ধ্বনির দ্বৈমাত্রিক প্রয়োগ যে হ'তে পারে না তা নয়। দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টা স্পষ্ট হবে।

(১) গর্জ্জিল পৌরব-রাজ অসি মুক্ত করি',
"কী! এত স্পর্দ্ধা তার? আনো তাকে ত্বরা,
এখনই উচিত শাস্তি করিব বিধান।"

(২) সহসা ধ্বনিল কু—,প্রতিধ্বনি সনে
শিহরি উঠিল দিক্ বন হ'তে বনে।

(৩) ছি—! বন্ধু, তোমাকে সাজে না কভু হেন দুর্ব্বলতা।

(৪) আবার ডাকিনু, "কে—?", নাহি পেয়ে সাড়া
বিস্ময়ে বাহিরে এসে উঠিনু চমকি'।

(৫) না—, না—, পারিব না করিতে পালন
এ নির্দ্দয় আজ্ঞা তব, ক্ষমা করো মোরে।

বলা বাহুল্য এ দৃষ্টান্তগুলিতে কী, কু, ছি, না প্রভৃতি অযুগ্মধ্বনিগুলির দীর্ঘ অর্থাৎ দ্বৈমাত্রিক উচ্চারণ হয়েছে। কিন্তু সাধারণ পয়ার জাতীয় ছন্দে এ রকম অযুগ্মধ্বনির দীর্ঘ উচ্চারণের ব্যবহার প্রায় নেই বললেই হয়। সুতরাং এ ছন্দকে কারবার করতে হয় একমাত্রিক অযুগ্মধ্বনি, এবং সংশ্লিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট (অর্থাৎ একমাত্রিক ও দ্বৈমাত্রিক) যুগ্মধ্বনি, এই তিন প্রকার ধ্বনি নিয়ে। একমাত্রিক অযুগ্মধ্বনির সংস্থাপন-রীতির কোনো বিশেষত্ব নেই। কিন্তু সংশ্লিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনির বিচিত্র সমাবেশের উপরেই এ ছন্দের ধ্বনি-প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। আর, সংশ্লিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনির বিচিত্র সংযোগের দ্বারাই এ ছন্দের ধ্বনি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয় ব'লেই এ ছন্দকে নাম দিয়েছি "যৌগিক ছন্দ"। বাংলা ছন্দের অন্যান্য শাখায় যুগ্মধ্বনি প্রায় সর্ব্বত্রই হয় সংশ্লিষ্ট না হয় বিশ্লিষ্ট; ওসব শাখায় যুগ্মধ্বনির এই দুই রূপের একত্র সমাবেশের দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। কিন্তু সাধারণ পয়ার-জাতীয় ছন্দের সর্ব্বাঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনির যুক্তধারার সঙ্গম তীর্থ। তাই এ ছন্দকে যৌগিক নামে অভিহিত করতে চাই। অন্য কোনো বাংলা ছন্দে এই দুই ধ্বনিস্রোতের ধারা এমন ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলিত হয়নি।

যাহোক, যৌগিক অর্থাৎ সাধারণ পয়ার-জাতীয় ছন্দে সংশ্লিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনি সন্নিবেশনের রীতিগুলি কি, এখন তারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক্। প্রথমেই বলা দরকার যে এ ছন্দে সংশ্লিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনি সংস্থাপনের অতি নির্দ্দিষ্ট বা অলঙ্ঘনীয় কোনো নিয়ম নেই। তবে একটু তলিয়ে লক্ষ্য করলেই এ ছন্দের রচনায় যুগ্মধ্বনি প্রয়োগের কতগুলি প্রচলিত রীতির সন্ধান পাওয়া যায়। ওই রীতিগুলি কি, তা আলোচনা ক'রে দেখা দরকার। আমরা প্রথমেই দেখেছি প্রচলিত কায়দায় 'অক্ষর' গুণে হিসাব রাখা হ'লেও সাধারণ পয়ার-জাতীয় ছন্দ আসলে অক্ষর-সংখ্যার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। ভারতীয় লিপিপদ্ধতির ফলে ওভাবে অক্ষর গুণে মোটামুটি ভাবে এ ছন্দের হিসাব রাখা যায়। কিন্তু ভারতীয় হরফ ও লিপিপদ্ধতির পরিবর্ত্তে অন্য রকম হরফ ও লিপিপদ্ধতির ব্যবহার করলেই অক্ষর গুণে হিসাব রাখার ত্রুটি ধরা পড়ে। শুধু তাই নয়, ভারতীয় লিপিপদ্ধতিতে 'অক্ষর' সাজানো সত্ত্বেও অনেক সময়েই অক্ষর গুণে এ ছন্দের হিসাব রাখা যায় না। যথা—

(১) মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া 'উৎকট'
হঠাৎ ফুকারি' উঠে—"হিং টিং ছট্!"
—রবীন্দ্রনাথ, সোনারতরী, হিং টিং ছট্

(২) তোমার 'মাভৈঃ' মন্ত্র কভু তারে দিবে না অভয়।
—যতীন্দ্রমোহন, নীহারিকা, দেশবন্ধু

(৩) নদীপ্রান্তে তরুগুলি 'ঐ' দেখ আছে কান পেতে,
'ঐ' সূর্য্য চাহে শেষ 'চাওয়া'।
—রবীন্দ্রনাথ, মহুয়া, মিলন

(৪) 'অপ্রগল্‌ভা' ধরিত্রী-সে প্রণামে লুণ্ঠিত।
—ঐ, ঐ, লগ্ন

(৫) হে ধরণী, কেন প্রতিদিন
তৃপ্তিহীন
'একই' লিপি পড়ো ফিরে ফিরে?
—রবীন্দ্রনাথ, পূরবী, লিপি

(৬) 'যুগান্তরের' ব্যথা প্রত্যহের ব্যথার মাঝারে
মিলায় অশ্রুর বাষ্পজাল।
—ঐ, ঐ, অতীত-কাল

(৭) তাপস নিঃশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে 'দাও উড়ায়ে',
'বৎসরের' আবর্জ্জনা দূর হ'য়ে যাক্।
—রবীন্দ্রনাথ, নটরাজ (বনবাণী), বৈশাখ-আবাহন

শুধু 'অক্ষর' গুণে হিসাব রাখতে গেলে দেখা যাবে উৎকট, চাওয়া, অপ্রগল্‌ভা, একই, দাও উড়ায়ে, বৎসরের প্রভৃতি জায়গায় 'অক্ষর' সংখ্যা প্রয়োজনের চেয়ে বেশী আছে। পক্ষান্তরে হিং, টিং, মাভৈঃ, ঐ, যুগান্তরের প্রভৃতি জায়গায় অক্ষর-সংখ্যা প্রয়োজনের চেয়ে কম আছে। অথচ ছন্দ যে সর্ব্বত্রই ঠিক আছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এর থেকে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হচ্ছে যে, সাধারণ পয়ার-জাতীয় ছন্দের ধ্বনি পরিমাণ আসলে অক্ষর-সংখ্যার উপর নির্ভর করে না, করে ধ্বনি-সমাবেশ রীতির উপর। বস্তুতই ধ্বনি-বিচারহীন নিছক অক্ষর সংখ্যার দ্বারা কোনো ছন্দই কখনও নিয়ন্ত্রিত হ'তে পারে না। উপরের দৃষ্টান্তগুলিতে 'চাওয়া' এবং 'একই' শব্দ-দুটিতে দৃশ্যত' তিনটি ক'রে 'অক্ষর' থাকলেও ধ্বনি-বিচারে এ-দুটিতে মাত্র দুটি ক'রে সিলেব্‌ল্ পাওয়া যাবে। আর অন্য সর্ব্বত্রই সংশ্লিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনির সমাবেশের দ্বারাই ছন্দ নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। কিন্তু ধ্বনি-সমাবেশের সঙ্গে অক্ষর সাজানোর কোনো অচ্ছেদ্য সম্পর্ক নেই। তাই অক্ষর-সংখ্যা কম বা বেশী হ'লেও ছন্দের ধ্বনি-পরিমাণ অব্যাহত থাকতে পারে। যাহোক্, এখন দেখা যাক্ যৌগিক অর্থাৎ সাধারণ পয়ার-জাতীয় ছন্দে সংশ্লিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনির সংস্থাপনে কবিরা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে কি কি নিয়ম পালন ক'রে থাকেন। পূর্ব্বেই বলেছি এ ছন্দের কোনো নিয়মই অতি নির্দ্দিষ্ট বা অলঙ্ঘনীয় নয়। তাই যথাক্রমে দৃষ্টান্তযোগে নিয়মগুলি উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে নিয়মের ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্তও দেখিয়ে যাব।—

(১) শব্দান্তবর্ত্তী মৌলিক যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ প্রায় সর্ব্বত্রই বিশ্লিষ্ট। যথা—শরৎ, পুণ্যবান, মুস্কিল, কাগজ, সাবান, চেয়ার, বাতাস, স্বয়ং, বরং, ভড়ং ইত্যাদি শব্দের অন্তিম যুগ্মধ্বনিটি বিশ্লিষ্ট এবং তার ধ্বনিমূল্যও দ্বিগুণ। শব্দান্তস্থিত বিসর্গ বাংলায় প্রায় সর্ব্বদাই অনুচ্চারিত অর্থাৎ silent থেকে যায়; কাজেই শব্দের অন্তিম বিসর্গটি শুধু যৌগিক ছন্দেই নয় পরন্তু বাংলা ছন্দের সকল শাখাতেই অগ্রাহ্য হ'য়ে থাকে। যথা—

হে মাতঃ বঙ্গ শ্যামল অঙ্গ ঝলিছে অমল শোভাতে
—রবীন্দ্রনাথ, কল্পনা, শরৎ

এখানে 'মাতঃ' শব্দের বিসর্গটি স্পষ্টতই অগ্রাহ্য হয়েছে। তেমনি বিধাতঃ, পুনঃপুনঃ, পদতঃ, দক্ষঃ, বক্ষঃ, বশতঃ প্রভৃতি বহু শব্দেরই অন্তিম বিসর্গটি বাংলা ছন্দের সকল শাখাতেই কার্য্যত' বিলুপ্ত ব'লেই গণ্য হ'য়ে থাকে। সেই জন্যই ও-সব শব্দের অন্তিম ধ্বনিটিকে যুগ্মধ্বনি ব'লেই গ্রাহ্য করা যায় না।

(১-ক) বহু শব্দের অন্তস্থিত মৌলিক অকার (কিংবা অন্য কোনো স্বরবর্ণ) বাংলায় লুপ্ত হ'য়ে যাওয়াতে শব্দান্তে যুগ্মধ্বনির উৎপত্তি হয়েছে। তা-ছাড়া, ব্যঞ্জনবর্ণের লোপ প্রভৃতি অন্যান্য নানা কারণেও বাংলায় শব্দপ্রান্তিক যুগ্মধ্বনি উৎপন্ন হয়েছে। এ সমস্ত লুপ্ত-স্বরান্ত বা তদ্ভব শব্দের অন্তস্থিত যুগ্মধ্বনির উচ্চারণও প্রায় সর্ব্বদাই বিশ্লিষ্ট ব'লে গণ্য হ'য়ে থাকে। যথা—জল, গাছ, হাত, আলোক, বন্ধন, অবসান, আকর্ষণ, অতিথ (=অতিথি), চার (=চারি), সার (=সারি), পাশ (=পার্শ্ব), নাই (=নাহি), নয় (=নহে), কয় (=কহে), সই (=সখী), দই (=দধি), বউ (=বধূ) ইত্যাদি।

(১-খ) মৌলিক, লুপ্তস্বরান্ত কিংবা অন্য প্রকারে উৎপন্ন একস্বর (অর্থাৎ Monosyllabic) শব্দের যুগ্মধ্বনিটিকেও শব্দপ্রান্তিক ব'লেই গণ্য করতে হয়। যথা—সৎ, দিক্, ট্রেন্, নথ, ঢেউ, ছাই, ঐ, সং, ঢং, হিং টিং, ছিঃ, বাঃ; ফল, প্রাণ, ঘট; সই, দৈ-দই, বৌ-বউ, দুই;

নাই, আজ ইত্যাদি শব্দের যুগ্মধ্বনিটি বিশ্লিষ্ট, সুতরাং এদের ধ্বনিমূল্যও সাধারণত' দ্বিগুণ হ'য়ে থাকে।

সাধারণ পয়ার-জাতীয় ছন্দে প্রতিপর্ব্বে শব্দ সমাবেশেরও কতগুলি রীতি লক্ষ্য করা যায়। এস্থলে আমরা সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হব না। তবে সংক্ষেপে এটুকু বলা দরকার যে, এ ছন্দে সাধারণত' কোনো শব্দের মধ্যে ছেদ থাকে না অর্থাৎ এ ছন্দে কোনো শব্দকে সাধারণত' দ্বিধা-বিভক্ত করা হয় না। তেমনি এ ছন্দে দুটি স্বতন্ত্র শব্দকেও সাধারণত' সংযুক্তভাবে উচ্চারণ করা হয় না, বরং প্রত্যেক শব্দই যাতে পরস্পর থেকে বিযুক্ত ও স্বতন্ত্র থাকে এ ছন্দে সে রকম প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, (অবশ্য অযুগ্ম একস্বর শব্দ প্রায় সর্ব্বদাই কোনো না কোনো শব্দের সঙ্গে সংলগ্ন হ'য়ে থাকে)। কেন না এ ছন্দ মূলত' গদ্যধর্ম্মী, তাই গদ্যের ন্যায় এ ছন্দেও প্রায় প্রত্যেক শব্দকেই স্বতন্ত্র ভাবে উচ্চারণ করতে হয়। আর এই জন্যই এ ছন্দে শব্দপ্রান্তিক যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ প্রায় সর্ব্বদাই বিশ্লিষ্ট। শব্দপ্রান্তিক যুগ্মধ্বনির বিশ্লিষ্ট উচ্চারণের দ্বারা প্রত্যেক শব্দের স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয় ও শব্দগুলি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। আর শব্দপ্রান্তিক যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ সংশ্লিষ্ট হ'লে পরস্পর দুটি শব্দের একত্র সংযুক্ত হ'য়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। এভাবে দুটি স্বতন্ত্র শব্দের পারস্পরিক সংযোগ ঘটলে একরকম নূতন ধরণের বর্ণসংঘাত উপস্থিত হয় এবং তার ফলে একটি নতুন ছন্দ-ভঙ্গী দেখা দেয়। এই ধরণের বর্ণসংঘাত ও এই ছন্দ-ভঙ্গীটি হচ্ছে স্বরবৃত্ত অর্থাৎ প্রাকৃত ছন্দের বিশেষত্ব। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্।

আজ বসন্তে বিশ্বখাতায়
হিসেব নেইক পুষ্পে পাতায়।

—রবীন্দ্রনাথ, ক্ষণিকা, অতিবাদ

এখানে "আজ্ বসন্তে" কথা-দুটি পরস্পরের সঙ্গে কিরূপ সংলগ্ন হ'য়ে গেছে এবং 'আজ' শব্দের হসন্ত জ্ 'বসন্ত' শব্দের ব-য়ের উপর আছাড় খেয়ে প'ড়ে কিরূপ বর্ণসংঘাতের সৃষ্টি করেছে তা লক্ষ্য করার বিষয়। কিন্তু সাধারণ পয়ার-জাতীয় ছন্দে সাধারণত' এ রকম শব্দ-সংযোগ ও বর্ণ-সংঘাত দেখা যায় না। কারণ এ ছন্দে শব্দপ্রান্তিক যুগ্মধ্বনির বিশ্লিষ্ট উচ্চারণের ফলে শব্দগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন থেকে যায়। উপরের দৃষ্টান্তটিতে 'আজ্' এই যুগ্মধ্বনিটিকে যদি টেনে বিশ্লিষ্ট ক'রে উচ্চারণ করা যায় তাহ'লে ওই শব্দদ্বয়ের মধ্যে সংযোগ বা সংঘাতের কোনো সম্ভাবনাই থাকবে না। এইটেই যৌগিক ছন্দের রীতি এবং অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

পূর্ব্বেই বলেছি পয়ার-জাতীয় ছন্দের কোনো নিয়মই অতিনির্দ্দিষ্ট বা অলঙ্ঘনীয় নয়। তাই আমাদের কাব্য-সাহিত্যে পয়ার ছন্দের উক্ত অন্যতম প্রধান নিয়মটিরও ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

দীনেরে মাভৈঃ ব'লে যেমন সে ডেকে নিয়ে যায়
অন্ধকার অজানায়।

—রবীন্দ্রনাথ, পূরবী, সমাপন

এখানে 'ভৈঃ' যুগ্মধ্বনিটি সাধারণ রীতি অনুসারেই ডবল ধ্বনিমূল্য পেয়েছি। কিন্তু—

মুক্তি-সাধনার পথে তোমার ইঙ্গিতে
মাভৈঃ বাজে নৈরাশ্য-নিশীথে।

—রবীন্দ্রনাথ, পরিশেষ, দুয়ার

এখানে 'মাভৈঃ' কথাটিতে ধ্বনি-সঙ্কোচ ঘটেছে, তাই কথাটির মূল্যহ্রাসও হয়েছে। যদি লেখা হ'তো

মাভৈঃ বাজিছে ঐ নৈরাশ্য-নিশীথে

তাহ'লে 'মাভৈঃ' কথায় ধ্বনি-প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে মূল্য বৃদ্ধিও ঘট্‌ত। পূর্ব্বেই বলেছি শব্দপ্রান্তিক যুগ্মধ্বনির প্রসারণই পয়ার-ছন্দের সাধারণ রীতি, ও-রকম ধ্বনির সঙ্কোচন এ ছন্দের প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম। যাহোক্, এ-রকম ব্যতিক্রমের আরেকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্।—

রসের আবেশ রাশি শুষ্ক করি 'দাও' আসি',
আনো, আনো, আনো তব প্রলয়ের শাঁখ।
* * * *
তাপস নিঃশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে 'দাও' উড়ায়ে,
বৎসরের আবর্জ্জনা দূর হ'য়ে যাক্।

—রবীন্দ্রনাথ, নটরাজ (বনবাণী), বৈশাখ-আবাহন

লক্ষ্য করার বিষয় এখানে 'দাও' শব্দটিকে দুই জায়গায় দুই রকম মূল্য দেওয়া হয়েছে। 'দাও" শব্দের যুগ্মধ্বনিটিকে

যৌগিক ছন্দের সাধারণ রীতি অনুসারে সর্ব্বদাই প্রসারিত করা হ'য়ে থাকে এবং ধ্বনিমূল্যও দ্বিগুণ দেওয়া হ'য়ে থাকে। এ দৃষ্টান্তটিতেও প্রথম 'দাও' শব্দে তাই করা হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় 'দাও' শব্দটিতে স্বরবৃত্ত বা প্রাকৃত ছন্দের কায়দায় ধ্বনিসঙ্কোচ ঘটানো হয়েছে। তাই তার ধ্বনিমূল্যও কম। "দাও উড়িয়ে" পর্ব্বটিতে স্বরবৃত্ত ছন্দের ভঙ্গীটি কেমন সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে তা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার যোগ্য। এ ভাবে শব্দপ্রান্তিক যুগ্মধ্বনিকে সঙ্কুচিত ক'রে পয়ার বা যৌগিক ছন্দে স্বরবৃত্ত ভঙ্গীর পূর্ব্ব ব্যবহারের দৃষ্টান্ত আমাদের কাব্য-সাহিত্যে এখনও খুবই কম। কিন্তু এভাবে স্বরবৃত্ত ভঙ্গীর পর্ব্ব প্রয়োগের দ্বারা যৌগিক ছন্দে বৈচিত্র্য সৃষ্টির সুযোগ এবং সম্ভাবনা যথেষ্টই রয়েছে। তাই এদিকে বাংলার কবিসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এবার যৌগিক ছন্দের দ্বিতীয় প্রধান নিয়মটির আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক্।—

(২) অ-সমাজবদ্ধ সংস্কৃত শব্দের মধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনি প্রায় সর্ব্বত্রই সংশ্লিষ্ট ও একব্যষ্টিক হয়। যথা—ভৈরব, কৌতুক, বন্দনা, চর্চ্চিত, চীৎকার, বৎসর, ভর্ৎসনা, প্রগল্ভ প্রভৃতি শব্দের মধ্যস্থিত যুগ্মধ্বনিটি প্রায় সর্ব্বদাই সঙ্কুচিত ভঙ্গীতে উচ্চারিত হয়, তাই এটি এক ব্যষ্টি অর্থাৎ এক unit-এর বেশি মূল্য পায় না। যথা—

(১) কুরচি, তোমার লাগি পদ্মেরে ভুলেছে অন্যমনা
যে-ভ্রমর, শুনি নাকি তারে কবি করেছে 'ভর্ৎসনা'
—রবীন্দ্রনাথ, বনবাণী, কুরচি

(২) কবিদল 'চীৎকারিছে' জাগাইয়া ভীতি
শ্মশান-কুক্কুরদের কাড়াকাড়ি-গীতি।
—রবীন্দ্রনাথ, নৈবেদ্য, যুগান্তর

(৩) 'বর্ষা' এলায়েছে তার মেঘময়ী বেণী।
—রবীন্দ্রনাথ, মানসী, সেকাল ও একাল

(৪) 'জ্যোৎস্না'-রাতে নিভৃত মন্দিরে
প্রেয়সীরে
যে-নামে ডাকিতে ধীরে ধীরে।
—রবীন্দ্রনাথ, বলাকা, শা-জাহান

(৫) তাই বসন্তের ফুল
নাম-ভুলে-যাওয়া
প্রেয়সীর নিঃশ্বাসের হাওয়া
'যুগান্তর'-সাগরের দ্বীপান্তর হ'তে বহি' আনে।
—রবীন্দ্রনাথ, পূরবী, অতীত কাল

এই দৃষ্টান্তগুলিতে ভর্ৎসনা, চীৎকারিছে, বর্ষা, জ্যোৎস্না, যুগান্তর প্রভৃতি শব্দের অন্তর্গত যুগ্মধ্বনিটি উচ্চারণে সংশ্লিষ্ট, তাই তার ধ্বনিমূল্যও এক ব্যষ্টি।

এ নিয়মটি হচ্ছে পয়ার ছন্দের দ্বিতীয় প্রধান নিয়ম, আর এ নিয়মের দ্বারা ছন্দের ধ্বনিবৈশিষ্ট্যও অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়। এ ছন্দে শব্দের মধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনিকে উচ্চারণ করতে হয় ঠেসে সংশ্লিষ্ট ক'রে, আবার শব্দের অন্তস্থিত যুগ্মধ্বনিকে উচ্চারণ করতে হয় টেনে বিশ্লিষ্ট ক'রে। যুগ্ম-ধ্বনির এই দ্বিবিধ উচ্চারণের যোগে এ ছন্দে যে ধ্বনিতরঙ্গের উৎপত্তি হয় তার মূল্যও কম নয় এবং তারই ফলে এ ছন্দের গতি হয় মন্থর ও তরঙ্গিত, আর তার ধ্বনিও হয় গম্ভীর। আর ধ্বনির গাম্ভীর্য্য ও তার গতির মন্থরতা যে যৌগিক ছন্দের একটি বিশেষ গুণ সে-কথা সর্ব্বজন বিদিত।

যাহোক, আমরা দেখেছি যৌগিক ছন্দের প্রধানতম নিয়মটির অর্থাৎ আমাদের আলোচিত প্রথম নিয়মটিরও ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত আছে। সুতরাং আমাদের আলোচ্যমান এই দ্বিতীয় নিয়মটিরও যে ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত থাক্‌বে তা বিচিত্র নয়। কেন না, এ ছন্দের প্রথম নিয়মটির ন্যায় এই দ্বিতীয় নিয়মটিও অলঙ্ঘনীয় নয়। এবার ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্।

(১) "আহা আহা" 'চীৎকার' করি' রঘুনাথ
ঝাঁপায়ে পড়িল জলে বাড়ায়ে দুহাত;
আগ্রহে সমস্ত তার প্রাণ মন কায়
একখানি বাহু হ'য়ে ধরিবারে ধায়!
—রবীন্দ্রনাথ, কথা ও কাহিনী, নিষ্ফল উপহার

(২) সংসারের দশদিশি ঝরিতেছে অহর্নিশি
ঝর ঝর 'বর্ষার' মতো—
ক্ষণ-অশ্রু ক্ষণ-হাসি পড়িতেছে রাশি রাশি
শব্দ তার শুনি অবিরত।
—রবীন্দ্রনাথ, সোনার তরী, বর্ষাযাপন

(৩) 'জ্যোৎস্না' ডালের ফাঁকে
হেথা আল্পনা আঁকে
এ নিকুঞ্জ জানো আপনার।
—রবীন্দ্রনাথ, বনবাণী, চামেলী-বিতান

(৪) 'যুগান্তরের' ব্যথা প্রত্যহের ব্যথার মাঝারে
মিলায় অশ্রুর বাষ্পজাল।
—রবীন্দ্রনাথ, পূরবী, অতীত কাল

পূর্ব্বের দৃষ্টান্তগুলিতে দেখেছি চীৎকার, বর্ষা, জ্যোৎস্না, যুগান্তর প্রভৃতি শব্দের অন্তর্গত যুগ্মধ্বনিগুলি সংশ্লিষ্ট ও একব্যষ্টিক। এইটেই হচ্ছে পয়ার ছন্দের সাধারণ নিয়ম। কিন্তু উপরের দৃষ্টান্তগুলিতে দেখ্‌ছি এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে। অর্থাৎ বর্ষা, জ্যোৎস্না, চীৎকার, যুগান্তর, প্রভৃতি শব্দের মধ্যস্থিত যুগ্মধ্বনিগুলির উচ্চারণে বিশ্লিষ্ট হয়েছে আর তাই ধ্বনিমূল্যও পেয়েছে দ্বিগুণ। এভাবে শব্দমধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনিকে বিশ্লিষ্ট ক'রে দ্বিগুণ মূল্য দেওয়া মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বিশেষ নিয়ম। সুতরাং এ দৃষ্টান্তগুলিতে যে ব্যতিক্রম ঘটেছে তাকে বলতে পারি মাত্রাবৃত্ত ভঙ্গীর ব্যতিক্রম। আমরা দেখেছি এ ছন্দের প্রথম নিয়মটির ব্যতিক্রম ঘটাতে হয় স্বরবৃত্তের কায়দায়, আর এখন দেখলুম এর দ্বিতীয় নিয়মটির ব্যতিক্রম ঘটাতে হয় মাত্রাবৃত্তের কায়দায়। উভয় প্রকার ব্যতিক্রমের দ্বারাই যৌগিক বা সাধারণ পয়ার-জাতীয় ছন্দে যথেষ্ট বৈচিত্র্য সৃষ্টি করবার সুযোগ সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এই সম্ভাব্যতার প্রতি কবিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

(২-ক) যে-সকল অ-সংস্কৃত মধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনিকে যুক্তাক্ষরের সাহায্যে প্রকাশ করাই সাধারণ রীতি, যৌগিক ছন্দে সে সকল শব্দের মধ্যস্থিত যুগ্মধ্বনিও প্রায় সর্ব্বত্রই সংশ্লিষ্ট ও একব্যষ্টিক হয়। যথা—কান্না, গিন্নি, গল্প, ঠাণ্ডা, রাস্তা, জব্দ, লম্বা, বেঞ্চি, ইঞ্চি, দিব্যি, ইস্তফা, ওস্তাদি, বিস্তর, মাষ্টার, বারান্দা ইত্যাদি, যথা—

'কান্না' আর হাসি
এক বীণাতন্ত্রী তারে একই গানে উঠিছে উচ্ছ্বাসি'।
—রবীন্দ্রনাথ, পরিশেষ, যাত্রী

এখানে 'কান্না' শব্দকে সাধারণ রীতি অনুসারেই দুই ব্যষ্টির মূল্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু,—

রাণি কেঁদে বলে, "তবে,
শুধু কি রইবে বাকী 'কান্নার' খেলা ?"
—ঐ, ঐ, খেলনার মুক্তি

এখানে 'কান্না' শব্দের যুগ্মধ্বনিটি বিশ্লিষ্ট, তাই 'কান্না' শব্দটি এখানে তিন ব্যষ্টির মূল্য পেয়েছে। মনে রাখা উচিত এটি হচ্ছে এ ছন্দের সাধারণ রীতির ব্যতিক্রম এবং এরকম ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত আমাদের সাহিত্যে খুব কমই আছে। তাই এরকম ব্যতিক্রমের প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত। কেন না, আজ যে সমস্ত ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত খুবই বিরল এক সময়ে সে-সমস্ত ব্যতিক্রমকে অবলম্বন করেই নবতর ছন্দরীতির প্রবর্ত্তন হ'তে পারে।

(২-খ) যে-সকল অ-সংস্কৃত শব্দের যুগ্মধ্বনিটি যুক্তাক্ষরের সাহায্যে লিখিত হয় না, পরন্তু বিযুক্তাক্ষরের সাহায্যেই লিখিত হ'য়ে থাকে, সে-সব শব্দের মধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনিটি সাধারণতঃ বিশ্লিষ্ট ও দ্বৈব্যষ্টিক ব'লেই গণ্য হ'য়ে থাকে, কিন্তু স্থলবিশেষে প্রায়শ বিকল্পে সংশ্লিষ্ট ও হ'তে পারে। যথা—চিমনি, বোল্‌তা, পাত্‌লা, টাট্‌কা, টুক্‌রা, বাদ্‌শাহ, খবরদার, মসজিদ, আল্‌কাত্‌রা ইত্যাদি। এসব শব্দের মধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনিটি মৌলিক অর্থাৎ মূল শব্দেরই অন্তর্গত। কিন্তু আরেক শ্রেণীর শব্দ আছে যার মধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনিটি মৌলিক নয়, গৌণত' উৎপন্ন। মূল শব্দের মধ্যস্থিত কোনো স্বরবর্ণের লোপ কিংবা অন্য কোনো প্রক্রিয়ার ফলে এই শ্রেণীর যুগ্মধ্বনির সৃষ্টি হয়। যথা—যজমান, পাগলামো, ঘটকালি, ডমকালো, চাকরি, রেশমি, আলতা (অকার লুপ্ত); মাতলামি, সামলানো (আকার লুপ্ত); নারকেল, আলপনা, মাসতুতো, হামবার, কঁদলো, উঠতো (ইকার লুপ্ত); আগলানো, বাদলাই, ঠাকরুণ (উকার লুপ্ত)। এসব শব্দ মধ্যবর্ত্তী গৌন যুগ্মধ্বনিকে সাধারণত' যুক্তাক্ষরের সাহায্যে প্রকাশ করা হয় না; পরন্তু এসব যুগ্মধ্বনিকে বিযুক্ত অক্ষরের দ্বারা প্রকাশ ক'রে ওসব শব্দের মধ্যবর্ত্তী বিলুপ্ত স্বরবর্ণটির ক্ষীণ স্মৃতিকে কোনো মতে রক্ষা করা হয়। এজন্যেই পাগলামো, সাম্লানো, আল্পনা, নার্কেল, চাক্রি, রেশ্মি, ঠাক্রুণ, মাস্তুত, ইত্যাদিরূপে ওসব শব্দের বর্ণ-বিন্যাস করা হয় না। শব্দ-মধ্যবর্ত্তী মৌলিক যুগ্মধ্বনি সম্বন্ধে কিন্তু একথা সর্ব্বত্র খাটে না। কতকগুলি মৌলিক যুগ্মধ্বনিকে যুক্তাক্ষরের সাহায্যেই প্রকাশ করা হয়। তা আমরা পূর্ব্বেই দেখেছি। যথা—গল্প, ঠাণ্ডা, রাস্তা, জব্দ। আবার কতকগুলি মৌলিক যুগ্মধ্বনিকে বিযুক্তাক্ষরের দ্বারা প্রকাশ করাই রীতি। যথা—টুক্‌রো, চশমা, আল্‌কাতরা। এসব শব্দকে কখনো টুক্রো, চশ্মা, আল্কাত্রা এভাবে লেখা হয় না। মনে রাখা দরকার যে আমরা এস্থলে অ-সংস্কৃত শব্দের মধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনির কাই আলোচনা করছি।

(আগামী সংখ্যায় শেষ)

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

'পিছন-ডাকে'

শ্রীঅনিলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ,

যাবার বেলা,
কাজল কালো,
ছুইটি আঁখি,
কেনরে আজি
  পিছন ডাকে ?

রাহুর মত
অশুভ দিঠি
পথের 'পরে
আগুন সম ;
  বিছায়ে রাখে !

পথের মাঝে
বকুলরাশি,
পড়িছে ঝরি,
নিশাসে মম,
  আগুন সম ;

আকাশে বাজে
দিবস রাতে,
প্রণয়-বাণী
গীতের সুরে—
  'হে প্রিয়তম' !

সরসী জলে,
নিজেরি ছায়া
হেরিয়া আজি
চমকি উঠি,
  কি যেন ভাবি'

অগাধ জলে,
মরণে জিনি,
কেন যে তারে
আবেগ ভরে
  ধরিতে নাবি !

মনের মাঝে
হতেছে মনে
আজিকে যেন
বিফল বাহু
  পথের বাঁকে,

কাতর মনে
পরশহারা
রোধিতে গতি
মৃণাল সম,
  জড়ায়ে থাকে ।

উদাস স্বরে,
পাহাড়-গুহা,
উঠিলে ধ্বনি
সিংহ সম
  নিজেরি ডাকে—

মনেতে ভাবি,
হারায়ে পথ,
শালের বনে,
প্রেয়সী মম,
  ফুকারি হাঁকে !

কোকিল বঁধূ
রঙিন চোখে,
আমের শাখে,
লুকায়ে রহি'—
  মুকুল ঝারে

আমার আঁখি
সে চোখে হেরি'
ভরিয়া ওঠে
সহসা আজি
  জলের ভারে !

দিকের শেষে—
পারের খেয়া
আপন মনে
কি জানি কেন
  বহিতে থাকে

উদাস মন
ফুকারি কাঁদে,
হেলিত চোখে—
বুঝিতে পুনঃ
  চেনেনি যাকে !
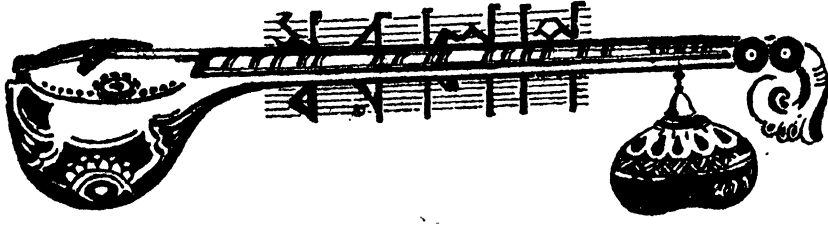
দূরের বন্ধু সুরের দূতীরে
পাঠালো তোমার ঘরে।
মিলন বীণা যে হৃদয়ের মাঝে
বাজে তব অগোচরে।
মনের কথাটি গোপনে গোপনে
বাতাসে বাতাসে ভেসে আসে মনে
বনে উপবনে।
বকুল শাখার চঞ্চলতায় মর্ম্মরে মর্ম্মরে ॥

পুষ্পমালার পরশ পুলক
পেয়েছে বক্ষতলে।
রাখ তুমি তারে সিক্ত করিয়া
সুখের অশ্রুজলে।
ধরো সাহানাতে মিলনের পালা
সাজাও যতনে বরণের ডালা
মালতীর মালা অঞ্চলে ঢেকে
কনক প্রদীপ
আনো তব পথ পরে ॥

"শাপমোচন"

কথা ও সুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শান্তিদেব ঘোষ

I [দপা -া গা মা] ||
I গমা -া গা মা । পদা দা পা -া I মা পা পা পা । পদা দা মা গা I
দু • রে র ব• ন্ ধু • সু রে র দূ তী • • রে পা

I গা মা গা ঋা । গা -া মা মা I গমা -া মা পা । গা মা পা দা I
ঠা • লো তো মা • • র ঘ • • রে • • • • •

I পা -া গা মা । পদা দা পা -া I পা পর্সা না র্সা । ঋর্া -া র্সা -া I
দূ • রে র ব• ন্ ধু • মি ল ন বী ণা • যে •

I না র্সা র্সঋর্া র্সা । ণা দা দা পা I পা দা দা ণা । -া -া -া -া I
হৃ দ য়ে র মা • ঝে • বা • জে • • • • •

I সা সা গা গা । মা মা -মা -পা II II
ত ব অ গো চ রে • •

II { পদা দা দা দা । মা -া র্সা -া I র্সঋর্া ঋর্া ঋর্া ঋর্া । র্সা না র্সা -া I
ম• নে র ক থা • টি • গো প নে গো গো প নে •

I দা দা দা দা । দা -া দজ্ঞর্া -া I র্সা ঋর্া জ্ঞর্া ঋর্া । র্সা ণা দা ণা I
বা তা সে বা তা • সে • • • • • • • • •

I র্সা সজ্ঞা´ জ্ঞা´ জ্ঞা´ । ঋা´ -া র্সা -া I ণা র্সা ঋা´ র্সা । ণা -া দা -া } I
ভে সে আ সে ম • নে • ব নে উ প ব • নে •

I দজ্ঞা´ জ্ঞা´ জ্ঞা´ জ্ঞর্রা । জ্ঞা´ -া -া জ্ঞা´ I রজ্ঞা´ জ্ঞা´ জ্ঞা´ র্রা । জ্ঞা´ -া -া -া I
ব• কু ল শা খা • • র চ ন্ চ ল তা • •• •

I জ্ঞর্মা´ জ্ঞর্মা´ মজ্ঞা´-ঋা´ । র্সা ণা দা পা I সা সা সা সা । সা দা দা দা II
• • • • • • • • • • ম র্ ম রে ম র ম রে

II সা -া সা সা । সা -পা -দা দা I পা পা মা মা । মা মা মা পা I
পু ষ্ প মা লা • • র প র শ পু ল ক পে •

I মা ণা ণদা -া । পা -া মা -পা I জ্ঞা -রা জ্ঞা -া । -মা -পা -দা -ণা I
য়ে • ছ • ব • ক্ষ • ত • লে • • • • •

I ণর্সা ণা দা পা । মা মা জ্ঞা -া I জ্ঞা -মা মা -পমা । জ্ঞা -রা জ্ঞা -া I
রা খ তু মি তা রে সি • ক্ত • ক • • রি • য়া •

I জ্ঞা -মা মা -জ্ঞা । সা -ঋা -মজ্ঞা-রজ্ঞা I ঋা -া সা -া । -া -া -া -া } I
সু • খে র অ • শ্রু • • • জ • লে • • • • •

I দা দা দা দা । না -া র্সা -া I ঋা´ -ঋা´ ঋা´ র্সা । না -া র্সা -া I
ধ র সা হা না • তে • মি ল নে র পা • লা •

I পদা দা দা দা । দা -া দজ্ঞা´ -া I -র্সা -ঋা´ -জ্ঞা´ -ঋা´ । -র্সা -ণা -দা -ণা I
সা জা ও য ত • নে • • • • • • • • •

I র্সা সজ্ঞা´ জ্ঞা´ জ্ঞা´ । ঋা´ -া র্সা -া I না র্সা ঋা´ র্সা । ণা -া ণা -দা I
ব র ণে র ডা • লা • মা ল তী র মা • লা •

I পা -ণা ণা ণদা । দা -া পা -দা I মপা পমা জ্ঞা রা । জ্ঞা -া -া রসা I
অ ন্ চ লে• ঢে • কে • ক ন• ক প্র দী • • প•

I সা -া সা -দা । -া -া -া -া I সা সা সা সা । সদা দা দা দা IIII
আ • লো • • • • • আ লো তা র প• থ প রে

দুঃখিত

শ্রীমতী বীণা ঘোষ

চা'য়ের টেবিলে তর্ক বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল—মেয়েদের বিবাহের বয়স লইয়া। বাঙ্গালী মেয়েরা কুড়ি পার না হইতেই বুড়ি হইয়া পড়ে এবং অতি সত্বরেই নাতি নাত্‌নী পরিবৃত হইয়া গঙ্গাযাত্রা করিয়া থাকে, ইহাই ছিল নরেন্দ্রনাথের প্রতিপাদ্য বিষয়। তাহাকে সমর্থন করিতেছিলেন গৃহস্বামী দেবীপ্রসাদ। নরেন্দ্রনাথ কিছুদিন পূর্ব্বে ইউরোপ ও আমেরিকা ঘুরিয়া অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া আসিয়াছে। সে বেশ জোরের সঙ্গেই বলিতেছিল,—"সেইত আপনাকে বল্‌ছি মিঃ ঘোষাল, যে আমাদের দেশে সব চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য হ'ল এই বিয়ে ব্যাপারটি। যে বয়সে ওদের দেশের মেয়েরা ফ্রক্ পরে' লাফিয়ে বেড়ায়, সে বয়সে আমাদের মেয়েরা দু'চারটি সন্তানের মা হ'য়ে পড়ে। জীবনের যা' কিছু আনন্দ ও আহ্লাদ তা' বিয়ের বেদীতে বিসর্জ্জন দিয়ে আমরা সনাতন ধর্ম্ম পালন করি। তা'র পর জীবনের যে কয়টি বছর পৃথিবীর আলোবাতাস ভোগ কর্ব্বার জন্য বাকী থাকে, সে কয়টি বছর জীবনের বিড়ম্বনা ও দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়েই কেটে যায়। এইত average বাঙ্গালী মেয়ের জীবন। কিন্তু দেখুন ওদের দেশের মেয়েদের জীবনে কত স্ফূর্ত্তি, কত কাজের উদ্দীপনা! এইত সে-দিন কাগজে দেখলুম,—দু'জন ঠাকুরমা পঁচাত্তোর বছর বয়সে স্কুলে যেয়ে ভর্ত্তি হয়েছেন বিদ্যাশিক্ষার জন্য। তা'রা নাকি বলেছেন যে ছেলেমেয়েরা সব যখন বড় হ'য়ে গেছে, সংসারের ঝঞ্ঝাট আর বেশী কিছু নেই তখন শান্তমনে বিদ্যাচর্চ্চায় বেশ আনন্দ আছে।"

চা'য়ের টেবিলে শ্রোতা ছিল আরও জন কয়েক। দেবীপ্রসাদের বড় মেয়ে নমিতা তর্কে বেশী কিছু বলিতেছিল না; তবে তাহার অনুভূতির সঙ্গে কথাগুলির বেশী অমিলও ছিল না। নরেন্দ্রনাথের শেষ কথায় সে হাসিয়া বলিল,—"এ কিন্তু মজা মন্দ নয়, নরেনবাবু। আমার ভারী ইচ্ছা হচ্ছে ঐ বুড়ি দু'টি কি ভাবে পড়াশুনা কচ্ছে তা'ই দেখে আসি। আমার বেশ মনে হয় ওরা প্রত্যেক দিন ক্লাশে বসে' বসে' ঝিমুবে এবং মাষ্টারের হাতে কানমলা না খেয়ে যা'বে না।"

নমিতার ছোট বোন সবিতা বলিল,—"আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, ওরা ছয় পেনীর সস্তাদামের উপন্যাস পড়ে' পড়ে' সারা বছর কাটিয়ে দেবে; যখন পরীক্ষার সময় আস্‌বে তখন প্রশ্নপত্র দেখে হয় কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বাড়ী ফিরবে অথবা হার্টফেল্ করে পটল তুল্‌বে।"

কথা শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিল। পরক্ষণেই নরেন্দ্রনাথ গম্ভীর ভাবে বলিল,—"আপনারা হাস্‌তে পারেন বটে, কিন্তু ঐ ব্যাপারটির পিছনে জীবনের যে কত বড় একটি আদর্শ রয়ে গেছে তা' যদি বুঝতেন তবে হয়ত বাঙ্গালী জীবনের দুর্ভাগ্য অনেকটা কমে যেত।"

নমিতা কৃত্রিম বিস্ময়ে বলিল, "সে কি?"

সবিতা গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল, "সে জাননা দিদি! জীবনের চিরতারুণ্য যা' গলে না টলে না, যা' স্পর্শমণির মত মানুষকে চিরদিন রঙীন আনন্দে মশ্‌গুল করে' রাখে,—যা' বুড়িদের জন্য নূতন করে' তরুণ বন্ধু সংগ্রহ করে' আনবে এবং হয়ত সংসারও পাতাবে।"

দেবীপ্রসাদ ধমক দিল,—"যা, যা' তোকে আর জ্যাঠামো কর্ত্তে হবে না। দেখ্‌ত আজের কাগজগুলো এখনো নিয়ে আস্‌ছে না কেন।"

সবিতা হাসিয়া উঠিয়া গেল।

এ বাড়ীতে দেবীপ্রসাদের অনেকগুলি ultra-modern ideas ছিল। সেগুলি সে নিজের পরিবারের মধ্যে

সময় অসময় প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হইত না। মেয়েদেরও সে সেই ভাবেই মানুষ করিয়া তুলিতেছিল; কিন্তু স্ত্রী মনোরমার জন্যই মেয়েরা ঠিক ষোল আনা রকম বিবিয়ানা শিক্ষা করিতে পারে নাই। মনোরমা লেখাপড়া শিখিয়াও বাঙ্গালী মেয়ের সহজ মাধুর্য্য ও ভীরুতাকে হারাইয়া ফেলে নাই। কাজেই দেবীপ্রসাদ যখন শঙ্কর বিবাহ বা বিধবা বিবাহের জয়গান করিত তখন মনোরমা বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে দ্বিধাবোধ করিত না। তাহাদের পারিবারিক জীবনে এইটুকু অসামঞ্জস্য থাকিলেও অশান্তি ছিল না। একটা স্বাধীন আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হইবার সুযোগ পাইয়া নমিতা ও সবিতার মানসিক বৃত্তিগুলি যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছিল তেমনই দেবীপ্রসাদের সঙ্গে তাহাদের একটি সহজ বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং তাহাদের মধ্যে দ্বিধাহীন ভাবে ভাব আদান প্রদানের পথে কোন বাঁধা ছিল না।

সবিতা চলিয়া গেলে দেবীপ্রসাদ সেই দিকে চাহিয়া বলিল,—"সবি'র মুখে যেন কিছুই বাজে না; ওর কল্পনায় কি যে আসে, কি যে আসে না তা'র কোন ঠিক ঠিকানা নেই। ওকে নিয়ে—"

নরেন্দ্র কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিল,—"এ কিন্তু খুব ভাল জিনিষ মিঃ ঘোষাল, জীবনের এই হাসি খুসী ভাবটি। এ মানুষকে চিরদিন আনন্দ দিতে পারে। এর কাছে অতুল ঐশ্বর্য্যও কিছু নয়।"

তাহার ভাবোচ্ছ্বাসে নমিতা একটু হাসিয়া বলিল,—"আসল কথাই কিন্তু ভুলে গেলেন নরেনবাবু। সেই যে বুড়িদের জীবনে কি এক বড় আদর্শের কথা বল্‌ছিলেন?"

নরেন্দ্রনাথ বলিল,—"ওঃ সে কথা এখনো ভুলেননি' দেখ্‌ছি। আমি বল্‌ছিলুম, মানুষের জীবনে যে শুধু নিজেদের ছোটখাট সুখ দুঃখ ও স্বার্থ নিয়েই চিরদিন ব্যস্ত থাক্‌তে পারা উচিত নয়, তা'র যে পশু পক্ষীর জীবনের সার্থকতার চেয়েও বড় এক সার্থকতা অর্জ্জন কর্‌বার আছে, সেই কি ওদের জীবনের উদ্দেশ্য নয়?"

এমন সময় সবিতা পর্দ্দা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিল। তাহার কানে দুই চারিটি কথা বোধ হয় গিয়াছিল। সে বলিল,—"আঃ আপনি বুঝি সেই বুড়ীদের নিয়ে এখনো বসে' আছেন। আমি কিন্তু মাইলখানিক এই সময়টুকুতে ঘুরে' এলুম। বাবা, বৈজু কাগজ দিয়ে যায় নি'? আজ কিন্তু এক মজার খবর কাগজে আছে, তা' যদি আবিষ্কার কর্ত্তে পারেন, নরেনবাবু, এক বাক্স লজেন্স আমি উপহার দেব। নেবেন ত?"

ইতিমধ্যে কাগজ পৌছিয়া গিয়াছিল। সকলেই কাগজ লইয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিল। সবিতার কথায় কেউ তেমন মনোযোগ দিল না। নমিতা ইসারায় সবিতাকে কাছে ডাকিয়া কাগজের একটি অংশ দেখাইয়া বলিল,—"এই কি?" সবিতা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না। তবু সে মজা করিবার জন্য পড়িয়া গেল। সংবাদটির মধ্যে অনেকখানি নূতনত্ব ছিল।

টিনেভেলিতে এক রমণীর স্বামী অনেক বছর আগে সন্ন্যাসী হইয়া সংসারের সঙ্গে নন্‌কোপারেশন করিয়াছিল। স্ত্রীটি কিন্তু অর্দ্ধ ডজন ছেলে পিলে লইয়া স্বামীর মত অসহযোগী হইতে পারে নাই। কাজেই ঝড় ঝাপ্‌টা অনেক সহ্য করিতে করিতে সুদীর্ঘ দশটি বছর সংসারকেই আকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে হইয়াছিল। পরে একদিন কোন মেলায় এক সন্ন্যাসীকে দেখিয়া রমণীর বিশ্বাস হইল যে এই তাহার স্বামী। তখন সে ছেলেমেয়ে সহ সাতদিন পর্য্যন্ত তাহার পিছনে পিছনে ঘুরিল। কিন্তু সন্ন্যাসী তাহাকে পত্নী বলিয়া ও ছেলেমেয়েদের আপনার সন্তান বলিয়া স্বীকার করিল না। অনেক কাকুতি মিনতি ও ভয় প্রদর্শন—কিছুই সন্ন্যাসীকে "হাঁ" বলাইতে পারিল না। স্নেহের অত্যাচার সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া সন্ন্যাসী একবার পলাইতেও প্রয়াস পাইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে তাহার মুক্তির পথই বন্ধ হইয়া গেল। গ্রামের লোক সবাই মিলিয়া চাঁদা করিয়া পাহারা বসাইল। ফলে সন্ন্যাসী উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়া নিজের মুক্তির পথ পরিষ্কার করিয়া লইল। গ্রামবাসীরা এবারও ঘটা করিয়া তাহার দাহ করিল এবং চাঁদা করিয়া রমণীকে শ্রাদ্ধের আয়োজন করিয়া দিল।

ঘটনাটি মোটামুটি ইহাই। সবিতা বলিল,—"দেখ্‌লেন মজার ব্যাপার। কার বা স্বামী, কি বা কাণ্ড, আর

পুড়্‌লই বা কে, আবার শ্রাদ্ধই বা কর্‌ল কে! এখন বলুন ত, নরেনবাবু, সন্ন্যাসী ঠাকুরটির স্থিতি কোথায় হ'বে?"

নরেন্দ্রনাথ বলিল,—"অক্ষয় স্বর্গ ভোগই ওর অদৃষ্টে লেখা আছে। সে যে প্রলোভন ত্যাগ কর্ত্তে পেরেছে, তা'তে স্বর্গ হ'তে রথই বা নেমে এসেছিল।"

কিন্তু পরক্ষণেই কৌতুকাবিষ্ট স্বরটি নামাইয়া বলিল,—"দেখুন মিঃ ঘোষাল, ভারতবর্ষের নারীদের একান্ত অসহায়তাই কি এরূপ ঘটনার কারণ নহে? ঐ রমণীটি যদি এত অল্প বয়সেই বিয়ে না কর্‌ত এবং ছয়টি ছেলে মেয়ের মা না হ'ত তবে স্বামীর উপর নির্ভর করবার ত তা'র কোন দরকারই ছিল না। সে যে শুধু নারী নয়, মানুষও বটে—সেই অনুভূতি থেকে সে যে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হয়েছে। সেই জন্যই ঐরূপ নাটকীয় একটি ঘটনা টিনেভেলিতে হ'তে পেরেছে। বিদেশীরা এ ব্যাপারটি যখন শুন্‌বে তখন তারা ভারতের সামাজিক প্রথাকে ঠিক শ্রদ্ধার চক্ষে দেখ্‌বে না বোধ হয়।"

সবিতা বাধা দিয়া বলিল,—"কবেই বা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেছে তারা? কিন্তু সে যাক্, সেজন্য আপনার রাত্রে অনিদ্রা না হ'লেই ভাল হ'বে। এখন ঐ সন্ন্যাসী ঠাকুর ত পৃথিবীর বুকে এক নাটকের নায়ক হিসাবে মন্দ অভিনয় করে' গেল না, কিন্তু পরকালে কি কচ্ছেন আপনার মনে হয়?"

নরেন্দ্রনাথ একটু কৃত্রিম উষ্মা প্রকাশ করিয়া কহিল,—"দেখুন, আপনি ব্যাপারটিকে এত ছোট করে দেখ্‌ছেন বলে' আমি দুঃখিত। আর আমি Spiritualist বা Theosophist নই, কাজেই আপনার উত্তর দিতে আমি অসমর্থ।"

সবিতা হাসিয়া বলিল,—"তবে আমার কাছে শুনুন। আপনি বোধ হয় জানেন না যে ভূশুণ্ডীর মাঠ নামে একটি জায়গা আছে। সেইখানে মরণের পর সন্ন্যাসী ঠাকুরের মত লোকদের স্থান হয়। এখন সেই জায়গাটিতে নিশ্চয়ই আর একটি নাটকীয় অভিনয় সুরু হ'য়েছে। এই স্থানটির আবিষ্কর্ত্তা বা প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন পরশুরাম।"

নরেন্দ্রনাথ বলিল,—"না, সে জায়গার কোন খবরই আমি রাখিনে। পুরাণ শাস্ত্রের সঙ্গে আমার পরিচয় অতি সামান্যই কিনা।"

সকলেই উচ্চরবে হাসিয়া উঠিল। দেবীপ্রসাদ বলিল,—"আপনি বোধ হয় পরশুরামের "গড্ডালিকা" বইখানি পড়্‌বার সুযোগ পাননি' মিঃ মুখার্জ্জি। সবির কল্পনার দৌড়ের কথা আর বল্‌বেন না। সে আপনাকে জব্দ করেছে বটে।"

নমিতা বলিল,—"কিন্তু আমি যে এই মজার খবর বের কর্‌ল্ম সেজন্য সবি'র লজেন্সের বাক্স কি আমার প্রাপ্য নয়?"

সবিতা বলিয়া উঠিল,—"এ ত সে খবর নয়।"

খবরটি সে নরেন্দ্রনাথের সম্মুখে খুলিয়া দেখাইল। নরেন্দ্রনাথ পড়িয়া বলিল,—"হাঁ, এ একটি খবর বটে মিঃ ঘোষাল। আপনি বোধ হয় খুসী না হ'য়ে পার্ব্বেন না বাঙ্গালা দেশের প্রগতির ধারা দেখে। একজন হিন্দু আই, সি, এস্, এইমাত্র জাহাজ থেকে নেমেছেন, বয়স ২৩, হিন্দু সমাজের যে কোন সম্প্রদায়ের কন্যার পিতাদের কাছ থেকে বিয়ের প্রস্তাব আহ্বান করেছেন।"

দেবীপ্রসাদ Matrimonial বিজ্ঞাপনটির উপর একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া কহিলেন,—"বাঙ্গালা দেশে এইরূপ বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন যে-দিন ফুরিয়ে যাবে, সেইদিন সত্যিকার হিন্দু সমাজ গড়ে উঠবে—আমার বিশ্বাস। এই আই, সি, এস্, ছেলেটি যে সাহস করে এতটা আশা কর্ত্তে পেরেছে সেজন্য তাকে অভিনন্দন দেওয়া উচিত।"

সবিতা বলিয়া উঠিল,—"হাঁ অভিনন্দন ত দেওয়াই উচিত। আমার মনে হয় ওর উপর Celebacyর অর্ডিনান্স জারী ক'রে ওকে Monasteryতে বন্ধ করে রাখা দরকার। বাছাধন হয়ত হাড়িডোমের ছেলে, বিয়ে কর্ত্তে চাচ্ছেন আবার ব্রাহ্মণ কায়স্থের মেয়ে। নিজেদের দলে ত আর মেয়ে জোটে না।"

নরেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিল,—"আপনি বড্ড নিষ্ঠুর সমালোচক মিস্ ঘোষাল। যিনি advertise করেছেন তিনি হয়ত সত্যি হাড়ী-ডোম নাও হ'তে পারেন। বিজ্ঞাপনটি হয়ত তাঁ'র liberal ideasরই পরিচয় দিচ্ছে।"

দেবীপ্রসাদ বলিলেন,—"সবি'র কথা হয়ত অনেকটা

ঠিক, কারণ ব্রাহ্মণ কায়স্থ বা বৈশ্য হ'লে ছেলেটির বিয়ের জন্য বিজ্ঞাপন দিতে হ'ত না। তা'হ'লেও ছেলেটির উদ্যম প্রশংসনীয় এবং আমার বিশ্বাস সে হয়ত এ উদ্যমে কৃতকার্য্যও হ'তে পার্ব্বে।"

নমিতা হঠাৎ উঠিয়া মনোরমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল,—"আজ না মেসোমশাই'র বাড়ী যাওয়ার কথা ছিল মা। সবি'ত যাবেই না, যে গল্পের গন্ধ পেয়েছে। চল মা আমরাই প্রস্তুত হ'য়ে নেই গিয়ে।"

মনোরমা অনেকটা অনিচ্ছা সত্ত্বে নমিতার সঙ্গে উঠিয়া গেলেন। সবিতা বলিতে লাগিল,—"এক কাজ কর না বাবা, তুমি দিদির নাম করে একখানা চিঠি লিখে দাও এখানে আস্‌তে। একটু মজা করা যাবে আর কি। কি বলেন নরেনবাবু?"

নরেন্দ্রনাথ বলিল,—"সে মন্দ হয় না বটে, কিন্তু একজন ভদ্রলোককে মিছামিছি হায়রান করে' লাভ কি? তবে তোমার অনুমাণ ঠিক কিনা তা' হয়ত বোঝা যেত।"

দেবীপ্রসাদ বলিলেন,—"আমারও একবার ইচ্ছে হচ্ছে ওর সম্বন্ধে ভাল করে' জান্‌তে।"

"তবে আজই লিখে দাও বাবা"—সবিতা আগ্রহভরা স্বরে বলিল।

*　　*　　*　　*

নরেন্দ্রনাথ যখন বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়া দেবীপ্রসাদের পরিবারের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হয়, তখন নমিতাকে লাভ করিবার জন্য তাহার যত্নের ক্রটি ছিল না। দেবীপ্রসাদের দিক দিয়া তেমন আপত্তিও হয়ত উঠিত না কিন্তু নরেন্দ্রের বাবা ছিলেন গোঁড়া ব্রাহ্মণ। যাহারা হিন্দু সমাজ পরিত্যাগ করিয়াছে এরূপ ব্রাহ্ম পরিবারের সঙ্গে ছেলের বিবাহ দিতে কোনদিন রাজী হইবেন না একথা নরেন্দ্রনাথ ভাল করিয়া জানিত। কাজেই তাহার চেষ্টা যেন ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়িতেছিল। অর্থাৎ তাহাতে জোয়ার ভাঁটা ছিল না। তবে দেবীপ্রসাদের পরিবারের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠতা পূর্ব্বের মত ছিল এবং সে তাহাদের একজন বিশেষ বন্ধুই হইয়া পড়িতেছিল। কাজেই যেদিন শ্রীযুক্ত দুলালচন্দ্র দাস আই, সি, এস্, ক'নে দেখিতে আসিবেন সেদিন সবিতার নিমন্ত্রণে যথারীতি উপস্থিত হইতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। সবিতার ধারণা একেবারে মিথ্যা হয় নাই, কারণ দুলালবাবু হিন্দুজাতির একজন হইয়াও নিম্নস্তরের সঙ্গে জন্মগত সম্বন্ধের দুর্ভাগ্য বহন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দেবীপ্রসাদ ও দুলালের মধ্যে চিঠির আদান-প্রদান অনেকদিন চলিয়াছিল। সবিতা আরম্ভটাই জানিত, কিন্তু তাহার পর মাস কয়েকের বিবরণ সম্বন্ধে কোন খবরই রাখিত না। প্রথমতঃ মনোরমা ও নমিতা শুনিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল কিন্তু মাসের পর মাস যখন চলিয়া গেল তখন প্রাথমিক আগ্রহ ও উত্তেজনাও অনেকটা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কাজেই যেদিন দেবীপ্রসাদ জানাইল যে তাহার একজন আই, সি, এস্, বন্ধু কয়দিনের জন্য বেড়াইতে আসিতেছেন তখন সবিতার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এ বন্ধুটি কে তাহা সহজেই ধরিয়া ফেলিল। ক্রমে মনোরমা ও নমিতাকেও জানাইতে হইল। ব্যাপারটি অপ্রীতিকর হইয়া উঠিতে বেশী দেরী হইল না। কিন্তু জিনিষটিকে হাল্‌কা করিয়া দিল সবিতা। সে বলিল,—"তোমরা কেউ যদি অভ্যর্থনা না কর আমিই কর্ব্ব। ধরনা কেন আমার সঙ্গেই ওর বিয়ে হ'তে যাচ্ছে।"

কাজেই নরেন্দ্রনাথের সাহায্যও সবিতার দরকার হইয়া পড়িয়াছিল। নমিতা বলিল,—"আমি আজই মাসিমার ওখানে চলে' যাচ্ছি। তোর বর যে'দিন চলে' যাবে সেদিন আমায় খবর দিস্।" তাহার পর দেবীপ্রসাদকে না বলিয়াই মাসিমার বাড়ী চলিয়া গেল। মনোরমা যথাসাধ্য নিজের কর্ত্তব্য করিবার জন্য রহিয়া গেলেন।

দুলালবাবু আসিয়া পৌছিলেন ঠিক সন্ধ্যার একটু আগেই। হোটেলে উঠিবার জন্যই তাহার ইচ্ছা ছিল কিন্তু দেবীপ্রসাদের আগ্রহাতিশয্যেই তাহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইল। সবিতা বেশ খোলাখুলি ভাবেই তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইল। নরেন্দ্রনাথও সন্ধ্যার পরেই আসিয়া জুটিলেন। সবিতা তাহার পরিচয় করিয়া দিল। বাঙ্গালী ধরণে নমস্কারের বিনিময় শেষ হইলে, নরেন্দ্রনাথই কথা তুলিল,—"আপনার ছাত্রজীবনের কৃতিত্বের

খবর আমি আগেই জানতুম, আজ আপনার সঙ্গে পরিচয় হ'য়ে মহা সৌভাগ্যের কারণ হ'ল।"

দুলাল বিশেষ বিনয়-প্রকাশ করিল এবং সে যে মফঃস্বল সহরে থাকিয়া societyএর একান্ত অভাবে হাঁপাইয়া উঠিয়াছে সে কথা সে সরল ভাবে উৎসাহ সহকারে বলিয়া গেল। তাহার ২৩ বৎসর জীবনে তখনও হাকিমী চাল আসে নাই, তখনও ছাত্রজীবনের সহজ চাঞ্চল্য ও জিজ্ঞাসু ভাবটি অন্তর্হিত হয় নাই। তাহার বাবা ছিলেন বাঙ্গালার বাহিরে কোন এক দেশীয় রাজ্যের শিক্ষাবিভাগে কর্ম্মচারী। কাজেই ছোটবেলা হইতেই লেখাপড়ার আবহাওয়ার মধ্যে থাকিয়া তাহার মন গড়িয়া উঠিয়াছিল অনেক রঙীন স্বপ্নের উত্তেজনার মধ্যেই। তাহার উপর তাহার বাবার একটু কঠোর শাসনও তাহার মনকে স্বাধীনতার উগ্র আস্বাদ পাইবার জন্য আরও আগ্রহান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল। কাজেই সে ইউরোপের খোলা হাওয়ায় হারাইয়া না গেলেও, সে যে ঠিক ঠিক মনটি লইয়া ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছিল তাহা সে নিজেই হয়ত বিশ্বাস করিতে পারিত না। দেশে আসিয়া সে যখন গল্প লিখিল "হতাশ প্রেমিক", "আশার "মরণ" এবং তরুণ সাহিত্যের দলে গিয়া ভিড়িল, তখন তাহার বন্ধুসমাজে খুব আলোচনা হইলেও তাহার মধ্যে হঠাৎ সাহিত্যিককে খুঁজিয়া পাইয়া তাহারা অভিনন্দিত না করিয়া পারিল না। মাসের পর মাস চলিয়া যাইতে লাগিল কিন্তু তাহার বিবাহের কোন আয়োজনই দেখা গেল না। তখন আবার তাহার "আশার মরণ" লইয়া আলোচনা আরম্ভ হইল এবং তাহার মানসীপ্রিয়া সমুদ্রের ওপার হইতে আসিবেন কিনা সে সম্বন্ধে অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। দুলাল বাইরের পৃথিবীতে জীবনের প্রথম অভিযানের ফলস্বরূপ কতগুলি নূতন আইডিয়া লইয়া দেশে ফিরিয়াছিল। তাহার নিজের মনে সাহিত্যিক নেশা থাকিলেও আধুনিক সাহিত্যিকাদেরে মনে মনে ঘৃণা করিত। সে নাকি বন্ধুদিগকে বলিত,—"এদের ন্যাকামি দেখ্‌লে গা' জলতে সুরু করে। এদের না আছে কল্পনা, না আছে অনুভূতির সততা।" তাহার আদর্শ ছিল এমন একজন—যে আধুনিক শিক্ষা পাইয়াছে কিন্তু আধুনিকতার জঞ্জাল দূরে রাখিতে পারিয়াছে।

* * * *

সবিতা মনে মনে অনেকখানি ঘৃণার ভাব নিয়াই দুলালকে অভ্যর্থনা করিয়াছিল। কিন্তু ক্রমশঃ তাহার সহজ সরল ব্যবহার এবং মার্জ্জিত রীতিনীতি দেখিয়া সে অনেকটা শান্ত হইয়া আসিতেছিল। নমিতাও পরে না আসিয়া পারে নাই। কিন্তু তেমন সহজভাবে ব্যবহার দেখাইতে পারিল না। কয়দিনের মধ্যে সবিতা যতটা প্রগল্‌ভা হইতে পারিল, নমিতা ঠিক ততটাই মৌনা ও অবিচলিতা রহিয়া গেল। দুলাল যেদিন চলিয়া যাইবে সেইদিন নমিতা শুধু এই বলিয়া ভদ্রতা জানাইল,—"আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে আমাদের বন্ধুবর্গের সংখ্যা বেড়ে গেল। এ সৌভাগ্যের জন্য আপনার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।"

দুলালও বলিয়া গেল,—"আপনাদের মধ্যে যে কয়টি দিন কাটিয়ে গেলুম, তার স্মৃতি অনেকদিন আমি পোষণ কর্ব্বো। এ কয়টি দিন আবার ফিরে পাবার জন্যে মনে আগ্রহও থাক্‌বে।"

* * * *

দেবীপ্রসাদ মোটের উপর সন্তুষ্ট হইতে পারিয়াছিলেন। তবে নমিতার নীরবতা ও অবহেলা তাহার মনকে খোঁচা দিতেছিল। যে দুইটি দিন দুলাল নমিতা, সবিতা ও নরেন্দ্রনাথকে লইয়া সিনেমায় গিয়াছিল সেই দুইটি দিনের উপরেই দেবীপ্রসাদ আশার সৌধ নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। মনোরমা স্বামীর আশা ও কল্পনাকে মোটেই উৎসাহিত করিতেন না, বরং এ ব্যাপারটি যাহাতে আর বেশীদূর না গড়ায় তাহার জন্য অনেক সময় অনুরোধও জানাইতেন। নরেন্দ্রনাথ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন মতামত প্রকাশ করিল না; তবে সে দুলাল সম্বন্ধে যে উচ্চ ধারণাই পোষণ করিত তাহা দেবীপ্রসাদ কাজে লাগাইতে চেষ্টা করিলেন। নরেন্দ্রনাথের মতামত উল্লেখ করিয়া মনোরমাকে নীরব করিতে প্রয়াস পাইতেন। কিন্তু মনোরমা সমস্ত মন দিয়া এরূপ

অশাস্ত্রীয় বিবাহকে ঘৃণা করিতেন। যেদিন দুলালের শেষ চিঠি পাওয়া গেল, সেদিন দেবীপ্রসাদ সবিতা, নমিতা ও মনোরমাকে লইয়া বায়োস্কোপে গেলেন। সিনেমা, থিয়েটারে যাওয়া দেবীপ্রসাদের খুব কম অভ্যাস ছিল, তবু সেদিনের শুভ সংবাদটিকে অনেক দিন মনে রাখিবার জন্য আয়োজনের ত্রুটি হইল না। দুলাল লিখিয়াছিল:—আপনার সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনের সৌভাগ্য আমি পেতে চাই। মিস্ নমিতা যদি আমাকে গ্রহণ কর্বার মত উদারতা দেখাতে রাজী হন্ তবে আমি নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে কর্বো।

বাড়ী ফিরিয়া মনোরমা যখন সংবাদটি শুনিতে পাইলেন তখন তিনি অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিলেন। দেবীপ্রসাদ অনেক যুক্তিতর্ক দিয়া বুঝাইলেন যে এ-সুযোগ নষ্ট করা শুধু নমিতার পক্ষে বড় একটি দুর্ভাগ্য হইবে না, তাহার বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থার বিবেচনায় তাহার পক্ষেও হইবে। মনোরমা ভাবিয়া দেখিবার জন্য একদিন সময় চাহিলেন। তাহার সমস্ত মন বিদ্রোহ করিলেও একটি জায়গায় তিনি কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছিলেন না। নমিতা যদি সত্যই মনে মনে রাজী হইয়া থাকে তবে কি তাহার ভবিষ্যৎকে একটি সংস্কারের জন্য নষ্ট করা ঠিক হইবে?

সবিতা শুনিয়াই আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠিল এবং নমিতাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিতে দেরী করিল না। নরেন্দ্রনাথও কংগ্রাচুলেশন্ জানাইতে দ্বিধা করিল না। নমিতা কিন্তু অতি শান্তভাবে সমস্তই সহ্য করিয়া অবিচলিত গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিল। দেবীপ্রসাদ শেষ চিঠি দিবার পূর্ব্বে নমিতার পূর্ণ সম্মতি আছে কিনা জানিবার জন্য মনোরমাকে অনুরোধ জানাইল।

নমিতা বাবার মতামত সম্পূর্ণ ভাল মেয়ের মত গ্রহণ করিতে যে রাজী ছিল তাহা নহে; তবে প্রথম সন্তান হিসাবে সে নিজের উপর অনেকখানি দায়িত্ব যেন মনে মনে গ্রহণ করিয়াছিল। পিতার বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থার কথা সে যতটা জানিত মনোরমাই প্রায় ততটা জানিত না। আই, এ, পাশ করার পর বি, এ, পড়া যখন হইল না, তখন সে নিজেকে ভাগ্যহীনা মনে করিয়াও বাবার উপর বেশী জুলুম করিতে পারে নাই। বরং তাহার মনে এই অনুভূতিই প্রবল ছিল যে যদি সে কিছু উপার্জ্জন করিতে পারিত তবে সে নিজেকে ধন্য মনে করিত। দেবীপ্রসাদ মনে মনে নমিতা সম্বন্ধে খুবই উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া তাহার সাধ্য হইল না বটে কিন্তু উঁচু সমাজে বা শিক্ষিত আবহাওয়ার মধ্যে যাহাতে নমিতার স্থান হয় সেজন্য তাহার একটি আন্তরিক ইচ্ছা ও আগ্রহ ছিল। কাজেই দুলালের প্রস্তাব তাহার কাছে ভগবানের দান বলিয়াই মনে হইয়াছিল এবং ইহা যে ত্যাগ করা উচিত হইবে না সে বিষয়ে তাহার নিশ্চিন্ত ধারণা ছিল। নমিতার বিবেচনা করিবার একমাত্র কারণ ছিল পিতার প্রয়োজন ও আগ্রহ। নিজের দিক দিয়া সে কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। নিজেদের গণ্ডীর বাহিরে অজ্ঞাত জগতে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করিয়া লইবার মত মনের সাহস তাহার ছিল না; তবে পিতার উদ্দেশ্য বিফল করিয়া দিবার মত স্বাধীন স্বত্ত্বাও যেন সে অনুভব করিতে পারিতেছিল না। কাজেই মনোরমার প্রশ্নে সে শুধু বলিয়াছিল,—"তোমরা যা' ভাল বুঝ লিখে' দাও।" চিরদিন নমিতার সহজ শান্ত ভাবটি পিতামাতার কাছে একটু রহস্যময় ছিল। তাহার ভিতরটি তাহারা যেন জানিয়াও জানিতে পারে নাই।

দেবীপ্রসাদ যথাসময় দুলালকে লিখিয়া দিলেন। কয়দিন পর বড়দিনের ছুটিতে নিমন্ত্রণও করিলেন। উত্তরে দুলাল ধন্যবাদ সহকারে নিমন্ত্রণ গ্রহণ-সংবাদ জানাইল।

*   *   *   *

সবাই মিলিয়া শিবপুরের বাগানে বেড়াইতে গিয়াছিল। শীতের অপরাহ্ন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, দূরে সারি সারি গ্রামগুলির সবুজ মাথার উপরে কুজ্ঝটিকার একটি ক্ষীণ আবরণ গড়িয়া উঠিতেছিল। তাহার দিকে চাহিয়া দুলাল সবিতাকে বলিল, "দেখুন একটি দিবসের মরণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও অনেক আশা নিরাশার মরণ ঘটে। আপনার দিদিকে আজ পর্য্যন্তও ঠিক করে জানতে পেলাম না। তিনি যেন একটু বেশী রকমের রিজার্ভ ও রহস্যময়—ঠিক যেন ঐ দূরের অস্পষ্ট গ্রামগুলির মত।" সবিতা উত্তর দিল,—"দিদি ছোটবেলা হ'তেই এমনি। যখন

আমরা খেলেছি বা ছুটাছুটি করেছি, দিদি তখন চুপচাপ হ'য়ে বই পড়েছে বা সেলাই শিখেছে। হাসিখুসী ভাবটি দিদি দেখান বটে কিন্তু তা'র মধ্যেও যেন অনেকখানি লুকোচুরী থাকে।"

বেড়াইতে বেড়াইতে নমিতা যে কোন্ সময় নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে একদিকে সরিয়া পড়িয়াছিল তাহা সবিতা বুঝিতে পারে নাই। সে তাহার স্বাভাবিক উত্তেজনা ও আগ্রহের সঙ্গে দুলালের কাছে বিলাতের গল্প শুনিতেছিল। তাহাদের দুইজনের মধ্যে যে একটি উগ্র কৌতূহলমিশ্রিত সাহসিকতা ছিল তাহার জন্যই আলাপ অতি সহজে জমিয়া উঠিতে পারিত। সবিতা দিদিকে না দেখিয়া হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া গেল। দুলালও চকিত হইয়া পড়িয়াছিল। অবশেষে নমিতার কথা লইয়াই আবার আলোচনা আরম্ভ হইল। দুলাল বলিল,—"হয়ত মানুষের বাহিরটা কিছু নয় এবং তা' দিয়ে গোটা মানুষের পরিচয়ও হয়ত পাওয়া যায় না; তবু ভিতরটা কি বাহিরটার অনেকটা ছায়া নয় মিস্ ঘোষাল?"

সবিতা হাসিয়া বলিল,—"ঐ দিদি আস্‌ছে; ওকেই জিজ্ঞাসা করা যাক্।"

কয়েকটি গাছের আড়াল হইতে বাহির হইতে হইতে নরেন্দ্রনাথ বলিল,—"মিস্ নমিতাকে monopolize করে' আমি ভয়ানক একটা অন্যায় করেছি মিঃ দাস। তিনি আমাকে একটা গল্প বল্‌ছিলেন।"

নমিতা বলিল,—"সবি'ই ত মিঃ দাসকে monopolize করেছিল। কাজেই আমাদের সবে' পড়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।"

সবিতা রাগের ভাণ করিয়া বলিল,—"হুঁ, তা' বল্‌বে বৈকি?"

দুলাল একটু হাসিয়া মত প্রকাশ করিল,—"তা' ঠিকই হয়েছে বোধ হয়। যা'র যেথা দেশ কিনা।"

নরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসু ভাবে চাহিল কিন্তু নমিতা আলোচনা আর বেশীদুর গড়াইতে না দিয়া বলিল,—"চলুন মিঃ দাস, এইবার বাড়ী ফেরা যাক্।"

ফিরিবার পথে নমিতা যেন ইচ্ছা করিয়াই অনেক অবাস্তব কথার আলোচনায় সময় কাটাইয়া দিল। দুলাল নমিতার মধ্যে হঠাৎ এই গল্পপ্রবণ-মনটিকে আবিষ্কার করিয়া একদিকে যেমন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল, অন্যদিকে তেমনি তাহার যথার্থ পরিচয় লাভের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল।

বাড়ী ফিরিলে মনোরমা নমিতা ও সবিতার দিকে চাহিয়া মনে মনে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। কিন্তু কোন সঠিক উত্তরই যেন মনে আসিতেছিল না। দেবীপ্রসাদ স্বাভাবিক উৎফুল্লতার সঙ্গে সান্ধ্যভোজনপর্ব্ব শেষ করিলেন। দুলাল ও নমিতার অপেক্ষাকৃত চুপচাপ ভাবটি তিনি লক্ষ্য করিলেন না। কিন্তু মনোরমার দৃষ্টি এড়াইল না। শুইতে যাওয়ার পূর্ব্বে মনোরমা নমিতার ঘরে আসিয়া বলিল,—"অসুখ করেনি ত' তোর?"

নমিতা মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল, —"অসুখ কর্ব্বে কেন?"

তাহার পর দুইজনেই নীরব। একটু পরেই দেবীপ্রসাদ দুপ্ দাপ্ করিয়া ঘরে ঢুকিলেন। নমিতার চুলগুলিতে আস্তে আস্তে দোলা দিতে দিতে বলিলেন,—"এখন ঘুমাও মা, কালই ত দুলাল চলে' যাবে। সকালেই ওর সঙ্গে খোলাখুলি ভাবে সব কথা শেষ কর্ত্তে হবে যে।"

* * * *

সকালে নমিতার ঘুম ভাঙ্গিতে একটু দেরী হইল। সে যখন নীচে আসিল তখন ব্রেকফাষ্ট টেবিলে সবাই আসিয়া জুটিয়াছিল। দেবীপ্রসাদ নমিতার অনুপস্থিতির জন্য মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন। নরেন্দ্রনাথও সেদিন অনুপস্থিত ছিল। নমিতার চক্ষু দুইটি রাত্রির অনিদ্রার সাক্ষ্য দিতেছিল। সেদিকে লক্ষ্য করিয়া দুলাল জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনার ত অসুখ করেনি' মিস্ ঘোষাল?"

বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া নমিতা উত্তর দিল,—"না, রাত্রে হঠাৎ ঘুম এল না। ঠাণ্ডার জন্য শরীরটা একটু খারাপ লাগছে যেন।"

মাঝখানে দেবীপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আজ নরেন এল না কেন?"

সবিতা উত্তর দিল,—"নরেনবাবু ত আজ সকালে মফঃস্বলে কোথায় মোকদ্দমা তদ্বির কর্ত্তে গেছেন। তাঁর বেয়ারা এই একটু আগে চিঠি দিয়ে গেছে।"

চিঠিটি ছিল দেবীপ্রসাদের নামে। সে তাহার অনিবার্য্য অনুপস্থিতির জন্য মার্জ্জনা চাহিয়াছে এবং দুঃখ প্রকাশ করিয়া দুলালবাবুকে নমস্কার ও শুভেচ্ছা জানাইয়াছে।

দুলালও খুব দুঃখ প্রকাশ করিল যে যাওয়ার পূর্ব্বে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে আর দেখা হইল না।

কতক্ষণ পর কাজের অছিলায় সবিতা ও দেবীপ্রসাদ বাহির হইয়া গেল। সবিতা গেল উপরে মনোরমাকে বিরক্ত করিতে এবং দেবীপ্রসাদ গেলেন বাগানে মালীদের কাজ দেখিতে। নমিতা একাকী একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। দুলাল বলিতে লাগিল,—"দেখুন মিস্ ঘোষাল, আজ সন্ধ্যায় আমি চলে যাচ্ছি। বচরের এই নূতন দিনটিতে আশা করবার মত আপনার আমাকে কিছুই কি বল্‌বার নেই? আবার কবে ছুটি পা'ব, কবে এখানে আস্‌তে পার্ব্ব তা'র ত কিছুই ঠিক নেই।"

নমিতা একটু ভাবিয়া উত্তর দিল,—"আমায় ক্ষমা কর্ব্বেন মিঃ দাস, নানা কারণে আমার মনটি আজ বড্ড বিচলিত হয়ে পড়েছে। আমি চিঠিতে সব কথা আপনাকে জানাব।"

দুলাল বলিল,—"আপনার ইচ্ছাই আমার শিরোধার্য্য।"

তাহার পর কিছুক্ষণ এটা সেটা আলোচনার পর দুলাল কিছু জিনিষ-পত্র কিনিতে বাহির হইয়া গেল।

রাত্রিতে বিদায় লইয়া যাইবার সময় দুলাল তেমন কিছু বলিয়া যাইতে পারিল না। তাহার বলিবারই বা কি ছিল! সে শুধু আশা জানাইয়া গেল যে সে আবার আসিবার সুযোগ অন্বেষণ করিবে।

* * * *

দিন কয়েক পর। নমিতা বাড়ীতে একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিল। তাহার পিতামাতার জিজ্ঞাসু নীরব ভাবটি তাহার অন্তরে একদিকে যেমন নীচতার অজস্র অপমান আনিতেছিল, অন্যদিকে তেমনি কর্ত্তব্যের সমস্যাও সৃষ্টি করিতেছিল। সবিতার চঞ্চল হাসি ও ঠাট্টা যেন ফুরাইয়া গিয়াছিল। আর সহ্য করিতে না পারিয়া সে একদিন মনোরমাকে বলিয়া মাসির বাড়ী চলিয়া গেল। তাহার মন যে কি চাহিতেছিল তাহা সে নিজেই ঠিক করিতে পারিতেছিল না। কোন্ পথটি তাহার গ্রহণ করিতে হইবে সে সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট কোন ধারণাই মনে আসিতেছিল না; একদিকে অজ্ঞাত জগৎ তাহার সমস্ত অনিশ্চয়তা ও সম্ভাবনা লইয়া তাহাকে আহ্বান করিতেছিল। অন্যদিকে তাহার চিরপরিচিত পৃথিবী স্নেহ, মমতা ও আত্মবিশ্বাস লইয়া তাহাকে টানিতেছিল।

একদিন একখানি চিঠি আসিয়া তাহার সমস্ত দ্বন্দ্ব ও সমস্যার অবসান করিয়া দিল। নরেন্দ্রনাথের চেষ্টায় কোন মফঃস্বল সহরের একটি মেয়ে-স্কুলে একটি ভাল চাকুরী পাইয়া সে চলিয়া গেল। যাওয়ার পূর্ব্বে দুইখানি চিঠি সে মাসির বাড়ী হইতে ডাকে দিয়া গেল। প্রথমখানি ছিল সবিতার কাছে।

স্নেহের বোনটি,

মা বাবার স্নেহের নীড়টি একদিন ত ছাড়তেই হ'ত। বাইরের পৃথিবীতে সাহস করে' বেরুতে পারিনি' এই স্নেহের নীড়টির আকর্ষণেই। মা বাবা হয়ত আমার অকৃতজ্ঞতায় দুঃখিত হ'বেন, আশাভঙ্গের বেদনায় আমার উপর বিশ্বাস হারাবেন। কিন্তু তুই আমার হ'য়ে এইটুকুই বল্‌বি যে তাঁদের নমি' চিরদিনই তাঁদের থাক্‌বে, তাঁদের অপরিমেয় স্নেহমমতার অমৃত আস্বাদই তা'র জীবনকে সঞ্জীবিত রাখবে। আমার আশা আছে তুই একাই আমাদের দু'জনের স্থান পূর্ণ কর্ত্তে পার্ব্বি। আমি দেখি বাইরে থেকে বাবাকে কোন সাহায্য কর্ত্তে পারি কি না। তুই শুনে' বোধহয় সুখী হ'বি যে আমি···মেয়ে-স্কুলে একটি চাকুরী পেয়েছি।

হাঁ, দুলালবাবুর কথা না বলে' চিঠি শেষ করা ঠিক হ'বে না। ভদ্রলোকটি বেশ। তুই জানিস কোথায় আমার মন বাঁধা আছে। যদি চিরজীবন অপেক্ষা কর্ত্তে হয় তবে তা'ও আমার কর্ত্তে হ'বে। দুলালবাবুর কাছে হয়ত আমি পেতাম পূজা আর শ্রদ্ধা—যা' কয়দিনের ঘনিষ্ঠতায় হয়ত উবে' যেত,—কিন্তু ভালবাসা যে পেতাম না তা' আমি বেশ জান্‌তাম। সেই জন্যই আমি বাবার আশা পূর্ণ কর্ত্তে পার্‌লাম না। এ দুর্ভাগ্যের বোঝা নিয়েই আমি সরে' দাঁড়ালাম। তুই যদি পারিস্ এ আশা পূর্ণ করিস্।

তোর নমি' দি'।

দ্বিতীয় পত্রখানি ছিল দুলালের কাছে।

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

চিঠিতে সব জানা'ব বলে আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। না দিলে এই চিঠিখানা লিখবার সুযোগ হয়ত পেতাম না। আমার এই শুধু জানাবার আছে যে আপনি আমাকে ক্ষমা কর্ব্বেন। যদি কোনদিন কোন ভাবে আপনার মনে কোন কষ্ট দিয়ে থাকি তবে তা'র জন্য চিরদিন দুঃখ কর্ব্বার দুর্ভাগ্য বহন কর্ব্বো।

—নমিতা ঘোষাল।

বীণা ঘোষ

রাঁচী-প্রসঙ্গ

শ্রীগদাধর সিংহরায় এম-এ, বি-এল

এক

রাঁচী একদিকে বিহারের লাটের গ্রীষ্ম-নিবাস, অপর দিকে একটা উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্য নিবাস। ছোট নাগপুর বিভাগের ও রাঁচী জিলার সদরও এই রাঁচী সহর।

অতি প্রাচীনকালের কথা ছেড়ে দিন—দেড়শত বৎসর পূর্ব্বেও এখানে সহরের নামগন্ধ মাত্র ছিল না। তখন স্থানটী পার্ব্বত্য জঙ্গলেই পরিপূর্ণ ছিল। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ছোট নাগপুর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর (East India Company) হাতে আসে এবং তার এক শতাব্দী পরে অর্থাৎ ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে রাঁচীর প্রথম মিউনিসিপ্যালিটী (Municipality) গঠিত হয়। অতএব সাধারণের চক্ষে এ সহরের বয়স মাত্র ৬৫ বৎসর। অন্যের তুলনায় এর এখন যৌবন; তাই যৌবনের উদ্দাম তেজে এখনও সে বেড়েই চলেছে।

রাঁচীর একটী গ্রাম্য-পথ। কয়েকজন মুণ্ডা পথের মাঝে দেখা যাচ্ছে।

'রাঁচী' এই নামের সঙ্গে এ স্থানের অতীত কাহিনীর এমন একটা নিবিড় সম্বন্ধ বর্ত্তমান যে আমরা সেটাকে একেবারে উপহাস করে ঠেলে ফেলে রেখে যেতে পারি না। মুণ্ডারি শব্দ "আরাঁচী" হ'তে "রাঁচী" শব্দের উৎপত্তি। কালক্রমে উচ্চারণভেদে "আ"টী কেবল লুপ্ত হ'য়ে গেছে। "আরাঁচী" শব্দের বাঙ্গালা অর্থ রাখাল বালকের হাতের বাড়ি। এই সহরের উপকণ্ঠে, দেড় ক্রোশ দক্ষিণে, ডোরণ্ডা। এ "ডোরণ্ডা" নামটীও নাকি দুইটী মুণ্ডারি শব্দের যোগে উৎপন্ন হয়েছে—'ডুরাঙ্গ' ও 'ডা'। 'ডুরাঙ্গ' মানে গান আর 'ডা' মানে জল। এ থেকে বোধ হয় কোনও গ্রাম্য কবি এই প্রচলিত উপকথা রচনা করে থাকবেন যে প্রথম মুণ্ডা ঔপনিবেশিকগণ যখন এদেশে পদার্পণ করেন তখন এস্থানে যে নদীটী এখনও দেখা যায় তারই পাশে ক্লান্ত দেহে বিশ্রাম করেন এবং সেই নদীর জল পান করে মনের সাধে নৃত্যগীত করতে থাকেন। উপকথাটীর মূলে কিছু সত্য থাক আর না থাক রাঁচী ও ডোরণ্ডার ঐ প্রচলিত মুণ্ডারি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হ'তে চক্ষুর সম্মুখে আদিম মুণ্ডাগণের অধিকারকালের কাহিনী যেন স্বপ্নের মত ভেসে যায়।

তারাই একদিন এ স্থানের প্রকৃত মালিক ছিল—তারাই একদিন বহুশ্রমস্বীকারে পার্ব্বত্য বনজঙ্গল পরিষ্কার করে স্থানটীকে বাসোপযোগী করে তুলেছিল এবং উর্ব্বর কৃষিক্ষেত্রেও পরিণত করেছিল। এখনও সহরের দূর সীমানায় নিভৃত পল্লীতে বেচারিদের দু একখানা কুঁড়ে ঘর দেখ্‌তে পাওয়া যায়—যেন অপরাধীর মত লোকালয় ত্যাগ করে দূরে একপাশে ভয়ে ভয়ে আত্ম-গোপন করছে।

"The Mundas and their country" নামক পুস্তকে মাননীয় রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র রায় এম-এ, বি-এল

রাঁচীর নিজ্জন পল্লীতে মুণ্ডারমনীগণের নৃত্য।

মহাশয় মুণ্ডাজাতির গভীর গবেষণাপূর্ণ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই পুস্তকের সাহায্যে মুণ্ডাজাতির সম্বন্ধে সামান্য গোটা কতক কথা বলি। এই মুণ্ডারা কে তা জানেন? এরাই হ'ল ভারতের আদিমকালের অনার্য্য সম্প্রদায়ের এক শাখা। বেদে কালো বর্ণের নাক-চ্যাপ্‌টা অনার্য্য দস্যুর যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা এদেরই। এদেরই সঙ্গে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ প্রাচীন আর্য্যগণের যুদ্ধ বাধে। তাঁরা বল্লেন, তোমাদের অধিকারভুক্ত জমি আমাদের ছেড়ে দিয়ে তোমরা দূরে বন-জঙ্গলের মধ্যে পড়ে থাকগে,—আর এরা বল্লো, না—আমাদের স্বাধিকার আমরা ছাড়বো না। এদের জন্মাধিকার (birth-right!) এরা ছাড়বে কেন? তখন League of Nations ছিল না ব'লেই বোধ হয় বিরোধটা মিট্‌লো না। মহাসমর বেধে গেল। এই নাক-চ্যাপ্‌টা কালো বর্ণের অসভ্য বর্ব্বরগুলোর তীরধনু ও পাথরের অস্ত্রের চোটে গৌরবর্ণ সভ্য আর্য্য পিতৃপুরুষগণ জরজর হ'য়ে প'ড়লেন; শেষে, এদের দস্যু, রাক্ষস্ ইত্যাদি বলে গাল পাড়্‌তে পাড়্‌তে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ ইত্যাদি দেবতাগণের শরণাপন্ন হ'য়ে স্তবস্তুতি আরম্ভ করলেন। বৈদিক সাহিত্যে এ খবর নাকি অনেকখানিই পাওয়া যায়। পরিণামে যা হ'ল তা অবশ্য আমরা অনেকেই জানি। এই আদিম অনার্য্য জাতিরই পরাজয় ঘট্‌লো। তাদের সুদিন অস্ত গিয়ে দুর্দ্দিনের উদয় হ'ল। ভারতে আর্য্যগণের পদার্পণের পূর্ব্বে এই হতভাগ্যের দল সুখে নাচ-গান-পানেই সময় কাটাতো, কিন্তু এখন আর তাদের সে ভাবে সময় কাটানো চল্‌লো না। বেচারিরা আর্য্য বিজেতাগণের প্রবল আক্রমণে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগ্‌লো। শেষে এমন দুরবস্থা তাদের ঘট্‌লো যে দু বেলা দুটী খেতেও পায় না, অনাহারে মরতে থাকে। তাদের এই ভাগ্য-বিপর্য্যয় সম্বন্ধে তাদের নিজ ভাষায় রচিত একটী প্রচলিত গান রায় বাহাদুর লিপিবদ্ধ করেছেন। তার বাঙ্গলা অনুবাদ আমরা এখানে দিলাম।—

"তখন ছিল সত্যযুগ
এখন হয়েছে কলি।
সেদিনের সে স্বর্ণযুগ
হায়রে! গিয়েছে চলি॥

তখন ছিল সত্য রাজ্য,—
এখন রাজা কলি
এনেছে হেথা দুঃখ-দৈন্য—
কত যে কেমনে বলি ॥
সেই সে শুভ স্বর্ণযুগে
ছিল না কাজের লেশ।
মানুষ শুধুই করিত পান
মনের আনন্দে বেশ ॥
পোড়া কলির রাজ্য এখন
চরম সীমায়—তাই
পেটের জ্বালায় মৃত্যু নিঠুর
আমরা দেখতে পাই ॥
সেদিন কোথা মানুষ যবে,
না জানি ভাবনা-ভয়,
পেট ভরাতো পচুই খেয়ে,—
মনেতে দুঃখ রয় ॥
দাও ধিক্কার এ পোড়া দিনে,
মানুষ যখন মরে,
প্রতিদিন সে খেতে না পেয়ে
ঘোর আকালের করে ॥"*

এখানে মুণ্ডা কবি যে সত্যযুগ ও স্বর্ণযুগের বর্ণনা করেছেন এটাই সম্ভবতঃ আর্য্যগণের ভারত প্রবেশের পূর্ব্বকাল। যাই হোক, মুণ্ডাগণ স্বভাবতঃ যে নাচ-গান-পানপ্রিয় তা এখনও এদের চরিত্র আলোচনা করলে দেখা যায়। রাঁচীতে মুণ্ডারমণীগণের নৃত্য-গীতের একটী ছবি আমরা স্থানান্তরে দিলাম।

শুধু নৃত্য-গীত নিয়ে থাকতে ভালবাসে বলে এদের বীরত্বের অভাব কোনদিন ছিল না। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে এরা নাকি কুরুরাজ দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করেছিল এ কথা মহাভারতে পাওয়া যায়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সম্বন্ধেও মুণ্ডাগণের মধ্যে একটি গান প্রচলিত আছে। রায় বাহাদুর সেটীও তাঁর পুস্তকে দিয়েছেন। বাহুল্য ভয়ে সেটী আর আমরা এখানে দিলাম না।

সেণ্ট্ পল্‌স ক্যাথিড্রাল গির্জ্জা অথবা ইংলিশ গির্জ্জা।
ইং ১৮৬৯-১৮৭৩ সালে ইহা নির্ম্মিত।

স্থান হ'তে স্থানান্তরে বিতাড়িত হ'য়ে শেষে মুণ্ডাগণ খৃষ্টপূর্ব্ব ছয় শতাব্দীতে ছোটনাগপুর প্রদেশে প্রথম প্রবেশ করে। তখন এ প্রদেশ জঙ্গলাকীর্ণ। নানা স্থান ঘুরতে ঘুরতে শেষে তারা বর্ত্তমান রাঁচী জিলা যে স্থান অধিকার করে আছে সেই স্থানে তাদের স্থায়ী বাসস্থান নির্দ্দেশ

* মূল মুণ্ডারি গানটী এই—

"সতোযুগু কলিযুগু, সতোযুগু হুইকিনা,
সতোযুগু কলিযুগু, কলিযুগু হিজুবিনা,
সতোযুগু হুইাকনা, ইলিগে-কো নুকিনা,
কলিযুগু তেবলিনা, রেঙ্গেটাকো গইটিনা,
নেখাইটিঙ্গ সনাইয়া, ইলিগে-কো নুকিনা,
চকটিঙ্গ মোনিঙ্গা, রেঙ্গেটেকো গইটিনা।"

করে। তখন এ অঞ্চলে গভীর জঙ্গল ছিল। বর্ত্তমান রাঁচী সহরের মাঝখানে একটী অংশকে এখনও লোকে "হিন্দ-পিড়ি" বলে থাকে। এটী মুণ্ডারি শব্দ "ইন্দ-পিড়ি"র বিকৃত রূপ। ইহার অর্থ মুণ্ডাগণের 'ইন্দ' উৎসবের পিড়ি বা উঁচু জায়গা। এখনও নাকি এখানে তাহাদের সে উৎসব হ'য়ে থাকে।

রোমান ক্যাথলিক গির্জ্জা। ইং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ইহা নির্ম্মিত হয়।

দুই

রাঁচী সহরে ঢুকলে সহজেই নজরে পড়ে খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারকগণের প্রাসাদতুল্য গির্জ্জা আর তৎসংলগ্ন শিক্ষালয়, হাসপাতাল ইত্যাদি লোক-মঙ্গল প্রতিষ্ঠান। এগুলি বাদ দিলে যেন এ সহরের অনেকখানি ছেঁটে ফেলে দেওয়া হয়। অতএব এ সম্বন্ধেও আমরা দু একটা কথা বলি।

এরূপ গির্জ্জা তিন সম্প্রদায়ের তিনটী—(১) জার্ম্মান মিশনের, (২) ইংলিশ মিশনের ও (৩) রোম্যান ক্যাথলিক মিশনের। শেষ দুইটির ছবি আমরা স্থানান্তরে দিয়েছি। প্রথমটীর ছবি সংগ্রহ করে উঠ্‌তে পারি নাই। শুধু রাঁচীর কেন ছোটনাগপুর বিভাগের মুণ্ডাগণের জীবনেতিহাসের সঙ্গে এই খৃষ্টীয় গির্জ্জাগুলির একটী অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এখানকার মুণ্ডাগণের সঙ্গে তাদের ঠিকাদার ও জাইগিরদারদের (অর্থাৎ ভূস্বামিগণের) ভূস্বত্ত্বাধিকার নিয়ে বিরোধ ঘটে। এটা যেন সেই প্রাচীন আর্য-অনার্য্য-বিরোধেরই পুনরভিনয়, যদিও ভিন্নরূপে। বিদেশীর ভূস্বামিগণ জমির উপর মুণ্ডাগণের কোনরূপ স্বত্ত্ব দিতে রাজী হলেন না। বেচারিরা বহু পরিশ্রমে জঙ্গল কেটে বসতবাড়ি ও চাষের জমি তৈরী করল, আর তাদেরই জমির উপর কোন স্বত্ত্ব থাকবে না! তারা বড়ই বিপদে প'ড়লো। ঠিক এই দুর্দ্দিনে হতভাগ্যের দল শ্রীভগবানের শুভাশীর্ব্বাদরূপে এই খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণের আশ্রয় পেয়েছিল।

প্রথমে পথপ্রদর্শক হন জার্ম্মান ধর্ম্মপ্রচারকগণ। কলিকাতা সহরের রাস্তার উপর গোটাকতক কোল জাতীয় কুলির সরলতায় আকৃষ্ট হয়ে তাঁরাই সর্ব্বপ্রথমে এ অঞ্চলে পদার্পণ করেন। তাঁদের মধ্যে অগ্রণী হ'লেন Pastors E. Schatz, F. Batsch, A. Brandt এবং H. Janke। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে এঁরা রাঁচীতে আসেন। উরাঁও ও মুণ্ডাগণের ভিতর ক্রমাগত পাঁচ বৎসর ধর্ম্মপ্রচারের পর ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ৯ই জুন তারিখে প্রথমে মাত্র চারি জন উরাঁও (নাম—কাসু, বন্ধু, গুড় ও নবীন পোরিণ) খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। তারপর ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ২৬শে অক্টোবর তারিখে দুই জন মুণ্ডা (নাম—সংধো ও মুঙ্গটা) এই নবধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। এরা অশিক্ষিত আদিম জাতি হ'লেও স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করতে সহজে রাজী ছিল না। কিন্তু সে সময়কার হিন্দু ভূস্বামিগণের ও এমন কি হিন্দু বিচারকগণের অত্যাচার ও অবিচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য তারা ক্রমশঃ

দলে দলে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণের আশ্রয়-প্রার্থী হয়। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে অর্থাৎ আর পাঁচ

রাঁচী পাহাড়ের উপর থেকে সহরের দৃশ্য।

বৎসরের মধ্যে নাকি ১৭০০ জন এই নব-ধর্ম্মে দীক্ষা প্রাপ্ত হয়। বর্ত্তমান জার্ম্মান গির্জ্জাটী সেই সময়ে প্রতিষ্ঠিত। জার্ম্মান ধর্ম্মপ্রচারকগণ শুধু গির্জ্জা প্রতিষ্ঠিত করেই ক্ষান্ত ছিলেন না, অশিক্ষিত দীক্ষিতের দলের যথারীতি শিক্ষার জন্ত বিলম্বে শিক্ষালয়েরও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

তারপর আসেন ইংরাজ ধর্ম্মপ্রচারকগণ (English Mission)। তাঁদের গির্জ্জার নাম St. Pauls' Cathedral অথবা English Church। এর নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয় ইংরাজী ১৮৬৯ সালে ও শেষ হয় ইংরাজী ১৮৭৩ সালে। ইংরাজী ১৮৯৫ সালে স্থাপিত এঁদের অন্ধ-শিক্ষালয় এখনও বর্ত্তমান।

সর্ব্বশেষে আসেন রোম্যান ধর্ম্মপ্রচারকগণ (Roman Catholic Mission)। এঁরা ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ডোরণ্ডাতে প্রথম ধর্ম্মপ্রচার কেন্দ্র স্থাপন করেন; পরে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে রাঁচী সহরের ভিতর এটীকে স্থানান্তরিত করেন।

রাঁচীর মেন রোডের চৌমাথা। ডানদিকে একখানা বোঝাই গরুর গাড়ীর পাশে একটী শাদা থামওয়ালা দোতালা বাড়ী দেখা যাচ্ছে। একটু লক্ষ্য করলে দোতালার ঘরের বারান্দাও দেখতে পাবেন। এইটী "দুর্গাবাটী"। ইং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত এবং ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত হয়।

এঁদের এই রাঁচীর গির্জ্জাটী বড়ই চমৎকার। এর ভিতরে ঢুকে দেখবার আমাদের সুযোগ হয়েছিল। ধর্ম্মমণ্ডপের

চারিধারের দেওয়ালে কি সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তিই না দেখলাম। প্রত্যেক মূর্ত্তির মধ্যে খৃষ্ট অবতার যীশুর জীবনের এক একটী স্মরণীয় ঘটনা যেন জীবন্ত হ'য়ে ফুটে বেরুচ্ছে! এঁরা প্রায় আমাদের মত সাকার মূর্ত্তিরই উপাসক। রোমান ধর্ম্মপ্রচারকগণ সর্ব্বশেষে রাঁচীতে এলেও স্থানীয় লোকের চিত্তাকর্ষণ করেছেন এঁরাই বেশী। আমাদের মনে হয়, অপর যে কোন কারণই থাকুক, বোধ হয় তাঁদের ধর্ম্মমত আমাদের সাকার মূর্ত্তি উপাসনার অনেকটা অনুরূপ হওয়াই এর প্রধান কারণ। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে তাঁদের ধর্ম্মমতে দীক্ষিতের সংখ্যা ছিল ১৫০০ আর ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ক্রমশঃ বেড়ে দাঁড়ায় ১৬৭,৩৬৬। এর মধ্যে একমাত্র রাঁচী জিলার দীক্ষিতের সংখ্যা হ'ল ৯১,৩৪৫। সোজা কথা কি! বর্ত্তমান সংখ্যা কত তা আমরা ঠিক বলতে পারি না। সম্প্রতি আর্য্য-সমাজের এদিকে কিছু লক্ষ্য পড়েছে শুনলাম। তাঁদের কার্য্যাবলী বিশেষরূপে অবগত নই বলে কিছু লিপিবদ্ধ করতে সাহস করলাম না। তবে এই বলে শেষ করি যে—Better late than never—একেবারে না হওয়া অপেক্ষা দেরীতে হওয়াও ভাল।

"ছট্" উৎসবের সময় উষাকালে বিহারী পুরুষ ও রমণীগণ আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে রাঁচী হ্রদে স্নান ক'রে সূর্য্য-পূজা করছেন। হ্রদের নিকটের দৃশ্য।

তিন

রাঁচী আদিতে ছিল মুণ্ডাদের সেকথা আমরা প্রথমেই বলেছি; কিন্তু এখন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে যেন একটী মহামিলন-ক্ষেত্র। সে বোধ হয় বিহারের লাটের অনুগ্রহে। তাঁর গ্রীষ্মাবাস এখানে না থাকলে কি এত অল্পদিনে এ সহরটা

"ছট্" উৎসবের সময় রাঁচী হ্রদে সমবেত বিহারী নর-নারীর দূরের দৃশ্য।

এমন জমকালো হ'য়ে উঠ্‌তো। এখন এখানে শুধু পাদ্রী সাহেবরাই নন,—হিন্দু, মুসলমান, মাড়োয়ারি সকলেই বাসিন্দা হয়ে পড়েছেন। কয়েকজন বাঙ্গালী বাসিন্দা ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হ'লে জানলাম যে তাঁদের পূর্ব্বপুরুষগণ এখানে এসেছিলেন কেহ বা কর্ম্মের আর কেহ বা ব্যবসার উপলক্ষে। বর্ত্তমানে তাঁদের এই গোড়া বঙ্গদেশে পিতৃ-পিতামহের আদি বাসস্থানের সঙ্গে সম্বন্ধটা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে কেবল মাত্র যাকে বলে ভৌগলিক অর্থাৎ geographical। তবে অবশ্য এটুকু প্রশংসার কথা যে তাঁদের এই আদি বাসস্থানের নামটা এখনও তাঁরা বল্‌তে পারছেন।

খৃষ্টীয়ানের গির্জ্জার কথা ত পূর্ব্বেই বলেছি। রাঁচীতে মুসলমানের মস্‌জিদ্‌ ও হিন্দুর মন্দিরেরও যে একান্ত অভাব আছে তা নয়। স্থানীয় বাঙ্গালী ভদ্রলোকগণ সেখানেও তাঁদের বিশিষ্টতাটুকু বজায় রাখ্‌তে সমর্থ হ'য়েছেন দেখলাম। তাঁদের স্বতন্ত্র সাধারণ পাঠাগার ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে স্বতন্ত্র ধর্ম্মমন্দিরও প্রতিষ্ঠা করেছেন—নাম "দুর্গাবাটী"। মন্দিরের এক পাশে বাসুদেব মূর্ত্তি আর এক পাশে শিবমূর্ত্তি; মাঝখানের মণ্ডপে দেবীপূজার আয়োজন হয়। বাঙ্গালীর বার মাসে তের পার্ব্বণ সব এখানেই হ'য়ে থাকে। জাঁকজমকটা হয় বেশী শারদীয়া পূজার সময়।

এ'ত গেল বাঙ্গালী হিন্দুদের কথা। বিহারী হিন্দুগণের একটা উৎসবের কথা বলি, কেননা রাঁচী ত হ'ল বর্ত্তমানে তাঁদেরই। তাঁদের "ছট্‌" উৎসব প্রায় বাঙ্গালীর দুর্গোৎসবেরই মত। সারা বাঙ্গলায় দুর্গোৎসবের মত সারা বিহারে "ছট্‌" উৎসবের ঘটা। রাঁচীতেও তার কিছুমাত্র কম না। কেহ কেহ বলেন "ছট্‌" শব্দটী 'ষষ্ঠী' শব্দের অপভ্রংশ। সাধারণতঃ 'ছট্‌' উৎসবটী নাকি কার্ত্তিক মাসের শুক্ল ষষ্ঠীতে হয়ে থাকে। আমাদের মনে হয় এ উৎসবটী সূর্য্যপূজারই রূপান্তর। পূজার পূর্ব্বদিন অপরাহ্নে স্থানীয় বিহারী হিন্দুগণ স্ত্রীপুরুষে দলে দলে ভক্তিভাবে গান গাইতে গাইতে শোভাযাত্রা করে রাঁচী হ্রদের তীরে উপস্থিত হন। সেখানে রাত্রিবাস করে পরদিন ঠিক ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে হ্রদে সকলে স্নান করে সূর্য্যোদয়কালে সূর্য্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে ভক্তিগদগদচিত্তে স্তব পাঠ করে থাকেন। তারপর আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের বাড়ি প্রসাদ বিতরণ করেন। অনেকে এ সময় মানৎ-পূজাও করে থাকেন। আমরা এই ছট্‌-উৎসবের দুইখানি ছবি স্থানান্তরে দিলাম।

RANCHI HILL

রাঁচী-পাহাড়। লক্ষ্য করলে পাহাড়ের মাথায় শিবমন্দিরটী দেখ্‌তে পাবেন।

রাঁচীতে শুধু যে সাকারমূর্ত্তি উপাসক বা জড়োপাসক হিন্দুগণেরই ধর্ম্মের নিশান দেখ্‌তে পাওয়া যায় তা নয়—এখানে নির্গুণ-ব্রহ্মোপাসক হিন্দুগণেরও উপাসনা মন্দির বর্ত্তমান। সহরের পশ্চিম সীমানায় রাঁচী-পাহাড়, তার চূড়ার উপর যেমন এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ঠিক তেমনই সহরের উত্তর সীমানায় মোরাবাদি পাহাড়ের শিখরদেশে

নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতীক "ওঁ" মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। সহরের হট্টগোল দূরে রেখে নিভৃতে—নির্জ্জনে পাহাড় দুইটী যেন চিরমৌনী

মোরাবাদী পাহাড়। পাহাড়ের মাঝামাঝি ডান পাশে যে সাদা বাড়িখানি দেখা যাচ্ছে ঐটিই হ'ল শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্ম মন্দির। এই মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের ঠিক মাথায় একটী ছোট ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠিত। পাহাড়ের ঠিক মাথার উপর "ওঁ" মূর্ত্তির উপাসনা বেদীও দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে। পাহাড়ের নীচে যে একটী বড় পাকা রাস্তা রয়েছে তার এক পাশে ছবির একেবারে ডান কোণে খুব ভালভাবে লক্ষ্য কর্‌লে "রামকৃষ্ণ মিশনের শাখাশ্রম" যাবার ফটকটী দেখ্‌তে পাবেন।

সাধকের মত নিজ নিজ ধ্যেয় বস্তু ভক্তিভরে মাথায় স্থাপন করে তাহারই ধ্যানে চিরমগ্ন। পাহাড় দুইটীর ছবিও আমরা স্থানান্তরে দিয়াছি।

মোরাবাদি পাহাড়ের "ওঁ" মূর্ত্তির নীচে একটী ব্রহ্ম-মন্দির দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তার সম্মুখের ফটকের গায়ে পাথরের উপর দেবনাগরী ভাষায় এইরূপ লেখা আছে—"১৯১০ খৃষ্টাব্দে শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই গিরিশিখরস্থ ব্রহ্ম-মন্দিরে আসিয়া সকল সম্প্রদায়ের লোকই নিজ নিজ ইষ্টদেবতার আরাধনা ও ধ্যান ধারণা করিতে পারিবেন।" তাঁর দেশবাসীর কাছে মহাপ্রাণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। সকল ধর্ম্মের প্রতি তাঁর সমান অনুরাগ ছিল। এটী ব্রহ্মমন্দির হলেও ফটকের মাথার উপর একটী ছোট ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠিত। তবে বর্ত্তমানে আর মন্দির-প্রাঙ্গণে সাধারণের প্রবেশাধিকার নাই। "প্রবেশ নিষেধ" বলে একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া আছে আর ফটকটিও চাবি বন্ধ। অনুসন্ধানে জানা গেল যে মন্দির-প্রাঙ্গণের ভিতর দিয়ে পাহাড়ের উপরে যাবার নাকি একটা সোজা পথ আছে। খোলা ফটক পেয়ে আগন্তুকের দল নাকি সেই পথটাকেই ক্রমশঃ পাহাড়ে উঠবার সদর রাস্তা করে ফেলেন এবং মন্দিরের ভিতরের জিনিষপত্রও অনেক নষ্ট করে ফেল্‌তে থাকেন।

রাঁচী ইম্পিরিয়াল হোটেলের সম্মুখের দৃশ্য। হোটেলের সম্মুখে যে ৫ জন ভদ্রলোক বসে রয়েছেন তার মাঝের ভদ্রলোকটী হোটেলের ম্যানেজার শ্রীবসন্তকুমার রায়। ইনি বি, এস সি পাশ করে নিজের পৈতৃক বাসভবনে এই হোটেল খুলেছেন। সর্ব্বপ্রকার শারীরিক পরিশ্রমেও তিনি কুণ্ঠিত নন। তাঁর এই স্বাবলম্বিতা প্রশংসার যোগ্য।

কাজে কাজেই পরে এই চাবির ব্যবস্থা করতে হ'ল। অনধিকারীর হাতে ভালও মন্দ হ'য়ে দাঁড়ায়!

১৩৪১ শালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় আমরা "রাঁচী ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও বিদ্যাপীঠের" কথা বলেছি। এবার সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণমিশনের কথা কিছু বলে এ প্রবন্ধ শেষ করব। ঐ মোরাবাদি পাহাড়ের ঠিক নীচে বড় রাস্তার ধারে রামকৃষ্ণমিশনের একটী শাখাশ্রম দেখলাম। আশ্রমের সম্মুখে একটী কাষ্ঠফলকে "জ্যোতিরিন্দ্র সেবাশ্রম" লেখা রয়েছে তাও দেখলাম। অনুসন্ধানে জানলাম যে সাধকপ্রবর জ্যোতিরিন্দ্রনাথই মিশনের শাখাশ্রমের জন্য এই জমি ও তৎসংলগ্ন ছোট পাকা আশ্রমবাটিখানি দান করে গেছেন। আট বৎসর হ'ল এ আশ্রমটী প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। এর স্থানীয় অধ্যক্ষ বর্ত্তমানে স্বামী বিশুদ্ধানন্দ। দুই তিন জন আশ্রম-সেবক নিয়ে এখানে তিনি থাকেন। আশ্রমের কাজের মধ্যে ধ্যান-ধারণা-উপাসনাই হ'ল প্রধান। এ স্থানটী যথার্থই তার উপযোগী। সহরের কোনও খ্যাতনামা ভদ্রলোকের বাড়িতে স্বামিজী সপ্তাহে একদিন বেদান্ত ব্যাখ্যাও করে থাকেন। শুনলাম শ্রোতার সংখ্যা নিতান্ত কম হয় না। আশ্রম-খরচের জন্য মাসিক ৫০৲।৬০৲ টাকা যা লাগে তাও নাকি স্থানীয় চাঁদা থেকেই চলে যায়। তা যদি হয় তবে ত রাঁচীর সৌভাগ্য বল্‌তে হবে! মিশনের আট বৎসরের পরিশ্রমের ফলে রাঁচীবাসীর মধ্যে একটু আধ্যাত্মিকতার সাড়া পাওয়া গেছে। যাই হোক্‌, সর্ব্বশেষে শ্রীভগবানের কাছে আমরা প্রার্থনা করি যেন তাঁর শুভ আশীর্ব্বাদে মিশনের অন্যান্য শাখাশ্রমের মত এ আশ্রমটীও অদূরভবিষ্যতে রাঁচীবাসির পক্ষে যথার্থই কল্যাণালয় হ'য়ে উঠে।

শ্রীগদাধর সিংহ রায়

ভ্রম-সংশোধন

গত মাসের সংখ্যায় প্রকাশিত নেশাতত্ত্ব নামক রচনার লেখক শ্রীযুক্ত পশুপতি ভট্টাচার্য্য। ভুলক্রমে তৎস্থলে শ্রীযুক্ত গিরিজা ভট্টাচার্য্য লিখিত হইয়াছিল।
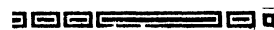
সবুরে মেওয়া

আমিনুল হক্

বহুদিন দেখা-সাক্ষাতের অভাবেই সোমেনের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বটায় ভাঁটা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঠিক্ এক অভাবনীয় মুহূর্ত্তেই তার সঙ্গে আমার দেখা। আমি হন্ হন্ করে ছুটেছিলাম ভবানীপুর অঞ্চলে আমাদের উকীলের বাড়ী। আমার পথের ওপর একটা নবনির্ম্মিত বাড়ীর গেটের সামনে ফুটপাতের ওপর সে দাঁড়িয়েছিল। পরনে গলা-খোলা, হাতকাটা টুইলের শার্ট, সাদা প্যাণ্টালুন, মোজাহীন পায়ে গ্লেস্‌কিডের আলবার্ট সি্লপার। তাকে লক্ষ্য না করে যখন প্রায় তার গা ঘেঁসেই চলেছি, আনন্দ ও বিস্ময়ে সে হঠাৎ এমন চেঁচিয়ে উঠ্‌ল যে আমি থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। পরক্ষণেই আমার ঘাড়ের ওপর হাত রেখে জিজ্ঞাসা কোর্‌ল, 'কি হে বাপু, এমন বেপরোয়া ভাবুবটীর মত কোথায় চলেছ?' আমি 'বল্‌লাম, কী আশ্চর্য্য! তুমি, সোমেন! উঃ কদ্দিন পর।'

আমাকে প্রায় হিড় হিড়্ করে ভিতরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু আমি বল্‌লাম, 'আজ বিশেষ কাজ আছে, এইখানেই খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তা হোক্ না, তারপর আর একদিন অবসর মত হবে; কি কোর্‌ছ আজকাল?

সোমেন—হাঁ, সেইটেই ত মস্ত ভাব্‌বার বিষয় হয়েছে হে! কোন দিকেই ত সুবিধে দেখ্‌ছি না। দাদাকে কত করে তখন বল্‌লুম, বাবার সঞ্চিত Bank balance ভাঙ্গিয়ে আমাকে বিলেত পাঠিয়ে কাজ নেই; কিন্তু না! আমাকে automobile Engineer করাই চাই। সে ত হয়ে এলুম বটে, এখন দুনিয়াটা যে অন্ধকার দেখ্‌ছি। এই কি করি, কোথায় করি, এই চিন্তাতেই প্রায় সাত আট মাস কেটে গেল। কাজের মধ্যে খাই, দাই, পড়ে থাকি, আর যখন ঘরের ভেতরের হাওয়া বদ্‌লানোর একান্ত দরকার হয়ে পড়ে, তখন এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধূমপান ও উন্মুক্ত বায়ু সেবন একসঙ্গে চলে। রাস্তা দিয়ে কত রকম automobile এ চড়ে কত রকম আরোহী-আরোহিণীগণ, তা দেখে দেখে সময় কেটে যায়! আচ্ছা তুমি কি কোর্‌ছ ভায়া বলত?

আমি।—কি আর করি বল। তুমিও সমুদ্র পাড়ি দিলে, আমিও এদিকে ইউনিভার্সিটী পাড়ি দিয়ে বি, এ, পাশ কোর্‌লাম। তারপর শতকরা নিরানব্বই জন যে বেকার সমিতির সভ্য, আমিও তার অন্যতম মেম্বার। চাকুরি-বাকুরি না হয়, শেষে দেশে ফিরে গিয়ে পৈতৃক যা আছে, তাই নেড়ে চেড়ে আরামে খাব দাব এই আশা ছিল, কিন্তু সেখানকার কাণ্ড শুনে আমার মাথা বিগ্‌ড়ে গেছে। বল্‌তে লজ্জা হয়, আমাদের এক মৌলবী সাহেবের পরামর্শে আমার বিধবা মার সঙ্গে আমার বিপত্নীক চাচার বিয়ে হয়ে গেছে। এতে নাকি সম্পত্তি রক্ষার সুবিধে হবে। থাক্‌গে যা হবার তা হয়ে গেছে, আমি প্রতিজ্ঞা কোরেছি, মা ও চাচা উভয়ের মধ্যে অন্ততঃ একজন না মরে যাওয়া পর্য্যন্ত আমি বাড়ীর মুখ দেখ্‌ছি না। এখন যাচ্ছিলাম আমাদের উকিলের পরামর্শ নিতে, আমার উত্তরাধিকারী স্বত্বে কোন অনিষ্ট হয় কি না।

সোমেন—হুঁ, তোমার পক্ষে অসুবিধার কথাই বটে, কিন্তু মাথাটা অত খারাপ কোর্‌লে চল্‌বে কেন; দেখ, ভাব্‌বার কোন প্রয়োজন নাই; দুদিনের জীবন, যতটা পার হেসে খেলে উড়িয়ে দেওয়াই ভাল। Even the darkest cloud has its silver lining; আমি নিজে ঘোর optimistic।

যাক্, আরও খানিকক্ষণ এ রকম সুখ দুঃখের কথাবার্ত্তার পর আমরা সরে পড়্‌লাম।

তিন্ মাস পর। কিছুতেই ভুল্‌তে পারছিনা যে বি, এ পাশ কোরেছি। "মা" বিশ্ব-বিদ্যালয়ের যে-উপাধির বাজারে

কোন মূল্যই হোল না, যে বি এ ডিগ্রীর পসরা মাথায় নিয়ে কত দুয়ারে কত উমেদারি করে করে আজ পর্য্যন্ত কোন কূল কিনারাই পেলাম না, ধিক্ সেই উপাধিকে। হায়রে, এরিই জন্যে অমূল্য জীবনের তেইশ তেইশটা বৎসর কাটল! এরিই জন্য কত কষ্ট, কত চেষ্টা, স্বাস্থ্য নষ্ট, কড়ি নষ্ট। তাও পেটের ভাতের উপযুক্ত মূল্য দিয়ে একে কেউ চায় না! জীবনটা কি তবে এমনি যাবে? নাঃ, দেওয়ালের গায়ে আমারই হাতে লেখা আমার motto জল জল করে যেন আমার দিকে তাকাচ্ছে:—

'জাগো, উঠ, চল সুখে কিসের ভাবনা?
কর্ম্ম জীবনের যন্ত্র,
কর্ম্ম জীবনের মন্ত্র
কর্ম্ম বেদ কর্ম্ম তন্ত্র
পূণ্য তীর্থ কর্ম্মক্ষেত্র,
এ মহা সাধনক্ষেত্রে পরাণ সঁপনা।

কবি! তোমায় নমস্কার!—পরাণ সঁপিতেই হবে। শুনেছি আমার মত এক গ্রাজুয়েট্ ভাই রাস্তার মোড়ে জুতা পালিশ করে পেটের চিন্তার একটা হিল্লে করেছে; আর একজন নাকি এই কল্‌কাতার রাস্তায় রাস্তায় রিক্‌শ টেনে কায়িক পরিশ্রমের মর্য্যাদা বাড়িয়েছে। আর আমি কি কিছু পারি না? পার্‌তেই হবে।—এই ব'লে রবিবারের Statesman খানা হাতে করে নেশাখোরের মত টল্‌তে টল্‌তে আমার এই ছকুখান্‌সামা লেনের মেস্ হতে ছুটলাম—P 64, Ballygunge Avenueর উদ্দেশ্যে। সেখানে পঁহুছে গাড়ী-বারন্দার নীচে কিছুক্ষণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাক্‌বার পর, যিনি দেখা দিলেন, তিনি বাড়ীর একজন চাকর, বোধ হয় উৎকলবাসী। জিজ্ঞাসা কোর্‌লেন, 'এই, কিয়া মাংতাহৈ?"

আমি হাতের কাগজখানি নেড়ে চেড়ে বঙ্গভাষাতেই উত্তর দিলাম, 'এই বাড়ীতে বেয়ারার কাজ খালি আছে, তোমার সাহেব বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, সেই কাজের জন্য এসেছি।'

'আচ্ছা ঠহ্‌রো' বলে ভৃত্য উপরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর Dressing gown পরে সাহেবী কায়দায় যিনি নীচে নেমে আমাকে দেখেও না দেখে আফিস্ কামরায় ঢুকলেন, বুঝতে বিলম্ব হোলো না যে ইনিই কর্ত্তামশায়, মিষ্টার "——" প্রফেসার I. E. S.। তারপর আমার ডাক্ পোড়্‌লো; আমি অতি সন্ত্রস্ত অথচ সরল ভাবে মার্ব্বেল-মণ্ডিত সিঁড়ির নীচে আমার সাড়ে চৌদ্দ আনার কেম্বিসের জুতো ছেড়ে লম্বা সেলাম ঠুকে সাহেবের সামনে হাজির হলাম। এইবার পরীক্ষা আরম্ভ:—

প্রশ্ন—তুম্ boyকা, বেয়ারাকা কাম জান্‌তা হায়?

[পরক্ষণেই আমাকে বাঙ্গালী বুঝিয়া বাংলাতেই বলিলেন, তুমি বেয়ারার কাজ জান?]

উত্তর—আজ্ঞে হুজুর, জানি।

প্রঃ—তুমি কোথায় কোথায় কাজ করেছিলে? কোন সার্টিফিকেট আছে? কি জাত?

উঃ—হুজুর! আর ত কোথাও কাজ করিনি; সার্টিফিকেটও নাই; তবে হুজুর যদি সদয় হন্, তবে আমি কাজ খুব তাড়াতাড়ি শিখে নিতে পারবো। কাজ দেখলে পছন্দ না হয় হুজুর তাড়িয়ে দেবেন। আমি হুজুর, জাতিতে মুসলমান।

প্রশ্নকর্ত্তা এইখানেই শুধু একটা "হুঁ" করিয়া থামিলেন। তার পর আমাকে বাইরে দাঁড়াতে বলে ওপরে বোধ হয় "মেম" সাহেবের পরামর্শ নিতে গেলেন। ওপরের বারান্দা হ'তে যতটুকু কথাবার্ত্তা আমার কাণে এল, তাহার মোটামুটী মর্ম্ম এই যে, Experienced লোকত অনেকবার রাখা গেছে; কিন্তু অনেক সময় তারা অতিরিক্ত পরিমাণে clever ও ফাঁকিবাজ হয়ে ওঠে; দেখা যাক্ না, একটা আনাড়ি লোক নিয়ে। যদি নেহাৎ বোকা না হয়, তাহলে ছোক্‌রা মানুষ, কাজটা চট্ করে শিখে নেবে। আর আনাড়ি বলে হয়ত কাজে খুব আগ্রহ দেখাবে। দেখা যাক্ এটাকে try করে। চেহারা দেখে ত সভ্য ভব্য গোছ চালাক চতুর বলেই মনে হচ্ছে।

যাক্, কপাল ছিল ভাল, তাই আধ ঘণ্টার মধ্যে এই অভিনব চাকুরীতে বাহাল হয়ে গেলাম। মাসিক বেতন মায় খোরাকী কুড়ি টাকা, আর শুকনো ৩০৲ টাকা। আমি 'শুকনো'টাই পছন্দ কোর্‌লাম, কারণ এতে ত তবুও নিজের একটু আত্মমর্য্যাদা, একটু স্বাধীনতা

বজায় থাক্‌বে। আহারের দুঃখ কিছু নেই, কারণ আজকাল যেখানে সেখানে হোটেল, রেস্তরাঁ ইত্যাদি।

বেয়ারার কাজ, কোর্‌ছি, মনের কি এক নেশায়। হাসিও পায়, দুঃখও হয়! আর তাই বা কেন? গ্র্যাজুয়েট্ হয়ে যদি মুচির কাজ কোর্‌তে পারে, রিকৃশ টান্‌তে পারে, তবে আমি এমন কোন্ নবাব সালাবৎ-জঙ্গ-ইহিতাশামদ্দৌলা বাহাদুর যে এমন ভদ্রঘরে ছায়ায় বসে বেহারার কাজ কর্ত্তে পার্ব্বোনা? বিশেষতঃ এখন আমি গৃহহীন, উদ্দেশ্যহীন, এটা যা হোক্ কিছু একটা। সবরমতী আশ্রমে শুনেছি, সবাই এমন কি "মহাত্মা" পর্য্যন্ত ঝাড়ু দেওয়া থেকে রান্নাবান্না সব রকম কাজ নিজ হাতে করেন, আর আমি কোন্ ছার্? হলামই বা সঙ্গতিপন্ন ঘরের ছেলে, তাতে কি হয়েছে। হতে পারে জীবনের এও একটা মহা শিক্ষা।

দিন্ চলে যাচ্ছে বেয়ারা হিসেবে বেশ ভালই। শারীরিক পরিশ্রম বিশেষ কিছুই নয়। উপরন্তু বিনি পয়সায় মোটরে চড়ে বেড়াবার ভাগ্য দিনে অন্ততঃ একবার হয়ই; হয়ত ছেলে মেয়েদের স্কুল পঁহুছানর সময়, নয় সাহেবের কলেজ যাবার সময় কিংবা "মেম্" সাহেবের বাজার কর্‌বার সময়। দুপুর বেলাটায় কাজ প্রায় থাকে না, কাজেই সময়ও কাট্‌তে চায় না। তখন আমার নির্দ্দিষ্ট গুদামে ঝিমুই, নয় কোন কোন দিন সাহেবের আফিস কামরা হতে খবরের কাগজ বা Illustrated Magazine এক আধখানা এনে চুরি করে পড়ি। রাত্রিতে যে দিন সকাল সকাল ছুটি পাই, সেদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরি, না হয় বায়োস্কোপে যাই। চাকুরীর টাকায় ত কুলায় না, তবে আমার পড়ার খরচ বাবদ বাড়ী থেকে এক বৎসরের মত যে টাকাটা এনেছিলাম, সেটা পোষ্টাফিস Savings Bank-এই আছে, কাজেই কোন অসুবিধা নাই। আমি খবরের কাগজ, বই-টই হাতড়াতাম্ বলে বাড়ীর boy আমাকে কেমন এক সন্দেহের চোখে দেখ্‌ত। সে হয়ত ভাব্‌তো যে সেগুলি আমি জমা কোরে বিক্রিওয়ালাদের কাছে বেচ্‌ব। একদিন ত ব্যাটা আমাকে ভারী ফাসাদেই ফেলেছিল আর কি। সেদিন মুনিবের বড় মেয়ে, যাঁহাকে বাড়ীর রীতি অনুসারে "দিদিমণি" বলা হোতো এবং যিনি Diocesan College এ পোড়্‌তেন, নিজের পড়ার ঘরে কি একটা বই খুঁজে খুঁজে পাচ্ছিলেন্ না। বয় তাঁর ব্যস্ত ভাব লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা কোর্‌ল, "কি খুঁজছেন দিদিমণি?"

দিদিমণি বল্‌লেন, "ওরে আমার একটা বই পাচ্ছি না, ঐ যে বড় মোটা বই যেটা what-not এর ওপর থাকৃতো; দেখ্ ত কোথায় গেল।" আমি তখন বাড়ীর অন্য দিকে কাজে ছিলাম, এ ব্যাপার কিছুই জান্‌তাম না। বয় ব্যাটা সুট্ করে আমার গুদাম ঘর হ'তে বইটা এনে হাজির কোর্‌লো। দুদিন পূর্ব্বে সেটা আমি পড়্‌বার জন্য নিয়ে গেছ্‌লাম, যথাস্থানে রাখ্‌বার কথা মনেই ছিল না। বইটা হচ্ছে একটা Girls' Annual.।

অবশ্যি বই পেয়ে দিদিমণি ত মহা খুশী। বয়কে জিজ্ঞাসা কোর্‌লেন, 'কি রে কোথায় পেলি?'

'আজ্ঞে, আমাদের নতুন বেয়ারার ঘরে'।

'বেয়ারার ঘরে? সে কি রে? সে কেন নিয়ে গেছ্‌ল আমার বই, চুরি করে বেচ্‌বার জন্য বুঝি? ডাক্ ত তাকে এখানে।'

আসামী হাজির। জেরা হ'ল 'তুমি এ বই নিয়ে গেছ্‌লে কেন?'

'আজ্ঞে, হুজুর দিদিমণি, আমিই নিয়ে গেছ্‌লাম। দুপুর বেলা হাতে কাজ থাকে না, তাই ছবি দেখ্‌বার জন্যে'।

'মিথ্যে কথা। ছবি দেখ্‌বার জন্যে না চুরি করে বেচবার জন্যে?'

'আজ্ঞে হুজুর দিদিমণি, অমন কথা বল্‌বেন্ না। গরীব ভদ্রঘরের ছেলে আমি, পেটের দায়ে না হয় চাকুরী কোর্‌ছি, তাই বলে চুরি কোর্ব্বো? হুজুররা লেখাপড়া শিখ্‌ছেন, আমরা মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, এক আধটু ছবিও দেখ্‌তে পাই না?'

'বেশ্‌ত, ছবি দেখ্‌বে ত আমাকে বলে নিলে না কেন? ফের যদি কোন বই হারায়, তাহলে তোমার

মাইনে থেকে পুরো দাম কাটাত যাবেই উপরন্তু জরিমানা হবে, বুঝলে। সাবধান।'

'আজ্ঞে হুজুর, তাই কোর্ব্বেন, আমরা গরীব দুঃখী মানুষ।'

এ যাত্রা ব্যাপারটার মীমাংসা সেখানেই হোলো বটে, কিন্তু দিদিমণির সেই রাগ-ভারাক্রান্ত চেহারা মনে যেন একটা দাগ কেটে দিয়ে গেল।

আর একদিন ওমর খৈয়ামের একখানা বেশ বড় সচিত্র Edition নিয়ে গেছ্লাম। বইটে ছিল পোষাণী, আলমারীর ভেতর। মনে হয়েছিল, এটার কেউ সহজে খোঁজ করবে না। সে দিন ছিল শনিবার, ছোট দিদিমণি তার হাফ্ স্কুল হতে ফিরে এসেছেন সঙ্গে একজন সমপাঠী নিয়ে। দুই বন্ধুতে অপরাহ্ণটা কাটাবার নানা রকম পন্থার মধ্যে ইহাও আবিষ্কার করে ফেল্লেন যে ভাল ভাল ছবির বই বের করে বসে বসে ছবি দেখ্তে হবে। এক আধখানা এদিক ওদিক দেখার পর খোঁজ পোড়্লো "ওমর খৈয়ামে"র। বইটা যখন যথাস্থানে পাওয়া গেল না, তখন ইতিপূর্ব্বেকার বদ্নামের জন্য আমারই গুদামঘর খানাতল্লাসী হ'তে লাগল। বড় দিদিমণি স্বয়ং এ যাত্রা খানাতল্লাসীর "বড় দারোগা"। সঙ্গে ছোট বোন ও তার সমপাঠী সাধারণ force, অর্থাৎ বুঝি জমাদার কনষ্টেবল হিসেবে। আমি তখন বাড়ীতেই ছিলাম না, কোন ফরমাইশে একটু দূরেই গেছলাম।

সেই দিন সন্ধ্যার দিকে বাড়ীর আব্হাওয়ার রকমে একটু একটু বুঝতে পার্লাম যে এ বাড়ীতে আমার চাকুরীর পরমায়ু আর বেশী দিন নাই। দিদিমণির রকম সকম দেখে বোঝা যাচ্ছিল যেন কত বড় কাজ করেছেন,—আসামী পাকড়াও করেছেন, এখন জেলে দিতে পার্লেই হয়। আমি যে চুরি-বিদ্যা জানি, সে বিষয় কোন সন্দেহই থাক্তে পারে না, তা না হলে আমার গুদোম ঘরে এক জোড়া দামী পামশুই বা কোথেকে আসে, আর অমন এক জোড়া ভাল ফরাস ডাঙ্গার ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবী, ভাল একখানা ফ্যান্সি আয়না, চিরুণী ও ব্রাশ যাহা বেশ একটু বাবু লোক ছাড়া কেউ ব্যবহার কোর্তে পারে না! বলা বাহুল্য যে, "ভদ্রলোক" সেজে বের হবার জন্য আমাকে কিছু কিছু এ সব উপকরণ আমার নির্দ্দিষ্ট গুদোম ঘরে রাখ্তে হোতো।

পরদিন সকালে যখন গিন্নিমা আমাকে এই প্রসঙ্গে জেরা করতে লাগলেন, তখন আমি অতি বিনীত ভাবে শুধু এই কথা বোল্লাম যে আমার বাবা মৃত্যুকালে সামান্য কিছু টাকা রেখে গেছ্লেন; আমি ত আর বিয়ে সাদী করিনি যে কারুর জন্য ভাব্না কোর্ব্বো, তাই কিছু ভাল কাপড় জামা করে রেখেছি, মাঝে মাঝে পরি। আর দুসার খানা ভাল কাপড় জামা ইত্যাদি কোর্তে গেলে যে চুরি কোর্তে হবে তার কোন মানে নাই।

বড় দিদিমণি দাঁড়িয়েই ছিলেন; বোল্লেন, 'দেখেছ মা, কি রকম impertinent হয়ে উঠেছে; তর্ক কোর্তে শিখেছে। না! the sooner he goes the better."

ব্যাপার বুঝতে পেরে আমি শুধু বল্লাম, হুজুররা রাখেন, না রাখেন, হুজুরদের ইচ্ছা; তবে আমি দিদিমণিকে বলেছিলাম যে যদি আপনার বই হারায়, তাহলে আমার মাইনা থেকে কেটে নেবেন।

সাত মাস পরের কথা। এ সুদীর্ঘ সময়টা নিজেকে জোর করে প্রায় সকল রকম সম্বন্ধ হতে দূরে রেখেছিলাম। একদিন আমাদের মুসলমানদের একটা পরব উপলক্ষে ছুটী পেয়ে বন্ধুবর সোমেনের সঙ্গে দেখা কোরতে গেলাম। বন্ধু তাদের সেই ফটকের নীচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রকাণ্ড এক বার্ম্মা সিগার ফুঁকছে। আমাকে দূর থেকে দেখেই বল্লে, 'আরে এস এস, তুমি যে দেখি ঈদের চাঁদ হয়ে পোড়েছ, এতদিন টিকিটাও দেখ্তে পাইনি।'

আমি সে কথার উত্তর না দিয়ে বল্লাম, 'আচ্ছা এ কি ব্যাপার হে! যখনই দেখি, তখনই তুমি এ ফটকের নীচে দাঁড়িয়ে, নিশ্চয়ই এর ভেতর একটা 'কিন্তু' আছে! কোথায় এ সুন্দর সন্ধ্যাটা Strand-এর দিকে drive-এ বেরুবে, না এখানে দরোয়ানি কোর্ছ। Automobile Engineering কতদূর হোলো?'

'হাঁ Engineering হচ্ছে বই কি, আরও কত কি হচ্ছে। আপাততঃ দাদার পুরাণো মোটরে হাত মক্স

করছি, গাড়ীটায় একটা-না-একটা ব্যাধি লেগেই আছে। দাদাকে বলি, দাদা ওটাকে এবার ফেলে দাও; দাদা হেসে বলেন, 'ওরে ও যে বনেদী জিনিষ, ওকে ছাড়তে আছে? ওর গুণের কথা কি বোলবো,—তোর বিলেত যাবার দ্বিতীয় বৎসরে তোর বৌদিকে নিয়ে যখন কাশ্মীরে গেলাম, এতবড় লম্বা রাস্তায় একটুকুও কষ্ট দেয়নি; বিশেষতঃ তুই অত বড় Engineer, ওটাকে ব্যাধিমুক্ত করে ফেল্। আচ্ছা, এখন চল ভেতরে।'

ভেতরে গিয়ে বসার পর সোমেন বোল্তে লাগল, 'আর এক ফ্যাসাদে পড়েছি, ভায়া,—একেবারে ২৪৩৩৩।'

আমি হেসে বল্লাম, 'সে কি ব্যাপার হে; অত টাকা ভেসে গেল না কি?'

সোমেন—'না হে না; টাকা ফাকা নয়। ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে আমাকে বে' কোরতে হবে। পেটের ভাতের এ পর্য্যন্ত ত কিছু যোগাড় হোলোনা, ওদিকে ত বাড়ীতে তাগাদা হচ্ছে, একটা বৌ আন্তে হবে। আমাদের Indian ঘরে এটা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার জানইত। বৌ নিজে পছন্দ করবার 'magna charta' পেয়েছি। তাড়াহুড়ো আমার নেই, তবে একটা নতুন idea মনে গজিয়েছে। এই বাড়ীর সামনে দিয়ে কত রকম গাড়ীতে কত রকম মেয়ে যায়, মনে ভেবেছি, যদি কোন দিন ঝপ্ করে কোন কুমারী মেয়ে চোখে লেগে যায়, তারই পাণি-প্রার্থনা কোর্ব্বো। একদিন সতিসত্যিই একটা মেয়ে চোখে লেগে গেল; গাড়ীর নম্বরটা তৎক্ষণাৎ টুকে রাখ্লাম ২৪৩৩৩, Austin 12. গাড়ীতে দুটী মেয়ে আর একটা ছেলে ছিল। বড় মেয়েটীর কথাই বল্‌ছি।'

কথা শুনে ত আমি অবাক্; ২৪৩৩৩ নং শুনে একরকম চম্‌কেই গেলাম। এ যে আমার মুনিবের গাড়ী, কি আশ্চর্য্য coincidence! নিজকে সংবরণ করে বোললাম, 'আচ্ছা তার পর?'—

'তার পর আর কি; আমি এখনও কাউকে কিছু বলিনি, তবে বন্ধু, তুমি যদি একটু সাহায্য কোরতে পার। উপস্থিত এই গাড়ীটার খোঁজ নিতে হবে, তার পর গাড়ী ঠিক হোলে, গাড়ীর মালিকের নাগাল মিলবে, আর গাড়ীর মালিকের নাগাল মিল্‌লে, মালিকের মেয়ের নাগালের চেষ্টা করা যাবে। কিন্তু সেটা আমার "jurisdiction" এর বাইরে; তখন বাড়ীর কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে।'

আমি—'বাহ্‌বা! বাহ্‌বা! বিয়ে করার কি নভেল idea। Engineer-এর মাথায় যাহোক্ originality আছে। আচ্ছা ধর মেয়েটা যদি বাক্‌দত্তা হ'য়ে থাকে, যদি তার বাপ মা এখন তার বে না দিতে চায়, যদি তোমাদের কুষ্ঠি ইত্যাদিতে না মেলে, এসব কত রকম বাধা আছে—'

সোমেন—"আরে যাও, যাও ওসব ছেড়ে দাও এখন। বুঝ্‌ছ না, its a sporting chance. কপালে থাকে, হবে, নয় নাই হবে। না হলে, আমি ত হাতে কমণ্ডলু নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি না।"

আমি—'হাসালে যা হোক্, সোমেন। আচ্ছা, যদি এ বিষয়ে কিছু সাহায্য কোরতে পারি, নিশ্চয়ই কোর্ব্বো। রাত্রি অনেক হোলো, এখন উঠি।'

আজ ক'দিন হতে মনের ভেতর একটা দ্বন্দ্ব চলেছে, বেশ বুঝতে পারছি। আমার বর্ত্তমান পারিপার্শ্বিক বেষ্টনীর যে দিক্‌টায় আজ পর্য্যন্ত মনের কোন আকর্ষণের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বুঝ্‌তাম না, এবং যে সম্ভবপর আকর্ষণ হতে নিজেকে বরাবর অতি সংযত ভাবে রক্ষা করে এসেছি, এবং মনে কোর্‌তাম যে, আমার দিক্‌টা এবং সেই দিকটার মাঝখানে যে ব্যবধানটা রয়েছে, তাহা হিমালয়ের মত অলঙ্ঘনীয়, সেই দিক্ থেকেই আমার মনের ওপর একটা জুলুম চলেছে। বন্ধুবর সোমেনই এর জন্য দায়ী, কারণ "দিদিমণিই" যে তার লক্ষ্য বস্তু, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সে-ই আমার এবং তার অজ্ঞাতসারে "দিদিমণির" জন্য তার দৃষ্টির তুলি দিয়ে আমার চোখেও রং লাগিয়ে দিয়েছে। মনে হচ্ছে দিদিমণির জন্য আমার অস্তিত্বের কোন অঞ্চল হতে এতদিনের পুঞ্জীভূত, ঘুমন্ত গভীর অনুরাগ আজ সহসা জেগে আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। আমার দৈনন্দিনের শাদাসিদে মন আজ মুনিব ও চাকরের মাঝখানের বেড়া ডিঙ্গিয়ে তাঁহাকে দেখ্‌বার জন্য, ভালবাস্‌বার জন্য আকুল। জীবনের একি আশ্চর্য্য অনুভূতি। আমার এ "চাকরের"

মনকে প্রশ্রয় দিলে ত চল্‌বে না, তাই কাজের ফাঁকে ছুটলাম একবার সোমেনের সঙ্গে দেখা কোর্‌তে।

আমাকে দূর থেকেই দেখে বল্‌ল, 'এস এস, কিছু সুখবর আছে?'

আমি—'হাঁ আছে বই কি; কি বখ্‌শিশ্‌ দেবে শুনি?'

'যা চাইবে তাই; আমার মানস-প্রতিমাকে আগে পাইয়ে দাও, তারপর তোমার জন্য না হয় ফরহাদের মতো পাহাড় কেটে শিরীণ সুন্দরীকে এনে দেবো।'

কথাটা শুনে আপনা আপনিই একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল। শুধু এই কথা বল্‌লাম, 'বন্ধু ব্যস্ত হয়ো না, জানইত সবুরে মেওয়া ফলে।' বেশী আর দাঁড়াতে পারছিলাম না, বল্‌লাম,' আজ এই পর্য্যন্ত।'

তিন দিন পর। কাজ কোর্‌তে কোর্‌তে সুযোগ বুঝে; গৃহকর্ত্রীকে বল্‌লাম, 'মা, একটা কথা আছে, যদি কিছু মনে না করেন।'

একটু বিস্ময়ের সঙ্গে বল্‌লেন, 'কি কথা বল্ তুই চলে যেতে চাস্ না কি? আমাদের পুরানো বেয়ারা এলেই ত যাবি।'

'আজ্ঞে হুজুর, সেকথা নয়। কথাটা হবে ছোট মুখে বড় কথা, কিন্তু সত্যি কথা।'

'আচ্ছা বল্‌ত শুনি।'

আমি অতি সহজ সরল ভাবে বল্‌লাম, 'দিদিমণির জন্য একটা বিয়ের প্রস্তাব আছে; বরেরা বেশ ভাল ঘর, এবং বর নিজেই বিলেত ফেরত 'ইঞ্জিনীরিং' পাস্।...'

কথা শেষ হতে না হতেই গিন্নীমা একটু রাগের স্বরে বল্‌লেন, 'ছ্যাথ্, ছোটমুখে এসব বড় কথা কেন? তোকে কে বল্‌লে যে মেয়ের বে দেবার জন্য আমরা উৎসুক হয়েছি? যা নিজের কাজ কর।'

আমি একটু ক্ষুণ্ণ হলাম। কিন্তু মনে আনন্দও হোলো যে সোমেনের প্রতি বন্ধুর কর্ত্তব্য একটা কোরেছি। অতঃপর সোমেনকে এদের বিষয় সব সংবাদ দিলেই তারা যা হয় একটা ব্যবস্থা কোর্ব্বে। তাদের বাড়ীর লোক এ বাড়ীতে যাওয়া আশা কোর্ব্বে এই সব সাত পাঁচ ভেবে আমি একদিন না বলেই সরে পড়লাম। দিন কয়েক পর, "দিদিমণির" জন্মদিন উপলক্ষে প্রায় ৫০৲ পঞ্চাশ টাকার ভাল ভাল বই কিনে আমার মেস্ হতে ঠিকানা না দিয়েই পার্শ্বেল-যোগে পাঠিয়ে দিলাম; তৎসঙ্গে একখানি ছোট চিঠিও দিলাম;—

"দিদিমণি, নমস্কার। না বলে চ'লে এসেছি, হুজুররা অপরাধ মাফ কোর্ব্বেন। আপনার শুভ জন্মদিন উপলক্ষে আমি গরীব মানুষ গোটা কয়েক বই উপহার পাঠালাম। গরীবের বলে উপেক্ষা কোর্ব্বেন না। আমার যে মাইনেটা পাওনা আছে, তা' হুজুর দয়া কোরে আপনার প্রাইভেট সেভিং ব্যাঙ্কস্ একাউণ্টসে রেখে দেবেন; অভাবে পড়লে একদিন নিয়ে আস্‌বো। ইতি—হুজুরের চাকর।"

প্রায় এক বৎসর পরের কথা। ইতিমধ্যে অনেক ঘটনা ঘটেছে। আমাদের বাড়ীর কর্ত্তা চাচা-সাহেব এখন পরলোকে। ইতিপূর্ব্বে আমাকে বাড়ী ফেরবার জন্য মা অনেক চেষ্টা তদ্বির করেছিলেন, আমি যাইনি। শেষে নিজে এসে অনেক মাতৃসুলভ কাঁদাকাঁটির পর আমাকে দেশে নিয়ে যান। বি, এ পাশ কোরে যখন কোন চাকুরি বাকুরির সুবিধা হোলোনা, আর সম্পত্তিতে আমার অধিকারের কোন ভয় নাই, তখন বিলেত যাওয়া ঠিক কোরে কোলকাতা এসেছি সব যোগাড় পত্র কোর্‌তে। সোমেনের সঙ্গে দেখা কোর্‌লাম তার হাজরা রোডের কারখানায়।

আমাকে পেয়েই ত সে Hallo old boy! বলে খুব হাত ঝাকনি দিলে, তার পর প্রগাঢ় আলিঙ্গন। কাজ ছেড়ে হিড়্ হিড়্ করে আমাকে টেনে তার মোটরে বসিয়েই ছুট একেবারে তার বাড়ীতে। আমাকে এতক্ষণ একটা কথা বলতেই দিলে না। Drawing Roomএ বসিয়েই বল্‌ল, 'আচ্ছা শেষে তুমি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলে বলত? আমি ভাবলাম বুঝি বা তুমি কোন্ "শিরীণের" জন্য উধাও হয়ে কোথায় চলে গেছ। যাক্, একটু বোস, তোমারি অনুগ্রহে পাওয়া আমার মানস প্রতিমাকে ডেকে আনি।'

আমি অতি প্রশান্ত, গম্ভীর ভাবে বসেই ছিলাম। যখন সত্যিই "দিদিমণি" এলেন, তখন আমার বুক ঢিপ্ ঢিপ্ কর্‌ছিলো। সোমেন্ বল্‌ল, 'আমার অন্তরঙ্গ বাল্যবন্ধু,

আনোয়ার।' আমি দাঁড়িয়ে অতি বিনীত ভাবে নমস্কার কোর্‌তেই তিনি আমার দিকে চেয়ে যেন বিস্ময়-বিহ্বল হয়ে গেলেন। একটু থেমে বল্‌লেন, 'আপনার প্রশংসা অনেক শুনেছি, পরম সুখের বিষয় যে আপনি এসেছেন।'

খানিকক্ষণ আলাপের পর, সুযোগ বুঝে পকেট থেকে হীরের ক্রচ্‌টা বের করে দিদিমণির হাতে দিতে দিতে বল্‌লাম, 'দেখুন, সোমেন্‌টা বিয়ের সময় বড্ড ফাঁকি দিয়েছে; কিন্তু আমার কর্ত্তব্য আমাকে কোর্‌তেই হবে, এই ক্ষুদ্র উপহারটা নিয়ে বন্ধুত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করুন।'

"দিদিমণি" সেটা নিতে নিতে বল্‌লেন, 'এ কিন্তু বড্ড বেশী হচ্ছে, কি দরকার ছিল বলুন ত? বন্ধুত্ব কি উপহারের অপেক্ষা করে? আচ্ছা, আমার খুব মনে হচ্ছে আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি। হয় আপনি, না হয় ঠিক আপনার মতনই চেহারার লোক্।'

আমি হেসে বল্‌লাম, 'তা হবে; এক চেহারার দুজন লোক সংসারে বিরল নয়। আমার এক বন্ধু বালীগঞ্জ অঞ্চলে থাক্‌তেন্। তাঁর কাছেই শুনেছিলাম, যে সেই অঞ্চলে ঠিক আমার মত চেহারার এক বেয়ারা নাকি কোন বড় অফিসারের বাড়ী কাজ কোর্‌তো।'

"দিদিমণি" একটু আশ্চর্য্য হয়েই বল্‌লেন, 'ওঃ তাই নাকি? ঠিক ঠিক, এখন মনে পড়েছে, হাঁ আমাদের বাড়ীতেই একটা বেয়ারা……।'

সোমেন ব'লে উঠ্‌ল, 'কি বিপদ! তুমি কি শেষকালে আমার অমন প্রাণের বন্ধুটীকে তোমাদের বেয়ারার সামিল করে দিচ্ছ?'

সবাই হেসে উঠ্‌লাম, 'তাতে আর কি হয়েছে? জন্মান্তর বাদে বলে, মানুষ কর্ম্মফলে ভিন্ন ভিন্ন জন্মগ্রহণ করে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পায়। আমি বলি, না মরেই মানুষ এক জীবনেই কত রকমে না রূপান্তরিত হয়; আজ বেয়ারা, কাল হয়ত মুনিব; আজ গরীব, কাল হয়ত ধনী; আজ হয়ত ছাত্রী, কাল হয়ত গৃহিণী। এই ধরুন না, আমি একটী কুমারীকে ভাল বাস্‌তাম, কিন্তু আজ হয়ত সে কোথায় কার অঙ্কলক্ষ্মী হয়ে বিরাজ কর্‌ছে।'

সোমেন উচ্চৈস্বরে হেসে উঠল; 'তাই না কি হে, তুমিও প্রেমে পড়েছিলে ভায়া? কিন্তু কই কোনদিন ত একথা বলনি, এযে ভায়া যাকে বলে sinking sinking drinking water. বলি, তোমার কল্যাণে ত আমি "মেওয়া" পেয়ে গেলাম, এখন বল ত তোমার "মেওয়ার" যোগাড় দেখি।'

আমি বোল্‌লাম 'না হে না, আমার জন্যে কষ্ট করতে হবে না, কারণ আমার "মেওয়া" চলে গেছে, এখন কেবল সবুরটাই আছে।'

দেড় বৎসর পরের কথা বল্‌ছি। সোমেনের একটী পুত্র-সন্তান হবার খবর যখন বিলেতে পেলাম, তখন কিছু উপহার পাঠাবার সঙ্গে তার স্ত্রীকে একখানি চিঠি দিলাম,—

"দিদিমণি!" নবকুমারের দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া সামান্য কিছু উপহার পাঠাইলাম। ইতি—আনোয়ার (আপনাদের সেই ভূতপূর্ব্ব বেয়ারা)।

আমিনুল হক্

শাশ্বত কালের বুকে

[শ্রীঅরবিন্দ]

অতি দূরে একখানি দৃশ্যমান পাল
একঘেয়ে নিত্য-নীল তন্দ্রা-ঘেরা মহোদধি বুকে,
শক্তির সাম্রাজ্য এক মন্দ্র-শান্ত রয়েছে বিধৃত
নীলোজ্জ্বল বর্ণের প্রতীকে যেন অন্তহীন স্তব্ধতায় ;
তারি ঊর্দ্ধে ত্বিষাম্পতি---সুবর্ণ গোলক যেন
দেবতারা ক্রীড়াচ্ছলে ফেলেছে ছুঁড়িয়া—
আবর্ত্তন করি' চলে আপনার বঙ্কিম সরণি,
কালের জ্বলন্ত আঁখি স্থবির সময়ে সদা
রত নিরীক্ষণে।
এইখানে কিম্বা আর আর কোনোখানে
—পর্ব্বতের দুরারোহ তুষার-নির্জ্জন উচ্চতারে
নিজ বক্ষে বাঁধি—
পৃথ্বী তোলে শির তার
ঊর্দ্ধলোকে অসীম জ্যোতির রাজ্যে দীপ্ত অভীপ্সায়,—
তারপর ভেঙ্গে পড়ে শ্রান্ত ক্লান্ত কষ্টশ্বাস
অর্দ্ধমৃত প্রায় ;
কিম্বা কোন্ ধূ-ধূ-করা বহ্নি-তপ্ত রিক্ত শুষ্ক
মরুভূর ক্ষুধিত আত্মায়
একটী নিশ্বাস পড়ে, একটী ক্রন্দন ওঠে
কিম্বা ফোটে এক রশ্মি-রেখা
শাশ্বতের চিত্ত হতে,
যেন খণ্ড অংশে অংশে বিম্বিত পুরাণ সেই
পূর্ণ মহীয়ান্।

এক এক মুহূর্ত্ত শুধু—কিন্তু তারি মাঝে
বিপুল অনন্তকাল বিরাজে সংহত স্থির
অ-সঙ্গ নির্জ্জন।
কালের গতির চক্রে ইন্দ্রিয়-রভসে বন্দী
আত্মার লীলায়
লক্ষ লক্ষ এই যে নিমেষ
ক্ষণিক বিলাস করি পুনঃ ম'রে যায়,
এই সব নিমেষের মাঝে
—মানুষের মহান্ প্রকাশে, সঙ্গীতের পক্ষ-মেলা
সুরের কম্পনে,
স্পর্শ-সুখে, ধ্বনির গমকে কিম্বা হাসির চমকে—
কি যেন প্রতীক্ষমান চির প্রতীক্ষায়,
কি যেন সঞ্চরি' ফেরে চির অস্থিতিতে হয়ে
চির বাসহীন—
এক মহা নাস্তি হ'য়ে সর্ব্ব-অস্তি-রূপী
শাশ্বত কালের বুকে, হেরি,
নিগূঢ় রহস্যে রাজে পরম কৌতুকে !

In horis aeternum
নামক ইংরাজী কবিতার
অনুবাদ

অনুবাদক—শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

প্রবাসীর সাহিত্যচর্চ্চা

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

আমায় যে-প্রকার পদবী দ্বারা আজ গৌরবান্বিত ক'রেচেন তার জন্য অযোগ্যতা জ্ঞাপনের একটা চিরাচরিত বিনয়োচিত প্রথা আছে। আমার কিন্তু একটা কথা মনে প'ড়ে গেল,—বিনয়ের মধ্যে একটা মিথ্যার গৌরব আছে, অর্থাৎ বিনয় হ'চ্চে নিজের শক্তি-সমৃদ্ধির অস্তিত্বটাকে অস্বীকার করা। সেইজন্য যে প্রকৃতই অশক্ত বা অসমৃদ্ধ তার জন্যে ওটা নয়। যে দৌলতখানায় থাকে সে যখন সেটাকে গরীবখানা ব'লে অভিহিত করে সেটা হয় শোভন বিনয়; যে গরীবখানারই মালিক সে ঐ কথাটা ব'লে পরিচয় দিতে গিয়ে অলঙ্কার শাস্ত্রমতে পুনরুক্তি দোষে দোষী হয় মাত্র। আমার মনে হয় সাহিত্যের আসরে গোড়াতেই অলঙ্কার শাস্ত্রকে চটিয়ে কাজ আরম্ভ করা সমীচীন নয়। তাই বিনয়ে বিরত হ'লাম।

আপনাদের এই সম্মেলনী বয়সে শিশু, কিন্তু এর জন্মতিথি দেবী সরস্বতীর এমনি একটি পুণ্য পূজার দিন শুনে এর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বেশ আশান্বিত হ'তে পাচ্চি। সুজাত শিশুর একটা শুভলক্ষণ তো এর মধ্যে চাক্ষুষ ভাবেই পাওয়া যাচ্চে—তা এর প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্য, যেটা এ আপনাদের সমবেত আগ্রহের মধ্যে থেকে আহরণ ক'রে নিচ্চে।

আপনারা ব'লবেন এদেশে আমাদের নিজের পরমায়ুই যে রকম দিন দিন সন্দেহের বিষয় হ'য়ে দাঁড়াচ্চে তা'তে আমাদের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে খুব উচ্চ আশা পোষণ করার কোন মানে হয় না। কথাটা সত্য, কিন্তু আমার মনে হয়, অংশতভাবে। অর্থাৎ একেবারেই যে সমস্ত প্রবাসী বাঙ্গালী সমাজকে এদেশ থেকে কিম্বা অপর সব প্রবাসভূমি থেকে তল্পিতল্পা বেঁধে ঘরমুখো হ'তে হবে একথা আমি বিশ্বাস করি না। পৃথিবীর কোন প্রবাসী জাতের ইতিহাসেই এ ধরণের ব্যাপার পাওয়া যায় না। আদিকালে নেহাৎ গায়ের জোরের যুগে অল্প খানিকটা জায়গা নিয়ে কোথাও কোথাও হ'য়ে থাকবে, কিন্তু খুব ব্যাপকভাবে যে হ'য়েচে এর উদাহরণ পাওয়া যায় না। খুব আশ্চর্য্য হ'লেও অতি আধুনিক সময়ে জার্ম্মেনিতে এর পরীক্ষা চ'লেচে,—সেখানকার ante-jew বা 'য়িহুদি-ভাগো' আন্দোলনে। কিন্তু হিট্‌লারের জার্ম্মানি শক্তির মত্ততায় যা ক'রচে তার বিরুদ্ধে সারা বিশ্বের অভিমত কি কঠোর ভাব ধারণ ক'রেচে তা আপনারা জানেন। এ হেন জনবিরোধী মতবাদ যে সাধারণ্যের মনে কায়েমী হ'য়ে আসন পাততে পারবে সে ভয় নেই। আপনারা জানেন হিট্‌লারকেও এরই মধ্যে বহির্জ্জগতের মতের চাপে দু'একবার যাকে বলে—উঠে আবার সিঁড়ি বেয়ে গুটি গুটি নেমে আসতে হ'য়েচে।

আমি একটা চূড়ান্ত অবস্থা অনুমান করে নিয়ে কথাটা ব'ললাম। সাধারণ ভাবে ব'লতে গেলে বেশ নিশ্চিন্ত ভাবেই বলা যায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিকেরা যতই না কেন নিজের নিজের ঘরে চারিদিকে বেড়া তোলবার চেষ্টা করুন, তা টিকবে না। টিকবে না সে প্রত্যক্ষভাবে অর্থনৈতিক কারণে, আর পরোক্ষভাবে এই কারণে যে, সমস্ত প্রাদেশিকদের ইচ্ছানুসারেই হোক বা ইচ্ছার বিরুদ্ধেই হোক সমস্ত ভারত অমোঘ এবং অপ্রতিহত ভাবেই একজাতিত্বের পথে অগ্রসর হচ্চে। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্ক্রিয়া দূরত্বের বিনাশ করে, স্থূল ভাবে, এবং সারা পৃথিবীর পরিবর্দ্ধমান একমানবত্বার বোধ এবং সারা ভারতের অতীত ইতিহাসের ধারা এবং বর্ত্তমানের আশা আকাঙ্ক্ষা সূক্ষ্ম ভাবে এই মিলনে সাহায্য ক'রচে।

তাই মনে হয় আমাদের এদেশ থেকে মুছে যাওয়া তবেই সম্ভব হবে যদি আমরা সেটা নিজেই চাই—অর্থাৎ জীবনসংগ্রামে পৃষ্ঠপ্রদর্শন ক'রে ঘরের ছেলে ঘরে গিয়ে বসি।

সেটা ঘটতে পারে নিতান্তই প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী। যোগ্যতা হারালে প্রবাসে পরের আওতার মধ্যে কেন, নিজের ঘরে পূর্ণ স্বাধীনতার মধ্যেও কি অবস্থা হয় তা বাঙ্গলার রাজধানীর যে-কোন একটা রাস্তার দুধারে নজর ফেরালেই বুঝতে পারা যায়।

তবে একথা নিশ্চয়ই স্বীকার্য্য যে আমরা এদেশে আমাদের পূর্ব্ব গৌরব ফিরে পাব না। পাওয়া যে উচিৎই একথা কি আমরা বুকে হাত দিয়ে ব'লতে পারি? গত শতাব্দী ব্যাপিয়া ইংরাজের বিজয়ের সাথে সাথে বাঙ্গালীর যে উপ-বিজয় হয়েছিল সেটা ছিল একটা phenomenon; তার বোধ হয় কিছুদিন পূর্ব্বে পর্য্যন্ত দরকার ছিল, তার দ্বারা উপকারই হ'য়েচে; কিন্তু একটা উপজাতির উপর অপর একটা উপজাতির, কোন ব্যাপারেই কায়েমী ভাবে আধিপত্য সমগ্র মহাজাতির পক্ষে কখনই কল্যাণপ্রসূ নয়। তা'তে ক'রে যারা চাপা রইল তারা তো গেলই, যারা আধিপত্য ক'রলে তারাও শেষ পর্য্যন্ত ক্রমবর্দ্ধমান আত্মম্ভরিতার অমূললতায় জড়িয়ে প'ড়ে নিজের শক্তি হারাতে থাকে। আমাদের এক সময় ছিল চাকরির মনোপলি উত্তর ভারতে, তাতে আমরা এসব দেশে একটা কৃত্রিম অভিজাত্যের শ্রেণীতে উন্নীত হ'য়ে বিরাজ ক'রছিলাম;—উনবিংশ শতাব্দির কুলীনত্বও ব'লতে পারেন। এই কৌলিন্যের বল্লালসেন ছিলেন ইংরাজ, কাজেই তাঁদের প্রতাপের আঁচে আমরাও আমাদের মর্য্যাদা বেশ নিরুপদ্রবে ভোগ ক'রে আসছিলাম।

পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশের জীবনধারার পরিবর্ত্তনের জন্য আমাদের মনোপলিতে একটা আঘাত এসে লাগল। আমরা আয়াসের মোহে যে-স্থানটি আঁকড়ে পড়েছিলাম তাতে আমাদের সংঘর্ষটা বাধল এদেশের intellingentia-র সঙ্গে—বিশেষ ক'রে সেই intelligentia ক্রমেই যেমন যেমন অধিকতরভাবে চক্ষুষ্মান হয়ে উঠতে লাগল এবং ক্রমেই পাশ্চাত্য শিক্ষার অধিকতর বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক সমস্যা যেমন জটিলতর হ'য়ে উঠতে লাগল।

এই intelligentia সব দেশেরই ভাগ্যনিয়ন্তা—আমাদের নিজের দেশেও, এদেশেও, পৃথিবীর সকল দেশেই; সুতরাং তাদের সঙ্গে সংঘর্ষে ব্যাপারটা ঐ রকম হওয়াই স্বাভাবিক, তবে জাতির দোহাই দিয়ে যেখানে ব্যক্তিগত স্বার্থের সংঘাত হ'য়েচে সেইখানেই কুৎসিত ঈর্ষার স্ফুলিঙ্গ বেরিয়ে নারকীয় দাহের সৃষ্টি ক'রেচে।

আমি এ জিনিষটা নিয়ে বেশী কথা বাড়াতে চাই না; কেন না এই যে সব-দেশ সব-দেশের মধ্যে প্রবেশ ক'রচে এর বড় দিকটাই আমায় মুগ্ধ করে। কারণ তার মধ্যেই আমাদের ভবিষ্যৎ। এই ভবিষ্যৎ অপ্রতিহত ভাবেই আসচে, কারণ সব চেয়ে বড় কথা হ'চ্চে ভগবানের বাঙ্গালী বিহারী, বা হিন্দু-মুসলমান বাদ নেই। যে যোগ্যতম সেই অধিকারী। তাই আমাদের দেশ থেকে বিদেশী ভাইয়াদের যেমন একটি একটি ক'রে বিদায় ক'রতে পারব বলে ভরসা নেই, এখান থেকেও তেমনি সমূলে উৎপাটিত হব ব'লে আশঙ্কা নিষ্প্রয়োজন।

দেবী সরস্বতীর কথা তুলতে গিয়ে লক্ষ্মীদেবীরই কথা অলক্ষিতে এসে পড়ল। দু'জনের মধ্যে আর যা যা ব্যাপারেই সতীনধর্ম্ম প্রবল থাক না কেন, সাহিত্য ব্যাপারে অবস্থা-ভেদে অনেক নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে ব'লে আমায় এটুকু ব'লতে হ'ল। একথা মানতেই হয় এই অর্থনৈতিক সংশয়-অবিশ্বাস থেকে আমাদের সাহিত্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্চে। কেমন করে তা বলি।

যেখানে থাকব সেখানকার মাটি থেকে যেমন আমরা প্রাণশক্তি সঞ্চয় করি, সেখানকার বিশিষ্ট ঐতিহ্য থেকে আমাদের ভাবশক্তি সঞ্চয় করাও সেই রকম স্বাভাবিক,—সেই ভাবশক্তি যা সাহিত্যের প্রাণ। কিন্তু তা আমরা কখনই পারি না যখন সেই দেশটির প্রতি আমাদের একটা সংশয় লেগে থেকে মনে একটা অনাত্মীয়তার ভাব জাগিয়ে রাখে। প্রবাসী যাঁদের এই ভাব নিয়ে সাহিত্য-চর্চ্চা ক'রতে হয়, তাঁদের বাস্তবিকই বিশেষ দুর্ভাগ্য, কারণ তাঁরা একদিকে যেমন দেশচ্যুত অন্য দিকে তেমনি বিদেশচ্যুত। ত্রিশঙ্কুর মত শূন্যে দোদুল্যমান থেকে তাঁরা না স্বর্গের, না মর্ত্ত্যের—কোনখানেরই রসের যোগান পান না। এতদ্বারা সাহিত্য পরোক্ষভাবে অপরিসীম ক্ষতিগ্রস্ত হয়;—সাহিত্যের বৈচিত্র্য নষ্ট হয় এবং

একই জমির রস টানতে টানতে সাহিত্য নির্জ্জীব হ'য়ে পড়ে। সাহিত্যের হিসাবে এমন যোগহীন দীর্ঘ প্রবাসের চেয়ে বরং দুদিনের পর্য্যটন-বিলাস ভাল, কেন না যেখানে যাই সেখানকার সঙ্গে অনাত্মীয়তার বাধা না থাকায় তার প্রাকৃতিক কি কৃষ্টিগত যা' কিছু সুন্দর, যা কিছু বিশিষ্ট তার সমস্তটুকু বেশ একটি নিবিড় পূর্ণতার মধ্যে পাই—যদিও অল্প সময়ের মেয়াদে। তাই দেখুন, বঙ্গবাসী বাঙ্গালী হিন্দুস্থানের মাহাত্ম্য গেয়েচে, হিন্দুস্থানের ইতিহাস কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে গৌরবান্বিত ক'রে তুলেচে, কিন্তু প্রবাসী বাঙ্গালীর দ্বারা সেটুকু হয় নাই। আপনারা হয়তো বলবেন আমাদের প্রবাসের প্রথম যুগে হয় নি কেন? সে সময় তো আজকের ঈর্ষা, আজকের অবিশ্বাস এমন ভাবে ফুটে ওঠে নি। সে সময় হয় নি তার কারণ প্রবাসের প্রথম যুগটা ঠিক সাহিত্যের যুগ নয়। সে সময়টা মন থাকে উগ্ররকম দোটানার মধ্যে, বিশেষ ক'রে গৃহপ্রিয় বাঙ্গালীর মন নিশ্চয় একরকম বাঙ্গলায়ই প'ড়ে ছিল। তা ভিন্ন আমাদের সাহিত্যে ইতিহাসে ও সময়টা ছিল, যাকে শ্রদ্ধেয় কেদার বাবু ব'লেচেন যেন প্রবন্ধ যুগ। রস সাহিত্যের যুগটাই সাহিত্যের সুবর্ণযুগ, সেই যুগে আজ পর্য্যন্ত আমরা এমন কিছুই দিতে পারিনি যাতে আমাদের প্রবাসভূমির অন্তর্লক্ষ্মীর ছায়া পড়েচে। একথা আপনাদের অগোচর নয় যে বেহারে থেকে এ পর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্যের অনেকে সেবা ক'রে এসেচেন এবং এখন পর্য্যন্ত আসচেন। অনেকে এখানে সাহিত্যজীবনের হাতে খড়ি নিয়ে পরবর্ত্তী সারা জীবনটা বাঙ্গলায় কাটিয়েছেন—এঁদের মধ্যে আমার ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামটা আপাতত মনে পড়চে। জীবিতদের মধ্যে যাঁরা লব্ধপ্রতিষ্ঠ তাঁদের ভেতর বাঙলার উপন্যাসিক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও বিচিত্রার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম করতে পারি। যাঁরা এইখানে জীবন কাটাচ্চেন তাঁদের মধ্যে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামটা বেশী করে মনে পড়ে। তাঁর সরস লেখার মধ্যে বেহার খানিকটা ফুটে উঠেচে বটে তবে বেশী নয়। সমীপ-বর্ত্তমানে সাহিত্য-সাম্রাজ্ঞী শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর নামটা আসে সবার আগে। তাঁর প্রবন্ধরাজীর মধ্যে দিয়ে তিনি বেহারের অতীতের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাতর্পণ কোথাও কোথাও ক'রেচেন বটে—যেমন মজঃফরপুর প্রবাসী বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রীর অভিভাষণে, কিন্তু তাঁর উপন্যাসে বেহার খুব বেশী স্থান পায় নাই। বেহারের দু'একটা সহরকে তাঁর উপন্যাসের কোন চরিত্রের আবাস ভূমি ক'রে দেখানর কথা বলচি না, সে জিনিষটা থাকতে পারে; কিন্তু বেহারের নিজস্বতার, এর আপন বিশিষ্ট জীবনের, এর প্রাকৃতিক সমৃদ্ধির, এর গরিমাময় অতীতের, এর সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার কথা তাঁর মত শক্তিশালী লেখিকার কাছেও এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

এ-বিষয়ে একমাত্র ব্যতিক্রম বোধ হয় শ্রদ্ধেয় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে তাঁর লেখনীও শুধু প্রবাসী বাঙ্গালীর সঙ্গে বেহার যতটা জড়িত এবং তার আঁকড়ি টানতে টানতে যতটা এসে পড়ে ততটাই ফুটে উঠেচে। তা অবশ্য অতুল, বাঙ্গলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রত্নরাজীর সঙ্গে তার সমান মর্য্যাদা, তবে তা বেহারের পূর্ণ রূপ নয়, তাঁর লেখা মুখ্যত হাস্যরসাত্মক বলে বেহারের মাত্র একটা দিক তাতে প্রকাশ পেয়েচে।

এই অভাবের কথা ভাবতে গিয়ে আমার আর একটা কথা এর কারণ স্বরূপ বলে মনে হয়। তা বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য প্রীতি। বিশিষ্টতা খানিকটা বজায় রাখা খুবই ভাল; আমি একথা বলি না যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য হারিয়ে আমরা ভাগলপুর প্রবাসী সেই সব জাতভাইয়েদের মত হয়ে যাই যাঁদের নিজের পরিচয় দেওয়ার সময় বলতে হয়—'আজ্ঞে, নাম আমার শিয়ামাপরসাদ আর ওর সঙ্গে বনর্জ্জী ভি আছে।' সে এক ভীষণ দৈবদুর্ব্বিপাক। আমার বলবার উদ্দেশ্য, আমাদের বৈশিষ্ট্য একবারে সেই রকম না হয় যাতে একটা কঠোর, অনমনীয় exclusiveness এসে পড়ে। অনেকটা এই ধরণের বৈশিষ্ট্য আমাদের এখানকার সমষ্টিগত জীবনে আছে, যাতে করে আমরা প্রবাসীর মধ্যেও প্রবাসী হ'য়ে প'ড়েচি। সমগ্র ভারতব্যাপী দেওয়া-নেওয়ার যুগে ঠিক এ-সমস্যাটা

আমাদের বড় বড় কয়েকজন চিন্তাবীরদের টনক নড়িয়েচে —বিশেষ করে এমন কয়েকজনের যাঁরা বাইরে এসে হিন্দুস্থানের সঙ্গে নিজেদের নাড়ীর যোগটা স্পষ্ট ভাবে অনুভব করবার সুযোগ পেয়েচেন। এঁদের মধ্যে আমি আগ্রা অযোধ্যা প্রবাসী রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ও ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নাম করব।

আমি মাঝে মাঝে এক আধটা গল্প লিখে থাকি। কিন্তু আপনারা মনে করবেন না সেই ঝোঁকে প'ড়ে আমাদের বেহারী ভাইদের সঙ্গে মনোমালিন্যের কাহিনীটার একটু চর্চ্চা ক'রে শেষকালে দুপক্ষকে টেনে বুনে মিলিয়ে দিয়ে একটা মিলনান্ত কিছু খাড়া করবার চেষ্টা করচি। উভয়ের কল্যাণের দিকে চেয়ে—সমস্ত জাতির ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে এই মিলনের সাধনাই আমাদের এখন প্রধান ব্রত হওয়া দরকার। একথা আমাদের বেহারী ভ্রাতাদেরও মনে রাখতে হবে এবং আমাদেরও মনে রাখতে হবে। এই মনে রাখার মধ্যে আমাদের উভয়ের বৃহত্তর স্বার্থ। ভারতের জাতীয়তা, সাহিত্য, কলা; ভারতের সর্ব্বতোমুখী প্রগতির পরিপুষ্টি এই সাধনার মধ্যেই। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে।

আপনাদের এটা সাহিত্যের আসর; এখানে আপনারা সমবেত হন জাতীয় বৃহত্তর সত্তাকে পরস্পরের চিন্তার আদান প্রদানের মধ্যে দিয়ে উপলব্ধি ক'রতে। এখানে এই কথাগুলি বলবার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করচি এবং আশা আছে আপনারাও স্থূলভাবে এগুলি মেনে নেবেন। অলমতিবিস্তরেণ।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

* লাহেরিয়া সরাই (দ্বারভাঙ্গা) সারস্বত সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

বাদল-রজনী

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্, এ

বাদল-রজনী আজি, ছেয়েছে আঁধার
তরীহীন কালোজল উচ্ছলিছে বেগে,
পান্থহারা কাঁদে পথ; হৃদয় আমার
ছেয়েছে অমনি কালো বাদলের মেঘে।

এমন তিমির-মায়া, শ্বসিছে পবন,
বিজলী চমকি' যায় হৃদয় উঘারি;
কারে আজি বুকে থুয়ে ভিজাব নয়ন?
কেহ নাই, হিয়া যারে সঁপিবারে পারি।

সাধ হয় বাহিরাই নিরজন পথে,
বুকে মোর বেঁধে লই সুনীল নিচোল,
কেহ মোরে দেখিবে না, শব্দহীন পদে
চলিব উতলা বায়ে সামলি' আঁচল।

মনে হয়, চুপি চুপি চলি অভিসারে
এ বিজন পথে আজি নিবিড় আঁধারে।
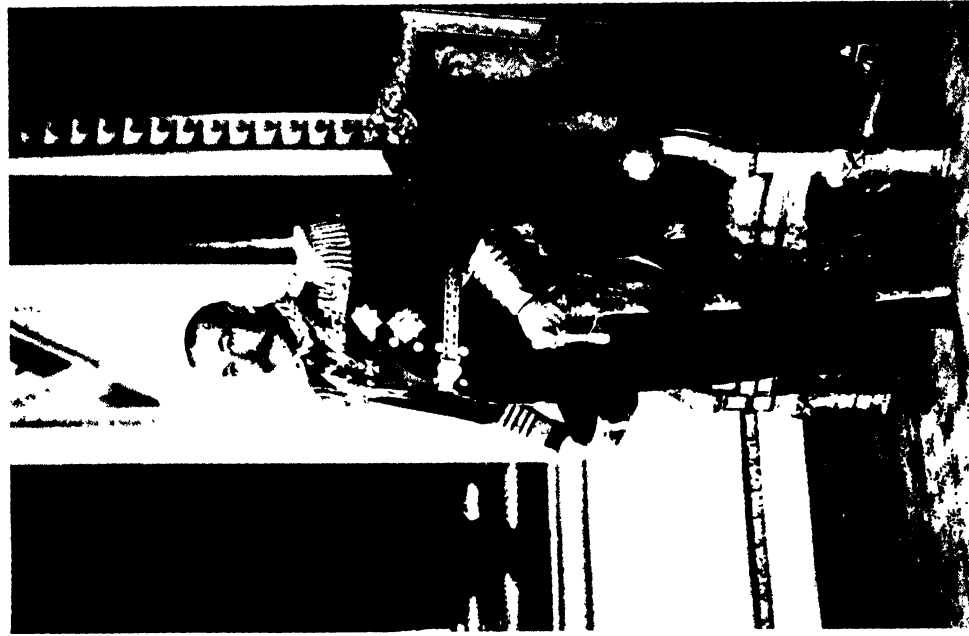
সম্রাট পঞ্চম জর্জ

সম্রাজ্ঞী মে

ফরিদপুরের মাঝি

শ্রীমাধব ভট্টাচার্য্য

(কেরায়া—কোমরপুর হইতে আঙ্গারিয়া)

ডাইনে বায়ে নাও চলেরে চিকন্দির ঐ গাঙ্গে,
মোর বৈঠা-ফেলার ঘায়ে কেবল কত যে ঢেউ ভাঙ্গে।
অথৈ জলে ভাসানো নাও আস্তে আস্তে যায়,
আরে, লগি বাইমু কোন বাঁকেতে ভাব্‌ছি খালি তায়।
(গান) মনরে আমার বেলা নাই আর,
চল্‌রে বৃন্দাবন, ওরে, চল্‌রে বৃন্দাবন।

নায়ের উপর টানামু পাল হাওয়া নাইরে, ভাই—
আবার বাদামখানি ছিড়া যে তা' খেলত' করি নাই।
ওপারে ঐ বালির ঘাটে কল্‌কলেরে ঢেউ
চাইয়া দেখি, জলের ঘাটে আসে নাইরে কেউ।
ধূ ধূ দেখায় কোন গেরস্তের ছনের ঘরের চাল,
ঘরের পথে যায়রে গরু ধইরা মাঠের আল।
(গান) মনরে আমার বেলা নাই আর,
চল্‌রে বৃন্দাবন, ওরে চল্‌রে বৃন্দাবন।

ধান-বোঝাই আর পাট-বোঝাই সব বড় দোমাল্লাই,—
হাল ধরিয়া ভাইসা চলে—ভাব্‌না কোন নাই।
ওপারের ঐ হাট কইরা সব ডিঙ্গি ফিরে ঘরে,
আরে, লগি বাইবার উজান-খালটি কত বাঁকের পরে?
মোর, কেরায়া ভাই হোগ্‌লাগাঁয়ের রায়ের
বাড়ীর হাট—
ওরে, আর কতদূর গেলে পামু আঙ্গারিয়ার ঘাট?
(গান) মনরে আমার বেলা নাই আর,
চল্‌রে বৃন্দাবন, ওরে, চল্‌রে বৃন্দাবন।*

---

* 'বরিশালের মাঝি'র ছায়ায়।

স্বাস্থ্যের পুনর্গঠন

ডাঃ এম্, জি বসাক, এম-বি

বাঙ্গালা দেশে ম্যালেরিয়ার আধিপত্য ও মৃত্যুর হার ভারতের অন্যান্য প্রদেশ এবং বিভিন্ন রোগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, এ কথা অস্বীকার করিবার নহে। প্রতি বৎসর প্রায় ১০ লক্ষ লোকের মৃত্যুর কারণ এই ম্যালেরিয়া জ্বর। এমন একদিন ছিল—যখন বাঙ্গালার সৌন্দর্য্য, ধনসম্পদ, আমোদ-প্রমোদ, আশা-ভরসা, সুখশান্তি ও স্বাস্থ্যবল সকলই বাঙ্গালার প্রতি-পল্লীতে, প্রতি সহরে বিরাজমান ছিল। কিন্তু আজ ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর কবলে দিনে দিনে পূর্ব্বের সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্য ক্রমশঃ নষ্ট হইতে চলিয়াছে। এ ধ্বংসের পথরোধ না করিলে বাঙ্গালী জাতির আর উন্নতি নাই। ম্যালেরিয়া আজ যে কেবল এই প্রদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাহা নহে, বরং ইহা বিহার, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব ও অন্যান্য প্রদেশের মধ্যে ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিয়াছে। ম্যালেরিয়ার তাণ্ডবে পল্লীর কুটীরগুলি শূন্যপ্রায়, পল্লীর বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা এখন পরিত্যক্ত। দেশের স্বাস্থ্যের আবহাওয়া এখন এত দূষিত যে, পুনরায় শীঘ্র ইহাকে বিশুদ্ধ না করিলে স্বাস্থ্যরক্ষার আর উপায় নাই।

ম্যালেরিয়া এ দেশে এখন সাধারণভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছে; এমন কি, নিরক্ষর কৃষক পর্য্যন্ত ইহার সহিত সুপরিচিত। ধনী প্রাসাদের মধ্যে ইহার আক্রমণ হইতে নিস্তার পান না। এনোফিলিস মশক কোন ম্যালেরিয়া-গ্রস্ত রোগীর রক্ত শোষণ করিয়া ঐ বিষ যদি কোন সুস্থ শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেয়, তখন সুস্থ ব্যক্তির শরীরে ঐ রোগ প্রকাশ পায়। অধিকাংশস্থলে দেখা যায় যে, যে স্থলে একব্যক্তি ম্যালেরিয়ায় মারা গিয়াছে, সেখানে ভুগিতেছে অন্ততঃ বিশ জন। এই কালব্যাধিতে জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি যে কত নষ্ট হইতেছে, তাহার পরিমাণ হয় না। শীর্ণদেহে, প্লীহা-যকৃৎ সংযুক্ত উদরে, পাংশুমুখে কত শত উপার্জ্জনক্ষম যুবক গৃহের কোণে নিরুপায় হইয়া দেশের দারিদ্র্য বৃদ্ধি করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বহুদিন যাবৎ ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া নবীনা মাতার স্তন্যদুগ্ধও শুষ্ক হইয়া যায়; ক্ষুধাতুর শিশু ক্ষীণ ও দুর্ব্বল অবস্থায় মাতার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে। ম্যালেরিয়া বিষ রক্তস্থ লাল কণিকাগুলিকে আশ্রয় করিয়া বা ক্রমে তাহাদের ধ্বংস সাধন করিয়া রক্তাল্পতা উপসর্গ আনয়ন করে।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, ম্যালেরিয়া রোগ ভোগের পর ক্ষীণ দেহ রক্তের অভাব হেতু পাংশুবর্ণ হইয়া যায়; খাদ্যে অরুচি জন্মে, পেটজোড়া পিলে হয় ও দেহ কর্ম্মশক্তিহীন হইয়া পড়ে। তখন এ শোচনীয় অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে চলিবে না। বহু বৎসর গবেষণার পর ইহা বিশেষজ্ঞগণকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, সুইজারল্যাণ্ডের আবিষ্কৃত রচিটোন ম্যালেরিয়া রোগীর কর্ম্মশক্তি পুনরায় ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ। ইহার নিয়মিত ব্যবহারে ম্যালেরিয়ার পুনরাক্রমণ হইতে রোগীকে রক্ষা করে। রচিটোনের মূল্যবান উপাদানগুলি স্বভাবজাত উদ্ভিজ্জ সংমিশ্রণ বলিয়া অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা ইহার গুণ ও কার্য্যকারিতা অনেক বেশী। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের চিকিৎসকমণ্ডলী ইহার গুণে মুগ্ধ হইয়া ম্যালেরিয়া রোগ ভোগের পর রচিটোন ব্যবস্থা দিতেছেন। ইহা রক্তস্থিত ম্যালেরিয়া বীজাণুদের ধ্বংসসাধন করিয়া, শরীরে নূতন রক্তকণিকা সৃষ্টি করিয়া রক্তকে সতেজ করে। ইহা সেবনে আহারে রুচি হয় ও হজমশক্তি বৃদ্ধি পায়। রচিটোন সেবনে দুর্ব্বলতা দ্রুত দূর হইয়া দেহে যথেষ্ট নববল ও জীবনীশক্তির সঞ্চার হয়; উৎসাহ ও কর্ম্মশক্তি বর্দ্ধিত হয়।

দ্বয়ী

শ্রীআশীষ গুপ্ত

সম্মুখে সাদা কাগজ, এবং হাতের ফাউণ্টেন পেনটা লিখিবার জন্য উদ্যত,—বাহিরের যে চোখ অর্থহীন তাহারই তীক্ষ্ণ অন্তর্মুখী দৃষ্টিতে আনন্দর চিত্ত যেন জ্বলিতেছিল। অশান্ত, চঞ্চল মনে সে জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। লিখিবার জন্য জাগ্রত ব্যাকুলতার অবধি নাই,—দুর্দান্ত উপবাসী সিংহকে যেন জীর্ণ পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে, সে যেন একবার কোন প্রকারে মুক্তি পাইলেই হয় এমনিতর আনন্দর ভাবলোকের অবস্থা। চিন্তাগুলা ধূমকুণ্ডলীর ন্যায় মনের মধ্যে পাক খাইয়া খাইয়া ওঠে, অথচ কিছুতেই তাহাদের একস্থানে সংগৃহীত করা যায় না।

—অধীরভাবে আনন্দ ফাউণ্টেন পেনের প্রান্তভাগ দাঁত দিয়া কাম্‌ড়াইতে লাগিল।

—বারান্দায় বারো আনা দামের স্যাণ্ড্যালের শব্দের পিছনে পিছনেই স্কুলের সহপাঠী এবং বর্ত্তমানকালের উকীল অপূর্ব্ব আসিয়া প্রবেশ করিল।

লিখিবার সময় এরূপ উপদ্রবে কোন লেখকই সুখী হয় না। কিন্তু তবুও আনন্দ মনে মনে সন্তুষ্ট হইল। বাঁচা গিয়াছে,—সেদিন অপূর্ব্ব বলিতেছিল, জীবনে নাকি দুঃখের আর তাহার অবধি নাই, বেদনার আর তাহার শেষ নাই, সেই দুঃখবেদনার কাহিনী সে একদিন বলিবে। আনন্দ মনে মনে কহিল, বাঁচিলাম! অপূর্ব্বর জীবনের বিবরণ আজ শুনিয়া লইব। মনকে তাহা কোন্ দিক দিয়া নাড়া দিয়া কোন্ স্রোতে প্রবাহিত করিবে কে জানে!

খুসী মুখে তাই সে কহিল, "অপূর্ব্ব যে, কি খবর বল, গাঁটকাটার পালা কিরকম চল্‌ছে?"

"না ভাই, সুবিধে করতে পারছিনে, লোকেরা বেজায় চালাক হ'য়ে উঠেছে।—আগে যা বল্‌তাম অবলীলাক্রমে তাই মান্‌ত, এখন তারাই আবার সেক্‌শ্যান বাৎলে দিতে আসে—"

"ঘোরতর দুর্দ্দিন তাহ'লে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে,—গোলা লোকদের আর বাইসিক্‌লে আলো না দিলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের এবং গোরু চুরি করলে ফাঁসির ভয় দেখিয়ে হাফ্-পাইস্‌ও আস্‌ছে না?"

ম্লান মুখে অপূর্ব্ব কহিল, "না, তার কারণ মানুষ আর গোলা নেই,—কিন্তু তোমরা এ দুঃখ বুঝবে না ভাই—"

আনন্দর চোখের দৃষ্টি কৌতুকে নাচিতে থাকে।

থাক কল্পনার রাজ্যে, অভাব কাকে বলে জাননা, —ব্রীফলেশ উকীলের দুঃখ তুমি কি বুঝবে?"

পলকের জন্য আনন্দর ঠোঁটের কোণে যে নিষ্ঠুর শ্লেষের হাসি খেলিয়া গেল, তাহা অপূর্ব্বর চোখে পড়িবার কথা নয়।

"গাউনের যা অবস্থা দেখলে শেয়াল কুকুরে কাঁদে, কোটপ্যাণ্টের দিকে তাকিয়ে প্রতিমুহূর্ত্তে সুইসাইড করতে ইচ্ছে হয়, জুতোর তলা নেই,—মুখে এক মুখ দাড়ি, কামাবার পয়সা নেই, দু'পয়সা দিয়ে একখানা ব্লেড কিনব সে সামর্থ্য নেই।—প্রথম যখন কিনেছিলাম—জুতোর কথা বলছি—তখন রং ছিল কালো, তা'র উপরে গুটি পাঁচেক তালি যা পড়েছে তাদের কোনটীর রংই কিন্তু কালো নয়—যখন যা সস্তায় জুটেছে লাগিয়েছি। দু'পায়ে দু'রঙের মোজা, মাথায় ক্রমবর্দ্ধমান টাক—মুখখানা কিন্তু মাসদেড়েকের দাড়িগোঁফে সমাচ্ছন্ন—মাথার চুল মুখে এসে স্থান লাভ করল—"

অতিরিক্ত খুসীতে আনন্দ হাত কচলাইতে লাগিল। —"লাভ্‌লি! কোর্টে যাওয়ার পথে তোমার গাউনকোট-প্যাণ্টপরিহিত মূর্ত্তিখানা একবার দেখিয়ে যেয়ো ত অপূর্ব্ব।"

অপূর্ব্ব মিনিটখানেক চুপ করিয়া রহিল, পরে কহিল, "পাঁচটা টাকা ধার দিতে হ'বে ভাই !"

অনুৎসাহিত মুখে আনন্দ বলিল, "আজকাল টাকার দাম বেজায় চড়া, পাঁচ টাকা হয়েছে পঁচিশ টাকার সামিল, অতএব ভেবে দেখ্‌ব—"

অপূর্ব্ব যতটা নির্ব্বোধ তাহার চেয়েও বেশী নির্ব্বোধের ন্যায় কিছুক্ষণ আনন্দের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, পরে বলিল, "পাঁচ বছর হ'ল বিয়ে করেছি, এরই মধ্যে তিনটে মেয়ে! ছোটটার বয়স পাঁচমাস, চেহারা বাদুড়ছানার মত, সমস্তদিন নিঝ্‌ঝুম হ'য়ে পড়ে' থাকে, কিন্তু চীৎকার আরম্ভ করে রাত্রি বারোটা থেকে—তার সঙ্গে কন্‌সার্ট যোগায় বাকী দুটো। ওঃ সে কি দানবীয় কোলাহল! হিংস্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি, বিপুল আগ্রহ হ'তে থাকে রচনাপুস্তকে লেখা পিতৃস্নেহ ভুলে একেবারে শিশুপাল বধ করে' ফেলি।"

"এরা তিনজনে বড় হবে, ধীরে ধীরে হবে তরুণী, অলকা দেবী, রাগিণী দেবী, নন্দিতা দেবী! ওই পাঁচ মাসেরটা, যেটা রাত বারোটায় চীৎকারের ধুয়া তোলে, ওইটে হচ্ছে নন্দিতা দেবী,—বুঝ্‌লে উনি হচ্ছেন নন্দিতা! কোন্‌দিন যে রাত বারোটায় আমার হাতে খণ্ডিতা হবেন তার স্থিরতা নেই।—হুঁ, নন্দিতাই বটে!"

অপূর্ব্বর মুখখানা গণ্ডারের নাকের উপরকার শিংয়ের মত দেখাইতেছে!

"স্ত্রী নাম রেখেছেন,—এঁরা আমার ছকু খানসামা লেনের গোকুলে বর্দ্ধিত হচ্ছেন, এ্যারোরুটের খরচে এঁদের আবির্ভাব, ফ্রকের খরচ, বব্ করবার খরচ ইত্যাদির গুরুতর সম্ভাবনায় এঁদের বৃদ্ধি, ইন্‌ষ্টিটিউটে নৃত্যশিল্পী হলধর ভদ্রের সহিত সম্মিলিত নৃত্যে এবং আমার সমাধিতে এঁদের পরিণতি। এঁদের দৌলতে আমার জীবনের ইতিহাস হবে পাতালপুরীর মত অন্ধকার, উত্তরমেরুর মত শীতল, বুঝ্‌লে আনন্দ, শেষ অবধি ঠাণ্ডা মেরে যাব আমিই!—"

আনন্দর মন ক্লান্ত, পীড়িত। সমস্ত সকালটা বৃথা গেল, অথচ লিখিবার জন্য আজ কত আগ্রহই না ছিল! অপূর্ব্বর কাহিনী শুনিবার জন্য তাহার মনে আর বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা নাই। টেবিলের উপরকার কাগজপত্র লইয়া আনন্দ অন্যমনস্কভাবে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

"বউয়ের অসুখ ভাই, বিয়ের পর থেকে সেই যে ভুগ্‌ছে! কোন্‌দিন যে পট্ ক'রে মরে' যাবে! দেবীত্রয় ত এম্‌নিতেই আমার কাছে ডাকিনীত্রয়ের সামিল, তখন যে তাঁরা আমার পক্ষে কি হ'য়ে দাঁড়াবেন ভাবতেই গায়ে কাঁটা দেয়!

"বউকে নিজে দেখে বিয়ে করেছিলাম,—প্রেমে পড়ে'। আমি ছিলাম প্রতিবেশী, মেয়েটা পড়ত ফোর্থক্লাশে, ভারী শিক্ষিতা মেয়ে! বয়স কম হ'লেও প্রেমকার্য্যে তার পটুত্ব ছিল অসাধারণ,—আর আমি ত বাংলাদেশের অপদার্থ তরুণ, এর জন্য ত মুকিয়েই রয়েছি,—অতএব হ'ল বিয়ে। এক পয়সা রোজগার করিনে, কিন্তু নিজের মনেই মুরুব্বিয়ানা চালে হাসি।—যে বাংলাদেশে পলিতকেশ গলিতদন্ত পিতামাতার বিকারগ্রস্ত প্রাচীনপন্থী মতামতের যুপকাষ্ঠে পঞ্চশরকে প্রত্যহ কচুকাটা হ'তে হয়, সেখানে আমি প্রেম করে' শিক্ষিতা মেয়ে বিয়ে করেছি! সে মেয়ে আগে আমার নামের আগে Mr. এবং পরে Esq. দিয়ে চিঠি লিখতে পারে!

"গর্ব্বের আর সীমা রহিল না, ফোর্থক্লাশে পড়া এতবড় শিক্ষিতা মেয়ে! দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল যে একটা দুঃসাহসিক কাজ করা গিয়েছে! মাসখানেক ফুলে রইলাম ফানুসের মত, কিন্তু তিরিশ দিনের বেশী সে ফানুস গোটা রইল না, চুপ্‌সে গিয়ে দেখলাম, পৃথিবীর কোটি আহম্মকের নামের সঙ্গে আর একটা নাম যোগ হ'য়েছে। ঘোড়ার ডিমের প্রেম, ঘোড়ার ডিমের বিয়ে!—"

অপূর্ব্বর মুখখানা পুনরায় গণ্ডারের নাকের উপরকার শিংয়ের মতন দেখাইতেছে।

আনন্দর আর অধৈর্য্যের শেষ নাই, কিন্তু ওর নিম্ন ওষ্ঠপ্রান্ত যেন গুটাইয়া গেছে!

—"বাঁচ্‌বে না ভাই বউটা, শুধু হাড় আর চামড়া. দু'বেলা পেট ভরে' দু' মুঠো ভাত অবধি পায় না। রোগে ওষুধ নেই, পথ্য নেই,—পরনে ছেঁড়া ন্যাকড়া, শীতের দিনে কাঁপ্‌তে থাকে হি-হি করে', ঘরসুদ্ধ কোথাও গরম কাপড় নেই এককানি।

"বাড়ীতে আলো নেই, হাওয়া নেই, স্বাস্থ্যনীতির কোনও বালাই নেই। দশঘর ভাড়াটে, কলতলায় দিবারাত্র তুমুল কোলাহল। এগারো টাকা ভাড়ার একখানা ঘর, বাঁচ্বে না ভাই বউটা!—অনেকদিন ধরে বাপের বাড়ী বাপের বাড়ী কর্‌ছিল, পাঠিয়ে দিলাম তিনমাসের জন্মে, কিন্তু দুর্দ্ধর্ষ ম্যালেরিয়া। শ্যালকদের জিজ্ঞাসা করলাম, বল্‌ল এ সময়টা আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত ভালো, ম্যালেরিয়া থাকে না। বিশ্বাস করিনি, কিন্তু তবু পাঠালাম, ঘুমিয়ে বাঁচব রাত্রিতে, নানান্ ফন্দীফিকিরে যা দু' চার পয়সা সংগ্রহ ক'রে আনি, নিজের পেটেই যাবে, ভাগীদার জুটবে না আরও চারজন!

"সময়ে সময়ে ভাবি, প্রেম না কর্‌লে পঁচিশ, কুড়ি, পনেরো টাকাতেও হয়ত স্বচ্ছন্দে চল্‌তে পার্‌ত! কিন্তু অনেক ভেবেই পাঠালাম বউকে, যদিও বাঁচবে না ভাই।—জংলা শাড়ী চেয়েছিল, দিতে পারিনি, কিই বা দাম! মনটা খারাপ হয়ে রয়েছে। তেলেভাজার দিকে ভারী ঝোঁক, বেগুনী ফুলুরীর জন্ম লোভের অবধি নেই, তারই জন্ম দু' একটা পয়সা মাঝে মাঝে চায়, তা পর্য্যন্ত দিতে পারিনে!"

আনন্দর আর ক্রোধের পরিসীমা নাই, কিন্তু তবুও যেন তাহার পায়ের তলায় কেহ সুরসুরি দিতেছে।

অপূর্ব্ব একমুহূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিল,—আনন্দ তাহার টেবিলের উপরকার কাগজপত্র গুছাইতে লাগিল। অপূর্ব্ব পুনরায় বলিল, "দুঃখের শেষ নেই ভাই, বেদনার আর অবধি নেই—"

আনন্দর মুখে বিরক্তির চিহ্ন তীক্ষ্ণতর হইল, ফাউণ্টেন পেনের ক্যাপ আঁটিতে আঁটিতে নিম্নকণ্ঠে সে গর্জ্জন করিতে লাগিল, "য় ইডিয়াট! য় ফুল! দ্য ব্লাস্‌টেড্ ফুল!"

সেই অস্পষ্ট চাপা গর্জ্জনের অর্থ গ্রহণ করিতে না পারিয়া বিহ্বলনেত্রে অপূর্ব্ব আনন্দর মুখের পানে কিয়ৎকাল চাহিয়া রহিল, পরে কহিল, "দু'চার পয়সা রোজগার যে কিরকম করে' কর্‌তে হয় তা আর বল্‌বার নয়। এক মক্কেলের তরফে কেস্ কর্‌ছিলাম, ব্রীচ্ অভ্ কণ্ট্র্যাক্টের নালিশ, আমার মক্কেল বাদী। প্রতিবাদী পক্ষকে গোপনে গোপনে এ তরফের কয়েকটি উইক পয়েণ্ট্‌সের সন্ধান দিলাম—যা হ'ক কিছু পাওয়া গেল!—এই করেই চল্‌ছে, নইলে কোন মাসে পনেরো, কোন মাসে কুড়ি, কোন মাসে পঁচিশ,—এতে কখনও চলে এত বড় সংসার!—বাট্ দেন্ উই হ্যাভ্ অল্‌সো গট্ টু লিভ্!"

শুনিয়া এতক্ষণ পরে আনন্দ সত্য সত্যই ভয়ানক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল! অকৃত্রিম বিস্ময়ে ভ্রূ কুঁচ্‌কাইয়া ধীরে ধীরে টানিয়া টানিয়া প্রতি কথাটি চমৎকার করিয়া উচ্চারণ করিয়া সে কহিল, "রি-য়্যা-লি! ই-উ হ্যা-ভ্ গ-ট্ টু! ই-উ হ্যা-ভ্ গ-ট্ টু!"

বলিয়াই সহসা অতিশয় আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "অপূর্ব্ব, তুমি একটু আগে আমার কাছে পাঁচটা টাকা ধার চাইছিলে, ধরে নাও ও টাকা তোমাকে আমি দিয়েছি, মনে কর ও আমি তোমাকে দেবই, পূবের সূর্য্য পশ্চিমে অস্ত গেলেও দেবই,—ওর জন্ম তোমাকে আর কোনরকম কৌশল অবলম্বন কর্‌তে হ'বে না। আচ্ছা এইবার ওই পাঁচ টাকা সম্বন্ধে কোনও আশঙ্কা না রেখে বল ত ক'টাকার জন্ম তুমি আমাকে বিক্রি কর্‌তে পার, ক' আনার বিনিময়ে পার ওকাজ কর্‌তে? ফল্‌স্ এভিডেন্‌স্ দিতে পার কত হ'লে, কত হ'লে দাঁড় করাতে পার মিথ্যে কেস্ আমার নামে?"

আনন্দর কণ্ঠস্বর ক্ষুরধার ছুরির ফলার ন্যায় নির্ম্মম হইয়া উঠিল, "রিয়্যালি! ই-উ হ্যা-ভ গ-ট্ টু লি-ভ্, রি-য়্যা-লি!"

অপূর্ব্ব সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল, "আমার সম্বন্ধে অমন করে অন্যায় বিচার কোরো না আনন্দ!—সংসারে বাস কর্‌তে গেলে অনেক কিছু কর্‌তে হয়। কল্পলোকের জীব তোমরা কল্পনার জগতে বিচরণ কর—"

উত্তেজিত হইয়া আনন্দ কহিল, "চুপ কর অপূর্ব্ব, সাহিত্যের তুমি কিচ্ছু জান না,—অকৃত্রিম আহম্মকের মত কেবল কল্পলোক আর কল্পনার জগৎ শিখে রেখে দিয়েছ!"

আনন্দর এমনতর উত্তেজনা দেখিয়া অপূর্ব্ব ভয় পাইয়া গিয়াছিল, দ্বিধাজড়িত কম্পিতকণ্ঠে সে বলিল, "কিন্তু তবু সাহিত্যের আদর্শবাদের সঙ্গে বাস্তব জগতের সামঞ্জস্য বিধান—"

আনন্দর স্বভাবস্নিগ্ধ চোখে যেন বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল, "তোমাকে আমি সাবধান করে' দিচ্ছি অপূর্ব্ব, সাহিত্যসম্বন্ধে উক্তি তোমার সংবরণ কর, আমি জানি পূর্ণ ইডিয়াসির দাবী তোমার, কিন্তু সে ইডিয়াসিকে আমার সাম্‌নে প্যারেড করে বেড়াবার অধিকার তোমার নেই।" বলিতে বলিতে নিজের উত্তেজনায় আনন্দ যেন সহসা নিজেই লজ্জিত হইল। চাহিয়া দেখে, কি যেন একটা গুরুতর আশঙ্কায় অপূর্ব্বর মুখ কালো হইয়া গেছে। অনুন্নত কণ্ঠে স্নিগ্ধসুরে সে কহিল, "কিন্তু অপূর্ব্ব, তোমার কোর্টের বেলা হ'য়ে যাচ্ছে না?"

অপূর্ব্ব হাসিল, ভীরু অপ্রস্তুত হাসি,—কিন্তু তবু যেন আনন্দর এই শান্ত কণ্ঠস্বরে অসহায় অপূর্ব্ব আশ্রয় পাইয়া বাঁচিয়া গেছে!—

"আমার আবার কোর্ট, তার আবার বেলা। ফুটপাথ যা গাছতলা তাই, কোর্টও তাই! তবুও উঠি ভাই,—বউটা বাঁচবে না—" বলিয়া অপূর্ব্ব বারংবার এদিক ওদিক ঘাড় ফিরাইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। আনন্দ যে অন্যমনস্কভাবে কি ভাবিতেছিল তাহা ঠিক বুঝিতে পারা গেল না। অপূর্ব্ব কয়েকবার আড়চোখে আনন্দর মুখের ভাব নিরীক্ষণপূর্ব্বক মনের মধ্যে সাহস সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে কহিল, "পাঁচটি টাকা ধারের কথা বল্‌ছিলাম আনন্দ, তিনচার দিনের মধ্যেই ফিরিয়ে দেব—"

অন্যমনস্ক আনন্দ সচকিত হইয়া কহিল, "এঁ্যা?"

"পাঁচটা টাকা ধার চাইছিলাম ভাই, দু'তিন দিনের মধ্যেই ফিরিয়ে দেব—এত দুঃখ আর সইতে পারিনে—"

আনন্দ উঠিয়া দাঁড়াইল, গূঢ় অপলকনেত্রে কিছুক্ষণ অপূর্ব্বর দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "আমাকে এই দুঃখের কাহিনীই বলার কথা সেদিন বল্‌ছিলে?"

"এছাড়া আর আমাদের বলার আছেই বা কি ভাই?—তোমাদের মত সুখের পায়রা ত আর নই। চারদিকে শান্তি, চারদিকে প্রাচুর্য্য,—অভাব নেই, অভিযোগ নেই, মেথরাণীবিনিন্দিত স্ত্রীর বেগুনি ফুলুরির হাঙ্গামা নেই, নেই জংলা শাড়ীর উপদ্রব, নেই রাত দুপুরে রাগিণী দেবী, অলকা দেবী, নন্দিতা দেবীর কোরাস—"

গভীর বিরক্তিতে আনন্দ পুনরায় ভ্রূকুঞ্চিত করিল, টেবিলের উপরকার কাগজপত্র এবং ফাউণ্টেন পেন ব্লটার ইত্যাদি তুলিয়া রাখিতে রাখিতে যে কণ্ঠস্বরে সে এইবার কথা কহিল, তাহার বিস্ময়কর শান্ত সুরে অপূর্ব্বর আর অস্বস্তির সীমা রহিল না। আনন্দ বলিল, "তোমাকে একটা কথা বলি অপূর্ব্ব, যদি তোমার পক্ষে মনে রাখা সম্ভব হয় তাহ'লে রেখো, ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।—যে জিনিষকে তুমি দুঃখ এবং বেদনা বলে বেড়াচ্ছ তা দুঃখ নয়, মজুরগিরি। —দুঃখানুভূতির জন্য হয় পটভূমির প্রয়োজন, তা ছাড়া বেদনার রূপ খোলে না।—মনের সে পটভূমি আর যারই থাক অপূর্ব্ব ভট্‌চাযের যে নেই, একথা বল্‌তে হলে গলা কাঁপবার আশঙ্কা করিনে। তোমার মনের স্পন্দিত হবার শক্তি নেই, শক্তি নেই তার ঊর্দ্ধমুখী চিন্তার, সেই চিন্তার বেদনা, তার ব্যর্থতা বহন করবার ক্ষমতা তোমার মনের নেই,—সে পঙ্গু, সে দুর্ব্বল, সে অসহায়, নেই তার অনুরণনের ধর্ম্ম।—সত্যি কথা বলতে গেলে,—আমার স্পষ্টবক্তৃত্ব মাফ কোরো অপূর্ব্ব,—মন বলে' তোমার কোনো বস্তুই নেই।" বলিয়া আনন্দ মৃদু হাসিল।

—অপূর্ব্ব যেন এতক্ষণ পাথর হইয়া গিয়াছিল, সহসা সচকিত হইয়া দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলিতে উদ্যত হইল, "কিন্তু—

অধীরভাবে আনন্দ কহিল, 'কিন্তু' নয়, শোন, স্ত্রীকে বেগুনী ফুলুরী না কিনে দিতে পারাটাই পৃথিবীতে বড় দুঃখ নয় এবং প্রাচুর্য্যের মধ্যে বাস করাটাই সুখ নয়।— তীক্ষ্ণ অনুভূতির মধ্যে আছে বেদনা, বর্ণোজ্জ্বল মনে তার আশ্রয়। সে বস্তু অন্নবস্ত্রের অভাবের মধ্যেও বাড়্‌তে পারে, আবার বাড়্‌তে পারে বিশাল প্রাসাদের হর্ম্ম্যতলেও। তোমার দৈন্যের মধ্যেও তোমার মনের ব্যাকগ্রাউণ্ড নেই, তোমার আবার দুঃখ কিসের! মাথা নেই তার আবার মাথা ব্যথা, ছোঃ!" নিদারুণ অবজ্ঞায় তাহার ওষ্ঠাধর সূক্ষ্ম হইয়া গেল।

"গাড়ীটানা মোষের চেহারা হয় জীর্ণ শীর্ণ, কাঁধে হয় তার ঘা এবং চোখ দিয়ে পড়ে তার জল, কিন্তু তাকে বেদনা

বলিনে, বলি ড্রাজারি!—আজকের সকাল বেলাটা তুমি আমার মাটি করেছ অপূর্ব্ব, অথচ আজ আমার এত জিনিষ লিখবার ছিল, এত কথা ছিল ভাববার। তোমাকে আমি ক্ষমা করতে পারছিনে।" বলিয়া বিষণ্ণ মুখে আনন্দ চুপ করিল। অপূর্ব্ব কথা কহিবার চেষ্টা করিল না। নিজের অজ্ঞাতসারে যে কত বড় পাপ সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে সেকথা মনে করিয়া তাহার আর আশঙ্কার অবধি রহিল না।

আনন্দ পার্স হইতে একটা পাঁচ টাকার নোট বাহির করিল; পরে কি ভাবিয়া সেটা রাখিয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে পাঁচটা টাকা লইয়া অপূর্ব্বর হাতে দিল, কহিল, "এটাকা সম্বন্ধে নির্ব্বোধের মত যা তা প্রতিশ্রুতি দেওয়ার প্রয়োজন নেই অপূর্ব্ব, এ আর আমার চাইনে—"

ছেঁড়া ছাতাটা হাতে করিয়া ব্যস্তসমস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব কহিল, "আসি ভাই তাহলে, তুমি আমার যা উপকার—"

নিদারুণ বিরক্তির সহিত বাধা দিয়া আনন্দ কহিল, "বাজে কথা বোলো না অপূর্ব্ব, এর আগের তোমার তিনদিনের প্রতিশ্রুতি যেমন বাজে, আমার উপকার সম্বন্ধে তোমার কৃতজ্ঞতাবোধও তার চেয়ে কম বাজে নয়।"

অপূর্ব্ব থতমত খাইয়া গেল, "আমি সত্যই বল্‌ছি চেষ্টা কর্‌ব আনন্দ, টাকা পাঁচটা ফিরিয়ে দিতে—"

ক্রোধে আনন্দর দুই চোখ হইতে যেন আগুন ঝরিতে লাগিল, "আর একটিও মিছে কথা কইলে টাকা তোমাকে রেখে যেতে হ'বে অপূর্ব্ব—"

অপূর্ব্ব দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।—তাহার পিছনে পিছনেই দরজার নিকটে আসিয়া আনন্দ ডাকিল, "অপূর্ব্ব, শোন—"

আনন্দর মুখে মৃদু হাসি!

"ওই পাঁচটা টাকার মধ্যে তিনটে আছে অচল,—ইচ্ছে করেই তোমাকে দিয়েছি—"

ত্রস্তভাবে অপূর্ব্ব কহিল, "থাক্, থাক্, ও আমি চালিয়ে নিতে পার্‌ব—"

নীরসকণ্ঠে আনন্দ কহিল, "তা তুমি পার্‌বে;—নিশ্চয়ই পার্‌বে!—আচ্ছা এস তা'হ'লে—"

বারো আনা দামের স্যাণ্ডালের শব্দ বারান্দার শেষ-প্রান্তে তড়িৎগতিতে মিলাইয়া গেল।

শ্রীআশীষ গুপ্ত

দেশের কথা

শ্রীসুশীলকুমার বসু

ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য

ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন হইত, প্রচুর মারণাস্ত্র সংগ্রহ করিতে পারিত, তাহার শক্তি সঞ্চয়ের ফলে, অপরের সাম্রাজ্য বা নিরাপত্তা বিপন্ন হইত, তবে, ভারতের প্রকৃত অবস্থার সংবাদ রাখিবার জন্য শুধু বিভিন্ন দেশের রাজসরকার নহে, সাধারণ শিক্ষিত লোকেরাও উৎসুক থাকিতেন। কোন দেশে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারকার্য্য চালাইতে দিবার পূর্ব্বে সে দেশের রাজ সরকারকে অনেক ভাবিয়া কাজ করিতে হইত। কিন্তু, ভারতবর্ষ এরূপ কিছু না হওয়ায় বাহিরের লোকের স্বভাবতঃই ভারত সম্বন্ধে ঔৎসুক্য কম; সেজন্য জ্ঞানও কম এবং সেইজন্যই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে কোনও কথা লোককে বিশ্বাস করানও সহজ। অন্যপক্ষে ভারতের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে কাহারও শঙ্কিত হইবার কোন কারণ নাই; অথচ, ভারতবাসীদিগকে জগতের চক্ষে হেয় করিয়া রাখায় অনেকের স্বার্থ আছে।

ভারতবাসীরা যে অসভ্য ও বর্ব্বর; আত্মরক্ষায় ও আত্মশাসনে সম্পূর্ণ অক্ষম; এই প্রকার অসভ্যদের দেশে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া এবং তাহাদিগের মধ্যে শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তার সাধনের চেষ্টা করিয়া যে, কাহারও স্বার্থ সাধন করা হইতেছে না, জগতের ও মানবজাতির কল্যাণ সাধনই করা হইতেছে, একথা জগৎবাসীকে বিশ্বাস করাইবার প্রয়োজন কাহারও কাহারও আছে। শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী জাতিগুলির কাহারও নীতি বা কার্য্য অন্যান্যদের অপেক্ষা যদিও কম নিন্দিত নহে; অর্থাৎ প্রত্যেকেই সমানভাবে দুর্ব্বলকে শোষণ ও নির্য্যাতন করিতেছে, তবুও, প্রত্যেকে অপরকে কতকটা সীমার মধ্যে রাখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত বলিয়া মুখে সকলকেই পোষাকী নীতিবাক্য আওড়াইতে হয়। এবং অপরকে ধমক দিবার সময় পাছে নিজের দোষের কথা কেহ উল্লেখ করে, এজন্য নিজেদের কাজের বৈধতা সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতে জনমত সৃষ্টি করিয়া রাখিবার প্রয়োজন হয়।

আমেরিকা এই প্রকার প্রচারকার্য্যের প্রধান ক্ষেত্র হইলেও, ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও ভারতের নিন্দা-প্রচার অপ্রতিহত গতিতে চলিয়াছে। বই লিখিয়া অথবা বক্তৃতা করিয়া যত লোকের নিকট কোন কথা পৌঁছিয়া দেওয়া যায়, চলচ্চিত্র সহযোগে তদপেক্ষা অনেক অধিক লোকের নিকট তাহা পৌঁছিয়া দেওয়া যাইতে পারে এবং তাহার ফলও অনেক ভাল হয়। ইহা ভারতের কুৎসাকারীদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই।

বর্ত্তমানে, 'ইণ্ডিয়া স্পিকস্' ও 'বেঙ্গলী' চিত্রদ্বয় ভারত-বাসীদের যে মিথ্যা কলঙ্কিত চরিত্র জগতের সম্মুখে ধরিয়া আমাদিগকে অশ্রদ্ধেয় করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা শিক্ষিত ভারতবাসীমাত্রেই অবগত আছেন।

নিগূঢ় রহস্যের দেশ, ভারতের একটি রোমাঞ্চকর চিত্র নাম দিয়া 'বাঙ্গালী' চিত্রখানিকে ভিয়েনা সহরের বিভিন্ন চিত্রগৃহে দেখান হইতেছে। ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি করিয়া শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ভিয়েনার প্রধান ধর্ম্মযাযকের নিকট একখানি পত্র লিখিয়াছেন।

এই প্রতিবাদের ফলে এই চিত্র প্রদর্শন বন্ধ হইবে কিনা জানিনা, অথবা হইলেও পূর্ব্বক্ষতির পূরণ হইবে কিনা তাহাও সন্দেহের বিষয়, তবে ধারাবাহিকভাবে ভারতের প্রকৃত খবর বিদেশে প্রচার করিবার প্রয়োজনীয়তা যে অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

'বাঙ্গালী' চিত্রখানিতে সীমান্ত প্রদেশের মিথ্যা চিত্র দেখান হইয়াছে কিন্তু, সম্ভবতঃ বিশেষ বিবেচনা করিয়া ইহার নাম বাঙ্গালী দেওয়া হইয়াছে।

ইওরোপের অন্যান্য দুই একটি সহরেও এই চিত্রখানি প্রদর্শিত হইতেছে। এই সকল প্রচারের প্রতিকারের জন্য সুভাষবাবু যে সকল উপায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়াছেন, তাহার মধ্যে আমেরিকার চিত্র এবং জিনিষ বর্জ্জনের পন্থা সর্ব্বাপেক্ষা ফলদায়ক হইতে পারে। প্রতিকারের জন্য কোনও একটি স্থানে দৃঢ়তা দেখাইতে পারিলে তাহার সুফল সর্ব্বত্রই ফলিবে, আশা করা যায়।

ভারতবাসীরা কাহাদের সমর্থন পাইতে পারেন

ভারতবাসীদের রাজনীতিক গুরুত্ব নাই বলিয়া, তাঁহারা বিশেষ চেষ্টা করিলেও, কোনও দেশেরই খুব অধিকসংখ্যক লোকের সহানুভূতি ও সমর্থন পাইবেন না—অবশ্য তাঁহারা সজাগ ও সচেষ্ট থাকিলে তাঁহাদের অজ্ঞাতে তাঁহাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার করা সম্ভব হইবে না এবং তাঁহারা সময় মত এরূপ প্রচারের প্রতিবাদ করিতে পারিবেন।

যদিও, রাজনীতিক বা অন্যবিধ স্বার্থের তাড়না ব্যতীত অধিকাংশ লোকেরই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোন কৌতূহল জাগ্রত হইবে না, তবুও সকল জাতির মধ্যেই জ্ঞানপিপাসু, সত্যনিষ্ঠ, উদারচেতা ও মানবপ্রেমিক এমন লোক আছেন, যাঁহারা স্বার্থব্যতীতও প্রকৃত তথ্য অবগত হইতে চাহিবেন, প্রয়োজন মত দৃঢ়তার সহিত সত্য কথা বলিতে ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে পারিবেন এবং আমাদিগকে প্রাপ্য মর্য্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। ইঁহারা সংখ্যায় অল্প হইলেও, ইঁহাদের মতের প্রভাব উপেক্ষণীয় নহে।

কিন্তু, আমাদের চরিত্র নীতি ও ধর্ম্ম, আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি ও সভ্যতা যে নিম্নস্তরের নহে, মানবসভ্যতাকে দিবার মত সম্পদ ও জগৎকে শুনাইবার মত বিশিষ্ট বাণী যে আমাদের আছে, একথা সকলকে জানাইবার চেষ্টা আমাদিগকে করিতে হইবে, এবং এইরূপেই পূর্ব্বোক্ত লোকদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইবে।

যাহাদের হাতে শক্তি আছে, ইচ্ছা করিলে যাহারা পৃথিবীর জনমতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াও কাজ করিতে পারেন, তাঁহারাও জনমত অনুকূলে আনিবার জন্য যে প্রকার আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন, তাহা হইতেই অনুকূল জনমতের প্রকৃত মূল্য আমাদের বুঝিতে পারা উচিত।

আমরা আরও, সর্ব্বপ্রকারে অক্ষম ও শক্তিহীন বলিয়া আমাদের পক্ষে মানুষের নৈতিক সমর্থনের মূল্য ও প্রয়োজন অনেক বেশী।

সাম্প্রদায়িক বিরোধ

সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও দাঙ্গাহাঙ্গামা এবং তদুপলক্ষে রক্তপাত, ধনসম্পত্তি ও প্রাণনাশ নানাবিধ নিষ্ঠুর আচরণ, এবং মানুষের অশেষবিধ লাঞ্ছনা, আমাদের জাতীয় জীবনের স্থায়ী লজ্জা ও কলঙ্কের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। প্রায় যে কোন উৎসব এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কলহের আত্মপ্রকাশ নিতান্ত সাধারণ ঘটনায় পরিণত হইয়াছে। এই সকল ব্যাপারে দোষ বা দায়িত্ব কোন পক্ষের বেশী তাহা বিশ্লেষণ করিয়া যে বিশেষ কোন লাভ হইবে, একথা আমরা মনে করি না। হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকল দেশবাসীকেই এই দুর্গতির লজ্জা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে অনুরোধ করিতেছি এবং আশা করিতেছি, সকলেই নিজ নিজ সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিলে এই পাপ সমাজ দেহ হইতে দূর হইবে।

এবারকার শ্রীরামনবমী মহরম উৎসবে দেশের নানাস্থানে হাঙ্গামা বাধিয়াছে এবং অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে ফিরোজাবাদে। এখানে জীবরাম নামক জনৈক ডাক্তারকে সপরিবারে ও কয়েকজন রোগী সমেত (মোট সংখ্যা ১১ জন) উন্মত্ত জনতা গৃহে অবরুদ্ধ করিয়া পোড়াইয়া মারিয়াছে। অবস্থা আয়ত্তের মধ্যে আনিবার জন্য এখানে ও অন্যান্য স্থানে পুলিশের গুলির ফলে লোক হতাহতও হইয়াছে।

মুখে আমরা হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথা বলিলেও এবং বুদ্ধি দিয়া তাহার প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝিলেও, কার্য্যক্ষেত্রে নিরপেক্ষ বিচার বুদ্ধির পরিচয় দিতে এবং অকপটে তাহার অনুসরণ করিতে পারি না। একটি

আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্ভবতঃ সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের স্বার্থ বা সংশ্রব আছে, এমন কোন ঘটনাতেই সাধারণতঃ একজন হিন্দু এবং একজন মুসলমান একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন না। ইহার কারণ আমাদের অন্তর্নিহিত সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি। শিক্ষিত এবং প্রভাবশালী লোকদের মার্জ্জিত ও সূক্ষ্ম সাম্প্রদায়িকতা অজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া নানা উপলক্ষ্যে অনর্থের সৃষ্টি করিতেছে। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই এমন লোক চাই, যাঁহাদের নিজ সম্প্রদায়ের দোষ ত্রুটি নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ ও বিচার করিয়া দেখিবার মত চিত্তের প্রসারতা আছে, এবং দৃঢ়ভাবে নিজের মত প্রকাশ করিবার মত সাহস ও সত্যনিষ্ঠা আছে।

এই সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি আমাদের মধ্যে একটা মিথ্যা অভিমান গড়িয়া তুলিয়াছে। ইহার ফলে, যদি দুইজন লোকের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয় এবং ঘটনাক্রমে ইহার একজন হিন্দু ও একজন মুসলমান হন তবে, অধিকাংশ লোকই ইহাকে দুইজনের বিরোধ মনে না করিয়া হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ মনে করিবে। হিন্দু বা মুসলমান কাহাকেও বাদ দিয়া আমাদের কাহারও চলিবার উপায় নাই, এবং সকলের উন্নতি ব্যতীত, কাহারও সাম্প্রদায়িক উন্নতি যে পূর্ণভাবে হওয়া সম্ভব নহে একথা মনে রাখিয়াই সকলকে কাজ করিতে হইবে।

সহশিক্ষা সম্বন্ধে ডাঃ এইচ্-কে-সেন

নিখিল-বঙ্গ অধ্যাপক সম্মিলনের সভাপতি রূপে ডাঃ এইচ-কে-সেন সহশিক্ষা সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

"শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহশিক্ষা প্রবর্ত্তন বর্ত্তমান কালের অন্যতম সমস্যা। আমাদের কন্যা ও ভগিনীদিগকে যদি আর্থিক জীবনের সংগ্রামক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হয়, তাহা হইলে স্ত্রী ও পুরুষকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন রাখা কি করিয়া সম্ভব হইবে? প্রথমটি আবশ্যক হইলে দ্বিতীয়টি অর্থাৎ সহশিক্ষা কেবলমাত্র অবশ্যম্ভাবী ঘটনামাত্র নহে, উহা কল্যাণজনক। অপর পক্ষে কোনও জাতির আর্থিক ও বাহিরের প্রাত্যহিক জীবনক্ষেত্রে নারীর কোন কিছু করিবার না থাকে তাহা হইলে সহশিক্ষা বহুলাংশে অপ্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়ায়, কিন্তু, স্ত্রী ও পুরুষের জীবনের কার্য্যক্ষেত্র দুই বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে চিরকাল স্বতন্ত্র করিয়া রাখা চলে না; জীবমাত্রেই তাহার জীবনের ও কার্য্যশক্তির পরিপূর্ণ ও অব্যাহত বিকাশ আকাঙ্ক্ষা করে। স্ত্রী ও পুরুষের একই ক্ষেত্রে মিলনের অনিবার্য্য সম্ভাবনার সমস্যা নিরাকরণে সত্য ও ন্যায়ের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া কার্য্যব্যবস্থা নিয়মিত করিলে, সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা ধ্বংস হইবার ভয় থাকে না। সমান অধিকার ও সমান সুবিধা পাইবার বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের প্রভাবে কোন কোন দেশে সমাজ-জীবনে নূতন আদর্শ দেখা দিয়াছে। ন্যায় ও সত্যকে ভিত্তি করিয়া নূতন সমস্যার সমাধান চেষ্টা করিলে সাময়িক সামাজিক বিশৃঙ্খলা উত্তীর্ণ হইয়া শান্তিপূর্ণ সমাজ-জীবন গঠিত হইবে।"

(আনন্দ বাজার পত্রিকা)

শ্রীযুক্ত ফজলুল হকের স্পষ্টবাদিতা

সাম্প্রদায়িক ব্যাপার সমূহে উভয় সম্প্রদায়ের স্পষ্টবাদিতা ও নিরপেক্ষ বিচার বুদ্ধির প্রয়োজনীয়তার কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। ফিরোজাবাদের শোচনীয় দুর্ঘটনা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ফজলুল হক এম্-এল-এ ইউনাইটেড্ প্রেসের মধ্যবর্ত্তিতায় যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন তাহার স্পষ্টবাদিতা বিশেষভাবে প্রশংসার যোগ্য। তিনি বলিয়াছেন :

"আমি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম যে নিখিলভারত মুসলিম লিগ করাচির ব্যাপার সম্বন্ধে, এতটা দীর্ঘ প্রস্তাব গ্রহণ করিলেও, ফিরোজাবাদের অত্যাচারের নিন্দা করিয়া একটি বাক্যও উচ্চারণ করেন নাই।...... এসেম্ব্লীতে মুলতুবী প্রস্তাব গ্রহণের সময় হিন্দুসদস্যগণ বিশেষ উদারতার সহিত আমাদের সাহায্য করিয়াছিলেন এবং ইহা অতিশয় শোচনীয় যে, করাচির ব্যাপার সম্বন্ধে সারা ভারতবর্ষে মুসলমানদের দ্বারা যে বহুসংখ্যক সাধারণ সভার অনুষ্ঠান হইয়াছে তাহার কোনটিতে অথবা মুসলিমলিগের কার্য্যবিবরণীতে এপর্য্যন্ত ফিরোজাবাদের অত্যাচারের নিন্দা স্থান পায় নাই। সেদিন টাউনহলের বক্তৃতায় আমি স্পষ্টভাবে ফিরোজাবাদের

ঘটনার নিন্দা করিয়াছিলাম এবং সুস্পষ্টতম ভাষায় বলিয়াছিলাম যে, এই অত্যাচারে যে-সকল মুসলমানের সংশ্রব আছে বলিয়া প্রমাণিত হইবে, সমগ্র সম্প্রদায় কর্তৃক তাহাদের সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জিত হওয়া উচিত।······ফিরোজাবাদে মুসলমানদের দ্বারা যাহা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সেরূপ অপরাধ করিবার মত লোক যতদিন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আছে ততদিন ভারতের ভবিষ্য রাজনীতিক মুক্তির কোন আশা থাকিতে পারে না। এইজন্য, ফিরোজাবাদে যাহা ঘটিয়াছে প্রত্যেক দেশপ্রেমিক ভারতবাসীর তাহার নিন্দা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য; এবং যে সম্প্রদায়ের লোক এই প্রকার অপরাধী সেই সম্প্রদায়ের লোকের নিকট হইতে নিন্দাবাদ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রত্যাশিত।"

করাচি গুলি বর্ষণের নিন্দা ও প্রতিবাদ করিবার সময় মুসলমানেরা যদি মনে রাখিতেন যে, যে-জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য গুলি বর্ষিত হইয়াছিল, তাহাকে কোনপ্রকারে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব না হইলে, হিন্দুদের ধন-সম্পত্তি ও জীবন বিপন্ন হইত ইহা জানিয়াও, আহতদের সেবা ও সাহায্য করিবার জন্য সর্ব্বপ্রথম হিন্দুরাই অগ্রসর হইয়াছিলেন, এসেম্ব্লিতে ও অন্যত্র তাঁহাদের সহিত একযোগে প্রতিবাদ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন তবে, তাহা বিশেষ শোভনীয় হইত এবং তাহা হইলে সম্ভবতঃ হিন্দুদের দুর্দ্দশা সম্বন্ধেও তাঁহারা অধিকতর সহানুভূতিসম্পন্ন হইতে পারিতেন।

হিন্দুমহাসভা ও করাচির গুলিবর্ষণ

কানপুরে হিন্দু-মহাসভার প্রকাশ্য অধিবেশনে, করাচির গুলিবর্ষণে সরকারের কার্য্যের সমর্থন ও প্রশংসা করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। অতীত অভিজ্ঞতার ফলে হিন্দুরা একটু অতিরিক্ত আতঙ্কগ্রস্ত হইয়াছেন, একথা সত্য। কিন্তু, এই প্রকার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া মহাসভা সর্ব্বপ্রকার ভদ্রতা, শোভনতা এবং মনুষ্যত্বের সীমা অতিক্রম করিয়াছেন। হিন্দুদের ধন-সম্পত্তি অথবা জীবন বিপন্ন হউক ইহা কোন হিন্দুই চাহিতে পারেন না; কিন্তু, তাই বলিয়া কোন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি প্রতিহিংসার বশে ইহা চাহিতে পারেন না যে, যে-সতর্কতা অথবা সর্ব্বনিম্ন ব্যবস্থায় ইহা নিবারিত হইতে পারিত তদপেক্ষা কঠোরতর ব্যবস্থা সমুচিত হইয়াছে। যাহারা নিতান্ত নিঃসহায়ভাবে হত এবং আহত হইয়াছে, তাহারাও অন্যান্য সকলের ন্যায় আমাদের দেশের লোক এবং আমাদের সহানুভূতির পাত্র।

এই প্রকার প্রস্তাব গ্রহণ না করিলে মহাসভার অনেক নিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক কথা ও প্রস্তাবের মূল্য আরও বাড়িয়া যাইত বলিয়া আমরা মনে করি।

কংগ্রেস্ ওয়ার্কিং কমিটিতে সুভাষ বাবু

দিনাজপুর সম্মিলন, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে বাংলার প্রতিনিধি হিসাবে সুভাষবাবুকে গ্রহণ করিবার জন্য কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টকে অনুরোধ করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

ওয়ার্কিং কমিটিতে বাংলার কোন প্রতিনিধি না থাকায় বাঙ্গালী মাত্রেই ক্ষুব্ধ হইয়াছেন এবং বাংলার প্রতিনিধিত্ব করিবার যোগ্যতা যে সুভাষবাবুর অন্য কাহারও অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নাই, সে সম্বন্ধেও বাঙ্গালীদের মধ্যে মতদ্বৈধ হইবার সম্ভাবনা নাই।

সুভাষবাবু বর্ত্তমানে বিদেশে নির্ব্বাসনে আছেন—তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ও অনিশ্চিত। তাঁহার জন্য জাতির মনে যে গভীর ব্যথা আছে, তাঁহার প্রতি এইরূপে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জ্ঞাপন করিয়াই আমরা আমাদের মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করিতে পারি, একথা সত্য। কিন্তু, কথাটাকে শুধু একদিক দিয়া দেখিলে চলিবে না। বর্ত্তমানে বাংলার সহিত অবশিষ্ট ভারতবর্ষের যে আদর্শ ও স্বার্থের সংঘাত আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে তাহার জন্য ওয়ার্কিং কমিটিতে বাংলার যথেষ্ট প্রভাব থাকা, দেশের মঙ্গলের জন্য বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই জন্য কার্য্যতঃ যাঁহার সহযোগিতা পাওয়া যাইত, এমন লোকের নির্ব্বাচনই অধিকতর যুক্তিযুক্ত ও বিবেচনা সঙ্গত হইত।

ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষা—হিন্দী

নিখিল ভারতীয় সকল প্রকার সভাসমিতিতে ভারতের সাধারণ ভাষা হিসাবে হিন্দীকে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব

গ্রহণ করা (প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে) অনেকটা প্রথাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রাজনীতিক কোন প্রাদেশিক অনুষ্ঠানেও হিন্দীর কথা আমরা ভুলিতে পারি না। দিনাজপুরেও যথারীতি একটি রাষ্ট্র ভাষা সম্মিলন হইয়াছে। হিন্দীর উপর অবশ্য আমাদের কোন বিদ্বেষ নাই। তবে ইহাকে প্রাধান্য দিবার অশোভন ব্যস্ততা দেখিয়া এসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

নিষ্ফল জানিয়াও একথা আমরা বহুবার দেখাইয়াছি যে ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষা হইবার পক্ষে বাংলার দাবী হিন্দী অপেক্ষা কম নহে। আমরা ইহাও দেখাইয়াছি যে, ভারতবর্ষের কোন ভাষার যদি এই দাবী থাকেও তবুও, ভারতবর্ষীয় কোনও ভাষা এই প্রাধান্য পাইলে, অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষা কতকটা কোণঠাসা হইয়া পড়িবে এবং এই ভাষাভাষীরা নানা ব্যাপারে অন্যদের উপর কতকটা অন্যায় সুবিধা পাইয়া যাইবেন। বর্ত্তমানে প্রদেশগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা যেরূপ তীব্র হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে ইহা সহজে উপেক্ষা করা যাইবে না। নিখিল ভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাদি, নিখিল ভারতীয় সকল ব্যাপারে, বক্তৃতা, বিতর্কাদিতে অন্যদের কতকগুলি বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতেই হইবে। সাধারণ ভাষা যাঁহাদের মাতৃভাষা হইবে, তাঁহাদের শুধুমাত্র নিজেদের মাতৃভাষা শিক্ষা করিলেই চলিয়া যাইবে, অথচ অন্যদের নিজেদের মাতৃভাষা ব্যতীত এই সাধারণ ভাষা শিখিতে হইবে।

এই সকল অসুবিধা ব্যতীত, সাধারণ ভাষা যাঁহাদের মাতৃভাষা হইবে, তাঁহারা অন্যদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই আত্মাভিমান তাঁহাদের জাগা খুব অস্বাভাবিক হইবে না এবং সম্ভবতঃ অন্যেরাও এজন্য তাঁহাদিগকে কতকটা ঈর্ষার চক্ষে দেখিবেন। অথচ, বহির্জগতের সহিত যোগাযোগের জন্য ইংরাজী আমাদের শিখিতেই হইবে। নিঃ ভাঃ হিন্দী সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতিরূপে মহাত্মা গান্ধীও বলিয়াছেন যে আধুনিক বিজ্ঞানচর্চ্চা, আন্তর্জাতিক ভাববিনিময় এবং সরকারি কর্ম্মচারী ও জনসাধারণের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য ইংরাজী ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন আছে। ভবিষ্যতেও ইংরাজী বর্ত্তমানের ন্যায় আন্তর্জাতিক ভাষাই থাকিবে।

কাজেই, আন্তর্জাতিক ও আন্তঃপ্রাদেশিক উভয়বিধ কার্য্যই ইংরাজীর সাহায্যে না চলিবার কারণ দেখা যায় না—এবং তাহাতে এই সকল অসুবিধার সম্ভাবনা নাই।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যোগাযোগের জন্য কোন একটি বিশেষ ভাষার উপর নির্ভর না করিয়া, সকল প্রদেশের পক্ষেই নিজেদের মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য একটি প্রধান ভারতীয় ভাষা শিখিবার ব্যবস্থা করিলে, যোগাযোগ অধিকতর ঘনিষ্ট হইত, এবং কোন একটি ভাষা অযথা প্রাধান্য পাইত না এবং কতকগুলি লোক অপেক্ষাকৃত অসুবিধায় পতিত হইতেন না।

বাংলা সাহিত্য হইতে প্রেরণা

ভিন্ন প্রদেশীয় কোন লোক বাংলায় আসিয়া বাংলার কোন সভাসমিতিতে কিছু বলিতে গেলে যে বাংলার প্রশংসা করিবেন তাহা কতকটা স্বাভাবিক ও ভদ্রতা এবং বিনয় সঙ্গত। কাজেই, এরূপ কথাকে মূল্যবান বা সত্য মনে না করিবার কারণ আছে। কিন্তু, বাংলা সাহিত্য হইতে কেহ দেশ সেবার প্রেরণা পাইয়াছেন, একথা শুধুমাত্র ভদ্রতার জন্য বলিবার প্রয়োজন নাই।

বাংলা সাহিত্যই বাঙ্গালীদের মধ্যে দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ করিতে যে সর্ব্বাপেক্ষা সাহায্য করিয়াছে, সে কথা সর্ব্বাপেক্ষা সত্য হইলেও আমরা অনেক সময়ই তাহা ভুলিয়া যাই। বাংলার বাহিরের কোন বড়লোক বাংলা সাহিত্য হইতে দেশপ্রেমের প্রেরণা পাইয়াছেন একথা একদিকে যেমন আমাদের আনন্দ ও গৌরবের কারণ হয়, অন্য দিকে আমাদের জাতীয় জাগরণে বাংলাসাহিত্যের বিপুল দানের কথা মনে করাইয়া দেয়।

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত মোহনলাল শকসেনা দিনাজপুর সম্মিলনে বলিয়াছেন যে, গৌরবোজ্জ্বল বাংলা সাহিত্য পাঠ করিয়া তিনি দেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার প্রেরণা পাইয়াছেন।

বাংলার বাহিরের লোকেরা আর একটু আগ্রহের

সহিত যদি বাংলাসাহিত্যের চর্চ্চা করিতেন তবে, অনেকেই সম্ভবতঃ শ্রীযুক্ত শকসেনার মত উক্তি করিতে পারিতেন।

জিন্না-রাজেন্দ্রপ্রসাদের সাম্প্রদায়িক মিলন প্রয়াস

আমরা কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী নহি এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্ব্বপ্রকারে মিলন প্রয়াসী। যাঁহারাই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের জন্য চেষ্টা করেন, তাঁহারাই আমাদের ধন্যবাদভাজন। যদিও একথা আমরা বিশ্বাস করি না যে কোন প্রকার জোড়াতালি এদিক দিয়া বিশেষ কিছু ফলপ্রসূ হইবে।

কিছুদিন পূর্ব্বে মুসলিম লিগের সভাপতি মিঃ মহম্মদ আলি জিন্না ও কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মীমাংসার জন্য যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহার গুণাগুণ সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য না করিয়া অন্য একটি দিক সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি।

মিঃ জিন্না একটি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের সভাপতি এবং একটি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি কথা বলিয়াছিলেন। অন্যদিকে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ হিন্দু হইলেও, হিন্দুদের কোন সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার সংশ্রব নাই এবং তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি হিসাবেও তিনি কথা বলেন নাই। কংগ্রেসের ভিত্তি জাতীয়তার উপর, তাহার সমগ্র নীতি এবং আদর্শ ইহারই অনুগামী। ইহা ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়েরই জাতীয়তা-বাদী লোকদের প্রতিষ্ঠান।

সকল সম্প্রদায়ের লোকদের ইহার আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া ইহার অন্তর্ভুক্ত করা, সকল সম্প্রদায়ের প্রতি নিরপেক্ষ সমান ব্যবহার করা, সকল সম্প্রদায়ের ন্যায়সঙ্গত দাবী এবং স্বার্থের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখা যেমন কংগ্রেসের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য, সেইরূপ সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক দাবী উপেক্ষা করিয়া জাতীয়তার আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখাও ইহার অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। কংগ্রেস এই আদর্শ রক্ষা করিয়া আসিতেছেন বলিয়া আমরা ধরিয়া লইব; অন্ততঃ মুসলমানদের প্রতি তাঁহারা কোন অবিচার করিয়াছেন, একথা কংগ্রেসের শত্রুগণও বলিতে পারিবেন না। এরূপ অবস্থায় যখন কোন বিশেষ এক সম্প্রদায়ের সহিত বুঝাপড়া করিবার চেষ্টা করা হয় তখন, আদর্শকে কিছু খর্ব্ব করিতেই হয়।

কিন্তু, ঘটনা অথবা অবস্থার অনুরোধে যদি বাধ্য হইয়া এমন কিছু করিতেও হয় তাহা হইলে, কোন একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে কিছু বিশেষ সুবিধা দিতে যাইয়া অন্য বা অন্যান্য সম্প্রদায়ের উপর কতটা অবিচার করা হইল, তাঁহারা সেটুকু মানিয়া লইতে কতটা প্রস্তুত প্রভৃতি কথাও, বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখা দরকার। ইহা দেখিবার এ সম্বন্ধে কথা বলিবার ক্ষমতা ও অধিকার শুধু মাত্র সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিদেরই আছে।

কংগ্রেসের সব সময়েই অক্ষুণ্ণ জাতীয়তার আদর্শ অনুকরণ করা এবং জাতিধর্ম্ম-সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলকে ইহাতে অনুপ্রাণিত করিবার চেষ্টা করা উচিত। ইত্যবসরে সাম্প্রদায়িক নেতারা পরস্পরের স্বার্থের সমন্বয় সাধন করিয়া কতটা একযোগে কাজ করিতে পারেন দেখিতে থাকুন। জাতীয়তার আদর্শ যদি একস্থানেও অক্ষুণ্ণ থাকে তবে তাহা ক্রমেই বিভিন্ন সম্প্রদায়কে অধিকতর নিকটবর্ত্তী করিবে আশা করা যায়।

জার্ম্মানিতে নূতন প্রেস আইন

বর্ত্তমানকালে মানুষের শক্তির উদ্ভব হইতেছে সংঘবদ্ধতা হইতে। মানুষ তাহার জ্ঞান, সভ্যতা এবং বহুবিধ কল্পনাতীত সুবিধার অধিকার লাভের জন্যও এই সুগঠিত ও সুসংহত সংঘবদ্ধতার নিকট ঋণী। কিন্তু, অধুনা শক্তিলাভের জন্য যে মারাত্মক প্রতিযোগিতা চলিতেছে, তাহাতে দশকে এমন নিখুঁতভাবে গড়িয়া তুলিতে হয় যে, তাহার মধ্যে মানুষের ব্যক্তিত্বের আর স্থান থাকে না। যে সকল দেশকে দুর্ব্বলতা পরিহার করিয়া শক্তিলাভের চেষ্টা করিতে হইতেছে সেই সকল দেশেই ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিস্ফুট। মানুষের স্বাধীন চিন্তা বাক্য এবং কার্য্য যে কতটা প্রতিহত হইতে পারে নূতন নূতন দৃষ্টান্ত নিত্যই জার্ম্মানিতে দেখা যাইতেছে। জার্ম্মানিতে নবপ্রবর্ত্তিত প্রেস আইন অনুসারে কোন জয়েণ্ট-

ষ্টক কোম্পানি কোন সাধারণ, ব্যবসায়ী বা সমবায় দল বা এই প্রকারের কোন প্রতিষ্ঠান এবং অনার্য্যেরা কোন সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে পারিবেন না। অবশ্য নাৎসী দলভুক্তেরা এই আইনের আমলে আসিবেন না।

প্রকাশকদিগকে ১৮০০ সাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের এবং তাঁহাদের স্ত্রীদের আর্য্যত্বের প্রমাণ দিতে হইবে। আমাদের এতটা দুর্গতির মধ্যেও মানুষের অতিসঙ্গত ও স্বাভাবিক অধিকারের এমন ব্যাপক বিলুপ্তি কল্পনা করিতে পারি না।

দিনাজপুর সম্মিলনে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা

জাতীয়তা ও গণতান্ত্রিকতার বিরোধী এবং অবিচারমূলক বলিয়া দিনাজপুর সম্মিলন সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা প্রত্যাখ্যান করিয়া এবং নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটিকে এসম্বন্ধে তাঁহাদের মনোভাব পরিবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করায়, একজন ব্যতীত সকল জাতীয়তাবাদী মুসলমান সভা পরিত্যাগ করেন। ইঁহাদের এইপ্রকার আচরণের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া ইঁহারা যে বিবৃতি দিয়া যান, তাহাতে ইঁহারা স্পষ্টভাবেই বলেন যে, ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায়ই তীব্রভাবে তাঁহারা ইহার নিন্দা করেন; তাঁহারা ইহাকে জাতীয়তা ও গণতান্ত্রিকতার বিরোধী বলিয়া মনে করেন এবং ইহাও মনে করেন যে হিন্দু বা মুসলমান কাহারও স্বার্থের জন্য ইহার উদ্ভব হয় নাই। কিন্তু, আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ইঁহারা ইহাও এই সঙ্গে মনে করিলেন যে, বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে কংগ্রেসের না বর্জ্জন না গ্রহণ নীতি বিশেষ বিবেচনাপ্রসূত ও সঙ্গত হইয়াছে এবং আলোচ্য সম্মিলনেরও তাহা ব্যতীত আর কিছু করা কর্ত্তব্য নহে।

ইঁহারা যদি ইহাকে অন্যায় ও অবিচারমূলক বলিয়া মনে করিয়া থাকেন তবে কোন্ বিবেচনা হইতে ইঁহারা ইহাকে বর্জ্জন করিতে পশ্চাৎপদ হইলেন তাহা আমাদের ন্যায় অনেকেই বুঝিতে পারেন নাই।

মুসলমান সম্প্রদায়ের মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই কংগ্রেসকে নিতান্ত অন্যায় ও অনিষ্টকর জানিয়াও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। যাঁহাদের জন্য দেশের সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও শক্তিশালী জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে এই জাতীয়তাবিরোধী নীতি অবলম্বন করিতে হইয়াছে সেই সম্প্রদায়ের প্রকৃত জাতীয়তাবাদী প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ত্তব্য হইবে, তীব্রভাবে ইহার নিন্দা করা এবং নিজ সম্প্রদায়ের মনোভাবকে পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করা। অন্য সম্প্রদায়ের লোকের দ্বারা এই কার্য্য ভালভাবে সম্পন্ন হওয়া শক্ত বলিয়া, তাঁহাদের কথার ও কার্য্যের ভুল ও বিকৃত ব্যাখ্যা হওয়া সম্ভব বলিয়া, ইঁহাদের দায়িত্ব আরও বেশী রহিয়াছে। বাংলার জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা যদি এই কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব পালনের শক্তির পরিচয় দিতে পারিতেন তবে, তাহা বিশেষ সুখের হইত এবং সম্ভবতঃ ইহা কংগ্রেসকেও বর্ত্তমান দুর্ব্বলতা পরিহার করিতে সাহায্য করিতে পারিত।

যুক্ত নির্ব্বাচন ও বাঙ্গালী হিন্দু

যুক্ত নির্ব্বাচনে বাঙ্গালী হিন্দুদের কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক লাভ হইবে এই আশায় বাঙ্গালী হিন্দুরা স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের বিরোধী হইতে পারেন না। বাংলাদেশে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় কাজেই যুক্ত নির্ব্বাচন প্রতিষ্ঠিত হইলে, নির্ব্বাচনের ফলাফলের উপর মুসলমানদের জনসংখ্যার প্রভাব অনুভূত হইবে এই স্বাভাবিক কথা ব্যতীতও যুক্ত নির্ব্বাচনে হিন্দুদের অন্য প্রকার আশঙ্কাও রহিয়াছে। মুসলমানেরা একটি সংঘবদ্ধ শক্তিশালী সম্প্রদায়: ইঁহাদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ প্রায় নাই বলিলেই হয়; অন্যদিকে হিন্দুরা বহু বিভাগে ও উপবিভাগে বিভক্ত এবং এই বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে বিশ্বাস ও উদ্দেশ্যের ঐক্যের অভাব আছে। এই অবস্থায় হিন্দুরা যে তাঁহাদের জনসংখ্যার অনুপাতেও নির্ব্বাচনে সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন না, তাহা যাঁহারা স্থানীয় সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহে যুক্ত নির্ব্বাচনের ফলাফল লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। কাজেই হিন্দুদের যুক্ত নির্ব্বাচন চাহিবার পশ্চাতে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক অভিসন্ধি নাই।

নূতন মেয়র

মৌলবী ফজলুল হক্ মেয়র নির্ব্বাচিত হওয়ায় আমরা এই জন্যই বিশেষভাবে আনন্দিত হইয়াছি যে এখানে হিন্দু ও মুসলমানেরা একযোগে কাজ করিতে পারিয়াছিলেন এবং হিন্দুরা তাঁহাদের অসাম্প্রদায়িকতার পরিচয় দিতে পারিয়াছিলেন। মৌলবী ফজলুল হক নিঃসন্দেহ যোগ্য ব্যক্তি। নব নির্ব্বাচিত ডেপুটি মেয়র শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায় চৌধুরীকেও আমরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

বিমান দুর্ঘটনা

দমদম বিমানঘাটির নিকটে বিমানপোত দুর্ঘটনায় দুইজন বাঙ্গালী বৈমানিকের ও দুইজন প্রমোদ-আরোহীর অকাল ও শোচনীয় মৃত্যুতে আমরা বিশেষ ব্যথিত। বাঙ্গালীরা এখনও এদিকে বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করিতে পারেন নাই এবং অধিক লোকও এদিকে ঝোঁকেন নাই। এই দুর্ঘটনা অনেক ভাবী বৈমানিককে নিরুৎসাহ করিবে। শ্রীযুক্ত বি-কে-দাসের নাম বাংলাদেশে সুপরিচিত ছিল।

জাতীয় ভিত্তিতে প্রাথমিক শিক্ষা

নিজ নিজ এলাকায় জাতীয় ভিত্তিতে প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা করিবার জন্য কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুরোধ করিয়া দিনাজপুর সম্মিলনে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। জাতীয় ভিত্তিতে শিক্ষাদানের একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য এই সঙ্গে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকেও অনুরোধ করা হইয়াছে। বর্ত্তমানের গঠনমূলক কাজের উপরই দেশের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে; এই চেষ্টা সকল দিকেই পরিচালিত করিতে হইবে। শিক্ষাকে ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় দিক বলা যাইতে পারে এবং ইহা যাঁহাতে কোন প্রকারে অবহেলিত না হয় তাহার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। প্রাথমিক শিক্ষা শুধু বর্ত্তমান অর্থে নহে; অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে জ্ঞান যাহাতে কতকটা সম্পূর্ণতা লাভ করে, দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনে চলিবার পক্ষে, আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সুফলগুলিকে মোটামুটি ভাবে কাজে লাগাইবার পক্ষে, দেশাত্মবোধ ও পৌর কর্ত্তব্যবোধ জাগ্রত করিবার পক্ষে, দেশের ও অন্যান্য দেশের অবস্থা মোটামুটি ভাবে বুঝিবার পক্ষে, ন্যূনপক্ষে যতটুকু জ্ঞান পর্য্যাপ্ত, দেশের লোক (যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পাইবে না) সহজে যাহাতে তাহা লাভ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা যদি করা যায় তবেই, প্রকৃতপক্ষে উপকারের আশা করা যাইবে। শিক্ষাকে সুলভ করিবার জন্য, ইন্দোরে যে হিন্দী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কল্পনা চলিতেছে; সেই ভিত্তিতে বাংলার কর্ম্মীরা সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য একটি বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যায় কিনা তাহা ভাবিয়া দেখিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের মুক্তি

কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের বিরুদ্ধে যে মোকর্দ্দমা চলিতেছিল, তিনি সসম্মানে তাহা হইতে মুক্তিলাভ করায় আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি, যদিও অধ্যাপক প্রমথনাথ সরকারের আত্মহত্যা ব্যাপারটিকে বিশেষভাবে করুণ করিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আমরা আর একটা কথার উল্লেখ করিতে চাই। মোকর্দ্দমা চলিবার সময় কুরুচিপূর্ণ আপত্তিজনক যে সকল পুস্তক বহুসংখ্যায় বাহির হইয়াছে ও প্রচুর বিক্রয় হইয়াছে তাহা আমাদের সমাজের নৈতিক স্বাস্থ্যের পরিচায়ক নহে।

বাঙ্গালীর প্রাদেশিকতা

হিন্দু মহাসভার কার্য্যকরী সমিতির ও কর্ম্মকর্ত্তাগণের নির্ব্বাচনের সময়, শ্রীযুক্ত কালীরঞ্জন আচার্য্য এই দাবী উপস্থিত করেন যে, সাধারণ সম্পাদকদের মধ্যে একজনকে বাংলা হইতে গ্রহণ করা হউক, তিনি এই সঙ্গে ইহাও বলেন যে, গত ১৬ বৎসর বাঙ্গালীরা এই সম্মান হইতে বঞ্চিত আছেন। ইহার উত্তরে ভাই পরমানন্দ বলেন যে, এই প্রকারের মনোভাব ভাল নহে; প্রস্তাবক অত্যন্ত তীব্র প্রাদেশিক মনোভাবের বশবর্ত্তী হইয়া এরূপ কথা বলিতেছেন।

কোনও বড়লোক তাঁহার দরিদ্র প্রতিবেশীর সর্ব্বস্ব গ্রাস করিয়া তাহাকে সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি। ভাইজীর উপদেশ আমাদিগকে সেই কথা মনে করাইয়া দিয়াছে। সর্ব্বত্র প্রাদেশিক স্বার্থ রক্ষার জন্য সচেষ্টতা বাহির হইতে খুবই খারাপ দেখায় এবং প্রকৃতপক্ষেও তাহা নিশ্চয়ই খারাপ হইত যদি ইহার পশ্চাতে বাঙ্গালীদিগকে সর্ব্বক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করিবার ধারাবাহিক ইতিহাস না থাকিত। বাংলার বিরুদ্ধে অন্যান্য প্রদেশবাসীদের যে প্রাদেশিক বিদ্বেষ, সর্ব্বক্ষেত্রে বাঙ্গালীদের কোণ-ঠাসা করিয়া রাখিবার (সফল) চেষ্টায় আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তাহাই বাঙ্গালীদের মধ্যে কতটা প্রাদেশিক মনোভাবের সৃষ্টি করিয়াছে। বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে প্রাদেশিকতার অভিযোগ আনয়ন করিবার পূর্ব্বে অন্য সকলকে এই কথাটা মনে রাখিতে হইবে।

বাংলা ও আসাম

আসাম স্বতন্ত্র প্রদেশ হইলেও ভৌগলিক হিসাবে ইহা বাংলারই অংশ। বাঙ্গালীরা এখানকার মোট জনসংখ্যার অর্দ্ধেকের উপর না হইলেও, এখানকার অন্য যে কোনও একটি জাতি অপেক্ষা তাঁহাদের সংখ্যা অনেক অধিক। সংখ্যায় ইঁহারা আসামীদের প্রায় দ্বিগুণ। এখানকার মোট জনসংখ্যার মধ্যে আসামীরা মাত্র শতকরা ২২জন এবং বাঙ্গালীরা ৪২ জন। কাজেই জাতি এবং ভাষা হিসাবেও আসাম বাংলার অংশ এবং এখানে বাঙ্গালীদের কথা ও সমস্যাই প্রধান। বাংলায় যদি অন্য ভাষাভাষী কোন সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সম্প্রদায় থাকিতেন তবে, তাঁহাদের কথা যে ভাবে বিবেচনা করা হইত, আমাদের অবাঙ্গালীদের কথাও সেইভাবে বিবেচনা অসঙ্গত বা অন্যায় নহে। কিন্তু, বাঙ্গালীদের অবস্থা এখানে অনেকটা গৌণ এবং তাঁহাদের সংখ্যা-লঘিষ্ঠ, ক্ষমতাহীন সম্প্রদায়ের ন্যায় অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

ভাষা ও কৃষ্টির ঐক্যই জাতির শক্তি ও ঐক্যের মূল ভিত্তি। এই দিক দিয়া আসামের বাঙ্গালীরা যাহাতে ক্রমে দূরে সরিয়া না যান, তাহা উভয় প্রদেশের বাঙ্গালীদের দেখিবার বিষয়। আসাম উপত্যকার স্কুল সমূহে দেশীয় ভাষারূপে আসামীর প্রবর্ত্তন হওয়ায়, বাঙ্গালীদের মাতৃভাষা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবার আশঙ্কা আসন্ন হইয়াছে।

মৌলবী মুনাওয়ার আলি, আসাম আইন পরিষদের আগামী অধিবেশনে আসাম-বিশ্ববিদ্যালয় বিলের আলোচনা উত্থাপন করিবেন বলিয়া নোটীশ দেওয়ায় সম্প্রতি আসামের বাঙ্গালীদের (হিন্দু মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের) মধ্যে বিশেষ বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে।

আসামে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে, এখানকার বাঙ্গালীরা যে বিশেষ অসুবিধায় পতিত হইবেন এবং বাংলার সহিত তাঁহাদের কৃষ্টিমূলক সংযোগ অনেক শিথিল এবং কালক্রমে বিচ্ছিন্ন হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আসামীরা যদি নিজেদের ভাষা ও কৃষ্টির পুষ্টির জন্য একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় চাহেন এবং তাহা চালাইতে পারেন তবে, যাহাতে সমগ্র দেশের স্কুল কলেজগুলির উপর তাহার কোন অধিকার না থাকে, তাহার জন্য বাঙ্গালীদের প্রাণপণ চেষ্টা করা বিশেষভাবে কর্ত্তব্য হইবে।

বাঙ্গালী অধ্যাপকের সম্মান

জার্ম্মান বৈজ্ঞানিকদের আধা সরকারি প্রতিষ্ঠান জার্ম্মান একাডেমি মিউনিকে তাঁহাদের দশম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি, এলাহাবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ মেঘনাদ সাহাকে তাঁহাদের সদস্য করিয়া লইয়াছেন। দুইজন চৈনিক এবং একজন ইংরেজ অধ্যাপকও এই সম্মানের অধিকারী হইয়াছেন।

শ্রীসুশীল কুমার বসু
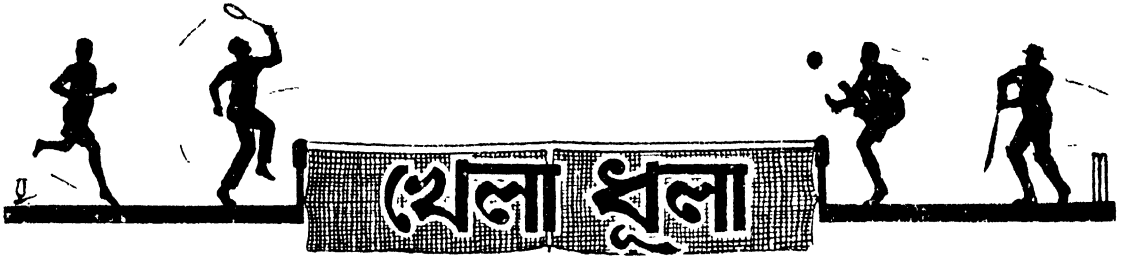
শ্রীবিনয় রায়চৌধুরী এম্ এ

হকি ঃ

এ দেশে হকিতে বোধ হয় বাইটন্ই সবচেয়ে পুরাণো বিখ্যাত টুর্ণামেণ্ট। তারপর নাম হিসেবে বম্বের আগা খার টুর্ণামেণ্ট। নানা প্রদেশ হ'তে বিশিষ্ট হকি টিম সকল প্রতি বছর বাইটন্ কাপ্ খেলতে আসে। ১৮৯৫ সালে বাইটন্ টুর্ণামেণ্ট কলিকাতায় প্রথম আরম্ভ হয়। কম্বাইনড্ টেলিগ্রাফ্; মাদ্রাজ "ইলেভেন্"; দিল্লীর "ইয়ংম্যান"; লক্ষ্ণৌ 'ওয়াই, এম, এ; ই, আই, আর প্রভৃতি বাহিরের টিম হতে একজন বাইটনের বাজি জিতবে অনেকেই এমন ভুল ধারণা করেছিল। এই প্রতিযোগিতায় স্থানীয় ক্লাবের মধ্যে অদ্বিতীয় কাষ্টমস, লীগ চ্যাম্পিয়ন মোহন-বাগান এবং গত বছর বাইটন বিজয়ী রেঞ্জার্স বাঙ্গলার হকি ষ্টাণ্ডার্ড সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেছে। তৃতীয় রাউণ্ডে ঢাকা স্পোর্টিংকে ২ গোলে জয় লাভের জন্য কম্বাইনড্ টেলিগ্রাফ্‌কে রীতিমত বেগ পেতে হয়েছিল। ঢাকা স্পোর্টিং সেদিন এত ভাল খেলবে কেউ আশা করে নি। রেঞ্জার্স অপ্রত্যাশিতভাবে লক্ষ্ণৌর 'ওয়াই, এম, এ'র কাছে ২ গোলে হেরে যায়। নেষ্টর, ডেভিড্সন, হজেস্, তিনটি ভাল প্লেয়ারকে হারিয়ে বাইটনে এমন অভাবনীয় পরাজয় ঘটলো। চতুর্থ রাউণ্ডে সবচেয়ে প্রবল প্রতিযোগিতা হয়েছিল মোহন বাগান বনাম ই, আই, আর এবং কম্বাইনড্ টেলিগ্রাফ্ বনাম কাষ্টমস্। বরাৎ জোরে ই, আই, আর ৩-১ গোলে মোহন বাগানকে পরাজিত করে। খেলার বেশীভাগেই কিন্তু বিপক্ষ দলকে মোহন বাগান ক্রমান্বয় আক্রমণ করে চেপে রেখেছিল। সুটিং সার্কেল এ বহুবার বল নিয়ে গিয়েও খাঁ ও দেব তিন চারটি গোলের সুযোগ নষ্ট করে। প্রতি বিভাগে সুদক্ষ খেলার পরিচয় দিয়েও মোহন বাগান সেদিন জয়ী হতে পারলো না—এ বড়ই পরিতাপের বিষয়।

মিসেস্ লা ব্রক বিজয়ী কাষ্টমস দলের ক্যাপ্টেনকে বাইটন কাপ দিতেছে

ফটো—দেবব্রত চাটার্জ্জী

কাষ্টমস্ বনাম টেলিগ্রাফ্ ম্যাচটি রজত জুবিলির সাহায্যার্থে চারিটি ম্যাচে পরিণত হয়েছিল। কাষ্টমস্ ৩ গোলে জয় লাভ করে। সিম্যান, ডিপহলটস, ওয়েষ্টনের কম্বিনেসনকে টেলিগ্রাফের ডিফেন্স রুখ্‌তে পারলো না।

ফাইনাল গেমে কাষ্টমস্ দল পুরোণো প্রতিদ্বন্দী বি, এন, আর দলের সঙ্গে খেলা হয়। এই নিয়ে বাইটন্ কাপে উক্ত টিম দুটি ৪ বার সাক্ষাৎ করিল। কাষ্টমস্ বেশীর ভাগই জয়ী হয়ে এসেছে। এবারকার ফাইনাল গেমে প্রথম দিন ড্র হয়। এক্সট্রাটাইম পর্য্যন্ত খেলা অমীমাংসিত থাকে। দ্বিতীয় দিনে অপরাজয় কাষ্টমস্ পুরোণো খেলার চাতুর্য্য ও ক্ষিপ্রগতিতা ফিরে পাওয়াতে বি, এন, আর বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হল। খেলার প্রথমভাগে সর্ট কর্ণারে বি, এন, আর এর সি ট্যাপসেল্ একটি গোল দেয়। গোল খেয়ে কাষ্টমস্ হঠাৎ না দমে অতি ধৈর্য্যের সহিত বিপক্ষ দলকে বার বার আক্রমণ করতে থাকে। দ্বিতীয় হাপে সি, ডিপহলটস্ কাষ্টমস্-এর হয়ে একটি গোল দেয়। ইহার পর কাষ্টমস্ দ্বিগুণ ভাবে সারা মাঠ চষে ফেলতে লাগলো। বি, এন, আর-এর খেলার উৎসাহ তখন অনেকটা কমে এসেছে। ১ মিনিটের মধ্যেই সিম্যান আর একটি গোল দিয়ে খড়্গপুর দলের সব আশা বিনাশ করে দেয়। এই নিয়ে কাষ্টমস্ ১০ বার চ্যাম্পিয়নহল।

স্যার আশুতোষ চ্যালেঞ্জ হকি কাপ্ বিজয়ী সেন্ট্ জেভিয়ারস্ কলেজ দল
[অমৃতবাজার পত্রিকার সৌজন্যে]

কাইভান কাপ ঃ

পুলিশ মাঠে ফাইনাল গেমে জেসপস দল ১ গোলে খড়্গপুর বি টিমকে হারিয়ে জয়লাভ করে। খেলার অধিকাংশ সময় খড়্গপুর জেসপস টিমকে আক্রমণ করে বিপন্ন করে রেখেছিল। গোল দেবার সুযোগও কম নষ্ট করে নি। শেষের দিকে জেসপের দলের টেলার একটি গোল দেয়। খড়্গপুর দল গোলটি শোধ করবার বিস্তর চেষ্টা সত্ত্বেও ব্যর্থ হয়।

জেসপস দল

ভজ; বার্ণস্ ও জোন্‌স্; মারসন, ম্যাক্‌লাউড ও ডি সুজা; হ্যারিশ, ক্রশ, টেলার, ম্যাকরড ও স্মিথ্।

খড়্গপুর দল

স্টিং; গ্যাস্‌পার ও স্মিথ্; স্টুর্টন, ওয়ালাটার্স ও হার্বিন্; মিড, স্মিথ্, হিল্, সেল্ ও লেনন্।

আম্পায়ার—সি, ডাফ ও এ জেমস্।

পূর্ব্ববর্ত্তী বিজয়ীগণ

লিলুয়া এ্যাপ্রেনটিস (১৯৩৩): টেলিগ্রাফ্ রিক্রিয়েশন্ (১৯৩৪)।

লক্ষ্মীবিলাস কাপ

শুধু ভারতীয় টিমরাই এই প্রতিযোগিতায় খেলতে পারে। কাষ্টমস্ মাঠে ফাইনাল গেমে দিল্লী ইয়ং মেনস্ টিমের কাছে ভবানীপুর দল ১ গোলে পরাজয় স্বীকার করেছে। খেলায় দুই দলের আক্রমণের আদান প্রদান সমানভাবে চলেছিল। প্রথম হাফে কোন পক্ষেই গোল দিতে সক্ষম হয় নি। খেলার শেষভাগে দিল্লীর দলের সুলতানী একটি গোল দেয়। সেই গোল ভবানীপুর দল শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা করেও শোধ করতে পারে নি।

প্রতি বছরেই দেখা যায় প্রথম দিকে খুব ভাল খেলে সেমিফাইনাল বা ফাইনাল গেমে ভবানীপুর নিজের খেলার দোষে বার বার পরাজিত হয়। গত ৩ বছর ঝান্সি হিরোস

এই প্রতিযোগিতার চাম্পিয়ন ছিল। এবারও লক্ষ্মীবিলাস কাপ দিল্লীতে গেল। আশা করি আগামী বছর বাঙালী কোন টিম জয় লাভ করে স্থানীয় হকির সম্মান রাখবে।

স্যার আশুতোষ চৌধুরী হকি কাপ

কলেজ মহলে এই টুর্ণামেন্টটি হলো সবচেয়ে নামজাদা। এবার যাদবপুর কলেজ মাঠে ফাইনাল গেমে সেণ্টজেভিয়ার দল প্রতিদ্বন্দ্বী মেডিক্যাল কলেজকে সাক্ষাৎ করেছিল। সেণ্ট্‌জেভিয়ার ১ গোলে জয়লাভ করে। প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত খেলাটি বেশ চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। প্রথম হাফে চমৎকার খেলার ফলে সেণ্ট্‌ জেভিয়ারের লিসেনবার্গ একটি গোল দিতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয় হাফে মেডিক্যাল কলেজের উপর্য্যুপরি আক্রমণে বিপক্ষ দল টলমল হয়ে পড়েছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ মেডিক্যাল কলেজ কোন গোল দিতে সক্ষম হয় নি। দুই দলেই কলিকাতার প্রথম ডিভিসনের কয়েকজন নামজাদা খেলোয়াড় যোগ দিয়েছিল। গত বছর সেণ্ট্‌-জেভিয়ার কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। খেলার শেষে উইলশন ও এলিমার উৎকৃষ্ট খেলোয়াড় হিসেবে প্রত্যেকে একটি করে বিশিষ্ট পুরস্কার লাভ করে।

সেণ্ট্‌ জেভিয়ার টিম্‌

মুরিটা ; এস্‌ জোসেফ্‌ ও ই, মার্চেণ্ট ; আর, হ্যাভলে, এস, ডিকেন্স্‌, ও গলষ্টন ; এস্‌, লিসেনবার্গ, উইলশন, পেরিয়ার, জে, রেণ্টন, ও ডি আগাষ্টিন।

মেডিক্যাল টিম

গ্রিফিথ্‌ ; এলিমার ও সিল ; এস, দত্ত, মার্স ও সেল্‌স; হ্যান্‌সন, আর, মুখার্জি, লোপেজ, এমেট ও এস্‌ সাধু। আম্পায়ার—ডি গুঁই ও গোষ্ঠ পাল।

বাইটন কাপে মোহনবাগান দল ই, আই, আর-এর সঙ্গে খেলছে। খেলায় ই, আই, আর ২—১এ জেতে।
ফটো—দেবব্রত চাটার্জ্জী

ইণ্টার কলেজিয়েট লীগ্‌ চ্যাম্পিয়ন ও কল্যাণ শিল্ড

এই দুটি টুর্ণামেণ্টও সেণ্ট্‌জেভিয়ার কলেজ জয়লাভ করেছে। স্পোর্টসে স্থানীয় কলেজের ভিতর ইহাদের রেকর্ড অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এ বছর হকি, বাইচ খেলা, স্পোর্টস্‌ প্রভৃতি খেলায় সেণ্ট্‌ জেভিয়ার যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে।

ক্রিকেট্‌

ইষ্টার ছুটিতে মিষ্টার এস্‌ কে সেন, কলিকাতার কয়েকজন নামজাদা ক্রিকেট খেলোয়াড়দের নিয়ে দার্জ্জিলিং-এ খেলতে গিয়েছিলেন।

জলাপাহাড়ে প্রথমদিন খেলায় স্থানীয় দার্জ্জিলিং "ইলেভেন্"এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। খেলার ফলাফল অমীমাংসিত হয়। দার্জ্জিলিং টিমের সুদক্ষ বোলার কুম্বস ও ডাবলিন্ ভার্সিটি ব্লু কেনীর সুন্দর বোলিং এবং চমৎকার ফিল্ডিং সত্বেও কলিকাতার দল দু ঘণ্টায় ২২২ রান্ করে। লাঞ্চের পর ৫ উইকেটে ২২২ রানে কলিকাতা দল ডিক্লেয়ার করেন। ব্যাটিং হিসেবে বি সর্বাধিকারী (৩৪), এস ব্যানার্জ্জি (৩৪) পি দত্ত (৫৪) এবং বেনিটি (৫২) রান বিশেষ চিত্তাকর্ষক হয়েছিল।

সাউথ ক্লাব ইণ্টার টুর্ণামেণ্টে বিজয়ী সি. এল্. মেটা।
[অমৃতবাজার পত্রিকার সৌজন্যে]

ইহার প্রত্যুত্তরে দার্জ্জিলিং দল ৪ উইকেটে মাত্র ৯৫ রান করে। এই দলে ডালহৌসির বুড়ো ওয়েব (৩৩) এবং কুম্বস্ নিখুঁত ব্যাটিং করে ৪০ রানে নট আউট্ হয়ে থাকেন।

তার পরদিন খেলায় দার্জ্জিলিংএর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টিম্ সেণ্ট্ জোসেফ্ কলেজ কলিকাতা দলের কাছে ৪৬ রানে পরাজয় স্বীকার করে।

টস্ জিতে কলিকাতা দল প্রথম খেলতে নামে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শুধু এস্ ব্যানার্জ্জি ছাড়া একে একে সেণ্ট জোসেফের মারাত্মক বোলিংএর কাছে সকলে আউট্ হয়ে যায়। কলিকাতাদল সর্ব্বশুদ্ধ ১২৬ রান করে। সেদিনকার পরাজয়ের হাত থেকে কোন মতে বাঁচিয়ে টিম্কে দাঁড় করায় এস্ ব্যানার্জ্জি।

অতি ধৈর্য্যের সহিত প্রতি বলটি মেরে এবং সুন্দর ষ্ট্রোক্ দেখিয়ে অল্ রাউণ্ডার এস্ ব্যানার্জ্জি একলাই ৮০ রান করে।

তারপর কলেজ টিম্ খেলতে নেমে এস ব্যানার্জ্জির বোলিংএর কাছে একদম দাঁড়াতে পারলো না।

ফার্ণানডিজ আর কেণী কিছুক্ষণের জন্যে নিজের টিমকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। ৭ উইকেটে মাত্র ২১ রান নিয়ে এস্ ব্যানার্জ্জি, সেণ্ট্ জোসেফ্ দলকে পরাজয় গ্লানিতে ভরিয়ে দেয়।

শেষ খেলা সেণ্ট্পলস্ কলেজের সঙ্গে হয়েছিল। এবারও কলিকাতার দল মাত্র ১৪ রানে জয়লাভ করে। প্রথম ইনিংসে কলিকাতার রান হয়েছিল ১৬১। ৬ উইকেটে মাত্র ৭০ রান নিয়ে বিপক্ষ দলে আলেক্জান্দার সেদিনকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বোলার হিসাবে সম্মান পেয়েছিল।

ইহার প্রত্যুত্তরে সেণ্ট্ পলস্ কলেজ ১৪১ রান করে। আলেক্জান্দার (৫০) এবং ওয়াটের (৩০) রান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

টেনিস্ঃ

সারে টেনিস চ্যাম্পিয়নসিপ্

জার্ম্মানির ডেভিস কাপ খেলোয়াড় ডক্টর প্রেন সিঙ্গল্স ফাইনালে স্পেনস্ কে ৬—৩, ৬—৩ গেমে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।

বহু রকমের মনোমুগ্ধকর ষ্ট্রোক্ এবং বলের উপর অসামান্য দখলের পরিচয় ডক্টর প্রেন দিয়েছিলেন। ব্যাক্ হ্যাণ্ডে ইনি বিশেষ পারদর্শী। এবং প্রত্যেকটি ষ্ট্রোকই আবার স্পিন দেওয়াছিল।

মহিলা সিঙ্গল্‌স ফাইনালে মিসেস উইটিনষ্টল্‌ ৬—১, ৫—৭, ৬—৪ গেমে মিসেস পিট্‌ম্যানকে হারিয়ে জয়ী হয়েছেন।

প্রথম সেটে মিসেস্ পিটম্যানের খেলার চাতুর্য্য একদম খোলেনি। দ্বিতীয় সেটের খেলা অন্যরকম হয়ে দাঁড়াল। তৃতীয় সেটে শুধু মারাত্মক সার্ভিস্ ও নিখুঁত ষ্ট্রোকের জোরেই উইটিনষ্টল্ জয়লাভ করেন।

বম্বে সুবাবন টেনিস্ চ্যাম্পিয়নসিপ্

বান্দ্রা ক্লাবে সিঙ্গলস্ ফাইনালে ভারতের দ্বিতীয় নম্বর খেলোয়াড় ই. বব্ অতি সহজেই ৪, সাটনকে ৬—৩, ৬—০ গেমে হারিয়ে জয়ী হয়েছেন। সেমিফাইনাল গেমে এ ভ্যাকেরিয়ার বিরুদ্ধে সাটনের চমৎকার খেলায় মুগ্ধ হয়ে পারদর্শিতার পরিচয় দেবে অনেকেই আশা করেছিল। কিন্তু সেদিন সাটনের খেলায় ভগ্নোৎসাহ হয়ে সকলকে বাড়ী ফিরতে হয়েছিল।

বম্বে ম্যারাথন্ রেস বিজয়ী ভিক্ষু ও বস্ক।
[অমৃতবাজার পত্রিকার সৌজন্যে]

ডবলস্ ফাইনালে ই, বব্ এবং পেরিরা ৪—৬, ৬—৩, ৬—১ গেমে এ, সানটুক্ এবং ভ্যাকেরিয়াকে পরাজিত করেছে।

সিংহল এক্সজিবিশন্ ম্যাচ্

সিংহল লন্ টেনিস্ এসোসিয়েসন্ হতে নিমন্ত্রিত হয়ে মাদ্রাজের কয়েকজন খেলোয়াড় সেখানে গিয়েছিল। সিংহল বনাম ইণ্ডিয়া এক্সজিবিশন্ ম্যাচে ভারতীয় খেলোয়াড়দের অভাবনীয় পরাজয় ঘটেছে।

পরাজয়ের প্রধান কারণ হল রেড্ গ্রাভেল্ কোর্টে ভারতীয়দের খেলার অনভ্যাস।

জি, নিকোলাস্ এবং এইচ্, স্থানসোনি ৬ ৩, ৩—৬, ৬—৩ গেমে রাজা রামনাদ এবং টি, বালগোপালকে হারায়।

ডক্টর গুণশেখর ও ডব্লিউ, রট্‌নাম্ ৮—৬, ৭—৫ গেমে জি, রেণী ও এন্ কৃষ্ণস্বামীকে হারায়।

সিংহল টেনিস্ টুর্ণামেন্ট :

অদ্বিতীয় খেলোয়াড় এইচ্, স্থান্‌সোনি সিঙ্গলস ফাইনালে মাদ্রাজে এন্ কৃষ্ণস্বামীর কাছে ৭—৫, ৬—১, ৬—২ গেমে পরাজয় স্বীকার করেছে। সিংহল টেনিস্ ইতিহাসে এই সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় খেলোয়াড় জয়ী হল।

সাউথ ক্লাব টুর্ণামেন্ট :

এ বছরের বালীগঞ্জ চ্যাম্পিয়ন ডব্‌লিউ, মাইকেলমোরকে সিঙ্গলস্ ফাইনালে ৬-২, ৫-৭, ৬-১ গেমে হারিয়ে তরুণ খেলোয়াড় সি, এল, মেটা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

সেদিনে উভয়ের খেলা হয়েছিল বেশ উঁচুদরের। মাইকেলমোর মেটার কাছে এত সহজে বশ্যতা স্বীকার করবে খেলার পূর্ব্বে পর্য্যন্ত কেউ আশা করে নি।

এবার সি, এল, মেটার রেকর্ড বেশ আশাপ্রদ।

পাটনা, রাঁচী, শ্যামবাজার, সাউথ ক্লাব এবং বহু সিঙ্গলস ও ডবলস্ প্রতিযোগীতায় মেটা জয়ী হয়েছে।

ভারতের বিশিষ্ট সিঙ্গলস খেলোয়াড়দের মধ্যে মেটা স্থান পায়। বিখ্যাত ফ্রেঞ্চ প্রোফেসনল্ রামিলন এই তরুণ

মেটাব খেলার চাতুর্য্যে মুগ্ধ হয়ে উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করে গেছেন।

ম্যারাথনরেস

অলিম্পিক্ এসোসিয়েসন অনুমোদিত বঙ্গেতে সর্ব্বপ্রথম ২৬ মাইল ম্যারাথন রেসে বি, বি, সি রেলওয়ে কর্ম্মী ভিক্ষু প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এই অভিনব দৌড় প্রতিযোগীতা দেখবার জন্য রাস্তার দুইধারে বঙ্গের জনতা ভরে গিয়েছিল।

১০ মাইল দৌড় প্রতিযোগিতায় এস্. এন চক্রবর্ত্তী
[অমৃতবাজার পত্রিকার সৌজন্যে]

সর্ব্বশুদ্ধ ১২ জন উৎসাহী প্রতিযোগী এই রেসে যোগ দিয়েছিল। এবং মাত্র ৪জন নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছিতে সক্ষম হয়েছিল। অন্যান্য দেশের তুলনায় ভিক্ষুর রেকর্ড খুব আশ্চর্য্যজনক নয়। তবে জীবনের সে এই সর্ব্বপ্রথম এত দূর দৌড়ে যোগদান করে উচ্চ সম্মানলাভে সক্ষম হয়েছে।

দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে ভি, বসুক। প্রতিযোগীতা আরম্ভ হবার পূর্ব্বে সেই ছিল ফেভারিট্। দৌড়ের প্রথম অবস্থায় সেই প্রথম যাচ্ছিল। কিন্তু মাঝ পথে ভিক্ষু তাকে ধরে ফেলে এবং সকলকে পেছনে রেখে অনায়াসে সে শেষ বাজী মারে।

প্রতিযোগিতার ফলাফল :

এ, ভিক্ষু—৩ ঘণ্টা, ৪০ মিনিট, ৪০ সেকেণ্ড্
ভি, বসরু— ৩ ঘণ্টা, ৫৫ মিনিট, ২৫ সেকেণ্ড
জে, ভরুচা— ৪ ঘণ্টা, ৩০ মিনিট, ৫৫ সেকেণ্ড
ই, জেকব—৫ ঘণ্টা, ১৫ মিনিট, ১২ সেকেণ্ড

পাঁচ মাইল দৌড় প্রতিযোগিতা

রামচরণ স্মৃতি ৫ মাইল দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রায় ৪০ জন প্রতিযোগী নাম দিয়েছিল।

আমহার্ষ্ট রো ও সার্কুলার রোড হতে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয় এবং একজন ব্যতীত সকলেই নির্দ্ধারিত পথ অতিক্রম করে। প্রথম হতেই ফণিভূষণ চন্দ্র, এস্ গুহ ও কে, নন্দীর মধ্যে বেশ প্রবল প্রতিযোগিতা চলছিল। বার বছর বয়স্ক রমেন্দ্রনাথ মল্লিক ও রামদুলাল ভট্টাচার্জ্জি এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করে অল্পবয়স্ক ছেলেদের ভিতর এক উৎসাহের ঢেউ এনে দিয়েছে।

প্রতিযোগিতার ফল

১ম—ফণিভূষণ চন্দ্র (মেদ্‌নীপুর)। সময়—২৯ মিনিট, ১৩ সেঃ
২য়—এস্ গুহ (ঢাকুরিয়া ক্লাব)। সময়—৩০ মিঃ ১২½ সেঃ
৩য়—কে নন্দী (বিবেকানন্দ স্পোর্টিং)। সময়—৩০মিঃ ৫১সেঃ

দশ মাইল দৌড় প্রতিযোগিতা :

বিখ্যাত স্পোর্টস্‌ম্যান্ বলাই চাটার্জির স্থাপিত ১০ মাইল দৌড় প্রতিযোগিতা সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছে। প্রতিযোগীর সর্ব্বশুদ্ধ সংখ্যা হয়েছিল ২৩ জন। মাত্র ১৫ জন নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করে। প্রতিযোগীরা বেঙ্গল অলিম্পিক্ কোর্স প্রদক্ষিণ করে পার্ক ষ্ট্রীট্ ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীট্ দিয়ে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি রোডে এসে শেষ করে।

প্রথম স্থান অধিকার করেছে বিজয়ী এস্, এম চক্রবর্ত্তী। গত বছরও শ্রীমান প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। এবার প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর শেষ পর্যন্ত ব্যবধান ছিল ১০০ গজের উপর। এস, চক্রবর্ত্তী বহু প্রতিযোগিতায় এ বছর জয়ী হয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করেন।

প্রতিযোগিতার কয়েকটি ফল :

১ম—এস্, এম, চক্রবর্ত্তী (আই, এ ক্যাম্প্)
সময়—১ ঘণ্টা ৭ মিনিট ২১ সেকেণ্ড

২য়—এস্, গুহ (আই, এ ক্যাম্প্)
সময়—১ ঘণ্টা ৭ মিনিট ৫০ সেকেণ্ড

৩য়—এন্ দাস (আই, এ ক্যাম্প)
সময়—১ ঘণ্টা ৮ মিনিট ৪ সেকেণ্ড

কলিকাতার ফুটবল লীগের প্রথম দিন খেলায় মোহনবাগান দল ডিভোনকে ২-১ গোলে হারিয়েছে।
ফটো—দেবব্রত চাটার্জ্জী

ফুটবল

বাইটন্ কাপের পরেই সোমবার ২৭ শে এপ্রিল কলিকাতার প্রথম ডিভিশন লীগ খেলা আরম্ভ হয়েছে। মাঠের ভীর সেই সঙ্গেই জমতে সুরু করেছে। নামজাদা খেলোয়াড়দের কে কোন টিম নিজেদের আয়ত্ত্বে আনতে পেরেছে সেই নিয়ে সহরময় জল্পনা-কল্পনা এতদিন পর সব শেষ হল।

সে আজ বহু দিনের কথা—১৮৯৮ খৃঃ অঃ মাত্র ৮টি ইংরেজ টিমকে নিয়ে কলিকাতা বর্ত্তমান লীগের গোড়া পত্তন হয়।

সেই বছর চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল গ্লষ্টার বলে একটি গোরা দল। ১৯১৫ সালে প্রথম ভারতীয় টিম মোহনবাগান খেলবার সুযোগ পায়।

সেই সময় হতেই লীগ খেলার প্রতি ভারতীয় জনতার প্রবল উৎসাহ দেখা দেয়।

প্রতি বছরেই লীগ্ খেলার আরম্ভ হবার সঙ্গে আগেকার এ্যানসেল, সারম্যান, পুলার, কর্নাভিন, বেনেট, পিগট্ ম্যাগ্নোনি, হোসি, ডেভিডসন, গ্যাব্রেয়ে্, ভাদুড়ী ভ্রাতৃদ্বয় সুধীর চ্যাটার্জি, মুকুল, অভিলাষ, কানু, রবি গাঙ্গুলি, কুমার, মণি দাশ, পাল, পি, দাস প্রভৃতি ওস্তাদ খেলোয়াড়দের অতীত কীর্ত্তিকলাপ অতি শ্রদ্ধার সহিত সকলে স্মরণ করে।

গত ১০ বছরের মধ্যে ফুটবল ষ্ট্যাণ্ডার্ড কত হীনবল ও নিম্ন পর্য্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। খেলার সেই চাতুর্য্য ক্ষিপ্রগামিতা, বলের উপর অসামান্য দখল চোখে আজকাল আর তেমন দেখা যায় না।

টিম হিসেবে মোহনবাগান অন্যান্য বছরের চেয়েও সব বিভাগেই বেশ পুষ্ট। কালিঘাটের নন্দ চৌধুরীকে পেয়ে মোহনবাগানের উৎসাহ একটু বেড়েছে। মনা দত্তের পর ভাল স্কোরার হিসেবে একটি সেণ্টার ফরওয়ার্ড-এর অভাব অনেক দিন অনুভব করেছিল। হাফ্ ব্যাক্ লাইন চলন সই।

ফরওয়ার্ড লাইনে এস্, চৌধুরী কে ভট্টাচার্জি, নন্দ চৌধুরী, বি মুখার্জি ও এল্ গুই সঙ্ঘভাবে খেলতে পারলে এদের আটকাবার সামর্থ লীগে অনেক বিশিষ্ট টিমের নেই।

মার্কামারা খেলোয়াড়দের এবার ইষ্ট বেঙ্গল টিমেই বেশী দেখা যাবে। মাদ্রাজের রমনা, লক্ষ্মীনারাণ, বাবাসাহেব, লক্ষ্ণৌর মজীদ, বাম্মার হ্যাশিং স্পোর্টিং-এর নাসীম এবং গত বছরের নুর মহম্মদ, কে, গাঙ্গুলি, তালুকদার, দুলাল প্রভৃতিকে নিয়ে এই ইষ্ট বেঙ্গল টিম। গত বছর রমনা, লক্ষ্মীনারাণ নাসীম সাউথ আফ্রিকায় খেলতে গিয়েছিল। বিশিষ্ট খেলোয়াড় হিসেবে ইষ্ট বেঙ্গলই সব চেয়ে strongest টিম। লীগ চ্যাম্পিয়ন হওয়া আশ্চর্য নয়।

এরিয়ান্স এবার বেশ balanced টিম। ছোনে মজুমদার, শশী, যামিনী, এস্ চক্রবর্ত্তী, এ গাঙ্গুলী, রহমান প্রভৃতি সকলেই খেলছে।

গত বছর লীগ চ্যাম্পিয়ন মহমেডান স্পোর্টিং এবার টিম হিসেবে যত দুর্ব্বল হবার সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল ততখানি হয় নি। শফি, রহমৎ, মহিউদ্দিন, অখিল, আমেদ্, রসিদ, সেলিম প্রভৃতিকে নিয়ে এবার লীগের আসরে নাবছে।

ই, বি, আর পুরোণো মনা দত্ত, কার্ডে, শোম, সামাদের উপর বেশী ভরসা করে আছে।

চাকুরিয়া লেকে অল ইণ্ডিয়া রেগেটা ফাইনালে মাদ্রাজ দলকে হারিয়ে ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাব উইলিংডন ট্রফি লাভ করেছে।
ফটো— দেবব্রত চাটার্জ্জী

কালীঘাট লীগের "বেবি" টিম। এ বছর এদের অনেক পুরোণো খেলোয়াড় অন্য টিমে যোগদান করেছে। কিন্তু বাইরের থেকে দু একজন ভাল খেলোয়াড় সংগ্রহ করাতে শেষ পর্য্যন্ত টিমটি মন্দ দাঁড়াবে না।

হাওড়া ইউনিয়ন গত বছরের পুরোণো টিম নিয়েই এবার খেলতে নাবছে।

The Premier European Club Calcutta র খেলা দেখবার জন্যে এককালে ভীড়ে মাঠে জায়গা হয়ে উঠতো না। আজ শুধু তারি ভগ্নাবশেষ পড়ে আছে। কোন মতে নিজের সম্মানটুকু বজায় রেখে টিকে আছে।

দুঃখের বিষয় সুদক্ষ বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের উপেক্ষা করে সুদূর বাম্মা হতে কেপ্ কমোরিন পর্য্যন্ত সারা দেশময় চষে বিশিষ্ট খেলোয়াড়দের জড় করে লীগ চ্যাম্পিয়ন হবার বাসনা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে মোহনবাগানের কর্তৃপক্ষদের কার্য্যকলাপ সকলের ধন্যবাদার্হ। শুধু তরুণ বাঙ্গলার খেলোয়াড় নিয়ে দেশ বিদেশে ক্রীড়া মহলে আগেকার গৌরব-ধ্বজা অতি সম্মানের সঙ্গেই রেখে আসছে এবং রাখবে।

অন্যান্য বাঙ্গালী টিমের কর্তৃপক্ষদের এ সম্বন্ধে একটু গভীর দৃষ্টি দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

ক্যালকাটা কম করে ৮ বার লীগ চ্যাম্পিয়ন এবং ৯ বার শিল্ড বিজয়ী হয়েছিল। ভারতের ফুটবল ইতিহাসে এ কম আশ্চর্য্যকর কৃতিত্বের পরিচয় নয়।

উরষ্টারের আরমষ্ট্রঙ্গ এবার গোল কিপারে খেলছে। অদ্বিতীয় নাইট শোনা যাচ্ছে শেষের দিকে যোগ দিতে পারে। ১৯১৪ সাল হতে লীগে আজ পর্য্যন্ত তরুণ খেলোয়াড়দের সঙ্গে সমান তাল রেখে নিজেদের উদ্যম ও চাতুর্য্য ও পারদর্শিতা অটুট রেখে এসেছে কলিকাতার নাইট এবং মোহন বাগানের গোষ্ঠ পাল। বাঙ্গালার উৎসাহী ক্রীড়ামোদিদের আনন্দ দিতে এতদিন যাবৎ ক্রীড়া মহলে কেউ সক্ষম হয় নি।

কাষ্টমস্ লীগের "সক্" টিম। কবে যে এদের খেলা খুলবে বলা শক্ত। ভাল ভাল টিম এদের কাছে অনেকবার পরাজয় স্বীকার করেছে। ডিভনসায়ার ও ব্ল্যাক ওয়াচ দুটি গোরা টিমের রেকর্ড বেশ সম্মানসূচক।

সিড্‌নি সার্ফিং বিচে মেয়েরা জলক্রীড়ায় ব্যস্ত।
[অমৃতবাজার পত্রিকার সৌজন্যে]

• লীগের চ্যাম্পিয়ন কে হবে ভবিষ্যৎবাণী করা নিশ্চয় অন্যায় হবে।

উক্ত সম্মানের জন্য ব্ল্যাকওয়াচ, মোহন বাগান, ইষ্ট বেঙ্গল ও মহমেডন স্পোর্টিং মধ্যে ভীষণ প্রতিযোগিতা চলবে সন্দেহ নাই।

ক্রীড়া জগতের খবর

বিলেতের পুট্‌নে ইন্টারভার্সিটি বাইচ্ প্রতিযোগিতায় কেম্ব্রিজ সাড়ে চার লেংথে অক্সফোর্ডকে হারায়। প্রায় ১২ বছর ধরে কেম্ব্রিজ জয়ী হয়ে একটি নতুন রেকর্ড স্থাপন করে চলেছে। এবারকার বাইচনাচ্ এর একটি বিশেষত্ব যে কেম্ব্রিজের "লাইট ব্লুরা" নতুন ফেয়ার বেয়ারন্ ষ্টাইলকে অনুকরণ করেছিল। অক্সফোড হল "home of lost causes।" সুতরাং প্রাচীন ষ্টাইলকে ছাড়বার সাহসটুকু হয়ে উঠেনি।

বম্বে ভিক্টোরিয়া সুইমিং বাথে ওয়াটার-পলো টুর্ণামেন্ট-এর ফাইনালে পার্শিরা বিপক্ষদল ইউরোপীয়ন টিমকে ৪ গোলে হারায়। কলিকাতা এই খেলায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেছে। কোনদিন বম্বে পার্শিদলের সঙ্গে বাঙ্গলার সর্ব্বোৎকৃষ্ট টিমের খেলা দেখবো।

নিউ ইয়র্কে এ, এ, ভি, ন্যাশানাল ইনডোর চ্যাম্পিয়নশিপে ১৬ বছর বয়স্ক এ্যাডলফ্ কিফার ১৫০ গজ ব্যাক্ ষ্ট্রোকে এক নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছে। তার সময় লেগেছিল মাত্র ১ মিনিট ৩৬১/১০ সেকেণ্ড। তারপরে ডেলি, জেহার ১ মিনিট ৩৬১/১০ সেকেণ্ড-এ সাঁতার কেটে কৃতকার্য্য হয়।

মিস্ লীলা রাও ভারতীয় পক্ষ হতে বিলেতে ডেভিস কাপে এবং প্যারিস্ চ্যাম্পিয়নশিপ্ মহিলা সিঙ্গলসে খেলতে যাচ্ছেন। ইনি পূর্ব্বে ডেভিস্ কাপে খেলায় তেমন কৃতকার্য্য হননি। এবার নিশ্চয় ভারতের মান তিনি রাখবেন। মহিলা ডবল্‌সে মিস্ প্যারট ও মিসেস ষ্টক্ খেলবেন।

হাঙ্গারির বিখ্যাত ফুটবল টিম "বুডাপেষ্ট কার" ফুটবল

ক্লাব জুন মাসে ভারতে খেলবার জন্য ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েসনের কাছে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। দুঃখের বিষয় সে প্রস্তাব নামঞ্জুর হয়েছে। বিখ্যাত ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি প্রভৃতি টিমরা বুডাপেষ্টে দলের কাছে অনেকবার হার স্বীকার করেছে। হকি, পলো, ক্রিকেট, টেনিস প্রভৃতি ক্রীড়ায় ইউরোপ ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে সমান ভাবে ভারতীয় খেলোয়াড়রা নিজেদের আসন প্রতিষ্ঠিত করেছে। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যেই আমাদের সাত্যকার পরিচয় পাই। ভারতের ফুটবল এসোসিয়েসনএর এই অন্যায় নামঞ্জুর কোনমতেই সমর্থন করতে পারলুম না।

ইংলণ্ডে ক্রিকেট-বোর্ডে বিখ্যাত ক্রিটিক্ প্লাম ওয়ার্ণার পার্শি পেরিন্, টি হিক্সন নির্বাচিত হয়েছেন। বাঙ্গলার ভূতপূর্ব গভর্ণর ষ্টানলে জ্যাক্‌সন চেয়ারম্যান পদত্যাগ করাতে উক্ত পদে প্লাম্ ওয়ার্ণার অভিষিক্ত হয়েছেন।

রজত জুবিলি ফাণ্ডের সাহায্যার্থে বম্বেতে মহিলা জিমখানা বনাম রেষ্ট টিমের একটি এক্সজিবিশন হকি খেলা হয়েছিল। বম্বে জিমখানা ৫ গোলে জয়লাভ করেছে। প্রথম হাফে মিসেস্ ওয়েভার ও জ্যাক্‌সন্ একটি গোল দেন। শেষ হাফে মিস্ লাইডন ক্রমান্বয় ৩টি গোল দিয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খেলোয়াড় হিসেবে সম্মানিত হন।

বিলেতে হোয়াইটসিটি ষ্টেডিয়াম-এ ইণ্টার পাব্লিক স্কুল স্পোর্টসে জার্ম্মানি ৫৭ পয়েণ্টস্ পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। স্পোর্টসে আজকাল বিদেশীর কাছে ইংরেজ ছেলেদের শোচনীয় অবস্থা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বিলিয়ার্ড এ জো ডেভিস্ ইউনাইটেড্ কিংডম প্রফেশনল্ চ্যাম্পিয়নশিপে টম্ নিউম্যানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ডেভিসের পয়েণ্ট হয়েছিল ২১,৭৩৭ আর নিউম্যানের ১৯,৯১৯।

রয়টারের খবরে প্রকাশ যে নবাব পাটৌডি অসুস্থ হওয়ায় এ বছর উরসেষ্টারসায়ার টিম হয়ে ক্রিকেট খেলায় অসমর্থতা জানিয়েছেন। কিছুদিন আগে প্রিন্স্ দিলীপ্ সিং ক্রিকেট জগৎ থেকে একরকম বিদায় নিয়েছেন।

ল্যাঙ্কেশায়ার টিমের হয়ে ভারতীয় টেষ্ট্ খেলোয়াড় অল্ রাউণ্ডার অমর সিং খেলবেন। উক্ত ক্লাবে এল্, কন্সষ্ট্যান্-টাইন যোগ দিয়েছেন।

এন্ সি, রায় আজমীরে ক্রমাগত ৬১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট ননষ্টপ্ সাইকেল চড়ে প্রায় ৪২০ মাইল অতিক্রম করে ভারতের নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছে।

দেশবাসী শ্রীমানের আশ্চর্য্যকর সাফল্যে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করেছেন। শোনা যাচ্ছে বম্বে হতে এন্, সি, রায় শীঘ্রই সাইকেলে পৃথিবী ভ্রমণ করতে বেরোবেন। বাঙ্গলার কৃতী সন্তানের সাফল্যের জন্য সকলেই প্রার্থনা করি।

১৭৪ ফিট ২⅞ ইঞ্চি "Discus Throw" ছুঁড়ে শ্রোডার, বার্লিনে এক পুলিসম্যান, জগতে এক নূতন রেকর্ড স্থাপন করলেন। আগেকার রেকর্ড ছিল সুইডেনবাসী হ্যারল্ড্ এ্যাণ্ড্রারসনের ১৭১ ফিট ১১⅛ ইঞ্চি।

বম্বের আগাখাঁর ফাইনালে বি, বি, সি, আই রেলওয়েকে ২-১ গোলে হারিয়ে বম্বে কাষ্টমস্ জয়ী হল। গত বছর উক্ত টিম চ্যাম্পিয়ন ছিল। বম্বে এবং কলিকাতার কাষ্টমস দল এদেশের হকিতে উৎকৃষ্ট টিম হিসেবে গণ্য হয়।

বিলেতের এফ্ এ কাপ্ ফাইনালে শেফিল্ড্ ওয়েডনেস্‌ডে ওয়েষ্ট ব্রমউইচ্ কে ৪—২ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হন। শেফিল্ড টিম লীগ বিজয়ী আরসেনলকে হারিয়ে ফাইনালে গিয়েছিল। ওয়েষ্ট ব্রমউইচ্-এর ৯ জন নামকরা খেলোয়াড় ছিল। প্রায় ১ লক্ষের অধিক লোক এই ক্রীড়া উৎসবে যোগ দিয়েছিল।

ভারতীয় হকি টিম নিউজিলাণ্ডের পথে সিংহলে ২টি এক্স্‌জিবিশন ম্যাচ্ খেলেছিল। প্রথম ম্যাচে অল সিলোনকে ২১ গোল দেয়। এত সুন্দর খেলা ভারতীয় খেলোয়াড়রা খেলতে পারে সিংহলের দর্শকরা ভাবতে পারে না। ধ্যানচাঁদ, রুপসিং, ওয়েলস্ এই তিনটি অদ্বিতীয় ফরওয়ার্ডকে "Three Musketeers" নামে সম্মানিত করেছে। দ্বিতীয় ম্যাচে সিংহল টিম ৭-১ গোলে হেরে যায়।

বিখ্যাত আমেরিকান ডেভিস্ কাপ খেলোয়াড় মিস্ রায়ান এতদিন পর প্রোফেসনল দলে যোগ দিলেন। ডেভিস কাপে মিসেস হেলেন উইলস্ মোডির সঙ্গে অনেকবার মহিলা ডবলস চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। কিছুদিন আগে তিনি কলিকাতার সাউথ্ ক্লাবে খেলে গেছেন।

পট ও মঞ্চ

— আনন্দ —

আমাদের ছায়াশিল্প এবং সমালোচক

সমালোচককে অনেকেই অনেক প্রকারে define করেছেন। আমাদের কথা আমরা পূর্ব্বেই বলেছি, বলেছি যে সমালোচকের মন হওয়া উচিৎ রসিক—দোষ ত্রুটিকে মনের রসে আর রঙে সুন্দর ও পূর্ণ করে দেখা উচিৎ সমালোচনার বিষয়বস্তুকে। সাধারণ লোকে যে মুখে প্রথম দর্শনেই দোষ আবিষ্কার করবেন সমালোচক সেই সুন্দরকে মুখকে সুন্দরই দেখবেন। যদি দোষ দেখাই হোত সমালোচকের কাজ তবে সমালোচনা দাঁড়াতো নিছক নিন্দাবাদ। সৌন্দর্য্য হচ্ছে মনের উপভোগ্য, বিশেষতঃ ভাষার সাহায্যে প্রকাশ করলেও কোনো সুন্দর জিনিষের প্রতি আমার মনোভাবের সম্যক্ ব্যঞ্জনা হয় না। কিন্তু বিচ্যুতির কথা আলাদা। তা অবাঞ্ছনীয়; সুতরাং তার উপস্থিতিই হয়ে দাঁড়ায় লেখা বা ভাষার বিষয়।

সমালোচকের একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে এবং তার কর্ত্তব্য পালনের পরে কিয়ৎপরিমাণে নির্ভর করে শিল্পের উন্নতি। সমালোচককে বলে দিতে হবে: এখানে তোমরা পিছিয়ে আছ, এই হচ্ছে তোমার শ্রীবৃদ্ধির অন্তরায়, এই বিষয়ে এই রকমে আরো উন্নতি সম্ভবপর ইত্যাদি। কিন্তু এসব হোল আদর্শবাদের কথা, বাস্তবের কথা বলি।

সিনেমার বিষয় যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে পড়েছে তা সাপ্তাহিক দৈনিক পত্রিকা ছাড়িয়ে 'বিচিত্রা'য় তার আবির্ভাব থেকে বোঝা যায়। কিন্তু সমালোচনার মত সমালোচনা বড় একটা দেখা যায় না। সমালোচকের নীতি থেকে without fear or favour বা নিরপেক্ষ কথাটা উঠে গেছে এবং এর ফল দাঁড়িয়েছে চমৎকার! যে প্রোডিউসার ও সমালোচকের সম্বন্ধ হওয়া উচিৎ বান্ধব সহযোগিতার, তা দাঁড়িয়েছে কোথাও রেশারেশির, কোথাও প্রভু ভৃত্যের। কর্ত্তৃপক্ষ সংবাদপত্রকে আমল দিতে চান না অথচ কৃপাভিক্ষু সমালোচক মধুলোভে গুনগুন করে। আজ সমালোচকদের যে হেয় অবস্থা, এর মূলে আছে তাদেরই দাস্য এবং স্তুতিবাদের প্রবৃত্তি। কিন্তু অবস্থাটা শুধু হেয়ই নয়, তার চেয়ে আরো ভীষণ—সত্য কথা বলবার সাহসও বুঝি আজ আর বড় একটা কারুর নেই। আমরা হয়ত' কোনো ছবির সমালোচনা প্রসঙ্গে তার বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করলাম, অপর জন সে কথা চেপে গেলেন। আমরা প্রশ্ন করতে পারি না যে কেন তিনি বিষয় বিশেষে নীরব রইলেন কারণ এর ধরাবাঁধা উত্তর আছে যে Opinions may differ কিংবা ঐ বিষয়টা আমাদের ভাল লেগেছে। ভাল লাগা এক, আর সত্যই ভাল হওয়া এক; বিজ্ঞাপনের জন্য বা পাশের জন্য নিতান্ত বাজে জিনিষও ভাল লাগতে পারে এবং দুঃখের কথা এই যে ভাল লেগেই আসছে। নিরপেক্ষ সমালোচনা কারুরই ভাল লাগে না, লাগবারও কথা নয় কারণ নিজেদের একাধিক মুখপত্র বা বিজ্ঞাপনক্রীত কাগজ আছে; সুতরাং নিরপেক্ষ সমালোচনা মানে শত্রুতা প্রকাশ। নিরপেক্ষ সমালোচকের হয়ত' পাঠকের কাছে আদর হবে কিন্তু তাতে লাভ কি? পাশও পাওয়া যায় না, না বা বিজ্ঞাপন!

সমালোচনার ধারা অনেক রকম হয়ে পড়েছে। কেউ বিবেককে একেবারে বিজ্ঞাপনের যূপে বলি দিতে পারেন না বলে নাটকের আখ্যানভাগ ও তার উৎকর্ষ সম্বন্ধে অনেক কিছু অতিরঞ্জিত লিখে নিকর্ষের বেলা চুপচাপ থাকেন। অপর একজন নাটকের সর্ব্বোচ্চ প্রশংসা করবার বেলা জানান যে ভাইসরয় গভর্ণর প্রভৃতি ঐ ছবি দেখে তার প্রশংসা করেছেন (অর্থাৎ রাজ প্রতিনিধিরাই যেন ছবির উৎকর্ষের শ্রেষ্ঠ বিচারকর্ত্তা)। তৃতীয় ব্যক্তি কেবল নির্লজ্জ প্রশংসায় স্বীয় প্রবৃত্তির পরিচয় দেন। চতুর্থ জন প্রথমে

ঘোষণা করেন যে নিরপেক্ষ সমালোচনা একমাত্র তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া যাবে, এবং নিরপেক্ষ সাধ্যমত সমালোচনা করেনও ততক্ষণ যতক্ষণ বিজ্ঞাপন পান না—বিজ্ঞাপন পেলে স্তুতিবাদ, আর না পেলে অকথ্য গালিগালাজ। প্রতিষ্ঠান বিশেষের মুখপত্র ছাড়া এমনও বিজ্ঞাপনক্রীত কাগজ আছে যা সারা বৎসর প্রতি সংখ্যায় প্রভু প্রতিষ্ঠানের পাবলিশিটি বা পাঠ্য বিষয়ের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞাপন দিতে পারলে কৃতার্থস্মন্য হয়। ব্যাপার যখন এই রকম, তখন যিনি সুন্দর নিরপেক্ষ সমালোচনা করবেন, favour refuse করবেন এবং প্রভু পালিতের রব অগ্রাহ্য করবেন তিনি উপেক্ষা ভিন্ন আর কি পেতে পারেন ?

এবার একজনকে নায়ক খাড়া করে একটু গল্প করা যাক্। ধরুন, আমিই নায়ক। এক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হবে বিজ্ঞাপন দেখে আফিসে যাওয়া গেল। (আমি আন্‌-কোরা নূতন লোক নই, ছায়াছবির বিষয়ে দু একটা রচনা আমার পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়েছে)। সম্পাদককে নমস্কার করলাম, উত্তরে ভদ্রলোক অঙ্গুলি সঙ্কেতে চেয়ার নির্দ্দেশ করলেন। অপরাপর সকলের সঙ্গে বক্তব্য শেষ হলে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন; আমি আপনার কাগজে রঙ্গজগৎ লেখবার জন্য এসেছি, যদি অনুগ্রহ করেন………।

হুঁ, আপনি আগে কোনো কাগজে লিখেছেন ?

আজ্ঞে হাঁ, তবে নিয়মিত ভাবে নয়—মাঝে মাঝে।

বেশ, কিন্তু দেখুন আমরা অপর লোক পাচ্ছি, তিনি এ বিষয়ে অনেক কিছু জানেন; আর তা ছাড়া……(হয়ত' তিনি সম্পাদকের ভক্ত, নয় মালিকের আত্মীয়) তবে আপনিও আসবেন মাঝে মাঝে, লেখা দেবেন। নমস্কার ঠুকে ফিরলাম। কিন্তু নিত্য যে দেশে কাগজের জন্ম সেখানে ভাবনা কি ? এবার "দেশমিত্র" আফিসে গেলাম। সোজা জিজ্ঞাসা করলাম; আপনাদের সিনেমার বিষয় থাকবে ত' ?

—দেখুন, ও বিষয়ে আমরা কিছু ঠিক করিনি এখনও, তা আপনি লিখবেন কি ?

—ঠিক করেন নি কি মশাই, এত popular subject আর কিছু আছে নাকি; হাঁা, আপনারা কি রকম লেখা চান ?

—কি রকম, মানে ?

—মানে, লেখা অনেক রকমের আছে জানেন ত ? এই ধরুন বিজ্ঞাপন আদায় করবার জন্য লেখা একরকম, বিজ্ঞাপন বজায় রাখার লেখা একরকম, আর নিরপেক্ষ সমালোচনা !

তারকার মত তারকা এই পল মুনি। সে শুধু মন্দ অভিনয় যে করেনি তা নয় বরাবর অতুলনীয় অভিনয় করেছে সম্প্রতি I am a fugitive from a chain gang এবং Border Townএ পলের বিপুল প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেল।

—ঃ, তা দেখুন just and impartial জিনিষই আমরা চাই; সেই বুঝে আপনি লিখবেন। অর্থাৎ আমি লেখক হলাম, চাপা থাক আপাততঃ আর্থিক প্রসঙ্গ না হয়।

কিছুদিন পরের কথা। পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। ফিল্ম কোম্পানীর আফিস এবং লোকজনের মুখ চিনেছি কিন্তু জমাতে পারিনি। সিল্‌ভার পিক্‌চার্সের

এড্‌ওয়ার্ড জি রবিন্সনকে একবার দেখলে বারবার দেখতে হবেই। এমন অভিনেতা কমই হয়। Dark Hagard, Two Seconds, Little Giant, ইত্যাদি অভিনয় জগতে অবিস্মরণীয়। অনুপম এই এড্‌ওয়ার্ড-জি-র শ্রেষ্ঠ হয়েছে শুনছি কলম্বিয়ার The Whole Town is Talking এ।

আফিসে গেলাম একদিন। সম্পাদক মশায়কে বার বার তাগাদা দিয়ে visiting card ছাপিয়েছিলাম, দিলাম তাই দরওয়ানের হাতে। ফিরে এসে সে জানালে প্রচার সম্পাদক মশায় এখন বিশেষ ব্যস্ত, একটু বসলে দেখা হতে পারে। কিন্তু জায়গা কোথায়? পরে আসবো জানিয়ে ফিরছি, পথের পাশেই ভৈরব সেনের আফিস, এক ভদ্রলোক প্রচার সম্পাদকের আফিস থেকে বাইরে এলেন এবং সেই ফাঁকে দেখা গেল প্রচার সম্পাদক বিশেষই ব্যস্ত আছেন—বয়স্য সমভিব্যাহারে আড্ডায়। পাশেই সূর্য্য ফিল্মসের আফিসে গিয়ে সোজা একেবারে পাবলিসিটি অফিসার জনার্দ্দন বাবুর টেবিলের সাম্‌নে হাজির। ভদ্রলোক পেন্সিল কাটতে কাটতে প্রশ্ন করলেন: কোথেকে আস্‌চেন? চেয়ার টেনে প্রথমে স্থির হয়ে বসে কার্ড দিলাম (অল্পেই জানতে পেরেছি এখানের আদব হোল কিছু না বলেই চেয়ার টেনে নিয়ে বসা)।

আপনাদের কাগজ ত' আমরা দেখিনি?

সঙ্গে এক কপি ছিল, দিলাম। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে: এক মিনিট, বলে ভদ্রলোক টেলিফোনের কাছে গিয়ে রিসিভার তুললেন: হ্যালো, Shadowland···আপনাদের

গ্রেটা গার্বো এবার Painted Veil এ বেশ সুন্দর অভিনয় করেছে। অগণিত হৃদয়ের রাণী এবার ফ্রেড্রিক্‌ মার্চের সঙ্গে Anna Kareninaতে দেখা দেবে।

front cover এর জন্যে কত চার্জ্জ করেছেন······একশো ······বেশ আমাদেরো কয়েকটা insertion থাকবে······ দেখুন আমাদের বিনয় সেনকে একটু boom করতে হবে, আর্টিষ্ট ভাল··· ··নিশ্চয়ই আসবেন ছবি দেখতে······আজই ······Its a deal······

ওয়ার্ণার বাক্সটারের পরিচয় দিতে হবে কি—যে বাক্সটার সকল সব ভূমিকায় সমান ওস্তাদ! বাকসটার কলম্বিয়ার Broadway Billএ মার্ণালয়ের সঙ্গে তার স্বভাবসিদ্ধ সুন্দর অভিনয় করেছে।

আমার বিরক্তি ধরে যায়ঃ আমি উঠি তা হলে ··

বেশ আসুন, আপনার ঠিকানায় খবরাখবর পাঠাবো। না, ব্লক আমাদের প্রথমে Shadowland ছাপে আর আপনাদের ইমিটেশন আর্টের জন্য আমরা ব্লক দিতে পারি না····· হ্যাঁ, আমার মনে থাকবে······আচ্ছা দেখুন···। আমি ততক্ষণে রাস্তায়। ভাবনা কি studio notes পাবো, চার সপ্তাহে একটা দৃশ্য তোলা সম্পূর্ণ হবে, তার বিবরণ পত্রস্থ করবো!

এবার সোজা সিল্‌ভারের ওখানে ভৈরব বাবুর আফিসে ঢুকলাম, পরিচয় দিলাম এবং আশ্বাসিত হলাম যে সব কিছুই ঘরে বসে পাওয়া যাবে। গলে গিয়ে নমস্কার জানিয়ে আবার চললাম, এবার বিদেশী ছবির সরবরাহকারীর আফিসে। কথার পিঠে কথা হয়, নানান্‌ কথা।

জানেন মশাই আমাদের Golden Ageকে নিন্দে করেছিল বলে 'স্পষ্টবাদী'কে কেমন ঠকতে হয়েছে? "স্পষ্টবাদী" "স্পষ্টবাদী" বুঝছেন না? বিখ্যাত ডেলি। হ্যাঁ, পাশ আর বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দিলুম তখন পায়ে পড়তে পথ পায় না! আমাদের ভাবনা কি মশাই, আমাদের হুকুম মত সমালোচনা হবে না ত' কার হুকুম মত হবে?

ভাল লাগে না। উঠে পড়লাম। আবার কিছুদিন বাদের কথা।

সম্পাদক মশায় বিজ্ঞাপনের বাহানা ধরেছেন, বার বার ফোন করেও কারুর কোনো খবর পাওয়া যায় না। এবার Light of Indiaর সঙ্গে কথা বললাম। নূতন ছবিখর, বিজ্ঞাপনও দেবে বলছে। দেখি কি হয়।

হ্যালো, হ্যাঁ 'দেশমিত্র' কথা বলছি আপনাদের বাংলা ছবিটার বিজ্ঞাপনের কি করলেন?

দোবো, নিশ্চয়ই পাবেন কিন্তু আমাদের রিভিউ বার করেন নি ত' এখনও।

সামনের সংখ্যায় বেরবে।

বেশ, একটু বুঝে সুঝে দেবেন আজ 'স্পষ্টবাদী'তে যে রকম বেরিয়েছে দেখেছেন? ঐ রকমই দেবেন।······

তা দেব বই কি, নির্লজ্জ স্তুতিবাদ না করলে বিজ্ঞাপন মেলে কৈ! কিন্তু বিজ্ঞাপন দাতাদের আবার write up দিতে হয়।

* * * *

অন্তরে গ্লানি বাইরে অবহেলা আর অপমান সহ্য আর কতদিন হবে! 'দেশমিত্র' ছেড়ে দিয়েছি। 'বিচিত্রা' সম্পাদক বলেছেন···কিন্তু থাক্‌ সে-সব ঘরোয়া কথা।

চিত্র জগতে এখন অবশ্য সার্লি টেম্পলই সবচেয়ে প্রিয় শিশু-তারকা কিন্তু এই জ্যাকি কুপারও বড় কম যায় না। জ্যাকি কুগান্‌ যাবার পর এবং সার্লি আসবার আগে পর্য্যন্ত ওরই ছিল একচ্ছত্র রাজত্ব। Skippy, Champ, Treasure Island প্রভৃতিতে দেখলে বুঝা যায় জ্যাকি কেন এত জনপ্রিয়।

চিত্র পরিচয় এবারে চিত্র পরিচয় পূর্ব্বমত বিশদভাবে দেওয়া সম্ভবপর নয় কারণ মাঝে একমাস বাদ পড়ে গেছে। আমরা এখানে (ক) শ্রেণীর বা অসাধারণ, (খ) শ্রেণীর বা সুন্দর, এবং (গ) শ্রেণীর অর্থাৎ উপভোগ্য ছবির শ্রেণী বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে সেই সব ছবিতে ভাল অভিনয় করেছেন এমন নট নটীর নাম দিলাম। (ছ) শ্রেণীর ছবি ছেলেরাও দেখতে পারে।

দেবদাস—নিউ থিয়েটার্সের বাংলা ছবি। সবচেয়ে প্রশংসার বিষয় হয়েছে প্রযোজক ও চিত্র নাট্যকার প্রমথেশ বড়ুয়ার film sense এবং নীতিন বসুর চিত্র গ্রহণ। শরৎ-চন্দ্রের অসামান্য সুন্দর সংলাপ যথাযথ ব্যবহার করায় ছবি হয়েছে মোহন। চিত্রনাট্য চমৎকার, যে কোনো প্রথম শ্রেণীর ছায়াছবির, এবং প্রযোজনাও অনবদ্য। সম্পাদনারও উচ্চ প্রশংসা করতে হয়। অমর মল্লিকের 'চুণীলাল', চন্দ্রাবতীর 'চন্দ্রমুখী' হয়েছে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। প্রমথেশ বড়ুয়ার 'দেবদাস' এবং যমুনার 'পার্ব্বতী' বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। শরৎচন্দ্রের 'পার্ব্বতী' রূপ পেয়েছে এজন্য যমুনাকে ধন্যবাদ জানাই। অন্যান্য ভূমিকা সু-অভিনীত, বিশেষ সাইগালের 'একনৈক ভদ্রলোক' এবং শৈলেন পালের 'মহেন'। দীনেশ দাশের 'ভুবন চৌধুরী' total failure. 'দেবদাস' সর্ব্ববিষয়ে ভারতের শ্রেষ্ঠ ছায়াছবি।

পাতালপুরী—কালী ফিল্মসের বাংলা ছবি। চিত্র-নাট্য দুর্ব্বল, সম্পাদনা এবং প্রযোজনায় কোনো কৃতিত্বের পরিচয় নেই। অভিনয় সবারই হয় চলনসৈ, নয় তারও নীচে, তবে শিশুবালার 'বিলাসী' কিছু প্রশংসা পেতে পারে।

বাসবদত্তা—কেশরী ফিল্মসের বাংলা ছবি। চিত্র-নাট্য, প্রযোজনা, সম্পাদনা সবকটাই বিশেষ নিন্দার বিষয়। চিত্রগ্রহণ কোনো রকমে চলনসৈ কিন্তু শব্দ-গ্রহণ জঘন্য। নাম ভূমিকায় কাননবালার অভিনয় চলনসৈ।

আমাদের মতে নিম্নলিখিত ছবিগুলি (ক) শ্রেণীর :—টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি (জন্ ব্যারীমোর ও ক্যারল্ লোম্বার্ড), হিয়ার কাম্স্ দি নেভি (জেম্স্ ক্যাগ্নি ও প্যাট্ ওব্রায়েন্), আই য়্যাম্ এ ফিউজিটিভ ফ্রম্ চেন্ গ্যাং (পল মুনি), **সার্কাস্ ক্লাউন্ (জো ই ব্রাউন্)**, বর্ডার টাউন্ (পল্ মুনি ও বেট্ ডেভিস্), ফরসেকিং অল্ আদার্স (ক্লার্ক গেবল্, জোয়ান্ ক্রফোর্ড; রবার্ট মণ্ট গোমারি ও চার্লস্ বাটার ওয়ার্থ) এবং **ব্রাইট্ আইজ (সার্লি টেম্পল্ ও জেমস্ ডান্)।**

(খ) শ্রেণীর ছবিগুলির নাম :—**সিকোয়া (বাহাদুরি আছে চেষ্টার ফ্রাঙ্কলিনের প্রযোজনায়, চিত্রগ্রহণের এবং ম্যালিবু নামে হরিণ ও গ্যাটো নামে বাঘের [পুমা] অভিনয়ের), লিট্‌ল্ মিনিষ্টার (ক্যাথারিন্ হেপ্‌বার্ণ ও জন্ বিল্),** দি কেস অব দি হাউলিং ডগ (ওয়ারেন্ উইলিয়াম্), লাইভ্স্ অব্ এ বেঙ্গল্ ল্যান্সার (গ্যারি কুপার), পেন্টেড্ ভেল্ (গ্রেটা গার্বো ও হার্বার্ট মার্শাল্), মিউজিক্ ইন্ দি এয়ার (ডগ্‌লাস্ মণ্টগোমারি ও জন্ বোলস্), **লাষ্ট জেণ্টল্‌ম্যান্ (জর্জ্জ আর্লিস্), বেবস্ ইন্ টয়ল্যাণ্ড (লরেল-হার্ডি),** ফ্লার্টেশন্ ওয়াক্ (ডিক্ পাওয়েল্) এবং কিড্ মিলিয়ন্স্ (এডি ক্যাণ্টর)।

নিম্নলিখিত ছবিগুলি (গ) শ্রেণীর :—ডাউন টু দেয়ার লাষ্ট ইয়ট্, ম্যান অব্ টু ওয়ার্ল্ড্স্ (ফ্রান্সিস্ লিডারার), **আন্‌ফিনিস্‌ড সিম্ফনি**, এ উইকেড্ ওম্যান্, বিহোল্ড্ মাই ওয়াইফ্ (সিল্‌ভিয়া সিড্‌নি), গিল্‌ডেড্ লিলি (ক্লডেট্ কল্‌বার্ট), ফাউন্টেন, বায়োগ্রাফি অব্ এ ব্যাচেলর গার্ল, ওয়ান্ এক্‌সাইটিং য়্যাড্‌ভেঞ্চার, ওল্ড কিউরিয়োসিটি সপ্, দি ম্যান হু রিক্লেমড্ হিজ হেড্ (ক্লড্ রেন্‌স্), স্কার্লেট্ পিম্পার্নেল্ (লেসলি হাওয়ার্ড), মাই হার্ট ইজ কলিং, এণ্টার মাদাম্ এবং ক্রাইম্ ডক্টর।

কবি-প্রশস্তি

শ্রীসতীশ রায়

১

হে কবি ! তব জন্মদিনে আমরা সখাবর্গ
পর্ণপুটে এনেছি ফুল, প্রীতির মধুপর্ক !
কি দিতে পারি খুঁজে না পাই,
দিয়েছি সব মনে ত নাই,
কবিরে মোরা দিয়েছি ঠাঁই ভালবাসার স্বর্গ।
এনেছি বহি' তোমার ধ্বজা
মনোরাজার আমরা প্রজা,
ধনরাজায় কে বলে রাজা দেই নে তারে অর্ঘ্য ॥

২

হে কবি ! তুমি নিখিল মনে জাগালে ভাবস্পন্দ।
শিল্পী তুমি ধরার বুকে রচিলে নব ছন্দ !
যে ছিল জড় সে পেলে প্রাণ,
তুষার হোল প্রবহমান,
মৌনমূক ধরিল গান, চক্ষু পেলে অন্ধ।
আকাশ হোল মাণিক নীল
তাহারি সাথে বনের মিল,
দৈত্যপুরে ভাঙিলে খিল, ঘুচালে ঘুম-বন্ধ !

৩

হে যাদুকর ! লেখনী তব পুষ্প করে বৃষ্টি,
মায়াতে তার নতুন করে প্রকাশ পায় সৃষ্টি !
দেখেছি, তবু দেখিনি যা'রে
সে হাসি' ফুল ছুঁড়িয়া মারে ;
সুচির পরিচয়ের পারে হয় যে শুভদৃষ্টি।
বনের ফুল, নদীর ধারা,
ভোরের রবি, রাতের তারা
লাগেনি আগে এমন ধারা মনের কাছে মিষ্টি।

৪

মরম কথা টানিয়া কবি কেমনে রচ ছন্দ ?
যাহাতে থাকে চাঁদিনী রাতে মহুয়া ফুলগন্ধ।
বলিনি যাহা তাহার কানে,
সেই সে ভাষা তোমার গানে,
স্বপন রচে আমার প্রাণে নব বিরহানন্দ !
কাহার যেন করুণ হাসি,
সুদূর হ'তে বাজায় বাঁশি,
পরাণ হ'তে চায় উদাসী, অশ্রুতে চোখ অন্ধ।

৫

নাই সে ভাব, ছন্দজালে করনি যারে বন্দী ;
এঁকেছে ছবি তুলিকা তব অমৃতনিষ্যন্দী।
ডুবারি ! মন গহন তলে
দিয়েছ ডুব লীলার ছলে,
মুক্তি দিলে মুকুতাদলে নিখিল হিয়া নন্দি'।
মনের যত মৌন আশা
তোমার গানে পেয়েছে ভাষা,
ভালবাসার যত পিপাসা হয়েছে মধুগন্ধী।

৬

মানস যবে ভরেছে মেঘে, মূর্চ্ছাহত চিত্তে
জাগাতে সাড়া পারেনি কেহ নিরাশ হীনবিত্তে।
দরদী তুমি ! তোমার গানে
জেগেছে সাড়া তখনি প্রাণে,
ডেকেছ কবি কি আশা দানে, বলেছ 'ও ত মিথ্যে'।
দুখের বিষ-দন্ত নাশি'
বাজালে কবি মোহন বাঁশি,
শ্মশানে তুমি ফোটালে হাসি, ফাগুন হিমরিক্তে।

৭

হে গুরু ! তুমি জীবন-পথে দিলে প্রেমের দীক্ষা,
নিখিল জনে বাসিতে ভাল দিয়েছ তুমি শিক্ষা !
শিখালে তুমি পরম প্রাণ
এ চরাচরে স্পন্দমান,
অঝোর ধারে তাঁহার দান হয় না নিতে ভিক্ষা !
সুন্দর যে মোদের তরে
আছেন বসে পথের পরে,
আকাশ ভরে বিরাজ করে অসীম প্রতীক্ষা।

৮

অশ্রুজলে শ্যামল করি' ভূতলে রচ স্বর্গ,
অমৃত পরিবেষণে তুমি জিয়াও মৃতবর্গ ;
বিরোধ মাঝে মিলন-দূত !
শান্তিবারি মধুশ্চ্যুৎ !
বরিষ তুমি, হে অদ্ভুত ! লহ প্রাণের অর্ঘ্য।
ছিন্ন করি' জীর্ণ গুটি
কালের জড় বাঁধন ছুটি'
হে প্রজাপতি ! মুক্তি লুটি' চল ফুলের ঘর গো।

৯

পঁচাত্তরী জন্মদিনে তোমায় অভিনন্দি'
নূতন করে লভিলে আজি অরূপ-রূপে সন্ধি।
তোমারি বাণী মোদের পুঁজি ;
গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজি
ধনীরে নয়, মানীরে নয় কবিরে মোরা বন্দি'।
আজিকে তব ললাট চুমি'
ধন্য হোল জন্মভূমি,
তরুণ মনে করেছ তুমি প্রেমের ডোরে বন্দী।
ধনীরে নয়, মানীরে নয়, কবিরে অভিনন্দি।

শ্রীসতীশ রায়

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চসপ্ততিতম জন্মোৎসব সভায় পঠিত

বেলফুল

শ্রীঅবনীনাথ রায়

সকালে স্নান করিয়া এলোচুল পিঠে দোলাইয়া গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে কমলিনী পাড়ার ঘরে ঢুকিল। গানের ধুয়া তখনো থামে নাই—

ঘর ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ
আমার মন ভুলাল রে!

এমন সময় মেনন নামক একটি মান্দ্রাজী ছাত্র সেই ঘরে ঢুকিল। তাকে দেখিয়া কমলিনী উল্লসিত হইয়া উঠিল। সাগ্রহে বলিল, এস, এস, মেনন সাহেব এস। কি ভাগ্যি আজ যে সকালেই তোমার দেখা পাওয়া গেল। তারপর প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করিয়া বলিল, দেখ, মেনন সাহেব, এই রবীন্দ্রনাথের গান তোমাদের দেশের লোক শুন্‌তে পেলে না ব'লে একটা খুব বড় সম্পদ থেকে বঞ্চিত হ'য়ে রইলো। কেমন, এ কথা তুমি মানো?

মেনন বলিল, নিশ্চয়ই মানি। কিন্তু এ বিষয়ে আমি ভাগ্যবান। আমি ত রবীন্দ্রাথের ওয়ার্কস্ থ্রু এণ্ড থ্রু পড়েছি। আমার মনে হয় আমার বাবা মা বাংলাদেশে এসে ভালই করেছিলেন—তা' না হ'লে আমার শিক্ষা-দীক্ষা বাংলাদেশে হ'তে পারতো না। তবে আমার কল্পনা আছে পাশ ক'রে বেরিয়ে দেশে ফিরে গিয়ে আমার দেশের লোককে রবীন্দ্রনাথের কাব্য তর্জ্জমা ক'রে শোনাবো।

বলা বাহুল্য কমলিনী এবং মেনন মেডিকেল কলেজের ছাত্র এবং সতীর্থ।

কমলিনী হাসিয়া বলিল, 'তা' যদি পার মেনন সাহেব তবে তুমি তোমার দেশের একটা সত্যিকারের উপকার করবে—আর আমি খুসী হ'য়ে সেদিন তোমাকে একটা মুক্তার তাজ গড়িয়ে দেব। আর পণ্ডিতদের ব'লে ক'য়ে তোমাকে একটা গালভরা উপাধি দেওয়াব—রবীন্দ্র-সাহিত্য 'তর্জ্জমা-তক্ষক।'

তারপর নিজের প্রগলভতায় যেন লজ্জিত হইয়া কমলিনী বলিল, সে কথা যাক্ মেনন সাহেব—আজ ত ছুটি। আজ আমাকে ফিজিওলজির নোটগুলি একটু বুঝিয়ে দেবে? তুমি ত ফিজিওলজি পারঙ্গম।

মেনন একটু নড়িয়া বসিয়া কমলিনীর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, মিস্ সেন, আমি বলছিলুম কি, পড়াশোনা ত রোজই আছে কিন্তু আজ বরং—

ঐ পর্য্যন্ত বলিয়াই মেনন থামিয়া গেল।

কমলিনী বলিল, 'থাম্‌লে কেন, মেনন সাহেব? যা' মনে আছে বলে যাও—আমি তোমায় অভয় দিচ্ছি। এনি প্রোগ্রাম। ছুটির দিনটা কাটানোর কোন উপায় কি তুমি উদ্ভাবন করেছ?'

মেনন আশ্বাস পাইয়া বলিল, 'আমি ভাবছিলুম কি, আজ শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে গেলে হয় না—সেখানে দুপুরে চড়িভাতি করা যায়! আর দোলনায় ঝোলা, তোমার গান এ সব ত অছেই।

কমলিনী টেবিল চাপ্‌ড়াইয়া বলিয়া উঠিল, 'ব্রাভো! বেশ প্রোগ্রাম। দিনটা বেশ কাটানো যাবে। আর কে কে যাবে বলেচে?'

মেনন বলিল, 'রাজেন এবং মিঃ সিং ওখানে গিয়ে মিট্ করবে বলেচে।'

কমলিনী খুসী হইয়া বলিল, বেশ, ভাল ব্যবস্থা হয়েছে। আমাদের চার জনের বেশ ছোট গ্রুপ হবে। চল, তোমার সঙ্গেই বেরুবো। কিন্তু তার আগে তোমাকে একটু চা' খাইয়ে দিই। বেয়ারাকে ডেকে আনি। তুমি একটু বসো।

এই বলিয়া কমলিনী ঘরের হাওয়ায় একটা কম্পন তুলিয়া গুন্ গুন্ করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল। দূর থেকে তার গানের সুর কানে আসিতে লাগিল—

আমায় কেন পাগল ক'রে যাস্
ওরে চলে যাওয়ার দল!

ইহার কয়েক বৎসর পরের কথা। একদিন জানা গেল কমলিনীর সহিত মেননের বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। মেডিকেল কলেজের বন্ধু বান্ধবেরা অবশ্য কেহই আশ্চর্য্য হইল না। তাহাদের ভাবখানা এই যে 'আমরা আগেই জানিতাম এইরূপ হইবে।' কিন্তু আত্মীয় স্বজনের মধ্যে অনেকে আশ্চর্য্য হইল। তাহাদের ভাবখানা এই যে, 'কেন, বাঙালীর মধ্যে কি পাত্র ছিল না?' অবশ্য প্রাপ্তবয়স্কা পাত্রীর মতের বিরুদ্ধে আত্মীয় স্বজনেরা কোন আপত্তি তুলিল না।

কিন্তু কিছুকাল পরে বোঝা গেল কমলিনী তার জীবনের সঙ্গী নির্ব্বাচনে বিন্দুমাত্র ভুল করে নাই। সে সুখী হইয়াছে। মেননও যেমন কমলিনী বলিতে অজ্ঞান, কমলিনীও তেমন মেননকে চোখের আড় করিতে চাহে না।

এই দাম্পত্য প্রেম আরো ঘনীভূত হইল তাদের প্রথম সন্তানের আবির্ভাবে। সুকুমার শিশু পুত্রটিকে লইয়া তুইজনেই যেন মাতিয়া উঠিল। ছেলেটি দেখিতে অবশ্য সুশ্রী হইয়াছিল।

মেনন বলিল, এর নাম রাখ, নারায়ণ।

কমলিনী বলিল, নামটা বড্ড বুড়ুটে, অন্য নাম বলো।

মেনন ছাড়িবার পাত্র নয়। বলিল, তবে রাখো, গোবিন্দ।

এ নামটাও কমলিনীর পছন্দ হইল না।

শেষে কমলিনী বলিল, এস, একটা রফা করা যাক্ খোকার নাম কোন ফুলের নামে রাখো। ঠাকুর দেবতার নাম এ যুগে চল্‌বে না। ওর নাম থাকুক, বেলফুল।

বেলফুলের সঙ্গে ছেলের সাদৃশ্য কল্পনা করিয়া প্রতিবাদ করার কথা মেননের মনে উঠিল না। সে রাজী হইয়া গেল। কিন্তু এ কথাও সত্যের খাতিরে স্বীকার করা যায় যে কমলিনীর সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে এই তাহার প্রথম পরাজয় নয়।

ইহার পর পাঠককে আমার সহিত পনেরো ষোল বছরের প্রসার অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। কেন না এই খণ্ডকালের ইতিহাস গল্পের পক্ষে অপরিহার্য্য নয়।

ডাঃ মেনন এখন মান্দ্রাজের বড় চিকিৎসকদের মধ্যে একজন। তার ইচ্ছা বেলফুল বিলেতে লেখাপড়া শেখে। বেলফুল মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করিয়াছিল।

সেদিন বিকালে এই বিলাত যাওয়া সম্বন্ধেই কথাবার্ত্তা হইতেছিল। বেলফুল বলিল, কেন বাবা, এ দেশে কি আমাদের লেখাপড়া হয় না? শিক্ষাদীক্ষার জন্যে আমাদের বিলেতে পড়তে যাওয়ার সার্থকতা কি?

মেনন বলিল, আমি সে কথা বলিনি, বেলা। এ দেশে যে আমাদের শিক্ষা দীক্ষা হয় না এমন ধারণা আমার মনেও নেই। কিন্তু তোমাকে জীবন-সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হ'তে হবে ত! আমি তোমাকে আই, সি, এস্ এর জন্যে চেষ্টা করতে বলি। যতদিন না সেই বয়েস হয় তুমি বিলেতে কোন একটা কলেজে পড়বে। এই আমার ইচ্ছা এবং প্ল্যান। কমল কি বল?

কমলিনী পাশেই একটা সোফায় বসিয়া কি বুনিতেছিল, বেলফুলকে ছাড়িয়া দিতে তারও মন সরিতেছিল না। ঐ একটিমাত্র ছেলে, ও চলিয়া গেলে কি লইয়া দিন কাটিবে! কিন্তু স্বামীর উচ্চ অভিলাষে বাধা দিতেও তার হাত উঠিল না। সে বলিল, আমি কি বল্‌বো বল। তুমি তোমার ছেলের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে যা' ভাল বুঝবে তাই কর।

বিলেত যাওয়ার প্রস্তাবে মাতারও নীরব সম্মতি কল্পনা করিয়া বেলফুলের মন অভিমানে পূর্ণ হইল। সে বলিল, তা' হ'লে তাই হোক্। তোমরা দু'জনে আমার জন্যে জীবনের যে পথ নির্দ্দেশ ক'রে দেবে আমি নির্ব্বিচারে তাই মেনে নেব। তোমাদের অবাধ্য ত কখনো হই নি।

কিন্তু বেলফুলের কেবলই মনে হইতে লাগিল যে পৃথিবীতে সকলেই ভবিষ্যৎটাই দেখে, বর্ত্তমানের দিকে কেউ ফিরিয়াও চায় না। মা বাবাও তাই দেখিলেন। তাঁরা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের রঙীন চিত্র মনের মধ্যে আঁকিতেছেন কিন্তু সেই অবসরে বর্ত্তমানটা ফাঁকি দিয়া পলাইল।

কিন্তু অবশেষে জাহাজ-ঘাটে আসিয়া ডাক্তার কাঁদিয়াই অস্থির। ছেলেকে কিছুতেই যেন ছাড়িয়া দিতে চাহে না।

বেলফুলও বাপের বুকে মুখ লুকাইয়া অনেক কান্না কাঁদিল। কমলিনী বরং অপেক্ষাকৃত শান্ত থাকিয়া দু'জনকে বুঝাইতে লাগিল।

বেলফুল চলিয়া যাওয়ার পর কয়েকদিন ডাক্তার মন-মরা হইয়াছিল। ক্রমশঃ সেটা অনেক সহিয়া গেল কিন্তু তবুও এমন মেল যায় না যাতে বাপ ছেলেকে চিঠি না লেখে, আর ছেলে বাপকে চিঠি না লেখে। দু'জনের চিঠিতেই বিচ্ছেদের ব্যথার সুর।

এক মেলে খবর আসিল বেলফুলের জ্বর হইয়াছে। চিঠিখানা হাতে করিয়া মেনন চেয়ারে যেমন বসিয়া ছিল তেমনি বসিয়া রহিল। কতক্ষণ সময় কাটিল হুঁস নাই, হুঁস হইল তখন যখন কমলিনী হাত ধরিয়া স্নানাহার করিতে লইয়া গেল।

সেদিন বিকালে সমস্ত সময় বাড়ীর গাড়ী বারান্দায় মেনন চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। যতগুলি "কল" আসিল ফিরাইয়া দিল। দোতালার গাড়ী বারান্দা হইতে নীচে দেখা যায় প্রাঙ্গণের ছোট্ট বাগানটুকু—কত রকমের ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে—বেলফুল এখানে থাকিতে নিজের হাতে ঐ বাগান করিয়াছিল।

পরের দিন প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ বেলফুলের নামে টেলিগ্রাফ মণিঅর্ডারে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। বলা হইল, পড়া শোনা এখন থাক, ভাল ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে থেকে শরীরটাকে আগে সুস্থ করো। খরচপত্রের জন্য কোন চিন্তা কোরো না ইত্যাদি। যে ল্যাণ্ডলেডির বাড়ীতে বেলফুল থাকিত তাঁহার নিকট বেলফুলের তত্ত্বাবধানের জন্য কেবল করিতেও ডাক্তারের ভুল হইল না।

পরের কয়েক মেলে একই খবর আসিতে লাগিল—রোজ একটু জ্বর হয়, কোন ভাবনার কারণ নেই, ওষুধপত্রের ব্যবস্থা হয়েছে, তবে লণ্ডনের জল হাওয়া সহ্য হচ্ছে না, বোধ হয় লণ্ডন ছাড়তে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

ডাক্তারের মনে তখন এই কথাটাই বার বার উঁকি দিতে লাগিল যে সাগর এত দুস্তর কেন? কোথায় বেলফুল আজ সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে—ইচ্ছা করিলেই তাকে দেখিতে পাওয়া যায় না কেন?

সেদিন রোগী দেখিয়া ফিরিবার পথে মোটরের মধ্যেই ডাক্তার একবার বমি করিল। দুপুর বেলা। খররৌদ্র দুইপাশের রাস্তায় পড়িয়া ঝক্ ঝক্ করিতেছে। শোফার তাড়াতাড়ি ডাক্তারকে লইয়া বাসায় ফিরিল।

বাসায় আসিয়া একটু পরেই ডাক্তার অজ্ঞান হইয়া গেল। অন্যান্য চিকিৎসকদের তাড়াতাড়ি খবর দেওয়া হইল। তারা আসিয়া ইঞ্জেক্‌শান ইত্যাদি দিয়া গেল কিন্তু ডাক্তারের আর জ্ঞান হইল না। রাত্রি সাড়ে এগারোটায় ডাক্তার মারা গেল।

চিকিৎসকেরা বলিল হাই ব্লাড্ প্রেসার!

মনকে সংযত করিতে কমলিনীর কিছুদিন সময় লাগিল। কিন্তু ওদিকে একমাত্র পুত্র বিদেশে রুগ্ন—পিতাকে হারাইবার শক্ বেলফুলের পক্ষে যে কি রকম মর্ম্মান্তিক তাহা কমলিনী আন্দাজ করিতে পারে। সুতরাং মাদ্রাজের বাড়ী ঘর দুয়ারের একটা বিলি ব্যবস্থা করিয়া কমলিনী ছেলেকে দেখিতে বিদেশ যাত্রা করিল।

লণ্ডনে পৌঁছিয়া জানিল ডাক্তারেরা বেলফুলের অসুখটাকে যক্ষ্মা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন এবং তাকে সুইজারল্যাণ্ডে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

সুইজারল্যাণ্ডের নার্সিং হোমে কমলিনী গিয়া যখন পৌঁছিল তখন মাতাপুত্রের কাহারও চোখই শুষ্ক ছিল না। অনেক দিন পরে মাকে পাইয়া বেলফুলের পিতৃশোক যেন একটু শান্ত হইল।

যখন কথা কহিতে পারিল তখন কমলিনী ছেলের শরীরে হাত বুলাইয়া বলিল, তোর শরীরে কিছু নেই যে রে, বেলা।

বেলফুল বলিল, তুমি কিছু ভেবো না, মা। ভারতবর্ষে ফিরে গেলেই আমার শরীর সেরে যাবে।

কমলিনী ভাবিল, সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি এই সুইজারল্যাণ্ড। এদেশ ছাড়িয়া ছেলে কিনা ফিরিয়া যাইতে চায় ভারতবর্ষে। এখানকার উত্তরদিকের জুরা পর্ব্বতের স্বাস্থ্যকর হাওয়া, আল্‌প্‌সের বিশ্ববিশ্রুত পার্ব্বত্য সৌন্দর্য্য, এখানকার বিশুদ্ধ দুধ এবং পনীর—এই সব ছাড়িয়া ভারতবর্ষের জল হাওয়া কি রোগীর পক্ষে উপকারী হইবে? কমলিনীর নিশ্চিত

ধারণা ছিল যে যক্ষ্মারোগের প্রতিকার যদি কোথাও থাকে তবে সে সুইজারল্যাণ্ডে—সুতরাং সে দেশ ছাড়িয়া ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাওয়া নিছক পাগলামি।

কিন্তু এই পাগলামির কথাতেও কমলিনীকে বাধ্য হইয়া কান দিতে হইল। দিনরাত বেলফুলের মুখে আর অন্য কথা নাই—কেবল এক কথা—আমাকে ভারতবর্ষে ফিরিয়ে নিয়ে চল, সেখানে গেলেই আমি সেরে যাবো।

অবশেষে ডাক্তারকে কথাটা জানাইতে হইল। ডাক্তার ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, রোগীর মনে সদাসর্ব্বদা দেশে যাওয়ার জন্যে একটা দুশ্চিন্তা থাক্‌লে এখানকার চিকিৎসায় কোন ফল হবে না। এ রোগের প্রধান ওষুধ হচ্ছে বিশ্রাম—শারীরিক এবং মানসিক। কিন্তু মিসেস্ মেনন, আপনার পুত্রের মন বিশ্রাম পাচ্ছে না। সুতরাং আমি বলি, আপনার পুত্রকে দেশেই নিয়ে যান। যদি তার মন পরিপূর্ণ বিশ্রাম পায় এবং এখানকার ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ওষুধ পথ্য খাওয়ানো হয় তবে তাতে সম্ভবতঃ ভাল ফল হবে।

ইহার উপর আর কাহারও কথা চলে না। সুতরাং কমলিনী বাধ্য হইয়া দেশে ফিরিবার আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে মাতাপুত্রে সুইজারল্যাণ্ড ছাড়িয়া ভারতবর্ষে আসিবার জন্য রওনা হইল। রোম এক্সপ্রেসে বার্ণের (Bern) নার্সিং হোম ছাড়িয়া ট্রিয়েষ্ট (Trieste) বন্দরে ইতালীয় জাহাজ ধরিবে। ষোল হাজার স্কোয়ার মাইলের এই ক্ষুদ্র স্বাধীন জনপদকে নীরব প্রণতি জানাইয়া মাতাপুত্রে সুইজারল্যাণ্ডের ক্রোড় ত্যাগ করিল।

ট্রিয়েষ্ট ছোট্ট বন্দর। নীচে ভিনিস উপসাগরের কূল ছুঁইয়া জাহাজ দাঁড়াইয়া আছে—আরো দূরে আড্রিয়াতিক সাগরের বিরাট জলোচ্ছ্বাস।

কমলিনী বেলফুলকে লইয়া ক্যাবিনে আশ্রয় লইয়াছে। ভোর রাত্রে জাহাজ ছাড়িবে। জাহাজে উঠিয়া বেলফুলের খুব স্ফূর্ত্তি—দেশে ফিরিবার আনন্দে তার চোখ মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

রাত নয়টা বাজিয়া গেল। ষ্টিয়ার্ড ঘণ্টাধ্বনি করিল—আত্মীয় স্বজন বন্ধু যাহারা জাহাজের যাত্রীদের বিদায় দিতে আসিয়াছিল তাহাদের এইবার নামিয়া যাইতে হইবে।

সিঁড়ি নামান হইতেছে এমন সময় একজন ইতালীয় ডাক্তার ব্যস্ত সমস্ত ভাবে জাহাজে উঠিয়া আসিল। একটু পরে সে কমলিনীর ক্যাবিন খুঁজিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল এবং কমলিনীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, মিসেস্ মেনন, আমার নাম ডাঃ গিয়োভ্যানি, আমরা এইমাত্র খবর পেলুম যে এই জাহাজে ক্ষয় রোগাক্রান্ত একজন রোগী আছে। রোগটি দূষিত এবং অন্য যাত্রীদের মধ্যে ব্যাপ্ত হ'তে পারে। অতএব জাহাজের নিয়ম অনুসারে আমরা রোগীকে এই জাহাজে যেতে দিতে অপারক। আপনাদের খুব অসুবিধা হ'ল—সেজন্যে আমরা দুঃখিত এবং লজ্জিত। কিন্তু উপায় নেই—আপনারা নেমে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন।

ডাক্তারের কথা শুনিয়া কমলিনীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। বেলফুল উত্তেজনার ফলে উঠিয়া বসিল—কেবল কাতরোক্তি করিয়া পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল Pray doctor, let me go—ডাক্তার আমাকে যেতে দাও আমার দেশে, আমাকে দেখ্‌তে দাও আমার আত্মীয় স্বজনের মুখ, আমাকে অনুভব করতে দাও আমার দেশের আলো বাতাস—ঈশ্বরের দিব্যি ক'রে বল্‌ছি ডাক্তার, তোমার ভাল হবে—একজন অপরিচিত বিদেশী যুবকের প্রতি দয়া কর···

বেলফুলের আকুলি বিকুলি কান্না দেখিয়া মনে হইতে লাগিল যেন কেউ তার হৃৎপিণ্ডটা ধরিয়া সজোরে মোচড় দিতেছে—আর তাহারি অব্যক্ত যন্ত্রণায় সে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। কিন্তু ইতালীয় ডাক্তারের মুখের একটি পেশীও কম্পিত হইল না। সে স্থির কণ্ঠে বলিল, কি করবো বলুন, মিসেস্ মেনন, আমরা নিয়মের অনুবর্ত্তী। দয়াধর্ম্ম করা আমাদের আইনের মধ্যে নেই। আমরা জানি শুধু কাজ, মানি শুধু কর্ত্তব্য। সুতরাং আমি যা' বলেচি সেই আমার শেষ কথা। আপনারা অবিলম্বে জাহাজ ত্যাগ করবার বন্দোবস্ত করুন।

লোকটা তর্ তর্ করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া গেল।

তাহার পর যে অশেষ দুঃখ এবং দুঃসহ অপমানের ভিতর

দিয়া মালপত্র এবং রুগ্ন ছেলে লইয়া কমলিনী ডাঙায় নামিয়া আসিল তার বিস্তৃত বিবরণ না দেওয়াই ভাল। সম্পূর্ণ অপরিচিত দেশ—রাস্তাঘাট অচেনা, ভাষা অজানা। তার উপর এই সময় টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে সুরু হইল।

কি ভাগ্যি তখনো একটা হোটেল খোলা ছিল। হোটেলের অধিকারী সমস্ত ঘটনা শুনিয়া হোটেলের একটা পাশ রোগীকে ছাড়িয়া দিল।

তাহার পরের ইতিহাস বিবৃত করাও যেমন দুঃসাধ্য, শোনাও তেমনি কঠিন। কিন্তু গল্প শেষ করিবার জন্য তবু তাহারি প্রয়োজন। কেবল এইটুকু ছবি কল্পনা করিয়া লইলেই যথেষ্ট হইবে যে বিদেশ বিভুঁই যায়গা—মরণাপন্ন এক রোগীর পাশে অসহায়া এক নারী!

দেশে ফিরিতে না পারিয়া বেলফুলের মন একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। প্রতিদিন তার অবস্থা ক্রমশঃ খারাপের পথে অগ্রসর হইয়া যাইতে লাগিল। অসুখের দ্রুতগতি দেখিয়া কমলিনী এবং সেখানকার ডাক্তারেরা পর্য্যন্ত অবাক হইয়া গেল। কিন্তু সে অসুখের গতিরোধ করা তথ তাহাদের সাধ্যের বাহিরে।

শেষ রাত্রে যখন জাহাজ ছাড়ে তখন জাহাজের ভেঁ শোনা যাইত—সেই সময় সমস্ত দিনের আচ্ছন্ন ভাবট কাটিয়া গিয়া বেলফুল সজাগ হইয়া উঠিত। সে উৎকং হইয়া কিসের জন্য যেন অধীর প্রতীক্ষা করিত—কিন্তু মুং কিছুই বলিত না।

টাল মাটালের মধ্য দিয়া আরো সাতটা দিন কাটিয় গেল। তার পর একদিন ভোর রাত্রে বেলফুল মারা গেল।

সমুদ্রের ধারেই বেলফুলকে এক জায়গায় কবর দিয় রাখা হইল।

সেদিন ট্রিয়েষ্ট বন্দরে ভারতের এবং ইতালীর ভাগ্যলক্ষ্মী পরস্পর মিতালি করিয়া হাত ধরিয়া দাঁড়াইল।

অদৃষ্ট মানুষের উপর শুধু উপদ্রবই করে না, পরিহাসং করে।

শ্রীঅবনীনাথ রায়

গান

কীর্ত্তি

নবীন সাথী তুমি আমার
এম্‌নি নবীন থাক,
পথের ভিড়ে আবার যেন
হারিয়ে যেয়োনাক।

এই হাসি আর চোখের চাওয়া
এম্‌নি এরা থাক্,
চটুল হাসির চপল স্রোতে
কর হতবাক্।

হাতখানি মোর গ্রহণ কর,
প্রাণের কাছে তুলে ধর,
আমার আপন নামটি ধরে'
কানে কানে ডাক।

এম্‌নি করে' হঠাৎ এসে,
দেখা দিয়ো বধূর বেশে,
—বিদায় বেলা বিদায় বাণী
কিছুই বোলোনাক॥

একটি পাতার কাহিনী

একশ' বছর আগে সুদূর আসামের জঙ্গলে একটি নতুন গাছের পাতা যেদিন প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল সেদিন কে জানত সেই সামান্য পাতা সমস্ত সভ্যজগতের সামাজিক অনুষ্ঠানে একদিন এমন যুগান্তর আনবে! বনের সাধারণ একটি জংলা গাছ—তার পাতার রহস্য শুধু চীনারাই জানত, জানত ইতিহাস যখন থেকে লেখা শুরু হয়েছে তারো অনেক আগে থেকে। যে ইংরাজ এই চায়ের পাতার প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হয়েছিলেন তিনি নিশ্চয়ই কল্পনা করতে পারেন নি ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তের এই বন্য ঝোপ কটি থেকে একদিন এক বিশাল ব্যবসায়ের পত্তন হবে।

মজার কথা এই যে, ভারতের নিজস্ব এই পাতা হয়ত চীনের আমদানি মালের কাছে জন্মস্থানের গৌরব ও নিজস্ব উৎকর্ষ সত্ত্বেও হটে যাবে এমন একটু সন্দেহও তখন দেখা গিয়েছিল। চায়ের ব্যবসায়ের প্রথম উদ্যোগী যাঁরা ছিলেন তাঁরা গোড়ার দিকে কি করবেন ঠিক করে উঠতে পারেন নি। দেশজ যে গাছ আপনা হোতে জঙ্গলে জন্মেছে তারই চাষ করা উচিত, না, চীন থেকে সে দেশের চায়ের গাছ আমদানি করে এদেশে রোপণ করা ভাল এ বিষয়ে তাঁদের মনে যথেষ্ট দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব ছিল। সৌভাগ্যবশতঃ শেষ পর্য্যন্ত চীনের আমদানি-করা পাতার ওপর দেশের চায়েরই জয় হল এবং সেই থেকেই বর্ত্তমান কালের একটি সুপরিচালিত প্রধান ব্যবসায়ের সূত্রপাত হল ভারতবর্ষে।

সুদূর ষোড়শ শতাব্দীতে পর্য্যন্ত ইউরোপ চায়ের কথা শুনেছিল। বিদেশী পর্য্যটকেরা অনেকে প্রাচ্য ভ্রমণ থেকে দেশে ফিরে চায়ের অদ্ভুত গুণ বর্ণনা করেন। কিন্তু ইউরোপকে প্রথম চায়ের স্বাদ জানায় ওলন্দাজেরা সপ্তদশ শতাব্দীতে। তখন বিশেষ সৌভাগ্যবান জন কয়েক লোক ছাড়া এই দুর্ল্লভ বিলাস উপভোগ করবার সামর্থ্য সকলের ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে সাহিত্যিক ও পেশাদারী বচন-বাগীশেরা প্রাচ্য দেশের একটি বিশেষ কৌতূহলের জিনিষ হিসাবে চায়ের উল্লেখ করেছেন। চা-খাওয়া তখনকার দিনে একটা বিশেষত্ব ছিল। স্যামুয়েল পেপ্‌স, অ্যাডিসন, সুইফট্ এবং ডক্টর জন্‌সন্ চাখোর হিসাবে বিশেষ গর্ব্ব অনুভব করতেন। ভিক্টোরিয়ান যুগের আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে চা খাওয়া আর বিশেষ কয়েকজন বিলাসীদের মধ্যে আবদ্ধ রইল না; ক্রমশঃ ইংরাজ জাতির জাতীয় অভ্যাস হয়ে দাঁড়াল। ভারতে চায়ের ব্যবসায়ের উন্নতির ফলেই এ সমস্ত সম্ভব হয়েছিল। ১৮৩৬ সালে ইংলণ্ড প্রথম এক পাউণ্ড ভারতীয় চায়ের নমুনা পায়, তারপর তিন বৎসর বাদে ৪৮৪ পাউণ্ড ভারতীয় চা ইংলণ্ডে রপ্তানি হয়।

সে সময়কার একজন খ্যাত লেখক লিখেছেন, "প্রত্যেক ভদ্র পরিবারেই সকালে চা, রুটি ও মাখনের জন্য একটি সময় নির্দ্দিষ্ট থাকত।" চায়ের পাত্র এমনি করে ইংরাজের ঘরে প্রতিষ্ঠিত হ'ল। নগন্য একটি পাতা একটি জাতির জীবনে কি পরিবর্ত্তন আনল ভাবলে অবাক হতে হয়। ভারতবর্ষই বৃটেনকে তার জাতীয় পানীয় দান করেছে, এবং তার গার্হস্থ্য জীবনের প্রতীক হিসাবে বৃটেনের লোকেরা এই পানীয় পৃথিবীর সুদূরতম প্রদেশে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে প্রচারিত করেছে।

ভারতবর্ষের মত এত উৎকৃষ্ট ও সুগন্ধযুক্ত চা পৃথিবীর কোন দেশে পাওয়া যায় না। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চায়ের বাগানগুলি ভারতেই অবস্থিত। চায়ের বাজারে তার স্থান সকল দেশের পুরোভাগে। কিন্তু ভারত নিজে তার উৎপন্ন চায়ের কতটুকু ব্যবহার করে? বৎসরে বোধ হয় গড়পড়তা মাথা পিছু দেড় ছটাকের বেশী নয়। এর কারণ হ'ল এই যে ভারত তার নিজস্ব পানীয়ের গুণ অত্যন্ত বিলম্বে বুঝতে শিখেছে। তবে চারিধারের লক্ষণ দেখে

মনে হচ্ছে অদূর ভবিষ্যতেই ভারতের চা দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে তার যথাযোগ্য স্থান অধিকার করবে।

আদর্শ ভূমিকা

কয়েক বৎসর আগে লণ্ডনের একটি থিয়েটারে একটি গীতি-নাটিকার অভিনয় দেখবার জন্যে মাসের পর মাস অসম্ভব ভীড় হচ্ছিল। সেই গীতি-নাটিকার একটি গানের গোড়ার কথা ছিল: "দুজনের চা"। সে গান তখন সকলেরই মুখে মুখে শোনা যেত। শুধু সুরের গুণেই নয়, সাধারণ ইংরাজের কাছে গানের কথাটির একটি সরল মাধুর্য্য ছিল বলেই গানটি অত জনপ্রিয় হয়েছিল। চা-কে যারা জাতীয় পানীয় করে তুলেছে "দুজনের চা"—এই কল্পনাটি তাদের একান্ত মনের মত।

সত্যি কথা বলতে গেলে "দুজনের চা" কথাটির ভেতর আরও অনেক কিছু পাওয়া যায়। "দুজনের চা" শুনলেই মধুর সুহৃদ-সঙ্গের একটি অপরূপ ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। চায়ের পেয়ালা সামনে নিয়ে দুজন বসে অসঙ্কোচে যেমন-খুসী পৃথিবীর যাবতীয় জিনিস আলোচনা করা যায়—ঘরের কথা, পরের কথা, নিজের ব্যক্তিগত খবর থেকে বিশ্বের গভীর সমস্যা কিছুই চর্চ্চা করতে বাধে না।

বান্ধবতার জন্যে এর চেয়ে আদর্শ ভূমিকা কিছু হতে পারে না। মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্দ্যের পরিণতি এই ভূমিকার ওপর অনেকখানি নির্ভর করে। হাজার যার গুণ, সেই চা না হোলে জীবন সত্যই নীরস হয়ে উঠত। ঠিক সময়টিতে চা না খেলে মনে হয় কোথায় যেন মস্ত বড় একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে। সকালের চা,—নিশ্চয়ই—তা না হলে চলে না। আর বিকালে ত একান্তই দরকার।

কিন্তু সকাল-বিকালের ধরা-বাঁধা সময় করবার কি দরকার? দিন বা রাত্রির একটি বিশেষ নির্দ্দিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠানের মত পান করবার জিনিষ ত চা নয়। চা যে-কোন সময়েই খাওয়া যায়। চা যখনই খাওয়া যাক ভালো লাগবেই, তার সময় অসময় নেই। তবে ভাল যাতে লাগে তার জন্যে একটু পরিশ্রম করতে হয়। সে পরিশ্রম অবশ্য সার্থক হয়।

চা তৈয়ারীর গুটিকতক মূল্যবান নিয়ম আছে। ভালো চা ব্যবহার করতে হবে; এমন চা যার সুগন্ধ আছে, আর আছে উপযুক্ত তার। সত্যিকারের চা-রসিকের এ বিষয়ে ভুল হ'তে পারে না। চা যদি ভালো হয়, তাহলে তৈরী করার আসল সমস্যা মিটে যাবে, বাকী যা থাকে তা তো নিতান্ত সহজ। যেমন কেট্‌লীতে জল বেশী বা কম ফুটোন হ'লে চায়ের স্বাদ বিকৃতি ও জোলো হয়ে উঠে। দোষ অবশ্য জলের, চায়ের নয়।

দুজনের চা-এর জন্যে তাই ঠিক দুটি চামচে চা দিতে হয় পাত্রে, এক চিমটে বেশী অবশ্য দেওয়া যেতে পারে পাত্রের উদ্দেশে। টাট্‌কা গরম জলে পাঁচ মিনিট ভেজাবার পর পেয়ালায় ঢেলে চুমুক দেওয়া আর গল্প করা—বাস্।

চায়ের সঙ্গেই আলাপ জমে ঠিক। আলাপ আর চা অচ্ছেদ্দ্য ভাবে জড়িত। সাধারণ কথাবার্ত্তাকে মধুর ও প্রাণবন্ত করে তুলতে চায়ের ক্ষমতা অদ্বিতীয়। চায়ের পাতার সুগন্ধে যখন চারিধার আমোদিত তখনই আমাদের মুখ ঠিক খোলে। পেয়ালায় অধর স্পর্শ করবার সঙ্গে সঙ্গে কি মধুর সুগন্ধই যে পাওয়া যায়!

এক হাজার বৎসরেরও আগে চায়ের উদ্দেশে এক চীনা যে প্রশস্তি রচনা করেছিলেন, সরলতা ও সত্যের দিক দিয়ে তার তুলনা মেলেনা। কবি বলেছিলেন,—"চা অবসাদ ও ক্লান্তি দূর করে, দেহকে সতেজ করে, অনুভূতিকে তীক্ষ্ণ করে, চিন্তার প্রেরণা দেয়, মনকে করে উদার ও প্রাণ-শক্তিকে করে সংযত।" কালের অত্যাচারে চা-য়ের মাধুর্য্য একটুকুও হ্রাস পায়নি। অবসাদহীন আনন্দ যে পেয়ালা থেকে পাওয়া যায় তাকে, সমধর্ম্মীরা যেখানে পরস্পরের কাছে প্রাণের কথা বলাবলি করছে—সেই ভূমিকায় একবার কল্পনা করলেই বুঝতে পারা যাবে এই অসম্পূর্ণ সৃষ্টিতে এর চেয়ে নিখুঁত আর কিছু হ'তেপারে না।

রুচির কথা

ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপারে মানুষের সাধারণতঃ একটু গোঁড়ামি থাকে। গোঁড়ামি সবক্ষেত্রেই যে খারাপ তা নয়। কারণ বিশেষ-বিশেষ বিষয়ে মানুষের বদ্ধমূল কোনো ধারণা

থাকলে বুঝতে হবে, সে ধারণা ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই জন্মেছে। খাদ্য ও পানীয়ের বেলায় যেমন, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের তেমন প্রাধান্য দেখা যায় না।

অবশ্য বাতিক-গ্রস্তদের কথা নয়, সাধারণ সুস্থ বুদ্ধিমান লোকদের কথাই এখানে ধরা হচ্ছে। বাঁচবার জন্যে আহার সকলকেই করতে হয়; তৃষ্ণাও সকলকে দূর করতে হয়। প্রয়োজন মত। ক্ষুধা তৃষ্ণা জীবনের মূল প্রেরণা। কিন্তু উৎকৃষ্ট কোন পানীয় সম্বন্ধে রুচি আমাদের মধ্যে গড়ে উঠে অনেক সাধনায়, ক্ষুদ্নিবারণের মত সেটা স্বাভাবিক ও সহজ নয়। নিপুণ হাতে তৈরী এক পেয়ালা ভালো চা এর মূল্য পানীয় রসিকের কাছে সাধারণ দৈনিক খাদ্যের চেয়ে অনেক বেশী।

চায়ের কথায় যখন আসা গিয়েছে তখন চা পানের আরাম আনন্দই এখানে বর্ণনা করা যাক্। শুধু পানীয় হিসাবেই প্রথমতঃ চা'কে ধরা যাক্। যে কোন ঋতুতে দিনরাত্রির যে কোন সময়ে এই পানীয়টি চলে, গ্রীষ্মে চা শরীরের শ্রান্তি দূর করে, স্ফূর্তি আনে; শীতে শরীরের জড়তা দূর করে দেয় তার উষ্ণতায়। অবসাদের সময়ে আর কোন পানীয়ই এত সহজে দেহে ও মনে সজীবতা সঞ্চার করতে পারে না।

শুধু গভীর তৃপ্তি দেওয়া নয়, শরীরকে চাঙ্গা করে তোলবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা গরম চায়ের আছে। সেই জন্য চায়ের আদর সর্ব্বত্র। চায়ের প্রচলন ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। যতই খাওয়া যাক না কেন চায়ে কখনও অরুচি ধরবার সম্ভাবনা নেই। সকাল, দুপুর, রাত্রি সব সময়েই মানুষ চা খেয়ে থাকে, নিত্য চা'টি আমাদের খাওয়া চাই-ই।

চায়ের মত এমন বিশুদ্ধ ও সুলভ পানীয় আর কিছু নেই। পানীয়ের মধ্যে একমাত্র জলই এর চেয়ে সস্তা। বিশুদ্ধ জলও আবার সব সময়ে সহজে পাওয়া যায় না। গরম ফুটোন জলের সঙ্গে চা খেলে কিন্তু বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে কোনই ত্রুটি থাকে না। সাধারণতঃ আমরা যে চা খেয়ে থাকি তাতে পেয়ালা পিছু চায়ের অংশের মূল্য অকিঞ্চিৎকর; যেটুকু চিনি এক পেয়ালায় লাগে, চায়ের দাম তার ছভাগের এক ভাগ মাত্র।

স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের দিক দিয়ে দেখতে গেলে চা পানের উপকারিতা অনেক। ক্লান্ত শরীর ও মন, উভয়কেই চা নূতন প্রেরণা দেয়। মনের ওপর তার সূক্ষ্ম ক্রিয়ার ফলে আমাদের সাধারণ আলাপ-আলোচনা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। পাশ্চাত্য জগতে চা সামাজিকতার অপরিহার্য্য অঙ্গ। স্বাস্থ্যের প্রতিকূল আবহাওয়ার সঙ্গে যোঝবার শক্তি আমরা চা থেকে পাই। সেই হিসাবে চা আমাদের পরমায়ু বৃদ্ধিতেও সাহায্য করে। কোনো রকম কষ্ট কল্পনা না করেই সুতরাং বোঝা যায় যে অদূর ভবিষ্যতের অধিকাংশ লোকই চা-পায়ী হবে। এই স্বাস্থ্যকর অভ্যাস আমাদের দেশে যে ভাবে বাড়ছে তাতে ভারতবর্ষই যে অচিরে চায়ের প্রচলনে সকলের অগ্রণী হবে এ বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ নেই।

কিশোরী

(Browningএর Evelyn Hope হইতে)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র এম্-এ (কলিঃ ও ক্যাণ্টাব)

সে যে হায় নাই আর! সুকুমার ফুলের মতন
ছিল যার মুখখানি, হরিল সে কুমারী রতন
মরণ আপন হাতে। বসে আছি শব দেহ পাশে ;
ওই তার বইগুলি, এই খাট, এখনো যে হাসে
ফুলগুলি নিজে তুলি রেখেছিল ফুলদানী পরে ;
সকলি যেমন ছিল তেমনি রয়েছে এই ঘরে।
রুদ্ধ বাতায়ন ফাঁকে অবারিত দুটি রবিকর,
ঘরের আঁধার পরে মূর্চ্ছা ভরে হয়েছে নিথর।

ষোলটি বছর মাত্র সবে পূর্ণ হয়েছিল তার,
জানিনা জানিত কিনা,—কে আমি যে,
কি নাম আমার।
বয়স হয়নি তার বুঝিবারে প্রেম কারে বলে,
কত সাধ কত আশা দেখেছি সে নয়নে উথলে।
প্রত্যহের শ্রমশ্রান্তি ছোটখাট যত দুখ সুখ,
সকলি ফুরাল যবে থামিল বুকের ধুক্ ধুক্।
বিধাতা নিলেন সব কিছু বাকি রহিল না আর,
শুধু চক্ষে জাগে মোর নিরমল ভালখানি তার।

বিলম্বে এসেছি আমি? কহ মোরে,
থেকো না নীরবে।
জানি সত্যে শুচিতায় গড়া তুমি। শুভগ্রহ সবে
এক সাথে মিলি তব কোষ্ঠিপত্র করিল রচনা,
তোমারে করিল তারা দীপ্তিময়ী শিশিরের কণা।
বয়সে তোমার আমি তিনগুণ বড়। এতদিন
তুমি আমি চলেছিনু ভিন্ন পথে, তা' ব'লে অচিন্
র'ব মোরা নিত্যকাল? তুমি মোর কেহ, কিছু নহ?
কেবল মৃত্যুর পথে সহযাত্রী দোঁহে অহরহ?

কভু নয়। যে দেবতা সৃজনে অমেয় শক্তিমান্,
তাঁহারি বদান্য হস্তে অপ্রমেয় তেমনি যে দান!
প্রণয় রচনা তাঁর প্রণয়েরি পুরস্কার তরে,
তাই আছে তোমা লাগি দাবী মোর প্রেমের ভিতরে।
হয়ত রয়েছে মাঝে বহুজন্মব্যাপী ব্যবধান,
লোক লোকান্তরে আমি তোমা তরে হ'ব ভ্রাম্যমাণ,
হবে মোর বহুশিক্ষা, অনেক ভুলিতে হবে মোরে,
তারপরে একদিন তোমারে বাঁধিব বাহু ডোরে।

সেদিন আসিবে জানি একদিন আসিবে নিশ্চয়,
যেদিন পারিব আমি নিঃসংশয়ে করিতে নির্ণয়,
—এমন আনন্দময় শুদ্ধসত্ত্ব ওই তনু মন
এত বর্ষ স্পন্দহীন ধূলিলীন ছিল কি কারণ ?
আলুল কুন্তলে তব কী রহস্য ঘনায় কাজলে
দিব বলি, বাখানিব বিম্বাধরে কি সুধা উথলে।
জরাজীর্ণ ধরা ছাড়ি' নব লোকে নব জন্মান্তরে
কি করিবে মোরে লয়ে র'বে না তা' মোর অগোচরে।

তখন বলিব আমি প্রবীণ হয়েছি প্রতীক্ষায়,
কতবার ফেলিয়াছি উজাড়িয়া নিঃশেষে আমায়,
মানবের অভিজ্ঞতা পুঞ্জীভূত করিয়াছি কত,
অগণিত দেশকাল লুণ্ঠিয়া করেছি পদানত।
মরমের অন্তস্তলে তবু যেন কি অমূল্য ধন
হারায়েছি, কিম্বা ব্যর্থ করিয়াছি তার অন্বেষণ।
জনমে জনমে আমি খুঁজেছিনু, পেয়েছি তোমারে,
বল দেখি কি লুকান আছে এই মিলন মাঝারে ?

তোমারেই নিরবধি আমি শুধু ভালবাসিয়াছি,
তবু কি বলিতে পারি প্রেমে তব প্রাণ ভরিয়াছি ?
ছিল ঠাঁই এই বুকে ধরিয়া রাখিতে ওই হাসি,
রক্ত পুষ্পাধর আর আলুল কাজল কেশরাশি।
থাক্ কথা। একটি মাত্র কচি পাতা হাতে তব দিনু,
হিমভরা মধুভরা হাতখানি যতনে ভরিনু।
থাক্ চাপা মুঠি তলে সঙ্গোপনে রহস্য দোঁহার,
ঘুমাও, জাগিবে যবে, স্মৃতি লবে বুঝাবার ভার।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র
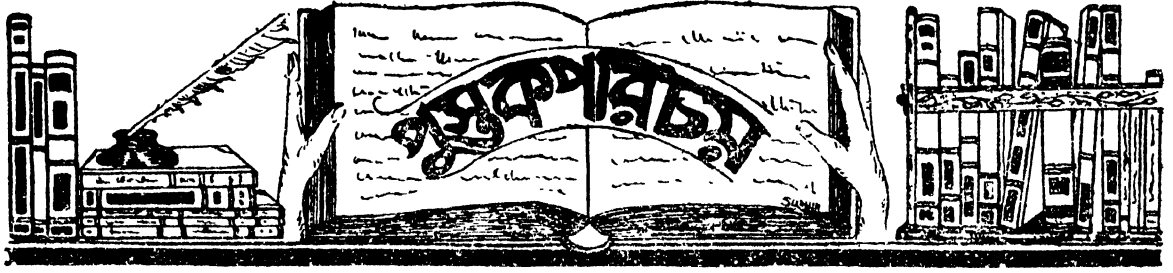
পুরুষ ও নারী—কবিতার বই, শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। প্রকাশক পি, সি, সরকার এণ্ড কোং ২ নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। ৪২ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲ টাকা।

দশটি কবিতার সংখ্যা। পুস্তকের নাম হইতেই বোঝা যায় কবি তাঁহার কাব্যের ভিতর দিয়া পুরুষ ও নারীর চিরন্তন সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, অর্থাৎ যে মত প্রতিপন্ন করিতে প্রবন্ধ লেখা যাইতে পারিত তাহাই প্রতিপন্ন করিতে তিনি কবিতা লিখিয়াছেন। কিন্তু প্রবন্ধ লিখিলে পাঠক পাঠিকাবর্গের সুবিধা হইত, কেননা তাহার মধ্যে লজিকের দাবী করা যাইত। বলা বাহুল্য কাব্যের মধ্যে লজিক থাকে না এবং বক্ষ্যমান কবিতাগুলির মধ্যেও লজিক নাই। "পুরুষ ও নারী" শীর্ষক প্রথম কবিতাটিতে তিনি জগৎ-সৃষ্টির রহস্য বোঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার মতবাদ হিন্দু-দর্শনকেও অনুসরণ করে নাই, পাশ্চাত্য দর্শনকেও নহে—এ মতবাদ তাঁহার নিজস্ব, কবির। তাহা লইয়াও তাঁহার সহিত কোন বিরোধ ছিল না যদি তিনি তাঁহার কাব্যের ভিতর দিয়া একটি পরিপূর্ণ রসধারার আনন্দানুভূতির সৃষ্টি করিতে পারিতেন, যাহা হইল প্রকৃত কাব্যের লক্ষণ। কিন্তু বক্ষ্যমান কবিতাগুলির মধ্যে সে স্বতঃস্ফূর্ত্ত গতিবেগ, সে আনন্দঘন রসরূপ নজরে পড়ে না। সমস্ত কবিতা পড়িয়া মনে হয় নারী কবির চক্ষে ভয়ঙ্করী রূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভয়ঙ্করীর অর্থ যেমন awe-inspiring, এই কবির ভয়ঙ্করীর অর্থ বীভৎসা—

কেবল একটী কবিতার কয়েকটি লাইন মনে হইল। কবি দার্শনিক মতবাদের বোঝা কাঁধ হইতে ফেলিয়া দিয়া কাব্যের আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সে লাইনগুলি নীচে তুলিয়া দিলাম :—

"আর কেহ শোনে নাই আমাদের নিভৃত আলাপ
পৃথিবী ঘুমায়ে ছিল, মেদুর নিশ্বাসে
সান্দ্র করি মন্দ সমীরণ ;
নিশ্চন্দ্র গগনতলে তারারা বন্দিনী ছিল রন্ধ্রহারা মেঘ-
কারাগারে।

শ্রাবণের
আসন্নবর্ষণ মেঘ সন্নত বিপুল গর্ভভারে।" (৪০ পৃঃ)

কিন্তু তবু 'গর্ভভারে' কথাটি রসবোধে পীড়া জন্মায়।

অনু। ক্রম ধাতুর অর্থ অনুসরণ করা। অতএব 'অনুক্রমণী' 'উপক্রমণিকা' অর্থে ব্যবহৃত হয় কি না বিবেচ্য। কবি প্রথম লাইনে লিখিয়াছেন "ধীরে ধীরে উঠিল যবনী।" বলা বাহুল্য এখানে 'যবনী' 'যবনিকা'র abbreviation হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে "যবনি" হওয়া উচিত ছিল, কেননা "যবনী" অর্থে মুসলমানী।

বইখানির বাঁধাই এবং রং অত্যন্ত সুন্দর এবং সুরুচি-বিজ্ঞাপক।

শ্রীঅবনীনাথ রায়

শ্রীযুত সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় রচিত **"মহারাজ মণীন্দ্র চন্দ্র"** বইখানি পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। মণীন্দ্রচন্দ্র বাঙ্গলার তথা ভারতবর্ষের একজন আদর্শ দানবীর ও বিদ্যোৎসাহী রাজা ছিলেন। তাঁহার পূত চরিত্রের দ্বারা বাঙ্গালার জনসমাজ গৌরবান্বিত, পবিত্রীকৃত হইয়াছে। প্রস্তুত জীবন-চরিত্রখানি মণীন্দ্রচন্দ্রের চারিত্র্য মহিমার উপযুক্ত জীবন-চরিত্রই হইয়াছে। শ্রীযুত

সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় বাঙ্গলা ভাষায় একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক, কবি, সাহিত্য-সেবী ; তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া মূল চিঠি পত্রের নজীর ইত্যাদি আবশ্যক ক্ষেত্রে উদ্ধার করিয়া দিয়া এই মহারাজের চরিত্র-চিত্রণ করিয়াছেন। বিষয়-মাহাত্ম্য ও রচনার পারিপাট্য এবং উপযোগিতা এই উভয় দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে বইখানিকে সার্থক ও সুন্দর বলিতে হয়। আমার মনে হয় এইরূপ বই বাঙ্গলার প্রত্যেক পাঠাগারে থাকা উচিত। বইখানির বাহ্য সৌষ্ঠব, ছাপার সৌন্দর্য্য, আবশ্যক চিত্রাদির সন্নিবেশ ইত্যাদি গুণের দ্বারা অনিন্দনীয়।*

শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়

ছায়াপথ—শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম: এক টাকা চার আনা। সুদৃশ্য মুদ্রণ ও প্রসাধন।

যে কয়জন স্ত্রী-লেখক আধুনিক নব্য সাহিত্যে মৌলিক রচনাশক্তি নিয়ে দেখা দিয়েছেন, নানা কারণে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীকে তাঁদের মুখপাত্রী বলা যেতে পারে। চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য এবং স্বাচ্ছন্দ্য বাক্য বিন্যাসের সরস এবং সূক্ষ্ম কারুকার্য্য, গল্পের সাবলীল একটী প্রবাহ—এ যে কেবল পুরুষ লেখকেরই এক চেটিয়া নয়, একথা তিনি অতি সহজে প্রথমেই প্রমাণ করেছেন। সাময়িক সাহিত্যে তাঁর ছোটগল্প ও প্রবন্ধ অনেকেই পড়েছেন, 'ছায়াপথ' তাঁর প্রথম ছোট উপন্যাস। আত্ম-প্রচারের বাহুল্য এবং বাহাদুরির বাহবায় তিনি বৃহৎ পাঠক সাধারণের কাছে এসে এখনো দাঁড়াতে পারেননি বটে, কিন্তু দাঁড়িয়েছেন তিনি একেবারে দেবী ভারতীর রত্নবেদীর ধারে। অত্যন্ত সাধারণ এবং স্বাভাবিক ঘটনা নিয়ে 'ছায়াপথ' আরম্ভ কিন্তু যে অসাধারণ ও বিচিত্র শক্তির স্পর্শে অতি সাধারণ বস্তুও সমস্যা সাহিত্যে অপরূপ হয়ে প্রকাশ পায়, জ্যোতির্ম্ময়ী সেই শক্তিতে 'ছায়াপথ' সুন্দর করে তুলেছেন।

নরনারীর মধ্যে যুগান্তকালের যে একটা সামাজিক সমস্যা, ছোট-বড়র প্রশ্ন, স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার দ্বন্দ্ব, অধিকার ভেদ—এগুলির সাহিত্য রূপটাকে তিনি এনেছেন 'ছায়াপথে' তাই প্রচারের চেয়ে প্রকাশের মাধুর্য্যটা বড়। কলহগুলি শ্রুতিমধুর, দেনা পাওনাটা সরস, ব্যঙ্গ বিদ্রূপগুলি আরামপ্রদ। প্রেমের একটী বৃহৎ ব্যর্থতায় নারীর ভিতরে এল আত্মস্বাতন্ত্র্য বোধ—এবং এইটী 'ছায়াপথের' প্রাণ। এই স্বাতন্ত্র্য বোধ কোথাও বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, জ্ঞানে গভীর, তীব্রতায় কঠিন, বৈরাগ্যে নির্লিপ্ত, প্রেমে লাবণ্যময়। এই স্বাতন্ত্র্যের চেতনাই যে আজকের নারী আন্দোলনের প্রাণ—একথা জ্যোতির্ম্ময়ীকে তাঁর আধুনিক চিন্তাপ্রণালীর ভিতর থেকে খুঁজে বার করতে হয়েছে। আমার বিশ্বাস মেয়েদের সমাজ সম্বন্ধে তাঁর মতো ক'রে আর কেউ ভাবে না। 'ছায়াপথ' সুন্দর বই, নূতন বই, বিশিষ্ট বই, কিন্তু যে যে জায়গায় ললিতকলাকে আহত করা হয়েছে, সেখানে আমরা ক্ষুণ্ণ হবো না এইজন্য যে, আধুনিক স্ত্রীলোকের দাবী দাওয়া জানবার সেখানে অবকাশ পাওয়া যাবে।

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

কালোমেয়ে—শ্রীযতীন্দ্র নাথ বিশ্বাস প্রণীত এবং ৩৬।১ হরিঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। দাম দেড় টাকা। প্রাপ্তিস্থান ডি, এম, লাইব্রেরী।

লেখকের রচনার গতি আছে এবং চরিত্র সৃষ্টিতে উৎকটতা নাই। বইখানি উপন্যাস। সুবালা কালোমেয়ে, কিন্তু ভালবাসে। দেখিতে মন্দ না হইলেও, টাকার অভাবে দরিদ্র গৃহস্থঘরের পিতৃহীনা শ্যামা মেয়ের বিবাহ কঠিন হইয়া ওঠে। বাল্যসঙ্গী বিনোদকে সে ভালবাসিয়াছিল। কিন্তু বিনোদ তাহার স্বজাতীয় নয়। সামাজিক হিসাবে এ প্রেম ব্যর্থ হইবার কথা। এক দিকে হৃদয়ের দাবী, আর এক দিকে চিরাচরিত প্রথা। এই সমস্যার ভিতর দিয়া লেখক নায়ক নায়িকার চরিত্র সহজভাবে ফুটাইয়া তুলিতে

*"মহারাজ মনীন্দ্র চন্দ্র"—প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ... ... ২০৩।১।১, নং কর্ণয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

প্রয়াসী হইয়াছেন। হৃদয়াবেগ কিম্বা পক্ষপাতের দ্বারা প্রশ্ন জটিলতর অথবা চরিত্রবিকাশের অপেক্ষা সমস্যা গুরুতর হইয়া ওঠে নাই। লেখক আশাবাদী নহেন এবং তাঁহার চিত্ত নৈরাশ্যপূর্ণও নয়। নিয়তির মমতা নাই। মানুষ নিয়তির অধীন। সমাজ নিয়তির মত। ব্যক্তির সুখ দুঃখ আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করে, কিন্তু নিয়তির নির্ম্মম গতি অব্যাহত থাকে। এমনি মনোভাবের ভিতর দিয়া এই করুণ কাহিনী প্রবাহিত। একই বিঘ্নবিপত্তির মধ্য দিয়া নায়ক-নায়িকার চরিত্র তাহাদের প্রকৃতির বশে ভিন্ন ভাবে ফুটিয়াছে। সুবালার দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা পাঠকের প্রশংসা আকর্ষণ করে। শৈলবালার চরিত্রের পরিণতি একটু নাটকীয় হইলেও বৈচিত্র্যপূর্ণ। এই তরুণ লেখকের লেখার সংযমের মধ্যে বেশ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 'কালোমেয়ে' পাঠকের ভাল লাগিবে। কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

বোম্বের মোহঃ—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু প্রণীত। ২২।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ হইতে ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৬২ পৃষ্ঠা—দাম ১৲।

বইখানি তিনটি গল্পের সমষ্টি। তিনটি গল্পতেই মহারাষ্ট্র দেশে বাঙালী জীবনের কাহিনী বর্ণিত হ'য়েছে। গল্পগুলির পারিপার্শ্বিক ও পটভূমি স্বভাবতঃই মহারাষ্ট্র দেশীয়, কিন্তু তার উপর বাঙালী চরিত্রের যে চিত্র অঙ্কিত হ'য়েছে,—তার মধ্যে অল্প কয়েকটি কলমের আঁচড়েই বাঙালী-চরিত্রের বিশিষ্টতা উজ্জ্বল বর্ণে ফুটে উঠেছে। লেখকের দীর্ঘকালব্যাপী মহারাষ্ট্র প্রবাসের অভিজ্ঞতা না থাকলে এমনটি সম্ভবপর হোতো না।

কিন্তু এইটুকুই গল্পগুলির প্রধান গুণ নয়। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বটে যে লেখক যা' সৃষ্টি করেছেন তার প্রধান উপকরণ হ'চ্ছে, মহারাষ্ট্র দেশের প্রাকৃতিক রূপ, মহারাষ্ট্র দেশের জীবন-ধারা এবং তার মাঝখানে বাঙালী-চরিত্রের ভাব-প্রবণতা, কিন্তু এই উপকরণ দিয়ে যা' গড়ে উঠেছে তার উপকরণগুলির বিশিষ্টতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই,—তার একটা সার্ব্বজনীন আবেদন আছে। মানব-জীবনের যে সমস্ত বৃত্তি সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বকালের,—যা' প্রবহমান সৃষ্টির ধারাকে চিরনবীন, চিরসতেজ, ও চির-কমনীয় করে রেখেছে, সেই সব বৃত্তির লীলায়িত বিকাশে গল্পগুলি অপরূপ, সরস ও প্রাণস্পর্শী হ'য়ে উঠেছে। প্রাণের বেদন-ভরা দরদ দিয়ে লেখক তার সমস্ত চরিত্রগুলিকে সৃষ্টি করেছেন এবং সে সৃষ্টি সার্থক হ'য়েছে নিঃসন্দেহ।

বিশেষতঃ প্রথম গল্প "বোম্বের মোহ" বাংলার কথা-সাহিত্যে একেবারে প্রথম শ্রেণীতে আসন দাবী করে নিশ্চয়ই। এটি বাঙালী যুবক ও মহারাষ্ট্রীয় তরুণীর অপূর্ব্ব প্রেমের কাহিনী। বাঙালী যুবকের সামাজিক মজ্জাগত সংস্কারের নিষ্ঠুর বিধান থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য নিরাশ্রয়া মহারাষ্ট্রীয় তরুণী প্রথমে নিয়েছিল মিথ্যার আশ্রয়, পরে যখন একটু একটু করে মিথ্যার আবরণ ঘুচিয়ে দিয়ে তার সত্যরূপ প্রকাশ করলে, তখন, বাঙালী যুবক মনের মধ্যে দারুণ আঘাত পেয়ে প্রবাস থেকে পালিয়ে এল জন্মভূমির ক্রোড়ে। কিন্তু তার সংস্কারের বন্ধনপাশে যে বজ্র আঘাত করেছিল, তা' একটা সতেজ প্রাণ,—তার আঘাত প্রতিরোধ করা যায় না,—তার স্পর্শের শিহরণ বিস্মৃত হওয়া যায় না। ক্রমে ছিন্ন হোলো বন্ধন-পাশ, টুটে গেল অজ্ঞানের মোহ, বাঙালী যুবক আবার দেশ ছেড়ে ছুটে এলো প্রবাসে,—কিন্তু হায়,—এইখানেই জীবনের ট্র্যাজেডী,—too late! too late! যা হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও হেলায় ছেড়ে দেওয়া হ'য়েছে, তা' আর মিলবে না,—আকুলতম কামনা করলেও না। তখন দেশ-সেবায় আত্মোৎসর্গের একটা মহত্তর আদর্শের মধ্যে দুজনের হোলো দৈহিক নয়,—আধ্যাত্মিক মিলন।

অন্য গল্প দুটি "বোম্বের মোহে"র মত এত উৎকৃষ্ট না হ'লেও একজন প্রথম শ্রেণীর লেখকের পরিচয় দেয়,—তার মধ্যেও আশা-নৈরাশ্যের ঘাত-প্রতিঘাতে মানবজীবনের প্রাণময় অথচ সকরুণ চিত্র আছে। 'বিচিত্রা'র পাঠক-পাঠিকাদের নিকট লেখক অপরিচিত নয়। তিনটি গল্পই বিচিত্রায় প্রকাশিত হ'য়েছিল।

শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র

১। বাঙ্গালীর সাধারণ উৎসব

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস—আসাম বন বিভাগ

আজ ৩০শে চৈত্র, কাল নববর্ষ। এ 'নববর্ষ' শুধু বাঙ্গালীর নয়, ভারতবাসী মাত্রেরই। এই দিনে চৈত্রের 'বিচিত্রা'র 'বিতর্কিকা'য় মোহাম্মদ আজরফ্ মহাশয়ের লিখিত 'বাঙ্গালীর সাধারণ উৎসব' শীর্ষক সমস্যার কথা পড়ছিলাম, আর মনে হচ্ছিল এইত কালই বাঙ্গালীর—তথা ভারতবাসীর একটা বিশেষ দিন যেদিন হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোকে একত্রে মিলে উৎসব করতে পারে। এই দিনের উৎসবের সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নেই। নববর্ষ হিন্দুরও যেমন, মুসলমানেরও তেমনি। সুতরাং ধর্ম্মের কোন সম্পর্ক না রেখে এই দিনকে আমাদের জাতীয় উৎসবের দিনরূপে সহজেই স্থির করা যায়, এবং এই দিনের উৎসবকে জাতীয় উৎসবরূপে চিহ্নিত করা যায়। ইহাকে আমার মতে ভারতীয় জাতীয় উৎসবের দিনে নির্দ্ধারিত করতে পারলে আরো ভাল হয়। কারণ ভারতের সকল প্রদেশের সকল ধর্ম্মাবলম্বীরাই এই দিনকে 'নববর্ষ' বলে স্বীকার করে থাকেন। ভারতের এমন কোন কোন জায়গা আছে, যেখানে এখনও হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে এই দিনকে একটা বিশেষ উৎসবের দিন মনে করে থাকেন। সুতরাং এই দিনকে জাতীয় উৎসবের দিনে পরিণত করা মোটেই কঠিন হবে না। দেশের নেতাদের দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট হলে সুখী হব।

মোহাম্মদ আজরফ্ মহাশয় এর অবতারণা করেছেন—এজন্য তাঁকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

২। বাংলা ভাষার বর্ত্তমান সমস্যা

শ্রীপ্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ত্তমান বাংলা ভাষায় নানা প্রকার সমস্যার আবির্ভাব হয়েছে। তার গঠন সমস্যা, তার শব্দ গঠনে প্রাদেশিকতার সমস্যা। এ কথা অবশ্যই মানতেই হবে, যে, যখন কোন ভাষা নতুন ক'রে গড়ে উঠে তখন তার ভিতর অল্প বিস্তর সমস্যার উদয় হয়ই।

বাংলা ভাবার বয়স কত এর বিচার করুন ভাষাতত্ত্ববিদ। তবে এ ধরে নেওয়া যায় যে, বাংলাভাষা এখন যৌবনে এসেছে। যৌবনের ধর্ম্মই হচ্ছে উচ্ছৃঙ্খলতা। কিন্তু তাই ব'লে তার যে, কোন বিশেষ নিয়ম কানুন থাকবে না এও তো ঠিক নয়। উচ্ছৃঙ্খলতার ভিতর দিয়ে ব্যভিচার এলে লোকের দৃষ্টি পড়ে তার উপর। বাংলা ভাষার ও সেইরূপ অবস্থা হয়েছে।

বাংলা ভাষার জন্ম যবেই হ'ক না কেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় তার সংস্কার সাধন করলেন—তাকে দ্বিজত্ব দান করলেন। তৎপূর্ব্বে ভাষা ছিল সংস্কৃতানুসারিণী। তার পর বঙ্কিমচন্দ্র তাকে পালন করে যৌবনে এনে পৌঁছে দিলেন। সেই থেকে নানা জনে নানা মতে তাকে লালনপালন করলেন। তার যৌবনশ্রী যখন সবে মাত্র বিকশিত হয়ে

উঠেছে এমনি সময় তার উপর পড়ল দীপ্ত রবির রশ্মি ও সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণ। এই দুইয়ের মিলনে বাংলা ভাষা অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠল।

কিন্তু এ সত্ত্বেও এসে জুটল অনেক সমস্যা। বাংলা সাহিত্য লেখ্য ভাষায় লেখা হবে, না কথ্য ভাষায় লেখা হবে। একদল বললেন, লেখ্য ভাষায় না লিখলে ভাষার গুরুত্ব থাকে না, তা হয় ছেলেখেলার মত। আর একদল বললেন, কেন তাই বা হবে কেন, কথ্য ভাষায় লেখার তো কোন হাঙ্গামা নেই, তাতে ভাষার গুরুত্বই বা লোপ পাবে কেন। কথ্য ভাষায় লেখা মানে শুধু ক্রিয়াপদগুলির পরিবর্ত্তন বই তো আর কিছু নয়। ভিতরে তো সমস্ত শব্দই প্রয়োগ করা চলবে। কথ্য ভাষার লেখার পথ প্রদর্শক হলেন "বীরবল" ও "রবীন্দ্রনাথ''। এঁরা তো বললেন যে, শুধু ক্রিয়া পদকে কথ্য ভাষায় রূপান্তরিত করলেই চল্‌তি ভাষা হলো। কিন্তু সেখানেও সমস্যা। একই ক্রিয়া পদ বিভিন্ন রূপ ধরলে। "পড়িল'' হ'ল "পড়লো", "পড়্‌ল''। 'করে' কেউ লিখলেন কোরে, ক'রে। তখন সমস্যা হলো ক্রিয়াপদকে এমন একটি রূপ দিতে হবে যাতে তার সেই রূপ সার্ব্বজনীন হয়। তারপর যাঁরা পথ-প্রদর্শক হলেন তাঁরাও যে একটু আধটু গোলযোগ করেন না এমন কথাও বলা চলে না। রবীন্দ্রনাথ কোথাও লেখেন 'হ'ক', কোথাও লেখেন 'হোক'। এই সমস্যা সাধনের ভার নিয়েছেন সুধীজন, এ আনন্দের বিষয় নিশ্চয়।

তারপর এর বানান সমস্যাও কম নয়। পূর্ব্বেই বলেছি যে, ক্রিয়াপদকে চল্‌তি করতে গিয়ে এলো এর বানান সমস্যা, কেউ বললেন, বানান হবে শব্দগত। কেউ বললেন, না, তা'হলে বিভ্রাট হবে অনেক। শব্দগত বানান যাঁরা লিখলেন, তাঁরা ''দেখে" কে করলেন দ্যাখে দেখে ইত্যাদি। সেখানেও হ'লো সমস্যা। নানাজনে নানা বানান নিজের খেয়াল অনুযায়ী লিখতে লাগলেন। এর মিমাংসাও সুধীজন করলে ভাল হয়।

এই সবের ফাঁকে আর এক সমস্যা মাথা তুললে—সেটা হ'লো প্রাদেশিকতা। এখন ভাষার মধ্যে অনেকেই নিজের নিজের প্রদেশের কথা চালাতে চেষ্টা করছেন। এতে ভাষা জগাখিঁচুড়ি পাকিয়ে যাচ্ছে। পূর্ব্ববঙ্গের লেখক চাইছেন তাঁর নিজের দেশের ভাষা চালাতে, মেদিনীপুরের লেখক তাঁর নিজস্ব ভাষা। তেমনি বাঁকুড়া বীরভূমের লেখকও চান তাঁর নিজস্ব ভাষা চালাতে। তা'হলে বাংলা সাহিত্যের যে কী অবস্থা হবে তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু তা তো উচিৎ নয়। ভাষা এমন হওয়া উচিৎ যে, তা হবে সর্ব্ববোদ্ধ। আমরা দেখতে পাই গঙ্গার তীরবর্ত্তী হাওড়া, হুগলী, নদীয়া প্রদেশের ভাষাই বাংলা সাহিত্যের ভাষা হয়েছে চিরকাল। সেটা হয়েছে এই জন্যে যে, এই গঙ্গাতীরবর্ত্তী প্রদেশেই শিক্ষা ও সমাজের গঠন হয়েছে বরাবর। আজও সে ধারার বদল হয়নি। তারপর বর্ত্তমান যুগে যখন কলিকাতা বাংলার রাজধানী হলো তখনও এইখানেই শিক্ষার ও ভাষার গঠন চলতে লাগল। তাই বলে কিন্তু কলকাতার নিজস্ব ভাষাও সাহিত্যের ভাষা হবে না। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র অনেক সময় কলকাতার ভাষা ব্যবহার করেন। সাহিত্যের ভাষা হবে তাই, যা সকল বাংলা ভাষাভাষীর মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে চলবে। এর মধ্যে বিশেষ কোন প্রাদেশিকতা থাকবে না। এই প্রাদেশিকতার হাত হ'তে বাংলা ভাষাকে রক্ষা করবার জন্যে বিশেষ আলোচনা হওয়া আবশ্যক মনে করি। বাংলা ভাষাকে বিশেষ রূপ দান করতে বিশিষ্ট সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করা সকলের দরকার।

৩। সাহিত্যে প্রাদেশিকতা

শ্রীরাধানাথ চৌধুরী বি, এ,

গত মাসের বিচিত্রায় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় বর্ত্তমান বাঙ্‌লা সাহিত্যে প্রাদেশিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। বাস্তবিক আজকাল সাহিত্যে এই প্রাদেশিক ভাষা ব্যবহার করা যেন একটা নূতন কায়দা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ জিনিষের প্রসার লাভ যত কম করে ততই মঙ্গল। সাহিত্যে এই প্রাদেশিক ভাষা ব্যবহারের ফলে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের মাতৃভাষা খণ্ডিত হতে পারে। বর্ত্তমান পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের কথ্য ভাষার মধ্যে প্রভেদ অনেক। আর ভাষা মাত্রেই সময়ের সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হয় এবং এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেই পণ্ডিতগণ ভাষাকে বহতা নদীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাই, যদি সাহিত্যে এই দুই ভাষার প্রয়োগ হয় তবে ভাষার ক্রমপরিবর্ত্তনের ফলে ভবিষ্যতে পূর্ব্ববঙ্গের কথ্য ভাষা ও পশ্চিমবঙ্গের কথ্য ভাষা দুটি বিভিন্ন ভাষায় পরিণত হবে। এই জন্যই আর প্রাদেশিক ভাষা ব্যবহার না করে উভয়ের উপযোগী একটি standard ভাষা ব্যবহার করা উচিৎ। নিধুবাবু লিখেছিলেন যে, "নানান্ দেশের নানান্ ভাষা, বিনে বাংলা ভাষা মেটে না আশা"। আজকাল আমাদের সাহিত্যে বহুরূপী বাঙ্‌লা

ভাষার প্রয়োগ দেখে কোনটাকে বাদ দিয়ে কোনটিকে নিয়ে যে আশা মেটাব সেইটেই সমস্যা হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গ ক্রমে রাজকৃষ্ণবাবু জেলা ভেদে বাঙ্‌লা ভাষার বিভিন্ন রূপের তালিকা দিয়েছেন কিন্তু তার শেষ সেইখানেই নয়। এক জেলার ভাষার মধ্যেও আবার বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। উদাহরণ রূপে আমি মুর্শিদাবাদের কথ্য ভাষার নমুনা দিলাম। পূর্ব্বাঞ্চলের কথ্য ভাষা ভাগীরথী তীরবর্ত্তী সকল ভদ্র ভাষার ন্যায়, কিন্তু সাধারণতঃ 'র' এর উচ্চারণ ঠিক হয় না। যেমন রাম বাবুর বাগানে যে আম আছে তা যেমন রসাল আর তেমনি অম্বল যায়গায় হবে 'আম বাবুর বাগানে যে রাম আছে তা যেমন অসাল আর তেমনি রম্বল'। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলের কথা মোটেই সহজ বোধগম্য নয়। নীচে একটা ঐ ভাষায় লিখিত কবিতার একটু অংশ উদ্ধৃত করছি—

"পহিলকার খেল শ্যাষ হোছেনা ডুব্যা গ্যালো চিক্যাস,
হ্যান্ সমাতে দেখ্‌লে শালিশ ঘঁড়ীর দফা লিক্যাস।
টিক্ টিক্ করেনা উটা, ধাৎ গেল্‌ছে ডুব্যা,
ঘঁড়ী বলে ব্যাচেহে অরা খালি চুণের ডিব্যা।"

অর্থাৎ প্রথমকার খেলা (first half) শেষ হলো না কিন্তু সূর্য্য অস্ত গেল। এমন সময় রেফারী (শালিস) দেখ্‌ল যে ঘড়ীর দফা শেষ। ওটা আর টিক্ টিক্ করে না, ধমনী ডুবে গিয়েছে। তখন ঘড়ীর জন্যে ওরা চুণের ডিবে বিক্রী করতে লাগল।

এ রকম বিভিন্নতা প্রতি জেলার কথ্য ভাষার মধ্যেই পরিলক্ষিত হবে কিন্তু এই সব দুর্বোধ্য কথ্য ভাষাকে সাহিত্যের আসরে প্রতিষ্ঠিত করা অর্থে সাহিত্যের মুণ্ডপাত ছাড়া আর কিছুই নয়। এই জন্যই আজ বাঙলা ভাষার একটি standard language-এর প্রয়োজন খুব বেশী। এখন কোন্ ভাষাটি সাহিত্যের পোষাকী ভাষা রূপে ব্যবহৃত হবে সেইটাই প্রশ্ন। রাজকৃষ্ণবাবুর মতে কলিকাতা রাজধানী হিসাবে তার কথ্য ভাষাই আমাদের সাহিত্যের পোষাকী ভাষার কাজ করাই উচিৎ। কিন্তু আমি এ বিষয়ে একমত হতে সম্পূর্ণ অক্ষম। কোলকাতার কথ্য ভাষার মধ্যে শব্দগত অনেক দোষ দেখা যায়, যেমন দুপুরকে দুকুর বলা, আমকে আঁব বলা, পাটকাঠিকে প্যাকাটি বলা ইত্যাদি। আমার মতে শুধু কোলকাতার নয়, কোন যায়গারই কথ্য ভাষা সাহিত্যের ভাষারূপে ব্যবহার হওয়া উচিত নয়। কোন জিনিষের ভাব ভাষায় প্রকাশ করলেই সাহিত্য হয় না। সেই প্রকাশভঙ্গী সুন্দর হওয়া দরকার। এই প্রকাশভঙ্গীকে সুন্দর করতে গেলেই শব্দ বিন্যাসের প্রয়োজন সর্ব্বপ্রথম। এই শব্দ বিন্যাসের দ্বারাই কাব্যের মাধুর্য্য বা গাম্ভীর্য্য সব প্রকাশ পায়। তাই সাহিত্যে কোন কথ্য ভাষার পরিবর্ত্তে যদি সংস্কৃতজ শব্দ বহুল বাঙ্‌লা ভাষা ব্যবহার করা যায় তবে বোধ হয় সব দিক দিয়ে সুন্দর হতে পারে। সংস্কৃতের কাছে বাঙ্‌লা ভাষার ঋণ এখনও অনেক—তাই তাকে একেবারে উপেক্ষা করা যায় না। অবশ্য ভাষাকে আধুনিক কালোপযোগী করার জন্য সংস্কৃতজ শব্দ ব্যবহার করা সত্ত্বেও ক্রিয়াপদ ছোট করা দরকার। যেমন 'গিয়াছিল'র যায়গায় গিয়েছিল, 'খাইলাম'এর যায়গায় খেলুম ইত্যাদির ব্যবহার থাকা প্রয়োজন। এ সবের ব্যবহারের ফলে কথ্য ভাষা ব্যবহার না করেও যে ভাষা আধুনিক কলোপযোগী হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

৩ক। সাহিত্যে প্রাদেশিকতা

শ্রীজিতেন্দ্রমোহন চৌধুরী

গত বৈশাখ মাসের 'বিচিত্রা'র "সাহিত্যে প্রাদেশিকতা" শীর্ষক আলোচনায় শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীহট্টের কথ্য ভাষার যে নমুনা দিয়াছেন তাহা অনেকাংশে তাঁহার স্বকপোল-কল্পিত। শ্রীহট্টে 'গান'কে গাওনা এবং 'ভাই'কে বাই বলে, একথা সত্য নহে। শ্রীহট্টের তথা-কথিত নিম্ন শ্রেণীর লোকও 'গান' এবং 'ভাই' শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। 'চাকঃরে' কথাটি শ্রীহট্টের না হইলেও বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কলমের এক খোঁচায় শ্রীহট্টের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছেন। এইরূপ 'জিঘাইল', 'কহিল্', 'তাহারে', 'দিছল','পাইছন' ইত্যাদি কথাও বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একান্ত নিজস্ব।

কতকগুলি কল্পিত শব্দ প্রয়োগ করিয়া কোন স্থানের ভাষার নমুনা দেওয়া উচিত কি না বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিজেই তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।
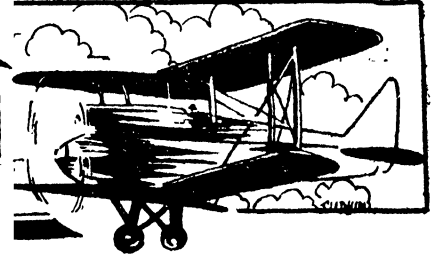
পঁচিশে বৈশাখ

পঁচিশে বৈশাখ বাঙলা দেশের একটি মহা শুভদিন। চুয়াত্তর বৎসর পূর্ব্বে ঐ দিনে যে ক্ষণজন্মা শিশু রবীন্দ্রের জন্ম হয় তিনি আজ বাঙালা দেশের শ্রেষ্ঠ মানব, বিশ্ব-জগতে বাঙলা দেশের পরিচয়। গত পঁচিশে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ চুয়াত্তর বৎসর পূর্ণ ক'রে পঁচাত্তরে পদার্পণ করেছেন। আমাদের অন্তরের ঐকান্তিক কামনা বাঙলা দেশের এই গৌরব-রবির দ্বারা বাঙলা দেশ এখনো যেন বহু বর্ষ ধ'রে সমুজ্জ্বল হ'য়ে থাকে। গত জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথ শান্তি-নিকেতনে তাঁর শ্যামলী নামক মৃত্তিকা-গৃহে প্রবেশ করেন।

বাঙালী বৈমানিকের অপমৃত্যু

গত ২৮শে এপ্রিল দমদমা বিমানখানার নিকটবর্ত্তী গৌরীপুর গ্রামের সন্নিকটে দেবকুমার রায় ও বিনয়কুমার দাস চালিত দুইখানি বিমানের সংঘর্ষের ফলে উক্ত দুই জন বিমান চালকের এবং দুইটি বিমানে দুইজন আরোহীর মৃত্যু ঘটে। এই দুইটি সাহসী বৈমানিকের শোচনীয় মৃত্যু সমস্ত বাঙালী জাতির পক্ষে একটি নিদারুণ দুর্ঘটনা। সাহস এবং পরাক্রমের পথে বাঙালীর সংখ্যা অন্যান্য জাতির তুলনায় অনেক কম। এর জন্য অবশ্য কেবল মাত্র বাঙালীর অনুন্নত দেহ এবং স্বাস্থ্যই দায়ী নয়, অন্যান্য কারণও আছে। সুতরাং এই দুইজন বাঙালী বৈমানিকের মৃত্যু বাঙালীর জাতীয় দুর্ঘটনা ব'লে কতকটা পরিগণিত হয়েছে। এর দ্বারা অবশ্য অপর বাঙালী বৈমানিকগণ অথবা তাঁদের অভিভাবকগণ নিশ্চয়ই ভীত কিম্বা নিরুৎসাহিত হবেন না, কারণ দুর্ঘটনা দুর্ঘটনার চেয়ে বেশি আর-কিছুই নয়, সকল সময়ে সকল ক্ষেত্রেই তা' ঘটে থাকে। তবে শিক্ষা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার সংখ্যা ক্রমশঃ ক'মে আসে।

পরলোকগত ঋষিবর মুখোপাধ্যায়

সম্প্রতি ৮৩ বৎসর বয়সে কাশ্মীরের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি ঋষিবর মুখোপাধ্যায় মহাশয় পরলোকগমন করেছেন। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে তিনি অনেক টাকা দান ক'রে গেছেন। প্রধানত তাঁর দানের ক্ষেত্র ছিল বাঁকুড়া।

প্রবাসী বাঙ্গালী ছাত্রের কৃতিত্ব

এ বৎসরে ভারতবর্ষের ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং মনোনীত ছাত্রদের মধ্যে দুইজন বাঙালী। তন্মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন শ্রীমান শিশিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃতীয় স্থান শ্রীমান ব্রহ্মদেব মুখোপাধ্যায়।

শ্রীশিশিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯২৭ সালের পর সুদীর্ঘ সাত বছরের মধ্যে আর কোনো বাঙালী ছাত্র সিবিল সার্ভিস পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করবার গৌরব লাভ করেন নি। শ্রীমান শিশিরকুমার এই গৌরবের অধিকারী হওয়ায় আমরা বিশেষ আনন্দিত হয়েছি। তিনি দেরাদুন ডি এ ভি কলেজের ভাইস্‌প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত অনন্তদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র। অনন্তবাবুর দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ বৎসরে গভর্মেণ্টের ফিনান্স্‌ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে তিনিই একমাত্র বাঙালী। শ্রীযুক্ত অনন্ত দাস বাবু সত্যই সুপুত্র গৌরবে গৌরবান্বিত বোধ করতে পারেন। আশীর্ব্বাদ করি শ্রীমানেরা দীর্ঘজীবী হোন।

উল্লিখিত তিনটি ছাত্রই এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

ওরিয়েণ্টাল গভর্মেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ অ্যাসিওরেন্স কোং

এই কোম্পানীর ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৩৪ সালান্ত বর্ষের বার্ষিক বিবরণী পাঠ ক'রে কোম্পানীর সর্ব্বতোমুখী উন্নতি লক্ষ্য ক'রে আমরা সুখী হয়েছি। এই বৎসরের নূতন কারবারের তায়দাদ ৪২,৩৭৮ খানি পলিসিতে ৭৬২ লক্ষ টাকার উর্দ্ধ। এই তায়দাদ গত পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৪,১৮৭ খানি পলিসি ও ৫৮ লক্ষ টাকার বেশি।

বৎসরের মোট আয় হয়েছিল ৩১৪ লক্ষ টাকা, তন্মধ্যে প্রিমিয়ম বাবৎ আয় প্রায় ২৪০ লক্ষ টাকা। কোম্পানীর বাৎসরিক ব্যয় হয়েছিল ১৯০ লক্ষ টাকা। সুতরাং ব্যয় অপেক্ষা আয় প্রায় ১২৪ লক্ষ টাকা অধিক।

কোম্পানীর উপস্থিত মোট ধনভাণ্ডার সাড়ে পনের কোটি টাকারও অধিক। কোম্পানীর মূলধন গভর্মেণ্ট সিকিউরিটি এবং মিউনিসিপ্যাল ও পোর্টট্রষ্ট ডিবেঞ্চারে খাটানো আছে। ঐ সিকিউরিটি ও ডিবেঞ্চারগুলির লিখিত মূল্যের চেয়ে বাজারদর ৪৩৯ লক্ষ টাকা অধিক। এতদ্ব্যতীত কোম্পানীর ২৫ লক্ষ টাকার রক্ষিত ভাণ্ডার আছে।

কোম্পানীর চেয়ারম্যান স্যর পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস সি-আই-ই মহাশয়ের অভিভাষণ থেকে বীমা বিষয়ে নূতন আইন গঠন সম্বন্ধে গভর্মেণ্টের সঙ্কল্প বিষয়ে নিম্নোদ্ধৃত অভিমতটুকু সকলের পক্ষে বিশেষতঃ বীমাকোম্পানীগুলির পরিচালকগণের পক্ষে বিশেষ প্রণিধান যোগ্য।

Everyone interested in Insurance in India will be glad to learn that Government have now decided to take up the question of Insurance Legislation, which is long overdue, in earnest, and Insurance interests have been called upon to submit their views in this connection, but I would urge that in addition to this a Committee of Enquiry should be appointed without delay, and that the widest opportunity should be given to all those well-versed and interested in the practice of Life Assurance, and Insurance generally, in this country to submit their views and to give evidence, if called upon to do so, before such Committee. It is essentially necessary at this time that no mistakes should be made in the form of Legislation required to control the practice of Insurance in this country, and in my opinion the possibility of mistakes being made can only be avoided if the views submitted and the evidence taken on the subject are carefully sifted and considered by a Committee of Enquiry representative of all the interests concerned, the report of which should form the basis of the proposed Insurance Legislation.

মালতীকুসুম তৈল

এস, কে, গুপ্তের মালতীকুসুম তৈলের এক শিশি নমুনা পেয়ে ব্যবহার ক'রে আমরা সুখী হয়েছি। তেলটির গন্ধ মনোরম এবং স্নানের পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থেকে মনকে প্রফুল্ল রাখে।

Edited by Upendranath Ganguly, Printed by Saratchandra Mukherjee at The Sreekrishna Printing Works 259 Upper Chitpore Road. and published by the same from 27/1, Fariapooker Street, Calcutta.

প্রথম শিক্ষা

অষ্টম বর্ষ, ১য় খণ্ড | আষাঢ়, ১৩৪২ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

নিমন্ত্রণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সংসার-কাজে ছুটি কিছু আছে হাতে
সেই ভরসায় ডাক দিনু এইখানে।
ইচ্ছাশক্তি যন্ত্রশক্তি সাথে
মিশ্রিত কোরো রেলে বা মোটর যানে।
আলাপ জমাব নিয়ে বহু বাজে কথা,
কাব্যগ্রন্থ অখোলা রহিবে কোলে ;
গান চাও যদি গ্রামোফোনে শোনাব তা',
মাথা নেড়ে শুনো আমার রচনা হোলে।
আরেকটা কথা বলে রাখি, জেনো তাবে
ইম্পর্টান্ট্ নিশ্চয় যায় বলা ;
তবু কহি, শুধু অভ্যাস অনুসারে
সঙ্কোচবশে কিছু নীচু করে গলা।
একালে চলে না সোনার প্রদীপ আনা,
সোনার বীণাও নহে আয়ত্তগত :
বেতের ডালায় রেশমী রুমাল টানা
অরুণবরণ আম এনো গোটাকত।
গন্ধজাতীয় ভোজ্যও কিছু দিয়ো,
পদ্যে তাদের মিল খুঁজে পাওয়া দায়।
তা হোক্, তবুও লেখকের তারা প্রিয়,
জেনো, বাসনার সেরা বাসা রসনায়।

ঐ দেখো, ওটা আধুনিকতার ভূত
মুখেতে জোগায় স্থূলতার জয়ভাষা,
জানি, অমরার পথহারা কোনো দূত
জঠরগুহায় নাহি করে যাওয়া-আসা।
তথাপি পষ্ট বলিতে নাহি তো দোষ
যে কথা কবির গভীর মনের কথা—
উদর-বিভাগে দৈহিক পরিতোষ
সঙ্গী জোটায় মানসিক মধুরতা।
শোভন হাতের সন্দেশ পানতোয়া,
মাছমাংসের পোলাও ইত্যাদিও
যবে দেখা দেয় সেবা-মাধুর্য্যে ছোঁওয়া
তখন সে হয় কী অনির্ব্বচনীয়।
ময়ান-মাখানো দু'হাতে ময়দা ঠাসা,
তরকারী রাঁধা সিদ্ধ ক'রে বা ভেজে,
আয়োজনে তার ভালোবাসা পায় ভাষা
ভোজনবেলায় স্পর্শ-অতীত সে যে।
বুঝি অনুমানে, চোখে কৌতুক ঝলে,
ভাবিছ বসিয়া সহাস-ওষ্ঠাধরা
এ সমস্তই কবিতার কৌশলে
মৃদুসঙ্কেতে মোটা ফরমাস করা।
আচ্ছা, না হয় ইঙ্গিত শুনে হেসো,
বরদানে, দেবি, না হয় হইবে বাম,
খালি হাতে যদি আসো, তবে তাই এসো,
সে দুটি হাতেরও কিছু কম নহে দাম॥

চন্দননগর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৫ই জুন ১৯৩৫

সাহিত্য কথা

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

আপনাদের শান্তিপুর সাহিত্য সম্মেলনে আমাকে সাহিত্য শাখার সভাপতির পদ গ্রহণ করতে আপনারা অনুগ্রহ করে আহ্বান করেছেন! তদ্বিষয়ে আমার অযোগ্যতার উল্লেখ ক'রে প্রচলিত বিনয় প্রকাশ করতেও আমি কুণ্ঠা বোধ করছি। বিনয় প্রকাশের জন্যও একটা অধিকার থাকা চাই। পশ্চাতে শক্তি ও সামর্থ্যের পৃষ্ঠপোষকতা না থাকলে বিনয় প্রকাশ কতকটা অবিনয়েরই মতো একটা বিসদৃশ বস্তু হ'য়ে দাঁড়ায়। সুতরাং শিষ্টাচার প্রকাশের সেই বিপদসঙ্কুল রীতি পরিত্যাগ ক'রে আপনারা আমার প্রতি যে সম্মান এবং সহৃদয়তা প্রদর্শন করেছেন তজ্জন্য আমি আমার অন্তরের ঐকান্তিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। দাবীর অতিরিক্ত দান লাভ করলে নির্ভয়ে যা প্রকাশ করা যায় তা' কৃতজ্ঞতা।

বহু দীর্ঘকাল হ'তে শান্তিপুর বাঙলা দেশের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে এসেছে। অদ্বৈত প্রভুর জন্মভূমি এই প্রাচীন নগরী সামান্য নয়,—এর ইতিহাস ঐতিহ্য, এর সংস্কার সংস্কৃতি, এর ধর্ম্মানুবর্ত্তিতা, এর পাল-পর্ব্ব উৎসব-অনুষ্ঠান মন্দির-মঠ, এর ব্যবসা-বাণিজ্য, এর বংশপরম্পরাগত বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর বৈদগ্ধ্য এ'কে এমন একটি গৌরব এবং আভিজাত্য প্রদান করেছে যা সত্যই শ্লাঘার বস্তু। এই অনুকূল আবহাওয়ার মধ্যে এখানে সাহিত্য এবং সাহিত্য-চেতনা কি পরিমাণে সৃষ্টি লাভ করেছে তা আমি ঠিক বল্‌তে পারি নে, কিন্তু এ কথা অসংশয়ে বল্‌তে পারি যে আপনাদের এখানকার ভূমি উর্ব্বর, এবং সেই ভূমির উপরিস্থিত আকাশ রৌদ্র-বৃষ্টি-বায়ুর প্রসাদে এবং দাক্ষিণ্যে বীর্য্যবন্ত; সুতরাং এখানকার সাহিত্য-ক্ষেত্রের মধ্যে বৃহত্তম মহীরুহের অঙ্কুরোদ্গমের সম্ভাবনা বর্ত্তমান। কোনো দিন যদি শুনি যে এখানে নূতন-এক রবীন্দ্রনাথের অথবা নূতন-এক শরৎচন্দ্রের সূচনা দেখা গিয়েছে, তা হ'লে নিশ্চয়ই বিস্মিত হব না।

স্মরণাতীত কাল থেকে আরম্ভ ক'রে এ পর্য্যন্ত সাধারণ ধর্ম্মবিশ্বাস এবং নীতিবোধকে অবলম্বন ক'রে অভ্রভেদী যে বিরাট সমাজ-সৌধ গড়ে উঠেছে বিপুল আলোড়নের প্রকোপে তা ভূমিশায়ী হবার উপক্রম করেছে। যুগ-দেবতা তাঁর রথের চাকা সংস্কারের পাকা সড়কে নিবদ্ধ না রেখে দক্ষিণে বামে দুই হাতি বিধি-বিধান আচার-অনুষ্ঠানের ঘরগুলি ভাঙতে ভাঙতে চলেছেন। অতীত তার মহিমার অবলেপ হারিয়েছে, আপ্তবাক্যে আমাদের প্রত্যয় নেই, শাস্ত্রাচারকে আমরা অত্যাচার ব'লে গণ্য করছি। শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর সর্ব্বত্র মানুষের মনে দুর্নিবার সংশয় জাগ্রত হয়েছে যে, প্রচলিত ধর্ম্ম ও নীতির বহুবিধ অনুশাসনের তাড়নায় আদিম মানব যেখানে উপনীত হয়েছে সেখানে হয়ত তার মঙ্গল নেই; তার দেহ ও মনের নির্ব্বিকল্প শক্তিকে বিধি-নিষেধের অনুশাসনে বেঁধে বেঁধে সংযম নামে যে বস্তু সে অর্জ্জন করেছে হয়ত প্রকৃতপক্ষে তা ক্লীবত্ব ভিন্ন অপর কিছুই নয়, সুতরাং সর্ব্বপ্রকার সংস্কারের নাগপাশ ছিন্ন ক'রে মানুষের পশুশক্তি এবং পশুমনকে উদ্ধার করতে হবে, নতুবা এই সভ্যতা এই সংস্কৃতি তাকে অপদার্থতার চরম অবস্থায় পৌঁছে না দিয়ে ছাড়বে না। যুগবিপ্লবের এই সঙ্কটকালে একমাত্র যে ধর্ম্মমত ক্রিয়াশীল হ'য়ে ধ্বংসলীলার উদ্দাম গতিকে সংযত করতে পারে তা বৈষ্ণব ধর্ম্ম, এবং আমার মনে হয় বৈষ্ণবতাই বাঙালী চিত্তের আন্তরিক ধর্ম্ম-প্রসক্তি, ধর্ম্ম-লক্ষণ। এমন কোন মতবাদ, আদর্শবাদ, এমন কি, বিপ্লববাদও নেই যা বৈষ্ণবতার উদার এবং বিস্তীর্ণ আধিপত্য অতিক্রম ক'রে যেতে পারে, যা তার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান ক'রে আশ্রয় লাভ করতে না পারে। আকাশে আলো এবং বায়ুর

মতো, আপনাদের শান্তিপুরে সেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাব পরিব্যাপ্ত। সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রে চৈতন্যদেব এই শান্তিপুরেই অদ্বৈত প্রভুর নিকট ছুটে এসেছিলেন। শচীদেবী এবং অন্যান্য ভক্তবৃন্দের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এখান থেকেই তিনি নীলাচল গমন করেন। এই সকল ঘটনা এই সকল কাহিনী মূল্যবান সম্পদের ন্যায় উত্তরাধিকার সূত্রে আপনারা ভোগ করছেন। সাহিত্য-শক্তির সৃষ্টি এবং বিকাশের জন্য এ সকলের প্রভাব অসামান্য ব'লে আমার মনে হয়। সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য সাহিত্যিকের নিজ প্রদেশের ভৌগোলিক আবেষ্টন এবং ঐতিহাসিক ধারা উপেক্ষার বস্তু নয়। সাহিত্য তার জন্মভূমির মৃত্তিকা হ'তে রস শোষণ ক'রে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে।

এইখানে পরোক্ষভাবে সাহিত্যে প্রাদেশিকতা ও বিশ্বলোকত্বের তর্ক এসে পড়ছে। অর্থাৎ, প্রত্যেক প্রদেশের সাহিত্য নিজ নিজ দেশের বিশেষত্বের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়ে তৎ-তৎ দেশের শিল মোহরের সুস্পষ্ট ছাপ বহন করবে, না, তার আবেদন এমন হবে যে দেশ এবং পাত্র নির্ব্বিশেষে সকল চিত্তে একই ভাবে এবং একই পরিমাণে রস বিতরণ করতে সমর্থ হবে। আমার মনে হয় এ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর, এই ধরণের অনেক উত্তরেরই মতো, উভয় তর্কের মধ্যস্থলে অবস্থান করছে। অর্থাৎ, সাহিত্য তার জন্মভূমির বিশেষত্ব হ'তে বর্জ্জিতও হবে না, অথচ সার্ব্বভৌমিক আবেদনও তার মধ্যে যথেষ্ট পাওয়া যাবে। এর প্রমাণস্বরূপ একথা বলা যেতে পারে যে, বিদেশীয় যে সকল রচনা পাঠ ক'রে আমরা প্রচুর রসোপভোগ করি তার মধ্যে প্রাদেশিকতার অভাব নেই।

যে সকল অনুভূতির দ্বারা আমাদের চিত্ত সাধারণত স্পন্দিত হয়, কাব্যশাস্ত্র সে গুলিকে মোটামুটি নয়টি বিভাগে বিভক্ত করে নব রস আখ্যা দিয়েছে। এই নয়টি রসের আবেদন ভারতীয় চিত্তের উপর যেরূপ, ক্যামাস্‌ক্যাট্‌কার অধিবাসীগণের উপরও মোটামুটি সেইরূপ, অর্থাৎ এই নয়টি রসের আবেদন সার্ব্বভৌমিক। সুতরাং সকল দেশের সাহিত্য-সৃষ্টিরই যখন অল্পাধিক এই নয়টি রস নিয়ে কারবার, তখন সাহিত্যের আবেদন সাধারণত সার্ব্বভৌমিক হতে বাধ্য। কিন্তু প্রত্যেক দেশের প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য এই রসগুলির মধ্যে এমন একটু ভঙ্গির বিভিন্নতা উৎপাদন করে যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমরা যেন একটি নূতন রসের আস্বাদ লাভ করি। দয়িতের প্রতি প্রেমিকার আত্মোৎসর্গ সর্ব্বদেশেই প্রচলিত আছে, কিন্তু তাই ব'লে কোনো লণ্ডনবাসিনী ইংরাজনন্দিনী তার প্রেমাস্পদকে সহজে বলে না,—আমার পরাণে তোমার চরণে লাগিল প্রেমের ফাঁসি।

সব সমর্পিয়া প্রাণ মন দিয়া নিশ্চয় হৈনু দাসী।

আত্মসমর্পণের এই বিশেষ অভিব্যক্তি শুধু ভারতীয় চিত্তেই সম্ভব। পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা যদি এই মনোভাবের রস গ্রহণ করতে অসমর্থ হয় তা হ'লে অপরাধ তাদেরই, ভারতীয় অভিব্যক্তির নয়।

এ কথা অবশ্য অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এবং জাতির মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান রাষ্ট্রিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক সংস্থাপনের জন্য এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র গমনাগমনের উত্তরোত্তর সুযোগ ও কারণ বৃদ্ধির হেতু দেশের সহিত দেশের এবং জাতির সহিত জাতির অনৈক্যের মাত্রা ক্রমশঃ হ্রাস পেয়ে আসছে, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সুর ক্রমশঃ এক সুরে গিয়ে ভেড়বার উপক্রম করছে; কিন্তু সুদূর ভবিষ্যতে কোনো দিন যদি সত্যই সমস্ত সুর এক সুরে গিয়ে মেশে, সে দিন জগতের পক্ষে সুদিন হবে না দুর্দ্দিন হবে আজ তা ঠিক ক'রে বলা কঠিন। কলিকাতার রাজপথে চল্‌তে চল্‌তে বিভিন্ন দোকানের সম্মুখে রেডিয়োর এক সুরে একই গান শুন্‌তে শুন্‌তে মনে যে ভাবের উদ্রেক হয়, কলম্বো হ'তে ক্যালিফোর্নিয়া এবং ক্যালিফোর্ণিয়া হ'তে মস্‌কো গিয়ে চিন্তার একই অভিন্ন অভিব্যক্তি শুনে শুনে মনে যদি সেই রকম ভাবেরই উদ্রেক হয় তা হ'লে রসোপভোগের দিক দিয়ে সে দিন সুদিন হবে না বলেই আশঙ্কা করা যেতে পারে।

এ থেকে কেউ যেন এমন কথা মনে না করেন যে, আমি বিশ্বলোকত্বের বিরুদ্ধে প্রাদেশিকতার সপক্ষে ওকালতি করছি; যদি কোনো পক্ষের হ'য়ে সে কার্য্য করে থাকি ত বৈচিত্র্যের পক্ষেই করেছি। কূপমণ্ডুকত্বের অর্থে আমি প্রাদেশিকতা শব্দ ব্যবহার করিনি। পূর্ব্বতন কালের সে ভৌগোলিক সঙ্কীর্ণতার যুগ এখন গত হয়েছে এখন আমাদের সমস্ত বিশ্বলোকের সঙ্গে

মৈত্রী, কুটুম্বিতা; সুতরাং আমাদের চিত্তের প্রসারকে নিজ প্রদেশের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখ্‌লে আমরা নিজেরাই নিজেদের বঞ্চিত করব, বিশ্বকুটুম্বিতার লৌকিকতার আদান প্রদানে যোগ দিতে সমর্থ হব না। আমি বল্‌তে চাই, সেই লৌকিকতার কর্ত্তব্য পালনে আমরা যদি অপর দেশে আমাদের দেশের রস-সম্ভারের উপঢৌকন পাঠাই, তার মধ্যে যেন আমাদের দেশের বিশেষ একটু সৌরভ বিশেষ একটু সুষমা থাকে। শান্তিপুরের নিখুঁতি কিম্বা খাসা মোয়া লিভারপুলে গিয়ে যেন সেখানকার কেকের চেয়ে কিছু নূতন আস্বাদ দিতে সমর্থ হয়। সুতরাং আমার মতে প্রাদেশিকতার সহিত বিশ্বলোকত্বের সম্পর্ক বিরোধের নয়,—মৈত্রীর।

এই প্রসঙ্গে সাহিত্য-বিচার বিষয়ে আর একটি অনুরূপ তর্কের কথা মনে পড়ছে, সে তর্কটির আখ্যা বস্তুতন্ত্রবাদ বনাম কল্পনাবাদ। এ তর্কটির বিশেষ কোনো সুস্পষ্ট অর্থ করা কঠিন, তবে মোটামুটি অর্থ বোধ করি এই যে, সাহিত্য সৃষ্টি, বিশেষতঃ কথা সাহিত্য সৃষ্টি, করবার জন্য আশ্রয় নিতে হবে বাস্তবের কঠিন ভূমির উপরে, না, উর্দ্ধও হ'তে হবে কল্পনার বায়ুময় আকাশ পথে। অন্য একটি অনুরূপ প্রশ্নের দ্বারা বোধ হয় এই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া কতকটা সম্ভবপর। অর্থাৎ প্রশ্ন যদি করি যে, পুষ্পের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য উপাদান সংগ্রহ করতে হবে মূলের সাহায্যে মৃত্তিকা হ'তে, না, শাখা-পল্লবের সাহায্যে বায়ুমণ্ডল হ'তে, তা হ'লে পূর্ব্বোক্ত বাস্তব বনাম কল্পনাবাদ প্রশ্নের উত্তরের কতকটা ইঙ্গিত বোধ করি দেওয়া হয়। কল্পনার আকাশ পথে নিশ্চয়ই পক্ষ বিস্তার করতে হবে, কিন্তু নিম্নে বাস্তবতার কঠিন ভূমিরও উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখ্‌তে হবে। সন্দেশে ছানার ওজন যত বেশীই হৌক না কেন চিনির রসও তার পক্ষে কম প্রয়োজনীয় বস্তু নয়, এ কথা মনে রাখ্‌তে হবে। কিন্তু এখানে যদি কেউ কথা-সাহিত্যে কল্পনা এবং বাস্তবতার গৌণতা এবং মুখ্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত করেন, তা হলে আমি নিশ্চয়ই কল্পনাকেই মুখ্য বল্‌ব। এ কথা ভুল্‌লে চল্‌বেনা যে, শিল্পের চরম উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি, সত্যানুসন্ধান নয়। কথা-সাহিত্য কথা শিল্প ভিন্ন অপর কিছুই নয়, সুতরাং তারও উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি, এবং সে জন্য তাকে বাস্তবতার কঠিন ভূমি আঁকড়ে পড়ে থাকবার প্রয়োজন নেই। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের যা প্রকট বাস্তব তা অনেক সময়েই কথা-সাহিত্যের বস্তু নয়। সেই দৈনন্দিন বাস্তবের অনির্ম্মল গাত্রে কল্পনার তীক্ষ্ণ অস্ত্র দিয়ে পল কেটে দিলে তবে তা সাহিত্যের দীপ্যমান কমল হীরে হয়ে ওঠে। সুতরাং সেই পলকাটা হীরকের দেহ হ'তে বিচ্ছুরিত নানা বর্ণের আভা দেখে কিছুতেই এরূপ আক্ষেপ করা যায় না যে, যত জ্যোতি যত বর্ণই বিচ্ছুরিত হোক না কেন, এ ত' আর সত্যসত্যই সত্য বস্তু নয়, কয়লার সগোত্র, খনি হ'তে সদ্যোত্থিত হীরকের গায়ে ত' আর এ দ্যুতির পরিচয় থাকে না, সুতরাং এই কৃত্রিম অসত্য বস্তুকে বাতিল করা হোক্। আধুনিক সাহিত্যে দুর্নীতি আশ্রয় এবং প্রশ্রয় লাভ করেছে বাস্তবতার এই রূপই একটা কদর্য্য যুক্তির অজুহাতে। যে স্থূল এবং ক্লেদযুক্ত বস্তুসত্তা অতীন্দ্রিয়তার স্পর্শ লাভ ক'রে নির্ম্মল হয়নি লঘু হয়নি, সাহিত্যের মায়ালোকে তার প্রবেশ নিষেধ।

আর্ট জিনিসটাই কৃত্রিম, সুতরাং তাকে অসত্য ব'লে অভিহিত করার মত অসত্য আর কিছু হ'তে পারে না। আর্টের জগতে সত্যের অর্থ অন্য। Decorative Artএর কথা স্মরণ করলে কথাটা সহজে স্পষ্ট হবে। মনে করুন, একজন শিল্পী কোনো মন্দির গাত্রে একটি চওড়া বর্ডার এঁকেছেন বাঘ আর হরিণ দিয়ে,—এক একটি হরিণ প্রাণভয়ে ছুটে পালাচ্ছে আর পিছনে পিছনে এক একটি বাঘ হরিণকে ধরবার জন্য উদ্দাম গতিতে ধাবিত হচ্ছে, এই হ'ল পরিকল্পনা। এখন এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে যদি এই রকম একটা আপত্তি তোলা যায় যে, 'হরিণ যখন খাদ্য এবং বাঘ যখন খাদক, তখন এত কাছাকাছি উভয় পশুকে স্থাপন করলে বাঘ হরিণ ধ'রে খাবেই, অতএব পরিকল্পনার মূলে ভাবগত একটি অসত্য রয়েছে', তখন তদুত্তরে এই কথাই বল্‌তে হবে যে বর্ডারের বাঘ যখন বর্ডারের হরিণ ধরে খায় না, অথচ বনের বাঘ বনের হরিণ ধ'রে খায়, তখন বনের বাঘ আর বনের হরিণের পক্ষে যেটা অসত্য বর্ডারের বাঘ আর বর্ডারের হরিণের পক্ষে সেটা অসত্য না হ'তেও পারে। কৌশলী শিল্পী খাদ্য-খাদকের অসম্ভাব্য ঐক্য অবলম্বন ক'রে এমন পরিকল্পনাও করতে পারেন যার মনোহারিত্ব যার

আবেদন বহু সুলভ সত্যের চেয়েও মূল্যবান। একটা কথা প্রচলিত আছে যে, গল্পের গরু গাছে চড়ে। কথাটা বাহ্যত হাস্যোদ্দীপক হলেও এর মধ্যে একটা বড় রকম সত্যের ইঙ্গিত আছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যা অসম্ভব কিম্বা অসঙ্গত, সাহিত্যের কল্পলোকে হয়ত তার স্থান থাকতে পারে। শক্তিমান শিল্পীর হাতে পড়লে সত্যই গল্পের গরু গাছে চড়ে।

কিন্তু এই যে শক্তি, যা অসম্ভাব্যকে সম্ভাবনার গণ্ডীর মধ্যে এনে উপভোগ্য করে তুলতে জানে, যা বাস্তব লোক থেকে কতখানি মাটি এবং মায়ালোক থেকে কোন্ কোন্ বর্ণ সংগ্রহ করে মূর্ত্তি গঠিত করতে হবে নিখুঁৎভাবে বোঝে, যে শক্তি মানবচিত্তের অন্তর্নিহিত অসীম রহস্যলোক পাঠকের সম্মুখে উদ্ঘাটিত ক'রে ধরতে পারে, তা ফাঁকি দিয়ে অর্জ্জন করা যায় না। তার জন্যে চাই অনন্যমুখী সাধনা। চিত্তের নিবিড়তম অনুভূতি থেকে সাহিত্যের উৎপত্তি একথা আমরা সকলেই শুনেছি, কিন্তু এই অনুভূতির জন্য চাই জ্ঞান, চাই অভিজ্ঞতা, চাই সূক্ষ্মতম অনুমান শক্তি। প্রতিভা নামে এমন কোনো বস্তু আছে কি না তা আমি জানিনে যা একা এই সকলের অভাব পূর্ণ করতে পারে। জগতের অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তির মতে প্রতিভা পরিশ্রমেরই নামান্তর। জগতের সমস্ত শ্রেষ্ঠ বস্তুই অসীম পরিশ্রমের ফল।

আজ শান্তিপুরে সাহিত্য সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে আমি এখানকার তরুণ সাহিত্যিকগণকে এই কথা বিশেষভাবে বলে যেতে চাই যে, সাহিত্য অবহেলা অনাদরের বস্তু নয়, অবসর বিনোদনের জন্য এ সুলভ মনোবিলাসও নয়। নিরলস পরিশ্রম এবং অবিচল নিষ্ঠার দ্বারাই এ'কে সামান্যত্বের সীমা অতিক্রম করিয়ে মায়ালোকের বস্তু করা যেতে পারে। নাম আমার মনে পড়ছে না, কিন্তু কোনো এক ব্যক্তি ইতিহাসের সহিত কথা-সাহিত্যের প্রভেদ নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছিলেন যে, ইতিহাসের তারিখগুলিই সত্য আর সবই অসত্য, আর কথা-সাহিত্যের তারিখগুলি অসত্য কিন্তু আর সকলই সত্য। এ কথা দ্বারা তিনি এই সত্যই প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন যে, কথা-সাহিত্যের কাল এবং পাত্র কল্পিত এবং অলীক হলেও, তার যে অংশ মানবচিত্তের এবং মানসলোকের গভীরতম রহস্য এবং বিচিত্রতম লীলার প্রকাশ, তার মধ্যে অলীকত্বের স্পর্শমাত্র নেই; তা সর্ব্বকালের এবং সর্ব্বজনের পক্ষে এমন অসংশয়িত সত্য যে তাকে মানবসংহিতা ব'লে অভিহিত করলেও অন্যায় হয় না। সুতরাং এ কথা প্রকাশ করে না বল্লেও চলে যে, সাহিত্যকে সেই উচ্চ আদর্শে স্থাপন করতে হলে পরিশ্রম, অধ্যবসায়, ধৈর্য্য এবং অনুরাগের একান্ত প্রয়োজন। বিনা প্রেম সে না মিলে নন্দলালা,—একথা সাহিত্য-সৃষ্টি বিষয়েও সম্পূর্ণ সত্য।

সাহিত্য বিষয়ে যে কয়েকটি কথা আপনাদের এখানে ব'লে যাব বলে মনে মনে স্থির ক'রে রেখেছিলাম তার কিছুই বলা হ'ল না। সে জন্য যে সামান্য মাত্র অবসর আমার অধিকারে ছিল তা নানাপ্রকার বাধা বিঘ্ন বিপত্তির দ্বারা খণ্ডিত হয়েছে। আপনারা আমার এই অনিচ্ছাকৃত কর্ত্তব্যচ্যুতির অপরাধ ক্ষমা করবেন। পরিশেষে আর একবার আমার প্রতি এই সম্মান প্রদর্শনের জন্য আমার ঐকান্তিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে আপনাদের কাছ থেকে আজ বিদায় নিচ্ছি।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শান্তিপুর সাহিত্য-সম্মেলনে সাহিত্য শাখার সভাপতির
অভিভাষণ। ২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২।

বন্দনা

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী

বন্দিনু স্রক চন্দন ঘেরি
তুমি বাংলার ধন,
বাহিরের নও তুমি আমাদেরি
আমাদেরি একজন !
আমাদের সুখ দুখ লাজ ভয়
তোমার পরশে সুন্দর হয়,
তোমার কণ্ঠে যেন কথা কয়
আমাদের দেহ মন :
বাহিরের নও তুমি আমাদেরি
আমাদেরি একজন ।

তোমার লেখনী কোন্ মহাবল
কোন্ মহা জাদু জানে,
ফুটাল এমন রসের কমল
বাংলার মাঝখানে !
মধুর পরাগ, মধু সৌরভ,
বচন অতীত রস গৌরব,
জুটিল বিশ্ব লুটিতে বিভব,
বাংলার এ রতন
বাহিরেব নও তুমি আমাদেরি
আমাদেরি একজন !

তোমারে ঘেরিয়া অমৃত পাগল
সমবেত হই সবে,
মধুলোভী মোরা মধুপের দল
আনন্দ উৎসবে ।
অনেক পেয়েছি আরো বহু আশ,
নূতন ভাবের নূতন প্রকাশ,
তব ফুলবনে নূতন সুবাস
অমৃতের নিকেতন !
আর কারো নও তুমি আমাদের
আমাদেরি একজন !

সুধীজন তব কণ্ঠে দিয়াছে
জয় গৌরব হার,
আসন দিয়াছে গুণীদের কাছে
জগতের দরবার !
দেশে দেশে তুমি যত পেলে মান,
যত উপহার যত অবদান,
মূল্য তাহার করিয়াছ দান
সঙ্গীত আরাধন !
তুমি ভারতের তুমি আমাদের
বাংলার একজন !

বাংলার বুকে চির মধুকোষ
তব ভাণ্ডারে সুধা
বিশ্বমানবে করে পরিতোষ
মিটায় মনের ক্ষুধা !
যুগে যুগে যেথা মানবের হিয়া
বাণীর দুয়ারে ফেরে গুমরিয়া,
বিশ্ববেদনা মরিছে কাঁদিয়া,
সেথা করো পরশন
হে গুণি তোমার গানের মন্ত্রে,
বাংলার হে আপন !

বাণী মন্দিরে অর্ঘ্য সাজিতে
সাজালে যে উপচার,
গাঁথিয়াছ মালা যে ফুলরাজিতে
সে যে এই বাংলার !
যে গান বুনিছ সুরের মায়ায়
এই ভারতের গহন ছায়ায়,
হে কবি সে গান সে সুর জানায়
ভারতের স্পন্দন !
তুমি বাংলার তুমি বাঙ্গালীর
আমাদের প্রিয়জন !

তুমি বিশ্বের এ কথা স্মরিয়া
মনে বিস্ময় লয়,
তবু বল মোরা ভুলি কি করিয়া
বাংলার পরিচয় !
তোমার মনের সুর উতরোলে
বাংলার ব্যথা ছন্দের দোলে
মনের গহনে করে গলে গলে
সুধারস সিঞ্চন,
তুমি জগতের তুমি ভারতের
তুমি বাংলার ধন !

শ্রীনিরুপমা দেবী

* শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘের (প্রাক্তন অধ্যাপক ও ছাত্রদের সভা) কলিকাতা শাখা সমিতির রবীন্দ্র-জন্মোৎসব-সভায় লেখিকা কর্তৃক পঠিত।

রহস্যবাদ

শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল এম-এ ভাষাতত্ত্বরত্ন

সভ্য জগতের নানা জাতির মধ্যে কি প্রাচ্যে, কি প্রতীচ্যে, কি প্রাচীনকালে, কি মধ্য যুগে, কি আধুনিক সময়ে এমন এক শ্রেণীর মনুষ্যের পরিচয় পাওয়া যায় যাঁহারা ইন্দ্রিয়ানুভূতির প্রতি আস্থাবান নহেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই পরিদৃশ্যমান জগৎ তাঁহাদের নিকট মিথ্যা—যাহা সত্য, তাহা ইহার অতীত। সেই সত্যকে আবিষ্কার করাই তাঁহাদের জীবনের এক মাত্র ব্রত। অনেকে এই সাধনায় জীবন অতিপাত করিয়াও সিদ্ধকাম হইতে পারেন নাই। তথাপি তাঁহারা অভীপ্সিত বস্তুর অন্বেষণে বিরত হন নাই। তাঁহাদের কেহ কেহ বলেন যে তাঁহারা সেই অমূল্য নিধির সন্ধান পাইয়াছেন, এবং সময়ে সময়ে আরাধ্য দেবতার সহিত তাঁহাদের সংযোগ ঘটিয়াছে।

এই অজ্ঞাত রাজ্যের অন্বেষণকারীদের কথা একেবারে অশ্রদ্ধেয় বিবেচনা করা উচিত নয়, কারণ ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই আদর্শ জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, এবং আকাঙ্ক্ষার বস্তুকে লাভ করিবার জন্য অশেষ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহারা যে রাজ্যে পর্য্যটন করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের আবিষ্কৃত তথ্যের আলোচনা না করিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা আমাদের অনুচিত। তাঁহারা স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনার্থ যতদূর শ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, ততদূর অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা আমাদের নাই বলিয়া কি বলিতে হইবে যে তাঁহারা ভ্রান্ত?

সাধারণ চিন্তাধারা হইতে তাঁহাদের চিন্তাধারা এত বিভিন্ন যে, তাঁহাদের বিচারসমূহ ও কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে আমাদিগকে তদুপযোগী করিয়া লইতে হইবে। প্রথমেই চিত্তশুদ্ধি আবশ্যক। এখানে নির্ম্মল চিত্তই জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। আর, আমাদের পূর্ব্বসংস্কারগুলিকে ভুলিতে হইবে—বাস্তব জগৎকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইবার অভ্যাস, এবং বিজ্ঞানই সর্ব্বস্ব ও অধ্যাত্ম-তত্ত্ব অকিঞ্চিৎকর, এই মনোভাবটা ত্যাগ করিতে হইবে। মনকে সংস্কারশূন্য করিয়া, * সকল প্রকার মানসিক অনুভূতির ভিত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া, তথাকথিত ছায়াবাদীদের, কবি ও ভক্তবৃন্দের উক্তির সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। যে পর্য্যন্ত আমরা একটা সত্য জগতের অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়া এই কল্পরাজ্যের সহিত তাহার তুলনা করিতে না পারিতেছি, সে পর্য্যন্ত তাঁহাদের উক্তিকে অসার বলিবার অধিকার আমাদের নাই।

জগতের স্বরূপ-বিচার দর্শন শাস্ত্রের অন্তর্গত, এবং দার্শনিক জটিলতার ভিতর প্রবেশ করা আমার শক্তির অতীত ও এই আলোচনার উদ্দেশ্যের বহির্ভূত। তথাপি কতকগুলি প্রাথমিক তত্ত্বের কথা আমাদিগকে স্মরণ করিতেই হইবে।

সর্ব্বপ্রথম তত্ত্বই 'অহম্', আমি। আমির অস্তিত্ব সম্বন্ধে কাহারো কোনো সন্দেহই থাকিতে পারে না। সাধারণ মানবের নিজ অস্তিত্বের বিশ্বাসকে কোনো দার্শনিকই স্থলচ্যুত করিতে পারেন না। অতএব 'আমি আছি', এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই নাই। সন্দেহ কেবল 'আমি' ছাড়া 'আর কি আছে' এই সম্বন্ধে।

শুক্তির ন্যায় নিজ দেহ-কোষে আবদ্ধ এই 'আমি'তে বাতরী স্রোত অবিরাম গতিতে অহরহঃ আসিতেছে। 'আমি' অর্থাৎ আত্মা তাহা অনুভব করিতেছেন। অনুভূতি সমূহের মধ্যে যেগুলি স্পর্শ-স্নায়ুর, দর্শন-স্নায়ুর ও শ্রবণ-স্নায়ুর উত্তেজনা হইতে উদ্‌ভূত, তাহারাই প্রধান। এই সকল অনুভূতির অর্থ কি? অর্থ এই যে ইহারা সংস্কারহীন আত্মার নিকট

* অর্থাৎ মনের যে অবস্থাটিকে Bertrand Russel "disinterested curiosity" নামে অভিহিত করিয়াছেন, সেই অবস্থায় আসিয়া।

গত ২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২ শান্তিপুর সাহিত্য পরিষদের দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

বাহির্জগতের পরিচয় দেয়। জগৎ কিরূপ ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে আমিকে, অর্থাৎ আত্মাকে, ইন্দ্রিয়ানুভূতিরই মুখাপেক্ষা করিতে হয়। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় চারিদিক হইতে যে সকল বার্তা বন্যার ন্যায় 'আমি'র নিকট উপস্থিত হয়, তাহা হইতেই 'আমি' নিজ বাহ্য জগৎ গঠিত করে—সেই বাহ্য জগৎ, যাহাকে সাধারণ লোকে বাস্তব জগৎ বলিয়া জানে। স্নায়ুমণ্ডলের সাহায্যে প্রাপ্ত অনুভূতি সমূহের যোগ-বিয়োগ ইত্যাদি বিন্যাস দ্বারা 'আমি'র মধ্যে একটী সামান্যতার ভাব (Concept) উৎপন্ন হয়, যাহাকে সে বাহ্য জগৎ বলিয়া গ্রহণ করে। এই 'আমি' বা 'আত্মাই' জ্ঞাতা [illegible] জ্ঞেয় [illegible] (Object)। নিজ অনুভূতি সমূহকে কতকগুলি অজ্ঞাত বস্তুতে আরোপিত করিয়া আত্মার মধ্যে যে সামান্যতার ভাব উৎপন্ন হয়, তাহাই আত্মার জ্ঞেয় বা বাহ্য জগৎ। কে জানে নক্ষত্রগুলি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে কি না। আমার মধ্যে ঔজ্জ্বল্যের যে অনুভূতি হয়, তাহাই আমি নক্ষত্রে আরোপ করিয়া উহাকে উজ্জ্বল বলি। বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে আমাদের নিশ্চিত ধারণা নাই। আমাদের ব্যবহারিক জগৎ সত্য জগৎ হইতে ভিন্ন।

অতএব প্রত্যক্ষ জগৎ বলিয়া যাহাকে ধরা হয়, তাহা আত্মার যথার্থ বাহ্য জগৎ নয়—উহা কেবল আত্মার আভ্যন্তরীণ চিত্রের বহির্নিক্ষেপ—অধ্যাস মাত্র—বৈজ্ঞানিক সত্য নয়—কল্পনিষ্পন্ন বস্তুর ন্যায় কল্পনা-প্রসূত। এরূপ কৃত্রিম বস্তুর বিশ্লেষণ অনর্থক। অতএব ইন্দ্রিয়ানুভূতি জনিত প্রমাণ যথার্থতার চরম প্রমাণ নয়। ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি দ্বারা ভৃত্যের কাজ চলিতে পারে, পথ প্রদর্শকের কাজ করাইতে গেলে নিরাপদ নয়। এতদ্ব্যতীত, যাহারা ইন্দ্রিয়ের প্রমাণে বিশ্বাসী নহেন, ইন্দ্রিয়জ প্রমাণ তাঁহাদের মতের খণ্ডন করিতে অসমর্থ। স্নায়ুতন্ত্রসমূহ দ্বারাই বাহিরের সংবাদ ভিতরে পৌঁছে। কে বলিতে পারে যে, বাহিরের কতকগুলি তথ্য পথে রুদ্ধ, বিকৃত বা লুপ্ত হইয়া যায় না, এবং আমাদের অবিদিত থাকে না ? অতএব দেখা যাইতেছে যে, আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার আমাদের শারীরিক যন্ত্রাদির বিধান দ্বারা সীমিত। আমাদের পাঁচটী ইন্দ্রিয় আমাদিগকে যাহা জানিতে দেয়, তাহাই আমরা জানি—তাহাও সম্পূর্ণরূপে নয়। এমন বহুজাতীয় জীব থাকিতে পারে, যাহাদের সম্বিৎ-কেন্দ্রের সহিত বহির্জগতের সংযোগ অন্য প্রকারে সঙ্ঘটিত হয়। তাহাদের বহির্জগতের অনুভূতি ভিন্ন প্রকারে হওয়া অসম্ভব নয়। অতএব বহির্জগত সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা, তাহা নির্ভুল বলিয়া কি প্রকারে স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে ? যদি স্নায়ুতন্ত্রগুলির গুণ বা বিধানের সামান্য ইতর-বিশেষ ঘটে, তাহা হইলে হয় ত বর্ণ শোনা, বা শব্দ দেখা, যাইবে,—প্রবাদ যে, সর্পের দেখার ও শোনার কাজ চক্ষু দিয়াই হয়। প্রকৃত বাহ্য জগৎ যেমন আছে তেমনিই থাকিবে, কেবল আমাদের অনুভূতিরই ব্যত্যয় ঘটিবে। জগৎ হইতে সংগীত সৌন্দর্য লোপ পাইলে [illegible] নহে, কিন্তু ভি[illegible] র [illegible] প্রকাশ পাইবে, কোকিলের কূজন চক্ষু-স্নায়ু-সমূহকে আঘাত করিয়া বর্ণচ্ছটার কৌতুক প্রদর্শন করিবে।

অতএব যাহাকে আমরা সত্য জগৎ বলিয়া ভাবি, তাহা সত্য নয়—তাহা আমাদের মনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ—তাহা আমাদের ব্যবহারিক জগৎ মাত্র। ইন্দ্রিয়-নিগড়ে বদ্ধ আমরা সত্য জগৎকে জানিতে পারি না। আমরা জানিতে অক্ষম বলিয়া কি তাহার অস্তিত্ব নাই ? রহস্যবাদীরা বলেন যে নিশ্চয়ই আছে। সেই সত্যের অনুসন্ধানে তাঁহারা নিরন্তর ব্যস্ত। যাহারা সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহাদের অনুভূতি আমাদের অনুভূতি হইতে স্বতন্ত্র। তাঁহারা প্রথমে অভ্যাস দ্বারা * স্নায়ুমণ্ডলকে সত্য জগতের অনুভূতি-সমূহের উপযোগী করিয়া লইয়াছেন, এবং পরে সকল অনুভূতির ঊর্দ্ধে উঠিয়া সত্য বা আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সত্য জগতের কোনো ভাষা না থাকাতে, তাঁহারা ব্যবহারিক জগতের ভাষা অবলম্বনে সত্য বা পরমাত্মাকে "দিব্য সঙ্গীত," "অজাত জ্যোতিঃ" ইত্যাদি রূপে বর্ণন করিয়াছেন। †

* যোগের প্রথম স্তরে নানারূপ শারীরিক ক্রিয়া, যেমন (আমাদের দেশে) আসন, প্রাণায়াম ইত্যাদি দ্বারা। দ্বিতীয় স্তরে ধ্যানের দ্বারা, তৃতীয় স্তরে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি দ্বারা, এবং শেষ স্তরে অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্বিকল্প সমাধি দ্বারা।

† বেদান্তের ভাষায় বলিতে গেলে সত্য অথবা জ্ঞানের চারিটী অবস্থা—বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী ও পরা, অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও

সকল লোকের চিত্তবৃত্তি সমান নয়। দুই ব্যক্তির মনে সত্যের চিত্র একই রূপ কি না, এ বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে। বাস্তব-বাদীরা (প্রত্যক্ষবাদীরা, Realists) ইন্দ্রিয়-প্রমাণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, ইন্দ্রিয়ানুভূত জ্ঞানকেই যথার্থ জ্ঞান বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাঁহাদের নিকট এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সত্য। সাংখ্য দর্শনেও জগৎকে সত্য বলা হইয়াছে। এই জগৎ প্রকৃতির পরিণাম। জগতে দুইটী সত্য বস্তু আছে—প্রকৃতি ও পুরুষ। প্রকৃতি ক্রিয়াশীল, পুরুষ প্রকৃতির কার্য্যের সাক্ষী মাত্র—জ্ঞাতা। জগৎ জ্ঞেয়। প্রত্যক্ষবাদীরা মানসিক অনুভূতি সমূহকে বস্তুতে আরোপ করিয়া, বস্তুকে সত্য বলিয়া জ্ঞান করেন। কিন্তু যে সকল গুণাবলী বস্তুতে আছে বলিয়া ধরা হয়, যথা বর্ণ, স্থূলতা ইত্যাদি, তাহাদের অস্তিত্ব আছে কি না সন্দেহের বিষয়—সে সব গুণ মানব-মনের ভাবমাত্র। যাহাকে আমরা বস্তু বলি তাহা কেবল পরমাণুপুঞ্জ †—প্রত্যেক অণুর পরমাণুগুলি পরস্পরের চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে—সম্ভবতঃ অতি কঠিন বস্তুও কুয়াসার জলকণাসমূহ অপেক্ষা অধিক ঘন বা দৃঢ় নয়। বর্ণসমূহ চক্ষু-স্নায়ুর ক্রিয়ামাত্র—কামল রোগগ্রস্ত ব্যক্তির দৃষ্টিতে সকল বস্তুই পীতবর্ণ—স্বপ্নেও নানা বর্ণের অনুভূতি হয়। ইন্দ্রিয়নিচয় জাগতিক বস্তুর যথাযথ জ্ঞান দিতে অসমর্থ। যদি সামর্থ্য থাকিত, তাহা হইলে একই বস্তু নিকট হইতে এবং দূর হইতে সমান দেখাইত, ভিন্ন প্রকারের অনুভূত হইত না। তবে বস্তুর সত্যতা কোথা?

অনেকে বলিবেন যে, কোনো বস্তু সম্বন্ধে অধিকাংশ লোকের অনুভূতি যখন একই প্রকারের, তখন ইহাই উহার সত্যতার প্রমাণ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কোনো দুই ব্যক্তির অনুভূতি সমান নয়। সুবিধার জন্য অধিকাংশের সম্মতিক্রমে মতের ঐক্যকে আমরা সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি। প্রত্যেকেই স্বকল্পিত জগতে বাস করে—এক ব্যক্তির জগৎ অন্য ব্যক্তির জগৎ হইতে ভিন্ন † প্রচুর অর্থ পাইয়া এক ব্যক্তি কোন্ কোন্ দানে ও লোক-হিতকর কার্য্যে উহা নিয়োগ করিবে তাহাই চিন্তা করে। অপর এক ব্যক্তি এরূপ অবস্থায় তাহার অর্থদ্বারা কোন্ কোন্ বিলাস-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবে এই চিন্তায় নিমগ্ন। রাসায়নিক পণ্ডিতদের কেহ মনুষ্য জাতির উপকারের, কেহ বা ধ্বংসের, সাধন আবিষ্কার করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

আমরা প্রত্যেকেই যেমন যেমন জীবন-পথে অগ্রসর হইতেছি, তেমনি তেমনি ভাবিতেছি যে, আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগতের পরিবর্ত্তন হইতেছে! সত্য সত্যই কি জগতের প্রকৃতি অন্যরূপ হইয়া যাইতেছে? না,—আমরা যে সকল উপাদানে নির্ম্মিত, ধীরে ধীরে তাহাদের গুণের ও সংস্থানের ব্যতিক্রম ঘটিতেছে বলিয়া বাহ্য-জগৎ আমাদের অনুভূতিতে ভিন্নধর্ম্মী বলিয়া বোধ হইতেছে। বাল্যে ও যৌবনে যে সকল বস্তুতে আমাদের প্রীতি ছিল, এখন বার্দ্ধক্যে সে সকল বস্তুতে আর সমান রুচি নাই। * কিন্তু যাহা সত্য, তাহা স্থায়ী—তাহার পরিবর্ত্তন নাই। যখন মনের পরিবর্ত্তনের সহিত আত্মার অনুভূতির সম্পর্ক থাকিবে না, তখনই সত্যের দর্শন পাওয়া যাইবে।

উপরি লিখিত উক্তি দ্বারা আমি পাঠকগণকে বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে তাহাদের ব্যবহারিক ধারণা ত্যাগ করিয়া মানসিক শূন্যবাদ অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিতেছি না। আমার বলিবার কথা এই যে, যে সকল অনুভূতিকে তাঁহারা যথার্থ বলিয়া ধরেন, এবং বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ বলিয়া জ্ঞান করেন, সে সব অনুভূতি আপেক্ষিক এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত মাত্র, এবং যে সকল মানসিক চিত্র রহস্যবাদীরা অঙ্কিত করেন, তাহাদের ব্যবহারিক উপযোগিতা না থাকিলেও, বা তাহারা ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রের অগোচর থাকিলেও, তাহাদিগকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিতে পারা যায় না। প্রত্যক্ষবাদীদের অনুভূতিতেও

সূক্ষ্মতম। সাধারণতঃ স্থূল বা বৈখরী সত্যের সহিতই আমাদের পরিচয়। সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম জ্ঞানের কদাপি অনুভূতি হইলেও আমাদিগকে বাধ্য হইয়া স্থূল বা বৈখরী শব্দসমূহ দ্বারা উহা ব্যক্ত করিতে হয়।

† কণাদের বৈশেষিক দর্শন।

* "যদ্রূপেণ যদ নিশ্চিতং তদ্রূপং ন ব্যভিচরতি তৎ সত্যম্"
শঙ্করাচার্য্য—

বিশ্বের নানা বৈচিত্র্যের চিত্র উপস্থিত হয়। সেই চিত্রগুলি একাঙ্গীভূত হইয়া একটা সমষ্টিগত চরম সত্যের নির্দ্দেশ করে। তখন প্রত্যক্ষবাদীর মনেও এই প্রশ্নটার উদয় হয় "এই অদ্বিতীয় বস্তুটা কি?" এরূপ প্রশ্ন প্রত্যক্ষজ্ঞান-নিরপেক্ষ—ইহা মনুষ্যের স্বভাবজাত আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত করে। যতক্ষণ সে সেই সর্ব্বাশ্রয় অজ্ঞাত বস্তুকে না পায়, ততক্ষণ তাহার অন্তরের ক্ষুধা মিটে না।

এই ত গেল বাস্তববাদী বা প্রত্যক্ষবাদীদের কথা। যাঁহারা ভাববাদী (Idealists), তাঁহাদের মতের এখন কিছু আলোচনা করা যাউক। তাঁহারা ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া ভাবকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, কেবল দুইটী পদার্থকেই আমরা নিশ্চিতরূপে জানি—একটী সচেতন চিন্তাশীল—জ্ঞাতা, অপরটী সেই জ্ঞাতার ভাবরূপ জ্ঞেয়। তাহাদের মতে মন ও মনের ক্রিয়া (জ্ঞান) ভিন্ন জগতে আর কোনো পদার্থ নাই। যাহাকে আমরা জগৎ বলি, উহা কতকগুলি মানসিক চিত্রের সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নয়—উহা সত্য নয়—উহা সত্যের দেশকালাধিকৃত ছায়ামাত্র। সত্য সেই সম্পূর্ণ ও অবিকৃত জ্ঞেয় বা সর্ব্বব্যাপী জ্ঞান সমুদ্র, যাহার বিন্দুমাত্র সংগ্রহ করিতেও আমরা অসমর্থ। সর্ব্বভূত, সকল চরাচর, সেই একমাত্র শাশ্বত জ্ঞেয়ের অভিব্যক্তি। স্বয়ং জ্ঞাতাও জ্ঞেয়-পর্য্যায়ভুক্ত। জ্ঞেয়ের কতকগুলি স্বরূপের উপলব্ধি হয় ইন্দ্রিয়নিচয় ও মনের দ্বারা, দেশকালবস্তু-জনিত সীমার মধ্যে। কিন্তু দেশ, কাল ও বস্তুকে সত্যের, অর্থাৎ চরম জ্ঞানের, অংশ ভাবিবার কোন কারণ নাই। যেমন যেমন আমাদের উপলব্ধিক্ষেত্র অনাদি, অনন্ত জ্ঞানরাশির দিকে প্রসারিত হয়, তেমনি তেমনি আমরা সত্যের অধিকতর সান্নিধ্য লাভ করিতে থাকি। শাশ্বত, অপরিচ্ছিন্ন, অসীম ভাবই, অর্থাৎ ঐশ্বরিক জ্ঞানই, ভাববাদীদের চরম সত্য। ইহাই সেই পরম পদার্থ, যাহার স্পর্শে সাধারণ বুদ্ধিতে, বিজ্ঞানে, দর্শনে ও কলায় যে সকল ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র, অনিত্য জগৎ সৃষ্ট হয়, তাহাদের ভিন্নতা দূর হইয়া, সবগুলির একীকরণ হইয়া যায়। অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, অতীন্দ্রিয় অলৌকিক জগৎই সত্য জগৎ।

ভৌতিক জগতের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সমূহ দ্বারা মনুষ্যের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয় না। মানস-ক্ষেত্রে বিচার-জনিত যে সকল সামান্যতার বোধ (concepts) উৎপন্ন হয়, তাহাদের দ্বারাই মনুষ্য কর্ম্মে প্রেরিত হয়। আধ্যাত্মিকতার উচ্চ স্তরে উন্নীত হইলে বোধসমূহ সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। এই ভাব-নিচয় দ্বারা পরিচালিত হইয়া, ইহাদিগকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্যই এরূপ ব্যক্তি প্রাণধারণ করেন, কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকেন, ক্লেশ সহ্য করেন এবং অবশেষে ইহধাম হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। প্রেম, রাষ্ট্রিয়তা, ধর্ম্ম, ত্যাগ, যশ—এই সকল ভাব অলৌকিক জগতের সামগ্রী। অতএব ভৌতিক জগৎ অপেক্ষা, সত্যের সহিত ইহাদের সম্বন্ধ অধিক।

ভাববাদের মধ্যেই আমরা জীবনের সর্ব্বোচ্চ সিদ্ধান্ত পাই। ইহা যে কেবল ইন্দ্রিয়-সম্পর্কহীন মানসিক যুক্তির দ্বারা নির্ণীত, এমত নহে—পরম সত্তাকে পাইবার জন্য মনুষ্যমধ্যে যে প্রকৃতিগত প্রবণতা আছে, ইহা তাহারই ব্যঞ্জনা। কিন্তু এই মতের ত্রুটি এই যে, কি উপায়ে পূর্ণ ও সত্য সত্তা আমাদের হস্তগত হইবে, ইহা তাহার পথ-নির্দ্দেশ করে না।

এই সঙ্গে আর একটী মতবাদের আলোচনাও আবশ্যক, যাহাকে দার্শনিক সংশয়বাদ বলা যাইতে পারে। সন্দেহবাদীরা সত্তা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষবাদীদের মত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নয়। ভাববাদীদের মত সম্বন্ধেও তাহাদের অনুরূপ মনোভাব। প্রত্যক্ষবাদীরা চক্ষু কর্ণের প্রমাণ দ্বারা শ্যামকে যথার্থ শ্যাম বলিয়া অনুভব করেন, কিন্তু ভাববাদীরা বলেন যে এই ইন্দ্রিয়-গোচর শ্যাম, শ্যাম নহে। ইহার পশ্চাতে যে অতীন্দ্রিয় বা ভাবগত শ্যামের বিদ্যমানতা আছে, তাহাই শ্যাম। তাহার গুণাবলী আমাদের অজ্ঞাত বা বোধের অতীত। সংশয়-বাদীরা বলেন যে, বাহ্য জগতের অস্তিত্ব কেবল মনে। যদি আমার মানসিক যন্ত্র নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে আমরা যাহাকে জগৎ বলি, তাহারও অস্তিত্ব থাকিবে না। যাহাকে আত্মার অনুভূতি বলে, আমার নিকট কেবল তাহারই অস্তিত্ব আছে। অনুভূতির সীমার বাহিরে কি আছে, না আছে, সে বিষয়ে আমার অনুমান করার অধিকার নাই। অতএব আমার নিকট "নিত্য অনির্ব্বচনীয় সত্তা" কথাটী অর্থ-হীন—চিন্তার জটিলতা মাত্র, কারণ মনের বহিস্থ জগৎ হইতে যদি মনের সম্বন্ধ একেবারে ঘুচিয়া যায়, তবে নিজ ভাবসমূহ ভিন্ন অন্যত্র সত্য পদার্থের অস্তিত্ব কোথা?

দার্শনিক সংশয়বাদ খুব যুক্তিপূর্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার অসঙ্গতি প্রমাণ করা অসাধ্য। প্রত্যক্ষে বিশ্বাসীরা বিজ্ঞান চর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করিয়া সন্তোষ লাভ করেন করুন, অতীন্দ্রিয় সত্তায় যাঁহাদের আস্থা, তাঁহারা ভাববাদে নিমজ্জিত থাকুন। কিন্তু যথার্থ ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা কখনই নির্ব্বিবাদে সহজাত জ্ঞান বা আবেগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিবেন না। কোনো না কোনো আকারে সংশয় তাঁহাদের মনে প্রবেশ করিবেই করিবে। সংশয়বাদ সম্বন্ধে আপত্তি কেবল এই যে, ইহা হইতে মানসিক শূন্যতার সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু মানব প্রকৃতিতে পরমাত্মার প্রতি যে স্বভাবজ বিশ্বাস নিহিত আছে, তাহার যথোচিত পোষণ দ্বারা এই অনিষ্ট হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে। সকল মতাবলম্বী দার্শনিকই যদি মূলভিত্তিরূপে স্বীকৃত নিজ নিজ মতের অনুসরণ করিয়া বিচার করিয়া দেখেন, তাহা হইলে তাহারা ইহা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিবেন না যে, আমরা প্রত্যেকেই এক অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় জগতে বাস করিয়া ও তৎসংক্রান্ত চিন্তায় নিযুক্ত থাকিয়া তথা হইতে অনুপ্রাণিত হইতেছি। এই জগতে আমরা নানা অনিয়ন্ত্রিত, অপরীক্ষিত ও অপরিজ্ঞাত ভাব ও ইঙ্গিত দ্বারা পুষ্ট হইতেছি। কিন্তু ইহার কার্য্যে অভ্রান্ত ঋত বা অসাধারণ শৃঙ্খলা স্থূল চক্ষে দৃষ্টিগোচর না হইলেও, অজ্ঞাতসারে ও অনির্দ্দিষ্টভাবে তাহার যে সকল ইঙ্গিত আমাদের অনুভূতিতে উপস্থিত করিতেছে, তাহাদের উপর নির্ভর করিয়া আমাদিগকে জীবন যাত্রায় অগ্রসর হইতে হইতেছে। যে সকল প্রাকৃতিক নিয়ম মানব মন পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা নিজ সুবিধার্থ উদ্‌ভাবন করিয়াছে, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আমাদিগকে ইহ জগতের কার্য্য সম্পাদন করিতে হইতেছে।

দর্শনশাস্ত্র একটী অজ্ঞাত পদার্থে ইঙ্গিত করিতে পশ্চাৎপদ নহে, কিন্তু সেই অজ্ঞাতটী কি, কোথা বা কিরূপে প্রাপ্তব্য এই প্রশ্নের উত্তরে বলে, "জানি না"। যে লক্ষ্যের দিকে সে নির্দ্দেশ করে, নানা আড়ম্বর সত্ত্বেও তাহাতে সে পৌছিতে পারে না, এমন কি জ্ঞাতা হইতে জ্ঞেয়কে পৃথক করিতে অসমর্থ বিজ্ঞানের দৌড়ই বা কত? সে প্রত্যক্ষ লইয়াই ব্যস্ত। কিন্তু ভিতরে ভিতরে সেও ভাববাদী—তাহাকেও কল্পনার আশ্রয় লইতে হয়। সে বোঝে যে, তাহার সসীম প্রতারক অনুভূতি সমূহ এবং তাহার চিত্রিত জগৎ, যাহাতে তাহার এত আস্থা, তাহাকে একমাত্র লক্ষ্যের দিকে লইয়া যাইতেছে—জীবন প্রবাহের রক্ষা, এবং তাহার ফলস্বরূপ, বিশ্বনিয়ন্তার অতিরহস্যময় কল্পনাকে সফল করা।

বিজ্ঞান বলে, "আমাদের দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ এবং ঘ্রাণ শক্তি আছে বলিয়া আমরা ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে, বিপদ হইতে সতর্ক হইতে এবং খাদ্য আহরণ করিতে সক্ষম হই। পুংজাতি স্ত্রী জাতিতে সৌন্দর্য্য অনুভব করে বলিয়া জীবনের ধারা অক্ষুণ্ণ থাকে। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, এই সহজাত আদিম বৃত্তিগুলির বিকাশ হইয়া উচ্চতর ও পবিত্রতর মনোবৃত্তির উদয় হইয়াছে, তথাপি ইহাদের নিজেদের কোনো সার্থকতা নাই, একপ বলা চলে না। সমাজের ইষ্ট সাধনে ইহাদেরও প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট। জীবন ধারণ করিতে হইলেই আহার করিতে হইবে। অতএব অনেক খাদ্য হইতে আমাদের সুখদ অনুভূতি হয়; আবার, অতিভোজনের পরিণাম অপ্রীতিকর, ইহাও আমরা জানিতে পারি। কতকগুলি এমন বিষয় আছে, যাহাদের তীব্র অনুভূতি যদি সদাসর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে নৈরাশ্যে আমাদের জীবনী শক্তির ক্ষতি হইতে পারে—যেমন জীবনের অনিশ্চয়তা, শরীরের ক্ষয়, বস্তু মাত্রেরই অনিত্যতা ইত্যাদি। এই কারণে এই অনুভূতিগুলি স্পষ্ট নয়। যখন আমাদের শরীর সতেজ থাকে, তখন আমাদের বাস্তবতা সারবত্তা ও স্থায়িত্বের বোধ প্রবল হয়। এই মনোভাব ভ্রমাত্মক ও ভ্রান্তজনক হইলেও, জাতির যোগ্যতা বৃদ্ধি ও রক্ষা কল্পে ইহার উপকারিতা কম নয়।

কিন্তু নিকট হইতে দেখিলে, এমন অনেক বিষয় আছে, যাহাদিগকে প্রয়োজনীয়তার গণ্ডীর ভিতর ফেলা যায় না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনেক বিষয় মানব-মনকে অধিকার করিয়াছে। কেবল জীবন-ধারণের ইচ্ছায় মানুষ যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন করিত, সেই সকল দ্রব্যে যে মুহূর্ত্ত হইতে তাহার রুচির অভাব ঘটিয়াছে, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই সে নিজ স্বাভাবিক বিকাশকে ব্যাহত করিয়াছে। তাহার মনোবৃত্তি অসন্তোষের কুহকে পড়িয়াছে। ভৌতিক সীমা ছাড়াইয়া ক্রমোন্নতি মনোরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। বাস্তবকে ত্যাগ

করিয়া মানুষ অবাস্তব আকাঙ্ক্ষার দাস, যথেচ্ছ ও অসাধ্য কল্পনার জনক, স্বপ্ন-রাজ্যের অধিবাসী হইয়াছে। তবে, তাহার স্বপ্ন যদি তাহাকে ভৌতিক বা মানসিক প্রাধান্য ব্যতীত কোনো উচ্চতর লক্ষ্যের দিকে চালিত করে, তবেই তাহার স্বপ্ন ন্যায্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। যদি কলাবিষয়ক ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি-সমূহকেও ক্রমোন্নতিবাদের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে উহা ভৌতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া মানসিক আধারে পুনর্গঠিত হইবে।

অতি সাধারণ মানবজীবনেও এমন কতকগুলি মৌলিক অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়, যাহাদের বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাখ্যা দেওয়া অসম্ভব। এই সকল অনুভূতির, ও তৎসংক্রান্ত আবেগসমূহের সহিত জীবনের ভৌতিক অংশের সম্বন্ধ অতি অল্প, অথচ চরিত্রের উপর ইহাদের প্রভাব অসামান্য। কার্য্যকারণমূলক বৈজ্ঞানিক জগতের সহিত ইহাদের সামঞ্জস্য করা যায় না। ধর্ম্ম-বিষয়ক, ক্লেশ-বিষয়ক ও সৌন্দর্য্য-বিষয়ক অনুভূতি-সমূহ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ইহাদের আলোচনা অতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সহিত করিয়াছেন।

(১) ধর্ম্ম যৌক্তিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত নয় -বিশ্বাসের উপর। ধর্ম্মে এমন কতকগুলি তত্ত্ব মানিয়া লওয়া হয়, যাহা বিচার দ্বারা প্রতিপন্ন করা যায় না। ইহাতে অতীন্দ্রিয়তাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়, এবং অলৌকিক জগৎকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। বিশ্বাসই জীবনের প্রধান অঙ্গ এবং ধর্ম্মের ভিত্তি। যদিও বাস্তব জীবনের সরল প্রবাহে ধর্ম্ম অনেক বাধা উপস্থিত করে, তথাপি ইহার গতি অপ্রতিহত। মানব-হৃদয়ে ইহার মূল দৃঢ়ভাবে প্রোথিত। অসভ্য অবস্থায় ইহা লৌকিক সুবিধার সাধন বলিয়া বিবেচিত হইত, কিন্তু মনুষ্য জাতির যতই অগ্রগতি হইতেছে' ততই ইহা সূক্ষ্মভাব-সমূহে পূর্ণ, এবং অলৌকিক রাজ্যের পদার্থে পরিণত হইতেছে।

(২) দুঃখ ভোগের ব্যাপারটী কি? যে সকল শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ অভ্রান্ত স্বাভাবিক নিয়মের অবশ্যম্ভাবী ফল এবং মানুষের নিষ্ঠুরতা, লালসা ও অবিচার দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহাদের উদ্দেশ্য কি? ক্লেশের কতকগুলি সাধারণ উদাহরণ দিয়া ও তাহাদের বাহিক কারণ দেখাইয়া, বৈজ্ঞানিক-গণ বলিবেন যে, জাতির পক্ষে উহাদের স্পষ্ট উপকারিতা আছে, কারণ উহারা আমাদের অতীত নির্বুদ্ধিতার জন্য শাস্তি দেয়, নবীন উদ্যমে উত্তেজিত করে, এবং ভবিষ্যৎ উল্লঙ্ঘন হইতে সতর্ক করে। কিন্তু তাঁহারা ক্লেশের গভীর তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিতে ভুলিয়া যান। কোনো অপরাধে অপরাধী না হইয়াও অনেককে ক্লেশ ভোগ করিতে হয় কেন? জগন্নিয়ন্তা নিরপরাধ শিশুকে দীর্ঘকালব্যাপী অনারোগ্য রোগের দারুণ যন্ত্রণা কেন সহ্য করান? প্রিয়জন বিয়োগের নিবিড় শোক মানুষকে কেন অনুভব করিতে হয়? জীবকে মৃত্যুর নানা ভীষণ যাতনার অধীন কেন হইতে হয়? বৈজ্ঞানিকেরা এই বিস্ময়কর ব্যাপারটিরও কারণ দর্শাইতে বিস্মৃত হন যে, যতই সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রগতি হইতেছে, ততই মানুষের ক্লেশ-সহিষ্ণুতার মাত্রা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। আরো আশ্চর্য্যের কথা এই যে, অনেক উচ্চস্তরের ব্যক্তি ক্লেশকে সাদরে ও সাগ্রহে বরণ করিয়াছেন, এবং ক্লেশেই নানা রহস্যের ও অবিনশ্বর আনন্দের সন্ধান পাইয়াছেন। রহস্যবাদীরা পরমাত্মার বিরহজনিত দারুণ ক্লেশ অনুভব করেন। ভারতবর্ষের বৈষ্ণবেরা পরমাত্মার অদর্শনে জীবাত্মার যে তীব্র ও দুঃসহ বিরহ যাতনা গোপীদের মুখ দিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা অতি করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী। পরমাত্মাকে লাভ করিবার আশায় যোগীরা কঠোর তপশ্চারণে উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

যে সকল অবস্থায় মনে দুঃখ ও দুশ্চিন্তা উপস্থিত হয়, সে সকল অবস্থায় আত্মার পীড়া হয় কেন? ক্লেশ মানসিক ব্যাপার, ---শরীরে অস্ত্রোপচার করিলে দারুণ যন্ত্রণা বোধ হয়, কিন্তু সামান্য ক্লোরোফর্ম প্রয়োগে যন্ত্রণার অনুভূতি থাকে না কেন? মানসিক অনুভূতি সম্পূর্ণ থাকার অবস্থাতেই কেবল আত্মার সুখদুঃখ অনুভব করিবার শক্তি থাকে কেন? স্বপ্নে যথেষ্ট সুখদুঃখ বোধ থাকে কেন?

ক্লেশকে আমরা যে দিক্ হইতে দেখি না কেন, উহা যে ইন্দ্রিয়জ্ঞানমূলক জগতের সহিত আত্মার বিরোধের ভাব, তাহাতে সন্দেহ নাই। ক্লেশের লোপ সাধন করিতে হইলে--- হয় ইন্দ্রিয়-উপলব্ধ জগতের সহিত আত্মার সমীকরণের---নয়,

যে জগতের সহিত তাহার খাপ খায়, তাহার সহিত সখ্য-স্থাপনের ব্যবস্থা আবশ্যক। এ বিষয়ে আশাবাদীদের ও নৈরাশ্য-বাদীদের মধ্যে মতভেদ নাই। কিন্তু যেখানে নৈরাশ্যবাদীরা জগতের কেবল ভীষণতাই অনুভব করেন, এবং ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোনো পন্থা খুঁজিয়া পান না, সেখানে আশাবাদীরা ক্লেশকে নিম্ন জগতের কঠোর শাস্তি না ভাবিয়া, অতীন্দ্রিয় সত্য জগতের পথপ্রদর্শক ও উপদেষ্টা বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করেন। আশাবাদী বুঝিতে পারেন যে, ক্লেশ তাঁহাকে এমন একটী জগতের দিকে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে, যাহা তাঁহার অভীষ্ট, কিন্তু তাহার নৈরাশ্যবাদীর অনভিপ্রেত। আশাবাদীর বিশ্বাস যে, ক্লেশের দ্বারা প্রেম পূর্ণাঙ্গতঃ প্রাপ্ত হয়, এবং উভয়ে মিলিয়া তাঁহাকে অদ্বিতীয় সত্তার দিকে চালিত করে। তিনি ক্লেশকে ভগবানের দান বলিয়া জ্ঞান করেন। ইন্দ্রিয়সুখের দ্বারা প্রতারিত না হইয়া, অনেকে ক্লেশকে বরণ করিয়া লইয়া কঠোর ব্রতী তপস্বী হন। সাধু ও বীরহৃদয় মহাপুরুষদের মহত্ত্বের মূল ক্লেশসহিষ্ণুতার ভূমিতে উপ্ত।

তাঁহারা সত্য বা পরমাত্মার সাক্ষাৎ পাইবার জন্যই অশেষ কষ্ট স্বীকার করেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, পরমাত্মা ছাড়া জগতের অন্য কোনো সদ্বস্তু নাই। জগতে তিনিই একমাত্র ও অদ্বিতীয় সত্তা। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে ব্রহ্ম ছাড়া কোনো পদার্থই স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে এই জগৎ কাল্পনিক—মায়ামাত্র। জীবে ব্রহ্মে ভেদ নাই—জীব ব্রহ্মেরই অংশ। ব্রহ্মই সৎ বা সত্য—ব্রহ্মই চিৎ বা জ্ঞান, যত দিন জীব মায়ার আবরণ হইতে মুক্ত হইতে না পারে যত দিন তার নিজ ব্রহ্মত্বের অনুভূতি না হয়, তত দিন তার আনন্দ নাই। যোগীরা সমাধিবলে সেই আনন্দ লাভ করিতে চাহেন। ধ্যানের ঘনীভূত অবস্থাকে সমাধি বলে। সমাধিতে যখন চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধ হইয়া যায়, সেই অবস্থাকে অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্বিকল্প সমাধি বলে। ইন্দ্রিয়নিগ্রহকে তপ বা তপস্যা বলে। এই তপ ভিন্ন সমাধি হয় না, এবং নির্বিকল্প সমাধি ভিন্ন সত্য বা আত্মার উপলব্ধি হয় না।

(৩) সঙ্গীত ও কাব্যের, লয় ও সৌন্দর্য্যের অনুভূতি আমাদিগকে বিস্ময়ে, সম্ভ্রমে ও আনন্দে আত্মহারা করিয়া ফেলে। আনন্দানুভূতি কেন হয়, তাহা বলা কঠিন। কাঞ্চন-জঙ্ঘা একটী উচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গ মাত্র। তুষার পাতে উহার গাত্র শুভ্রবর্ণ ধারণ করে। এই প্রাকৃত বস্তুকে দেখিয়া অনেকে এত মুগ্ধ হয় কেন? প্রাকৃতিক কারণে পৃথিবীর কতকগুলি বিস্তীর্ণ গহ্বরে অনেক পরিমাণে জল সঞ্চিত হয়। এই জল রাশিকে সমুদ্র বলে। ইহাতে এমন কি আছে যে, ইহা দেখিয়া কাহারো কাহারো মন বিস্ময়ে আপ্লুত হয়? চন্দ্র সামান্য উপগ্রহ মাত্র। কিছু ধার করা আলোক উহা হইতে পাওয়া যায় বটে। উহাকে দেখিয়া কেহ কেহ আনন্দে উদ্বেলিত হয় কেন? পদ্ম বা গোলাপ ফুল কতকগুলি পত্রের বর্ণযুক্ত পরিণতি মাত্র। উহারা মানব মনকে উৎফুল্ল করে কেন? কোকিল একটী সৌন্দর্য্যহীন কৃষ্ণবর্ণ পক্ষী। উহার স্বরে অনেকে এত মাধুর্য্য অনুভব করে কেন? হরিণ বন্য চতুষ্পদ জন্তু। উহার চক্ষুতে এমন কি মাদকতা আছে যাহার বর্ণনে কবিপরম্পরা মুখর? এই সকল সমস্যার সমাধান হয় না। আমাদের ইহাও জানা নাই যে, যাহাকে উচ্চ অঙ্গের কলা বলে, তাহা দ্বারা জাতীয় ক্রমোন্নতির কি সহায়তা হয়। সৌন্দর্য্যের রহস্য এখনো, পর্য্যন্ত উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। সৌন্দর্য্যকে আমরা খুঁজিয়া বেড়াই, উহার ছায়ামাত্রের সাহচর্য্য পাই, কিন্তু উহার কায়ার সাক্ষাৎ ঘটে না। আমরা এই মাত্র বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছি যে, সৌন্দর্য্যের আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সৌন্দর্য্যের নিকট হইতে যে অস্পষ্ট বার্ত্তা আসে, তাহাতে অভ্যাসবশতঃ সাড়া দিই মাত্র, কিন্তু বুঝিনা উহা কি।

এখানেই আমরা আত্মার সেই অনুভূতির পরিচয় পাই, যাহাকে সাধারণতঃ লোকে রহস্যবাদ বলে। দর্শন শাস্ত্রের প্রশস্ত অথচ অন্ধকারময় রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া এক শ্রেণীর মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা আদর্শ সত্তার নিকট পৌঁছিবার তিনটী সঙ্কীর্ণ অথচ সরল পথ আবিষ্কার করিয়াছেন; তাঁহারা দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, ধর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়া, ক্লেশকে বরণ করিয়া এবং প্রকৃতি ও কলার সৌন্দর্য্যে নিমজ্জিত হইয়া তাঁহারা সত্যের অন্ততঃ দ্বারদেশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছেন। এই তিনটী পথ দিয়া এবং আরো বহু রহস্যময় উপায়ে আত্মার নিকট সত্যের সম্পূর্ণ স্বরূপের সংবাদ আসে, যাহা ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অনধিগম্য। হেগেল বলেন, "অধ্যাত্ম তত্ত্বের ইন্দ্রিয়জানুভূতিই সৌন্দর্য্য।" আইকেন বলেন, "সত্য, শিব ও সুন্দর সুসঙ্গত ও যথার্থ অধ্যাত্ম জগতের অংশ। এই তিনটীতেই আমরা প্রকৃত সত্তার যথার্থ মূর্ত্তি দেখিতে পাই।" এই সকল উক্তি দ্বারা যথার্থ জগতের আবরণ অনেক পরিমাণে মুক্ত হইতেছে—সুস্পষ্ট ভাবেই হউক বা অস্পষ্ট ভাবেই হউক, বদ্ধ আত্মার নিকট সত্য প্রতিভাত হইতেছে।

যাহাদের অতীন্দ্রিয় জগতে প্রবেশাধিকার আছে, তাঁহারা সৌন্দর্য্যকে ভাস্বররূপে স্বর্গের দেবতাদের সঙ্গে বিচরণ করিতে

দেখেন। আবার, মর্ম্মে চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারাও তাঁহারা উহাকে দেখিতে পান। তাঁহাদের দৃষ্টিপথে যদি কখনো কোনো অতি সুরূপ মুখ বা আকৃতি পড়ে, তাহা হইলে উহাতে ঐশ শ্রী অনুভব করিয়া তাঁহারা চমকিত হন, এবং তাঁহাদের শরীরে অদ্ভুত শিহরণ উপস্থিত হয়। একাগ্রতা ভিন্ন যথার্থ আনন্দের অনুভূতি হয় না। বিদ্বানেরা গণিতের বা বিজ্ঞানের জটিল প্রশ্নের সমাধানে যে অতুল আনন্দ অনুভব করেন, তাহা একাগ্রতা হইতে উৎপন্ন। সুর ও লয়ের সঙ্গে আপনাকে বিলাইয়া দিতে না পারিলে, সঙ্গীতের আনন্দ পাওয়া যায় না। নায়ক নায়িকা পরস্পরের মিলনে যে নিবিড় সুখ অনুভব করে তাহা একাগ্রতাবশতঃ। এই সকল ক্ষণিক একাগ্রতার উদাহরণ হইতে স্থায়ী ব্রহ্মানন্দের অনুভূতির জন্য কত দূর একাগ্রতা আবশ্যক তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। অস্থায়ী খণ্ড আনন্দসমূহ স্থায়ী অখণ্ড আনন্দেরই অংশ।

অনেকের জীবনে এরূপ বিমল মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইয়াছে, যখন তাঁহাদের চিত্তে সৌন্দর্য্য, প্রীতি অনুরাগে পরিণত হইয়াছে, এবং মনোমধ্যে এক অপূর্ব্ব ত্রাসবিজড়িত আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে। সে সময়ে তাঁহারা অনুভব করিয়াছেন যে, পৃথিবী একটা নূতন জীবনীশক্তিতে পূর্ণ—এমন একটা প্রভায় উদ্ভাসিত যাহা প্রতীয়মান জগতের বস্তু নহে—যাহা সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আকর হইতে বিচ্ছুরিত। এবম্প্রকার উচ্ছ্রিত অনুভূতির অবস্থায় তাঁহাদের নিকট ঘাসের প্রত্যেক পাতাটী অর্থযুক্ত বলিয়া অনুভূত হয়—যেন অপূর্ব্ব আলোকের নির্ঝর—যেন অমরাবতীলগ্ন মরকত। আত্মা—যিনি দর্শক—যেন সহসা রহস্য-মন্দিরে নীত হইয়া বিস্ময় ব্যাকুল নেত্রে সত্যসুন্দরকে দর্শন করিতেছেন। এরূপ অনুভূতির ধারা অসাধারণ হইলেও, ইহাকে আমরা অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে পারি না। ইহা কতদূর সত্য, তাহা অতি সূক্ষ্ম পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিতে হইবে।

স্নায়ুবাহিত সংবাদ ব্যতীত অন্য কোনো অধিক বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণ দ্বারা ভৌতিক জগতের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না। কিন্তু সাধারণ মনুষ্যের বার্ত্তাবহ যন্ত্র ত্রুটিযুক্ত, এবং তাহা দ্বারা লোকে সহসা প্রতারিত হয়। রহস্যবাদীরা, প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে এই বার্ত্তাবহ যন্ত্রের সিদ্ধান্তকে সন্দেহ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যক্ষদর্শন বা তর্কজাল দ্বারা কখনো প্রতারিত হন নাই। তাহারা ইন্দ্রিয়জ্ঞানসাপেক্ষ জগৎকে পুনঃ পুনঃ অস্বীকার করিয়া চিরদিন বলিয়া আসিতেছেন যে, অন্য একটী পথ দিয়া—একটী অদ্ভুত বেতার যন্ত্রদ্বারা—একটী গূঢ় উপায় দ্বারা, জ্ঞাতা আত্মা সত্য পদার্থের জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের বা তর্কের উপর নির্ভর-শীল ব্যক্তিদের অপেক্ষা অনুভূতি সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা পূর্ণতর বিবেচনায়, যে সকল বার্ত্তা ধর্ম্ম, ক্লেশ ও সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া আসে, সেই সকল বার্ত্তাকে তাঁহারা জীবনের কেন্দ্রে স্থাপন করেন। সত্যের ক্ষুধা সকল দর্শনেরই জননী। ইহাই সত্যের অস্তিত্বের প্রমাণ। রহস্যবাদীদের মতে ইন্দ্রিয়ানুভূতি ব্যতীত চরম সন্তোষ লাভের অন্য পন্থা আছে। তাঁহারা সসীমের মধ্যে অসীমকে পাইবার আশা করেন; এমন কি অসীম অতীন্দ্রিয় জগতে বিচরণ করিতে সক্ষম। রহস্যবাদের প্রথম সূত্র—সত্যের অনুসন্ধান করা; এবং দ্বিতীয় সূত্র—আত্মা স্বয়ং সত্য, অতএব তিনি সত্যকে পাইবার আশা করেন, কারণ সমধর্ম্মী না হইলে মিলন অসম্ভব। * এই দুইটি সূত্রের অনুসরণ ও অনুশীলনের উপর রহস্যবাদীর আধ্যাত্মিক জীবন যাত্রা নির্ভর করে।

রহস্যবাদীদের মতবাদ যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়—কর্ম্মের উপর। এই মতে জীবাত্মা মূলতঃ পরমাত্মা হইতে নিঃসৃত বলিয়া পরমাত্মার সংযোগ-লাভে সমর্থ। এই জন্যই রহস্য-বাদীরা দাবী করেন যে যুক্তি ও তর্কের বহির্ভূত অলৌকিক জগতের রহস্য তাঁহাদেরই নিকট কিয়ৎপরিমাণে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। সত্য সত্যই সেই জগৎ যাহা বুদ্ধি ও যুক্তির অগম্য (যতো বাচা নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ), তাহা রহস্যবাদী ভিন্ন কি করিয়া স্থূল প্রত্যক্ষবাদীর জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে! পরিচ্ছিন্ন মন ও বুদ্ধি অপরিচ্ছিন্ন সত্তা বা জ্ঞানকে মনের বিষয়ীভূত করিতে পারে না। † দার্শনিকদের নিত্য সত্তা প্রাণহীন ও দুর্লভ, কিন্তু রহস্যবাদীদের পরম পদার্থ সজীব, সুলভ ও ভালবাসিবার যোগ্য।

রহস্যবাদী বলেন, "আমাদের মতবাদ প্রয়োগ-সাপেক্ষ বিজ্ঞান। ইহার বাহ্যিক বিবরণমাত্র শুনিয়া ইহাকে গ্রহণ করিও না, চাখিয়া ইহার স্বাদুতার পরিচয় লও। আমরা জ্ঞানী নই, আমরা কর্ম্মী। বিজ্ঞানের ও দর্শনের জ্ঞান সীমাবদ্ধ, কিন্তু আমাদের দৃষ্টি সীমাকে অতিক্রম করিয়া অসীম সত্যকে অনুভব করিয়াছে। সংখ্যালঘু হইলেও আমাদের সম্প্রদায়ের বিনাশ নাই।"

শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল

* আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলেন যে পূজা ও আরাধনা দ্বারা দেবতাকে পাইতে হইলে ভক্তকে স্বয়ং দেবতা হইতে হয়। "দেবো ভূত্বা দেবমর্চয়েৎ।"

† A finite and conditioned intelligence is never in a position to have a clear conception of an infinite and unconditioned substance.

৬

সৌদামিনী ঠাকরুণের পানসী সদর হইতে ফিরিতেছিল। খুব ভোর বেলা, অল্প অল্প কুয়াসা করিয়াছে। মালাধর বলিল—ভাল দেখা যাচ্ছে না মা, উই যে কালো কালো—উঁহু উঁহু ··ওদিকে কেন? ও হল গে বাঘা চৌধুরীর তালুক—আমাদের চকের সীমানা দক্ষিণের ঐ বাবলাবন থেকে।

চিন্তামণি বুড়া পিছনের গলুয়ে তামাক সাজিতেছিল। কলিকা ফেলিয়া মচ মচ করিয়া ছঁইএর উপর দিয়া চলিয়া আসিল। মালাধরের নির্দ্দেশমতো একটু ঠাহর করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সোজা বাঁশের লাঠি লইয়া চিরকাল তার কারবার, সীমানা-সরহদ্দ তল্লাস করিবার মত ধৈর্য্য তার ধাতে সয় না। কোটরের মধ্যে চোখ ছুটা চক চক করিয়া উঠিল। বলিল—মা ঠাকরুণ, ডাকব নাকি দাদামণিকে? তুমি একেবারে এক রাজ্যি কিনে ফেলেছ, দাদা আমার দেখবে না একটু?

এলোমেলো শয্যায় কীর্ত্তিনারায়ণ অঘোরে ঘুমাইয়া আছে, হাত-পা গুটাইয়া সব এক জায়গায় আসিয়াছে, ঘোড়ায় চড়িতে গিয়া আছাড় খাইয়া কপাল কাটিয়া গিয়াছিল, তার দীর্ঘ রেখা যেন জয়পত্রের মত আঁকিয়া আছে। চিন্তামণি ছুই পা আগাইয়া লেপটা আস্তে আস্তে কীর্ত্তিনারায়ণের গায়ের উপর তুলিয়া দিল। এবার মালাধরের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল—তুমি কি বলগো সেন মশাই, নৌকোটা লাগান থাক এইখানে। দাদামণিকে কাঁধে নিয়ে চকের উপর দিয়ে সোজা দেব এক ছুট। তোমার এই পানসীর আগে গিয়ে বাড়ী উঠব। রাজা তার রাজ্যিপাট দেখবে না, তাই কি হয়!

মালাধর ঘাড় নাড়িয়া তৎক্ষণাৎ সায় দিল—নিশ্চয়, নিশ্চয়—দেখ্‌বেন বই কি। ঐ একবার ছায়া দেখিয়ে গেলেই হ'ল। তারপর আমি রইলাম, আর রইল চকের প্রজাপাঠক। নজর নিদেনপক্ষে ষোল আনা ধরলেও একটি হাজার। এখন না দেখ, খাজনা দিতে ত আসতে হবে—তখন? আরে আরে বেটারা বেগেই চল্‌ল যে। ডাইনে মেরে ধর্‌ নৌকো।

সৌদামিনী ইহারই মধ্যে একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন। চোখে তার জল আসিয়াছিল। ঐটুকু এক চকে চিন্তামণির এত আহ্লাদ, আর পুরাণো আমলে কর্ত্তা যেদিন সেখহাটির গোটা পরগণা কিনিয়া ফেলিলেন! সে এক দিন গিয়াছে। সমস্ত দিন আমরুল শাক ঘসিয়া ঘসিয়া ঐ চিন্তামণি চাপরাশখানা সোনার মতো চকচকে করিয়া ফেলিল। চিন্তামণি আগে আগে চলিল, পিছনে কর্ত্তার পালকী, তার পিছনে পঙ্গপালের মত ঢালির দল। পাকা বাঁশের দীর্ঘ লাঠি উঠাইয়া সারবন্দী সকলে চলিয়াছে। সে-সব যেন কালকার কথা। মাসটা বৈশাখ, বড় গরম, খাই-খাই করিয়া রওনা হইতে একেবারে ঘোর হইয়া গেল। আকাশে খণ্ড চাঁদ উঠিতেছে। সৌদামিনী হাসিয়া বলিয়াছিলেন—বিয়ে করতে চলেছ সেন। উলু দেব? কর্ত্তা

রসিকতা করিয়া কি একটা শ্লোক আওড়াইলেন—আর ঘর ফাটানো হাসি! শ্লোক বলিতেন তিনি কথায় কথায়, সে সব সৌদামিনী এক বিন্দু বুঝিতেন না হাসিটা কিন্তু আজও স্পষ্ট কানে বাজে, হাসি ত নয়—যেন জোয়ারের ঢেউ, চারিদিক একেবারে তোলপাড় করিয়া দেয়।

আগে এসব জমিদারী কিছুই ছিল না, ঐ সেখহাটি হইতে জমিদারীর পত্তন। তাই লইয়া নরহরির সঙ্গে প্রথম মন কসাকসি বাধে। নরহরি সদুপদেশ দিয়া পাঠাইলেন—আর একবার বিবেচনা করতে বোলো, এ চাতালের উপর বসে বসে ভুঁড়ি দুলিয়ে পুঁথি পড়া নয়। কর্ত্তা ছিলেন ভালমানুষ লোক, সংস্কৃত ও উর্দ্দু জানিতেন চমৎকার। সে আমলের কালেক্টরীর বাংলানবিশ দেওয়ান। অবসর পাইলেই পণ্ডিত মহাশয়দের লইয়া কাব্যচর্চ্চা হইত। কিন্তু জমিদার হইয়া কাব্যের পুঁথি ক্রমশঃ সিন্দুকে উঠিল। মস্ত বড় ঢালির দল গড়িয়া উঠিল, দলের সর্দ্দার চিন্তামণি। হাঁক-ডাকে এমন যে নরহরি চৌধুরী—তার দলও কানা হইয়া গেল। কর্ত্তার সঙ্গে সঙ্গে সমস্তই প্রায় গিয়াছে। সেদিনের লজ্জাবতী বধূ সৌদামিনী বাঘিনীর মতো ঠাঁটটা কেবল আগলাইয়া বসিয়া আছেন, যখন-তখন কচি ছেলের দিকে চাহিয়া নিশ্বাস পড়ে, কবে যে সে মানুষ হইয়া উঠিবে!

হঠাৎ নৌকা ঘুরিয়া যাইতে সৌদামিনীর যেন চমক ভাঙিল। হুকুম দিলেন—এখানে বাঁধতে হবে না, চলুক যেমন চলছে—

মালাধর সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল—হ্যাঁ, হ্যাঁ—চালা, চালা নৌকা—তোড়জোড় না করে ফস্ করে অমনি বাঁধলেই হল—নাঃ? আপনি জানেন না গিন্নি-মা, চৌধুরীর ঐ ভূত-প্রেতগুলো হক্ না হক্ মাথায় লাঠি মেরে বসে। আখেরের ভাবনা ভাবে না। তারপর গলা নীচু করিয়া কহিল—কিন্তু একটুখানি ধরুক, মা। আমাকে নেমে যেতে হবে। আমার বাড়ী ঐ সোজা। মিছেমিছি ঘুরে মরব কেন অদ্দুর?

চিন্তামণি নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইল। সৌদামিনী বলিলেন—রাগ করলে, সর্দ্দারবুড়ো? অত বড় ঐ ছেলে পিঠে নিয়ে মাঠ ভাঙলে পিঠ তোমার কুঁজো হয়ে যাবে, বুক ফুলিয়ে লাঠি ধরতে হবে না আর কোনদিন।

ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া নদী-জলের দিকে তাকাইয়া চিন্তামণি দাঁড়াইয়া রহিল। মৃদু হাসিয়া সৌদামিনী বলিলেন—আমরা বাজে লোক কি না। সর্দ্দার আমাদের সঙ্গে কথা বলে না।

সর্দ্দার বলিল—বলাবলি আর কি মা, আর ত সেদিন নেই, বুড়ো অকর্ম্মা হয়েছি, দুধের ছেলেটাও বয়ে নিতে পারিনে। তাই বলি, ছুটি দাও এবার—চলে যাই—

সৌদামিনী খুব হাসিতে লাগিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন—আ—হা, সে বুঝি তুমি! অকর্ম্মা আমার ঐ ছেলে। যেখানে যাব, আঁচল ধরে সঙ্গে চলেছেন। ঐ ননীগোপাল আবার মানুষের মতো হয়ে তোমাদের সঙ্গে মহালে ঘুরবে—আ আমার কপাল!

চিন্তামণি রাগিয়া আগুন হইল। বলিল—তাই বুঝি সোণার পালঙ্কে তোমার ননীগোপালকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছ মা! কার ছেলে, হুঁশ আছে তা? খালি কাঠের উপর পড়ে রয়েছে, শীতে ধনুকের মতো হয়ে গেছে, কাপড়খানা গায়ে তুলে দেবার ফুরসৎ তোমাদের কারো নেই—এততেও মনোবাঞ্ছা পূরল না, মা?

ঘাটের উপর সারবন্দী সব বাছাড়ি নৌকা। মালাধর হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল—দেখিস্, দেখিস্—মাঝি, লাগে না যেন—সামাল, ঐ ডান পাশ দিয়ে—ঐ বালির চরটার ওখানে ধরবি। বলিতে বলিতেই কিন্তু ঠক্ করিয়া পানসীর মাথা একটা নৌকার গায়ে গিয়া লাগিল। ছইএর ভিতর হইতে অমনি মধুকণ্ঠের প্রশ্ন আসিল—কোন্ সুমুন্দি গো?

মালাধর বলিল—হেঁ হেঁ বাবা, গোলপাতা কাট্‌তে চলেছ? মেজাজ বড্ড গরম যে। থামো, থামো। আগে বসি গিয়ে কাছারী। সৌদামিনীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—মা, এই খুঁটো-সেলামী আদায় করে দেব আপনাকে বছরে পাঁচ শ টাকা।

আশ্চর্য্য হইয়া সকলে মালাধরের মুখের দিকে তাকাইল।

মালাধর গম্ভীর হইয়া ঘাড় নাড়িল। বলিতে লাগিল—আলবৎ। বাপের সুপুত্তর হয়ে সব খুঁটো-সেলামী

দিয়ে যাবে। এই গাঙ না হয় কোম্পানীর, পাড় ত আমাদের চকের সামিল। পাড়ে খুঁটো পুঁততে হবে না? কাছি মোর সব যে মাশুনা ঘুমোবেন, সে হচ্ছে না। এক এক খুঁটোর খাজনা চার চার আনা। দেখুন না কি করি।

সৌদামিনী চিন্তামণির দিকে ফিরিয়া হাসিমুখে বলিলেন—বোসো, বোসো সর্দ্দার। ঐ খুঁটো-সেলামী, দড়ি-সেলামী, কলসী সেলামী,—শুনে নাও সব মালাধরের কাছ থেকে। সর্দ্দার পাইক তুমি, কাজে লাগবে।

চিন্তামণি রুক্ষকণ্ঠে কহিল—ওসব আমাদের এখানে নয় গো, সেন মশাই। তোমার আগের মনিবের কাছে চলে থাকে ত চলেছে—আমাদের এখানে নিয়ম-কানুন আলাদা। আসল খাজনা—তাই মাপ হয়ে যায় কথায় কথায়—তার হেনোতেনো, ছাইভস্ম—

সৌদামিনী বলিলেন—কিন্তু এবার থেকে শিখে নাও গো সমস্ত। না শিখে উপায় কি? পেট ত মানবে না। সে আমল নেই আর। ছেলে যে এদিকে আমার দিগ্‌গজ হয়ে উঠছেন। 'ক' লিখতে একেবারে কেঁদেই খুন।

মালাধর প্রশ্ন করিল—কেন?

মুখ টিপিয়া হাসিয়া সৌদামিনী বলিলেন—বোধ হয় কৃষ্ণ নাম মনে পড়ে কিম্বা হয় ত কলম ভেঙে যায়—

এইবারে চিন্তামণির মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল। ঘুমন্ত ছেলের দিকে আর একবার স্নেহ-দৃষ্টিতে চাহিল। বলিল—ভাঙবে না? ওর কবজীর হাড় দেখেছ মা, চওড়া কি রকম? খাগের কলম টিকবে কেন ও হাতে? লাঠি—পাকা পাঁচ হাতি বাঁশের লাঠি, তার কমে হবে না কিছুতে⋯ এইবার দাদা-মণিকে আমি লাঠি শেখাব।

মালাধর বলিল—কিন্তু খোকাবাবু লেখেন ত বেশ। সদরেই ত দেখলাম এবার—

চিন্তামণি বাধা দিয়া অধীর কণ্ঠে কহিল—তার গরজটাই বা কি? কিচ্ছু দরকার নেই। পুঁথি পড়তে হয়, আনা যাবে পণ্ডিত-মশায়দের। তাঁরাই পড়ে পড়ে শোনাবেন। আর তোমরা এক কুড়ি নায়েব-গোমস্তা রইলে, দাদামণি লিখতেই বা যাবে কোন দুঃখে?

মালাধর তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া বলিল—তা ঠিক। কি দুঃখে লেখাপড়া করতে যাবেন। কিন্তু যা শিখেছেন উনি তাই বা জানে ক'জন? সদরেই দেখলাম এবার, দিব্যি ঢেরা সই দিয়ে ছিলেন—গোটা গোটা অক্ষর। কলম ভাঙা টাঙা মিছে কথা।

চিন্তামণি তখন আপনার ঝোঁকেই বলিয়া চলিয়াছে—হুকুম দাও মা ঠাকরুণ, দাদাকে আমি লাঠি শেখাই। বাড়ি যা খুলবে ও হাতে! আজ ওঁকে ভরসা করে দিতে পারলে না মা, কিন্তু ওস্তাদের নাম করে বলছি, দাদামণি আমার হাজার লোকের মহড়া নেবে একদিন। আমি বুড়ো মানুষ, আমি হয়ত থাকব না তুমি দেখো—

সৌদামিনী শান্ত দৃষ্টি তুলিয়া চিন্তামণির দিকে একটুখানি চাহিয়া রহিলেন। বলিলেন—ভরসা হল না, তাই বুঝি। এই বুঝলে তুমি সর্দ্দার? চকের নূতন কাছারী বাঁধা হোক্, পাইক-বরকন্দাজ নিয়ে ঢোল বেহারার পাল্কী হাঁকিয়ে তোমার দাদামণি সেখানে গিয়ে উঠবে। এখন এমনি এমনি গেলে তোমাদের ইজ্জত থাকবে কিছু? ওকি—ওকি—

নৌকা কূলের কাছাকাছি আসিতেই মালাধর লাফাইয়া পড়িল, চটিসুদ্ধ পড়িল গিয়া একেবারে কাদার মধ্যে নোনা কাদা—কে যেন যত্ন করিয়া ছানিয়া নিভাঁজ করিয়া রাখিয়াছে। মালাধরের হাঁটু অবধি তলাইয়া গেল। পানসীর সকলে হাসিয়া উঠিল। মালাধরের দৃকপাত নাই। দুই আঙুল দেখাইয়া সে কহিতে লাগিল—কিছু ভাবতে হবে না মা, এই দুটো মাস সবুর করুন আটচালা কাছারী ঘর তুলে দিচ্ছি। বাঁশ, খড় সব ভূতে যোগাবে, এক পয়সাও চাইনে সদর থেকে—মাত্তোর দুটো মাস—

মালাধর বাঁধের উপর দিয়া যাইতেছিল। হৈ-চৈ শুনিয়া তাকাইয়া দেখিল, একটু দূরে দল বাঁধিয়া কারা চাষে লাগিয়াছে। শব্দ-সাড়া খুবই হইতেছে, গরু বড় চলিতেছে না, লাঙলের মুঠা ধরিয়া দশ-বিশটা জোয়ান সারবন্দী দাঁড়াইয়া হাসাহাসি করিতেছে।

হাঁক দিল—কে রে?

লোকগুলা তাকাইয়াও দেখিল না। মালাধর বলিল—কার জমিতে কে লাঙল দেয়? শেষকালে জেলের ঘানি ঘুরিয়ে মরবি বেটারা? সব নতুন বন্দোবস্ত হবে, সেলামী লাগবে—হেঁ হেঁ মাগ্‌না নয়।

বাঁধের আড়াল হইতে ভানুচাঁদ যেন হঠাৎ পাতাল ফুঁড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। হাতে হুঁকা, দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে ভানু বলিল—তামাক ইচ্ছে করবে সেন মশাই? একেবারে সাজা রয়েছে। এসো না এদিকে।

মালাধরের কণ্ঠ এক মুহূর্তে একেবারে খাদে নামিয়া আসিল। বলিল—না বাবা, তামাক নয়। বলা হয়ে গেছে বড্ড। বলছিলাম ছোঁড়াগুলোকে, ওরা ত সব তোমাদেরই পাড়ার দেখছি—সবাই আমরা পাড়াপড়শী, পর ত নয়—তাই বলছিলাম, বাপধনেরা এই যে সকাল বেলা পরের জমিতে লাঙল নামিয়েছ,—একটা ফাসাদ যদি বাধে আমাদেরই ত দৌড়তে হবে।

ভানুচাঁদ বিস্ময়ের ভাবে কহিল পরের জমি হবে কেন? জমি ত আমাদের। বাঁধের গায়ে লাঠিটা ঠেস দেওয়া ছিল, অন্যমনস্ক ভাবে সেটা হাতে করিয়া তুলিল। বলিল—কেন, তুমি সেনমশাই, সমস্ত ত জান। মনে পড়ছে না বুঝি?

মালাধর তাড়াতাড়ি বলিল—পড়ছে বৈ কি, বাবা। জমি তোমাদের নয় ত কার আবার? সাত পুরুষে জমি তোমাদের। খুব মনে পড়ছে। হি-হি করিয়া মালাধর হাসিতে লাগিল। বলিল—দুপুর রাতে ঝপাঝপ কোদাল মারছিলে। কাছি খুলে ডিঙি গেল ভেসে। তিন দিন পরে দীঘলের বাঁধাল থেকে সেই ডিঙি রাখহরি নিয়ে এল। খুব মনে আছে।

ভানুচাঁদও হাসিতেছিল। হঠাৎ বলিল—কাছি খুলে গেল না হাতি। ও ঠিক তোমার কাজ। ডিঙি তুমি খুলে দিয়েছিলে। অন্ধকারে তখন ঠাহর করতে পারিনি যে—নইলে আর কিছু না হোক, হাতে ত কোদাল ছিল একখানা করে—

মালাধর জিভ কাটিল সর্ব্বনাশ! অমন কাজ করব আমি! না বাবা, কোদালের কোপ-টোপ তোমরা দেখে শুনে জায়গাবিশেষ ঝেড়ো। তেমনই খানিক হাসিতে লাগিল। হঠাৎ গলা খাটো করিয়া বলিল—কিন্তু সে ছিল রাত বিরেতের কাজ—সাক্ষী মেলে না, সে এক রকম মন্দ নয়। কিন্তু দিন-দুপুরে এই যে হৈ-হৈ করে গরু তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে—এটা কি রকম হচ্ছে বল ত? এখন যদি গ্রামের ওদের সব সাক্ষী মেনে দেয় এক নম্বর ফৌজদারী ঠুকে! চৌধুরী মশায়ের আর কি হবে, মরতে মরবি তোরাই ত, বাবা!

কে কথা বলেরে ভানু? আরে আরে আমাদের মালাধর যে! গলা শুনিয়া মালাধর পিছন ফিরিল। রঘুনাথ সর্দ্দার। সে একেবারে পিছনে আসিয়া পড়িয়াছে। আশ্চর্য্য হইয়া রঘুনাথ বলিল—কাল দেখে এলাম পরেশ উকিলের ওখানে ফিরলে কখন বল? কাজকর্ম্ম চুকল ত?

মালাধর তাচ্ছিল্যের স্বরে কহিল—ভারী ত কাজকর্ম্ম, হ্যাঃ। মেয়েমানুষ অবলা জাত—নিয়ে গেল নাছোড় বান্দা হয়ে···সমস্ত রাত মশা তাড়িয়ে মরেছি। তারপর? শরীর-গতিক ভাল ত বাবা? চৌধুরী মশায় আছেন ভাল?

রঘুনাথ কহিল—চৌধুরী মশায় বড্ড যে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

পাংশুমুখে মালাধর বলিল—কেন? কেন বল দিকি?

রঘুনাথ হাসিয়া বলিল—চাকরি-টাকরি দেবেন বোধ হয়।

মালাধর তাড়াতাড়ি কহিল—তা দেবেন বই কি এ ত আমাদের পেশা। চৌধুরী মশায় বিচক্ষণ লোক—জানেন ত সমস্তই। তা বেশ আমি দেখা করব ওঁর সঙ্গে—

এক পা দু'পা করিয়া মালাধর বেশ খানিকটা আগাইয়াই ছিল, এবারে সে হন হন করিয়া হাঁটিতে সুরু করিল। পিছন হইতে রঘুনাথ বলিল—দাঁড়াও, দাঁড়াও এক্ষুনি দেখা হয়ে যাবে। চৌধুরী মশায় চকের চাষ দেখতে আসছেন...

ততক্ষণে মালাধর পথ ছাড়িয়া সীমানায় পা দিয়াছে।

কিন্তু কি ক্ষণেই সেদিন রাত্রি পোহাইয়াছিল, গ্রামে পৌঁছিয়াও গ্রহ কাটিল না। মোড় ঘুরিয়াই বাঘ—স্বয়ং বাঘাহরি চৌধুরী। সঙ্গে আরও যেন কে—কে একজন মধ্যম-

পাড়ার যজ্ঞেশ্বর চাটুয্যে। তাকাইয়া দেখার ফুরসৎ মালাধরের ছিল না। সে দিকটায় পানের বরোজ ও সুপারি বন। ধাঁ করিয়া আগে ত রাস্তা হইতে নামিয়া পড়িল, তারপর কোন বনে ঢুকিবে সেটা পরের বিবেচনা। কিন্তু শনির নজর এড়ায় নাই। তীক্ষ্ণ কণ্ঠের হাঁক আসিল—কে? কে ওখানে?

মালাধর মুখ ফিরাইয়া কোন গতিকে কহিল—এই যে—আমি। প্রশ্ন করিয়াছেন শ্যামকান্ত, অবাক কাণ্ড বাপের সামনে শ্যামকান্তের গলার আজ এত জোর খুলিয়াছে, সেও চৌধুরীর পিছু পিছু চক দেখিতে চলিয়াছে। যজ্ঞেশ্বর আগের কথার খেই ধরিয়া বলিতেছিলেন—ফাঁকা মাঠের মধ্যে কাছারী করবেন কেন? সে সুবিধে হবে না, চৌধুরী মশাই। একখানা দেশলায়ের কাঠির ওয়াস্তা। তার চেয়ে যেমন ছিল—গ্রামের মধ্যেই থাকুক। ঐ মালাধরকে জিজ্ঞাসা করুন বরং। ও ত হাল-চাল সমস্ত জানে···

কথা শুনিয়া মালাধর ঘুরিয়া দাঁড়াইল। বলিল কিছু ভাববেন না, চৌধুরী মশাই। ভার আমাকেও দিন। কাছারী টাছারী সমস্ত বেঁধে দেব। চৌরি ঘর—আটচালা। দরোয়ানের দেউড়ী—সমস্তই। দুটো মাস সময় দেবেন শুধু—

চৌধুরী বলিলেন—তুমি ওখানে কি করছ?

মালাধর বলিল—আজ্ঞে আপনারই কাছে যাচ্ছিলাম।

হাসিমুখে নরহরি বলিলেন—পথটা বেছেছ ভাল। কিন্তু আমার কাছে কেন বল দিকি?

মালাধর ততক্ষণে দু'এক পা করিয়া রাস্তার দিকে আগাইতেছিল। অপ্রতিভ হাসি হাসিয়া বলিল—আর বলেন কেন মশাই, চাকরি—হা-হা-হা—ছা-পোষা মানুষ—চক দখল করুন, যা-ই করুন—চকের আদায়ের কাজটা যেন আমার থাকে। নতুন কাউকে বহাল করে বসবেন না। রঘুনাথও বল্লে সেই কথা—বল্লে, যাও, চৌধুরী মশায়ের সঙ্গে দেখা কর গিয়ে···তিনি ত জানেন সমস্ত।

শ্যামকান্ত ব্যঙ্গের সুরে কহিল—তা জানেন বটে, সমস্তই জানেন। তোমার চাকরি যাবে কোথায়? কেন, বরণডাঙার গিন্নি কি বলছেন—

মালাধর বলিল—আরে রামোঃ। বরণডাঙা করবে—মহাল শাসন! এক নম্বর মেয়েমানুষ, আর দুই নম্বর হ'ল এক পুঁটকে ছোঁড়া। চৌধুরী মশায়ের যমদূতগুলো কবে ঐ মা-ব্যাটা আর নায়েব-গোমস্তা সবসুদ্ধ গোটা চকটাই বিদ্যাধরীর তলায় রেখে আসবে, তার কিছু ঠিক-ঠিকানা আছে? আমাদের আখেরের ভাবনা আছে মশাই—বলিয়া সে একবার নরহরির দিকে, একবার আর সকলের দিকে চাহিয়া হাসিয়া উঠিল। শ্রোতারাও হাসিতে লাগিল।

হাসিলেন না কেবল নরহরি। গম্ভীরস্বরে বলিলেন—চাকরি তোমায় দেব, মালাধর কাল বিকেলে দেখা করো।

যে আজ্ঞে—বলিয়া তাড়াতাড়ি পায়ের ধূলা লইয়া মালাধর বিদায় হইল।

শ্যামকান্ত খানিক তাহার গমন-পথের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া অনেকটা যেন আপনার মনে বলিয়া উঠিল—আস্পর্দ্ধা কি লোকটার!

মৃদু হাসিয়া নরহরি বলিলেন—তা ঠিক, মালাধর আমাদের চক্ষুলজ্জা করে না। একটু চুপ থাকিয়া বলিলেন—তা ছাড়া চিরকাল এখানে কাজ করে আসছে। শ্যামগঞ্জে, এখন গণ্ডগোল জমে উঠল। বরণডাঙায়, বুড়ো বয়সে ও-ই যায় কোথায়?

শ্যামকান্ত বলিল—কিন্তু গণ্ডগোলের মূল ত ঐ। ও-ই ত বরণডাঙার গিন্নিকে আনল এর মধ্যে।

নরহরি হাসিয়া বলিলেন—আমাকে সুদ্ধ ঘোল খাইয়ে দিল। কম লোক মালাধর? তাই ত দেখা করতে বল্লাম। এবার ওকে নিশ্চয় বেঁধে ফেলব।

শ্যামকান্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—ওকে বিশ্বাস করবেন?

নরহরি বলিলেন—বিশ্বাস করব কেন? চাকরী দেব।

যজ্ঞেশ্বর বলিলেন—তা লোকটার ক্ষমতা আছে বটে। কিন্তু বাবাজী যা বললেন তাও দেখুন ভেবে। বড় বিশ্বাস-ঘাতক লোক—পয়সা পেলে লোকটা না পারে এমন কাজ নেই।

নরহরি বলিলেন—পয়সা কড়ি যাতে পায়, সেই উপায় করতে হবে তা হলে। ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির কে আসবে আমার তহশীলদার হ'তে। জমিদার বাড়ী হাতি-ঘোড়া

জীব-জানোয়ার পুষতে হয়, ঐ রকম মালাধরও ছ'চারটে পুষতে হয়। এসব আপনারা বুঝবেন না চাটুয্যে মশায়, চাকরী আমি ওকে দেবই। আর আমাদের ঐ বড়বাবুও ওকে পছন্দ করবেন—আমার চেয়ে বেশী করবেন।—এই আগে থাকতে বলে দিলাম।

৭

গামছা কাঁধে, তেল মাখিয়া জন সাত-আট দীঘির ঘাটে চলিয়াছে। হাঁক ডাক করিয়া মালাধর তাহাদের উঠানে আনিল। বলিতে লাগিল—সু-খবর শুনে যান দাদা, আর তহশীলদার নয়—সদর নায়েব, হেঁ হেঁ—একদম হরিচরণ চাটুয্যে। বিশটা সখীসোনা এখন শর্ম্মার মুঠোর মধ্যে। চৌধুরী মশায় বলছিলেন তাই—নায়েবও যা নবাবও তা। ঐ কেবল নামের হেরফের।

একজনে প্রশ্ন করিল—বাঘা চৌধুরীর চাকরী নিয়েছ নাকি ?

মালাধর চিন্তিত ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল—মুস্কিল ত হচ্ছে ঐ। দুই সূর্য্যের উদয় হল,—কার রোদে ধান শুকোই ? বরণডাঙার গিন্নি ত চুপ-চাপ বসে আছেন, বলেন—যা কর তুমি, মালাধর। আবার ওদিকে চৌধুরীও নাছোড়বান্দা। কাল বিকেলে গিয়ে চেক-মুড়ি আনতে বলেছে। মামলা আর মাথা-ফাটাফাটি চলুক এইবার। কে মালিক সাব্যস্ত হ'তে থাকুক। আমি ওসব তাতে নেই। আমার কি, আমি নির্গোলে আদায় করে যাব কাল সকাল থেকে।

পরদিন সকালে বরণডাঙা হইতে হারাণ সরকার আসিয়া উপস্থিত। বলিল—মা পাঠিয়েছেন।

এক গাল হাসিয়া নরহরি বলিল—বেশ, বোলো মা'কে। কিচ্ছু ভাবনা নেই। আদায়ের আরম্ভ আজ থেকে।

হারাণ চোখ-মুখ ঘুরাইয়া ফিসফিস করিয়া বলিল—তা যেন হল। কিন্তু চৌধুরী কাল চকে লাঙ্গল নামিয়েছিল। বলে, চক নাকি তার। চক হ'ল তার—আর আমরা যে পুঁটি মাছের মতো করকরে টাকা গুণে দিয়ে এলাম। সে হয়ে গেল ভুয়ো! মা তোমাকে ডেকেছেন আজ—

মালাধর বলিল—যাব বিকেলে।

পরদিন পুনশ্চ হারাণ আসিল।—কই ? কি হল।

মালাধর বলিল—একদিনে আর কি হবে-ভাই ? প্রজা পাঠক অনেক খবর হয়ে গেছে। দুটো মাস দেরী করতে বল। আটচালা কাছারী বাড়ী—দেউড়ি সমেত।

হারাণ বলিল—সে কথা নয় হে, তোমার বরণডাঙায় যাবার কথা। রোজ ওরা হৈ হৈ করে লাঙল চালাচ্ছে—দখল সাব্যস্ত করছে, বুঝলে না ? একটা বিহিত করা দরকার। মা'কে বলছিলাম, তাই—ফৌজদারী, দেওয়ানী দুটোই জুড়ে দেওয়া যাক। সেইসব ঠিক হবে আজকে। তুমি একবার চলো, সেন মশাই।

মালাধর বলিল—বিকেলে যাব।

হারাণ বলিল—কালও ত বলছিলে ঐ কথা।

মালাধর বিষম চটিয়া বলিল—আজকে আবার একটা নতুন কথা বলব না কি ? সে লোক আমি নই। বিকেল বেলা যাব, বলে দিও।

সকালের পর দুপুর, তারপরেই বিকাল আসিয়া থাকে। রোজই আসে। মালাধর বিকালে হয়ত যাইবেই, সেজন্য তাড়া কিছু নাই। কিন্তু প্রজাপাটক ডাকাডাকি করিয়া এদিকে মালাধর বিষম তাড়া লাগাইল। ভোরবেলায় হাত বাক্স কোলে করিয়া দুর্গানাম লিখিয়া সে চণ্ডী-মণ্ডপে বসে। পাইক-বরকন্দাজ নাই। কিন্তু তাহাতে যায় আসে না। বেলা প্রহরখানেক হইতে প্রজাদের বাড়ি বাড়ি নিজেই দপ্তর হাতে ঘুরিতে সুরু করে। এই রকম সন্ধ্যা অবধি চলে। সন্ধ্যার পর রেড়ির তেলের দীপ জ্বালিয়া আবার চণ্ডীমণ্ডপে বসে। কিন্তু আদায়পত্রের সুবিধা হয় না বিশেষ কিছু। লোকে জিজ্ঞাসা করে—কোন তরফের আদায় করছ, সেন মশাই ?

মালাধর বলে—তাতে দরকার কি বাপু, তোমাদের হকের খাজনা, শোধ করে যাও—ব্যস ?

—কিন্তু ওদিকে সদরে ছুটোছুটি আরম্ভ হয়েছে, সে খবর রাখো না ?

মালাধর বলে—নিষ্পত্তি ত হবে একটা। আমার এ কায়েমী চাকরী, আমি নড়ছিনে কিছুতে। আসে বরণডাঙা—ভাল, আসে চৌধুরী—আরও ভালো। আমি করচা

লিখে শেষ করে রেখেছি। মালিকের নামের যায়গাটা ফাঁক রয়েছে কেবল।

—তুমি কোন দলে সেন মশাই ?

মালাধর হাসিয়া বলে—তোমরা যে দলে। বরণডাঙার গিন্নি রোক টাকা গুণে দিয়েছে। সেটা ত আর মিথ্যে নয়। বেশ ত দেও টাকা, রসিদ দিচ্ছি, বরণডাঙার মোহর-মারা রসিদ—

—চৌধুরীর লোক এসে শাসিয়ে গেছে, ওদের টাকা দিলে ঘাড় ভাঙবে।

—তবে চৌধুরীর টাকাই দাও। কাঁচা রসিদ কিন্তু। কাল বিকেলে গিয়ে চেকমুড়ি আনবে, তখন এসো, একদম দখলে পেয়ে যাবে।

এত তর্কাতর্কি করিয়াও কিন্তু লোকগুলা গাঁটের টাকা গাঁটে লইয়া পিছাইয়া পড়ে।

একদিন উঠান হইতে আওয়াজ আসিল—মালাধর আছ ?

উঁকি মারিয়া দেখিয়া মালাধর তটস্থ হইয়া দাঁড়াইল। —এসো এসো রঘুনাথ সর্দ্দার যে। বলি, খবর ভালো ! চৌধুরী মশায় ভালো আছেন ?

রঘুনাথ বলিল—তলব হয়েছে।

—হবারই কথা। বিকেলে যাবো।

রঘুনাথ ঘাড় নাড়িয়া বলিল—উঁহু, এখনই।

মালাধর হাসিয়া বলিল—কেন, চৌধুরী মশায়ের ব্রাহ্মণ-ভোজনের ইচ্ছে হল নাকি ? কিন্তু আমি ত ব্রাহ্মণ নই।

রঘুনাথ বলিল—কর্ত্তার আমল নেই আর। শ্যামকান্ত গদী চেপে বসেছেন। এ দেবতা একেবারে কাঁচাখেগো। এখন আর ভোজন-টোজন নয়। একদম সোজা হুকুম, নিয়ে এসো সঙ্গে করে। না আসতে চায়, বেঁধে এনো।

মালাধর শুষ্কমুখে বলিল—ভয়ের কথা হয়ে উঠল বড্ড। কি করা যায় ?

রঘুনাথ হাসিয়া বলিল—আপাততঃ দুর্গা বলে উঠে পড়। জ্যান্ত বা মরা—বুঝতে পারলে না ?—চলো—

শ্যামকান্ত বিনা ভূমিকায় বলিল—জমিদারী এবার থেকে আমি দেখছি। বাবা আর খাটবেন কত ; আমার উপর ভার পড়ে যাচ্ছে। চাকরী নিতে হ'লে আমার খোসামোদ করতে হবে।

মালাধর সবিনয়ে বলিল—যে আজ্ঞে।

—তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি কেন, বুঝেছ ?

মালাধর একগাল হাসিয়া বলিল—বুঝেছি কতক কতক। চাকরি দেবেন, বোধ হয়।

শ্যামকান্ত কহিল না ; মুণ্ডপাত করব। সৌদামিনী ঠাকরুণ মামলা রুজু করেছেন—চক বেদখলের মামলা। সমস্তই তোমার কারসাজি।

মালাধর জিভ কাটিয়া ঘাড় নাড়িয়া মহা প্রতিবাদ করিতে লাগিল।—কক্ষনো না ; একেবারেই না। আমার গরজটা কি মশাই ? বিষয় আপনাদের যার হয় হোক গে, আমার সেহা-করচা নিয়ে সম্পর্ক। ষোল আনা হিস্যার মালিক সৌদামিনী দেব্যা না লিখে নরহরি চৌধুরী লিখতে আমার আর কি এমন বেশী খাটনি, বলুন।

—তবে বরণডাঙার হয়ে এত কাণ্ড করলে কেন ?

মালাধর বলিল—বরণডাঙা ? আমার বয়ে গেছে। চৌধুরী মশায়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চলছিল—হরিচরণ চাটুয্যে মধ্যবর্ত্তী। চাটুয্যে রাঘব বোয়াল মশাই, সমুদ্দুর শুষে নেয়, পান খাবার খরচা টরচা কি আদায় করল—ভাগের বেলায় তখন তাইরে নাইরে না। তখন মনে ভাবলাম, দুত্তোর—পুরোণো মনিবকে কিছু পাইয়ে দি এই ফাঁকে—ধর্ম্ম হবে। নুন খাই যার, গুণ গাই তার। তা হয়েছে মশাই, ভালই হয়েছে। প্রায় দুনোদুনি দর। সোনা-ওঠা চর —মেয়েমানুষ ছাড়া কে নিত অত টাকা দিয়ে ? মনিব মশায় রেজেষ্ট্রী অফিস থেকে টাকা বাজিয়ে নিয়ে সোজা বরিশালের ষ্টীমারে উঠে বসলেন।

শ্যামকান্ত হাসিয়া বলিল—আর তুমি এলে বুঝি নিরম্বু একাদশী করে ?

মালাধর ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল—ঐ ত ভুল করছেন, বড় বাবু। চৌধুরী মশাইও ঐ ভুল করলেন বলে

এত গণ্ডগোল। বলি, চাকর মনিব কি আলাদা? মনিব মশায় জানেন সব। আট টাকা মাইনে মশায়, রাত দিনের চাকরী, খোরাকী ওরই মধ্যে। তাও আজ আড়াই বচ্ছর মাইনে বাকী। মনিব কি ভাবেন, আমি বাতাস খেয়ে আছি?

শ্যামকান্ত হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল—চকের দলিলের নকল আছে তোমার কাছে, আমি সেইটে দেখব।

মালাধর ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আজ্ঞে না। সে ত নেই।

শ্যামকান্ত বলিল—সদরে গিয়ে খোঁজাখুঁজি করবার সময় নেই আর। বুধবারে মোকদ্দমার দিন। দলিল না দেখালে তোমার গলা কাটব।

মালাধর বলিল—দলিল কি গলার ভিতর রয়েছে বাবু?

শ্যামকান্ত হাসিয়া ফেলিল, না থাকে, সিন্দুকের ভিতরে ত আছে! সিন্দুক খুলবার মন্তোর আমি জানি। বাবা যা ভুল করেছেন, আমার বেলা তা হবে না। দাঁড়িয়ে রইলে কেন, মালাধর, বোসো—বোসো ফরাসের উপর। রঘুনাথ, দেওয়ানজীর সেরেস্তা থেকে জেনে এস বুধবারেই মোকর্দ্দমার দিন ত?

শ্যামকান্তের মন্ত্রটা কি প্রকার কে জানে, কিন্তু ফল তার হাতে হাতে। পুনরায় ডাকাডাকির আর আবশ্যক হইল না। মালাধর সন্ধ্যার পর আবার ক্রোশ দুই হাঁটিয়া সৌদামিনীর সেই দলিলের নকল চাদরে বাঁধিয়া লইয়া আঁধারে আঁধারে শ্যামকান্তের বৈঠকখানায় আসিয়া উঠিল। শ্যামকান্ত হাসিয়া বলিল—এইটে ত সেই? তোমায় বাপু কিছু বিশ্বাস নেই। প্রদীপের আলোয় শ্যামকান্ত মনে মনে পড়িতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে মুখ অন্ধকার হইয়া গেল। বলিল—আচ্ছা দলিল তো। বাঁধন-কসনের বাকী নেই কিছু। তবে অনর্থক মামলা করে কি হবে?

মালাধর কৃতার্থ হইয়া যেন গলিয়া পড়িবার যো হইল। বলিল—আজ্ঞে আমার কাজকর্ম্ম এই রকম। খুঁৎ পাবেন না। চাকরিটা দিন, দেখতে পাবেন, তখন

বিরক্ত মুখে শ্যামকান্ত বলিল—চক পেলে ত চাকরী? যত কিছু উৎপাত আসতে পারে, একটা একটা করে সব ত দলিলে ঢুকিয়ে বেঁধে ফেলেছ। মাথা ঢোকাবার একটু ফাঁক নেই।

মালাধর হাসিয়া বলিল—নেই, কিন্তু ফাঁক হতে কতক্ষণ। হুজুর যদি ইচ্ছে করেন, মাথা ত মাথা, হাতি ঢুকিয়ে দিতে পারি ওর মধ্যে।

শ্যামকান্ত বলিল—রেজেষ্টী কবলা, ওর উপর কি, চালাকী করবে?

মালাধর বলিল—হুকুম হয়ত হোসেনশা'র আমলের সনদ বেরিয়ে যেতে পারে। রেজেষ্টীর চেয়েও তার দাম বেশী। আসল হল, হুজুরের ইচ্ছে। বলিয়া আঙুলে কাল্পনিক টাকা বাজাইয়া মালাধর হাসিয়া ফেলিল। বলিল—হুজুর, কথাবার্ত্তাটা এবার আগে থাকতে আস্কারা হয়ে যায় যেন। সেবারের যত গোলমাল, সমস্ত ঐ দোষে। আরে বাবু, গণেশ পুজো না হলে মা দুর্গা ভোগ কি নেন কখনো? হ'ল না তাই। (ক্রমশঃ)

শ্রীমনোজ বসু
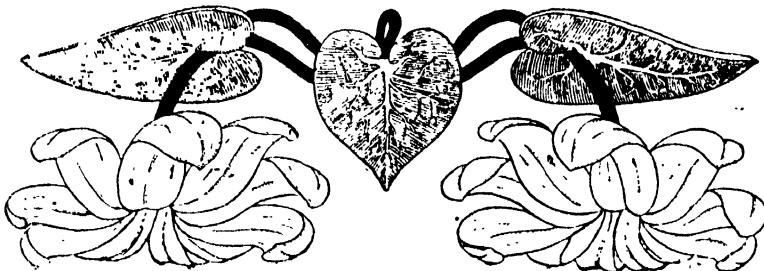
বেদনাই সহজ ধর্ম্ম

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম বি, এল

'সহজ' শব্দটী সহজাত অর্থে ব্যবহার করিতেছি এবং সহজাত ধর্ম্মকে জীবনের অপরিহার্য্য তথ্যরূপে গ্রহণ করিয়া আচার ধর্ম্মের সহিত তাহার সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে জীবজগতের সর্ব্বত্রই একটি বেদনা বোধের অস্তিত্ব আমরা অনুভব করিতে পারি। ইতর প্রাণীর কথাই যদি ধরি, তবুও দেখি পাখী তার ডিম অতি যত্নে তা' দেয় ও রক্ষা করে। ডিম আহরণ করিতে গেলেই মর্ম্মন্তুদ ব্যথায় চীৎকার করে, অপহরণকারীকে নখরা-ঘাতে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করে। পাখীর ইহা এক অস্পষ্ট অনুভূতি; বোধশক্তি দিয়া এই বেদনাকে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি সে করিতে পারে না; তথাপি তার ডিমটিকে বেদনার দ্বারাই সে পাইয়াছে এবং এই বেদনার দানকে নিজকে বিপন্ন ও বঞ্চিত করিয়াও সে রক্ষা করিতে চেষ্টা করে। পশুদের মধ্যে এ লক্ষণ আরো স্পষ্ট। হিংস্র বাঘিনীও তার শাবকের জন্য প্রাণে অনেকখানি বেদনা পোষণ করে। স্তন্যদুগ্ধ দান করিয়াই যে সে কেবল তার শাবকের যত্ন করে এমন নহে, অন্য জীবের আক্রমণ হইতে শাবকটিকে রক্ষা করার জন্য বাঘিনী সর্ব্বদাই তৎপর। এই জাতীয় লক্ষণ দেখিয়া আমরা অনায়াসে মানিয়া লইতে পারি যে পশুপাখীর এই বেদনাবোধ সাক্ষাৎভাবে তাহাদের শাবক পর্য্যন্ত বিস্তৃত। হইতে পারে ইহা এক অন্ধ অনুভূতি, তবুও নিজেদের দেহের বেদনালব্ধ শাবকগুলির সহিত পশুপাখীও যে একটা বেদনার সূত্র দ্বারা বাঁধা পড়িয়া আছে, তাহা অস্বীকার করার কোনো কারণ ত খুঁজিয়া পাই না। যূথবদ্ধ হইয়া যে সকল পশু বাস করে, তাহাদের বেদনা কখনো কখনো তাহাদের দলভুক্ত অন্য পশু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে দেখা যায়। গৃহপালিত পশু কুকুর ও ঘোড়া অনেক সময় তাহাদের বিপন্ন প্রভুর জন্য যে বেদনা অনুভব করে, তাহার বহু প্রমাণ অনেকেরই জানা আছে। কীটতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরাও বলিবেন এই বেদনাবোধের লক্ষণ কীটপতঙ্গের মধ্যেও অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। পশুপক্ষী ও কীট-পতঙ্গের জগৎ ছাড়িয়া দিয়া বৃক্ষ ও লতাগুল্মের জগতেও এই বেদনাবোধের অস্তিত্ব যে আছে তাহাও কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক গভীর গবেষণার ফলে লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আর কবির কথা যদি ধরেন ত বলিতে পারি কবি চেতন অচেতনের সীমারেখা ভুলিয়া গিয়া অজানা লোকের অনুপ্রেরণায় পাহাড় পর্ব্বতের ন্যায় জড়বস্তুর মধ্যেও চেতনা ও বেদনার সত্তা অনুভব করিয়াছেন :—

"মনে হ'ল এ পাখার বাণী
দিল আনি'
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।
পর্ব্বত চাহিল হ'তে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ।"
(বলাকা, রবীন্দ্রনাথ)

কবি এখানে এক ব্যথিত চিত্তের অস্ফুট বেদনার পরিচয় পাইয়াছেন। কবিদের যে সকল কথার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আমরা খুঁজিয়া পাই না, আমরা তাহাকে বলি নিছক কবি কল্পনা, অর্থাৎ অবাস্তব জিনিষ; কিন্তু এই অনুভূতি কি প্রকৃতই অবাস্তব? সোণার পাথর বাটি একটি অবাস্তব কল্পনা, অলঙ্কার শাস্ত্রের মতে ইহা যোগ্যতাহীন শব্দ সমাবেশ, কাজেই বাক্য নহে; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' ও অন্যান্য বহু কবিতায় যে বেদনা, আত্মপ্রকাশের আকুতিরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে চিত্ততন্ত্রী স্পন্দিত হইয়া উঠে, বেদনার রসে প্রাণমন পরিপূর্ণ হইয়া যায়; ঠিক যেন

"বলিতে না পারে স্পষ্ট করি'
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি'।"

আদ্যোপান্ত বেদনার রসে আপ্লুত ও অভিসিঞ্চিত রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এ কিসের বেদনা? ইহা কি উদ্গাত অঙ্কুরের মুক্তির বেদনা? সকল সৃষ্টি সকল স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার পশ্চাতেই রহিয়াছে এই অনন্ত বেদনা। বেদনার পথেই ভাব ও বস্তুকে অবলম্বন করিয়া অনাদি অতীত হইতে অনন্ত ভবিষ্যতের পথে এই জীবনের ব্যঞ্জনা চলিয়াছে। মুক্তির আনন্দ সৃষ্টির আনন্দ এই বেদনাকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হয়, ফুটিয়া উঠে। প্রশ্ন হইতেছে, এই বেদনা কি? আমরা প্রত্যেকেই আপনাতে আপনি অতৃপ্ত; আমরা প্রকাশ চাই, প্রসার চাই, অল্পে আমরা সুখ পাই না। এই যে না পাওয়ার অনুভূতি, এরই মধ্যে এক অনন্ত বেদনা এক অনন্ত ক্ষুধার পরিচয় রহিয়াছে। 'বলাকা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সকল গতি সকল মুক্তির পশ্চাতের এই বেদনাকেই গভীর ভাবে অনুভব করিয়াছেন :—

"শুনিলাম আপন অন্তরে
অসংখ্য পাখীর সাথে
দিনে রাতে
এই বাসা ছাড়া পাখী ধায় আলো অন্ধকারে
কোন্ পার হ'তে কোন্ পারে!
ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে
হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোন্ খানে।"

আমি বলিতে চাহিতেছি জীবন নিয়ন্ত্রণে কবির এই বেদনার অনুভূতি মোটেই অবাস্তব জিনিস নয়। জীবনের গভীরতম ক্ষেত্রে অজ্ঞাতলোকে ইহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

মানব সমাজে এই বেদনাবোধ নানারূপে আপনার অস্তিত্ব প্রকটিত করে। নদীগর্ভে বালক নিমজ্জিত হইতেছে, একটি যুবক অকস্মাৎ তাহা দেখিতে পাইয়া নিজের জীবনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া জলতলে ঝাঁপ দিয়া বালকটীকে সলিল-সমাধি হইতে কেন রক্ষা করিতে যায়? কেন প্রজ্জ্বলিত গৃহের অনলশিখার অভ্যন্তরে বিপন্ন শিশুকে উদ্ধার করার জন্য যুবকেরা ছুটিয়া যায়? কেনই বা অন্ধ আতুরের বেদনা ও দারিদ্র্যদুঃখ দেখিলে প্রাণ ব্যথিত হইয়া উঠে? রাজকুমার সিদ্ধার্থ কিসের প্রেরণায় দীন ভিক্ষুক বেশে সর্ব্বহারার কৃচ্ছ্রসাধ্য জীবন বরণ করিয়া লইলেন; যিশুখৃষ্ট কেন ক্রুশবিদ্ধ হইয়া প্রাণপাত করিতে গেলেন; নিমাই কেন জননীর স্নেহ, পত্নীর প্রেম উপেক্ষা করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া পাগল সাজিলেন? ইহার সর্ব্বজনবোধ্য সহজ উত্তর—এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হইবে যে এই অনন্ত বেদনাবোধই তাহার একমাত্র কারণ। ভগবান তথাগত ও যিশুখৃষ্টের জীবনের ইতিহাসে ইহা স্পষ্ট, অতি স্পষ্ট। বুদ্ধ, খৃষ্ট ও চৈতন্য এই বেদনারই ডাক শুনিতে পাইয়াছিলেন :—

"বেদনাদূতী কহিছে ওরে প্রাণ
তোমার লাগি জাগেন ভগবান।"

নরনারীর পারস্পরিক অনুভূতির মধ্যেও নিজকে রিক্ত ও উজাড় করিয়া দিয়া নবসৃষ্টির জন্য একটি বেদনা গুপ্ত রহিয়াছে। মায়ের যৌবনের ব্যথাকে কবি রূপ দান করিয়াছেন :—

"মা শুনে কয় হেসে কেঁদে
ছেলেরে তার বুকে বেঁধে
ইচ্ছা হ'য়ে ছিলি মনের মাঝারে।"

মা সন্তানের দেহমন গড়িয়া তোলেন বেদনার পথে নিজের সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিয়া। এই বেদনাই সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে। চির সুন্দরের রূপায়ন ও অনুভূতির প্রচেষ্টা অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়াছে এই বেদনার পথেই। সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান ও সকল প্রকার মানস সৃষ্টির পশ্চাতে আছে এই শাশ্বত বেদনা। বিশ্বের সমস্ত গতি ও প্রাণ-প্রবাহই যেন উৎসারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইতেছে আত্মপ্রকাশের বেদনা হইতে বেদনার পথে। আরো একটু নিবিড়ভাবে এই বেদনাকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিলে আমাদের বলিতে আপত্তি হইবে না যে এই বেদনাই আনন্দকে বুকে করিয়া সৃষ্টির অন্তহীন পথ বাহিয়া চলিয়াছে এবং এই বেদনার সহিত উপনিষদের ঋষি কথিত আনন্দ ওত-প্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে। ঠিক যেন নারায়ণের বক্ষলগ্না লক্ষ্মী বা লক্ষ্মীর বক্ষলগ্ন নারায়ণ। এই আনন্দ বা বেদনা মূলতঃ অবিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য। আমরা বৈষ্ণব রসশাস্ত্র ও অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বের এবং যুগলমূর্ত্তির মধ্যে যে অনবদ্য সত্য রহিয়াছে তাহা এই আনন্দ ও বেদনার তথ্য দিয়া উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতে পারি। বেদনা এমনই একটি সত্তা যা ছাড়া আনন্দের অনুভূতি সম্ভবপর হয় না। Our Sweetest

songs are those that tell of saddest thoughts. আত্মনিহিত আনন্দই বেদনার পথে প্রকাশমান আনন্দরূপে আবার ফুটিয়া উঠে—গর্ভযাতনার ভিতর দিয়া পদ্মকোরকতুল্য সুন্দর শিশুর মত। বেদনার পশ্চাতে লগ্ন হইয়া রহিয়াছে শাশ্বত আনন্দ যার লীলায়িত গতি বেদনারূপে আবার সেই আনন্দকেই প্রকাশিত করে। বৈষ্ণবেরা বলিতে পারেন যে এই বেদনাই সেই বিরহিণী রাধা যাঁর অশ্রুপাথারের ভিতর দিয়া আনন্দস্বরূপ কৃষ্ণ আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন!

যে বেদনার কথা আমি বলিতেছি, তাহা আমাদের সকলের অনুভূতিগ্রাহ্য শাশ্বত বস্তুরূপে উপলব্ধি করা সম্ভবপর বলিয়া মনে করিতেছি। জাগতিক সকল সম্বন্ধের মধ্যেই রহিয়াছে এই বেদনাবোধ। সমাজবন্ধনের ইহা যোগসূত্র। বিশ্বজগতে চেতনার অভিব্যক্তির তারতম্যানুসারে আমাদের নিকট কোথাও ইহা অব্যক্ত, কোথাও ব্যক্ত বা অর্দ্ধব্যক্ত। প্রাণপ্রবাহের মধ্যে যে বেদনাবোধের সন্ধান আমরা পাইতেছি গতিবেগসমন্বিত মানব সমাজের কর্ম্মস্রোত তাহারই উৎসারিত চলমান রূপ। এই কর্ম্মস্রোতের একত্ব ও অবিভাজ্যতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া ইহাকে আপাতদৃষ্টিতে তিনটী স্বতন্ত্র ধারায় বিভক্ত করিয়া দেখিলে মানবেতিহাসের অনেক কিছু তথ্য আমাদের নিকট স্পষ্ট হইয়া পড়ে। কর্ম্মস্রোতকে এইরূপ ত্রিধারায় ভাগ করিয়া দেখা সভ্য মানবের চিন্তায় নূতন নহে। হিন্দু শাস্ত্রে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম,—এই ত্রিবর্গের সাধনা সামাজিক জীবনে শিক্ষার অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পাশ্চাত্য জগতের চিন্তাশীল পণ্ডিতগণের কেহ কেহ কর্ম্ম-স্রোতের তিনটী মূল উৎসের কথা কহিয়া থাকেন। Power (ক্ষমতাস্পৃহা) Wealth (ধনস্পৃহা) এবং Sex (কাম) রাসেলের মতে কর্ম্মের এই তিনটী উৎস। ফ্রয়েড শুধু যৌন কামনা Sex দ্বারাই মানব সমাজের অধিকাংশ ক্রিয়াশীলতার ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব।

হিন্দু চিন্তার ধর্ম্ম, অর্থ, কামের—ধর্ম্ম বলিতে ধর্ম্মের আচার অর্থাৎ মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের প্রদত্ত ধর্ম্মসাধনার বিধি, অর্থ বলিতে অর্থশাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট ধনার্জ্জনের প্রণালী এবং কাম বলিতে বাৎস্যায়ন প্রভৃতি মুনিজন লিখিত কামসেবার উপায় বুঝিতে হয়। প্রাচ্যই হউক, আর পাশ্চাত্যই হউক, এই উভয় চিন্তায়ই কর্ম্মপ্রবাহের এই তিনটী ধারার মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ পরিকল্পিত হইয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ ধরিয়া লইয়াছেন কাম ও অর্থের ব্যবহারিক দিকটাকে যথাসম্ভব সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করাই তাঁহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য নহে, সমাজ সংস্থিতির জন্য অর্থ ও কামের, বিশেষতঃ কামের উপর পীড়ন ও তাহার একান্ত নিরোধ তাঁহারা অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে করিয়াছেন। এদেশে অর্থের ব্যবহার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিধান দ্বারা এক সময়ে নিয়ন্ত্রিত হইত এবং এখনো যথেষ্টভাবেই নিয়ন্ত্রিত হয়। ধনোপার্জ্জনের পথে হিন্দুকে আজকালও যথেষ্ট নিষেধ বাধা মানিয়া চলিতে হয়, এবং সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের বাহুল্য দ্বারা অর্থ ব্যয় করিয়া ধার্ম্মিক হিন্দুকে পরকালের পথ সুগম করিতে হয়। ধর্ম্মজীবনের অনুশীলনে কাম ও অর্থ—কামিনী ও কাঞ্চন কোনো কোনো ক্ষেত্রে একেবারে বহিষ্কৃত। এই জাতীয় চিন্তাপ্রসূত দেশাচারের ফলে মানব সমাজের ইতিহাস হইয়াছে ধর্ম্ম অর্থ ও কামের সংঘাতের ইতিহাস। ইহাতে মানুষের শক্তির—তাহার অগ্রগতির পাথেয়ের—কতখানি অপচয় হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা দুষ্কর।

আমার মনে হইতেছে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের মধ্যে মূলতঃ কোনো বিরোধ নাই। বিশ্বের অন্তর্নিহিত প্রকাশের বেদনা হইতে উৎসারিত একই স্রোত বা প্রবাহের এই তিনটী ধারা মাত্র। বেদনাকে আমি জীবনের অপরিহার্য্য ও একমাত্র ধর্ম্ম বলিতে চাহিতেছি। এই ধর্ম্ম হইতে বা ধর্ম্মের পথে উৎসারিত কর্ম্মপ্রবাহকে তিনটী ধারায় বিভক্ত করিয়া আঁকিয়া দেখানো যাইতে পারে।

বেদনাই সহজ ধর্ম্ম
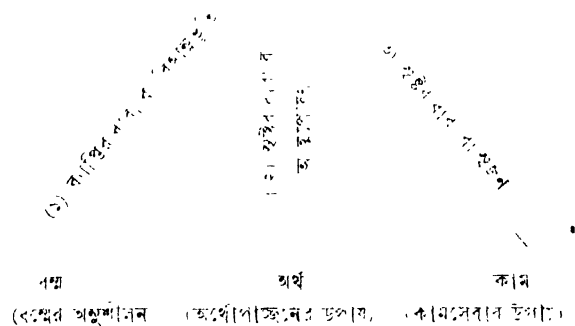
(১) ব্যাপ্তি বা বিশ্বানুভূতি :—জীবনের অনেকগুলি ক্রিয়া বেদনা হইতে স্বতঃ উৎসারিত হইলেও সাক্ষাৎভাবে তাহাদিগকে সৃজনমূলক বা আত্মপোষণমূলক ক্রিয়ার পর্য্যায়ভুক্ত করা যুক্তিসঙ্গত হয় না। অনেকে এই চেষ্টা করিতে গিয়া কষ্ট কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সিদ্ধার্থ বিম্বিসারের যজ্ঞস্থলে ছাগ শিশুর প্রাণ রক্ষা করিতে গিয়া আত্মবলি দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, বিশ্বের দুর্নিবার দুঃখে নিজের দুঃখরূপে অনুভব করিয়া বিশ্বের হিতার্থে আপনাকে সর্ব্বসত্ত্বায় লুটাইয়া দিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়াছিলেন। বেদনাবোধ ইহার কারণ হইলেও তাহা সৃজনমূলক বা আত্মসংরক্ষণমূলক বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলে উপলব্ধি বিভ্রাট ঘটিবার অবকাশ রহিয়াছে। স্বাভাবিক বেদনার প্রেরণায় মানুষ বিপন্নকে উদ্ধার করে, দরিদ্রকে দান করে। নফর কুণ্ডুর ন্যায়, মেথরের প্রাণ রক্ষাকল্পে, আত্ম বিসর্জ্জনও দেয়। সামান্য চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে এই জাতীয় অনুভূতি হইতেই মানব সমাজে সেবাধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই শ্রেণীর ক্রিয়াকে বিশ্বানুভূতিমূলক বা ব্যাপ্তিমূলক ক্রিয়া বলিয়া অভিহিত করা সঙ্গত বলিয়া মনে করি। বেদনার অনুপ্রেরণায় যে সেবা ব্যক্তি বা সঙ্ঘের পথে সমাজে অনুষ্ঠিত হয় তাহাই জীবনের বাস্তব ধর্ম্ম বা আচার ধর্ম্ম। যে সকল আচার অনুষ্ঠান এই সেবাধর্ম্মের অনুশীলনকে রুদ্ধ ব্যাহত ও ক্ষুণ্ণ করে, জীবনের মুক্ত ধারাকে স্তব্ধ করিয়া দিয়া জীবনকে যন্ত্রে পরিণত করে, তাহা পূজা পার্ব্বণের ঘটায় ও ধূপ ধুনার গন্ধে শুচিশুভ্রবেশ পরিধান করিয়া প্রকটিত হইলেও ধর্ম্ম নহে। ধর্ম্মানুশীলনের কষ্টিপাথর হইতেছে বেদনা।

"জগৎ হ'য়ে র'ব আমি একলা রহিব না,
মরিয়া যাব একা হ'লে একটী জলকনা।"
('স্রোত'—রবীন্দ্রনাথ)

নিজের মধ্যে যে জীবনধারা প্রবাহিত, তাহা বিশ্বের জীবন প্রবাহ হইতে অভিন্ন এই অনুভূতি হইতে অহিংসা বা জীবে দয়ামূলক ক্রিয়ার উৎপত্তি। এই শ্রেণীর কর্ম্মের আচরণ বাস্তবিকই ধর্ম্মানুশীলন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে কূট তর্কের অবতারণা না করিয়া, মঠে মন্দিরে ও ভজনালয়ে ভগবানের উদ্দেশে মাথা না ঠুকিয়া এ ধর্ম্মাচরণ সম্ভবপর। বাস্তব জীবনে ভগবান বুদ্ধের ন্যায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কিত প্রশ্নে নীরবতা অবলম্বন করাই ত উচিত।

সেবাধর্ম্মের অনুশীলনে এখানে যে আত্মপ্রসারণের কথা বলিতেছি তাহা আত্মসংরক্ষণ বা সৃজনমূলক ক্রিয়ার—অর্থ ও কামের, পুষ্টি ও সৃষ্টির—বিরোধী নহে। এই ধর্ম্মের আচরণের জন্য ঐ দুইটী ক্রিয়ার সঙ্কোচ সাধনের কোনো প্রয়োজন নাই, বরং তা করিতে গেলে প্রকৃত ধর্ম্মানুশীলনকেই ব্যাহত করা হয়।

(২) পুষ্টির ধারা—আত্মপোষণ ও সংরক্ষণ :—

এই কর্ম্মধারার উৎসও বেদনা। শিশু জন্মিবামাত্রই মাতৃস্তন্য পান করিতে গিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য যে ক্রিয়াশীলতার পরিচয় দেয়, উদ্ভিদ যে অপরিহার্য্য নিয়মের বশে থাকিয়া মাটি হইতে রস সংগ্রহ করিয়া আত্মপোষণ করে, মানব সমাজে এই জাতীয় ক্রিয়ার পরিণত অবস্থার নামই অর্থসেবা। জটিল অর্থনীতিশাস্ত্র ইহারই সূত্র ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। অর্থসেবাকে জীবনের ভিত্তি ও সমাজ বিবর্ত্তনের মূলনীতি বলিয়া ধরিয়া লইয়া ঈশ্বরবিশ্বাস-মূলক ও ভয়জনিত আচার ধর্ম্মের উপর এক শ্রেণীর চিন্তাশীল পণ্ডিতগণ আক্রমণ করিয়াছেন এবং ঈশ্বরবিশ্বাসকে লোপ করিয়া সামাজিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করিতেছেন। ইহাতেও ভুলের সম্ভাবনা যথেষ্টই আছে। এই অর্থসেবা যতক্ষণ পর্য্যন্ত পূর্ব্বকথিত বেদনামূলক ক্রিয়ার পরিপোষক ও সহায়ক ততক্ষণই মানব জীবনে ইহার সার্থকতা আছে। এই অর্থসেবা বিশ্বানুভূতির প্রতিকূলতা করিলেই ইহা হইয়া উঠে কল্যাণের পরিপন্থী। এই প্রশ্নটীর দুইটা দিক আছে। ইহাতে একদিকে সমাজে ধনিক প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে এবং অন্যদিকে সমানাধিকারবাদের আদর্শে শ্রমিক প্রভুত্ব সমাজে স্থাপন করিতে গেলে ব্যাপ্তি ও সৃষ্টির ধারা ক্ষুণ্ণ ও সঙ্কুচিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সামাজিক জীবনে অর্থসেবার প্রাধান্য মানিয়া লইয়া বিশ্বানুভূতি ও সৃজন-মূলক ক্রিয়াকে তাহার অনুগামী করা মোটেই নিরাপদ নহে।

সৃষ্টির ধারা—সৃজন :—

এই শ্রেণীর ক্রিয়ার পশ্চাতেও রহিয়াছে বেদনাবোধ। শিল্পীর বেদনা, কবির বেদনা, বৈজ্ঞানিকের সত্যানুসন্ধানের